নগর পারে রূপনগর

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

বাবা ও মা-কে

এই লেখকের

কাল, তুমি আলেয়া
শিলাপটে লেখা
সাত পাকে বাঁধা
জানালার ধারে
অলকাতিলকা
রাত্রির ডাক
প্রতিহারিণী
উত্তর বসন্তে
বলাকার মন
নবনায়িকা
নিষিদ্ধ বই
মহুয়া কথা
সমুদ্র সফেন
সাবরমতী
অগ্নিমিতা
রোশনাই
রাগশর
দ্বীপায়ন
একজন মিসেস নন্দী
বাজীকর
পঞ্চতপা
চলাচল

ঐ নাটক

[illegible]

প্রথম পর্ব

॥ এক ॥

বাইরে থেকে দেখতে গেলে শহর কলকাতার চেহারাটা সেদিনও খুব বদলায় নি।

অথচ বদলাবার কথা। শুধু কলকাতার নয়, সমস্ত দেশের। কারণ, বহু কালের বহু যুগের বহু সহস্র দিন থেকে এই দিনটার অনেক তফাত। ঘড়ির বিলিতি হিসেব ধরলে ঠিক এই দিনটার নয়, পরের দিনটার। যে দিন রাত বারোটার পরে শুরু হবে। কিন্তু ভাবের দিক থেকে আজকের এই দিনটার সঙ্গেই এক বিশেষ লগ্নের যোগ। আর একদিন নয়, আজই—আজই রাত বারোটার পরে।

বহু প্রত্যাশায় এক বিপুল আলো দপ করে জ্বলে উঠবে। সেই আলোর বন্যায় গোটা দেশ ভেসে যাবে। দু'শ বছরের জমাট বাঁধা অন্ধকার খান-খান হয়ে ইতিহাসের গুহায় মিলিয়ে যাবে।

পলাশীর পাপের কাল শেষ হবে।

কিন্তু তবু কলকাতার এই দিনটাকে অন্য সব দিন থেকে খুব অন্য রকম মনে হয়নি। প্রতি দিনের মতই এই দিন সূর্যের মুখ দেখেছে। সকালের কাগজ বিলি হ..র সঙ্গে সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্য একটু উদ্দীপনার ছোঁয়া পেয়েছে সকলে। অন্যান্য জায়গার মানুষদের মিলিত ইচ্ছার বেগ কোন্ মোহনার দিকে গড়িয়েছে তার কিছুটা হদিস মিলেছে। খবরের কাগজের সম্পাদকরাও কিছুটা উদাত্তগম্ভীর ভাবের ছোঁয়া দিয়ে গেছেন। নেতাদের বিবৃতি আর বাণী সকলে সেদিন হয়ত একটু বেশি খুঁটিয়ে পড়েছে। এই দিনের আর আগামী দিনের সরকারী-বেসরকারী অনুষ্ঠানসূচীগুলির ওপর সকলে হয়ত একটু আগ্রহ সহকারেই চোখ বুলিয়ে নিয়েছে।

তারপর মোটামুটি বাঁধা ছকে বেলা গড়িয়েছে। সকাল গেছে, দুপুর গেছে, বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যার ছায়া নেমেছে। তখনো কোনো ঘটা নেই তেমন। ঘটা যদি কিছু লেগে থাকে তো সে শহরবাসীর বুকের তলায়। ঘণ্টা কতকের মধ্যে দু'শ বছর পরে ভারতের আকাশে যে নতুন তারার উদয় হবে সে কথা ভেবে বুকের তলার রোমাঞ্চ যদি চোখের কোণে চিকচিকিয়ে উঠে থাকে, তো সেও গোপনে।

কারণ তখনো বেশি আশা করতে ভয়।

আশার তলায় তলায় আশঙ্কার ছায়া। উল্লাসের সঙ্গে সঙ্গে কি-হয় কি-হয় আতঙ্ক। গত এক বছর ধরেই এখানকার জীবনের সহজ ধারা গেছে। গেছে হয়ত গোটা দেশটারই। কিন্তু যেখানে যে বাস করছে। সেখানকার ক্ষতটাই সে

বড় করে দেখে। তবু গত এক বছরের মধ্যে এই বাংলা দেশের ক্ষতটাই সব থেকে বড় হয়ে উঠেছিল বোধ করি। কলকাতা তখনো অ-ভঙ্গ বাংলার হৃৎপিণ্ড। এই হৃৎপিণ্ডের ওপর অবিশ্রান্ত নিষ্ঠুর আঘাত পড়ছে একটা বছর ধরে। পড়ছেই আর পড়ছেই। এই হৃৎপিণ্ডের ওপর জিঘাংসু ছুরির ঘা বসছে অবিরাম। বসছেই আর বসছেই।

একটানা এক বছর ধরে এখানে একটা জিনিস বড় সুলভ, ভারী শস্তা। মানুষের জীবন। চাইলেই পাবে। অসতর্ক হলেই দিতে হবে। দু-দশ টাকায় জীবন বিকিয়েছে, শুধু হিংসার আনন্দে জীবন লুটিয়েছে। মহানগর শ্মশানপুরীর মত। ঘাতকের ছুরি আর গুলীর ভয়ে বন্দীশালার মত। কার যে কখন টান পড়ে ঠিক নেই।

দীর্ঘ এক বছর ধরে এখানে মৃত্যুর ক্রূর অন্ধকারে জীবন দুলেছে।

ক্রমে ব্যাপক তাণ্ডব থেমেছে বটে, কিন্তু জীবন-ছিনতাইয়ের নেশা ঘোচে নি। সকালের কাগজ খুলেই ছেলে-বুড়ো প্রথমে দেখবে কোথায় কি গণ্ডগোল হয়ে গেল, কোথায় কারফিউ হল, কোন্ জায়গায় জীবনযাত্রা কত ঘণ্টার জন্য অচল হয়ে গেল। এই বিচ্ছিন্ন অথচ একটানা গোলযোগের পিছনেও নির্বোধ পরিকল্পনা ছিল, হিংস্র আশা ছিল। বুদ্ধিভ্রংশ প্রেরণার যোগানদার ছিল।

কোনো দুই ভাইয়ের অঢেল পৈতৃক সম্পত্তি আর গোটাকয়েক ঘর-বাড়ি ছিল। ছোট ভাই নানান কৌশলে বহু বিঘ্ন সৃষ্টি করে বিষয়-আশয় ভাগ-বাঁটোয়ারার ব্যবস্থা করল। চুল-চেরা ভাগ হল। নিজের দিকটা আট-ঘাট বেঁধে বুঝে নিল সে। তারপর আবার হামলা শুরু করল। বড় ভাই বলল, এ কি রকম ব্যবহার হে?

ছোট বললে, খাস পৈতৃক বাড়িটা তোমার ভাগে পড়েছে। কিন্তু ওই বাড়িটা আমি ছেলেবেলা থেকে নিজের বলে জেনেছি, ওটার সঙ্গে আমার কত স্মৃতি জড়ানো, তাই বাড়িটাতে আমারও কিছু অধিকার থাকা দরকার। ছোট ভাইকে ওটা গোটাগুটি দিয়ে দিলেই ভাল হয়, নেহাত যদি আপত্তি থাকে তো ওটা দুজনারই হোক।

দেশের ছোট ভাইয়ের দল এই একই রাস্তায় পা বাড়ালে। রক্তের বিনিময়ে দেশটাকে দুখণ্ড করা গেছে যখন, এই রাস্তা ধরেই কলকাতা মিলবে না কেন? এটা যে খাস পৈতৃক বাড়ি। উদার মনে সবটা দিয়ে দিলেই ভাল হয়—কিন্তু নেহাত যখন আপত্তি, দুজনেরই অধিকার থাক ওতে।

ক'টা দিন আগেও ছোট ভাইয়ের তরফ থেকে এই দাবি শোনা গেছে,

পনেরোই আগস্টের পরেও কলকাতায় দুই সরকারের রাজধানী থাকবে। অন্যথায় শান্তি দূরের বস্তু।

দিন এগিয়ে আসছে, থেকে থেকে তখনো এই ইন্ধন পুষ্ট হয়ে উঠছে। গত তেশরা জুলাই পশ্চিম বাংলার নতুন কংগ্রেস মন্ত্রিসভার শপথানুষ্ঠান হয়ে গেল, তার পরেও এই দাবির রেশ কানে আসতে লাগল। তখনো শান্তি দূরের বস্তু। কলকাতা প্রাপ্তির আশা গেল, কিন্তু সীমানা নির্ধারণের বহু বিবাদ-বৈষম্যের রফা হতে বাকি—তাই তখনো শান্তি দূরের বস্তু। আগস্ট মাস এসে গেল, পদ্মার ওপার থেকে নতুন করে আবার একটা হানাহানির আর্ত রব শোনা গেল। ন'ই আগস্ট সকালে গান্ধীজী কলকাতায় পদার্পণ করলেন, বিকেলে তিনি রওনা হবেন নোয়াখালির পথে।

কিন্তু যাওয়া হল না। কলকাতাতেই আটকে গেলেন তিনি।

কারণ, শান্তি যে তখনো সর্বত্রই অনেক দূরের বস্তু। ঘরের শান্তি স্থির না হলে দূরের শান্তির অস্থিরতা ঘোচাবেন কি করে? বৃদ্ধ জনকের গলার শিরা-উপশিরা ফুলে উঠল, তিনি তারস্বরে প্রার্থনা করতে লাগলেন, স্বাধীনতার শুচিতা উপলব্ধির জন্যেই হানাহানি বন্ধ হোক। বন্ধ হোক, বন্ধ হোক, বন্ধ হোক।

কিন্তু কলকাতার বুকে যে তখন অনেক রক্ত ঝরেছে, অনেক আগুন জ্বলেছে। তাই বেদনাহত শিশু অবুঝ অভিমানে অনেক সময় যেমন নিজের মায়ের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, তেমনি ক্ষিপ্ত শোকার্ত বিভ্রান্ত এখানকার অবুঝ তরুণ শক্তির একাংশ। তারা গর্জন করে উঠল, বৃদ্ধ, তুমি ফিরে যাও, আমরা কাউকে চাই না, শান্তির জন্যে আমরা অনেক দিয়েছি, এবারে অশান্তির মধ্যেই চরম নিষ্পত্তি হয়ে যাক।

শান্ত কণ্ঠে জনক ঘোষণা করলেন, শান্তির প্রার্থনা সম্বল করে তাহলে এই-খানেই আসন নিয়ে বসলাম আমি। শান্তির ব্রত ভঙ্গ হলে জীবন উৎসর্গ করা ছাড়া উপায় থাকবে না।

একটা করে দিন যায়। সেই দিনটা এগিয়ে আসছে। যত আশা ততো আশঙ্কা, যত উদ্দীপনা তত উৎকণ্ঠা। ভিতরে যত আগ্রহ, বাইরে ততো নিস্পৃহ-তার প্রলেপ।

তারপর এই দিন। চোদ্দই আগস্ট।

রাত বারোটা বেজে এক মিনিট পেরুলে ভারতের প্রথম মন্ত্রিসভা কার্যভার গ্রহণ করবেন। জ্যোতিষীর বিচারে পনেরই আগস্টের প্রথম প্রভাত অশুভ। তাই এই মাঝামাঝি ব্যবস্থা।

চোদ্দই আগস্টের বিকেল বিদায় নিয়েছে। সন্ধ্যা নেমেছে।

দিল্লীতে রাজনৈতিক ক্ষমতা হাত-বদলের শেষ পালা চলেছে।

এখানে, বিভেদের বিষজর্জর এই কলকাতার এক শহরতলীতে প্রেমের ক্ষমতায় হৃদয় বদলের কঠিন পরীক্ষার আসনে অবিচল বসে আছেন অতিবৃদ্ধ জাতির জনক।

ক্ষমতা বদল হবে। হৃদয় বদল হবে না?

*   *   *   *

এই দিনে এই সন্ধ্যায় হঠাৎ একটি হারানো হৃদয় খুঁজে পেয়েছেন জ্যোতিরাণীও। সেই হৃদয় তাঁর নিজেরই।

এই হৃদয় বদল হবার আর কোনো প্রশ্ন নেই। আকাঙ্ক্ষা নেই। আগ্রহ নেই। কিন্তু খুঁজে যে পেয়েছেন তাইতেই রোমাঞ্চ বোধ করছেন। উৎসাহ বোধ করছেন। বৃদ্ধা শাশুড়ীর অনুযোগ কানে যেতে প্রথমে থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। বুড়ীর হিজিবিজি মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন কি। কিন্তু তাঁকে দেখছিলেন না আদৌ, থমকে দাঁড়িয়ে নিজের নিভৃতের কিছুই উপলব্ধি করছিলেন জ্যোতিরাণী। উপলব্ধিটা মাথার দিকে রওনা হয়েছিল। বুদ্ধির দিকে। গত দশ-বারো বছর ধরে তাই হয়ে আসছে। সব কিছুই আবেগশূন্য বুদ্ধি দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে আসছিলেন তিনি।

কিন্তু শাশুড়ীর অনুযোগে অন্তস্তলের অনুভূতিটা আজ বুদ্ধির দরজা পর্যন্ত এগোতে পারল না। বুকের কাছাকাছি এসে থেমে গেল। ভিতরটা টনটন করে উঠল জ্যোতিরাণীর। সেখানে অনেক দিনের হারানো কেউ ডুকরে উঠছে। জ্যোতিরাণী থমকালেন। নিজের ভিতরে তাকালেন। তেপান্তরের মাঠের মত ধু-ধু শূন্য বক্ষ-প্রান্তরে ও কোন্ হারানো বস্তু কার স্পর্শে ডুকরে উঠল, তাই দেখলেন।

দেখলেন, ওটা তাঁর নিজেরই হৃদয়।

জ্যোতরাণী অবাক প্রথম। আজ অনেক অনেক অনেক কাল হয়ে গেল তিনি কান্না ভুলেছেন। বুদ্ধির আলো জ্বেলে তিনি কথায় কথায় হাসতে পারেন। অবলীলাক্রমে তীক্ষ্ণ গাম্ভীর্যে নিজেকে ঢেকে ফেলতে পারেন। অবলীলাক্রমে সেই গাম্ভীর্যের আঘাত হেনে মুখের ওপর সব কিছুই অবজ্ঞা করে যেতে পারেন। এই জ্যোতিরাণী একখানি জ্বলন্ত শিখার মত। যে-শিখা হৃদয়শূন্য আলো ছড়াতে পারে, আবার যে-শিখা অনায়াস দহন-কাজেও পটু।

কিন্তু আজকের এই আবিষ্কারে তিনি অস্বস্তি বোধ করলেন খানিকক্ষণ ধরে। একটা নীরব ছটফটানি চলল কিছুক্ষণ। অস্বস্তিটা তারপর কি এক অনুশোচনার রাস্তায় গড়াতে থাকলো। এই তো সে-দিনও তাঁর মধ্যে ভারী একটা তাজা মেয়ে ছিল। সদ্য-ফোটা জুঁই ফুলের মত তাজা। ছোঁয়া লাগলে জলের দাগও ভাসত।

যার সবেতে উৎসাহ, সবেতে আনন্দ, সবেতে অহেতুক তাড়া। বাইরের যে-কোনো উপলক্ষে নিজের সমস্যা ভুলতে যার দু মিনিটও সময় লাগত না। গত দশ-বারো বছর ধরে তিনিও স্বাধীনতার জন্যেই যুঝছেন। নিতান্ত ব্যক্তিগত স্বাধীনতা। কিন্তু নিজের স্বার্থের ছায়াটা এমনই আচ্ছন্ন করে রেখেছে তাঁকে যে দু'শ বছরের এক বিরাট অন্ধকারের ছায়া সরে যাচ্ছে সে-দিকেও চোখ নেই। মন নেই। হৃদয় নেই।

জ্যোতিরাণীর মনে হল সমস্ত দেশের মধ্যে এই দিনটা থেকে শুধু একমাত্র তিনিই বুঝি তফাতে সরে আছেন।

অনুশোচনার সঙ্গে আশার অচ্ছেদ্য মিতালি। অনুতাপের পলতেয় আশার আলো জ্বলে। আসলে ভিতরে ভিতরে একটুখানি আশার তাপের জন্য উন্মুখ হয়ে ছিলেন জ্যোতিরাণী। তাই পেলেন যেন। যে হারানো হৃদয়টিকে খুঁজে পেলেন, তাকে নিয়ে আবার নতুন করে সব শুরু করা যায় বুঝি। যে পথে তিনি মার খেয়েছেন সেটাই যে একমাত্র পথ, কে বললে? জীবন এইটুকু আঘাতে আর এত সহজে ফুরিয়ে যাবার জিনিস, কে বললে? হঠাৎ জ্বলে ওঠা এই আশার শিখা কতটুকু সত্যি জানেন না। এই আশা মরীচিকা কিনা জানেন না। হঠাৎ পাওয়া দুর্লভ রত্নের মত একেই সত্যি বলে আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইলেন, এটুকুর মধ্যেই অখণ্ড পরমায়ু সঞ্চার করতে চাইলেন। শাশুড়ীর অনুযোগের, আধ ঘণ্টার মধ্যে ভারী একটা উদ্দীপনা বোধ করলেন জ্যোতিরাণী।

তিন রাস্তার ত্রিকোণ জোড়া অর্ধচন্দ্র আকারের বিরাট দোতলা বাড়িটায় তাই হঠাৎ এত আলো জ্বলে উঠতে দেখা গেল এই সন্ধ্যায়।

পথের লোক ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। কেউ অবাক হল, কারো ঠোঁটের ফাঁকে ব্যঙ্গের হাসি ফুটল। বড়লোকের লোক-দেখানো ঠাট ভাবলে। কারণ, এই দিনের অনুষ্ঠানসূচীতে কলকাতার আলোকসজ্জার প্রোগ্রাম বাতিল করা হয়েছিল। নেতারা বলেছিলেন, বাইরে আলোর উৎসব করতে হবে না, কারণ অবিমিশ্র আনন্দের দিন নয় এটা। এই দিনের পিছনে বহু মৃত্যু, বহু শোক, বহু চোখের জলের ইতিহাস। এই দিনে অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়েছে। এই দিনে এক কোটি বাঙালী হিন্দু নিজেদের পররাষ্ট্রে বিসর্জন দেবে। তাই এই দিনে বাইরের আলো নয়, যে-যার ঘরে বসে মনের আলো জ্বালো, আর প্রার্থনা করো, আর নিজেকে শুচিশুদ্ধ করো।

কিন্তু জ্যোতিরাণী অতশত খবর রাখেন না। তাছাড়া আলোকসজ্জার বাড়তি ব্যবস্থাও কিছু করা হয়নি। এত বড় বাড়ির সব আলো জ্বাললে এই রকমই ঝলমল করে ওঠে।

নেতাদের নির্দেশের খবর জ্যোতিরাণী না রাখলেও তাঁর ন-দশ বছরের ছেলে সাত্যকি রাখে। এই দিনের এই কালের সব খবরই রাখে সে। যুদ্ধের হাওয়া গায়ে লেগেছে, দুর্ভিক্ষের দুর্বোধ্য আর্তনাদ কানে শুনেছে, মারামারি হানাহানি স্ব-চক্ষে দেখেছে—ওই বয়সে এতে যেটুকু অংশ নেওয়া সম্ভব তাও নিয়েছে। এই দিনের এই যুগের সঙ্গে তার শিরায় শিরায় যোগ। বাইরে থাকতে পেলে ঘরে থাকতে চায় না। সমবয়সী একদঙ্গল ছেলের সঙ্গে রাস্তায় বা যে-কোনো বাড়ির রকে হুড়োহুড়ি করে। সর্বদা উত্তেজনার খোরাক খোঁজে, কোনোরকম উত্তেজনার গন্ধ পেলেই ওদের কান মন সজাগ। অন্যের ছেলের খোঁজ রাখেন না জ্যোতিরাণী, বয়সের তুলনায় নিজের ছেলেটা অন্তত অনেক এগিয়ে আছে।

বাড়িতে হঠাৎ সবগুলো আলো জ্বলে উঠতে দেখে সে দৌড়ে এলো। চাকর-বাকরের মুখে খবর পেল, মায়ের হুকুমে সব আলো জ্বালা হয়েছে, মা নিজেও জ্বেলেছেন। সব কটা ঘরের, সব কটা বারান্দার, ছাতের, বাইরের আঙিনার—যত আলো আছে সব একসঙ্গে জ্বালতে বলেছেন মা।

অতএব মাতৃসন্নিধানে এলো ছেলে।

প্রসন্ন মনে নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন জ্যোতিরাণী, এই আলোর ছটায় নিজের মনের সব অন্ধকারও যেন দূর হয়ে যাচ্ছিল। ছেলের ডাকে বাধা পেলেন।

মা, এত আলো জ্বালতে বললে যে? বারণ ছিল না!

জ্যোতিরাণী ঘুরে দাঁড়ালেন। থতমত খেলেন হঠাৎ, কার বারণ ছিল?

খবরের কাগজে তো লিখে দিয়েছিল আলো জ্বেলে আনন্দ করতে হবে না। আজ আলোর উৎসব হবে না।

কিছুই বোধগম্য হল না জ্যোতিরাণীর, ছেলের মুখের দিকে চেয়ে শুধু মনে হল তিনি যেন ভুল কিছু করে ফেলেছেন। এর সঙ্গে নিজের কোনো তাড়নার যোগ আছে সেটা গোপন করার জন্যে বললেন, তোর ঠাকুমাই তো বলল—

হ্যাঃ, ওই বুড়ীর কোনো জ্ঞানগম্যি আছে, তুমি কাগজখানাও উল্টে দেখো না!

ছেলের বাচালতায় জ্যোতিরাণী উষ্ণ হয়ে উঠলেন।—ভাগ এখান থেকে। বেশ করেছি, আমি ভাড়া করে আলো জ্বালতে গেছি নাকি, বাড়ির আলো জ্বেলেছি।

ধমক খেয়ে ছেলে চলে গেল। মায়ের সঙ্গে দুটোর বেশি তিনটে কথা বলতে হলে এমনি ধমক খেয়েই ফিরতে হয় তাকে।

জ্যোতিরাণী নিজের ঘরে এসে বসলেন। ভিতরে ভিতরে এক অকারণ

অসহিষ্ণুতার আঁচ অনুভব করছেন। ছেলের এই সামান্য কটা কথায়ও তাঁর নিভৃতের আশার আলোটা যেন নাড়া খেয়েছিল। তাই। ছেলেমানুষের কথা কিন্তু ক্ষতর ওপর আঁচড় পড়লেই লাগে, তা সে আঁচড়টা ছেলেই দিক আর বুড়োই দিক। এই দিনেও মা কাগজখানা উল্টে দেখেনি, অর্থাৎ মা নিজেকে নিয়েই আছে।

খানিক আগে শাশুড়ী কিরণশশী অনেকটা এই অনুযোগই করে গেছেন। করেছিলেন বলেই অবশ্য জ্যোতিরাণী একসময় গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছেন। এর আগে আলস্য ভেঙে উঠে ঘরের আলোটাও জ্বালা হয়নি। সেই কতকাল ধরে জ্যোতিরাণী একটা ক্লান্তির সমুদ্রে সাঁতার কাটছেন। বাইরে থেকে কেউ টের পায় না। পাবে কি করে, জ্যোতিরাণীর ভিতর-বার আলাদা। একটা বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। বই সম্বল। ঘুমোতে হলেও বই, সময় কাটাতে হলেও বই। মনের মত বাংলা বই এখন আর জোটে না, সবই শেষ করে এনেছেন। সম্প্রতি ইংরেজি উপন্যাসের রাজ্যে ঢুকেছেন। শুধু উপন্যাস কেন, লাইব্রেরি থেকে এমন বইও আসে যা পড়ার পর আড়ালে রাখতে হয়। হয় বটে কিন্তু বিদেশী লেখকদের প্রতি ক্রমশ শ্রদ্ধা বাড়ছে তাঁর। জীবনের বহু বিচিত্র গুহা-গহ্বরে তাদের অবাধ বিচরণ।

দিনে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শরীরটা যেন মোটার দিকে ঘেঁষছে। জ্যোতিরাণীর তাতে বিশেষ আপত্তি। শরীরটাকে খাড়া ঋজু রাখতেই হবে যেন। তা না রাখতে পারলে একটা বড় রকমের হার হয়ে গেল। জ্যোতিরাণী অনেক কিছুর সঙ্গেই আপস করতে পারেন, শুধু এই হারের সঙ্গে নয়। তাঁর এই দেহকে কেন্দ্র করে নতুন জীবনের শুরু থেকে অন্ধ ঈর্ষার আগুনে জ্বলেছে একজন। মজার কথা, সেই একজন ঈর্ষাতুর রমণী নয় কোনো। পুরুষ। তাঁরই যৌবনবাস্তবের একচ্ছত্র পুরুষ। স্ত্রীর দিকে তাকালেই নিজের অযোগ্যতার আগুনে যে ধিকিধিকি জ্বলেছে। সেই আগুনে জ্যোতিরাণীর জীবনটাও খাক করে দিতে চেয়েছে। দিতে যে পেরেছে আজও জানে না। জানতে দিতে জ্যোতিরাণীর সবথেকে বেশি আপত্তি। আজও তাঁর ধারণা, তাঁর দিকে তাকালেই মানুষটা নিজের মুখ আয়নায় দেখার মত করেই দেখতে পায়। এইখানেই জ্যোতিরাণীর জয়, আর একজনের পরাজয়। তাই সাতাশ বছর বয়সের এই কাঠামো বদল হোক, দেহের এই বাঁধুনি ঢিলে হোক, এ তিনি একটুও চান না।

শয্যায় বসেই আয়নার দিকে চোখ ফিরিয়েছিলেন। খুঁটিয়ে দেখছিলেন।... সাতাশ কেন, সাতাশ পেরুতে চলল, কিন্তু সব ঠিকই আছে। ওটা তাঁর মনের

ভয়, আয়নায় না দেখলেও চলে। ঠিক যে আছে, বাইরের দিকের বারান্দার রেলিংয়ে খানিক দাঁড়ালেই বোঝা যায়। রাস্তায় দু পা হাঁটলেই বোঝা যায়। মেয়েদের আসল রূপটা পুরুষের চোখে যেমন ফোটে তেমন আর কোথাও নয়।

চিন্তার প্রগল্ভতায় জ্যোতিরাণী হেসেই ফেলেছিলেন।

আজ আর কেউ আসবে মনে হয়নি। বিকেলে একটা ছবি দেখে আসবেন ভাবছিলেন। কিন্তু একা একা তাও ভালো লাগবে মনে হয়নি। অন্যমনস্কের মত আধপড়া বইটা ওল্টাচ্ছিলেন। দিনের আলোয় টান ধরছিল। ও-দিকের মহল থেকে সন্ধ্যা আবাহনের কাঁসর-ঘণ্টা কানে আসছিল। বুড়ী শাশুড়ী বেঁচে আছেন বলেই বাড়ির ও-ধারটা পুরনো দিনের পাতায় আটকে আছে এখনো।

একটু বাদে দরজায় শাশুড়ীর গলা শোনা গেছে, কই গো, জ্যোতি ঘরে নাকি?

সেকেলে হলেও বউয়ের নাম ধরে ডাকেন। এটা বিগত কর্তা অর্থাৎ শ্বশুরের নির্দেশে চালু হয়েছিল। তিনি বলতেন, বউমা ডাকা মানেই আমাদের সামনে ঘোমটা টেনে জড়সড় হয়ে থাকতে বলা। তিনি জ্যোতিরাণী বলে হাঁক দিতেন। বলতেন, খাসা মানানসই নাম মায়ের, ডেকে সুখ আছে।

জ্যোতিরাণী খাট থেকে নেমে দাঁড়িয়েছেন। শাড়ির আঁচল মাথায় তুলে দিয়েছেন। একেবারে ঘোমটা না দিলে শাশুড়ী আবার খুশি হন না। এখন আর অবশ্য তাঁকে খুশি করার জন্য মাথায় কাপড় তোলেন না জ্যোতিরাণী। অভ্যেসে তোলেন।

ঘরের আবছা অন্ধকারে চোখ চালিয়ে শাশুড়ী বিরসকণ্ঠে বলে উঠলেন, এই ভর-সন্ধ্যেয় ঘর-দোর অন্ধকার করে বসে আছ?

দু পা এগিয়ে জ্যোতিরাণী সুইচটা টেনে দিলেন। আলো জ্বলল। চৌকাঠের এদিকে এসে শাশুড়ী আর একবার নিরীক্ষণ করলেন তাঁকে। আগের দিন হলে ঝঙ্কার দিয়ে উঠতেন, সাঁঝের আঁধার, এলো চুল, অলক্ষ্মী বলে পেলাম কূল। দিন বদলেছে, এখন নরম থাকতেই চেষ্টা করেন। সবসময় পেরে ওঠেন না অবশ্য। ভারী গলায় বললেন, চোখমুখ ফোলা ফোলা দেখছি, ঘুমিয়ে উঠলে, না শরীর খারাপ?...ডাক সন্ধ্যেয় ঘর অন্ধকার, খোলা চুল, কি যে তোমাদের মতিগতি বুঝি না! আমি আরো কি কথা বলতে এলাম—

বিরক্তি গোপন করে জ্যোতিরাণী ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাস ফুটিয়েছেন একটু। অনুযোগের এইটুকুই বিনীত জবাব।

বুড়ী আরো একটু কাছে ঘেঁষলেন, গলার স্বর খাদে নামল। গোপনীয় কিছুই জিজ্ঞাস্য যেন।—হ্যাঁগো, দাদুভাই বলছিল আজকের মত দিন আর হয় না,

লালমুখোরা সব আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে, আমাদের দেশ আমাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছে—সত্যি নাকি ?

শাশুড়ীর রাজনৈতিক জ্ঞানের গুরু তাঁর ন বছরের নাতি সিতু, অর্থাৎ সাত্যকি। জ্যোতিরাণী নির্লিপ্ত মুখে মাথা নেড়েছেন। সত্যি।

তারপরেই শাশুড়ীর সেই অনুযোগ। যে অনুযোগ জ্যোতিরাণীকে তাঁর হারানো হৃদয়ের সন্ধান দিয়েছে। বুড়ীর দৃষ্টি খাড়া হল, গলা স্বাভাবিক পর্দায় চড়ল।—বলো কি, আর এই দিনে বাড়িঘর অন্ধকার করে বসে আছ! আমার দাদাশ্বশুর লাঠালাঠি মোকদ্দমা করে তিন বছর পরে একটা জমি দখল করতে পেরে কত ঘটা করলেন। তিন রাত ধরে আলো জ্বলল, বাণ্ডিবাজনার ধুম পড়ে গেল, আর এ তো আস্ত একটা দেশ। এই পুণ্যির দিনেও তোমরা যে-যার নিজের খেয়ালে আছো! ভালো হবে কি করে ?

গজগজ করতে করতে চলে গেলেন। যে কোনো উপলক্ষে বাড়ি একটু সরগরম হোক, প্রাণের একটু সাড়া জাগুক, এইটুকুই অভিলাষ তাঁর। কিন্তু কে জানে কেন, তাঁর এই অনুযোগেই জ্যোতিরাণীর বিরক্তিতে টান ধরতে লাগল। এক অজ্ঞাত অনুশোচনা দানা পাকাতে লাগল। নিজের খেয়াল, নিজের স্বার্থ নিয়েই তো মগ্ন বটেন। একদিন নয়, একটানা অনেকগুলো বছর। আর সেই স্বার্থটা এমনই যে এই দিনটাও তাঁর মনের কোনো সাড়া না কুড়িয়ে পার হতে চলেছে।

বিবেকের দংশন বাড়তে লাগল। তিনিই বাড়িয়ে তুললেন। এমন হল কি করে! এ কি আত্মবুদ্ধির গহ্বরে ডুবে আছেন তিনি ? একটানা এতগুলো বছর ধরে শুধু নিজেকে উদ্ধার করে চলেছেন। এ-ই শুধু নেশার মত হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন। নিজেকে মুক্ত করার বদলে এই নেশায় নিজেকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছেন। কিন্তু যে আদর্শে পুষ্ট হবার ফলে সত্তার এই সহজাত ক্ষোভ তাঁর, সে তো এমন ছোট স্বার্থের গণ্ডীর মধ্যে বাঁধা ছিল না কখনো! সে যে অনেক বড় ছিল, অনেক ছড়ানো ছিল।

শাশুড়ী চলে যেতে বাবাকে মনে পড়েছে জ্যোতিরাণীর। আশ্চর্য, অনেকদিন বাদে মনে পড়েছে। মনে পড়বে বলে গম্ভীর বিষণ্ণ মুখে তিনি যেন কোথাও অপেক্ষা করছিলেন। মনে পড়তে মুখখানা চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল।

মাত্র পনেরটা বছর ছিলেন বাবা তাঁর জীবনে। জ্যোতিরাণীর এই স্বাধীনচেতা মনটি তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া। বড় ভালবাসতেন। তাঁর জন্মের পরেই বেশ বড় গোছের কি একটা পারিবারিক বিচ্ছেদ মিটে গিয়েছিল। বাবা বলতেন, মেয়েটা শান্তির দূত। শান্তির খবর এনেছে। বড় পরিবারের কারো সঙ্গে

ঝগড়াঝাঁটি করে বসলে বাবা কার দোষ না শুনেই হেসে বলতেন, তুই তো ঝগড়া মেটাবি, ঝগড়া করবি কেন! আবার বিপরীত ফয়সালা করতেও দেখেছেন তাঁকে। দু বছরের বড় এক খুড়তুতো ভাই পয়সা চুরি করে জ্যোতিরাণীর নাম দিয়েছিল। বলেছিল, সে স্বচক্ষে ওকে পয়সা নিতে দেখেছে। ফ্রকপরা মেয়ের কাণ্ড দেখে সকলে অবাক হয়েছিল সেদিন। বয়সে বড় খুড়তুতো ভাইকে চোখ দিয়ে ভস্ম করা গেল না যখন, কাছে এসে হঠাৎ গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে তার গালে এক চড়। তারপরে নিজেই ভ্যা করে কান্না। বিচারকরা অর্থাৎ মা কাকা কাকী হতভম্ব হঠাৎ। ছেলেটার গালে ছোট ছোট পাঁচটা লাল দাগ ফুটে উঠেছে। গালের ওপর এমন অতর্কিত আক্রমণের জের না সামলাতে পেরে চোখে লাল নীল সবুজ দেখতে দেখতে মেঝেতে বসে পড়েছে সে। চোখেমুখে জলের ঝাপটা খেয়ে তবে ঠাণ্ডা হয়েছে।

জ্যোতিরাণী ততক্ষণে বাবার কাছে ছুট। শাস্তি বাবাও দেবেন জানা কথাই, তবু মায়ের থেকে বাবার শাস্তি নিরাপদ মনে হয়েছিল। বাবা মেয়ের কান্নার কারণ বুঝে ওঠার আগেই অগ্নিমূর্তি মায়ের আবির্ভাব। মেয়েকে দেওর আর জায়ের সামনে বেশ করে পিটুতে না পারলে মায়ের মান থাকে না। সেটা না বুঝে মেয়ে বাপের আশ্রয়ে পালিয়ে আসায় আরো ক্রুদ্ধ তিনি। সব শুনে বাবা হঠাৎ গলা চড়িয়ে বলে উঠলেন, বেশ করেছে। তুমি আবার এজন্যে শাসন করতে এসেছ ওকে ?

সর্বদা হাসি-হাসি মুখ বাবাকে গম্ভীর হতে দেখলেই সকলে ভয় ভয় করে। তার ওপর এই ধমক। মায়ের পায়ে পায়ে প্রস্থান। কান্না ভুলে জ্যোতিরাণী অবাক। এর থেকে অনেক লঘু অপরাধে বাবার কাছে কদিন আগেও শাস্তি পেতে হয়েছিল—ঠায় এক ঘণ্টা ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল।

বড় হয়ে বাবার সম্পর্কে কত গল্প শুনেছেন ঠিক নেই। বড় হয়ে মানে জ্যোতিরাণীর বয়েস তখন চৌদ্দ-পনের। বাবা ছিলেন কলেজের নামকরা মাস্টার। বই নিয়েই থাকতেন। আর জ্যোতিরাণী অনেক সময় সেই মুখখানা দেখতেন চেয়ে চেয়ে। এই বাবার এত আদরের মেয়ে তিনি মনে হলেই আনন্দে গর্বে বুকখানা ভরে উঠত। উঠতি বয়সে যে-সব লোকের সঙ্গে বাবার কাজের যোগ ছিল তাঁদের তো মুনি-ঋষি গোছেরই ভাবতেন চৌদ্দ বছরের জ্যোতিরাণী। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, সুরেন বাঁড়ুজ্যে, ভগ্নী নিবেদিতা, রাসবিহারী ঘোষ, 'বাঘা যতীন—এ সব তো জপ করার মত নাম। বিপিন পাল তো সেদিন মারা গেলেন। রবিঠাকুর আর শ্রীঅরবিন্দ তো বেঁচেই আছেন।

বরাবর শান্তিপিপাসু মানুষ তাঁর বাবা, কিন্তু শেকলের বদলে শান্তি চাননি।

কতই বা বয়েস বাবার তখন, স্কুল ছেড়ে সবে কলেজে ঢুকেছেন। দাসত্বের জ্বালা ঘোচাবার জন্যে ওই বয়সে যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গড়া দুই সালের সেই গায়ে কাঁটা দেওয়া গুপ্ত সমিতিতে ঢুকেছিলেন। জ্যোতিরাণীর মনে পড়ে বছর বারো বয়সের সময় এক সাধুর মৃত্যুর খবর শুনে বাবা কদিন একেবারে পাথর হয়েছিলেন। তিরিশ সাল সেটা। দেহত্যাগ করেছেন নিরালম্ব স্বামী। তথনই বাড়ির সকলের মুখে সেই রোমাঞ্চকর গুপ্ত সমিতির টুকরো টুকরো গল্প শুনেছিলেন। এক যুগের সেই আগুনে মানুষ আর এক যুগের মহাসাধক নিরালম্ব স্বামী। ওই গুপ্ত সমিতি ছিল বিপ্লবের নীড়। সকলের সঙ্গে তাঁর বাবাকেও সাঁতার, বক্সিং, লাঠি খেলা, গুলীগোলা ছোঁড়ায় রপ্ত হতে হয়েছিল। দেশের সব মহাবিপ্লবীরা তো বটেই, মহীয়সী বিদেশিনী ভগ্নী নিবেদিতার পর্যন্ত ওই সমিতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। তাঁকে কেউ সন্দেহ করত না। পৃথিবীর সেরা বিপ্লব-বাদের বই যোগাতেন তিনি।

জ্যোতিরাণী পরে জেনেছেন বাবার সঙ্গে দলের অনেকেরই মতের মিল হত না। তিনি বলতেন, এভাবে ইংরেজশাসনের কায়েমী ভিত নড়ানো যাবে না। তাহলে সিপাই বিদ্রোহ ব্যর্থ হত না। এরও প্রায় একশ' বছর আগে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের দাপটেই ইংরেজ পালাতো তা হলে।

কিন্তু মতের মিল হোক না হোক দল ছাড়ার প্রশ্ন ছিল না। সে-সবে সেদিনের জ্যোতিরাণীর ছোট বুক কি বিষম দুরু দুরু করত। কত জনের তো ফাঁসী হয়ে গেছে, তাঁর বাবারও তো হতে পারত। মনে হলে গায়ে কাঁটা দিত, যাতনায় দম বন্ধ হবার উপক্রম হত তাঁর। বাবার গায়ে পিঠে হাত বুলোবার ছলে কতদিন গলায় হাত বুলিয়েছেন ঠিক নেই, যা হতে পারত সেই দাগও যেন মুছে ফেলতে চাইতেন তিনি।

আজ বারো বছর হতে চলল বাবা নেই। কিন্তু জ্যোতিরাণীর হঠাৎ মনে হল তিনি আছেন। এই দিনটা তিনি দেখছেন। আর জ্যোতিরাণী যে দেখছেন না, তাও দেখছেন।

চমকে উঠলেন। চোখের সামনে আর একখানা মুখ ভেসে উঠছে। তরতাজা সুন্দর মুখ। হাসি-মাখানো করুণ চোখ।

বাবাকে তবু মনে পড়ত। কিন্তু এই মুখ তো প্রায় স্মৃতির আড়ালেই চলে গিয়েছিল জ্যোতিরাণীর।

বাড়িঅলার ছেলে শুভ্রেন্দু। শুভ্রেন্দু সরকার। ডাক নাম শোভা। নিচের তলায়

থাকত ওরা। বাড়িঅলা হলেও উপরতলার আত্মীয়ের মত হয়ে উঠেছিল। বছর কুড়ি বয়েস, জ্যোতিরাণীর থেকে চার বছরের বড়। কলেজে পড়ত। কিন্তু বাড়িতে কেউ তাকে কখনো পুরুষের সম্মান দেয়নি। জ্যোতিরাণীও না। আত্মীয়পরিজনেরা ঠাট্টা করত, মেয়েলি নাম, মেয়ে মেয়ে চেহারা—শাড়ি পরলে মানাতো ভালো।

মাত্র মাস কয়েক আগে বাবা গত হয়েছেন। জ্যোতিরাণীর ভিতরটা তখনো কতটা পুড়ছিল, কেউ খবর রাখে না। কিন্তু এই ছেলেটা রাখত। অন্তত চেষ্টা করত রাখতে। জ্যোতিরাণীকে খুশি করার চেষ্টার অন্ত ছিল না তার। কিন্তু জ্যোতিরাণীর উল্টে এক-একসময় রাগ হয়ে যেত।

যে বয়সে মেয়েরা নিজেদের অন্তঃপুরের রহস্য সম্পর্কে সচেতন হতে থাকে, পরিবেশগুণে জ্যোতিরাণীর তা নিয়ে মাথা ঘামাতে কিছু দেরি হয়েছিল। বড় পরিবারে তিনি অনেক ছোট, অনেকের ছোট। তাই ছোটর গণ্ডিটা ডিঙানো সহজ হয়নি। কিন্তু দেহতটে ততদিনে প্রকৃতির হাত পড়েছে। ছাঁদ বদলেছে। নিভৃতে কিছু একটা দুর্বোধ্য কানাকানি শুরু হয়ে গেছে। ইস্কুলে যাতায়াতের পথে পুরুষ চোখের আওতায় পড়ে মনে মনে মাঝেসাঝে হোঁচট খেতে হচ্ছে। তবু শোভাদার অত টান কেন তলিয়ে ভাবার মন তখনো হয়নি। শোভাদাকে তখনো নিতান্ত কচি ভাবতেন জ্যোতিরাণী। পাত্তা দিতেন না। বাধ্য বলেই কারণে অকারণে গঞ্জনা দিতেন, অবজ্ঞা করতেন। সেটাই যে সব থেকে বেশি যাতনার কারণ শোভাদার, তা বুঝেও বুঝতেন না।

বাবার মৃত্যুর পর বাবার যোগ্য মেয়ের মতই সাহসিকা হয়ে ওঠার সাধ স্বাভাবিক। সেই হাওয়াও এসেছিল তখন। মেয়েরা পুরুষের সমানতালে এগিয়ে এসেছিল। প্রীতি ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত, শান্তি ঘোষ, সুনীতি চৌধুরী, বীণা দাস, উজ্জ্বলা মজুমদার—এঁরা তখন শক্তির খড়্গ হাতে নেমে পড়েছেন। মেয়েদের অবলা নাম ঘুচেছে। সব অন্তঃপুরেই এক নতুন উদ্দীপনার ঢেউ লেগেছে। জায়গায় জায়গায় তখনই আবার বড় বড় সাহেব মারার হিড়িক পড়ে গেছে। ঢাকায়, কুমিল্লায়, মেদিনীপুরে, কলকাতায়। বোমার মত একটা না একটা খবর ফেটে পড়ছে।...ডালহৌসি স্কোয়ারে টেগার্টের গাড়িতে বোমা পড়ল ...কানাই ভট্‌চায আলিপুরের জজ গার্লিককে দিলে খতম করে...জেলের বড় সাহেব কর্ণেল সিম্পসনও গেল...

বাড়ির এক-একদিনের আলোচনায় এক চাপা প্রেরণার শিখা জ্বলে জ্বলে উঠতে চায়। সব থেকে বেশি রোমাঞ্চ হয় জ্যোতিরাণীর। ভাবেন, বাবা একদিন যে কাজে নেমেছিলেন সেটা সফল হল বুঝি। শোভাদা সেই রোমাঞ্চের

ভাগীদার হতে সর্বদা উৎসুক। কিন্তু তার ভাগে সেই চিরাচরিত অবজ্ঞা। কোথাও কোনো হামলার খবর নিয়ে এলে শোনার পর জ্যোতিরাণী ঠাস-ঠোস বলে বসবেনই কিছু। অথচ তার এ-সব খবর বিশেষ করে জ্যোতিরাণীর জন্যেই আনা। একবার বিষম উত্তেজনায় গোরা পুলিসের ঠেঙানির এক প্রত্যক্ষ বিবরণ দেবার মুখেই ভয়ানক জব্দ। বলতে না বলতে জ্যোতিরাণী ফস করে জিজ্ঞাসা করে বসলেন, তুমি কি করলে বলো, খরগোশের মত চোখ বুজে ছুট দিলে, তারপর দূরে দাঁড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে দেখলে ?

শোভাদার মুখ চুন। মাথা নিচু।

কদিন পরেই এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলে সকলে। সে দৃশ্য জ্যোতিরাণীর অন্তত ভোলার নয়। দেশের নামে হাঁক-ডাক করে ফ্ল্যাগ হাতে একদঙ্গল লোক চলেছে বাড়ির পাশ দিয়ে। সকলের সামনের সারিতে পতাকা হাতে শোভাদা। সেই দিনে এটা বড় কম ব্যাপার নয়। জ্যোতিরাণীর চোখে পলক পড়ে না। ফ্ল্যাগ উঁচিয়ে চলতে চলতে ঘাড় ফিরিয়ে শোভাদা এদিকেই চেয়ে আছে। তাঁর দিকে। হাসছে। নরম সুন্দর মুখখানায় যেন আগুন লেগেছে।

সেই মুহূর্তে, সেই মুহূর্তেই জ্যোতিরাণী বুঝেছিলেন শোভাদা কি চেয়েছে তাঁর কাছ থেকে। সেই মুহূর্তেই অনুভব করেছেন, কার কাছে আসার জন্য সমস্ত কাপুরুষতার গ্লানি ধুয়ে মুছে ফেলতে চেয়েছে শোভাদা। আর সেই মুহূর্তেই শোভাদাকে পুরুষমানুষ মনে হয়েছে জ্যোতিরাণীর। অনন্য পুরুষ।

কিন্তু দৃশ্যটা দেখার পর থেকেই অস্বস্তিরও একশেষ। বিকেল গড়িয়েছে। সন্ধ্যা পার হয়েছে। সকলের সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিরাণীও সারাক্ষণ ছটফট করেছেন। ফোলানো ফাঁপানো এক-একটা খবর কানে এসেছে। বে-ধড়ক মারপিট করেছে পুলিস, সঙিন দিয়ে খুঁচিয়েছে, অনেককে হাসপাতালে পাঠিয়েছে, অনেককে জেলে।

জ্যোতিরাণী খালি প্রার্থনা করছিলেন, শোভাদা ফিরে এসো, আর কক্ষনো কিছু বলব না। কক্ষনো না, কক্ষনো না—

রাতের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে শোভাদা ফিরেছিল। কপালের একটা দিক ঢাউস ফোলা। কিন্তু সেও এমন কিছু নয়, জামা-কাপড়ের নিচের দিকটা রক্তাক্ত। উরুতে দু-দুটো ক্ষত, শক্ত করে আধময়লা ন্যাকড়া বাঁধা। পুলিসের হাতে ধরা দেয়নি শোভাদা, পালিয়েছে। তাতে আরো বেশি রক্তক্ষয় হয়েছে।

সেই ক্ষত দেখে শিউরে উঠে দু হাতে মুখ ঢেকে ফেলেছিলেন জ্যোতিরাণী। আর তাই দেখে শোভাদা হেসেছিল।

গোপনে চিকিৎসার ত্রুটি হয়নি। কিন্তু গ্যাংগ্রিন না কি হয়ে গেল। সাতাশ

দিন বেঁচেছিল শোভাদা। জ্যোতিরাণী কাছে গিয়ে বসলেই হেসে বোঝাতে চেয়েছে তার একটুও কষ্ট হচ্ছে না, সব কষ্ট দূর হয়ে গেছে। শেষ নিশ্বাস ফেলার পরেও মনে হয়েছে, শোভাদার নরম মুখে এক অদ্ভুত পরিতৃপ্তির হাসি ছড়িয়ে আছে।

বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে এই শোভাদাকে নিয়ে অনেক অপ্রিয় ব্যাপার ঘটে গেছে। এই নিয়ে ঘরের এক অবুঝের ওপর অনেকবার জলে উঠেছেন, ঝলসে উঠেছেন তিনি। কিন্তু তারপর এতকালের মধ্যে শোভাদাকে তো মনেও পড়েনি কখনো।

এক যুগ বাদে মনের পটে যে কোমল তাজা মুখখানা আজ ভেসে উঠল, হঠাৎ সেই মুখের হাসিটুকু শেষ যেমন দেখেছিল তেমন নয়। এই হাসিতে যেন বঞ্চিতের অভিযোগ মেশানো। শোভাদা যেন বলতে চায়, এই দিনটাও ভুললে? আমরা কি একেবারে অন্ধকারে হারিয়ে গেলাম?

ধড়মড় করে খাট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন জ্যোতিরাণী। তারপর তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বেরুতে গিয়ে খট করে ঘরের দ্বিতীয় আলোর সুইচটা জেলে দিয়েছেন। ঘোরানো বারান্দার আলো কটা জালতে জালতে দ্রুত এগিয়েছেন।

মেঘনা!

অনভ্যস্ত চমক-লাগানো ডাক শুনে ঝি দৌড়ে এসেছে। ওদিক থেকে আধবয়সী সদা চাকরও।

বাড়ির আলোগুলো জেলে দাও তো! সব! ওপরে নিচে যেখানে যত আলো আছে সব কটা। এক্ষুনি!

হাঁ করে চেয়ে বউদির চোখেমুখে দুর্বোধ্য এক আলোর তৃষ্ণা দেখেছিল তারা। তারপর, তিন রাস্তার ত্রি-কোণ জোড়া অর্ধচন্দ্র আকারের বিরাট দোতলা বাড়িটায় এত আলো জলে উঠতে দেখেছে সকলে।

॥ দুই ॥

জোরালো আলোয় শুধু সুন্দরের রূপ খোলে না অসুন্দরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আসলে বাইরে নয়, জ্যোতিরাণী নিজেরই অন্তস্তলে আলো ফেলেছেন। সেখানে প্রায় এক যুগের জমা-করা অবাঞ্ছিত স্মৃতিগুলিই আগে চোখ টানছে। যেগুলো গোঁ ভরে অনেক সময় তিনি লালন করেছেন, পুষ্ট করেছেন। যার ফলে নিজের অনেক আচরণও তিনি বিবেকের নিক্তিতে ফেলে ওজন করে দেখেন নি।

কিন্তু এই লগ্নে জ্যোতিরাণী ও-দিকটা থেকে মুখ ফিরিয়েই থাকতে চান। আশা শত হাতে উদ্ধার করে। এই মুহূর্তের প্রেরণাটুকু তিনি নিষ্প্রভ হতে দিতে চান না। কালের গর্ত খুঁড়লেও তো কত হীরে মুক্তো উঠবে, আবার কত ক্ষত হাঁ করে গিলতে আসবে। যেমন আছে, থাক।

কিছু একটা করা দরকার। চুপচাপ বসে থাকলেই এলোমেলো ভাবনা। আর সেই ভাবনারও শেষ পর্যন্ত বক্র গতি। কিন্তু কি করা যায় এখন?···ছেলেটা ঠাস ঠাস দু কথা শুনিয়ে গেল। ন বছরের ছেলের মুখে এ-রকম কথা শুনে শুনে জ্যোতিরাণীর এক-একসময় পিত্তি জ্বলে যায়। বাড়ির মধ্যে শুধু তাঁকেই একটু যা ভয় করত, কিন্তু সেটা যেন কমছে। এখন অত পরোয়া করে না। মা কাগজখানাও পড়ে না—কাগজ পড়ে তোরা তো সব উল্টে দিলি! ওই ঠাকুমাই মাথাটা খেয়েছে। আর পাড়ার যত বখাটে ছেলেগুলো। আর বাপ তো আছেই। বাপ যার দেখে না তার ছেলের কাঁধে শনি। শনিই। ভাবতে গেলেই মাথা গরম হয়ে যায় জ্যোতিরাণীর।

বাপের কথা মনে হতেই মুখে কঠিন রেখার আভাস ফুটছিল। সামলে নিলেন। নিজের উদ্দেশেই অসহিষ্ণু ভ্রূকুটি করলেন একটা। ভাবনা সেই পুরনো রাস্তায় গড়াচ্ছে। এই না কিছু একটা করবেন ভাবছিলেন! এই দিনে এই সময় মানায় এমন কিছু। চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ঝরঝরে হতে চেষ্টা করলেন আবার। কি করবেন? বেরিয়ে পড়বেন কোথাও?

মিত্রাদির কথা মনে হল। মনে হওয়ার কারণ আছে। আভাসে ইঙ্গিতে মিত্রাদি কিছুদিন আগে তাঁর কাছে একটা প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। ঠিক করেন নি, করার ইচ্ছে ছিল। জ্যোতিরাণীকে নির্লিপ্ত দেখে আর কথা না বাড়িয়ে চেপে গেছেন।

টেলিফোন করে তাঁকে একবার আসতে বললে কেমন হয়···।

নতুন করে আবার একটু উদ্দীপনার ছোঁয়া লাগল। আজকের এই আলোয় মন উদার হয়েছে মনে হল। নইলে সকলকে ছেড়ে মিত্রাদিকে ডাকার কথাই আগে ভাবলেন কেন? ওই মহিলার সঙ্গে বাইরে যত হৃদ্যতা, ভিতরে ভিতরে তাঁর প্রতি তেমনি বিরূপ জ্যোতিরাণী বুদ্ধিমতী মিত্রাদিও তা জানেন বোধ হয়। অথচ কেন যে বিরূপ জ্যোতিরাণী নিজেই তা ভালো জানেন না।

ভালো নাম মৈত্রেয়ী। মৈত্রেয়ী চন্দ। সে নাম সিকেয় তোলা আছে। মিত্রা, মিত্রাদি, আর মিত্রা মাসি—এই তিনের গণ্ডীর মধ্যে তাঁর বিচরণ। নতুন যোগাযোগ হলে তিনি মিসেস চন্দ। কিন্তু সেটা পুরনো হতে বেশি সময় লাগে

না। হলেই তিনি চোখ রাঙান, বুড়ী হয়ে ছোঁড়া-ছুঁড়ীদের নিয়ে মেতে আছি, অত মিসেস মিসেস কোরো না বাপু—কেন, নাম নেই আমার!

কিন্তু বয়েস তাঁর বড় জোর তিরিশ। জ্যোতিরাণীর থেকে বছর তিনেকের বড়। দেখায় বেশি। মিত্রাদির সেজন্যে মনে মনে খেদ আছে। সুপটু প্রসাধনেও দেহকে কৃশ দেখানো যায় না। রোগা হতে চেষ্টা করে তিনি নাকি হাল ছেড়েছেন। যতটা বলেন ততোটা মোটা নন মিত্রাদি। বে-ঢপ কিছু নন্। কিন্তু স্বাস্থ্যের কথা উঠলেই তাঁর এই হা-হুতাশ। জ্যোতিরাণীর এক-একসময় মনে হয় নিজের দিকে লোকের চোখ টানার মিত্রাদির এই এক বিপরীত রীতি।

মিত্রাদি রূপসী নন, কিন্তু মুখখানা সুশ্রী। বছর কয়েক আগেও অনেক রূপসী মেয়েকে মলিন মনে হয়েছে তাঁর পাশে। দেখতে দেখতে একটু মোটাই হয়ে পড়ছেন বটে, কিন্তু মিত্রাদির রূপ তাঁর চাল-চলনে, কথায়-বার্তায়, হাসি-খুশিতে। জ্যোতিরাণী অনেক সময় লক্ষ্য করেন তাঁকে, বুঝতে চেষ্টা করেন এই চাল-চলন কথা-বার্তা হাসি-খুশি আসল না মেকী। বুঝতে পারেন না বলেই রাগ হয়। ঠুনকোও মনে হয় তাঁকে।

অথচ এই মিত্রাদি তাঁকে একটু তোশামোদই করেন। কতদিন বলেছেন তোমার কথা মনে হলে আমার হিংসে হয়। মাত্র তো তিন বছরের ছোট আমার থেকে, কিন্তু ছেলে আড়াল করে এখনো উনিশ বলে দিব্বি আর একবার ছাঁদনা-তলায় ঘুরিয়ে আনা যায়।

জ্যোতিরাণী তুষ্ট হন। খুব অতিশয়োক্তি করছেন না জানেন। মুখে বলেন, বেশি বেশি বোলো না, বাপু।

মিত্রাদি পাল্টা চোখ পাকান, ডাক্তার ডাকব?

জ্যোতিরাণী হেসে ফেলেন। এই উক্তির পিছনে একটা মজার ব্যাপার আছে। মাসকয়েক আগে জ্যোতিরাণীর গলায় কি হয়েছিল। থ্রোট স্পেশালিস্ট এসে গলা পরীক্ষা করে প্রেসক্রপশন লেখার আগে বয়েস জিজ্ঞাসা করেছিলেন। মিত্রাদি উপস্থিত ছিলেন তখন। আর বাড়ির মালিকও ঘরে ছিলেন। ছিলেন বলেই সৌজন্যবোধে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। জবাবটা তিনিই দিলেন। বললেন, ট্যুয়েন্টিসেভেন।

স্পেশালিস্ট অত না ভেবেই ফস করে বলে বসলেন, আমি পেশেন্টের বয়েস জিজ্ঞাসা করছি।

মালিক, অর্থাৎ শিবেশ্বরবাবুর ঠাণ্ডা দুই চোখ ডাক্তারের মুখখানা দেখার মত করেই চড়াও করেছিল। জবাব দিয়েছেন, আমি আমার বয়েস বলছি বলে মনে

হয় আপনার ?

অপ্রস্তুত হয়েও ভদ্রলোক প্রেসক্রুপশন লেখার ফাঁকে আড়ে আড়ে বার দুই জ্যোতিরাণীর দিকে তাকিয়েছেন। মিত্রাদি হাসির বেগ দমন করেছেন। জ্যোতিরাণীর মুখ লাল হয়েছে।

ডাক্তার চলে যেতে শিবেশ্বরবাবু মন্তব্য করেছেন, সিলি!

মিত্রাদি আর এক প্রস্থ হেসে সংশয় প্রকাশ করেছেন, ভদ্রলোক প্রেসক্রুপশন লিখলেন না কবিতা লিখে গেলেন দেখা দরকার।

উঁচু মহলের বহু হোমরাচোমরা ব্যক্তির সঙ্গে মিত্রাদির খাতির। খাতিরটা মৌখিক নয়। কারো জন্যে কিছু করবেন মনস্থ করলে মিত্রাদি অনায়াসে তা করে দিতে পারেন। নিজের চেনা না থাকলেও মাথা খাটিয়ে একটা যোগাযোগ বার করে ফেলতে পারেন। এই দুর্লভ যোগাযোগের আশায় পাড়া ছেড়ে অনেক বেপাড়ার মেয়েরাও যে-যার স্বার্থ নিয়ে এর-ওর মারফৎ তাঁর শরণাপন্ন হয়। কারো লোভনীয় চাকরি চাই, কারো গান-বাজনা-শিল্পকলায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই, উন্নতির আশায় কারো বা বড় কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারের সুপারিশ চাই। মিত্রাদি নিজেই বলেন, আমার কাছে যারা আসে তাদের কেবল চাই চাই চাই। ওদের কাছ থেকে আমি এখন পালাতে চাই। সিনেমায় অভিনয় করবে তার জন্যেও চুপি চুপি আমাকে খোঁচাবে। আমাকে পেয়েছে কি সব!

মিত্রাদি রাগ দেখান, রাগ করেন না। আর, বাড়িয়েও বলেন না। কিছু না কিছু আশা নিয়ে দু'-পাঁচটা মেয়ে সর্বদাই তাঁর পিছনে ঘুর ঘুর করছে। কিন্তু মিত্রাদি সদয় ব্যবহার করেন বটে, সহজে সদয় হন না কারো ওপর। তবে সদয় হলে যে কাজ হয়, সে-রকম নজির আছে। অতএব স্বার্থের দায়ে যারা আসে তাদের তাঁকে সহৃদয়া করে তোলার চেষ্টারও বিরাম নেই। মেয়ের পছন্দসই বর জুটবে এই আশাতেও অনেক আধুনিকা মা নিজের মেয়েকে তাঁর হাতে সঁপে দিতে চেষ্টা করেন।

মিত্রাদির পূর্ণতার এই চটকটাই অপছন্দের কারণ কি না জ্যোতিরাণী সঠিক ঠাওর করে উঠতে পারেন না। তাঁর দিকে চেয়ে জ্যোতিরাণী ফাঁক খোঁজেন, ফাঁকি খোঁজেন। খোঁজার কারণও আছে। জীবনযাত্রা এত সহজ সরল হবার কথা নয় মিত্রাদির। কিন্তু সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ।

কথায় কথায় সেদিন মিত্রাদি বলছিলেন, কি যে দিন-কাল হল, সর্বস্ব খুইয়ে শুধু মান আর প্রাণ নিয়ে ভালো ভালো ঘরের মেয়ে-বউরা সব কলকাতায় পালিয়ে আসছে। বাঁচতে এসে তাদের মধ্যেও কতজন যে আবার এখান থেকেও কোন্

অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে ঠিক নেই।···ভাবছিলাম এদের জন্য কিছু একটা গড়ে তোলা যায় কি না। পারলে কাজের কাজ হত, ওদেরও আশ্রয় হত।

জ্যোতিরাণীর আগ্রহ দেখলে মিত্রাদির উৎসাহ দ্বিগুণ ছেড়ে চার গুণ হতে পারত। মিত্রাদির মাথায় অনেক কিছু আসে, অনেক কিছুই করতে সাধ যায় তাঁর। মেয়েদের জন্যে ভাবেন তিনি ভিতরে ভিতরে সেই গর্বও একটু আছে হয়ত। কিন্তু জ্যোতিরাণী সেদিন এ-কানে শুনেছেন ও-কান দিয়ে বার করে দিয়েছেন।

আজ কিছু একটা করার উদ্দীপনায় মিত্রাদির সেই প্রস্তাবটাই মনে ধরল জ্যোতিরাণীর। যে মেয়েদের হাসি গেছে তাদের মুখে হাসি ফোটাতে পারলে কেমন হয়? যে মেয়েদের আশা গেছে তাদের বুকে আশা জাগাতে পারলে কেমন হয়? ভাবতে গিয়ে নিজের মুখে হাসি ফোটানো আর নিজের বুকে আশা জাগানোর মতই লাগছে। চমৎকার হয়। মিত্রাদির প্রস্তাবে সেদিন কান দেননি বলে আক্ষেপ হচ্ছে। কিছু একটা করতে পারলে কাজের মত কাজ হয় বটে।

করতে হলে কি দরকার? প্রথমেই একটা বাড়ি দরকার বোধ হয়।···বাড়ি একটা ছেড়ে কটাই আছে। বাড়ির খোদ মালিক এজন্যে কলকাতার কোনো বাড়ি ছেড়ে দিতে চাইবে না বোধ হয়। আয়ের বন্যায় টান পড়বে। কলকাতার কাছাকাছি যে-কোনো একটা বাগানবাড়ি নেওয়া যেতে পারে। তাই বরং ভালো হবে, কলকাতার হাওয়া পর্যন্ত বিষিয়েছে। বাইরেই ভালো। কল্পনায় সেই ভালোর চিত্রটা দেখতে গিয়ে উৎসাহ বাড়ছে জ্যোতিরাণীর।···বিভাসবাবুকে ধরে বেলেঘাটায় গিয়ে এ ব্যাপারে গান্ধীজীর সঙ্গে আলোচনা করে এলেও মন্দ হয় না। শেষের দিকে বাবা গান্ধীজীর ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন—পরিচয় দিলে চিনবেন। আর, বিভাসবাবুও মুখে যা-ই বলুন, ভিতরে ভিতরে গান্ধীজীর ওপর টান আছে, নইলে ফাঁক পেলেই দেখা করতে ছোটেন কেন?

বিভাসবাবু।···বিভাস দত্ত।

মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আজ এই প্রথম কি এক অজ্ঞাত অনুভূতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যেন থমকালেন জ্যোতিরাণী। তারপর নিজের নিভৃতে চোখ চালিয়ে সেটাকে দেখতে চেষ্টা করলেন। বুঝতে চেষ্টা করলেন। দেখাও গেল না, বোঝাও গেল না। তবু জ্যোতিরাণী আজকের চিন্তা থেকে এই নাম আর এই নামের মুখখানা বাতিল করে দিলেন। তাঁর বহু চিন্তার সঙ্গে এই এক নাম আর এই এক মুখ নিজের অজ্ঞাতেই কেমন জড়িয়ে যায় মনে হল। কেন মনে হল? জড়িয়ে না যাওয়াটাই তো আশ্চর্য। অকৃতজ্ঞতা। তবু কেন মনে হল?

কেন মনে হল জ্যোতিরাণী জানেন না। না জেনেও ওই নাম আর ওই মুখ

চিন্তা থেকে ছেঁটে দিলেন শুধু। মন সংকল্পে বিবাগী হলে শুধু মন্দ ছাড়ে না, অনেক ভালও ছাড়ে। পরম আত্মীয়পরিজনকেও ছেড়ে যেতে হয়। আজকের এই আলোয় সেই গোছেরই একটা সংকল্প নেবার মন জ্যোতিরাণীর। বিভাসবাবুকে দরকার নেই, মিত্রাদিকে নিয়ে নিজেই তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করে আসতে পারবেন। দরকার হলে একাই পারবেন।

টেলিফোনের রিসিভার তুলে নম্বর ডায়েল করলেন।···আছে কিনা কে জানে। যে হুট-হুট করে বেড়ানো অভ্যাস। পারেও···

কে, মিত্রাদি? আছ তাহলে···আমি জ্যোতি।

কি ভাগ্যি গো, টেলিফোনের গলা তো ভুলেই গেছি! কি খবর? ও-ধার থেকে মিত্রাদির তরল বিস্ময়।

খবর ভালো। কি করছ? একবার আসতে পারবে?···আলোচনা ছিল।

আমার সঙ্গে! কি আশ্চর্য, সূর্য আজ···

অনেকক্ষণ অস্ত গেছে। আসবে তো এসো—গাড়ি পাঠাব?

গাড়ি···। থাক, গাড়িঅলা তিন-তিনটি অতিথিনারায়ণ আপাতত বাড়িতে মজুত। রাত বারোটা এক-এর স্বাধীনতা নিয়ে জোর মাথা ঘামাচ্ছে। বিদেয় করে আসতে একটু সময় লাগতে পারে কিন্তু, ওদের একজনকেই লিফ্‌ট্‌ দিতে বলব'খন। তোমার হুজুরটি কোথায়, বাড়িতে?

জ্যোতিরাণীর ভুরুর কাছটা আপনি কুঁচকে গেল একটু। পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়লেন, তোমার অতিথিনারায়ণদের মধ্যে নেই বলছ?

এই দুষ্টু মেয়ে!

এসো। রাখলুম।

রিসিভার নামিয়ে জ্যোতিরাণী পায়ে পায়ে ঘর ছেড়ে বেরুলেন। ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাস একটু। ঘরে থাকলেই আবার কি ভাবতে বসে যাবেন ঠিক নেই। আলোগুলো সত্যিই ভালো লাগছে। নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে যেন। মিত্রাদি এই মুহূর্তেই এসে গেলে ভালো হত। কতক্ষণে আসবে বিশ্বাস নেই।

দাঁড়িয়ে গেলেন। আলোয় ঝকঝক করছে বারান্দাটা। ঘোরানো বাঁকের ওই কোণের মেঝেয় বসে গল্প করছে সদা আর মেঘনা। সদার বয়েস পঞ্চাশ ছাড়িয়েছে। মাথার চুলের চারিদিকে ভালো-রকম পাক ধরেছে, মাঝখানটা মিশমিশে কালো। কালোর চারধারে ধপধপে সাদার বর্ডারের মত দেখায়। সদা কথা কম বলে। সুস্থির ঠাণ্ডা ভাব-ভঙ্গি। মেঘনা তার উল্টো। নামের

সঙ্গে স্বভাব মেলে কিছুটা। বয়েস তারও চল্লিশের ওধারে। গায়ের রং তামাটে। মোটাসোটা গড়ন, কিন্তু কাজে তৎপর খুব। চোখের পলকে ভারী কাজ সেরে রাখে। সেই সঙ্গে গজর গজর মুখ চলে। মুখ বুজে সে কাজ করতে পারে না, কাছে কেউ না থাকলে নিজের সঙ্গেই কথা বলে।

বাড়িতে আরও দুটো ছোকরা চাকর আছে, শামু আর ভোলা। এত বড় বাড়ির ঘর-দোর সব পরিষ্কার রাখতে হলে চারটে লোকও যথেষ্ট নয়। তাছাড়া শাশুড়ীর ফাইফরমাশও লেগেই আছে। তাঁর একবারে মনে পড়ে না সব, ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ে। মনে পড়লেই হুকুম। শামু আর ভোলা তাই বুড়ীমাকে একটু-আধটু এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করে। ডেকে না পেলে শাশুড়ী গলা চড়িয়ে সদার উদ্দেশে হাঁক দেন, মড়া দুটো গেল কোথায় রে সদা, কানে তুলো দিয়ে বসে আছে!

সদা নাম কানে গেলেই মড়া দুটো সজাগ হয়। যে কাছে থাকে দৌড়ে আসে। সদাদাদা ঠাণ্ডা মুখে কৈফিয়ত তলব করলে ওরা খুব স্বস্তি বোধ করে না। অনেক কাল আছে বলে হোক বা বউদি খাতির করে বলে হোক, সদাদাদার কৈফিয়ত নেবার দাবিটা ওরা মেনেই নিয়েছে। সদা ওদের খুব প্রীতির চোখে দেখে না। অলস ভাবে। মেঘনাকে সে পরামর্শ দিয়েছিল, বউদিকে বলে কয়ে তোমার ছেলে দুটোকে এখানকার কাজে লাগিয়ে দাও না, বাইরে রেখেছ কেন?

দুটো কর্মঠ ছেলে আছে মেঘনার। একজনের বয়েস একুশ-বাইশ, আর এক-জনের বছর আঠেরো। বড় ছেলে কোথায় কলে কাজ করে, ছোট ছেলে একটা মোটর মেরামতের দোকানে। চৌদ্দ-পনের বছর আগে মেঘনার স্বামী মরেছে। এই ছেলে দুটোকে সে-ই টেনে তুলেছে। সদার সুপরামর্শেও মুখ-ঝামটা দিয়ে উঠতে দেখা গেছে তাকে, খুব পরামশ্যি দিলে যা হোক, বাইরে মরদের কাজ কচ্চে তা থিকে ছাড়িয়ে এনে বাড়ির কাজে লাগাও!

অর্থাৎ মেঘনার মতে বাড়ির কাজ মরদের কাজ নয়। সদার সঙ্গে আড়াআড়ি করে ছোকরা চাকর দুটোকে ও-ই বেশি প্রশ্রয় দেয়। প্রায়ই খর-খর করে উঠতে শোনা যায়, ছেলেমানুষের সাথে তুমি অত লাগো কেনো, সারাক্ষণ তো বসে কাটাও, নিজে কত্তি পারো না!

সদা কৈফিয়ত দিতে চেষ্টা করে, আমার কি ওদের মত বয়েস আছে?

জবাব পেলে মেঘনার রসনা খরতর হয়।—বয়েস নেই তো কাজকর্ম ছেড়ে কাশীবাসী হওগে যাও না, নিজে বসে থেকে ওদের চোখ রাঙাও কেন?

এত বড় বাড়িতে জ্যোতিরাণী অনেক সময় নিজের মনে ঘোরা-ফেরা করেন। নীরবে দেখেন, নীরবে এ-সব বিতণ্ডা শোনেন। গেল বারে সদা বাড়ি যাবার আগে

লক্ষ্য করেছেন, কদিন আগে থেকেই মেঘনার মেজাজ চড়া। বছরে একবার এক মাসের ছুটি নিয়ে সদা দেশে যায়। ওই একটা মাস ডবল মাইনে পায় সে। জ্যোতিরাণীই দেন। দেশে ওর ছেলে-বউ, জমি-জমা আছে। জীবন কাটালে এখানে, দেওয়াই উচিত। কিন্তু মেঘনাও সমান দাবি নিয়ে জ্যোতিরাণীর কাছে এসে উপস্থিত হয়েছিল। বলেছে, সে ছুটি নেয় না বলে তাকে আরো বেশি দেওয়া উচিত। বিনা প্রতিবাদে জ্যোতিরাণী উচিত কাজ করেছেন। তাকেও দিয়েছেন। কিন্তু তাতেও মেঘনার মেজাজ ঠাণ্ডা হয়নি লক্ষ্য করেছেন, ও যেন সদাকে গঞ্জনা দেবার ফাঁক খুঁজে বেড়িয়েছে। সদা নালিশ করলে বিহিত করা যেত। নালিশ করেনি। ও চলে যাবার পরেই মেঘনার জিভ একেবারে ঠাণ্ডা।

মেজাজ ভালো থাকলে এ-সব দেখে শুনে জ্যোতিরাণী কৌতুক বোধ করেন। ভালো না থাকলে বিরক্ত হন। বারান্দার কোণে বসে এ ভাবে নিবিষ্ট মনে ওদের গল্প করতে দেখে আজ বেশি চোখে লাগল। তা'ছাড়া আজ আরো একটু বৈচিত্র্য লক্ষ্য করলেন। হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলে যাচ্ছে সদা, আর মেঘনা হাঁ করে গিলছে। বারান্দাময় চড়া ফটফটে আলো না থাকলে জ্যোতিরাণী এগোতে বা সাড়া দিতে দ্বিধা বোধ করতেন।

রবারের চটিতে ঈষৎ শব্দ করে কিছুটা এগনো সত্ত্বেও ওদের হুঁশ নেই।

সদা—

চমক ভাঙতে সদা ঘাড় ফেরাল, তারপর উঠে দাঁড়াল। মেঘনারও নিবিষ্টতা ভঙ্গ হল বটে, কিন্তু তার চোখ-মুখ তখনো অন্য-রকম। কি জন্যে ডাকা হয়েছে না শুনেই তড়বড় করে বলে উঠল, সদাদাদা ওদের দেশের খুদে স্বদেশী ডাকাতদের কি সব গল্প করছেলো গো বউদিমণি, শুনে আমার কম্প হচ্ছে—আ-হা, যে-জন্তি মরলি সেই দিনটা বাছারা দেখতেও পেলি না।

সদার দেশ মেদিনীপুর। মেঘনার উচ্ছ্বাসে ভিতরে ভিতরে হঠাৎ একটা ধাক্কা খেলেন জ্যোতিরাণী। এই দিনের উপযুক্ত স্মৃতির মধ্যে বিচরণ করছিল ওরাও। উল্টে তাঁর মনই বরং স্বচ্ছ নয় এখনো, তাই বিরূপ হয়েছিলেন। বাইরের এই আলো ওদের মধ্যে আরো বেশি পৌচেছে মনে হল। তাই নির্দ্বিধায় ওরা এভাবে বসে গল্প করতে পারছিল।

মিত্রাদি আসবেন খেয়াল রেখো, আমি ওদিকে আছি, এলে খবর দিও।

তাড়াতাড়ি সরে এলেন। সঙ্কোচ বোধ করছেন একটু। সদার সম্পর্কে কিছু ভাবা তাঁর উচিত হয়নি। পিছনের দিকটা তিনি বড় বেশি ভুলে ছিলেন বলেই এমন ভুল। সদাকে মোটামুটি সবাই চিনেছে। কথায় কথায় সেদিন বিভাসবাবুও

হেসে বলেছিলেন, ওকে নিয়ে একটা গল্প লিখবেন···

জ্যোতিরাণী থমকালেন। কে যেন ভ্রুকুটি করল ভিতর থেকে। অনেক ভালোর সঙ্গে এই একটা নামও আজ ছাড়িয়ে যাবার কথা। অথচ নতুন মনটা যেন সেই পুরানোকেই বার বার ছুঁয়ে ছুঁয়ে এগোতে চায়।

সদাকে বড় করে দেখতে গিয়ে প্রথমেই যে চিত্রটা চোখে ভাসল সেটা অবশ্য ভুললেই অপরাধ। বছর ছয় আগের কথা। কি তার থেকে কিছু বেশি। এই বাড়ি-ঘরের অস্তিত্ব ছিল না তখন। শ্বশুরে বেঁচে। তাঁর শেষ কথায় আক্রোশ বুকে চেপে ছেলেকে সস্তার জায়গায় দু-ঘরের একটি আস্তানা খুঁজে উঠে আসতে হয়েছিল। একমাত্র ছেলেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি, চলে যেতে বলেছিলেন। তিন বছরের শিশু কোলে জ্যোতিরাণীকে চলে আসতে হয়েছিল, কিন্তু সেই বোধ হয় প্রথম শ্বশুরকে দেবতুল্য মনে হয়েছিল তাঁর।

···কিন্তু এটা সদার প্রসঙ্গ।

চোখের জলে ভেসে শাশুড়ীই জোর করে সদাকে সঙ্গে দিয়েছিলেন। সেই দু-ঘরের আবাসে বসবাসকালে যাকে কেন্দ্র করে এত কাণ্ড, তাঁকে অর্থাৎ জ্যোতিরাণীকেই ছেড়ে শিবেশ্বরের চোখ দুটো তখন বাইরের দিক ছোটাছুটি করছিল। তার প্রথম কারণ, বাপের ওপর সঙ্কল্পবদ্ধ আক্রোশ, দ্বিতীয় কারণ, দায়িত্ব বহনের দায়। জ্যোতিরাণীর বয়েস তখন একুশও নয়, শুয়ে বসে সময় কাটে না, তার ওপর মানসিক অশান্তি। প্রাইভেটে আই-এ পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন তিনি। কিছু দূরে একটি মেয়ে কোন্ কলেজে আই-এ পড়ত। ছুটি থাকলেই ছেলেকে সদার কাছে রেখে জ্যোতিরাণী সেই মেয়েটির কাছে যেতেন কলেজের ধারা বুঝতে। মেয়েটির যেদিন তাড়াতাড়ি কলেজ ছুটি হত সেদিনও যেতেন।

কিন্তু নিরুপদ্রবে যেতে পারতেন না। প্রথম উপদ্রব ঘরে। কোনো বাড়িতে পড়তে যান শুনেই শিবেশ্বরের দু চোখ ঘোরালো হয়ে উঠেছিল। ছেলে নিয়েই সদাকে পৌঁছে দিয়ে আসতে এবং নিয়ে আসতে হুকুম করেছিলেন তিনি। আর তেমনি সমান দর্পে সেই হুকুম নাকচ করেছিলেন জ্যোতিরাণী। দ্বিতীয় উপদ্রব, বাইরে বয়েস-কালের কয়েকটা আড্ডাবাজ ছেলের উৎসুক দৃষ্টি ক্রমশ বড় বেশি অবাধ্য হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। তাদের হাব-ভাব স্পষ্ট হয়ে উঠছিল, একটু-আধটু মুখও খুলছিল।

একদিন মাত্রা ছাড়াল। জ্যোতিরাণী ঝলসে উঠে ঘুরে দাঁড়ালেন।—ভদ্রলোক না আপনারা? ভদ্রলোকের ছেলে না?

বাঞ্ছিত রসদ পেয়ে গেল যেন তারা। চোখের নিমেষে উঠে এসে ছেঁকে ধরল।

বুক টান করে তাদের একজন কৈফিয়ত তলব করল।—কি বললেন? কি বললেন আপনি?

সরে দাঁড়ান!

কেন সরে দাঁড়াব, আপনি পথ আলো করে চলেন বলে? আপনি আমাদের অপমান করলেন কেন সেই জবাব দিন আগে।

জ্যোতিরাণীর চোখে আগুন, কিন্তু কি যে করবেন হঠাৎ ভেবে পেলেন না।

কিছু করতে হল না, জবাব দিতেও হল না। ধূমকেতুর মত কোথা থেকে সদা হাজির। বাড়ি কাছেই, কার্ণিশে ঝুঁকে লক্ষ্য করে থাকতে পারে। পিছন থেকে সামনে এসে দাঁড়াল।—কি হয়েছে? এখানে দাঁড়িয়ে কেন বউদিমণি?

যে মাতব্বর রুখে এসেছিল সে ঘুরে দাঁড়াল।—তুমি আবার কে চাঁদ?

দিনে-দুপুরে চাঁদ দেখিস শালারা বাপ চিনিস না! মুখের কথা ফুরোবার আগেই যেভাবে বাপ চেনাল, জ্যোতিরাণীর দুই চক্ষু স্থির। দুটো পাক খেয়ে ওদের মাতব্বর তিন হাত দূরে মুখ থুবড়ে পড়ল। আর তার সঙ্গী কজন আপনা থেকেই কয়েক পা তফাতে সরে দাঁড়াল।

ছোটলোকদের সামনে দাঁড়িও না বউদিমণি, চলে এসো!

যে কজন ছিল একত্র হলে সদাকে মাটিতে পুঁতে ফেলতে পারত। ওর কথা ভেবে কটা দিন এরপর ভয়ে ভয়ে কেটেছিল জ্যোতিরাণীর। সাবধানও করেছেন। কিন্তু সদা নির্বিকার।

এ-ই সদা। ছেলেবেলা থেকে শ্বশুরের সংসারে আছে। ওর বাবাও এই সংসারেই জীবন কাটিয়ে গেছে। প্রাণ যায় যাক, সদা কৃতজ্ঞতা ভুলতে পারে না।

ঘোরানো বারান্দার বাঁকের ওধারে দেয়ালে বড় আয়না ফিট করা। তার নীচে মুখ-হাত ধোবার বেসিন। আয়নায় চোখ পড়তে জ্যোতিরাণী দাঁড়িয়ে গেলেন একটু।···পুরুষের লোভাতুর দৃষ্টি তখন সত্যিই গায়ে বিঁধত। এখন বেঁধে না। আভিজাত্যের মার্জিত বিনয় আর সৌজন্যের আর স্তুতিকলার ফাঁকে ফাঁকে সেই একই অনাবৃত লোভ হামেশা উঁকিঝুঁকি দিতে দেকেন। তবু না।· এরই থেকে উল্টে বরং কিছু একটা যাচাইয়ের তুষ্টি বোধ করেন। আয়নায় নিজের ঠোঁটের ফাঁকেই হাসির আভাস দেখলেন জ্যোতিরাণী। মেয়েদের বয়েস সম্পর্কে কোন্ একটা বইয়ে বেশ মজার মন্তব্য করেছিলেন বিভাসবাবু···

আবার সেই নাম! সচকিত হলেন জ্যোতিরাণী। নিজের প্রতি এই তৃতীয় দফা ভ্রূকুটি করতে করতে দ্রুত বাঁকের ওধারে অদৃশ্য হলেন তিনি। শাশুড়ীর মহলে।

দরজার খানিক এধারেই পা থেমে গেল। ছেলের সরোষ কটূক্তি কানে যেন এক পশলা বিষ ছড়ালো।—তুই দিবি কিনা আগে বল্ বুড়ী, নইলে এই কৌটোর আফিং সব তোর গলায় ঠেসে খুন করব তোকে।

জবাবে শাশুড়ীর নিরুপায় অনুনয় আর তর্জন।—লক্ষ্মী দাদা, সোনা মাণিক আমার, ওসব জিনিস হাতে করতে নেই—শিগ্‌গীর দে বলছি ওটা, নইলে এক্ষুনি তোর মা-কে ডাকব কিন্তু—

এঃ, মাকে ডাকবে! ছেলের বিকৃত আস্ফালন, ডাক্ না দেখি কত আস্পর্ধা তোর—

সঙ্গে সঙ্গে বাহুতে হ্যাঁচকা টান পড়তে বিষম বিস্ময়। পর মুহূর্তে মুখ শুকনো। বউয়ের মূর্তি দেখে শাশুড়ীও হকচকিয়ে গেলেন হঠাৎ। তারপরেই নাতির ওপর রাগ।—ত্যাখো, তোমার ছেলের সাহস ত্যাখো, পয়সা দিইনি বলে ও আমার আফিংয়ের কৌটো নিয়ে পালাচ্ছে, আবার বলে কিনা ওই আফিং গলায় ঠেসে আমাকে খুন করবে!

রাগে থমথমে মুখ জ্যোতিরাণীর। ঠাকুমাকে 'তুই' বলার জন্যেও কদিন শাসন করেছেন ঠিক নেই। শাশুড়ীই আবার উল্টে প্রশ্রয় দেন, দোষ খণ্ডাতে চেষ্টা করেন।—বলুক, বড় হলে কি আর বলবে!

সেই প্রশ্রয়ে এ পর্যন্ত গড়িয়েছে। এক হাতে শক্ত করে বাহু ধরা, কৌটোর জন্য অন্য হাত বাড়াতে প্রাথমিক ভয় কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করে ছেলে বলল, এটা আফিংয়ের কৌটো নয়—

কৈফিয়ত শেষ হবার আগে কৌটোটা মায়ের হাতে চলে গেছে। তাকে আগলে দাঁড়িয়ে জ্যোতিরাণী, কৌটোটা খুলে ফেললেন। ছোট কালো কালো কয়েকটা গুলি মেঝেতে পড়ল। তেমন শব্দ হল না। কৌটোয় ওরকম আরো কতগুলো রয়েছে।

নিজের নাকের কাছে ধরলেন একবার।—কি এগুলো?

গালার গুলী—

ওদিক থেকে বিস্ময়ে ভেঙে পড়লেন শাশুড়ী। আধা ছানিপড়া দুই চক্ষু টান করে কৌটোটার দিকে চেয়ে বলে উঠলেন, কি পাজী কি পাজী অ্যাঁ! পয়সা আদায়ের ফিকিরে এই করেছে। আমি আরো ভাবছি অত করে লুকোলাম, দস্যি ওটা খুঁজে বার করল কি করে! চোখে ধুলো দেবার জন্য আবার ওইরকম কালো কৌটো করেছে—আফিং বলে আমাকে দূর থেকে খুলে দেখালে পর্যন্ত! নাতির হেনস্থার সম্ভাবনাতেই হয়ত তাঁর বিস্ময়ের শেষের দিকে হাসির প্রলেপ পড়তে

পাগল। তিনি ঠকেছেন এইটেই বড় কথা যেন।

কিন্তু ঠাকুমার হাসি দেখেও ন বছরের সিতু ভরসা পেল না খুব। মায়ের এই মুখ প্রায় নৃশংস গোছের মনে হল তার।

শুধু রাগ নয়, সেই সঙ্গে কি এক হতাশাও বুঝি জ্যোতিরাণীকে গ্রাস করতে আসছে। ছেলের ঘাড় আর বাহু ধরে তাকে ঘরের বাইরে টেনে আনার উপক্রম করতে শাশুড়ী বাধা দিয়ে উঠলেন। ও-কি! শাসনের জন্য অমনি হাত নিশপিশ করে উঠল বুঝি তোমার, আমার কাছে দাও বলছি, আমি দিচ্ছি দু-ঘা।

রাগের মাথায় ঘুরে কিছু একটা বলতে গিয়েও জ্যোতিরাণী সামলে নিলেন। দ্বিগুণ রাগে ছেলে নিয়ে এগোবার মুখে আবার বাধা। দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন কালীদা।

কালীনাথ। সম্পর্ক খুঁজলে জ্যোতিরাণীর ভাসুর সম্পর্ক। শিবেশ্বরের থেকে বছরখানেকের বড়। বিয়ের আগে এ বাড়ির দুটি লোককে ভাল চিনতেন জ্যোতিরাণী। একজন এই কালীদা, আর একজন মামাশ্বশুর গৌরবিমল। দ্বিতীয় যোগসূত্রটাও কাছের নয়, শাশুড়ীর সমবয়সী এক মাসীর ছেলে। শিবেশ্বরের থেকে বছর তিনেক বড় হতে পারেন এই মামাশ্বশুরটি। ইনি ছিলেন জ্যোতিরাণীর বাবার ছাত্র, সেই সুবাদে বাড়িতে যাতায়াত ছিল। আর কালীদা ছিলেন খুড়তুতো জ্যাঠতুতো দাদাদের সতীর্থ এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু। দাদাদের বন্ধু হলেও বাড়ির সকলের সঙ্গেই খাতির ছিল তাঁর। সকলের সঙ্গেই লাগতেন। নিজে বড় হাসতেন না, কিন্তু কথার জালে ফেলে বা কিছু একটা কাণ্ড করে সকলকে হাসিয়ে মারতেন। তাই কালীদা এলে বাপের বাড়িতে খুশির সাড়া জাগত।

এখন ভদ্রলোক আরো একটু গম্ভীর হয়েছেন বটে, কিন্তু ধাত বদলায়নি। তাঁর রসিকতার ধার বরং আরো সূক্ষ্ম হয়েছে। গম্ভীর মুখে বৃহৎ সমস্যাও তরল করে আনার ব্যাপারে তাঁর জুড়ি নেই। সত্যিকারের সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও মিটি মিটি হাসতে পারেন তিনি। মামাশ্বশুর এবং কালীদা দুজনেই ছেলেবেলা থেকে এই পরিবারে মানুষ। শ্বশুর চোখ বোজার পর মামাশ্বশুর কৌশলে অন্যত্র সরে গেছেন। এর পিছনে নিগূঢ় কারণও আছে। সম্প্রতি কলকাতায় থাকেনও কম। থাকলে প্রায়ই আসেন অবশ্য। সিতুর টানেই আসেন—ছেলেটা ছোটদাদুর গল্পের সমঝদার। এই এক জায়গায় দুরন্ত ছেলেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠাণ্ডা হয়ে বসে থাকতে দেখা যায়।

কালীদা এ বাড়িতেই থাকেন। বাড়ির কর্তৃত্বও বলতে গেলে তাঁরই হাতে। শাশুড়ী বা জ্যোতিরাণী ছেড়ে দরকার পড়লে বাড়ির আসল মালিকও এই একজনের

সঙ্গেই পরামর্শ করেন। ডাক্তার যেমন নিরপেক্ষ বিবেচনায় চিকিৎসা করেন, কালীদাও তেমনি নিরপেক্ষ ভাবেই পরামর্শ দেন। তাই এখানে সকলেরই মোটামুটি নির্ভরযোগ্য আপনার জন তিনি।

ইঁদুর কলে পড়ল বুঝি—। কি ব্যাপার?

জবাবে জ্যোতিরাণী তাঁর দিকেও জ্বলন্ত দৃষ্টি হানলেন একটা। রাগ সকলের ওপরেই। কালীদার ওপরেও। ছেলে দিন-কে-দিন কি হয়ে উঠছে দেখেও দেখেন না সব সময়। বেশি বললে দু দিন হাঁক-ডাক করে শাসন করেন, তারপর আবার যে কে সেই। অথচ আসকারা দেবার বেলায় সকলের পাঁচ হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসা চাই।

অস্ফুট ঝাঁজে জ্যোতিরাণী জবাব দিলেন—কিছু না।

তিনি পথ ছেড়ে দাঁড়ালেই ছেলে নিয়ে বেরুতে পারেন। নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করতে পারেন। তারপর আর কেউ তাকে বাধা দিতে পারবে না। দরজা না ভেঙে কেউ ঘরে ঢুকতে পারবে না। এই বাধা পেয়েই জ্যোতিরাণী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন আরো।

কালীনাথের সাড়া পেয়ে শাশুড়ীই বাঁচলেন যেন।—ছাখ, রাগ ছাখ একবার, আমি যে বলছি কানেই যায় না। দোষ করেছে বলে একেবারে খুন করতে হবে—

নির্লিপ্ত গাম্ভীর্যে কালীনাথ তপ্ত পরিস্থিতিটুকুই শুধু আঁচ করে নিলেন। জ্যোতিরাণীর অগ্নিদৃষ্টির মুখোমুখি হলেন তারপর। বললেন, আচ্ছা, আমি দেখছি কি করেছে। তুমি যাও, নিচে বিভাসবাবু বসে আছেন।

আচমকা এক বিপরীত প্রতিক্রিয়া ভিতরে ভিতরে ওঠা-নামা করে গেল বারকয়েক। একটু আগের চোখের তাপ ঠাণ্ডা হতে থাকল। মুখের বাড়তি রক্তকণাগুলো যথাস্থানে ফিরে চলল। ছেলের বাহু-ধরা হাতের কঠিন মুঠো ঢিলে হয়ে এলো।

সুযোগ হেলায় নষ্ট না করে সিতু মায়ের হাত ছাড়িয়ে একেবারে ঠাকুমার কোলে এসে নিশ্চিন্ত হল।

কালীনাথের পাশ কাটিয়ে শাশুড়ীর ঘর থেকে নীরবে বেরিয়ে এলেন জ্যোতিরাণী।

॥ তিন ॥

স্বাভাবিক প্রেরণা, আর, হতাশার বাষ্প থেকে নিজেকে টেনে তোলার উদ্দীপনা, এক জিনিস নয়। বাস্তবের আয়নায় এই দুইয়ের তফাত চোখে পড়ে। বিভাস দত্তর আসার খবর অনেকটা এই বাস্তবের মত।

আজ এই ক'ঘণ্টার যে অনুভূতির মধ্যে বিচরণ করছিলেন সেটা সত্যিকারের অবলম্বন হবে কি হবে না এই সংশয় ছিল বলেই কি সর্বক্ষণের চিন্তা থেকে জ্যোতিরাণী এই একজনকে দূরে সরিয়ে রাখছিলেন? এই জন্যেই কি সকলকে ছেড়ে মিত্রাদিকে ডেকেছিলেন? যে তাঁর ওই উদ্দীপনার ফানুসটা কোনো বাস্তব কটাক্ষের হুল ফুটিয়ে চুপসে দেবে না—বরং ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড় করে তুলবে আরো? বাহবা দেবে, পাঁচজনের কাছে বলে বেড়াবে, বার বার টেনে টেনে মাটিতে নামাতে চাইবে না বিভাসবাবুর মত—এই জন্যে?

জ্যোতিরাণী সঠিক জানেন না।

নীচে বিভাসবাবু বসে আছেন শুনেও সিঁড়ি পেরিয়ে জ্যোতিরাণী সোজা নিজের ঘরে এসে ঢুকলেন কেন, তাও জানেন না। যেন ঘরে কাজ আছে কিছু, সেটাই আগে সারা দরকার।···বাপের বাড়ির এক খুড়তুত দাদাকে মনে পড়ল। সমস্ত বছর পড়াশুনায় ফাঁকি দিয়ে পরীক্ষার সময় খুব অনুশোচনা হত তাঁর। সেই অনুশোচনার ফলে নাওয়া-খাওয়া ভুলে সে রুটিন করতে বসে যেত। দিনে বারো ঘণ্টা এমন কি আঠেরো ঘণ্টা পর্যন্ত পড়ার মিয়াদ ধার্য করে তবে সান্ত্বনা পেত। সঙ্কল্পের সেই নতুন উদ্দীপনায় নিজেই ফুটত দিনকতক। তারপর আবার যে কে সেই। পরীক্ষার ফলের মধ্য দিয়ে তার যে চেহারাটা বেরিয়ে আসত সেটা হাস্যকর। হাস্যকর হলেও সেটাই সত্যি।

ঘরে এসেও জ্যোতিরাণী অস্বস্তি ভোগ করলেন খানিকক্ষণ। বিভাসবাবুর আসার ফল খুড়তুত দাদার সেই পরীক্ষার ফলের শামিল। আর জ্যোতিরাণীর এতক্ষণের সঙ্কল্পও যেন অনেকটা সেই রুটিন করার মতই। বিভাসবাবু এসেছেন শোনামাত্র সেটার বুনট ঢিলে হতে শুরু করেছে। কিন্তু ঢিলে হোক সেটা তিনি চাননি। মনে-প্রাণে চাননি।

আয়নায় নিজেকে দেখলেন একবার। মাথায় চিরুনি বুলিয়ে নিলেন। না, বাড়িতে কেউ এলে সাজসজ্জা তিনি করেন না। এটুকু অভ্যাসে করলেন। আসলে ভিতরে ভিতরে নিজেকে একটু প্রস্তুত করে নিচ্ছেন তিনি। বিভাসবাবুর

আসাটা সহজ ব্যাপার। প্রায়ই আসেন। এলে জ্যোতিরাণী খুশিই হন। কখন আসবেন এই প্রতীক্ষায়ও থাকেন অনেক সময়। কদিন না এলে কখনো সরাসরি চোখ পাকিয়ে কৈফিয়ত তলব করেন, কখনো বা ঘুরিয়ে টিপ্পনী কাটেন। কিন্তু সেই সহজ অভ্যস্ত দিনগুলোর সঙ্গে এ দিনটার হঠাৎ এত তফাত হয়ে গেছল কেন কে জানে। এই ব্যতিক্রমের ঝাপটায় চেনাজানা সব মুখের মধ্যে বিশেষ করে এই একজনকে তফাতে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলেন বলেই হয়ত একটুখানি প্রস্তুতির ফাঁক দরকার। চেষ্টাটা কেন করেছিলেন সেটা আর তলিয়ে দেখতে রাজি নন তিনি।

জোর করেই হাসলেন একটু জ্যোতিরাণী। ফলে হাসা সহজ হল তারপর। এবারে নীচে যাওয়াও সহজ হবে। সহজ না হতে পারাটাই ছেলেমানুষি। চিন্তাটা এবারে বিভাসবাবুর স্বপক্ষে ঘোরালেন তিনি। অনেক রোগী যেমন ডাক্তারকে এড়াতে চায়, সেই দশা হয়েছিল যেন তাঁর। রোগ না ধরলে অসুখ সারবে কেমন করে? বিভাসবাবুর সামনে পড়লে মনটা সাদাসাপটা বাস্তবের ওপর দিয়ে বিচরণ করতে বাধ্য হয়, কল্পনার পাখা মেলে আকাশে ওড়ে না। এটা ওই ভদ্রলোকের দোষ না গুণ? জীবনের অতি ঝকমকে কৃত্রিম খোলসও অনেক সময় ছিঁড়ে-খুঁড়ে তছনছ হয়। এটা দোষ না গুণ?

হাসি মুখেই নিচে নামলেন জ্যোতিরাণী। বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন, অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি তো? কিন্তু ঘরে ঢুকেই থমকাতে হল। বিভাসবাবুর মুখোমুখি উল্টো দিকের সোফায় গা ছেড়ে বসে আছেন মিত্রাদিও। জ্যোতিরাণীর মুখ দিয়ে আপনিই বেরিয়ে গেল, ও মা, তুমিও—

হাসিমুখে নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলেন মিত্রাদি। এভাবে নড়লে-চড়লে তাঁর সাজ-সজ্জার ঝলক বাড়ে। দু চোখ কপালে তুলে বললেন, তুমি আমাকে আশা করোনি নাকি?

জ্যোতিরাণী সামলে নিলেন। শেষের এই স্বল্পক্ষণ মিত্রাদির কথা মনে ছিলই না বটে। যে কারণে তাঁকে ডেকেছিলেন সেটা এখানে প্রকাশ হলে আরো ছেলেমানুষি হবে যেন। এধারের পুরু গদি আঁটা লম্বা সেটিটায় বসে পড়ে একটা হাত সেটির মাথায় ছড়িয়ে দিলেন জ্যোতিরাণী। ঘরোয়া আলাপে এমনি ঢিলে-ঢালা শিথিল ভঙ্গিতেই বসেন তিনি। বললেন, আশা করেছি। টেলিফোনে রওনা হচ্ছ বললে, ভাবলাম কাল নাগাত ঠিক এসে পৌঁছে যাবে। এত যে তৎপর হয়েছ ভাবিনি।

—দেখলেন, দেখলেন? মৈত্রেয়ী চন্দ বিভাস দত্তর দিকে ফিরলেন, ঘুরিয়ে

ফিরিয়ে ও আমাকে মোটা বলল! অর্থাৎ, আমার চলতে-ফিরতে দিন কাবার—

হাসলে বিভাস দত্তর কালো মুখ কমনীয় দেখায়। কিন্তু তিনি গোটাগুটি হাসেন না বড়। সেই হাসি ঠোঁটে আর চোখে লেগে থাকে। ক্রমাগত সিগারেট খান। ছটো আঙুল হলদে হয়ে গেছে। আঙুলে সিগারেট না থাকলে গলার বোতাম খোঁটেন। এটা মুদ্রা-দোষ। এরও সমালোচনা হয়। মিত্রাদি একদিন বলেছিলেন, ভদ্রলোকের গলা একটু লম্বা বলে লোকের চোখ থেকে গলা আড়াল করেন। আর সিগারেট থাকলে বুকের কাছে নয় মুখের কাছে হাত তো উঠেই আছে।

মিত্রাদির বিশ্লেষণ যথার্থ নয়। মানুষটাই একটু লম্বা ধরনের। দোহারা চেহারা। রূপবান নয়, কিন্তু সপ্রতিভ মূর্তি। একসঙ্গে অনেক কথা বলেন না। কেটে কেটে বলেন। আর থেকে থেকে বেশ সরস মন্তব্য করেন। তাতে ধারও থাকে অনেক সময়। ফলে এ বাড়িতে যাঁরা হামেশা আসেন, তাঁরা সকলেই তাঁকে খুব পছন্দ করেন না। তবে এত বড় সাহিত্যিকের সাক্ষাৎলাভে মুখে সকলেই আনন্দ প্রকাশ করেন। কিন্তু জ্যোতিরাণীর ধারণা, অত সিগারেট খাওয়া বা ওই বোতাম খোঁটা মানসিক চাঞ্চল্যের লক্ষণ। ভিতরে ভিতরে ভদ্রলোক আদৌ সুস্থির নয়। তাঁর স্নায়ু বশ নয়। এই জন্যেই অত বেশি চা-ও খান বোধ হয়।

নাক-মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বিভাস দত্তর হাসি-ভরা দৃষ্টিটা মৈত্রেয়ী চন্দর প্রতি মনোযোগী হল। বললেন, আপনি এত বিশদ করে বুঝিয়ে না দিলে বুঝতে পারতুম না অবশ্য। চোখের পাল্লায় রেখে আর একপ্রস্থ ওজন করে নিলেন যেন, তারপর মন্তব্য করলেন, উনি তাই যদি বলে থাকেন তাহলে সত্যের অপলাপ হয়েছে, ঠিক মোটা বলা চলে না।

সুচারু ভ্রূ-ভঙ্গি করে বাধা দিয়ে উঠলেন মৈত্রেয়ী চন্দ, থাক থাক, আসলে আপনিও ফোড়ন দিচ্ছেন। সাহিত্যিকদের জানতে বাকি নেই, মুখে এক মনে এক।

ছদ্ম বিতণ্ডা শুনে মুখ টিপে হাসছেন জ্যোতিরাণী। কিন্তু আসলে বিরক্ত হচ্ছেন তিনি। সবেতে মিত্রাদির নিজের দিকে চোখ টানার সেই পুরনো রীতিই মনে এলো প্রথম। কিন্তু বিরক্তির অন্য কারণও থাকতে পারে। মিত্রাদিকে যখন ডেকেছিলেন তখন মনের আর এক অবস্থা। তখন বিভাসবাবু আসতে পারেন একবারও ভাবেননি। তিনি আসবেন জানলে মিত্রাদির ডাক পড়ত না।

—চা বলি? প্রশ্নটা দুজনেরই উদ্দেশে।

বিভাস দত্ত জবাব দিলেন না। অর্থাৎ তাঁর আপত্তি নেই। মিত্রাদি মাথা

নাড়লেন।—আমি না। বিকেল থেকে এ পর্যন্ত চার কাপ হল। সাহিত্যিককে আপ্যায়ন করো।

চায়ের কথা উঠলে এই গোছেরই কিছু বলে মিত্রাদি নিজেকে নাকচ করেন। ক' পেয়ালা হয়ে গেছে সেই ফিরিস্তি দেন। কিছুদিন হল জ্যোতিরাণী এটা লক্ষ্য করছেন। সেটির পিছনের একটা বোতাম টিপতে প্যাঁক করে বাইরে শব্দ হল। সব-কটা সোফা-সেটির পিছনে এমনি বোতাম আঁটা। জ্যোতিরাণীর অনুমান, এই ব্যবস্থা নিছক আধুনিকতার দায়ে নয়। ওপাশে কর্তার খাসদখলের মহল পরের তৈরি। শিবেশ্বরবাবুর বন্ধু-বান্ধব, অতিথি-অভ্যাগতরা আগে এই ঘরেই আসর জমাতেন। তাঁদের দরকারী আলোচনার বৈঠকও বসত এখানে। রাতের আসর বা আলোচনা রঙিন পানীয় ভিন্ন হয় না। সেই সময় আসন ছেড়ে উঠে কলিং-বেল টিপে বারবার চাকর-বাকর তলব করতে ভালো লাগার কথা নয়। তাই সোফা-সেটির গায়ে এই ব্যবস্থা।

এখন এটা জ্যোতিরাণীর ড্রইংরুম বলা যেতে পারে। ও-দিকের মহলের সাজসজ্জা এখন একেবারে অন্যরকম। সেখানে প্ল্যান করে সোফা-সেটি সাজানো, সাইড-টেবল সেণ্টার-টেবল বসানো, দেয়ালে নামকরা বিদেশী শিল্পীদের ছবি টাঙানো। হলঘরের আর একদিকে ঝকঝকে চেয়ার-টেবিল, কাচের বুক-কেস। তার ওপাশে ছোট ডাইনিং-রুম, সেখানে ওয়াইন-স্ট্যাণ্ডে বোতল আর ডিক্যাণ্টার মজুত। তারপরেই হাল-ফ্যাশানের অ্যাটাচড্ বাথ। জ্যোতিরাণী কোনো সময় এদিকটা চেয়েছিলেন বলেই যেন বাড়ির মালিক ওদিকটায় অত বেশি মন দিয়েছিলেন।

কিন্তু উভয় তরফের পরিচিত যাঁরা তাঁরা এ-ঘরেই বেশি আসেন। এখানেই বসেন।

শামু এসে চায়ের নির্দেশ নিয়ে গেল। বাড়িতে কেউ এলে তাকেই তৎপর থাকতে হয়। জ্যোতিরাণী নিজের হাতে তাকে ভালো চা করতে শিখিয়েছেন। আর ঝুঁকি ভাগ করার দায়ে শামু ভোলাকে শিখেয়েছে।

মিত্রাদি প্রসঙ্গের দিকে এগোতে চাইলেন। ফোনে কেন ডাকা হয়েছে এখনো জানেন না।—তারপর, কি হুকুম বলো, তলব কেন? ঢুকেই সাহিত্যিক দেখে ঘাবড়ে গেছি, কি কাজে লাগতে পারি?

অনেক কাজ,—জ্যোতিরাণী বললেন,—বিভাসবাবু তাঁর লেখার রসদ খুঁজছেন, তোমার থেকে ভালো যোগানদার আর কে আছে? এখন বসে রসদ যোগাও। মিত্রাদিকে ভালো করে ধরতে পারলে আপনার আর মেটিরিয়ালের জন্য ভাবতে

হবে না বিভাসবাবু, উনি নিজেই জ্যান্ত মেটিরিয়াল।

নিছক কৌতুকের কথা। মিত্রাদিকে ডাকার কারণ ব্যক্ত করবেন কি করবেন না, সেই দ্বিধায় পড়ে কথা ঘোরানোর চেষ্টা। বিভাস দত্ত এ-পকেট ও-পকেট হাতড়ে সিগারেটের প্যাকেট খুঁজছেন আর হাসছেন অল্প অল্প। কিন্তু মিত্রাদির মুখের চকিত পরিবর্তন দেখে জ্যোতিরাণী সত্যিই অবাক। এ ধরনের কৌতুক মিত্রাদির গায়ে মাখারও কথা নয়। উল্টে সোৎসাহে যদি লাভের ভাগের বখরা করতে বসতেন লেখকের সঙ্গে, সেটাই স্বাভাবিক হত। কিন্তু চকিতে অস্বাভাবিক কিছুই দেখলেন বুঝি জ্যোতিরাণী। প্রেক্ষাঘরের অন্ধকারে হঠাৎ একঝলক দিনের আলো ঢুকলে পরদার সকল ছবি যেমন রূপশূন্য বর্ণশূন্য দেখায়, তেমনিই হয়ে গেল মিত্রাদির মুখখানা। তেমনি অনাবৃত, কৃত্রিম। মুহূর্তে সামলে নিয়ে মিত্রাদি হেসেই উঠলেন বটে, কিন্তু সেও নিষ্প্রাণ ঠেকল।

—হাউ ফানি! সত্যি এ-জন্যে ডেকেছ নাকি?

বিভাস দত্ত নতুন সিগারেট ধরাচ্ছিলেন, কারো দিকে লক্ষ্য করেননি। এবারে হাসি-মুখেই নিশ্চিন্ত করলেন তাঁকে, কিছু ভাববেন না, দরকার পড়লে আমিই গিয়ে হাজির হব আপনার কাছে। আজ এখানে আমি আসব এ উনি নিজেই জানতেন না।

প্রেক্ষাঘরের দরজা আবার বন্ধ করা হল যেন। ছবির রং ফিরল, বর্ণ উজ্জ্বল হল। একটু আগের চকিত ব্যতিক্রম একেবারে মুছে দেবার মত করেই ডবল হাসলেন মিত্রাদি। যে লঘু ইশারার ফলে এই বিভ্রম, বাক্-কুশলিনীর মত সেটা ধরেই রসালাপে মগ্ন হলেন।—দেখেছেন কাণ্ড! আমি আঁতকে উঠেছিলাম একেবারে, এতকালের যা-কিছু গোপন সব গেল বুঝি ফাঁস হয়ে। কবে যে ও বিশ্বাসঘাতকতা করে বসে সেই ভয়ে অস্থির আমি। আপনি মশাই আর বেশি আসবেন-টাসবেন না এ বাড়িতে।

জ্যোতিরাণীর চোখে-মুখে হাসির প্রলেপ লেগে আছে বটে, কিন্তু মনের তলায় একটু আগে যে আঁচড় পড়েছে, সেটা এতেও মুছে গেল না। মিত্রাদির দিকে চেয়ে তিনি যেন কিছু দেখেছেন। ভারী দুর্বোধ্য কিছু।

শামু চায়ের ট্রে রেখে গেল। মিত্রাদি কাজ পেলেন। তিনটে পেয়ালার দু পেয়ালায় চা ঢেলে দুজনের দিকে এগিয়ে দিলেন। বিভাস দত্ত বিনা নোটিসে এসেছেন জেনে নিশ্চিন্ত হবার পর ভিতরে ভিতরে আবার উৎসুক হয়ে উঠেছেন। বিরূপও। টেলিফোনে কেন ডাকা হয়েছে তাঁকে আর শোনা হবে কিনা ঠিক কি। সচরাচর তাঁর ডাক পড়ে না। এই গরবিনী অন্তত ডাকে না, নিজে

থেকেই আসেন তিনি। আজ ডেকেছে যখন, মনে কিছু ছিলই। অতএব আর একবার মন বোঝার চেষ্টায় এগোলেন।

প্রথমে সামনের অনাহূত লোকটার উদ্দেশ্যেই বাক্যবাণ নিক্ষেপ করলেন একটা, বললেন, আজকের এই দিনে বাইরে গলা ফাটিয়ে বক্তৃতা না করে আপনি ঘরে বসে আছেন এ কিন্তু ভাবিনি—

—গলাটা ফাটানো ছাড়া আর কি লাভ হবে তাতে। নির্লিপ্ত জবাব দিয়ে কোলের মাসিকপত্রটা হাতে তুলে নিলেন বিভাসবাবু।

ওই বাংলা সাহিত্যপত্রটা আগেই লক্ষ্য করেছিলেন জ্যোতিরাণী। নামও দেখে নিয়েছিলেন। খুব চালু কাগজ নয়, কিন্তু ইদানীং বেশ নাম শুনছেন। ওটা দেখে মনে মনে একটু খুশিও হয়েছিলেন। কারণ, লেখকের সঙ্গে ওটা হঠাৎ চলে আসেনি, বিশেষ উদ্দেশ্যেই এসেছে। কিন্তু মিত্রাদিকে দেখে এ সম্পর্কে আর উচ্চবাচ্য করেননি তিনি।

—তারপর, কি ব্যাপার বলো, মিত্রাদি জ্যোতিরাণীর দিকে ফিরলেন, প্রাক্-স্বাধীনতার সন্ধ্যায় খুব একটা ভালো খবর দেবে ভেবে দৌড়ে এলাম—বাইরে অত আলো দেখেও ভেবেছিলাম ভিতরে খুব কিছু ঘটা হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গ উঠতেই কি একটা অনুভূতি যেন অসহিষ্ণু হয়ে ঠেলে উঠতে চাইল। জ্যোতিরাণীর মনে হল, নিজেও তিনি এদের সামনে একটা গোপনতার আবরণ টেনে বসে আছেন সেই থেকে। ফলে এই দিন, এই রাত, এই আলো, সবই নিষ্ফল হতে চলেছে। নিজেকে টেনে তোলার আশাও দূরে সরছে। কিন্তু গোপনতার দরকার কি? সামনে বসে আছেন বিভাস দত্ত, তাতেই বা কি? খানিক-আগে যে চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, সেটা বলতে না পারার মত ঠুনকো ভাবার কি হল?

ঠাণ্ডামুখে মিত্রাদির সঙ্গে কথাটা শেষ করে নেবার জন্য প্রস্তুত হলেন তিনি। বললেন, ঠিকই ভেবেছ। ভালো খবর দেব, আর ভিতরে ঘটাও হচ্ছে কিছু। হাসলেন একটু, শোনো, ওই যে ঘর-বাড়ি খুইয়ে সব মেয়েরা এখানে এসে বিপদে পড়ছে বলছিলে সেদিন, আর তাদের নিয়ে কি করা যায় ভাবছিলে, তার কি হল?

মিত্রাদি আর যাই হোক, এ প্রসঙ্গ আদৌ আশা করেননি। কিন্তু শোনামাত্র চোখে-মুখে চাপা আগ্রহ দেখা গেল। জবাব দিলেন, কি আর হবে, আমার ভাবনাই সম্বল। একা কি আর করতে পারি···তুমি কিছু ভেবেছ নাকি?

সিগারেট অ্যাশপটে গুঁজে বিভাস দত্ত গলার বোতাম চড়াও করেছেন। দৃষ্টিটা খোলা সাময়িকপত্র থেকে এক-একবার জ্যোতিরাণীর মুখের ওপর এসে থামছে।

জ্যোতিরাণী মাথা নাড়লেন।—ভাবিনি…তবে কিছু করতে পারলে মন্দ হয় না। বিভাস দত্তর চোখে চোখ পড়ল, আপনি কি বলেন ?

বিভাস দত্ত এ আলোচনায় তেমন উৎসাহ বোধ করলেন না। হাল্কা জবাব দিলেন, কিছু করলে কিছু হয়ই তো, ভালো-মন্দ বলা শক্ত।

—কেন ? সারাক্ষণ এই একজনকে এড়াতে চেয়েছিলেন বলেই হয়ত জ্যোতিরাণীর এই বিপরীত জেরা।

বিপাকে পড়ার মত করে বিভাস দত্ত জবাব দিলেন, আপনারা ঠিক যে কি করতে চান, তাই তো জানি না।

জ্যোতিরাণীর ঝোঁক বাড়ছে যেন। বললেন, আমরাও জানি না।… আপনাকে নিয়ে একদিন গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করে আসব কিনা ভাবছিলাম।

—আমাকে নিয়ে! কেন ?

যদি তিনি কিছু পরামর্শ দেন।

বিভাস দত্তর দু চোখ আবার কোলের খোলা মাসিকপত্রের দিকে ঘুরল। মুখ দেখেই বোঝা গেল জবাব দেবেন কিছু। দিলেন। একটু থেমে বললেন, তা মন্দ হয় না।…খবরের কাগজে বেরুবে, পাঁচজনে জানতেও পারবে। কিন্তু আমাকে নিয়ে কেন ?

লোকটাকে এই মুহূর্তে সব থেকে বেশি অবাঞ্ছিত মনে হচ্ছিল মিত্রাদির। কিন্তু জ্যোতিরাণীর মেজাজের আভাস পেয়ে ঠোঁটের ফাঁকে তিনি নীরব হাসি ধরে রাখলেন। সেটির মাথা থেকে জ্যোতিরাণীর প্রসারিত বাহু নেমে এসেছে। বসার শিথিল ধরন বদলেছে। ঘুরেই বসলেন, হাসি-হাসি মুখ।—লেখকরা যে দিক-দিশারী। সব দেশেই লেখকরা হলেন পয়লা নম্বরের ভরসা, আর আমাদের লেখকরা শুধু আকাশেই উড়বেন ?

—লেখকরা আকাশে ওড়ে না, বিভাস দত্ত প্রায় নির্লিপ্ত, এরোপ্লেনের ভাড়া বড় বেশি।

জ্যোতিরাণী হাসছেন মুখ টিপে। আরো কড়া জবাব মুখে এসেছিল। বলতে যাচ্ছিলেন, সেই খেদেই কাগজে-কলমে আরো বেশি ওড়েন তাঁরা, খবরের কাগজটাকে বড় করে দেখেন, পাঁচজনের জানাটাকেই বড় ভাবেন। কিন্তু বললেন না। প্রায় অকারণে একটা বিতণ্ডা ফেঁদে বসছেন মনে হতে তর্ক ছেড়ে এদিকে ফিরলেন আবার।—তুমি এক কাজ করো মিত্রাদি, কি হতে পারে না পারে সব একটা কাগজে ছকে ফেলো, তারপর এসো একদিন।

মিত্রাদি সানন্দে মাথা নাড়লেন। এবারে ওঠার ফাঁক খুঁজছেন তিনি।

এ প্রসঙ্গ আপাতত এখানেই থামলে খুশি হন। কারণ, এ নিয়ে বিভাস দত্তর বিশ্লেষণ শুরু হলে সহৃদয়ার এই মতি কতক্ষণ স্থির থাকবে তাতে তাঁর বিলক্ষণ সংশয় আছে।

মিত্রাদির সঙ্গে আলোচনা শেষ করতে পেরে মনে মনে ঈষৎ তুষ্ট জ্যোতিরাণীও। সামনে আর কে বসে আছে না আছে তা নিয়ে সত্যি মাথা ঘামাননি তিনি। নিজের ইচ্ছার জোরটাই সহজে স্পষ্ট করে তুলতে পেরেছেন। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন একবার। এতক্ষণে যেন ওই খোলা মাসিকপত্রের ওপর বিশেষভাবে চোখ পড়ল তাঁর। জেনেও জিজ্ঞাসা করলেন, ওটা কোন্ কাগজ, সেই লেখাটা ওতে আছে নাকি ?

হুঁ....।

অর্থাৎ সেই কাগজ। এবং সেই লেখা এতে আছে। এবং আছে বলেই এটা আনা। যে লেখা প্রসঙ্গে জ্যোতিরাণী তার লেখককে দিনকয়েক আগে দুটো মান-অভিমানের কথা শোনাতে ছাড়েননি। বলা বাহুল্য, লেখক বিভাস দত্ত। তাঁর বহু রচনা মাসিকপত্রে বা প্রেসে চালান হবার আগে জ্যোতিরাণী শুনে থাকেন। অপছন্দ হলে সরাসরি বলেন সেটা। কোথাও কাটতে বলেন, কোথাও জুড়তে বলেন। বিভাস দত্ত সহজে রাজি হন না। হাসেন শুধু। এলে জ্যোতিরাণী তর্ক করতে ছাড়েন না। অনেক সময় তাঁর মন রাখার জন্যেই তিনি হয়ত অদল-বদল করেন একটু-আধটু। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ছাপা হবার পরে সেটা পড়ে জ্যোতিরাণী অপ্রস্তুত। বলেন, আগেরটাই তো ছিল ভালো মনে হচ্ছে এখন, আপনি বদলালেন কেন ?

বিভাস দত্ত তখনো শুধু হাসেন।

তাড়া ছিল বলে এই লেখাটা বিভাস দত্ত আগে পড়ে শোনাবার অবকাশ পাননি। অবশ্য অনেক লেখাই শোনানো হয় না। কিন্তু এই লেখাটা পাঠক-মহলে কিছু তাপ ছড়িয়েছে। অন্য কাগজে এই লেখাটার প্রসঙ্গে সরগরম সমালোচনা পড়েছেন জ্যোতিরাণী, লেখকের তীক্ষ্ণ ভাব-তন্ময়তার প্রশংসা ছিল। ফলে সাক্ষাতে জ্যোতিরাণী বক্রবচন শুনিয়েছেন তাঁকে, বলেছেন, আসলে লেখা কাটা-ছাঁটার ভয়েই আপনি সময় পেয়ে ওঠেননি। তা কি এমন লিখলেন ?

জবাবে বিভাস দত্ত বলেছিলেন, কাগজখানা পাঠিয়ে দেবেন।

সর্বনাশ! জ্যোতিরাণী সেধে বিপদগ্রস্ত যেন, বলেছেন, আপনাদের গল্প-উপন্যাস তবু চোখ-কান বুজে পড়ে ফেলি, গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ পড়তে গেলেই আমার মাথা ধরে যায়।

বিভাস দত্ত হেসে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, পড়ার কাজটা তাহলে তিনিই এসে সমাধা করে যাবেন একদিন।

সেই কাগজ। এবং সেই লেখা।

জ্যোতিরাণীর গলার স্বরে আগ্রহ চড়ল।—ও মা, আগে বলেননি কেন, আমি তো কবে থেকে আশায় আছি শুনব। পড়ুন। মিত্রাদি পড়েছ?

মৈত্রেয়ী চন্দ লেখা এবং লেখক দুইয়েরই মুণ্ডুপাত করে নিলেন মনে মনে। —কোন্ লেখাটা বলো তো? মাসিক পত্রটার দিকে চোখ গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে কি মনে পড়তে বাঁচোয়া। অন্ধতামিস্র? পড়েছি···ওয়াণ্ডারফুল, লেখকের মুখ থেকে আর একবার শুনতে আপত্তি ছিল না, কিন্তু আমার যে ভাই এখনি উঠতে হবে।

ওঠার আগে বাধা পড়ল। সিতুর হাত ধরে ঘরে ঢুকলেন কালীনাথ। পিছনে শামু। চায়ের খালি পেয়ালা তুলে নিয়ে শামু চলে যেতে কালীনাথবাবু গম্ভীর মুখে ওধারের খালি সেটিটা দেখিয়ে সিতুকে বললেন, ওখানে চুপ করে বসে থাকো, আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে ঘুরে এসে তোমার তেল বার করছি।

গোমড়া মুখে ছেলে ধুপ করে সেটিতে এসে বসল। কড়া অনুশাসন। অনুশাসকেরও কড়া মুখ। হালকা চোখে বিভাস দত্ত দুজনকেই দেখলেন একবার। আর ছেলেটার দিকে চেয়ে মিত্রাদি হেসেই ফেললেন।—বেচারা, ওর এমন শাস্তি কেন?

জ্যোতিরাণী গম্ভীর। আড়চোখে ছেলেকে দেখলেন দুই একবার। তারপর এদিকে ফিরলেন, কালীনাথ ততক্ষণে দরজার ওধারে।

ঘড়ি দেখে মৈত্রেয়ী চন্দ ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়লেন, আমার ভাই তাড়া আছে, চলি আজ, কেমন?

বাইরের বারান্দার মুখে কালীনাথের নাগাল পেলেন তিনি। ডাকতে হল না। পিছনে কেউ আসছে মনে হতে উনিই ফিরে তাকিয়েছেন। হাসি গোপন করে মৈত্রেয়ী চন্দ সামনে এগিয়ে এলেন, শাস্তিটা কার হল, ছেলেটার, না ঘরে যাঁরা ছিলেন তাঁদের?

কালীনাথের নিরুৎসুক দৃষ্টি মহিলার পা থেকে শুরু করে মুখের ওপর এসে থামল।—ঘরে মিত্রাদিও ছিলেন।

মিত্রাদির পাহারা লাগে না, চোখে-মুখে চাপা হাসির ঝলক, সত্যি যাচ্ছ কোথাও, না আমাকে ডাকার ছল?

—মিত্রাদির সঙ্গে ছলনা-পর্ব বছর বারো আগে শেষ হয়েছে।

উক্তি মনঃপূত হল না। ভুরুর মাঝে ভাঁজ পড়ল।—হ্যাঁ, আর বারো বছর বাদেও তুমি সেই কচি ছেলেটি আছ। ভুরুর বিন্যাস শেষ হবার আগেই সিঁড়ির গায়ে একটা খালি গাড়ি এসে দাঁড়াল। মৈত্রেয়ী চন্দ খুশি আবার।—তোমার জন্যে?…বাঁচা গেল। আগে লিফট দাও, তারপর যেখানে খুশী যাও।

কালীনাথ বললেন, অধম ভাগ্যবান। এসো।

হঠাৎ ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করছেন জ্যোতিরাণী।

মন দিয়ে শুনছেন। কান পেতে শুনছেন। আবার এই উন্মুখ নিবিষ্টতার দরুনই অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন। বিভাস দত্ত পড়েনও ভালো। গলার স্বর মিষ্টি, গম্ভীর। অনেকক্ষণ একটানা পড়ে গেছেন, আর জ্যোতিরাণীও সহজ মনোযোগেই শুনে গেছেন। দেশের সদ্য বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে গুরু-গম্ভীর রচনা। গোড়ায় একটুও ভালো লাগছিল না জ্যোতিরাণীর। তথ্যের থেকেও ভাবের বুনট চারগুণ জোরালো। কবে কোন্ আলোর স্বপ্নে মগ্ন ছিল এই দেশ আর এই দেশের মানুষ। কারা এলো, কারা গেল, কারা বিজয়-পতাকা তুলল, কারা নামলো—কেমন করে কাল তারা উঁচু-নীচু ছোট-বড় সকল চিহ্ন মুছে মুছে এগোল। আর কিছুক্ষণ এই ধারায় পড়া চললে জ্যোতিরাণী হয়ত বা বিরক্ত হয়ে বলেই বসতেন, থামুন মশাই, এত ভাব-বিস্তার ভালো লাগছে না।

কিন্তু রচনার সুর না বদলাক, জ্যোতিরাণী ধাক্কা খেলেন বর্তমানের দিকে এসে। অন্ধতামিস্রের দিক যেটা। মন্দকে মেনে নেওয়ার এক বিরাট অধঃপতনের যুগ যেটা। দেশটাকে একেবারে রিক্ত করে দিতে পারে যে দস্যু, তার নিশ্ছিদ্র আঁধার-তপস্যায় রূপ দিচ্ছেন লেখক। অন্ধকারের বন্যা নামিয়েছে দস্যু, অন্ধকারের বাষ্প ছড়িয়ে আকাশ ছেয়েছে। সূর্য গিলেছে। তারপর অন্ধকারের শিল্প রচনায় বসেছে সেই দস্যু। রূপ গড়ছে। তমিস্রমানুষের জীবন্ত রূপ।

ঠিক এইখানেই চমকে উঠেছিলেন জ্যোতিরাণী। পুরুষের ঠিক এমনি এক রূপ কোথায় দেখেছেন তিনি। খুব কাছেই কোথাও অলক্ষ্য থেকে এখন সেটা লক্ষ্যের দিকে পাড়ি দিচ্ছে। গোচরে আসছে, স্পষ্ট হয়ে উঠতে চাইছে। এই অস্বস্তিকর অনুভূতিটা মন থেকে ছেঁটে দিতে চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু ওটা হঠাৎ এসে চড়াও করেনি তাঁকে। ওটা তিনি সঙ্গোপনে লালন করে আসছেন। তারই ওপর কেউ আলো ফেলল যেন। ফেলতে চাইল। তাই অস্বস্তি। তাই এ বিড়ম্বনা।

জ্যোতিরাণীর শেষের দিকের এই উন্মুখ তন্ময়তা কেমন করে টের পেয়েছেন

বিভাস দত্ত। পড়তে পড়তেই মুখ তুলছেন এক-একবার। তাঁর স্বচ্ছ দু চোখ জ্যোতিরাণীর একাগ্র দৃষ্টির সঙ্গে মিলছে থেকে থেকে। নীরবে, নিঃশব্দে। তারপর মাসিকপত্রের পাতায় নেমে আসছে আবার। জ্যোতিরাণীর নিভৃতের কোন অনাবৃত দিকটা লেখনীর বুনটে স্পষ্ট করে তুলছেন তা যেন তিনি জানেন। জ্যোতিরাণীর থেকেও অনেক, অনেক বেশি জানেন।

কিন্তু জ্যোতিরাণী অতটা জানতে চান না। অন্ধকারের ওই রূপ ওই মূর্তি তিনি এতটা ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে আনতে চান না। সন্তর্পণে একবার ছেলের দিকে তাকালেন তিনি। ছেলে টের পেল না। খানিক আগে পর্যন্ত নিরুপায় মুখ করে সেও শুনছিল বসে। কিছুই বুঝছিল না, কিন্তু মজা লাগছিল শুনতে। বাড়িতে এত আলো অথচ লেখায় অন্ধকারের ছড়াছড়ি। একটু বাদে বাদেই একরাশ অন্ধকারের কথা। যে পড়ছে আর যে শুনছে সকৌতুকে দুজনকেই চেয়ে চেয়ে দেখেছে। দুজনকেই ছেলেমানুষ মনে হয়েছে তার। কিন্তু শেষে বিরক্তি ধরে গেছে। সেটির হাতলে মাথা রেখে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পায়ের ওপর পা তুলে সিতু আপাতত নিজের চিন্তায় তন্ময় হতে চেষ্টা করছে। পায়ের বুড়ো আঙুল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শূন্যের উপর কিছু লিখে চলেছে সে।

সচকিত হয়ে জ্যোতিরাণী এদিকে ফিরলেন আবার। পড়ায় ছেদ পড়েছে, বিভাস দত্ত তাঁর দিকে চেয়ে আছেন। তেমনি অতল গভীর চাউনি।

—পড়ুন। অস্ফুট একটা স্বর বেরুলো জ্যোতিরাণীর গলা দিয়ে।

চান না চান, সমস্ত চোখ-কান-মন একাগ্র জ্যোতিরাণীর। কোনো পুরুষ সম্পর্কে তাঁর নিভৃতের একটা অনুভূতিই রূপ নিচ্ছে, আকার নিচ্ছে। তাকে তিনি না দেখে পারেন কি করে। বরং দেখার জন্যেই সমস্ত স্নায়ু উন্মুখ, লালায়িত। বিভাস দত্ত সেই অন্ধকারের শিল্পজগতে টেনে নিয়ে চলেছেন আবার তাঁকে। স্তূপ স্তূপ অন্ধকার ছেঁচে তুলে, অন্ধকার কেটে কেটে, অন্ধকার চুনে চুনে মানুষ গড়া হচ্ছে যেখানে। পুঞ্জে পুঞ্জে অন্ধকারে গড়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, দেহ, বুক। তাদের একজনকেই দেখছেন জ্যোতিরাণী—যে তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছে। জ্যোতিরাণী দেখতে পেয়েছেন তাকে, চিনতে পেরেছেন। সে চেনা মানুষ। সে তার ঘরের মানুষ।

সে শিবেশ্বর!

অন্ধকার, অন্ধকার, অন্ধকার, অফুরন্ত অন্ধকার শুধু।

এ কি!

অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলেন জ্যোতিরাণী। ঘরের মধ্যে সত্যি সত্যি নিকষ

কালো অন্ধকারের সমুদ্র নেমেছে হঠাৎ। এ কি হল! ঠিক এই মুহূর্তেই ঘরের, বাইরের, নীচের এই এলাকার সব কটা আলো একসঙ্গে নিবে গেল কেমন করে! জ্যোতিরাণী স্বপ্ন দেখছেন না, জ্যোতিরাণী রচনা শুনছেন না। এই ঘর-বাড়ি-আলো, আসবাবপত্র, তিনি নিজে, বিভাসবাবু—সব অন্ধকারে ডুবে গেছে।

নিশ্ছিদ্র কালোর গ্রাস থেকে বেরুবার জন্যই জ্যোতিরাণী দাঁড়িয়ে উঠলেন হঠাৎ। সামনে এগোতে গেলেন। পাশের ছোট টেবিলে বাধা পেয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন। তার আগে কারো গায়ে ধাক্কা লাগল। টাল সামলাতে গিয়ে জ্যোতিরাণীর সর্ব দেহে একটা স্পর্শ যেন মুহূর্তের জন্য নিবিড় হল। কেউ তাঁকে ধরে ফেলল।

বিভাসবাবু। আকস্মিক অন্ধকারের আঘাতে তিনিও হতচকিত হয়েছিলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর নিজের অগোচরেই উঠে দাঁড়িয়েছিলেন।

সর্বাঙ্গ কেমন অবশ হয়ে আসছে জ্যোতিরাণীর।......বিভাসবাবুর হাতে তাঁর বাহু ধরা, আর এক হাত কাঁধের ওপর। বিভ্রান্ত, বিমূঢ় তখনো, এ স্পর্শ নিবিড়তর হলেও তাঁর বাধা দেবার শক্তি নেই বুঝি।...মুখের ওপর উষ্ণ নিশ্বাস ঠেকল একটা।

মৃদু স্বরে বিভাস দত্ত বললেন, আপনি বসুন, আমি দেখছি কি হল। হঠাৎ সব ফিউস হয়ে গেল বোধ হয়।

ঠিক আত্মস্থ না হলেও পা সরাতে পিছনে সেটির স্পর্শ পেলেন জ্যোতিরাণী। বসলেন। বিভাসবাবুই বসিয়ে দিলেন তাঁকে। তারপর দরজার দিকে এগোতে চেষ্টা করলেন।

জ্যোতিরাণীর সংবিৎ ফিরল যেন। অন্ধকারে যে ডাকটা তাঁর গলা দিয়ে বেরিয়ে এলো হঠাৎ, সেটা তাঁর ছেলের উদ্দেশে।

সিতু—!

সাড়া পেলেন না।

॥ চার ॥

জ্যোতিরাণী সাড়া পেলেন না, কারণ সাড়া দেবার জন্য ছেলে সেখানে বসে ছিল না।

ঘরের বা নিচের এই এলাকার সব কটা আলো হঠাৎ নেভেনি। নিজের

হাতে করে এই অঘটনটি ঘটিয়েছে স্বয়ং সিতু। ঘটানোর পর তার মাথা একটু ঠাণ্ডা হয়েছে। অর্থাৎ একটু ভয় ধরেছে। ফলে সে আর ধারেকাছে নেই। একেবারে ঠাকুমার আশ্রয়ে গা-ঢাকা দিয়ে তবে হাঁফ ফেলেছে। তার দিক বিবেচনা করলে তার দোষ কেউ দিতে পারবে না। কিন্তু সে-রকম বিবেচনা করার মত লোক এক ঠাকুমা ছাড়া এ বাড়িতে আর একটিও নেই জানে বলেই তাঁর শরণাগত হওয়া ছাড়া আর গতিও নেই।

একটানা অনেকক্ষণ সহ্য করেছিল সিতু। বসে থাকতে কষ্ট হচ্ছিল বলে শুয়ে পড়েছিল। তাও যদি মায়ের একটু খেয়াল হত। একরাশ আলোর মধ্যে বসে একজন শুধু অন্ধকার অন্ধকার করছে, আর একজন হাঁ করে তাই গিলছে। বিরক্তি দূর করার জন্য সেটিতে শুয়ে শুয়ে সে নিজের অনেক চিন্তা শেষ করেছে। প্রথমেই চালিয়াৎ তুলুটাকে জব্দ করার ফন্দি এঁটেছে। সে বিকেলে গল্প করছিল, স্বাধীনতার আগে ফরাসী নামে এক দেশে মানুষ কেটে কেটে একটা রক্তের নদী তৈরী করা হয়েছিল। সেই নদীতে সাঁতার কেটে কেটে স্বদেশীরা যুদ্ধ করেছে। সেই নদী আর সেই যুদ্ধ নাকি তার কোন আত্মীয় স্বচক্ষে দেখেছে। তাই এক জায়গায় বিভাসকাকার পড়ায় ফরাসী দেশের নামটা শোনামাত্র তার দু কান খাড়া হয়েছিল। যতটুকু বুঝেছে, সে-দেশে একটা কিছু মারামারি হয়েছিল বটে, কিন্তু সে দেড়শ' বছরেরও আগের কথা।

অথচ, তুলু এমন ভাবে বললে যেন সেদিনের কথা। রকে বসে বিকেলে কি চালটাই দিলে তুলু, শুনতে শুনতে বোকাগুলোর সব গায়ে কাঁটা দিল আর তুলুকে মস্ত দিগ্‌গজ ভাবল। সিতু কিন্তু বিশ্বাস করেনি। রক্তের পুকুর একট হলেও হতে পারে, কিন্তু নদী হওয়া কি চারটেখানি কথা নাকি! একটা দেশের সব মানুষ আর জন্তু-জানোয়ার কেটে ফেললেও নদী হয় কিনা তার সন্দেহ আছে। কিন্তু তাতেও মুখ বুজেই থাকতে হয়েছিল, কারণ তুলু যদি ফস্ করে জিজ্ঞাসা করে বসে ফরাসী দেশটা কোথায়, তাহলে সে দিল্লীতে বলবে, না বোম্বাইয়ে বলবে, না বিলেতে বলবে, তাই জানে না। বাধা দিতে গেলে উল্টে জব্দ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। বন্ধু-মহলে এমনি সব গায়ে-কাঁটা-দেওয়া গল্প বলার নায়ক ছিল সিতু নিজে। ছোটদাদুর কাছে চমৎকার চমৎকার গল্প শুনত আর বন্ধুদের কাছে সে-সব বলে নিজের কদর বাড়াতো। ছোটদাদু অর্থাৎ তার বাবার সেই দূরসম্পর্কের মামা গৌরবিমল ভট্চায। এই ছোটদাদুটি এখন বাড়িতে থাকেন না বলে সিতুর বেশ অসুবিধা হয়েছে।

তুলুর ভাঁওতা ধরে ফেলার পর তাকে সকলের সামনে নাকাল করার রাস্তাটাও

বের করে ফেলেছে সে। আজ যারা ছিল তাদের সকলের সামনে হঠাৎ ছুলুর মাথায় রামগাঁট্টা বসিয়ে দেবে একটা। সকলে অবাক হবে আর ছুলু রুখে উঠবে, কারণ ব্যথা পাওয়ার মত করেই তো সে মারবে গাঁট্টাটা। কিন্তু রুখে আসা পর্যন্তই তার দৌড়, ওর সঙ্গে গায়ের জোরে যে পারবে না, সেটা সে ভালই জানে। যাই হোক, ছুলু যখন রুখে আসবে আর বাকি সকলে হঠাৎ গাঁট্টা মারার জন্য অবাক হবে, সিতু তখন অন্যদেরই জিজ্ঞাসা করবে, গাঁট্টাটা এক্ষুনি মারলুম, না দেড়শ' বছর আগে মেরেছি বল্, তো? আর বলবে, ছুলুর আত্মীয় যদি দেড়শ' বছর আগে ফরাসী দেশের রক্ত দেখে থাকে, তাহলে এই গাঁট্টাও সে দেড়শ' বছর আগেই মেরেছে। আর বলবে, সেখানে রক্তের নদী-টদি কিছুই হয়নি, পুকুর বা ডোবাও হয়নি—এই গেল বছরে কলকাতার রায়টে যেমন হয়েছিল, তার বেশি একটুও হয়নি।

চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটছে গম্‌গমে গলায় আরো বেশি অন্ধকার ছড়াচ্ছে বিভাস কাকা। আর মা আরো বেশি মনোযোগ দিয়ে শুনছে। সিতু ছুজনার উদ্দেশেই মনে মনে মুখ ভেঙচে মনটাকে আবার অন্যদিকে ফেরাতে চেষ্টা করেছে।··· ভাইকে রামগাঁট্টা মারা হয়েছে শুনলে নীলিদি হয়ত ঠাস ঠাস কথা শোনাবে কিছু। ইস্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়ে বলে নীলিদির দেমাক খুব, সিতু শুনেছে ওকে নাকি নীলিদি হনুমান বলেছে। ভীতু অতুল সেদিন ফিস ফিস করে খবরটা দিয়েছিল। নীলিদি বলেছে, বাপের অত টাকা থাকলে ছেলেগুলো ও-রকম হনুমান হয়। ঠাকুমার মুখে শোনা রামায়ণের হনুমানকে ততো অপছন্দ নয় সিতুর, তার জন্যেই তো বলতে গেলে সীতা উদ্ধার হয়েছিল। কিন্তু চিড়িয়াখানার মুখ-পোড়া হনুমান তা বলে আদৌ পছন্দ নয়। নীলিদি যখন বলেছে চিড়িয়াখানার হনুমানের কথাই বলেছে। এইজন্যেই কাল ছুলালের মাথায় গাঁট্টাটা আরো জোরে কশানো দরকার।

কি করবে নীলিদি? হনুমান না বলে বড় জোর এবারে গরিলা বলবে। আর নিজে যে পরীক্ষায় ফেল মেরে কাঁদে সকলের সামনে! গেল বার ফেল করে নীলিদি মুখে শাড়ির আঁচল চেপে কাঁদতে কাঁদতে ফিরছিল যখন, সিতুর একটু দুঃখই হয়েছিল। মনে মনে সেদিন সে পরীক্ষক সেজে অনেক নম্বর দিয়ে নীলিদিকে একেবারে ফাস্ট´ করে দিয়েছিল। কিন্তু আগামীবারের পরীক্ষায় সে-ই পরীক্ষক সেজে পায়ের বুড়ো আঙুল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নীলিদিকে সে মস্ত মস্ত গোল্লা দিতে লাগল। নীলিদিকে সে একটুও ভয় করে না, একটু-আধটু সমীহ বরং ওই ভীতু রোগা-পটকা অতুলের দিদি রঞ্জুদিকেই করে। বেশি দুষ্টুমি করলে বা অতুলকে কিছু বললেই রঞ্জুদি নাগালের মধ্যে পেলে সোজা এসে হাত ধরে।

বাড়িতে মায়ের কাছে টেনে নিয়ে যেতে চায়। আর একটু বড় হলে এই রঞ্জুদিকেও যে ঠাণ্ডা করে দেবে সে, সেটা একরকম ঠিক করাই আছে। পায়ের আঙুল ঘুরিয়ে এইসঙ্গে রঞ্জুদির পরীক্ষার খাতায়ও গোটাকয়েক গোল্লা বসালো সিতু।

তারপর পায়ের আঙুল ঘুরিয়ে শুধু গোল্লা দেওয়া নয়, শূন্যের ওপর বেশ লেখাও যায় দেখল। দুলালের নাম লিখল, অতুলের নাম লিখল, তারপর নীলিদির নাম, রঞ্জুদির নাম। তাদের সঙ্গে ক্লাসে প্রথম হয় বলে অহঙ্কারে ডগমগ সমরের নাম লিখেও বড় করে গোল্লা বসাতে ভুলল না। মাস্টারমশাই ক্লাসে কিছু জিজ্ঞাসা করলেই বলার জন্য হাত তুলে ঘোড়ার মত লাফাতে থাকে যে সমর। একেবারে সবজান্তা। সমরের পরেই এলো সজারুমাথা স্ববীরের নাম। সঙ্গে সঙ্গে গোল্লা বসানো ভুলে আর এক মতলব মাথায় এলো। স্ববীর বয়সে কিছু বড় তাদের থেকে। বড় যে, সেটা বোঝানোর জন্যে আজ হোমিওপ্যাথি শিশিতে নস্যি পুরে এনেছিল, আর সকলকে দেখিয়ে সেই নস্যি নাকে দিচ্ছিল। সকলে মস্ত বাহাদুর ভেবেছে তাকে। সিতুকে সেটা হজম করতে হয়েছে, আর স্ববীর যখন 'নে দেখি' বলে নস্যির শিশি তার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে, তখনো 'ভারী তো' বলে শুধু ঠোঁট উল্টেই তাচ্ছিল্য দেখাতে হয়েছে তাকে। কারণ, কালীজেঠুর কৌটো থেকে চুরি করে নস্যি টানার মজা সে অনেক আগেই হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিল একবার। মাথা ঘুরে পড়েই গিয়েছিল ঠাস করে। নাকের জলে চোখের জলে একাকার হয়ে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে হয়েছিল খানিকক্ষণ, নাকের ভিতর দিয়ে সর্বাঙ্গ একেবারে জ্বলে যাচ্ছিল।

কিন্তু এখন বন্ধুদের অবাক করে দেবার মত আরো বড় কিছুই মাথায় এসে গেছে তার। যে গালার গুলী দেখিয়ে ঠাকুমাকে অত ভড়কে দেওয়া গেছল, তাই দিয়েই একটা কাজের মত কাজ হতে পারে। কাল বিকেলের আলো যখন কমে আসবে, সকলকে আর বিশেষ করে স্ববীরকে দেখিয়ে ওই কৌটো থেকে সে একটা গালার গুলিই মুখে দেবে। বলবে, আফিং ধরেছে।···গালা আবার বিষ টিষ কিনা কে জানে। সে-রকম বিষ নয় নিশ্চয়, হলে আর অত ভাল ভাল গালা হাতের কাছে পড়ে থাকত না, আর গলির সেই বউটাও তাহলে কষ্ট করে গলায় দড়ি না দিয়ে গালা খেয়েই মরতে পারত। তাছাড়া ঢোক না গিললেই হল, জিভের তলায় রেখে কোনো এক ফাঁকে ফেলে দিয়ে মুখ ধুয়ে এলেই হবে।

কিন্তু মা আর বিভাসকাকার জ্বালায় এমন ভালো ব্যাপারটাও জমাট করে ভাবা যাচ্ছিল না। বিভাসকাকার গলার স্বর আরো অদ্ভুত শোনাচ্ছে। পাগলের

মত অন্ধকার দিয়ে কি সব যেন তৈরী হচ্ছে বলছে। আর মায়ের চোখমুখও কেমন দেখাচ্ছে। এই ক্যাটকেটে আলোর মধ্যে বসেও বিভাসকাকার লেখার ওই অন্ধকারের মধ্যেই মা যেন সত্যি সত্যি হাবুডুবু খাচ্ছে। ভূতের গল্প শোনার মত মায়ের যেন ভয় ধরেছে আবার না শুনেও পারছে না।

বার বার এভাবে ব্যাঘাত ঘটার পর আর চিন্তা করতে ভালো লাগেনি সিতুর। শুয়ে থাকতেও না। উঠে বসেছে। সামনের একজোড়া মুখ বারকয়েক নিরীক্ষণ করে দেখেছে। দেখতে দেখতে হঠাৎ তার মনে হয়েছে একটানা অনেকক্ষণ শাস্তি ভোগ করা হয়েছে, আর পারা যায় না। চুপি চুপি এখান থেকে উঠে গেলেও কেউ এরা খেয়াল করবে না। কারণ, দুজনেই এখন অন্ধকারে ডুবে আছে। তাছাড়া কালীজেঠু বাইরে যত হাঁকডাক করে, ভিতরে ততো কঠিন নয়। অতএব এতক্ষণ যে এখানে ছিল তাই যথেষ্ট।

যেমন চিন্তা তেমনি কাজ। এ-ঘর ছেড়ে ও-ঘরের দরজার কাছে গিয়েও ফিরে দেখেছে একবার। অনুমানে একটুও ভুল হয়নি। ও যে এতক্ষণ ওই ঘরে ছিল, তাই কারো মনে নেই বোধ হয়।

বারান্দা পেরুতে গিয়ে পা থেমে গেল আবার। বারান্দায় একধারে কতগুলো সুইচ বোর্ড। ওপর আর নিচের গোটাকয়েক আলাদা আলাদা মেইন সুইচ আছে। কোন্‌টা কোন্‌ এলাকার তা অবশ্য ভালো জানে না। সেই সুইচ বোর্ডের নিচে একটা উঁচু টুল পাতা। ওটা ওখানে রেখেছিল সদা। বউদিমণির আদেশে বাড়তি আলোগুলো সব জ্বালার জন্য ওটার দরকার হয়েছিল। তারপরেও টুলটা ওখানেই থেকে গেছে।

অতএব, ওই সুইচ নিয়ে একটু গবেষণার ইচ্ছেও সিতুর দিক থেকে খুব অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এই ইচ্ছের ওপর আর একটা অস্বাভাবিক ইচ্ছেও চেপে বসল। আলোয় বসে অত অন্ধকার-অন্ধকার করা কেন? অন্ধকারের রূপ কি, সেটা স্বচক্ষে দেখলেই তো হয়। সিতুর মনে হল, এতক্ষণ ধরে যেন তারই চোখে-মুখে-নাকে-কানে অন্ধকার ঠাসা হয়েছে।

অতএব মাথায় যা এলো, তা করে ফেলার লোভ কিছুতে সামলাতে পারল না। পর পর গোটা-দুই মেইন সুইচ টেনে দিতেই বিভাসকাকার সেই অন্ধকারের সমুদ্র।

এই সমুদ্র ভেঙে সিতু দোতলায় ছুট। দোতলার আলো ঠিকই জ্বলছে।

বিভাস দত্ত চলে গেছেন। নিচের ঘরে জ্যোতিরাণী একলা বসে।

শামু আর ভোলা, এমন কি সদা আর মেঘনাও এদিক-ওদিক ঘুরঘুর করছে।

আর মাঝে মাঝে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। নিচের সব আলো নিভেছে ওদের টের পেতে দেরি হয়নি। শামু আর ভোলা তো নিচেই ছিল। এতগুলো আলো একসঙ্গে কি করে নিভল মাথা ঘামিয়ে সেটা ঠাওর করার আগেই সদা নেমে এসেছে। তার একটু বাদে মেন্ বোর্ড-এ টর্চ ফেলতেই ব্যাপার বোঝা গেছে। মেন্ সুইচ অন্ করার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার ঘুচেছে।

আলো জেলে সদা এ-ঘরে এসে বউদিমণিকে খবর দিয়েছে, কি হয়েছিল। কারণ, শামু আর ভোলা সদাকে আগেই জানিয়েছিল, অন্ধকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খোকাবাবুর ছুটে ওপরে পালানো টের পেয়েছে তারা। দুয়ে দুয়ে চার কথার মত ব্যাপারটা তখনই বোঝা গেছে। সদা তক্ষুনি সেটা বউদিমণিকে জানানো দরকার মনে করেছে।

এদিকে মেঘনা লক্কা ছেলের কাণ্ডর কথা যত ভাবছিল, ততো হেসে লুটোপুটি খাচ্ছিল। তার সঙ্গে হাসছিল শামু আর ভোলাও। কিন্তু একটু বাদেই তাদের মুখে কৌতূহল দেখা গেছে। ওই চেনা-মুখ ভদ্রলোক এতক্ষণ হল চলে গেল, বউদিমণি এখনো ঠায় বসে কেন ওখানে! প্রত্যেকেই তারা উঁকি দিয়ে দেখে গেছে আর ছেলেটার কথা ভেবে শঙ্কা বোধ করেছে। মেঘনা অনেক সময় ওই ছেলেমানুষের হয়ে দুই-এক কথা বউদিমণিকেই বলে। কিন্তু এই মুখ দেখে তারও ভিতরে ঢুকতে সাহস হল না। তবু তার থেকে থেকে হাসিই পাচ্ছে। সদা ঈষৎ গম্ভীর। মেঘনার চপল কৌতুকভরা চোখ-মুখখানা সে চড়াও করেছে অনেকবার।

স্তব্ধ মূর্তির মত শুধু বসেছিলেন জ্যোতিরাণী। কিছুই ভাবছিলেন না। কিছুই ভাবতে পারছিলেন না।

রচনার নয়, খানিক আগের এই আলো-নেভা অন্ধকার যেন আষ্টেপৃষ্ঠে ছেঁকে ধরে আছে তাঁকে। আর কি এক অনুভূতি বুঝি স্পর্শ হয়ে সর্বাঙ্গে লেগে আছে।

আলো জ্বলার পর বিভাসবাবু আর বসেননি। হাসছিলেন তিনি। বলেছেন, ভালো জব্দই করেছে ছেলেটা, আজ থাক, আর একদিন হবে'খন। স্বাভাবিক হাসি-হাসি চোখে দেখেছেন একটু, তারপর কি ভেবে জিজ্ঞাসা করেছেন, কাল আপনার প্রোগ্রাম আছে নাকি কিছু?

জ্যোতিরাণী মাথা নেড়েছেন, প্রোগ্রাম নেই।

কাল একবার আসতে পারেন জানিয়ে বিভাস দত্ত চলে গেছেন। তাঁর আসা-যাওয়া দুইই অনাড়ম্বর। যখন ইচ্ছে হয় আসেন, যখন ইচ্ছে হয় উঠে চলে যান। তবু তাঁর এই যাওয়াটা খুব স্বাভাবিক লাগল না জ্যোতিরাণীর, আরো একটু বসে দু-পাঁচটা কথা বলে গেলেই যেন স্বাভাবিক হত। মাসিকপত্রটাও নিয়ে যাননি,

ওটা অবশ্য ইচ্ছে করেই রেখে গেছেন।

কিন্তু ওটার প্রতি আর কিছুমাত্র আগ্রহ নেই। রচনার কথা ভাবছেন না জ্যোতিরাণী। রচনায় অন্ধকারের যে চেনা-মানুষ দেখছিলেন, আর এক অন্ধকারের বাস্তব ধাক্কায় সেও কোথায় তলিয়ে গেছে। জ্যোতিরাণীর এই সদ্য বর্তমান কোথাও উধাও হয়েছে। কিছু তিনি হাতড়ে বেড়াচ্ছেন। কি নিজেও জানেন না।

আত্মস্থ হলেন একসময়। মুখের রং বদলালো। একের পর এক কঠিন রেখা পড়তে লাগল সেখানে। অস্বাভাবিক কঠোর হয়ে উঠল দুই চোখ। রাগ সবটাই ছেলের ওপর। এই রাগ অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে যেন ফিরে পেলেন তিনি। আচমকা একশ' পাঁচ ডিগ্রী জ্বর ওঠার মত স্নায়ুগুলি সব একসঙ্গে তেতে উঠল। জীবন একেবারে দুর্বিষহ করে তুলতে যেটুকু বাকি সে যেন ওই ছেলেই করছে, ওই ছেলেই করবে।

শামু-ভোলা-সদা-মেঘনা সকলের চোখের ওপর দিয়ে দোতলায় উঠে গেলেন। ছেলেকে এখন হাতের মুঠোয় পাবেন না জানেন। সে এখন কোন্ আশ্রয়ে আছে, না দেখেও অনুমান করতে পারেন। তবু একবার তাকে দেখতে চাইলেন তিনি। শাশুড়ীর দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

সিতু আঁতকে উঠল প্রায়। মায়ের এই মুখ কখনো-সখনো দেখেছে সে। তার থেকেও অনেক বেশি ভয়ঙ্কর মনে হল। ঠাকুমা আবার এই সময়ে আফিং খেয়ে ঝিমুচ্ছে। বুড়ী দিক ফিরে ওকে জড়িয়ে ধরেই শুয়ে আছে বটে, আর ঠেলা খেয়ে এক-একটা খেই-হারানো প্রসঙ্গ আবোলতাবোল ভাবে জুড়তে চেষ্টা করছে—কিন্তু আসলে বুড়ীর মৌজ এসেছে। সিতু চোখ বুজে ফেলল তাড়াতাড়ি, মায়ের এই চোখে চোখ পড়লে আপনিই বুঝি সুড়সুড় করে উঠে যেতে হবে তাকে।

জ্যোতিরাণী ফিরলেন। এর হেস্তনেস্ত করবেন তিনি। এমন করবেন যাতে অনেক দিন মনে থাকে। দাঁড়ালেন একটু। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ এবং গলার আওয়াজ। কালীদা কার সঙ্গে কথা বলতে বলতে ওপরে উঠে আসছেন। কথা কানে আসতেই বুঝলেন, সঙ্গে আর কে আসছে। কালীদা বলছেন, আমরা তো ভেবেছিলাম এবারে কোনো পাহাড়ে-টাহাড়ে একেবারে চিম্‌টে-কল্‌কে নিয়ে বসে গেছ তুমি।

দূরসম্পর্কের সেই মামাশ্বশুর গৌরবিমল, শাশুড়ীর মাসির ছেলে। সম্পর্কটা দূরের হলেও এই বাড়ির মানুষদের সঙ্গে সেটা অচ্ছেদ্যই ছিল। সেটা মনে পড়লে জ্যোতিরাণী শুধু অস্বস্তি বোধ করেন না, এক ধরনের উষ্মা ভিতরে ভিতরে জমাট বাঁধতে থাকে। কারণ, সম্পর্কটা শিথিল হবার একটা উপলক্ষ তিনি।

সমবয়সী মামুর সঙ্গে এই ধরনেরই কথাবার্তা বলেন কালীদা। সম্ভব হলে জ্যোতিরাণী আড়াল নিতেন। ঘরে চলে যেতেন। কিন্তু এক্ষুনি ডাক পড়বে আবার। সামনে এসে দাঁড়াতে হবে। মামাশ্বশুর এলে তাঁর খোঁজ-খবর না নিয়ে যান না।

দুজনেরই হাসিমুখ। কালীনাথ বললেন, আমাদের ওপর মামুর এখন নো টান, পাঁচ দিন আগে কলকাতায় এসেও এ-মুখো হয়নি। গাড়িচাপা না দিয়ে রাস্তা থেকে ধরে তুলে নিয়ে এলাম।

জ্যোতিরাণী মুখে কিছু না বলুন সৌজন্যের খাতিরে অন্তত একটু হাসতে পারার কথা। ভদ্রলোককে তিনি শ্রদ্ধা যে করেন, তাতে কোনো ভুল নেই। কদিন না এলে ছেলের প্রসঙ্গ তুলে অনেক সময় অনুযোগও করেন। কিন্তু আজ কিছুই পারলেন না, কিছুই করলেন না। তাঁদের দেখে শাড়ির আঁচল মাথায় তুলে দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়েই রইলেন।

গৌরবিমল হাসছেন মৃদু মৃদু। লম্বা-চওড়া সৌম্য চেহারা। মাথার চুল এবারে আরো ছোট করে ছাঁটা। পরনে খদ্দরের মোটা ধুতি, গায়ে একটা ঢোলা ফতুয়ার ওপর খদ্দরের চাদর। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। মাথার সামনের দিকের টাক্ ক্রমশ বাড়ছে। ফলে বয়েস যা তার থেকে বেশি দেখায়।

ভালো আছো?

জ্যোতিরাণী মাথা কাত করলেন একটু। অস্ফুটস্বরে বললেন, মা ও-ঘরে আছেন।

বারান্দা ধরে আস্তে আস্তে নিজের ঘরের দিকে চললেন তিনি। গৌরবিমল সকৌতুকে চেয়ে চেয়ে দেখলেন একটু, তার পর ইশারায় কালীনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার হে?

ঠোঁট উল্টে কালীনাথ সামনের দিকে পা বাড়ালেন। বললেন, এই বাড়ির হাওয়া আর দার্জিলিংয়ের আবহাওয়া দুই-ই সমান অনিশ্চিত, এই রোদ্দুর, এই বৃষ্টি—বোথ্ ইকোয়ালি আন্‌প্রেডিক্‌টেব্‌ল্।

ঘরে এসে বিশ মিনিটও সুস্থিরভাবে কাটাতে পারলেন না জ্যোতিরাণী। অস্থিরতার সবটুকু উষ্মাই ঘুরে ফিরে ছেলের ওপর গিয়ে পড়ছে। আবারও বেরুলেন। এসময় শাশুড়ীকে ওঁরা খুব সজাগ পাবেন না জানা কথা। জ্যোতিরাণী যেন তাঁদের এড়ানোর জন্যই শাশুড়ীর ঘর দেখিয়ে দিয়েছিলেন।......জলখাবারের ব্যবস্থা করা দরকার, রাত্রিতে যদি থাকেন ভদ্রলোক তাও সদাকে বলে দিতে হবে।

শাশুড়ীর ঘর পর্যন্ত যেতে হল না। এদিকের ঘরেই কথাবার্তা শোনা গেল।

বাইরে থেকে কালীদার হাসির শব্দ শুনে জ্যোতিরাণী দাঁড়িয়ে গেলেন। ছেলেকে নিয়েই হাসাহাসি হচ্ছে। ছোটদাহুকে পেয়ে সিতু হাতে স্বর্গ পেয়েছে। বিশেষ করে এই সঙ্কটের দিনে পেয়ে।

—মারাই তো উচিত তোকে। মেরে তুলোধুনো করা উচিত। ভদ্রলোক বসে লেখা পড়ছিল আর আলোগুলো সব তুই বেমালুম নিবিয়ে দিলি!

কালীদার গলা। জ্যোতিরাণী ভুরু কোঁচকালেন।

—না, তোমাকে থাকতেই হবে আজ। ছোটদাহুর উদ্দেশে ছেলের বায়না।

ছোটদাহু বললেন, তোকে মায়ের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য আমাকে এখানে থাকতে হবে? কেন, মায়ের কাছে মার খাসনা তুই?

সিঁতু আঁক-কষার মুখ করে ভাবল হুই-এক মুহূর্ত। তারপর জবাব দিল, আজ হাতে পেলে খুন করবে মনে হচ্ছে।

ঘরের মধ্যে হুজনেই হেসে উঠলেন আবার। গৌরবিমল আশ্বস্ত করলেন তাকে, তাহলে আর যাই কি করে। থাকা যাবে।

জ্যোতিরাণী আর ভিতরে ঢুকলেন না। ফিরে গেলেন। বয়স্কদের এই চপলতা বরদাস্ত করা আরো কঠিন।

রাত্রি।

মস্ত পালঙ্কে একা শুয়ে জ্যোতিরাণী এপাশ ওপাশ করছেন। একা থাকাই অভ্যেস। ছেলে রাতে ঠাকুমার কাছে শোয়। ঠাকুমার গলা না জড়ালে তার ঘুম হয় না। ওপাশের বড় ঘরটায় শিবেশ্বর থাকেন। হুজনের হু-ঘরে থাকার ব্যবস্থাও অনেক দিনের। এই ব্যবস্থাটা কবে কি করে পাকা হয়ে গেছে খুব চিন্তা করলে মনে পড়তে পারে। জ্যোতিরাণী মনে করতে চেষ্টা করেন না। কারণ এই ব্যবস্থা আর একজনের থেকেও হয়ত তাঁরই অনেক বেশি মনঃপূত। এর থেকে অনেক ছোট বাড়িতেও ছেলে নিয়ে আলাদা ঘরেই থাকতেন তিনি।

কিন্তু পাশের ঘরের দরজা রাত্রিতে অনেকদিনই খোলা হয় না। শিবেশ্বর চাটুজ্জে একজন নামজাদা মাথাওয়ালা লোক। এই মাথার কেরামতি পরলোকগত শ্বশুর দেখে গেছেন, শাশুড়ী কালীদা মামাশ্বশুর আর বাইরের হোমরা-চোমরা পাঁচজন দেখছেন। এই কেরামতি জ্যোতিরাণী অস্বীকার করতে পারেন না। কি ছিল আর কি হয়েছে। যা ছিল তার বনিয়াদ শুদ্ধ কালের ফাটলের মধ্যে ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছিল। আর যা হয়েছে তা ভবিষ্যতের অদৃশ্য অনিশ্চয়তার মধ্যেও পাকাপোক্ত ভিত রচনা করছে

টাকার সঙ্গে মাথা থাকলে সেই মাথার ফুরসত এই দিনে কমই মেলে। এই মাথার সর্বত্র সমাদর। এ মাথা নিয়ে টানাটানি লেগেই আছে। শিল্পপতিরা ডাকেন, শিবেশ্বর চাটুজ্জে তাঁদের প্ল্যান দেখেন, তাঁদের জন্য প্ল্যান করে দেন। দেশের আর দশের অর্থনীতির বহু ব্যাপারে তাঁর মত এবং মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। অর্থনীতির ইংরেজি বাংলা মুখপত্রে এমন কি বিদেশী জার্নালেও তাঁর অভিমত ফলাও করে ছাপা হয়। এ ব্যাপারে সরকারী কমিশন বসলেও বাইরের নিরপেক্ষ এক্সপার্ট হিসেবে তাঁর ডাক পড়ে। ফলে দেশের রাজনৈতিক কর্ণধারদের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ। অর্থনীতির প্রসঙ্গে তাঁর দৃষ্টিপাত আর আলোকপাত, তাঁর জট পাকানো আর জট ছাড়ানো, হাজারো ফাঁক সৃষ্টি করা আর হাজারো ফাঁক জোড়া—এ আর শিবেশ্বর চাটুজ্জের শুধু পেশা নয় এখন, অবসর বিনোদনের নেশাও।

তাঁর কদর বাড়ছে, সমাদর বাড়ছে। অবকাশ কমছে। উঁচু মহলের যারা খাতির করে তাঁকে, খাতির শুধু তারা কাজের বেলাতেই করবে এমন নির্বোধ নয়। নিজস্ব রীতিতে তাদেরও অবকাশ যাপনের ব্যবস্থা আছে। উৎসব আছে, আনন্দ আছে। সে-সবেতেও এই মানুষকে তারা তোয়াজ করে নিয়ে যায়। তাছাড়া নাম যশ টাকা হলে সামাজিক দায়িত্ববোধও আপনিই বাড়ে। আর পাঁচটা প্রতিষ্ঠানের মাথাওয়ালা লোকের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। হৃদ্যতা হয়। ব্যক্তিজীবনে তারাও কম লোক নয় কেউ। সরকারী বে-সরকারী বা রাজনীতির ক্ষেত্রে তাদের প্রতাপ স্বীকৃত।

ফলে শিবেশ্বর চাটুজ্জের অনেক দিন অনেক রাত বাইরে কাটে। অনেক রাতের ঘড়ির কাঁটা তাঁর নিচের ওই নিজস্ব মহলের দেয়ালে অতিথি-অভ্যাগতদের অলক্ষ্যে ঘোরে। সেখানে বসে কাজ হয়, কাজের আলাপ-অলোচনা হয়, আবার আনন্দও হয়। কিন্তু বাড়িতে থাকলে শিবেশ্বরবাবু একসময় না একসময় ওপরে ওঠেন। কলকাতায় থাকলে একসময় না একসময় বাড়ি ফেরেন তিনি। অনেক বড় বড় উৎসব সমারোহ থেকে ফেরার পরেও নিজের মাথার ওপর কখনো তাঁকে দখল হারাতে দেখেছেন বলে মনে পড়ে না জ্যোতিরাণীর। মদ সামান্যই খান। তাও সৌজন্যের খাতিরেই খান হয়ত। কিন্তু জ্যোতিরাণীর ধারণা আকণ্ঠ খেলেও এই মাথার একটা স্নায়ুও বিভ্রান্ত হবে না।

আদর অভ্যর্থনা এবং অতিথি বিদায়ের পরে অনেক রাতে ওপরে উঠলেও এক-একদিন প্রায় সকাল পর্যন্ত আলো জলতে দেখা যায় তাঁর ঘরে। দেখা যায় কারণ ভেন্টিলেটার দিয়ে ও-ঘরের কয়েকটা আলোর রেখা এ-ঘরের অন্ধকারে দাগ কাটে।

এই আলো দেখেই জ্যোতিরাণী বুঝতে পারেন ও-ঘরের মানুষ জেগে আছে। কিছু লিখছে, নয়তো পড়ছে কিছু। গোড়ায় গোড়ায় মাঝরাতে বা ভোররাতে ঘুম ভাঙলে ওই আলো দেখে উঠে অনেক সময় ও-ঘরের দরজায় উঁকি দিতেন তিনি। এখন আর ওঠেন না। দেশের আর বিদেশের রাজ্যের বই আসে, জার্নাল আসে। সেসবের এক বর্ণও জ্যোতিরাণী বোঝেন না। সবই অর্থনৈতিক বাস্তবের বই আর জার্নাল। যে বাস্তবের চাকায় দুনিয়া ঘুরছে আর যে বাস্তব ওই চাকার রসদ যোগাচ্ছে। আগে অনেক সময় ওগুলো উল্টে-পাল্টে দেখতেন জ্যোতিরাণী। বি-এ'তে ইকনমিক্স তাঁরও পাঠ্য ছিল। ওই বিষয় নিয়েই কিছুকাল য়ুনিভার্সিটিতে এম-এ'র ক্লাসও করেছেন। কিন্তু এমন দুর্বোধ্য আর নীরস লাগেনি সে-সব।

রস পেতে জানে যে, সে পায়। রস কেউ না পেলে এসব বই ছাপাও হত না, কেনাও হত না। আর ওই একজনের সে রস পেতে হলে রাতের এ সময়টুকু ছাড়া আর সময়ও নেই। জ্যোতিরাণীর অবাক লাগে এক-একসময়। আর কিছু না হোক, রাত জাগার ফলে অসুখ-বিসুখ হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু অসুখ হয় না। বিয়ের এই প্রায় এক যুগের মধ্যে কখনো অসুখ হতে দেখেননি তিনি।

আজ অবশ্য ওই ঘরের দরজা খুলবে না, আলোও জ্বলবে না। কারণ আজ একটা বিশেষ দিন। পরম সম্মানের দিন। পরম মর্যাদালাভের দিন। শিকল ভাঙার দিন। দেশের প্রতি টান কার নেই? যার মাথা যত উঁচু তার টানের ঘোষণা ততো জোরালো। কোনো এক যুগে মদ না খেলে কালচারের হানি হত। এ যুগে দেশের প্রতি টান না থাকলে তাই হয়। আজকের এমন দিনে এই টানের মানুষেরা ঘরে বসে থাকে কি করে? দলে দলে যুক্ত হয়ে তারা কিছু না কিছু দায়িত্ব পালন করছে, সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে এই দিন যাপনের সূচী গ্রহণ করছে। দেশের প্রতি এই টানের সঙ্গেও শিবেশ্বর চাটুজ্জে প্রত্যক্ষভাবে না হোক পরোক্ষ-ভাবে যুক্ত। আজ টানের মানুষেরাই তাঁকে টেনে নিয়ে গেছে। কাল ফিরবেন।

খবরটা জ্যোতিরাণী শুনেছেন শাশুড়ীর মুখ থেকে। বুড়ী মায়ের প্রতি ছেলের এই অনুকম্পাটুকু আছে। বাড়ি না ফিরলে তাঁকে জানান। নইলে অযথা চিন্তা করেন তিনি। ছেলের খবর নেবার জন্য বাড়ির আর পাঁচজনকে বিরক্ত করেন। তাঁর ফেরা না ফেরার খবর আর রাখেন কালীদা। পাঁচ কারণেই তাঁকে খবর রাখতে হয়। কালীদা শুধু এ বাড়ির অ্যাটর্নী নন, বাড়ির মালিকের নিজস্ব সচিবও। আর কিছুটা খবর রাখে সদা। খাবার রাখতে হবে কি হবে না, একজন খাবে কি পাঁচজন, সে সম্বন্ধে মুখে বা টেলিফোনে সদা মালিকের নির্দেশ পেয়ে থাকে।

এদিক থেকে জ্যোতিরাণী নিশ্চিন্ত। সত্যিই নিশ্চিন্ত। তাঁর দিক থেকে কোনো প্রতীক্ষা নেই, কোনো নিবিড় মুহূর্তের প্রত্যাশা নেই। অসময়ে ও-ঘরের দরজা খুললে বা আলো জ্বললে বরং অশান্তি ভোগ করেন। কোন্ কারণে কি থেকে স্নায়ুর তাড়না শুরু হবে বলা শক্ত। কিন্তু হবেই। বছরের পর বছর ধরে তাই হয়ে আসছে। একজনের অবকাশের সঙ্গে জ্যোতিরাণীর শুধু অশান্তির যোগ। শুধু তাঁর নয়, বাড়ির লোকেরও। জ্যোতিরাণীর কোনো আচরণ তিনি সহজ চোখে দেখেন না। জ্যোতিরাণীও তাই। ভালো কথাও অনেক সময় বরদাস্ত করতে পারেন না। বছরের পর বছর ধরে যে স্নায়ুযুদ্ধ চলে আসছে এ তারই ফল। জ্যোতিরাণী ঝগড়া করেন না, গলা তুলে পাঁচ-কান করেন না। মুখের ওপর খুব স্পষ্ট করে দু-পাঁচ কথা বলেন, নয়তো নীরবে অবজ্ঞা করে যান। চেয়ে চেয়ে দেখেন কতদূর গড়ায়।

অনেক দূর পর্যন্তই গড়ায় এক-একদিন। মালিকের দাপটে বাড়ির লোক সচকিত হয়ে ওঠে। এমন কি বৃদ্ধা শাশুড়ী আর বাচ্চা ছেলেটাও। কখন কার ঘাড়ে কোপ পড়ে সেই শঙ্কা। এই কোপ অন্ধ, দয়ামায়াশূন্য। অকারণে বা তুচ্ছ কারণে খান-খান হয়ে ফেটে পড়তে দেখা যায় তাঁকে। জিনিসপত্র তছনছ হয়, অনেক ব্যবস্থা লণ্ডভণ্ড হয়। এছাড়া ক্ষতি অবশ্য শেষ পর্যন্ত কারোই হয় না। কিন্তু সারাক্ষণের এই উদ্বেগ ক্ষতির বাড়া।

কখনো-সখনো এর থেকেও অনেক বেশি তিক্ত প্রহসনের মুখোমুখি হতে হয় জ্যোতিরাণীকে।

এরও পূর্বাভাস আগেই পান তিনি। একটা হিম-দৃষ্টি যেন অনেকক্ষণ আগে থেকে ছেঁকে ছেঁকে ধরতে থাকে তাঁকে। সর্বাঙ্গ লেহন করে। পুরুষের অনুরাগের দৃষ্টি নয়, প্রবৃত্তি-শানানো নিশ্চল তন্ময় দৃষ্টি। এই পূর্বাভাসের সঙ্গে পূর্বরাগের যোগ নেই কিছুমাত্র। বরং তার বিপরীত। বড় গোছের এক-একটা রেষারেষি বা বিবাদের পরেই এ ধরনের অভিলাষ পুষ্ট হতে দেখেছেন জ্যোতিরাণী। অধিকার বিস্তারের ক্রূর অপমানকর অভিলাষ। সেটাই যেন চরম প্রতিশোধ।

নীরব প্রতীক্ষায় আর সময়ের প্রতীক্ষায় তখনো ও-ঘরের আলো জ্বলে।

তারপর এ-ঘরের দরজায় হাত পড়ে। দরজা খুলে যায়। এক বিতৃষ্ণ অনুভূতিতে জ্যোতিরাণীর পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত সজাগ হয়ে ওঠে। কিন্তু সারাক্ষণ নিজের সঙ্গে নিঃশব্দে যোঝেন তিনি। বুঝতে পারেন। যিনি আসেন তিনি নিভৃতের সবল পুরুষ নন। তাঁর দুর্বল রীতি ক্রমশ নগ্ন হতে থাকে, ক্রূর হতে থাকে, অত্যাচারী হয়ে উঠতে থাকে। কিন্তু জ্যোতিরাণীর দিক থেকে?

কোনো আমন্ত্রণ নেই, বাধা নেই। অভ্যর্থনা নেই, প্রত্যাখ্যান নেই।

সব কিছুর বিনিময়ে এই অপরিসীম সহিষ্ণুতাই যেন সব থেকে বড় জবাব জ্যোতিরাণীর।

জবাবটা ছোটও নয় খুব।

প্রতিক্রিয়া আছেই। মানুষটা নির্বোধ এমন অপবাদ কেউ দেবে না। এই জবাব পাবেন জেনেই ইদানীং তিনি যতটা সম্ভব নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা করেন। এই চেষ্টাও জ্যোতিরাণী অনুভব করতে পারেন। অধিকার বিস্তারের ক্রূর তাড়নায় রাতের অন্ধকারে ঘরে হানা দেওয়া কমে আসছে। কিন্তু প্রতিশোধের ওই অপমানকর অভিলাষ একটুও কমেনি। সেটা বরং আরো বেড়েছে। সেই নগ্ন অভিলাষ তাঁর চোখে-মুখে জমাট বাঁধতে থাকে। তারপর সংযমের বাঁধ আবারও ভাঙে একদিন।

কিন্তু তার আগে শিবেশ্বর চেয়ে চেয়ে শুধু দেখেন। দেখেন আর ওজন করেন আর বিশ্লেষণ করেন।......রমণীর রূপের ভাণ্ডার এতদিনে অনেকখানি নিঃশেষ হয়ে যেতে পারত, স্বাস্থ্যের ওই অটুট বাঁধন অনেকখানি শিথিল হতে পারত। ছেলে—ওই এক সিতুই শেষ করে এনেছিল প্রায়। আরো পাঁচটা এলে কিছুই আর অবশিষ্ট থাকত না। তাই যত দেখেন শিবেশ্বর, ততো খেদ ততো ক্ষোভ ততো পরিতাপ তাঁর।

প্রতিশোধের এই সম্ভাবনা নির্বোধের মত নিজেই তিনি ছেঁটে দিয়ে বসে আছেন।

লোকটার এই পরিতাপও জ্যোতিরাণী অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারেন। মুখের দিকে তাকালেই বুঝতে পারেন। পারেন বলেই এক-একসময় উৎকট আনন্দ হয় তাঁর। শুধু আনন্দ নয়, আনন্দের তলায় তলায় অফুরন্ত স্বস্তিও বোধ করেন। নিশ্চিত স্বস্তি।

...সেই একদিন। অনেক দিনের কথা।

প্রায় দশ বছর আগের কথা। সন্তান সম্ভাবনার শুরু থেকেই জ্যোতিরাণীর দেহে ভাঙন ধরেছিল, রূপে ক্ষয় ধরেছিল।

সেই জ্যোতিরাণী এই জ্যোতিরাণীর প্রেতমূর্তি। মনে পড়লেও শিউরে ওঠেন তিনি। দেহে অশান্তি। তার থেকে অনেক বেশি অশান্তি মনে। অশান্তি, যাঁর ঘরে এসেছেন তাঁরই কারণে। বয়স কম তখন, নতুন বউ। ভেতর পুড়লেও বাইরে দাঁত কামড়ে সহ্য করতে হয়। বিয়ের কয়েক মাসের মধ্যেই চোখে অন্ধকার দেখেছেন তিনি। আশাভঙ্গের এক বিরাট সমুদ্রের মধ্যে পড়ে-

ছিলেন যেন। স্বপ্ন ভেঙেছে। আর একজন সেটা টের পেয়েছিল কি করে জ্যোতিরাণী জানেন না। টের শুভদৃষ্টির মুহূর্তেই পেয়েছিল বোধ করি।

জ্যোতিরাণী আপসের চেষ্টার ক্রটি করেননি। নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতেই চেয়েছিলেন। ভবিতব্য মেনে অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিতেই চেয়েছিলেন। কিন্তু অকারণে কেউ এত নির্মম অশান্তি টেনে আনতে পারে, অন্ধ মর্জির এমন দাস হয়ে উঠতে পারে, তিনি কল্পনাও করেননি। অবিরাম তখন এই অশান্তির মাশুলই দিচ্ছিলেন জ্যোতিরাণী। সন্তান সম্ভাবনার সময় যত এগিয়ে আসছিল ততো যেন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি।

শিবেশ্বর হঠাৎই একদিন চমকে উঠেছিলেন। বাড়িতে ঘন ঘন ডাক্তার দেখেও যাঁর হুঁস হয়নি, হঠাৎ আপনা থেকেই তিনি সচকিত একদিন। তপ্ত স্নায়ুগুলো সব একসঙ্গে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। স্ত্রীর দিকে চেয়ে শিউরেই উঠে-ছিলেন। রমণীর যে সম্পদের দিকে চেয়ে তাঁর এত তাড়না এত যাতনা, ওই অনাগত সন্তান বুঝি তার সবটুকুই গ্রাস করে ফেলেছে। এই সম্পদ গেলে আর বুঝি তাঁর গর্ব করার কিছুই থাকবে না, অবলম্বন থাকবে না।

শাশুড়ীর অমতে ডাক্তারের পরামর্শমত শ্বশুর নার্সিং হোমেই ব্যবস্থা করে-ছিলেন। ফলে শিবেশ্বরও মাথা খাটাবার সুযোগ পেয়েছিলেন। ডাক্তারের সঙ্গে কিছু পরামর্শ আর কিছু ব্যবস্থা তিনিও করেছিলেন। টাকা ফেললে সকল ব্যবস্থাই হয়। নতুন ঝোঁকে শিবেশ্বর টাকা সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। কদিন ধরেই বিষম কষ্ট পাচ্ছিলেন জ্যোতিরাণী। জীবনসঙ্কটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যেন তিনি। অশান্তি আর উদ্বেগে দিশেহারা অবস্থা। এই উদ্বেগের মুখেই প্রস্তাবটা শুনেছিলেন তিনি। শিবেশ্বরই জানিয়েছিলেন, ভালয় ভালয় সব হয়ে গেলে, এবং যে আসছে সে ভালো থাকলে, আর ছেলেপুলের দরকার নেই তাঁদের। তখন আর্থিক অবস্থা যা, তাতে একজনই যথেষ্ট। সামান্য অপারেশন, একসঙ্গেই হয়ে যাবে, জ্যোতিরাণী টেরও পাবেন না।

জ্যোতিরাণী সেই অবস্থায় সাগ্রহে রাজি হয়েছিলেন। তাঁকে এত সহজে রাজি হতে দেখে শিবেশ্বর মনে মনে অবাকই হয়েছিলেন।

যে সম্ভাবনা নির্মূল করা হয়েছে তার জন্য জ্যোতিরাণীর একদিনের জন্যও অনুতাপ হয়নি। যে এসেছে তাকে দেখার পরেও না। জীবনের নিভু নিভু সলতে একটা। আঙুলের ছোঁয়ায় নিভে যেতে পারে। থাকতে এসেছে কিনা কে জানে। ডাক্তারেরা অনেক কসরত করে তাকে রক্ষা করেছে।

কিন্তু তবু না।

শ্বশুর কেমন করে টের পেয়েছিলেন জ্যোতিরাণী আজও জানেন না। নার্সিং হোম থেকেই প্রকাশ হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু তিনি জেনেছিলেন যে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ছেলে নিয়ে জ্যোতিরাণী গাড়ি থেকে নামতে বাড়িতে শাঁখ বেজেছিল বটে, আর শাশুড়ীও আনন্দে দৌড়ে এসেছিলেন। কিন্তু শ্বশুরের মুখে হাসি দেখেননি তিনি। কঠিন মুখ করে তিনি দূরে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁকেই দেখছিলেন।

দুই চোখের সেই স্তব্ধ ভর্ৎসনা জ্যোতিরাণী আজও ভোলেননি।

অন্ধকার ঘরে চমকে ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলেন জ্যোতিরাণী। বাইরে চারিদিক থেকে অনেকগুলো শাঁখ বেজে উঠেছে একসঙ্গে।

॥ পাঁচ ॥

শাঁখ বেজেই চলেছে।

এক বাড়ির শাঁখ আর এক বাড়ির ঘুমন্ত মানুষদের ডেকে ডেকে তুলছে। আবার তারাও বাজাচ্ছে।

দূর থেকে তোপের আওয়াজ ভেসে এলো কয়েকটা। এই রাতে কোন্ বাড়িতে রেকর্ড চালিয়ে দিয়েছে, জন-গণ-মন অধিনায়ক···

জ্যোতিরাণীর শিরদাঁড়া দিয়ে যেন একটানা বিদ্যুৎ-স্রোত বয়ে গেল খানিকক্ষণ ধরে। সেই রোমাঞ্চ দেহের অণুতে অণুতে ছড়াতে লাগল। এই দিনটাকে আবার ভুলেছিলেন তিনি। সঙ্কল্প ভুলেছিলেন। অনেকক্ষণ ধরে ভুলেছিলেন। শিকল ভাঙার দিকে না চেয়ে শিকল আঁটছিলেন বসে বসে।

হাত বাড়িয়ে বেড-সুইচ টিপলেন। স্তিমিত আলোও চোখে ধাক্কা দিল প্রথম। টেবিলের ঘড়িতে বারোটা বেজে চার। তিন মিনিট হয়ে গেল দেশের মুক্তির বয়েস। বেড-সুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দিলেন আবার। ঘরের ভিতরটা এমনিতেই অন্ধকার নয় খুব। মুহূর্তের মধ্যে সব চিন্তা ওলট-পালট করে দিয়ে যারা ভিড় করে আসছে চোখের সামনে, এই অবস্থাতেই তাদের ভালো দেখা যায় যেন। মুক্তির আলোয় জলজল করছে রাশি রাশি মুখ—দেখা অদেখা, জানা অজানা, চেনা অচেনা মুখ। আর তাঁর বাবার মুখ। আর শোভাদার মুখ।···

আশ্চর্য, এত মুখও তাঁর মনের তলায় ছিল!

বিছানায় থাকা সম্ভব হল না। আবছা অন্ধকারে দরজা খুলে বাইরের বারান্দায় এলেন। সঙ্গে সঙ্গে খারাপ লাগল কেমন। সন্ধ্যা থেকে আলো নিয়ে শুধু ছেলেখেলাই করেছেন মনে হল। গোটা বারান্দাটা আর নিচটা আলোয় ঝলমল করছিল। লগ্ন যখন হল তখন একটাও আলো নেই। উপায় নেই, সকলে পাগল ভাববে, নইলে এই মুহূর্তে লোক ডেকে আবার সব আলো জ্বালতে বলতেন তিনি।

কাছ থেকে, দূর থেকে, শাঁখের আওয়াজ ভেসে আসছে তখনো। জ্যোতি-রাণীর কেমন মনে হল এই এত বড় বাড়িটাই শুধু অখণ্ড নীরবতার মধ্যে ডুবে আছে। ভারী ইচ্ছে হল, শাঁখ এ বাড়িতেও বাজুক। এই লগ্ন এখানেও ধরা থাক। সদা বা মেঘনাকে বলে রাখলে ওরা ঠিক বাজাতো। এমন কি, ওই ছেলে —যাকে হাতের মুঠোয় পেলে হাড় গুঁড়িয়ে দেন তিনি, ঘুম ভেঙে ঠাকুমার ঘর থেকে শাঁখ নিয়ে উঠে এসে তাকেও যদি গাল ফুলিয়ে বাজাতে দেখা যেত, জ্যোতিরাণী কি-চ্ছু বলতেন না। উল্টে তার সব দোষ হয়ত ক্ষমাই করে দিতেন।

বারান্দার রেলিংয়ে ঠেস দিয়ে বাইরের দিকে চেয়েছিলেন। বিদায়ী শ্রাবণের আকাশে মেঘের ছিঁটে-ফোটাও নেই। আকাশ ভরতি তারা জ্বলছে। গা-জুড়নো ঠাণ্ডা বাতাস দিয়েছে। এই শান্ত প্রকৃতির দিকে চেয়ে সদ্য মুক্তির স্বাদ নিতে চেষ্টা করলেন জ্যোতিরাণী। কোথা থেকে একটু আলো এসে পড়েছে তাঁর মুখে, আকাশের তারারা তাঁর দিকেই চেয়ে আছে, ঠাণ্ডা বাতাসেও যেন মুক্তির সম্ভাষণের ছোঁয়া লেগে আছে।

চমকে উঠলেন। আবছা মূর্তির মত কে এদিকেই এগিয়ে আসছে।

—মেঘনা?

—হ্যাঁ বউদিমণি, তুমিও জেগে আছ?···চারদিক থেকে এত শাঁখ বাজল, আর শুয়ে থাকা গেল না।

—তুইও বাজালি না কেন?

—খুব ইচ্ছে কচ্ছিল গো বউদি, ভাবলাম ঘুম ভেঙে গেলে তুমি আবার বকাবকি করবে। উঠে দেখি ও-দিকটায় কালীদাদাবাবু আর মামাবাবুও বেরিয়ে এয়েছেন—কেউ-ই ঘুমোয়নি, এখন বাজাবো একটু?

—থাক, আর বাজাতে হবে না।

নিজের ঘরের দিকে ফিরলেন। জ্যোতিরাণীর কেমন মনে হল, এরাও নিজের ইচ্ছেয় জেগে নেই কেউ। তাঁর মতই ঘুমুতে পারেনি বলে ঘুমোয়নি। মুক্তির তৃষ্ণা আছে যার সে-ই বুঝি জেগে আছে। বড় মুক্তির এই জোয়ারে যে যার ছোট

তৃষ্ণা মিশিয়ে দিতে চায়, জমা করে দিতে চায়।

কিন্তু মেঘনার কি চাই? সে কোন্ তৃষ্ণা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে?

কালীদার কি চাই? তাঁর মনের কোঠায় মিত্রাদি কি আজও কুলুপ এঁটে বসে আছে?

আর মামাবাবুর? বৈরাগ্য আর পাহাড়ের ডাকের মধ্যেও মুক্তি মিলছে না? …থাক। অনেক গুরুজন।

আর জ্যোতিরাণীর নিজের? নিজের ঠিক কোন্ মুক্তিটা চাই?

তাড়া নেই। ভাবা যাবে। টেবিল হাতড়ে জলের গেলাস নিয়ে জল খেলেন। তারপর শুয়ে পড়লেন। চোখ বুজলেন ঘুমের জন্ম নয়, কিছু দেখার জন্য।

এই মুহূর্তে কোনো সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে দ্বিধা নেই। দ্বিধা নেই সঙ্কোচ নেই ভয় নেই গ্লানি নেই। নিজেকে টেনে তুলতে হলে অমনি দেখে দেখেই টেনে তুলতে হবে। বাবার প্রভাবে তাঁর মনটাই শুধু পুষ্ট হয়েছিল। তার বেশি কিছু না। তাঁর স্বাধীনচেতা মনের জন্যই ঘরে এমন দ্বন্দ্ব। এই মনকে আর কিছু বড় কাজে লাগান নি জ্যোতিরাণী।

…সন্ধ্যা থেকে অনেক কিছু ভেবেছিলেন, অনেক কিছু সঙ্কল্প করেছিলেন। সেই সঙ্গে বার বার একজনকেই সন্তর্পণে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন তিনি। তফাতে রাখতে চেয়েছিলেন।…বিভাস দত্তকে। কারণ মুক্তির আশ্রয় আর ইশারার মতই সে বার বার কাছে এগিয়ে আসছিল। এই সত্যটাই জ্যোতিরাণী তখন প্রাণপণে অস্বীকার করতে চেয়েছেন। ওই একজনকে সব থেকে বেশি চেয়েছিলেন বলেই সবার আগে ওখানে পাহারা বসিয়েছিলেন।

এই জন্যেই কালীদার মুখে তাঁর আসার খবর পেয়ে অমন বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। শাশুড়ীর ঘরে তাঁর ক্রুদ্ধ মুঠো থেকে ছেলের হাত খসে গেছল। যে সত্যের দিক থেকে মুখ ফিরিয়েছিলেন সেটা হঠাৎ ব্যঙ্গ করে উঠেছিল তাঁকে।

…মনোযোগ দিয়ে লেখকের রচনা শুনছিলেন তিনি। এত মন ঢেলে যে ছেলে কখন চোখের আড়াল হয়েছে তাও টের পাননি। কিন্তু বিভাস দত্ত কি শোনাচ্ছিলেন তাঁকে? আসলে কার মূর্তি আঁকছিলেন, কাকে দেখাচ্ছিলেন? আর, জ্যোতিরাণীই বা সমস্ত স্নায়ু একত্র করে উন্মুখ অধীর আগ্রহে তাই শুনছিলেন তাই দেখছিলেন কেন? অন্ধকারের মূর্তি যত বেশি ঘোরালো ধারালো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছিল, যত বেশি চেনার আওতায় আসছিল—দেখার শুদ্ধ উদ্দীপনাও ততো বাড়ছিল কেন তাঁর?

কারণ, ঠিক ওই রকম করেই একজনকে দেখতে চেয়েছিলেন তিনি, ওই রকম

করেই চিনতে চেয়েছিলেন। যেমন করে দেখলে চিনলে নিজের কোনো আচরণ অসঙ্গত না মনে হয়। উল্টে জোর পায়, পরিপুষ্ট হয়। যেমন করে দেখলে আর চিনলে একজনের প্রতি তাঁর এত বিদ্বেষ এত বিরূপতা এত বিমুখতার দরুন নিজের কাছেও কোনো জবাবদিহির প্রশ্ন না ওঠে। মনে বিবেকের ভ্রূকুটির আঁচড় না পড়ে।

আর···ওই অন্ধকারে একাই বিচরণ করছিলেন তিনি? আর কেউ সঙ্গে ছিল না? পাশে ছিল না? তাঁর প্রতি কি জ্যোতিরাণী নিজের অগোচরেও সচেতন ছিলেন না? ছিলেন। কত বেশি ছিলেন সে শুধু বোঝা গেছে পাজি ছেলে সত্যি সত্যি সব আলো নিভিয়ে দিতে। সব কিছু সত্যিকারের অন্ধকারে ছেয়ে যেতে। ছেলের বেয়াদপির শেষ নেই। দিন-কে দিন জাহান্নামে যাচ্ছে। যাতে ভুলে না যায় সেই রকম সাজাই হাতে পেলে তিনি দেবেন ওকে। কিন্তু তবু, জ্যোতিরাণীর তখনকার সেই রাগ সবটাই কি ছেলের দুরন্তপনার জন্যে? এর থেকেও অনেক, অনেক বড় কিছু কারণ নেই?

···তাঁর কাঁধে, বাহুতে একটা স্পর্শ যেন এখনো লেগে আছে। মুখের ওপর একটা নিঃশ্বাসের তাপ বুঝি এখনো ছড়িয়ে আছে। কিন্তু ওটুকু সান্নিধ্য কিছু নয়।···সারা সন্ধ্যা ধরে সমস্ত ভাবনা-চিন্তা আর সংকল্প থেকে অতি সন্তর্পণে যাকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন, ওই অন্ধকারে এক মুহূর্তে লোকটা কোথায় কত কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল সে এক জ্যোতিরাণী ছাড়া আর কেউ জানে না। এমন কি বিভাস দত্ত নিজেও জানেন না। কটা মুহূর্ত দুনিয়ায় ওই একজন ছাড়া আর কারো বুঝি অস্তিত্বও ছিল না।

বিভাস দত্ত চলে যাওয়ার পরেও তাই অমন বিভ্রান্ত বিমূঢ় হয়ে বসেছিলেন। তারপর নিভৃতের এই দেখাটাকে প্রাণপণে ঠেলে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন। অস্বীকার করতে চেয়েছেন। যত বেশি চেয়েছেন ছেলের ওপর ততো ক্রুদ্ধ হয়েছেন।

চোখ দুটো জ্বালা জ্বালা করছে জ্যোতিরাণীর। কিন্তু এই দিনটাই বুঝি অতি বড় হতাশার থেকেও নিজেকে উদ্ধার করারই দিন। এই জ্বালাও একেবারে আশাশূন্য নয়। দুরারোগ্য ব্যাধিরও সঠিক হদিস পেলে আশা জাগে। জ্যোতিরাণীও যেন এই আশাতেই খুব স্থিরভাবে একটা ব্যাধি নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন। জ্বালা একটু করবেই, কারণ ব্যাধিটা নিজের।

কিন্তু কেন এ-রকম হল? কেন? কেন?

বিভাস দত্ত দুর্দম পুরুষ নয়। অতর্কিত দস্যুর মত রমণীর মন ছিনিয়ে নিতে

পারে এমন সবল পুরুষও নয়। বরং ভীরু পদক্ষেপ তাঁর। হিসেবের রাস্তায় চলে অভ্যেস। আত্মচেতন, আত্মগোপনকারী। তাঁর কাছে মর্যাদার মূল্য বেশি। লেখার তলায় তলায় নিভৃতের গোপন বাসনা বোনেন। ওতেই যেটুকু তৃপ্তি। বাস্তব সাহিত্যের মূল্যে বিকোয় সেগুলো, নগদও মেলে। নিজেও তিনি ভোগই করেন, শুধু নিজেকে রক্ষা ক'রে ভোগ করেন। কিন্তু এই ভোগও শেষ পর্যন্ত ফাঁকিই।

কিছুদিন আগে জ্যোতিরাণী একটা বিলিতি গল্প পড়ছিলেন। নায়ক আত্মকেন্দ্রিক। কল্পনায় এক দুর্লভ রূপসী মহিলাকে তার যৌবনের দোসর করেছে। চোখ বুজে বাস্তবের মতই তার আবির্ভাব অনুভব করতে পারে। বালিশে হাত ছুঁইয়ে তার স্পর্শে মগ্ন হতে পারে। সম্ভোগের আরতি ক্রমে প্রায় বাস্তবের আকার নিতে থাকে। কিন্তু বাস্তবে যখনই সেই মহিলাকে দেখে, ভোগের স্বপ্ন ভেঙে যায়। মিথ্যেটা যেন দাঁত বার করে ব্যঙ্গ করতে থাকে। তবু প্রাণপণ চেষ্টায় আবারও সেই কল্পনার বিবরে ঢোকে নায়ক। ভোগের আরতি সাজায়। এই করেই সে নিজের সর্বনাশ সম্পূর্ণ করে তুলল। কোনো মেয়েই মনে ধরে না। একে একে তিনবার বিয়ে করল। প্রতিবারেই পরিণাম বিচ্ছেদ। শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করল ছেলেটা। আত্মহত্যা করল চতুর্থবার বিয়ের পর। ঘটনা পরম্পরায় এই শেষবার সে বিয়ে করতে পেরেছিল সেই দুর্লভ রমণীকেই যে তার এতদিনের ধ্যান জ্ঞান স্বপ্ন। কিন্তু ধ্যান ভাঙল, জ্ঞান ফিরল, স্বপ্ন টুটল। না, মহিলার দোষ নেই, বরং আরো প্রিয়, আরো সুন্দর হয়েই এই নতুন জীবনের সঙ্গে নিজেকে জুড়তে চেয়েছিল। তবু বড় মর্মান্তিকভাবে ছেলেটার ধ্যান ভেঙেছে, জ্ঞান ফিরেছে, স্বপ্ন টুটেছে। সে জেনেছে, ভোগ নয়, এতকাল সে ভোগের মরীচিকার স্বপ্নে বিভোর হয়ে ছিল। ভোগের মরীচিকার পিছনে ছুটে মরছিল। এই মরীচিকার তৃষ্ণা তার জুড়বে কেমন করে?

বিভাস দত্তকে এই গল্পের নায়কের সঙ্গে এক করছেন না জ্যোতিরাণী। তাঁরও জ্বালা আছেই সে-কথা ভাবছেন। জ্বালাটা যখন ধরা পড়ে, বিবেকের আর নীতির চাবুক খেয়ে তাঁর লেখনীর মুখে সেটা তখন আর এক রূপে প্রকাশ পায়। ওতে আবার একটু বাড়তি সুনাম মেলে, সম্মান মেলে। আত্মচেতন ভোগের গণ্ডী আরো একটু শক্ত-পোক্ত হয়।

দু বছর আগের ভুলে যাওয়া একটা চিত্র চোখের সামনে ভেসে উঠল জ্যোতি-রাণীর। মোটরে তিন-চারদিনের জন্ম হাজারিবাগ বেড়াতে গেছলেন সকলে মিলে। শুধু বাড়ির মালিক আর শাশুড়ী ছাড়া। কালীদা ছিলেন, মামাশ্বশুর ছিলেন, ছেলে ছিল, বিভাস দত্ত ছিলেন, সদাও ছিল। দুটো মোটরে গেছলেন তাঁরা।

আনন্দে কেটেছিল কটা দিন। জ্যোতিরাণীর উৎসাহেই যাওয়া। সেখানে কলকাতার জীবন মন থেকে ছেঁটে দিতেই চেষ্টা করেছিলেন তিনি। খুশি মনে জ্যোতিরাণী তখন একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেও করেন নি। পাহাড়ে ওঠা-নামার সময় যতবার সাহায্যের দরকার হয়েছে, ততোবারই হাতের নাগালে একখানা হাতই শুধু মিলেছে। বিভাস দত্তর হাত। মহিলাদের কেরামতি প্রসঙ্গে বিভাস দত্ত টীকা-টিপ্পনী জুড়েছেন বটে, কিন্তু তাঁর সাহায্যের হাতও সর্বদাই মজুত ছিল।

...একটা উঁচু পাথরে উঠতে গিয়ে বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন জ্যোতি-রাণী। আধা-আধি উঠে না পারেন আর উঠতে, না পারেন নামতে। বিভাস দত্ত প্রায় টেনেই তুলেছিলেন তাঁকে। সেই প্রগল্‌ভ সান্নিধ্যও জ্যোতিরাণীর মনে অন্তত কোনো রেখাপাত করেনি। পাথরটা দুজনের সহজ অবস্থানের মত বড়ও নয়। তবু না। নিচের ওরাও দেখছে, হেসেছে। কালীদা চিৎকার করে উঠেছেন, দুটোর একসঙ্গে পড়ে মরার ইচ্ছে? নেমে এসো বলছি! মামাশ্বশুরের কাঁধে চেপে ছেলেও সানন্দে চিৎকার করে ডাকছিল। বাইরে বেরুলে গৌরবিমল মামাশ্বশুরের খোলস কিছুটা ছাড়তে পারেন, আগের মতই অনেকটা সহজ হতে পারেন দেখা গেছে। আর বিয়ের আগে জ্যোতিরাণী বাপের বাড়িতে তাঁকে খানিকটা শ্রদ্ধা করলেও পরোয়া একটুও করতেন না, এখনো করেন না। তবে শ্বশুরবাড়িতে সমীহভাবেও ঠাট বজায় রাখতে হয় বটে। সেটা বজায় রাখার আরো অনেক অবাঞ্ছিত কারণও ঘটে গেছে। এই সব কিছু অস্বীকার করার জন্যেই যেন তিনি এ ধরনের আনন্দে আরো বেশি মেতে উঠেছিলেন।

শরীর ক্লান্ত ছিল। হোটেলের খাওয়া-দাওয়ার পরেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। মাঝরাতে কেন যেন ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙলেই রাতে উঠে জল খেতে হয় তাঁর। উঠলেন। বাইরের জ্যোৎস্না জানলা দিয়ে ঢুকে তাঁর ঘরের মধ্যে লুটোপুটি খাচ্ছিল। জল খেয়ে সেই জ্যোৎস্না দেখতে দাঁড়ালেন জ্যোতিরাণী।

দেখা হল না। তার বদলে আর এক ব্যাপার দেখলেন। অদূরের ঢাকা বারান্দায় কে একজন পায়চারি করছে। হাতের জলন্ত সিগারেট মুখে উঠতে চিনলেন কে। ঠাণ্ডার রাত, কিন্তু গায়ে একটা চাদরও নেই। জ্যোতিরাণী অবাক। রাত কম করে দেড়টা-দুটো হবে।

গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে বেরিয়ে এলেন তিনি। কাছাকাছি এসে পিছন থেকে বললেন, মাথা না হয় গল্পের প্লটে গরম, গায়ে যে ও-দিকে ঠাণ্ডাটি লাগছে!

চমকে ফিরলেন বিভাস দত্ত। চুরি ধরা পড়ার মত মুখ। সেই মুখ দেখামাত্র জ্যোতিরাণীর মনে হয়েছিল, ভদ্রলোক আর যা-ই ভাবুক, গল্প ভাবছিল না।

সামনে নিয়ে বিভাস দত্ত অবশ্য এটা ওটা দু-পাঁচ কথা বলেছিলেন আর জ্যোতিরাণীর তাড়া খেয়ে ঘরে চলে গেছলেন। ইচ্ছে করলেই জ্যোতিরাণী তারপর বিকেলের পাহাড় দেখার ভিতর দিয়ে অনেকদূর পর্যন্ত দেখতে পারতেন।

না, তিনি ভিতর দেখতে চেষ্টা করেন নি। জেনেও না। কার ভিতরে কি হচ্ছে তা নিয়ে মাথা ঘামান নি। মানুষের ভিতরেও তো রক্ত মাংস বীভৎস কঙ্কাল। ভিতর কে দেখে?

কিন্তু আজ একেবারে স্বতন্ত্র একদিন। আজও চোখ বুজে থাকলে সমস্তটা জীবন এক শূন্য ফাঁকির বোঝাই সম্বল করতে হবে বুঝি।

জ্যোতিরাণী তা করবেন না। আবছা অন্ধকারে তাঁর দৃষ্টিটা স্থির হল আবার। সেটা এবারে সরাসরি নিজের দিকে ফিরিয়েছেন তিনি। বিভাস দত্তর কথা থাক, মাথা ঘামালে অমন অনেকেরই ভিতর-বার জানা যেতে পারে। কিন্তু তাঁর নিজের কি ব্যাপার? নিজের মধ্যে এতদিনের এই কারচুপি কিসের? এ-রকম হল কেন? একজনের প্রত্যাশার সঙ্গে তাঁর নিভৃতের প্রশ্রয় এভাবে যুক্ত হল কেমন করে? এত নিভৃতের যে নিজেও সঠিক ঠাওর করতে পারেন নি!

...এ কি শুধু কৃতজ্ঞতা? কৃতজ্ঞ রমণীর হৃদয়ের প্রসাদ আর প্রসন্নতা শুধু?

বিয়ের পর থেকে এই একজনের কাছেই নানাভাবে কৃতজ্ঞ তিনি। এই একজন না এলে তাঁর জীবন আরো অনেক বিষিয়ে যেতে পারত, অনেক দুর্বিষহ হতে পারত—এমন কি ভয়াবহ পাঁকের মধ্যে একেবারে নিঃশেষও হয়ে যেতে পারত। বিভাস দত্ত তাঁকে বহুভাবে রক্ষা করেছেন।

তাঁর বিয়েটা ঘটিয়েছিলেন কালীদা আর মামাশ্বশুর। ছেলে বিয়ে করার জন্য ক্ষেপে উঠেছিল বলে শ্বশুর বিচলিত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু এঁদের সুপারিশ না থাকলে বিয়ে শেষ পর্যন্ত হত কিনা কে জানে। কালীদার কথায়ও হয়ত খুব কান দিতেন না শ্বশুর, হাল্কা স্বভাবের জন্য শ্বশুর কখনই তাঁকে খুব নির্ভরযোগ্য মনে করেননি। কিন্তু মনে মনে তিনি স্নেহ আর শ্রদ্ধা করতেন ওই মামাশ্বশুরটিকে। যাই হোক, বিয়ে হয়েছে বলে তাঁদের প্রতি জ্যোতিরাণীর কৃতজ্ঞ থাকার একটুও কারণ নেই। অনেক সময় বরং মনে মনে এঁদের তিনি সহ্যই করতে পারেন নি। কিন্তু বিভাস দত্তর প্রতি অকৃতজ্ঞ হলে সেটা অপরাধ।

বিয়ের পরে এই সংসারে এসে আলাপ তাঁর সঙ্গে। শিবেশ্বরের সহপাঠী হলেও ভাবটা কালীদার সঙ্গেই বেশি ছিল। গোড়ায় গোড়ায় বিভাস দত্ত কবি ছিলেন। য়ুনিভার্সিটিতে পড়তেই তাঁর কবিতার খ্যাতি হয়েছিল। অনেক পত্র-পত্রিকায় তাঁর কবিতা ছাপা হত। খাড়া চোখা-চোখা বাক্যবাণের কবিতা। কবিতায় ভাবের

থেকেও জ্বালা বেশি থাকত। জীবন-যন্ত্রণার অনেক রকম নরম-গরম স্থর বাজতো। অনেকেরই ভালো লাগত। জ্যোতিরাণীরও লাগত। কিন্তু তখন তিনি চোখেও দেখেন নি তাঁকে।

দেখে স্বভাবতই খুশি হয়েছিলেন। ছাপার অক্ষরে লেখা বেরোয় এমন একজনকেই বোধ হয় প্রথম সশরীরে দেখলেন তিনি। আরো খুশি হয়েছিলেন তাঁর কথা শুনে। কবিতার মতই কথাবার্তার ধরন। প্রথম তাঁকে দেখে ভদ্রলোক হাঁ করে মুখের দিকে চেয়েছিলেন খানিকক্ষণ। তারপর কালীদার দিকে ফিরে বলে উঠেছিলেন, এ কার গলায় কি মালা পড়ল কালীদা, অ্যাঁ?...ইস্, আগে যদি জানতাম!

অর্থাৎ আগে জানলে মালার জন্য নিজেই গলা বাড়াতে চেষ্টা করতেন।

বয়েস তখন কারোই বেশি নয়। সকলেরই ভালো লাগার কথা। কিন্তু বলা বাহুল্য, উক্তিটা শুধু একজনেরই পছন্দ হয়নি। শিবেশ্বরের। তাঁর চিন্তাধারা ততদিনে বাঁকা রাস্তায় চলা শুরু করেছে। এইজন্যেই এ স্তুতি জ্যোতিরাণীর আরো বেশি ভালো লেগেছিল কিনা বলা যায় না।

বিভাস দত্ত প্রায়ই আসতেন। এর পর শ্বশুর-শাশুড়ীর আওতায় আলাপ তখন বিস্তৃত হবার নয়। হয়ও নি। তবে ফাঁক পেলেই কালীদা জ্যোতিরাণীকে ঘরে ডেকে পাঠাতেন। বিশেষ করে শ্বশুরমশাই আহ্নিকে বা অন্য কিছুতে ব্যস্ত থাকলে দু-তিনবারও চায়ের হুকুম করে পাঠাতেন। শিবেশ্বর বাড়িতে না থাকলেও বাইরের ঘরে আড্ডা বসত। বাড়িতে তখন কাজের লোক একমাত্র সদা। তার ফুরসত হতই না। অতএব জ্যোতিরাণীকেই হুকুম তামিল করতে হত। কিন্তু তাঁর মনে হত, চা চাওয়াটা উপলক্ষ। তাঁর উপস্থিতিটাই বাঞ্ছিত।

এই আড্ডার পাটও কমে এসেছে আস্তে আস্তে। এখানকার সমস্ত সহজ ধারাতেই একে একে টান ধরেছিল। বিভাস দত্তর আসাও প্রায় বন্ধ হয়েছিল। কেন, সেটা আর মুখ ফুটে জ্যোতিরাণী কালীদাকে জিজ্ঞাসা করেন নি। জানেন কেন। কেউ তখন শান্তিতে নেই। শ্বশুর না, শাশুড়ী না, কালীদা না, মামা-শ্বশুর না। সকলেই তখন যে যার চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত।

এর অনেকদিন বাদে জ্যোতিরাণী হঠাৎ একটা খামে আঁটা চিঠি পেলেন। অচেনা লেখা, খামের ওপর তাঁরই নাম।

নির্দোষ চিঠি। কিন্তু সেটা পড়তে পড়তে জ্যোতিরাণীর প্রথমে কাঁপুনি ধরেছিল। চিঠিটা তাঁর হাতে না পড়ে আর একজনের হাতে পড়লে কি হত সে-কথাই প্রথম মনে হয়েছিল। পড়া হতেই চিঠিটা লুকিয়ে ফেলেছেন তিনি।

তারপর নিরাপদ অবকাশে আবার পড়েছেন। অনেকবার পড়েছেন।

হিমের মত যে হতাশা বুকের তলায় জমাট বেঁধে উঠছিল, তাতে যেন জীবনের আলো পড়েছিল একপ্রস্থ, জীবনের তাপ লেগেছিল। এই এক চিঠির জন্যই বিভাস দত্তর কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকা উচিত তাঁর। মানুষ বিভ্রান্ত হলে সামনের খোলা পথও বুঝি চোখে পড়ে না। সেই বিভ্রমের মধ্যেই বাস করছিলেন জ্যোতিরাণী। বিভাস দত্তর চিঠি এই বিভ্রম থেকেই টেনে তোলার কাজ করেছে।···লিখেছেন, কারো ব্যথায় বেদনাহত হওয়া দোষের কিনা তিনি জানেন না। তবে দোষ-গুণ নিয়ে তিনি মাথা ঘামান না। না লিখে পারা গেল না বলেই লিখছেন। জ্যোতি-রাণীর ব্যথার খবর তিনি কতটা জানেন বা কেমন করে জানেন সেটা বড় করে না দেখতে অনুরোধ করেছেন।

লিখেছেন, সব জেনেও অসহায়ের মত হয়ত চুপ করে বসেই থাকতুম। কিন্তু সেদিন কালীঘাটে মন্দিরের সামনে আপনার শাশুড়ীর সঙ্গে আপনাকে দেখে আর চুপ করে থাকাও গেল না। আমি সেখানে পুণ্যি করতে যাইনি, মানুষের সমর্পণের মুখগুলো দেখে দেখে লেখার রসদ সংগ্রহের জন্য ওসব জায়গায় প্রায়ই গিয়ে থাকি। আপনার পরনে গরদ ছিল, কপালে বড় তামার পয়সার মত সিঁদুরের টিপ ছিল, কিন্তু কারো দিকে আপনার চোখ ছিল না। মনে হয়, যার পায়ে ধর্ণা দেবার জন্য শাশুড়ী আপনাকে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর দিকেও না। বলির পশুকে যে-ভাবে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়, গরদে আর সিঁদুরে সাজিয়ে ওখানে আপনাকে নিয়ে যাওয়াটাও তেমনি লাগছিল আমার। দেখতে বা বুঝতে যদি আমার ভুল হয়ে থাকে তাহলে আর কোনো কথা নেই। কিন্তু ভুল যদি না হয়ে থাকে তাহলে ছোট একটা পরামর্শ দিতে পারি। মন না টানলে মন্দিরের দরজা খোলে না। কিন্তু আর এক মন্দিরের দরজা আপনার সামনে খোলাই আছে। শুনেছি, পড়াশুনার দিকে আপনার ঝোঁক ছিল, ম্যাট্রিক ভালই পাস করেছিলেন। এই রাস্তাতেই আরো খানিকটা এগোতে বাধা কি? তাতে আর কিছু না হোক সময় ভালো কাটবে, আর, এগোতে পারলে নিজের ওপর আস্থাও ফিরবে। শেষে লিখেছিলেন, ভয়ের মুখোশে যত বিশ্বাস করবেন, ভয়ের পীড়নও ততো সত্য হয়ে উঠবে। ভয় করবেন না।

সেই চিঠি লিখে কি যে উপকার করেছিলেন বিভাস দত্ত, তিনি নিজেও জানেন কিনা সন্দেহ। দু দিন মন্ত্রের মত শুধু জপ করেছেন জ্যোতিরাণী, ভয় করব না, ভয়ের মুখোশে যত বিশ্বাস করব ভয়ের পীড়ন ততো ভয়ঙ্কর হবে, ততো সত্য হয়ে উঠবে। ভয় করব না, ভয় করব না, ভয় করব না।

প্রস্তাবটা সোজা শ্বশুরের কাছেই করেছিলেন তিনি। পড়তে চান।

শ্বশুর তখন নিজের ছেলের ওপর যত বিরূপ, ছেলের বউয়ের ওপর ততো নয়। নাতি একটু বড় হয়ে উঠতে তাঁকে নিয়ে হেসেখেলে একভাবে দিন কাটাতেন বটে, কিন্তু বউয়ের বিষণ্ণ অবকাশ তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। এক কথায় রাজি তিনি।—বেশ তো শিবুকে বলো, ব্যবস্থা করে দেবে।

শিবেশ্বরকে জ্যোতিরাণী সংকল্প জানিয়েছেন বটে, কিন্তু ব্যবস্থা করতে বলেননি। বাড়িতে পড়লে আপত্তি করার কোনো কারণ দেখেননি শিবেশ্বর। কালীদাকে দিয়ে বইপত্র সংগ্রহ করেছেন জ্যোতিরাণী। আর তাঁর মারফতই বিভাস দত্তকে দয়া করে আসতে অনুরোধ করেছেন একবার। কি পড়তে হবে না পড়তে হবে খোঁজখবর নিয়ে তিনিই বলে দিয়ে গেছেন।

সেটা পছন্দ হোক বা না হোক, বাবার সায় আছে জেনে শিবেশ্বর মুখ বুজেই ছিলেন।

এর বছর-দেড়েক বাদে শ্বশুরের আশ্রয় ছেড়ে যখন দু-ঘরের আস্তানায় উঠে যেতে হয়েছিল তাঁদের, সেখানেও বিভাস দত্ত মাঝেসাঝে আসতেন। কিন্তু বেশি এসে কখনো বিড়ম্বিত করেননি জ্যোতিরাণীকে। এলে কালীদার সঙ্গেই আসতেন, আর ঘরের মালিকের উপস্থিতিতেই আসতেন। ভদ্রলোকের এই সুবিবেচনার জন্যও জ্যোতিরাণী মনে মনে কৃতজ্ঞ থাকতেন।

…তেতাল্লিশ সাল সেটা। আই-এ-পাস করার পর জ্যোতিরাণীর বি-এ পরীক্ষাও দেওয়া শেষ। ওদিকে দুর্ভিক্ষের পদসঞ্চার শোনা যাচ্ছে, আর জ্যোতিরাণীর সংসারে প্রাচুর্যের বাঁধ ভেঙেছে। দিনে দিনে সেই প্রাচুর্য ফুলে-ফেঁপে উঠছে। ছোট ঘর ছেড়ে বড় ঘরে উঠেছেন, বড় ঘর ছেড়ে আস্ত বাড়িতে। সেই আস্ত বাড়ি ছেড়ে আবার বড় বাড়ির খোঁজ চলছে।

এমন দিনে কাগজে দেখলেন, বিভাস দত্তর জেল হয়েছে। কারণ, তাঁর সদ্য প্রকাশিত একখানা বই। শ্বেতবহ্নি। বইটা সরকার বাজেয়াপ্ত করেছেন। বইটা জনস্বার্থের ক্ষতির কারণ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। জ্যোতিরাণী হতভম্ব। কদিন আগেও বিভাস দত্তর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। নতুন বইয়ের কথা কিছুই বলেননি। তবে সেই মুখে দুর্ভিক্ষের ছায়া দেখেছিলেন তিনি। দুর্ভিক্ষের জ্বালা দেখেছিলেন। আগুনও দেখেছিলেন হয়ত। জ্যোতিরাণী বিচলিত হয়েছিলেন। সাহায্য করার মত অঢেল টাকাই হাতে আছে তখন। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেই সকলকে সাহায্য করা যায় না। উল্টে বিভাস দত্তর প্রচ্ছন্ন ক্ষোভ-কটাক্ষ থেকে কেন যেন নিজেদেরও একেবারে মুক্ত ভাবা সম্ভব হয়নি তখন।

বইখানা সংগ্রহ করার জন্য উদ্গ্রীব হয়েছিলেন জ্যোতিরাণী।

ছু-তিনদিনের মধ্যে সে বই আপনিই এসেছে তাঁর কাছে। বেনামী প্রেরকের মারফত ডাকে এসেছে। বই খুলে জ্যোতিরাণী আরো হতভম্ব। বইখানা তাঁরই নামে উৎসর্গ করেছেন লেখক।

একরকম নিঃশ্বাস রোধ করেই পড়ে উঠেছেন। তারপর নিজের ঘরের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফিরিয়েছেন তিনি। ঘরের মানুষের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলেছেন। সেই মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে নিঃশব্দে খুঁজেছেন কিছু।

দীর্ঘ পনের মাস পরে এই বিভাস দত্তকেই সম্ভবত সব থেকে বেশি অবাক করতে পেরেছিলেন জ্যোতিরাণী। জেলের বাইরে অনেকেই সেদিন তাঁর জন্য ফুল, ফুলের মালা নিয়ে অপেক্ষা করছিল। জ্যোতিরাণীর হাতে কিছু ছিল না। শুধু তিনি ছিলেন।

বিভাস দত্ত অবাক যেমন, খুশিও তেমনি। হেসে বলেছিলেন, আপনি···!

জ্যোতিরাণীও হেসেছিলেন। বলেছিলেন, নয় কেন? ভয়ের মুখোশে যত বিশ্বাস করা যায়, ভয়ের পীড়ন ততো সত্য হয়ে ওঠে। কাজ কি বিশ্বাস করে?

জ্যোতিরাণীর কাছ থেকে সেদিন ফুল পাননি বিভাস দত্ত, তার থেকে অনেক বেশি কিছু পেয়েছিলেন। তারপর থেকে ছুর্ভিক্ষ তাঁর এই পাওয়ার ওপরে অন্তত ছায়া ফেলতে পারেনি।

···শেষে, ছু বছর পরের সেই সর্বনাশা একটা দিন।

উনিশশ' ছেচল্লিশের ষোলই আগস্ট।

জ্যোতিরাণীরা তখন অতি-অভিজাত পাঁচমিশালি লোকালয়ের এলাকায় একটা বড় বাড়িতে থাকেন। ছু-তিনটে বাড়ি কেনা হয়েছে, আর এখানে আজকের এই বসত-বাড়িও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আর কদিন বাদেই তাঁরা এই বাড়িতে উঠে আসবেন। প্রাচুর্যের বন্যার হদিস জ্যোতিরাণী হয়ত কিছুটা পেয়েছেন, কিন্তু সেটা ঠেকাতে পারেননি। সেরকম সক্রিয় চেষ্টাও কিছু করেন নি।

কিছুকাল হল শ্বশুর চোখ বুজেছেন। শাশুড়ী তখনো আগের পুরনো ভাঙা বাড়িতে থাকেন। নিজেদের নতুন বাড়ি হলে ছেলের কাছে এসে থাকবেন। একই পাড়ায় ওই পুরনো পৈতৃক বাড়ির কাছেই এই নতুন বাড়ি উঠছিল। শাশুড়ী পুরনো বাসস্থান ছেড়ে না আসায় স্থবিধেই হয়েছিল। কালীদা আছেন সেখানে, মামাশ্বশুর যাই-যাই করেছেন বটে, কিন্তু তখনো যাননি। তাঁরা থাকাতে নতুন বাড়ি দেখাশুনার অনেক স্থবিধে হচ্ছিল। ওই কারণে সদাও তখন সেখানেই।

পনেরই আগস্টের রাত্রিতেও কলকাতার চল্লিশ লক্ষ লোক প্রতি রাত্রির মতই

শয্যা নিয়েছিল। কেউ কি ভেবেছিল পরের দিনটা কি হবে? কেউ কি জানত কত লোকের এই শেষ ঘুম? কেউ কি কল্পনা করেছিল রাত পোহালে কত লোক আবার গলিতে-পথে-ফুটপাথে পড়ে ঘুমুবে—আর উঠবে না?

শুধু পরদিন কেন, পরপর কটা দিন…

সেই ব্যাপক হত্যার জন্য চল্লিশ লক্ষ শহরবাসীর খুব কম লোকই প্রস্তুত ছিল।

দুপুর থেকে দিশেহারা অবস্থা। বাড়ির দরজা-কপাট সব বন্ধ করা হয়েছে। বন্ধ দরজা যতদূর সম্ভব সুদৃঢ় করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু দরজা বন্ধ করে ভয় ঠেকানোর দিন নয় সেটা। বন্ধ দরজা খুলতে সময় লাগে না, ভাঙতে সময় লাগে না, জ্বলতে সময় লাগে না। ভয়-ত্রাসে থরথর করে কেঁপেছে কটি প্রাণী। জ্যোতিরাণী, শিবেশ্বর, আট-ন বছরের সিতু। আর দুটো চাকর। সিতুর মুখের দিকে চেয়েই জ্যোতিরাণীর বুকের রক্ত হিম হয়েছে থেকে থেকে। সপ্তাহের মধ্যে পাঁচদিনই সে ঠাকুমার কাছে থাকে। অজ্ঞান অবস্থা থেকেই দাদু আর ঠাকুমার কাছে থেকে বড় হয়েছে। শেষ না ঘনালে আজ এমন দিনেই সে এখানে থাকবে কেন?

জানলার একটা শার্সিও খুলতে পারেন না জ্যোতিরাণী। তাজা দেহ রক্তাক্ত হতে দেখেছেন, মাটিতে লুটোতে দেখেছেন। সেগুলো টেনে টেনে নিয়ে যেতে দেখেছেন। প্রাণভিক্ষার আকুতি দেখেছেন। হত্যার উল্লাস দেখেছেন। ঘরের মধ্যে বসেও এক-একটা অসহায় আর্তনাদ ধারালো ছুরির মত বুকে এসে বিঁধছে, আর সেইসঙ্গে হত্যার মত্ত উল্লাসে কানের পরদা ফেটে যাচ্ছে।

সাহায্যের জন্য শিবেশ্বর টেলিফোন নিয়ে বসেই আছেন। টেলিফোনে সাড়া মিলছেই না প্রায়। থানা পুলিস কিছুই ধরা গেল না। যেখানে পারছেন পাগলের মত চেষ্টা করছেন যোগাযোগ করতে। কিন্তু শহর কলকাতা সেদিন যোগাযোগশূন্য।

দুপুর পেরুলো, বিকেল হল। সন্ধ্যা আসন্ন। তারপর রাত্রি। তারপর?

তাঁদের বন্ধ দরজায় এর মধ্যে বারকয়েক ঘা পড়ে গেছে। বড় রাস্তার ওপর এত বড় বাড়ি বলেই এখনো দরজা খুলে যায়নি। তাছাড়া এত বড় বাড়িতে বন্দুক থাকা সম্ভব, সেই ভয়ও আছে। দরজায় ঘা পড়লেই শিবেশ্বর ওদের শুনিয়ে চাকরের উদ্দেশে বন্দুকের জন্য হাঁক দিয়েছেন।

বন্দুক নেই।

পিছনের জানলা খুলে যে-বাড়ি থেকে সাহায্য পাওয়া সম্ভব, তাদের শরণাপন্ন হতে চেষ্টা করেছেন জ্যোতিরাণী। কিন্তু পরিচিত মুখের মধ্যে যেন শ্বাপদের মুখ দেখেছেন তিনি, তাঁর হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে গেছে। কোনো রমণীর দেখা মেলেনি।

মিলেছে যাদের, তারাও যেন সময়ের আর সুযোগের প্রতীক্ষায় আছে।

নীচের দরজায় মাঝে-মাঝেই ধাক্কা পড়ছে।

ওরা জানে এই বাড়ির লোকের টাকা আছে।...ওরা জানে টাকার থেকেও আরো লোভনীয় কিছুও আছে।...রাস্তায় নেমে গাড়িতে ওঠার মধ্যেও এদিক-সেদিক থেকে কতজোড়া লুব্ধ চোখ তাঁকে ছেঁকে ধরত ঠিক নেই।

রাত বাড়ছে। মৃত্যু থিতিয়ে থিতিয়ে ঘন হচ্ছে।

ছেলেটা বমি করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছে। চাকর দুটো মৃতের মত কাঠ। শিবেশ্বর পাগলের মত ছটফট করছেন। জানলার শার্সি খুললেই দূরে দূরে আগুন জ্বলতে দেখা যাচ্ছে। তাণ্ডব রব শোনা যাচ্ছে।

জ্যোতিরাণীর সম্বিৎ ফিরল যেন। শিবেশ্বর তাঁর দিকেই চেয়ে আছেন, অদ্ভুত চোখে দেখছেন তাঁকে। চোখে চোখ পড়তে বলে উঠলেন, তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন? তোমার ভয়ের কি আছে? ওরা দরজা ভেঙে ঢোকেই যদি, আমাকে কাটবে, ছেলের দিকে দেখলেন—ওই ওকে কাটবে, চাকর দুটোকে কাটবে। তোমাকে কি-চ্ছু বলবে না, তোমাকে খুব আদর করে নিয়ে যাবে ওরা।

না, জ্যোতিরাণী আর্তনাদ করে উঠতে পারেননি, ভগবানকে ডাকতে পারেননি, বধির হতে পারেননি। পাথরের মত বসেছিলেন শুধু। শুধু শুনেছিলেন।

সেই রাতও ভোর হয়েছে।

কিন্তু এতটুকু জীবনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসেনি। নতুন উদ্দীপনার দ্বিগুণ উল্লাসে মৃত্যু নিয়ে ছিনিমিনি খেলা শুরু হয়েছে আবার। আবার দরজায় ঘা পড়েছে মাঝে মাঝে। ওরা জানান দিয়ে গেছে, ওরা আছে। সুযোগের আর সময়ের প্রতীক্ষায় আছে।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিরাণী হঠাৎ আশা করতে শুরু করলেন। কাল আশা করার শক্তি ছিল না, বোধ ছিল না।...কাল সম্ভব হয়নি বলে কেউ তাঁদের উদ্ধার করতে আসেনি, কিন্তু আজ নিশ্চয় আসবে। যদিও জানলার ফাঁক দিয়ে দেখছেন, আসা অসম্ভব, তবু ভাবতে চেষ্টা করেছেন আসবে, কেউ আসবেই। দুপুর পর্যন্ত ছেলেকে চুপি চুপি সান্ত্বনা দিয়েছেন, এলো বলে কেউ।

...একজনই আসতে পারেন। এই দিনে শুধু একজনকেই মনে পড়ছিল জ্যোতিরাণীর। মামাশ্বশুর গৌরবিমল। কেন শুধু তাঁর কথাই মনে হয়েছে জানেন না। শুধু মনে হয়েছে, আসবেনই। কলকাতায় থেকে থাকলে এত বড় বিপদে প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে একমাত্র তিনিই আসতে পারেন।

পাগলের মত কান পেতে শিবেশ্বর যখন মৃত্যুর পায়ের আওয়াজ শুণছেন,

জ্যোতিরাণী তখন সেই আশার পদক্ষেপ শোনার জন্য কান পেতে আছেন।

আশায় আশায় বেলা চারটে বাজল। জ্যোতিরাণী কি এবার আশা ছাড়বেন? গৌরবিমল কি কলকাতায় নেই তাহলে?

বাড়ির সামনে একটা ট্রাক থামার আওয়াজ এলো। তারপর ঘন ঘন দরজায় ধাক্কা পড়তে লাগল, শিবেশ্বরের নাম ধরে ডাকাডাকি করছে কারা।

আশা! জীবনের আশা! শিবেশ্বরই দৌড়ে গিয়ে দরজা খুললেন। জ্যোতিরাণীও ছুটে এলেন।

বন্দুক হাতে জনাকয়েক পুলিসের লোক। তাদের সঙ্গে বিভাস দত্ত। এক মুহূর্ত দেরি না করে বেরিয়ে আসার জন্য তাড়া দিচ্ছেন তিনি।

ভাবার অবকাশ নেই। পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই তাঁদের নিয়ে ট্রাক মৃত্যুর ওপর দিয়ে জীবনের পথে চলল।

বিভাস দত্তর বাড়িতে তিন দিন ছিলেন তাঁরা। এর আগে নড়া সম্ভব হয়নি। চেষ্টাও কেউ করেনি। শুনেছেন, চব্বিশ ঘণ্টার চেষ্টায় এক বিশেষ ভক্ত পাঠকের পুলিস-অফিসার বাপকে ধরে ওই ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন বিভাস দত্ত। কিন্তু কি করছেন বা কতটা করেছেন, সেটা কারো অনুভব করারও শক্তি ছিল না তখন। জ্যোতিরাণীরও না। পরে অনুভব করেছেন।

...সেই শুরু থেকে জ্যোতিরাণী অনেক অনেকরকমভাবে কৃতজ্ঞ বিভাস দত্তর কাছে।

কিন্তু কৃতজ্ঞতা তো গোপনতার দোসর নয়। বিভাস দত্ত অমন প্রাণের ঝুঁকিও নিয়েছিলেন কেন, তাও তলিয়ে ভাবতে যাননি তিনি। সে চিন্তা বরং এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু সে যা-ই হোক, তাঁর সঙ্গে নিজের নিভৃতের প্রশ্রয় এভাবে যুক্ত হল কেমন করে? এ কি শুধু কৃতজ্ঞতা?

কৃতজ্ঞ রমণীর হৃদয়ের প্রসাদ আর প্রসন্নতা শুধু?

নিজের ব্যাধিতেই হাত দিতে পেরেছেন জ্যোতিরাণী। জ্বালা করছে। করুক। দুরারোগ্য ব্যাধিরও সঠিক হদিস পেলে আশা জাগে।

ভোর হল। জানলা দিয়ে পুবের আকাশ দেখা যাচ্ছে। ওদিকটায় যেন শুচিস্নান চলেছে। স্বাধীনতার প্রথম সকাল।

কোথায় বুঝি কে আবার গমগম শব্দে রেকর্ড চালিয়ে দিল। টানা স্তোত্রের মত লাগছে শুনতে।

কান পাততে গিয়ে জ্যোতিরাণীর মনে পড়ল কিছু। সঙ্গে সঙ্গে শয্যায় উঠে বসলেন তিনি।...রোজ, কাক-ডাকা ভোরে বাবা একটা স্তোত্র পাঠ করতেন। কান

পেতে শুনতেন তাঁরা। অদ্ভুত লাগত শুনতে। সেটা বাবার লেখা কি কার, আজও জানেন না। শুনে শুনে কদিনের চেষ্টায় জ্যোতিরাণী সেটা গানের খাতায় লিখে রেখেছিলেন।

খাতাটা কোথায়?

উঠলেন। ট্রাঙ্ক খুললেন। ট্রাঙ্কের তলা থেকে বেরুল। সেখানেই বসে পড়ে সাগ্রহে পাতা ওলটালেন।

"......জগতের প্রভু আলো পাঠিয়েছে। তোমরা এসো, এই-আলোয় বুক ভরে নাও। সমস্ত সত্তা ভরে এই আলো পান করো। এই আলোয় সকলে মিলে আর একবার অন্তরের জগৎ সৃষ্টি করো। যে যেখানে আছ, এসো। আনন্দে বেরিয়ে এসো। আলো থেকে এসো, অন্ধকার থেকে এসো, গৃহ থেকে এসো, গুহা-কন্দর থেকে এসো। বাবারা এসো মায়েরা এসো, যত ভাইয়েরা এসো বোনেরা এসো। হে সুখীজন তোমরা এসো। হে বেদনাহত তোমরা এসো। হে শক্তিমান তোমরা এসো। হে পদানত তোমরা এসো। হে ভোগশ্রান্ত তোমরা এসো। হে কর্মক্লান্ত তোমরা এসো। হে জীবনতাড়িত তোমরা এসো। হে মরণপীড়িত তোমরা এসো। জগতের প্রভু আলো পাঠিয়েছে।......"

জ্যোতিরাণীর বুকের ভিতরটা হাল্‌কা লাগছে। চোখের কোণে জল চিকচিক করছে।

টেলিফোন বেজে চলেছে।

ঘোরানো বারান্দার ওধার থেকে মায়ের ঘরে উঁকিঝুঁকি দেবার মতলবে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছিল সিতু। সকালে ঘুম থেকে উঠে ছোটদাদুকে দেখতে না পেয়ে ঘাবড়েছে একটু। ছোটদাদুর এভাবে পালানো নতুন নয়। থাকবে কথা দিয়েও তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ঘুম পাড়িয়ে সকাল হতে না হতে দিব্যি সরে পড়ে। রাত থাকতে ওঠে যে, সিতু তার নাগাল পাবে কি করে। যত সকাল সকালই উঠুক সে, ঘড়িতে সাতটা বেজে যাবেই।

মোট কথা পুজো-আর্চা করে বটে ছোটদাদু, কিন্তু এই কারণে মনে মনে ও তাকে খুব সত্যবাদী ভাবে না। পরে আবার এলে মিথ্যের খোঁচা দিতে ছাড়ে না। ছোটদাদু হাসে, বলে, মিথ্যে বলতে যাব কেন, চোখ থাকলে দেখতে

পেত্তিস আমি কোথাও যাই নি, সব সময় তোর সঙ্গে আছি।

এও বিশ্বাস করে না। তবু আগে আগে একটু সংশয়ের মত দেখা দিত। ছোটদাদু পাহাড়ে ঘোরে, সাধু-টাধুদের কাছেও থাকে অনেক সময়। তাদের তো কত ক্ষমতা। ছোটদাদুরও সেই ক্ষমতা একটু-আধটু হয়েছে কিনা কে জানে। কিন্তু জ্ঞান-বুদ্ধি আর একটু পাকতে সে সংশয় গেছে। ছোটদাদুর কথা সত্যি কিনা নিজে অনেকবার যাচাই করেছে। একলা ঘরে শূন্যের দিকে চেয়ে অনেক দিন বলেছে, আমার সঙ্গে কথা বল তো একবার, ডাক তো আমাকে—দেখি কেমন সব সময় কাছে থাক তুমি।

ছোটদাদু ডাকেও নি, কথাও বলে নি। একদিন শুধু মায়ের কথা শোনা গেছল। সিতু চোখ বুজে মন দিয়ে ডাকছিল ছোটদাদুকে, মা কখন এসেছে টের পায় নি। মায়ের গলা শুনে অপ্রস্তুত।

ওকি! কার সঙ্গে কথা বলিস?

লজ্জা পেয়ে সিতু পালিয়েছে। বললেই তো মা বোকা ভাববে তাকে। সেটা আদৌ পছন্দ নয়। পরে হি-হি করে হেসেছে, মা বড় বড় চোখ করে চেয়ে ছিল তার দিকে, ছেলেটা পাগল হয়ে গেল কিনা ভয় ধরেছিল বোধ হয়। তারপরেই ছোটদাদুর ওপর রাগ, মিথ্যেবাদী! মিথ্যে কথার জাহাজ একখানা, কাছে থাকে না হাতী—তুমি কি ভগবান যে কাছে থাকলেও দেখতে পাব না—তুমি বরং একটা ভূত—

সমুচিত বিশেষণ প্রয়োগ করতে পেরে নিজেই হেসে সারা আবার।

যাই হোক, সেই কাল থেকে মায়ের মতিগতি দেখে এ যাত্রায় ছোটদাদুর কথা দেওয়ার ওপর একটুও নির্ভর করে নি সে। পালালে কতটা বিপদ তা ছোটদাদুর একটুও মাথায় ঢুকেছে বলে মনে হয়নি তার। অতএব তার ঘুমের ফাঁকে পালাতে যাতে না পারে, মাথা খাটিয়ে সেই গোছের ছোটখাটো একটা ব্যবস্থা করে রেখে তবেই সে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুতে পেরেছিল। ছোটদাদু বিদ্যেসাগরী চটি পরে। রাতে শোবার আগে তারই এক পাটি ঠাকুমার ঘরে লুকিয়ে রেখে এসেছিল। সে বার করে না দিলে কেউ খুঁজে পাবে এমন সাধ্যি নেই। সকালে আবার জায়গারটা জায়গায় রেখে দিলেই হবে। কেউ টেরও পাবে না। ছোটদাদু পালাতে চাইলেই শুধু টের পাবে, নইলে বাড়িতে তার খালি পায়ে ঘোরাই অভ্যাস।

খুব ভোরে উঠবে প্রতিজ্ঞা করে শুয়েছিল। উঠে দেখে সেই সাতটা। ছোটদাদু নি-পাত্তা। সেই সঙ্গে কালী জেঠুও। দৌড়ে আগে ঠাকুমার ঘরে গিয়ে এক পাটি জুতোর খোঁজ করেছে। সেটা যথাস্থানে আছে দেখে একটু স্বস্তিবোধ করে—

ছিল। কিন্তু ঠাকুমার চোখ আড়াল করে সেটা যথাস্থানে রাখতে এসে হতভম্ব। অন্য পাটি নেই সেখানে। জুতোর খোঁজ পড়ে নি এবং ছোটদাদু ধারে-কাছেই কোথাও আছে ভেবেছিল। ব্যাপারটা কেমন গোলমেলে ঠেকল তার।

সদা বাজারে গেছে, অতএব মেঘনাকেই জিজ্ঞাসা করল ছোটদাদু কোথায়। মুচকি হেসে মেঘনা বলেছে, ওই মায়ের ঘরে গিয়ে খোঁজ করগে যাও, মজা টের পাবে।

মেঘনাকে দুচক্ষে দেখতে পারে না সিতু। কথা শুনলে গলা টিপে ধরতে ইচ্ছে করে। কিন্তু আপাতত সমস্যাটাই প্রবল। মেঘনার উদ্দেশে মুখ ভেঙচানোটাও জমল না ভাল করে। ছোটদাদুর যাওয়ার খুব দরকার ছিল কিনা কে জানে, জুতোর খোঁজে একপ্রস্থ হৈ-চৈ হয়ে গেছে হয়ত। মেঘনার বচন শুনে সেই রকমই মনে হল। কোন একটা কাজ যদি নিঃশব্দে করে সারা যেত। যাতে সে হাত দেবে একটা না একটা গণ্ডগোল হবেই হবে। আর সিতুর মেজাজ সব থেকে বেশী বিগড়োয় গণ্ডগোলটা মায়ের কানে উঠলে।...তাই হয়েছে বোধ হয়, নইলে মেঘনা এ কথা বলবে কেন।

কিন্তু ছোটদাদুকে তা বলে মায়ের ঘরে কখনও ঢুকতে দেখেছে বলে তো মনে পড়ে না। দরকার পড়লে কালী জেঠু বরং আসে। কিন্তু মেঘনা হতচ্ছাড়ী মজা টের পাওয়ার জন্য মায়ের ঘরে যেতে বলল কেন? সন্তর্পণে মায়ের ঘরের দিকেই পা বাড়িয়েছিল সে।

টেলিফোন বাজছে। বাজছেই...।

ঘরে কেউ থাকলে টেলিফোন ধরত। সাহস করে আরো একটু এগনো গেল। মা নেই, কেউ নেই। খালি ঘরে টেলিফোন বাজছে। কান খাড়া করে সিতু এক মুহূর্ত শুনে নিল। ওধারের বন্ধ কলঘরে তোড়ে জল পড়ার আওয়াজ। মা সচরাচর অত সকালে চান করে না। কিন্তু চানে একবার ঢুকলে চট করে বেরোয়ও না। নিশ্চিন্ত।

বুক টান করে সিতু টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিল।—হ্যালো!

ওধারে মিত্রা মাসি। মায়ের খোঁজ করল। চানে গেছে শুনে কোথাও বেরুবে কিনা জিজ্ঞাসা করল। সিতু জানে না। মিত্রা মাসি বলল, কালী জেঠুর ঘরে ফোন করে তাকেও পায় নি। সিতু ঠোঁট উল্টে জবাব দিয়েছে, ঘরে নেই তো পাবে কি করে, সকাল হতে না হতে ছোটদাদুকে নিয়ে হাওয়া।

মিত্রা মাসি কাজের কথা বলতে চেষ্টা করেছে এর পর।—শোন্, আমি একটু কাজে কলকাতার বাইরে চলে যাচ্ছি এক্ষুনি, আজ না-ও ফিরতে পারি, মা-কে

বলিস—

মায়ের সঙ্গে আমার দেখা হবে না।

সে কি রে, তুই যাচ্ছিস কোথায়?

কোথাও না। মা আমাকে হাতের কাছে পেলেই স্রেফ খুন করবে। তাই দেখা হবে না।

ওধার থেকে মিত্রা মাসি হেসে সারা। আর এধার থেকে তার উদ্দেশে সিতুর বারকয়েক জিব ভেঙচানো সারা। ও মার খাবে তাই শুনেও হাসি!

ওধারের হাসি থামতে সকৌতুক প্রশ্ন কানে এলো, খুন করবে কেন? তুই কি করেছিলি যে একেবারে খুনই করতে হবে?

এ প্রসঙ্গ মন্দ লাগল না সিতুর। নিজের এত বড় দুঃসাহসের কাজটাও গোপন করার মত নয়। মিত্রা মাসির রসজ্ঞান আছে। কৃতিত্বের কথা শুনলে খুশি হবে। বলল, কাল রাতে বিভাসকাকু মাকে কি পড়ে শোনাচ্ছিল তো—একধার থেকে কি সব অন্ধকারের কথা পড়ছিল খালি—তাই মেন টেনে দিয়ে দিলুম গোটা একতলা ঘুটঘুট্টি অন্ধকার করে।

প্রথমে বিস্ময় আর পরে হাসি শুনেই বোঝা গেল, শুনে মিত্রা মাসি কত মজা পেয়েছে। কি ডাকাত ছেলে রে তুই! আলোগুলো সব একেবারে নিবিয়ে দিয়ে বসলি! তারপর, তোর মা কি করল?

সিতু এধার থেকে ঠোঁট ওলটালো, এরকমই বুদ্ধি বটে মেয়েদের! জবাব দিল, মা কি করল দেখার জন্যে আমি কি সেখানে বসে ছিলাম নাকি—আমি তো ততক্ষণে ঠাকুমার বিছানায়।...তারপর থেকেই তো মা আমাকে ধরার তালে আছে, ছোটদাদু এসে গেল তাই রক্ষে—

গৌরবিমলবাবু?

হ্যাঁ—

মিত্রা মাসির সঙ্গে কথার ফেরে পড়ে সিতুর আর একটা দিক ভুল হয়ে গেছে। যে বিপদের কথা বলছিল সেই বিপদের দিকটাই। ওপাশের কলঘরে জলের শব্দ কখন বন্ধ হয়ে গেছে টের পায়নি। বন্ধ দরজা কখন খুলেছে তাও না।

ষষ্ঠ চেতনার ক্রিয়া কিনা বলা যায় না, মিত্রা মাসির কথার জবাব দিতে দিতে একবার পিছন ফিরে তাকিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে বিষম ধাক্কা। পিছনে মা দাঁড়িয়ে।...হাত পাঁচেকের মধ্যেই। মায়ের পিছনে বেরুবার দরজা, পালাবার রাস্তাও নেই। মা নিঃশব্দে তার দিকেই চেয়ে আছে।

এমন বিপাকের সম্ভাবনা কে ভেবেছিল?

ছেলে মনে মনে প্রমাদ গুনছে আর প্রতীক্ষা করছে আর মাঝে মাঝে চোখ তুলে মাকে দেখছে।

কিন্তু তার আশঙ্কা গোটাগুটি ঠিক নয়। জ্যোতিরাণী সরে এসে ছেলের পিছনে দাঁড়িয়েছেন। মিত্রাদির সঙ্গে ছেলের একটু আগের সরস আলাপ শোনেন নি। কিছুই কানে যায় নি তাঁর। স্নানঘর থেকে বেরিয়ে ছেলের কানে টেলিফোনটাই শুধু লক্ষ্য করেছেন তিনি।

এরই মধ্যে মা স্নান সেরে বেরুতে পারে সিতু আশা করে নি। কিন্তু জ্যোতি-রাণী সত্যিই তাড়াতাড়ি বেরোন নি। বরং অনেক বেশী সময় নিয়ে চান করেছেন আজ। কলঘরে গিয়ে ঢুকেছিলেন প্রায় ঘণ্টা দুই আগে।

অন্ধকার থাকতে শয্যা ছেড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন। আকাশের শুচিস্নান দেখছিলেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। কতক্ষণ ধরে দেখেছেন জানেন না। পূবগগনের প্রথম রৌদ্র তাঁর মুখে এসে লেগেছে। ওদিকে কোথায় নতুন দিনের অভ্যর্থনায় বেতারবন্দনা শোনা যাচ্ছিল।

অদ্ভুত একটা শান্তি অনুভব করছিলেন তিনি। সামনের সমস্ত প্রকৃতি বুঝি শান্তির আসন বিছিয়ে বসেছে। বাবার সেই স্তবের রেশ, উদাত্ত প্রসন্ন আহ্বানের রেশ যেন বুকের তলায় আনাগোনা করছিল তখনও। একটু চেষ্টা করলে জ্যোতিরাণী বাবার সেই বিস্মৃত কণ্ঠও শুনতে পেতেন বোধ করি।

তখনি স্নানের কথা মনে হয়েছে। স্নান করা দরকার।

প্রায় দু ঘণ্টা ধরেই চান করেছেন। সব গ্লানি ধুয়ে-মুছে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছেন। যত জানা গ্লানি, যত অগোচরের গ্লানি—সব। আকাশ থেকে যেভাবে অন্ধকার সরে যেতে দেখেছেন, ঠিক সেই রকম করে। সরে যাচ্ছিলও। যত চান করছিলেন বাবার বিদেহী কণ্ঠের সেই স্তব তত বুঝি পুষ্ট হয়ে উঠছিল, স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। আজ কত জল যে ঢেলেছেন জ্যোতিরাণী জানেন না।

ভেজা চুল, ভেজা মুখ, ভেজা চোখের পাতা। অত জল ঢালার দরুন কালো চোখের চার ধারে সাদা বলে কিছু নেই। চান করে এলে এমনিতেই তাঁর চোখ লাল হয়। কিন্তু তাঁর আজকের এই স্নানার্দ্র মুখখানা নিজে তিনি আয়নায় দেখেন নি।

চুপচাপ মুখের দিকে চেয়ে মাকে একভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভয় সত্ত্বেও সিতুর সেটা চোখে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ভয় একটু কমেছে তার। ফলে সাহস করে আরো একটু ভালো করে লক্ষ্য করতে পেরেছে। মাকে যেন আজ একটু অন্য রকম লাগছে, মায়ের কি এক বিশেষ রূপ যেন চোখে পড়ছে। ভিতরের আশঙ্কা সত্ত্বেও যা তার ভালো লাগছে। ভয় নেই আশ্বাস পেলে এই মাকে যেন

দুহাতে জড়িয়ে ধরতেও পারে সে।

অতটা ভরসা পেল না। ভরসা করে অস্বস্তিকর নীরবতা ভঙ্গ করল শুধু।—মিত্রা মাসির ফোন, কি কাজে কলকাতার বাইরে যাচ্ছে, তোমাকে জানাতে বলল—

জ্যোতিরাণীর মুখে কথা নেই। চুপচাপ চেয়েই আছেন।

সিতু ঘাবড়ে গেল আবার একটু। ভা'লো লাগছে অথচ ভয়ও করছে। মা যেন ওই দুটো চোখ দিয়েই তাকে ধরে রেখেছে। পালাবার ফাঁক থাকলেও পালাতে পারত কিনা সন্দেহ।···দোষ তো আর একটা নয়, গালার গুলীর কৌটো দেখিয়ে ঠাকুমা-বুড়ীকে ঠকিয়ে পয়সা আদায়ের চেষ্টা, রাতে আলো নেভানো, ছোটদাদুর জুতো লুকানো, তারপর এখন আবার মিত্রা মাসিকে টেলিফোনে এইসব বলা।···মা এভাবে চেয়ে আছে কেন, মনের সাধে আজ কত ঠেঙ্গাবে ধরে তাই ভাবছে নাকি! সেরকম ভাবতে ইচ্ছে করে না, তবু ভয় যায় না।

অতএব আত্মরক্ষার তাগিদে দ্বিতীয় চেষ্টা করল ছেলে।—আজকের দিনে কাউকে মারতে হয় না, ছোটদাদু বলেছে—

জ্যোতিরাণী সেই থেকে ছেলের দিকে চেয়ে ছিলেন বটে, তাঁর মনে বিরূপতার আর লেশমাত্রও ছিল না। মারধর করার কথা একবারও ভাবেননি তিনি, বরং এই দুরন্ত ছেলেও তাঁর কিছু উপকারই করেছে মনে হচ্ছিল। কি উপকার সেটাই স্পষ্ট অনুভূতির গোচর করে তুলতে চেষ্টা করছিলেন।

শেষের কথা কানে যেতে সে চেষ্টায় ছেদ পড়ল। ছেলের বিপন্ন মূর্তিটাই এতক্ষণে ভালো করে চোখে পড়তে কৌতুক বোধ করলেন। মুখ গম্ভীর।

আজ কি?

······স্বাধীনতার দিন। আজ কারো গায়ে হাত তুলতে হয় না।

হাসি চাপা সহজ হচ্ছিল না আর। হেসেই ফেলতেন। কিন্তু তার আগেই পিছন ফিরে তাকাতে হল। ছদ্ম রোষে চটি ফটাফট করতে করতে কালীনাথ ঘরে ঢুকছেন। এসেই এক হাতে সিতুর ক্ষুদ্র বাহু আর অন্য হাতে তার কান চড়াও করলেন। তোর—স্বাধীনতা বার করছি, কান দুটো আজ একেবারে ছিঁড়ে নিয়ে তবে কথা—

আর খানিক আগে, মাকে একেবারে মুখোমুখি দেখে সিতু যখন প্রমাদ গনছিল—তখন যদি কালী জেঠু এভাবে এসে তার কানের ওপর হামলা করত আর মায়ের সমুখ থেকে তাকে টেনে নিয়ে যেত—সিতু সেটা এক বাঞ্ছিত ত্রাণ-কার্য বলে ধরে নিত। কিন্তু কেন যেন এই মুহূর্তে তাঁর আবির্ভাব একটুও ভালো লাগল না। হঠাৎই তার মনে হয়েছিল মায়ের এই চাউনি নির্দয় নয় খুব। আর একটু থেকে

দেখা যেতে পারত মা কি করে। তার শেষের কথায় মায়ের ঠোঁটের ফাঁকে আর চোখের কোণে একটু বুঝি সদয় কৌতুকের আভাস দেখেছিল সে। কিন্তু বরাতই মন্দ সিতুর। সব আশাতেই ছাই।

কান আর বাহু ধরে কালীনাথ হিড়হিড় করে তাকে দরজা পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন একবার। বিচার কেমন চলছিল আঁচ করার উদ্দেশ্যেই বোধ হয়। শিকার ছোঁ-মেরে তুলে নিয়ে যাওয়ার প্রতিক্রিয়া দেখার জন্যেও হতে পারে। ছেলেটাকে পাছে মারধর করে সেই ভয়ে গৌরবিমলই পাঠিয়েছেন তাঁকে। কিন্তু জ্যোতিরাণীর মুখের দিকে চেয়ে কালীনাথও কেন যে থমকালেন একটু জানেন না। পরিস্থিতি নির্মম কোনো বিচারানুষ্ঠানের মত মনে হল না তাঁর। বিচার পণ্ড হওয়ার ফলে সেই চিরাচরিত কঠিন অসহিষ্ণুতাও কিছু দেখলেন না।

ফলে এই নাটকীয় আবির্ভাবের দরুন কালীনাথ নিজেই অপ্রস্তুত একটু। রক্ষক তাই ভক্ষকের ভূমিকা নিলেন। তর্জনের স্বরে বলে উঠলেন, পাজী কি করেছে জানো? সকালে উঠে দাদু পাছে চলে যায় সেজন্যে রাত্রিতেই তার এক পাটি চটি লুকিয়ে রেখেছে। সকালে উঠে বাজারে বেরুব দুজনে—এক পাটি চটি নেই। সকলে মিলে খুঁজেও পাওয়া গেল না, শেষে আমার স্যাণ্ডেল পায়ে গলিয়েই বেরুতে হল ভদ্রলোককে। কান ছেড়ে দিয়ে তিনি সিতুর মাথাটা ধরে ঝাঁকালেন একপ্রস্থ। —মাথায় কেবল শয়তানী গিসগিস করছে, চলো, আজ ভালো হাতে হবে।

আসামী বগল-দাবা করে প্রস্থান করলেন তিনি। বাইরে বেরিয়েও নিজের অগোচরে চোখ দুটো তাঁর আর একবার ওই ঘরের দিকে ফিরল শুধু।

জ্যোতিরাণী চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন একটু। কাল রাত থেকেই এক আমূল পরিবর্তনের মুখে নিজেকে ফেরাতে চেষ্টা করছেন তিনি। কিন্তু ফেরানো অত সহজ নয় বোধ করি। স্বভাবের বড় অবুঝ রীতি। বাড়ির নৈমিত্তিক হাওয়া গায়ে লাগতে না লাগতে সঙ্কল্পের শিকড়গুলো সব ঢিলেঢালা হয়ে পড়তে চায়।......দিনকে দিন শাসনের বাইরে চলে যাচ্ছে ছেলেটা, সেটা এদের কারো কাছেই কোন রকম সমস্যা নয়। সমস্যা যেন উল্টে তিনিই সৃষ্টি করছেন। ভুলিয়ে-ভালিয়ে তাঁকে ঠাণ্ডা রাখতে পারলেই শান্তি যেন।

তবু, মনে আজ কোনরকম বিরূপতার আঁচড় পড়তে দেবেন না জ্যোতিরাণী। ছেলে উপলক্ষ শুধু।......আসল ব্যাধিতে হাত দিতে চেষ্টা করেছেন তিনি। করছেন। তাই করবেন।

ছেলের চকিত-ত্রস্ত বিপন্ন মুখখানা মনে পড়তে হঠাৎ হাসিই পেল তাঁর। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তোয়ালে দিয়ে ভিজে চুলের বোঝার জল ছাড়াতে ছাড়াতে

নিজের মনেই হাসতে লাগলেন। সকালের আর এতক্ষণ ধরে স্নানের প্রসন্ন অনুভূতির মধ্যেই ফিরে এলেন আবার। বাইরে রাস্তার দিক থেকে একটা অস্পষ্ট কোলাহল কানে আসছে। ঘর ছেড়ে সব বেরুতে শুরু করেছে বোধ হয়।

……এই দিন, এই দিনের এই সকাল অন্য সব দিন বা অন্য সব দিনের সকালের মত নয়। এই দিন, এই সকাল আসবে বলে দু'শ বছর ধরে কত কাণ্ড হয়ে গেছে।

বউদিমণি, মামাবাবু আর কালীদাদাবাবু চায়ের টেবিলে বসে আছেন যে গো, মা খপর দিতে বললেন—

জ্যোতিরাণী ফেরেননি, আয়নায় মেঘনার মুখ দেখতে পাচ্ছেন। সকালের চায়ের পর্ব তাঁর হাত দিয়েই সমাধা হয়ে থাকে। বাড়িতে আত্মীয়-পরিজন এলেও বাড়তি দায়িত্বটুকু তাঁরই।

বল গে এক্ষুনি আসছি—

মাথা আঁচড়ে নিলেন। অল্প প্রসাধনও সেরে নিলেন। তারপর থমকালেন একটু। ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার খুলে রূপোর সিঁদুরের কৌটো হাতে নিলেন। সিঁদুরের টিপ পরলেন। বিন্দুর মত টিপ নয়, তার থেকে বড়ই হয়ে গেল টিপটা। সিঁথিতে সিঁদুরের আঁচড় ফেলতেই আয়নার উপরে দৃষ্টিটা হোঁচট খেল আবার।

মেঘনা চলে যায়নি, দরজার ওধার থেকে গলা বাড়িয়ে বেশ মন দিয়ে দেখছে তাকে। আয়নার ভিতর দিয়ে চোখাচোখি হতে মাথাটা সরে গেল। জ্যোতিরাণী ডেকেই বসলেন তাকে।—এই মেঘনা, শোন্ তো!

না ডাকলেই ছিল ভালো। মেঘনার জিভে লাগাম নেই।

কি দেখছিলি?

লজ্জা পেয়ে মেঘনা হেলে-দুলে আত্মপ্রকাশ করেছে আবার। তোমাকে গো বউদিমণি, জলে-ধোয়া টাটকা জুঁই ফুলটির মত দেখতে লাগছে মুখখানা। এরই মধ্যে চান সারলে আজ?

বেশ করলাম। মেঘনার চাউনি দেখে মনে হল সিঁদুর টিপেরও একটা মানান-সই উপমা হাতড়ে বেড়াচ্ছে। ধমকের সুরে বললেন, তোর কাজ আছে কিছু না সকাল থেকে কেবল মুখ দেখেই বেড়াচ্ছিস? ঘুরে না বেড়িয়ে সদাকে একটু সাহায্য করলেও তো পারিস, বেচারার বয়েস হয়েছে কত দিক সামলাবে।

মোক্ষম অস্ত্র। মেঘনার মেজাজের ছিলেয় এবারে টান পড়বে জানা কথাই। অবিচারের কথা শুনে গোল গোল দুই চক্ষু স্থির প্রথম। তারপরেই জিভের ডগা খনখন করে উঠল।—এই দেখো, আমি বলে সেই আঁধার থাকতে উঠে দাঁতে কুটো দিয়ে খেটে মরছি, সে জায়গায় তোমার আদরের লোক একবার বাজার ঘুরে এসেই

নেতিয়ে পড়ল—আর আমি কিনা গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি! একেই বলে—

কি বলে শোনার জন্য জ্যোতিরাণী আর সেখানে দাঁড়িয়ে নেই। ঠোঁটের ফাঁকে হাসি চেপে প্রস্থান করেছেন। সদার ওপর এর শোধ নিতে না পারা পর্যন্ত মেঘনার এই মেজাজ ঠাণ্ডা হবে না।

এ সংসারে এরকম একটা ঝক্‌ঝকে দিন আর কি কখনো দেখেছেন জ্যোতিরাণী?

চায়ের টেবিলে সিতু তার ছোটদাতুর ওপর চড়াও হয়েছে। গতরাতে কোনো একটা গল্প শুরু করেছিলেন বোধ হয়, এক্ষুনি সেটা শেষ করতে হবে। গল্পটা মগজে গেঁথে নিয়ে বন্ধুদের আবার সেটা শুনিয়ে তাক লাগিয়ে দিতে হবে। চালবাজ ছলুর মুখ ভোঁতা হবে। ফরাসী দেশে ওর কাকার স্বচক্ষে দেখা রক্তনদীর গল্প সে-ই করেছিল। কিন্তু ঠাকুমাবুড়ীর কিছু যদি জ্ঞানগম্যি থাকত, সাতসকালে এসে বসেছে গজর গজর করতে। কালীনাথের চোখের সামনে সেদিনের মোটা কলেবরের খবরের কাগজ।

হাতের কাছে সরঞ্জাম গুছিয়ে সদা অপেক্ষা করছিল। তাড়াতাড়ি খাবার সাজিয়ে তার হাতে দিয়ে জ্যোতিরাণী চা করতে লাগলেন। মামাশ্বশুরের হাসিমাখা দৃষ্টিটা বার দুই তাঁর মুখের ওপর ঘুরে গেল টের পেলেন। খবরের কাগজ পাঠরত কালীনাথের দুই চোখও একবার এদিকে ফিরেছে। চা করতে করতে জ্যোতিরাণীর চোখোচোখি হয়েছে ছেলের সঙ্গে। ভুরু দুটো কুঁচকে দিলেন একবার।

ছেলের চোখে এও প্রায় নতুনই ঠেকল।

এদিকের গল্পের ছেদ পড়তে শাশুড়ীও এবার বউয়ের দিকে মুখ ফেরালেন।—তোমার ছেলের কাণ্ড শুনেছ? হারামজাদা আমার শোবার ঘরে দাতুর এক পাটি জুতো লুকিয়ে রেখেছে—ছোঁয়াছানির কিছু কি আর বাকি আছে! ঘরময় গঙ্গাজল ছিটোতে হবে এখন—কি দস্যি কি দস্যি। আর এক পাটি জুতো সরিয়ে রেখে সদাও আবার ওকে খুব জব্দ করেছে। পাজী সেই রাগে সদাকে ধরে মারে আর কি—

শাশুড়ীর এইরকমই স্বভাব। খুঁটিনাটি সব দোষই বলা চাই, বেগতিক দেখলে আবার পাঁচ হাতে আগলে রাখাও চাই। দাতুর নিরাপদ আওতায় বসে সিতু বিড়বিড় করে উঠল, একটা কাগজে লেখো সব—লিখে রাজ্যসুদ্ধু লোককে শুনিয়ে এসো—তোমার ঘরে মালা ঘোরাওগে যাও না, গল্পটা শুনতে দেবে না?

কালীনাথ একটা দাবড়ি দেবার জন্যেই মুখ তুলেছিলেন বোধ হয়। তার আগে [illegible] সিতুর চুলের মুঠি ধরে মাথাটা ঝাঁকিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দুজনেই

হেসে উঠলেন তাঁরা। জ্যোতিরাণীর চোখের অনুযোগ চোখেই থেকে গেল। তাঁদের চোখে চোখ পড়তে তিনিও না হেসে পারলেন না। ঠাকুমা ছদ্মকোপে বিগলিত, দেখলি, হারামজাদা সব সময় ওইরকম করে কথা বলে আমার সঙ্গে।

নাতির উদ্দেশে ওই সম্ভাষণ শুনলেও মনে মনে বিরূপ হন জ্যোতিরাণী। কিন্তু আজ গায়ে মাখলেন না। আজ সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা দিন। বাইরের রাস্তায় বহু লোকের কলকণ্ঠ ক্রমে জোরদার হচ্ছে।

জ্যোতিরাণী নিজেই সামনের পেয়ালায় চা ঢেলে ঢেলে দিলেন। শাশুড়ী উঠে গেলেন স্নান সারতে। নিজের জন্য শুধু এক পেয়ালা চা নিয়ে জ্যোতিরাণী ঠেস দিয়ে দাঁড়ালেন। গৌরবিমল তাঁকে বসতে বললেন হয়ত, কিন্তু সিতুর তাড়নায় তার দিকে ফিরতে হল। হাতে করে ছোটদাদুর মুখ নিজের দিকে ঘুরিয়ে সে অসহিষ্ণু তাগিদ দিল, গল্পটা তাড়াতাড়ি শেষ করো না—কাল রাতে সেই একটু বলেই থেমে গেলে—

হৃষ্টমুখে ছোটদাদু প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, কোন্ দেশের গল্প বলছিলাম বল্ আগে—

আয়ারল্যাণ্ডের।

কোন্ বছরের?

আজ থেকে একশ এক বছর আগের, আঠের শ···

আটচল্লিশ। আর স্বাধীনতার জন্য বিদ্রোহ যারা করেছিল সেই নটা লোকের নাম?

বলব? সিতুর চোখেমুখে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হবার উদ্দীপনা।—এই, একজন হল গিয়ে প্যাট্রিক ডনহাউ—

ডনহিউ। তারপর?

তারপর চার্লস ডাফি, টমাস—টমাস ম্যাকগী—জন মিচেল—কজন হল? চার? পাঁচ নম্বর হল গিয়ে ওদের দলপতি টমাস মীঘার—ছয় মাইকেল আয়ারল্যাণ্ড—সাত মরিস লাইয়েন—আট হল গিয়ে তোমার রিচার্ড রিচার্ড রিচার্ড ও'গোরম্যান—আর নয়···নয়···নয়···নয় ভুলে গেছি।

টেরেন্স ম্যাকমানাস—

কালীনাথের কাগজে মন ছিল না। নীরব গাম্ভীর্যে তিনি ক্ষুদ্রকায় সিতুকে দেখছিলেন। নটা নাম শেষ হতে হাত বাড়িয়ে তিনি তার মাথাটা ধরে গোটাকয়েক নাড়া দিলেন।—মাথায় কি আছে রে তোর অ্যাঁ? দুষ্টুমি ছাড়া মালকড়িও বেশ কিছু আছে দেখি! জ্যোতিরাণীর দিকে তাকালেন, ওর বাবার আর বেশিদিন

আমাকে দরকার হবে না, আর একটু বড় হলে আমার চাকরিটাই খাবে দেখছি ও ...রাতে শুনে নটার মধ্যে আটটা নাম মনে করে বসে আছে! আমি দুটোও বলতে পারতুম না।

এইমাত্র শুনেও জ্যোতিরাণী একটা নামও ফিরে বলতে পারবেন কিনা সন্দেহ। তাঁর স্বল্প হাসিমাখা দু চোখ ছেলের দিকে ফিরল। গল্পে ব্যাঘাত সিতুর পছন্দ নয়, নটার মধ্যে একটা নাম ভুলে গিয়েই নিজের ওপর বিরক্ত হয়েছিল, কোন্ তাগিদে যে মনে রাখতে হয় তার এরা কি জানে। দুলু অ্যাণ্ড কোম্পানীকে গল্পটা আরো জমাটি করে শোনাতে হবে তো। দুটো একটা নাম ভুল হয়ে গেলে ক্ষতি নেই অবশ্য, চোখ-কান বুজে নিজেই বানিয়ে বলে দেবে—কেউ ধরতেও পারবে না।

বলো, তারপর কি হল?

তারপর ধরা-পড়া সেই নজন আসামীর একসঙ্গে বিচার হতে লাগল। বিচারে ফাঁসি যে হবে জানা কথাই। বিদ্রোহের আত্মাটাকেই ধ্বংস করে না দিলে রাণীর রাজ্য নিরাপদ হবে না।

গল্পের শ্রোতা শুধু সিতুই নয়, গৌরবিমলের বলার ধরনে গম্ভীরগোছের একটু নাটকের ছোঁয়া লাগল।

—শেষ দিন। বিচারক দণ্ড ঘোষণা করবেন। কোর্টের বাইরে মানুষের সমুদ্র। তাদের মন অশান্ত, উত্তেজিত। পরাধীনতার শিকল ভাঙতে চেয়েছিল যে নজন দুর্ধর্ষ নেতা, তাদের দণ্ড ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতার শেষ আশার সূর্যটাই ডুবে যাবে বুঝি।

...হঠাৎ এত বড় জনতার মুখ শেলাই একেবারে। ওরা আসছে। কারাগার থেকে বার করে বিচারঘরের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাদের। এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয়—নটা আগুনের গোলা যেন। হাত বাঁধা, একটা লম্বা শেকলে সকলের কোমর বাঁধা—তাদের চারদিক থেকে বন্দুক আর সঙিন উঁচিয়ে আছে রাণীর সৈন্যরা।

আসামীরা ভিতরে চলে গেল। জনতার নিঃশ্বাস পড়ছে না। পারলে তারা ভিতরে ঢুকত। উপায় নেই। কিন্তু ভিতরের কথাবার্তা শোনার ব্যবস্থা আছে, তাই শ্বাস বন্ধ করে কান খাড়া করে আছে তারা।

বিচারক প্রস্তুত। গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বললে, তোমরা নজন রাজদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত। বিচারে তোমাদের অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে। কোর্ট দণ্ড ঘোষণা করার আগে তোমাদের কি কিছু বলার আছে?

বিদ্রোহীদের নেতা টমাস মীঘার উঠে দাঁড়াল। মীঘার জানে তার জবাব

শোনার জন্য বাইরের বিশাল জনতা কান পেতে আছে। বেশ স্পষ্ট করে বলল, ধর্মাবতার, এটা আমাদের শেষ অপরাধ নয়, প্রথম অপরাধ। হুজুর যদি এযাত্রা আমাদের ক্ষমা করে দেন, তাহলে ভদ্রলোকের মত আমরা কথা দিচ্ছি, পরের বারে আমাদের কাজ আরো একটু পাকাপোক্ত হবে—আর পরের বারে এরকম বোকার মত ধরা যাতে না পড়ি সেই ব্যবস্থাও নিশ্চয় করব।

বাইরের জনতা আনন্দে হৈ-হৈ করে উঠল। এদিকে রক্তবর্ণ বিচারক তক্ষুনি তাদের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করল।

এরপর কি শুনবে সেই আশঙ্কায় সিতু স্তব্ধ। জ্যোতিরাণীও উৎকর্ণ একটু। এইখানেই গল্পের শেষ কিনা বুঝতে পারছেন না। কালীনাথও আর কাগজ পড়ছেন না। বাইরের কলরব আরো বেড়েছে।

সকলের প্রতিক্রিয়া একনজরে লক্ষ্য করে গৌরবিমল বলতে লাগলেন, কিন্তু জনমতের চাপ ক্রমে এমনহয়ে উঠল যে, রাণী ভিক্টোরিয়া ভেবেচিন্তে শেষ পর্যন্ত ফাঁসি মকুব করে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের হুকুম দিলেন। অস্ট্রেলিয়ার বন-জঙ্গলের এক-একটা অস্বাস্থ্যকর দ্বীপে তাদের জীবন কাটুক।

...কিন্তু আসল ধাক্কাটা রাণী খেলেন এর ঠিক তেইশ বছর বাদে। একেবারে হাঁ তিনি।

আগের ঘটনা ভুলেই গেছেন। তেইশ বছর বাদে অস্ট্রেলিয়ার সদ্যনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে জরুরী আলোচনায় বসতে হবে তাঁকে। রাজ্যগত কিছু বোঝাপড়া হবে তাঁর সঙ্গে। সেই নব-নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর নাম চার্লস ডাফি।

চার্লস ডাফি! হঠাৎ যেন গরম শিসে ঢালা হল রাণীর কানে। কে চার্লস ডাফি?

শুনলেন সেই চার্লস ডাফি—সেই নজনের একজন, তেইশ বছর আগে যাদের ফাঁসি মকুব করেছিলেন তিনি।

রাণী স্তব্ধ। হঠাৎ কি মনে হল তাঁর। বাকি আটজন আসামীর রেকর্ড তলব করে পাঠালেন তিনি। তাদের কি হয়েছে?

কি হয়েছে দেখে রাণীর দুই চক্ষু স্থির। সেই আট আসামীর একজনও দ্বীপান্তর খাটার জন্য বসে ছিল না। তারা কে? পরের জীবনে তারা কারা? রাণী এ কি দেখছেন? প্যাট্রিক ডনহিউ আর টেরেন্স ম্যাকমানাস সংযুক্ত সমর বিভাগের দুই দুর্ধর্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারাল! ...টমাস ম্যাকগী কানাডা হাউস অফ কমন্সের একজন স্বনামধন্য সভ্য। নিউইয়র্কের যশস্বী রাজনীতিবিদ জন মিচেল। মনটানার

গভর্নর টমাস মীঘার। অস্ট্রেলিয়ার পর পর দুটি নামজাদা অ্যাটর্নি জেনারেল মরিস লাইয়েন আর মাইকেল আয়ারল্যাণ্ড। নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডের গভর্নর জেনারেল রিচার্ড ও'গোরম্যান। আর এই একজন···অস্ট্রেলিয়ার নয়া প্রধানমন্ত্রী চার্লস ডাফি—রাজকীয় সৌজন্যে রাণীকে যার সঙ্গে জরুরী বৈঠকে বসতে হবে।···তেইশ বছর আগে এই নটি মাথাই তিনি রক্ষা করেছিলেন বটে একদিন।

রাণী কি স্বপ্ন দেখছেন!

বিস্ময়ের ঘোর কাটতে দেখা গেল রাণী হাসছেন আপনমনে। তৃপ্তিতে সমস্ত মুখ ভরে গেছে তাঁর।···ঘাতককে ফাঁকি দিয়ে দুনিয়াকে কিছু দিতে পেরেছেন তিনি। মানবতার কিছু লাভ হয়েছে।

॥ সাত ॥

ছোটদাদুর গল্প বলা শেষ। বাইরের হুল্লোড়ও বেশ পুষ্ট হয়ে উঠেছে। হৈ-চৈ কানে আসছে। সিতুর আর এক মিনিটও এখানে বসে থাকার কথা নয়। দু মিনিট আগেও ভাবছিল, এত সব না বলে ছোটদাদু চট করে গল্পটা শেষ করলেই সে বাইরে ছুটতে পারে। কিন্তু শেষ হওয়ামাত্রই ছুটতে পারল না। দ্রষ্টব্য কিছু চোখে পড়ল।

তার মা। গল্পের এই শেষ শোনার জন্য সিতুও প্রস্তুত ছিল না বটে, কিন্তু মায়ের কি হল! দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, অথচ মনে হচ্ছে একটুও কাছে নেই। সকৌতুকে মা-কে দেখছে সে। কি রকম ফ্যালফ্যাল করে ছোটদাদুর দিকে চেয়ে আছে, মাথা থেকে শাড়ির আঁচলটা খসে পড়েছে, লালচে মুখ···লাল সিঁদুরের টিপটা টক্‌-টক্‌ করছে।

বাইরের আর এক প্রস্থ আনন্দ-রব কানে আসতে কৌতুকে ছেদ পড়ল। উঠে দুড়দাড় করে মায়ের পাশ ঘেঁষে বাইরের দিকে ছুটল সে।

জ্যোতিরাণীর চমক ভাঙল। লজ্জা পেয়ে হাসতে চেষ্টা করলেন। শাড়ির আঁচল মাথায় উঠল।

গম্ভীর মুখে কালীনাথ বলে উঠলেন, তুমি মামু একটি রাম পাষণ্ড।

অভিযোগের তাৎপর্য স্পষ্ট না হলেও হাল্‌কা সুরে গৌরবিমল বললেন, রাম আবার পাষণ্ড হল কবে।···তা কেন?

সকোপে কালীনাথ জবাব দিলেন, গল্প বলার নাম করে মানুষের ভেতর ধরে

নাড়াচাড়া করো কেন? আঙুলের ইঙ্গিত জ্যোতিরাণীর দিকে।—ওই দেখছ না? কেঁদেটেদে ফেললে খুব মজা লাগত দেখতে, না?

গৌরবিমল হেসে ওঠার আগেই জ্যোতিরাণী ঘর ছেড়ে প্রস্থান করলেন। তিনিও হেসেই ফেলেছিলেন। কালীদার এই রকমই কথা। ভাসুর যে সে জ্ঞান নেই। শুধু শাশুড়ী কাছে থাকলে তাঁর কথাবার্তা অন্যরকম।

কিন্তু যত হাল্‌কা করেই বলুন, কালীদার কথা হাওয়ায় ভাসে না। তাঁর বচন যেমন, চোখও তেমনি। এখনও মিথ্যে বলেন নি। জ্যোতিরাণী হাসতে পেরেছিলেন সত্যি, কেউ দেখলে এখনো ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাসই দেখবে। কিন্তু এই দিনে মামাশ্বশুরের মুখে এই গল্প শোনার পর কোন্ অগোচর থেকে একটা কান্নার ঢেউ দুলে-দুলে ফুলে-ফুলে তাঁর বুকের দিকে এগোতে চাইছে এখনো। যে কান্নায় দাহ নেই, দীপ্তি আছে।

গল্পের শেষ শোনার আগে পর্যন্ত নিজের প্রতি সচেতন ছিলেন জ্যোতিরাণী। কাগজ পড়া ছেড়ে কালীদার গল্প শোনার তন্ময়তা আর নাতির কাছে ছোটদাদুর গল্প বলার তন্ময়তা বাড়ে কার উপস্থিতিতে সেটা তিনি ভালই জানেন। আজও সেই জানার মনটা অচেতন ছিল না একেবারে। বিশেষ করে সকলেরই চোখে আজ কি যে পড়ছে কে জানে।...ভয় ভুলে ছেলেটা হাঁ করে মুখের দিকে চেয়েছিল, মেঘনা তো জলে-ধোয়া জুঁই ফুলই টেনে আনল, কালীদার কাগজে মনোযোগ গেছে, মামাশ্বশুরের গল্পের বুনট জোরালো হয়েছে।

এই সচেতন মনটাই আচমকা আছাড় খেয়েছে একটা। সে-যে কোন্ গভীরতার মধ্যে ডুব দিয়েছিল এখনও স্পষ্ট নয় খুব।

...এই দিনে বলার মতই গল্প। শোনার মতও। তবু এ-রকম একটা নাড়াচাড়া খেয়ে উঠলেন কেন জ্যোতিরাণী? নটা বাইরের লোককে রাণী ক্ষমা করতে পেরেছিলেন। অনেকটা দায়ে পড়ে ক্ষমা। জ্যোতিরাণী ঘরের একটা লোককে ক্ষমা করতে পারলে কি হয়? দায়ে পড়ে ক্ষমা নয়, যদি মন-প্রাণ দিয়ে ক্ষমা করতে চেষ্টা করেন তিনি? এক নিস্পৃহ ক্ষমার ফলেও রাণী দুনিয়াকে কিছু দিতে পেরেছিলেন, মানুষের কিছু লাভ হয়েছিল।.. সহৃদয় ক্ষমার ফলে জ্যোতিরাণীর কি কিছুই লাভ হতে পারে না?...খুশিতে তৃপ্তিতে রাণী একদিন হাসতে পেরেছিলেন। জ্যোতিরাণী কি কোনদিন হাসতে পারবেন না?

...গল্পটা মামাশ্বশুর কি তাঁকেই শোনালেন?

বাইরের আনন্দ-কলরব আরো মুখর হয়ে উঠেছে। জ্যোতিরাণী রাস্তার দিকের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। অদূরে মেঘনাও দাঁড়িয়ে হাঁ করে জনতার আনন্দ

দেখছে। কে এলো না এলো খেয়াল করল না।

কয়েক নিমিষের মধ্যে আত্মবিস্মৃত জ্যোতিরাণী নিজেও। আনন্দের এমন বিরাট ব্যাপক রূপ কল্পনাও করেন নি কোনদিন। কাতারে কাতারে মানুষ চলেছে। ছেলে-বুড়ো মেয়ে-পুরুষ। পায়ে হেঁটে, রিক্সায়, ট্যাক্সিতে, লরিতে বসে। ফুল ছুঁড়ছে, রঙিন কাগজ ছুঁড়ছে, আতর ছুঁড়ছে, হাতে কিছু না থাকলে একদল আর একদলের উদ্দেশে কণ্ঠের উল্লাস ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে। রেকর্ড বাজছে, লাউড-স্পীকারে বাতাস গমগম করছে। বাবার সেই স্তোত্রের রূপ যেন স্বচক্ষে দেখলেন জ্যোতিরাণী। অভ্যুত্থান উৎসবের এই দিনে আনন্দ ছেড়ে, ঘর ছেড়ে, গৃহ ছেড়ে প্রসন্ন মানুষ বেরিয়ে এসেছে মুক্ত সূর্যের আলোয়। অন্ধকারের গুহাকন্দর থেকে এসেছে, এসেছে বিরক্তি আর গ্লানির গর্ভবাস থেকে মুক্ত হয়ে। এসেছে শক্তিমান আর পদানত, এসেছে ভোগশ্রান্ত আর কর্মক্লান্ত। সত্যি বুঝি অফুরন্ত বিচিত্র আলো পাঠিয়েছে জগতের প্রভু। জনতার এই আনন্দের মধ্যে বাবার সেই ডাকই যে গমগম করে বাজছে—আনন্দমুখর ওই হাসিমুখগুলোর মধ্যে যে শোভাদার নরম-সরম হাসিমুখখানা জ্বলজ্বল করছে!

নির্নিমেষে দেখছেন জ্যোতিরাণী। জনগণের স্বর্গ দেখছেন। বিভেদশূন্য, বৈষম্যশূন্য, ছোট-বড় উঁচু-নীচু সকলের আনন্দের স্বর্গ দেখছেন। মিলনের এক অবিরাম স্রোত দেখছেন। আনন্দে মানুষ বুঝি পাগল হয়ে গেছে, আরো পাগল হতে চাইছে। বাড়ির ঠিক নীচে একটা দৃশ্য দেখে হেসে ফেললেন জ্যোতিরাণী। মোটাসোটা একটা লোক লুঙ্গিপরা এক বুড়ো মুসলমানকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে তার লম্বা লম্বা পাকা দাড়িভরতি দুই গালে দুটো চুমু খেয়ে বসল। তারপর দুজনে দুজনকে জাপটে ধরে নাচতে লাগল।

···দুদিন আগেও মারামারি কাটাকাটি হানাহানি করেছে এই লোকগুলো। সেই হিংসা সেই ত্রাস সেই বিভীষিকা তিনি নিজের চোখে দেখেছেন। আজ তার কোনো দাগ নেই, কোনো ছায়া নেই। এতবড় হিংসা দাহ দ্বেষ ভুলে মানুষ কি সত্যিই এভাবে মিলতে পারে?···পারে?

পারে যে তাই তো দেখছেন তিনি। চোখ দিয়ে দেখছেন, হৃদয় দিয়ে দেখছেন, সমস্ত সত্তা দিয়ে দেখছেন। ভরপুর হয়ে দেখছেন। বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে হুঁশ নেই। ওদিক থেকে মেঘনা কখন চলে গেছে খেয়াল করেন নি। তার আগে ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে কতবার তাঁকে লক্ষ্য করেছে তাও না।

পিছন থেকে তারই খনখনে গলা কানে আসতে সচকিত হলেন।—ও মা, তুমি সেই থেকে এখনও ঠায় দাঁড়িয়ে আছ বউদিমণি! ওদিকে খোকাবাবুর টিকির

দেখা নেই, কোথায় টো-টো করে ঘুরছে কে জানে, মামাবাবুর তাগিদে কবার তো রাস্তায় বেরিয়ে খুঁজে এলাম—সেই কখন চান-টান সেরে বসে আছেন তেনারা।

ওদিকের দেয়াল-ঘড়িতে চোখ পড়তে জ্যোতিরাণী অপ্রস্তুত।—এত বেলা হয়েছে আমাকে ডাকিস নি কেন!

—ডাকব কি গো, তুমি কি আর তোমার মধ্যি ছিলে, মূর্তিখানার মত একেবারে বিভোর হয়ে দেখছিলে—রাস্তার কত লোক যে বজ্জাতি করে হাত-পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে তোমার দিকে চেয়ে চিৎকার করতে করতে গেল তুমি টেরও পেলে না—দেখে আমি হেসে বাঁচি না।

জ্যোতিরাণীর মুখ লাল হবার উপক্রম। দ্রুত প্রস্থান করলেন সেখান থেকে। ...বজ্জাতিতে মেঘনারও জুড়ি নেই।

ঘোরানো বারান্দার মুখে বন্ধ বড় ঘরটার সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন। জ্যোতিরাণীর পরের ঘর...বাড়ির মালিকের ঘর। যে ঘরের দরজা রাত্রিতে খুলবে।...রাতে ফেরার কথা আছে শুনেছেন।

ইচ্ছে করলে জ্যোতিরাণী এখনও খুলতে পারেন। বাইরের দিক থেকে ছিটকিনি লাগানো। মালিকের অনুপস্থিতিতে খেয়ালের বশে আগে এক-আধ সময় খুলেছেন। অনেক আগে। চুপচাপ খানিক দাঁড়িয়ে শূন্য শয্যা দেখেছেন, নিষ্প্রাণ আসবাবপত্র দেখেছেন, থাকে থাকে দুর্বোধ্য বইয়ের সারি দেখেছেন, সেই দেখার মধ্যে প্রীতির ছিটেফোঁটাও ছিল না কোনদিন। একটা বিরূপ অনুভূতি শুধু স্পষ্ট হয়ে উঠত। সবকিছুর মধ্যে একজনের এক অকরুণ প্রতিচ্ছবি দেখতেন তিনি চেয়ে চেয়ে।

আবার সচকিত হয়ে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ঢুকে পড়লেন জ্যোতিরাণী। সমস্ত মুখ লাল হয়েছে হঠাৎ। সঙ্কল্পের একটা আভাস উঁকিঝুঁকি দিয়েছে মনের তলায়।...আজ ওই ঘর যদি খুলতেই হয় তাঁকে, ভিতরে আসেনই যদি...জ্যোতিরাণী রাত্রিতে মালিকের উপস্থিতিতে যদি খোলেন...তখন যদি আসেন?

পালিয়ে এলেন বটে, কিন্তু নিজের দিকে তাকিয়ে যা দেখলেন হঠাৎ, যা অনুভব করলেন, তা অস্বীকার করতে পারলেন না।

গতদিনের যত ঘটনা, যত ভাবনাচিন্তা, সকালে বাবার লেখা সেই স্তবের খাতা বার করা, অত ভোরে গায়ে মাথায় অবিশ্রান্ত জল ঢেলে ঢেলে গোচরের আর অগোচরের যত গ্লানি ধুয়ে ফেলার চেষ্টা, মামাশ্বশুরের গল্প, শেকল-ভাঙা দিনের আকাশমুখর উৎসব—এই সব-কিছু যেন সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে একটাই সঙ্কল্পের দিকে টেনে নিয়ে গেছে তাঁকে।...প্রতীক্ষায় সঙ্কল্প। জ্যোতিরাণী জানেন না, সবকিছুর মধ্যে

কেবল এই এক প্রস্তুতির কানাকানি চলেছে গতকাল থেকে এ পর্যন্ত। ভিতরে কেউ শুধু বলেছে, এমন দিনে সব ভোলা যায়, সব পারা যায়, অসম্ভব কিছু সম্ভব করার মত একটা প্রতীক্ষাও পুষ্ট করে তোলা যায়।

আয়না থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন জ্যোতিরাণী। নিজের দিকেও ভাল করে তাকানো দায়। সমস্ত মুখে বুঝি ওই প্রতীক্ষারই রঙ লেগে আছে।

বিকেল যত গড়াচ্ছে সিতুর মেজাজের অবস্থা ততো খারাপ হয়ে আসছে।

দোষের মধ্যে আজ একটু বেশি বেলা করেই বাড়ি ফিরেছিল। সেই যে সকালে বেরিয়েছিল, ফিরেছে বেলা দুটো নাগাদ। কি যে আনন্দের হাট লেগেছিল তাতো জানে না কেউ, কেবল দোষই দেখে। ছোটদাদু কালীজেঠু সদা—সকলে নাকি খুঁজতে বেরিয়েছিল তাকে। পাবে কোথায়, সকলের সঙ্গে সে-ও তো একটা লরিতে চেপে বসেছিল। কার লরি, কোথায় যাচ্ছে কে জানে—ওসব কিছুই মনে ছিল না তার। তাছাড়া চালিয়াত দুলু গেছল, সজারু-মাথা সুবীর গেছল, এমন কি রোগা-পটকা ভীতু অতুল পর্যন্ত হাঁচড়ে-পাঁচড়ে লরিতে উঠেছে। সিতু বসে থাকে কি করে? তারপর অত যে বেলা হয়েছে সে কি আর সেই লরির একটা লোকেরও খেয়াল ছিল?

বাড়ি আসতেই কালীজেঠুর সেই ঝাঁকানি আর ছোটদাদুর পর্যন্ত রাগ। মা অবশ্য কিছুই বলে নি। সকাল থেকেই মায়ের মতিগতি কেমন ভালোর দিকে বদলেছে মনে হয়েছিল তার। কিন্তু একা কালীজেঠুই যথেষ্ট। ছোটদাদুকে নিয়ে নিজে দিব্বি বেরিয়ে গেল আর তাকে শাসিয়ে যাওয়া হল বাড়ি থেকে এক পা নড়লে ঠ্যাং ভেঙে দেওয়া হবে, আর, ট্রেনের টিকিট কেটে ছোটদাদুকেও একেবারে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসা হবে। ভালো হয়ে থাকলে সন্ধ্যার পর বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার আশ্বাস ছোটদাদু অবশ্য দিয়েছে, কিন্তু সন্ধ্যার আগে তারা ফিরবেই যে এমন ভরসা সিতু একটুও করে না।

হাতে-নাতে ধরা না পড়লে কারও শাসনের ধার ধারে না সিতু। এরই মধ্যে কবার রাস্তায় বেরিয়েছে ঠিক নেই। কিন্তু বন্ধু-বান্ধব একজনেরও টিকির দেখা মেলে নি। মেজাজ এইজন্যেই আরও বেশি খারাপ। কোথায় কত ফুর্তি করছে তারা ঠিক নেই। ওরা যখন বাড়িতে ডাকতে এল তখন সে নজরবন্দী। আর ও খালাস পেল যখন, অর্থাৎ ছোটদাদু আর কালীজেঠু যখন বেরিয়ে গেল, তখন কারো পাত্তা নেই। এমন দিনে কে আর শখ করে বাড়িতে বসে থাকে!

নীচের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখছিল আর সেই সঙ্গে একটা

মতলবও ভাঁজছিল।...মায়ের হাব-ভাব আজ অন্যরকম, তাকেই যদি একটু বেড়িয়ে আনতে বলে, কেমন হয়? মায়ের গাড়ি তো পড়েই আছে, আর ড্রাইভারটাও বসে বসে কেবল ঝিমুচ্ছে। মা শুনতেও পারে আবার ধমকে উঠতেও পারে। কিন্তু আজ যেন শোনার সম্ভাবনাই বেশি।

আশাটুকু উজ্জ্বল হয়ে ওঠার আগেই এক ফুঁয়ে নিবে গেল। গেট ঠেলে ভিতরে ঢুকছে একজন...মা-কে আর পাওয়ার আশায় জলাঞ্জলি। রাজ্যের বিরক্তি মুখে করে সিতু দোতলায় এসে মাকে খবর দিল, বিভাস-কাকু এসেছে।

ছেলের গোমড়া মুখ জ্যোতিরাণী লক্ষ্য করেও করলেন না।

...ভদ্রলোক আসতে পারেন কাল বলেই গেছলেন। রাত আর দিনের তফাতের মতই এই দুটো দিন সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে গেছে। কালীদার মুখে কাল বিভাসবাবুর আসার খবর শোনামাত্র তিনি বিমূঢ় হয়েছিলেন। আজ মনের আকাশ পরিষ্কার, দ্বিধাদ্বন্দ্বশূন্য। সহজ অভ্যর্থনায় সামনে গিয়ে দাঁড়াতে সঙ্কোচ নেই। এসেছেন শুনে খুশি মুখে নীচে নেমে চললেন তিনি।

মাঝসিঁড়িতে কিছু মনে পড়তে দাঁড়িয়ে পড়লেন আবার। কালকের সেই মাসিকপত্রটা কোথায় রেখেছেন...অন্ধতামিস্র? ঘরেই আছে কোথাও। ওটা নিয়ে নামবেন কিনা ভাবলেন এক মুহূর্ত। রচনাটা শেষ পর্যন্ত পড়ে দেখার আগ্রহ আর ছিল না। তবু...থাকগে। নীচেই চললেন।

সোফার কাঁধে মাথা রেখে সিগারেট টানছেন বিভাস দত্ত। তাঁর সামনে বছর সাতেকের একটি মোটাসোটা ফুটফুটে মেয়ে গম্ভীর আগ্রহে দেয়ালে টাঙানো চকচকে ছবিগুলো দেখছে। ছবি ছাড়া কাঁচের আলমারির খেলনার মত শৌখিন জিনিস-গুলোও তার চোখ টেনেছে।

ঘরে পা দিয়ে জ্যোতিরাণী হাসি মুখে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কাঁচের আলমারির সামনে মেয়েটির দিকে চোখ পড়তে দেখে নিয়ে ফিরে তাকালেন।—এটি কে?

ভাইঝি ··।

জ্যোতিরাণী মনে মনে বিস্মিত হলেন একটু। ক' বছরের আলাপে বিভাস দত্ত বাড়ির কাউকে আনা দূরে থাক, কোন আত্মীয়-পরিজনের প্রসঙ্গে একটি কথাও কখনও বলতে শোনেন নি। গেল বারে রায়টের সেই দুর্যোগে যে তিন দিন ছিলেন তাঁদের বাড়িতে, সেই কটা দিনও বাড়ির লোকজনকে যেন তফাতে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন ভদ্রলোক।

মেয়েটি ঘুরে দাঁড়িয়ে এত বড় বাড়ির কর্ত্রীকেই দেখছিল বোধ করি।

বেশ মেয়েটি তো। জ্যোতিরাণী এগিয়ে গিয়ে তাকে টেনে নিয়ে সোফায় বসালেন। দু হাতে তার ঝাঁকড়া চুলের গোছা সামনে থেকে সরিয়ে দিয়ে মুখখানা নিজের দিকে তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম কি ?

শমী···। কি মনে পড়তে হেসে উঠেই লজ্জা পেল একটু। কচি ঠোঁটে সলজ্জ হাসিটুকু লেগে থাকল। দাদারা ডাকত শোম্বোস...

খেয়াল না করেই জ্যোতিরাণী আগ্রহ দেখালেন, এমন সুন্দর নামকে এ-রকম বলা কেন ?

মেয়েটি সপ্রতিভ বেশ। গুছিয়ে জবাব দিল, শমী বসু নাম তো আমার, দুষ্টুমি করে ওই রকম ডাকত।

বসু শুনে জ্যোতিরাণী বিভাসবাবুর দিকে তাকালেন। নিজের ভাইঝি নয় বোঝা গেল। ভদ্রলোক এক সিগারেট থেকে আর এক সিগারেট ধরাচ্ছেন। জ্যোতিরাণীর হঠাৎ খেয়াল হল, দাদাদের প্রসঙ্গে মেয়েটা দুবারই 'ডাকত' বলেছে, 'ডাকে' বলে নি। কেন যে একটু অস্বস্তি বোধ করলেন জানেন না। মেয়েটাকে মিষ্টি লাগছে বেশ। জিজ্ঞাসা করে বসলেন, তুমি এখন দাদাদের কাছে থাক না ?

মাথা নাড়ল।—আমি তো এখন কাকুর কাছে থাকি।

একা ? আর তোমার বাবা-মা...দাদারা ?

জিজ্ঞাসা করেই জ্যোতিরাণী অপ্রস্তুত একটু। ছোট্ট মেয়েটার হাসি-হাসি মুখখানা কেমন যেন হয়ে গেল। হাসতেই চেষ্টা করছে, কিন্তু সেটা হঠাৎ-আসা একটা কান্না ঠেকানোর মতই। অন্যদিকে চেয়ে অভিমানী মেয়ের মত একটু মাথা নাড়ল। জ্যোতিরাণী হকচকিয়ে গেলেন। ফিরে দেখলেন, দেয়ালের অয়েল পেন্টিংটার দিকে চেয়ে নির্লিপ্ত মুখে সিগারেট টানছেন বিভাসবাবু।

মেয়েটার সামনে জ্যোতিরাণী তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করতেও ভরসা পেলেন না। কিন্তু এইটুকু মেয়ে বচনপটু বটে। ক্ষণিকের একটা অবোধ-অনুভূতি কাটিয়ে জবাবও দিল। যে তাকে দু হাতে ধরে আছে, তাকে ভাল লাগার দরুনও হতে পারে। বলল, মা তো আমাদের কাছে থাকে না এখন, মা আকাশের চাঁদের পাশে তারা হয়ে আছে—কথা বলে না, রাতে শুধু চেয়ে থাকে—দাদা চিনিয়ে দিয়েছিল। আর বাবা আর দাদারা কেউ আসে নি, সব বরিশালেই থেকে গেছে—অনেকটা নালিশের সুরেই বক্তব্যটুকু শেষ করল সে—তারা জাহাজে আছে বলে ভুলিয়ে-ভালিয়ে দীনজ্যাঠা আমাকে জাহাজে তুলে অন্য লোকের সঙ্গে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছে।

জ্যোতিরাণী ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছেন। ঘরে যেন বাতাস কম। আবারও

অদূরের মানুষটার দিকে তাকালেন তিনি। এবারে বিভাস দত্ত ওই মেয়েটাকেই শুনিয়ে বললেন, শোম্বোস এখন আমার কাছে থেকে ইস্কুলে পড়বে, কলেজে পড়বে—অনেক বড় হয়ে আর অনেক পড়াশুনা করে তবে বরিশালে যাবে, তার আগে আর বাবা-দাদাদের কাছে যাবার নামও করবে না, তাই না?

প্রস্তাব খুব মনে ধরেনি মুখ দেখেই বোঝা গেল, তবু ভব্যতার খাতিরেই গম্ভীর মুখে সে মাথা নাড়ল। জ্যোতিরাণী আত্মস্থ হলেন, তার মুখখানা আবার নিজের দিকে ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এখন তুমি কি খাবে বল?

ছোট্ট শমীর মুখে খুশির আমেজ লাগল একটু। লজ্জা লজ্জা মুখ করে তার কাকুর দিকে তাকালো। কিছু বলাটা শোভন হবে কিনা বুঝছে না। জ্যোতিরাণী উঠে দ্রুত ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। সামনে শামু আর ভোলা। ওদের দিয়ে হবে না। তাড়াতাড়ি নিজেই ওপরে উঠে গেলেন। নিজের হাতে ডিশ ভরতি খাবার সাজিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই নেমে এলেন। সদাকে বললেন, বিভাসবাবুরটা তুমি নিয়ে এসো।

খাবারের ডিশ দেখা মাত্র মেয়েটার নীরব খুশির অভিব্যক্তি লক্ষ্য করলেন তিনি। ভিতরটা খচখচ করে উঠল আবার। নিজে বসে ওকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে এলেন।—খাও।

আপ্যায়নে প্রীত হয়ে শমী অনুমোদনের আশায় কাকুর দিকে ঘাড় ফেরাল। কাকু মাথা নাড়তে নিশ্চিন্ত।

খেতে খেতে শমীর কিছু মনে পড়ে থাকবে। মুখ উঁচিয়ে জ্যোতিরাণীকে দেখতে চেষ্টা করল।—এই এত বড় বাড়িটা তোমার?

সহজ হবার চেষ্টায় জ্যোতিরাণী হাসিমুখেই মাথা নাড়লেন, তাঁরই।

সঙ্গে সঙ্গে আবার প্রশ্ন হল, আর আসার সময়ে একটা ঘরের মধ্যে যে একটা চকচকে মোটরগাড়ি দেখলাম—সেটা?

সেটাও আমার। তোমার গাড়ি চড়তে ভালো লাগে?

কেমন লাগে সেটা তার মুখেই লেখা হয়ে গেল। জ্যোতিরাণী বললেন, আজই তোমাকে অনেকক্ষণ গাড়ি চড়িয়ে একেবারে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হবে।

উৎফুল্ল মুখে সে কাকুর দিকে ফিরল। ভাবখানা, বেশ ভালো জায়গাতেই বেড়াতে আসা হয়েছে দেখা যাচ্ছে।

ওদিকে খাবারের ট্রে হাতে সদার পিছনে সিতুও ঘরে এসে দাঁড়াল। বিভাস-কাকুর সঙ্গে একটা মেয়েকেও দেখেছিল মনে পড়তে বেশিক্ষণ আড়ালে থাকা গেল না। বিভাস দত্ত মাথা নেড়ে সদাকে চলে যেতে বললেন। জ্যোতিরাণী জিজ্ঞাসা

করলেন, চা দেবে তো ?

বিভাস দত্ত আবার মাথা নাড়লেন। চা-ও না।

সদা ট্রে নিয়ে ফিরে গেল। বিভাস দত্ত সিতুর দিকে ফিরলেন, কি মাস্টার, আজ বাড়িসুদ্ধ লাইট ফিউস করার মতলব নাকি ?

এ প্রসঙ্গ কেন যে অনভিপ্রেত জ্যোতিরাণী জানেন না। কাল আর আজকের মধ্যে অনেক তফাত। কিন্তু স্মৃতির বিড়ম্বনা এত সহজে কাটিয়ে ওঠা যায় না হয়ত। ইতিমধ্যে বিভাস দত্তর বিমনা দৃষ্টি বারকয়েক তাঁর মুখের ওপর নিবদ্ধ দেখেছেন।···অনভ্যস্ত সিঁদুরের টিপটা একটু বড়ই হয়ে গেছে বোধ হয়। তাড়াতাড়ি ছেলের দিকে মুখ ফেরালেন তিনিও। কেমন সুন্দর মেয়ে, দেখেছিস ?

খাবারের ডিশ খালি করার ফাঁকে শমীও এই নতুন আগন্তুকটিকে লক্ষ্য করছিল। এবারে দুজনের মধ্যে যাচাইয়ের নীরব দৃষ্টি বিনিময় হল একপ্রস্থ। বিভাসকাকুর কথার জবাব দেবার দরকার বোধ করে নি সিতু। কিন্তু মায়ের প্রশংসার একটা সমুচিত জবাব না দিয়ে পারা গেল না। দেখার যেটুকু, সে ঘরে ঢুকেই মনোযোগ সহকারে দেখে নিয়েছে। মা কাউকে কোলে টেনে নিয়ে আদর করে খাওয়াতে পারে এটাও তার কাছে একটা দ্রষ্টব্য বস্তু।

গম্ভীর মুখে ত্রুটি আবিষ্কার করল সে, ও একটা রাক্ষসের মত খাচ্ছিল।

এই! সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিরাণীর ধমক। আর বিভাস দত্তর হাসি।

আদেশের সুরে জ্যোতিরাণী বললেন, তোর মোটরবাইক নিয়ে খেলা করগে যা ওর সঙ্গে, আর ভালো বই-টই কি আছে দেখা—যেটা পছন্দ হয় ওকে দিয়ে দিবি। শমীকে বললেন, ওর সঙ্গে যাও।

ক্ষুদ্র আগন্তুকের প্রথম উক্তিই ভালো লাগে নি শমীর। কিন্তু লোভনীয় বস্তু দুটির আকর্ষণও কম নয়। অতএব সাগ্রহে অনুসরণ করল।

তারা চলে যেতে জ্যোতিরাণী ঘুরে বসে একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন করে ফেললেন। মেয়েটি কি রকম আত্মীয় আপনার ? ওর বাবা-দাদারা কেউ নেই নাকি ? আপনার কাছে কবে এসেছে ?

দিন পনেরো। একটাই জবাব দিলেন বিভাস দত্ত।

আপনি বলেন নি তো কিছু ?

খুঁজলে ও-রকম মেয়ে এই কলকাতার শহরেই এখন কত পাবেন ঠিক নেই। নিস্পৃহ কৌতুকে বিভাস দত্ত তাঁর দিকে ঘুরে বসলেন একটু।

স্বাধীনতার আনন্দ কেমন হল বলুন—

মেয়েটির প্রসঙ্গে জানার জন্য সত্যিই মনে মনে অস্থির হয়েছিলেন জ্যোতিরাণী।

প্রসঙ্গ-বদলের কারণ বুঝলেন না। বললেন, আনন্দ কম হবে কেন, সকাল থেকে মানুষের সমুদ্র দেখছি। উঠে আলোটা জেলে দিয়ে এসে বসলেন। বাইরের আলোয় খুব টান ধরে নি তখনও, তবু। বললেন, আপনি কি রকম দেখলেন বলুন শুনি।

চমৎকার। মনুমেণ্টে ওঠার জন্য লোকে কিউ দিয়ে দাঁড়িয়েছে।

কেন ?

আনন্দে আত্মহত্যা করার জন্যে বোধ হয়।

বিভাস দত্তর চঞ্চল দৃষ্টি তাঁর মুখে স্থির হল একটু। জ্যোতিরাণী হেসে ফেললেন। তারপর জোর দিয়েই বললেন, আপনার যেমন কথা, আনন্দ করবে না তো কি আজকের দিনে শোক করে বেড়াবে ?

ভদ্রলোকের দু চোখ মুখের ওপর থেকে নড়তে চেষ্টা করেও পারল না যেন। মাথা নাড়লেন।—না, আনন্দ করবে বই কি। ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাস। পকেট হাতড়ে তৃতীয় দফা সিগারেটের প্যাকেট বার করলেন। কৌতুককর কিছুই বলবেন মনে হল।

বললেন, একটু আগে আপনি ওই শমীর কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন। না ?... মেয়েটা আমার তেমন নিকট-আত্মীয় কেউ নয়, ওর বাবা আমার বিশেষ বন্ধু ছিল। বয়সে বড়, দাদা ডাকতুম। আর ওই যে দীনজ্যাঠার কথা বলল—যে তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে জাহাজে তুলে দিয়েছিল, তার নাম দীন মহম্মদ—পুরুষানুক্রমে ওদের জমি-জমা দেখাশুনা করত। বরিশালে আমার সঙ্গেও খুব খাতির হয়ে গিয়েছিল তার, কলকাতায় এলে আমার সঙ্গে দেখা না করে যেত না।

জ্যোতিরাণীর ভিতরটা হিম হয়ে আসছে। কি শুনতে হবে অনুমান করা শক্ত নয়।

বিভাস দত্ত বললেন, শমীর বাবা আর দাদারা নিখোঁজ হতেই ও-ই একটা মেয়েকে কি করে রক্ষা করেছিল দীন মহম্মদই জানে। আমার ঠিকানা দিয়ে জাহাজের অচেনা যাত্রীর হাতে ওকে সঁপে দিয়েছিল। এখন আমার কাজ শুধু ওর বাবা-দাদাদের ভোলানো। এ-রকম কত বাবাকে ভোলাতে হচ্ছে, কত মা-কে ভোলাতে হচ্ছে, কত ভাইকে ভোলাতে হচ্ছে, কত বোনকে ভোলাতে হচ্ছে...তবু আনন্দ করবেই সকলে, কি বলেন ?

জ্যোতিরাণী চুপ একেবারে। বিভাস দত্ত তাঁকে কিছু কটাক্ষ করেন নি, কিন্তু তিনিও তো এই দিনের প্রসন্নতার দিকটাই শুধু সমস্ত সত্তা দিয়ে গ্রহণ করতে চেয়েছেন।

চমকে উঠলেন হঠাৎ। ওপর থেকে একটা কচি গলার আর্তনাদ। একবার মাত্র।

প্রায় ছুটে জ্যোতিরাণী সিঁড়ির কাছে আসতে ওপর থেকে মেঘনা চিৎকার করে উঠল, ও বউদিমণি!শিগগীর এসো, কি করেছে ছেলে—একেবারে রক্তগঙ্গা হয়ে গেল যে গো!

খুব অল্প সময়ের মধ্যে ওপরে একটা ভিন্ন নাটকের অনুষ্ঠান হয়ে গেছে বটে।

ওপরে এসে শ্রীমান সিতু তার ক্ষুদ্র সঙ্গিনীর মনোরঞ্জনের দ্রব্য বার করার কথা ভুলে আবার কয়েকপ্রস্থ নিরীক্ষণ করেছে তাকে। ভালো লেগেছে। বেশ মোটা-সোটা, ফুলো ফুলো—ধরে চটকাতে ইচ্ছে করে। আর, ইচ্ছে একবার করলে সিতু সেটা বাতিল করতে পারে না।

বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ শরীরের ওপর হামলা শুরু হতে সঙ্গিনী অবাক। —কি করছ?

দেখছি। তোর বয়েস কত?

সাত।

সিতু নাক সিঁটকালো।—তুই তো বাচ্চা মেয়ে, তোর সঙ্গে খেলব কি?

তোমার বয়েস কত?

এই দশে পড়ব। তোর নাম কি?

শমী বোস।

সিতু তক্ষুনি মাথা নেড়েছে।—না, তোর নাম শমী ঘোষ।

প্রথমে শরীরের ওপর হামলা, তারপর নামের ওপর। রাগ হতেই পারে। শমী জিজ্ঞাসা করেছে, তোমার নাম কি?

সাত্যকি চ্যাটার্জী।

এবারে শমীও মাথা নেড়েছে।—তোমার নাম সাত্যকি সিম্পাঞ্জী।

দুঃসাহস দেখে সিতু তাজ্জব। কিন্তু কিছু বলা বা করার আগে ছোট যোগাযোগ একটা। ঢাক-ঢোল কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল কারা। কানে আসতেই দেখার জন্য শমী জানলার ধারের চেয়ারটায় উঠে দাঁড়িয়েছে। দু হাতে জানলার গরাদ ধরে সেখান থেকে পা রেখেছে জানলার আড়াআড়ি লোহার পাতের গরাদটার ওপর।

আর সেই অবকাশে সিতু নিঃশব্দে তার পিছনের চেয়ারটা সরিয়ে নিয়েছে। বাজনা চলে যেতে শমী প্রত্যাশিত কাজটিই করেছে। পিছনে চেয়ার না

থাকাতে দেহভারে দুই হাত হেঁচড়ে নেমেছে, তারপরেই আড়াআড়ি গরাদে থুতনির ওপর প্রচণ্ড আঘাত। চিবুক দুখানা হয়ে মাংস হাড়ে বসে গেছে।

বেগতিক দেখে সিতু উধাও।

রক্ত দেখে জ্যোতিরাণীর মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। জামা রক্তে ভেসে গেছে, মেঝেতেও রক্ত। মেয়েটা কাঁপছে থরথর করে, হেঁচকি উঠে গেছে। কিন্তু চিৎকার ওই একটাই করেছিল, তারপর প্রাণপণে কান্না চাপতে চেষ্টা করছে।

দিশেহারা জ্যোতিরাণী তাকে জাপটে ধরে মেঝেতে বসে পড়ে শাড়ির আঁচল মুঠো করে থুতনিতে চেপে ধরলেন। কিন্তু গলগল করে রক্ত বেরুচ্ছে। সদাকে বললেন, শিগগীর তুলো নিয়ে এসো। মেঘনাকে বললেন, বিভাসবাবুকে ডাক্ শিগগীর!

হেঁচকি তুলতে তুলতে মেয়েটা আঙুল দিয়ে জানলা দেখিয়ে দিল। যা বলতে চেষ্টা করল তার তাৎপর্য, ওখানে বাজনা দেখতে উঠেছিল, ছেলেটা চেয়ার সরিয়ে নিয়েছে।

কি ঘটেছে বুঝতে এক মুহূর্তও সময় লাগেনি জ্যোতিরাণীর। এত রক্ত দেখে তাঁরই শরীরের রক্ত যেন সিরসির করে পায়ের দিকে নামছে। এই ছেলে নিয়ে কি করবেন তিনি? কি করতে পারেন? বিভাসবাবু আসছেন না কেন! জ্যোতিরাণী এক পাঁজা তুলো চেপে ধরলেন, কিন্তু রক্ত যে থামে না।

বিভাসবাবু এলেন। দেখলেন।

জ্যোতিরাণী সদার দিকে ফিরলেন আবার।—ড্রাইভারকে বল্ শিগগীর গাড়ি বার করতে। বিভাস দত্তকে বললেন, হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে এক্ষুনি স্টিচ করতে হবে, অনেকখানি কেটে গেছে।

এক হাতে চিবুক চেপে ধরে আছেন, অন্য হাতে শমীকে বুকে জড়িয়ে তুলে নিয়ে ওই রক্তাক্ত বস্ত্রেই জ্যোতিরাণী দরজার দিকে এগোলেন।

পিছন থেকে বিভাস দত্ত বললেন, আমার কাছে দিন।

জ্যোতিরাণী ততক্ষণে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করেছেন।

স্টিচ হল। ইনজেকশন হল। গাড়ি বিভাস দত্তর বাড়ির দিকে চলেছে। রাস্তায় ভিড়। স্বাধীনতার রাতের উৎসবে মুখর নগর। জ্যোতিরাণী কিছু দেখছেন না, কিছু শুনছেন না। গাড়ির কোণে ঠেস দিয়ে বসে আছেন, তাঁর বুকের ওপর অবসন্ন মেয়েটা বোধ করি ঘুমিয়েই পড়েছে। কিন্তু বুকের ওপর কচি শরীর এখনো কেঁপে কেঁপে উঠছে। স্টিচ আর ইনজেকশনেও ভয়ানক কষ্ট পেয়েছে। ব্যাকুল

জ্যোতিরাণী বুক দিয়ে আগলে রাখতে চাইছেন তাকে।

বিভাস দত্ত একসময় বললেন, আপনি অত ব্যস্ত হবেন না, ওর এখনো অনেক কাঁদতে বাকি।

কানে বিঁধল।···একটা কান্না তাঁরই ছেলের হাত দিয়ে হয়ে গেল। জ্যোতিরাণী নীরব।

গাড়ি থামল একসময়। বিভাস দত্ত নামলেন। হাত বাড়িয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন শমীকে নিলেন তাঁর কাছ থেকে। দুই এক মুহূর্তের প্রতীক্ষা।

···আপনি নামবেন ?

অস্ফুট স্বরে জ্যোতিরাণী বললেন, আজ থাক্।

॥ আট ॥

বাড়ি। অনেকক্ষণের একটা আচ্ছন্নতার ঘোর কাটিয়ে জ্যোতিরাণী গাড়ি থেকে নামলেন। মাথাটা ঝিমঝিম করছে তখনো।

নীচে তাঁর বসার ঘরের আলো জ্বলছে। চকিত দৃষ্টি ওপাশে বাড়ির মালিকের খাস বৈঠকখানার দিকে ফিরল। সে-ঘরেরও আলো জ্বলছে, দরজা-জানলা সব খোলা।

···কর্তা ফিরেছেন।

তিনি বাড়ি থাকলে ও-ঘরের দরজা জানলা খোলা থাকে, আলো জ্বলে। এই রকমই নির্দেশ। কখন প্রয়োজন হবে বা কখন অতিথি আসবে কেউ জানে না। কিন্তু ও-ঘরে আপাতত কেউ নেই মনে হয়, কারণ শামু এধারের অর্থাৎ জ্যোতিরাণীর বসার ঘরের দরজার কাছে মোতায়েন। লোক এ-ঘরেই আছে।

গাড়ি থেকে নেমে জ্যোতিরাণী নিঃশব্দে পাশের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেলেন। কেউ এসেছে কিনা জানেন না, বেশ-বাস রক্তে মাখা, কারো চোখের সামনে পড়তে না হলে বাঁচেন। ভিতরের সিঁড়ির কাছে ভোলা দাঁড়িয়ে। ইশারায় তাকে জিজ্ঞাস করলেন, ঘরে কে ?

—বাবু আর মামাবাবু।

জিজ্ঞাসা না করলেও হত। ঘরে কে সেটা ওদের মুখের দিকে তাকালেই বুঝতে পারার কথা। শুধু একজনের উপস্থিতিতে ওরা এমনি তটস্থ। বাড়ির মধ্যে কথা সেই একজনই সব থেকে কম বলেন। কিন্তু তিনি যে আছেন সেটা

সর্বদা সকলকে অনুভব করতে হয়।

দোতলায় উঠতে ওদিক থেকে এগিয়ে এলেন কালীদা। নীচে নামার উদ্যোগ করছিলেন হয়ত। থমকে চেয়ে দেখলেন একটু।—ইস্! রক্তে যে একেবারে··· মেয়েটা খুব বেশি-রকম জখম হয়েছে নাকি?

জ্যোতিরাণী একবার তাকালেন শুধু, হাঁ না কিছুই বললেন। নিরুপায় ক্ষোভে চাউনিটা ঈষৎ নির্লিপ্ত দেখালো, পাশ কাটিয়ে ঘরে যেতে চান আপাতত।

কালীদা আবার বললেন, তোমার ছেলেও সেই যে পালিয়েছে আর ঘরে ঢোকেনি। কারো বাড়িতে বসে আছে নিশ্চয়—

জ্যোতিরাণী আর দাঁড়ালেন না।···তোমার ছেলে। এঁরা যখন বলেন তোমার ছেলে—আরো জ্বালা বাড়ে। ছেলেই শুধু তাঁর, আর কিছু দায়িত্ব নেই, আর কিছু করার নেই। তখন আর পাঁচজন আছে। কিন্তু বলার সময় এই কথাটি বলতে ছাড়েন না কেউ।

ভালই হয়েছে। ছেলে ঠিক এই মুহূর্তে এই বাড়ির আনাচে-কানাচে কোথাও নেই, ভালই হয়েছে। ঠিক এই বোধ হয় চাইছিলেন তিনি। সামনে আর যে-ই আসুক, এই রক্ত-মাখা অবস্থায় ছেলে যেন তাঁর সামনাসামনি না পড়ে। পড়লে কি হত বা কি হবে তিনি জানেন না। নেই, ভালো হয়েছে।

আবার স্নান। সকালের স্নানের সঙ্গে এই স্নানের অনেক তফাত। টান-ধরা স্নায়ু নরম হল না। বরং শীত শীত করছে। এমন দিনে অসহায় একটা মেয়ের কচি শরীর থেকে কত রক্তপাত হয়ে গেল। তাঁর ছেলের সেটা খেলা, খেয়াল। আজ ভয়ে পালিয়ে আছে, কালই ভুলে যাবে। বিভাসবাবুও কিছু মনে করে রাখবেন না। শুধু মেয়েটাই চট করে ভুলতে পারবে না। তার চিবুক কেটে দুখানা হয়েছে। অনেকগুলো স্টিচ পড়েছে।

···জ্যোতিরাণীর ভেজা মুখ শক্ত হয়ে আসছে। বিভাসবাবু বলেছেন, সবে কান্না শুরু মেয়েটার। তাঁকে শোনাবার জন্যে বলেননি। সাহিত্যিক শোক নিয়েও সাহিত্য করে, আর পাঁচজনের মত বলবে কেন? কিন্তু লজ্জায় অপমানে জ্যোতিরাণীর বুকের ভিতরে কেটে বসেছিল কথাগুলো।···ওই ছেলেকে নিয়ে তিনি কি করবেন পরে ভাববেন। এখন বাড়ি নেই, ধারে কাছে নেই, খুব ভালো হয়েছে।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাথা আঁচড়ালেন। এতক্ষণের টকটকে সিঁদুরের টিপ ধুয়ে মুছে যেতে কপালটা খড়খড়ে লাগছে কেমন। সঙ্গে সঙ্গে কান পাতলেন তিনি। পাশের ঘরের লোক এখন পাশের ঘরেই আছে। কি করে যে টের পান জ্যোতিরাণীর নিজের কাছেও স্পষ্ট নয়। কিন্তু ঠিকই টের পান। ঘড়ির দিকে

তাকালেন, বাড়ি ফিরে চানের ঘরে ঢুকেছিলেন তাও আধ ঘণ্টার ওপর হয়ে গেছে।

বাইরের আনন্দের রেশ এখনো কানে আসছে। রাস্তা দিয়ে লোক হৈ-চৈ করতে করতে যাচ্ছে। মানুষের এই আনন্দ নিয়ে বিভাস দত্ত ঠেস দিয়ে গেছেন। জ্যোতিরাণী সেটা উড়িয়ে দিতে পারেন নি, কিন্তু মন দিয়ে গ্রহণও করেন নি। হঠাৎ নিজেকে আবার সজাগ করতে চাইলেন তিনি। সকাল থেকে আজ তিনি আলো দেখেছেন, মানুষ দেখেছেন, বুকের তলায় যে নতুন বন্যার স্বাদ অনুভব করেছিলেন—তার কি হল? কিছু গোচরে কিছু বা অগোচরে তিনি যে এক প্রতীক্ষা নিয়ে বসেছিলেন, তার কি হল? মামাশ্বশুরের গল্পের সেই রাণী জ্যোতিরাণীর কাছ থেকে আবার দূরে সরে গেল?

বিক্ষিপ্ত মনটাকে গুছিয়ে তোলার চেষ্টায় আয়নার সামনে দাঁড়িয়েই কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল।··পাশের ঘরে আছে কেউ, সেটা এখন আর কল্পনা নয়। বাস্তব। এই বাস্তবের সামনে দাঁড়িয়ে সকালে দুপুরে বিকেলে যেমন করে নিজেকে এক প্রস্তুতির দিকে টেনে এনেছিলেন, তেমনটি করা এখন আর সহজ নয়। কিন্তু সহজ কাজই শুধু পারতে হবে তার কি মানে?

আয়নায় নিজের দিকে চেয়ে জ্যোতিরাণী বড় করেই সিঁদুরের টিপ পরলেন আবার। সকালে যেমন পরেছিলেন তেমনি।

একটু বাদে মেঘনা এসে খবর দিল, মামাবাবু চলে যাচ্ছেন, কালীদাদাবাবু ডাকছেন।

জ্যোতিরাণী জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকালেন, কারণ, বিকেল পর্যন্ত জানতেন মামাশ্বশুর থাকবেন। কিন্তু এই একজনের আসার যেমন নিশ্চয়তা নেই, থাকারও না। হঠাৎ আসেন, হঠাৎই যান। মেঘনা চলে যেতে জ্যোতিরাণীও ঘর থেকে বেরুলেন। পাশের ঘরের খোলা দরজার সামনে পা থেমে গেল।···ঘরে আলো জ্বলছে, ভারী পরদার এধার থেকে মানুষ দেখা যাচ্ছে না। কি রকম অস্বস্তি একটা, সমস্ত অতীত মুছে দিয়ে পরদা ঠেলে প্রসন্নমুখে ঘরের ভিতরে গিয়ে দাঁড়াতে হলে যতটা প্রস্তুতি দরকার, তা যেন এখনো হয়নি। হয়নি বলে নিজের ওপরেই বিরূপ জ্যোতিরাণী। এ নিজেরই ত্রুটি, নিজেরই আত্মাভিমান। পারবেন। এখনই তো তিনি ঢুকতে যাচ্ছেন না ও-ঘরে।

পায়ে পায়ে এগিয়ে চললেন।

মামাশ্বশুর তাঁর ঝোলা কাঁধে বেরুবার জন্য প্রস্তুত। কালীদা ইজিচেয়ারে অর্ধশয়ান, তাঁর মুখ দেখা যাচ্ছে না, চোখের সামনে সকালের খবরের কাগজ। জ্যোতিরাণী সামনে আসতে গৌরবিমল বললেন, আজ আর থাকা হল না, একজন

পরিচিত ভদ্রলোকের অসুখ খবর পেলাম—

কাগজের ওধার থেকে কালীনাথ নির্লিপ্ত মন্তব্য করলেন, উনি না গিয়ে পড়লে অক্সিজেনের নল ধরার লোকের অভাব।

মৃদুস্বরে জ্যোতিরাণী জিজ্ঞাসা করলেন, কিছুদিন এখন কলকাতায় থাকবেন তো ?

জবাবে কাগজের আড়াল থেকে কালীনাথের গম্ভীর গলা শোনা গেল আবার। —হ্যাঁ। খুব কাছেই যাচ্ছেন—হরিদ্বার। যাবেন আর আসবেন।

হাসিমুখে গৌরবিমল বললেন, তোর বাচালতা গেল না। জ্যোতিরাণীর দিকে ফিরলেন, বাঁদরটার জন্য এতক্ষণ অপেক্ষা করলাম—এলোই না। কোথায় পালিয়ে আছে ঠিক নেই, সদা আবার খুঁজতে বেরিয়েছে, কিন্তু আমি আর দেরি করতে পারছি না…।

জ্যোতিরাণীর মুখে একটা বিরূপতার ছায়া এঁটে বসল। গৌরবিমলের তাও দৃষ্টি এড়ালো না। বললেন, কালীর কাছে শুনলাম ছেলের কথা ভেবে ভেবে আজকাল বেশিরকম অশান্তি ভোগ করছ। ওইটুকু ছেলে, একটু বেশি দুষ্টু হয়ে পড়েছে, তার জন্য অত ভাবার কি আছে। তোমার ভয়ে এই যে এত রাত পর্যন্ত পালিয়ে বসে আছে এটাও ঠিক নয়। এলে বেশি মারধর কোরো না, শাস্তি দিয়ে ওকে ঠাণ্ডা করা যাবে না, উল্টে আরো বিগড়ে যাবে—

কাগজের ওধার থেকে কালীনাথের মুখ আধখানা দেখা গেল।—যাকে বলছ সে আরো বেশি বিগড়চ্ছে বোধ হয়।

মিথ্যে বলেননি। জ্যোতিরাণীর ঠাণ্ডা সংযত দৃষ্টি সদয় নয় একটুও। ছেলের দৌরাত্ম্য থেকেও এঁদের সৎ পরামর্শগুলো বেশি অসহ্য।

হাসিমুখে গৌরবিমল জ্যোতিরাণীকে লক্ষ্য করলেন একটু।—তোমাকে একটা কথা বলে রাখি, ছেলেটা দিনকে দিন দুরন্ত হচ্ছে বলে ও এ-রকমই থাকবে না। হাসলেন আবার, তোমার শাশুড়ীর মত বংশের সেই বিরাট পুরুষ ফিরেছে বলছি না, কিন্তু ওকে দেখলে আমার আর পাঁচটা ছেলের মত মনে হয় না—ও ঠিক বদলাবে। তবে তোমাদের ইচ্ছেমত রাতারাতি বদলে যাবে না হয়ত…

তিনি চলে গেলেন। জ্যোতিরাণী নিজের ঘরে চলে এলেন। মামাশ্বশুরের মারফত কালীদাই এই উপদেশ বর্ষণের ব্যবস্থা করলেন মনে হতে ক্ষোভ আরো বেশি। রাগ বেশি হলে তাঁর সর্বশরীর সিরসির করে কেমন। তাই করছে। এখনকার মত অন্তত ছেলেটা পালিয়ে বেঁচেছে। তাকে হাতে পেলে এই উপদেশের ফল আরো অকরুণ হত।

ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে মাঝেসাঝে গ্রামের বাড়িতে যেতেন জ্যোতিরাণী। সেখানে সাঁতার শিখেছিলেন। হাঁটুজলে দাপাদাপি করতে দেখে বাবাই সাঁতার শিখিয়ে দিয়েছিলেন। নতুন সাঁতার শিখেই পুকুরপাড় থেকে একটু দূরে চলে গিয়েছিলেন তিনি। তারপর যত প্রাণপণে জল ভাঙেন, ঘাট যেন কিছুতে আর এগিয়ে আসে না। প্রাণান্তকর অবস্থা। দু-পাঁচ হাত দূরের ঘাট বুঝি দূরেই থেকে যাবে, অথচ সাঁতার তো কেটেই চলেছেন।

আজকের অনুভূতিটাও সেইরকম। যে প্রতিকূলতা অতিক্রম করার জন্য তিনি অবিরাম যুঝছেন কাল থেকে, সেটা খুব দুস্তর মনে হয়নি। অথচ পেরে উঠছেন না। একের পর এক বাধা যেন ষড়যন্ত্র করেই ঠেলে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে তাঁকে।

শয্যায় বসলেন। বিকেলের এই কটা ঘণ্টা মুছে ফেলতে হলে আবার খানিক যুঝতে হবে। বিভাসবাবু আজ না এলেই ভালো ছিল। মেয়েটার অঘটন হত না। চেষ্টা করেও জ্যোতিরাণী আঘাতে রক্তপাতে বিবর্ণ একখানা কচিমুখ ভুলতে পারছেন না।

বিষম চমকে খাট থেকে নেমে দাঁড়ালেন। উৎকর্ণ।

পাশের ঘর থেকে চাপা গর্জন ভেসে আসছে। খুব চাপা। সেই সঙ্গে প্রহারের ঠাস ঠাস শব্দ। জ্যোতিরাণী বিমূঢ় হঠাৎ। এভাবে কে কাকে মারছে!

দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। পাশের ঘরে দরজার কাছেই পরদার এধারে সদা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অদূরে বিমূঢ়মূর্তি মেঘনা। জ্যোতিরাণীকে দেখেই সদা বারান্দা ধরে ছুটল। মেঘনাও চকিতে সরে গেল। ঘরের মধ্যে বেধড়ক মারের শব্দ আর চাপা গর্জন।

পরদা সরিয়ে জ্যোতিরাণী দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে গেলেন। মার খাচ্ছে ছেলে—সিতু। মারছে তার বাবা। এলোপাথারি মারের চোটে ছেলেটাও বুঝি হকচকিয়ে গেছে।

কেন আলোয় হাত দিয়েছিলি···কেন আলো নিভিয়েছিলি···!

অস্ফুট ক্রুদ্ধ উক্তি কানে আসা মাত্র জ্যোতিরাণী নিস্পন্দ একেবারে।

স্ত্রীকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে শিবেশ্বরের মাথায় রক্ত দ্বিগুণ চড়ল। মার নয়, মারের উল্লাস। মারের চোটে সিতু মেঝেয় বসে পড়েছে। হাত দিয়ে হল না, চোখের পলকে শৌখিন ছড়িটা নিয়ে এলেন শিবেশ্বর। সপাসপ মেরে চললেন। কুকুর-বেড়াল মারার মত। ছেলেটা মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে, এক-একটা চাবুক পড়ছে আর ককিয়ে উঠছে।

জ্যোতিরাণী দেখছেন। দরজা ছেড়ে এগিয়ে গেলেন না, বাধা দিলেন না। স্থির দাঁড়িয়ে দেখছেন।

আর সুইচ ধরবি, আলোয় হাত দিবি... ! চাবুক থামছে না। -

ঝড়ের মত ঘরে ঢুকলেন কালীনাথ। থমকে দেখলেন এক মুহূর্ত। তারপরে ছুটে গিয়ে সিতুকে আড়াল করতে চেষ্টা করলেন।

সরো'! সরে দাঁড়াও বলছি ! এবারের গর্জনে ঘর কেঁপে উঠল।

কালীনাথ থমকালেন বটে, সরলেন না। গম্ভীরমুখে বললেন, দাও না দু-ঘা বসিয়ে···রাগের মাথায় খুব দোষের হবে না। ঝুঁকে সিতুকে মেঝে থেকে তুলে নিলেন। আঘাতের চিহ্ন দেখে দুচক্ষু স্থির। সর্বাঙ্গ দাগড়া দাগড়া হয়ে ফুলে উঠেছে, কেটেও গেছে ক'জায়গায়। এমন কি, গলায় মুখেও মারের দাগ ফুটে উঠেছে।

আরো আশ্চর্য, আধমরা হয়েও ছেলেটা আর্তনাদ করেনি, চিৎকার করে দাপাদাপি করেনি। যাতনায় কাতরাচ্ছে শুধু।

বিষম উতলামুখে ঘরে ঢুকলেন বৃদ্ধা কিরণশশী। খবরটা দিয়ে মেঘনাই সম্ভবত তাঁর আফিমের মৌজ ছুটিয়ে দিয়েছে। চোখে ভালো দেখতে পান না, তবু ঝড় যে একপ্রস্থ হয়েই গেছে সেটা অনুমান করতে দেরি হল না। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে কালীনাথের কোলে প্রহারজর্জর সিতুর গায়েপিঠে হাত দিয়েই হাউমাউ করে উঠলেন তিনি।—একেবারে শেষ করেছে নাকি ? আঁ ? কি করলি তুই—ছেলে যে নেতিয়ে পড়েছে গো !

শিবেশ্বরবাবু অল্প অল্প হাঁপাচ্ছেন তখনো। আড়চোখে দোরগোড়ার একজনেরই প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলেন তিনি। তারপর হাতের ছড়িটা যথাস্থানে রেখে গম্ভীরমুখে খাটে এসে বসলেন। সিতুকে নিয়ে কালীনাথ ততক্ষণে ঘরের বাইরে চলে এসেছেন। বিড়বিড় করতে করতে কিরণশশীও।

জ্যোতিরাণী দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর নিষ্পলক দু চোখের আওতায় একখানি মাত্র মুখ। সেই মুখ শিবেশ্বরের।

···সকাল থেকে জ্যোতিরাণী এই ঘরে আসবেন বলে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তাই এলেন বটে। পায়ে পায়ে খাটের পাঁচ হাতের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন।

ওকে এভাবে মারলে কেন ?

নির্লিপ্ত গম্ভীরমুখে শিবেশ্বর ফিরলেন তাঁর দিকে। চোখে চোখ রাখলেন। ছেলেকে শাসন করাটা সার্থক হয়েছে মনে হল।—কৈফিয়ৎ দিতে হবে ?

দিলে ভাল হয়।

ভালো কাজ তো আমি কখনো করিনি। বিদ্রূপের চেষ্টায় গম্ভীর মুখ বিকৃত হল ঈষৎ। চেয়ে আছেন। কি যেন ব্যতিক্রম চোখে পড়ছে। সিঁদুরের টিপটাই বোধ হয়।

মারলে কেন? আরো সংযত আরো মৃদু-কঠিন জ্যোতিরাণীর গলার স্বর।

গাম্ভীর্যের তলায় তলায় এক ধরনের আনন্দ উপভোগ করছেন শিবেশ্বর। পাল্টা প্রশ্ন করলেন, বাইরের লোকের সামনে ছেলে গোটা নীচের তলা অন্ধকার করে দিয়ে পালিয়েছে, তোমার তাতে আপত্তি হয়নি বোধ হয়?

জ্যোতিরাণী দেখছেন। দেখছেন, দেখছেন, দেখছেন। যতখানি দেখে নিতে পারা যায় দেখছেন।—হয়েছে। কিন্তু তোমার আপত্তি কি জন্যে; অন্ধকার করেছে বলে না বাইরের লোক ছিল বলে?

প্রচ্ছন্নতার পরদা সরে গেল। পুরু ঠোঁটের ফাঁকে ক্রূর হাসির আভাস। চোখের কোণে সেই হাসি একটা হিংস্র অভিলাষের মত চিকচিকিয়ে উঠল। জবাব দিলেন না।

তুমি তাহলে কাকে মারলে?

ছেলেকে। চোখে দেখেও বুঝতে অসুবিধে হল?

প্রাণপণে নিজেকে সংযত করে রাখলেন জ্যোতিরাণী। মাথা নাড়লেন, বুঝতে অসুবিধে হয়েছে। চোখে আগুনের কণা। আরো একটু দাঁড়িয়ে বুঝতেই চেষ্টা করলেন। তারপর ঘর ছেড়ে নিজের ঘরে চলে এলেন।

মনের কাছ থেকে বুকের কাছ থেকে অনেক—অনেক দূরে সরে গেছে এই দিনটা। বাইরের আনন্দের রেশ অস্পষ্ট নয় এখনো, কিন্তু জ্যোতিরাণীর কানে কিছু ঢুকছে না। আলো নেই, বাতাস নেই, শুধু চাপ চাপ অন্ধকার। বিভাস দত্তের রচনার সেই জীবন্ত অন্ধকার। সেই অন্ধকার আর অন্ধকারে গড়া সেই মূর্তি। অন্ধতামিস্র। একটানা অনেকগুলো বছর তো এরই মধ্যে কেটেছে। আজ এমন দমবন্ধ হয়ে আসছে কেন? এমন রিক্ত, নিঃস্ব, সর্বস্বান্ত মনে হচ্ছে কেন?

অন্ধকারের সমুদ্রের ওধারে যে আলোর তট উঁকিঝুঁকি দিয়েছিল, সেটা নিছক কল্পনা। সেটা আলেয়া। কল্পনার আলোটুকুও সরে গেলে বাকি থাকে কি?

গত রাতে আলো নেভানোর কাণ্ডর পর জ্যোতিরাণীর হাতে পড়লেও ছেলের রক্ষা থাকত না। আর আজ কচি মেয়েটার অত রক্তপাত দেখার পর ছেলেকে হাতের কাছে পেলে কি যে কাণ্ড হত তিনি জানেন না।…শাস্তি তার থেকে অনেক বেশিই হয়েছে। কিন্তু শাস্তির এমন কুৎসিত দিক আর কি দেখেছেন?

…আলো নেভানোর ঘটনা আজকের নয়, গত রাতের। এসে শুনল কার

কাছে ? মামাশ্বশুর বা কালীদার মুখে শুনে থাকতে পারে। তাঁরা ছেলের দুরন্তপনার লঘু ফিরিস্তি দিয়ে থাকতে পারেন, নালিশ করেননি নিশ্চয়। শাশুড়ীও বলে থাকতে পারেন।...বাড়ি ফিরলে ছেলে বুড়ী মায়ের ঘরে একবার উঁকি দিয়ে তাঁকে নিশ্চিন্ত করে নিজের ঘরে ঢোকে। তখন নাতির প্রসঙ্গেই বেশি গল্প করেন শাশুড়ী। তাঁর বলাও বিচিত্র নয়।

যে-ই বলুক, শুধু কালকের ব্যাপার বলেই চুপ করে থাকেনি নিশ্চয়। দুরন্ত ছেলের আজকের অপরাধও কানে গেছেই। যেটা ক্ষমার অযোগ্য। কিন্তু শাস্তি শুধু কালকের অপরাধের জন্য। জ্যোতিরাণী নিজের কানে শুনেছেন। আজকের ব্যাপারটা তুচ্ছ। রক্তপাতের খবর শুনে রক্ত গরম হয়নি, হয়েছে আলো নেভানোর কথা শুনে।

কতক্ষণ কেটেছে খেয়াল নেই। নিস্পন্দ মূর্তির মত বসে ছিলেন জ্যোতিরাণী। মাথার মধ্যে দাউ দাউ জ্বলছে যা, বাইরে তার প্রকাশ নেই।

টেলিফোন। ঝনঝন শব্দ মগজে গিয়ে বাজল। অসহিষ্ণু দৃষ্টিটা সেদিকে ফিরল। যতক্ষণ না ধরবেন, ওটা বাজবেই। দুনিয়ার কোনো যোগাযোগ কাম্য নয় এখন। ঘর থেকে ওটা বিদায় করার কথা আগেও অনেকদিন ভেবেছেন। বাড়িতে চারটে টেলিফোন। মালিকের শোবার ঘরে একটা, নীচে বসার ঘরে একটা—একটা কালীদার ঘরে, আর একটা এখানে। আগে এ-ঘরে টেলিফোন ছিল না, তখন পাশের ঘরের টেলিফোনে ডাক পড়ত। কিন্তু মালিকের উপস্থিতিতে জ্যোতিরাণী অনেক সময় টেলিফোন ধরতেন না। বলে দিতেন ব্যস্ত আছেন, পরে তিনি ফোন করবেন। কেউ তাঁর কাছে ফোন নম্বর চাইলে কালীদার ঘরের নম্বর দিয়ে দিতেন। হঠাৎ কালীনাথই একদিন তাঁর ঘরে ফোন এনে হাজির। এটা কর্তার নির্দেশ কি কালীদার নিজস্ব বিবেচনার ফল, জ্যোতিরাণী জানেন না।

হ্যালো!

মিত্রা বলছি, অসময়ে বিরক্ত করলাম নাকি ?

না...

গলা ভার-ভার কেন ?

না, বলো...।

সকালে টেলিফোন করেছিলাম তোমার ছেলে বলেছিল তো ?

হ্যাঁ।

জোর তলব পেয়ে চন্দননগর চলে গেছলাম, আজ ফিরতে পারব ভাবিনি। ...গিয়ে দেখি তোমার কর্তাও উপস্থিত সেখানে, ফাঁক পেয়ে তাঁর সঙ্গেই পালিয়ে

এলাম। খুব হৈ-চৈ করে কাটল দিনটা, আর তোমার ছেলের কাণ্ড শুনে তো সকলে হেসে সারা।

জ্যোতিরাণী এইবার মন দিলেন একটু—ছেলের কি কাণ্ড?

ও মা, জানো না বুঝি! সকালে তুমি ঘরে ছিলে না, তোমার ছেলের কথা শুনে আমি হেসে বাঁচি না! বলে দিল, ওর সঙ্গে তোমার দেখাই হবে না, নীচের সব আলো নিবিয়ে দিয়ে বিভাসবাবুকে সত্যিকারের অন্ধকার দেখিয়ে দিয়েছে বলে তুমি নাকি হাতে পেলে ওকে আর আস্ত রাখবে না। এত বড় সাহিত্যিকের বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা শুনে সকলে ভারী খুশি—কি বিচ্ছু ছেলে বাবা তোমার, ভালো চাও তো সামলাও।

কানের ভিতর দিয়ে মিত্রাদির হাল্‌কা কথাগুলো মাথার মধ্যে নড়াচড়া করে ফিরল একপ্রস্থ। খুব ঠাণ্ডা নির্লিপ্ত জবাব দিলেন, কিছু ভেবো না, ছেলেকে সামলাবার ব্যবস্থা তার বাবা ফিরে এসেই করেছেন।

সে কি! মিত্রাদির কণ্ঠস্বর বিলক্ষণ হোঁচট খেল, বকাবকি করেছেন নাকি? ভদ্রলোকের কাণ্ড…ওখানে তো দিব্যি হাসছিলেন! এ মা…নেহাত হাসির ব্যাপার বলেই……

এখানেও হাসির ব্যাপারই করেছেন, তোমার লজ্জা পাবার কারণ নেই। কথা বলতে হচ্ছে বলেই ঠোঁটের একদিক কুঁচকে যাচ্ছে জ্যোতিরাণীর।—তোমার খবর কি, এ সময় হঠাৎ আমাকে মনে পড়ল কেন?

প্রসঙ্গ বদলাতে পেরে ওধারের মহিলা স্বস্তি বোধ করলেন সম্ভবত। কথার সুরে আবার লঘু প্রীতির আমেজ।—মনে পড়বে না, এমন একটা দিনে দেখাই হল না তোমার সঙ্গে, তাই ভাবলাম টেলিফোনে অন্তত দেখাটা হোক।

আরো দুই এক কথার পর মুক্তি পাওয়া গেল। রিসিভার রেখে জ্যোতিরাণী সেখানেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন খানিক। মুখে লালের আভা স্পষ্ট। ভাবতে পারলে ভাবার মত কিছু আছে। এক্ষুনি আর একবার পাশের ঘরে ঢুকতে ইচ্ছে করছে, দেখতে ইচ্ছে করছে, কিছু বলতেও ইচ্ছে করছে। কি দেখতে বা কি বলতে—জ্যোতিরাণী জানেন না। উদগ্র তাড়নার মত একটা ইচ্ছে শুধু।

…গতকালের খবর কোথায় পেয়েছে বোঝা গেল। নির্মম শাসনের হেতুও। না, মিত্রাদির ওপর রাগ হচ্ছে না জ্যোতিরাণীর।…মিত্রাদির হাল্‌কা স্বভাব, হাসির রসদ পেলে মুখ শেলাই করে থাকতে পারে না। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবলে ছেলে হাসির ব্যাপারই করে বসেছিল গতকাল। তাই বলাটা দোষের হয়নি ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু স্বভাব যেমনই হোক, মিত্রাদিকে নির্বোধ ভাবেন না জ্যোতি-

রাণী।···একসঙ্গে ফেরার পর রাতে ফোন করার দরকার হল কেন তাঁর? স্বাধীনতার শুভেচ্ছা জানানো? মনের সায় পেলেন না এখানেই।···ছেলের সঙ্গে সকালে টেলিফোনের প্রসঙ্গ আপনি ওঠেনি, মিত্রাদি তুলেছে। সে কি তার মনে পড়লেই হাসি পায় বলে? চন্দননগরেও মনে পড়েছে, আবার অত হৈ-চৈ করে রাতে বাড়ির ফেরার পরেও মনে পড়েছে?

···জ্যোতিরাণীর ধারণা, মিত্রাদি শুধু একটা কথাই সত্যি বলেনি। ছেলের কাণ্ড শুনে ছেলের বাবারও হাসার খবরটা। ছেলের বাবাকে মিত্রাদি একেবারে মন্দ চেনে না। গাড়িতে একসঙ্গে ফেরার পথে ছেলে সকালে টেলিফোনে কি বলেছে না বলেছে খুঁটিয়ে মিত্রাদিকে ফিরে আবার জিজ্ঞাসা করাও অস্বাভাবিক নয়। বরং পুরোমাত্রায় স্বাভাবিক। পুরনো রোগ চাপা পড়লে মনে হয় সেরে গেছে। কিন্তু সারে না বড়। মিত্রাদিও রোগের খবর রাখে। কালীদার সঙ্গে যোগাযোগ ঘোচেনি যখন, খবর না রাখার কারণ নেই। এই জন্যেই মিত্রাদি ঘাবড়েছে। ···আর এই জন্যেই এ সময়ে টেলিফোন।

মিত্রাদি পাকা লোক। দু'কূল রাখতে জানে।

ঘরে আর থাকা গেল না, জ্যোতিরাণী বেরিয়ে এলেন। চুপচাপ ঘরে বসে ভাবার অবকাশ পরে পাবেন। স্নায়ুগুলোর একটাও বশে নেই এখন। এ রকম হলে অনেক সময় চুপচাপ গোটা বাড়িটাতে ঘুরে বেড়ান, ওপর-নীচ করেন। নয়তো কিছু একটা কাজে লেগে যান। যা-হোক কিছুতে মন দিতে চেষ্টা করেন।

সেই অভ্যাসেই বেরিয়ে এলেন। এর থেকেও নগ্ন গ্লানি সহ্য করে অভ্যস্ত তিনি। তবু এই দিনের সঙ্গে অন্য দিনের অনেক তফাত। বিদ্যুতের আলো ঝলসে ওঠার পর আঁধার দ্বিগুণ ঘন মনে হয়। সমস্ত দিনভ'র যে আলোর কল্পনায় মগ্ন ছিলেন তিনি, সেটা আলো নয়, আলোর চমক। তাই দ্বিগুণ হতাশা, দ্বিগুণ জ্বালা, দ্বিগুণ যাতনা।

জ্বলন্ত দৃষ্টি রঙিন পুরু পরদায় ব্যাহত হয়ে ফিরে এলো। ধীর পায়েই পাশের ঘরের দরজা অতিক্রম করলেন। রাত মন্দ হয়নি, তবু কেউ এখনো খেতে বসেনি হয়ত। বসলে মেঘনা বা সদা এসে খবর দিত। খাবার ঘরের সরু বারান্দার এধারে কালীদার ঘর।

জ্যোতিরাণী দাঁড়িয়ে গেলেন।

কালীদার খাটে সিতু শুয়ে। গলা পর্যন্ত চাদরে ঢাকা। ঘুমিয়ে পড়েছে। তার একদিকে কালীদা বসে, অন্যদিকে শাশুড়ী। তাঁর একখানা হাত সিতুর গায়ে, হাত বুলোতে বুলোতে ঢুলুনি এসেছে।

এসো, গম্ভীর মুখে কালীনাথ ডাকলেন, তোমাকে ডাকতে পাঠাব ভাবছিলাম। শাসনটা ভালই হয়েছে, বেশ জ্বর এসে গেছে। চিকিৎসা আপাতত আমিই করলাম, ডাক্তার ডাকলেও তো লজ্জা, মারের দাগ দেখে সে হয়ত পুলিসেই খবর দিয়ে বসবে।

শাশুড়ীর ঢুলুনি গেছে তৎক্ষণাৎ। ঘাড় ফিরিয়ে জ্যোতিরাণীকে দেখে নিলেন। থমথমে মুখ। রাগে খাট থেকে নেমে দাঁড়ালেন তিনি। কালীনাথকে বললেন, আমার কথার জবাব দিলি না যে? গয়াতে হোক কাশীতে হোক যেখানে হোক আমাকে পাঠিয়ে দে তুই। তারপর মারুক ধরুক কাটুক যা খুশি করুক—চোখের সামনে এ অত্যাচার আর দেখতে পারিনে আমি।

কালীনাথের চোখ আর একপ্রস্থ দরজার দিক ঘুরে পিসির দিকে ফিরল। গাম্ভীর্যের ব্যতিক্রম ঘটল না। বললেন, মহাপুরুষের ওপর দিয়ে এ-রকম ঝড়জল গিয়েই থাকে, বংশের ঠাকুর ফিরেছে বলো আর ঠাকুর ফেলে তুমিই পালাবে? মুখে বিদ্রূপের একটা রেখাও পড়ল না।—এ-রকম আর দু-পাঁচটা শাসনের ধকল সামলে উঠতে পারলে নাতি তোমার মহাপুরুষ-টুরুষ গোছের কিছু হয়ে বসতেও পারে—দেখো না কি হয়।

শাশুড়ীর রাগ চড়ল আরো। মুখঝামটা দিয়ে উঠলেন তিনি, তোরাই দেখ, আমার আর দেখে কাজ নেই—ভালো চাস তো আমাকে পাঠিয়ে দে কোথাও।

রাগে গরগর করতে করতে যতটা সম্ভব দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি। বউয়ের দিকে ফিরেও তাকালেন না।

উঠলেন কালীনাথও। গলার স্বর একই রকম নির্লিপ্ত। তুমি বোসো এখানে, মার দেখে খিদে পেয়ে গেছে, খেয়ে আসি।…জ্বর বেশি, ঘুমের মধ্যেও কেঁপে কেঁপে উঠছে, একা রাখা ঠিক হবে না।

চলে গেলেন। পায়ে পায়ে জ্যোতিরাণী বিছানার সামনে এসে দাঁড়ালেন। ছেলে ঘুমুচ্ছে। মুখটা লাল। দূর থেকেও প্রহারের দুই একটা চিহ্ন চোখে পড়ল। গায়ের চাদর সরালে কত চোখে পড়বে ঠিক নেই। ঘুমের মধ্যেও কষ্ট পাচ্ছে বোঝা যায়। জ্যোতিরাণী দেখছেন। ছেলের ঘুমন্ত মুখ শিগ্‌গীর নজর করে দেখেছেন বলে মনে পড়ে না।…দুরন্তপনার চিহ্নও নেই। বরং অসহায় কচি মুখই একখানা। প্রহারজর্জর বলেই এমন অসহায় লাগছে কিনা জানেন না।

বুকের তলায় খচখচ করে উঠল কেমন।…মার খেয়েছে ঘণ্টাখানেক হয়ে গেল। এত মার কখনো খায়নি। জ্বর এসে গেছে। কিন্তু এতক্ষণের মধ্যে ছেলের কথা একবারও ভাবেন নি তিনি। মানুষটা অপমান তাঁকেই করেছে বটে,

এই দিনটাকেও ব্যর্থতার নিঃসীম গহ্বরে ঠেলে দিয়েছে। কিন্তু তার জের সামলাতে ছেলেটার কি হাল হল একবারও মনে পড়েনি। তিনি শুধু নিজের অপমান, নিজের যাতনা, নিজের ক্ষোভ নিয়েই ছিলেন এতক্ষণ। এদিকে না এলে জানতেও পারতেন না কি হয়েছে।

...দেখছেন। আরো কাছে গিয়ে বসতে ইচ্ছে করছে। গায়ে একখানা হাত রাখার জন্য আঙুলের ডগাগুলো সিরসির করছে। কিন্তু জ্যোতিরাণী তা পারলেন না। জ্যোতিরাণীর স্বাভাবিক সহজতায় চিড় খেয়েছে আজ নয়। আজকের এ ব্যাপার না ঘটলেও পারতেন কিনা সন্দেহ।

না পারারও যাতনা আছে। ঘুমন্ত ছেলের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে নিঃশব্দে হঠাৎ সেই যাতনাই ভোগ করেছেন জ্যোতিরাণী। আর সেই সঙ্গে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটু আশার আলো উঁকিঝুঁকি দিতে চাইল মনের তলায়। যে প্রসঙ্গ অনেক শোনা সত্ত্বেও মনের কোথাও রেখাপাত করেনি কখনো, ছোট একটা লোভের বস্তুর মত সেটাই যেন চিকচিকিয়ে উঠতে চাইল। সেই অসম্ভব কল্পনা জ্যোতিরাণী আগে যেমন ছেঁটে দিয়েছেন মন থেকে, এখন তেমন পারছেন না কেন?...শোনা যায়, ফাঁসির আসামী পর্যন্ত জীবনের আশায় গোটাগুটি জলাঞ্জলি দিয়েও শেষ নিষ্পত্তির আগের মুহূর্ত পর্যন্ত বিস্ময়কর দৈব কিছু ঘটে যেতে পারে ভাবে।

এও কি অতটাই অসম্ভব? তবু আশা ছাড়া মানুষ বাঁচেই না বুঝি। ওই ভাবনার দিকেই ঝুঁকতে চাইছে ভিতরটা।

...একটু আগেও তাঁকে শুনিয়ে কালীদা ওই নিয়ে পিসিকে ঠাট্টা করে গেলেন।...মহাপুরুষের ওপর দিয়ে এ-রকম ঝড়ঝাপটা গিয়েই থাকে বললেন। আর বললেন, এ-রকম দু-পাঁচটা শাসনের ধকল সামলে উঠতে পারলে মহাপুরুষ-টুরুষ গোছের কিছু হয়ে বসতেও পারে।

...বংশের সেই ঠাকুর ফিরল, মহাপুরুষ বুঝি মুখ তুলে তাকালো, সেই বিরাট পুরুষের প্রত্যাবর্তন ঘটল, প্রভুজী এলো—ছেলের প্রসঙ্গে এমন আজগুবী প্রত্যাশার কথা শাশুড়ীর মুখে এযাবৎ কত শুনেছেন ঠিক নেই। শুধু শাশুড়ী কেন, ওই এক কথা শুনে শুনে বিগত শ্বশুরটিও হয়ত একটু ভিন্ন চোখেই দেখা শুরু করেছিলেন নাতিটিকে। বংশের ওই বিরাট পুরুষের অবিশ্বাস্য আখ্যান জ্যোতি-রাণী বিয়ের পরেই শুনেছিলেন। ঠিক যেমন করে জ্যোতিরাণীর শাশুড়ী শুনে-ছিলেন তাঁর শাশুড়ীর মুখে। আবার সেই শাশুড়ীরও হয়ত তাঁর পূর্ববর্তিনীর মুখে শোনা। যাই হোক, সেই আখ্যানের সম্পদটুকু জ্যোতিরাণীর শাশুড়ী পর্যন্তই স্মৃতির কোঠায় সঞ্চয় করে রেখেছিলেন। তাঁর পরে কোনো এক কালের সেই

নিরুদ্দিষ্ট মহাপুরুষের অস্তিত্বের কাহিনী আর প্রচার পাবে এমন আশা রাখেন না। সেই খেদেই সম্ভবত আরো বেশি করে অদেখা ঠাকুরটির মহিমা কীর্তন করতেন বর্তমানের শাশুড়ী কিরণশশী।

নাতির মধ্যে তাঁর সেই মহাপুরুষের লক্ষণ আবিষ্কারের উদ্দীপনা দেখে জ্যোতিরাণী গোড়ায় গোড়ায় হাসতেন। শেষে বিরক্ত হতেন। এখন তো শুনলে রাগই হয়। রাগ যে হয় সেটা শাশুড়ীও টের পান। কর্তার কাল আর নেই, বউয়ের রাগটাগগুলো একেবারে উপেক্ষাও করতে পারেন না। ফলে দৈবলক্ষণ আবিষ্কারের আগ্রহ বা বিশ্বাসের সরব আতিশয্য ইদানীং কমেছে। কিন্তু আর পাঁচজনে ঠাট্টা করতে ছাড়ে না তা বলে।

...কালীদা সেই ঠাট্টাই করেছেন। জ্যোতিরাণী সচকিত হলেন।... মামাশ্বশুর গৌরবিমল? তিনিও তো বিকেলে কিছু বলে গেছেন। তিনি ঠাট্টা করেননি। কোনো মহাপুরুষ-টুরুষের অসম্ভব কল্পনার কথা তিনি বলেননি। শুধু বলেছেন, ওকে দেখলে আর পাঁচটা ছেলের মত মনে হয় না—ও ঠিক বদলাবে।

জীবনের চকচকে আশার সঙ্গে ওই ভদ্রলোকের যোগ কম। সেটা জ্যোতিরাণীর থেকে বেশি আর কেউ জানে কিনা সন্দেহ। আশা পরিহারের নির্লিপ্ত শক্তির প্রতিই আস্থা বরং অনেক বেশি এখন। যাবার আগে তিনি ওই আশ্বাস দিয়ে গেলেন কেন? তিনি কি দেখেছেন?

কি দেখেছেন, ঘুমন্ত ছেলের দিকে চেয়ে জ্যোতিরাণী তাই যেন অনুভব করতে চেষ্টা করলেন। যা তিনি বলে গেছেন তার সাদা অর্থ ছেলে অমানুষ হবে না শেষ পর্যন্ত, সাধারণ আর পাঁচজনের তুলনায় বরং ভালো হবে। বুকের তলায় আবার যেন কি হচ্ছে জ্যোতিরাণীর। অন্যরকম কিছু। ওই আশ্বাসটুকুই আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করছে। কোথায় যেন একটা গল্প পড়েছিলেন বা শুনেছিলেন।...এক গরীব শিল্পীর গল্প। ঘরে বসে সুরের জাল বুনত। অন্ধ আক্রোশে অকরুণ পাওনাদার বাজনার তারগুলো সব টেনে টেনে ছিঁড়ে দিয়ে গিয়েছিল। শিল্পীর বুকের তারগুলোও। বোবা কান্না চেপে শিল্পী সেই ছেঁড়াখোড়া বাজনাটা দেখছিল। হঠাৎ মনে হল নীচের দিকের একটাই মাত্র সূক্ষ্ম সরু তার ছেঁড়েনি। আরো আশ্চর্য, হাত পড়তে ওই একটা তারই সুরে বাজছে। শিল্পী বাজনা তুলে নিল, সব কটা ছেঁড়া তারের শোক ভুলে ওই একটা তার নিয়েই আবার তন্ময় সে।

ছেলের দিকে চেয়ে আছেন জ্যোতিরাণী। কিন্তু ভিতরে যেন সুরে বাজছে কিছু।...বাজতে চাইছে।

নিজের অগোচরেই কাছে ঝুঁকলেন। ঘরে কেউ আসতে পারে সে কথা আর

মনে থাকল না। একখানা হাত ছেলের মুখ গাল কপাল স্পর্শ করল।

থতমত খেলেন একটু। হাত সরিয়ে নিলেন। তারপর—তারপর হঠাৎ এ কি দেখলেন জ্যোতিরাণী? এ কি দেখলেন?

হাতের স্পর্শে ছেলে নড়েচড়ে ককিয়ে উঠল একবার। যন্ত্রণাকাতর মুখ বিকৃত হল। দু চোখ মেলে তাকাল সে। কয়েকটা মুহূর্তের জন্য ঘুমের ঘোর গেল। গেল বোধ হয় তাঁকে দেখেই।

প্রথমে বিভ্রম। তারপর বিস্ময়। তারপর?

গলিত রাগ আর ঘৃণা আর বিদ্বেষের একটা ঝাপটা এসে লাগল যেন মুখের ওপর। জ্যোতিরাণী বিমূঢ়। ঘুম তাড়িয়ে ছেলে দেখতেই চেষ্টা করছে তাঁকে। স্বপ্নের ঘোরে গোটাগুটি চোখ তাকিয়ে যেমন দেখে, প্রায় তেমনি। সেই চোখের গভীর থেকে গলিত ঘৃণার মতই উপ্‌চে পড়ছে অপরিসীম বিদ্বেষ।

খাট ছেড়ে জ্যোতিরাণী দু পা পিছিয়ে গেলেন। ওই দৃষ্টিও এদিকেই ফিরবে বুঝি।

না। চোখের পাতা নেমে এলো। তন্দ্রার ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারল না।

জ্যোতিরাণী কাঠ।

একটু বাদে কালীদা এলেন।—ঘুমুচ্ছে তো?

জবাব না দিয়ে জ্যোতিরাণী ঘর ছেড়ে পালিয়ে এলেন। এই মুহূর্তে দুনিয়ার সমস্ত চোখের আড়ালেই বুঝি পালাতে চান তিনি।

শুধু একজনের বাদে। যে একজন তাঁর বুকের তলার সব কটা তারই ছিঁড়েখুঁড়ে একাকার করে দিয়ে গেছে। সুরে বাজবার মত একটা তারও অবশিষ্ট রাখেনি।

সেই একজনের ঘরের সামনেই দু পা থেমে গেল আবার। ভিতরে আলো জ্বলছে না। বাইরের বারান্দার আলোও নেভানো। নিজের ঘরে ঢুকেও জ্যোতিরাণী প্রথমেই আলোটা নেভালেন। তারপর দরজা বন্ধ করলেন।

অন্ধকার।···বিভাস দত্তর লেখা সেই অন্ধকার। দস্যি ছেলে সব আলো নিবিয়েও এত অন্ধকার করতে পারেনি বোধ হয়। রচনাটা কাল আগাগোড়া ভালো করে পড়ে দেখতে হবে।

শয্যা···। ঘুমই পাচ্ছে। শুয়ে পড়লেন। বিরক্তিতে নাকমুখ কুঁচকে উঠে পড়লেন তক্ষুনি। ওধারের জানলার ফাঁক দিয়ে একফালি আলো সরাসরি বিছানায় এসে পড়েছে লক্ষ্য করেন নি। অসহিষ্ণু হাতে জানলাটা বন্ধ করে আবার এসে শুয়ে পড়লেন।

নিশ্চিন্ত।…সুরে কিছু বাজেনি, বাজবে না। সব কটা তারই ছিঁড়েছে।

'…এ-রকম দু-পাঁচটা শাসনের ধকল সামলে উঠতে পারলে মহাপুরুষ-টুরুষ কিছু হয়ে বসতেও পারে।' কালীদার ঠাট্টায় মাত্রাজ্ঞান নেই। ঘুম পাচ্ছে…।

…মামাশ্বশুর ঠাট্টা করেননি, আশ্বাসই দিয়ে গেছেন, বলেছেন, ও বদলাবে একদিন। কিন্তু নিজে তিনি কি দেখেছেন? কিসের ঝাপ্‌টা খেয়ে পালিয়ে এসেছেন ছেলের কাছ থেকে?

বেজায় ঘুম পাচ্ছে জ্যোতিরাণীর।

ঘুমিয়েই পড়লেন কিনা জানেন না। চোখের সামনে দিয়ে কি সব হিজিবিজি বার হয়ে যাচ্ছে একটাও ধরতে পারছেন না। চোখের সামনে নয়। চোখে তো রাজ্যের ঘুম।…মগজের মধ্য দিয়ে বোধ হয়। কিন্তু হঠাৎ এ আবার কি?…দিনের আলো। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছেন? সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল জ্যোতিরাণীর। কি দেখছেন?

…দেখছেন, তিনি বসে আছেন। সামনে শাশুড়ী। কপালে টক্‌টকে সিঁদুর। পরনে চওড়া লালপেড়ে শাড়ি। তাঁর তাজা মুখে ভাবের শিহর। কোলে এগারো দিনের এক শিশু। শিশুর ঝাঁকড়া কালো চুলের মধ্যে একটামাত্র চুলের ওপর তাঁর কাঁপা আঙুলের স্পর্শ। ধপধপে সাদা একটা পাকা চুল শিশুর মাথায়! বিস্ময়ে আবেগে প্রায় আর্তনাদের মতই শাশুড়ীর কণ্ঠস্বর। কর্তার নির্দেশমত বউয়ের নাম ধরে ডাকতেও ভুলে গেছেন।—এ কি গো! সত্যিই প্রভুজী ফিরলেন নাকি গো বউমা! অ্যাঁ? ওরে কে আছিস কর্তাকে ডাক্ শিগগীর! দেখো দেখো বউমা, ঘরে কে বুঝি এলো—শিগগীর দেখো!

॥ নয় ॥

বংশের সেই বিশ্রুত পুরুষ মানিকরাম।

স্বাধীনতার এই দিনটি থেকে প্রায় একশ চল্লিশ বছর আগে যাঁর আবির্ভাব।

তাঁর আগে অনেকে এসেছেন, পরেও। কিন্তু পরিবারটির ধারা যাঁর স্মৃতি নিয়ে পুষ্ট, তিনি মানিকরাম।

সেই পুরুষের কোনো স্মৃতিকথা লেখা হয়নি। ফলে শিবেশ্বরের পিতৃপুরুষ পর্যন্ত যে স্মৃতি সচল ছিল, তাতে আগের কয়েক পুরুষের কল্পনার ধারা মেশাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই স্মৃতির কতটুকু সত্য আর কতটুকু কল্পনা তা নিয়ে কেউ

মাথা ঘামায়নি। স্মৃতি শুধু বিশ্বাসের রূপ নিয়েছে। কারো আমলে সেই বিশ্বাস ভিন্নমুখী প্রবৃত্তির তলায় চাপা পড়েছে, কারো সময়ে বা আবেগমুখর হয়েছে।

ঐতিহ্যের বিচারে বংশের আদিপুরুষ এই মানিকরাম বলে গিয়েছিলেন ফিরবেন। বলেছিলেন, যাঁকে ফেরাতে বেরুলেন তাঁকে নিয়েই ফিরবেন। কোনো একদিন ফিরবেন।

সেই যুগের ইতিহাস আজ বাণীহারা।

আজকের মত সেদিনও প্রতি উষার পূব আকাশে লাল সূর্য উঠত, সায়াহ্নে অস্ত যেত, রাত হত, পাখির মুখে আবার নতুন দিনের ঘোষণা শোনা যেত। আজকের মত সেদিনও সৃষ্টির তলায় তলায় বহু ধ্বংসের মশাল জ্বলত, ধর্ম আচরণের ফাঁকে ফাঁকে বহু কুৎসিতের স্রোত বইত—জ্ঞানের পাশাপাশি আপসহীন বহু অজ্ঞতারও। বদান্যতার নীল আকাশ হিংসার কালো মেঘে ছেয়ে যেত, তারই ফাটলে ফাটলে উদারতার বিদ্যুৎচমকও চোখে পড়ত। ভোগের উৎসে বহু পাঁক জমত আবার পঙ্কজপদ্মও দেখা যেত দুই-একটা।

মাঝে অনেকগুলো যুগের তফাত হয়ে গেছে। তাই রূপের তফাত হয়েছে—দেখারও। এই দিনে বসে সেই দূর অতীতের দিকে তাকালে মনে হবে জীবন বুঝি সেদিন এত বদ্ধ জলাশয়ের মত ছিল। শুধু এক বৃহৎ ব্যাপক অন্ধ তামসিকতার ধ্যানাসনে বসে ছিল বুঝি সেদিনের মানুষগুলো।

আজকের এই অতি সভ্য প্রচ্ছন্নতার যুগ থেকে সেই থেমে-যাওয়া কালের দিকে তাকালে প্রথমে যে ভয়াবহ বস্তুটা আমাদের চোখ টানবে, সেটা সংস্কারের এক অতিকায় যূপকাঠ। শুধু সংস্কারের নয়, প্রবৃত্তিরও। একদিকে অন্ধ শাসন আর একদিকে ভোগের সহস্র আরতি। শাস্ত্রের বিতর্কে হানাহানি, ন্যায়নিষ্ঠার রেষারেষি, দাক্ষিণ্যের ক্রূরতা, সংকীর্ণতার প্রগল্‌ভতা। ইচ্ছেয় হোক অনিচ্ছেয় হোক মৃত পতির সঙ্গে আগুনে পুড়ে কুলরমণী সতী হচ্ছে, গঙ্গাযাত্রী বৃদ্ধের ইন্দ্রিয়লোলুপতার নিয়তি-নির্বন্ধ শাস্ত্রীয় আগুনে মুখ বুজে ঝাঁপ দিচ্ছে নতুন বয়সের মেয়ে। বড়লোকের উৎসবে-আমোদে ব্যভিচারের বন্যা, নির্বিকার চিত্তে ভার্যা বিক্রি করছে বনিতা বিক্রি করছে প্রবৃত্তিতাড়িত অভাবী মানুষ। ভোগের স্থূল নীতি, পর-দার হরণের স্থূল রীতি।

সমাজের এই বাহ্য চিত্রের মধ্যে মানিকরাম এক বেমানান আগন্তুক।

কিন্তু বছর কুড়ি-একুশ বয়স পর্যন্ত তাঁকে নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি।

আদি নিবাস বর্ধমান। অভাবের সংসারে কাজের মানুষ নন তিনি। অকর্মণ্য, ভবঘুরে। তাঁকে নিয়ে কেউ কখনো লাভের হিসেব করেনি। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়

পরিজনেরাও প্রীতির চোখে দেখেন নি। কারণ তাঁর স্বভাব। এই স্বভাবের ওপর সকলের সর্বরকমের অনুশাসন বিফল হয়েছে। গঞ্জনাও নিষ্ফল হয়েছে। আত্মীয়-পরিজনেরা দুই প্রকৃতির অমানুষ বরদাস্ত করতে পারে। এক, পরিবারের সকল স্বার্থের সংস্রব থেকে সে যদি দূরে সরে যায়। দুই, মুখ বুজে সকল অত্যাচার গঞ্জনা সয়েও অস্তিত্বশূন্য দাসানুদাসের মত যদি একপাশে পড়ে থাকে।

মানিকরাম দুইয়েরই ব্যতিক্রম। দূরে যতক্ষণ সরে থাকেন, নিজের খেয়াল-খুশিমত থাকেন। কোনো গঞ্জনাই মগজের ভিতর পর্যন্ত ঢোকে না। আর দৈবাৎ কখনো ঢোকে যদি, তাহলে শাসককেই সত্রাসে পালাতে হবে তাঁর সম্মুখ থেকে। বাইরে যিনি যত জবরদস্ত শাসক, ভিতরে তিনি ততো দুর্বল বোধ করি। সংসারের কর্তাপ্রতিম ব্যক্তিটিকে একবার তাঁর ভয়ে তিন দিনের জন্য একেবারে অদৃশ্য হতে হয়েছিল। কারণ মানিকরাম ঘোষণা করেছিলেন, বৃহৎ পরিবার থেকে দুটো মানুষ চিরকালের মত খসে যাবে। একজন সাক্ষাৎ মাত্রে খুন হবে, আর একজন খুনের দায়ে ফাঁসির দড়ি গলায় পরবে।

এই চণ্ডাল রাগ যে বৃথা আস্ফালন নয় সে-রকম দুই একটা অভিজ্ঞতার ব্যাপার সংসারে আগেও ঘটে গেছে। অতএব শখ করে কে আর উন্মাদের সামনে আসে? তিন দিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকার পর মানিকরাম সেই ভদ্রলোককে হাতের মুঠোয় পেয়েছিলেন চার দিনের দিন। ইতিমধ্যে স্বাভাবিক নিয়মেই রাগ পড়ে এসেছিল কিছুটা। আরো পড়েছিল তাঁর মায়ের চেষ্টায়, যাঁর লাঞ্ছনার দরুন তাঁর এই দুর্বার রাগ। বাড়ির খোদ কর্তা অর্থাৎ বাবা অতিবৃদ্ধ, অথর্ব। তিনি থেকেও নেই। অতএব সংসারের আসল মুরুব্বি মানিকরামের বৈমাত্রেয় বড় ভাই। মানিকরামের দ্বিগুণ বয়েস। বুড়ো কর্তার তিন বিয়ে। মানিকরাম কনিষ্ঠা পত্নীর সন্তান।

পরিবারের প্রবলপ্রতাপ বৈমাত্রেয় অগ্রজটি বিমাতাকে অর্থাৎ মানিকরামের মা-কে অপমান করে বসেছিলেন একবার। মা খেতে বসছিলেন। তখন কি এক ঘরোয়া বিবাদের ফয়সালা করতে এসে যথেচ্ছ কটূক্তি করেছিলেন। ওই মা-ও সপত্নী-সন্তানের থেকে বয়সে খুব বেশি বড় হবেন না। তিনিও মুখে মুখে জবাব দিয়েছিলেন। ফলে পরিস্থিতি ঘোরালো হয়েছিল। ক্রোধের বশে ভদ্রলোক হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়েছিলেন। দাপাদাপির ফলে কি একটা বস্তু পায়ের আঘাতে মায়ের আহারের থালায় এসে লেগেছিল। আহার ত্যাগ করে মা কাঁদতে কাঁদতে শয্যায় আশ্রয় নিয়েছিলেন।

মেজাজী ব্যক্তিটির দাপটের এই নজির অভাবনীয় কিছু নয়। মানিকরাম তখন বাড়ি ছিলেন না। ফিরে এসে শুনেছেন। যাঁরা শুনিয়েছেন তাঁদেরও একটু

তাতিয়ে দেওয়াই উদ্দেশ্য ছিল। একমাত্র মায়ের ব্যাপারেই ওই ছেলের যা একটু টনক নড়ে। কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য যে এরকম প্রমাদ ঘটাবে কেউ কল্পনাও করেননি। ঘটনা শুনে মানিকরাম চুপচাপ উঠে গেছেন। তারপর নিঃশব্দে বৈমাত্রেয় অগ্রজের সন্ধান করেছেন। সন্ধানের হাবভাব দেখেই বাড়ির লোক শঙ্কা বোধ করেছেন। ঘটনাটা যাঁরা তাঁর কানে তুলে দিয়েছেন শঙ্কার ব্যাপারটাও তাঁরাই যথাস্থানে পৌঁছে দিতে ভুল করেননি। অতএব ভয়ে তখনকার মত দাপটের মানুষটি ঘরের দরজা বন্ধ করাই উচিত বিবেচনা করেছিলেন।

সুবিবেচনাই করেছিলেন। কারণ তার দশ মিনিটের মধ্যে মানিকরাম শুনেছেন বৈমাত্রেয় দাদা বাড়ি ফিরেছেন। শোনামাত্র এসে ঘরের দরজায় ধাক্কা দিয়েছেন। বলা বাহুল্য দরজা খোলেনি। পরক্ষণে তাঁর মূর্তি দেখে সকলে কেঁপে উঠেছে। কোথা থেকে একটা লোহার ডাণ্ডা এনে বন্ধ দরজা খোলার ব্যবস্থায় লেগে গেছেন মানিকরাম। ত্রাস, হট্টগোল, চেঁচামেচি। ভিতরে বসে ঠক-ঠক করে কাঁপছেন ভদ্রলোক। বাইরে তাঁর স্ত্রী এবং অন্যান্য মেয়েরা মানিকরামের হাত ধরে ঝোলা-ঝুলি, কান্নাকাটি।

শেষে ওই মা এসে ছেলেকে জাপটে ধরতে তখনকার মত ফাঁড়া কাটে। আর সেই সময় ভিতরের মানুষকে শুনিয়ে মানিকরামের সেই ঘোষণা।

রাতের অন্ধকারে অপরাপরদের সাহায্যে তিন দিনের জন্য ভদ্রলোক বাড়ি থেকেই উধাও হয়েছিলেন। বৃদ্ধ অথর্ব বাপ মানিকরামকে কবিরাজ এনে দেখাতে চেষ্টা করেছিলেন। আর মা কেবল গায়ে-পিঠে হাত বুলিয়েছিলেন।

বিকার কমেছে খবর পেয়ে পলাতক ভদ্রলোক বাড়ি ফিরেছিলেন। তবু আড়ালে আড়ালেই ছিলেন। বিপদে পড়লেন চতুর্থ দিন দুপুরে।

আপদ বাড়ি নেই জেনে চুপি চুপি পুকুরে দুটো ডুব দিয়ে আসতে গেছলেন। যাঁকে ভয় সেই যমসদৃশ অমানুষ যে অদূরের বাগানের ছায়ায় গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে অবকাশ-বিনোদনে রত, জানতেন না।

মানিকরাম দেখলেন। সর্বক্ষণের দোসর বাঁশিটা মাটিতে পড়ে থাকল। উঠে এসে পা টিপে ঘাটের সিঁড়ি টপকে জলে নামলেন। এবারে জলের শব্দ হল। ভদ্রলোক ফিরে তাকিয়েই তারস্বরে আর্তনাদ করে উঠলেন একটা। ফেরার রাস্তা আগলেই মানিকরাম জলে নেমেছেন। চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়ে শিকার ধরলেন। তারপর বিড়াল যেমন ইঁদুর ধরে নিয়ে যায় তেমনি করেই তাঁকে টেনে নিয়ে গেলেন অথৈ জলে।

হাত ছাড়াবার চেষ্টা, কাকুতি-মিনতি ব্যর্থ হল। মানিকরাম তাঁকে জলের

ভিতরে চোবান আর তোলেন। চিৎকার আর্তনাদ শুনে ইতিমধ্যে বাড়ির লোকজন সব ছুটে এসেছে। চক্ষু কপালে সকলের। একসঙ্গে আট-দশজন জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। চিৎকার, চেঁচামেচি, পারে মেয়েদের কান্নাকাটির সে এক বিচিত্র দৃশ্য।

রক্ষা বুঝি আর হয় না। দস্যুর হাত থেকে তারা শিকার ছিনিয়ে আনার আগেই প্রাণবায়ু নির্গত হয়ে যাবে বুঝি।

যাই হোক, সকলে মিলে রক্ষা করল শেষ পর্যন্ত। এত দাপটের ভদ্রলোক তখন অর্ধমৃত। ভয়ের ধকল আরো মর্মান্তিক। ধরাধরি করে তাঁকে ঘাটে এনে তোলা হল। তখন গরমকাল। কিন্তু কাঁপছেন থর-থর করে। অদূরে দাঁড়িয়ে মানিকরাম দেখছিলেন তাঁকে। হঠাৎ হেসে উঠলেন। হাসি আর থামে না।

ইতিমধ্যে তাঁর মা এসে রাগের জ্বালায় বেশ জোরেই কয়েকটা চড়-চাপড় বসিয়ে দিয়েছেন ছেলের গায়ে। মানিকরামকে হাসতে দেখেই ভোল বদলেছে সকলের। এখন তারাও এসে দু-চার ঘা কষিয়ে দিলে বিপদের সম্ভাবনা নেই। নাজেহাল যাঁর হল, তিনি এসে দিলেও না। হাসার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কট গেছে। কেউ গালাগাল করতে লাগল তাঁকে, কেউ বা সত্যি মারতেই এলো।

মানিকরাম হেসে সারা।

এই মানিকরাম। আসল স্বভাব তাঁর এই। তাঁর রাগের নজির আঙুলে গোনা যায়। নিজের খেয়াল-খুশিতে দিনযাপন করেন। দিনে তিনবার করে বাড়ি থেকে বার করে দিলেও গায়ে বেঁধে না, খিদের সময় খেতে না দিলেও রাগ হয় না। একজন খেতে না দিলে আর একজনের দ্বারস্থ হতেও কিছুমাত্র সঙ্কোচ নেই।

একমাত্র শখের জিনিস হাতের বাঁশিটি। কান পেতে শোনার মতই বাজান, কিন্তু কান পেতে কেউ শোনে না বড়। দু-তিন দিনের জন্যও উধাও হয়ে যান এক-একসময়। আবার নিজের ইচ্ছে মতই ফেরেন। এজন্যে এক মা ছাড়া কেউ উতলা হন না, কেউ খোঁজও করেন না কোথায় ছিলেন। হাল ছেড়ে মা-ও ছেলের অনাচার অনিয়মে অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে গেছেন।

ছেলেবেলায় যথারীতি পাঠশালায় টোলে হাজিরা দিয়েছেন। পড়াশুনায় মন থাকলে ভালো করতেন না এমন কথা পাঠশালা বা টোলের বিমুখ পণ্ডিতেরাও বলবেন না। কিন্তু অনাদরের মানুষের মন ফেরাবার কৌশল তাঁরাও জানতেন না। অতএব পুঁথির থেকে মাঠ-ঘাটের টান বেশি। কালবোশেখীর ঝড়ে গরু-ছাগলও যখন আশ্রয় ছেড়ে নড়ে না, বাইরের উন্মুক্ত ঝঞ্ঝার সঙ্গে মনের আনন্দে একজনকেই

শুধু বুক চিতিয়ে ঝোলাঝুলি করতে দেখা যেতে পারে। তিনি মানিকরাম। দারুণ গ্রীষ্মের কাঠ-ফাটা রোদে গাছের পাতা মাঠের ঘাস পর্যন্ত যখন জ্বলে যায়, মাটি ফেটে চৌচির হয়—সেই অকরুণ খর সূর্য মাথায় করে একজনকেই শুধু অনায়াসে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পাড়ি দিতে দেখা যেতে পারে। তিনি মানিকরাম। কৃষ্ণপক্ষের নিঝুম রাতে পৌষের হাড়ে বেঁধা শীতের কামড়ের ভয়ে আরামের শয্যায়ও কেউ যখন নড়েচড়ে পাশ ফিরে শুতে চায় না, ঘুম ভেঙে গেলে তখনো বাইরে থেকে কারো বাঁশির আওয়াজ কানে আসতে পারে। কাউকে বলে দিতে হবে না বাঁশি কে বাজায়। বাজান মানিকরাম।

বাবা-মা বেঁচে থাকতে আত্মীয়-পরিজনেরা মিলে তাঁকে ধরে বেঁধে একটাই কর্তব্যকর্ম সমাধা করেছেন। তাঁর বিয়ে দিয়েছেন। বিয়ের কিছুদিন বাদে মা মারা যান। পরের দু মাসের মধ্যে বাবা। মা মারা যাবার পরেই বাড়ির বন্ধন শিথিল হয়েছিল। বাবা চোখ বোজার পর বৈমাত্রেয় অগ্রজ সংসারের বিধাতা হয়ে বসলেন। ফলে বাড়ির সঙ্গে মানিকরামের সম্পর্ক আরো ঢিলে হয়ে গেল। অমন অকর্মণ্য ভবঘুরেকে বশে আনতে পারেন, কিশোরী বধূর তেমন জাদু জানা ছিল না।

শুধু নিজেদের বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবার নয়, এই মানুষটির প্রতি গোটা গ্রামের চোখ পড়ল একদিন। চোখ পড়ার সূচনাটি বিচিত্র।

মানিকরামের বছর একুশ বয়েস তখন। পাশের বড় মহলের কর্তা মারা গেলেন হঠাৎ। কর্তাটি সম্পর্কে জ্ঞাতিভাই তাঁদের। নিঃসন্তান অবস্থাপন্ন মানুষ ছিলেন। দালান-কোঠা করেছিলেন। জমিজমা ছিল। খুব সদাচারী ছিলেন না ভদ্রলোক। লোকের ধারণা সেই কারণেই সন্তানহীন। প্রথম পক্ষের স্ত্রী মারা যেতে অনেকদিন পর্যন্ত বিয়ে করেন নি। মাত্র বছর আট-নয় আগে মোটামুটি একটি সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করে ঘরে এনে তুলেছিলেন। এই বউয়েরও ছেলেপুলে হল না। স্বাস্থ্য ভাল থাকলে আর একটা বিয়ে করার ইচ্ছে ছিল ভদ্রলোকের। কিন্তু শরীরে বেশ কিছুদিন ধরে ভাঙন ধরেছিল।

মারা যখন গেলেন, বউয়ের বয়েস তখন বাইশ-তেইশ। গোটা সম্পত্তির মালিক তিনিই।

বড়লোক জ্ঞাতি মারা যেতে মানিকরামের বাড়ির সকলে শোকের বাড়িতে গিয়ে ভেঙে পড়ল। বিশেষ করে মানিকরামের বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা। স্বামী মরলে মৃত স্বামীর মাথা কোলে নিয়ে স্বামীর চিতায় বসে সতী হওয়াই বিধি তখনও। কিন্তু সরকার বাহাদুরের অবুঝপনার দরুন জীবিত পত্নীর স্বামীর চিতায় পুড়ে মরার

বিধিতে নানা বাধার সৃষ্টি হচ্ছিল তখন। আইন তখনও হয় নি বটে। কিন্তু স্থানীয় হাকিমের অনুমতি ভিন্ন সতী হওয়া চলত না। হাকিম নিজে এসে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মৃতের পত্নীর সঙ্কল্প নড়াতে চেষ্টা করতেন। মাদকদ্রব্য খাইয়ে সহমরণ-যাত্রিণীর স্নায়ুবিভ্রম ঘটানো হয়েছে কিনা সেই পরীক্ষা করানো হত। শেষ মুহূর্তে অনিচ্ছুক পত্নী সঙ্কল্প পরিবর্তন করলে আত্মীয়-পরিজনেরা যাতে হামলা না করে, অর্থাৎ চারদিক থেকে বাঁশের আঘাত করে করে আবার না তাকে জলন্ত চিতায় ঠেলে দেয়—সেই জন্যে সরকারী প্রহরা মোতায়েন রাখতে হত।

যাই হোক, এত সব বিঘ্ন সত্ত্বেও অজ পাড়াগাঁয়ে তো বটেই, এ ধরনের বর্ধিষ্ণু স্থানেও সতী হওয়ার সংখ্যা খুব কম ছিল না। সতী না হলে দুর্নামের ঢি-ঢি পড়ে যেত। তাছাড়া সরকার বাহাদুর এই প্রথা রোধ করবেন দেশের যে মানুষদের দিয়ে, তারাই এই রীতির স্বপক্ষে।

মৃত স্বামীকে বাইরের দাওয়ায় আনা হয়েছে, শিয়রের কাছে মূর্তির মত তাঁর বউ বসে। বিলাপের প্রথম পর্ব সমাধা হয়েছে, মানিকরামের বৈমাত্রেয় দাদারা বৃদ্ধ পড়শীদের সঙ্গে সেখানেই বসে সতী হওয়ার ভাগ্য এবং মাহাত্ম্য আলোচনায় মগ্ন। সতী রমণীর অক্ষয় স্বর্গলাভের ব্যাপারে কিছুমাত্র সংশয় নেই কারও। একজন বৃদ্ধ মন্তব্য করলেন, এই সদ্য কুলবিধবার লক্ষণ দেখে মনে হয়, গত ছয় জীবনে তিনি এই স্বামীর সঙ্গে সহমরণে গেছেন—এইবার হলে সাতবার হবে।

সঙ্গে সঙ্গে সদ্য বিধবার দিকে চেয়ে ধন্য ধন্য করে উঠলেন সকলে। তাঁরাও সেই লক্ষণই দেখলেন। সাত-সাতবার সতী হওয়ার মানেই বৈকুণ্ঠে স্বয়ং লক্ষ্মীর আসনে গিয়ে বসা। শুধু তাই নয়, এমন সতীর পুণ্যে মর্ত্যের পুণ্য। চোখের জলে ভেসে এয়োরা সব চিতার ছাই কাড়াকাড়ি করে কপালে লেপবে। শ্মশানের পারে দামোদরের গায়ে সতীর মন্দির তো একটা নিশ্চয় তোলা হবে। সতীর নাম অক্ষয় হয়ে থাকবে তাতে। যেতে আসতে কুলবতীরা সেই মন্দিরে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে যাবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

অদূরে দাঁড়িয়ে মানিকরাম চুপচাপ শুনছেন, আর নির্লিপ্ত কৌতুকে দেখছেন সকলকে। বিশেষ করে সদ্য বিধবা বাইশ বছরের বৌঠানটিকে।

বৌঠানের নাম কালীমতী। পাশের মহলের জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে এই জ্ঞাতি দেওরটির প্রতি অর্থাৎ মানিকরামের প্রতিই ঠাকরোনটি বাহ্যতঃ সব থেকে বেশি নির্মম ছিলেন। কারণ এই দেওরের মত এত জ্বালাতন শত্রুও নাকি করে না। বাড়িতে বৌঠানই কর্ত্রী, শাসন করার কেউ নেই, তাই আগে বিনা ঘোমটাতেই জ্ঞাতি দেওরের কাছে আসতেন, ঠাসঠোস কথাবার্তা শোনাতেন, মুখঝামটা

দিতেন। ইদানীং দু-তিন বছর হল ঘোমটা টানেন, আর রাগলে সরাসরি না বলে ঘরের দেয়ালকে শুনিয়ে কটুকাটব্য করেন।

বাড়িতে ভাত না পেয়ে কত দিন বেলা দুপুরে এবাড়িতে এসে হাঁক দিতে শোনা গেছে, কই গো বৌঠান, ঘরে কিছু আছে নাকি গো—খিদেয় পেট জ্বলে গেল।

বৌঠাকরোনের অমনি পিত্তি জ্বলেছে। তক্ষুনি জবাব পাঠিয়েছেন—কিছু নেই। বলেছেন, এটা দ্রৌপদীর হেঁসেল নয় যে, ঘরে সব সময় আহার মজুত থাকবে।

মজুত যে থাকে সেটা মানিকরাম জানেন। পাবেন যে, তাও। হাসিমুখে বলেন, তাহলে আর কি হবে, একটু জল-বাতাসাও হবে না?

এখানে কেন, বাড়িতে জোটে না সেটুকু?

ঘরের বউয়ের এমন বিরূপ বচন শুনলে যে-কেউ কানে আঙুল দেবে। কারণ, বয়সের নিজের দেওরের সঙ্গে অবাধে কথা বলারই রীতি নয় তখন। মানিকরামের শুধু হাসি বাড়ে।—যাই, আর কোথাও দেখিগে তাহলে।

কিন্তু যাবার আগেই পিঁড়ি পড়ে, ঠাঁই হয়, আর শেষ পর্যন্ত জোটে যা সেও লোভনীয়। কিন্তু কথাও শুনতে হয় সেই সঙ্গে। যেমন, এত নবাবী যখন নবাবের ঘরে জন্মালেই হত।···কাঠ-দুপুরে ঝি-চাকর সুদ্ধু যখন ঘুমিয়ে আর বাড়ির কর্তা বাইরে···তখন এভাবে অন্দরে এসে ঢোকে যে তাকে বেহায়া ছাড়া আর কিছু বলা যায় না, ইত্যাদি।

মানিকরামের এ কান দিয়ে ঢোকে, ও কান দিয়ে বেরোয়। খেয়ে-দেয়ে ঢেঁকুর তুলে তিনি বলেন, প্রাণটা বাঁচল, বৌঠান যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা।

বলা বাহুল্য, পায়ে দুপ-দাপ শব্দ তুলে অন্নপূর্ণা প্রস্থান করেন।

শুধু খাওয়ার ব্যাপারে নয়, দৈবাৎ কখনো টাকা-পয়সার দরকার হয়ে পড়লেও অম্লান বদনে এই বৌঠানটির কাছেই এসে হাত পেতে থাকেন তিনি। তাও পান, তবে এক্ষেত্রে বিরূপ মুখের ঝামটা আরও একটু বেশি খেতে হয়, এই পর্যন্ত।

এই বিপরীত হৃদ্যতাও খুব উদার চোখে দেখে না কেউ। বাড়ির দাস-দাসীরাও জানে, কর্ত্রী তাদের এই লোকটার ওপর খড়্গহস্ত। তাদের মারফৎ এ বাড়ির অর্থাৎ মানিকরামের বাড়ির পাঁচজনও তাই জানেন। মানিকরামকে নির্লজ্জ বেহায়াই মনে করেন তাঁরা, কিন্তু সেই সঙ্গে সংশয়ের অদৃশ্য আঁচড়ও পড়ে এক-আধটা। আর এ আঁচড় এমনই বস্তু যে, শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ অদৃশ্য থাকে না। মাত্র পাঁচ-ছ মাস আগে স্বয়ং কর্তার মারফৎ কি একটা অতি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত কালী বউয়ের কানে এসেছিল। তখন কালীর নাচই দেখা গেছে তাঁর। সকলেরই মনে হয়েছে, জ্ঞাতি দেওরের মত তাঁর এমন শত্রু আর বুঝি হয় না।

দু দিন বাদে মানিকরামের সাড়া পাওয়া মাত্র রণরঙ্গিণী মূর্তিতে তাঁকে শুনিয়ে স্বামীকে আদেশ করেছেন, দেউড়ীতে যেন তক্ষুনি ভাল দেখে দারোয়ান বসানো হয় একটা, বাইরে থেকে যে-সে তাঁর বাড়ির ভিতরে এসে ঢুকবে এ তিনি আর বরদাস্ত করবেন না।

মানিকরাম সেই যে হাসিমুখে প্রস্থান করেছিলেন, আর এই এলেন। তাঁর প্রতি সচেতন নয় কেউ। তিনি শুধু বৌঠানকে দেখছেন, আর এদের সতী মাহাত্ম্যের উচ্ছ্বাস শুনছেন।

বৈমাত্রেয় দাদার ইঙ্গিতে সকলকে সরিয়ে কুল-পুরোহিত একসময় কালীমতীর সামনে এসে বসলেন। তার খানিক বাদেই পুরোহিতের সগর্ব ঘোষণা শোনা গেল, কালীমতী সতী হবেন।

মৃতের বাড়িতে নতুন উদ্দীপনার সাড়া জাগল। পুরুষেরা আ-হা আ-হা করে উঠল। মেয়েদের মধ্যে ছোটাছুটি পড়ে গেল। কে আল্‌তা পরাবে, কে লাল চেলী পরাবে, কে সিঁদুর মাখাবে! হর্ষবিষাদে টইটম্বুর পরিবেশ। পুরুষদের জনাকতক ছুটল হাকিমের কাছে খবর দিতে। সে ব্যাটা বিধর্মী এসে আবার কি বাগড়া দেয় কে জানে। বর্ধমান বর্ধিষ্ণু জায়গা, গ্রাম হলে চিন্তার কারণ ছিল না।

নির্লিপ্ত কৌতুকে মানিকরাম তখনও বৌঠানকেই দেখছেন। তিনি সরে না এলে মেয়েদের অসুবিধে হচ্ছে সে খেয়ালও নেই। অগত্যা একজন বর্ষীয়সী রমণী তাড়া দিলেন, বৌঠানের পায়ের ধুলো নিয়ে এখন সরো দেখি এখান থেকে, হাঁ করে দেখছ কি ?

মানিকরামের মুখ খুলল এতক্ষণে, বললেন, বৌঠানকেই দেখছি, বড় আনন্দ হচ্ছে।

ব্যস্তসমস্ত এয়োরা সবিস্ময়ে থমকালেন। লোকটা বলে কি! শোকে শেলবিদ্ধ বৌঠান তখনও মৃত স্বামীর শিয়রে বসে। গুরুজনস্থানীয়া একজন তাড়া না দিয়ে পারলেন না।—বলিস কি পাগলের মত, তোর আনন্দ হচ্ছে ?

মানিকরাম মাথা নাড়লেন, আনন্দ হচ্ছে। বললেন, উনি চিতায় পুড়ে মরলে আমাদেরই তো লাভ, এই বাড়ি-ঘর বিষয়-সম্পত্তি সব আমাদের হবে, জিজ্ঞেস করে দেখ ওঁকে।

একটা কুৎসিত ধাক্কা খেয়ে হঠাৎ বিমূঢ় সকলে। এমন কি কালীমতীর মুখের ওপরেও শোকের বাড়া একটা আঘাত এসে লাগল যেন। তিনিও বিভ্রান্ত দুটো চোখ আতি দেওরের দিকে না তুলে পারলেন না। ওদিকে বাইরে খবরটা শুনেই মানিকরামের বৈমাত্রেয় দাদাটি ছুটে এসে মানিকরামকে গলা ধাক্কা দিয়ে বাইরে

নিয়ে এলেন। পারেন তো সেইখানেই ধরে খড়মপেটা করেন তাঁকে।

মানিকরাম হাসছেন। বৃদ্ধেরা মুখ ফেরালেন, এমন পাষণ্ডের মুখ দেখতেও আপত্তি।

যথাসময়ে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে শ্মশানযাত্রা করা হল। হাকিমকে খবর দেওয়া হয়েছে, এখন আসা না আসা তাঁর দায়। বাড়িতে না এলে শ্মশানে যাবেন। বাড়িতে না আসাই বাঞ্ছনীয়। শব আর সতী নিয়ে শ্মশানে রওনা হওয়া মানেই আধখানা কাজ সারা।

সহমরণ দেখার আগ্রহে কাতারে কাতারে মানুষ দামোদরের দিকে চলেছে। নদীর গায়ে দাহভূমি।

শ্মশানের আচার অনুষ্ঠান শেষ হবার আগেই দলবলসহ হাকিম হাজির। সাদা চামড়ার মানুষ হলেও এখানেই জন্ম-কর্ম হাকিমের। এ-দেশের ভাষা বোঝেন, ভেঙে ভেঙে বলতেও পারেন। এই একটা সময়—যখন কুলললনার সঙ্গে সরাসরি নিজেরাই কথাবার্তা বলতে চেষ্টা করেন তাঁরা।

সদ্যবিধবার বয়স দেখে হোক, বা মুখশ্রী দেখেই হোক, হাকিমটি যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন বাধা দিতে। কেউ তাঁর ওপর জোর করছে কিনা সেই খোঁজ নিলেন, বিধিমত পরীক্ষা করলেন কেউ কিছু খাইয়ে স্নায়ুবিভ্রম ঘটিয়েছে কিনা। শেষে চিতার আগুনে পুড়ে মরা কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার বোঝাতে চেষ্টা করলেন. আত্মীয়-পরিজনেরা বিরূপ হলে বা কোন রকম অত্যাচার করলে সরকারী আশ্রয় এবং নিরাপত্তার আশ্বাসও দিলেন।

কিন্তু কালীমতী অটল। বললেন, ছ' জন্মে ছয়বার তিনি এই স্বামীর সঙ্গে চিতারোহণ করেছেন, এবারেও তাঁর সতী না হয়ে উপায় নেই। তিনি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় সতী হচ্ছেন।

মত পরিবর্তন করা গেল না দেখে হাকিম পালালেন। এ দৃশ্য দেখা সকলের স্নায়ুতে সয় না। হিন্দু-মুসলমান প্রহরীদের অবশ্য ডিউটিতে রেখে গেলেন। কেউ কোন রকম জোর না করে সেটা তাদের দেখা কর্তব্য।

দামোদরের তীরে চিতা সাজানো হল। ঢাক-ঢোল বাজছে। মুহুর্মুহু হরিধ্বনি দিচ্ছে সকলে। কালীমতী স্নান করলেন। তারপর জলন্ত কাঠি হাতে যথাবিধি স্বামীর চিতা প্রদক্ষিণ করলেন। শেষে চিতায় আগুন ধরিয়ে হাসিমুখে স্বামীর মাথাটি কোলে নিয়ে বসলেন।

পাঁচজনের তৎপরতায় দাউ দাউ করে চিতার আগুন জলে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে বিকট চিৎকার একটা। হাত-পা ছুঁড়ে কালীমতী আর্তনাদ করে উঠলেন। তারপরেই যন্ত্রণায় চিৎকার করে জলন্ত চিতার ওপর থেকে ছুটে পালাতে চেষ্টা করলেন তিনি। নিমেষে দর্শকদের মুখের ভোল বদলে গেল। মার মার করে উঠল তারা। তাদের ঠেকাবার জন্য কর্তব্যে প্রহরারত ছিল যে সিপাইরা, কুলরমণীর এই অনাচার বরদাস্ত করতে না পেরে তাদের মধ্যে একজন হিন্দু সিপাই-ই লাঠি তুলে কালীমতীকে তাড়া করল।

আর্ত ত্রাসে থমকে দাঁড়ালেন কালীমতী। সভয়ে চিতার দিকেই ছুটলেন আবার। কিন্তু চিতার আগুন আরও ভয়াল। তাঁর কাপড়ে আগুন জলছে তখনও। হঠাৎ তীরের মত ছুটে গিয়ে কালীমতী দামোদরে ঝাঁপ দিলেন।

মার, মার! ধর হতভাগীকে! ধরে এনে বাঁশের বাড়ি দিয়ে মাথা দুখানা করে চিতায় এনে ফেল শিগগীর! গেল গেল সব গেল—ধরে আন—হাত-পা বেঁধে চিতায় এনে ফেল্ শিগগীর!

সকলের আগে সতীকে ধরে আনার জন্য ছুটেছিল যে হিন্দু সিপাই হঠাৎ এক বিষম ধাক্কা খেয়ে সে চিতার ওপরেই পড়তে পড়তে বাঁচল। আর পরমুহূর্তে এক ভোজবাজীর দৃশ্য দেখে এত বড় ক্ষিপ্ত জনতা পঙ্গু কয়েক মুহূর্ত। যেখানে কালীমতী ঝাঁপ দিয়েছেন, চিতার একটা জলন্ত কাঠ হাতে নদীর সে-দিকটা আগলে দাঁড়িয়েছেন মানিকরাম। যম-সদৃশ মূর্তি।

চিৎকার করে মানিকরাম বললেন, খবরদার! যে এক পা এগোবে, তাকে সরাসরি যমের বাড়ি পাঠাব আমি। তারপরেই ক্ষিপ্ত আক্রোশে সিপাইদের তাড়া দিয়ে উঠলেন, তোমরা সঙের মত দাঁড়িয়ে দেখছ কি? হাকিমের কাছে নালিশ করে তোমাদের একেবারে খতম করে দেব আমি—এই দেখতে দাঁড়িয়ে আছ তোমরা এখানে?

সত্যি সঙের মত দাঁড়িয়ে দৃশ্যই দেখছিল তারা। হাকিমের নাম কানে যেতে সম্বিৎ ফিরল। হাঁ-হাঁ করে লাঠি উঁচিয়ে জনতা রোধ করতে এগিয়ে এল তারা।

জলন্ত কাঠ হাতে মানিকরাম নদীর দিকে ফিরলেন। জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে বলির পশুর মত কাঁপছেন কালীমতী। যেটুকু অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন তার যাতনা টের পাচ্ছেন না—পারের দিকে চেয়ে একরাশ ঘাতকের মুখ দেখছেন তিনি।

তাঁকে ধরে তোলার জন্য মানিকরাম জলের দিকে এগোলেন।

তাঁর দিকে চেয়ে ত্রাসে বিভীষিকার আর্তনাদ করে উঠলেন কালীমতী। তাঁর ধারণা, ওই জলন্ত কাঠ হাতে মানিকরামও ধরতেই আসছেন তাঁকে।

মানিকরাম থমকালেন। ব্যাপারটা বুঝলেন। হাতের জলন্ত কাঠটা ছুঁড়ে

জলে ফেলে দিলেন। তারপর এগিয়ে এলেন।

এইবার তাঁর মুখের ওপর চোখ পড়ল কালীমতীর। দিশেহারা হয়ে যে আশ্রয় চাইছিলেন, সেই আশ্রয়েরই আশ্বাস পেলেন বুঝি। মানিকরামের চোখে-মুখে যে আগুন ফেটে পড়ছে, সেটা রাগের কি বিদ্রূপের তা স্পষ্ট নয় এখনও। কিন্তু সেই সঙ্গে দু চোখ ভরা জল!

হাত বাড়িয়ে বাহু ধরে ভয়ে অর্ধমৃতা রমণীকে টেনে তুললেন তিনি। বিড়বিড় করে বললেন, সতী হবার শখ মিটেছে তো, এখন এসো, কিছু ভয় নেই।

কিন্তু ভয় নেই বললেই ভয় যায় না। তীরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে অদূরের মানুষ-গুলোর হিংস্র মূর্তি দেখে আর কটুকাটব্য শুনে ত্রস্ত হরিণীর মতই কালীমতী সচকিত আবার। শক্ত মুঠোয় বাহু ধরা না থাকলে আবার নদীতেই ঝাঁপিয়ে পড়তে ছুটতেন তিনি। মানিকরামের ইঙ্গিতে সিপাইরা হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এসে তাঁদের চারদিকে বূ্যহ রচনা করল। এবারে ব্যর্থ সতীকে রক্ষা করার দায়িত্ব তাদের। এখন তাঁকে হাকিমের কাছে নিয়ে যেতে হবে। তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে।

কালীমতীর ভিজা কাপড়, বক্ষের আবরণ সিক্ত। পরপুরুষের চোখে প্রায় নগ্ন দৃশ্য একটা। কিন্তু কালীমতীর আপাতত প্রাণরক্ষার তাগিদ ছাড়া আর কোন দিকে হুঁশ নেই। প্রাণপণে মানিকরামকে আঁকড়ে ধরে ঠকঠক করে কাঁপছেন তিনি। হেঁটে অগ্রসর হবার ক্ষমতাও নেই।

দৃশ্য দেখে বয়স্করা ছ্যা-ছ্যা করে উঠল। চোখের ওপরে এমন অবিশ্বাস্য পাপ দেখতে অভ্যস্ত নয় কেউ। অগ্নি উদ্গিরণ করতে করতে যে যার প্রস্থান করল। অল্পবয়সীরাই শুধু এ দৃশ্য বর্জন করে যেতে পারল না। তারা সঙ্গ নিল।

এখন আর রাখারাখি, কানাকানি নয়, কলঙ্ক আর রটনার ঢালা স্রোত বইতে লাগল। যে দুজনকে নিয়ে অপবাদ আর দুর্নামে মেতে উঠল সকলে, তাদের একজন সম্পূর্ণ নাগালের বাইরে। তিনি কুলবধূ কালীমতী। সরকারী হেপাজতে আছেন। এই লোকালয়ের বাইরে সরকারী তরফ থেকে তাঁকে বাসস্থান দেওয়া হয়েছে, খোরপোষের পাকাপাকি আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে। নিজেরই প্রচুর বিষয়-সম্পত্তি আছে, সে-কথা কালীমতী কারো কাছে ব্যক্ত করার অবকাশ পান নি। মনের এই অবস্থায় বিষয়-আশয় কি আছে না আছে তা নিয়ে একবারও মাথা ঘামান নি। এখনও যেন সম্পূর্ণ আত্মস্থ হতে পারেন নি। কেউ এলে বা কিছু বললে ফ্যালফ্যাল্ করে মুখের দিকে চেয়ে থাকেন শুধু।

আর একজন মানিকরাম। তিনি নাগালের বাইরে নন। বৈমাত্রেয় দাদারা এবারে এই উপলক্ষে তাঁর বিরুদ্ধে একাত্ম হয়েছেন। এমন অনাচারের পর পাড়া-প্রতিবেশীরাও সকলেই সহায় তাঁদের। এর ওপর প্রত্যহ তাঁকে নিয়ে পাঁচরকম গুজব কানে আসছে। প্রতিদিনই তিনি কালীমতীর কাছে গিয়ে থাকেন নাকি। কৌতূহল দমন না করতে পেরে দুই-একজন জিজ্ঞাসাই করে বসেছেন তাঁকে। জানতে চেয়েছেন, কথাটা সত্যি কি না।

মানিকরাম মাথা নেড়েছেন, সত্যি। বলেছেন, আমি না দেখলে তাঁকে কে দেখবে?

এই দেখাটা যে বৈধ নয় সে সম্বন্ধে দ্বিমত কেউ নয়। পাপের সংশ্রব একেবারে নির্মূল করার জন্যেই আটঘাট বেঁধে বৈমাত্রেয় দাদারা কালীমতীর বিষয়-সম্পত্তি গ্রাসের উদ্যোগ করছেন। চেষ্টাটা আরও নির্বিঘ্ন হয় মানিকরামকেও বিদায় করতে পারলে। তাই দুর্নামের ব্যাপারটা তাঁরা সাগ্রহেই বিশ্বাস করলেন। আগে এক রাত মানিকরাম বাড়ি না ফিরলে কেউ তাঁর চরিত্র নিয়ে অন্তত মাথা ঘামাত না। কিন্তু এখন না ফিরলে পরিবারেরই অনেকে নিঃসংশয়ে রায় দেন, ওই কুলটা বউটার ওখানে ছাড়া কোথায় আর যাবে, সেখানেই গেছে।

মানিকরাম নির্বিকার। কিন্তু গঞ্জনা সহ্য করা কঠিন হয়ে উঠতে লাগল তাঁর পনের বছরের বউটার পক্ষে। বউয়ের নাম ভগবতী। দশ বছর বয়সে এই সংসারে এসেছিলেন যখন, তখন থেকেই পাঁচজনের মুখে পাঁচরকম শুনে কিশোর স্বামী-টিকে ভয় করতেন তিনি। এই ক' বছরে তাঁর চোখ অনেকটা খুলেছে বটে, কিন্তু মনে মনে এখনো ভয়ই করেন তাঁকে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা এযাবৎও নিবিড় হয়নি কখনো।

ঠেস কটূক্তি আর গঞ্জনায় তাঁরই কান পাতা দায় হল। সংসারে তাঁর কোনো অস্তিত্ব নেই। একপাশে পড়ে ছিলেন। তেমনি পড়ে থাকতে আপত্তি নেই। কিন্তু স্বামীটির বিরুদ্ধে বাড়ির মানুষেরা তাঁকেই বিষিয়ে তোলার জন্য সক্রিয় হয়ে উঠলেন। জায়েরা বলেন, এমন লোকের মুখে আগুন, ভাসুরেরা শোনান, এই পরিবারে থাকতে হলে ওই দুশ্চরিত্র স্বামীর সংশ্রব ত্যাগ করাই উচিত। হয় তাকে ফেরাও নয় তো যেদিকে দু চোখ যায় চলে যাও। গুষ্টিসুদ্ধ সকলে মিলে তো তার পাপে ডুবতে পারেন না।

অতএব ভগবতী স্বামীকে ফেরাতে চেষ্টাই করলেন প্রথম। তাঁর দুই পা বুকে আঁকড়ে অঝোরে কাঁদলেন। মানিকরাম হকচকিয়ে গেলেন। স্ত্রীটিকে স্ত্রী হিসেবে লক্ষ্য করার ফুরসত তাঁর বিশেষ হয়নি। শেষে চেষ্টা করে কান্নার হেতু

বুঝে নিলেন। শেষে বললেন, বেচারী বৌঠানের এমনিতেই দুঃখের শেষ নেই, তার ওপর সকলে মিলে তাঁর ওপর এভাবে অত্যাচার করছে সেটা কি ভালো ?

ভগবতী ফুঁসে উঠলেন তক্ষুনি, ওই কুলখাগীর নাম আমি কানে শুনতে চাই না, মরণে এত ভয়—জন্ম জন্ম নরকে পচে মরবে, পচে মরবে, পচে মরবে।

বলা বাহুল্য, সকলের মুখে যেমন শুনে আসছেন, এই জ্বালা তারই পুনরুক্তি মাত্র।

মানিকরাম চুপচাপ দেখলেন তাঁকে। হাসছেন অল্প অল্প। পরে বললেন, আমি যদি হঠাৎ মরে যাই, তুমি ভয় পাও না ? হাসতে হাসতে আমার সঙ্গে চিতায় গিয়ে বসতে পারো ?

ভগবতীর স্বামী ফেরানোর দায়, দুর্বল হলে চলে কি করে। মাথা ঝাঁকালেন, নিশ্চয় পারেন। মন্তব্য করলেন, কালীমতীকে মেরে-ধরে আবার চিতায় এনে ফেলাই উচিত ছিল—এটুকুও না পারলে আবার কিসের সতী !

হাসি চেপে মানিকরাম বললেন, তাহলে তুমি সতী হবার জন্য তৈরি হও, আমি দু-চারদিনের মধ্যেই ব্যবস্থা করছি।

পনের বছরের পত্নীটি এবারে ভয় পেলেন। কাঁদতে কাঁদতে আবার স্বামী ফেরানোর চেষ্টায় মন দিলেন তিনি।

মানিকরামের ঘরের শান্তিও এমনি করে ব্যাহত হতে লাগল। ভেবে-চিন্তে একদিন তিনি প্রস্তাব করলেন, চলো, এখান থেকে আমরা চলে যাই।

কোথায় ? ভগবতী অবাক !

কলকাতায়।...আমি তুমি বৌঠান তিনজনেই চলে যাব।

এই জায়গা ছেড়ে চলে যাবার কথা কদিন ধরেই ভাবছেন মানিকরাম। কলকাতা মাথায় এসেছে কেন নিজেও সঠিক জানেন না। রোজই বৌঠানের দুর্দশা দেখেন, তাঁর মনের অবস্থা দেখেন, আর থেকে থেকে কলকাতার কথা মনে হয়। সেখানে মানুষের বুদ্ধির আলো হয়ত আর একটু প্রশস্ত দেখা যাবে। সমাচার দর্পণে পড়েছেন রামমোহন নামে একজন ভদ্রলোক বেন্টিঙ্ক সাহেবের সঙ্গে যোগ দিয়ে সতীদাহ আইন করে তুলে দেবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। আরো অনেক নামজাদা লোক আছেন তাঁর দলে। কলকাতায় গেলে তাঁদের হয়ত দেখতে পাবেন। এ-রকম চেষ্টা চলছে দেখলে বৌঠানের মনও ফিরতে পারে।

কিন্তু এত কথা বউকে বুঝিয়ে বলার নয়, তাই মনের বাসনাটুকুই ব্যক্ত করলেন শুধু।

নিজের পনের বছর মাত্র বয়েস হলেও স্বামীটিকে কখনো পরিণত বুদ্ধির মানুষ

ভাবেন না ভগবতী। তার ওপর বৌঠানকে সুদ্ধু সঙ্গে নেবার প্রস্তাব। চিতা থেকে উঠে আসার ফলেই ওই রমণীটির পাপ আকাশছোঁয়া হয়ে আছে। সেই সঙ্গে নিজের স্বামীকে জড়িয়ে যা-সব কানে আসছে, তার বোঝাই দুর্বহ। রটনা অবিশ্বাস করার মত বুদ্ধি-বিবেচনা বা চিন্তাশক্তি তখনো হয়নি। প্রস্তাব শোনা মাত্র উল্টে অবিশ্বাসই ঘোরালো হয়েছে। বলে উঠেছেন, ওই মেয়েলোকের সঙ্গে শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে চলে যাব, সে কি কথা!

অবুঝ স্বামীর আশ্বাসের থেকে শ্বশুরের ভিটের এই আশ্রয়টুকুই তাঁর কাছে প্রত্যক্ষ এবং বড়।

এরপর মানিকরাম আর একটা কথাও বলেন নি।

এদিকে দিনের পর দিন কেমন স্তব্ধ হয়ে আসছেন কালীমতীও। জীবনের ত্রাস কেটে যেতে জীবন ভয়াবহ ঠেকছে তাঁর কাছে। কোন্ পরিস্থিতিতে পড়েছেন এখন, অনুভব করতে পারেন। তবু যাঁর সাহস আর দয়ায় এই অসহ্য জীবন ফিরে পেয়েছেন, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। ওই মানুষ না থাকলে সকলে তাঁকে জ্বলন্ত কাঠ দিয়ে পিটিয়েই আবার চিতায় এনে ফেলত। সব কিছু হারিয়ে এখন তাঁরই একটু স্নেহ একটু করুণা এখন একমাত্র সম্বল। দু হাতে সেটুকুই আঁকড়ে থাকতে চান। তাই তিনিও সেদিন একটা প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন মানিকরামের কাছে। বলেছেন, সরকার আমার খোরপোষের ব্যবস্থা করবে বলেছে, আমার কিছু আছে সে কথা আমি তাদের বলিনি। তুমি লোক ডেকে লেখাপড়া করো, সব তোমার নামে করে দিচ্ছি।

মানিকরাম হেসেছিলেন। বলেছেন, তুমি যাতে আর গাঁয়ে ঢুকতে না পারো পাঁচজনকে ডেকে দাদা সেই ব্যবস্থা করে ফেলেছে। এরপর সম্পত্তি দখল করতে তার খুব বেশি অসুবিধে হবে না।

কালীমতীর দৃষ্টি ধারালো হয়ে উঠল তৎক্ষণাৎ।—আমি না দিলে নেবে কি করে? জবাব না দিয়ে মানিকরাম ভাবলেন একটু। তারপর বললেন, ওসবে কাজ নেই, তার থেকে চলো আমরা কলকাতা চলে যাই।

আর কে যাবে? কালীমতীর দু চোখ তাঁর মুখের ওপর স্থির।

বউকে বলেছিলাম। সেও আমাকে বিশ্বাস করে না দেখছি।

বিবর্ণ পাণ্ডুর হয়ে উঠল কালীমতীর সমস্ত মুখ। কদিন ধরেই সদা হাসিখুশি এই মুখখানা ভারাক্রান্ত দেখছেন মনে হল। বিমর্ষ দেখেছেন। কি যে হতে পারে সেটা অনুমান করে নিতে এক মুহূর্তও দেরি হল না তাঁর। চিতার আগুনের ঘা এখনো গা থেকে ভালো করে শুকোয়নি। হঠাৎ তার দ্বিগুণ জ্বালা অনুভব

করলেন তিনি।

টাকা সকলের না হোক অনেকের কান টানে। শ্মশানের ওই কাণ্ডর পর অবকাশ পেয়েই মানিকরাম কালীমতীর বাড়িতে ছুটেছিলেন। চাবি সংগ্রহ করতেও খুব বেগ পেতে হয়নি তাঁর। টাকাকড়ি গয়নাপত্র যা পেয়েছেন এক সঙ্গে জড়ো করে সব তিনি কালীমতীকে দিয়ে গেছলেন। হতচেতন কালীমতীর অবশ্য কোনদিকে হুঁশ ছিল না তখন। সেই টাকাই কাজে লাগল। তাঁদের কুলপুরোহিতটির বয়েস হয়েছে, মোটামুটি অবস্থাপন্নও। অনেক বড়ঘরের যজমানি তাঁর। পাঁচজনে মান্যগণ্যও করে। লোকটি ঘোর বিষয়ী। অর্থের টান সব থেকে বড় টান তাঁর। কালীমতী জানেন তা।

পুঁজির টাকা থেকে কিছু টাকা খরচ করলেন তিনি। একজন বিশ্বস্ত লোক যোগাড় করে গোপনে তাঁকে কিছু টাকা প্রণামী পাঠালেন, এবং অনুগ্রহ করে এক বার হতভাগিনীকে দেখে গেলে ভালো কিছু প্রাপ্য হবে সেই আভাসও দিলেন।

তিনি এলেন। রাতে সকলের অগোচরেই এলেন। আর দৈবাৎ যদি কেউ জেনে ফেলে সেই ভয়ে নিজের বড় দুই ছেলেকেও সঙ্গে আনলেন।

কালীমতী দূর থেকে মাটিতে মাথা রেখে প্রণাম করলেন। বসার আসন সংগ্রহ করে রেখেছিলেন, পেতে দিলেন। তারপর সরাসরি বক্তব্য পেশ করলেন, আমি যতদিন না কিছু ব্যবস্থা করতে পারছি, বাড়ি-ঘর জমি-জমা সব আপনি দেখুন।

কুলপুরোহিতের দুই চোখ লোভে চকচক করে উঠল। এত বড় প্রত্যাশা কল্পনাও করেন নি। আখেরে অভাবনীয় কিছু লাভ হতে পারে বটে। তাঁরই মুখে মানিকরামের বৈমাত্রেয় দাদার বহু পাষণ্ডতার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত বিস্তার করতে বসলেন তিনি। বিষয়ের লোভেই সোনার বউটাকে চিতায় তোলার জন্য ব্যস্ত হয়েছিল সে কথাও ঘোষণা করলেন। নিজে তিনি গত ছ' জন্মে ছয়বার সতী হওয়ার মহিমা কীর্তন করেছিলেন কোন্ লোভে—সে কথা মনে থাকল না। যা-ই হোক, মা-লক্ষ্মীর মুখ চেয়ে এর পর যে তিনি ওই পাষণ্ডের সঙ্গে লড়তে ছাড়বেন না সেই আশ্বাসও দিলেন।

তাঁরই মুখে অতঃপর মানিকরামের সংসারের সমাচার শুনলেন কালীমতী। ধূর্ত মানুষ, এখানে এসে মানিকরামের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হওয়াই বিধেয়, সেটা তিনি খুব ভালো জানেন। পাগল ছেলেটার কি হেনস্থাই যে করছে সকলে মিলে সখেদে সেই সব কাহিনী বললেন। জানালেন, এমন কি ওর কচি বউটাকে পর্যন্ত নিজেদের হাতের মুঠোয় নিয়ে নিয়েছে।

বুকের ভিতরে আবারও ধক্ করে উঠল কালীমতীর।...সেদিন বলছিল বটে, বউও বিশ্বাস করে না।

ঠিক কি সঙ্কল্প করে কুলপুরোহিতকে ডেকেছিলেন, সব তালগোল পাকিয়ে গেল। তারপরে প্রত্যহ মানিকরাম এসেছেন। কালীমতী কথা বলেন না, পাঁচ কথা জিজ্ঞাসা করলে একটার জবাব দেন হয়ত। শুধু চেয়ে চেয়ে দেখেন তাঁকে। শুধু দেখেন আর দেখেন।

খেয়াল হলে মানিকরাম জিজ্ঞাসা করেন, কি দেখছ ?

কালীমতী কখনো জবাব না দিয়ে চুপচাপ চেয়েই থাকেন, কখনো বা উদ্গত কান্না গোপন করার জন্যেই উঠে চলে যান তাড়াতাড়ি।

এর পর একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই জ্ঞাতিবর্গ এবং পাড়ার মানুষেরা বড়-সড় নাড়াচাড়া খেল একটা।

খবর এলো কালীমতী গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। দলে দলে লোক ছুটল দেখতে।

কুলরমণীরা মন্তব্য করলেন, পাপের শেষ হয়েছে। সেই মরা মরলি, দুদিন আগে স্বামীর সঙ্গে চিতায় উঠে কলঙ্ক ঘোচাতে পারলিনে ?

মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন ভগবতীও। আর সংসারের বিষয়ী মালিকটি তো বটেই।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে আবার যে খবরটা শোনা গেল তাও কম বিড়ম্বনাজনক নয়। আত্মহত্যার আগে সরকারী লোকজন ডেকে কালীমতী বিষয়-আশয় বিলি ব্যবস্থার দস্তুরমত দলিলই করে গেছেন একটা। যাবতীয় সম্পত্তি তিনি জ্ঞাতি দেওর মানিকরামকে দিয়ে গেছেন। সকলের সামনে আঁকাবাঁকা অক্ষরে নিজের নামও সই করেছেন তার ওপর।

দামোদরের পারে চিতা জ্বলছে।

জ্ঞাতি-পরিজনেরা কেউ নেই। জনাকয়েক লোক সংগ্রহ করে মানিকরাম দাহ-কার্য সম্পন্ন করছেন। রাত হয়েছে। পুলিসের বিধিবদ্ধ অনুমতি পাওয়ার পর শ্মশানে আসতেই বিকেল গড়িয়েছিল।

চিতার আগুন ভালো করে জ্বলে উঠতে দূরে বসে মানিকরাম দেখছেন চুপচাপ। তাঁর ঠোঁটের ফাঁকে হাসির মত লেগে আছে। কি মনে হতে কালীমতীর স্বামীর সেই চিতার ওপরেই চিতা সাজিয়েছেন তিনি।

অন্ধকারে বসে দেখছেন মানিকরাম আর ভাবছেন, ওই আগুনের ভয়ে কি

দিশেহারা মূর্তিই না দেখেছেন কদিন আগে। আজ সেই আগুন বড় নির্বিঘ্নে জ্বলছে।

মানিকরামের সম্বিৎ ফিরল একসময়।

আগুন নিভে এসেছে। নিভন্ত চিতা ধিকি-ধিকি জ্বলছে। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারের বুকে দগ্‌দগে ঘায়ের মত দেখাচ্ছে চিতাটা।

কালীমতীর দেহ ছাই হয়েছে।

মানিকরাম উঠলেন। সঙ্গের লোককটাকে আগেই বিদায় দিয়েছিলেন। নদীর জলে চিতা নেভালেন। তারপর চান করলেন। রাতের আকাশের আর নিথর দামোদরের শান্ত স্তব্ধতা তাঁর সত্তায় এসে মিশেছে।

সেই রাতেও বাড়ির অনেকে তাঁর দেখা পেয়েছিলেন। ঘুমচোখে উঠে কিশোরী বউ ভগবতী তাঁকে খেতে দিয়েছিলেন। এই এক মৃত্যুতে শোক কারো হয়নি। তাঁরও না। স্বামী চুপচাপ খেয়ে ওঠার পরেও কিছুটা বরং নিশ্চিন্তেই ঘুমুতে পেরেছিলেন তিনি। তাঁর শরীর ভাল ছিল না। দেহের অভ্যন্তরে কদিন ধরে কি এক ব্যতিক্রম অনুভব করছেন। অন্তঃসত্ত্বা যে, তখন পর্যন্ত সে খবর নিজেও ভাল করে রাখেন না। লক্ষণ দেখে বড়জা শুধু দুই-একবার সম্ভাবনার কথাটা বলেছিলেন। ইতিমধ্যে কালীমতীর সতী হওয়া থেকে এ পর্যন্ত নানা বিভ্রাটে তা নিয়ে মাথা ঘামানোর অবকাশ আর হয়নি।

পরদিন সকালে উঠে কেউ আর মানিকরামের দেখা পাননি।

দিন গেছে, মাস গেছে, বছর ঘুরেছে। একে একে সাতটা বছর পার হয়েছে। সংসার থেকে একটা মানুষ যেন একেবারে মুছে গেল। এক ভগবতী ছাড়া আর কেউ তাঁর আশায় বুক বেঁধে ছিলেন না। আশা তাঁরও ফিকে হয়ে আসছিল।

প্রাকৃতিক ধারা আপন রীতিতে কাজ করেছে। যথাসময়ে সন্তান এসেছে। ছেলে। শূন্য জীবনের একমাত্র সম্বল। কিন্তু ভগবতীর বয়েস মাত্র ষোল তখন। তাই আরও বেশী অসহায় বোধ করেছেন। একে একে আরও ছটা বছর কেটেছে তারপর। আশ্রিত জীবনে অনেকটাই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। কিছুটা অবস্থার ফেরে, কিছুটা বা স্বভাবগুণে ভাসুরদের সংসারে নিজের দাবীর দিকটা প্রায় ছেঁটে দিয়েই চলতে শিখেছিলেন তিনি। আশ্রিতের মতই থাকেন, দিবারাত্র খাটেন। নানা কারণে সংসারের দৈন্যদশা শুরু হয়েছে। ভাসুরদের মধ্যে বিচ্ছেদ উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। তবু এই একজনের প্রতি খুব অকরুণ নয় কেউ।

এমন দিনে খবরটা কানে আসতে বাড়ির সকলেই সচকিত হয়ে উঠল।

পরিবারের ঘনিষ্ঠ পরিচিত কে একজন কলকাতা গেছলেন। বর্ধমান থেকে নৌকোয় কলকাতায় যাওয়াটাও তখন প্রবাস যাত্রার মতই। কেউ ফিরলে দেশের মানুষ খবর নিতে ছোটে তার কাছে। সেই লোক উল্টে এ বাড়িতে ছুটে এলো।

তারপর তাক লাগার মতই খবর দিল বটে।

মানিকরাম ভাল আছেন এবং কলকাতায় আছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে, তাঁর অতিথি হয়েই কলকাতায় তোফা আনন্দে কাটিয়ে এসেছে সে। মানিকরামের ভাগ্য ফিরে গেছে। প্রভুজী নামে কে একজন পয়সাঅলা লোকের সঙ্গে ব্যবসায় নেমে অঢেল পয়সা করেছেন নাকি। এখন একাই ব্যবসা করেন। নিজের বাড়ি হয়েছে, জুড়ি গাড়ি পর্যন্ত হয়েছে, ইত্যাদি।

শুকনো নদীতে হঠাৎ বান ডাকার মত ভগবতীর শুকনো চোখে জলের ধারা উপচে উঠতে চাইল। মানুষটা বেঁচে আছে, ভাল আছে, বিবাগী হয়ে যায়নি, এটাই প্রত্যাশার অতিরিক্ত খবর মনে হল প্রথম। কিন্তু একেবারে নিশ্চিন্ত হবার মত সম্বল নয় খবরটুকু। এখন আর পনেরো বছরের কিশোরী নন তিনি, বয়েস এখন তেইশ। জীবনের জটিল দিকগুলো অনেক আগেই ভাবতে শিখেছেন।...এত ভাল আছে, এভাবে ভাগ্য ফিরেছে, তবু একটানা এই সাত বছরের মধ্যে একটা খবর পর্যন্ত নেয়নি।...বাড়ি হয়েছে, সেই বাড়িতে নতুন ঘরনী এসেছে কিনা জানেন না। আসাই সম্ভব।

কদিন আকাশ-পাতাল চিন্তা করেছেন ভগবতী। খবরটা রাষ্ট্র হবার পর সংসারের সকলের কাছেই তাঁর কদর বেড়েছে। জায়েরা পরামর্শ দিয়েছেন কলকাতায় চলে যেতে। গিয়ে দেখতে কি ব্যাপার। সতীন নিয়ে ঘর করাও তেমন দুর্ভাগ্যজনক কিছু নয় সেই দিনে। দেওরের অবস্থা ফিরেছে শুনেই আগ্রহ সকলের।

কিন্তু ভগবতী যাওয়ার কথা ভাবছেন না। বরং একজন এখানে আসতে পারেন সেই সঙ্গোপন আশাটাই বুকের তলায় উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে।··ছেলের খবর তো জানা ছিল না, ছেলে আছে শোনার পর আসার সম্ভাবনা একেবারে অসম্ভব লাগছে না। এখানে থাকতেও নির্লিপ্ত মানুষটার ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলোর ওপরেই যা একটু টান দেখা যেত। বাড়ির বাচ্চা-কাচ্চাগুলোকে কোলে-পিঠে-কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন।

আশা বিফল হল না। মানিকরাম সত্যিই এলেন একদিন।

বৈমাত্রেয় দাদারা বাইরে খুশির ভাব দেখালেন, ভিতরে ভিতরে সন্ত্রস্ত। ছলে-কৌশলে কালীমতীর ভিটেসুদ্ধ তাঁরা বেচে খেয়েছেন। কালীমতীর সেই দানপত্র

হস্তগত করে বড় ভাই সেটা পুড়িয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। অবস্থাপন্ন ভাই এখন কিছু দাবী করে বসলে বিপদ।

সে প্রসঙ্গ উঠল না। শোনা না থাকলে ভাইয়ের অবস্থা যে এত ফিরেছে বোঝাও যেত না। পরনে মোটা কাপড়, গায়ে মোটা ফতুয়া, ফতুয়ার তলা দিয়ে ধপধপে পৈতে বেরিয়ে এসেছে। পায়ে চটি, মাথার চুল আঙুলের ডগায় ধরা যায় না এমনি ছোট করে ছাঁটা। মুখে হাসি লেগে আছে। আগের থেকেও অনেক সহজ, অনেক সরল মনে হয়েছে।

ভাইয়েরা নিশ্চিন্ত।

স্ত্রীর সঙ্গে নিভৃতে দেখা সেই রাত্রিতে। ওধারে ছেলে ঘুমুচ্ছে। ছেলেকে ইতিমধ্যে অনেকবারই দেখেছেন মানিকরাম। তবু ভাল করে দেখছেন আর একটু। তারপর স্ত্রীর দিকে ফিরেছেন। খুঁটিয়ে দেখেছেন তাঁকেও।

আমার আশা একেবারে ছেড়ে দিয়েছিলে বোধ হয়?

আর যাই হোক, ভগবতী কাঁদতে চান না। শক্ত হয়ে মাথা নাড়লেন। আশা ছাড়েন নি।

মানিকরাম তাঁর দিকে চেয়ে হাসলেন মিটিমিটি। ছেলেকে দেখিয়ে বললেন, আসতুম ঠিকই, আরও কিছুদিন পরে আসতুম হয়ত · ওর কথা শুনে আর থাকা গেল না। এ খবর তো জানতুম না—

অস্ফুট মৃদু জবাব দিলেন ভগবতী, কি করে খবর দেব?

খবর দেবার কোন উপায় ছিল না, হাসিমুখে মানিকরাম তা স্বীকারই করলেন যেন। কটা বছরের দীর্ঘ যাতনা কোনো অভিযোগে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল না তাও লক্ষ্য করলেন। যাতনা বটেই, এ সংসারের ধারা ভালই জানেন তিনি। কিন্তু ক্লেশ সহ্য করারও বিশেষ একটা রূপ আছে বোধ হয়। থেকে থেকে মানিক-রাম তাই অনুভব করছিলেন। সাত-আট বছর আগে স্ত্রীর এই রূপ তাঁর অগোচর ছিল। একটু ভেবে বললেন, দু-তিন দিনের মধ্যেই আমি কলকাতা ফিরব আবার, নয় তো সেখানকার কাজকর্ম অচল হবে।···এবারে ভরসা করে তুমি আমার সঙ্গে যেতে পারবে বোধ হয়?

ফেরার কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ভগবতীর নিঃশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম। পরের-টুকু শুনে গুরুভার নেমে গেল। কিন্তু কান্না আসছে আবারও। মাথা নাড়লেন। যাবেন।

কথাবার্তা বলাটা ক্রমে সহজ হয়ে এলো। কলকাতার বাড়ির প্রসঙ্গ উঠতে ভগবতী ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, সেখানে আর কে আছে?

মুখ গম্ভীর করে মানিকরাম জবাব দিলেন, আছে একজন, গেলে টেরটি পাবে।

ভগবতী থতমত খেলেন। ফাঁপরেও পড়লেন। কিন্তু মুখের দিকে তাকালে কোন ভয়ই ভয়ের মনে হয় না। আশঙ্কা সত্যি হলেও না।

মুচকি হেসে মানিকরাম জানালেন, তার নাম চাঁদ, বাড়ির চাকর, গত সাত বছর ধরেই ছায়ার মত সঙ্গে আছে—বউ আনতে যাওয়া হবে শুনে খুশিতে আটখানা।

সম্ভব হলে ভগবতী ছুটে গিয়ে ঠাকুরপ্রণাম করে আসতেন। মনে মনে করলেন। সাত বছর আগে যাঁকে হারিয়েছিলেন আর যাঁকে পেলেন, তাঁরা একই মানুষ। কিন্তু ভগবতীর মনে হল, একই বটে, তবু কোথায় বুঝি অনেক তফাত। অভিমান ধুয়ে মুছে গেছে। সঙ্কোচও। দেখছেন। ওই চোখে-মুখে বিত্তের কোন খাদ মেশেনি, ভোরের কাঁচা আলোর মত কি এক শুচি-স্নিগ্ধতা মুখখানাকে ঘিরে আছে।

তবু সবই জানার লোভ ভগবতীর, জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যবসা করে মস্ত লোক হয়েছ শুনলাম ?

আমি কিছুই করিনি, যেটুকু হয়েছে সব প্রভুজীর দয়ায়।

এই রকমই শুনেছিলেন বটে ভগবতী।—খুব ভাল লোক বুঝি ?

খুব।...তবে সব সময় বোঝা যায় না।

তাঁর অনেক টাকা ?

অনেক।

প্রভুজী নাম কেন, এদিকে সন্ন্যাসী নাকি ?

মস্ত।

শ্রদ্ধায় ভক্তিতে ভগবতী অভিভূত।—তোমার সঙ্গে এত খাতির হল কি করে ?

মিটিমিটি হাসতে লাগলেন মানিকরাম, খাতির করতে জানলে খাতির হয়।

ব্যবসা করার টাকাও তিনি দিলেন তোমাকে ?

তিনিই দিলেন।

লাভের ভাগ দিতে হয় না ?

ভাগ কেন, সবই দিতে হয়। সেদিকে কড়া মহাজন।

ভগবতী অবাক। সঠিক বোধগম্য হল না। মানিকরাম হাসলেন তেমনি। বললেন, মহাজন কড়া বটে, কিন্তু ফিরে আবার দেন যখন, রাখার জায়গা হয় না।

এবারে বোঝা গেল যেন। অর্থাৎ হিসেব বুঝে নেবার বেলায় কড়া, কিন্তু দেবার বেলায় মুক্তহস্ত। নইলে এরই মধ্যে বাড়ি হয় কি করে, গাড়ি হয় কি করে ?

শ্রদ্ধা কমল না একটুও। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, ভদ্রলোক বাড়িতে আসেন?

ডাকলে আসেন।

তুমি ডাক না?

সেরকম আর ডাকা হয় কই!...হাসছেন, তুমি ডেকে দেখতে পারো, ভদ্রলোকের স্বভাব ভাল, মেয়েরা ডাকলে একটু বেশি আসেন শুনেছি।

ভগবতী লজ্জায় লাল হয়ে উঠলেন, আবার ঘাবড়েও গেলেন। অমন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি প্রসঙ্গে এ-রকম মন্তব্য আশা করেন নি।

কলকাতার নতুন সংসারের মোটামুটি একটা ছাঁদছিরি ফিরল যার সহায়তায়, সে বাড়ির চাকর চাঁদ।

এতদিন দুটো মানুষই শুধু বাস করত এখানে, সংসারের পাট বলতে কিছু ছিল না। বাড়ির মালিকের মত এমন বোধশূন্য মানুষও ভগবতী আর দেখেন নি বোধ করি। দেশেও যদি মুখ ফুটে বলতেন কিছু, মোটামুটি যতটা সম্ভব ব্যবস্থা করেই আসা যেত। তা বলা দূরে থাক, যেন ষোলকলায় সংসার সাজিয়েই তিনি বউ আনতে গেছলেন। কলকাতায় আসার লোভে সেখানে যে বায়না ধরল যাব, অম্লানবদনে তাকেই বললেন, চলো—

ছেলে নিয়ে স্বামীর সঙ্গে একা আসেন নি ভগবতী। দুটি ভাসুর এসেছেন, বড় ভাসুরের বড় দুই ছেলে এসেছে, আর দূর সম্পর্কের আরও দুটি প্রতিবেশী এসেছে। তাঁরা নিজেরা ছাড়াও আরও ছজন। এর ওপর ছেলেপুলে নিয়ে জা' দুটিরও আসার ইচ্ছে ছিল, স্বামীটির তাতেও আপত্তি হত না, এযাত্রায় ভাসুরেরাই তাঁদের ক্ষান্ত করেছিলেন।

সংসারের হাল দেখে ভগবতীর চক্ষুস্থির।

বাড়ি ছোট নয়, পাকা দালান। কিন্তু বাড়ি বলতে শুধু বাড়িই। খাটপালঙ্ক, আসবাবপত্র দূরে থাক, রান্না-খাওয়ার ব্যবস্থা পর্যন্ত নেই। দেশের যে লোক এখান থেকে ফিরে গিয়ে কর্তাটির হদিস দিয়েছিল, সে কি ধরনের আতিথেয়তায় পরিতুষ্ট হয়ে অত প্রশংসা করেছিল ভগবতী ভেবে পেলেন না। চাঁদের মুখে যে সমাচার অবগত হলেন, তিনি হাসবেন না কাঁদবেন? চাঁদের নিজস্ব রান্নার সরঞ্জাম কিছু আছে। মাটির ছোট একটা পোড়া হাঁড়ি, দুই-একটা মাটির বাসন। আর কর্তার? তিনদিনে কি একদিন ভাত মুখে তুলতেন তিনি যে নিজের জন্য কিছু ব্যবস্থা করবেন। নেহাত ধমক খেয়েও চাঁদ যেদিন নাছোড়বান্দা হয়ে উঠত, আর বায়না ধরত, এমন কি ও উপোস করবে বলে ভয় দেখাত, কর্তা সেদিনই শুধু

রাঁধতে রাজি হতেন। সেদিনের মত মাটির হাঁড়ি-বাসন কিনে আনা হত। কদিন আর সেই এঁটো-কাটা আগলে বসে থাকবে চাঁদ, হাঁড়ি-কুড়ি ফেলে না দিয়ে করবে কি? কে ধোবে? এত টাকা-কড়ি থাকতেও চিঁড়ে-মুড়ি দই-গুড়-বাতাসা খেয়ে এভাবে দিন কাটাতে চাঁদ বাপের জন্মে আর কাউকে দেখেনি।

এতগুলো লোকের পর্যাপ্ত শয্যাব্যবস্থা পর্যন্ত আনা হয়নি দেশ থেকে। এখানে সম্বলের মধ্যে ভগবতী দেখলেন চাঁদ আর মালিকের দুজনার দুটো পাটি আর দুটো চাদর। রাতে মশারি না টাঙালে মশায় তুলে নিয়ে যায় শুনলেন, গরমের রাতেও তাই আপাদ-মস্তক চাদরে মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকতে হয়। মোটামুটি সুব্যবস্থা যদি কিছু থেকে থাকে তো আছে কর্তার ঠাকুরঘরে। চাঁদ বলল, ওই ঠাকুরের আরামের দিকে বাবুর যা একটু লক্ষ্য, আর কোন কিছুতে না।

স্ত্রীর অসহায় মূর্তি দেখেও মানিকরাম কৌতুকবোধ করেছেন। কয়েক গোছা নোট তাঁর হাতে গুঁজে দিয়ে বলেছেন, চাঁদকে দিয়ে সব ব্যবস্থা করে নাও, ভাবনার কি আছে?

সমস্ত দিনের মত নিখোঁজ তারপর।

অতএব ভাবনা সিকেয় তুলে কোমর বেঁধেই ভগবতী ব্যবস্থায় মন দিয়েছেন। তবু যেদিকে তাকান সেদিকেই ভাল করে তাকানোর প্রয়োজন হাঁ করে আছে মনে হতে তাঁর অত ঠাণ্ডা মাথাও বিগড়োবার উপক্রম। রাগ করে সেদিন চাঁদকেই বললেন, এভাবে না থেকে আমাকে আনার জন্য বাবুকে আরও আগে ঠেলে পাঠাতে পারলে না?

চাঁদ হাঁ প্রথম। তারপর হাসি। বলল, বাবুকে আপনিও ভাল করে চেনেন না দেখছি মা-ঠাকরোন। বাবুর সংসার আছে এতকালে সে কথা তো সেদিন জানলাম মোটে! সেই যে দেশের অতিথি এলেন একজন, তাঁর ঠেঙে প্রথম শুনলাম। বাবু কি একদিনও মুখ ফুটে বলেছেন নাকি! সেই অতিথি বাবুটি বামুন নয় বলে খাইয়ে-দাইয়ে খুব যত্ন-আত্তি করলাম—বাবুর এক কর্মচারীর থেকে চেয়ে-চিন্তে এনে গদিশয্যে পেতে দিলাম—তাঁর সঙ্গে খুব খাতির হয়ে যেতে তবে তো জানলাম আপনার কথা।

লোকটি বচনপটু। কর্তারই সমবয়সী। কর্ত্রীর নির্ভরযোগ্য প্রিয়পাত্র হয়ে উঠতে তার দু দিনও লাগল না। বর্ধমান থেকে আর যাঁরা এসেছেন, কলকাতায় তারাও নতুন। অতএব সর্বব্যাপারে চাঁদ ভরসা। ভোর না হতে মানিকরাম হেঁটে গঙ্গার চানে চলে যান। ফেরেন ঘণ্টা দুই বাদে। তারপর ঠাকুরঘরে ঢোকেন। সেখানেও ঘণ্টাখানেক। তারপর কাজে ভোবেন। এই ফাঁকে কিছু খাওয়ানো

গেল তো গেল। বেরিয়ে যদি পড়েন, কখন ফিরবেন বা সমস্ত দিনে আর ফিরবেন কিনা তা বোধ হয় তিনিও জানেন না। তবে তাঁর প্রতীক্ষায় থেকে স্ত্রীটি দিন দুই মধ্যাহ্নে উপোস দিতে একটু সচেতন হয়েছেন। সময়ে একবার ফিরতে চেষ্টা করেন, না পারলে কোথাও খেয়ে নিয়েছেন বলে খবর পাঠান। ব্যবসায়ের কাজে মাঝে-মাঝে বাইরেও বেরুতে হয়—তখন হয়ত একদিনের জায়গায় তিনদিন হয় ফিরতে। বেত আর চন্দনকাঠের কারবার—নৌকোয় ঘোরাঘুরি করতেই হয়। কথামত না ফিরলে ভগবতীর দুশ্চিন্তা দেখে চাঁদ হাসে। বলে, বাবু তো আপনি আসার পর তারিখ আর ঘড়ি দেখতে চিনছেন মা-ঠাকরোন! কিছু ভাববেন না, প্রভুজীর খাতিরের লোক যিনি তাঁর ক্ষেতি করে কে।

এই চাঁদের কাছে ভগবতী কৃতজ্ঞ। ও না থাকলে তাঁর আত্মভোলা কর্তার কি হাল হত কথার ছলে চাঁদ প্রায়ই সে গল্প ফেঁদে বসে। ভগবতী অবিশ্বাস করেন না। নিবিষ্ট মনে শোনেন, শুনে এক-একসময় গায়ে কাঁটা দেয় তাঁর। টাকা কি এমনিতে হয়েছে, রাত-বিরেতে কত সময় বনে-জঙ্গলে কাটাতে হয়েছে, বাঘের মুখে, সাপের মুখে পড়তে হয়েছে, ডাকাতে পিছু নিয়েছে—এক-একবার এমন বেঘোরে পড়েছে যে, মনে হয়েছে ফাঁড়া বুঝি আর কাটল না। আজ না-হয় টাকার জোরে দশজন কর্মচারী আর সঙ্গীসাথী জুটেছে, কিন্তু সেদিন চাঁদ ছাড়া আর কেউ ছিল না। আর কিছু না হোক, মুখের সামনে খাবারটি না ধরলেই তো কর্তার প্রাণটি খোয়াতে হত। অবশ্য বেইমান নয় চাঁদ তা বলে। ওর সামান্য প্রাণটাও যে কর্তার দয়াতেই রক্ষা পেয়েছে, সে কথাও একশবার বলবে।...সে কথা মনে হলে চাঁদ দুঃস্বপ্ন দেখে নাকি এখনো। এক বাঁদরমুখো গোরা মাতাল সাহেবের চাকরি করত সে। রোজ রাতে মদ খেয়ে কাউকে চাবকাতে না পারলে সাহেবের মেজাজ ভালো হত না। চাঁদ তখন খেতে না পেয়ে গাঁ ছেড়ে কলকাতায় এসেছে। কি দেশ এটা তখন কি জানত! বলা নেই কওয়া নেই মাত্র তিরিশটি টাকা নিয়ে একজন দিলে তাকে ওই মাতাল সাহেবের কাছে বেচে। ওকে বলল, সাহেববাড়িতে যেমন মাইনে, তেমনি ফুর্তি। মাইনে তো কলা, ফুর্তির চোটে প্রাণ যায়। চাবুকের চোটে তিনদিনে গায়ের চামড়া ফেটেছে। চারদিনের দিন রাত বারোটার সময় চাবুক খাবার ডাক পড়তে চাঁদ বাড়ি ছেড়ে ছুট। সঙ্গে সঙ্গে সাহেবও বেত নিয়ে তাড়া করল—ছুটো আরদালীও ছুটল তাকে ধরতে। ধরেই ফেলত আর প্রাণটিও যেত যদি না ওই রাতে বাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে যেত। অত রাতে বাবু নিজের মনে বাঁশি বাজিয়ে যাচ্ছিলেন, প্রাণের ভয়ে চাঁদ তাঁকেই জড়িয়ে ধরল। আরদালী ছুটো এসে গেল, বাবু শুনলেন কি হয়েছে। এদিকে মাতাল সাহেব এসে ওর ওপর

ঝাঁপিয়ে পড়ে আর কি।

বাবু তখন আরদালীদের কানে কানে কি বললেন। ভয়ানক ঘাবড়ে গিয়ে তারা মাতাল সাহেবকে যা বোঝালে তার অর্থ গোরা-সাহেবদের কান কেটে নিয়ে তাই দিয়ে বাবু পুজো দিয়ে থাকেন। এ পর্যন্ত পঞ্চাশ জোড়া কান কেটেছেন, আর এক জোড়া দরকার। লোকটাকে নিয়ে যাক্ আপত্তি নেই, কিন্তু সাহেবকে কান দুটি দিয়ে যেতে হবে। আরো অবাক কাণ্ড, ট্যাঁক থেকে বাবু সত্যিই একটা ছুরি বার করলেন। মাতাল সাহেব তখন চাবুক ফেলে দু হাতে কান চেপে বহুট্ লাগেগা, বহুট্ লাগেগা বলে চেঁচাতে চেঁচাতে পিছন ফিরে চোঁ-চাঁ দৌড়।

সেই থেকেই চাঁদ বাবুর সঙ্গে আছে। ওদিকে বাবুরও তখন দীন দশা। আড়তদারদের কাজ নিয়ে ঘোরেন, হাড়ভাঙা খাটুনি, মাইনে যা পান, তাতে খাওয়াপরা একসঙ্গে জোটে না। কিন্তু অত কষ্টে থেকেও বাবু কোনদিন তাকে যেতে বলেননি, উল্টে কতদিন নিজের মুখের আহার ওকে তুলে দিয়েছেন। ছমাস বাদে সেই সাগরের মেলায় গিয়ে তো প্রথম ভাগ্য ফিরল বাবুর। তারপর প্রভুজীর মত মহাজন পেলেন, অভাব গিয়ে টাকার বন্যা এলো।

প্রভুজীর দয়া আর কৃপার গল্প চাঁদের মুখেও শুনেছেন ভগবতী। সুদিনের মুখেও সংকট এসেছে দুই-একবার। টাকার জন্যে একবার তো গোটা ব্যবসাই ডুবতে বসেছিল। তিনদিন বাদে বিলিতী জাহাজ বোঝাই হয়ে মাল চালান যাবে, এদিকে টাকার দায়ে গুদোম থেকে মাল খালাস করা যাচ্ছে না। যাঁর মাথায় বজ্রাঘাত, তিনিই সকলকে আশ্বাস দিচ্ছেন, প্রভুজী জানেন যখন তিনিই সব ব্যবস্থা করবেন, কিছু ভেবো না। জাহাজ যেদিন ছাড়ার কথা, সেইদিন হাসিমুখে বাবু হুকুম করলেন, টাকা এসেছে মাল খালাস হয়েছে, জাহাজে মাল তোলো। শুনে সকলে হাঁ—কর্তা বলেন কি, এই শেষ সময়ে জাহাজ মাল নেবে কেন! দু দিন আগে মাল তোলার নিয়ম, তাছাড়া অত মাল তুলতেও তো গোটা দিন লেগে যাবে। অবাক তো হবেই সকলে, কেউ তো আর জানে না জাহাজ ছাড়ার ওই দিনই বদল হয়ে গেছে—জাহাজ ছাড়বে আরো এক হপ্তা বাদে। কর্তাই শুধু জানেন।

তবে সাধু-সন্তের টাকায় ব্যবসা ফেঁপে উঠলে লাভের টাকা যে তেমন ভোগে আসে না, চাঁদের মনের তলায় সেই খেদও আছে একটু। এই বাড়িটা যখন কেনা হল, তখন সকলে মিলে বাবুকে ধরল একটু আমোদ-আহ্লাদ হোক, নাচ-গান, খাওয়া-দাওয়া হোক এক রাত্রি। কিন্তু বাবু সরাসরি আবদার নাকচ করে দিলেন, প্রভুজী খুশি হবেন না, দরকার নেই। তাছাড়া, এত পয়সাঅলা লোকের বাড়ির কি হাল ছিল সে তো মা-ঠাকরোন নিজের চোখেই দেখেছেন। এত কৃচ্ছ সাধন

চাঁদের একটুও পছন্দ নয়। প্রভুজী না হয় সাধক মানুষ, কখন কোথায় থাকেন এক বাবু ছাড়া খবর রাখে না কেউ—এই মুহূর্তে হয়ত বা হিমালয়ের চুড়োতেই ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন। কিন্তু বাবু তো আর তা নন, সংসারে সংসারী মানুষের মতই থাকতে হয়, একটু আমোদ-আহ্লাদ করাটা দোষের কিছু নয়। প্রভুজীর এটুকু অন্তত বোঝা উচিত।

প্রভুজীটিকে একটিবার চোখে দেখার বাসনা ভগবতীরও কম নয়। একদিকে সাধক, অন্যদিকে ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত—এমন বিচিত্র জীবনের কথা ভগবতী আর শোনেননি। কলকাতায় এসে দেখতে পাবেন ভেবেছিলেন। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে তাঁর প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে সঙ্কোচ হয়েছে।···যে ঠাট্টা করেছিলেন দেশে, ভোলবার নয়। বলেছিলেন, তুমি ডেকে দেখতে পারো, ভদ্রলোকের স্বভাব ভালো, মেয়েরা ডাকলে একটু বেশি আসেন। কথা তুললে আবার কি বলে বসেন ঠিক কি। তাছাড়া অজ্ঞাত ভয়ও আছে একটু। তান্ত্রিক সাধু-সন্ন্যাসীদের দুই-একটা কাণ্ড-কারখানার গল্প তাঁর শোনা আছে। গাঁয়ের এক বিধবাকে তো একজন এক-বার শুধু চোখ তাকিয়েই চিরকালের মত টেনে নিয়ে গেল।

দেখতে দেখতে বছর ঘুরেছে একটা। ভগবতীর কোলে দ্বিতীয় সন্তান এসেছে। এও ছেলে। প্রথম ছেলেকে শিশু অবস্থায় পাননি মানিকরাম। এই শিশুর বাঁধনে পড়ে গেলেন। তাঁর অনিয়ম কমতে লাগল। চাঁদ খুশিতে আটখানা। তাঁর বিশ্বাস, মা-ঠাকরোন সাক্ষাৎ ভগবতী, নইলে অমন বিবাগী মানুষ ঘরমুখো হয়! চার-পাঁচ মাস যখন বয়স শিশুর, মানিকরাম তাকে বুকে নিয়ে ঘোরেন। কাজের মধ্যে একটু ফুরসত পেলেও চাঁদকে বলেন, নিয়ে আয় তো ছেলেটাকে।

ছ'মাসে ছেলের অন্নপ্রাশন হয়ে গেল। ধনীর উৎসবের মতই ঘটা হল। দেশ থেকে ভগবতীর জায়েরা আর বাদবাকি ভাসুরেরাও সব এলেন। আসতে পেরে আর যাবার নাম করলেন না তাঁরা। বাঞ্ছিত আপনজনের মতই থেকে গেলেন। সব থেকে বেশি আনন্দ চাঁদের। এই এক উৎসবে বাবু কোনদিকে কার্পণ্য করলেন না বা তাঁর প্রভুজীর দোহাই পাড়লেন না। উৎসব শেষে গভীর রাতে স্বামীকে নিরিবিলিতে পেলেন ভগবতী। মনের কথাটা তখনি তুললেন। দু ছেলের মা, আগের থেকে সংকোচও কিছু কমেছে। বললেন, এইদিনেও তোমার প্রভুজী একবার এলেন না···ছেলেকে একটু আশীর্বাদ করলেন না?

সাদা-মাটা প্রশ্নটা শুনে মানিকরাম কেমন যেন বিমূঢ় হঠাৎ। মুখের দিকে চেয়ে রইলেন খানিক, তারপর অন্যমনস্কের মত স্বগত প্রশ্ন করলেন, আসেননি ···না?

ভগবতী অবাক।—সেকি! এসেছেন কিনা তাও খেয়াল করোনি? তাঁকে জানিয়েছিলে তো?

জবাব না দিয়ে তেমনি বিমনা মুখেই মাথা নাড়লেন মানিকরাম।—আসেননি ···আমার ওপর বিরূপ হয়েছেন বোধ হয়।

কেন, তুমি কি করেছ?

ঠিক জানি না। কিছু করেছি হয়ত।

কি ভাবতে ভাবতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি। ভগবতীর মুখে অজ্ঞাত শঙ্কার ছায়া।

জমজমাট বাড়িতে একটা বিষাদ ঘনীভূত হয়ে উঠল আরো এক বছর বাদে। মানিকরামের অতি-আদরের দ্বিতীয় ছেলের বয়েস মাত্র দেড় তখন। এবং ভগবতী আবারও অন্তঃসত্ত্বা। হঠাৎ দেখা গেল দেড় বছরের মোটাসোটা বাড়ন্ত শিশুটা কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে। মাংস শুকোচ্ছে, হাড়ও শুকোচ্ছে বোধ হয়। কবরেজ-বদ্যির ভিড় লেগে গেল বাড়িতে। তাঁরাও কিছু একটা দুরারোগ্য ব্যাধির আশঙ্কায় মুখ বিকৃত করলেন।

ভগবতীর বুক দুরু দুরু। তিনি কাঁদেন। মানিকরাম গম্ভীর। স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেন, কিছু ভেবো না, সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু সত্যিকারের পরিবর্তন কোন্ দিক দিয়ে আসছে, সেটা মানিকরামও জানতেন না। হঠাৎ এক রোমাঞ্চকর পদসঞ্চার তার।

রাতে বৃষ্টি হয়েছিল। সকালের দিকেও আকাশ মেঘলা ছিল। ঠাণ্ডাও ছিল। মানিকরাম যখন গঙ্গার স্নানে এলেন, ভোরের আলো ভালো করে জাগেনি। স্নানার্থীর সংখ্যাও দু-চারজনের বেশি নয়।

স্নান শেষে গলাজলে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত জপ করেন মানিকরাম। তাই করতে যাচ্ছিলেন। অদূরে চোখ পড়তে চমক ভাঙল। সবে ফরসা হয়েছে তখন। দূরে দূরে আরো দু-পাঁচজন স্নানরত। মানিকরামের থেকে গজ-পনের দূরে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে। মুখ পাতলা ওড়নায় ঢাকা। বয়েস বেশি নয় বোঝা যায়। রূপসীও মনে হয়। বড় ঘরের মেয়ে হবে। গঙ্গার পাড় ঘেঁষে শৌখিন পাল্কি দাঁড়িয়ে। পাল্কি-বাহকেরা দূরে সরে গেছে। সঙ্গে আছে একটি প্রৌঢ়া গোছের রমণী। ধনী-ঘরের পরিচারিকা হবে।

এদিকটায় তখন স্নানের বাঁধানো ঘাট বলতে কিছু নেই। স্নানের জন্য মেয়েদের আলাদা স্থানও কিছু নির্দিষ্ট নেই। একটা নিরিবিলি দিক বেছে নিয়ে তারা স্নান

করে। রক্ষণশীলারা আপাদমস্তক কাপড়ে ঢেকেই পরিচারিকার হাত ধরে চান সেরে ওঠে। মানিকরামও বরাবরই ভিড় এড়িয়ে চান করে থাকেন।

যোগাযোগ বিস্ময়কর কিছু নয়। কিন্তু পাতলা ওড়নার ভিতর দিয়ে মেয়েটি যেন বেশ নিবিষ্ট আগ্রহে লক্ষ্য করছে তাঁকে। আর তাঁর দিকে চোখ রেখেই বয়স্কা পরিচারিকাকে বলছে কিছু। পরিচারিকাও ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে তাঁকে। মানিকরাম অবাক হলেন একটু, তিনি থাকাতে মেয়েটির জলে নামতে অসুবিধে হচ্ছে মনে হল। উঠে অন্যদিকে সরে যাবেন কিনা ভাবলেন। কিন্তু অন্যদিকে তো মেয়েটিও সরে যেতে পারে। এই নির্জন দিকটা বেছে নিয়েই তো রোজ চান করেন তিনি।

কি ব্যাপার না বুঝে আবার তাকালেন।

মনে হল, পাতলা ওড়নার ফাঁকে মেয়েটি হাসছে তাঁর দিকে চেয়ে। মনে হল নয়, স্পষ্টই দেখলেন তিনি।

বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। জপে মনোনিবেশ করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু মন ঠিক বসল না। দুর্বোধ্য কৌতূহল নিয়ে আবারও ফিরে তাকালেন একবার।

মুখের ওড়না সামান্য সরেছে। মেয়েটি স্পষ্টই মিটি-মিটি হাসছে তাঁর দিকে চেয়ে।

উষালগ্নে এ আবার কি ব্যাপার! তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে নিলেন মানিকরাম। ছিটগ্রস্ত কোনো বড়লোকের মেয়ে হবে ভাবলেন প্রথম। রোগ তাড়ানোর জন্যেও অনেকে গঙ্গাস্নান করে থাকে। কিন্তু জপে মন দিতে পারছেন না। যতবার চেষ্টা করছেন, কেবলই মনে হচ্ছে, কৌতুকভরা রমণী-কটাক্ষ তাঁর পিঠে বিঁধে আছে। মিথ্যে নয়, বিঁধে আছেই। অনিচ্ছা সত্ত্বেও যতবার ফিরলেন, একই দৃশ্য দেখলেন। ঠিক এক বললেও ভুল হবে। প্রতিবারই মনে হল, ওড়নার আড়ালে চাপা কৌতুক পুষ্ট হয়ে উঠছে।

বারকয়েক জপে ব্যাঘাত হবার পর, মানিকরাম গলাজলে মুখোমুখি ঘুরেই দাঁড়ালেন একেবারে। ব্যাপারটা না বোঝা পর্যন্ত জপের চেষ্টা নিষ্ফল।

সঙ্গে সঙ্গে নীরব নাটকের অপ্রত্যাশিত পরিণাম দেখে বিমূঢ় তিনি। এক ঝটকায় মুখের ওড়না সরিয়ে দিল মেয়েটি। বছর একুশ হবে বয়েস। হাসিভরা দুটো চোখ তাঁর মুখের ওপর আটকে রেখেই ওড়নাটা পরিচারিকার গায়ে ছুঁড়ে দিলে। দেহে নাড়া পড়ল কি জমাটবাঁধা রূপের উৎসে নাড়া পড়ল সঠিক বুঝে উঠলেন না মানিকরাম। বিচিত্র রূপসীর সর্বাঙ্গে যেন যৌবনের হিল্লোল বয়ে গেল

একপ্রস্থ। কাজলটানা কালো চোখের গভীরে হাসির বিদ্যুৎ তাঁর মুখের ওপর আরো জোরে ঝাপটা দিয়ে গেল। চোখের হাসি চাপা দুই ঠোঁটের ব্যবধান ঘোচালে। ঝক্‌ঝকে দু সারি দাঁতের আভাস দেখা গেল।

স্থান কাল ভুলে মানিকরাম ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছেন।

মেয়েটি জলে নামল। জল ভেঙে এগিয়ে চলল। রমণী-অঙ্গের রেখায় রেখায় যৌবন লুটোপুটি খেতে লাগল। জল-ছোঁয়া কি এক স্পর্শে বিবশ বিহ্বল মানিকরাম। তিনি জেগে আছেন কি নিভৃতের কোনো সুপ্ত কামনা চোখের সামনে স্বপ্নের রূপ ধরেছে তাও নিশ্চিত জানেন না।

জল ঠেলে বুকজলে এসে থামল মেয়েটি। রক্তাভ একটি শ্বেতপদ্ম স্থির হল। আস্তে আস্তে মানিকরামের দিকে ফিরল একবার। এবারের দৃষ্টিতে আর ঠোঁটের কোণের হাসির আভাসে ভরা-গাঙের নিবিড়তার ছোঁয়া।

তারপর সামনের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। প্রসন্ন গাম্ভীর্যভরা দুচোখ ওপরের দিকে প্রসারিত। রমণী-অঙ্গ স্থির নয় খুব, জলও নড়ছে একটু একটু। জলের নীচে বেশবাস আঁট করে নিচ্ছে হয়ত। পরমুহূর্তে শান্ত জল ভেঙে চৌচির। রক্তাভ শ্বেতপদ্ম দাঁড়িয়ে নেই আর। অবলীলাক্রমে ভেসে চলল, এগিয়ে চলল—দূরে, আরো দূরে। জাহ্নবী ভাগীরথী যেন বুকে নেবার জন্য দূরের গভীরে ডাকছে তাকে। চলেছে সে, শুধু চলেছে। কোনো আয়াস নেই, কোনো ছেদ নেই, অবলীলাক্রমে চলেছে।

হঠাৎ শঙ্কিত, ভীত-ত্রস্ত মানিকরাম। শুধু মানিকরাম কেন, দৃশ্যটা স্নানরত আরও অনেকের চোখে পড়েছে। তারাও হাঁ করে অভাবিত ব্যাপারটা দেখছিল এতক্ষণ। দূরে দূরে গুঞ্জন উঠল এবারে। কেউ বলল পাগল, কেউ বা দূরের নৌকোকে ডেকে দূরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বিপদ বোঝাতে চেষ্টা করল। কিন্তু মাঝির কানে সে-ডাক পৌঁছুল না বোধ হয়। মানিকরামের দিশেহারা অবস্থা। চোখের সামনে কি আত্মঘাতিনী হতে চলেছে ওই মেয়ে! পিছন ফিরে তাকালেন। দেখলেন, বয়স্কা পরিচারিকাটি নির্লিপ্ত মুখে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। তার মুখে উদ্বেগের একটা আঁচড়ও পড়ে নি।

মেয়েটি তখন ভরা গঙ্গায় প্রায় মাঝামাঝি চলে গেছে। বিন্দুর মত দেখাচ্ছে তাকে।

একটু বাদে মেয়েটি ফিরছে মনে হল। তাই। রক্তাভ শ্বেতপদ্ম ক্রমে স্পষ্টতর হতে লাগল। তীরে লোকের ভিড় জমে গেছে ততক্ষণে। সকলের নির্বাক চোখের ওপর দিয়ে অনায়াসে একসময়ে ফিরে এলো সে। যেখান থেকে জলের

বুকে দেহ ভাসিয়েছিল প্রায় সেইখানেই ফিরে এসে দাঁড়াল। বিমূঢ় মানিকরামের হঠাৎ মনে হল এও এক অসম্ভব ব্যাপার। অন্তত কোন মেয়ের পক্ষে। মাঝ-দরিয়া পর্যন্ত স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটলেই শুধু এটা সম্ভব হতে পারে। তাই কেটেছে, অন্যথায় অনেক দূরে ভেসে যাবার কথা। স্রোতের টান অবশ্য নামমাত্র এখন, জোয়ার-ভাঁটার সন্ধিকাল সম্ভবত। তবু মানিকরাম নিজেও এতটা পারতেন কিনা সন্দেহ।

মেয়েটি বুকজলে দাঁড়াল আবার। শ্বেতপদ্মের সমস্ত মুখ রক্তাভ এখন। হাঁপাচ্ছে বেশ। জলের আড়ালেও বুকের ওঠা-নামা বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু সবটুকুই কৌতুকোচ্ছল লীলার শ্রম, এই মুখে ক্লেশের চিহ্নমাত্রও নেই। এবারে আর ঘুরে তাকাতে হল না, মানিকরামের দিকে মুখ করেই সাঁতার-লীলা শেষ করেছিল সে। তাঁর বিমূঢ় মুখের ওপর চোখ রেখেই হাঁপাচ্ছে, আর হাসছে। আগের থেকেও প্রসারিত হাসি। হাসির ফাঁকে ফাঁকে মুক্তোর মত দাঁতের সারি ঝকমকিয়ে উঠছে।

কি যে হল মানিকরামের, নিজেও ভাল জানেন না। হঠাৎ জল ঠেলে দ্রুত পারের দিকে চললেন তিনি। তীরে উঠলেন। নীরব দর্শকেরা তখন ওই রমণীটির সঙ্গে তাঁকেও দেখছে। জলের দিকে ঘুরে তাকালেন একবার। আর কোন দর্শকের প্রতি সচেতন নয় মেয়েটি। সে শুধু তাঁকেই দেখছে আর—আর হাসছে মুখ টিপে।

শুকনো কাপড় তুলে নিয়ে হন-হন করে এগিয়ে চললেন মানিকরাম। ভিজা কাপড় বদলানো হল না। রোজই হেঁটে ফেরেন, কিন্তু পা দুটো ভার ভার লাগছে আজ। মাথাটা ঝিম-ঝিম করছে। ভোরের বাতাসে একটা দুর্বোধ্য বিস্ময় জমাট বেঁধে আছে।

...মেয়েটিকে কি কোথাও কখনও দেখেছেন তিনি? যত ভাবছেন, মুখের আদল ততো চেনা-চেনা লাগছে কেন? কিন্তু এযাবৎ এক নিজের স্ত্রী আর কালীমতী ভিন্ন আর কোন নারীর মুখ ভাল করে চোখ তাকিয়ে দেখেছেন তিনি? ভিতরে ভিতরে তবু একটা খোঁজাখুঁজি চলেছে কেন? মানিকরাম ভাবতে লাগলেন। কিন্তু কূলকিনারা পেলেন না।

কাপড় বদলে সকলের অগোচরে ঠাকুরঘরে গিয়ে ঢুকলেন। সকালের জপ পর্যন্ত সারা হয় নি। বেলা গড়াবে আজ। ওদিকে বাইরেও অনেক কাজ পড়ে। মন থেকে অবিশ্বাস্য সকালটা ছেঁটে দিয়ে চোখ বুজে জপে বসলেন তিনি।

...কিন্তু চোখের সামনে প্রসারিত গঙ্গা। সেই গঙ্গায় কৌতুকভরা পূর্ণযৌবনা বিচিত্র রূপসীর একখানি নবনীত মুখ। আয়ত চোখের গভীরে ঈষৎ-চঞ্চল নিবিড়

কটাক্ষ, অধর-কোণে হাসির ঝলক, মুক্তোর মত দাঁতের সারি···

অসহিষ্ণু বিরক্তিতে আবার জপে মন দিলেন মানিকরাম। আবারও।

···শুরাজ্যোৎস্নার আকাশে পরিপূর্ণ চাঁদের হাসি অনেক দেখেছেন মানিকরাম। সেই আকাশের বুকে চাঁদ অনেক ছোট। কিন্তু সেই ছোট চাঁদের যৌবনের বন্যায় গোটা আকাশ হাসে। গঙ্গাও বুঝি আজ তেমনি হাসছিল। ভরা গঙ্গা আজ ওই চাঁদের মত এক রমণীকে বুকে নিয়েছিল, তার কাছ থেকে যৌবন ধার করেছিল। সকালে যা দেখেছিলেন, চোখ বুজে মানিকরাম এখনও তাই দেখছেন।

সরোষে তাকালেন তিনি। জপের চেষ্টা বিড়ম্বনা শুধু। সামনে রাধা-কৃষ্ণের বিগ্রহ। শ্যামের হাতে বাঁশী, বাঁমে শ্যাম-দেহলগ্ন শ্রীরাধিকা। মানিকরাম চেয়ে চেয়ে দেখছেন।

হঠাৎ ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মত সবেগে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। ক্রোধে রক্তবর্ণ সমস্ত মুখ। নিজের দুটো চোখ ছিঁড়েখুঁড়ে তুলে এনে আছড়ে ফেলতে চাইলেন বিগ্রহের সামনে। কি দেখলেন, কি দেখে উঠলেন মানিকরাম? ···মুরলীধর শ্যাম তাঁর চোখের সম্মুখে আর নেই দেখলেন। আর শ্রীরাধিকার দিকে চেয়ে চেয়ে এক রমণীকে দেখলেন, আর রমণীর যৌবন দেখলেন। আর গঙ্গা দেখলেন, আর গঙ্গার বুকে সেই যৌবনের অফুরন্ত লীলা দেখলেন।

অশান্ত পায়ে ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে এলেন মানিকরাম। মুখ থমথমে গম্ভীর। তাঁর কেবলই মনে হতে লাগল গঙ্গায় আজ যা দেখে এসেছেন তা সত্যি নয়। সত্যি হতে পারে না। ওটা অন্তরের দিকে দৃষ্টি ফেরানোর পরীক্ষা একটা। অন্তর্যামীর বিচিত্র পরীক্ষা। তিনি ভিতর দেখালেন তাঁকে। ভিতর দেখিয়ে সতর্ক করলেন, সচেতন করলেন।

কিন্তু কাজেও মন বসল না। পরীক্ষা ভাবুন আর যাই ভাবুন, জাগ্রত চোখে যা দেখেছেন তা অস্বীকার করার চেষ্টা মিথ্যে। ঘুরে-ফিরে কেবলই মনে হতে লাগল, ওই রকম একখানি রমণী-মুখের আদল তিনি কোথাও কখনও দেখেছেন। স্বপ্নের ঘোরে দেখে থাকলেও দেখেছেন। অথচ আশ্চর্য, দেখে থাকলে ওই রূপ, মুখের ওই হাসি, চোখের ওই কটাক্ষ, গঙ্গা উপচে-তোলা ওই যৌবন—আগে কখনও রেখাপাত করল না কেন?

দেখেছেন কি দেখেন নি এটা স্থির করতে পারলেও মানিকরাম কিছুটা স্বস্তিবোধ করতেন হয়ত। শুধু ভাবছেন তিনি।···মেয়েটির সমস্ত আচরণ শুধু তাঁকেই লক্ষ্য করে তাতে সন্দেহমাত্র নেই। শুধু তাঁকে অবাক করার জন্য, তাঁকে বিহ্বল করার জন্য। অতটা রূপসী না হলে ওই বয়সের এক মেয়ের অমন অদ্ভুত

আচরণ নির্লজ্জ বই কি। কিন্তু বিহ্বলতা কাটিয়ে তার আচরণ বিশ্লেষণ করা কারও পক্ষেই সম্ভব হয়নি হয়ত। মানিকরামের পক্ষে তো নয়ই।

দিনটা এক-রকম আচ্ছন্নের ঘোরে কেটে গেল। রাতেও কারও সঙ্গে একটি কথাও বললেন না। এই মুখ দেখে কেউ কাছেও এগুল না। শুধু ভগবতী ছাড়া। এক বছরের এক শিশুর অজ্ঞাত ব্যাধির দরুন একটা আশঙ্কার ছায়া ক্রমে ভারী হয়ে উঠছিল। ভগবতী শুধু এই একজনের মুখের দিকে চেয়ে যা একটু সান্ত্বনা পেয়েছেন, ভরসা পেয়েছেন। দুশ্চিন্তায় মন বেশি কাতর হলে এই মুখের আশ্বাস পেয়েছেন, অভয় পেয়েছেন, ভরসা পেয়েছেন। কিন্তু আজ তাঁর দিকে তাকিয়ে ভগবতীর শুকনো মুখ আরও শুকিয়ে গেল। সমস্ত দিন ছটফট করে কাটিয়েছেন তিনিও। কারণ, আজও এক নতুন কবিরাজ এসে মুখ ভার করে চলে গেছেন। আশ্বাস পাওয়া দূরে থাক, আড়াল থেকে কবিরাজের হাবভাব লক্ষ্য করে মনে হয়েছে সঙ্কটকাল খুব দূরে নয়। তিনি আসবেন জেনেও স্বামী বাড়ী ছিলেন না—এরও ভিন্ন অর্থই করে নিয়েছেন ভগবতী। অর্থাৎ আশা করার কিছুই নেই। আর এখন এই মূর্তি দেখেও ত্রাসে বুকের ভিতরটা গুড়গুড় করে উঠল। ছেলের অসুখ ভিন্ন এই স্তব্ধতার আর কোন কারণ তাঁর মনেও এলো না।

নিঃশব্দেই ঘর ছেড়ে প্রস্থান করলেন ভগবতী। মানিকরাম একা থাকতে চেয়েছিলেন। তবু স্ত্রীর এই মুখ বুজে চলে যাওয়াটা লক্ষ্য করলেন। দরজা পর্যন্ত দু চোখ অনুসরণ করল তাঁকে। চুপচাপ তারপর নিজের ভিতরটাই দেখতে বসলেন তিনি। দেখতে লাগলেন। যৌবনে পা দেবার আগে বাপ-মা-ভায়েরা যাঁর সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে দিয়েছিল, তাঁর রূপ আছে কি নেই, তা নিয়ে কখনও মাথা ঘামাননি তিনি। প্রথম সন্তান যখন এসেছে, তখনও নারীর অন্তঃপুরের রহস্যের দিকে ভাল করে চোখ যায় নি। স্ত্রীর জীবনে একটানা সাত বছর অনুপস্থিত ছিলেন তারপর। ...ফিরে আসার পর তেইশ বছরের স্ত্রীটিকে ভাল লেগেছিল। কিন্তু সেই ভাল লাগার আড়ালে কামনার দিকটা অগোচর ছিল। দ্বিতীয় সন্তান এসেছে। নিভৃতের কতগুলো মুহূর্ত ছাড়া মন তখনও কামনার ঊর্ধ্বে বিচরণ করেছে। শুধু ভাল লাগা-টুকুই দানা পাকিয়েছে।...এক বছর না যেতে স্ত্রী আবারও অন্তঃসত্ত্বা। তাতেও ভাল-লাগার প্রলেপ পড়ে ছিল এযাবৎ। কামনা সংসারের পালনীয় আচরণের আশ্রয়ে নিরাপদে বাস করছিল।

আজ ভাল-লাগার প্রলেপ মুছে গেছে। সংসারের পালনীয় নীতির মুখোশ সরে গেছে। নিজেকে খুব স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছেন মানিকরাম। আসলে সত্ত-গত কটা বছর যাতে তিনি জড়িয়ে ছিলেন, সেও নিছক ভোগ আর আসক্তি। নারীর

দেহ তাঁকে বিস্মৃতি দিয়েছে। সেই বিস্মৃতির নগ্ন লালসায় অনেক রাত তিনি প্রতীক্ষা করেছেন, প্রহর গুনেছেন। কামনার ঊর্ধ্বে সত্যিই তিনি উঠতে পারেন নি। কোন দিন পেরেছিলেন কিনা সন্দেহ। কালীমতীকে ঘিরেও এই একই ভোগের স্পৃহা সুপ্ত ছিল কিনা সে সম্বন্ধেও তিনি নিঃসংশয় নন আজ।

নিজের দিকে চেয়ে কামনার সহস্র ফণা দেখলেন বুঝি মানিকরাম।

যে কামনা নিজের স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে না, কালীমতীকে পৃথক চোখে দেখে না, শুচি-প্রভাতের গঙ্গাবহগাহনের লগ্নে দেখা কোন মূর্ত যৌবনাকেও তফাতে সরিয়ে দিতে চায় না। সেই কামনা শুধু ভোগের আঁধার খোঁজে। পেলে সহস্র শিখায় জ্বলে জ্বলে উঠতে চায়।

বুকের তলায় একটা যাতনা নিয়েই উঠে দাঁড়ালেন মানিকরাম। যাতনা বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে শান্তিও একটু। নিজেকে দেখতে পাওয়ার শান্তি। নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। ঠাকুরঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

দরজা বন্ধ।

অনেক সময়ই বন্ধ থাকে। ইচ্ছে করলেই খুলতে পারেন। কিন্তু ইচ্ছে করল না। উল্টে সকালের কথা মনে পড়ল। নিস্পন্দের মত দাঁড়িয়ে রইলেন খানিক। তারপর যেমন এসেছিলেন তেমনি নিঃশব্দেই ঘরে ফিরে এলেন আবার।

রাত্রির শেষ প্রহরও শেষ হল। ভোরের প্রথম পাখি ডাকার সঙ্গে সঙ্গে গামছা কাপড় নিয়ে গঙ্গার স্নানে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। রাতে মনে হয়েছে সকালে কিছু একটা ঘটবে। নতুন কিছু। যা ঘটবে তার পটভূমিও হয়ত ওই গঙ্গার তীর। কিন্তু পথে বেরিয়ে অন্যরকম লাগছে। পূবের আকাশের ত্বকের নীচে জবাকুসুম-সংকাশ রঙের পট উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। রাতের আঁধার ফিকে হয়ে আসছে। মানিক-রামের মাথা থেকেও অমনি খানিকটা ঠাসা অন্ধকার যেন তরল হয়ে গেছে। মাথায় ভূত চেপেছিল গোটা একটা দিন। অজানা অচেনা কে এক তরলমতি বিকৃত-মস্তিষ্ক মেয়ে হঠাৎ মোহাচ্ছন্ন করে দিয়েছিল তাঁকে। মাথা খারাপ না হলে ওই রকম করে কোন মেয়ে হাসে না বা সাঁতার কেটে মাঝ-গঙ্গায় চলে যায় না। আসল ব্যাপার রূপ। ওই রূপ দেখেই মোহগ্রস্ত হয়েছিলেন। গঙ্গার পারে যারা ছিল, সকলেই তাই হয়েছিল।

সব ধুয়ে-মুছে ফেলার তাড়নায় হন-হন করে হেঁটে গঙ্গায় পৌঁছুলেন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন একটা। আজ আর কোন পাল্কি চোখে পড়ল না। নিজের নিরিবিলি জায়গাটি বেছে নিয়ে জলে নামলেন। অনেকক্ষণ ধরে চান করলেন। মাঝে মাঝে দুই-একবার পিছন ফিরে তাকাতে হল তবু।...গতকাল কখন নিঃশব্দে

অদূরে এসে দাঁড়িয়েছিল মেয়েটা, টের পান নি। গলাজলে দাঁড়িয়ে নির্বিঘ্নে স্তব-পাঠে মন দিলেন। জোরেই মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন। মন ডুবে গেল। স্তব সম্পন্ন হল। মন হাল্কা হল।

তীরে ওঠার জন্য এগিয়ে আসতেই দু চোখ আচমকা হোঁচট খেল একপ্রস্থ। নিস্পন্দের মত দাঁড়িয়ে গেলেন মানিকরাম।

পাড়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে কালকের রহস্যময়ীর সঙ্গিনী সেই বয়স্কা পরি-চারিকাটি। তাঁরই প্রতীক্ষায় আছে। কিছু বলবে মনে হয়।

পায়ে পায়ে পাড়ে উঠলেন মানিকরাম। গামছাটা কোমরে জড়িয়ে নিয়ে দ্বিধান্বিত রমণীর সামনে এসে দাঁড়ালেন।

কি—চাই? কণ্ঠস্বর নিজের কানেই রূঢ় শোনাল।

দিদি আপনার কাছে পাঠালেন।

কে তোমার দিদি?

কালকের সেই···

বুঝেছি, কিন্তু কে সে?

রমণী নীরব। রুক্ষ হাব-ভাব দেখে ঘাবড়ে যাবার দরুন হতে পারে, আবার বলবে না বলেও হতে পারে।

মানিকরাম আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে?

তাঁর দাসী।

তিনি কে? কি নাম?

রমণী নিরুত্তর আবারও।

অসহিষ্ণু মানিকরাম সংযত করলেন নিজেকে। তারপর ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, আমার কাছে কি জন্যে পাঠিয়েছেন তোমাকে?

জবাবে রমণীটি ছোট্ট একটা চিরকুট বাড়িয়ে দিল তাঁর দিকে। বিস্মিত মানিক-রাম হাত পাততে আলতো করেই সেটা তাঁর হাতে ফেলে দিল সে। মানিকরাম পড়লেন। আঁকা-বাঁকা অক্ষরে একটি বাড়ির নির্দেশ শুধু লেখা আছে তাতে।

কি এটা?

ওইখানেই দিদি থাকেন। দয়া করে আপনাকে একবার আসতে অনুরোধ করেছেন।

মানিকরামের মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। এতক্ষণের স্নান আর স্তবপাঠের প্রশান্তির লেশমাত্র অবশিষ্ট নেই। উত্তেজনায় কণ্ঠস্বর ঝাঁঝাল শোনাল আরও।— আমি তাঁকে চিনি না, তিনিও আমাকে চেনেন না, অনুরোধ করলেই আমি যাব

কেন ?

পরিচারিকাটি তেমন ঘাবড়াবার পাত্রী মনে হল না এবার। চুপচাপ চেয়ে রইল একটু, তারপর জবাব দিল, দিদির ধারণা তিনি আপনাকে চেনেন, আপনিও তাঁকে চেনেন।

না, আমি তাঁকে চিনি না, আগে কখনও দেখিনি! মানিকরামের গলা চড়ছে, কে তিনি ?

তিনি শুধু আপনাকে দয়া করে একবারটি আসতে অনুরোধ করেছেন, আর কিছু বলে দেন নি। নির্লিপ্ত মুখে পরিচারিকা প্রস্থান করল। চলে যাচ্ছে…।

মানিকরাম হতভম্ব খানিকক্ষণ। সচকিত হয়ে হাতের কাগজটাই দেখলেন একবার। দলা পাকিয়ে সরোষে ফেলে দিলেন সেটা। অশুচি স্পর্শের মত লাগছে। জলে নামলেন আবার। স্নান করলেন। কিন্তু অনুভূতিটা গেল না।

বাড়ি।

আজ আর ঠাকুরঘরের দিকে পা বাড়াতেও চেষ্টা করলেন না। বাইরের ঘরে ব্যবসায়ের কাগজপত্র নিয়ে বসলেন। অন্দরমহল থেকে খাবার এলো। সে খাবার তেমনি পড়ে থাকল। একসময় উঠে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন।

দাসীর মারফত ওই আমন্ত্রণ আশা করেন নি তিনি। কিছু একটা ঘটতে পারে ভেবেছিলেন। ঘটেছে।

গতকালের সকালটা বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে।…পাতলা ওড়নার ফাঁক দিয়ে যৌবনগর্বিতা রূপসীর সকৌতুক পর্যবেক্ষণ, ওড়না খুলে ছুঁড়ে ফেলা, কটাক্ষ, হাসি, ঝকমকে দাঁতের আভাস। স্থির যৌবন অস্থির হয়েছে তারপর, জলে নেমেছে, মীনকন্যা স্বচ্ছন্দে জলে বিহার করেছে। বিপদকে ব্যঙ্গ করে ফিরে এসে কাছেই দাঁড়িয়েছে আবার। শ্রমলীলায় যৌবনসম্ভার ফুলে-ফুলে উঠেছে, দুরন্ত রূপলাবণ্য অঙ্গ থেকে খসে-খসে জলে মিশতে চেয়েছে।…মুখে আবার সেই হাসির ঝলক, সেই কটাক্ষ-বিদ্যুৎ, মুক্তোর মত দাঁতের সারি।

দৃশ্যটা আজও কতবার দেখে উঠলেন মানিকরাম ঠিক নেই। থেকে থেকে আবারও মনে হল, রমণীর ওই মুখের আদল কোথাও দেখেছেন। পরিচারিকাও বলে গেল মেয়েটা চেনে তাঁকে, তিনিও তাঁকে চেনেন। এযাবৎ যত মেয়েকে দেখেছেন, তাদের সব কটি মুখ তিনি হাতড়ে বেড়িয়েছেন। সংখ্যায় তারা নামমাত্র। কারও সঙ্গে মেলে নি। হয়ত বা ওই অদ্ভুত মেয়ের কিছু ভুল হয়েছে। হয়ত বা অনেক দিনের অদেখা কোনো চেনা মানুষ ভেবেছে তাঁকে। কিন্তু তবু মানিকরাম

স্বস্তিবোধ করছেন না কেন?

বাড়ি ফিরলেন সন্ধ্যার পর। সমস্ত দিন অনাহারে গেছে। চোখে-মুখে একটা চাপা অশান্তির ছাপ। আজ তাঁকে দেখে আরও বেশি শঙ্কিত হলেন ভগবতী। শঙ্কা শুধু ছেলের জন্য নয়, এই মানুষটির জন্যেও। কিছু না বলে তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধোবার ব্যবস্থা করলেন। তারপর খেতে দিলেন।

মানিকরাম নিঃশব্দে খেয়ে উঠলেন। ভগবতী কাছেই দাঁড়িয়ে। খাওয়া শেষ হতে আস্তে আস্তে বললেন, নামকরা একজন আচার্যের কথা বলছিল চাঁদ, তাঁকে ডেকে ভাল করে একটু শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করলে হয় না?

মুখের ওপর সজোরে চাবুক পড়ল যেন একটা। স্ত্রীর দিকে চেয়ে রইলেন খানিক। ছেলের কথা, ছেলের অসুখের কথা মনেও ছিল না। ভিতরে ভিতরে নীরব কাটা-ছেঁড়া হয়ে গেল একপ্রস্থ।—কাল কবিরাজ এসে কি বলে গেলেন?

কোন আশ্বাসের কথা বলতে পারলে ভগবতী বলতেন।—বলেন নি কিছু, অনেক ওষুধ দিয়ে গেলেন। একটু থেমে জোর দিয়েই আবার বললেন, ভগবান অমঙ্গল করবেন না, চেষ্টা তো সব-রকমই হচ্ছে, এত ভাবছ কেন?

মানিকরাম চেয়ে আছেন। উদ্গত অনুভূতিটা আবারও দমন করলেন। শান্ত গলায় বললেন, আমি ছেলের কথা ভাবছি না।

এই মুখ দেখে আর এই জবাব শুনে ভগবতী বিস্মিত হঠাৎ। চেয়ে আছেন মুখের দিকে।

আমি প্রভুজীর কথা ভাবছি।

কি হয়েছে তাঁর? মুহূর্তে ব্যাকুল ভগবতী।

কিছু হয়নি। তিনি আমাকে ত্যাগ করেছেন।

এই উক্তির তাৎপর্য জানেন না ভগবতী। চমকে উঠলেন তবু। নির্বাক তারপর।

ঘর ছেড়ে বাইরে চলে এলেন মানিকরাম। থমথমে মুখ। অন্ধকার দাওয়ায় পায়চারি করলেন খানিকক্ষণ। ওই অন্ধকারের মতই অস্পষ্ট একটা জাল তাঁর চার দিকে। তাতে টান পড়েছে। ডান হাতের চেটো কি এক স্পর্শে সিরসির করে উঠল। আকা-বাঁকা অক্ষর বসানো একটা দুমড়ানো কাগজের স্পর্শ। সকালে যেটা গঙ্গার পাড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। অক্ষরগুলো চোখের সামনে মেচে-বেড়াল। পায়ের গতি দ্রুত হল মানিকরামের। তবু ঠেকানো গেল না, অজ্ঞাত নিভৃতের পর্দা ঠেলে ঝলসে উঠল রহস্যভরা রমণীর মুখ। দৃপ্তরূপা, কৌতুকোচ্ছল, অস্থিরযৌবনা।

এক মুহূর্ত থমকালেন মানিকরাম। তারপর হনহন করে দাওয়ার ওধারে এগিয়ে গেলেন। হাঁক দিয়ে কোচোয়ানকে ডাকলেন। সে ছুটে আসতে গাড়ি জুড়তে হুকুম করলেন।

উধ্বর্ থেকে চারদিকে ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়েছে কেউ। দুর্বোধ্য কিন্তু অমোঘ। সেটা তিনি ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে আসবেন কি ওটাই নরকে টানবে তাঁকে, জানেন না।

মানিকরাম যাবেন।

অন্ধকারে এক নিঝুম পুরীর সামনে জুড়ি গাড়ি থামল। মানিকরাম নামলেন। অনুমানে মনে হল এই বাড়ি। কোচোয়ানের মুখ দেখতে পেলে দেখতেন তার মুখে বিস্ময়ের আঁচড় পড়েছে কতগুলো। সামনে ফটক। তার ওধারে বড় চৌহদ্দির মধ্যে বাড়ি। কোনো জানলা-দরজা দিয়েও আলোর রেশমাত্র দেখা যাচ্ছে না। ওখানে জনমানব বাস করে মনে হয় না।

বাড়ি চিনতে ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। মানিকরাম ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন চুপচাপ।

ভুল হয়নি। ফটকে জুড়ি গাড়ি থামার শব্দ শুনেই হয়ত দরজা খুলে কাচ-ঢাকা প্রদীপ হাতে বেরিয়ে এলো কেউ। মানিকরামের চিনতে কষ্ট হল না। হাতের আলোয় প্রদীপবাহিকার মুখ দেখা গেল। সেই বয়স্কা পরিচারিকা।

ফটক ঠেলে মানিকরাম ধীর শান্ত পায়ে কাছে এলেন।

পরিচারিকার মুখে কৌতূহল নেই, চোখে প্রশ্ন নেই। আগন্তুককে একবার দেখে নিল শুধু। কে এলো বা কে আসতে পারে জানাই ছিল যেন। সামান্য ইশারা করে প্রদীপ হাতে সে ভিতরে ঢুকে গেল।

মানিকরাম অনুসরণ করলেন। গোটা দুই অন্ধকার ঘর পার হয়ে হঠাৎ আলোর রাজ্যে এসে পড়লেন যেন। বড় বড় ঝাড়লণ্ঠনে একরাশ করে মোম জ্বলছে। দেয়ালে-দেয়ালে কাচ-ঘেরা আলোর শোভা।

হাতের প্রদীপ রেখে পরিচারিকা এগিয়ে গিয়ে একটা ঘরের সামনে দাঁড়াল। দরজায় শৌখিন পুরু পরদা ঝুলছে। পরদাটা টেনে ধরল।

মানিকরাম ভিতরে ঢুকলেন।

বড় ঘর। মাথার ওপর জোড়া ঝাড়। আলোর বন্যায় সাদাটে ঘর। দেয়ালে দেয়ালে দামী কাচের আয়না। ঘরময় নরম গালিচা। একধারে পুরু একটা গদির ওপর ঝালর দেওয়া রেশমী চাদর বিছানো। সেখানে বড় একটা মখমলের

তাকিয়া ঠেস দিয়ে নবাবনন্দিনীর মত বসে আছে একজন।

সেই মেয়ে।

বসার ভঙ্গী শিথিল। মনে হয় শুয়ে ছিল, আগন্তুকের খবর পেয়ে উঠে বসেছে। এইদিকেই চেয়ে আছে। দৃষ্টি গম্ভীর। গাম্ভীর্যের তলায় কৌতুকের আভাসও অস্পষ্ট নয়।

নিষ্পলক দৃষ্টি-বিনিময়। মেয়েটি তাঁকে আহ্বান জানাল না, কাছে আসতে ইশারা করল না। শুধু চেয়ে আছে। অপরিচিত মানুষ দেখছে না যেন, পরাজিত পুরুষ দেখছে। যে পুরুষ অনেক যুঝে শেষে হার মেনেছে। হার মেনে নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে।

মানিকরাম এগিয়ে এলেন। রেশমের চাদরে মোড়া গদির একপাশে গান-বাজনার সরঞ্জাম। তানপুরা, সারেঙ্গী, মৃদঙ্গ, তবলা। ঘরের বাতাস থেমে আছে, বাজনাগুলিও বুঝি মুখর হবার শক্তি হারিয়েছে। বাদ্যযন্ত্রগুলির সামনেই দাঁড়িয়ে গেলেন মানিকরাম।

কে তুমি? গলার স্বর জলদগম্ভীর।

নিরুত্তর। কাজল-টানা গভীর দুটি চোখ তাঁর মুখের ওপর আটকে আছে। এই কটাক্ষে বিদ্যুৎ নেই। পরাজিত পুরুষের প্রতি সে সদয় হতে পারে, নির্দয়ও হতে পারে। কি হবে, মুখের দিকে চেয়ে তাই যেন স্থির করে নিচ্ছে।

কাছে এসে মানিকরামের গম্ভীর দৃষ্টিটা আর একপ্রস্থ ধাক্কা খেয়েছে। গলায় কানে হাতে সোনা-হীরের গয়না। পরনে সোনার জরি বসানো অতি সূক্ষ্ম চাঁপা রঙের বেনারসী। দু'পেঁচ দিয়ে গায়ে জড়ানো, কিন্তু এত সূক্ষ্ম যে এই আলোয় অঙ্গের আভা চোখ টানে। অন্তর্বাস অজ্ঞাত বস্তু তখন। অভিজাত ঘরের অন্দরমহল পর-পুরুষের অগম্য স্থান তাই। হীরে-ঝলমল আলোর ছটায় রমণীর জাগ্রত যৌবন স্নায়ু বিবশ করার মত।

মানিকরাম অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন আরো।

কে তুমি?

চোখে পলক পড়ল না, ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য হাসির আভাস স্পষ্টতর হল। পুরুষের বিড়ম্বনা দেখে সদয়ই হবে স্থির করেছে বুঝি।

আমার কথা কানে যাচ্ছে তোমার? কে তুমি?

চেয়েই আছে। কিন্তু রমণীর এতক্ষণের স্থির যৌবনে এবারে সাড়া জাগল একটু। বসার শিথিল ভঙ্গি সামান্য বদলাল। এক হাতের হীরের বাজুবন্ধে আলো-ঝলসালো, হাতখানা পিছনের দিকে সরল। যে বস্তুটা হাতে নিল, কি সেটা

মানিকরাম ঠাওর করতে পারলেন না। কিন্তু শব্দ শুনে বুঝলেন। ছোট ঘণ্টা নাড়ার শব্দ।

মানিকরাম ঘাড় ফেরালেন। হুকুমের প্রতীক্ষায় সেই পরিচারিকা দাঁড়িয়ে।

ঠাকুরের বসতে অস্থবিধে হচ্ছে, আসন পেতে দে। আসনে গঙ্গাজল ছিটিয়ে আনিস।

কণ্ঠস্বর এই প্রথম শুনলেন মানিকরাম। কানের পরদায় লেগে থাকার মত মিষ্টি অথচ মৃদু-গম্ভীর। কৌতুক নয়, কিছু দরকারী নির্দেশই দিল যেন। অসহিষ্ণুতায় ফাটল ধরেছে মানিকরামের, বিস্ময়ের আঁচড় পড়ছে মুখে। আবারও মনে হল বিচিত্র রমণীর এই মুখের আদল কোথাও কি দেখেছেন—গলার এই আমেজলাগা স্বর কোথাও কি শুনেছেন কোনদিন ?

সুদৃশ্য আসন হাতে পরিচারিকা এগিয়ে এলো, বাজনাগুলোর সামনে সেটা পেতে দিয়ে প্রস্থান করল। স্নায়ু আবার তেতে উঠেছে মানিকরামের, সর্বাঙ্গ পরিহার করে উষ্ণ দৃষ্টিটা শুধু তার মুখের ওপর আটকে রাখতে চেষ্টা করলেন।

তুমি কি পাগল ? নাকি তোমার খেলার পাত্র ভেবেছ আমাকে ?

মেয়েটার কালো চোখের গভীরে হাসির ছোঁয়া লাগল এবারে। আপাদমস্তক দেখল একবার। কৌতুক-গাম্ভীর্যের নীরব অধ্যায় শেষ। সামান্য মাথা নাড়ল কি নাড়ল না। বাণী-উৎসের মুখ আস্তে আস্তে খুলল যেন। বলল, নওল বিহনে রাধিকা পাগল, শ্যাম বিহনে গোপিনী পাগল, মুরলী বিহনে যমুনা পাগল…তারা কি পাগল ?…আর খেলার মানুষই বা ভাবি কি করে, গঙ্গার পারে দাঁড়িয়ে পর পর চারদিন বুকজলে যে জপের নিষ্ঠা দেখেছি, আকাশের ইন্দ্রেরও ভয় ধরে থাকতে পারে। বোসো গো ঠাকুর বোসো, আমি পাগলও নই, তোমাকে খেলার মানুষও ভাবিনি।

এই বাস্তব সত্যি কিনা মুহূর্তের সেই সংশয় মানিকরামের। গঙ্গার জলে যে মেয়ে যৌবনের জোয়ার নামিয়েছিল সেদিন, তার থেকে রমণীর এই রূপও কম বিচিত্র নয়। অন্তস্তলের আত্মপুরুষের একটা চাবুক খেলেন তিনি। বসার বদলে ওই আসনের ওপরে পা রাখলেন একটা। সংযত গম্ভীর স্বরে সেই একই প্রশ্ন করলেন।—কে তুমি ?

আমি শুভা। ওস্তাদ বলে, এখনো গলার সাত পাখি ভালো বশ হয়নি, নাচে এখনো অঙ্গে সাগরের ঢেউয়ের দোলা লাগেনি। তবু তোমাদের কলকাতার বাবুরা কাড়াকাড়ি মারামারি করে ছুটে আসে যার গান শুনতে আর নাচ দেখতে—আমি সেই শুভাবাঈ। চিনলে ?

এ পর্যন্ত মানিকরাম কোনো নাচ-গানের আসরে গিয়ে বসেননি। চেনেন

না। কিন্তু নাম শুনেছেন। কলকাতার বড়লোক বাবুদের কাছে এই নামের কদর জানেন। সাহেব-সুবোদের দিশি মজলিসে খুশি করার দরকার হলেও আসরে ইদানীং সব থেকে বেশি ডাক পড়ে যার সে শুভাবাঈ। ঠিক এই নাম আশা করেননি মানিকরাম, কিন্তু এই গোছেরই কেউ একজন হতে পারে মনে হয়েছিল। তবু শোনার পর সরোষে চেয়ে রইলেন একটু। গলার স্বর কঠোর শোনালো।—তা আমাকে ডেকেছে কোন্ মতলবে ?

শুভাবাঈয়ের কৌতুক-ধারা সবটুকুই প্রচ্ছন্ন। জবাব দেবার আগে চুপচাপ দেখল একটু।—মতলব তো ছিল কিছু, কিন্তু তোমার রাগ দেখে ভয় ধরেছে। দাঁতে করে ঠোঁটের একটা কোণ ঘষে নিল বার-দুই, দু চোখ মুখের ওপর আটকে আছে তেমনি। বলল, তরলমতি যুবতী, ঝোঁকের মাথায় নাহয় ডেকেই বসেছি··· কিন্তু এত যদি বিরূপ, তুমি এলে কেন গো ঠাকুর, তোমাকে বেঁধে তো কেউ আনেনি ? উদ্গত কৌতুক দমনের চেষ্টায় কালো চোখ চকচক করে উঠল একবার, নিরীহ মুখ করেই বক্তব্য শেষ করল, যা-ও এলে তাও আবার দিনমানে নয়···

মানিকরামের মুখে লালের আভা ছড়াচ্ছে। রাগ ওই রমণীর ওপরেও বটে আবার নিজের ওপরেও বটে। ইচ্ছে হল সামনের ওই বাদ্যযন্ত্রগুলোকেই পায়ের আঘাতে চূর্ণ করে দেন।

কি জন্যে ডেকেছ, অনেক টাকা আছে আমার ভেবেছ ?

ভাবব কেন, শুনেছি মানিকঠাকুর এখন মস্ত লোক, টাকার ছড়াছড়ি তাঁর। কিন্তু আমি তোমাকে টাকার জন্যে ডাকিনি, ঠাকুরের আশীর্বাদে এই দাসীরও টাকা কিছু আছে। আমি তোমাকে ডেকেছি শুধু দেখতে—দেখতে আর দেখতে। গঙ্গার তীরে তোমাকে দেখার পর কেবলই মনে হয়েছে, তোমাকে দেখার জন্য ন বছর ধরে একটা মেয়ে দিন গুনেছে আর কাল গুনেছে। তুমি তার কি উপকার যে করেছ সে তো নিজের চোখেই দেখলে সেদিন, এত বড় গঙ্গাও কাবু তার কাছে, তরতরিয়ে এ-পার ও-পার করতে পারে। ডুবন্ত মেয়েটাকে কি ভাসাই না ভাসতে শিখিয়েছে, তোমার অপার করুণা ঠাকুর।

মানিকরাম বিস্মিত, বিমূঢ়।···তাঁর নাম পর্যন্ত জানে মেয়েটা। বাঈজীদের শিকার ধরার বিচিত্র ছলা-কলা কিনা সে সন্দেহও মনের তলায় উকিঝুঁকি দিয়ে গেল একবার। কিন্তু শুনলেন যা, তাও মনে হয় না।

তুমি চেন আমাকে ?

কালো গভীর দুটো চোখ তাঁর মুখের ওপর স্পষ্টই ভাসছে এবারে। সেই হাসির ছটা ঠোঁটের কানায়-কানায় ভরে উঠতে চাইছে। জবাব না দিয়ে আলতো

করে পাল্টা প্রশ্ন করল, রাত-দুপুরে বাঁশী বাজাও আজকাল···নাকি টাকার বাঁশী শুনে শুনে ও-পাট ভুলেছ?

অর্থাৎ চেনে যে তাই বুঝিয়ে দিল। চকিতে দেশের সবগুলো চেনা মেয়ের মুখ হাতড়ে বেড়ালেন একবার। কারো সঙ্গে মেলে না। অথচ এখন এই মুখের আদল চেনা-চেনা লাগছে আরো।

কে তুমি?

আমি? অনেকক্ষণের চাপা হাসিটা ভ্রূ-ভঙ্গির ফাঁকে ফাঁকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। আমি তো শুভাবাঈ গো ঠাকুর! তোমাকে দেখে ন বছর আগের কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য যে মেয়েটা আমাকে অস্থির করে মারলে সে আর একজন। তা বসবে না দাঁড়িয়েই থাকবে?

নিজের অগোচরেই যেন আস্তে আস্তে বসলেন মানিকরাম। সদর্পে যে আসনে পা রেখে দাঁড়িয়েছিলেন সেই আসনেই বসলেন।

রমণীর ঝকমকে চোখের কালো তাঁর মুখের ওপর নড়েচড়ে স্থির হল আবার। পরিস্থিতি এবারে গোটাগুটি তারই দখলে যেন। অবাধ্য ছেলে কিছুটা বাধ্য হয়েছে সেই তুষ্টি। মাথা নাড়তে গিয়ে সর্বাঙ্গ দোল খেল একটু। বলল, শুভাবাঈকে তুমি আর চিনবে কি করে, আয়নার সামনে দাঁড়ালে তোমার সেই ছিঁচকাঁদুনে মেয়েরই যে অবাক লাগে এক-একসময়।···ন বছর আগে সাগরের মেলায় সুভদ্রা নামে তেরো বছরের যে মেয়েটাকে আশ্রয় দিয়েছিলে একদিন, মাঝরাতে নৌকোয় তোমার দু পা জড়িয়ে ধরে মতি পিসির কাছে যাবে না বলে কেঁদে কেঁদে গঙ্গা-সাগরের জল বাড়িয়ে দিয়েছিল—অবাক লাগে সেই কাঁদুনে মেয়েরও।···চিনলে?

রুদ্ধ হাসির বাঁধ ভাঙল এবার। শুভাবাঈয়ের সর্বাঙ্গ দুলে উঠল, ফুলে উঠল, আর হাসি বাড়ল।

মানিকরাম সম্মোহিতের মত বসে আছেন। আলো জ্বাললে একরাশ অন্ধকার যেমন মুহূর্তে নিঃশেষে মিলিয়ে যায়, ঠিক তেমনি করেই ন বছরের একটা বিস্মৃতির পরদা সরে গেছে চোখের সমুখ থেকে। সুভা···সুভদ্রা! বিশ্বাস করবেন কি করবেন না বুঝে উঠছেন না মানিকরাম।···তেরো বছরের সেই ফুটফুটে কিশোরী মেয়ে—এত রোগা যে কিশোরীও মনে হয় না। শুধু হাড়ের ওপর একটা ধপধপে সাদা চামড়া বসানো, কিন্তু মুখের দিকে তাকালে চোখ ফেরানো যেত না, অজ্ঞাত বেদনায় বুকের ভিতরটা খচখচ করে উঠত কেমন। পাঁচ কথা জিজ্ঞাসা করলেও একটার জবাব দিত না, এক-একসময় বোবাই মনে হত মেয়েটাকে।

···সেই মেয়ে! অস্থি-চর্মসার সেই অসহায় মেয়ের মুখের সঙ্গে নটা অদেখা

বছর যোগ করলে এই হয়! এ রকম হতে পারে? পারে যে, সেটা আর তিনি অবিশ্বাস করেন কি করে?

…এত বড় দুনিয়ায় মানিকরাম একা তখন। সঙ্গে ছায়ার মত ঘোরে শুধু চাঁদ। মানিকরামের তখন একটাই সঙ্কল্প, টাকা করবেন। কালীমতী তাঁকে টাকা আর বিষয়-আশয় দিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। তাহলেই যেন দুঃখ ঘুচবে মানিকরামের। টাকা আর বিষয়-আশয় নিজেই কত করতে পারেন কালীমতীকে দেখিয়ে ছাড়বেন তিনি। কলকাতায় দশ টাকা মাইনেয় এক সাহেবের আমদানি-রপ্তানির ব্যবসায়ে নেটিব সরকারের কাজ পেয়েছিলেন তিনি। সাহেব দিবারাত্র খাটাত তাঁকে, জলের দরে মাল খোঁজার তাগিদে জঙ্গলে পাঠাত। ঘোরাঘুরির বাবদে যে টাকা পেতেন, তাতেই মাস চলে যেত মানিকরামের। মাইনের টাকা সবটাই বাঁচত।

তখনি চোখ খুলেছিল। তিনি দেখতেন এদেশের পয়সঅলা বেনিয়ানদের কাছ থেকে মোটা সুদে মূলধন সংগ্রহ করেও সাহেবরা ব্যবসা করে, দেখতে দেখতে লাল হয়ে ওঠে। বছর না ঘুরতে ব্যবসা তাদের ফুলে ফেঁপে ওঠে। দেশের বড়লোকেরা শুধু সুদের টাকা গুনে পেয়েই খুশি—বিলাস-ব্যসনে মনের আনন্দে দিন কেটে যায় তাদের।

কি যে করা যেতে পারে মানিকরাম তখনো স্থির করেননি। বিশ্বাস করে তাঁকে কোনো বেনিয়ান টাকা দেবে না। নিজের সঞ্চিত মূলধন আর একটু বাড়লে তাই নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়বেন স্থির করেছিলেন। কিন্তু তার আগেই কি নিয়ে অবনিবনা হবার ফলে সাহেবের চাকরি গেল। মানিকরাম অথৈ জলে পড়লেন।

কিন্তু ওই জলই যে তাঁর প্রথম টাকার উৎস, তখনো জানা ছিল না।

বিপাকে পড়ে সময়ে বুদ্ধি যোগাল। গেল-বারে গঙ্গাসাগরের মেলায় উপস্থিত ছিলেন তিনি। সেখানকার দৃশ্য দেখে সঙ্কল্পটা তখনই মাথায় এসেছিল দুই-একবার। গেল-বারে কে তাঁকে টেনেছিল সেখানে জানেন না। তিনি পুণ্য করতে যাননি, গেছলেন খেয়ালের বশে। প্রতি বছর ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে সাগর-উপদ্বীপ নৌকোয় ছেয়ে যায়—নৌকো, পানসি, মাড়। ওখানে চোদ্দশ বছরের মন্দিরে বাস করেন নাকি জাগ্রত কপিলদেব। তাঁরই অর্চনার উপলক্ষে বাৎসরিক মেলা বসে। লক্ষ লক্ষ যাত্রী আসে,—ছেলে-বুড়ো নারী-পুরুষ। পুণ্যার্থী আসে দেশ-দেশান্তর থেকে। নৌকো, পানসি, মাড় ভাউলিয়া জড় হয় ষাট-সত্তর হাজার। বাঈজী গায়ক বাদক নিয়ে জল-বিহারে আসে পয়সঅলা শৌখিন বাবুরা। খুচরো ব্যবসায়ী আসে কাতারে কাতারে—লক্ষ লক্ষ টাকায় কেনা-বেচা

হয়। আসে বারবনিতাও, চুপিসারে ডেরা বাঁধে।

আগের বারে মানিকরাম ঘুরে ঘুরে দেখেছিলেন শুধু। অনেকটা লক্ষ্যভ্রষ্টের মতই। যাত্রী দেখেছেন, পারাপার দেখেছেন, কেনা-বেচা দেখেছেন। মনের তলায় তখন একটা সম্ভাবনা উঁকিঝুঁকি দিয়ে গেছে শুধু। সেবারে সঙ্গে ছিল শুধু একটা বাঁশী।

পরের বারেও বাঁশী ছিল আর সঙ্গে ছিল চাঁদ। সেবারে আর লক্ষ্যভ্রষ্টের মত আসেননি তিনি। বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছিলেন। মেলা বসবে জানুয়ারীতে, তিনি তার দু মাস আগেই এসেছিলেন। বাসনা, আগে থাকতে গোটাকতক নৌকো সংগ্রহ করবেন। মেলার সময় কড়ি গুনে যাত্রীদের পারাপারের কাড়াকাড়ি তিনি দেখেছেন। নৌকোই বোধ করি সব থেকে দুষ্প্রাপ্য বস্তু সে-সময়। নৌকো পানসি মিলিয়ে কত হাজার হয় মানিকরাম জানেন না, সে সংখ্যা আরো পাঁচ-দশ হাজার বাড়লেও পর্যাপ্ত হয় না বোধ করি।

গঙ্গাসাগরে নয়, সেখান থেকে অনেক দূরে জেলেদের একটা গাঁয়ে এলেন তিনি। নৌকো বা পানসি কিছুই ইজারা নিতে হল না। এক বুড়ো মাঝির সঙ্গে খাতির হয়ে গেল তাঁর। মাঝির ধারণা, এমন বাঁশী যে বাজায়, ছলনার আশ্রয় সে নিতে জানে না। তার ওপর ব্রাহ্মণসন্তান।—এমন শুচিকান্তি। মানিকরামের প্রস্তাব তার মনে ধরল। এযাবৎ সেখান থেকে গোটাকতক নৌকো গেছে গঙ্গাসাগরের মেলায়, চড়া দরে কদিনের জন্য বিলাসী বাবুদের ভাড়া দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পয়সা গুনে নিয়ে যাত্রী পারাপার করানোর শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যবস্থার কথা তারা ভাবেনি কখনো। তিরিশখানা নৌকো যোগানোর দায়িত্ব সেই মাঝিই নিলে। মেলার দিনকতক আগে থাকতেই মাঝিসহ নৌকোগুলো সাগরে উপস্থিত থাকবে। এপারে থাকবে পনেরটা নৌকো, ওপারে পনেরটা। একদিকে থাকবেন মানিকরাম নিজে, অন্যদিকে মাঝি। নিয়মিত নৌকো পারাপার করবে। প্রতি পারের যাত্রী পিছু একটি করে মাত্র পয়সা নেওয়া হবে। বুড়ো মাঝির সঙ্গে লাভের বখরা আধাআধি।

ব্যবস্থা পাকা করে মানিকরাম কলকাতায় ফিরলেন আবার। মূলধনে টান পড়েনি। আরো একটা সঙ্কল্প মাথায় এসেছে তাই। ভাগ্য এবারেও প্রসন্ন। সবসুদ্ধ একশ টাকা জমা রেখে অল্প দামের চটি চটি কয়েক হাজার ধর্মগ্রন্থ বিক্রি করার দায়িত্ব নিলেন তিনি। বাংলা ভাষায় যত রকমের সস্তার অলৌকিক ধর্মগ্রন্থ আছে সব তাঁর হেপাজতে চলে এলো। মেলার আগে একখানা নৌকো বোঝাই করে সেই বই আর বাঁশী আর চাঁদকে নিয়ে উপস্থিত হলেন তিনি। ছাপরা বেঁধে দোকান

ঘর করা হল, বই সাজিয়ে সেখানে চাঁদকে বসিয়ে দিলেন তিনি। চাঁদের ওপর প্রগাঢ় আস্থা তাঁর।

মেলা বসেছিল। সেই মেলার কাল অবসানও হয়েছিল একদিন। মানিকরামের নিজস্ব সঞ্চয়ের থলেতে যে টাকা এসেছিল, সেই অঙ্ক তিনি নিজেও কল্পনা করতে পারেন না। সেই বুড়ো মাঝি দেবতার কৃপা ভেবেছিল। আর চাঁদ শেষ বইখানা বিক্রি করার পর সখেদে বলেছিল, আরো যদি দুই-এক নৌকো বই আনা যেত কর্তা···

কমলা প্রসন্ন সেই দিন থেকে। মেলার ভিড়ের সময় মন্দিরের কাছে আসারও ফুরসত মেলেনি মানিকরামের। ইচ্ছেও হয়নি। কিন্তু ফেরার আগে হঠাৎ মনে হয়েছিল। ভাঙা হাটের চিহ্ন শুধু পড়ে আছে। লক্ষ লক্ষ জনতা কি পেতে এসেছিল আর কি পেয়ে চলে গেল তিনি জানেন না। তিনি যা চেয়েছিলেন, পেয়েছেন।···কিন্তু তিনি তো দেবতার কাছে চাননি কিছু।

পায়ে পায়ে মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। বিগ্রহ দেখলেন। নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন। সকালের সূর্য মাথার ওপরে উঠল। হুঁশ নেই। কি দেখছেন তিনি জানেন না, কি ভাবছেন জানেন না। অস্ফুটস্বরে বিড়-বিড় করে বললেন একসময়, আমার কিছু না, সব তোমারই থাকল।

কিন্তু মেলার কালে আর এক সমস্যায় জড়িয়ে পড়েছিলেন তিনি।

ন বছর বাদে আজ এই রাতে সে সমস্যার পরিণতি দেখে দুই চক্ষু বিস্ফারিত তাঁর।

মেলায় যত মানুষ আসে, তাদের সকলেই যে প্রাণ নিয়ে ফেরে তা নয়। প্রাণ রেখেও যায় কেউ কেউ।···অসুখে মরে, অঘটনে মরে। মরে যখন অতি সহজে মরে। আর, লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর মধ্যে সেদিকে ফিরে তাকানোর লোকও কদাচিৎ মেলে।

সুভদ্রার মা-ও তেমনি অনাড়ম্বরে মরেছিল। বিধবা, বুকের ব্যামো নিয়ে মেয়েকে সঙ্গে করে এসেছিল পুণ্য করতে। সঙ্গে দেশের লোক ছিল। গঙ্গাসাগরে পা দিয়ে বিধবা-বোঝা অচল হয়ে পড়তে সে ইচ্ছে করেই সরে গেছে কিনা কে জানে। মরার আগে বলতে গেলে মাথার ওপর একটা ছাউনিও জোটেনি পুণ্যার্থিনীর। যাদের চোখ পড়েছে তারা দুই একবার আ-হা আ-হা করে পাশ কাটিয়েছে। মানিকরাম ঘাটে বসতেন, যাত্রীর কাছ থেকে পয়সা গুনে নিয়ে তাদের নৌকোয় তুলতেন। ফাঁক পেলে উঠে এসে দেখে যেতেন চাঁদ কি-রকম দোকান চালাচ্ছে। তখনই চোখে পড়েছিল ব্যাপারটা। ব্যস্ততা আর বিশৃঙ্খলার

মধ্যেই যেটুকু সম্ভব খোঁজখবর নিতে চেষ্টা করেছেন। বিধবা চোখ বুজতে দাহকর্মে সহায়তাও করতে চেষ্টা করেছিলেন একটু। তারপর ওদিকে মাথা ঘামানোর ফুরসত আর মেলেনি।

রাতের দুই-এক ঘণ্টা নৌকোতেই ঘুমিয়ে নিতেন মানিকরাম। বিধবাটি মারা যাবার দু'দিন বাদে হঠাৎ তের বছরের মেয়েটার দিকে চোখ পড়েছিল তাঁর। সামান্য ফুরসত পেয়ে ঘাটের একধারে বসেই খেয়ে নিচ্ছিলেন। দেখলেন মেয়েটা অদূরে বসে আছে, তাঁর দিকেই চেয়ে আছে। সেই অসহায় বুভুক্ষু চাউনি মানিক-রাম ভুলবেন না বোধ হয়। তাকে দেখামাত্র বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠেছিল কেমন। মনে হয়েছে, গত দু'দিনও মেয়েটা যেন দূরে দূরে দাঁড়িয়ে তাঁকেই দেখেছে —কিন্তু মানিকরাম তখন কোন্ দিকে তাকাবেন ?

খাওয়া থামিয়ে মানিকরাম ইশারায় ডাকলেন তাকে। কঙ্কালসার শরীরটাকে টেনে টেনে কাছে নিয়ে এলো মেয়েটা। মুখের দিকে তাকিয়ে মানিকরাম প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন—খাওয়া হয়েছে কিনা। জবাব পেলেন না, কিন্তু বুঝলেন। তাঁর খাবারটা দেখতে বলে তাড়াতাড়ি ওর জন্যে খাবার কিনতে গেলেন তিনি।

ফিরে এসে হতভম্ব। গো-গ্রাসে তাঁর উচ্ছিষ্ট খাবারই খাচ্ছে মেয়েটা। খাওয়ার এমন মর্মান্তিক দৃশ্য আর বুঝি দেখেন নি। তিনি ফিরতে মেয়েটা ভয়ে কাঠ।

মানিকরাম বসলেন। তাকে বসিয়ে খাওয়ালেন আস্তে আস্তে। বারকয়েক জিজ্ঞাসা করে বুঝলেন মা মরার পর এই প্রথম আহার জুটল তার। মাথা নেড়ে জবাব দিতে পারলে মুখ ফোটে না—বোবাই মনে হয় মেয়েটাকে।

মানিকরাম ভাবনায় পড়ে গেলেন। আপাতত নৌকোতেই আশ্রয় দিলেন তাকে। নিজে বাইরের পাটাতনে শুয়ে-বসে রাত কাটাতে লাগলেন। ঘুম না এলে বাঁশী বাজান। নিষুতি রাতে সেই বাঁশী এক-একদিন মুখর হয়ে ওঠে।... কিন্তু এ-রকম একটা অসহায় মেয়েকে নিয়ে কি করবেন তিনি ? ভেবে বিরক্তও হন এক-একসময়। কিন্তু মেয়েটার মুখের দিকে তাকালে আর রাগ করতে পারেন না।

অকূলে কূল পেলেন একদিন। মেয়েটার বাহু ধরে একজন মাঝবয়সী রমণী তাঁর কাছে এসে হাজির। সুশ্রী, হাসি-হাসি মুখ। নিজেই নিজের পরিচয় দিল, নাম বলল মতিঠাকরোন। মেয়েটার মতিপিসি। নিজের পিসি না হলেও আপনার ভাইয়ের থেকেও নাকি বেশি ভালবাসত তার বাপকে। অনেক কালের চেনা-জানা। মেলায় এসে মেয়েটার শেষ সম্বল ওই মা-ও গেল বলে চোখের জল ছেড়ে দিল। চোখের জল মুছে তারপর বিভুঁইয়ে অসহায় মেয়েটাকে আশ্রয় দেওয়ার

দরুন মানিকরামের উদ্দেশে আশীর্বাদ বর্ষণ করল। এবারে তার দায় শেষ, মতি-পিসিই ওর ভার নিল।

মানিকরাম হাঁপ ফেলে বাঁচলেন। কিন্তু মেয়েটা তেমনি বোবা আর বিবর্ণ। আপনজনের আশ্রয় পেল এই বোধও আছে কিনা সন্দেহ।

মতিপিসিকে যথাসাধ্য আপ্যায়ন করলেন মানিকরাম। যাবার আগে চুপি-চুপি কিছু টাকাও গুঁজে দিলেন মেয়েটার হাতে। তারপর নিশ্চিন্ত।

নৌকোর ভিতরে জায়গা ছিল সেদিন, কিন্তু ঠাণ্ডার রাতেও বাইরে শুয়েই খোলা আকাশের দিকে চেয়ে বাঁশী বাজাচ্ছিলেন মানিকরাম। ঠাণ্ডা গরম দুইয়েতেই অভ্যস্ত তিনি।

হঠাৎ নৌকোটা যেন দুলে উঠল একটু। মানিকরামের বাঁশী থেমে গেল। উঠে বসলেন। প্রেতের মত কে যেন নৌকোয় উঠেছে। পরক্ষণে চিনলেন। সুভদ্রা। মানিকরাম অবাক।

সুভদ্রা দু হাতে তাঁর পা দুটো জড়িয়ে ধরল, পায়ে মাথা রাখল।

মানিকরামের তখনো মনে হল বিদায়ের আগে শেষ কৃতজ্ঞতা জানাতে এই রাতেও না এসে পারেনি বুঝি। কিন্তু পা থেকে মেয়েটা মাথা তোলে না আর। হঠাৎ সচকিত তিনি, চোখের জলে দু পা ভিজে যাচ্ছে। পা ছাড়াতে গিয়েও পারলেন না, দু পা আঁকড়ে ধরে আছে।

কি হল! ওঠো—কান্না কিসের!

জবাবে ফুলে ফুলে কান্না, পায়ের ওপর মাথা নেড়ে কি যেন বোঝাতে চাইছে।

পিসির সঙ্গে যেতে চাও না তুমি?

পা আরো জোরে আঁকড়ে ধরল, সবেগে মাথা নাড়ল।

মানিকরাম হতভম্ব!—কেন? আপনার জন তোমার, তুমি তো ভালো করে জান তাঁকে? জান তো?

এবারে আর মাথা নাড়ল না। জানে যে সেটা অস্বীকার করতে পারল না। কি যে করবেন মানিকরাম ভেবে পেলেন না। হয়ত বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা করতেন। সে অবকাশ পেলেন না। দুই একটা লোকের সঙ্গে লণ্ঠন হাতে মতিপিসি হাজির। জোরেই ডাকাডাকি করল প্রথম, তারপর মানিকরামের সাড়া পেয়ে নৌকোয় উঠে এলো। আবছা আলোয় ভালো মুখ দেখা গেল না, কিন্তু গলা শুনেই বোঝা গেল তার মেজাজ অপ্রসন্ন। দৃশ্যটা দেখে নিয়ে বলে উঠল, এই রাতে এখানে পড়ে আছিস তুই? ছি ছি ছি—আমি ত্রাসে খুঁজে মরছি! বলতে বলতে আরো উগ্র হয়ে উঠল সে, ভালো সইবে কি করে তোর, বাপ-মায়ের যেমন চরিত্র—

থাক্ তাহলে এখানেই পড়ে, আমার পরাণ পোড়ে বলেই নিতে চেয়েছিলাম, নইলে—

মুহূর্তে কি যে হয়ে গেল মানিকরামের কে জানে। এক ঝটকায় পা ছাড়িয়ে নিলেন, তারপর কঠোর কণ্ঠে বলে উঠলেন, ওঠো! ওঠো—!

গর্জন শুনে ভয়ে কাঠ মেয়েটা। উঠে দাঁড়াল আস্তে আস্তে।

পিসির সঙ্গে যাও! যাও—নেমে যাও বলছি!

সেই হুঙ্কারে রাতের স্তব্ধতা কেঁপে উঠেছিল বুঝি। ভীত দিশেহারা কঙ্কালসার মেয়েটা একবার শুধু দু চোখ তুলে দেখল তাঁকে। তারপর আস্তে আস্তে নেমে চলে গেল।

মানিকরাম মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন, কিন্তু ভিতরটা ভারাক্রান্ত হয়ে ছিল সমস্ত রাত, মনে আছে।

দু দিন না যেতে অসহায় মেয়েটার অস্তিত্ব ও আর মনে ছিল না।

সেই সুভদ্রা এই শুভাবাঈ।

মানিকরামের সম্বিৎ ফিরল যেন। ইচ্ছে করেই শুভাবাঈ চুপ করে ছিল বোধ হয় কিছুক্ষণ। বিগত চিত্রটা স্মরণের অবকাশ দিয়েছে। মুখের ওপর তার চোখ দুটো শুধু হাসছে তেমনি।

অস্ফুটস্বরে মানিকরাম বললেন, তোমার এই পরিণতি কেন?

হাসি চাপতে গিয়ে শুভাবাঈ জোরেই হেসে উঠল। সর্বাঙ্গ দুলে উঠল, ফুলে উঠল। দাঁত দেখা গেল, হীরের গয়নায় ঝলক লাগল। শেষে হাসি থামিয়ে বলল, বড় কড়া মেয়েমানুষের হাতে দিয়েছিলে যে গো ঠাকুর, মতিপিসি কোথাও আর খুঁত রাখেনি। ছেলেবেলায় কানাঘুষা শুনতুম ওর জন্যেই অকালে আমার বাবা মরেছিল—কিন্তু তার যে এত গুণ তা কি জানতুম! দেখছ না আমাকে? আ-হা, গেল বছর বেচারী মারা গেল, আমি কেঁদে বাঁচি না।

নির্বাক বিস্ময়ে মানিকরাম দেখছেন শুধু।

হাসির ঝলক তুলে শুভাবাঈ আবার বলল, কি বোকাই না ছিলাম সেদিন, তোমার আশ্রয় গেলে আর বাঁচবই না মনে হয়েছিল। দু দিন উপোস করার পর তুমি আমাকে খেতে দিয়েছিলে—সেই খিদের স্বপ্ন দেখি এখনো আর গায়ে কাঁটা দেয়—উপোস কাকে বলে তা জীবনে ভুলব না! আর এক প্রস্থ হাসির দমকে রমণী-যৌবন কুটিপাটি খেয়ে উঠল। বলল, সেদিন প্রাণের দায়ে আমি তোমাকে ছাড়তে চাইনি, আর তুমি ভাবলে তের বছরের মেয়েটা বুঝি প্রেমেই পড়ে গেছে তোমার—তাড়িয়ে বাঁচলে। ছদ্মবিস্ময়ে দু চোখ বড় বড় করে মাথা নেড়ে টেনে

টেনে বলল, তুমি ঠিকই ভেবেছিলে গো! পরে দেখি, রাতের পর রাত একলা বিছানায় শুয়ে আমি কেবল তোমার বাঁশী শুনি! সেই বাঁশী ভুলতে গোপিনীরাও এত চেষ্টা করেছিল কিনা সন্দেহ! ভোলা হলই না, তারপর থেকে বছর বছর ধরে কেবল দিন গুনেছি আর ভেবেছি দেখা এক দিন হবে—হবেই দেখা। হল তো?

কি এক ঘোর থেকে মানিকরাম বার বার টেনে টেনে তুলছেন নিজেকে। আবারও তুললেন। শুভাবাঙ্গী হাসছে বটে, কিন্তু তাঁর মনে হল মিথ্যে বলে নি—প্রতীক্ষাই করছিল তাঁর জন্য। হিংস্র প্রতীক্ষা। ওই হাসি, ওই বাঁধ-ভাঙা অশান্ত হিংস্র যৌবন দিয়ে সে বুঝি নিঃশেষে তাঁকে গ্রাস করার জন্যেই বসে আছে। শুধু এই কারণেই গঙ্গার বুকে পাগলের মত দেহলীলা বিকশিত করেছিল, শুধু এই কারণেই ডেকে পাঠিয়েছে।

ধীর শান্ত কণ্ঠে বললেন, তোমার জন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু এবারও তোমার একটু ভুল হয়েছে···তুমি পুরুষ দেখনি।

উঠে দাঁড়ালেন আস্তে আস্তে।

সে কি গো! উচ্ছল হাসি মাঝখানেই থেমে গেল। ভ্রূভঙ্গি করে থমকালো একটু।—ও কি, উঠলে? হাসতে গেলে কথা বলা হয় না বলেই যেন হাসি সামলালো কোনরকমে। বলল, আচ্ছা এসো। কিন্তু মতিপিসি আমাকে যে পুরুষ চিনতেই শিখিয়েছে গো ঠাকুর! গঙ্গায় আমাকে দেখে তোমার জপ ভুল হয়ে গেছে, চিরকুট পেয়ে ছুটে এসেছ, যে আসনে পা রেখে দাঁড়িয়েছিলে সেই আসনে বসতে পেয়ে বেঁচেছ—আমি যে পষ্ট দেখতে পাচ্ছি মহাপুরুষ আবার এলো বলে! এসো, এসো, ইচ্ছে হলেই চলে এসো—তোমার দয়া কি ভুলতে পারি? আমার সব দরজা তোমার জন্য খোলা রাখব।

রমণীর চোখে-মুখে আবারও শুধু সেই হিংস্র আগুন দেখলেন মানিকরাম। নীরবে দেখলেন। তারপর দরজার দিকে ফিরলেন।

পিছনে ঘণ্টা নাড়ার শব্দ হল। দরজায় পরিচারিকা এসে দাঁড়াল। নীরব কৌতুকে পিছন থেকে শুভাবাঙ্গী তাঁকে বাইরে নিয়ে যেতে ইঙ্গিত করল হয়ত। কিন্তু মানিকরাম আর ফিরে তাকালেন না।··

একে একে তিন দিন কাটল। মানিকরাম গঙ্গাস্নান করেন, পুজো করেন, নিয়মিত কাজে মন দেন। কিন্তু সব কিছুর মধ্যে একটা দুর্বোধ্য ফাঁক শুধু তাঁরই চোখে পড়ে। সর্বক্ষণ মনে হয় কেউ বসে আছে তাঁর জন্য, তাঁর শেষ দেখার প্রতীক্ষায় আছে। অহর্নিশি এক দুর্বার আকর্ষণে টানছে তাঁকে।

নিজের ওপরে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন মানিকরাম। অসুস্থ শিশুর রোগশয্যার

পাশে দাঁড়াতে পারেন না, স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাতে পারেন না।

চার দিনের দিন হঠাৎ কলকাতা ছেড়ে চলে গেলেন তিনি। বাড়িতে বলে গেলেন ফিরতে দিনকতক দেরি হবে।

ফিরলেন চৌদ্দ-পনের দিন বাদে। রুক্ষ, উস্‌কো-খুস্‌কো মূর্তি।

সন্ধ্যায় বাড়িতে পা দিয়েই কেমন মনে হল, বাড়ির হাওয়া বদলেছে। ফেরামাত্র সকলে সচকিত, অথচ বিষণ্ণ গম্ভীর। জ্ঞাতিরা কেমন দূর থেকে লক্ষ্য করছে তাঁকে, চাঁদও ভয়ে ভয়ে দেখছে তাঁকে। রুগ্ন ছেলের সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ভগবতী যেন চমকে উঠলেন। তাঁর চোখে-মুখে আতঙ্কের ছাপ।

ছেলে শয্যায় মিশে গেছে আরো। তার জীবনের শিখা আর বেশিদিন জ্বলবে মনে হয় না। একটা নিঃশ্বাস চেপে মানিকরাম পাশের ঘরে চলে এলেন।

ভগবতীও উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘরে এসে দাঁড়ালেন। থমথমে মুখ। অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি বর্ধমানে গেছলে?

মানিকরাম অবাক।—কেন?

হঠাৎ তাঁর দু পায়ের ওপরেই ভেঙে পড়লেন ভগবতী। চোখের জলে ভেসে বলে উঠলেন, ওগো বলো তুমি বর্ধমানে যাওনি, বলো কোনো মায়ের কোল তুমি খালি করে দাওনি, এ কাজ তুমি করোনি, বলো বলো—

মানিকরাম হতবাক খানিকক্ষণ।—বর্ধমানে যাব কেন? সেখানে কি হয়েছে?

কান্না-ভেজা চোখে ভগবতী অন্তস্তল পর্যন্ত দেখে নিলেন যেন। তারপর হঠাৎ অস্বস্তি বোধ করলেন কেমন। বললেন, চাঁদের কাছে কারা যে বলল তোমার নৌকো বর্ধমানের দিকে যেতে দেখেছে?

না। কিন্তু আমি কি করেছি বলে তোমাদের ভয়?

ত্রাসমুক্ত হয়ে ভগবতী প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেলেন। একটু বাদে বাড়ির জ্ঞাতিবর্গদের নিয়ে ফিরলেন। সকলেরই বিব্রত মুখ, একজনের হাতে কাগজ একখানা—সংবাদ প্রভাকর।

প্রভাকরের খবর, দিন দশেক আগে বর্ধমানের রঙ্কিনী দেবীর থানে আবার একটি বালক বলি হয়ে গেল। গত কয়েক বছরের মধ্যে এই নিয়ে পাঁচ দফা নরবলি হল সেখানে। গুজব, প্রতিবারেই কোনো-না-কোনো ধনী সন্তানের দুরারোগ্য ব্যাধি-মুক্তির কামনায় এই নৃশংস বলি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এবারে মাতৃক্রোড়চ্যুত হয়েছে এক গরীব বিধবার একমাত্র বালক-সন্তান। শোকে বিধবাটি উন্মাদপ্রায়। শাসকদের প্রতি প্রভাকরের তীব্র অনুযোগ, এইসব তমসাচ্ছন্ন অকরুণ দুষ্কৃতিকারীদের খুঁজে বার করা যাচ্ছে না কেন?

মানিকরামের সর্বশরীর থর থর করে কেঁপে উঠল একবার। তারপর স্তব্ধ পাষাণ তিনি। তাঁর অনুপস্থিতির দরুন ভীতত্রস্ত আলোচনায় বাড়িতে কোন্ আশঙ্কা বিশ্বাসে পুষ্ট হয়েছিল সেটা আর একটুও দুর্বোধ্য নয়। ঘরে যারা এসেছিল এই মুখের দিকে চেয়ে একে একে প্রস্থান করল। এমন কি ভগবতীও ঘর থেকে সরে গেলেন।

মানিকরাম দাঁড়িয়েই আছেন। ধমনীর প্রতিটি রক্তকণায় আগুন লেগেছে। যত জ্বলছে তত স্থির তিনি।

পায়ে পায়ে রুগ্ন ছেলের ঘরে এসে দাঁড়ালেন। ছেলে ঘুমুচ্ছে। শিয়রে স্ত্রী বসে। তীব্র তীক্ষ্ণ চোখে মানিকরাম মৃতপায় ছেলেকেই দেখলেন খানিকক্ষণ। তারপর স্ত্রীর দিকে ফিরলেন।—আমি ও-কাজ করিনি তুমি বিশ্বাস করেছ?

ভগবতী তৎক্ষণাৎ মাথা নাড়লেন। করেছেন।

কোরো।...তোমার খোকা বাঁচবে। তাকে বাঁচতে হবে।...কিন্তু না যদি বাঁচে তাহলে কিছু বলি দেব।

ভগবতী শিউরে উঠলেন। ধীর পদক্ষেপে মানিকরাম ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সোজা এসে পুজোর ঘরে ঢুকলেন তিনি।

চারটে দিন কাটল একে একে।

চার দিনের মধ্যে চার ঘণ্টার জন্যেও ওই পুজোর ঘর থেকে বার হননি মানিকরাম। পাঁচ দিনের দিন সন্ধ্যায় বেরুলেন।

কান্নার রোল শুনে বেরুলেন।

দেড় বছরের শিশু চিরনিদ্রায় শয়ান। মানিকরাম দেখছেন। ডাক ছেড়ে কাঁদছিলেন ভগবতী। তাঁকে দেখে হঠাৎ গলার আওয়াজ থেমে গেল। নিজেকে সংযত করার চেষ্টায় ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলেন তিনি। মানিকরাম তাও দেখলেন।

আরো পাঁচ দিন কেটে গেল। এই পাঁচ দিনের প্রতিটি মুহূর্ত বুঝি অনুভব করল সকলে। কি এক অজ্ঞাত ত্রাসে ভগবতী ছেলের শোকও বুকে চেপে আছেন। এমন কি স্বামীর পিঠে হাত বুলোতে চেষ্টা করে এই দিন সকালেই তিনি বলেছেন, ও থাকবে না বলেই হয়ত ঠাকুর আর একজনকে দিচ্ছেন...হয়ত ও-ই আবার ফিরে আসছে।

মানিকরাম নির্বাক। এ কদিন তিনি গঙ্গাস্নানেও যাননি, পুজোর ঘরেও ঢোকেননি।

এর দু ঘণ্টা বাদেই সভয়ে ছুটে এলেন ভগবতী। দিশেহারা মুখ।—চাঁদকে তুমি বলেছ ঠাকুরঘরের বিগ্রহ-টিগ্রহ সব বার করে দেবার ব্যবস্থা করতে?

হ্যাঁ। তোমাকে তো বলেছিলাম, খোকা না বাঁচলে আমারও কিছু বলি দেওয়ার আছে।

দু হাতে নিজের কান চাপা দিতে চাইলেন ভগবতী।—না না না! আমার ঠাকুর, আমি পুজো করব। তুমি পাগল হয়ে গেলে?

না। খুব ধীর খুব স্পষ্ট করে বললেন মানিকরাম, শুধু ঠাকুর নয়, আমি ধর্মও ছাড়তে চলেছি।···প্রভুজী আমাকে ছেড়েছেন, খোকাও গেছে—তুমি কি করবে?

আর্ত ত্রাসে সবেগে একবার মাথা নাড়লেন ভগবতী, তারপর ছুটে পালালেন ঘর থেকে।

সন্ধ্যা সবে গত হয়েছে। শুভাবাঈয়ের বাড়ির ফটকের সামনে জুড়ি গাড়ি দাঁড়াল। মানিকরাম আজ আর বাইরে এক মুহূর্তও অপেক্ষা করলেন না। সোজা ভিতরে চলে এলেন।

শুভাবাঈ সেই ঘরে সেই গদিতেই বসে। কিন্তু মানিকরামকে দেখে আজ সে উচ্ছল হয়ে উঠল না একটুও। উল্টে বিষম অবাক হয়েছে যেন, আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়েছে।

মানিকরাম দূর থেকে দেখলেন। তারপর কাছে এলেন। খুব কাছে, গদির ওপরে। মানিকরাম নির্নিমেষে দেখলেন আবার, হাতের নাগালের মধ্যে একখানা যৌবনের উৎস···কামনার শিখা জ্বেলে জ্বেলে খুঁটিয়ে দেখছেন তিনি। কতটুকু শক্তি তার, তাই পরখ করছেন।

তোমার ধারণা মিথ্যে হয়নি, আমি এসেছি।

কিন্তু শুভাবাঈ হকচকিয়ে গেছে কেমন। অস্ফুটস্বরে বলল, এই শোকের সময় বউকে ফেলে এলে?

মানিকরাম সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।—শোকের সময় তোমাকে কে বললে?

শুভাবাঈ নিরুত্তর। একটা অজ্ঞাত অস্বস্তি বোধ করছে সে।

থাবার মত দুটো হাতা উঠে এলো তার দুই কাঁধে।—কে বলেছে তোমাকে?

চাঁদ এসেছিল।···আমি তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম।

পুরুষের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তার মুখের ওপর আটকে রইল কয়েক নিমেষ।—যেতে দাও। সামনের দিকে ঝুঁকলেন তিনি। কিন্তু তোমার কি হল? তোমার হাসি গেল কোথায়? কত কি দেখিয়েছিলে সেদিন, সেসব গেল কোথায়? আমি যে দেখতে এলাম তুমি কতটা পারো—

দাউ দাউ আগুন জ্বলছে মাথায়। ওই অবাধ্য দুরন্ত যৌবনের উৎসে নিঃশেষে

ডুব্‌তে না পারা পর্যন্ত এই আগুন নিববে না।

নিঃশ্বাস রুদ্ধ হবার উপক্রম শুভাবাঈয়ের। উদ্‌ভ্রান্ত নিষ্পেষণে বাহুর আর বুকের হাড়-পাঁজর সুদ্ধু গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। হিংস্র নিপীড়নে দুই অধর ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে বুঝি। দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না, শুভাবাঈ গদির ওপর দেহ ছেড়ে দিল।

তার বুকের ওপর ঝুঁকে মানিকরাম নির্নিমেষে দেখলেন আবার। বিড়বিড় করে বললেন, পুরুষ অনেক দেখেছ বলেছিলে···আমার মত পুরুষ দেখেছ ?··· কতটা পারো তুমি ? আমার মত পুরুষকে একটা গোটা জীবন ভোলাতে পারো ? বরাবরকার মত তোমাদের অন্ধকারের মধ্যে টেনে নিয়ে যেতে পারো ?

শুভাবাঈয়ের দুই চক্ষু বিস্ফারিত। পুরুষ দেখেছে বলেছিল, কিন্তু এ-রকম পুরুষের আত্মাহুতি দেখেনি যে, সেটা সমস্ত অন্তরাত্মা দিয়ে অনুভব করছে সে। বাধা দেবার ক্ষমতা নেই। দুই হাতের থাবায় তার তনুবদ্ধ সমস্ত যৌবনসম্ভার যেন ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেখে নিতে চাইছে কেউ—ভোলাতে পারে কিনা, অন্ধকারে ডুবিয়ে দিতে পারে কিনা। দেখার তাড়নায় অধর, কাঁধ, গলা, বুক, জানুদেশ—সব পৃথক হয়ে গেল বুঝি।

কিন্তু দেহের যাতনায় নয়, এই পুরুষের দিকে চেয়ে এক অজ্ঞাত ভয়ে শুভা-বাঈয়ের বুকের তলায় থর থর কেঁপে উঠল কে।

মানিকরাম বড় নিঃশ্বাস নিলেন একটা। দৃষ্টিটাও যেন বিঁধে দিতে চান মুখের ওপর।—কতটা পারো তুমি ? আমি ধর্ম ছাড়তে যাচ্ছি, সকলে ছেড়েছে আমাকে—স্ত্রীও ছাড়বে। সব যাক। কিন্তু তুমি চুপ করে আছ কেন ? তুমি না বড় আশায় অপেক্ষা করছিলে ?

অস্ফুটস্বরে শুভাবাঈ জবাব দিল, আজ আমার শরীর ভালো না···

অসহিষ্ণু মানিকরাম আবার একটা ঝাঁকুনি দিলেন তাকে ধরে।—আমি আজকের কথা বলছি না—তুমি পারো তোমার মধ্যে আমার এই জীবনটা ডুবিয়ে দিতে ? পারো ভুলিয়ে দিতে ? পারো ? পারো পারো পারো ?

পারি। দ্রুত ভেবে নিচ্ছে শুভাবাঈ, কাল এসো।

একটু একটু করে আত্মস্থ হলেন যেন মানিকরাম। নারীদেহ ছেড়ে দিলেন। উঠে দাঁড়ালেন। যৌবনের উৎস থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেবার আগে আর একবার দেখে নিলেন। বললেন, আসব। কাল আসব, পরশু আসব, রোজ আসব। এখান থেকে নাও যেতে পারি। আর যাদের ওপর তোমার নির্ভর, তাদের তুমি বাতিল করে দিতে পার। তোমার অভাব থাকবে না।

চলে গেলেন।

পরের সন্ধ্যায় পরিচিত এক ধর্মসভায় উপস্থিত তিনি। উদ্দেশ্য আগেই জানিয়ে রেখেছিলেন। ধর্ম-বদলের হাওয়া এসেছে। ধর্ম যারা ত্যাগ করে তাদের থেকেও সমর্থকদের উৎসাহ এবং আগ্রহ বেশি। জায়গায় জায়গায় তখন ধর্মসভা হয়, সংস্কার বর্জনের নানা মহড়া চলে। মানিকরাম কৃতী পুরুষ, তাঁকে সাদর আপ্যায়ন জানালে সকলে।

স্থির হল আগামী সন্ধ্যায় আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্মান্তরিত হবেন মানিকরাম।

উঠলেন সেখান থেকে। যেখানে যাবেন বলে সমস্ত সত্তা উন্মুখ, সেখানেই চললেন।

বাইরে থেকে শুভাবাঈয়ের বাড়িটা আজ আরও একটু বেশি অন্ধকার মনে হল। ভিতরে গিয়ে দরজা ঠেলতে গিয়ে স্তব্ধ হঠাৎ। বাইরে তালা ঝুলছে। একটা নয়, সব কটা দরজায়।

আঙিনার ওধারে একটা খুপরি-ঘরে আলো জ্বলছে। মানিকরাম এগোলেন সেদিকে। একটা হিন্দুস্থানী লোক রুটি পাকাচ্ছে। বাড়ির পাহারাদার হবে। সে জানাল, বাঈজী চলে গেছে, একদিনের মধ্যে বাড়ি ছেড়েই চলে গেছে।

মানিকরাম গাড়িতে উঠে বসলেন। ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাস। তীক্ষ্ণ অকরুণ শাণিত হাসি। বাঈজীর অভাব কলকাতায় হবে না।···তবে শুভাবাঈকেই দরকার ছিল তাঁর।

বাড়ি।

ছোট্ট একটা শব্দ হলেও এ স্তব্ধতায় দ্বিগুণ হয়ে ওঠে সেটা। কদিন ধরে এ বাড়িতে যেন নিঃসীম নীরবতার সাধনা চলেছে।

মানিকরাম ঘরে এসে দাঁড়ালেন। ভগবতী শুয়েছিলেন, উঠে বসলেন। বড় ছেলে ঘরে ছিল, বাবাকে দেখে চলে গেল। মানিকরাম বললেন, কাল রাত্রি থেকে আমি আর এ বাড়িতে থাকছি না। টাকা সময়মতই তোমার হাতে আসবে, তুমি নিশ্চিন্ত থেকো।

বিবর্ণ মুখে ভগবতী চেয়ে আছেন। ঠোঁট দুটো নড়ল।—থাকছ না কেন?

কাল সন্ধ্যার পর থেকে তোমার ধর্ম আর আমার ধর্মের তফাত হয়ে যাবে। এক বাড়িতে থাকা তাই সম্ভব হবে না।

ঘর ছেড়ে চলে এলেন তিনি। ভগবতী স্থাণুর মত বসে।

পরদিন সকাল থেকে ভগবতী নিঃশব্দে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে চলেছেন পাশের ঘরের

দিকে। বাইরে থেকে দেখে যাচ্ছেন মাঝে মাঝে।…একভাবে বসে আছেন মানুষটা, বসেই আছেন।

ভগবতীর এমন স্তব্ধ-পাষাণ গাম্ভীর্যও আর বুঝি কেউ দেখেনি। দুপুরের দিকে হঠাৎ চাঁদকে নিজের ঘরে ডাকলেন তিনি। অজানা আশঙ্কায় চাঁদের কাঁদ-কাঁদ মুখ।

প্রভুজীকে তুমি দেখেছ কখনও?

প্রশ্ন শুনে চাঁদ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল খানিক। তারপর মাথা নাড়ল। দেখেনি!

ভগবতীর মুখের একটা রেখাও অস্থির নয়। আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার বাবুর ব্যবসায়ের লোকেরা কেউ দেখেছে?

চাঁদ মাথা নাড়ল।—নাম সকলেই শুনেছে, কেউ দেখেনি বোধ হয়।…

আচ্ছা যাও।

মুহূর্ত কাটছে। দুপুর গিয়ে বিকেল গড়াল। সন্ধ্যার ছায়া গাঢ় হতে থাকল। ভগবতী উঠে পাশের ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না, ঘরের মানুষ বার হবার জন্যে প্রস্তুত।

ভগবতী ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন।—কোথায় যাচ্ছ?

মানিকরাম গম্ভীর, বিরক্তও একটু।—কাল শোনোনি?

শুনেছি। ধর্ম কি এত ঠুনকো জিনিস যে তুমি বললেই তোমার ধর্ম আর আমার ধর্ম আলাদা হয়ে যাবে?

এসব কথা থাক এখন।

থাক, দরকারও নেই। তুমি যাচ্ছ না।…নিষেধ আছে।

পা বাড়িয়েও ঘুরে দাঁড়ালেন মানিকরাম। বিস্মিত একটু।—কার নিষেধ আছে?

মুখের দিকে স্থির নিষ্পলক চেয়ে আছেন ভগবতী। মানিকরাম আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কার নিষেধ?

প্রভুজীর।

নিমেষে কি হল, কি যে হয়ে গেল, মানিকরাম জানেন না। পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ ছুটে গেল, নিস্পন্দ কয়েক মুহূর্ত। এক ঝটকায় ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। সামনে পড়ল চাঁদ। মানিকরাম থমকে দাঁড়ালেন। হাতের আচমকা এক চড়ে ঘুরে তিন হাত দূরে গিয়ে পড়ল সে।

টলতে টলতে মানিকরাম ঘরে এলেন আবার।

এরপর দিনকতক মাত্র সংসারে ছিলেন তিনি। সেই কটা দিন আর এক মূর্তি দেখেছে সকলে। সৌম্য, প্রশান্ত, ধ্যানস্থ। তারপর একদিন সকাল থেকে আর তাঁর দেখা মেলেনি। ছোট একটা চিঠি রেখে গেছেন। ভগবতীর উদ্দেশে লেখা।—প্রভুজী দয়া করেছেন—তুমি আমাকে রক্ষা করেছ। সাগরে তাঁকে পেয়েছিলাম, নগরে তাঁকে হারিয়েছি। আমি তাঁরই সন্ধানে যাচ্ছি। তুমি ভয় কোরো না, চিন্তা কোর না। আমি ফিরব একদিন। প্রভুজীকে নিয়েই ফিরব। নিশ্চিত ফিরব।

* * * *

'...আমি ফিরব একদিন। প্রভুজীকে নিয়েই ফিরব। নিশ্চিত ফিরব।'

প্রতিশ্রুতিটুকু মন্ত্রের মতই সম্বল করেছিলেন ভগবতী। তাঁর কোনো সংশয় ছিল না, পরিতাপ ছিল না। অভ্যাসে মন্ত্র হৃদয়ে বসে। তেমনি করেই এ বিশ্বাস হৃদয় জুড়ে ছিল। শেষের দিনে শেষ নিঃশ্বাস ফেলার সময়ও এই বিশ্বাস নিয়েই চোখ বুজেছেন।

তুটি ছেলে আর তাঁদের ভরা সংসার রেখে গেছলেন তিনি। মায়ের পরে ছেলেরাও আশা করেছেন মানিকরাম ফিরবেন, প্রভুজী ফিরবেন। কালে সে আশা ভাগবত বিশ্বাসের রূপ নিয়েছে। বাস্তব বিশ্বাস নয়, অলৌকিক গোছের। বিপাকে পড়লে যে বিশ্বাস আশ্বাসের মত, মন তুর্বল হলে সান্ত্বনার মত, স্ফীত হলে গর্ব করার মত। তাঁরা অনাচার দম্ভ অপচয় পরিহার করে চলেননি। এই বিশ্বাস সেই সব ঘাটতি পূরণের মূলধন।

তিন পুরুষ পর্যন্ত অপচয়ের স্রোত উত্তরোত্তর বেড়েছে। বৈভব অভিশাপ বহন করেছে—আশীর্বাদও। অনেক অঘটন ঘটিয়েছে, অনেক উদারতার পথও বিস্তার করেছে। সেই সব তুর্বলতার ফাঁক দিয়ে মানিকরাম অবিস্মৃত থেকেছেন, আর সেই সব উদারতার পথে তিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন। পরবর্তীদের কল্পনায় মানিকরাম আর প্রভুজী এক হয়ে গেছেন। মানিকরাম প্রভুজী, প্রভুজী মানিকরাম। প্রতিশ্রুতিমত যদি কোনদিন মানিকরাম ফেরেন কারো ঘরে—প্রভুজীই ফিরবেন।

তৃতীয় পুরুষের প্রধান যিনি তাঁর তুরন্ত তুর্বার জীবনের পরিধি অতি পরিমিত। তিনি আদিত্যরাম। তাঁরই একমাত্র বংশধর সুরেশ্বর—শিবেশ্বরের বাবা, জ্যোতিরাণীর শ্বশুর। সুরেশ্বরের জন্ম আদিত্যরামের মৃত্যুর প্রায় পাঁচ মাস বাদে। বিষয়সম্পত্তির লোভে সুরেশ্বরের জন্মের ওপরেই কালি ছিটোতে চেষ্টা করেছিলেন আদিত্যরামের জ্ঞাতিবর্গ। আলোর স্পর্শে কাতর কীটের মতই সভয়ে তাঁরা সরে দাঁড়িয়েছিলেন যাঁর আপসশূন্য দাপটে, তিনি এক রমণী।

তিনি আদিত্যরামের স্ত্রী হৈমবতী—সুরেশ্বরের মা, কিরণশশীর শাশুড়ী। বংশের ধারা বদলে দিয়েছিলেন হৈমবতী। তিন পুরুষের ভাগাভাগির ফলে প্রাচুর্যে টান ধরেছিল। কিন্তু যাও ছিল, বিধবার একমাত্র ছেলেকে রসাতলে পাঠাবার পক্ষে যথেষ্ট। যে হাতে ছেলের জীবনের হাল ধরেছিলেন হৈমবতী, চোখ বোজার আগে সেই হাতের মুঠো ঢিলে হয়নি। সম্ভবত পরেও না। কারণ, নিজের সংসারে সুরেশ্বর মায়ের প্রভাবটুকুই আঁকড়ে ধরে থাকতে চেয়েছেন।

এ পরের কথা। বয়েসকালেও মায়ের অনেক খেয়ালী আচরণ নিষ্ঠুরই মনে হত। আর কিরণশশীর তো কথাই নেই। এখনো যদি কানের কাছে কেউ তার শাশুড়ীর কথা তোলে তো আফিমের মৌজ ছুটে যাবে। তাঁকে তিনি শ্রদ্ধা বেশি করতেন কি ভয়, আজও সঠিক জানেন না। গোড়ায় গোড়ায় তিনি জ্যোতিরাণীর কাছে নিজের শাশুড়ীর গুণ-কীর্তনও কত করেছেন ঠিক নেই। বলতে গিয়ে কত সময়ে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে। কিন্তু অভিমান হলে কথা শোনাতেও ছাড়েননি জ্যোতিরাণীকে। বলেছেন, তোমরা আর শাশুড়ী কি দেখলে? সে-রকম হলে আর রক্ষে ছিল না।...ঘুমের মধ্যেও বুকের কাছটা হিম হয়ে থাকত, বেঁচে থাকতে নাকের ওপর কখনো ঘোমটা তুলে চলাফেরা করিনি।

বংশের ধারা বদলাতে গিয়ে মূল শিকড় ধরে টান দিয়েছিলেন হৈমবতী। সকলে ধরে নিয়েছিল মানিকরামের ভাবের পালা ইনিই সাঙ্গ করে দিলেন বুঝি। আদিত্য-রামের পরে তাঁর ছেলের নাম থেকে 'রাম' ছেঁটে দেওয়াটাই জ্ঞাতিদের চোখে স্পর্ধার ব্যাপার।

কিন্তু মানিকরামের ওই ভাবের চিত্র কেউ যদি সম্পূর্ণ করে গিয়ে থাকেন, করেছেন হৈমবতী। মানিকরামকে তিনিই অখণ্ড পরমায়ু দিয়ে গেছেন।

এককালের সেই নীরব অধ্যায় শুধু বিচিত্র নয়, রোমহর্ষক।

নতুন বয়সের গোড়া থেকে হৈমবতীর সঙ্গে দুর্দম আদিত্যরামের যে বিরোধ পুষ্ট হতে দেখেছে সকলে, আসলে সেটা প্রবল ব্যক্তিত্বের সংঘাত।

বড়ঘরের মেয়ে। বাপের সব কটিই মেয়ে-সন্তান। আদরে বড় হয়েছেন। আদর পাবেন আশা নিয়েই স্বামীর ঘর করতে এসেছিলেন। কিন্তু বড়ঘরের স্বামীরা সেই দিনে ঘরের থেকে বাইরেটা বেশি চিনে অভ্যস্ত। আনন্দের রসদের খোঁজে তাঁরা অন্তঃপুরে আসতেন না। অন্দরের সঙ্গে তাঁদের যোগ আনুষ্ঠানিক।

হৈমবতী এই স্বাভাবিক রীতি বরদাস্ত করতে রাজি ছিলেন না। বাধা দিতেন। আদিত্যরামও বাধা পেতে ভালবাসতেন বোধ হয়। বাধা পেলে তাঁর রক্ত নেচে উঠত। নিজেকে পুরুষসিংহ ভাবতেন তিনি। পুরুষের মতই তাঁর হিংসা, ক্রোধ

—কখনো বা ক্ষমাও। কিন্তু তাঁর ক্ষমার মধ্যেও শুধু আত্মাভিমানই দেখতেন হৈমবতী।

স্ত্রীর সত্তার দিকটা খুব বিলম্বিত লয়ে বুঝতে শুরু করেছিলেন আদিত্যরাম। বুঝে কখনো রাগে সাদা হতেন, কখনো বা কৌতুক বোধ করতেন। রাগ হলে চরম ফয়সালাই করে ফেলতে চেয়েছেন—যে ফয়সালা তাঁদের জানা আছে। দুই-একজন জ্ঞাতির তরতাজা বউ রাত পোহাবার আগে কোথায় যে চিরকালের মত হারিয়ে গেছে সেটা সত্যিই কাকপক্ষীর অগোচর নয়। আর, রাগের বদলে কৌতুক বোধ করলে আদিত্যরাম আরও কয়েক ধাপ নীচে নেমে দেখতেন কতদূর গড়ায়।

অনেকদূর পর্যন্ত গড়াত।

কি এক ব্যাপারে হৈমবতী বিষ খেয়ে জ্বালা জুড়োবার অভিলাষ ব্যক্ত করেছিলেন। সন্ধ্যায় সেদিন তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরেছিলেন আদিত্যরাম। একটা কৌটো স্ত্রীর দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।—ধরো।

কি এতে?

বিষ। সকালে চেয়েছিলে যে। ভালো জিনিস, বেশি কষ্ট পাবে না—অনেক পয়সা খরচা করে যোগাড় করেছি।

কৌটো হাতে অনেকক্ষণ তাঁর মুখখানা দেখেছিলেন হৈমবতী। কি দেখে-ছিলেন তিনিই জানেন। বলেছিলেন, দুজনে একসঙ্গে যেতে পারলে দুঃখ থাকত না, কিন্তু তোমার সে সাহস হতে আরো কয়েক জন্ম লাগবে। তারপর কৌটো খুলেছিলেন। বিষ মুখে পুরেছিলেন।

বিষ নয়। তিক্ত কিছু একটা বস্তু। হৈমবতীর ক্ষতি কিছু হয়নি। কিন্তু তাঁর ওই উক্তি আর ওই কাণ্ডর পর সত্যিকারের বিষ না আনার খেদ আদিত্য-রামের অনেকদিন পর্যন্ত ঘোচেনি। এই প্রসঙ্গ তুলে হৈমবতী কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়েছিলেন আর একদিন। মানিকরামের তিথি পালনের দিন সেটা। বছরের সেই দিনে আগে উৎসব হত, ঘটা হত। তখন সে আড়ম্বরে ভাঁটা পড়েছে। তবু অন্য সব দিন থেকে ওই দিনটাকে স্বতন্ত্র ভাবত সকলে।

আদিত্যরাম সেদিনও মদ খেয়েছিলেন। মদ বেশি খেলে ইদানীং তিনি ঝোঁকের মাথায় অন্দরমহলে হানা দিতেন। হৈমবতীকে জব্দ করার সেটা প্রকৃষ্ট উপায় ভাবতেন হয়ত। বুক ফুলিয়ে আদিত্যরাম স্ত্রীর সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। অর্থাৎ এই দিনে সকলে যা করে তিনি তার ব্যতিক্রম। হৈমবতী বলেননি কিছু, কিন্তু আদিত্যরামের নীরবতা বরদাস্ত করারও মেজাজ নয় তখন।

বুক ঠুকে ঘোষণা করেছেন, মানিকরামের বংশধর কোনো সম্বন্ধীর পরোয়া

করেন না, কেউ ওভাবে তাঁর দিকে ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে থাকলে তিনি তার দুই চক্ষু গেলে দেবেন।

হৈমবতী জবাব দিয়েছেন, কত বিরাট পুরুষ ছিলেন তিনি সেটা তোমাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

আদিত্যরামের নেশা সহজে হয় না, কিন্তু সহজে ছোটে। বড়সড় একটা ঝাঁকুনি খেয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। কাঁধের ওপর মাথা রেখে মানিকরাম সম্পর্কে এ-রকম শ্লেষ কেউ করতে পারে ধারণা ছিল না। ঠিক শুনেছেন কিনা সেই সংশয়। —কি বললে?

আরো স্পষ্ট পুনরুক্তি করেছেন হৈমবতী, কত বড় মহাপুরুষের বংশধর তুমি সেটা তোমাকে দেখে বোঝা যাচ্ছে।

আদিত্যরামের পানাসক্ত মুখের রেখাগুলো আস্তে আস্তে স্থির হয়েছে। একটা চোখ একটু ছোট করে স্ত্রীকে দেখেছেন তিনি। এটা তাঁর শিকারের দৃষ্টি। শিকারের লক্ষ্য স্থির করার সময় এই রকম করে দেখেন। বলেছেন, তোমার সময় ঘনিয়েছে।

হৈমবতী নির্লিপ্ত।—সত্যি বিষের কৌটো-টৌটো একটা পাও কিনা দেখো তাহলে।

আদিত্যরাম দেখেছেন আর অল্প অল্প মাথা নেড়েছেন।—তার দরকার হবে না। বাড়ির আনাচ-কানাচ খুঁড়লে দুই একটা কঙ্কাল তোমার চোখে পড়তে পারে।

দুই একটা কেন, কলকাতা খুঁড়লে অনেক বেশি চোখে পড়তে পারে। তোমার মত বংশধর তো ঘরে ঘরে আছে।

না। এর পরেও আদিত্যরাম চরম কিছু করে বসতেন না। কারণ তাঁর অবাকই লাগত। এই আত্মঘাতী দুঃসাহসের কূলকিনারা পেতেন না। তাঁর শিকারের হাত নিশপিশ করত। আবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হত বড় দুর্লভ শিকার। তাই মায়া হত। শিকারের অছিলায় তিনি খেলা করতেন অনেক সময়।

কিন্তু খেলার কাল দ্রুত শেষ হয়ে আসছিল। হিংসা যার বীজ, হিংসাই তার ফসল। বীজ নিয়ে খেলা সম্ভব, ফসল নিয়ে নয়।

সামান্য উপলক্ষ থেকে বড় সংঘাতের সূচনা দেখা গেল সেবারে। দর্পভরে শ্বশুরবাড়ির সামাজিক আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন আদিত্যরাম। বৃদ্ধ শ্বশুর আবার লোক পাঠালেন। বিশেষ অনুরোধ করে পত্র দিলেন। তাঁর ছেলে নেই, জামাইরাই ছেলে। শরীর সুস্থ থাকলে নিজেই এসে ছোট মেয়ে-জামাইকে নিয়ে

যেতেন। যে শুভানুষ্ঠান উপলক্ষে আমন্ত্রণ, পঞ্জিকা অনুসারে আগামী তিন দিনের যে-কোনদিন তা সম্পন্ন হতে পারে। অতএব নিজের সুবিধে বুঝে আদিত্যরামই যেন দিন স্থির করে দেন। শ্বশুর সেই মত ব্যবস্থা করবেন। অন্য জামাইরা আসছেন, ছোট জামাই না এলে তাঁর দুঃখের সীমা থাকবে না।

আদিত্যরাম জবাব পাঠালেন, তিন দিনই তিনি ব্যস্ত থাকবেন, ইচ্ছে করলে তিনি মেয়েকে নেবার ব্যবস্থা করতে পারেন। তবে ছোট মেয়েকে নেবার জন্য তিনি যেন অন্য জামাইদের কাউকে ধরে না পাঠান আবার, বিশ্বস্ত কাউকে পাঠালেই হবে। আর সে-রকম সুবিধে না থাকলে কাউকে পাঠাবার দরকার নেই, তাঁর মেয়ে বাড়ির গাড়িতেই বাপের বাড়ি যেতে পারবেন।

অন্য জামাইদের মত তিনি যে শ্বশুরের বিত্তের প্রত্যাশী নন সেটা ভালো করেই বুঝিয়ে দেওয়া গেল। এই প্রত্যাখ্যানে উপেক্ষা ছিল, অপমান ছিল। সেটা শ্বশুরকে কতখানি বিঁধেছে জানার উপায় নেই, মেয়েকে কতখানি বিঁধেছে স্বচক্ষে দেখা গেল।

হৈমবতী জিজ্ঞাসা করেছেন, তিন দিন কি কাজে এত ব্যস্ত থাকবে তুমি?

ওই মুখ দেখেই আদিত্যরাম পরিতুষ্ট, শ্বশুরের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান সার্থক। —কাজের কি অন্ত আছে, অনেক কাজ।

হৈমবতী আর কিছু জিজ্ঞাসা করেননি বা একটা অনুরোধও করেন নি।

শ্বশুরবাড়ির নেমন্তন্ন উপেক্ষা করে চুপচাপ ঘরে বসে কাটাবেন না আদিত্য-রাম। স্ত্রী যে বাপের বাড়ি যাবেন সেটা তিনি ধরেই নিয়েছিলেন। অতএব বাগানবাড়িতে এক চটকদার অনুষ্ঠানের আয়োজন তিনিও করলেন। তিন দিন ব্যস্ত থাকবেন বলেছেন, কথার খেলাপ করবেন না। বাগানবাড়ির প্রমোদ-ব্যবস্থাও তিন দিনের। শহরের সেরা বাঈজীর কাছে তিন দিনের নজরানা গেল। টাকা বহু খরচ হবে, আদিত্যরাম পরোয়া করেন না। এই বিলাসের মুক্ত-পথে তাঁর ভাগের জমিদারীর আয়তন ছোট হয়ে আসছে। না হয় আরো একটু ছোট হবে, আর একটা তালুক যাবে। তা বলে আনন্দের আয়োজনে কার্পণ্য করতে রাজি নন। তাঁর ইয়ার-বক্শীরা বাহবায় মাতোয়ারা। পুরুষসিংহ তারা একজনই দেখেছে।

বাগানবাড়ির উৎসবের খবর হৈমবতীর জানার কথা নয়, জানেনও না। কিন্তু নীরবে লক্ষ্য রাখছেন তিনি। কাজ বলতে জমিদারীর কাজ নয় সেটা তিনি খুব ভালো করে জানেন। টাকার প্রয়োজন ভিন্ন জমিদারী নিয়ে এ-মহলের মালিক মাথা ঘামান না কখনো। তাঁর মুখ্য ব্যস্ততা শিকার নিয়ে। ওটাই প্রধানতম

ব্যসন। শিকারের ঝোঁক চাপলে ইন্দ্রিয়ের অন্যান্য যাবতীয় প্রলোভন উপেক্ষা করতে পারেন। কিন্তু এবারে শিকারে যে বেরুচ্ছেন না তাও বোঝা গেল। কারণ, কদিন আগে থেকেই তার তোড়জোড় শুরু হয়, আয়োজন চলে।

দুপুরে বেরুবার মুখে পান চিবুতে চিবুতে আদিত্যরাম জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার বাপের বাড়ির উৎসব কবে ঠিক হল ?

হৈমবতী পাল্টা প্রশ্ন করলেন, তুমি ফিরছ কখন ?

আদিত্যরামের মেজাজ প্রসন্ন। তাঁর উৎসবের আয়োজন যোল কলায় পূর্ণ। গোলাপবাঈজীকে নিয়ে বাগানবাড়িতে পর পর তিন দিন খানাপিনা নাচগানের ঢালা স্ফূর্তি চলবে, শহরের শৌখিন রসিকবাবুদের কানে সে সুসমাচার পৌঁছে গেছে। অনেকেই আমন্ত্রণ প্রত্যাশা করেছে। অনেকে পেয়েছে, অনেকে হতাশ হয়েছে। মোট কথা আদিত্যরামের মর্যাদা বেড়ে গেছে। সেই তুষ্টিতে স্ত্রীর গম্ভীর মুখখানাও লোভনীয় লাগছে তাঁর।

বলেছি তো তিন দিন ব্যস্ত থাকব।

তিন দিন বাইরেই ব্যস্ত থাকবে···না ফিরবে ?

বলা যায় না, কাল একবার ঘুরে যেতেও পারি। কেন ?

এমনি।- এসো তাহলে।

ছড়ি ঘুরিয়ে আদিত্যরাম দরজা পর্যন্ত গিয়েও ফিরে দাঁড়ালেন আবার।—তুমি আজ বাপের বাড়ি যাচ্ছ তো ?

যেতে পারি।

কবে ফিরবে ?

বলা যায় না।

অন্য দিন হলে আদিত্যরাম এই জবাবেই উষ্ণ হতেন। কিন্তু আজ তাঁরই দিন। গরম হলে ঠকবেন। হৃষ্টকণ্ঠে বললেন, বিকেলের দিকে আমি গাড়িটা পাঠিয়ে দেব'খন, তোমার বাপের বাড়ির গাড়িতে গিয়ে কাজ নেই, যাও তো এই গাড়িতেই যেও। আর ফেরার আগে খবর পাঠিও, বাড়ির গাড়ি গিয়ে নিয়ে আসবে—এসময়ে বাজে গাড়ির ঝাঁকুনিতে ক্ষতি হতে পারে। বুঝলে ?

বুঝেছি। তোমার ভালো গাড়ি পাঠিয়ে দিও।

যাবার সময়ও মনের মত একটু খোঁচা দেওয়া গেল, অন্তরতুষ্টিতে ভরপুর আদিত্যরাম প্রস্থান করলেন।

···হৈমবতীর বাপের বাড়ির দু-ঘোড়ার পুরনো আমলের গাড়ি। আর জামাইয়ের তিন তাগড়াই ঘোড়ার হালের গাড়ি। তবু বাপের বাড়ির গাড়ির

ঝাঁকুনিতে ক্ষতি হওয়ার সময় এখনো আসেনি। জমাট-বাঁধা ক্ষোভের মুখেও হৈমবতী মনে মনে বিস্মিত একটু।···সন্তানসম্ভাবনার কথা নিজে তিনি মুখ ফুটে কখনো বলেননি। তবু জানে দেখা যাচ্ছে। চার সাড়ে চার মাস চলছে, স্বাভাবিক স্থলে টের না পাওয়ার কথা নয়। কিন্তু এটা তিনি স্বাভাবিক স্থল ভাবেন না।

মধ্যাহ্নে বাপের বাড়ির গাড়ি নিতে এলো তাঁকে।

হৈমবতী গাড়ি বিদায় করে দিলেন। জানালেন, শরীর ভালো নেই, যাওয়া সম্ভব হল না। কিন্তু ফটক পেরোবার আগেই একজন চাকর ছুটে গিয়ে থামালো গাড়িটাকে। নির্দেশ জানালো, মা অপেক্ষা করতে বলেছেন।

হৈমবতী সেই নির্দেশই দিয়েছেন বটে। চকিতে কিছু মনে পড়েছে তাঁর। মনের তলায় যে সঙ্কল্প বহুক্ষণ ধরে দানা বেঁধেছে তাতে কিছু ফাঁক ছিল। সেই ফাঁক ভরাট করার সুযোগ হারাচ্ছিলেন যেন। মনে হওয়া মাত্র বাপের বাড়ির লোককে অপেক্ষা করতে বলেছেন।

এবারে সহদেবকে ডেকে পাঠিয়ে নিজের ঘরে চলে এলেন হৈমবতী।

সহদেব বাড়ির চাকর ঠিক নয়, চাকরের থেকে তার মর্যাদা অনেক উঁচুতে। মালিকের যোগ্য অনুচর বলা যেতে পারে তাকে। মনিবের একান্ত বিশ্বাসী প্রিয়পাত্র। মাস গেলে মোটা মাইনে দেওয়া হয়। শিকারযাত্রার যাবতীয় দায়দায়িত্ব সহদেবের। শিকারে বেরুলে সহদেবের স্থান প্রভুর পাশে। বয়সে সে প্রভুর থেকে বছর দুই বড়, কিন্তু সেখান থেকে এতটুকু আদর পেলে আনন্দে গলে গিয়ে পা দুখানা চেটে দিতে পারে। আদিত্যরাম মাঝে মাঝে তার পিঠ চাপড়ে দেন, তারিফ করে বলেন, জাত শিকারীর চোখ কান নাক হয়ে উঠেছে সহদেবের।

শুধু শিকারের ব্যাপারে নয়, যে-কোনো কঠিন কাজ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে হলে আদিত্যরামের প্রধান নির্ভর সহদেব। প্রভুর হুকুম হলে সহদেব ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় বোঝে না। অথচ নিজে সে লোকটা ভালো। বিনয়ী, সদাচারী। হৈমবতীর সামনেও হাত জোড় করেই থাকে। কিন্তু প্রভুপত্নী যে তাকে খুব পছন্দ করেন না তাও সে খুব ভালই জানে। প্রভুর আস্থাভাজন বলেই তাঁর বিরাগভাজন সে।

তলব পেয়ে সহদেব দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। যুক্তহস্ত, অধোবদন।

হৈমবতী নিজেই বাবাকে চিঠি লিখে দিলেন একটা। শরীর ভালো নেই বলে যেতে পারলেন না, দুঃখ যেন না করেন। তারপর চিঠি ভাঁজ করে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন।—আমার বাবা গাড়ি পাঠিয়েছেন, তুমি ওই গাড়িতে চলে যাও। বাবার সঙ্গে দেখা করে চিঠি তাঁর হাতে দেবে। আমার শরীরটা ভালো নেই বোলো। দেরি কোরো না, যাবে আর আসবে।

হুকুম শিরোধার্য করে সহদেব চিঠি নিয়ে চলে গেল।

প্রভুপত্নীর অশ্রুজলে মুখখানা ভালো করে দেখতে পেলে সহদেবের মত সেয়ানা লোকও ঘাবড়াতো কিনা বলা যায় না।

চিঠি লিখতে লিখতেই সময়ের হিসেব সেরে নিয়েছিলেন হৈমবতী।...গাড়ি কম করে দেড় ঘণ্টা সময় নেবে বাপের বাড়ি ফিরে যেতে। যত তাড়াতাড়িই তিনি সহদেবকে আসতে বলে দিন না কেন, মেয়ের বাড়ির লোককে আদর-যত্ন না করে, না খাইয়ে বাবা ছাড়বেন না। কম করে আরো এক ঘণ্টা যাবে তাতে।...দেড় আর এক-এ আড়াই ঘণ্টা। তারপর পায়ে হেঁটেই বাড়ি ফিরবে, কারণ মুখে তাড়াতাড়ি ফিরতে বললেও হৈমবতী তাকে গাড়ি ভাড়া করে ফিরতে বলেননি বা পয়সা দিয়ে দেননি। তাছাড়া, প্রভু বাড়ি নেই যখন সহদেব নিশ্চিন্ত। অতএব সে হেঁটে ফিরবে জানা কথা। হাঁটা-পথে কম করে আরো সাড়ে তিন ঘণ্টা লাগবে। মোট দাঁড়াল ছ ঘণ্টা।...এখন চারটে, রাত দশটা হবে ফিরতে।

...তাতেই হবে।

বিকেলে বাড়ির গাড়ি ফিরল। কারো কোনো নির্দেশ না পেয়ে সহিস ঘোড়া খুলে নিয়ে আস্তাবলে ঢুকিয়ে দিলে।

হৈমবতী অপেক্ষা করছেন।

রাত্রি সাড়ে নটার সময় গাড়ি জোতার হুকুম পেয়ে অবাক হল সহিস। কিন্তু কর্ত্রীর হুকুম উপেক্ষা করার নয়। বাড়িতে দুই-একটি পরিচারিকার ব্যস্তসমস্ত আনাগোনা দেখলে সে। কিছুই বুঝল না। বোঝেনি আনাগোনা যারা করল তারাও। কর্ত্রী তাদের হুকুম করেছেন সহদেব ফিরছে কিনা ছুটে দেখে আসতে। ছোটাছুটি করে তারা ফটকে এসেছে আর ফিরে গেছে।

তাঁর নির্দেশে গাড়ি ফটকের সামনে অপেক্ষা করছিল। ঠিক দশটার সময় হৈমবতী এলেন। আপাদমস্তক সাদা শালে মোড়া। গাড়িতে উঠলেন না। অপেক্ষা করতে লাগলেন। মুসলমান সহিস বিমূঢ়।

মিনিট পনেরর মধ্যেই সহদেবকে দেখা গেল। দূর থেকে গাড়ি দেখে দ্রুত পা চালিয়ে সে কাছে এলো। কিন্তু বিস্ময় দানা বাঁধারও অবকাশ মিলল না।

হৈমবতী বললেন, এত দেরি করলে কেন, শিগ্‌গীর গাড়িতে ওঠো।

জেগে আছে কি স্বপ্ন দেখছে সহদেবের সেই সংশয়। হৈমবতী তাড়া দিলেন, তোমার বাবু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন খবর এসেছে, আমি একাই যাচ্ছিলাম—শিগগীর উঠে পড়ো।

তার আগে হৈমবতী নিজেই উঠলেন গাড়িতে। সহদেবের চমক ভাঙল।

তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে সে ওপরে সহিসের পাশে গিয়ে বসল। গাড়ি ছুটল।

ভিতরে হৈমবতী স্থির বসে। মিথ্যার আশ্রয়ই নিতে হল। উপায় ছিল না, সহদেবকে চেনেন তিনি। সন্দেহ করার অবকাশ পেলে তাকে সঙ্গে নেওয়া যেত না। হাত জোড় করে হয়ত বলে বসত কর্তাবাবু ঠিক কোথায় আছেন এখন তাই জানে না। ঘোড়ার পা খোঁড়া হয়েছে বলে দিতেও মুখে আটকাতো না। ওর মত মিটমিটে পাজী আর দুটো দেখেন নি হৈমবতী। অথচ বিশ্বাসও একমাত্র ওকেই করতে পারেন। এই নৈশ অভিযান নিরাপদ নয়, বিশেষ করে কুল-রমণীর পক্ষে। পায়ে পায়ে বিপদ হতে পারে। গোরা সাহেবগুলো মদ খেয়ে রাস্তায় টহল দেয়। বেগতিক দেখলে সহদেব ওদের গায়ের উপর দিয়ে গাড়ি ছোটাতে হুকুম করবে। প্রাণ থাকতে প্রভুপত্নীর এতটুকু অসম্মান হতে দেবে না সে। সেখানেও প্রভুর সম্মান, প্রভুপত্নী উপলক্ষ।

...সহিসকে কিছু জিজ্ঞাসা করছে কিনা কে জানে। করলেও কূল-কিনারা পাবে না। সহিসের মাথায়ও ঢোকেনি কিছু। কখন কোন্ লোক এসে মনিবের অসুস্থতার খবর দিয়ে গেছে তার জানার কথা নয়।

কতক্ষণ কেটেছে জানেন না। বাগানবাড়ির ফটক দিয়ে গাড়ি ঢুকল। হৈমবতী তেমনি স্থির, কঠিন।

গাড়ি থামল। সহদেব নেমে দরজা খুলে দিল। হৈমবতী নেমে এলেন।

তোমাকে আসতে হবে না, এইখানে থাকো।

অনুচ্চ কঠিন বাধা পেয়ে সহদেব হকচকিয়ে গেল। আবছা আলোয় কর্ত্রীর সমস্ত মুখ জ্বলছে মনে হল।

সহদেব স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে গেল। হৈমবতী পায়ে পায়ে এগোলেন।

আলোঝলমল বিলাসশালার সেটা কৈশোর প্রহর। যে প্রহরে ভোগের উত্তেজনা আর উদ্দীপনা সবে জমাট বাঁধতে থাকে। রসিকবাবুরা তখনো গদি ফরাসের নরম তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে দেহ সোজা রেখেছে। তাদের হাতে হাতে মদের গেলাস, চোখে তাদের রঙবেরঙের ঘোর। মুখে বাহবা রব। তাদের মাঝে পা মুড়ে বসে কণ্ঠের কলস হাতে যেন কোন্ দুর্লভ যৌবন ছেঁকে তোলার ফিকিরে আছে গোলাপবাঈ। তুলতে পারলে তার মুগ্ধ ভক্তদের বিলোতে কার্পণ্য করবে না—মুখের মৃদু-মন্দ হাসিতে সেই আশ্বাস। হাত দুখানা বুকের কাছে উঠছে, শ্রোতাদের দিকে ফিরছে। সর্বাঙ্গ বেতের মত হেলছে দুলছে—কানে গলায় বুকে বাহুতে হাতে মণিভূষণ জ্বলছে।

হঠাৎ বুঝি ঘরের মধ্যে শব্দশূন্য বিদ্যুৎ ঝলসালো একপ্রস্থ। সেই বিদ্যুৎ

তরঙ্গের আঘাতে মুহূর্তে স্তব্ধ সম্মোহিত সকলে।

ঘরের মধ্যে দরজার দিকের বিশাল ঝাড়ের ঠিক নিচে ইন্দ্রাণীর মতই কে দাঁড়িয়ে, সহসা বোধগম্য হল না কারো। মেঝেতে তাঁর পায়ের কাছে একটা সাদা শাল পড়ে আছে। সোনার কাজ করা বেনারসী শাড়ির আভায় সভাস্থলের জোড়া জোড়া চোখে ধাঁধা লেগেছে। ঝাড়ের নিচে দাঁড়ানোর ফলে অঙ্গের হীরে মুক্তো জড়োয়ার গয়নার ছ্যুতি ঠিকরে আসছে।

আদিত্যরাম নিজের দু চোখ ভালো করে রগড়ে নিলেন একবার। ঠিক দেখছেন কি মদের ঘোরে দেখছেন বুঝছেন না। কিন্তু আর সকলে কি দেখছে তাহলে? গোলাপবাঈয়ের গলায় কুলুপ আঁটা কেন? সত্যি যদি না হবে, ঝাড়ের নিচে দাঁড়িয়ে ছিল যে, সে এখন তাঁর দিকে ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে কি করে?

হৈমবতী আদিত্যরামের ঠিক পাশে এসে দাঁড়ালেন। মাথায় খাটো ঘোমটা। সুরসভায় ইন্দ্রের পাশে শচীর যোগ্য আসন না দেখেই স্থির রোষে নীরব যেন একটু।

—সব সরে যেতে বলো!

আদেশ কানে যেতে মোহভঙ্গের পাল্টা আঘাতে মুহূর্তে সজাগ সকলে। নিজের নিজের দেহ টেনে হিঁচড়ে তোলার হিড়িক পড়ে গেল। দুপাশ খালি। ইন্দ্রাণী-রূপিণী নির্বাক ইন্দ্রের পাশ ঘেঁষে আসন নিলেন। হাতের ইশারায় নর্তকীকে ইঙ্গিত করলেন তার কাজ করে যেতে।

গোলাপবাঈয়ের তখনো দিশেহারা চক্ষু, কণ্ঠে তখনো কুলুপ আঁটা।

আদিত্যরামের সম্বিৎ ফিরল। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। পায়ের ধাক্কায় মদের পাত্র উল্টে গেল। মানীর ঘরের কুলবধূর রাত্রির আঁধারে বাড়ি ছেড়ে বাগানবাড়িতে বাঈজীর আসরে এসে বসার অভাবনীয় নজির সমাজে নেই।

আদিত্যরাম বাঈজীকে বললেন, তুমি চলে যাও, আর দরকার নেই। সভার অন্য সদস্যদের দিকে ফিরলেন।—তোমরাও যেতে পারো।

আস্তে আস্তে হৈমবতীর দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি।

হৈমবতী উঠলেন। আদিত্যরাম দরজার দিকে এগোলেন। হৈমবতী অনুগামিনী। জুড়ি গাড়ির সামনে সহদেবকে দেখে আদিত্যরাম দাঁড়ালেন কয়েক মুহূর্ত। তার আপাদমস্তক দেখলেন। তারপর গাড়িতে উঠলেন। হৈমবতী বিপরীত আসনে বসলেন।

কয়েকটি পাথরের মূর্তি নিয়ে রাতের স্তব্ধতা ভেঙে ভেঙে ঘোড়া ছুটেছে।

বাড়ি।

ঝড়ের মত উপরে উঠে গেলেন আদিত্যরাম। হৈমবতী সিঁড়ির গোড়ায়

দাঁড়ালেন একটু। তারপর উপরে উঠতে লাগলেন।

সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন। ঘর থেকে বেরিয়ে আদিত্যরাম হনহন করে এগিয়ে আসছেন। হাতে কাঁটাচাবুক।

সিঁড়ি আগলে দাঁড়ালেন হৈমবতী।—কোথায় যাচ্ছ?

সরে দাঁড়াও।

সহদেবকে আমি মিথ্যে কথা বলে নিয়ে গেছি। সে জানে তুমি অসুস্থ হয়ে পড়েছ।

ক্রূর হাতের ঝটকায় পাশের দেয়ালে ধাক্কা খেলেন হৈমবতী। নীচে গড়িয়ে পড়েও যেতে পারতেন।…আদিত্যরাম নেমে গেলেন। হৈমবতী নিস্পন্দ।

হঠাৎ সচকিত হয়ে একসময় নীচে ছুটলেন তিনি।

প্রহারে জর্জরিত কুকুরের মত মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে সহদেব। জামা ছিঁড়ে গেছে—সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত। উন্মাদের মত চাবুক চালাচ্ছেন আদিত্যরাম। সহদেবের দেহ থেকে প্রাণটা বার করে নিতে না পারা পর্যন্ত চাবুক থামবে না।

কিন্তু থামল। না থামলে শেষ আঘাতটা হৈমবতীর মুখের ওপর পড়ত। পড়তে যাচ্ছিল। ধাক্কা দিয়ে তাঁকে সরাতে যাচ্ছিলেন আদিত্যরাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা করলেন না। চোখের আগুনে হৈমবতীর মুখখানা ঝলসালেন খানিক। চাবুকটা ফেলে দিয়ে ঝড়ের মতই বেরিয়ে গেলেন আবার।

একটু বাদে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা গেল। এই রাতে গাড়ি বেরুচ্ছে আবার। …যিনি গেলেন তাঁর এখন মদ চাই। কিন্তু মদ বাড়িতেও মজুত থাকে।…… তাহলে আরো কিছু চাই। অনুমান, ওই গাড়ি এখন গোলাপবাঈয়ের ডেরার দিকে ছুটবে।

সহদেবের নিস্পন্দ দেহ মাটিতে লুটোচ্ছে। হৈমবতী শিউরে উঠলেন। বেঁচে আছে কি নেই বোঝা যাচ্ছে না।

দ্রুত বেরিয়ে ঝি দুটোকে ডেকে আনলেন। ধরাধরি করে সহদেবকে তুলল তারা। ঘরে শুইয়ে দিল। অনেকক্ষণ বসে নিজের হাতে শুশ্রূষা করলেন হৈমবতী, ক্ষত মুছে মুছে দিলেন, প্রলেপ লাগালেন। সহদেব কেঁপে কেঁপে উঠছে। হুঁশ নেই তেমন।

হৈমবতী নিজের ঘরের শয্যায় এসে বসেছেন একসময়। সমস্ত রাত বিনিদ্র কেটেছে তারপর।…সহদেবের ওপর আরো অত্যাচার হতে পারে। হৈমবতীকে বিচলিত দেখলে ক্রূর উল্লাসে ওই মানুষের হাতে ওর জীবনসংশয় ঘটাও বিচিত্র নয়। কিছু না হলেও ওর বিদায়ের সময় ঘনিয়েছে। প্রভুর বিশ্বাস গেছে।

আর এই অত্যাচারের সবটুকুর জন্যেই তিনি দায়ী।

দিনের আলো জাগার আগে তাঁর খাস ঝিকে ডেকে তুললেন হৈমবতী। হুকুম করলেন, যেমন করে হোক আর যত টাকা লাগুক ভালো দেখে একটা গাড়ি ডেকে আনতে হবে।

টাকা ফেললে সবই সম্ভব। অত ভোরেও গাড়ি এলো।

হৈমবতী নীচে নামলেন। সহদেবের ঘরে এলেন। বিছানায় কাতরাচ্ছে সে। হৈমবতী ডাকলেন, সহদেব, উঠে গাড়িতে এসে বসতে পারবে? আমি সঙ্গে থাকব, কোনো ভয় নেই।

তাঁকে দেখেই একটা উদগ্র ঘৃণা আর বিদ্বেষ জমাট বাঁধছিল সহদেবের চোখে। কথা শুনে যাতনা ভুলে অবাক হয়ে তাকালো। কিন্তু চোখের তারায় অবিশ্বাস।

হৈমবতী বললেন, তোমার গায়ের সব কটা চাবুক আমার গায়ে লেগেছে, ভয় পেও না, উঠে এসো, আজ থেকে তোমার সমস্ত ভার আমি নিলাম। ওঠো, দেরি করো না—

সহদেব উঠল। কোথায় যাবে জানে না।

হৈমবতী তাকে সহিসের সঙ্গে বসতে দিলেন না। ভিতরে বসালেন। তারপর নিজেও উঠলেন। গাড়ি ছুটল তাঁর বাপের বাড়ির দিকে।

বাবার সঙ্গে কথা বলে সহদেবের সেখানেই থাকার ব্যবস্থা করলেন। আসার আগে তার হাতে একতাড়া নোট গুঁজে দিয়ে বললেন, আমাকে না জানিয়ে এখান থেকে নড়ো না—তোমার বাবু এলেও না।

বাড়ি এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

আদিত্যরাম তখনো ফেরেননি।

সংঘাতের স্থচনা এই। পরিণতির পটভূমি বিচিত্রতর।

গতরাত্রে আদিত্যরামের বাগানবাড়ির ঘটনা চাপা থাকার মত নয়। অত রাতে জুড়ি হাঁকিয়ে চাটুজ্জেবাড়ির ঘরের বউ বাগানবাড়ির বাঈজীর আসরে উপস্থিত হয়েছিল স্বামী ধরে আনতে, এ এক অবিশ্বাস্য ঘটনাই বটে। যেখানে নেশাগ্রস্ত কত পরপুরুষ উপস্থিত ছিল ঠিক নেই। আর, যে-স্বামী কিনা আদিত্যরামের মত স্বামী। দু-পাঁচ মুখ থেকে দু-পাঁচশ কান হবার মতই খবর।

হলেও আদিত্যরাম পরোয়া করতেন না, কারণ সাহস করে তাঁর সামনে এসে কেউ কিছু বলত না।

কিন্তু ঘটনাটা এক বিরাট কৌতুকের ব্যাপার হয়ে ছড়িয়ে পড়ল যাঁর জন্যে, তিনি মৈত্রবাড়ির নীলগোপাল মৈত্র। আদিত্যরামের সমবয়সী কি দুই এক বছরের

বড় হবেন। বাণিজ্যসূত্রে এককালে কমলার পা পড়েছিল এই বংশেও। কিন্তু পরবর্তীরা কলাবতী বাগ্‌বাদিনীর ভক্ত হয়ে ওঠার ফলে কমলার পদচিহ্ন নিষ্প্রভ হয়ে এসেছিল। এককালের সঙ্গীতপ্রীতি এখন নীলগোপালের কাব্যপ্রীতিতে এসে ঠেকেছে।

ছেলেবেলা থেকে এই নীলগোপালের সঙ্গে আদিত্যরামের শত্রুতা। তাঁর বেপরোয়া সাহস অনেকসময় নীলগোপালের সূক্ষ্মবুদ্ধির কাছে ঠোক্কর খেয়েছে। বয়েসকালে এই শত্রুতা বনেদী রেষারেষিতে দাঁড়িয়েছিল। যেটুকু না থাকলে আভিজাত্যের আমেজ নষ্ট হয়। নীলগোপাল মানুষটি সুরসিক, সুকবি, কিন্তু দাম্ভিক। আদিত্যরাম তাঁকে কোনদিন বরদাস্ত করতে পারতেন না।

বছর কয়েক হল নীলগোপালের স্বভাব বদলেছিল। বাইরের কারো সঙ্গে তেমন যোগ ছিল না তাঁর। তিনি অন্তঃপুরের মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। বনেদী রেষা-রেষিতে মরচে ধরেছিল। যে কারণে নীলগোপালের এই পরিবর্তন, আদিত্যরাম তাই নিয়ে অনেক হাসি-বিদ্রূপের অবতারণা করেছেন, অনেকভাবে তাঁকে অপদস্থ করতে চেয়েছেন। কিন্তু নীলগোপালের কানে তুলো, পিঠে কুলো।

সকলে জানে, অন্তঃপুরে নীলগোপাল যে রসবতীর আঁচল ধরে সুখে কাল কাটাচ্ছেন, সেটা সৌদামিনীর আঁচল।

সৌদামিনী মৈত্রবাড়ির কুলবধূও নয়, ব্রাহ্মণকন্যাও নয়। নীলগোপালের স্ত্রীর ছেলেবেলার সহচরী। কায়েতের মেয়ে। অল্পবয়সের বিধবা। তার মাকে নীল-গোপালের স্ত্রীর বাপেরবাড়ির মানুষেরা ঝি ভাবত না, বাড়ির একজনই মনে করত। নীলগোপালের স্ত্রী যতদিন বেঁচেছিল, উৎসবপার্বন উপলক্ষে সৌদামিনী মৈত্রবাড়িতে এসেছে, গেছে। সই ছাড়তে চায়নি বলে প্রতিবারই দু-পাঁচ দিন করে থেকে গেছে, যাবার সময় দুজনে গলা জড়াজড়ি করে কেঁদেছে।

একটু বেশিবয়সে ছেলে হবার পর নীলগোপালের স্ত্রী শয্যা নিয়েছিল। দীর্ঘদিন রোগে ভুগে সেই শয্যাতেই চোখ বুজেছে। ছেলে হবার আগে তার একান্ত ইচ্ছায় সৌদামিনীকে এ বাড়িতে আনা হয়েছিল। কিন্তু সে আর ফেরার ফুরসত পায়নি। নবজাতকের দায়িত্ব তাকে নিতে হয়েছে। অগোচরে ছেলের বাপের দায়িত্বও।

স্ত্রীবিয়োগের পর শোক ভুলতে খুব বেশি সময় লাগেনি নীলগোপালের। সৌদামিনীর মা সৌদামিনীকে নিতে এসে অকথ্য গালিগালাজ করে ফিরে গেছে। এই এক ব্যাপারের দরুন শ্বশুরবাড়ির সঙ্গেও সম্পর্ক ঘুচে গেছে নীলগোপালের। চারদিকে হাসাহাসি কানাকাটির ঢি-ঢি পড়ে গেছে। নীলগোপাল নির্বিকার। ঝিয়ের মেয়ের প্রতি এত অনুরাগ দেখে অনেক লঘু প্রহসনে মেতেছেন আদিত্য-

রাম। কিন্তু যত দিন গেছে, মনে খটকা লেগেছে তাঁর। একটা দুটো করে করে কয়েকটা বছর চলে গেল, কিন্তু নীলগোপাল আর বিয়ে পর্যন্ত করলেন না। ওই সৌদামিনী তেমন রূপসীও কিছু নয় শুনেছেন। বেশ সুশ্রী এবং স্বাস্থ্য ভালো, অঙ্গসৌষ্ঠব ভালো। তা এ-রকম তো কতই আছে। কিন্তু নীলগোপালের এমন একনিষ্ঠ অনুরাগ দেখে ক্রমে কৌতূহল বেড়েছে সকলের—আদিত্যরামেরও।

নীলগোপালের জীবনে সৌদামিনীর অধ্যায় হৈমবতীরও অজ্ঞাত ছিল না একেবারে। স্বামীর সঙ্গে ওই লোকের শত্রুতার খবর তাঁর কানে আসত। সৌদামিনীর বৃত্তান্ত শোনার পর স্বাভাবিক ঘৃণার উদ্রেকই হয়েছিল। কিন্তু বছর বছর ধরে এরা যখন অধোবর্ণা রমণীর প্রতি লোকটার আসক্তি প্রসঙ্গে লঘু হাসিঠাট্টা করেছে —তখন কেন যেন হৈমবতী ততটা বিরূপ হতে পারেননি। বরং নীরব কৌতূহলে নিজের পরিচারিকার কাছে মৈত্রবাড়ির অনেক খবর শোনেন। এই সেদিনও কে বলছিল, সৌদামিনী যেমন মেয়েই হোক, সইয়ের ছেলেটাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে বটে—নিজের মা-ও অত যত্নআত্তি করতে পারে না।

আদিত্যরামের বাগানবাড়ির ঘটনার পর এই নীলগোপাল হঠাৎ এসে রসের ভিয়েনে পাক দেবেন, কেউ কল্পনাও করেনি।

দিনকতকের মধ্যে চার পৃষ্ঠার এক কাব্যলিপিকা দেখে রসিকজনেরা পর্যন্ত হকচকিয়ে গেল প্রথম। তার পর সাড়া পড়ে গেল। বিনে পয়সায় হাজারে হাজারে নাকি বিলি করা হয়েছে সেই কাব্যলিপিকা। কাব্যের নাম 'কুলবধূর নিশি অভিষান'। চার পাতা-জোড়া কাব্যে কুলবধূটি কে তার উল্লেখ নেই। কবির নামও অনুক্ত। কিন্তু কে কবি, বা কার কুলবধূকে নিয়ে লেখা সেটা ছড়ার ছত্রে ছত্রে স্পষ্ট।

ব্যাপারটা নিয়ে এত হৈ-চৈ পড়ে গেল যে, হৈমবতীরও জানতে বাকি থাকল না কিছু। খাস ঝিকে তিনি হুকুম করেছিলেন একটা কাগজ যোগাড় করে আনতে। কিন্তু তার দরকার হল না। তাঁর নামেই ডাকে এলো একখানা। প্রেরক কে তক্ষুনি বুঝে নিলেন হৈমবতী।

কিন্তু কাব্য পড়ে তিনি রাগবেন না হাসবেন, ভেবে পেলেন না। কবিতার নাম যাই হোক, কোথাও তাঁকে ছোট করা হয়নি। উল্টে দশভুজার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। একখানা জলন্ত স্ফুলিঙ্গ লম্পট মদ্যপ স্বামীরূপী পতঙ্গকে কেমন করে বারনারীর ভোগের আসর থেকে হিড়হিড় করে টেনে তুলে এনেছে তারই সকৌতুক বিবরণ। প্রকারান্তরে কবি তেজস্বিনী কুলবধূর তারিফ করেছেন, আর বিদ্রূপের বাক্যবাণে স্বামীটিকে জর্জরিত করেছেন।

ক্রোধে অপমানে আদিত্যরাম ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। প্রতিজ্ঞা করলেন চরম শোধ নেবেন। প্রথম ভাবলেন গুলী করে মারবেন নীলগোপালকে। মাথা একটু ঠাণ্ডা হতে দেখলেন সেটা সহজ ব্যাপার নয়। নীলগোপালেরও সঙ্গতি আছে কিছু, সে তার বন্দুকের সামনে বুক পেতে দেবে না। তাছাড়া মারলে তো হয়েই গেল, এমন শোধ নেবেন যা চিরকাল মনে থাকে, এবং সকলে জানতে পারে।

উপায় মাথায় আসতে সময় লাগল না। মোটা টাকা সংগ্রহ করলেন আগে। তারপর এক রমণীই গোপনে দূতীগিরি করল সৌদামিনীর কাছে। প্রস্তাব লোভনীয়।

কিন্তু দূতীটি যে সমাচার নিয়ে ফিরে এলো, শুনে দাউ দাউ আগুন জ্বলতে লাগল আদিত্যরামের মাথার মধ্যে। এই অপমান আগের অপমানকেও ছাপিয়ে গেল বুঝি। সৌদামিনী যে জবাব পাঠিয়েছে তার সারমর্ম, আদিত্যরামের কাছে চলে আসতে তার আপত্তি নেই, কিন্তু এদিকের লোকটাকে দেখে কে? অতএব আদিত্যরাম যদি তাঁর ঘরের স্ত্রীটিকে নীলগোপালের কাছে পাঠিয়ে দেন, সৌদামিনী তাহলে নিশ্চিন্ত মনে তাঁর কাছে চলে আসতে পারে।

সৌদামিনীর জবাবও রাষ্ট্র হয়ে গেল কেমন করে। খাস ঝি তেতে উঠে বারবার সৌদামিনীর মুখে আগুন দেবার অভিলাষ ব্যক্ত করায় হৈমবতী ধমকেই তার পেটের কথা টেনে বার করলেন। তারপর রাগে ঘৃণায় স্তম্ভিত তিনিও।

আদিত্যরাম আবার প্রতিজ্ঞা করলেন শোধ নেবেন।

ঠিক পনের দিনের দিন তাঁর হাসিমুখ দেখা গেল। অন্যদিকে একটা চাপা কানাকানি উদগ্র হতে হতে হৈমবতীর কানে এলো। শুনলেন, আগের দিন ভোরে গঙ্গাস্নানে গেছল সৌদামিনী, আর ফেরেনি। সেই থেকে নীলগোপাল নাকি পাগলের মত হয়ে আছেন, চারদিক খোঁজাখুঁজি করছেন। থানায় খবর দিয়ে তাঁর সন্দেহের কথা বলেছেন। কিন্তু পরিচারিকা নিখোঁজ হয়েছে শুনলে কে আর অত মাথা ঘামায়, রক্ষিতা শুনলে তো হেসেই উড়িয়ে দেবে। আর এ নিয়ে আদিত্যরামের মত মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিকেও তারা বেশি বিরক্ত করতে রাজী নয়। একবার শুধু জিজ্ঞাসাবাদ করে গেছে তারা। আদিত্যরাম প্রথমে আকাশ থেকে পড়েছেন, পরে রাগে ফেটেছেন।

নীচে, একলা ঘরে হেসে গড়াগড়ি যাচ্ছিলেন আদিত্যরাম। স্ত্রীকে দেখে উঠে বসলেন। গম্ভীর।

তুমি জানো কিছু?

আদিত্যরামের দৃষ্টি ধারালো হতে থাকল। কঠিনগলায় জবাব দিলেন, তুমি

আমাকে অনেক অপমান করেছ। বাইরের ব্যাপারে মাথা গলাতে এলে তুমিও এর পর উচিত শাস্তি পাবে। তোমাকে আমি শেষবারের মত সাবধান করে দিচ্ছি। যাও এখান থেকে!

ভয়ে নয়, ঘৃণায় ঘর ছেড়ে চলে এলেন হৈমবতী।

একে একে চার দিন কাটল। আরো কিছু কথা কানে এলো হৈমবতীর। নীলগোপাল অবিরাম খুঁজে চলেছেন নাকি সৌদামিনীকে। কখনো অভিশাপ দিচ্ছেন, কখনো পাগলের মত বকছেন। বলছেন, কাপুরুষ আদিত্যরামের সাধ্য নেই সৌদামিনীর গায়ে হাত ছোঁয়ায়—তার আগে গলায় দড়ি দেবে সে। কিছু একটা করবেই। সৌদামিনী কিছু একটা করে বসবে বলেই তাঁর ভয় আর শোক।

এদিকে আগের দিন সকাল থেকেই পরের দিনের শিকারযাত্রার আয়োজন চলেছে সাড়ম্বরে। এই শিকার যে কোন্ শিকার তাও হয়ত মনে মনে বুঝছেন হৈমবতী।...

সকাল দশটা তখন। আদিত্যরাম বেরিয়েছেন। ঝিয়ের কথা শুনে সচকিত হয়ে হৈমবতী জানলায় এসে দাঁড়ালেন। ঝি বলেছে, ও মা, নীলগোপাল ঠাকুর যে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে—এই বাড়িটাকেই দেখছে পাগলের মত!

সত্যি তাই। তাঁকে দেখামাত্র বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠল হৈমবতীর। এ-রকম মূর্তি তিনি কল্পনাও করেননি। শৌখিন মানুষ ছিলেন লোকটি। আড়াল থেকে হৈমবতী দেখেছেন তাঁকে বারকয়েক। কিন্তু একি চেহারা হয়েছে তাঁর! কালচে মুখ, খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, উস্কো-খুস্কো চুল। গায়ে আধময়লা ফতুয়া, পরনের কাপড়টাও ময়লা। পাগলের মত উদ্‌ভ্রান্ত চোখে বাড়িটাকেই দেখছেন বটে।

লোকটার ওই বেদনার্ত বোবা চাউনি বুকের মধ্যে কেটে বসল হৈমবতীর।

দুপুরের মধ্যে বাড়ির সামনে আরো বারকয়েক দেখা গেল নীলগোপালকে। ঘরের মধ্যে ছটফট করতে লাগলেন হৈমবতী। কিছুতে আর স্থির হতে পারছেন না। বুকের মধ্যে যেন কেবলই কাটছে, কাটছে, কাটছে, কাটছে।

একসময় এক অটুট সঙ্কল্প নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। ঝিকে আদেশ দিলেন ভালো দেখে একটা গাড়ি ডাকতে। নিজে প্রস্তুত হলেন। আলমারি খুলে টাকা বার করলেন।

গাড়ি বাপের বাড়ি পৌঁছুতে যাকে চাইছিলেন তাকেই পেলেন প্রথম। সহদেবকে। মায়ের এই মূর্তি দেখে সে অবাক।

হৈমবতী তাকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, সৌদামিনিকে চেনো?

সহদেব সঙ্কুচিত।

আঃ, লজ্জা করার সময় নয় এখন, তুমি জানো কি হয়েছে?

সহদেব মাথা নাড়ল, জানে। বলল, নীলগোপালবাবু কোথা থেকে খবর পেয়ে এখানেও এসেছিলেন, দু হাত ধরে কান্নাকাটি করছেন।

সৌদামিনীকে আজই খুঁজে বার করতে হবে সহদেব, আজ রাত্রিটা মাত্র সময়। পারবে?

সহদেব মুখের দিকে চেয়ে রইল একটু। তারপর মাথা নীচু করে বলল, মা হুকুম করলে পারি···আমি বোধ হয় জানি তাকে কোথায় রাখা হয়েছে।

আনন্দে কি কোন্ অনুভূতিতে, চোখে জল আসার উপক্রম হৈমবতীর। সামলে নিয়ে বললেন, সহদেব, তুমি আমার ছেলে—এসো।

সহদেব বলল, সঙ্গে কয়েকজন লোক নিলে হত।

বাবাকে বলে হৈমবতী লোকের ব্যবস্থা করলেন। সকলকে নিয়ে নিঃশব্দে বাড়ি থেকে বেরুলেন তিনি।···

এ বাড়িতে ফিরলেন সন্ধ্যার পরে। দেহ অবসন্ন। কিন্তু মন শান্ত। এত শান্তি তিনি আর কখনো পাননি বোধ করি। সমস্ত পথ সৌদামিনীর মুখখানা চোখে ভেসেছে। বেগ কিছুই পেতে হয়নি। তবে সৌদামিনী অবাক হয়েছিল বটে। হৈমবতী বলেছিলেন, তুমি ভাগ্যবতী, ভয় পেও না—বিশ্বাস করে চলে যাও, সহদেব তোমাকে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবে।

সৌদামিনী তাঁর পায়ে হাত রেখে প্রণাম করেছে।

আদিত্যরাম বাড়ি ফিরলেন প্রায় শেষ রাতে। হৈমবতী জেগে ছিলেন। টের পেলেন। ভারী জুতোর শব্দ দোরগোড়ায় এসে থেমেছে। কিন্তু দরজায় ধাক্কা পড়েনি। পায়ের শব্দ আবার সিঁড়ির দিকে মিলিয়েছে।

ভোরে দেখা হল। আদিত্যরামই আবার উঠে এসেছেন। ঘরে এসে বসেছেন। তারপর হৈমবতীকে দেখেছেন চেয়ে চেয়ে।

কাল তুমি কোথায় গেছলে?

বাবার ওখানে।

সেখান থেকে?

হৈমবতী জবাব দিলেন না।

সহদেব তোমার বাবার ওখানে থাকত শুনলাম, সে কোথায়?

বিদায় করে দিয়েছি।

আদিত্যরাম দেখছেন। একটা চোখ ক্রমে ছোট হয়ে আসছে। চেয়ে আছেন

হৈমবতীও। তাঁর মুখের একটা রেখাও কাঁপছে না।

খুব ধীর কঠিন স্বরে আদিত্যরাম বললেন, শিকারে যাবার কথা ছিল, যাচ্ছি।…হয়ত আজই ফিরব। বুঝলে?

হৈমবতী মাথা নাড়লেন। বুঝেছেন।

আদিত্যরাম উঠে চলে গেলেন। দরজার কাছে ঘুরে দাঁড়িয়ে শেষবারের মত যেন আর একবার দেখে গেলেন হৈমবতীকে। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত তারপর হৈমবতীকে একটি কথাও বলতে শোনেনি কেউ।

সন্ধ্যে পেরুতে না পেরুতে প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি খেয়ে জেগে উঠল গোটা বাড়িটা। লোকে লোকারণ্য। বাড়ির লোকজনও ছোটাছুটি করছে। শুধু হৈমবতী যেন পাষাণ। চিত্রার্পিত।

…একটি শবদেহ বহন করে এনেছে ওরা। সেই দেহ আদিত্যরামের।

ঘটনাও বলা হয়েছে হৈমবতীকে। কিন্তু এক বর্ণও কানে ঢোকেনি তাঁর। বুদ্ধির অগম্য কিছু শুনেছেন যেন।…জঙ্গলের গাছ থেকে সরাসরি মাথায় ছোবল মেরেছে কালনাগিনী। সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ।

* * * *

অনেক, অনেক বছর পরের কথা। হৈমবতী তখন বৃদ্ধা, সুরেশ্বর আর কিরণশশীর তখন যৌবনকাল। ওই রাশভারী বৃদ্ধার মুখে বড় বিচিত্র কথা শুনেছিলেন একদিন তাঁরা। আর বেশিদিন বাঁচবেন না, হৈমবতী বুঝতে পেরেছিলেন। ছেলে ছেলেরবউকে ডেকে বলেছিলেন, ঠাকুরকে…প্রভুজীকে যেন ভুলো না বাছারা, তিনিই সব। তাঁর আসন যেন পাতা থাকে।

সুরেশ্বর কিরণশশী অবাক। ঠাকুর বা প্রভুজীর নামও কোনদিন তাঁর মুখে শোনেনি কেউ। পাড়াপ্রতিবেশী পাঁচজনের মুখে বাড়ির কর্ত্রীর গল্প তাঁরা অনেক শুনেছেন। সৌদামিনী উদ্ধারের কাহিনী, আর আদিত্যরামের আকস্মিক অঘটনের কথাও জানা তাঁদের।

কিন্তু যে কথা শুনলেন সেদিন, তা আর কেউ জানে না।

…তাঁদের জন্মেরও আগে সেই এক কল্পান্তক দিনে মনে মনে কেউ যদি কোনো অকালমৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকেন, তো হয়েছিলেন হৈমবতী। সে মৃত্যু তাঁর নিজেরই।

আদিত্যরামের মুখের দিকে চেয়ে তাঁর ক্রূর চোখে হত্যার নির্ভুল ছায়া দেখেছিলেন তিনি।

তারপর সকাল থেকে কেবলই প্রস্তুত করতে চেষ্টা করেছেন নিজেকে। কিন্তু

মন কিছুতে শান্ত হয় না। থেকে থেকে শুধু মনে হয়েছে তাঁর ভিতর থেকে এক অনাগত শিশু কাঁদছে।

সেই সঙ্কটে হঠাৎ ঠাকুরকে—প্রভুজীকে মনে পড়েছে তাঁর। ঘরের দরজা বন্ধ করে সমস্ত দিন আকুল হয়ে প্রার্থনা করেছেন। বলেছেন, যদি অপরাধ করে থাকি প্রভুজী, শাস্তি দিও। কিন্তু সহ্য করার শক্তি দাও ঠাকুর, স্থির হবার শক্তি দাও—শিশুর কান্না আমি যে আর শুনতে পারিনে।

রাতে মৃত মানুষ বাড়ি ফিরল। হৈমবতী এও চাননি।···কিন্তু প্রভুজীর বিচার মাথা পেতে নিয়েই একদিন আবার উঠি দাঁড়িয়েছেন তিনি।

ছেলে ছেলেরবউকে আবারও বলেছেন, ঠাকুরকে····প্রভুজীকে ভুলো না বাছারা। তিনিই সব। বাইরে ঘটা না করলেও হবে, বুকের মধ্যে যেন তাঁর আসন পাতা থাকে।

॥ দশ ॥

বুকের মধ্যে আসন পাতাই ছিল, মায়ের নির্দেশ কখনো অমান্য করেননি সুরেশ্বর।

যতকাল বেঁচে ছিলেন, প্রভুজীর অলক্ষ্য আসনের অস্তিত্ব সকলকে অনুভব করতে হয়েছে। গৌরবিমল করেছেন, কালীনাথ করেছেন, জ্যোতিরাণীও করেছেন। পূর্বপুরুষের মহিমা স্মরণ করে এঁরা আবেগবিহ্বল হয়ে ওঠেননি বটে, অবজ্ঞাও দেখাননি কখনো। কারণ সকলেরই ধারণা, বাড়ির কর্তা সেটা বরদাস্ত করবেন না। প্রভুজী-প্রসঙ্গে কিরণশশীর আবেগ অন্ধ বিশ্বাসের সগোত্র। তাঁর বিশ্বাস বেশি কি ভয়, বলা শক্ত। কর্তা ধারে কাছে না থাকলে কালীনাথকে অনেকসময় টিপ্পনী কাটতে শোনা গেছে, সোয়াশো বছর বাদে প্রভুজী মানিকরাম যোগ্য পাবলিসিটি অফিসার পেয়েছেন।

কিরণশশী বুঝতেন না। হাসতে দেখে তাঁর সন্দেহ হত, শঙ্কা হত। বলে উঠতেন, কোনো অসম্মানের কথা বললি না তো রে হতভাগা!

কালীনাথের বিস্ফারিত দু চোখ কপালে উঠত তৎক্ষণাৎ।—অসম্মান! বলছিলাম, ওই বংশের ছেলে হলে ঠাকুরের নাম তোমাদের থেকেও চারগুণ বেশি প্রচার করে বেড়াতাম আমি!

সখেদে তক্ষুনি ঠাণ্ডা হয়ে যেতেন কিরণশশী। বলতেন, সে বরাত আর

হল কই।

শ্বশুর বেঁচে থাকতেও বাড়িতে জ্ঞাতি-পরিজনদের যাওয়া আসা ছিল। সাবেকী আমলের সামাজিক আদান-প্রদানও বন্ধ হয়নি। তাঁদের গৃহিণীরা অন্দরমহলে আসতেন। বউকে ধরে ধরে শাশুড়ী তখন যেতে আসতে প্রণাম করাতেন সকলকে। সামনে বসে মুখ বুজে তাঁকে বংশের মহিমাকীর্তন শুনতে হত। দু-পাঁচ কথার পর আলোচনার ধারা সেদিকে গড়াতই। পুণ্যস্মৃতি স্মরণ করে কেউ উদ্ভাসিত, কেউ কণ্টকিত। উপসংহার আবার অনিবার্যভাবেই জ্যোতিরাণীর দিকে ফিরত। কেউ মন্তব্য করতেন, এ বাড়ির যোগ্য বউই শিবু এনেছে, দেখলে চোখ জুড়োয়।

এই প্রশংসাবচনে শাশুড়ী খুব যে খুশি হতেন তা নয়। কারণ, এই বউ আনার পিছনে শিবেশ্বরের যে সক্রিয় ভূমিকা ছিল, সেটা গোপন থাকলেই তিনি খুশি হতেন। কিন্তু গোপন ছিল না। বরং সকলে জেনেছে বিয়ে করার জন্য ছেলে ক্ষেপে উঠেছিল বলেই এই বিয়ে হয়েছে। বউ আনবে বাপ-মা, ছেলে শুধু মুখ বুজে বিয়েটি করবে—ওই মন্তব্যে এ আদর্শ ম্লান হওয়াই স্বাভাবিক।

আর কেউ হয়তো বউকে লক্ষ্য করেই বলতেন, ভাগ্য করে কি ঘরে যে এসেছ জান না, শুধু রূপ থাকলে হবে না, যোগ্য গুণও থাকা চাই। শাশুড়ীর দিকে ফিরতেন তারপর, ঠাকুরের কথা, ভগবতী ঠাকরোনের কথা, হৈম ঠাকরোনের কথা—বউ সব জানে তো?

কথা নয়, কথামৃত। আলোচনার এই পর্যায়ে একগাল হেসে মাথা নাড়তেন শাশুড়ী। এও না জানলে তাঁর শাশুড়ী হওয়াই অসার্থক যেন।

জ্যোতিরাণী কখনো কৌতুক বোধ করতেন, কখনো বা অবাক লাগত। তাঁর যে একটানা সতের বছরের একটা অতীত ছিল, এ সংসার থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন একটা দুনিয়া ছিল, সেই দুনিয়ার রীতি-নীতি চিন্তা অভ্যাস যে তাঁর ভিতরে বাসা বেঁধে আছে—সেকথা কারো মনেও পড়েও না। জন্মগ্রহণ করেই তিনি যেন সতের বছরে পা দিয়েছেন আর এই বাড়ির বউ হয়ে এসেছেন। তাঁর অতীত বলে কিছু নেই, এইখান থেকে শুরু, এইখান থেকে ভবিষ্যৎ।

জ্যোতিরাণী তাই গল্পই শুনতেন, মনে খুব দাগ কাটত না। সত্যিই কত বড় ভাগ্য নিয়ে এ-বাড়ির বউ হয়ে এসেছেন, চেষ্টা করেও তা উপলব্ধি করতে পারতেন না। সতের বছরের জীবনে উপলব্ধির বস্তুটি তাঁর ভিন্ন উপাদানে গড়া। বাপের বাড়ির অভ্যস্ত পরিবেশের সঙ্গে এখানকার এতটুকু মিল খুঁজে পেতেন না তিনি।

কিন্তু স্মৃতির আখ্যান শোনার ব্যাপারে আগ্রহ থাক বা না থাক, বাড়ির একজনের মধ্যে ওই বংশগরিমার ছিটে-ফোঁটাও আছে কি না—জ্যোতিরাণী অনেক

সময় সেটা সাগ্রহে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করতেন। সেই একজন শিবেশ্বর। গাঁট-ছড়া বাঁধা সারা যাঁর সঙ্গে। তখন থেকেই হৃদয় খোঁজার তাগিদে জ্যোতিরাণীর এই আগ্রহ কিনা বলা যায় না। কিন্তু তখনো ঠিক এমনিই অবাক লাগত আবার। ওই প্রসঙ্গে শিবেশ্বর নিজে কখনো কিছু বলা বা গর্ব করা দূরে থাক, জ্যোতিরাণী কখনো কথা তুললেও বিরক্ত হয়ে বলতেন, রাবিশ! বিগত মহাপুরুষ বা মহীয়সীদের কারো নাম জানা আছে বলেও মনে হত না।

কিন্তু জানা ভালই আছে। সে সম্পর্কে জ্যোতিরাণী একবার এক মজার গল্প শুনেছিলেন কালীদার মুখে। শুনে হেসেছিলেন খুব।

শিবেশ্বরের তখন ম্যাট্রিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে। তার কিছুদিন আগে কালীদা আই-এ পরীক্ষা দিয়ে উঠেছেন। বয়সে এক বছরের বড় হলেও পড়তেন দু ক্লাস ওপরে। দুজনে যুক্তি করলেন কিছুদিনের জন্য বেড়াতে বেরুবেন কোথাও। উৎসাহে উদ্দীপনায় ভরপুর। কিন্তু অভাব দুটি জিনিসের। কর্তার অনুমতি এবং টাকা। অনুমতি পেলে টাকাও মিলবে।

শিবেশ্বরের পরিষ্কার মাথা। সেই মাথায় প্ল্যান গজালো। কালীদাকে নিশ্চিন্ত করলেন তিনি, টাকা হাতে এসেই গেছে। অনুমতি তো বটেই।

পরীক্ষা শেষ হবার দিন কয়েকের মধ্যেই প্ল্যানমাফিক এগোলেন শিবেশ্বর। মা-কে জানালেন পর পর দুদিন এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছেন তিনি।......ভারী সুন্দর একজন লোকের সঙ্গে কাশীতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি আর কালীদা। লোকটির সমস্ত শরীর মুখ যেন আলো দিয়ে গড়া। তাঁর সঙ্গে তাঁরা কাশীর মন্দির দেখে বেড়াচ্ছেন, গঙ্গার ঘাটে বসে গল্প করছেন। আর ভিতরটা যেন এক অদ্ভুত আনন্দে ভরে যাচ্ছে তাঁদের। তাই ইচ্ছে করছে একবার কাশীটা ঘুরে আসতে।

পুলকে রোমাঞ্চে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে মা কিরণশশীর। তক্ষুনি কর্তার উদ্দেশে পড়ি-মড়ি করে ছুটেছেন তিনি। প্রভুজী ভিন্ন এমন অহেতুকী কৃপা আর কার হতে পারে! ছেলের কাছে যে চেহারার বর্ণনা পেয়েছেন, সেও যে তাঁর সঙ্গেই মেলে!

শোনার সঙ্গে সঙ্গে সুরেশ্বর স্তব্ধ খানিক। কিরণশশী আকুল, ওগো তুমি কাল পারো কালই কাশী পাঠাও ওদের, প্রভুজীর এত করুণা......

শিবুকে ডাকো।

হাঁকডাক করে মা সেখান থেকেই ছেলেকে ডাকলেন। ছেলে নির্লিপ্ত মুখে হাজির।

পায়ের থেকে খড়ম খুলে সুরেশ্বর আষ্টেপৃষ্ঠে বসিয়ে দিলেন ঘাকতক। মা হতভম্ব, ছেলেও এই অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত নয়। কর্তা বিমূঢ় গৃহিণীকে বললেন,

স্বপ্ন দেখার সঙ্গে সঙ্গে ওর এই স্বপ্নটাও দেখে রাখা উচিত ছিল। কালী কোথায়?

অনুমতি আর টাকা একসঙ্গে এনে দিয়ে কালীদাকে অবাক করে দেবার মতলবে আগে তাঁর কাছে প্ল্যান ফাঁস করা হয়নি। কর্তার ঘরে ছেলের ডাক পড়তে আশান্বিত হয়ে তিনিও দরজার আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু খড়মের মাহাত্ম্যে সেই যে চোঁ-চাঁ ছুট দিয়েছিলেন, রাত গভীর হবার আগে আর বাড়ি ফেরেননি।

জ্যোতিরাণী এ সংসারে অনেক পরের আগন্তুক। তার অনেক আগে কালীনাথ এসেছেন, গৌরবিমল এসেছেন। এখানকার দিনগত ধারা তখন অন্য খাতে বইছিল।

শিবেশ্বরের জন্মের আগে দু-দুবার সন্তান-শোক পেয়েছিলেন কিরণশশী। প্রথম সন্তান মেয়ে, ছ মাস বয়েস না হতে শিশুরোগে হঠাৎ মারা যায়। দ্বিতীয়টি ছেলে —মৃত ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। তৃতীয় সন্তান শিবেশ্বর। তাঁকে দেখে সুরেশ্বর স্ত্রীকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, এটা হয়ত থাকবে। কি দেখে বলেছিলেন তিনিই জানেন। কিন্তু অনেককাল পর্যন্ত কিরণশশীর ভয় ঘোচেনি। সেই ভয়ের দরুন যেভাবে ছেলেকে বড় করে তুলছিলেন তিনি, সুরেশ্বরের তা অনেকসময়েই মনঃপুত হত না। বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলে তিনিও। নিজের জীবনের দুর্বহ বেদনার স্মৃতির কারণে হোক বা যে জন্যেই হোক, সেই মা লোভের সমস্ত উপকরণ নির্মম হাতেই তফাতে সরিয়ে দিতেন। সুরেশ্বরের মনে আছে, ছেলেবেলায় স্কুল থেকে তিন মাইল পথ বাড়িতে হেঁটে আসতে কষ্ট হত। খিদেও পেত। যাবার সময় কজন ছেলে মিলে মাস-ভাড়ায় ঘোড়ার গাড়িতে যেতেন। সাইকেল বস্তুটা হালের আমদানি তখন। অনেক দাম। চেষ্টা-চরিত্র করে সাইকেল চড়া শিখে ফেলেছিলেন তিনি। তারপর সাইকেল ধ্যান-জ্ঞান। যে বংশের ছেলেরা জুড়ি গাড়ি হাঁকিয়ে বেড়াতেন একদিন, তাঁদেরই পরবর্তী একজনের একখানা সাইকেল আশা করা খুব দুরাশা নয়। মা দিতেনও হয়ত কিনে, কারণ ছেলের বাসনা জানার পর থেকে কিছু কিছু টাকা তাঁকে আলাদা সরিয়ে রাখতে দেখা গেছে। আর, একদিন সাইকেলের দামের খোঁজও করেছিলেন তিনি। কিন্তু কোথা থেকে চিৎপুরে বড়সড় আগুন লেগে বসল একটা, অনেকের অনেক ক্ষতি হয়ে গেল। ওই আগুনে সুরেশ্বরেরই এত দিনের বাসনা পুড়ে ছারখার হয়ে গেল বুঝি। কারণ, মা সেই গচ্ছিত টাকা তাঁর হাত দিয়েই সাহায্যের জন্য পাঠিয়ে দিলেন। সুরেশ্বরের সত্যিকারের রাগ হয়েছিল তখন। ফলে যে শাস্তি পেলেন, ভোলবার নয়। মাস-ভাড়ার ঘোড়ার গাড়ি বন্ধ হয়ে গেল। স্কুলে যাবার সময়ও হেঁটে যাবার ব্যবস্থা করলেন মা।

মায়ের এই রীতি সুরেশ্বরের গর্বের বস্তু। ফলে নিজের ছেলেকে সর্বদা আয়াস

দিয়ে ঘিরে রাখার চেষ্টাটা তাঁর চোখে বেঁধা স্বাভাবিক। স্ত্রীকে বলতেন, লোভের প্রশ্রয় দিও না, তাতে ওরই খারাপ হবে।

কিরণশশীর ভালো লাগত না। ছেলেকে আগলেই রাখতেন তিনি। কর্তাকে জানতে না দিয়ে তার যাবতীয় বায়না মেটাতে চেষ্টা করতেন। ধরা পড়লে ছেলেকে আড়াল করে নিজের ঘাড়ে দোষ নিতেন। তাঁর ধারণা জন্ম থেকেই এই ছেলেটাকে কর্তা খুব সুচক্ষে দেখেননি। ছেলের রং তেমন ফর্সা নয়, বেঁটেও। সেই জন্যও খুঁতখুঁতুনি দেখেছেন। বলতে শুনেছেন, ও অন্যরকম হবে, আমাদের মধ্যে এরকম কেউ কখনো ছিল না।

অন্যরকম যে হয়েছেন সে ধারণা ছেলের মনে বেশ অল্পবয়েস থেকেই পাকা-পোক্ত হয়ে উঠেছিল। শুধু ছেলের নয়, ছেলের মায়েরও। ইস্কুলের মাস্টাররা অন্যরকম বলে, পাড়ার পাঁচজন অন্যরকম বলে। কত যে অন্যরকম, প্রথম পরীক্ষাতেই সেটা বোঝা গেল। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম দশজনের গোড়ার দিকে যে ছেলের নাম, সে অন্যরকম বইকি। পরীক্ষার ফল বেরুতে আনন্দে আটখানা হয়ে মা বলে উঠেছিলেন, ঠাকুরঘরে প্রণাম করে আয় শীগ্‌গির, তারপর তোর বাবাকে প্রণাম করে আয়।

খবর শুনে খুশি মনে কর্তাও এদিকেই আসছিলেন। ছেলের তির্যক বচন শুনে দাঁড়িয়ে গেলেন। হেসেই মাকে বলছে, ভাল পাস করলাম আমি আর কেরামতিটা যেন তোমার ঠাকুরের আর বাবার।

শুনে আর ঘরে ঢোকা হয়নি। ফিরে গেছেন।

যে ঋজু অনাড়ম্বর ধারায় বাড়ির কর্তাটি অভ্যস্ত, তার কাল দ্রুত সরে যাচ্ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়-সময় শিবেশ্বরের জন্ম। যুদ্ধ থেমে যাওয়ার পর থেকেই এই পরিবর্তন লক্ষ্য করছিলেন সুরেশ্বর। যত দিন যাচ্ছে মানুষের প্রয়োজনবোধ ততো বাড়ছে। প্রয়োজন মেটাবার উপকরণও ততো বেশি হাতের কাছে আসছে। স্বভাবের দরুন এই হাওয়া থেকে নিজে তিনি বিচ্ছিন্ন থেকেছেন, কিন্তু বিচ্ছিন্ন করতে পারেননি কাউকে। এমন কি সে-চেষ্টাও নিজের কাছেই হাস্যকর গোঁড়ামি মনে হয়েছে অনেক সময়।

কিরণশশীর দূরসম্পর্কের ভাইয়ের ছেলে কালীনাথ ছেলেবেলা থেকেই এ বাড়ির আশ্রিত। গৌরবিমল আরো পরের। ঘরে ঘরে কত পরের ছেলে বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করে তখন। এ তবু খুঁজলে সম্পর্ক মেলে। আশ্রিত তখন নিজেকে সর্বদা আশ্রিত ভাবত না, দুদিনেই বাড়ির সঙ্গে মিশে যেত। দূরসম্পর্কের অসমবয়স্ক শ্যালকটিকে অর্থাৎ গৌরবিমলকে কর্তা পছন্দ করতেন। তাঁর দিকে চেয়ে তবু

যেন একটা চরিত্রের হদিস পেতেন তিনি। সাদাসিধে চালচলন, হাসিমুখ। কথা-বার্তা আচরণে স্নিগ্ধ সংযমের অনুশাসন চোখে পড়ে। গৌরবিমল এ বাড়িতে থেকে পড়তে আসেননি। পড়াশুনা শেষ করে চাকরির খোঁজে এসেছিলেন। চাকরি পেলে চলে যাবেন কথা ছিল। কিন্তু তাঁর চাকরি পেতে যত সময় লাগত, সেটা ছাড়তে সময় লাগত অনেক কম। কর্তা জিজ্ঞাসা করতেন, কি রে, তোর চাকরির কি হল, অফিস যাচ্ছিস না যে?

গৌরবিমল মৃদু মৃদু হাসতেন, জবাব বড় দিতেন না। একবার একটা ভালো চাকরিই পেয়েছিলেন। সাহেব কোম্পানী। কিন্তু চার দিন চাকরি করার পর পাঁচ দিনের দিন তাঁকে অনেক কষ্টে থানা থেকে ছাড়িয়ে আনতে হয়েছিল। তাঁকে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে আপিসে আসতে দেখে এক সাহেব অপমানকর কিছু বলে বসেছিল। আর তার ফলে গৌরবিমল তাঁকে ধরে দুই-একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বসেছিলেন। আপিসের অন্য বাঙালী সাহেবরাই গৌরবিমলকে থানায় চালান করে সাহেবদের কোপ থেকে নিজেদের রক্ষা করেছিলেন।

যাই হোক, চাকরি থাক আর না থাক, এ বাড়ি ছাড়া হয়নি। যাবার কথা তুললে বাড়ির কর্তার কাছে উল্টে দাবড়ানি খেতে হয়েছে। কর্তা আগেই জানতেন তলায় তলায় স্বদেশীর দিকে ঝোঁক শ্যালকটির। গোড়ায় গোড়ায় দুই-একবার সতর্কও করেছেন তাঁকে, ছেলে দুটোর মাথা বিগড়ে দিও না, সাবধান।

ছেলে দুটো বলতে শিবেশ্বর আর কালীনাথ। গৌরবিমল একদিন হেসে জবাব দিয়েছিলেন, ওরাই না আমার মাথা বিগড়ে দেয়।

ওই কটাক্ষ যে শুধু শিবুর প্রসঙ্গে, কর্তার তাতে একটুও সন্দেহ ছিল না। কালীর নাম গৌরবে যুক্ত হয়েছে। কিন্তু একটুও রাগ করেননি তিনি। ছেলের হাবভাব মতিগতি যদি গৌরবিমলের মত হত, তাহলে বোধ হয় খুশিই হতেন তিনি।

ছেলে তাঁর চোখের ওপর মস্ত কৃতী হয়ে উঠছে। আই-এতে প্রথম হয়েছে, বি-এতেও প্রথম শ্রেণীর প্রথম। এম-এ পড়ছে। গর্ব করার মতই ছেলে। কিন্তু দিনকে দিন ছেলের দম্ভ দেখে তাঁর গর্ব ঘুচে গেছে। সদা সন্দিগ্ধ, সদা বিরক্ত—তার মা কিছু বললেও পাঁচটা প্রশ্ন করে সত্যি-মিথ্যে যাচাই করতে চায়। শুধু বাপের মুখের দিকে চেয়েই কথা বলাটা রপ্ত হয়নি এখনো।

সুরেশ্বরের মনে হয়েছিল, শিগ্‌গীর তাও হয়ত হবে। ফলে মুখ ফিরিয়ে থাকতেই চেষ্টা করেছেন তিনি। কিন্তু সব সময় তাও সম্ভব হত না।

ছেলের আর সেই সঙ্গে ছেলের মায়েরও সব থেকে বেশি গর্বের ধন ছিল কতগুলো মেডেল আর সার্টিফিকেট। মায়ের অন্তত সার্টিফিকেটের মর্ম বোঝার কথা

নয়, ছেলেই তাঁকে বুঝিয়ে থাকবে। লেখা-পড়া অথবা মৌলিক চিন্তার ব্যাপারে কেউ যে ছেলের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না, ওগুলো তারই নিদর্শন। তার বিশেষ বিশেষ রচনা প্রসঙ্গে বড় বড় লোকের উক্তি, এমন কি দুই-একজন বিদেশী পণ্ডিতের আলোচনাও সেই সব প্রশংসাপত্রের মধ্যে সযত্নে জায়গা পেয়েছে। বাড়িতে সমঝদার কেউ এলেই ঘুরেফিরে সেই সব মানপত্র এসে পড়ত। মেডেল সার্টিফিকেট দেখানো হত। ছেলের এই রোগটা বেশ কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করছিলেন কর্তা।

ছেলের রোগ তবু বরদাস্ত করা যেত, ছেলের মায়ের এই রোগ অসহ্য।

বাড়িতে একবার দুটি শোকাতুরা মহিলা এসেছিলেন। কিছুকাল আগে তাঁদের পরিবারে একটা বড় রকমের দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। অনেকদিনের চেনা-জানা, সুরেশ্বর না ডাকতেই এগিয়ে গেছলেন তখন। যথাসাধ্য করেও ছিলেন। সেই কৃতজ্ঞতায় আসা। কিন্তু বিষণ্ন তখনো।

সুরেশ্বর জানতেন না কিছু। হঠাৎ একটা ঘরে ঢুকে দেখেন, গৌরবিমল আর কালী হাসাহাসি করছে কি নিয়ে। তাঁর পদার্পণের ফলে হাসি গোপনের চেষ্টাও লক্ষ্য করলেন। পাশের ঘরে উঁকি দিতে ব্যাপার বোঝা গেল। স্ত্রীটি ছেলের মেডেল সার্টিফিকেট প্রশংসাপত্র সব বার করে বসেছেন। দেখাচ্ছেন, সাতখানা করে সেসবের মর্ম বোঝাচ্ছেন। একটার সঙ্গে আর একটা জুড়ে কি যে বলছেন নিজেও ভালো জানেন না। রমণী দুটি নিছক সৌজন্যের খাতিরে যা দেখানো হচ্ছে দেখছেন এবং যা বলা হচ্ছে শুনছেন।

এঁদের একজন নামকরা বিদ্বান লোকের স্ত্রী। সুরেশ্বর নিঃসংশয়, সেই কারণেই ওগুলো বেরিয়েছে। অতিথিদের শোকের ব্যাপারটা ছেলের গুণমুগ্ধ মায়ের মনে আছে কিনা সন্দেহ। আর বাড়ি ফিরে ছেলেও হয়ত অমন বিদ্বান লোকের স্ত্রীকে মেডেল সার্টিফিকেট দেখানো হয়েছে শুনে খুশি হবে।

এর দিনকতক বাদে বাড়িতে ছোটখাটো একটা চুরি হয়ে গেল। বাড়িতে ঠিক নয়, শিবেশ্বরের ঘরে। জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড ওলটপালট। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল চুরি কিছুই যায়নি, এক মেডেল সার্টিফিকেট আর প্রশংসাপত্রগুলি ছাড়া। মা আর ছেলের কাছে কোনো বড় চুরির থেকে কম নয় এটা। মা সক্ষোভে ছেলেকেই দুষলেন, যত রাজ্যের বিদ্বান বন্ধুদের সরাসরি ঘরে এনে ঢোকাস, এ নিশ্চয় তাদের কারো কাজ—হিংসায় জ্বলছে সব, তাই সরিয়েছে।

শিবেশ্বরের সেই হিংস্র মূর্তি দেখে শুধু কালীদা নয়, মামু, অর্থাৎ গৌরবিমলও শঙ্কিত। শিবেশ্বরের বুদ্ধিও তাঁর মায়ের মতই একথা কেউ বলবে না। রাগে রক্তবর্ণ হয়ে কালীনাথকেই চোরের দায়ে ধরা হল প্রথম। এ ধরনের দুর্বুদ্ধি তাঁর মাথাতেই

আসা সম্ভব। কিন্তু তা বলে এত দুঃসাহস শিবেশ্বর কল্পনা করতে পারেন না।

—কোথায় রেখেছ সব? ভালো চাও তো বার করে দাও।

কালীনাথ আকাশ থেকে পড়লেন। ফলে শিবেশ্বরের রাগ দ্বিগুণ বাড়ল। তাঁর ঘরে এসে কালীনাথের বিছানা মাটিতে ফেলে দিয়ে, বাক্স-প্যাঁটরা থেকে সব বার করে ছড়িয়ে একাকার করলেন। হাতে পড়ল কালো চামড়ায় মোড়া একটা মোটা বড়সড় নোটবই। সকলেই জানেন কালীদার ওটা শখের বস্তু। লেখার মত কিছু পেলেই ওতে লিখে রাখার অভ্যাস তাঁর। অনেক মজার ঘটনা লেখা আছে, বড় বড় লোকের অনেক স্মরণীয় উক্তি টোকা আছে, ভালো ভালো কবিতার লাইন আছে। আর ইদানীংকালের নিজের লেখা দুই একটা গোপনীয় চিঠির নকলও আছে—যার খবর একমাত্র শিবেশ্বরই রাখেন। কাগজপত্র মেডেল না পেয়ে অন্ধ আক্রোশে শিবেশ্বর সেই বাঁধানো নোটবইটাই পায়ে চেপে ধরে টেনে ছিঁড়ে কুটিপাটি করলেন।

কালীনাথ ধ্বংসকার্য সমাধা হতে দেখলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, ওটা ছিঁড়লি কেন?

শিবেশ্বর ফুঁসে উঠলেন, বেশ করেছি ছিঁড়েছি, কি করবে তুমি?

কেন বেশ করবি, এই বাড়িতে থাকি বলে?

শোনার সঙ্গে সঙ্গে শিবেশ্বরের মনে হয়েছে ভুল হয়েছে। খানিক গুম হয়ে থেকে বলে উঠেছেন, তা হলে গেল কোথায়?

কালীনাথ রাগ সামলেছিলেন অন্য কারণে। এই ভাইটির সঙ্গে তাঁর তখন জীবনের এক নিগূঢ় ব্যাপার নিয়ে শলপরামর্শ চলছে। অতএব চেষ্টা করে মাথা ঠাণ্ডাই রাখলেন তিনি। একটু ভেবে বললেন, মামুকে জিজ্ঞাসা করে দেখেছিস?

শিবেশ্বরের রক্ত মাথায় উঠল আবার। এত কাণ্ডর মধ্যে এই একজন গা-ঢাকা দিয়ে আছে বটে। দাঁতে দাঁত ঘষে বলে উঠলেন, নিয়ে থাকলে আজ তাকে ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বার করে ছাড়ব।

নিঃশব্দে সব দেখছিলেন আর সব শুনছিলেন আর একজন। বাড়ির কর্তা স্বয়ং। শেষের এই উক্তিও শুনলেন। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে তিনি।

তাঁর দিকে চেয়ে শিবেশ্বর হতভম্ব। বাবার হাতে সেই কাগজপত্রের গোছা, মেডেল। তাঁরই ইঙ্গিতে শ্যালক গৌরবিমল ঠিক চুরির মত করে ওগুলো সরিয়ে তাঁর হাতে দিয়েছিলেন। লঘু কৌতুক এই সঙ্কটের দিকে গড়াতে পারে ভাবেননি।

সুরেশ্বর ঘরে এসে দাঁড়ালেন। মেডেলগুলো ঝনঝন করে মাটিতে পড়ে গেল। ছেলের সমেনে দাঁড়িয়ে সার্টিফিকেট আর প্রশংসাপত্রগুলো ছিঁড়তে লাগলেন তিনি। সেই কঠিন মূর্তির দিকে চেয়ে কালীনাথও কাঠ। ছেঁড়া কাগজের মতই ওগুলো

হুমড়ে ছেলের মুখের ওপর ছুঁড়ে দিলেন তিনি। নিষ্পলক কঠিন দৃষ্টি।—তুই কার বাড়ি থেকে কাকে তাড়াবি?

ছেলে নির্বাক, পাংশু।

সুরেশ্বর আবার বলেন, আমার বাড়িতে বিদ্যার জায়গা হতে পারে, বিদ্যা নিয়ে অহঙ্কারের জায়গা হবে না।

চলে এসেছেন। এধারের ঘরে এসে দেখেন গৌরবিমল চুপচাপ বসে, শুকনো মুখ। বুঝলেন ছেলের উক্তি কানে গেছে। সরোষে বলে উঠলেন, তুই এভাবে বসে আছিস কেন? ও যা বলেছে, সেটা তোর থেকেও আমার বুকে চারগুণ বেশি লেগেছে তাও কি তোকে বোঝাতে হবে?

গৌরবিমল যা কখনো করেন না, নিঃশব্দে সেই গোছের একটা আবেগ প্রকাশ করে ফেললেন হঠাৎ। উঠে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বসলেন। নিজের হাতে ছেলের ওই সার্টিফিকেট আর প্রশংসাপত্র ছেঁড়ার পর এই উক্তি তাঁর মনের কোথায় নাড়া দিয়েছিল তিনিই জানেন।

ছেলের রোগ ওই এক কাণ্ডর পরে সেরে গেল বটে, কিন্তু এরপর থেকে মামুকে আর প্রীতির চোখে দেখা সম্ভব হল না তাঁর পক্ষে। বাবা যে সেই সব সাধের সম্পদ নিজের হাতে সরাননি সেটুকু বোঝার মত বুদ্ধি তাঁর আছে। এমন কি, তারপর থেকে কিরণশশীও এই দূরসম্পর্কের ভাইটিকে খুব সদয় চোখে দেখেননি অনেক দিন পর্যন্ত।

এর পর যাঁর ওপর শাসনের ছুরি উঁচিয়ে দাঁড়াতে দেখা গেছে কর্তাটিকে, সেই নাটকের আপাত-নায়ক কালীনাথ।

শিবেশ্বরের তখন ফিফ্থ্ ইয়ার। আর তিন বছর আগে বি-এ পাশ করে কালীনাথ অ্যাটর্ণীশীপ পড়তে ঢুকে ছিলেন। অ্যাটর্ণীশিপের মাঝের পরীক্ষাতেই কালীনাথ গড়াগড়ি খেয়ে উঠেছেন একদফা। শিবেশ্বরের মত সব পরীক্ষায় প্রথম না হোন, একেবারে ফেল করার মত ছাত্র নন। ফেলের খবর শুনে কর্তা তাই অবাক হয়েছিলেন একটু। শিবেশ্বর তাঁকে বুঝিয়েছেন অ্যাটর্ণীশিপ পাস করা মুখের কথা নয়, শতকরা আশীনব্বুই জনই ফেল করে থাকে।

পরের বারে কালীনাথ কোনরকমে পাস করেছেন বটে, কিন্তু তারপরেই পড়াশুনার সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচে গেছে যেন। কর্তা দুই-একদিন জিজ্ঞাসা করেছেন, কি রে, এখানেই শেষ হল, না ফাইন্যাল পরীক্ষাটা দিবি?

শুধু কর্তা নয়, গৌরবিমলও লক্ষ্য করেছেন, পড়াশুনার আগ্রহ বাড়ির রক্ত-

ছেলেটির‌ও একটু কমেছে। শিবেশ্বরের। বাড়িতে ছাত্র বলতে এই দুজনই। ফাঁক পেলেই দুজনের মধ্যে ফিস-ফিস আলোচনা হয়, কি পরামর্শ হয়।

আসল ব্যাপার কালীনাথ প্রেমে পড়েছিলেন। প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন বলা যেতে পারে।

সদা-রসিক মানুষটা ভিতরে ভিতরে এত যে আবেগপ্রবণ, শিবেশ্বরের ধারণা ছিল না। ব্যাপারটা অনেকদিন পর্যন্ত তাঁর কাছেও গোপন ছিল। কালীনাথ ধরা পড়েছেন মৈত্রেয়ীর একখানা চিঠি সেই নোটবই থেকে খসে তাঁর হাতে পড়তে। নোটবইয়ে টোকা তারিখ-সহ কালীদার লেখা চিঠির বয়ানও তখনি দেখেছেন।

শিবেশ্বরের হাতে ধরা পড়ে কালীনাথ বেঁচেছিলেন বোধ হয়। অনেক দিনের পুঞ্জীভূত উচ্ছ্বাস আর আশঙ্কা মুক্তির পথ পেয়েছিল।

নাম কি ? শিবেশ্বরেরই জ্যেষ্ঠের ভূমিকা।

মৈত্রেয়ী, সকলে মিত্রা বলে ডাকে।

মৈত্রেয়ী কি ?

মজুমদার। সাগ্রহে যোগ করেছেন কালীনাথ, বামুন······মজুমদার টাইটেল।

ঠোঁট উল্টে শিবেশ্বর মন্তব্য করেছেন, বামুন না হলেই বা কি, কি পাস ?

কালীনাথের মুখ ঈষৎ নিষ্প্রভ।—ম্যাট্রিক পাস করে আই-এ পড়ছিল। হঠাৎ চাকরি পেয়ে গিয়ে চাকরি করতে লাগল। ভদ্রলোকের অনেকগুলো মেয়ে তো···।

বয়েস কত ?

এই উনিশটাক হবে এখন, বছরখানেক হল চাকরিতে ঢুকেছে।

দেখতে কেমন ?

কালীনাথের মুখে খুশির আভাস, আগ্রহেরও।—তুই দেখবি ?

দেখব। দেখতে কেমন বলো।

মন্দ নয় বোধ হয়। অনেকই তো বিয়ে করতে চায়, আপিসেও দুই-একজন ভক্ত জুটেছে।

তোমার সঙ্গে আলাপ কদিনের ? কি করে পরিচয় হল ?

তিন বছর আগের।······প্রথম খেলার মাঠে দেখেছিলাম। আমাদের সঙ্গে বি. এ পড়ত ভূপতি মজুমদার, তার বোন। দাদার সঙ্গে খেলা দেখতে এসেছিল।

মেয়েদের খেলা দেখাটা তখনো এতটা চালু হয়নি। অতএব শিবেশ্বরের পরের প্রশ্ন, বেশ খেলোয়াড় মেয়ে বুঝি ?

কালীনাথ শঙ্কিত।—না রে, খুব হাসিখুশি মিষ্টি মেয়ে, আজই চল্ না, আলাপ করিয়ে দিই।

সেইদিনই আলাপ হয়েছে। ভাইকে কালীনাথ য়ুনিভার্সিটির অমূল্য রত্ন হিসেবেই পরিচয় করিয়েছেন। তারপর শিবেশ্বরের খরচায় রেস্টুরেণ্টে বসে এক-সঙ্গে খাওয়া হয়েছে তিনজনের, তারপর সিনেমা দেখা হয়েছে, তারপর মৈত্রেয়ীকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে নিজেদের ফেরা হয়েছে।

মরুসাগরে আশার জল দেখেছিলেন কালীনাথ। ফেরার সময় আর একজনকে চুপচাপ দেখে প্রতীক্ষা পীড়াদায়ক হয়েছে।—কি রে, কি-রকম মনে হল?

মন্দ নয়। এখন তুমি কি করবে?

কি করি বল্ তো, আমার তো কিছু আর ভালো লাগছে না।

বিয়ে করে ফেলো। শিবেশ্বরের নির্লিপ্ত পরামর্শ।

বলিস কি, অ্যাটর্ণীশিপ পাস করার আগে?

যা মাথা তোমার, অ্যাটর্ণীশিপ পাস করে বেরুতে কম করে আরো তিন বছর। রোজগার করতে আরো ক'বছর কে জানে। ততদিন মেয়েটা বসে থাকবে তোমার জন্যে?

কালীনাথ চিন্তিত। বিমর্ষও, কারণ মানুষটা নির্বোধ নয় আদৌ। বললেন, না থাকতেও পারে। কিন্তু কি করব তাহলে?

বাবাকে বলো।

আঁতকে উঠলেন কালীনাথ।—খড়ম নিয়ে তাড়া করবে না?

করে করবে। অত যদি ভয় তো ছেড়ে দাও, আমিই চেষ্টাচরিত্র করে দেখি বিয়েটা করে ফেলতে পারি কিনা।

ঠাট্টা কি না বুঝতে না পেরে কালীনাথের ভিতরটা ছাঁত করে উঠেছিল। কারণ, এই ভাইটির রসজ্ঞানের উপর কোনদিনও আস্থা নেই তাঁর। তবু হেসেই বলেছিলেন, ইয়ারকি হচ্ছে বুঝি, তুই তো মাত্র বছর তিনেকের বড় ওর থেকে···

তুমি মাত্র চার বছরের। প্রেমে পড়লে মাথা এইরকমই ভোঁতা হয় ভাবলেন শিবেশ্বর। বললেন, আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি না, তোমার ভয় নেই। দিনকতক সবুর করো, তুমি না পারো মা-কে দিয়ে আমি কিছু করাতে পারি কিনা দেখি।

সবুর করতে করতে বেশ কিছুদিন কেটে গেল। মা-কে জানানোর কথা উঠলেই কালীনাথ বাধা দেন। সমঝদার সমর্থক পেয়ে তাঁর বল-ভরসা কিছু অবশ্য বেড়েছে। কিন্তু সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব তোলার দুঃসাহস নেই। এদিকে তিনজনের দেখাসাক্ষাৎ ঘন হতে লাগল, রেস্টুরেণ্টে খাওয়া আর সিনেমা দেখাও বাড়তে লাগল। আর বাড়ির পরামর্শ দ্রুত জমাট বাঁধতে লাগল। আলাপ পরিচয় ঘনিষ্ঠ হতে শিবেশ্বরেরও নির্লিপ্ত ভাব কমে এলো, মেয়েটাকে যে ছেড়ে

দেওয়া যেতে পারে না সে-সম্বন্ধে কালীদার সঙ্গে একমত হতে সময় লাগল না তাঁর।

কিন্তু দুটি বুদ্ধিমান মাথা একত্র হওয়া সত্ত্বেও সমস্তার সমাধানের দিকে এগনো গেল না। সমস্তা বাড়ির কর্তা।

সমাধান একদিন আপনিই হয়ে গেল।

ট্যাক্সিতে বেড়িয়ে মৈত্রেয়ীকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে তখনকার মত খুশি মনে দুজনে বাড়ি ফিরেছেন। ট্যাক্সি বাড়ির অনেক আগেই ছেড়ে দিয়ে বাকি পথ হেঁটে এসেছেন। কিন্তু আসার সঙ্গে সঙ্গে নির্মেঘ আকাশ থেকে সরাসরি মাথার ওপর বাজ পড়ল।

কর্তা বাইরের ঘরে বসেছিলেন। ডাকলেন দুজনকে, এদিকে এসো।

কিছু না বুঝেই সামনে হাজির তাঁরা।

মেয়েটি কে ?

হতচকিত দুজনেই।

খুব ধীর ঠাণ্ডা মুখে সুরেশ্বর আবার বললেন, আমি ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাসে যাচ্ছিলাম, তোমরা ট্যাক্সিতে—কে মেয়েটি ?

শুকনো জিভে করে শুকনো ঠোঁট ঘষতে লাগলেন কালীনাথ, বুকের ভিতরে ঠক-ঠক কাঁপুনি। শিবেশ্বরেরও জলতৃষ্ণায় গলা কাঠ।

জবাব না পেয়ে কর্তার সহিষ্ণুতায় চিড় খাওয়ার উপক্রম। কালীনাথের চোখে চোখ।—তোমার নামে তিন দিন আগে একটা বে-নামী চিঠি পেয়েছি আমি, এক মেয়ের সম্পর্কে লিখেছে। এ সেই মেয়ে ?

ত্রাসের ওপর ত্রাস। মাথা নেড়েছেন কি না কালীনাথ জানেন না।

কে মেয়েটি ?

এবারে মুখব্যাদান করতে হল। কে মেয়ে, কি নাম, কার মেয়ে, কি করে—সব একে একে প্রশ্ন করে জেনে নিলেন তিনি। সাহস পেয়ে শিবেশ্বর মেয়েটির অনুকূলে একবার একটু রং চড়াতে চেষ্টা করেছিলেন। কঠিন মুখ করে সুরেশ্বর তাঁকে থামিয়ে দিয়েছেন, তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করা হয়নি।

বাংলা দেশে লীগ মন্ত্রিত্বের নয়া মৌসুমে বহু মেয়ে তখন আপিসে-কাছারিতে চাকরি করছে। প্রণয়-প্রগতির নতুন হাওয়া উঠেছে। বড় বড় শিল্পপতি আর প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন নামের সঙ্গে নানা রঙের প্রণয় সংবাদ যুক্ত হয়ে সস্তার কাগজে ছাপা হচ্ছে—লোকে পরম আগ্রহে পড়ছে সে-সব। অন্যদিকে ধর্ম ডুবছে, ধর্মের আড়ম্বর বাড়ছে। সুরেশ্বর দেখেন সব, শোনেন সব, মুখে কিছু বলেন না। তাঁর মতে সমাজের বিকৃতির যুগ সেটা। এর মধ্যে এই সব চাকরি করা মেয়েদের কি চোখে

দেখেন তিনি, জানলে কালীনাথ এই প্রেমের ব্যাপারে পা বাড়াতেন কিনা সন্দেহ। তার ওপর বে-নামী চিঠি আসে যে মেয়ের নামে।

কিন্তু মনোভাব বুঝতে দিলেন না সুরেশ্বর। সংযত কঠিন।—তাহলে কি করা হবে এখন ঠিক করেছ, বিয়ে?

নিরুত্তর। প্রমাদ গুনছেন।

সুরেশ্বর গর্জে উঠলেন এবারে।—আমি জবাব শুনতে চাই, কি করা হবে এখন?

আজ্ঞে অ্যাটর্ণীশিপ পাস করার পর······

পাস করার পর যে চুলোয় খুশি যাও, এখন মোটরে হাওয়া খেয়ে বেড়ানো হচ্ছে কেন? পাজী হতভাগা কোথাকার, তোকে আমি চাবকে লাল করব—খাওয়া-পরার ব্যবস্থা নেই, দাঁড়াবার ঠাঁই নেই, পরীক্ষায় ফেল করে এখন এই করে বেড়াচ্ছিস তুই! যা দূর হ, দূর হ আমার চোখের সমুখ থেকে—ওই মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হলে এ-বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়তে হবে, এ-যেন মনে থাকে।

নিজের ঘরে এসে অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসে ছিলেন কালীনাথ। শিবেশ্বর সামনে ঘুরঘুর করে কি সান্ত্বনা দেওয়া যেতে পারে ভেবে না পেয়ে সরেই গেছেন। বাবা এরপর তাঁকেই ধরবেন কিনা সে সম্বন্ধেও নিশ্চিন্ত নন একেবারে।

অভিমানের প্রাথমিক পর্যায়ে এ-বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়াই স্থির করেছিলেন কালীনাথ। যা-হোক একটা চাকরি জোটাতে চেষ্টা করবেন প্রথম, সামান্য অবস্থা দেখে মৈত্রেয়ী তাঁর সঙ্গে ঘর বাঁধতে রাজি যদি না-ও হয়, তবু এ-বাড়ির গলগ্রহ হয়ে আর থাকবেন না। কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুভবুদ্ধি উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল।···বি-এ এম-এ'র ছড়াছড়ি চারদিকে, কাজ জোটানো সহজ নয় খুব। অ্যাটর্ণীশিপ পরীক্ষাও শিকেয় উঠবে তাহলে। সব থেকে বড় কথা, যে-মানুষটির হাতে এই হেনস্থা, তাঁর যে তিরস্কার করার অধিকার আছে সেটাই তিনি অস্বীকার করতে পারলেন না। বলতে গেলে পথের থেকে কুড়িয়ে তাঁকে আশ্রয় দিয়েছেন, পয়সা খরচ করে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন। নিজের জলপানি পাওয়া ছেলের জন্য একটি পয়সাও খরচ নেই, কিন্তু তাঁর জন্যে আছে। তাছাড়া, নিজের ছেলের সঙ্গে কোনদিন তাঁকে তফাৎ করে দেখেননি যে মানুষ, তাঁকে অসম্মান করার মত অকৃতজ্ঞ তিনি হবেন কি করে?

পরদিন চুপি চুপি শিবেশ্বরকে জানালেন, বুঝিয়েসুঝিয়ে মিত্রাকে অপেক্ষা করার কথা বলতে হবে, পাস করার আগে বিয়ে করতে চাইলে লোকে পাগল বলবেই তো···।

তা না-হয় হল, শিবেশ্বরের সন্দিগ্ধ মনে অন্য চিন্তা, কিন্তু বাবা কি সত্যিই কাল আমাদের ট্যাক্সিতে দেখেছেন ?

না দেখলে বলবেন কি করে ?

মামু যদি দেখে থাকে, মামু যদি বলে দিয়ে থাকে ? সে তো সর্বদাই রাস্তায় টো-টো করে বেড়াচ্ছে। বাবার চোখে পড়ল কি করে…!

সন্দেহটা শিবেশ্বরের মাথা থেকে কালীনাথের মাথায় চালান হয়ে গেল। তিনি ভাবলেন শুধু, মুখে কিছু বিরূপ মন্তব্য করলেন না। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে শিবেশ্বরকে আবার জানালেন, মিত্রার সঙ্গে কথা হল, সে অপেক্ষা করতে রাজি হয়েছে, পাস করার পরেই বিয়ে হবে।

এরপর পড়াশুনায় ভয়ানক মনোযোগী হয়ে পড়লেন কালীনাথ।

ওই প্রথম প্রেমিকাটি কথা রাখতে পারলে ভবিষ্যতে কি হত বলা যায় না। কিন্তু সে সমস্যা আসেনি। দু' মাস না যেতে শুকনো বিবর্ণমুখে কালীনাথ শিবেশ্বরকে জানিয়েছেন, মৈত্রেয়ীর বিয়ে হয়ে গেল, পয়সাঅলা লোকের ছেলের সঙ্গে…।

শিবেশ্বর সচকিত।—সে কি! সেদিনও তো হঠাৎ তার সঙ্গে রাস্তায় দেখা আমার, কিছু বলেনি তো! বিয়ে হয়েই গেল একেবারে? অপেক্ষা করবে বলেছিল যে ?

সে-কথার জবাব না দিয়ে কালীনাথ বললেন, ছেলেটা ব্রাহ্মণ নয়, কি চন্দ শুনলাম…পয়সার জোরেই হয়ে গেল বোধ হয়।

খানিক চুপ করে থেকে শিবেশ্বর একসময় নিজের মত প্রকাশ করলেন। দেখো, মৈত্রেয়ী তোমাকে অপছন্দ করত না সেটা ঠিক, কিন্তু তুমি রাজি হলেও বিয়ে করত কিনা আমার বরাবর সন্দেহ ছিল।

কালীনাথ তর্ক করলেন না। সে সংশয় তাঁর নিজেরও ছিল না এমন নয়। কিন্তু সেটাই সত্যি বলে মেনে নিতে পারেননি, বা মেনে নিতে চেষ্টাও করেননি। আসল কথা, নতুন বয়সে নিজে তিনি একটি মেয়েকে ভাল বেসেছিলেন। জীবনের প্রথম প্রেমে বিহ্বল হয়ে অনেকগুলি দিন স্বপ্ন দেখে কাটিয়ে দিয়েছিলেন। সেই প্রথম প্রেম ব্যর্থ হয়েছে। তাঁর বুকের তলায় একটা ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। সেই ক্ষত থেকে নিঃসাড়ে রক্ত ঝরেছে।

আর সেই ক্ষতের জন্য মনে মনে একজনকেই দায়ী করেছেন তিনি। বাড়ির কর্তা সুরেশ্বর চাটুজ্জেকে।…

বছর দেড়েকের মধ্যে শিবেশ্বরের এম-এ পরীক্ষা হয়ে গেল। কেমন দিলেন বা ফল কি-রকম হবে তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি। অর্থনীতির এ-রকম ছাত্র

বিশ্ববিদ্যালয়ে খুব বেশি আসেনি বলে প্রোফেসারদেরও ধারণা। অতএব, তাঁর ফলাফল নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই কারো।

শিবেশ্বরের নিজেরও না। এরপর কমপিটিটিভ পরীক্ষা দেবেন কি স্কলারশিপ যোগাড় করে বাইরে যেতে চেষ্টা করবেন, সেই চিন্তা করছিলেন তিনি। সুরেশ্বরের মতামত চাওয়া হয়নি, সরাসরি মতামত দেনওনি কিছু। কিন্তু ছেলের বাইরে যাওয়াটা যে পছন্দ নয়, সেটা বোঝা গেছে গৌরবিমলের সঙ্গে কথাবার্তায়। নির্লিপ্ত মন্তব্য করেছেন, অত কি দরকার, কলেজে-টলেজে চেষ্টা করলেই তো হয়।

কিন্তু সকল চেষ্টায় ছেদ পড়ে গেল অচিরে। কারণ অদৃশ্য বিধাতাটি তখন এ-বাড়ির দিনগত তরণীর হাল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এক স্রোতের মুখে ফেরাবার জটিল শিল্প-রচনায় মগ্ন ছিলেন। এবারের নাটকের নায়ক কালীনাথ নয় স্বয়ং শিবেশ্বর। কালীনাথের এই নাটকে দ্রষ্টার ভূমিকা। কিন্তু সূচনায় নায়কটিকে তিনিই যে মঞ্চের দিকে ঠেলে দিয়েছেন, তাতে কোনো ভুল নেই। সেটা গোচরে করেছেন কি অগোচরে সে-ও একমাত্র তিনিই জানেন।

পরীক্ষার পর শিবেশ্বরের যত অখণ্ড অবকাশ, কালীনাথের ততো নয়। কিন্তু শিবেশ্বরের তা মনে থাকত না। ঘরে এসে যখন-তখন গল্প ফেঁদে বসতেন। ফাঁক পেলে সিনেমা থিয়েটারে টেনে নিয়ে যেতেন তাঁকে, ঘন ঘন ইংরেজি ছবি দেখতেন, ছবির চোখে-লাগা ইন্দুদুহিতাদের প্রতি তাঁর ঔৎসুক্য গোপন থাকত না। যৌবনের প্রচ্ছন্ন দিক ঘেঁষে আলোচনার উৎসাহ দেখা যেত। পরিবর্তনটা কালীনাথ লক্ষ্য করলেন। শিবেশ্বর একদিন তাঁকে বলেছিলেন, তোমার সেই মৈত্রেয়ীর খবর কি? ···দেখতেশুনতে মন্দ ছিল না মেয়েটা। চলো না একদিন গিয়ে হাজির হই দু'জনে, কোথায় থাকে এখন জানো?

কোন্ নরম জায়গায় ঘা পড়েছে, পুরনো ক্ষতের ওপর কতটা আঁচড় পড়েছে, সে শুধু কালীনাথই জানেন। তাঁকে দেখলে বোঝাও যাবে না তাঁর প্রথম স্বপ্নের আঙিনায় কোনো দিন কোনো মেয়ে বিচরণ করেছে। হাসিখুশি কথাবার্তায় উল্টে মনে হবে জীবনের একটা ছেলেমানুষির অধ্যায় খুব সহজে পার হয়ে এসেছেন। শিবেশ্বরের এই ইচ্ছের কথা শুনেও হেসেছিলেন তিনি। জবাব দিয়েছেন, সেই চন্দ ভদ্রলোক এক নম্বরের গুণ্ডা শুনেছি, ঠেঙাতে এলে কি করবি?

শিবেশ্বরের কৌতূহল তক্ষুণি অন্যদিকে ঘুরেছে।—ওরকম গুণ্ডার সঙ্গে মৈত্রেয়ীর বনিবনা হচ্ছে কি করে তাহলে?

কালীনাথ টিপ্পনী কেটেছেন, অনেক মেয়ের আবার তোর মত স্কলারের থেকে গুণ্ডা বেশি পছন্দ।

শিবেশ্বর মনে মনে জবাবের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন খানিকক্ষণ ধরে।

সে জায়গায় না হোক, কালীনাথ একদিন তাঁকে আর এক অপ্রত্যাশিত জায়গায় এনে হাজির করলেন। ছুটির দিন, বিকেলের শো-এ সেদিনও কি একটা ছবি দেখার কথা ছিল দুজনের। আগে বেরুতে হয়েছিল, কারণ কালীনাথ মাঝে কোথায় দেখা করে তারপর যাবেন।

ট্রাম থেকে নেমে বিশ-তিরিশ গজ হেঁটে এক অচেনা বাড়িতে পদার্পণ। নীচের ঘরে তাঁকে বসতে বলে সিঁড়ি টপকে উপরে গেলেন কালীনাথ। পাঁচ-সাত মিনিট অপেক্ষা করার পরেই শিবেশ্বরের বিরক্তি ধরেছে। হঠাৎ চমকে ফিরে তাকালেন তিনি। কানে লেগে থাকার মতই মিষ্টি গলা।

আপনাকে ওপরে আসতে বললেন।

জ্যোতিরাণীর সঙ্গে সেই প্রথম দেখা শিবেশ্বরের। কোনো প্রথম দেখা এক নিমেষে সমগ্র চেতনায় এমন বিপুল বিভ্রম ঘটাতে পারে, শিবেশ্বরের ধারণা ছিল না। সেই দেখা চোখের ভিতর দিয়ে সমস্ত শিরা-উপশিরায় ছড়িয়ে পড়তে লাগল। স্থান-কাল ভুল হয়ে গেল।

কালীদা আপনাকে ওপরে আসতে বললেন।

পুনরুক্তি শুনে চোখের ঘোর কাটিয়ে তুলতে চেষ্টা করলেন শিবেশ্বর। করেও বোকার মত জিজ্ঞাসা করলেন, কালীদা কোথায়?

ওপরে।

সতের বছরের জ্যোতিরাণী আগে আগে চললেন, পিছনে শিবেশ্বর। সিঁড়ি ধরে জ্যোতিরাণী আগে আগে উঠতে লাগলেন, পিছনে শিবেশ্বর সশরীরে স্বর্গারোহণ করছেন কিনা জানেন না।···পিঠের ওপরে একরাশ খোলা চুল কোমর ছাড়িয়ে দুপাশে নড়া-চড়া করছে। পরনে আটপৌরে চাঁপা রঙের শাড়ি। শাড়ির রং-এ গায়ের রং-এ মিলেমিশে একাকার। পুষ্ট গড়ন। সিঁড়ি দিয়ে উঠছে, শিবেশ্বরের মনে হচ্ছে গোটা সিঁড়িটাই দুলছে চোখের সামনে।

স্বর্গারোহণ শেষ। শিবেশ্বর দাঁড়িয়ে পড়লেন।

আসুন। সতের বছরের জ্যোতিরাণী আবার থেমেছেন, আবার ফিরেছেন, নিবিড়-কালো দুই চোখের তারা মুখের ওপর আর একবার আটকেছে, আবার তাঁকে ডেকে নিয়ে ঘরের দিকে এগিয়েছেন। অপরিচিতের বুকের তলায় কি কাণ্ড বেধেছে কোনো ধারণা নেই। দেড় দুই বছর হল পুরুষ-চোখের অনেক রকমের অদ্ভুত তন্ময়তা চোখে পড়ছে বটে জ্যোতিরাণীর, কিন্তু কালীদার আত্মীয়কে ডাকতে এসে কিছুই লক্ষ্য করেননি। তাঁকে ডেকে আনতে বলা হয়েছে, ডেকে নিয়ে চলেছেন।

॥ এগারো ॥

এক দার্শনিকের মতে সাহিত্য-কলার প্রচ্ছন্ন কাব্য-সম্ভারের দিকটার নাম রোমান্স। দ্বিতীয় দার্শনিকের মন্তব্য, হৃদয়ের খবর যদি জানতে, হৃদয়ের প্রতিটি কুড়েঘরেও রোমান্সের প্রাসাদ দেখতে পেতে। দুজনকেই নাকচ করেছেন তৃতীয় দার্শনিক, সাদামাটা এই বাস্তব দুনিয়ায় তাকেই তুমি রোমান্টিক বলতে পারো জীবনে যে কখনো কোনো সূক্ষ্ম অনাবিল কর্ম সম্পন্ন করেছে অথবা কোনো সূক্ষ্ম অনাবিল সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়েছে।

শিবেশ্বরের সাহিত্যকলার সঙ্গে যোগ নেই, হৃদয়ের খবর তিনি রাখেন না, সূক্ষ্ম সুচারু কাজও কিছু করেননি। কিন্তু শেষের সংজ্ঞার শেষটুকু ধরে তাঁকেও ওই আবেগের অধিকারী বলা যেতে পারে। এক সপ্তদশীর সুচারু সৌন্দর্য দেখে শুধু মুগ্ধ নয়, তিনি বিহ্বল হয়েছিলেন!

ঘরের মেঝেয় মাদুর পাতা। সেখানে জনাকতক অপরিচিত এবং একজন অপরিচিতার মাঝে কালীদা জমিয়ে বসে আছেন। অচেনা মহিলাটি বিধবা। শিবেশ্বরের নির্ভুল অনুমান, যে-মেয়ে তাঁকে ওপরে ডেকে নিয়ে এলো ইনি তার মা। বাকি তিনজন তার কাছাকাছি বয়সের। কালীদার পাশে মাদুরাসন নেবার পর এদের মধ্যে একখানা মুখ চেনা-চেনা লাগল। কালীদার সহপাঠী, বাড়িতে এক-আধ দিন দেখে থাকবেন।

কালীদা ওদিকের পরিচয়-পর্ব সম্পন্ন করলেন আগে,ইনি মাসিমা,আর এঁরা সব আমার বন্ধু ভক্ত অ্যাণ্ড শাকরেদ। আমার আর মামুর এটা ঘর-বাড়ি বলতে পারো।

মাসিমা মৃদু হেসে টিপ্পনী কাটলেন, এমন ঘর-বাড়ি যে আজকাল এদিক মাড়ায়ও না।

অভিযোগ কানে না তুলে কালীদা ফলাও করে শিবেশ্বরের পরিচয় দিলেন। মৈত্রেয়ীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার সময়ে স্তুতির যে প্রচ্ছন্ন তাগিদ ছিল এখানে তা নেই। অতএব, এ পরিচয় রসযুক্ত হল। য়ুনিভার্সিটিতে বরাবর প্রথম হয় বলাটা কিছু নয়, প্রথম আর দ্বিতীয়ের ফাঁক দিয়ে অনায়াসে একখানা আস্ত জাহাজ চলে যেতে পারে বললেন। উপসংহারে মন্তব্য করলেন, পাছে ভালো ছেলে করে দেয়, সেই ভয়ে ওর সঙ্গে মন খুলে আমি মিশতে পারি না পর্যন্ত।

সকলে হাসতে লাগল। মাসিমাটিও হাসিমুখে তাঁকে লক্ষ্য করলেন। যে

একজন উপস্থিত থাকলে কালীদার বলাটা ষোলকলায় সার্থক হত, ঘরে শুধু তাকেই দেখলেন না শিবেশ্বর। ঘর দেখিয়ে দিয়ে সে অন্যত্র সরে গেছে।

কিন্তু অচিরে এই পরিতাপ থাকল না। এক হাতে গোটাকতক ডিশ, অন্য হাতে গোটাকতক পেয়ালা ঝুলিয়ে তাকে ঘরে ঢুকতে দেখা গেল। আর পিছনে অপেক্ষাকৃত ছোট মেয়ের হাতে কেটলি একটা।

কালীদাও যেন তারই অপেক্ষায় ছিলেন। বলে উঠলেন, এই যে, ইনি আমাদের জ্যোতিরাণী—এবারে ফার্স্ট ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাস করে বসে আমার কালো মুখে চুন-কালি মাখিয়েছে। আমি থার্ড ডিভিশন বা তার নীচের ধাপ ফোর-কাস্ট করেছিলাম। পরীক্ষার খাতায় একখানা করে নিজের ফোটো গুঁজে দিয়েছিল কিনা, সাহস করে আর সে-কথাও জিজ্ঞেস করে উঠতে পারিনি।

সঙ্গোপনে চোখ চালিয়ে মুখে সিঁদুরে কারুকার্য দেখলেন শিবেশ্বর। হাত দু-খানা চা ঢালার কাজে তৎপর। কিন্তু কালীদা অব্যাহতি দিলেন না জ্যোতিরাণীকে, আঙুল তুলে চোখ পাকিয়ে শিবেশ্বরকে দেখালেন, এই কে এসেছে চেনো?

জ্যোতিরাণীর থতমত-খাওয়া দৃষ্টিটা শিবেশ্বরের মুখের ওপর উঠল। কালীদার আত্মীয়, এর বেশি কিছু জানা নেই।

কালীদা মেজাজে আছেন। সদর্পে ঘোষণা করলেন, ফার্স্ট ডিভিশন নয়, সবেতে একেবারে ফার্স্ট। তোমার আই-এ পড়ার ইচ্ছে হয়েছে শুনলাম, ও ইচ্ছে করলে আই-এ টপকে তোমাকে একেবারে বি-এ পাস করিয়ে ছেড়ে দিতে পারে।

সকলের আর একপ্রস্থ হাসির ফাঁকে শিবেশ্বরের মুখের ওপর সলজ্জ দুটি কালো তারার চকিত বিচরণ। চা ঢালা শেষ হতেই দ্রুত প্রস্থান।

আর সকলের সঙ্গে শিবেশ্বরও চায়ের পেয়ালা টেনে নিলেন। ওটাই হঠাৎ দুর্লভ সামগ্রী মনে হল তাঁর। টের পেলে কালীদা বলতেন, স্পর্শগুণে চায়ের পেয়ালা কবিতা হয়ে গেছে।

ওঠার আগে মাসি বার-দুই গৌরবিমলের প্রসঙ্গ তুললেন। কালীদাকে বললেন, গৌর আসে না কেন, অবশ্য আসতে বোলো।

গৌরবিমল আবার এক নতুন চাকরিতে মাথা গলিয়েছেন, তাঁর অবকাশ কম। কিন্তু সে-কৈফিয়ৎ না দিয়ে কালীদা গম্ভীরমুখে জবাব দিলেন, গৌরের মতিগতি আজকাল নদীয়ার পথে ছুটেছে, দাঁড়ান ঠেঙিয়ে পাঠাচ্ছি।

ঠিক এই সময় যাকে আর একবার দেখার জন্য দু চোখ উসখুস করছিল শিবেশ্বরের, তাকে দোরগোড়ায় দেখা গেল। মাকে কিছু বলার উদ্দেশে আসা কি চায়ের খালি পেয়ালাগুলো নিয়ে যেতে, বোঝা গেল না। কালীদার ঠাট্টার মুখে

তাকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখলেন শিবেশ্বর। তারপর ভাঙা আসরে না ঢুকে অদৃশ্য হতে দেখলেন।

বাইরে এসে বড় বড় গোটাকতক নিঃশ্বাস নেবার পর অনেকক্ষণের একটা বিভ্রম গেল শিবেশ্বরের। কালীদা ট্রামের উদ্দেশে পা বাড়াতে বাধা দিলেন, সিনেমা ভালো লাগবে না, হাঁটি চলো।

ভিতরটা হাসছে কালীনাথের দেখে বোঝার উপায় নেই। বললেন, না লাগারই কথা। আকাশ বড় নীল, বাতাস বড় মিঠে—

হাঁটা হল। তারপর বসা হল এক জায়গায়।

কালীদা জিজ্ঞেস করলেন, তারপর ?

তারপর তুমি বলো।

কালীদা ভাবলেন একটু।—তারপর বাড়ির কর্তার খড়ম।

শিবেশ্বর রেগে গেলেন।—ওই খড়মের ভয়ে তুমিই কাঁপো, আর কেউ কাঁপে না।

কালীদা এবারে হাসছেন মিটিমিটি।—বিলেতি ছবির নায়িকাদের থেকেও বেশি ভালো লাগল ?

শিবেশ্বর হাসতে লাগলেন।

পর পর দু রাত প্রায় বিনিদ্র কাটাবার পর তাঁর এলোমেলো চিন্তা এক স্পষ্ট সংকল্পের দিকে ঘুরে গেল। এই দু দিনে কালীদার কাছে যতটুকু খবর সংগ্রহ করা গেছে, তাতে বাড়িতে আপত্তি করারও কোনো কারণ নেই। অর্থনীতিতে একটা কথা আছে, তিন গিনি চাও যদি পাঁচ গিনির কাজ করো। শিবেশ্বর সেই বচনের গুণগ্রাহী হয়ে উঠলেন।

তৃতীয় দিন বিকেলে অ্যাটর্নী অফিস থেকে বেরিয়ে কালীনাথ দেখেন, তাঁর প্রতীক্ষায় শিবেশ্বর দাঁড়িয়ে।

বিস্ময়ের ভান না করে মন্তব্যসূচক প্রশ্ন করলেন, মাথাটা গোটাগুটি বিগড়েছে তাহলে ?

শিবেশ্বর মাথা নাড়লেন, বিগড়েছে। কিন্তু রসকসের ধার দিয়ে গেলেন না। বাইরে এসে বললেন, একটা কথার পরিষ্কার জবাব দাও, ওই মেয়েটিকে তোমার বিয়ে করার ইচ্ছে আছে ?

কালীদা চিন্তিত।—যদি বলি আছে, ডুয়েল লড়বি ?

আঃ, যা বলছি জবাব দাও না ?

কালীদা ভ্যাবাচাকা খেলেন।—লোকে প্রেমে পড়লে কাঁদে, সাহায্যের জন্যে হাতে-পায়ে ধরে, তুই যে দেখি চোখ রাঙিয়ে কাজ হাসিল করতে চাস!

অসহিষ্ণুতা না বাড়িয়ে স্পষ্ট জবাবই দিলেন তারপর। প্রথম জবাব, কর্তার ভয়ে ওই ইচ্ছের রোগ তাঁর সেরে গেছে। দ্বিতীয় জবাব, জ্যোতিরাণীকে তিনি ফ্রক-পরা থেকে দেখে আসছেন, এখনো নিতান্ত নাবালিকাই ভাবেন, অতএব সে-রকম ইচ্ছে এযাবৎ স্বপ্নেও স্থান পায়নি। তৃতীয় জবাব, ওই বাড়ির লোকেরা এখন মেয়ের বিয়ের কথা ভাবতে শুরু করেছেন বটে, কিন্তু মেয়ের হাতে দড়ি-কলসি দিয়ে অর্থাৎ তাঁর মত চালচুলোহীন লোকের কাছে গছিয়ে মেয়ে পার করার কথা ভাবছেন না।—এবারে তোমার ইচ্ছেটা কি বলো। বিয়ে করবে?

ওঁরা রাজি হবেন?

তোমার প্রাণরক্ষার তাগিদে চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু এদিকের কি হবে?

কোন্‌দিকের?

কর্তার খড়্গের?

শিবেশ্বর সঙ্গে সঙ্গে তেতে উঠলেন।—কেন বাজে বকো, তোমাকে তো বলেছি, তোমার মত ভীতু নই আমি। ওঁরা রাজি হলে বাবার অমতে আটকাবে না।

কিন্তু বাবার অমত হলে ওঁদের রাজি হতে আটকাবে। তোমাকে তো একবার দেখেই জামাইপদে বরণ করে নেননি তাঁরা।

এই বাস্তবের দিকটা শিবেশ্বর চিন্তা করেননি। একটু ভেবে বললেন, বাবার অমত হবে না। মাকে যা বলার আমি বলে রেখেছি। মত যাতে হয়, সেই ব্যবস্থা মা-ই করবে। কিন্তু তার আগে তুমি ও-বাড়ি গিয়ে একবার কথাটা পেড়ে দেখো—আজ গেলেই ভালো হয়।

কালীনাথের মুখ থেকে কৌতুকের ছায়া সরে গেল। মনোযোগসহকারে দেখলেন একটু।—পিসেমশাইয়ের মত হতে পারে বলছিস?

শিবেশ্বর মাথা নাড়লেন।—হতে পারে না, হবে।

বেশ। কালীনাথ হেসে উঠলেন, তাহলে ভালো যাতে হয় তাই করে ফেলি। আজই যাই।

জ্যোতিরাণীর মায়ের কাছে কালীনাথ যে ভাবে আর ভাষায় প্রস্তাবটা উত্থাপন করলেন, কন্যাদায়গ্রস্ত যে-কোনো মায়ের কাছে তা লোভনীয় বটে। বিধবা হবার পর থেকে নিজেকে কন্যাদায়গ্রস্তই মনে করে আসছেন তিনি। মেয়ের রূপের জোর আছে, কিন্তু তাঁর টাকার জোর নেই। রূপের জোরে মেয়ের বড়ঘরে পড়াটা অসম্ভব ভাবেননি কিন্তু সেই বড়ঘরের আবার কোন্ রূপ প্রকাশ পাবে, সে-চিন্তা

মাথায় এলেও উতলা হন। অতএব, বিগত স্বামীর সরল মনোভাব অনুযায়ী একটি সাদাসিধে সৎপাত্রের সন্ধানে ছিলেন তিনি। ইদানীং বাড়ির ছেলেদের সঙ্গে কথা-বার্তাও হচ্ছে এই নিয়ে।

প্রস্তাবটা মেঘ না চাইতে জল আসার মত হবে ভেবেছিলেন কালীনাথ। বড় বংশের ছেলে, সকলের থেকে ভরসার কথা তাঁর আর মামুর আত্মীয়, চেনা-জানা ঘরের ছেলে। এই একবারই কালীনাথ মানিকরামের বংশের খ্যাতি-বচনে পঞ্চমুখ হয়েছিলেন। আর ছেলে? সেই প্রশংসা শুনলে সদারুক্ষ শিবেশ্বরেরও বুকের তলায় কৃতজ্ঞতার বান ডাকতে পারত।

জ্যোতিরাণীর মা ছেলের চেহারাটা মনে করতে চেষ্টা করলেন একবার। মনে পড়তে খুব যে উৎসাহ বোধ করলেন তা নয়।···লম্বায় মেয়ের মাথায় মাথায় হবে। ফর্সা বটে, কিন্তু মুখখানাও কমনীয় নয় খুব। বড় বংশের কৃতী ছেলের ওটুকু খুঁত অবশ্য ধরার মধ্যে নয়। আসল বস্তু গুণ। গুণের ফিরিস্তি শুনেই লোভ হয়েছে। খুঁটিয়ে এটা-সেটা জিজ্ঞাসা করেছেন।

কিন্তু তা সত্ত্বেও যতটা আগ্রহ হবার কথা, ঠিক ততখানির আঁচ পেলেন না যেন কালীনাথ। একবাক্যে স্বীকৃতি জানাতে মহিলার কোথায় যেন দ্বিধা।

ছেলের বাবা রাজি হয়েছেন? আমাদের অবস্থা তো কিছুই না।

আপনি রাজি হলে তবে তো সে-প্রশ্ন। আছাড়া, মেয়ে পছন্দ হলে অবস্থার জন্য আটকাবে না, আমার পিসেমশাইটি সেদিক থেকে নির্লোভ।

একটু ভেবে জ্যোতিরাণীর মা বললেন, হলে মেয়ের ভাগ্য তো ভালই। তুমি সুবীরের সঙ্গে কথা বলো, আর গৌরবিমলকে একবার পাঠিয়ে দিও।

সুবীর অর্থাৎ জ্যোতিরাণীর জ্যাঠতুতো দাদা, কালীনাথের সহপাঠী। আর মামুকে আসতে বলার মানে হয়ত আরো কিছু খোঁজখবর নেবার ইচ্ছে।

কিন্তু সুবীরের সঙ্গে কথা বলতে এসে ভিতরে ভিতরে কালীনাথের সংশয়ের আঁচড় পড়ল একটা। সব শুনে সম্বন্ধ যে ভালো, সেটা ইনিও অস্বীকার করলেন না, কিন্তু ঈষৎ দ্বিধাগ্রস্ত মনে হল তাঁকেও। হঠাৎ গৌরবিমলের প্রসঙ্গ তুললেন।
—গৌরদার খবর কি, তাঁর দেখা নেই কেন?

চাকরি করছেন, সন্ধ্যের আগে বাড়িই ফেরেন না।

তাঁর সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে?

তাঁর সঙ্গে আলোচনা হবে কেন?

না, এমনিই বলছিলাম। তাঁকে একবার আসতে বোলো। আর এ সম্বন্ধে কাকীমার সঙ্গে একটু আলোচনা করে তোমাকে জানাব'খন।

না, কালীনাথ ঠিক হাওয়ায় ভেসে বাড়ি ফিরলেন না। তা বলে খবর শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে যে, তাকেও একেবারে হতাশার গহ্বরে নিক্ষেপ করলেন না। গম্ভীরমুখে সার-সমাচার জ্ঞাপন করলেন, বিয়ে হতেও পারে আবার না-ও হতে পারে।

তার মানে?

মানের দিকে না এগিয়ে কালীনাথ এবারে আর একটু আশার সঞ্চারে উদ্যোগী হলেন।—তুমি যে রত্ন ছেলে সেটা সকলে একবাক্যে স্বীকার করেছেন। এখন মনে হচ্ছে একজন মত দিলে ওঁরা এগোবেন।

কালীদার হাবভাব খুব প্রাঞ্জল নয়। শিবেশ্বরের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি তাঁর মুখের ওপর আটকে রইল একটু। বললেন, বাবা মত যাতে দেন, সেজন্যে মাকে বিকেলেও আবার বলে রেখেছি।

আমি পিসেমশাইর কথা বলছি না, তাঁদের গার্জেনের মতামতের কথা বলছি। তাঁর সার্টিফিকেট পেলে তবে হতে পারে।

শিবেশ্বর অবাক।—কে গার্জেন?

মামু। মেয়ের মা আর ভাই দুজনেই তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন। পারো তো মামুর পায়ে এখন বেশ করে তেল ঢালো।

শিবেশ্বরের স্বভাবের ব্যতিক্রম হল না খুব। দপ করে জ্বলে উঠলেন প্রথম।—তাঁদের জানিয়ে দাও আর দরকার নেই, মামুর পরামর্শ নিয়ে তাঁরা আর যেখানে খুশি মেয়ের বিয়ে দিতে পারেন, এখানে নয়।

মুখে নিরীহ বিস্ময় কালীনাথের, মেয়ের বিয়ে দেবার আগে তাঁরা খোঁজখবর করবেন সেটা দোষের নাকি?

তাহলে তুমি কি করতে গেছলে?

আমাকে তাঁরা ফাজিল ভাবেন, মামুকে তাঁরা আমার থেকে চার ডবল বিশ্বাস করেন। জ্যোতিরাণীর বাবা ওঁকে খুব ভালবাসতেন বলেই তাঁর ওপর আরো বেশি টান তাঁদের।

যুক্তির কথা বটে। তাছাড়া দায় যার ভাবনা তার। শিবেশ্বর মেজাজ ঠাণ্ডা করলেন। একদিনের দেখা এক মেয়েকে ঘিরে নিভৃতের বাসনাগুলো যেভাবে ছোটাছুটি দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে, মেজাজ দেখিয়ে সেগুলিকে বশে আনার লাগাম তাঁর হাতে নেই। এম-এ পরীক্ষার পর থেকেই নারী-তত্ত্ব বিশ্লেষণে মনোযোগী হয়েছেন। সিনেমার নায়িকা আর ফ্যাশনপাড়ার মেয়েরা তার রসদ যুগিয়েছে বটে, কিন্তু বিশ্লেষণের চোখ দুটোকে অন্ধ করে দিতে পারেনি। অর্থনীতির দুরূহ জটিলতা

ছিন্নভিন্ন করে দেখার মত করেই দেখেছেন, আর দেখার এক নতুন স্বাদ অনুভব করেছেন। কিন্তু সতের বছরের বাড়ন্ত গড়নের এই এক মেয়ে মুখের ওপর সরাসরি একটা জোরালো আলো ফেলে গোড়াতেই তাঁর দু চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে, সজাগ বুদ্ধির বিভ্রম ঘটিয়েছে। শিবেশ্বর বিশ্লেষণরত হয়েছেন পরে, ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসারও অনেক পরে—রাতের নিরিবিলি শয্যায় শুয়ে। এই বিশ্লেষণের সঙ্গে এক অদম্য অভিলাষ যুক্ত হয়েছে। তার রোমাঞ্চ যত যাতনা ততো।

কালীদাও হাত গোটাক এটা তিনি চান না। ভুরু কুঁচকে অনুমতি দেবার মত করে বললেন, গলবস্ত্র হয়ে তুমিই তাঁকে সার্টিফিকেট নিয়ে দয়া করে যেতে বলো তাহলে, আমার দ্বারা হবে না।

গুরুগম্ভীর প্রস্থান। একলা ঘরে কালীনাথ খানিকক্ষণ ধরে হাসলেন আপন মনে। ভারী মজাদার খোরাক মিলেছে যেন কিছু। উঠে চাবি লাগিয়ে ট্রাঙ্ক খুললেন। একধারের একেবারে তলায় হাত চালিয়ে চামড়ায় বাঁধানো চকচকে কালো মোটা নোটবই বার করলেন। পায়ে চেপে টেনে যে নোটবই ছেঁড়া হয়েছিল, তার থেকেও বড়। এখন আর ট্রাঙ্ক খোলা ফেলে রাখেন না কালীনাথ, বা ওই বস্তুটাও ওপরের দিকে চোখের ওপর ফেলে রাখেন না। আগের নোটবই থেকে টুকে যে লেখাগুলো উদ্ধার করার মত, করেছেন। নতুন সংযোগও কিছু হয়েছে। মৈত্রেয়ীর বিয়ের খবরটা যেদিন কানে এসেছিল, সেই রাতের নির্জনেও ওতে হাত পড়েছিল। আধখানা সাদা পাতা ভরাট হয়েছিল।

আজ আবার বেরুল ওটা। কালীনাথ হাসছেন। শুধু মজার ঘটনা, শুধু কৌতুককথা, শুধু স্মরণীয় উক্তি, শুধু কবিতার লাইন, আর শুধু গোপন চিঠির নকল লিখে রাখার মধ্যে বৈচিত্র্য খুব নেই। সদ্য বর্তমানের রসদ নিয়ে অক্ষরের বুনটে আগামী দিনের দুই-একটা কৌতুক-চিত্রও ছকে রেখেছেন তিনি। মেলে ভালো। না মিললেও খেদ নেই। কিন্তু মেলাবার আগ্রহ আছে তাঁর।

লেখায় ছেদ পড়ল। গৌরবিমল ঘরে ঢুকেছেন। নোটবই একপাশে সরিয়ে রাখলেন কালীনাথ। ওটার অস্তিত্ব সকলেই জানেন, কারো কোনো বিশেষ কৌতূহল নেই।

এই যে মামু এসো, মেঘ না চাইতেই জল।

মামু হাল্‌কা প্রশ্ন করলেন, জলের অভাবে তোর লেখা আটকাচ্ছিল নাকি?

আটকাচ্ছিল। চাকরি-বাকরি শিকেয় তুলে তোমাকে এখন ঘটকালির জন্যে ছুটতে হচ্ছে।' বাড়িতে যে বিয়ে লাগে-লাগে।

কালীনাথের গুরুবচনও লঘু করে শোনা অভ্যাস সকলের। জিজ্ঞাসা করলেন

—কার, তোর ?

রাম বলো, কুঁজোর আবার চিৎ হয়ে শোবার সাধ ! যুবরাজের।

শিবুর ?

জি।

অতঃপর ঘটনাটা বেশ লঘু করে বিস্তার করতে বসলেন কালীনাথ। যথা, সেদিন সুবীরদের বাড়িতে কাজে গেছলেন তিনি, সঙ্গে শিবু ছিল। জ্যোতিকে দেখেই তার মুণ্ডু ঘুরে গেছে, প্রেমের সপ্তকাণ্ড টপকে একেবারে বিয়ের ডালে চেপে বসেছে। পিসিমাকে আলটিমেটাম দিয়েছে আর প্রস্তাব পেশ করার জন্য এই অধমকে গলাধাক্কা দিয়ে ও-বাড়ি পাঠানো হয়েছে।

কালীনাথের হাসার কথা, হাসছেন। কিন্তু অলক্ষ্য দৃষ্টিটা সজাগ তাঁর। বিকেলে জ্যোতিরাণীর মা আর সুবীরের সঙ্গে কথা বলার পরে মনের তলায় যে ছোট একটা আঁচড় পড়েছিল, সেইখানেই আবার একটু সুড়সুড়ির মত লাগল যেন। শোনামাত্র মামুটি হকচকিয়ে গেলেন কেমন।

তুই গেছলি নাকি ?

না গিয়ে করি কি, প্রাণের মায়া আছে না ?

অন্যমনস্কের মত গৌরবিমল বললেন, তাহলে ঘটকালির আর বাকি কি !

একটু বাকি। ওঁদের আপত্তি আছে বলে মনে হল না, আর আপত্তি হবেই বা কেন। তবু কথা দেবার আগে মাসিমা আর সুবীর তোমাকে একবার দেখা করতে বললেন। ছেলের সম্বন্ধে আমার থেকে তোমার মতামতের ওপরেই বেশি আস্থা বোধ হয়।

মুখের দিকে চেয়ে গৌরবিমল শুনলেন চুপচাপ। কিন্তু এই শোনাটাও কিছু একটা বিড়ম্বনার মুখোমুখি দাঁড়ানোর মত মনে হল কালীনাথের।

আচ্ছা। গল্প করতে এসেও ফিরে গেলেন গৌরবিমল।

কালো নোটবই খুলে কালীনাথ কলম বাগিয়ে বসলেন আবার। তাঁর ভিতরে ভিতরে ভারী মজাদার কিছু নেচে বেড়াচ্ছে। লেখার বুনট এবারে আরো বেশি রস-ঘন হতে পারে।

কিন্তু আবারও বাধা।

অন্দরে ডাক পড়েছে। ডেকেছেন স্বয়ং কর্তা।

অন্দরে ইতিমধ্যে ছোটখাটো একটা প্রহসন সুসম্পন্ন হয়ে গেছে। বাড়ির গৃহিণী কোমর বেঁধে যথাস্থানে ছেলের বিয়ের নোটিশ পেশ করেছেন। বিয়ের মেয়েও ঠিক হয়ে গেছে শুনে কর্তা প্রথমে হতভম্ব হয়েছেন। সম্ভাব্য বধূকালী আর ছেলের পছন্দের

মেয়ে, অতএব কানে তাঁর গলানো সিসে ঢালা হয়েছে। আগের মতই একটা অর্বাচীন প্রেমের ব্যাপার ধরে নিয়ে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছেন তিনি। মত দেবার বদলে গর্জন করে উঠেছেন, ওই দুটোকেই চাবকে বাড়ি থেকে বার করে দেওয়া দরকার।

কিন্তু গৃহিণীও অপ্রস্তুত হয়ে অবতীর্ণ হননি। এই বিয়েতে বাধা দিলে ছেলে যে আপনা থেকেই বাড়ির বার হয়ে যাবে সেকথা জোরগলায় ঘোষণা করেছেন। আর ছেলে গেলে তিনি যে বসে থাকবেন না, সে তো স্বতঃসিদ্ধ কথা। এম-এ পাস করতে চলেছে ছেলে, তেইশ পেরুল বয়েস, এত বয়েস পর্যন্ত বংশের আর কে কবে অবিবাহিত থেকেছে সেই চ্যালেঞ্জ সামনে রাখতেও ভুললেন না। তাছাড়া সৎবংশের মানী ঘরের মেয়ে, দেখতে চমৎকার, একটা পাস দিয়েছে—আপত্তি হবেই বা কেন? দু দিন বাদেই বড় চাকরি করবে ছেলে, সে-কি বাপের মুখ চেয়ে বসে থাকবে নাকি? সেই বিয়ে হবে, মাঝখান থেকে ছেলে খোয়াবেন তাঁরা।

কর্তা বুঝলেন ব্যাপার অনেক দূর গড়িয়েছে। কালীনাথের বেলায় যে শাসন সহজ হয়েছে এখানে সেটা না চলতেও পারে। এই দুর্বলতার দরুন যাতনাও বোধ করলেন একটু। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবলেন খানিক। তারপর কালীনাথকে ঘরে ডেকে পাঠালেন।

আজ আর নিজের সংকট নয়, তাই ফাঁসির আসামীর মত মুখও নয়, কালীনাথের। তবে সবিনয়েই কর্তাসকাশে এসে দাঁড়ালেন।

এই প্রেমের ব্যাপারটা কতদিনের? রাগে তেতে প্রথমেই কাঠখোট্টা প্রশ্ন নিক্ষেপ করলেন সুরেশ্বর।

গৃহিণী মুখঝামটা দিলেন, কথার ছিরি দেখো—।

কালীনাথ জবাব দিলেন, আজ্ঞে আমার সঙ্গে গিয়ে শিবু একদিনই মাত্র মেয়েটিকে দেখেছিল।

বাঃ বাঃ! একদিনের হাতেখড়িতেই ওকে তুমি তাহলে পোক্ত করে তুলতে পেরেছ? তা তুমি মেয়েটিকে কতকাল ধরে দেখছ?

আজ্ঞে, ছেলেবেলা থেকে।

রাগ বাড়ছেই কর্তার।—অত রূপবতী যখন, নিজের কাঁধে না নিয়ে ওর ঘাড়ে চাপাতে গেলে কেন? কি করে মেয়েটা, ট্যাক্সিতে হাওয়া খেয়ে বেড়ায় না অফিসে চাকরিও করে?

কিছুই করে না। কোন্ পরিবারের মেয়ে মামুকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন। আমার থেকে তিনি অনেক বেশি জানেন তাঁদের।

এর মধ্যে গৌরবিমলের নাম শুনে হঠাৎ যেন একটু আশ্বস্ত হলেন কর্তাটি।

এই একজনকে অন্তত ও-দুটোর মত অর্বাচীন ভাবেন না তিনি। তক্ষুনি তাঁরও ডাক পড়ল ঘরে।

কালীনাথ চলে যেতে পারলেন না। দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে রইলেন। মামুর মুখখানা দেখামাত্র তাঁর দু চোখ আবার কৌতুকের রসদ খোঁজায় মগ্ন।

কর্তা বললেন, বোস্। ছেলে তো বিয়ে করার জন্য ক্ষেপে উঠেছে, শুনেছিস ?

গৌরবিমলের ঠোঁটের ফাঁকে একটা হাসির আভাস দেখা গেল শুধু।

তোমার দিদির ধারণা, একদিনের দেখা সেই মেয়ের সঙ্গে বিয়ে না হলে ছেলে বিবাগী হয়ে যাবে, নয়তো সম্পর্ক চুকিয়ে বাড়ি থেকে চলে যাবে। যাক, কে মেয়ে, কি বৃত্তান্ত তুই ভালো জানিস শুনলাম ?

গৌরবিমল মাথা নাড়লেন, জানেন।

মেয়েটি কেমন ?

খুবই ভালো।

কিরণশশীর মুখে হাসি ফুটল। কর্তা একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তারপর পরিবারের খবর, বিশেষ করে মেয়ের বিগত বাপের পরিচয় শোনার পর বেশ ভালই লাগল তাঁর। মেয়ের বাপের প্রসঙ্গে শ্যালকটির অবিমিশ্র শ্রদ্ধাও লক্ষ্য করলেন। চিন্তাটা এবার অনুকূল ভাবনার দিকে এগুলো। একটু ভেবে বললেন, তাহলে তুমিই গিয়ে কথাবার্তা বলে দেখো, তাঁদেরও তো মতামত থাকতে পারে।

কথাবার্তা কালী বলেছে। অমত হবে না বোধ হয়, আমিও বলব'খন।

তাঁর অগোচরে কথাবার্তাও বলা শেষ শুনে কর্তার মুখে অপ্রসন্ন ছায়া নামল আবার। কালীনাথের মূর্তিখানা একবার দেখে নিয়ে বললেন, তাহলে তো এগিয়েই গেছে। গৃহিণীর দিকে ফিরলেন, তোমার ছেলেকে জিজ্ঞেস করে দেখো মেয়েটিকে আমাদের একবার দেখার অনুমতি দেবে কিনা, আর কুষ্টি-টুষ্টিগুলো মেলানো চলবে কিনা।

ঠিকুজিকোষ্ঠী মেলাবার দুর্বলতা গৃহিণীরও বিলক্ষণ আছে, তাই রীতিমত সমস্যায় পড়ে গেলেন তিনি। না যদি মেলে তাহলে কি করবেন ?

সমস্যার সমাধান গৌরবিমলই করে দিলেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন, মেয়ে অপছন্দ হবে না…তবে ঠিকুজি-ফিকুজির ব্যাপার এরপর আর না তোলাই ভালো।

এখন আর মামুকে নয়, কর্তার মুখখানাই বেশ করে দেখছেন কালীনাথ। সেই মুখের দ্বিধা না ঘুচুক সমর্পণ সারা। কালীনাথ নিজের ঘরে চলে এলেন। আর নোটবই খুলে বসতে ইচ্ছে করল না। মন প্রসন্ন, তবু ভিতরটা চিন-চিন করছে

কোথায়। তার ওপর কৌতুকের প্রলেপ লাগাতে বসলেন। মানবরীতি দেখার কৌতুক। রীতিটা সনাতন অবশ্য। নিজের ছেলের সঙ্গে পরের ছেলের কিছু তফাৎ হয়েই থাকে। পরের ছেলের বেলায় যত কঠোর হওয়া চলে, নিজের ছেলের বেলায় ততো নয়। তাঁর বেলায় পা থেকে খড়ম খুলতে চেয়েছিলেন কর্তা, ছেলের বেলায় অসহায়। সেই অসহায় মূর্তিটাই আনন্দের খোরাক যুগিয়েছে। শুধু তাই নয় এই ফাঁকে নিজের ভেতরটাও আর একটু ভালো করে দেখতে পেয়েছেন কালীনাথ। বাপ-মা খুইয়ে ছেলেবেলা থেকে এখানকার আশ্রয়ে আছেন। কিন্তু আশ্রিতের ক্ষোভ বড় বিচিত্র। স্নেহ-মায়া-মমতার ভাগ সমান ছেড়ে উল্টে বেশি আশা করে সে। মৈত্রেয়ীর বিয়ের পর থেকে এই গোছের একটা জ্বালাই তিনি পুষছিলেন বোধ করি। সব কিছুর ওপর আলোকপাত হতে ভারী হাল্কা বোধ করলেন। যতক্ষণ মোহ, ততক্ষণ যাতনা, মোহভঙ্গ হলে যাতনা থাকে না।

পরদিন রাতে গৌরবিমল খবর দিলেন, কথাবার্তা মোটামুটি পাকা। সামনের ছুটির দিনই মেয়ে দেখার ব্যবস্থা হতে পারে।

মামুর ওপর শিবেশ্বর এই প্রথম কৃতজ্ঞ একটু। বাবার সঙ্গে গতকালের ফয়সালায় মামুর ভূমিকা মায়ের মুখেও শুনেছেন, কালীদাও বলেছেন। তাঁর কথায় ঠিকুজির ঝামেলা পর্যন্ত এড়ানো গেছে। বাক্স থেকে সার্টিফিকেট চুরির আগেও এই একজন যে তাঁর খুব কাছের মানুষ ছিলেন তা নয়। তাঁর সঙ্গে মানসিক বিরোধটা সবলের সঙ্গে দুর্বলের বিরোধের মত। শিবেশ্বরের প্রতিভা সম্বল। দশজনের প্রশংসা আর বাহবায় সেই প্রতিভার ছটা তাঁর নিজেরই চোখ ধাঁধায়। অথচ ঘষেমেজে এম-এ পাস মামুটির হাবভাবে কোনদিন এই প্রতিভার মূল্য মেলেনি। তাঁর নিস্পৃহ আচরণে উল্টে অনেকসময় অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ পেয়েছে। পাক না পাক, শিবেশ্বরের সেইরকমই মনে হয়েছে। কিন্তু সহজ বলিষ্ঠতার একটা রূপ আছেই। চেষ্টা করেও কখনো দুর্বল ভাবতে পারেননি তিনি। যাই হোক, সময়ে সবল মানুষ সহায় হলে মনে নরম হওয়াই স্বাভাবিক।

মেয়ে দেখে এসে কর্তা অন্য মানুষ। ছেলের ওপর বিরূপ ভাব তো গেলই, উল্টে মনে মনে এই প্রথম তার রুচির তারিফ করলেন বোধ হয়। বাড়ি ফিরে মেয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। গৌরবিমলকে বললেন, সাক্ষাৎ মা-জননীকে দেখে এলাম, এরকমটি তো আজকাল বড় চোখে পড়ে না।

ছেলের বিয়ে দেবার জন্যে হঠাৎ ছেলেমানুষের মতই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তিনি। কিন্তু তিন-চারদিন কেটে গেল, মেয়ের বাড়ি থেকে কেউ কথাবার্তা কইতে

আসে না। দাবী-দাওয়ার ব্যাপার নেই বটে, কিন্তু আনুষ্ঠানিক আলাপ-আলোচনার ব্যাপার তো আছে। মাঝে ছুটির দিনও চলে গেল আর একটা, কিন্তু কেউ এলো না। বাড়ির গৃহিণীর ব্যস্ততা দেখে গৌরবিমল বললেন, আসবে'খন, তাড়ার কি আছে। ওঁদের সম্বল সামান্য, যোগাড়যন্ত্রের কথাও ভাবতে হবে।

কর্তা খেঁকিয়ে উঠলেন, আমার বাড়িতে মা আসবে, যোগাড়যন্ত্রের কথা ভাবব আমি, তাঁদের বলে দাও ইচ্ছে করলে শাখা-সিঁদুর পরিয়ে তাঁরা মেয়ের বিয়ে দিতে পারেন।

কিন্তু মনে মনে সকলের থেকে বেশি ব্যস্ত হয়েছেন শিবেশ্বর নিজে। কালীনাথকে বললেন, ওঁদের কি মতলব? তুমি একবার ঘুরে এসো না?

অতএব ঘুরে আসতে হল। এবং ঘুরে এসে যে সমাচার জানালেন, শিবেশ্বরের মুখ কালো।

কালীদা জানালেন, আসবে ঠিকই, তবে মাসিমার সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে যতদূর মনে হল, মেয়েকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে মত করানোর চেষ্টা চলছে।

কেন কেন? বিয়ে করতে চায় না?

কালীদা মাথা নাড়লেন। অর্থাৎ অনেকটা সেইরকমই। বললেন, আপাতত আই-এ পড়তে চায়।

সে তো বিয়ের পরেও পড়া হতে পারে।

সে কথা তাকে বলা হয়েছে।

ঠিক এই মুহূর্তে অনাগত কালের কোনো বিষের বীজ শিবেশ্বরের অলক্ষ্য অন্তস্তলে রোপণ করা হয়ে গেল কিনা, কেউ জানে না। আপাতত তাঁর মাথাটাই দ্রুত কাজ করে গেল। যে মাথা দিয়ে অর্থনীতির দুরূহ জটিলতা ভেদ করে থাকেন। একটু বাদে মুখ খুললেন।—নিজের রূপের জোরটা ওই মেয়ে খুব ভালই জানে তাহলে। দেখলে অনেকেই বিয়ে করতে চাইতে পারে। সে-রকম কিছু ব্যাপার আছে মনে হয়?

ঈষৎ চিন্তিত মুখে মাথা নাড়লেন কালীনাথ, সে-রকম মনে হয় না। একটু ভেবে বললেন, এক ওদের বাড়িঅলার একটা ছেলেকে হয়ত একটু পছন্দ করত, পুলিসের গুলীতে ছেলেটা মারা যেতে দিনকতক খুব কান্নাকাটি করতে দেখেছিলাম। তা সেও তো এক বছরের ওপর হয়ে গেল···তাছাড়া ওটা সে-রকম ব্যাপার কিছু না হওয়াই সম্ভব। মোট কথা, তুই কিছু ভাবিস না, ছেলেমানুষ, বিয়ের নামে ঘাবড়েছে হয়ত, তাই পড়াশুনার কথা বলছে। খবর এলো বলে।

শিবেশ্বর আর কিছু বললেন না বটে, কিন্তু ভাবনাটা তাঁর মাথা থেকে গেলও

না। এমন কি, কালীদার কথামত খবর আসার পরেও না।

সতের বছরের জ্যোতিরাণীর ভিতরে ভিতরে সত্যিই যে একটা ওলট-পালট হয়ে গেছে, সে-খবর বাড়ির কোনো দ্বিতীয় প্রাণী জানে না। তবে প্রথম প্রতিক্রিয়ায় জ্যোতিরাণী নিজেই বিভ্রান্ত, বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

ম্যাট্রিক পাসের খবর বেরোবার আগে থেকেই জ্যোতিরাণীর মা মেয়ের বিয়ের ভাবনায় উতলা হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর জোরের জায়গা খালি হয়ে গেছে দু বছর আগে স্বামী মারা যেতে, তার ওপর নিজেও প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিন্তা স্বাভাবিক। মেয়ের অগোচরে ভাসুরপো সুবীরের কাছে অনেক সময় এ নিয়ে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেছেন তিনি। শেষে একটা সম্ভাব্য সমাধান সুবীরের মাথায়ই এসেছে। গৌরদার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব করলে কেমন হয়? খুব চমৎকার হয় তো!

গৌরবিমলের বয়েস নিয়ে জ্যোতিরাণীর মায়ের মনে গোড়ায় একটু দ্বিধা ছিল। মেয়ের সতের, ছেলের কম করে আটাশ। কিন্তু যত ভাবলেন, চিন্তাটা ততো মাথায় বসে যেতে লাগল তাঁর। এগার-বারো বছরের তফাতে বিয়ে আগে তো হরদমই হত। এখনও হয়। তাঁর সঙ্গে বিগত স্বামীর বয়সেও তফাতও এইরকমই ছিল। সব থেকে বড় কথা, মেয়ে ভালো থাকবে, কারণ, গৌরবিমলকে তাঁরা আজ থেকে জানেন না। স্বামীরও একান্ত অনুগত প্রিয়পাত্র ছিল। তবে জামাই প্রসঙ্গে মনে মনে আর একটু উঁচু আশা পোষণ করতেন জ্যোতিরাণীর মা, ছেলের বয়েসের থেকেও মন আসলে সেই কারণেই খুঁতখুঁত করছিল হয়ত।

যাই হোক, অনেক ভেবে শেষে ভাসুরপোকে জানালেন, গৌরবিমলের কাছে কথাটা পেড়ে দেখা যেতে পারে।

প্রস্তাব শুনে গৌরবিমল আকাশ থেকেই পড়েছিলেন প্রথমে। নিজের বয়েসের কথা তুলে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন, চাকরি যাও সামান্য করছেন, তা-ও থাকবে কি থাকবে না ঠিক নেই বলেছেন। কিন্তু সুবীরের প্রস্তাবে এতকালের হৃদ্যতার দাবীর দিকটাই বড় হয়ে উঠেছিল। জ্যোতিরাণীর মায়ের ইচ্ছেও অনুক্ত থাকেনি।

ফলে গৌরবিমলকে ভাবতে হয়েছিল। সেদিন বলেছিলেন, আচ্ছা, কটা দিন ভেবে দেখি, পরে বলব।

এই ভাবনার দুর্বলতা কিছু আছেই। সেদিনও যাবার সময় জ্যোতিরাণীকে দেখে গেছেন। আর এতদিনের দেখার সঙ্গে সেই দেখার একটু তফাতও হয়ত হয়েছিল।

কিন্তু নাটকের এই অধ্যায় পর্যন্ত জ্যোতিরাণী ঘুণাক্ষরেও জানতেন না। তাঁকে চলে যেতে দেখে সেইদিনও বলেছিলেন, আজ এসেই পালাচ্ছেন যে, মা তো ওই

ঘরে শুয়ে আছে।

গৌরবিমল একটা অজুহাত দেখিয়ে চলেই গেছলেন সেদিন। তারপর দুদিন বাদে অফিসফেরত বিকেলে এসেছিলেন। যে-রকম আশা করে এসেছিলেন, তাই হয়েছে। ছেলেরা তখনো বাড়ি ফেরেনি।

জ্যোতিরাণীর মায়ের ঘরে একবার উঁকি দিয়ে নিঃশব্দে ছাতে উঠে গিয়েছিলেন তিনি।

কার্নিসের ওপর কনুইয়ে ঠেস দিয়ে গালে হাত দিয়ে জ্যোতিরাণী আকাশ দেখছিলেন অথবা গাছ দেখছিলেন অথবা ঘরমুখো পাখি দেখছিলেন অথবা কিছুই দেখছিলেন না। কিন্তু কিছু দেখা বা না দেখার মধ্যেও একটা নিবিষ্টতা ছিল, যার ছন্দপাতন ঘটাতে গৌরবিমলের মন সরেনি।

জ্যোতিরাণী হঠাৎই চমকে ফিরেছিলেন। অবাক তারপর।—ও মা, আপনি! মা ঘুমুচ্ছে বুঝি এখনো?

বোধ হয়। গৌরবিমলের আত্মস্থ হতে সময় লাগেনি। হেসে খুব হাল্কা করে বলেছেন, এদিকে তোমাকে না জানিয়ে বাড়ির এরা সব এক কাণ্ড বাধাবার মতলবে আছে, তুমি কিছুই জানো না নিশ্চয়?

জ্যোতিরাণী আরো অবাক।—না তো! কি?

তোমার বয়েস সতের আর আমার আটাশ পেরুতে চলল, তবু এঁরা ভাবছেন একটা বিয়ের ব্যাপারে ঘটানো যেতে পারে। তাই আমি ভাবলাম কিছু বলার আগে তোমার মতটাই একবার শোনা যাক।

মুহূর্তে কি যে হয়ে গেল, সে শুধু গৌরবিমলই দেখলেন। এমন আবির-গোলা হতচকিত বিমূঢ়-বিস্ময় আর বুঝি কখনো দেখেননি। কিন্তু সে শুধু কয়েকটা মুহূর্ত।

না-না, এ মা—আমি—আমাকে—আপনি—

কি যে বলতে চেয়েছিলেন জ্যোতিরাণীও জানেন না, গৌরবিমলও না। কথা শেষ হবার আগেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট সেখান থেকে। গৌরবিমল শূন্য ছাতে দাঁড়িয়ে-ছিলেন কিছুক্ষণ। আবারও ভাবনায় পড়েছিলেন তিনি।

আর সেই থেকে জ্যোতিরাণীর এক অদ্ভুত অবস্থা। গোড়াতে মায়ের ওপর আর দাদাদের ওপর প্রচণ্ড রাগ হয়েছে তাঁর। এইটুকু বয়েস থেকে যাঁকে দেখে আসছেন, শ্রদ্ধা করে আসছেন, সমীহ করে আসছেন—সর্বদা যাঁকে কত বড় মনে হয়েছে ঠিক নেই, তাঁর সঙ্গে বিয়ে—ভাবতেও ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করেছেন তিনি। কটা দিন সেই অস্বস্তি যেন ছেঁকে ধরেছিল তাঁকে। কিন্তু এই কটা দিনের মধ্যে বয়েসটাও যেন তাঁর সতের ডিঙিয়ে অনেকটা এগিয়ে গেছে। অস্বস্তি তখনো, কিন্তু

মনের তলায় একটা বিস্ময় উঁকিঝুঁকি দিয়েছে।···ভদ্রলোক কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, চুপচাপ দেখছিলেন। চমকে ফিরে দাঁড়িয়ে সেই দেখার একটা মুহূর্তের কি যেন তন্ময়তা জ্যোতিরাণী দেখেছিলেন। তখন মনে হয়নি, পরে থেকে থেকে মনে হয়েছে। হচ্ছে।

কিন্তু একটা দিনের মধ্যে কি হয়ে গেল। কালীদার সঙ্গে কে এক আত্মীয় এলো। অত বড় স্কলার, শোনার আগে জ্যোতিরাণী ভালো করে তার দিকে চেয়েও দেখেননি। দু দিন না যেতে কালীদা হঠাৎ এসে মায়ের সঙ্গে দাদার সঙ্গে কি ফিসফিস করে গেলেন কিছুক্ষণ ধরে। পরদিনই আবার গৌরবিমলবাবু এলেন, মা-কে দাদাকে কি বলে গেলেন। শেষে হঠাৎ তাঁকে বলা হল, তাঁকে দেখতে আসছেন কারা। এলেন, দেখে গেলেন। জ্যোতিরাণীর মাথায় তখনো কিছু ঢুকছে না যেন। ঢুকল তাঁরা দেখে যাবার পরে। জ্যোতিরাণী হাঁ করে শুনলেন, তাঁর বিয়ে—বিয়ে সেই বেঁটেখাটো স্কলার ছেলের সঙ্গে। যে ছেলে শুধু কালীদার আত্মীয় নয়, গৌরবিমল-বাবুর ভাগ্নেও।

এ-রকম পরিস্থিতিতেও পড়ে কেউ ? এবারে দ্বিগুণ অস্বস্তি। সতের বছরের জ্যোতিরাণী জীবনে কোনো জটিলতার মুখোমুখি দাঁড়ান নি। এই অস্বস্তির জট ছাড়াবেন কি করে ? কেন যে এত খারাপ লাগছে তাই তো স্পষ্ট নয় খুব। কেবল খারাপ লাগছে। বিচ্ছিরি রকমের খারাপ লাগছে।

স্পষ্ট করে কিছু ভাবা গেল না বটে, কিন্তু মাথায় বুদ্ধি এলো একটা। সকলকে অবাক করে গোঁ ধরে বসলেন, বিয়ে-টিয়ে নয়, তিনি পড়বেন আরো।

বাড়িতে আদরের মেয়ে বলেই রাগ না করে মা আর দাদারা বোঝাতে বসলেন। তাঁদের সঙ্কোচের কোনো কারণ নেই, কারণ গৌরবিমলের সঙ্গে বিয়ের কোনো কথা উত্থাপন করা হয়েছিল সেটা মেয়ে জানে বলেই তাঁদের ধারণা নেই। সুবীরের ধরাকরার ফলে গৌরবিমল বলেছিলেন পরে জানাবেন। ইতিমধ্যে ভাগ্নের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব এলো। নিজের প্রসঙ্গ উল্লেখমাত্র না করে গৌরবিমলও ভাগ্নের জন্যেই সুপারিশ করে মেয়ে দেখার দিন পর্যন্ত পাকা করে গেছেন।

বিয়ে না করার ইচ্ছেটা যে শেষ পর্যন্ত টিকবে না, বাড়ির আগ্রহ দেখে জ্যোতিরাণীর সেটা ঠিকই মনে হয়েছিল। তবু নিজের গোঁ ধরেই ছিলেন।

সেদিন নিষ্পত্তি হয়ে গেল।

মায়ের ঘরে ডাক পড়তে ভিতরে ঢুকেই থমকে দাঁড়ালেন জ্যোতিরাণী।

ঘরে গৌরবিমল বসে। সহজ হাসিমুখে তিনিই ডাকলেন, এসো এদিকে, মা-দাদাদের অবাধ্য হবার মত মস্ত বড় হয়ে গেছ শুনলাম ? মায়ের দিকে ফিরলেন

তারপর, আপনি যান তো একটু, আমি ছুটো কথা বলি ওর সঙ্গে।

মা চলে গেলেন। জ্যোতিরাণীও ছুটে পালাতে পারলে বাঁচতেন। কিন্তু পা ছুটো মাটির সঙ্গে আটকে আছে। অবনতমুখী।

তেমনি হাসিমুখেই গৌরবিমল বললেন, দেখো, তোমার মা আর দাদার আগের ইচ্ছেটা বরাবরই আমার পাগলামি মনে হয়েছিল। তাই সেদিনের কথা মনে রেখে দরকার নেই। তোমার মায়ের কথা পেয়ে আমি ও-বাড়ির ওঁদের কথা দিয়েছি। আমাদের অপ্রস্তুত কোরো না।...আর সত্যিই যদি তোমার পড়াশুনা করার ইচ্ছে থাকে তো সেখানেও আটকাবে না। আমার ভাগ্নেটি এই এক গুণের খাঁটি সমঝদার।

শুধু মা-কে নয়, গলা ছেড়ে এবারে দাদাদেরও ডাকলেন তিনি। সকলে আসতে ছদ্মগাম্ভীর্যে মা-কেই লক্ষ্য করে বললেন, আগে আমার জন্মে একথালা মিষ্টি আনা হোক।...জ্যোতিরাণী আর আপত্তি করবে না, এবারে নিশ্চিন্ত মনে কাজে এগোতে পারেন।

বিয়ে হয়ে গেল।

মাঝে একদিন বাদ দিয়ে এ বাড়ির বৌ-ভাতও। একমাত্র ছেলের বিয়েতে সুরেশ্বর খরচের কার্পণ্য করেননি। ঘটা করে উৎসব সম্পন্ন হল। আর খাটাখাটুনির সব থেকে বড় ধকলটা গেল কালীনাথের ওপর দিয়ে। হৈ-চৈ আনন্দের মধ্য দিয়েই সে-দায়িত্ব পালন করলেন তিনি। মামুর উদ্দেশে তাঁর এক-একটা আচমকা হাঁক শুনে কেউ হেসেছে কেউ আঁতকে উঠেছে। গৌরবিমল বলেছেন, তুই তো জ্বালিয়ে মারলি দেখি, আবার কি দরকার পড়ল ?

কালীনাথ গম্ভীর।—কিছু না। সর্বদা রেডি আছ কিনা দেখছি।

সমস্তক্ষণের কাজ আর ফুর্তির ফাঁকে ফাঁকে এই একখানা মুখই যে দেখেছেন কালীনাথ, তা শুধু তিনিই জানেন।

দায় শেষ হল। রাত মন্দ নয় তখন। যে ঘরে বউ অর্থাৎ জ্যোতিরাণীকে বসানো হয়েছে, এতক্ষণে সেই ঘরে আসার ফুরসত পেলেন তিনি। জ্যোতিরাণী বসে আছেন, শেষের অতিথিরাও অনেকে আছেন। দুই-একজন বন্ধুর সঙ্গে শিবেশ্বরও উপস্থিত সেখানে।

অনেককে ঠেলে কালীনাথ সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। ঘামে সমস্ত মুখ ভেজা। কাঁধে তোয়ালে। সেটাও শুকনো নয়। দু হাত কোমরে তুলে গম্ভীর মুখে তিনি পর্যবেক্ষণে মনোনিবেশ করলেন। দেখার এই ঘটা দেখে পরিচিতজনেরা হাসতে

লাগলেন। সঙ্কোচে জ্যোতিরাণীর আনত দৃষ্টি।

গত পরশু থেকে আমি তোমার ভাসুর, কালীনাথ তেমনি গম্ভীর, মুখ তোলো, কথা আছে।

এই কণ্ঠস্বর শুনে মুখ তুলতে হল জ্যোতিরাণীকে।

কোমর থেকে এক হাত নামিয়ে আঙুল তুলে শিবেশ্বরকে দেখালেন কালীনাথ। —সেদিন বলেছিলাম কিনা ও ইচ্ছে করলে আই-এ টপকে তোমাকে একেবারে 'বিয়ে' পাস করিয়ে ছেড়ে দিতে পারে?

হাসির রোল উঠল। হেসে ফেলে জ্যোতিরাণীও মাথা নোয়ালেন আবার।

কালীনাথ বেরিয়ে এলেন। আর একবারের তদারক সারা হতে ছুটি। স্নানের ঘরে ঢুকলেন তিনি। স্নান সেরে নিজের ঘরে এলেন। মাথা আঁচড়ালেন। এত খাটাখাটুনির পর খাওয়ার রুচি নেই। এক গেলাস ঠাণ্ডা জল গড়িয়ে খেলেন। তারপর দরজা বন্ধ করলেন।

এবারে ঘরের আলো নেববার কথা। তারপর লম্বা ঘুমে অচেতন হবার কথা।

কিন্তু আলো নিভল না।

চাবি লাগিয়ে ট্রাঙ্ক খুললেন। যে জিনিসের খোঁজে ভিতরে হাত চালালেন সেটা একেবারেই বেরিয়ে এলো। কালো চামড়ায় বাঁধানো সেই মোটা নোটবই।

কলমের খোঁজে টেবিলের ড্রয়ার হাতড়াচ্ছেন কালীনাথ। আর হাসছেন মৃদু মৃদু।

॥ তেরো ॥

মনের জগতে প্রথম ধারণার একটা দাম আছে। তবু বুদ্ধিমানেরা বলেন, তার দাস হওয়া ভালো নয়। কারণ ভুল হলেও ওটার ছাপ সহজে ওঠে না।

কিন্তু বুদ্ধিমানেরাই আবার এই প্রাজ্ঞবচন শোনে কম।

বিয়ে করতে আসার কদিন আগে থেকেই শিবেশ্বরের মাথায় একটা অস্বস্তিকর ধারণা ঘুরপাক খাচ্ছিল। বিয়ে করতে এসে ওটাতে আরো বেশি জট পাকিয়ে গেল।

বিশ্লেষণের মূল তথ্যে তিনি ভুল দেখেননি। যেমন, যে মেয়েকে তিনি বিয়ে করতে চলেছেন, সে নিছক সুখের ঘরের রূপসী না হলেও পুরুষের চোখ টানার মতই রূপসী। কতখানি টানার মত সেটা নিজেকে দিয়েই অনুভব করতে পারেন। ...বাড়িঅলার কে এক ছেলে নাকি কাছে এসেছিল, মরে যেতে কদিন খুব কান্নাকাটি করেছে। সুযোগ পেলে কাছে সকলেই আসতে চাইবে, সে সুযোগ আর কেউ

পেয়েছে কিনা জানেন না। এই বিয়ে নতুন কোনো গোপন কান্নার কারণ হল কিনা সেই চিন্তা মাথায় এসেছে। এসেছে কারণ, ওই মেয়ে তাঁকে নাকচ করেছিল, বিয়েতে আপত্তি জানিয়েছিল। কালীদা আর বিশেষ করে মামুর সুপারিশ ভিন্ন এই বিয়ে হতই না বোধ হয়। নিছক সুখের ঘরের রূপ নয়, তাই বাড়ির লোকের পীড়াপীড়িতেও রাজি হয়ে থাকতে পারে।····· মেয়ে পড়তে চেয়েছিল, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন রত্নের প্রতিও তার কিছুমাত্র আগ্রহ দেখা যায়নি।

মোট কথা বিয়ে করতে এসেও প্রথম প্রত্যাখ্যানের আঁচড়টা শিবেশ্বরের মন থেকে মুছে যায়নি। ফলে বিয়ের অনুষ্ঠানের এক স্বাভাবিক ব্যাপারও খুব সাদা চোখে দেখা সহজ হয়নি।

সেটা শুভদৃষ্টির অনুষ্ঠান।

বিয়ের আসরের উপভোগ্য অধ্যায় এটা। কিন্তু কয়েক জোড়া ক্যামেরা আর কয়েক শ' জোড়া খুশি-মুখর প্রগলভ চোখের ওপর দিয়ে এই শুভ কাজটুকু সম্পন্ন করতে কন্যারা কতখানি ঘেমে ওঠে সে খবর সঠিক জানা নেই। শিবেশ্বরের তিন বারের চেষ্টাতেও তাঁর প্রত্যাশিত চোখের সঙ্গে আর দুটি চোখ মেলেনি।

তোলো তোলো, ভালো করে চোখ তুলে বেশ করে দেখে নাও, আমরা কেউ দেখছি না, ভয় নেই। কন্যার প্রতি একদঙ্গল মেয়ে-পুরুষের সকৌতুক তাড়না।

এদিকে শিবেশ্বর মুখ তুলেছেন, কয়েক নিমেষ অপেক্ষাও হয়ত করেছেন। কিন্তু একতরফা তাকানো বিসদৃশ। ফলে ঠেলাঠেলিতে ওদিকের দৃষ্টি যখন মুখের ওপর ওঠার উপক্রম করেছে, শিবেশ্বরের মাথা তার আগেই নীচের দিকে নেমেছে। তক্ষুনি আবার মুখ তুলেছেন বটে তিনি, কিন্তু ওদিকের মুখ তার মধ্যে আনত আবার।

হাসাহাসির ধুম পড়েছে। এ-রকম হয়েছে একে একে প্রায় তিনবার। শেষের বারে দুজনের চোখ তোলার সময়টা মোটামুটি মিলেছিল বলা যেতে পারে, কিন্তু আসরের রসিক-রসিকাদের বিবেচনায় এও বাতিল। ফলে চিরাচরিত পুনরনুষ্ঠানের তাগিদ।

এরপর একজন সুরসিকা জ্যোতিরাণীর চিবুক তুলে ধরেছেন, ধরে রেখেছেন। —নাও, এইবার দেখাদেখি করো ভাল করে।

এইভাবে চিবুক তুলে ধরে আরো তিনবার ঘটা করে শুভদৃষ্টি বিনিময় করানো হয়েছে। কিন্তু সেটা কতখানি শুভ হয়েছিল, ভবিতব্য জানে।

কারণ প্রথম দু-দুবারের 'ব্যর্থতা শিবেশ্বরের প্রথম ধারণার ওপর ছায়াপাত করেছে। তারপর যতবার চোখে চোখ মিলেছে, জ্যোতিরাণী প্রসন্ন কমনীয় মুখ দেখেননি একখানা। ঠিক কি-যে দেখেছেন জানেন না। কিন্তু যেমন আশা

করেছিলেন তেমন দেখেননি। সকলের হাসির মধ্যে এক ধরনের বে-খাপ্পা গাম্ভীর্য দেখেছেন। ফলে তৃতীয়বারে যখন তাঁর চিবুক তুলে ধরা হয়েছে, জ্যোতিরাণী ভয়ে ভয়ে তাকিয়েছেন।

শিবেশ্বরের চোখ আছে। এটুকুও তাঁর চোখে পড়েছিল।

সময়কালে চমকপ্রদ কিছু মনে পড়াটা প্রতিভার লক্ষণ নাকি। অর্থনীতির পরীক্ষা দিতে বসে এই প্রতিভার সুফল অনেকবার পেয়েছেন। এই মুহূর্তে হঠাৎ যা মনে পড়েছিল সেও চমকপ্রদ বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে চমকটা খেয়েছেন শিবেশ্বর নিজেই।

...কথাটা কালীদা বলেছিলেন। মৈত্রেয়ীর স্বামী গুণ্ডাগোছের লোক শুনে শিবেশ্বর জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ও-রকম লোকের সঙ্গে মৈত্রেয়ীর বনিবনা হচ্ছে কি করে। জবাবে কালীনাথ বলেছিলেন, অনেক মেয়ের আবার তোর মত স্কলারের থেকে গুণ্ডা বেশি পছন্দ। শোনার পর শিবেশ্বরের চিন্তাটা স্থূল বিশ্লেষণের দিকে গড়িয়েছিল। পুরুষের দেহগত গঠনের প্রতি মেয়েদের নগ্ন লোভের একাধিক বিলিত ছবিও দেখেছেন। রোমের কোন্ নিষ্ঠুর রাজার আদেশে পরিচারক-সদৃশ একটা লোককে হিংস্র বুনো মোষের সঙ্গে লড়াইয়ে নামতে হয়েছিল। পুরুষের বাহুবলে শেষ পর্যন্ত সেই বুনো মোষ ঘায়েল হয়েছিল। তাই দেখে রাণীর মাথায় কামনার আগুন জ্বলেছিল। গোপনে সেই দুর্দম পুরুষকে সে রাতের শয্যায় ডেকে এনেছিল। এই ছবিটা দেখেছেন মাত্র কয়েক দিন আগে।

আচম্‌কা নিজের একটা বড় দুর্বলতার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন যেন শিবেশ্বর। শুভদৃষ্টির এই অতি স্বাভাবিক গরমিলের পিছনে আরো একটা বাড়তি সংশয় উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে গেছে।

সপ্তপদীর অনুষ্ঠানে মেয়ে-জামাই সামনে-পিছনে দাঁড়াতে কাটা ঘায়ে নুন ছিটিয়েছেন কে এক মহিলা।—ও মা, এ যে দেখি একেবারে ক্ষুদে জামাই, আমাদের মেয়ে লম্বা না জামাই লম্বা!

আর একজনের টিপ্পনী, যা আছে—আছে। মেয়ে দুদিনে টেনে লম্বা করে দেবে'খন।

তারপর এই ফুলশয্যার রাত।

প্রত্যাশার তলায় তলায় অলক্ষ্য কীটের দংশন চলেছিল একটা। শিবেশ্বর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। তারপর নিবিষ্ট চোখে দেখেছেন চেয়ে চেয়ে। দেখার এই একটানা নীরবতায় অস্বস্তি বোধ করেছেন জ্যোতিরাণী। কিন্তু মুখ তুলতে চেষ্টা করেও পেরে ওঠেননি।

দেখছেন যাকে তার বয়েস মাত্র সতের, সতের বছরের অভ্যস্ত জীবন ছেড়ে এই প্রথম সে আর এক আঙিনায় পা দিয়েছে—এই সহজ সত্যটা হৃদয় দিয়ে অনুভব করলে সকল সমস্যা ছাড়িয়ে শিবেশ্বর নিজের প্রাপ্তিটাই বড় করে দেখতে পেতেন। কিন্তু তিনি শুধু প্রাপ্তির জলুস দেখছেন, হৃদয় গোটাগুটি অনুপস্থিত।

পুরুষের চোখে বিয়ে সমাপ্তির ব্যাপার, মেয়েদের চোখে শুরু। জ্যোতিরাণীর এই শুরুটাই ধাক্কা খেল একটা। ধাক্কা খেতে লাগল।

মুখ তোলো।

পুরুষের প্রথম সম্ভাষণ খট করে কানে লাগল। জ্যোতিরাণীর বুকের ভিতরটা থর-থর কাঁপছে অনেকক্ষণ ধরে। মুখ তুলতে পারলেন না, কাঁপুনি বাড়ল শুধু।

হাত বাড়িয়ে শিবেশ্বর তাঁর মুখখানা নিজের দিকে ফেরালেন এবার, অন্য হাতে মাথার ঘোমটা সরিয়ে দিলেন।—আমাকে তোমার এত অপছন্দ কেন?

জবাবে জ্যোতিরাণী মুখ নামিয়ে নিতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু হাতের বাধায় পারা গেল না।

শুভদৃষ্টির সময়ে মুখ তুলে দেখতে চাওনি, এখনো চাও না বোধ হয়?

কথাবার্তার ধরন বে-খাপ্পা লাগছে। সঙ্কোচ আর লজ্জা আর ভয় কাটিয়ে তুলতে পারলে জ্যোতিরাণী এই মুখখানা অন্তত দেখতেন, বুঝতে চেষ্টা করতেন।

অপছন্দ কেন?

প্রাণের দায়ে জ্যোতিরাণী সামান্য মাথা নেড়ে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, অপছন্দ নয়।

তাহলে বিয়েতে আপত্তি করেছিলে কেন?

জ্যোতিরাণী ঘাবড়েই গেলেন। আপত্তির খবর কানে গেছে কি করে জানেন না। কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কার ছায়া পড়ল মুখে। কেন যে আপত্তি করেছিলেন নিজেই ভালো জানেন না।

আপত্তি করেছিলে তো? শিবেশ্বরের নিষ্পলক দু চোখ তাঁর মুখখানা চড়াও করেই আছে।

জ্যোতিরাণীর অসহায় দৃষ্টিটা আপনা থেকেই ওই চোখের সঙ্গে মিলল এবার। অস্ফুট শব্দ করে শিবেশ্বর হেসে উঠলেন।—এটাকেই শুভদৃষ্টি ধরে নেওয়া যাক তাহলে, কি বলো?

নিরুপায় জ্যোতিরাণীও হাসতে চেষ্টা করলেন একটু, কিন্তু সেটা কান্নার মত দেখালো।

…অনেকখানি প্রস্তুতির দরকার ছিল, আর কিছু অবকাশ দরকার ছিল। যে প্রস্তুতি সমর্পণ শেখায়, যে অবকাশ প্রতীক্ষায় মাধুর্য আনে।

সতের বছরের জ্যোতিরাণীর প্রথম যৌবনবাস্তবে এই দুইয়েরই নিদারুণ অভাব ঘটেছিল। তিনি যেন বড় অতর্কিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন, বিপর্যস্ত হয়েছিলেন। অনভিজ্ঞ অপটু অসহিষ্ণু পুরুষের প্রথম রীতি বড় স্থূল, বড় নগ্ন, বড় নির্দয় মনে হয়েছিল। যৌবনে প্রথম পদক্ষেপে জ্যোতিরাণীর সমস্ত অন্তরাত্মা বিমুখ হয়েছিল, তিনি আত্মরক্ষা করতে চেয়েছিলেন। অনিবার্য ব্যর্থতায় পুরুষের বাসনার আগুন দ্বিগুণ জ্বলেছে। ফুলশয্যার রাতের ফুল বিকশিত হয়নি, নিষ্পিষ্ট হয়েছে।

তারপর দিনে দিনে পুরুষের নিভৃতের আচরণ স্থূলতর, নগ্নতর হতে দেখেছেন জ্যোতিরাণী। সমস্ত দিন ধরে শ্বাপদের মত কেউ যেন যৌবনের উচ্ছৃঙ্খল ভোজের প্রতীক্ষায় বসে। সন্ধ্যা পার হতে না হতে তার চোখে-মুখে চাপা উল্লাস। প্রথম প্রথম চেনা-অচেনা কত লোক বাড়িতে এসেছে, গেছে। বউয়ের রূপের প্রশংসা করেছে তারা। সেই প্রশংসা উল্লাসের ইন্ধন যুগিয়েছে একজনের। রাত্রিটাকে ঠেকিয়ে রাখবে কে, সে আসবেই। এসেছে। জ্যোতিরাণী ঘরে এসেছেন। যে ঘরে ভোগের আরতি সাজিয়ে বসে নেই কেউ। ভোগের আগুনই শুধু জ্বলছে। সেই আগুনে আত্মাহুতি দেবার ডাক পড়েছে তাঁর। আত্মাহুতিই দিয়েছেন।

গোড়ায় গোড়ায় তবু অন্ধকারের আশ্রয় ছিল, কদিন না যেতে সেই আশ্রয়ও গেছে। জ্যোতিরাণীর দুই চোখের অসহায় আকুতিতেও ঘরের আলো নেভেনি। উল্টে উদ্দীপনার আঁচ লেগেছে। দুটো চোখের ধকধকে দৃষ্টিশলাকা তাঁর সর্বাঙ্গ অনাবৃত করেছে, সর্বাঙ্গ দহন করেছে, সর্বাঙ্গ লেহন করেছে, সর্বাঙ্গ বিদ্ধ করেছে, তারপর সর্বাঙ্গ গ্রাস করেছে। ভোগের নির্লজ্জতর, বীভৎসতর রূপ দেখেছেন জ্যোতিরাণী, বীভৎসতর উল্লাস দেখেছেন। তিনি যেন শুধু ভোগের সামগ্রী। ভোগের দোসর নন। বিনিময়ের প্রশ্ন নেই। দস্যুর মত সর্বস্ব লুঠ করার উদ্‌ভ্রান্ত তাড়না।

দস্যুর মত, দস্যুর সেই সর্বস্ব হরণের বলিষ্ঠতাও নেই। ভোগের এই নগ্ন প্রহসন আরো নির্দয় রকমের কুশ্রী তাই।

শিবেশ্বর জানেন, রূপের প্রশংসায় সকলে পঞ্চমুখ যার, সেই রূপসী স্বেচ্ছায় তাঁর ঘরে আসেনি। তাকে জোর করে আনা হয়েছে। তাকে দখল করা হয়েছে। অধিকার বিস্তারের এক জৈব আক্রোশ সর্বদা অনুভব করেছেন তাই। সেই অনুভূতি দিয়ে নিজের খর্ব দেহের দুর্বলতা ঘোচাতে চেয়েছেন। মৈত্রেয়ীর গুণ্ডা স্বামী পছন্দ, পশুবলে বুনো মোষ ঘায়েল করতে পারে যে পরিচারক রূপসী রাণী

তাকে রাতের গোপন শয্যায় ডেকে নেয়। পুরুষ-শক্তির প্রতি আরো কত অনমিতা-যৌবনার গোপন অর্ঘ্য নিবেদন দেখেছেন শিবেশ্বর।

অধিকার বিস্তারের তাড়নায় পুরুষের এই শক্তিটাকেই কল্পনায় সজাগ করে তুলতে চেয়েছেন তিনি। কিন্তু শক্তি নেই। ফলে আচরণ নিষ্ঠুরতর হয়েছে, ক্রূরতর হয়েছে।

সব থেকে বেশি কাছে টানার কথা যাকে, শুরু থেকেই জ্যোতিরাণী সব থেকে বেশি এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করলেন তাঁকেই। পাছে অসময়ে ডাক পড়ে সেই ভয়ে দিনের সর্বক্ষণই শ্বশুড়-শাশুড়ীর কাছে কাছে থাকেন তিনি, না চাইতে হাতের কাছে সব এগিয়ে দেন। ফলে শাশুড়ী ততটা না হোক, শ্বশুর মহাখুশি। শাশুড়ীর খুশি-অখুশির ব্যাপারটা ছেলের খুশি-অখুশির সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু দু'দণ্ড বউকে কাছে না দেখলে শ্বশুরের ভালো লাগে না। তিনি হাঁকডাক করে বউকে ডাকেন। জ্যোতিরাণী হাঁপ ফেলে বাঁচেন।

সুরেশ্বর বউয়ের মুখ শুকনো দেখেন প্রায়ই। কখনো উদ্বিগ্ন হন, কখনো বা চোখ পাকিয়ে ছেলেকে শুনিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, ও তোমাকে কিছু বলেছে নাকি? মুখ ভার কেন?

নালিশ করলে তক্ষুনি শাসনের দণ্ড উঁচিয়ে তাড়া করবেন হয়ত। কিন্তু জ্যোতিরাণী নালিশ করবেন কি নিয়ে?

বাড়ির মধ্যে আর দেখা-সাক্ষাৎ হয় কালীদার সঙ্গে। কথাও হয়। কালীদা সেই রকমই হালকা মেজাজে আছেন। কিন্তু শাশুড়ী শুরুতেই বউকে ভাসুর চিনিয়েছেন। ভাসুরের কতটা শ্রদ্ধাভক্তি প্রাপ্য শাশুড়ী সেটা তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। কালীদা হাসিমুখে আপত্তি জানিয়েছিলেন, কিন্তু পিসিমা, ও যে আমার এই পদোন্নতির অনেক আগে থেকে আমাকে জানে!

জানুক গে। বউ তা বলে মাথার কাপড় ফেলে ভাসুরের সঙ্গে কট-কট করে কথা কইবে নাকি!

আর একজনের কচিৎ দেখা মিলেছে। মামাশ্বশুর গৌরবিমলের। ভাসুরই যখন এত বড়, মামাশ্বশুর তো আরো কত বড়। তাঁর ছায়া দেখেও জ্যোতিরাণী পালিয়েছেন। বিয়ের পনের দিনের মধ্যে শ্বশুরের ঘরে হঠাৎ একদিন ডাক পড়ল তাঁর। গিয়ে দেখেন শাশুড়ীও উপস্থিত সেখানে। আর কালীদা আর মামাশ্বশুর আর সদা চাকর। মামাশ্বশুর এক মাসের জন্য দেরাদুন না নৈনিতাল কোথায় যাবেন বলে প্রস্তুত। সদা তাঁর তোরঙ্গ আর ছোট বিছানা নিয়ে চলল।

শাশুড়ীর নির্দেশমত জ্যোতিরাণী প্রণাম সারলেন। তারপর সকলের অলক্ষ্যে

মামাশ্বশুরের মুখখানা একবার না দেখেও পারলেন না। হাসিমাখা দৃষ্টিটা তাঁর দিকেই প্রসারিত দেখে তাড়াতাড়ি মাথা নোয়ালেন।

শ্বশুরের দিকে ফিরে গৌরবিমল বললেন, বউ কিন্তু এই কদিনের মধ্যেই রোগা হয়েছে একটু, বাপের বাড়িতে নিন্দে হবে। শিবুকে দিয়ে মাঝেসাঝে ওকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেবেন, নতুন নতুন—মন খারাপ হয় বোধ হয়।

এই এক ব্যাপারে ছেলের সঙ্গে তাঁর বাপের মতের মিল। বউ ঘন ঘন বাপের বাড়ি যাবে এটা তাঁর পছন্দ নয়। প্রকারান্তরে সে কথা তিনি আগেই বউকে শুনিয়ে রেখেছিলেন। কর্তার হয়ে গিন্নীই মৃদু প্রতিবাদ করলেন; মন খারাপ করলে তো হবে না, এটাই ঘর-বাড়ি।

গৌরবিমল চলে গেলেন। এক মাসের জায়গায় পাঁচ-ছ মাস কেটে গেল। গোড়ায় গোড়ায় জ্যোতিরাণী তাঁর দুই-একখানা চিঠি আসার সংবাদ পেয়েছেন। সংবাদ কেন, শাশুড়ীকে সেই চিঠি পড়ে শোনাতেও হয়েছে। লিখেছেন, কর্তার ভয়ে সত্য গোপন করে বাড়ি থেকে বেরুতে হয়েছে তাঁকে। চাকরি পোষাচ্ছিল না বলে সে-পাট চুকিয়েই ঘুরতে বেরিয়েছেন তিনি। কবে ফিরবেন ঠিক নেই।

এই চিঠির প্রতিক্রিয়া শুধু একজনেরই মনে নীরবে দাগ কেটেছে। তিনি ঘরের বউ জ্যোতিরাণী। তারপর চিঠিপত্রও বন্ধ হয়েছে। শ্বশুরকে কখনো-সখনো বলতে শোনা গেছে, বাউণ্ডুলেটা কোথায় যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কি করছে না করছে একটা খবরও দেয় না।

তাড়াহুড়োর বিয়ের ভিত কাঁচা হয় নাকি। বিয়ের দু মাস না যেতে বাড়ির কর্তাটির স্নেহে গোছের একটা খটকা বাঁধল মনে। বউয়ের সোনার রং বদলাচ্ছে, চোখে-মুখে টান ধরেছে। শরীরও শুকোচ্ছে। কিছু বললে বা জিজ্ঞসা করলে হাসে, কিন্তু হাসিটা একটুও তাজা মনে হয় না তাঁর। শেষে নিজে থেকেই ছেলেকে ডেকে হুকুম করলেন বউকে মাঝে মাঝে বাপের বাড়ি নিয়ে যেতে। জ্যোতিরাণীকে বললেন, বুড়ো ছেলেকে ফেলে ইচ্ছে করলে বাপের বাড়ি গিয়ে থেকে আসতেও পারে দিনকতক করে। মোট কথা তিনি শরীর ভালো দেখতে চান, মুখে হাসি দেখতে চান।

শিবেশ্বরের সময় নেই। তাঁর এম-এ পরীক্ষার ফল বেরিয়ে গেছে। প্রথম শ্রেণীতে পাস করেছেন, প্রথমও হয়েছেন। এই ফলটা বাড়ির কারো কাছে অপ্রত্যাশিত নয়। শিবেশ্বর সগর্বে স্ত্রীর কাছে ফলাফল ঘোষণা করেছেন। এইটুকুই আসল ক্ষমতার পুঁজি তাঁর। কিন্তু শোনামাত্র স্ত্রীর মুখখানা যে আনন্দে উদ্ভাসিত

হল না, সেটা ভালো করেই লক্ষ্য করেছেন তিনি। এও এক ধরনের উপেক্ষা বলেই ধরে নিলেন। স্বামীর কৃতিত্বে আনন্দ হয় না কোন্ স্ত্রীর?

অতএব বউকে যখন-তখন বাপের বাড়ি ঘুরিয়ে এনে মন ভালো করানোর সময় নেই তাঁর। মাথায় এখন অনেক ভাবনা, বড় কিছু করার ভাবনা। তাছাড়া সেখানে গেলে মেয়েকে দেখেই শাশুড়ী মুখ কালো করেন, মেয়ের শরীর এমন খারাপ হয়ে যাচ্ছে কেন সে-কথা পাঁচবার করে জিজ্ঞাসা করেন।

গেল বারে বিরক্ত হয়ে শাশুড়ীর মুখের ওপর বলে বসেছিলেন, বাবাই দেখা-শুনা করেন, বাবাকে জিজ্ঞাসা করব আদর-যত্নের ত্রুটি হচ্ছে কি না।

শাশুড়ী চুপ। মেয়ে কাঠ।

এরপর শিবেশ্বর আর আসেননি। জ্যোতিরাণী কালীদার সঙ্গে এসেছেন মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। শ্বশুরই পাঠিয়েছেন। কিন্তু আর একজনের সেটা যে পছন্দ নয় জ্যোতিরাণী তা ফেরা মাত্র অনুভব করেছেন। একবার নয়, প্রতিবারই। স্ত্রীর দিক থেকে এও যেন অবাধ্যতাই। এই অবাধ্যতারও মাশুল আদায় হয়েছে। মাশুল আদায়ের একটাই স্থূল রীতি জানা আছে।

দেহে নতুন অশান্তির সূচনা অনুভব করেছে জ্যোতিরাণী। ক্ষিদে হয় না, মাথা ঘোরে, খাবার দেখলে গা ঘুলোয়। খাবারের থালা ফেলে উঠে বাথরুমে ছুটতে হয়। ব্যাপারটা শাশুড়ীর চোখে ধরা পড়েছে প্রথম, পরে শ্বশুর জেনেছেন। শাশুড়ী আনন্দে আটখানা, শ্বশুর উদ্বিগ্ন। কিন্তু ঘরের একজনের কোনো বিকার নেই। অথবা সর্বদাই বিকারগ্রস্ত। জ্যোতিরাণী অবশ্য বলেননি কিছু, কিন্তু শাশুড়ী জানেন যখন, ছেলেরও না জানার কথা নয়।

অশান্ত উদ্‌ভ্রান্ত ইন্দ্রিয় শেষ পর্যন্ত নিজেরই আত্মার কবর খোঁড়ে। শিবেশ্বরও সেই অনিবার্য রাস্তায় পা বাড়িয়েছেন।

এম-এ পাস করার পর বড় ভাবনাটা কোন্ দিকে গড়াচ্ছে জ্যোতিরাণী তা বেশ কিছুদিন ধরে অনুভব করে আসছেন। কিন্তু খুব গোচরের অনুভূতি নয় সেটা, তাই বুঝতে সময় লেগেছে। আর বোঝা গেছে যখন, বুকের তলায় রক্ত ঝরেছে। বিকার কোন্ পর্যায় গড়িয়েছে ভেবে শিউরে উঠেছেন।

বাড়ির মধ্যে একখানা ঘরের একটি মাত্র মানুষকে সব থেকে বেশি এড়িয়ে চলার চেষ্টা বেশ ভাল করেই লক্ষ্য করেছেন শিবেশ্বর। মা জলখাবার হাতে দিয়ে পাঠালেও মাঝামাঝি এসে বউ সে থালা সদার হাত দিয়ে চালান করেছে। দুই-একবার এ-রকম করার পর শিবেশ্বর সদাকে জেরা করেই ব্যাপারটা ধরে ফেলেছেন। তারপর খাবারের থালা মায়ের কাছে নিয়ে গিয়ে প্রায় আছড়ে ফেলেছেন।—তুমি

সদার হাত দিয়ে খাবার পাঠিয়েছিলে ?

মা ভ্যাবাচাকা।—না তো, জ্যোতি নিয়ে গেল তো !

এখান থেকে নিয়ে গেছে, কিন্তু খাবারের থালা ঘরে পৌঁচেছে সদার হাত দিয়ে। রোজই তাই হচ্ছে। এভাবে কষ্ট না দিয়ে কাল থেকে তুমি এখান থেকেই সদার হাত দিয়ে পাঠিও। হাতে-পায়ে ধরে বিয়েটা আমি করেছি জান না ?

সরোষে প্রস্থান। জ্যোতিরাণীর মাথা মাটির সঙ্গে মিশতে চেয়েছে। বারকতক ছি-ছি করে শাশুড়ী নিজে খাবারের থালা নিয়ে উঠে গেছেন আবার। কিন্তু ছেলের সেটাও আবার পছন্দ নয় মনে হতে পরদিন গম্ভীর মুখে বউকে দিয়েই পাঠিয়েছেন। বলেছেন, কষ্ট করে নিজেই গিয়ে দিয়ে এসো, এ বংশের ছেলেদের মান-অভিমান বুঝলে এমন কাজ করতে না। একটু বুঝে চলতে চেষ্টা করো।

এসব পুরনো প্রহসন। শিবেশ্বরের সন্ধানী চোখ অনেক দিন ধরে অনেক কিছু লক্ষ্য করেছে। তাঁর হাঁকডাক শুনে কত সময় মা ছুটে এসেছে, কিন্তু বউ এমনই কাজে মগ্ন যে, তার কানে ঢোকে নি। কালীদার সঙ্গে এমন কি ধারে-কাছে সদার সঙ্গে কোথাও বেরুলেও বউয়ের একরকম মুখ, তাঁর সঙ্গে আর একরকম।

সংশয়ের কাঁটা প্রথমে নিজেকে ক্ষত করে, পরে অন্যকে। নিজের ভিতরে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে বিয়ের আগে প্রথম প্রত্যাখ্যানের খবরটা কানে আসা মাত্র। সংশয়-প্রবণতার ওই কাঁটা এরও কতকাল আগে থেকে পুষ্ট হয়ে এসেছে সেটা মনো-বিজ্ঞানীর বিচারের বিষয়। শিবেশ্বর শুধু নিজের ক্ষতসৃষ্টির সময়টা জানেন আর উপলক্ষ জানেন। ভোগের অপরিহার্য ক্লান্তির দরুন হোক অথবা সংশয় সর্বদা জটিলতর বিবর খোঁজে বলে হোক, শিবেশ্বরের আচরণে হঠাৎ সহজ পরিবর্তন দেখা গেল একটু।

জ্যোতিরাণীও লক্ষ্য করলেন সেটা। গোড়ায় গোড়ায় মন্দ লাগল না। রাতের প্রতীক্ষা অতটা নির্দয়, অতটা নগ্ন মনে হত না। তার বদলে নারী-পুরুষের সনাতন প্রেম-প্রীতির আলোচনায় উৎসাহ দেখলেন তিনি। কালীদা আর মৈত্রেয়ীর ব্যর্থ প্রণয়ের কাহিনী তখনই শুনলেন। উভয় তরফের সেই ব্যর্থতার বোবা বেদনা অতিরঞ্জিত করে বলতে কার্পণ্য করেন নি শিবেশ্বর। বিয়ের পরেও মৈত্রেয়ীর মনে আর কারও জায়গা হয়নি সেটা বেশ জোর দিয়েই ঘোষণা করেছেন। আর বলেছেন, তিনি সেটা একটুও দোষের মনে করেন না। দোষ কেউ করে থাকেন তো করেছেন একজন, তাঁর বাবা।

জ্যোতিরাণীর কাছে এটা একটা খবরের মত খবর। সাগ্রহে শুনেছেন, শোনার পর বেদনা বোধ করেছেন কালীদার জন্য। ওই সদা হাসি-খুশি মানুষটার ভিতরে

এত বড় একটা ব্যথা লুকিয়ে থাকতে পারে তিনি কল্পনাও করতে পারেন না।

কালীদার পরে আরও কয়েকটা কল্পিত প্রেমের চিত্র অথবা ছবির কাহিনী অদল-বদল করে ব্যক্ত করেছেন শিবেশ্বর। একদিনে নয়, প্রতিদিন একটা-আধটা করে। বিয়ের পরে কোন্ বিদুষী রমণী স্বামীকে পূর্ব-প্রণয়ী কল্পনা করে সমস্ত জীবন কাটিয়ে দিল। কোন্ বিদেশিনী একে-একে তিনবার বিধবা হল, অথচ কোন স্বামীকেই কারও থেকে কম ভালবাসে নি। প্রত্যেককে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছে, প্রত্যেকের জন্য হাহাকার করেছে। সেই রমণীও রূপবতী, গুণবতী, বিদুষী। কাহিনীর অন্তে নিজের উদার মতামত ব্যক্ত করেছেন শিবেশ্বর। এর কোনটাই অস্বাভাবিক নয় বা নিন্দার নয়। কারণ প্রেম-প্রীতি-ভালবাসার ব্যাপারগুলো নিছক হৃদয়ের বস্তু, কৌটোয় করে বিশেষ কারও জন্যে আলাদা করে তুলে রাখার জিনিস নয়। যে মেয়ে স্বামীর মধ্যে প্রণয়ীকে কল্পনা করেছে, স্বামীর মধ্যে তার মনের মত প্রীতি-ভালবাসা দেখতে পেলে তা করত না। মৈত্রেয়ী এখনও কালীদাকে ভুলতে পারে নি হয়ত এই কারণে। আবার যে মেয়ে তিন স্বামীকে ভালবেসেছে, সেও তিনজনের মধ্যেই ভালবাসার মত গুণ দেখেছে। মেয়ে বা পুরুষ যে নিয়মে একজনকে ভালবাসে, সেই নিয়মেই একসঙ্গে দশজনকে ভালবাসতে পারে। সমাজের দিক চেয়ে ঘর একজনের সঙ্গেই বাঁধে, কিন্তু দশজনের প্রতি অনুরাগী বা অনুরাগিণী হলে দোষের হবে কেন? এ তো টাকা বা পয়সা নয় বা শাড়ি-গয়নাও নয় যে, ওকে দেব তাকে দেব না।

এইখানেই শেষ নয়, নির্লিপ্ত মুখে শিবেশ্বর নিজের একটা অর্ধ-প্রণয় প্রসঙ্গও বলে গেছেন। এও একেবারে হালের আবিষ্কার।...তাঁর থেকে দু ক্লাস নীচে পড়ত একটা মেয়ে, নাম...সুশীলা। নামটা এই মুহূর্তের আমদানি বলেই সাদামাটা বোধ হয়, মেয়েটি রূপসী নয়, কিন্তু শ্রী আছে, আর ভারী বুদ্ধিমতী। শিবেশ্বর সেই ম্যাট্রিক থেকে বরাবর প্রথম হয়ে আসছেন বলে মেয়েটি তাঁকে ভয়ানক শ্রদ্ধা করত। নিজের পড়াশুনার সাহায্যের আশায় প্রায়ই আসত তাঁর কাছে, সাহায্য পেতও। তার শ্রদ্ধা অনুরাগে এসে দাঁড়াল, শেষে বিয়েই করতে চাইল তাঁকে। জাত-বর্ণের তফাতের দরুন নয়, শিবেশ্বর রাজি হতে পারলেন না কারণ, তিনি জানেন, মেয়েটি আসলে ভালবেসেছে তাঁর বিদ্যেকে, তাঁকে নয়। বিদ্যের প্রতিই তার অপরিসীম অনুরাগ।

তারপর? জ্যোতিরাণীর আগ্রহ দেখা গেছে।

একজন বিদ্বান লোকের সঙ্গেই বিয়ে হয়ে গেছে তার, বেশ ভালই আছে।...ভদ্রলোকটিকে নিয়ে একদিন এসে দেখাও করে গেছে। আমাকে দেখিয়ে দিব্বি

হাসিমুখে বলেছে, ওর ব্রিলিয়েন্ট য়ুনিভার্সিটি কেরিয়ার দেখে ওকেই একসময় বিয়ে করতে চেয়েছিলাম। সকলেই হেসেছে, কারও মনে কোন দাগ পড়ে নি।

তারপর খুব সন্তর্পণে, সেই সঙ্গে সহজ হাসি মুখে লক্ষ্যের দিকে এগিয়েছেন তিনি।—বোকারাই শুধু এসব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায়। যাকগে, আমার কথাও তো শুনলে, এবারে তোমার ব্যাপারটা বল না শুনি, বিয়ে তো প্রথমে করতে চাওনি আমাকে, নিশ্চয় ছিল কেউ?

ভিতরে ভিতরে তক্ষুনি এক অজ্ঞাত আশঙ্কার ছায়া পড়েছে জ্যোতিরাণীর। মাথা নেড়েছেন। কেউ ছিল না।

কেউ না?

আবারও মাথা নেড়েছেন।

এতখানি বিশ্বাস আরোপ করার পর এই জবাবে উদ্দেশ্য বানচাল হবার উপক্রম দেখে শিবেশ্বরের ভিতর থেকে একটা ক্রূর অনুভূতি ঠেলে উঠতে চাইল। কিন্তু সে ভাব দমন করলেন, গোপনও করলেন। হাসি মুখে জ্যোতিরাণীকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করে বললেন, এত সব শোনার পরেও এই সামান্য ব্যাপারে ভয় তোমার! আরও হেসেছেন।—একজন যে ছিল সে তো আমি নিজেই জানি।

স্ত্রীকে প্রায় বক্ষলগ্ন করে রাখার দরুন তার সচকিত ভাবটা স্পষ্টই অনুভব করলেন। চোখেও মুহূর্তের ত্রাস দেখলেন বুঝি। ভিতরটা খল-খল করে উঠল। —কে বলে দেব?

জবাবে জ্যোতিরাণীর সশঙ্ক, নির্বাক প্রতীক্ষা।

কেন, তোমাদের বাড়িঅলার ছেলে? পুলিসের গুলীতে শেষ পর্যন্ত মারা গেল যে?

অস্বস্তি ঘোচে নি, তবু যেন জ্যোতিরাণী নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। আর কোন্ নামের ত্রাস তাঁকে আতঙ্কিত করেছিল, সে শুধু তিনিই জানেন। গৌরবিমল নাম।

ঠিক বলেছি কি না? শিবেশ্বরের চোখে-মুখে প্রসন্ন হাসি।

তোমাকে কে বলল? অস্ফুট প্রশ্ন জ্যোতিরাণীর।

তোমাদের বাড়ির লোকের মুখেই তো তার গল্প শুনেছি, এ কি গোপন করার কিছু না ঘাবড়াবার কিছু?

বাড়ির লোক কবে আবার এই গল্প করল জ্যোতিরাণী ভেবে পেলেন না। তবে বলার ধরনে ভরসা পেলেন বটে।

ছেলেটাকে খুব ভালবাসতে তুমি, তাই না?

জ্যোতিরাণী নিরুত্তর।

ওরকম ছেলেকে তো ভালবাসা দোষের নয়, না বাসলেই বরং তোমার হৃদয় নেই বলতাম। খুব ভালবাসতে তো?

ও আমাকে খুব পছন্দ করত।

কিন্তু মরে যেতে তুমি খুব কেঁদে ছিলে শুনলাম।

ওভাবে মরে গেল যে···সকলেই কেঁদেছিল।

তা তো বটেই, শিবেশ্বরেরও সহানুভূতির স্বর, দেশের জন্য মরেই গেল, বেঁচে থাকলে জীবন হয়ত কত সুন্দর হতে পারত।

জ্যোতিরাণীর বুকের তলার স্মৃতির বেদনা মুখেও প্রকাশ পেল। দৃষ্টি ছলছল।

কি যেন নাম ছিল ছেলেটার?

শোভাদা।

বেশ সুন্দর চেহারা ছিল, তাই না?

স্মৃতির মণিকোঠায় চলে গেছেন জ্যোতিরাণী। মৃদু হেসে মাথা নেড়েও জবাব দিলেন, মেয়ে-মেয়ে দেখতে ছিল।

তাহলেও বেশ লম্বা-চওড়া আর জোয়ান ছিল তো?

জ্যোতিরাণী ঈষৎ হাসি মুখেই মাথা নাড়লেন। তা ছিল না।

শিবেশ্বরের চিন্তার সঙ্গে মিলল না। স্ত্রীর এই সহজতা দেখার সঙ্গে সঙ্গে মগজে ছুরির ফলার মত আবার এক বিষাক্ত ধারণা কেটে বসছে।···অতীতে ওই ছেলেটাকে যতই পছন্দ করুক, তার পরে আরও কেউ এসেছে নিশ্চয়। নইলে একটু আগে প্রসঙ্গ তোলামাত্র এই দেহের কাঁপুনি অনুভব করেছিলেন কেন— চোখে ত্রাস দেখেছিলেন কেন?···তিনি সঠিক জায়গায় আঙুল ফেলতে পারেন নি বলেই নিশ্চিত মুখে কথা বলছে এখন।

জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, তোমার সেই শোভাদার ছবি আছে? দেখতাম একবার, ওই বয়সে দেশের জন্যে জীবন দিলে···

বাড়িতে আছে। মারা যাবার পর সকলের সঙ্গে তোলা হয়েছিল, আমি এক কপি চেয়ে রেখে টাঙিয়ে রেখেছিলাম।

শিবেশ্বর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন, তারপর আর কাকে তোমার পছন্দ হয়েছিল বল।

যে প্রসঙ্গে কথা চলছিল সেটাই মনে ধরেছিল জ্যোতিরাণীর। জিজ্ঞাসা করলে শোভাদাকে নিয়েই আরও গল্প করতে পারতেন। কিন্তু প্রসঙ্গ বদল হওয়ার ফলে আবার সেই পুরনো অস্বস্তি উঁকিঝুঁকি দিল। মাথা নেড়ে জানালেন, কাউকে না।

পরদিন নিজে থেকেই বউ নিয়ে শ্বশুরবাড়ি ঘুরে আসার আগ্রহ দেখা গেল

শিবেশ্বরের। জ্যোতিরাণীর রুগ্না মা অনেকদিন বাদে মেয়ের মুখে সামান্য একটু উজ্জ্বল আভা দেখলেন যেন। তারই ফলে জামাইকে ডেকে কাছে বসিয়ে অনেক আদর-যত্ন করলেন তিনি।

অর্থনীতিতেও মনস্তত্ত্বের একটা বড় জায়গা আছে। তার খুব একটা রকমফের নেই। সেই মনস্তত্ত্বের ওপরে নির্ভর করেই শ্বশুরবাড়ি এসেছেন শিবেশ্বর, এবং স্ত্রীটিও সেই ফাঁদে পা দিয়েছে। একফাঁকে একখানা বাঁধানো ফটো এনে শিবেশ্বরকে দেখালেন জ্যোতিরাণী। না দেখালে অবশ্য শিবেশ্বরের নিজেরই মনে পড়ত এবং দেখতে চাইতেন। তার আর দরকার হল না।

কাল দেখতে চেয়েছিলে, এই দেখো শোভাদার ছবি।

নিবিষ্ট চোখেই দেখলেন শিবেশ্বর। দেখার কিছু নেই, রোগজীর্ণ মৃত দেহ, গালে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। কিন্তু শিবেশ্বর দেখছেন জ্যোতিরাণীকে। যারা আছে সকলেই কাঁদছে, কিন্তু স্ত্রীটি চোখে-মুখে আঁচল চাপা দিয়ে একেবারে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

দেখার পর শিবেশ্বর বললেন, ফটোটা তোমারই তো, বাড়ি নিয়ে চল। ছবিটা নিজেই একটা কাগজে মুড়ে নিলেন তিনি। এই আগ্রহ আবার জ্যোতিরাণীর অস্বাভাবিক লাগল কেমন। তবু সামনের রাতটা কল্পনাও করতে পারেন নি তিনি। তখনও জানেন না, সংশয়ের অবধারিত পরিণাম বিশ্বাসঘাতকতার রূপ কেমন হতে পারে।

বাড়িতে রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর জ্যোতিরাণী ঘরে আসার দু মিনিটের মধ্যে শিবেশ্বরের বিগত রাতের শেষের প্রসঙ্গ তুললেন আবার। গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার ওই শোভাদার পরে আর কাকে পছন্দ হয়েছিল তোমার ?

জ্যোতিরাণী ধাক্কা খেলেন একটা। প্রশ্নের দরুন নয়, বিগত কটা মাসের সেই মুখ দেখে।

এত করে বোঝাবার পরেও কাল বললে না, আজ বলতে হবে। বললে তোমার ক্ষতি হবে না, আমি নিশ্চিন্ত হব। কাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলে তুমি ?

জ্যোতিরাণী অস্ফুট স্বরে জবাব দিলেন, কাউকে না।

সেই ছবিটা হাতে নিলেন শিবেশ্বর, ওপরের কাগজ সরিয়ে দেখলেন একটু। ঠোঁটের ফাঁকে রাগ-চাপা হাসি। চোখে চোখ রাখলেন, বলবে কি বলবে না ?

চেয়ে আছেন জ্যোতিরাণীও।

বেশ। না বললে কথা তো আর পেটের থেকে টেনে বার করা যায় না।... তোমার শরীর মনের জন্য বাবার বড় দুশ্চিন্তা। এই ছবিখানাই বাবাকে দেখাব তাহলে। তিনি জানতে পারবেন, প্রায় অর্ধেক-বিধবার সঙ্গে তাঁর ছেলের বিয়ে

হয়েছে, বউয়ের শরীর মন ভাল থাকবে কি করে।

সমস্ত মুখ বিবর্ণ, জ্যোতিরাণী স্তব্ধ।

মুখে যা বলেছেন শিবেশ্বর কাজে তা করেন নি। পারতপক্ষে বাপের মুখোমুখি আজও দাঁড়ান না। কিন্তু এক কাজে তিনি সফল হয়েছেন। অল্পবয়সী বউয়ের সারাক্ষণের শান্তি কেড়ে নিতে পেরেছেন। তার মুখে যেটুকু আশার আলোর আভাস গত কয়েকদিনে দেখেছিলেন, সেটা নেভাতে পেরেছেন। জ্যোতিরাণীর বুকের ভেতরটা দুমড়ে গেছে, মুচড়ে গেছে। হীনতার এমন নজির আর দেখেন নি। কিন্তু শিবেশ্বর বউয়ের এই প্রতিক্রিয়ার ভিন্ন অর্থ করেছেন। গোপনতার পর্দায় টান পড়েছে ভেবেছেন। বউ সেই কারণেই সদাশঙ্কিত, সদাবিষণ্ণ ধরে নিয়েছেন।

নিজেকে তিনি অনুদার ভাবেন না। জ্যোতিরাণীকে ভালবাসেন না একথাও মনে করেন না। তিনি কেবল জানতে চান রূপসী বউ কেন তাঁকে বাতিল করেছিল। তিনি শুধু শুনতে চান বিয়ের আগে আর কে বা কতজন তার অনুরাগী হয়ে উঠেছিল। নিজে তিনি রূপ দেখে পাগল হয়েছিলেন, আর কেউ হবে না কেন? তাদের মধ্যে কেউ না কেউ প্রশ্রয় না পেলে কেন বিয়েতে অমত, কেন বিয়ের আসরে মুখ তুলে তাকাতেও আপত্তি, বিয়ের পরে কেন গোড়া থেকেই তাঁকে এড়ানোর চেষ্টা? এই অজ্ঞাত ব্যাপারটার ফয়সালা হয়ে গেলেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যেতে পারে ভাবছেন। তাঁর উদারতায় জীবনযাত্রার গতি সহজ হতে পারে ভাবছেন।

সব বিকারের এই রীতি। সমস্যা ভিতর থেকে সৃষ্টি হয়, মাকড়শার মত নিজের চারধারে সেটা একের পর এক জাল বোনে।

ভাবনা যখন কোনো মেয়েকে নিয়ে, তার সঙ্গে পুরুষ যুক্ত হবেই। শিবেশ্বরের ভাবনাও নতুন পথে চলার খোরাক পেল হঠাৎ। হাতের নাগালের মধ্যে একজন পুরুষের ছায়া দেখলেন তিনি।

ব্যাপার কিছুই নয়, শাশুড়ীর নির্দেশে কালীদার ঘরে বিকেলের জলখাবারের থালা রেখে আসতে গেছলেন জ্যোতিরাণী। নতুন নয়, রোজই তাই করে থাকেন। সেদিন আসতে কালীদা বললেন, অনেকদিন বাদে মামুর একখানা চিঠি পেলাম হঠাৎ, কাশী থেকে লিখেছেন। জানতে চেয়েছেন শিবু কি করছে আর জ্যোতি কেমন আছে।

কিছু না বলে জ্যোতিরাণী নিষ্প্রভ মুখে তাকালেন শুধু।

আমি লিখে দিলাম, শিবু আপাততঃ বউ শাসন ছাড়া আর কিছু করছে না,

। জ্যোতি' । করে ওর মাথায় বরফ চাপাতে পারছে না সেই দুঃখে গোঁ ধরে নিজের শরীর নিপাত করছে।

যে-রকম গম্ভীর মুখে কালীদা বললেন, যাতনা সত্ত্বেও জ্যোতিরাণী হেসে ফেলেছিলেন। কথাগুলো কতখানি মনের মত কালীদার ধারণা নেই, তাই ঘর থেকে বেরুবার পরেও মুখের হাসি মুছে যায় নি।

শিবেশ্বর তখন নিজের ঘরের সামনে বারান্দার ওধারে দাঁড়িয়ে। জ্যোতিরাণী লক্ষ্যও করেন নি, কিন্তু শিবেশ্বর দেখলেন। হাসি দেখলেন। দিনের পর দিন··· কতদিন হাসি দেখেন নি, ভুরু কুঁচকে চিন্তা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্ক সক্রিয় হয়ে উঠল তাঁর।

স্ত্রীকে তারপর যতবার দেখলেন ব্যতিক্রম দেখলেন। ব্যতিক্রম কিছু ছিল না তা নয়। জ্যোতিরাণী অন্যমনস্কই ছিলেন একটু। মামাশ্বশুরের চিঠির কথাই ভাবছিলেন। সম্ভব হলে চিঠিখানা চেয়ে নিয়ে পড়তেন। চিঠির খবরের মধ্য দিয়ে এই একজনের নীরব স্নেহ অনুভব করছিলেন তিনি। মন থেকে বারবার ঠেলে দেওয়া সত্ত্বেও ছাদের ওপরে এক বিকেলের কয়েকটা মুহূর্ত উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল। সেই কটা মুহূর্তই আজ তাঁকে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছে কিনা জানেন না।

কালীদা তখন কি বলছিল? রাতে ঘরে ঢোকামাত্র অতর্কিত প্রশ্ন নিক্ষেপ করলেন শিবেশ্বর। তাঁর চিন্তায় এসব ব্যাপারে প্রস্তুত হবার অবকাশ দেওয়া মানেই ভুল করা।

থতমত খেয়ে জ্যোতিরাণী চোখ তুলে তাকালেন শুধু। কি জানতে চায় সেটাই বোধগম্য হল না।

বুঝতে পারছ না?

কখন?

বিকেলে যখন খাবার দিতে গিয়ে খুব হাসতে হাসতে ফিরলে দেখলাম? বেশি বলে সতর্ক করে দিতে চান না।—কি কথা হল?

মামাবাবুর চিঠি এসেছে বলছিলেন।

কি লিখেছে?

জানি না।

কিন্তু শিবেশ্বরের হঠাৎ যেন অনেকখানি জানা হয়ে গেল।—চিঠি এসেছে শুনে তোমার অত হাসার কি হল?

বিয়ের এই চার-পাঁচ মাসের মধ্যে জ্যোতিরাণীর বয়েস বড় দ্রুত বেড়ে গেছে। মুখের কথা আর মনের কথায় তফাৎ খোঁজা শুরু হয়ে গেছে তাঁর। তফাৎ

দেখলেন। খুব অস্পষ্ট। জবাবও এই প্রথম দিলেন, কালীদা তোমার মাথায় বরফ চাপাতে বলছিলেন।

কালীদার কথার ধরন জানেন শিবেশ্বর। কিন্তু রাগের বদলে তাঁর চোখে-মুখে আগ্রহ প্রকাশ পেল।—কেন কেন? কালীদাকে তোমার কোনো দুঃখের কথা বলেছ নাকি?

জ্যোতিরাণী মৃদু জবাব দিলেন আবারও, বলার দরকার হয় না, সকলেরই চোখ আছে।

শিবেশ্বর আবার নতুন করে ভাবতে শুরু করেছেন।…কালীদা নয় কেন? বাইরে কালীদা যে-ভাব নিয়েই থাকুক, মৈত্রেয়ীর পিছনে ঘুরত যখন তখনই তার ভিতর জানা গেছে। ভিতরের সেই আত্মবিহ্বল তাড়না শিবেশ্বরের অন্তত জানতে বাকি নেই।…জ্যোতিরাণীর সঙ্গে মৈত্রেয়ীর কোনো তুলনা হয় না। শরীর এত যে খারাপ হয়েছে, তাও না। তাহলে কালীদা নয় কেন? বিয়ের আগে শিবেশ্বর অবশ্য কালীদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, জ্যোতিরাণীকে তাঁরই বিয়ে করার মতলব কি না। কালীদা অস্বীকার করেছিল, বলেছিল, ফ্রক-পরা থেকে দেখেছে। কিন্তু দেখেছে যখন, কালীদারও এই বয়েস নয় তখন। তাকে বুদ্ধিমানই ভাবেন শিবেশ্বর। মৈত্রেয়ীর পর আবার কোনো মেয়ের দিকে ঝুঁকলে এই বাড়িতে বাস ঘুচবে জানত, কারণ বাবাকে অত ভয় আর কেউ করে না। তাছাড়া কালীদার আর একটা কথাও মনে পড়ল। তাঁকে নিশ্চিন্ত করার জন্য বলেছিল, মেয়ের বাড়ির লোকেরা বিয়ের কথা ভাবছে বটে কিন্তু মেয়ের হাতে দড়ি-কলসী দিয়ে বিয়ে দেবার কথা ভাবছে না। অর্থাৎ কালীদা দড়ি-কলসী তুল্য। কথাটার মধ্যে সত্য থাকতে পারে, সে বিয়ে করতে চাইলে মেয়ের বাড়ি থেকেই আপত্তি উঠত হয়ত। কিন্তু বাবার ভয়ে বা কারো আপত্তির ভয়ে চোখও অন্ধ হবে তার কি মানে? যে রূপ দেখে তিনি নিজে পাগল হয়েছিলেন, সেই রূপ কি কালীদা দেখেনি?…দিনের পর দিন দেখেছে। মৈত্রেয়ীকে দেখে যে মুগ্ধ হতে পারে, এই একজনকে দেখে সে কি মুখ ফিরিয়ে থেকেছে?

…এই জন্যেই কি তাঁর বিয়েতে কালীদার এত আগ্রহ ছিল? এই জন্যেই বলা মাত্র কবার করে ছোটাছুটি করেছিল? বিয়ের সময় দশ হাতে কাজ করেছিল? নিজে যাকে পাবেই না, সে বাড়িতে আসুক, কাছে থাকুক—এই জন্য?

…এক বাড়িতে থেকে কালীদার আজকাল দেখাই পাওয়া যায় না কেন? তাঁর হাসি-ঠাট্টায়ও ছেদ পড়েছে। বাড়িতে থাকলে ঘরের বার হয় না বড়। কিন্তু পড়া-শুনায় মন যে কত সে তো শিবেশ্বর জানেন। চোখের সামনে একবার বই খুললে

ফেল কেউ করতে পারে বলেই মনে হয় না তাঁর। গেল বারে ফেল তো করেছিল শুধু মৈত্রেয়ীর জন্য।

গোড়ায় গোড়ায় তবু এই নতুন ভাবনাটা প্রতিরোধই করতে চেষ্টা করেছেন শিবেশ্বর। কালীদার সঙ্গে সম্পর্কটা আজকের নয়। ছেলেবেলার সম্পর্কে হৃদয়ের যোগ কিছু থাকেই। তাছাড়া, শিবেশ্বরের অন্তরঙ্গ বলতে কেউ নেই, এই এক-জনই তবু কিছুটা কাছের মানুষ। সন্দেহ সত্যি হলে মনের আর একটা দিক নিঃস্ব হয়ে যায়। শিবেশ্বর চান না যা তিনি ভাবছেন তা সত্যি হোক। কিন্তু এই রোগ শূন্য থেকেই রসদ সংগ্রহ করে থাকে। তিনি চান না-চান, ভাবনাটা ক্রমে আকার নিতে লাগল। তারপর তারই মধ্যে নিবিষ্ট হলেন।

জ্যোতিরাণী সেটা টের পেলেন দিনকতকের মধ্যেই।

সকালে বিকেলে যখনই কালীদার ঘরে খাবার নিয়ে গেছেন বা খাবার দিয়ে তাঁর ঘর থেকে বেরিয়েছেন, তখনই দেখেছেন এদিকের দরজায় সজাগ দৃষ্টি নিয়ে একজন দাঁড়িয়ে। সকালের দিকে তাড়াতাড়ি খেয়ে কালীদা অ্যাটর্নী আপিসে বেরিয়ে যান, শাশুড়ীর নির্দেশে জ্যোতিরাণীকে তখন সামনে থাকতে হয়। দেখেছেন তখনও···ঘর থেকে সেই সময় আর একজন বেরিয়ে আসবেই, অন্যমনস্কের মত এদিক-ওদিক ঘুরঘুর করবে। অনেক উপলক্ষেই এই একই ব্যাপার দেখলেন তিনি।

জ্যোতিরাণীর যে বয়স তখন, এই জটিলতার ব্যাপারটা এত সহজে আঁচ করতে পারার কথা নয়। কিন্তু বয়স তাঁর ঘরের লোকই বাড়িয়ে দিয়েছে, জটিলতার ছায়া চেনাতে শিখিয়েছে।

মন নতুন করে বিষিয়ে উঠতে লাগল আবার। এদিকে দেহের মধ্যেও অশান্তির শেষ নেই। অনাগত শিশুর আগমন ঘোষণা দিনে দিনে স্পষ্ট হচ্ছে, পুষ্ট হচ্ছে। সে যেন তাঁর জীবনীশক্তি টেনে নিচ্ছে। চলতে গেলে মাথা ঘোরে, চোখে অন্ধকার দেখেন। আয়নায় নিজের দিকে তাকাতে পারেন না, বিকৃত, কুৎসিত মনে হয় নিজেকে।

কোথাও একটা ব্যতিক্রম ঘটছে—বাড়ির কর্তা সুরেশ্বর চাটুজ্জে সেটা অনুভব করতেন। কিন্তু কি সেটা ঠাওর করে উঠতে পারতেন না। তাঁর কেবল মনে হত বাড়িটার হাওয়া বদলাচ্ছে। আদরের বউয়ের স্বাস্থ্য নিয়ে তাঁর দুশ্চিন্তা ছিল। সন্তান-সম্ভাবনার দরুন শরীর খারাপ হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু এতটা কেন খারাপ হবে তিনি বুঝে ওঠেন না। নিজেই তিনি ডাক্তার ডেকেছেন, দেখিয়েছেন, কিন্তু তারতম্য চোখে পড়ছে না। ওদিকে ক'মাস পার হয়ে গেল ছেলের পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে, অথচ, সে-ও এমন হাত-পা গুটিয়ে বসেই আছে কেন বুঝছেন না।

ঠিক ছ মাসের শেষাশেষি যে ব্যাপারটা ঘটল, সব থেকে বেশি হকচকিয়ে গেলেন সম্ভবত তিনিই।

জ্যোতিরাণীর মা অনেকদিন ধরেই অসুস্থ। রুগ্ন। তাঁর অসুখ বাড়াবাড়ির দিকে গড়ালো। কিন্তু সেটা যে বাড়াবাড়ি তা স্পষ্ট করে বোঝা গেল না মহিলার সহ্যশক্তির দরুন। কাউকে ভাবাতে চান না তিনি, কাউকে বিরক্ত করতে চান না। যাই হোক, অসুখের খবর আসতে শ্বশুরই শাশুড়ীকে বললেন, জ্যোতি-মাকে পাঠিয়ে দাও, কিন্তু নিজেরই যে-রকম শরীর, ভালো থাকলে যেন চলে আসে।

শাশুড়ী ছেলেকে বললেন নিয়ে যেতে। শিবেশ্বর সাফ জবাব। দিলেন, বিকেলের আগে তাঁর সময় হবে না।

তাহলে কালী নিয়ে যাক। আপিসে যাবার সময় দিয়ে আসবে, ভালো থাকলে সন্ধ্যার পর আবার নিয়ে আসবে।

অতএব সময় শিবেশ্বরের হল। নিয়ে গেলেন। সেই বাড়ির লোকেরা মেয়েকে আশ্বাস দিলেন, ডাক্তার দেখে গেছে, ভয়ের কিছু নেই, সেরে যাবে। তারপর শিবেশ্বরকে অনুরোধ করলেন, ও মায়ের কাছে থাক না দিনকতক।

গম্ভীর মুখে শিবেশ্বর মাথা নাড়লেন।—মা নিয়ে যেতে বলেছেন, বাবার শরীরটাও ভালো না।

যে-ভাবে বললেন, দ্বিতীয়বার অনুরোধ কেউ করলেন না। জ্যোতিরাণী নিঃশব্দে দেখলেন, নিঃশব্দে শুনলেন। তারপর নিঃশব্দেই ফিরে এলেন।

এরপর যে তিন দিন এলেন মা-কে দেখতে, এলেন কালীদাকে নিয়ে। বিকেলে এসেছেন দু দিন, ফিরতে রাত হয়েছে। আর একদিন কালীদার ছুটি ছিল। বাড়ি ফিরে প্রতিদিনই অস্বাভাবিক মূর্তি দেখেছেন ঘরের ব্যক্তিটির। তবু নিয়ে যাবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করতে প্রবৃত্তি হয়নি। সেই বাপেরই মেয়ে তিনি, যাঁর ভিতরে আগুন ছিল। গোঁ যে নিজেরও আছে, বিয়ের আগে সেটা অনুভব করার সুযোগ হয়নি শুধু।

মাঝে দিনতিনেক যাননি। সেদিন খবর পেলেন অসুখটা হঠাৎ খারাপের দিকে ঘুরেছে। ভাগ্যক্রমে কালীদা বাড়ি ছিলেন, শিবেশ্বরের কাছে বাইরের ঘরে কে এসেছে। জ্যোতিরাণী তক্ষুনি চলে গেলেন। শাশুড়ী বলে দিলেন, চৈত্রের শেষ, সম্ভব হলে যেন চলে আসেন, পরদিন সকালেই না-হয় আবার তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

শিবেশ্বর তাঁদের যেতে দেখলেন। একটু বাদে উঠে এসে মায়ের মুখে খবর শুনলেন। মা বললেন, তাঁরও একবার যাওয়া উচিত।

সেই উচিত কাজটা শিবেশ্বর করলেন রাত্রি আটটার পরে। দুজনকে তখনো ফিরতে না দেখে। শ্বশুরবাড়ি এসেই শুনলেন, জ্যোতিরাণীকে নিয়ে কালীদা মিনিট

পাঁচেক আগে রওনা হয়ে গেছেন। রোগিণী ঘুমুচ্ছিলেন বলে বাড়ির মানুষেরা অন্য ঘরে কথাবার্তা কইছিলেন। ফলে শাশুড়ীর অবস্থা সঙ্কটজনক কিছু মনে হল না শিবেশ্বরের। শুনলেন বটে খারাপ হয়েছিল, এখন একটু ভালো মনে হচ্ছে। শাশুড়ীর ঘরে এলেন। দেখলেন। তারতম্য দেখার মন নয় বলেই তারতম্য কিছু চোখে পড়ল না। শিয়রের কাছে বসে শুধু তাঁর খুড়ী-শাশুড়ী।

পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই বেরিয়ে পড়লেন আবার। বাড়ি ফিরতে মা জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন আছে বেয়ান?

বউকেও জিজ্ঞাসা করেছেন, ছেলে গেছল বলে ছেলেকেও করলেন। জ্যোতিরাণী সেখানেই দাঁড়িয়ে, কালীদাও। একটু আগেই ফেরা হয়েছে বোঝা যাচ্ছে। তিক্ত কণ্ঠে শিবেশ্বর বলে উঠলেন, কেমন আবার—ভালই, বেড়াতে ভালো লাগে কিছু একটা বলে বেড়াতে বেরোয়, আমাকে তোমার এভাবে ঠেলে পাঠাবার দরকার কি ছিল? সবেতে তোমার বাড়াবাড়ি—

মা আকাশ থেকে পড়লেন, কালীনাথ হতভম্ব। জ্যোতিরাণী নিস্পন্দ।

কথাটা কিরণশশী একেবারে হজম করতে পারলেন না। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কর্তাকে জানালেন, ছেলে এই-এই বলছিল। অবাক তিনিও। বিশ্বাস করতে পারলেন না, আবার খটকাও লেগে থাকল একটু। রাতে খেতে বসে খুব সাদাসিধে-ভাবে বউকে বললেন, তোমার মায়ের অসুখটা তেমন ভয়ের কিছু না শুনলাম··?

জ্যোতিরাণী নির্বাক।

ঠিক দু দিন বাদে বাপের বাড়ির লোক ছুটে এলো আবার, খবর ভালো না, এক্ষুনি যাওয়া দরকার। শিবেশ্বরের সামনেই জ্যোতিরাণী চুপচাপ শুনলেন শুধু, তার-পর তাকে বিদায় করলেন। যাবার নামও করলেন না। খবরটা পেয়েছিলেন বেলা তিনটে নাগাদ। সন্ধ্যায় আবার লোক এলো। জ্যোতিরাণী বাইরেই ছিলেন তখন।

মা মারা গেছে।

জ্যোতিরাণী অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলেন একটা। ওদিকের ঘর থেকে শ্বশুর-শাশুড়ী বেরিয়ে এলেন, এদিকের ঘর থেকে কালীদা। তার আগেই মুখে শাড়ির আঁচল গুঁজে দিয়ে প্রায় পড়তে পড়তে টলতে টলতে জ্যোতিরাণী নিজের ঘরে এলেন। মাটিতে আছড়ে পড়তে যাচ্ছিলেন, কিন্তু শয্যায় যে বসে তাকে দেখা মাত্র ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মত ছিটকে সোজা হলেন। মুখ থেকে শাড়ির আঁচল খসে গেল। রাগে ঘৃণায় বিদ্বেষে দুই চোখ ধক-ধক করে উঠল। গলার স্বরে আগুন ঝরল।

তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠলেন, মা নেই—বুঝলে? তোমার জন্যে মা মরার

আগেও এতটুকু শান্তি পেল না, এ আমি জীবনেও ভুলব না, ভুলব না, ভুলব না! তুমি নীচ নীচ নীচ নীচ !

মাটিতে বসে পড়লেন।

মৃত্যুর খবর শুনে তাড়াতাড়ি ঘরের দিকে এসেছিলেন শ্বশুর, শাশুড়ী, কালীনাথ। দাঁড়িয়ে গেছেন। ঘরের পরদাটা সরানো ছিল। ওই মূর্তি দেখে চোখ ধাঁধিয়ে গেছে। কথাগুলো কানের পরদা ছিঁড়ে দিয়ে গেছে।

বিভ্রান্ত, বিমূঢ় তিনজনেই।

ঘরের মধ্যে হয়ত বা শিবেশ্বরও।

॥ চোদ্দ ॥

আপসের দুই ধারা। একদিক ছেড়ে দিয়ে অন্যদিক ধরতে হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুটো দিকই খোয়াতে হয়।

শেষের ব্যাপার দূরের ব্যাপার। সুরেশ্বর চাটুজ্যে আপাতত জ্যোতিরাণীর দিকটাই শক্ত হাতে ধরতে গেলেন।

সেই রাতে তিনিই প্রথমে ঘরে ঢুকেছেন। মেঝেতে বসেছেন। বউকে কোলের কাছে টেনে নিতে চেয়েছেন। বিড়বিড় করে বলেছেন, জ্যোতি-মা···জ্যোতি-মা··· আমার দিকে তাকাও।

জ্যোতিরাণীর সর্বশরীর থরথর করে কেঁপে উঠেছে। তিনি যদি শ্বশুরকে আঁকড়ে ধরে তাঁর কোলে মাথা গুঁজতে পারতেন, যদি অনেকক্ষণ ধরে ফুলে ফুলে কাঁদতে পারতেন, ভালো হত। শ্বশুর সেইরকমই আশা করেছিলেন। কিন্তু জ্যোতিরাণী নিজের অজ্ঞাতে শাড়ীর আঁচল মাথায় তুললেন, কাপড় মুখে গুঁজে কান্না রোধ করলেন। ফলে দেহ আরো বেশি কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

কিরণশশী আর কালীনাথও এসে দাঁড়িয়েছিলেন। সুরেশ্বর ইশারায় জল চাইলেন। কালীনাথ জল এনে দিতে নিজে হাতে বউয়ের চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিলেন তিনি, ভিজে হাতে ঘাড় কান মুছিয়ে দিলেন, মাথায়ও জল চাপড়ে দিলেন একটু। তারপর হঠাৎ ছেলের দিকে ফিরে আদেশ করলেন, একটা গাড়ি ডাকো।

মূর্তির মত দাঁড়িয়েছিলেন শিবেশ্বর। কালীনাথই তাড়াতাড়ি দরজার দিকে এগোলেন। বাধা পড়ল।—তোকে বলিনি। ঠাণ্ডা চোখে আবার ছেলের দিকে তাকালেন।—এক্ষুনি একটা গাড়ি ডাকতে হবে।

শিবেশ্বর বেরিয়ে গেলেন। দু-মিনিটের মধ্যে ট্যাক্সি ডেকে আনলেন। বউকে ধরে নিয়ে গাড়িতে তুললেন সুরেশ্বর। নিজেও পাশে বসলেন। তারপর ছেলের দিকে ফিরে আবার আদেশ করলেন, ওঠো—

শোকের বাড়ির সকলেই জ্যোতিরাণীর প্রতীক্ষায় বসেছিল। সুরেশ্বর তাদের জানালেন, বউমার শরীরটা ভালো নয়, খবর শুনে আরো খারাপ হয়েছে, আসতে দেরি হয়ে গেল।

ঘণ্টাখানেক বাদে জ্যোতিরাণীর মায়ের দেহ নিয়ে বেরুনো হল। একটু বাদে সুরেশ্বর উঁকি দিয়ে দেখেন, বউ মায়ের খাটে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। খুড়ী-জেঠিরা তাকে ঘিরে বসে আছে। ফিরে এসে ছেলেকে বললেন, রাতটা তোমাকে এখানে থাকতে হবে।

পরদিন সকালে নিজেই আবার ট্যাক্সি করে এসে বউকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন।

বাড়িতে তিন দিনের কাজ চুকে গেল। ও-বাড়ির দশ দিনের কাজেও ছেলে বউসহ নিজে সর্বক্ষণ উপস্থিত থাকলেন। বাড়িতে কর্মকর্তাদের হাতে জোর করে একফাঁকে কিছু টাকাও গুঁজে দিলেন, বললেন, জামাইকে ছেলের কাজ করতে দেওয়া উচিত। এ-বাড়ির লোকেরা জ্যোতিরাণীর সামনে তাঁর শ্বশুরের অনেক প্রশংসা করলেন। সেই সঙ্গে একটা বিস্ময় তাঁদের অনুক্ত থাকল—বাপ এমন, ছেলে এ-রকম কেন!

শ্বশুরের প্রতি জ্যোতিরাণী কৃতজ্ঞ। তিনি বাপের কাজ করেছেন। সকলের কাছে বউয়ের মুখ রক্ষা করেছেন। কিন্তু তবুও শুধু তাঁরই মুখ চেয়ে নিজের দু-পায়ের ওপর জোর দিয়ে দাঁড়াবার শক্তি যেন হারিয়ে ফেলেছেন।

দিন কাটছে একটা দুটো করে। বউয়ের ওপর মনে মনে ক্ষুণ্ণ হয়ে আছেন শাশুড়ী কিরণশশী। মা মরলে শোক সকলেরই হয়। কিন্তু সেই সন্ধ্যায় ওই মূর্তি দেখেছিলেন কেন, আর তার মুখে অমন দুঃসাহসের কথাই বা শুনেছিলেন কেন—সেটা তাঁর মাথা থেকে যায়নি এখনো। পাঁচবার করে তাঁর ছেলেকে নীচ বলেছে। ছেলে হয়ত তার শাশুড়ীর অসুখটা খুব বড় করে দেখেনি, তার জন্যে এমন রাগ আর এমন সব স্পর্ধার কথা! বউয়ের শরীরের হাল দেখে মুখ বুজে আছেন। মনে মনে আশা করছেন, কর্তাও এত বড় অপমান বরদাস্ত করবেন না, সময় হলে নিজেই জিজ্ঞাসা করবেন, এসব কথার কি মানে।

কিন্তু কর্তা সেই চিন্তার ধার দিয়ে গেলেন না। আপসের দুই ধারার একটা দিকই বেছে নিয়েছেন তিনি। বউয়ের দিক। জ্যোতিরাণীর সেই মূর্তি আর সেই কথা শুনে আঘাত তাঁরও লেগেছিল। কিন্তু সেটা তিনি সামলাতে পেরেছিলেন

নিজের ছেলেকে চেনেন বলে। মায়ের অসুখের নাম করে বউয়ের বেড়াতে বেরুনোর শখ—এরকম একটা কদর্য ছেলে তার মায়ের কাছে কেন করেছিল, অবকাশ সময়ে সেটাই তলিয়ে ভাবতে চেষ্টা করেছিলেন তিনি। ভেবে ঠিক ঠাওর করতে পারেননি। অপমানে একমাত্র মেয়ে মৃত্যু-শয্যায়ও তার মাকে দেখতে যায়নি। তারপর তাঁর কেবলই মনে হয়েছে, সেই রাগ আর সেই ক্ষোভ শুধু ওই অপ্রীতিকর ব্যাপারটার জন্যেই নয়। তার মূল অনেক গভীরে। অনেক দিনের অনেক যাতনার ফল ওটা। নইলে এরকম হতে পারে না।

···প্রতিমার মত বউ। দেখলে চোখ জুড়োয়। মনে মনে ছেলেটার পছন্দের প্রশংসাই করেছিলেন তিনি। কিন্তু বিয়ের পর অমন বউকে তেমন তো হাসতে দেখেন নি। শুধু হাসি নয়, তার মুখের তাজা ভাবও যেন দিনে দিনে ম্লান হয়েছে। তাই সেই সন্ধ্যার ব্যাপারটা শুধু সেদিনের ব্যাপার নয়, এটা তাঁর স্থির অনুমান।

মায়ের অসুখ শুনেও না দেখতে যাওয়ার মধ্যে বউয়ের মর্যাদাবোধটাই উল্টে বড় করে দেখেছেন তিনি। আর মৃত্যুর খবর আসার পর বউয়ের সেই জলন্ত মূর্তি আর ক্রোধের উক্তি স্মরণ করে হঠাৎ নিজের মা হৈমবতীকে মনে পড়েছে তাঁর। মায়েরও যেন এইরকমই মর্যাদা জ্ঞান ছিল, অন্যায়ের জবাবে এইরকম জ্বলে ওঠার শক্তি ছিল। অবশ্য মায়ের জীবনের যে-দিকটা তাঁরা দেখেননি—শুধু শুনেছেন, সেই মায়ের সঙ্গে তুলনা কারো হয় না। তবু সত্তাবোধের দিক থেকে মায়ের সঙ্গে এই বউয়ের কোথায় একটা বড় মিল তাঁর চোখে পড়েছে। নইলে সেই সন্ধ্যায় আঘাতের কথা ভাবতে গিয়ে হঠাৎ নিজের মায়ের মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠেছে কেন বারবার।

কিরণশশীকে বলতেও গেছলেন কথাটা। মায়ের স্মৃতি তাঁর জীবনের সব থেকে বড় সঞ্চয়। কিন্তু বলেননি শেষ পর্যন্ত। পুত্রস্নেহে গৃহিণীকে অন্ধই ভাবেন তিনি। তাঁর ভালো লাগবে না শুনতে।

আরো দিন পনের বাদে ছেলেকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠালেন তিনি। জ্যোতি-রাণী তাঁর কাছেই ছিলেন। ছেলের মা-ও। ডাকের কারণ না জানার ফলে তাঁর অস্বস্তি।

শিবেশ্বর এলেন। ক দিন ধরেই বাপের হাব-ভাব অন্যরকম লাগছে। গুরুগম্ভীর প্রতীক্ষা।

কর্তা জিজ্ঞাসা করলেন, তুই কি করবি না করবি ঠিক করেছিস?

প্রশ্নটা অপ্রত্যাশিত।—ভাবছি···

ভাবতে ভাবতে ছ মাস তো পার হয়ে গেল, আর কত বছর লাগবে মনে হয়?

নিরুত্তর।

সুরেশ্বর বললেন, এদিকে জমি-জমা যা ছিল শেষ হয়ে এসেছে। যা আছে তার থেকেও আয় নেই-ই প্রায়। আমার চালাতে কষ্ট হচ্ছে। ভাবনাটা তাড়াতাড়ি শেষ করে যা-হোক কিছু আরম্ভ করা দরকার।

কথা শেষ।

ছেলের গম্ভীর প্রস্থান। সুরেশ্বরের কারো দিকেই চোখ ছিল না। নইলে স্ত্রীর বিরস মুখ দেখতে পেতেন, আর বউয়ের চোখের কৃতজ্ঞতার স্পর্শ পেতেন।

বিয়ের আয়নায় পুরুষ চেনা যায়, মেয়েকেও চেনা যায়। কিন্তু চেনার শুরুতে গরমিল হয়ে গেল কেউ কাউকে চিনতে পারে না। শেষে চিনতে চায়ও না। এ বাড়ির দিন এই পথেই গড়িয়ে চলল।

পনের দিনের মধ্যেই শিবেশ্বর অপ্রত্যাশিত ভালো চাকরি যোগাড় করলেন একটা। একসঙ্গে কথা বেশি বলতে পারেন না, কলেজের চাকরি পছন্দ নয় তাই। বড় ব্যাঙ্কে অফিসারের চাকরি পেলেন। অর্থনীতিতে বি-এতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট, এম-এতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট, তার ওপর নিজের মৌলিক লেখা-টেখা আছে—না পাবার কথা নয়।

পরের পর্যায়ের অসহিষ্ণুতার শুরু এই চাকরি থেকে। ব্যাঙ্কের চাকরি আর যাই হোক আরামের চাকরি নয়। খাটুনি আছে। সকাল সাড়ে আটটায় নাকে-মুখে আগুন ভাত গুঁজে ছুটতে হয়, ফিরতে সন্ধ্যা। কোনদিন বা রাত। যে মন এই চাপ নিতে পারে সেই মন নয় শিবেশ্বরের। প্রথমেই তাঁর মনে হল, এই দীর্ঘ অনুপস্থিতি আর একজনের শান্তির কারণ হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে পুরনো রোগের ওপরে আঁচড় পড়তে লাগল। যান যখন তিক্ত মুখ, ফেরেন যখন কুটিল দৃষ্টি। দু মাস যেতে না যেতে কালীদার টানা গরমের ছুটি এলো। কিন্তু তাঁর ছুটি বলে কিছু নেই।... কালীদাই ডাক্তার আনে, ওষুধ আনে, বাবার নির্দেশে বউয়ের জন্য ফল-টল কিনে আনে। সন্দেহের সেই কালো পাথরে মাথা খোঁড়া শুরু হয়েছে আবার। ...বাবা-মা দুপুরে ঘুমোয়, সদা ঝিমোয়। বউয়ের শরীর খারাপ, কিন্তু মনের বিনিময় হতে বাধা কি? তিনি বাড়ি থেকে বেরুলেই তো অখণ্ড শান্তি।

শুধু তাঁর অশান্তি। মাথায় অশান্তির আগুন।

সেইদিন, আড়াই মাসের ভালো চাকরি ইস্তফা দিয়ে বাড়ি ফিরলেন শিবেশ্বর। ভালো করে বিকেল হয়নি তখনো। প্রথমেই কালীদার সঙ্গে দেখা। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আজ এরই মধ্যে ছুটি হয়ে গেল?

শিবেশ্বরের ছুটি চোখ সরাসরি তাঁর মুখের ওপর বিদ্ধ হল। বললেন, আজ নয়, একেবারে ছুটি হয়ে গেল। চাকরি ছেড়ে দিয়ে এলাম।

চাউনিটা দুর্বোধ্য। শেষ শুনে কালীদা আরো অবাক।—এত ভালো চাকরি ছেড়ে দিয়ে এলি ?

ভালো করিনি, না ?

শিবেশ্বর ঘরের দিকে এগোলেন, মুখের হাসিটা অস্বাভাবিক। কালীদা ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন।

জ্যোতিরাণী একপ্রস্থ ঘুম দিয়ে উঠেছেন। উঠি-উঠি করেও শুয়েই ছিলেন। ভালো লাগছিল না। চেনা গলা কানে আসতে কাত হয়ে ঈষৎ ঝুঁকে দেখলেন একবার, তারপর উঠে বসলেন। ঘরে ঢুকে শিবেশ্বর বক্র চোখে তাকালেন একবার। স্ত্রীর মুখে কতটা বিস্ময়ের আঁচড় পড়েছে আগে সেটা উপলব্ধি করার ইচ্ছে। কোটটা আলনায় ফেলে ধুপ করে মুখোমুখি বসে পড়লেন।—চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে এলাম···পোষালো না। কালীদা বলল, অত ভালো চাকরি ছেড়ে ভালো করিনি। তুমি কি বলো ?

কিছু বলবে না জানা কথা, ওইরকম শুধু চেয়ে থাকবে। চাকরি ছাড়ার ফলে শিবেশ্বরের মানসিক দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি হয়ে যায়নি। নিজের ভিতর থেকে সমর্থন মিলছে না বলে উল্টে যাতনা বাড়ছে। হতাশা উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। এরপর এই নিয়ে আবার বাবার সামনাসামনি দাঁড়াতে হবে হয়ত, জবাবদিহি করতে হবে। ভিতরে জোরের অভাব হলে বাইরের জোরের সুরটা চড়া হয়। তিক্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন, আমার চাকরি ছাড়াটা তোমাদের পছন্দ হবে না জানি, অত ঘাবড়াচ্ছ কেন, কালীদার মত আমি ফেল-করা ছাত্র নই, চাকরি করতে চাইলে চাকরি পিছনে-পিছনে ঘুরবে। দায়িত্ব নিয়েছি যখন চাকরিও করব। কিন্তু সেটা আমার সুবিধে-মত করব, আর কারো সুবিধের দিকে চেয়ে নয়।

জ্যোতিরাণী একটা কথাও বললেন না। উঠে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। চাকরি ছাড়ার কারণটা কালীদার কাছে দুর্বোধ্য লাগতে পারে, জ্যোতিরাণীর কাছে নয়। শোনামাত্র তিনি বুঝেছেন।

কিন্তু কথা বলার রুচি নেই, সামনে বসে থাকারও না। দিনে দিনে দেহ বিকল হচ্ছে জ্যোতিরাণীর। দাঁড়াতে চলতে কষ্ট। যে আসছে, সে বুঝি তার সমস্ত অস্তিত্ব ঘুচিয়ে দিয়ে আসবে। প্রথম বার, ত্রাস আর আতঙ্কের ছায়া পড়ছে ক্রমাগত। এই সময়ে সকলের থেকে বেশি সাহস আর ভরসা পাবার কথা যার কাছ থেকে, সেই মানুষের এই ব্যবহার। কোনো শত্রুও এ সময়ে এ রকম ব্যবহার করে কিনা

জ্যোতিরাণীর জানা নেই। জ্যোতিরাণীর প্রায়ই মনে হয়, তিনি মরতে চলেছেন। যে শিশু ভূমিষ্ঠ হবে, সে একটা মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে আসছে। তাঁর দেহ ক্ষয় হয়ে হয়ে সেই মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছে। কিন্তু সেদিকে চোখ নেই মানুষটার। চোখ নেই মন নেই সহানুভূতি নেই। দেহের এই হাল দেখেও সন্দেহের কীট গিসগিস করছে মাথায়। দেহের থেকেও জ্যোতিরাণীর মন চারগুণ বিকল। তিনি কেবল শেষ দেখছেন। শেষের হাতছানি দেখছেন। ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত হতে চেষ্টাও করছেন। কিন্তু তাতে এত কষ্ট কেন? শুধু বেঁচে থাকার মধ্যে এর থেকে কি বেশি আশা, কি আনন্দ?

শিবেশ্বরের চাকরি ছাড়ার খবরটা তার এই প্রস্তুতিকেই আর এক ধাপ এগিয়ে দিল।

কর্তাও শুনলেন। কোনরকম মন্তব্য না করে শুধু জিজ্ঞাসা করলেন, চাকরিটা ছাড়া হল কেন?

ছেলেরও সংক্ষিপ্ত জবাব, খাটুনি বড় বেশি, পোষালো না। অন্য চাকরি পেতে খুব কষ্ট হবে না সেই ভরসার কথাটাও মুখ ফুটে বলতেই চেষ্টা করলেন।

ছেলে চলে যেতে মা তার পক্ষ নিলেন। বললেন, নাকে-মুখে আগুন ভাত গুঁজে সেই সকালে যাওয়া আর রাতে ফেরা—পোষাবে কি করে? কটা মাসে চোখমুখ একেবারে বসে গেছে। আমি তো তখনই বলেছিলাম এই চাকরিতে কাজ নেই।

কর্তা নীরস মন্তব্য করলেন, আমি চোখ বুজলে সবই পোষাবে।

চিন্তামগ্ন তিনি। ছেলে চাকরি ছেড়েছে সেই কারণে নয়। তাঁর কেবলই মনে হয়েছে কোথায় বড় রকমের গণ্ডগোল হয়ে গেছে একটা।

কালীদা আর মৈত্রেয়ীর প্রেম-প্রীতির ব্যাপারটা জ্যোতিরাণী শুনেছিলেন শিবেশ্বরের মুখ থেকে। শুধু এই দুজনের কেন, আরো অনেকের কথাই শুনেছিলেন। কিন্তু শোভাদার ছবি নিয়ে সেই কাণ্ড ঘটে যাবার পর সেইসব কথার একবর্ণও আর বিশ্বাস করেননি। সব কটা গল্পই তাঁকে ভোলাবার জন্যে করা হয়েছিল, সন্দেহের যে কীট মাথায় ঘুরছে তাকে খোরাক যোগাবার মত রসদ কিছু মেলে কিনা, সেটাই আসল লক্ষ্য ছিল, আর সবই ভাঁওতা ধরে নিয়েছিলেন।

কিন্তু সেদিন দুপুরের দিকে একটু অবাক হবার পালা তাঁর। শিবেশ্বর বাড়ি ছিলেন না। বেশিক্ষণ বাইরে থাকেন না, পাঁচ-দশ মিনিটের জন্য কখনো চাকরির দরখাস্ত ছাড়তে পোস্ট অফিসে যান, কখনো বা এক-আধ ঘণ্টার জন্য কারো সঙ্গে দেখা করতে। বাদবাকি সময় বাড়িতে বসেই কাটান। জ্যোতিরাণী শাশুড়ীর

ঘর থেকে আসছিলেন, দরজায় মৃদু কড়া নাড়ার শব্দ শুনে তাঁরই প্রত্যাবর্তন ভাবলেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে কড়া যে এত আস্তে নড়ে না, সেটা খেয়াল করলেন না।

দরজা খুলে অবাক। একটি মেয়ে···মাথায় ঘোমটা। বয়স তাঁর থেকে দুই এক বছরের বড় হতে পারে। বেশ সুশ্রী। কোনো বউ দরজা খুলে দিতে পারে এটা অচেনা মহিলাটিও আশা করেন নি বোঝা গেল। নম্র বিনয়ে কপালে দু হাত ঠেকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কালীনাথবাবু এ বাড়িতে থাকেন?

জ্যোতিরাণী অবাকই হয়েছিলেন, নইলে এই শ্রী নিয়ে অচেনা কোনো চোখের সামনে পড়ে গেলেও দাঁড়িয়ে থাকতেন না। মাথা নাড়লেন।

তিনি কি আছেন?

জ্যোতিরাণী আবারও মাথা হেলালেন।

দয়া করে একটু খবর দিন মৈত্রেয়ী চন্দ দেখা করতে এসেছে।

অনুরোধের ফাঁকে দুটো চোখ তাঁকেই ভালো করে লক্ষ্য করছে মনে হতেই সচকিত হয়ে জ্যোতিরাণী ফিরলেন। কিন্তু কালীদার দরজা পর্যন্ত যেতে হল না। ঘরের দরজা খুলে কালীদা নিজেই গলা বাড়িয়েছেন। দেখেছেন। কালীদার মুখে ক্ষণিকের বিভ্রমও লক্ষ্য করেছেন জ্যোতিরাণী।

তাড়াতাড়ি নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন তিনি।···মৈত্রেয়ী চন্দ···মৈত্রেয়ী। নামটা শুনেছেন কোথায়। মনে পড়ল। শিবেশ্বরের কোনো কথা এক বর্ণও বিশ্বাস করেন নি, বলেই মনে পড়তে আরো বিস্ময়। শুধু বিস্ময় নয়, শরীর মনের সব ধকল ভুলে ক্ষণিকের কৌতূহলও।

কালীদা দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন। এই আবির্ভাব বড় বেশি অপ্রত্যাশিত। আর তার তলায় তলায় অস্বস্তিও। কর্তা ঘরে আছেন।

কি ব্যাপার?

গরমে সমস্ত মুখ ঘেমে উঠেছে মৈত্রেয়ীর। হেসেই পাল্টা প্রশ্ন করলেন, ব্যাপার জেনে দরজা থেকেই বিদায় করবে নাকি?

মুহূর্তের দ্বিধা কাটিয়ে কালীনাথ ডাকলেন, এসো। নিজের ঘরেই এনে বসালেন। চকিতে ভেবে নিলেন জ্যোতিরাণীকেও ডাকবেন কিনা। তার শরীরের কথা ভেবেই চিন্তাটা বাতিল করে দিলেন, তাছাড়া তিনি ভাসুর। পাখার রেগুলেটরটা বাড়িয়ে দিলেন। ঘরের দরজা-জানালা সব টান করে খুলে দিয়ে সামনে এসে বসলেন।

হঠাৎ এ সময়ে?

অফিসের এক বড় কর্তা মারা যেতে ছুটি হয়ে গেল, এক বান্ধবীর সঙ্গে এদিকে

এসেছিলাম। মনে পড়ে গেল তুমি এ-পাড়ায় থাকো।

দুটো চোখ দিয়ে কালীনাথ কথাগুলো ওজন করছেন কি মৈত্রেয়ীকে, নিজেই জানেন।—তুমি এখনো চাকরি করছ ?

ও মা, কবে থেকেই তো করছি, অন্য অফিসে আগের থেকে আরো ভালো চাকরি করছি।

তোমার ভদ্রলোকটি খুব পয়সাঅলা লোক শুনেছিলাম, চাকরি করতে দিতে রাজি হলেন ?

দুই ভুরুর মাঝে কোঁচকানো রেখা পড়ল, দৃষ্টি মুখের ওপর।—কারো দেওয়া না দেওয়ার ধার ধারি আমি ?

তা বটে। কালীনাথের নির্লিপ্ত মন্তব্য।

ওদিকে ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিলেত যাবার ইচ্ছে। আমি বলেছি, যাবে যাও, না ফিরলে আপত্তি করব না। ব্যারিস্টারি পাস করে প্রথমেই আমার সঙ্গে মামলা করে নিজের উকিল নিজে হয়ো, জিততে পারলে আমাকে সেখানেই নিয়ে যেও—সুখে ঘর-করনা করবখ'ন। মৈত্রেয়ী হেসে উঠলেন।

কিন্তু হাসির কথাতেও আর একজনের হাসি পেল না সেটা লক্ষ্য করলেন। এক পলক দেখে নিয়ে বললেন, আমাকে হঠাৎ এখানে দেখে তুমি যেন ভারী মুশকিলে পড়ে গেছ মনে হচ্ছে ?

বিড়ম্বনা কাটিয়ে ওঠার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করলেন কালীনাথ, তাজা মানুষটা হঠাৎ অন্যরকম হয়ে গেছেন সত্যি। বললেন, তোমার বিয়ের আগে বাড়ির কর্তা একদিন তোমাকে আমাকে আর শিবুকে ট্যাক্সিতে দেখে আমাকে পায়ের খড়ম নিয়ে তাড়া করেছিলেন।···তিনি বাড়িতেই আছেন তো···

ভয়টা সত্যি হলেও এ-রকম স্থূল উক্তি কেউ আশা করে না। শুকনো মুখে মৈত্রেয়ী বললেন, আমি যাই তাহলে···

বোসো বোসো। কালীনাথের সহজ হবার চেষ্টা, এরকম বলা আমার উচিত হল না, কর্তাটি রাগী হলেও অভব্য নন, তাছাড়া বাড়িতে এসেছ, তোমার সঙ্গে অভদ্রতা করতেই বা যাবেন কেন।

আশ্বাস সত্ত্বেও মুখের সহজ খুশির ভাবটায় টান ধরল মৈত্রেয়ীর। কিছু একটা ব্যতিক্রম অনুভব করছেন। মানুষটাকে যতটুকু চেনেন, আগের কথাগুলো নিছক কর্তার ভয়েই বলেছেন মনে হল না। হঠাৎ মনে পড়ল কি।

ওই যে বউটি দরজা খুলে দিল···কে ?

যে স্বাভাবিক জবাবটা মুখে এসেছিল, সেটা বলতে গিয়েও বললেন না

কালীনাথ। কৌতুক গোপন করে জবাব দিলেন, এ বাড়িরই বউ। মুখের সামান্য পরিবর্তনটুকুও উপভোগ্য মনে হল।

বাড়ির বউ মানে ?

শিবুর বউ।

চকিতে মুখ থেকে একটা ছায়া সরল যেন।—শিবেশ্বরবাবুর বিয়ে হয়ে গেল এর মধ্যে! শুধু বিয়ে কেন—হেসে ফেললেন—ভারী সুন্দরী তো, কিন্তু ভয়ানক কাহিল দেখলাম···ছেলেপুলে হবে বলে ?

কালীনাথ হাঁ-না কিছুই বললেন না। মৈত্রেয়ীর আসার কারণ একটুও স্পষ্ট নয় এখনো। তার সহজতাও খুব স্বাভাবিক লাগছে না। বিয়ের পরে এই প্রথম দেখা।···দুই তরফেরই প্রতীক্ষার প্রতিশ্রুতি ছিল।···ছিল না ঠিক, কালীনাথ নিজে থেকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আর মৈত্রেয়ীর প্রতিশ্রুতি আদায় করেছিলেন। সেই কারণেই সব কিছু অস্বাভাবিক লাগছে কিনা বুঝে উঠছেন না।

সচকিত দুই চোখ দরজার দিকে গেল একবার। এদিক-ওদিক তাকালেন, জোরেই ডেকে উঠলেন তারপর, শিবু, ভিতরে আয়, অচেনা কেউ নয়।

ঘাড় ফিরিয়ে মৈত্রেয়ী শূন্য দরজার দিকে তাকালেন। কয়েক মুহূর্ত, শিবেশ্বর দরজায় এসে দাঁড়ালেন। মুখে অপ্রতিভ হাসি।—ও, আপনি···· !

চিনতে পেরেছেন তাহলে, এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, এসে গেলাম। আপনারা তো খবরও নেন না। সুপরিচিতা এবং সুরসিকার মতই কথাবার্তা মৈত্রেয়ীর।—এসেই আপনার বউ দেখলাম, খাসা সুন্দরী। কিন্তু কি চেহারা হয়েছে! যত্ন-আত্তি করেন না বুঝি ?

বক্রচোখে শিবেশ্বর কালীনাথকে দেখে নিলেন একনজর। হাসিমুখেই বললেন, যত্ন-আত্তির ভার কালীদার, ওঁকে বলুন। এক মিনিট, আসছি—

হাল্কা ব্যস্ততায় বেরিয়ে এলেন। রাগ কালীদার ওপর, কারণ, কয়েক মুহূর্ত আগের একটা দুর্বলতা কালীদার কাছেই ধরা পড়েছে। বাইরে থেকে এসেই কালীদার ঘরে মেয়ের গলা আর শাড়ির আভাস দেখেই দু চোখ ধারালো হচ্ছিল। কার গলা বা কার হাসি শুনলেন, চেনা শাড়ির আভাস দেখলেন কিনা—সেই খটকা লাগেনি। লাগেনি কারণ মৈত্রেয়ী বা আর কোনো মেয়ের আসাটা কল্পনার বাইরে।

নিঃশব্দে ঘরের দেয়ালের এধারে না এসে পারেননি। সঙ্গে সঙ্গে কালীদার ওই ডাক। কি করে টের পেল এখনো জানেন না।

নিজের ঘরে এলেন। খুশি উপচে উঠল। হঠাৎ ভয়ানক আনন্দ হচ্ছে তাঁর।

কেন, তলিয়ে ভাবার অবকাশ নেই। স্ত্রীর মুখখানা দ্রষ্টব্য বস্তু আপাতত।—মৈত্রেয়ীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে তো?

হাসিমুখ বড় দেখেন না জ্যোতিরাণী।—আলাপ হয়নি।

বলল যে এসেই বউ দেখেছে!

দরজা খুলে দিয়েছিলাম।

ও। কে চিনেছ তো? কালীদার সেই মৈত্রেয়ী! অকারণ খুশির মাত্রাটা ছাড়িয়ে যাচ্ছে নিজেই অনুভব করলেন বোধ হয়। বললেন, কালীদার কাছে এলেও বাড়িটা আমাদের, একটু চা-টা দিতে পারলে হত। সদাটাকেও এ-সময়ে আবার দেখি—

ব্যস্ত পায়ে বেরিয়ে এলেন। ভালো করে দুপুর গড়ায়নি তখনো। এ-সময়ে উনুন ধরিয়ে চা করার কথা ভাবতেও গায়ে জ্বর আসছে জ্যোতিরাণীর। এই ভব্যতার কথা তাঁরও মনে হয়েছে, কিন্তু শরীর টানছে না।

অব্যাহতি পেলেন। একটু বাদেই দেখলেন, মহিলা চলে যাচ্ছেন, সঙ্গে শুধু কালীদা আছেন।

শিবেশ্বর চায়ের আপ্যায়ন জানিয়েছিলেন, কিন্তু মৈত্রেয়ী অপেক্ষা করতে পারেননি। বিকেলের আগে তাঁর ফেরার তাড়া। শিবেশ্বরের ধারণা, তিনি এসে না পড়লে এই তাড়াটা থাকত না। তিনি এসে বসার পরেই কথাবার্তা কি রকম রং-চটা গোছের হয়ে পড়ছিল। কালীদার মুখ বন্ধই ছিল বলতে গেলে, কথা দুচারটে যা তাঁর সঙ্গেই হয়েছে। কালীদার মুখে এম-এ'র ব্রিলিয়েণ্ট রেজাল্টের কথা শুনে তাঁকে কংগ্র্যাচুলেট করেছেন। আর তাঁর মস্ত চাকরি ছাড়ার কথা শুনে নাকি কালীদাকে বলেছেন, আরো অনেক বড় হবেন বলেই এটা পেরেছেন, নইলে এত সাহস কার হয়? তারপর হঠাৎ হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মৈত্রেয়ী ওঠার জন্য ব্যস্ত।

ওদের মধ্যে নিজেকে অবাঞ্ছিত মনে হয়েছে শিবেশ্বরের।

মৈত্রেয়ীর ওঠার তাড়াটা আকস্মিকই বটে। বাইরে এসেই বললেন, চলি তাহলে, আমাকে দেখে খুশি হওনি এটা বেশ বোঝা গেল।

এবারে কালীনাথ হাসলেন মুখ টিপে।—খুশি হতে বলছ?

আমি কিছুই বলছি না। তোমার সঙ্গে দুই-একটা পরামর্শও ছিল অবশ্য। থাক্ গে—

বললে না কেন?

সময় পেলাম না, তাছাড়া ভরসাও হল না।

কালীনাথ চেয়ে আছেন। ভরসা না পাওয়ার লক্ষণ দেখছেন। জিজ্ঞাসা করলেন, চন্দ সাহেব আগের বাড়ি তো ছেড়ে দিয়েছেন, এখন থাকো কোথায়?

মুহূর্তের জন্য হতচকিত মুখ মৈত্রেয়ীর। তারপরেই তরল বিস্ময়।—ওমা, খবরাখবরও রাখো দেখি! থমকালেন একটু, নতুন বাড়ির ঠিকানা নিয়ে কি করবে? যাবে?

কালীনাথ হাসছেন মৃদু মৃদু।

মৈত্রেয়ী সকোপে বললেন, তোমার মুরোদ জানা আছে। হাত-ব্যাগ খুলে কাগজ পেলেন এক টুকরো। কলম বার করে খসখস করে টেলিফোন নম্বর লিখলেন একটা।—এই নাও, আপিসের ফোন। যেদিন আসবে, আগে টেলি-ফোন কোরো। আসবে তো? সত্যি দুই-একটা দরকারী পরামর্শ ছিল—

কালীনাথ যাবেন কথা দেননি। কথা দেবার মত করে হেসেছেন শুধু। তারপর টেলিফোন নম্বর নিয়ে ফিরেছেন।

শিবেশ্বর তখনো ঘরের বাইরেই দাঁড়িয়ে। দাঁড়িয়ে নয়, অল্প অল্প পায়চারি করছিলেন। তাঁকে দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন।

গম্ভীর মুখে কালীনাথ নিজের ঘরে চলে এলেন।

শিবেশ্বরের দুই ভুরু আপনা থেকে কুঁচকে গেল। সংকোচ গোপনের চেষ্টা নয়, ওভাবে ঘরে গিয়ে ঢোকাটা উপেক্ষার মত। সাগ্রহে কালীদার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন তিনি। কালীদার সেটা না বোঝার কথা নয়।

কিন্তু আগ্রহ দমন করা সম্ভব হল না শেষ পর্যন্ত। সেই থেকে সন্ধ্যার পরেও ঘণ্টাখানেক ধরে মৈত্রেয়ীর বাড়ি বয়ে আসাটাই মাথার মধ্যে ঘোরাফেরা করেছে। মেয়েটা একটু মোটার দিক ঘেঁষেছে বটে, কিন্তু চেহারা আগের থেকে মিষ্টি লেগেছে। তা বলে সারাক্ষণ রূপচিন্তায় মগ্ন ছিলেন না তিনি আদৌ। রমণী-রীতির কোনো এক বিশেষ দিকের রহস্যের পরদা চোখের সামনে দুলেছে। দুলেছে দুলেছে। তার অনেকটাই দেখা গেছে আবার অনেকটাই যায়নি। শিবেশ্বরের গোটাগুটি দেখার উদ্দীপনা। জ্ঞানলাভের বাসনা।

কালীদার ঘরের দরজা ভেজানো। দিন-রাতের বেশির ভাগ তাই থাকে। দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন। যে দৃশ্য দেখলেন, সেটা আরো উপভোগ্য। খাটের ওপর বুকে বালিশ চেপে উপুড় হয়ে কালীদা শয়ান, সামনে খোলা কালো মোটা বাঁধানো নোট-বইয়ের মধ্যে খোলা কলম।

শিবেশ্বরকে দেখে উঠে বসলেন। এভাবে আজকাল আসে না বড়। বিস্ময় বা কৌতূহল প্রকাশ করলেন না। কলমসুদ্ধ নোট-বইটা তুলে পাশের টেবিলে

সরিয়ে রাখলেন।—বসতে আজ্ঞা হোক।

কালীদার এই গুণটা অস্বীকার করা যায় না। সহজ কথাবার্তার রাস্তা নিজেই করে দেয়। শিবেশ্বর চেয়ার টেনে বসে খাটের একধারে পা চালিয়ে দিলেন। অর্থাৎ আয়েস করেই বসলেন।—লেখার মত আজ তাহলে কিছু পেয়েছ বলো? পড়াশুনা ফেলে ওটা নিয়ে বসেছ—

মুচকি হেসে কালীনাথ বার দুই মাথা ঝাঁকালেন। পেয়েছেন।

মৈত্রেয়ী হঠাৎ একেবারে বাড়িতে হানা দিলে যে?

তাই তো দেখছি।

যোগাযোগ রেখেছ তাহলে?

রাখিনি। আজ হল।

অবিশ্বাসের দৃষ্টিটা মুখের ওপর বুলিয়ে নিলেন একবার।—এসেছিল কেন?

ঠিক বোঝা গেল না। তুই এসে না গেলে বোঝা যেত হয়ত।

ওর সেই গুণ্ডাগোছের বড়লোক স্বামীর সঙ্গে এখন আর খুব বনিবনা হচ্ছে না বোধ হয়?

বোধ হয় না।

সন্দেহের মধ্যে থাকার দরকার কি, আজ যখন হল না, কালই বাড়ি গিয়ে বুঝে এসো।

বাড়ির ঠিকানা দিলে না। নতুন অফিসে চাকরি নিয়েছে, সেখানে দেখা করতে বলে গেল।

কথার ধরনে স্নায়ু চড়ছে শিবেশ্বরের। অবিশ্বাস গোপনের চেষ্টাও গেল।—অর্থাৎ তুমি বলতে চাও ওর বাড়ির ঠিকানাও তুমি জানো না?

বলতে চাই না। জানি না।

মৈত্রেয়ীর বাড়িতে আসার ফল যে হঠাৎ আর একদিকে ঘুরে যাবে, সেও দুজনের কারোই জানা ছিল না। চুপচাপ খানিক মুখের দিকে চেয়ে থেকে শিবেশ্বর কি ভেবে কালো নোট-বইটার দিকে হাত বাড়ালেন।—দেখি ওটা।

কালীনাথ খাট ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। নোট-বইটা হাতে নিয়ে ট্রাঙ্ক খুললেন। ভিতরে রেখে চাবি দিলেন। তারপর ফিরে এসে বসলেন।—আজ্ঞে না, একটু আপত্তি আছে।

সঙ্গে সঙ্গে শিবেশ্বরের মগজে নাড়াচাড়া পড়ল একপ্রস্থ। বছর দেড়েকও হয়নি, এরকম একটা বস্তু পায়ে চেপে দুখানা করেছিলেন মনে আছে। রাগ আর অপমানের প্রথম ধাক্কায় আবারও সেইরকম কিছু করার তাগিদ অনুভব করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে অন্য চিন্তা মাথায় এলো। খুব সূক্ষ্ম, খুব তীক্ষ্ণ চিন্তা।...কালীদা মনের কথাও লেখে ওতে, আর লেখে যখন, রেখে-ঢেকে লেখে না।

আগে তো আপত্তি হত না, এখন আপত্তি যে?

আগের থেকে দিন একটু বদলেছে।

একটু না অনেক?

সেটা যদি তুমি বুঝে থাকো, খুবই আশার কথা।

রাগটা ভিতরে কেটে বসছে শিবেশ্বরের। কিন্তু চেনেন কালীদাকেও। জলের ওপর তেলের মত রাগটা তার রসিকতার ওপর আলাদা হয়ে ভাসবে শুধু। খুব ঠাণ্ডা গলায় মনের কথাটা ব্যক্ত করলেন।—মৈত্রেয়ীর কোনো কথা কখনো গোপন করার দরকার হয়নি তোমার।···আমি যদি বলি, মৈত্রেয়ী ছাড়াও আরো কারো সম্পর্কে কিছু লেখা আছে ওতে, আর সেই জন্যেই দেখাতে চাও না?

অনুমান নির্ভুল।

শিবেশ্বর দেখছেন না, দু চোখ দিয়ে মুখের রেখা পাঠ করতে চাইছেন। কিন্তু রেখা আদৌ দেখছেন না বলেই অসহিষ্ণুতা।—আমার কথাও আছে বোধ হয়?

বোধ হয় না, আছে।

আর তোমাদের রূপসী বউয়ের কথা?

তোমার কথা থাকলে তার কথাও থাকাই স্বাভাবিক। সেই ভয়েই দেখাতে আপত্তি।

ভয় কেন?

ভিতরের সব চেহারা দেখতে অনেক সময় ভালো লাগে না। কালীনাথ নির্বিকার।

রাগে ক্ষোভে শিবেশ্বরের দু চোখ চক্‌চক্ করছে।—আপত্তি করে তুমি ঠেকাতে পারবে মনে করো?

করি। না পারলে আমাকে বাড়ি-ছাড়া হতে হবে।

সেটা কি খুব ভয়ানক কিছু ব্যাপার হবে?

কালীনাথ হেসে উঠলেন।—আমার পক্ষে ভয়ানক না! নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে বেঘোরে কে পড়তে চায় বল্?

সেই রাতেই ঘরের লোকের আর এক মূর্তি দেখেছেন জ্যোতিরাণী। ঘরের মধ্যে অবিশ্রান্ত পায়চারি করতে দেখলেন। রাগে ফর্সা মুখ কালো।

তাঁর দিকে ফিরে শিবেশ্বর হঠাৎ একসময় বলে উঠলেন, কালীদার সময় ঘনিয়ে এসেছে, বুঝলে? কার সঙ্গে লাগতে এসেছে জানে না, জানবে।

না, জ্যোতিরাণী কিছুই বোঝেননি, ধিকধিকি জ্বলছে সেটুকু শুধু বুঝেছেন।

আর একটা কথা, কালীদার ঘরে তুমি যাবে না, সদা আছে, তার কোনো কাজ তোমাকে করতে হবে না, কথাও বলবে না—তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকে এটা আমি চাই না, বুঝলে?

এক শ্বশুরের ঘরে ছাড়া জ্যোতিরাণী কারো ঘরেই যান না আজকাল। কথাও হয়ই না। তবু জিজ্ঞাসা করলেন, কেন?

অব্যক্ত রোষে চেঁচিয়ে উঠলেন শিবেশ্বর, আমি চাই না বলে, আবার কেন কি? কেন চাও না?

আমার খুশি খুশি খুশি! ফের যদি আমার মুখের ওপর কথা বলবে, আমি বাবাকে ঘরে ডেকে একটা হেস্তনেস্ত করব বলে দিলাম।

জ্যোতিরাণী কথা আর বলেননি। মাথাটা ঝিমঝিম করেছে। চোখে লাল নীল সবুজ দেখেছেন। তারপর শুয়ে পড়েছেন।

দিন কাটছে একটা-দুটো করে। কিন্তু কাটছে বলে মনে হয় না জ্যোতিরাণীর। অথচ যে-দিনের জন্য মনে মনে প্রস্তুত হওয়ার চেষ্টা, তার শেষ যেন দ্রুত ঘনিয়ে আসছে।

অবসন্ন দেহ সেদিন বিকেলে হঠাৎ নাড়াচাড়া খেল একপ্রস্থ। প্রায় সাড়ে আট মাস বাদে মামাশ্বশুর এসে হাজির। গৌরবিমল।

জ্যোতিরাণী শাশুড়ীর সঙ্গে রান্নাঘরে ছিলেন। বসে ময়দা মাখছিলেন। দু হাত জোড়া। শ্বশুর বকতে বকতে তাঁকে সেই ঘরেই নিয়ে এলেন। জ্যোতিরাণী চমকেই উঠেছিলেন। হাতের উল্টোদিকে করে মাথার ঘোমটা বাড়িয়ে দিলেন। শ্বশুরের পরে শাশুড়ীও বকাবকি করলেন একপ্রস্থ, অনুযোগ করলেন। জবাবে ভদ্রলোক বেশ হাসছেন মনে হল। শ্বশুরের অভিযোগ থেকে বোঝা গেল মাত্র দিন তিনেকের জন্য এসেছেন তিনি। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ায়, বাইরের সে-রকম কোন্ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের কি কাজে এসেছেন নাকি। শালা সম্পর্ক, তাই শ্বশুর তর্জনও করলেন, যেতে চেয়ে দেখ্, ঠ্যাং ভেঙে দেব।

ঘোমটার আড়ালেও জ্যোতিরাণী টের পেলেন হাসিমাখা দৃষ্টিটা দুই-একবার এদিকে ঘুরছে। শেষে কুশল প্রশ্নই কানে এলো, জ্যোতি কেমন আছ?

হাত আটকা, প্রণাম করা সম্ভব নয়। জ্যোতিরাণী সামান্য মাথা নাড়লেন। অর্থাৎ ভালই। এই একজনের ওপর হঠাৎ এ রকম অভিমান হচ্ছে কেন বুঝছেন না।

কর্তা বললেন, আর আছে, মা আমাদের ওপর সদয় আর হলই না, শরীরের

হাল দেখছিস না। তার ওপর ওর মায়ের শোক গেল।

শাশুড়ীও বলতেন বোধ হয় কিছু, কিন্তু কর্তার বলার ধরন দেখে চুপ মেরে গেলেন। স্বাস্থ্যহানি কতটা ঘটেছে ঘোমটা আর ঘরের আবছা অন্ধকারের দরুন গৌরবিমল সঠিক ঠাওর করতে পারলেন না।

নিজের ঘরে এসে জ্যোতিরাণী অকারণে ছটফট করলেন খানিকক্ষণ। শেষের সেই প্রস্তুতির হাত থেকে বাঁচার আকাঙ্ক্ষা অদম্য হয়ে উঠল। নিদারুণ হতাশার মধ্যে মানুষ হঠাৎ আশ্রয় পেলে যেমন দুর্বল হয়, আবার আশাও করে অনেকটা সেই রকম অবস্থা মনের। তাঁর বাবা নেই, মা নেই, দুনিয়ার অনেকখানি ফাঁকা। কিন্তু এমন একজন আছেন, যাঁকে তাঁরা ভালবাসতেন, স্নেহ করতেন, বিশ্বাস করতেন। বিনিময়ে এই একজনের ওপর বাবা-মায়ের দাবিটা যেন তাঁর কাছে ফিরে এসেছে। জ্যোতিরাণী এ-রকম করে সেটা আর কখনো অনুভব করেননি। তাই তাঁর আসাটা আশ্বাসের মত, বল-ভরসা যোগাবার মত।

সন্ধ্যার পর সদা মামাবাবুকে খবর দিল, বউদিমণির প্রণাম করা হয়নি, ঘরে একবারটি আসতে বললেন।

গৌরবিমল এলেন। ঘরে জ্যোতিরাণী একা। বাইরের অন্ধকার বারান্দার এক কোণে ইজিচেয়ারে শিবেশ্বর শুয়ে আছেন। এইরকমই থাকেন রোজ। সেটা জেনেও জ্যোতিরাণী মামাশ্বশুরকে ঘরে ডেকে পাঠিয়েছেন।

মাথায় খাটো ঘোমটা, শাড়ির আঁচলও গায়ে জড়ানো নয়, কাঁধে তোলা। তাঁকে ভালো করে দেখে প্রায় আঁতকে উঠলেন গৌরবিমল।—একি চেহারা হয়েছে তোমার?

প্রণাম সেরে জ্যোতিরাণী খাটের বাজু ধরে দাঁড়ালেন। ঠোঁটের ফাঁকে হাসিটুকু দুর্জয় অভিমানের মত। জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি ভালো ছিলেন…?

আমি তো ছিলাম, কিন্তু তোমার এ-কি ব্যাপার! তখন ভালো করে লক্ষ্য করিনি, কি হয়েছে? ডাক্তার দেখছে?

জ্যোতিরাণী মাথা নাড়লেন, দেখছে। মামাশ্বশুরের চিন্তাচ্ছন্ন মুখ দেখে তাঁর অভিমান বাড়ছে বই কমছে না। অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি শীগগিরই চলে যাবেন?

যাবার কথা, একটু কাজে এসেছিলাম। সে কথা থাক, আমি ওদের ডেকে জিজ্ঞেস করি—

প্রাণপণে কি একটা অনুভূতি দমনের চেষ্টা, তেমনি মৃদুস্বরে জ্যোতিরাণী বললেন, শরীর বোধ হয় আর সারবে না।…আপনি দিনকতক থেকে গেলে ভালো

হত। মনে হয় বাঁচব না···

বলতে বলতে জ্যোতিরাণীর ঠোঁট দুটো থরথর করে কেঁপে উঠল। তারপর সর্বাঙ্গ কাঁপতে লাগল, চোখের কোণ ধরে হুড়হুড় করে জল এসে গেল।

গৌরবিমল হকচকিয়ে গেলেন। কাঁধে হাত রাখার জন্য তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়লেন। কি করবেন বা কি বলবেন বুঝছেন না।—বোসো, বোসো তুমি। এসব কি কথা! আমি দেখি কি করতে পারি, কিছু ভয় নেই—বোসো তুমি।

শক্ত হাতে খাটের বাজু ধরে জ্যোতিরাণী দাঁড়িয়েই রইলেন। কিন্তু কাঁপছেন তখনো। দুশ্চিন্তায় বিষম উতলা হয়ে গৌরবিমল তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে শিবেশ্বর এসে দাঁড়ালেন। সব শোনেননি, শেষের দুই-এক কথা কানে গেছে মাত্র। আর অন্ধকারে দাঁড়িয়ে জ্যোতিরাণীর মূর্তিটাই বিশেষ নজরে পড়েছে। যেটুকু শুনেছেন আর দেখেছেন, তাইতেই আত্মসম্মানে লেগেছে। কিন্তু হাসছেন।—এতদিন বাদে মামুকে দেখে তাঁকেই মুরুব্বি ঠাওরালে নাকি? নালিশ-টালিশ সব ঠিকমত করা না হয়ে থাকে তো বলো আবার ডেকে আনি।

খাটের বাজুতে জ্যোতিরাণীর হাতের মুঠো শক্ত হল।

শিবেশ্বরের গলা আরো সরস শোনালো, কিন্তু জ্বালা ঝরল আরো বেশি।—বলি এটা কি থিয়েটারের স্টেজ, না সিনেমার স্টুডিও ভেবেছ তুমি যে, যে আসবে তার কাছেই দুঃখের রিহার্সাল দিতে বসবে?

ঘরের আলোটা কি কেউ খুব আস্তে আস্তে নিবিয়ে দিচ্ছে? ভূমিকম্প হচ্ছে কোথাও? আলো কমছে কেন? ঘরটা এভাবে দুলছে কেন! এর থেকে অনেক কঠিন অনুশাসনে অভ্যস্ত জ্যোতিরাণী। কিন্তু দুর্বলতম মুহূর্তে সামান্য আঘাতই হয়ত যথেষ্ট। খাটের বাজু ছেড়ে এক হাত এগিয়ে শয্যায় বসতে গেলেন। কিন্তু শয্যাটা হাতেই পেলেন শুধু, বসতে পারলেন না। মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

শিবেশ্বর থমকালেন। এগিয়ে ঝুঁকে দেখলেন। ব্যাপারটা অভিনয়ের মত লাগল না। আরো একটু ঝুঁকলেন। তারপর ঘাবড়েই গেলেন হঠাৎ। হন্তদন্ত হয়ে ঘরের কোণের কুঁজোটার দিকে ছুটলেন।

এদিকে ঘর থেকে বেরিয়ে গৌরবিমল সোজা কালীনাথের কাছে এসেছেন। জিজ্ঞাসা করেছেন, কালী,জ্যোতির কি হয়েছে রে? আর এরকম বলছে কেন?

কি বলেছে তাও জানিয়েছেন। গম্ভীর মুখে কালীনাথ নিজের মাথার ওপর

একটা আঙুল ঘুরিয়ে দিয়েছেন এক চক্কর। অর্থাৎ মস্তিষ্কের কিছু বিকৃতি ঘটেছে।

কার?

শিবুরই বেশি। আর সকলের কিছু কিছু।

কিন্তু এর বেশি আর বলা হল না, শোনাও হল না। শিবেশ্বরের সন্ত্রস্ত ডাক শোনা গেল, মামু, কালীদা—একবার এদিকে এসো!

অস্বাভাবিক ডাক শুনে তাঁরা ছুটে এলেন। ওদিকের ঘর থেকে সুরেশ্বর আর কিরণশশী। হাতের কাজ ফেলে সদাও।

জ্যোতিরাণী মেঝেতেই পড়ে আছেন। আঁতকে ওঠার মত দৃশ্য। জ্ঞান নেই। নিঃশ্বাস পড়ছে কি পড়ছে না বোঝা যায় না। চোখে-মুখে সমানে জলের ঝাপ্‌টা দিয়ে চলেছেন শিবেশ্বর। মেঝেতে জল, শাড়ির অনেকটা ভিজে গেছে।

দিশেহারা বাড়ির কর্তা চেঁচিয়ে উঠলেন। ছেলের দিকে চেয়ে বলে উঠলেন, ওরে, তুই কিছু করিসনি তো? তুই মেরে ফেললি না তো মাকে?

॥ পনের ॥

ডাক্তার বলে গেল অ্যানিমিয়া।

আগের ছোট ডাক্তারও তাই বলেছিলেন। বড় ডাক্তার সেটাই আরো বড় করে বলে গেলেন। ওষুধ বাড়ল, পুষ্টির ব্যবস্থা বাড়ল। সব কিছুতে বড়সড় একটা টেবিল ভরে গেল। ডাক্তারের মত শুধু তিনজন জানেন। কালীনাথ, গৌরবিমল আর শিবেশ্বর। এ সময়ে এ-ধরনের রক্ত-স্বল্পতা ভয়ের কারণ। একটু-আধটু নয়, বেশ ভয়ের কারণ। রোগিণীর মানসিক অবস্থাও ডাক্তার খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে গেছেন। যতটুকু বলা সম্ভব কালীনাথ বলেছেন। মোট কথা মনের দিক থেকেও যে একটা চাপ চলেছে বড় ডাক্তার সেটা আঁচ করতে পেরেছেন। বিরক্ত মুখ করে আর নির্বোধকে উপদেশ দেবার মত করে বলে গেছেন, সন্তান-সম্ভাবনার সময়টা এমনিতেই মেয়েদের মানসিক দুর্বলতার সময়, বিশেষ করে প্রথমবার—সেটা শিক্ষিত মাত্রেরই জানা উচিত। সী শুড রিগেন হার ফুল মুড অভ অ্যাকসেপটেন্স—অন্যথায় এই ভারী সময়ের সঙ্কটে রোগিণী ফেরানো শক্ত হয়।

সেই রাতটাই আধা-আধি বেহুঁশের মত কেটেছিল জ্যোতিরাণীর। চিকিৎসাগুণে আর সকলের শুশ্রূষায় দুদিনের মধ্যে কিছুটা সুস্থবোধ করলেন তিনি। তার পরেই

সঙ্কোচ। শ্বশুর তাঁর শয্যা ছেড়ে নড়তে চান না, শাশুড়ীও ঘুরে ফিরে এসে বসেন। ঘরে দুটো মোড়া আনা হয়েছে, কালীদা আর মামাশ্বশুর সে দুটো দখল করেই আছেন। ফাঁক পেলে দরজার কাছে সদা এসে দাঁড়ায়। শুশ্রূষার এই পর্বে শুকনো-মুখ শিবেশ্বরের দর্শকের ভূমিকা। তাঁকেও ঘরেই দেখা যাচ্ছে বেশির ভাগ সময় কোনো না কোনো কোণে, চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন।

তৃতীয় দিনের কোনো এক ফাঁকে কালীনাথের সামনেই গৌরবিমল জ্যোতি-রাণীকে বললেন, যে দায়িত্ব নিয়ে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন সেটা বুঝিয়ে দিয়ে দুই-একদিনের মধ্যেই আবার ফিরে আসছেন। সেই সঙ্গে স্নেহের সুরে ভয়ও দেখিয়েছেন, খুব খুশি মনে সেরে উঠতে চেষ্টা না করলে কেউ আর তাঁর ধারে কাছেও আসবেন না।

মামাশ্বশুর কথা রেখেছেন। কাজ সেরে দিন তিনেকের মধ্যেই আবার ফিরে এসেছেন। জ্যোতিরাণী ব্যতিক্রম কিছু করছেন না, নিয়ম করে ঘড়ি ধরে ওষুধ চলছে, পথ্য চলছে। কিন্তু উন্নতি বলতে যা বোঝায় সেটা কারো চোখে পড়ছে না। এক ডাক্তারের চোখ ছাড়া। তিনি বলেন, সব কিছু যে ঠিক-ঠাক চলছে এ অবস্থায় সেটাই উন্নতি।

কিন্তু এর মধ্যে বিপর্যয় যদি কারো ওপর দিয়ে গিয়ে থাকে তো সেটা গেছে শিবেশ্বরের ওপর দিয়ে। সেই বিপর্যয়ের ঘোর এখনো কাটেনি তাঁর। ভিতরে ভিতরে নিঃশব্দে এখনো একটা বড় রকমের ধকল চলেছে।

প্রথম ধাক্কাটা খেয়েছিলেন সেই সন্ধ্যায়, জ্যোতিরাণী অজ্ঞান হবার পর। কিন্তু সেটা আচমকা এসেছে। আসল ধাক্কা খেয়েছেন পরের রাত্রিতে—চিকিৎসার বিধিব্যবস্থা মোটামুটি যখন হয়ে গেছে, তারপর। তার আগে পর্যন্ত স্ত্রীর দিকে ভালো করে তাকানোর বা একাগ্রভাবে কিছু চিন্তা করার নিরিবিলি অবকাশ মেলেনি।

বাবা-মা তখন শুতে চলে গেছেন। খানিক আগে কালীদা আর মামুকেও ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। দরকার হলেই ডাকবেন। জ্যোতিরাণী নিঃসাড়ে ঘুমুচ্ছেন। ঘরে সবুজ আলো জ্বলছিল। খাটের সামনে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে শিবেশ্বর বসেছিলেন।

আঘাতটা তখনই খেয়েছেন। যতবার তাকিয়েছেন স্ত্রীর বিবর্ণ পাণ্ডুর ঘুমন্ত মুখের দিকে, ততবার। আঘাতে আঘাতে কে যেন তাঁর চেতনার একটা বন্ধ দরজা খুলে দিয়েছে। চোখের সামনে থেকে একটা অন্ধকারের পরদা কে বুঝি ছিঁড়ে-খুঁড়ে তছনছ করে দিয়েছে। না, বিবেকের আঘাত নয়, বিবেকের দংশনও নয়। এই

আঘাতে শুধু নিজে তিনি একটা অবিশ্বাস্য মোহ ভেঙে জেগে উঠেছেন।

······চোখের সামনে এ তিনি কাকে দেখছেন? এ কে? জ্যোতিরাণী না তার প্রেত! স্ত্রীর কোন্ রূপের কল্পনায় তিনি ডুবেছিলেন এতদিন? যে রূপ তাঁকে পাগল করেছে, অন্ধ করেছে, দগ্ধ করেছে—সেই রূপ কোথায়? কার কথা ভেবে তিনি এতদিন এত কাণ্ড করলেন? শিবেশ্বর দেখেছেন আর শিউরে উঠেছেন। ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করেছে। তিনি কি পাগল হয়েছিলেন? এই রমণীকে দেখে কোনো পুরুষের চিত্ত বিচলিত হতে পারে? এ-রকম কি রাতারাতি হল? তা না হলে তাঁর চোখে পড়ল না কেন?

শিবেশ্বরের সব থেকে বড় সঞ্চয় নিমেষে শূন্য হয়ে গেল বুঝি। তিনি যেন মুহূর্তে মুহূর্তে দেউলে হতে লাগলেন।

প্রেম নয়, প্রীতি নয়, যা তিনি পেয়েছিলেন সেই দুর্লভ সম্পদ হারাবার শোকটাই হঠাৎ পাগল করে তুলল তাঁকে। তুলতে লাগল। কবে থেকে হারাতে শুরু করেছেন জানেন না। কতটা হারিয়েছেন দু চোখ টান করে তাই দেখতে লাগলেন। এক দুর্বার ক্ষোভে নিজেই স্তব্ধ তিনি। ক্ষোভ নিজের ওপর, জ্যোতিরাণীর ওপর, ওই অনাগত সন্তানের ওপর—সমস্ত অস্তিত্বের ওপর। নিজের মোহে নিজে অন্ধ হয়ে ছিলেন তিনি, সেই ফাঁকে স্ত্রী তাঁকে রিক্ত করেছে, যে শিশুর আবির্ভাব ঘোষণা দেখছেন—সে-ও।

বড় ডাক্তারের কথা মনে পড়ল। সঙ্কট কাটেনি।······নাও যদি কাটে, একেবারে অসহ্য হবে না। কিন্তু যা তিনি খোয়াতে চলেছেন সেটা দুঃসহ। সেটা গেলে কিছু আর থাকল না। যা ছিল তাই ফিরে পেতে হবে। তার থেকেও অনেক বেশি। এর মধ্যে কোনো আপস নেই।

সেই রাতে মোহ ভাঙার পর থেকে নিজের চোখ দুটোকে সর্বদা সজাগ রেখেছেন তিনি। সকলের অনুপস্থিতিতে নিজে যতটুকু পারেন করে চলেছেন। ডাক্তারের উপদেশ স্মরণ রেখে অপ্রীতিকর একটা কথাও কখনো বলেননি। উপদেশ স্মরণ রাখারও দরকার ছিল না, এই স্ত্রী কারো ঈর্ষার কারণ হতে পারে না, সেই চোখ তাঁর খুলেছে। তিনি একা ঘরে থাকলে অস্বস্তি বোধ করে মনে হতে নিজেই যখন-তখন কালীদাকে ডেকে আনেন, মামুকে ডেকে আনেন।

কিন্তু মাথা থেকে চিন্তাটা বিসর্জন দিতে পারেননি এক মুহূর্তের জন্যেও। সকলের অগোচরে ডাক্তারকে নিতান্ত নির্বোধের মত জিজ্ঞাসা করেছেন, আগে দেখতে খুব মানে···ভালো ছিল···আগের মত হবে?

ডাক্তার কৌতুক বোধ করেছেন, তাঁর পিঠ চাপড়ে আশ্বাস দিয়েছেন, সী উইল

বি মোর লাভলি, ডোণ্ট্ ওয়ারি।

তবু দুশ্চিন্তা না করে পারেননি শিবেশ্বর। তাঁর নিজস্ব দুশ্চিন্তা।

ন মাসে পড়তে শরীর যা-ও সেরেছিল জ্যোতিরাণীর তাও আবার যেতে বসল। ডাক্তাররা পরামর্শ দিলেন অবিলম্বে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার। ছেলেপুলে শিগগীরই হয়ে যাবে, এ অবস্থায় বাড়িতে রাখার ঝুঁকি নেওয়া ঠিক নয়।

শাশুড়ীর খুঁতখুতুনি কানে না তুলে অন্য সকলের সাহায্যে শ্বশুর সেই ব্যবস্থাই করলেন। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অধীনে একটা নামকরা নার্সিং হোমের ক্যাবিনে শয্যা নিলেন জ্যোতিরাণী।

দিন এগিয়ে আসতে লাগল।

শিবেশ্বরের ছটফটানি বাড়তে লাগল।

প্রায় শেষ মুহূর্তে সঙ্কল্প স্থির করলেন তিনি। নার্সিং হোমের ডাক্তারের কাছে জ্যোতিরাণীর মানসিকতা প্রসঙ্গে উদ্দেশ্যের অনুকূল একটা চিত্র এঁকে, তার সঙ্গে আরো পাঁচ রকমের উপসর্গ জুড়ে এবং টাকার জন্যে আটকাবে না সেই আভাস দিয়ে তাঁদের রাজি করালেন। কিন্তু আনুষ্ঠানিক বণ্ড সই করার আগে দায়িত্বটা সম্পূর্ণ একার ঘাড়ে নেওয়া যুক্তিযুক্ত ভাবলেন না।

জ্যোতিরাণীকে বোঝালেন, ভালয় ভালয় সব হয়ে গেলে, আর, যে আসছে সে ভালো থাকলে আর ছেলেপুলের দরকার নেই তাঁদের। জ্যোতিরাণীর স্বাস্থ্যের দিক চেয়ে ডাক্তাররাও তাঁর মতে সায় দিয়েছেন এবং ব্যবস্থা করতে রাজি হয়েছেন। দ্বিতীয় বার এরকম স্বাস্থ্যহানি সহ্য না হবারই কথা। তাছাড়া তাঁদের আর্থিক সঙ্গতির দিকটাও ভাবা দরকার। ব্যবস্থা কিছুই নয়, সামান্য অপারেশন, একসঙ্গেই হয়ে যাবে, তিনি টেরও পাবেন না।

জ্যোতিরাণী আপত্তি করেননি। আপত্তি করার কথা ভাবেনও নি। এই আঠেরো বছরের জীবনে সন্তানলাভের প্রাক-স্বর্গ রচনার আনন্দ তিনি কখনো ভোগ করেননি। তাঁর আকাঙ্ক্ষার গাছে এ-রকম কোনো ফুল ফোটেনি, ফল ধরেনি। যে আসছে, তার আসাটা একটা অনিবার্য ব্যাপারের মত। আর সেই আসার সময় যত ঘনিয়ে আসছে, তাঁর অস্তিত্ব ততো যেন সঙ্কটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ক্ষীণ জীবন আর দুঃসহ মৃত্যুর মাঝামাঝি বসে আছেন তিনি। যে আসবে, তাঁকে একেবারে ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে নিঃশেষ করে দিয়েই আসবে বুঝি।...তা যদি না হয়, আবার? বেঁচে যদি ওঠেন, আবার দ্বিতীয় বার?

না, আঠের বছরের জ্যোতিরাণীকে বোঝাবার জন্য একবারও সাধ্য-সাধনা করতে হয়নি। তিনি সাগ্রহে রাজি হয়েছেন। সন্তান যে দিতে পারে তাঁকে

তিনি বিশ্বাস করেননি, বিশ্বাস করেন না। এবারে বাঁচলে আর না।

...ছেলে এসেছে।

জ্যোতিরাণী যেন ঘুমের ঘোরে শুনছেন। ঘুমের ঘোরে কটা দিন অফুরন্ত মুক্তির স্বাদ নিয়েছেন। এই ঘুম যদি মৃত্যুর ঘুমও হয় তাহলেও খেদ নেই বুঝি। জেগে ওঠার পরেও ঘোর কাটেনি।...শ্বশুর-শাশুড়ী এসেছেন...কালীদা মামাশ্বশুর এসেছেন...আর একজনকেও কতবার দেখেছেন। কিন্তু একদিন দেখছেন কি কয়েকদিন ধরে দেখছেন ঠিক ঠাওর করতে পারেন না।...তারপর কাকে নিয়ে যেন মাঝে মাঝে ডাক্তারদের বেশ ব্যস্ত মনে হয়েছে।...বাড়ির কাদের যেন আশ্বাস দিচ্ছেন। এক শিশুর জীবনের আশ্বাস।...কিন্তু শিশু কে?...শিশু কি?

ভাবতে গিয়ে জ্যোতিরাণী আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন।

জ্যোতিরাণীর এই ঘোর কেটেছে বলতে গেলে দিন সাতেক বাদে। তারপর অবাক চোখে দেখেছেন শিশু কে, শিশু কি। জীবনের নিভু নিভু সলতে। শুনেছেন ডাক্তাররা অনেক কসরত করে তাকে রক্ষা করেছেন।

নার্সিং হোম থেকে বাড়ি ফেরার আগের দিন সুরেশ্বর চাটুজ্যে অপারেশনের খবরটা জানতে পারলেন কি করে। কোনো নার্স বা জুনিয়র ডাক্তারের অনবধানে প্রকাশ হয়ে থাকবে। জ্যোতিরাণীর মনেও নেই ব্যাপারটা বা জানেনও না কবে কখন অপারেশন হয়েছে। হয়েছে যে, একদিন শিবেশ্বর শুধু তাঁকে জানিয়েছিলেন কথাটা। শুনে জ্যোতিরাণী আরো বড় করে মুক্তির নিশ্বাস নিতে পেরেছিলেন।

কর্তার মুখ দেখে সেদিন গৃহিণী ঘাবড়েছিলেন। নতুন করে আবার ভয়ের ব্যাপার কিছু হল কি না সেই আশঙ্কা। সুরেশ্বর চাটুজ্যে গম্ভীর মুখে আশ্বাস দিয়েছেন, ভালো আছে। কাল আসবে।

সন্ধ্যায় এদিকের ঘরে এসে দেখেন কালী আর গৌরবিমল বসে। তিনিও বসলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, আমাকে না জানিয়ে এ-রকম একটা অপারেশন হয়ে গেল...এর দরকার হল কেন?

কিন্তু শোনামাত্র তাঁদেরও বিস্ময় দেখে তিনি অবাক।—বউমার আর ছেলেপুলে হবে না, অপারেশন হয়েছে, তোমরা জান না?

জানে না যে সেটা আর মুখে বলার দরকার হল না। রাতে ছেলের ঘরে এলেন সুরেশ্বর।—অপারেশনের পরামর্শ কে দিল? কেন হল?

আমতা আমতা করে শিবেশ্বর জবাব দিলেন, ওর স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে... মানে আবারও এ-রকম হলে...ডাক্তারও সেই চিন্তা করেই...

তক্ষুনি মনে হল বাবা কালই গিয়ে ডাক্তারকে চেপে ধরতে পারেন। বিপাকে

পড়ে তাড়াতাড়ি তিনি খানিকটা দায় বাবার আদরের বউয়ের ঘাড়েই চাপিয়ে দিলেন। দ্বিধার সুরে বললেন, ইয়ে—জ্যোতিও মত দিয়েছিল, মানে আবার এ রকম হলে বাঁচবে না ভাবছিল—।

পরদিন যথাসময়ে বাড়ির দরজায় গাড়ি দাঁড়িয়েছে। জ্যোতিরাণী ছেলে নিয়ে গাড়ি থেকে নেমেছেন। শাঁখ বেজেছে। আনন্দে আটখানা হয়ে শাশুড়ী ছুটে এসে নাতি কোলে নিয়েছেন। শ্বশুরও এসে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু কাছে আসেননি, দূরেই দাঁড়িয়েছেন।

তাঁর চোখে চোখ পড়তে জ্যোতিরাণী অবাক প্রথম। এভাবে তো শ্বশুর কখনো তাকাননি তাঁর দিকে। সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে কে যেন তাঁকে বলে দিয়েছে, কেন—কেন এই নির্বাক ভৎর্সনা।

স্বপ্নের কথা গোপন কথা। ভালো হলেও ফাঁস করতে নেই, মন্দ হলেও না। অন্যথায় ভালো হলে ফলবে না, মন্দ হলে ফলবে। বাড়ির মধ্যে এ-ধরনের সংস্কারের প্রতি গভীর আস্থা যাঁর, তিনি শাশুড়ী কিরণশশী। স্বপ্নের কথা তিনি গোটাগুটি ফাঁস করলেন না বটে, কিন্তু মনের আনন্দে আভাসে ইঙ্গিতে তিনিই অনেক কথা বলতে লাগলেন। আনন্দ তাঁরই সব থেকে বেশি। ওইটুকু একটা প্রায় আকারশূন্য মাংসপিণ্ডকে অমন অনায়াসে তিনি নেড়ে-চড়ে উল্টে-পাল্টে তেল মাখান, চান করান, পরিষ্কার করেন কি করে, বা তার দিকে চেয়ে আনন্দে আট-খানা হয়ে এত কি দেখতে পান—জ্যোতিরাণী ভেবে পান না! আনন্দ যখন প্রবল, সেই মুখে শুধু জ্যোতিরাণী নয়, সকলেই তাঁর উচ্ছ্বাস শুনেছেন। শাশুড়ী জোর গলায় বলেছেন, ছেলেটা ভবিষ্যতে কি হয় তোমরা দেখে নিও।

নিজেই বলেছেন, কদিন কি আতঙ্কে না কেটেছে তাঁর। এক-একটা স্বপ্ন দেখেছেন আর গায়ে কাঁটা-কাঁটা দিয়ে উঠেছে। ভালো স্বপ্নই, কিন্তু ভালো দেখলে অনেক সময় আবার উল্টো ফল হয়—সেই ভয় ধরেছে। রেখে-ঢেকে যেটুকু বলেছেন তাই শুনেই হেসেছেন সকলে।...নাতির নাম আলোককুমার হলে কেমন হয়? কারণ ও জন্মাবার আগে তিনি দেখেছেন আলোয় আলোয় বাড়ি ছেয়ে গেল। আর যদি নাগকিশোর হয়? অত হাসার কি হল—কদিন আগেও ঘুমের মধ্যে দেখেছেন, কি সাপ, কি সাপ, সাপে যেন বাড়ি কিলবিল করছে, অথচ একটাও কামড়াচ্ছে না। সাপ শুনেই বউয়ের মুখ অন্যরকম দেখলেন মনে হল। একগাল হেসে বলেছেন, ওমা, সাপ শুনে ভয় হল বুঝি! জানো না তো, জন্মের আগে সাপ দেখা খুব ভালো।...আর নাম যদি বেণুগোপাল রাখা হয়? এও ঠাট্টার কথা নয়, দু চোখ

লেগে আসতে না আসতে কি বাজনাই শুনেছেন, এখনো কানে লেগে আছে। শোবার ঘরের ঠাকুরের ছবির কাছ থেকে সেই কান-মন জুড়নো রুনুঝুনু বাজনাটা তাঁর দিকে এসেছে, আবার ঠাকুরের দিকে ফিরে গেছে। আর ঘুম ভাঙতে ছবির দিকে চোখ যেতেই মনে হয়েছে ঠাকুর যেন হাসছেন মুখ টিপে।

এ-সব স্বপ্ন যে জাগ্রত মস্তিষ্কের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন সেটা সকলেই বুঝেছেন, কিন্তু তা নিয়ে কেউ তর্ক তোলেননি।

কিন্তু সেই দিন বাড়ির সকলে বুঝিবা হকচকিয়েই গেলেন।

বেলা তখন দশটা। জ্যোতিরাণী শুয়েই ছিলেন। শরীর দুর্বল, শুয়েই থাকেন। নাতি-কোলে কিরণশশী মেঝেতে বসেছিলেন। নাতির মাথায় এরই মধ্যেই চুল গজিয়েছে বেশ। আঙুলে করে সেই চুল সরিয়ে সরিয়ে গোড়া থেকে সযত্নে ময়লা তুলছিলেন তিনি। হঠাৎ কি যেন চোখে পড়ল। ভুল দেখলেন ভেবে আবার চুল সরিয়ে নজর করলেন। তারপরেই বিমূঢ় তিনি, এক হাতের উল্টো দিক দিয়ে চোখ দুটো কচলে নিয়ে দেখলেন আবার। অন্য হাতের কাঁপা আঙুলে একটা মাত্র চুল ধরা। ধপধপে সাদা চুল একটা, পাকা চুল! একটা মাত্র পাকা চুল!

তারপরেই অভাবনীয় রোমাঞ্চ। সর্বাঙ্গ কেঁপে কেঁপে উঠল বার দুই। সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদের মত কণ্ঠস্বর। ভয়ানক চমকে ধড়মড় করে উঠে বসলেন জ্যোতিরাণী।

এ কি গো! সত্যিই প্রভুজী ফিরলেন নাকি গো বউমা! অ্যাঁ? ওরে কে আছিস কর্তাকে ডাক্ শিগ্গীর! দেখো দেখো বউমা, ঘরে কে বুঝি এলো—শিগ্গীর দেখো!

বড় দুর্যোগের মধ্য দিয়ে যে জীবনীশক্তির জন্ম তার ক্ষমতা অপরিসীম। হৃদয়ের নিবিড়তম যাতনার ভিতর দিয়ে তার নিঃশব্দ আবির্ভাব, সত্তার গভীরে তার নীরব পুষ্টি। যে ঝড়টা গেল জ্যোতিরাণীর মাথার ওপর দিয়ে, সেটা তাকে নিঃশেষে গ্রাস করতে পারত। কিন্তু তা যখন পারেনি, ওই ঝড়ই উল্টে তাঁকে শক্তি যুগিয়েছে, বাঁচার ক্ষমতা বাড়িয়েছে, আত্মরক্ষার রাস্তা চিনিয়েছে। দিনে দিনে দেহ থেকে রোগের চিহ্ন মুছে গেছে। পরিবেশ অনুকূল। তাঁর স্বাস্থ্যের প্রতি শ্বশুরের সারাক্ষণ সজাগ দৃষ্টি। শুধু পৃথক ব্যবস্থা নয়, বউয়ের মনের দিকেও চোখ রেখেছেন তিনি। প্রায়ই বিকেলে গাড়ি ডেকে আনেন, বউকে নিয়ে শালাকে নিয়ে গঙ্গার ধারে চলে যান, কোনদিন বা খোলা মাঠে। নিজে না পারলে কালীনাথ আর গৌরবিমল দুজনকেই সঙ্গে দেন। ছেলে ইচ্ছে হলে যেতে পারে,

ইচ্ছে না হলে যাবে না। ছেলের ইচ্ছে হোক না হোক, বাপের লক্ষ্যের সঙ্গে আপাতত তাঁর একটুও তফাত নাই। বাবা যা চান ছেলে তার থেকে বরং অনেক অনেক বেশি চান।

বছর না ঘুরতে সেই অনেক বেশিই ফিরে পেলেন। নিজের ছেলের জন্য তাঁদের দুজনের কাউকে কোন সময় ভাবতে হয়নি। জন্মের পর থেকেই সে তার ঠাকুমার আশ্রয় পেয়েছে। ছেলেটা রোগা, ভোগেও প্রায়ই। ফলে খিটখিটে কান্না লেগে আছে। কিন্তু তার জন্যে তাঁদের কোনো ঝামেলা পোহাতে হয়নি। একটু কিছু হলে শ্বশুর হোমিওপ্যাথি ডাক্তার ডেকে এনেছেন। দুর্ভাবনা যেটুকু করার ঠাকুমা আর দাদুই করেছেন। নাতির মাথায় সেই একটা পাকা চুল আবিষ্কারের পর থেকেই নাতির প্রতি দাদুরও বিশেষ একটু দুর্বলতা দেখা গেছে। মুখে সেটা প্রকাশ করেননি, উল্টে নাতির ঠাকুমাকে শুনিয়ে ঠাট্টা-ঠিসারা করেছেন। তবু দুর্বলতা বোঝা গেছে।

বছর খানেক পর্যন্ত শিবেশ্বরের দু চোখ স্ত্রীর স্বাস্থ্য আর চেহারার প্রতি সজাগ প্রহরায় মগ্ন ছিল। খুঁটিয়ে দেখেছেন, ওজন করেছেন। তারপর অন্তর-তুষ্টিতে ভরপুর হয়েছেন এক-একদিন। সেই ডাক্তারের কথাই ফলেছে। ফলছে। যা গেছে তার দ্বিগুণ ফিরে এসেছে। আসছে। নিজের চোখ দুটোকে সর্বদা বিশ্বাস করেন না তিনি। এই চোখ একবার তাঁকে ঠকিয়েছে। কতখানি হারিয়েছিলেন, তাঁকে বুঝতে দেয়নি—চোখের সামনে অহর্নিশি সেই প্রেতমূর্তি দেখেও অন্ধই হয়েছিলেন তিনি। তাই, ফিরেছে যা তার কতটা সত্যি সেটা অন্যের চোখ দিয়েও যাচাই করেছেন। তাঁর নজর এড়ায়নি।···হ্যাঁ, আগের মতই দেখেছেন আবার। স্ত্রী বারান্দায় এসে দাঁড়ায় যখন, আশপাশের বাড়ির মানুষেরা ভব্যতার খাতিরেও সব সময় চোখ ফিরিয়ে নিতে পারে না, রাস্তার লোক ফিরে ফিরে ঘাড় উঁচিয়ে তাকায়। এই সেদিনের কথা, সস্ত্রীক সিনেমা দেখতে গেছলেন। পাশের, পিছনের দু-চার জনের সিনেমা দেখা যে ঘোচার দাখিল সেটা শুধু তিনিই অনুভব করেছেন। গোড়ায়, বিশ্রামের সময়, আর ছবির শেষে সব আলো জ্বলেছে যখন, তখন আরো অনেক মুখের কারুকার্য লক্ষ্য করেছেন। লক্ষ্য করেছেন আর আনন্দ পেয়েছেন।

এক বছরের শিশুটার প্রতিও যেন এক ধরনের ঈর্ষা তাঁর। অবশ্য কৌতুকেরই ব্যাপার। মা বলেন অতটা ফরসা না হলেও নাতির তার মায়ের মুখেরই আদল, কালে দিনে মায়ের মতই সুন্দর হবে। সকলে হাসেন, হাসেন শিবেশ্বরও। কিন্তু স্ত্রীর কাছে বলেন, মায়ের চোখ খারাপ হয়েছে। স্ত্রীর রূপের ভাগ ছেলে নেবে সেটাও যেন মনঃপূত নয়।

কিন্তু এটা যে রোগের লক্ষণ, তখনো ভাল করে জানেন না। স্ত্রীর রূপ নিয়ে এত আনন্দ এত গর্বের আড়ালে আসলে যে সেই পুরনো রোগটাই পুষ্ট হয়ে উঠছে, ভালো করে জানেন না তখনো।

জানা শুরু হল। খুব ধীরে।

প্রথমে নিজের সঙ্গে নিজের গোলযোগ। সেটা নিজের চাকরি নিয়ে। ভবিষ্যতের চিন্তা মাথায় এলে মাঝে মাঝে আশাহত হয়ে পড়েন। চাকরি আবারও একটা যোগাড় করেছিলেন, আগের মত অত ভালো চাকরি না হোক, একেবারে মন্দও নয়। সঙ্কল্পে মন বেঁধেই কাজে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুদিন না যেতে ভালো লাগেনি। সর্বদা ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত মনে হয়েছে। কি একটা শূন্যতা বুঝি গুটিগুটি এগিয়ে আসতে চেয়েছে তাঁর দিকে। থেকে থেকে পিছুটান অনুভব করেছেন কিসের। খুব স্পষ্ট নয়, একেবারে অস্পষ্টও নয়।

শেষে হঠাৎ একদিন মনে হয়েছে, যে কাজ করছেন, সেটা তাঁর উপযুক্ত নয় আদৌ, তাঁর জ্ঞান-বিদ্যাবুদ্ধি অনুযায়ী এর থেকে অনেক ভাল চাকরি তাঁর পাওয়া উচিত। অতএব এ চাকরিটাও গেল।

আসলে নিজের ব্যাধিতে হাত দেননি শিবেশ্বর। সেটা চাপা পড়ে ছিল। যে প্রেরণা আর উদ্দীপনা নিয়ে তিনি জ্যোতিরাণীর রূপ ফেরাতে বসেছিলেন, সেও রোগেরই নামান্তর। রূপ ফিরেছে। সঙ্গে সঙ্গে আগের দিনের মতই সেটা দখলের প্রশ্ন উঠেছে। এই রূপের তিনি বাঞ্ছিত দোসর কিনা, অবচেতন মনে আবার সেই অশান্তি শুরু হয়ে গেছে। পুরনো ব্যাধি ফিরে যখন আত্মপ্রকাশ করে, তার গতি-প্রকোপ দুর্বার হয় প্রায়ই। বিশেষ করে এই ধরনের ব্যাধি।

সেটা এত দ্রুত বোঝা যেত না যদি না এই চেনা প্রতিকূলতার সঙ্গে যোঝার ক্ষমতা জ্যোতিরাণীর অনেকগুণ বেড়ে যেত। যদি না তাঁর ভিতরের প্রতিরোধের শক্তি এতটা পুষ্ট হয়ে উঠত। আগে শিবেশ্বরের হীন আচরণ, কটু ভ্রূকুটি, স্থূল অসহিষ্ণুতা জ্যোতিরাণীর বুকের ভিতরে গিয়ে দাগ কাটত, ক্ষত সৃষ্টি করত। তাই ক্ষোভ ত্রাস আর হতাশার মধ্যে ডুবে যেতেন। নিজেকে ক্ষয় করে তার মাশুল দিতেন। কিন্তু এখন তিনি আত্মরক্ষা করতে শিখেছেন। মৃত্যু-তটে দাঁড়িয়ে শেখা। শিবেশ্বর আর সেখানে আঘাত করতে পারেন না। চেষ্টাটা দ্বিগুণ হয়ে নিজের কাছে ফিরে আসে।

ব্যাধির প্রকোপ তখনো অনেকটাই নীরবতায় প্রচ্ছন্ন। টের শুধু জ্যোতিরাণীই পান। টের পান রাতের নিভৃতের শয্যায়। বাসনার সেই নগ্নতা আগের থেকেও ক্রূর হয়ে উঠতে চায়। কিন্তু আগের সেই স্থূল উদ্‌ভ্রান্ত রীতিও জ্যোতিরাণীর

মনের ওপর আঘাত হানত বলেই এত আঘাত পেতেন তিনি, এমন দুঃসহ লাগত। অত্যাচার মনে হত। কিন্তু এখন সেই মনটাকে আগলে রাখতে শিখেছেন তিনি, পৃথক করে রাখতে শিখেছেন। ফলে এখানেও তাঁরই জিত, আর একজনের হার। ভিতরের ক্রূরতা নিভৃতবাস্তবে যথার্থ অত্যাচারী হয়ে উঠতে পারে, জ্যোতিরাণীর তুলনায় মানুষটা অত সবল নয়, অত বলিষ্ঠ নয়।

উল্টে সেই নিভৃতে রয়ে-সয়ে জ্যোতিরাণী একদিন এমন একটা ঠাট্টা করেছিলেন যে শিবেশ্বরের মর্মমূলসুদ্ধ জ্বলে গেছে।

ব্যাধির ওপরকার প্রচ্ছন্নতার পরদা আস্তে আস্তে সরে যেতে লাগল। অসন্তোষের প্রথম উপলক্ষ চাকরি। এবারে বে-সরকারী কলেজের মাস্টারিই নিয়েছেন তিনি। খাটুনি কম, ঢাল অবকাশ। কিন্তু শিবেশ্বরের তাও ভালো লাগে না। মাইনে কম। কাগজে অর্থনীতির সমস্যা প্রসঙ্গে লিখে-টিখেও পান কিছু। কিন্তু সেও সামান্যই। মায়ের হাতে টাকা দিয়ে হাতে যা থাকে সেটা উবে যেতে সময় লাগে না। জ্যোতিরাণীও ঠিক বুঝে-শুনে খরচ করতে পারেন না। দু টাকা খরচ করলে চলে যেখানে, সেখানে হয়ত পাঁচ টাকা খরচ হয়ে যায়। শিবেশ্বর হঠাৎ এক-একদিন চেঁচিয়ে ওঠেন, আমি তো লাটসাহেব নই, একটু বুঝে চলা দরকার।

জ্যোতিরাণী একদিনই জবাব দিলেন।—মেজাজ দেখে তো লাটসাহেবই মনে হয়, রোজগারটাই যা কম।

আসলে নিজের অক্ষমতার দরুনই ক্ষিপ্ত হন শিবেশ্বর। তাঁর মতে রমণীকে বশ করার মত, তার ওপর অধিকার বিস্তার করার মত আর একটা বড় অস্ত্র টাকা। অঢেল টাকা। এই জোরের দিকটাও শূন্য দেখছেন তিনি।

জ্যোতিরাণীর এই অবকাশও তাঁর চক্ষুশূল। সেদিন হঠাৎ গম্ভীর মুখে বললেন, মায়ের শরীর ভালো নয়, ছেলেটাকে আর কতকাল তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে রাখবে? আজ থেকে খোকা এখানে শোবে। মা কালও বলছিল, ঘুমুতে দেয় না।

খোকার বয়েস তখন এক বছর তিন-চার মাস। আধো-আধো কথা ফুটেছে। চঞ্চল, কিন্তু অসুখ লেগেই আছে। বাড়ির মধ্যে এক বাবা-মাই তার কাছে দূরের মানুষ। তাঁদের থেকে অনেক বেশি চেনে দাদু, ছোট দাদু আর জেঠুকে। ঠাকুমাকে তো কথাই নেই। অন্নপ্রাশনের সময় তার ঘটা করে নাম রাখা হয়েছিল। সেটা উবে গেছে। কালীনাথ সর্বদা ওকে আদর করে ডাকতেন, ছাতু। তাঁকে দেখলেই শিশুও উল্টে বলত, থা-তু! ঠাকুমাকে দেখলেই ডাকত, 'থা-ত'! সদাকে ডাকত শুধু 'থা'।

এই থা-কে লা করে নিয়ে আপনা থেকেই ঠাকুমার মাথায় নাম গজালো একটা।

কিছুদিন তিনিও 'থাতু-থাত' করেছেন। আদরে কখনো সেটা সাতু হয়েছে। তারপর হঠাৎ সাত্যকি মাথায় এসেছে। মহাভারতের নাম এইটুকুই মনে আছে, মহাভারতের চরিত্রের গুণাগুণ মনে নেই। সত্যের সঙ্গে সাত্যকির কিছু নিবিড় যোগ আছে ভেবে থাকবেন। আর নামের দিক থেকে অভিনব তো বটে। সানন্দে ঘোষণা করেছেন নাতির পোশাকী নাম হল সাত্যকি। ডাকনাম তাই থেকে 'সিতু'তে ঠেকেছে।

সেই রাতেই বাবা-মায়ের মাঝে তার শয্যা পাতা হল। ঠাকুমা মনে মনে ক্ষুণ্ন হলেন কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। একঘুম পরে রাত দশটায় চাঙ্গা হয়ে উঠেই স্থান-বদল দেখে শিশুর মেজাজ বিগড়ালো! সে কান্না জুড়ে দিল। জ্যোতিরাণী তাকে থামাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু শিশুর গোঁ বাড়ল, কান্না চড়ল। বিরক্ত হয়ে গুরুগম্ভীর বাপ ধমকে থামাতে চেষ্টা করলেন তাকে। ফল আরো বিপরীত হল, তারস্বরে কান্না জুড়ে দিল সে। নাজেহাল হয়ে শেষে শিবেশ্বরও ক্ষেপে উঠলেন যেন। হ্যাঁচকা টানে ছেলেকে তুলে কান্নার ওপরেই সশব্দে দুটো চড় কষিয়ে দিয়ে মায়ের কাছে ফেলে দিয়ে এলেন।

এমনি ছোটখাটো ব্যাপার থেকে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পেতে লাগল। কখনো চিৎকার-চেঁচামিচি করেন, কখনো বা গুম মেরে থাকেন। আধিপত্য বিস্তারের তাড়না দিনে দিনে বাড়ছে। অথচ ভিতরে কেবল পরাজয়ের গ্লানি। গ্লানি আর আক্রোশ। তাঁর পরিবর্তন দেখে মামু আর কালীদা কিছু বলা-বলি করে মনে হয়। মনে হওয়া মাত্র মেজাজ চড়ে শিবেশ্বরের। দুজনের এখন আড্ডা জমে খুব। কালীদার অ্যাটর্নীশিপের ফাইন্যাল পরীক্ষা হয়ে গেছে। মামু তাদের দাতব্য প্রতিষ্ঠানের ট্রাস্টিদের একজন। কলকাতার শাখার ভার তাঁর ওপর। মাসে দু মাসে এক-আধবার সাত-আট দিনের জন্য বাইরে যেতে হয়। প্রতিষ্ঠানের মূলকেন্দ্র বাইরে। কালীদার মুখেই শিবেশ্বর শুনেছিলেন, মামুদের ট্রাস্টএর অনেক টাকা, মামুর হাত দিয়ে মাসে বহু টাকার লেন-দেন হয়। অনেক হাসপাতাল টাকা পায়, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পায়, আর মাস গেলে ব্যক্তিগত মনিঅর্ডার যে কত যায় ঠিক নেই। ট্রাস্টএর কলকাতার সম্পত্তি থেকে মোটা আয় হয় মাসে, সে-সব সংগ্রহ এবং বিলি ব্যবস্থার দায়িত্ব মামুর। মোট কথা কালীদার মতে, মামু বিনে মাইনের একজন কেউকেটা ব্যক্তি।

ভিতরটা কেমন চিনচিন করত শিবেশ্বরের। কালীদার কথা কতটা সত্যি আর কতটা অতিরঞ্জিত জানেন না। কিন্তু বাবার, স্ত্রীর, এমন কি কালীদারও মামুর কাজের প্রতি এক ধরনের শ্রদ্ধা লক্ষ্য করেছেন। সেটা যে মানুষটার প্রতি

তা ভাবতে পারতেন না। মনে হত, তাঁর মাস্টারির পরিমিত রোজগারের থেকেও মামুর রোজগার না করার বাহাদুরিটাই যেন বেশি।

একে একে দুবার কলেজ বদলেছেন। কিছু না করে এক-একবার মাসখানেক মাস দেড়েক বাড়িতে বসে থেকেছেন। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে ক্ষেপে উঠেছেন। বিশেষ করে জ্যোতিরাণী কিছু বললে। মা-কে বলেন—অসুখ করেছে। মা ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। তারপরেই মামু আর কালীদা এসে জিজ্ঞাসা করেন, কি অসুখ?

কখনো চুপ করে থাকেন, কখনো বা কিছু একটা রূঢ় জবাব দিয়ে বিদায় করেন তাঁদের। ছেলের এই দ্বিতীয়বারের পরিবর্তন ক্রমে কর্তাও লক্ষ্য করলেন।

শিবেশ্বর আবারও চাকরিতে ঢোকেন। সেই কলেজের চাকরি। মাঝে মাঝে হঠাৎ বাড়ি চলে আসেন। কেন আসেন জ্যোতিরাণী বুঝতে পারেন। যতটা সম্ভব তাঁর মন বুঝে চলতে চেষ্টা করেন। কিন্তু নিজেকে রক্ষা না করে নয়। ভিতরে দাগ পড়তে দেন না। আগের মতই যদি স্ত্রীটিকে ভাঙতে দেখতেন শিবেশ্বর, দিশেহারা হতে দেখতেন, তাহলে হয়ত এত আক্রোশ হত না। কিন্তু তাঁর সমস্ত ক্ষোভ যেন বাইরে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে।

অবকাশ সময়ে বই পড়েন শিবেশ্বর। বিলিতি বই। বেছে বেছে সেই সব বই-ই সংগ্রহ করেন যা তাঁর এই মনের পরম উপাদেয় খোরাক। নারী-পুরুষের নগ্ন জটিলতা বিস্তার করে করে যে লেখকেরা বড় গোছের আগুন জেলে থাকেন, তাঁদের বই। নারীর বিচিত্র মনস্তত্ত্বের কিছু লঘু কাহিনীও পড়া হয়ে গেছে। কিন্তু পড়ার পর শিবেশ্বর তা লঘু ভাবেন না। সেদিন পড়ছিলেন, এক মস্ত অবস্থাপন্ন গুণী লোকের বিদুষী বউয়ের সঙ্গে তার কাঠখোট্টা ড্রাইভারের স্থূল প্রণয়ের গল্প। ইংরেজ রমণী আর ষণ্ডাগুণ্ডা আইরিশ ড্রাইভার। প্রেম প্রীতি অর্থ সম্পদ কিছু দিয়েই স্বামীটি তার স্ত্রীকে ধরে রাখতে পারল না শেষ পর্যন্ত। কারণ কি? কারণ, ইন্দ্রিয়াসক্ত রমণীর তুষ্টি-বিধানের এমন কিছু জাদু-প্রক্রিয়া জানে লোকটা, যার প্রলোভন স্ত্রীটি কিছুতে কাটিয়ে উঠতে পারলে না।

হাসিমুখে এ-রকম দুই-একটা গল্প স্ত্রীকে শুনিয়েছেন শিবেশ্বর। জ্যোতিরাণী লাল হয়ে বলেছেন, ওই ছাইভস্ম বই উনুনে দাও।

শিবেশ্বর বলেন, উনুনে দিলে শুধু বই-ই পুড়বে, আর কি পুড়বে?

মানুষটার যাতনা যে জ্যোতিরাণী এক-একসময় উপলব্ধি করেননি তা নয়। শিবেশ্বর একদিন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যদি বাইরে ভালো চাকরি পাই, যাবে?

এই বয়সে বাবা-মাকে ফেলে?

শিবেশ্বর হেসেছেন।—আপত্তি আছে, না?

না। পাও তো দেখো।

জবাব দিয়ে চুপচাপ মুখের দিকে চেয়ে দেখেছেন খানিক। দেয়ালে বাবার ফোটোখানার দিকে চোখ গেছে হঠাৎ। জ্যোতিরাণী বলেছেন, আমি কার মেয়ে ঠিকমত জানলে এ-রকম ব্যবহার তুমি করতে না। চাপা আবেগে ছবিটা দেয়াল থেকে পেড়ে এনেছেন। বলেছেন, ভগবান কেমন জানি না, এই বাবাই আমার কাছে ভগবান। তাঁর ফোটো হাতে নিয়ে বলছি, আমাকে নিয়ে তোমার কোনো দুর্ভাবনার কারণ নেই।

দুই একটা দিন ভালই কেটেছে তারপর। কিন্তু দুই-একটা দিনই। আবার সামান্য উপলক্ষে অথবা বিনা উপলক্ষে মতি বদলাতে দেখেছেন। ফলে, সহানুভূতির বদলে জ্যোতিরাণী রাগে জলেছেন।

জ্যোতিরাণী আত্মরক্ষা করতে শিখেছেন বটে, কিন্তু এই একঘেয়ে দিনযাপনের ক্লান্তিকর যাতনা আছেই। সব থেকে খারাপ লাগে যখন শাশুড়ী ছেলের পক্ষ নিয়ে অকারণে কথা শোনান। শ্বশুরকেও মাঝে মাঝে গম্ভীর দেখেন। সেটা শাশুড়ীর লাগানির দরুনই মনে হয়। শাশুড়ীর জন্য ভাবেন না, কিন্তু শ্বশুরের স্নেহের প্রতি জ্যোতিরাণীর সত্যিকারের লোভ। এই কারণেও মন খারাপ হয় মাঝে মাঝে।

এমন দিনে কবি বিভাস দত্তের আবির্ভাব। শিবেশ্বরের সহপাঠী, কিন্তু হৃদ্যতা বেশি কালীদার সঙ্গে। কবি বিভাস দত্ত তখন সাহিত্যিক বিভাস দত্ত নামে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ হতে স্ত্রীটির খুশি মুখ শিবেশ্বর লক্ষ্য করেছেন।

জ্যোতিরাণীকে দেখে শিবেশ্বরের সামনে বিভাস দত্ত রসিকতা করেছেন, এ কার গলায় কি মালা পড়ল কালীদা···ইস্, আগে যদি জানতাম!

ঠিক সেই মুহূর্তে সিতুকে কোলে নিয়ে সদার আবির্ভাব। কালীনাথ হেসে বলেছেন, আক্ষেপটা বড় দেরিতেই করলে ভায়া, ওই দেখো···তিলক।

মুখে এসেছিল কলঙ্কের তিলক, সামলে নিয়েছেন। যেটুকু বলেছেন তাইতেই জ্যোতিরাণীর সমস্ত মুখে আবির গুলে দেওয়া হয়েছে।

বিভাস দত্তকে দিনকতক ঘন ঘন আসতে দেখা গেছে এই বাড়িতে। তারপর কিছুটা ছেদ পড়েছে।

সেদিনও জ্যোতিরাণীর মন ভালো ছিল না। শ্বশুরের সামনে শাশুড়ী সকাল বেলায়ই পাঁচ কথা শুনিয়েছেন। তাঁর ছেলে চেঁচালেই তিনিও মুখ খোলেন,

কারণটা কি তা জানার দরকার হয় না। শাশুড়ীর সঙ্গে জ্যোতিরাণীও সকাল থেকে উপোস আছেন। তাঁর সঙ্গে কালীঘাট যেতে হবে। নাতির কল্যাণে ছেলের কল্যাণে পুজো দিতে হবে। আসলে ছেলের হাবভাব দেখেই ভিতরে ভিতরে চিন্তিত তিনি, সেটা জ্যোতিরাণীর বুঝতে বাকি নেই। শাশুড়ীর সময় হল যখন বেলা মন্দ নয়। শুকনো মুখ, বিরূপ মন নিয়েই গেছলেন জ্যোতিরাণী।

...গিয়ে কি যে লাভ হয়েছে তিনিই জানেন।

দুদিন বাদে বিভাস দত্তর সেই চিঠি এসেছে। মন্দির এলাকায় লেখার রসদ সংগ্রহ করার জন্য গিয়ে দূর থেকে জ্যোতিরাণীকে দেখে বিভাস দত্ত যে চিঠি লিখেছিলেন। যে চিঠিতে তিনি আবার পড়াশুনার রাস্তাটা দেখিয়ে দিয়েছিলেন আর লিখেছিলেন, 'ভয়ের মুখোশে যত বিশ্বাস করবেন, ভয়ের পীড়নও ততো সত্য হয়ে উঠবে। ভয় করবেন না।'

সেই চিঠিতে গরদ-পরা বড় সিঁদুর পরা জ্যোতিরাণীকে মন্দিরে দেখে বলির পশুর সঙ্গে তুলনা করেছেন বিভাস দত্ত—আরো এক বছর আগে দেখলে কি লিখতেন, সেই কথা ভেবেছেন জ্যোতিরাণী। এখন তিনি আত্মরক্ষা করতে শিখেছেন বটে, কিন্তু এইভাবে আর কত কাল কাটবে, এখনই তো ক্লান্তি এসে গেছে।

বিভাস দত্তর প্রস্তাব আঁকড়ে ধরেছেন তিনি, শ্বশুরের মত নিয়ে কালীদাকে দিয়ে বইপত্র আনিয়ে পড়াশুনা শুরু করেছেন। বিভাস দত্ত মাঝে মধ্যে এসে এটা-সেটা দেখিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন। অবশ্য কমই আসেন তিনি। শিবেশ্বর বক্রোক্তি করেন, কলেজে পড়তে ওই বিভাস দত্তরা আমার ধারে কাছে ঘেঁষতে সাহস করত না।

জ্যোতিরাণী চুপ করে থাকেন। কিন্তু শিবেশ্বরের তাও অসহ্য।

ভাঙার পটভূমি যখন প্রস্তুত তখন বড় উপলক্ষ কিছু দরকার হয় না। বিনা কারণেই ভাঙার পর্ব সম্পূর্ণ হতে পারে। তবু সামান্য উপলক্ষ একটা ছিল।

জ্যোতিরাণীর পড়াশুনো জোর কদমে চলছিল। ইচ্ছে সামনের বারেই পরীক্ষাটা দেবেন। কলেজ থেকে শিবেশ্বরের যখন-তখন চলে আসাটাও বাড়ছিল। একদিনও দেখেননি, অথচ মনে হত পড়াশুনাটা বুঝি বিভাস দত্তর সঙ্গেই জমেছে। সেদিন এসে দেখেন স্ত্রীটি বাড়ি নেই। মায়ের কাছে শুনলেন, মামু আর কালীদার সঙ্গে গেছে দুপুরের শো-এ সিনেমা দেখতে। তাঁরা নাকি আজ দুপুরেই বাড়ি চলে এসেছিলেন।

সন্দেহ কিছু নয়, শিবেশ্বর শুধু ধরে নিলেন ব্যবস্থাটা আগেরই ছিল, তাঁকে গোপন করা হয়েছে। স্ত্রী চিরকাল গোপনতার আশ্রয় নিয়ে এসেছে বলেই তাঁর

এত যাতনা—এটাই স্থির বিশ্বাস। গুম হয়ে ঘরে গিয়ে বসলেন তিনি।

বিকেলে ফিরে মূর্তি দেখেই জ্যোতিরাণী ব্যাপার বুঝলেন। শাশুড়ীও মুখ ভার করে জানালেন, ছেলে এখন পর্যন্ত কিছু মুখে দেয়নি।

জ্যোতিরাণী খাবার নিয়ে এলেন। টেবিল থেকে খাবারের থালা মাটিতে আছড়ে ফেলে দিলেন শিবেশ্বর।

জ্যোতিরাণী চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন খানিক। তারপর জায়গাটা পরিষ্কার করে থালা নিয়ে চলে গেলেন। সন্ধ্যার পর নির্লিপ্ত মুখে তাঁকে পড়তে বসতে দেখে শিবেশ্বরের মেজাজ দ্বিগুণ চড়ল। হঠাৎ উঠে এসে তাঁর সামনে থেকে বইটই-গুলো নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন তিনি।

জ্যোতিরাণী বই কুড়িয়ে এনে রেখে দিলেন। তারপর সামনে এসে দাঁড়ালেন।

শোনো! যে অনুশাসনের রাস্তায় শিবেশ্বর একবার বছর দেড়েক আগে এগিয়েছিলেন, সেই রাস্তাই ধরলেন।—এখন থেকে কালীদার সঙ্গে বা মামুর সঙ্গে কোথাও বেরুবে না তুমি। কথা কানে গেল?

জ্যোতিরাণীও সেই দেড় বছর আগের প্রশ্নের পুনরুক্তি করলেন। কিন্তু স্বর ভিন্ন।—গেছে। কেন?

আমার হুকুম বলে। মনে থাকবে?

বাবাকে জিজ্ঞাসা করব।

ক্ষিপ্ত আক্রোশে মুখের কাছে এগিয়ে এলেন শিবেশ্বর।—বাবাকে কি জিজ্ঞাসা করবে?

জিজ্ঞাসা করব তাঁরও এই হুকুম কিনা। হলে মনে থাকবে।

ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। সেই মুহূর্ত থেকে বিপর্যয় শুরু।

বলা বাহুল্য শ্বশুরকে জ্যোতিরাণী কিছু জিজ্ঞাসা করেননি, করবেনও না। কিন্তু সেই সম্ভব-অসম্ভবের চিন্তা নেই শিবেশ্বরের। আত্মধ্বংসী রোষের মধ্যে তলিয়ে যেতে লাগলেন তিনি। পরদিনই তৃতীয় কলেজের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে এলেন। কটা মাস ঘরে বসেই কাটিয়ে দিলেন। তারপর তাঁর আচরণে প্রকাশ্যেই বে-খাপ্পা হয়ে উঠতে লাগল। মা-কে শুনিয়ে পাঁচ কথা বলেন, কালীদা আর মামুকে শুনিয়ে বিরূপ মন্তব্য করেন। বাবার সামনে কিছু না বললেও তাঁরও কানে যায়।

উতলা মুখ করে শাশুড়ী বউয়ের দিকে তাকান, শ্বশুর জিজ্ঞাসাই করেন জ্যোতিরাণীকে, ওর কি হল আবার?

কালীদা আর মামাশ্বশুর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেন।

আগের সমস্ত অসংযত অশান্ত চিন্তার রাশ একসঙ্গে ছেড়ে দিয়েছেন শিবেশ্বর।

ভাবেন আর ভাবেন। বিয়ের পর থেকে এ পর্যন্ত কতবার যে ভাবা হয়ে গেল ঠিক নেই। হঠাৎ তাঁর মাথায় এলো, মৈত্রেয়ীকে কালীদা একেবারে মুছে ফেলতে পারল কি করে? মৈত্রেয়ী বাড়ি বয়ে এসেছিল, তা সত্ত্বেও কালীদা নির্লিপ্ত। সে চলে যাবার কদিন পরেও শিবেশ্বর খোঁজ নিয়েছিলেন মৈত্রেয়ীর সঙ্গে দেখা হয়েছে কিনা। হয়নি। কালীদার সময় নেই নাকি। এটা কি করে সম্ভব হল?

…সম্ভব হতে পারে যদি মৈত্রেয়ীকে মুছে দেবার মত সামনে আর একজন কেউ থাকে।

…কালীদার কেন সেই কালো নোট বই দেখতে এত আপত্তি? কি আছে ওতে?

শিবেশ্বর চাঙ্গা হয়ে উঠলেন আবার। ওই নোট বইয়েতেই যেন সমস্ত সমস্যার সমাধান রয়েছে। ওটা দেখতে না পারা পর্যন্ত শাস্তি নেই।

তাকে তাকে থাকেন। সুযোগও পেলেন এক দিন। ঘণ্টাখানেকের জন্য বাবা তাড়া দিয়ে কোথায় পাঠালেন কালীদাকে। মামুও বাড়ি নেই। আর ব্র্যাকেটে ঝুলানো কালীদার ছাড়া জামার পকেটে সব থেকে বড় ঐশ্বর্যটাই মিলল বুঝি। চাবি।

ট্রাঙ্ক খুললেন। নোট বই নেই। ফলে ধৈর্য গেল। আঁতিপাতি করে খুঁজলেন। নেই। বাক্স বন্ধ করে গুম হয়ে এসে বসলেন। সন্দেহের ভিত আরো পাকা হতে বাকি থাকল না।

কালীদা পরদিনই টের পেলেন। বিকেলে শিবেশ্বরকে ডেকে নিয়ে সামনের একটা পার্কের বেঞ্চিতে বসলেন। গম্ভীর।

আমার ট্রাঙ্ক খুলেছিলি?

ঘোরালো দৃষ্টিতে শিবেশ্বর তাকালেন তাঁর দিকে। হেস্তনেস্ত হয়ে গেলেও আপত্তি নেই। ঘাড় নাড়লেন, খুলেছিলেন।

কিন্তু এরপর কালীনাথ যা করলেন সেটা অপ্রত্যাশিত। একখানা হাত রাখলেন তাঁর কাঁধে।—কি হয়েছে তোর আমাকে বল তো, আগে তো সব বলতিস, এ রকম পাগলের মত করে বেড়াচ্ছিস কেন?

এই ব্যাধির যা নিয়ম, সহানুভূতির স্পর্শে শিবেশ্বর কেঁদেও ফেলতে পারতেন। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, যাই হোক, জীবনে এই একজনকে ছেঁটে দিতে পারবেন না তিনি। বিড়বিড় করে বললেন, আমার মাথাটা বোধ হয় খারাপ হয়ে যাবে কালীদা।

কালীনাথ তুই চক্ষু টান করলেন।—এখনো বোধ হয়!

তুমি আমাকে ওই নোট বইটা দেখাচ্ছ না কেন?

ওতে আমার অনেক ছেলেমানুষি রাগের কথা আছে। কিন্তু তুই কী জানতে

চাস ?

শিবেশ্বর বললেন, আমি শুধু জানতে চাই জ্যোতি আমাকে পছন্দ করতে পারলে না কেন, তার মনে আর কে আছে ?

পছন্দ করতে পারল না তোমার গুণে। পরে গম্ভীর মুখে বললেন, এসব চিন্তা তোর মাথায় আসে কেন! তার মনে আর কেউ নেই, আমি বলছি সে খুব ভালো মেয়ে।

শিবেশ্বরের রাগত মুখ।—ভালো মেয়ের কাউকে ভালো লাগতে পারে না ?

পারে। ভালো মেয়ের ভালো লোক দেখলেই ভালো লাগে।

শিবেশ্বর হঠাৎ হাত দুটো জড়িয়ে ধরলেন তাঁর।—কালীদা, আমি শুধু সত্যি যা তাই জানতে চাই, সেটা না জানা পর্যন্ত আমার মন স্থির হবে না। তুমি শুধু বলো, কাকে ও পছন্দ করত, বিয়ের আগে আর কার সঙ্গে ওর বিয়ের কথা হয়েছিল ?

পছন্দ কাউকে করত না।

রমণী-চরিত্র সম্পর্কে কালীদার সামান্য জ্ঞানও আছে বলে মনে হল না। ধারণা চেপে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, তাই না হয় হল, বিয়ের চেষ্টা তো চলছিল, আর কার সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছিল ?

কথা তো কতজনের সঙ্গেই হয়, বিয়েটা হয় একজনের সঙ্গে। তাতে কি ?

আঃ কালীদা বলো না!

আমার সঙ্গে। কালীনাথ গম্ভীর। মিথ্যেটার ওপর সত্যের রং ফলাতে চেষ্টা করলেন, আমাদের জ্যোতিরাণীই দড়ি-কলসীর কথা বলতে সব ভেস্তে গেল বোধ হয়।

জ্যোতিরাণীর মুখ চেয়েই বলা। শিবেশ্বরের চকচকে দু চোখ তাঁর মুখের ওপর আটকে আছে।—তারপর ? আর কার সঙ্গে কথা হয়েছিল ?

জেনে তুই কি করবি ?

জেনে সেটা মেনে নেব। গোপনতা থাকবে না, দুজনেরই মন হাল্‌কা হবে—এ খুব ভালো হবে কালীদা!

কিন্তু আমি যে বললাম জ্যোতিরাণীর মনে কিছু নেই ?

আচ্ছা আচ্ছা, আমারই মনের দিকে চেয়ে বলো তুমি। আমাকে তুমি নিশ্চয় ভালবাসো কালীদা, শুধু এটুকু জানতে পারলেই আমার মন ঠাণ্ডা হবে, সুস্থির হবে, আমি স্বাভাবিক হতে পারব।

কালীদা দেখছেন তাঁকে, ভাবছেন।—সত্যি ?

সত্যি সত্যি সত্যি। আর কার সঙ্গে বিয়ের কথা হয়েছিল ?

মামুর সঙ্গে।

শিবেশ্বর লাফিয়ে উঠলেন প্রায়। কালীদা বাতিল হবার সঙ্গে সঙ্গে এইটেই আঁচ করছিলেন তিনি। উৎকট রকমের আনন্দ হচ্ছে তাঁর।—জ্যোতিরাণী জানত?

বোধ হয় না।

হল না কেন?

মাঝখানে তুমি গিয়ে লাফিয়ে পড়লে। দ্রুত চিন্তা করছেন কালীনাথ।—তাছাড়া মামুও রাজী হতেন না বোধ হয়, তুই এগিয়ে আসতে নিজে ছোটাছুটি করে বিয়েটা ঘটিয়ে দিল। এই বিয়ের জন্য রোজ দুবেলা তোর মামুর পায়ের ধুলো নেওয়া উচিত।

সেই রাতেই গৌরবিমলের কাছে কালীনাথ পার্কের ব্যাপারটা বললেন সব। শিবেশ্বরের বিকৃতির দিকটাই বিশেষ করে বললেন। বিয়ের প্রসঙ্গে নিজের আর মামুর নাম যে যুক্ত করেছেন তাও গোপন করলেন না।

গৌরবিমল নির্বাক খানিকক্ষণ। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, তোর সঙ্গে বিয়ের কথা হয়েছিল নাকি?

না, ওটা গৌরবে যুক্ত করেছি। শুধু তোমার সঙ্গে হয়েছিল।

তুই জানলি কি করে?

জাস্ট্ বাই অ্যাপ্লাইইং সিক্সথ্ সেন্স। পরে জ্যোতির মায়ের সঙ্গে আধ ঘণ্টা কথা বলেই বুঝে নিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি রাগ করলে না তো?

না।……তবে এবারে এখান থেকে সরে পড়া ভালো না?

না, তাহলে ওর পাগলামি আরো বাড়বে। দেখো না, কথা যখন দিয়েছে মাথা ঠাণ্ডা হতেও পারে। হলে নিজেই পরে হাসবে।

কিন্তু শিবেশ্বরের মাথা কোন্ পর্যায়ে গরম, দুজনের কারোরই ধারণা ছিল না।

শিবেশ্বর নিশ্চিন্ত। ভারী নিশ্চিন্ত। বাড়িতে মামুর সঙ্গে বিয়ের কথা হয়েছিল অথচ জ্যোতিরাণী জানত না এ সম্ভাবনা তিনি একেবারে বাতিল করে দিলেন। এবারে স্ত্রীটির অনেক আচরণের রহস্য দিনের আলোর মত স্পষ্ট তাঁর কাছে।……বিয়েতে আপত্তি করা হয়েছিল……শুভদৃষ্টির সময় মুখ তুলে দেখতে ইচ্ছে করেনি……বিয়ের পরেই মামু হঠাৎ সাত-আট মাসের জন্য গা-ঢাকা দিল…ফিরে এলো যেদিন সেই সন্ধ্যায় জ্যোতি তাকে ঘরে ডেকে এনে কথা কইল……তারপর অজ্ঞান হয়ে গেল……তারপর আস্তে আস্তে তার এত জোর বাড়ল যে এখন কেয়ারই করে না তাঁকে।

বুঝতে আর বাকি কি শিবেশ্বরের ?

ছুটো দিন মনের আনন্দে কাটালেন তিনি। তারপরের সন্ধ্যায় জ্যোতিরাণীকে নিবিষ্ট মনে পড়াশুনা করতে দেখে আঘাত দেবার বাসনা উদগ্র হয়ে উঠল।

শয্যায় বসে হাসতে হাসতে অনেকটা নিজের মনেই বললেন, মামাশ্বশুরের সঙ্গে প্রেম······এ-রকম প্রেম বাংলাদেশে অন্তত কম দেখা যায়।

জ্যোতিরাণী চম্‌কে উঠলেন। পরমুহূর্তে বিবর্ণ পাংশু সমস্ত মুখ।

শ্যেন দৃষ্টিতে প্রতিক্রিয়া দেখে নিলেন শিবেশ্বর।—কি হল ? পড়াশুনা শেষ করে কি করবে, চাকরি-বাকরি করে নিজের পায়ে দাঁড়াবে ? কিন্তু তাতেও দুঃখ ঘুচবে কি করে ?

অস্ফুট স্বরে জ্যোতিরাণী বললেন, কি বলছ তুমি !

ভিতরটা খল-খল করে উঠল শিবেশ্বরের, বলার ফল তো চোখেই দেখতে পাচ্ছেন। উঠে কাছে এলেন।—বড় সাংঘাতিক কথা বলছি, কেমন ? মামুর সঙ্গে বিয়েটা হল না বলে এই বিয়েতে আপত্তি করেছিলে—আপত্তিটা ধরে থাকলে না কেন ? তাহলে তো এতদিন ধরে এত দুঃখ পেতে হত না, এত কাণ্ডও হত না। রাজি হলে কেন ?

তেমনি অস্ফুট স্বরে জ্যোতিরাণী বললেন, তুমি অতি অভদ্র, অতি ছোট, অতি নীচ······।

ধরা-পড়া মুখের এই উক্তি শোনামাত্র মাথায় দাউ-দাউ আগুন জ্বলে উঠল শিবেশ্বরের। চিৎকার করে উঠলেন, এ আমি বরদাস্ত করব না, করব না ! আমি ছোট, আমি নীচ ! রোসো—

উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘর থেকে বেরুলেন তিনি। সামনেই বাবা। ওধারে পায়চারি করছিলেন, চেঁচামিচি শুনে এদিকেই এগিয়ে আসছেন। ছেলের মূর্তি দেখে হতভম্ব তিনি।

শুনুন। এই বাড়িতে হয় মামু থাকবে নয় আমি থাকব। আপনি ভেবে কালই জানিয়ে দিন কে থাকবে ! চিৎকার করেই বলেছেন শিবেশ্বর।

সুরেশ্বর স্তব্ধ। কাঁপছেন অল্প অল্প।—কি হয়েছে ?

কি হয়েছে অত আমি বলতে চাইনে। মোট কথা এ বাড়িতে মামু আর আমি দুজনে থাকব না। আপনি কালই বলে দেবেন কে থাকবে !

দুপ-দাপ পা ফেলে শিবেশ্বর বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ঘরের মধ্যে জ্যোতিরাণী কাঠ।

কালীনাথ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে কর্তাকে ধরে তাঁর ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন।

দরজার কাছে বিবর্ণ মুখে কিরণশশী দাঁড়িয়ে।

কিছুক্ষণ বাদে কর্তা জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে জানিস কিছু ?

কালীনাথ তাঁর ঘরের থেকে বেরুলেন যখন, তখন বেশ রাত।

পরদিন বিকেলে থমথমে বাড়ি থেকে কর্তাকে নিয়ে আবার এক জায়গায় বেরুলেন তিনি। নির্দেশমত কালীনাথ আগেই সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করে রেখে ছিলেন।

বিশেষ রোগের কোনো বিশেষজ্ঞের সঙ্গে ঘণ্টাখানেক ধরে কথা হল কর্তার। কি কথা কালীনাথ জানেন না। তিনি বাইরে বসে।

সন্ধ্যায় দুজনে বাড়ি ফিরলেন আবার। কর্তার মুখের দিকে চেয়ে একটা কথাও জিজ্ঞাসা করতে সাহস করেননি কালীনাথ।

বাড়ি এসেই সুরেশ্বর শুনলেন, গৌরবিমলকে রাতের গাড়িতেই যেতে হবে কোথায়, তাঁর কাজ পড়েছে। তাঁকে ঘরে ডেকে পাঠালেন।

বললেন, একসঙ্গে তোরও মাথা খারাপ হল ? আমার একটা মাত্র ছেলে এরকম হয়ে গেল, তাকে ফেরাবার সুযোগও দিবি না ? এই অপমান নিয়ে চলে গিয়ে তুই কার মুখে চুন-কালি দিবি রে ? বোস—

কিরণশশীকে ডেকে নিয়ে পাশের ঘরে গেলেন তিনি। ফিরলেন আধ ঘণ্টা বাদে। হাতে খাম একটা। দরজায় ঠেস দিয়ে কিরণশশী কাঁপছেন থর-থর করে।

ছেলে আর ছেলের বউকে একসঙ্গে ঘরে ডাকলেন কর্তা। তারা আসতে শিবেশ্বরের দিকে খামটা বাড়িয়ে দিলেন, ধরো—।

কি আছে না জেনেই শিবেশ্বর হাতে নিলেন সেটা।

কর্তা বললেন, আটশ টাকা আছে ওতে, এ পর্যন্ত সংসার খরচের জন্য যে টাকা দিয়েছিলে তা প্রায় সবটাই তোলা ছিল।

বাবার বক্তব্য শিবেশ্বরের কাছে তখনো স্পষ্ট নয়। স্পষ্ট হল।

আজকের মধ্যেই জানাতে বলেছিলে বাড়িতে কে থাকবে। মামু থাকবে, তুমি যাবে। তোমার ছেলে নিয়ে, বউ নিয়ে। কালকের মধ্যেই। এর যেন নড়চড় না হয়।

সমস্ত রাত জ্যোতিরাণী মূর্তির মত বসে কাটিয়েছেন। শিবেশ্বর গভীর রাতে বাড়ি ফিরে শুয়ে পড়েছেন।

পরদিন সকালে উঠেই বেরিয়েছেন আবার। কলকাতায় তখন বাড়ি পাওয়ার

সমস্যা নেই। দু-ঘরের বাড়ি ঠিক করে ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই ফিরেছেন আবার। সব গোছগাছ সারা হতে দুপুর গড়িয়েছে। গাড়ি এসেছে।

শাশুড়ী ঠাকুরঘরে ঢুকে কপাট দিয়েছেন। মামাশ্বশুর আর কালীদার দেখা মেলেনি। শ্বশুর তাঁর ঘরে বসে। ছেলে সদার কোলে।

জ্যোতিরাণী আস্তে আস্তে শ্বশুরের ঘরে এসে দাঁড়ালেন। তার আগে শাশুড়ীর অপেক্ষায় ঠাকুরঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি বেরুবেন না বুঝেছেন।

শ্বশুর বিড়বিড় করে বললেন, যা করেছি, ছেলের মুখ চেয়ে করেছি জ্যোতি-মা।···আমি, তোমার বাবা এখনো বেঁচে আছি জেনো। ভেবো না······।

শ্বশুরের পা দুখানা প্রায় বুকে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম করলেন জ্যোতিরাণী। তারপর তেমনি আস্তে আস্তে বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠলেন।

॥ ষোল ॥

সঙ্গে সদা ছিল।

শিবেশ্বর বা জ্যোতিরাণী তাকে আসতে বলেননি। মালপত্র লরিতে তোলার ব্যবস্থা করে সদা নিজেও উঠে বসেছে। শিবেশ্বর আপত্তি করেননি। একজন লোক যোগাড় করার কথা সকালে ওকে বলে রেখেছিলেন। কিন্তু মুখের কথা খসালেই লোক মেলে না। তাই গোছগাছ করে দিয়ে আসতে ও নিজেই যাচ্ছে ভাবলেন। লরি আগেই বেরিয়ে গেল। সদা বাড়ি চেনে। সকালে ফিরে এসেই ঘর দুটো ধোয়া-মোছা করার জন্য ওকে পাঠিয়েছিলেন।

জ্যোতিরাণী আর শিবেশ্বর ট্যাক্সিতে পাশাপাশি বসে এলেন। কি বাড়ি, কেমন বাড়ি, কোথায় বাড়ি, কখানা ঘর, সে শুধু শিবেশ্বরই জানেন। নির্বাক দুজনেই। জ্যোতিরাণীর কোলে ছেলেটার ফুর্তি হয়েছে। সে আনন্দে কল-কল করছে। মিতাক্ষরে শিবেশ্বর এক-আধবার ড্রাইভারকে রাস্তার হদিস দিচ্ছেন।

গন্তব্য স্থানে পৌঁছে ট্যাক্সি থেকে নেমে শিবেশ্বর অপ্রত্যাশিত কিছু দেখলেন। জ্যোতিরাণীও। ছেলেটারও ফুর্তি আরো বাড়ল।

জামার হাতা গোটানো মালকোছা-মারা মূর্তি কালীদার। ঘামে জবজবে মুখ। সদার সঙ্গে লরি থেকে মালপত্র নামাতে ব্যস্ত।

তাঁদের দেখেই হাত-জোড় করে কালীনাথ অভ্যর্থনা জানালেন, এই যে আসুন, প্রাসাদে পদার্পণ করুন।

জ্যোতিরাণীর ভালো লেগেছে হয়ত। কিন্তু মনের যে অবস্থা, মুখে ভালো লাগার আভাস ফোটানোও সহজ নয়। শিবেশ্বর অবাক, তুমি!

কালীনাথ গম্ভীর।—এই দু-তিন ঘণ্টার মধ্যেই চিনতে কষ্ট হচ্ছে?

শিবেশ্বর আর কিছু বললেন না। সকালে সদার কাছ থেকে বাড়ির ঠিকানা পেয়ে থাকবে। কালীদার সঙ্গে ছেলেবেলার হৃদ্যতা। কিন্তু পরিস্থিতি বিশেষে তাকে দেখে এই খুশির অনুভূতিটা নতুন। গত কাল সন্ধ্যা থেকে এটুকু সময়ের মধ্যে এতদিনের সঞ্চিত ক্ষোভ হঠাৎ আর একদিকে ঘুরেছে। যাকে নিয়ে এতবড় কাণ্ডটা ঘটে গেল, কালীদার সঙ্গে এখানে সেই মামুকে দেখলেও তাঁর মেজাজ ওলট-পালট হত কিনা সন্দেহ। রাগ আর ক্ষোভ এখন শুধু একজনের ওপর। বাবার ওপর।

একটা পুরনো বাড়ির দোতলায় দুখানা ঘর। ব্যবস্থাপত্র এমন কি দোতলায় ওঠার সিঁড়িও পৃথক—এই যা সুবিধে। গোছগাছ মোটামুটি সারা হতে রাত। এক ফাঁকে বেরিয়ে কাছাকাছি একটা দোকান থেকে কালীনাথ রাতের খাবার আনানোর ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। আর ছেলের দুধ সদার সঙ্গেই এসেছে।

ছেলেকে দুধ খাইয়ে জ্যোতিরাণী তাকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে ঘুম পাড়ালেন। তারপর কালীদার তাড়ায় তাঁদের তিনজনের এবং সদার আহার চুকল। সকলেই গম্ভীর। খেতে খেতে একবার শুধু বললেন, জ্যোতির মুখ দেখে মনে হচ্ছে বহুদূরের কোনো প্রবাসে নির্বাসন ঘটেছে।

খাওয়া শেষ হতে জ্যোতিরাণী চুপচাপ আবার ছেলের কাছে গিয়ে বসলেন। মাঝের দরজা খোলা। এক ঘরের ভিতর দিয়ে অন্য ঘর গোটাগুটি দেখা যায়। ও-ঘরের টুক-টাক কথাবার্তা কানে আসছে জ্যোতিরাণীর। কালীদার গলাই শুধু কানে এলো। আবার কলেজে চাকরি নেবার পরামর্শ···ছেলের দুধ রাখা আর খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কিছু উপদেশ···চাকরবাকর না রেখে দেখেশুনে একটা ঝি রাখলে কেমন হয়, ইত্যাদি। জ্যোতিরাণী ঠিক শুনছিলেন না, কানে আসছিল। কিন্তু শেষের গোটাকতক কথা কান পেতে শুনলেন।

এবারও কালীদার গলা প্রথমে।—তাহলে আমি চলি?

শিবেশ্বর বললেন, হ্যাঁ···রাত হয়েছে। একটু দ্বিধা কাটিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কাল আসছ?

না।

কবে আসছেন মুখে জিজ্ঞাসা করেননি শিবেশ্বর, এ প্রশ্নটা চোখের।

কালীনাথ বললেন, আর বোধ হয় আসছি না।

ঈষদুষ্ণ গম্ভীর দৃষ্টি শিবেশ্বরের।—বাবার ভয়ে ?

ও-ঘরে কেউ শুনছে কিনা তা নিয়ে মাথা-ব্যথা নেই কালীনাথের। স্পষ্ট জবাব দিলেন।—না, তোমার ভয়ে।

শিবেশ্বর নীরব একটু।—ভয় করতে হবে না, এসো। না এলে ভাবব আমাকে ছাড়ার একটা সুযোগ পেয়েছ। মা এলে মা-কে নিয়ে এসো, ছেলেটাকে না দেখে থাকতে পারবে না।—আর একটা কথা। ভাবলেন একটু,—মামুকেও একবার আসতে বোলো…।

ঠিক শুনলেন কিনা, জ্যোতিরাণীর সেই সংশয়। ঠিকই শুনেছেন। ওদিক থেকে কালীদার কথায়ও বিস্ময় ঝরছে।

বলিস কি রে! এ যে জলে ভাসে শিলা! সকলে মিলে আসা-আসি না করে তাহলে পাততাড়ি গুটিয়ে তুই-ই আবার চল্ না ? কর্তাকে যা বলার আমি বলছি—

না! চাপা গর্জনের ত মশোনালো।

কালীনাথ চলে গেলেন। সদা থাকল। শিবেশ্বর ভাবলেন, পরদিন সকালের কাজকর্ম সেরে ও যাবে। অল্প মাইনের একটা বিশ্বস্ত লোক ধরে আনার জন্য ওকে আর একবার তাগিদ দিয়ে রাখলেন। সদা জবাব দেওয়ার দরকার বোধ করল না। বহুদিনের লোক, কর্তার ছেলেকে দেড় যুগ ধরে দেখছে—হুকুম করলেই তটস্থ হয়ে ওঠে না।

পরদিন দুপুরে বেরিয়েছিলেন শিবেশ্বর, ফিরলেন সন্ধ্যার আগে। মাথায় যে সভ্য চিন্তার বোঝা চেপেছে একদিনে সেটা লাঘব করা গেলে সুস্থির হতে পারতেন। সেটা সম্ভব নয় জেনেও মেজাজ অপ্রসন্ন। ফিরে দেখলেন সদা ছেলের সঙ্গে খেলা করেছে। ভিতরে এসেই জ্যোতিরাণীকে জিজ্ঞাসা করলেন, সদা আজও গেল না ?

দু দিনের মধ্যে এই প্রথম কথা স্ত্রীর সঙ্গে। জ্যোতিরাণীর কথা বলার রুচি নেই। কিন্তু ভবিতব্য মেনে এত বড় অপমান মাথায় নিয়ে বাড়ি ছেড়ে এসেছেন, ক্ষুদ্র মান-অভিমানেও অরুচি। ঠাণ্ডা জবাব দিলেন, ও এখানেই থাকবে।

এ-রকম কিছু আঁচ করেই প্রশ্নটা করেছিলেন শিবেশ্বর। সঙ্গে সঙ্গে অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন।—কেন ? ওকে এত মাইনে আমি দেব কোথা থেকে ?

মুখের ওপর চোখ রেখেই জ্যোতিরাণী জবাব দিলেন, আমার পরীক্ষা দেওয়া বন্ধ হবে না, এর মধ্যে নতুন লোক এসে সব কাজ করতে পারবে মনে হলে যেতে বলে দাও। ওকে আমি থাকতে বলিনি, মা বলে দিয়েছেন।

বাবা বলেছেন শুনলে তক্ষুনি হয়ত ঘাড় ধরেই তাড়াতেন সদাকে। মা বলেছেন শুনে অতটা রাগ হল না। পরে ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখলেন, সদাকে বিদায় করলে

আড়াইজনের সংসারও অচল হতে পারে বটে। সকালে উঠেই তিনি হাট-বাজার-দুধের জন্য ছোটাছুটি করতে পারবেন না। তাছাড়া সদা রাঁধতেও জানে।...মা সুবিবেচনার কাজই করেছেন।

শিবেশ্বর খাটে বসেছিলেন চুপচাপ। একটু বাদে জ্যোতিরাণী তাঁর সামনে একটা খবরের কাগজ পেতে দিলেন। তারপর ওটার ওপর খাবারের থালা এনে রাখলেন। হাতে বানানো রুটি আর তরকারী। এই জলখাবারের মধ্যে যে দৈন্য উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে সেটা চোখে লাগল। আবার এরই মধ্যে হঠাৎ কোন্ ব্যাপারটা যে ভালো লাগছে সঠিক বুঝলেন না। এমন কি খেতেও ভালো লাগছে। একটু বাদে জ্যোতিরাণী চা এনে দিলেন। তাও ভালো লাগল।

দু-ঘর আর রান্নার ফালি জায়গাটুকুর মধ্যে অনবরত আনাগোনা করতে হচ্ছে জ্যোতিরাণীকে। নিঃশব্দে একটা না একটা কাজ করে চলেছেন। আর এরই মধ্যে তাঁর প্রতি একজনের নীরব মনোযোগ অনুভব করেছেন। দুই-একবার চোখা-চোখি হয়েছে। আপসের এই চাউনিটা পিচ্ছিল লেগেছে, লোভাতুর মনে হয়েছে। ভিতরটা আরো বিমুখ হয়েছে জ্যোতিরাণীর। দৃষ্টি-লেহন তিনি চেনেন। অনাবৃত অভিলাষ দেখে তিনি অভ্যস্ত। তা সত্ত্বেও যে আশ্রয় ছেড়ে এসেছেন সেখানে একটু অবলম্বন ছিল। শ্বশুরের কাছে কোনদিন নালিশ নিয়ে উপস্থিত না হলেও, সেই পথ খোলা ছিল। দম্ভ উপেক্ষা করার মত জোরও ছিল একটু। সেই আশ্রয় থেকে তাঁকে তুলে এনে সেই জোরটুকু খর্ব করে দিতে পারার তুষ্টিও দেখেছেন তিনি ওই পিচ্ছিল লোভাতুর চোখে। অসহায় শিকারকে সম্পূর্ণ আয়ত্তের খাঁচায় এনে পুরতে পারার নীরব আনন্দ দেখছেন।

খুব মিথ্যে না হলেও শিবেশ্বরের মনের তলায় আপাতত ঠিক এই উপমাটাই কাজ করছিল না। শিবেশ্বরের চোখেমুখে লোভ উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল কারণ, দু-ঘরের এই সদ্য-পাতা সংসারে স্ত্রীটির ঘর-করনার ব্যস্ততার মধ্যে ভালো-লাগা একটা নতুন স্বাদ অনুভব করছিলেন তিনি। চোখের সামনে এভাবে ঘুর ঘুর করে কখনো কাজ করতে দেখেননি তাকে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে সর্বাঙ্গ থেকে যে লাবণ্য উপচে পড়ছে তাও যেন দুই চোখের ভোজের বস্তু। এমন কি কাজের মধ্যে থাকায় বিরাগের গাম্ভীর্যটুকুও লোভের সামগ্রী মনে হচ্ছে তাঁর। বিশ বছরের স্ত্রীটির এই নতুন রূপ আজই যেন আবিষ্কার করলেন তিনি।

রাতে দু'বছরের ছেলেটা অনেকক্ষণ ধরে জ্বালাতন করে শেষে ঘুমিয়ে পড়ল। তার মন কার জন্যে কাঁদছে দুজনেই জানেন। কিন্তু কেউ এ নিয়ে একটা কথাও বললেন না। শিবেশ্বর একবার এ-ঘরে এসে দাঁড়াচ্ছেন খানিক, আর একবার ও-

ঘরে। সদার শয্যা বাইরে সিঁড়ির কাছের বারান্দায়।

জ্যোতিরাণী একবারও মুখ তুলে তাকাননি। তিনি জানেন কার প্রতীক্ষা, কিসের প্রতীক্ষা। ভিতরটা যত বিমুখ, বাইরে ততো শান্ত।

ছেলে ঘুমলো। শিবেশ্বর শয্যায় এসে বসলেন। মুখখানা যথাসম্ভব স্বাভাবিক করতে চেষ্টা করলেন।—মা-কে নিয়ে কালীদাকে আসতে বলে দিলাম কাল···না দেখে থাকতেও পারবে না।

জ্যোতিরাণী হাত দিয়ে বিছানা গোছ গাছ করছেন।

আর মামুকেও বলেছি আসতে।

জ্যোতিরাণীর হাত থেমে গেল। আস্তে আস্তে ফিরে তাকালেন। মুখে রক্ত-কণার আনাগোনা রোধ করতে পারলেন না।—কেন? আমি কতটা অপমান হলাম দেখাবার জন্যে, না ডেকে তাঁকে আর একটু অপমান করার জন্যে?

চোখ রাঙিও না, ও-সবের ধার ধারি না।

জ্যোতিরাণী বললেন, চোখ রাঙাতে জানতুম না, তুমি শেখাচ্ছ। চোখে চোখ রাখলেন, মুখ আরো স্থির, কঠিন।—বিকেল থেকে যেজন্যে অপেক্ষা করছিলে সেই সময় হয়েছে—এসো। বাজে কথা বলার দরকার নেই, আমি ক্লান্ত।

পুরুষের লোভ মুখের কথায় এভাবে অনাবৃত করে দেবার নজির স্বামী-স্ত্রীর জীবনে ঘটে না বোধ হয়। রাগে শিবেশ্বরের সমস্ত মুখ, কানের ডগা পর্যন্ত টকটকে লাল। বুকের তলায় যে অনুভূতি টগবগিয়ে উঠল, তার সঙ্গে বিকেলের ভালো লাগার যোগ নেই একটুও।

অধিকার বিস্তারের হিংস্র নির্মম তাড়না শুধু। ভব্যতার সামান্য মুখোশটাও টেনে ছিঁড়ে দিয়েছে নারী।

নিজের নারী নয় যেন। দু চোখ ধকধক করে জ্বলছে, সমস্ত ইন্দ্রিয় ব্যভিচারী উল্লাসে উচ্ছৃঙ্খল হতে চেয়েছে। পিচ্ছিল নগ্নতায় কোনো পরের রমণীকে টেনে আনার বাসনার মত।

জ্যোতিরাণীর মত পরের রমণীকে।

কিন্তু বিনিময়ের এত বড় অসম্পূর্ণতাও শিবেশ্বর আর বোধ করি অনুভব করেননি। অভ্যর্থনা তিনি কোনদিন আশা করেন নি, করেন না। তবু প্রত্যাখ্যানও যে এমন প্রাণশূন্য সহিষ্ণু হতে পারে, সেই অভিজ্ঞতা এই প্রথম যেন। নিজের শয্যায় ফিরে গেছেন যখন তখনো হৃৎপিণ্ড ধক-ধক করে জ্বলছে। আর শুধু জ্যোতিরাণীর সেই মুখোশ-ছেঁড়া কথাগুলো থেকে গেছে।

দিন গেছে। নিজের স্ত্রীকে পরপুরুষের চোখ দিয়ে দেখার রীতি বদলালেন

না শিবেশ্বর। স্ত্রীর হৃদয় দখল করতে পারেন নি, পরপুরুষ তো বটেই। মুখ বুজে অবাঞ্ছিত পরপুরুষের অবিচ্ছিন্ন দখলে আসতে হলে পরের রমণীর যে যাতনা, নিজের স্ত্রীর সেই যাতনা কল্পনা করে নতুন নতুন উত্তেজনার খোরাক পেতে চেষ্টা করেছেন তিনি।

জ্যোতিরাণীর মত এক পরের রমণীর যাতনা।

দু দিন না যেতে কালীদাকে নিয়ে শাশুড়ী এসেছেন। বউয়ের সঙ্গে কথাবার্তা বিশেষ বলেন নি। থমথমে মুখ। নাতি কোলে নিয়ে বসে ছেলের কাছে কান্নাকাটি করেছেন। আসাটা ঘনঘন হয়েছে তারপর। শেষে নাতিকে নিয়েই বাড়ি গেছেন তিনি। মাথা কিছুটা ঠাণ্ডা হয়েছে শিবেশ্বরের, আপত্তি করেন নি। তাছাড়া ঠাকুমাকে না পেয়ে ছেলেটা জ্বালাতন বড় বেশি করে, খেতে চায় না। আর অসুখ-বিসুখ লেগেই আছে, তখন সামলানো আরো মুশকিল হয়। ছেলে পাঠানোর আর একটা সুফল দেখলেন শিবেশ্বর। দু'দিন গেলেই ছোট ছেলে আবার মায়ের কাছে আসতে চায়। মায়ের ওপর টান খুব নেই, এটা তার খেলাও বটে ঝোঁকও বটে। ছেলে এ-বাড়ি ও-বাড়ি ভাগাভাগি করে থাকে। ঠাকুমার ফুরসত হয় না সব সময়, কাজেই কালীদাকে নিয়ে আসতে হয়। ফলে কালীদার আসা বেড়েছে। শিবেশ্বর জানেন না কেন, কিন্তু কালীদা এ-বাড়িতে এসে থাকলেও তাঁর কিছুমাত্র আপত্তি নেই।

এটা নিজের শক্তির ওপর আস্থা ফেরেনি বলেও হতে পারে।

সিঁড়িতে সেদিন দুজোড়া পায়ের শব্দ শোনা গেল। জ্যোতিরাণী কান পাতলেন। তারপর সচকিত। কালীদা কার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আসছেন বোঝা মাত্র এধারের ঘর থেকে বেরিয়ে ও-পাশের ঘর ছাড়িয়ে একেবারে রান্নার জায়গায় এসে দাঁড়ালেন।

সঙ্গে মামাশ্বশুর এসেছেন।

চাপা ক্ষোভে জ্যোতিরাণী দাঁড়িয়েই রইলেন সেখানে। কেন আসতে গেলেন? এত বড় অপমানের পরেও ডেকেছে বলেই আবার আসতে গেলেন কেন? মামাশ্বশুরের ওপরেই রাগ হতে লাগল তাঁর। কালীদার ওপরেও।

হাসি-হাসি মুখ করে শিবেশ্বর এসে জানালেন, কালীদা আর মামু এসেছে।

জ্যোতিরাণী নির্লিপ্ত হতে পেরেছেন ততক্ষণে। কিছু না বলে মুখের দিকে একবার তাকালেন শুধু। তারপর মোড়াটা টেনে বসলেন। অতিথিদের অভ্যর্থনার দায়িত্ব পালন করতে হবে। শিবেশ্বর ফিরে গেলেন।

ওদিক থেকে কালীদার হাঁকডাক কানে এলো দুই-একবার। কিন্তু জ্যোতিরাণী ব্যস্ত। সদা খবর দিয়ে এলো, বউদিমণি রান্নাঘরে, হাত জোড়া। খানিক বাদে হাসিমুখে কালীদা উঠে এলেন। বললেন, কি করছ, মামুকে ধরে নিয়ে এলাম—

শান্ত মুখে জ্যোতিরাণী বললেন, না আনলে ভালো করতেন, আমি তো একটা মানুষ।

কালীনাথ অপ্রস্তুত।—কি কাণ্ড, ওটার মাথা একটু ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে আবার তোমার গরম হল!

আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, এদিকে নতুন ঘরকরনা দেখার জন্য শিবেশ্বরের সঙ্গে মামু এসে উপস্থিত। শিবেশ্বরই নিয়ে এসেছেন। হাসিমুখে মামু জ্যোতিরাণীকে বললেন, ভালই তো গোছগাছ করে নিয়েছ দেখছি।

জ্যোতিরাণীর মুখের ওপর সামান্য হাসির প্রলেপ পড়তে সময় লাগল না। বললেন, মোটামুটি হয়েছে। এদিকে গরম, আপনারা ও-ঘরে গিয়ে বসুন, আমি আসছি।

তাঁরা চোখের আড়াল হতেই সমস্ত মুখ ধারালো হয়ে উঠলো। সদার হাত দিয়ে খাবার পাঠালেন, চা পাঠালেন। আরো খানিক অপেক্ষা করে জ্যোতিরাণী উঠলেন। মনে মনে প্রস্তুত। শাড়ির আঁচল মাথায় তুললেন।

কালীদা তরল কণ্ঠে বলে উঠলেন, এসো—এবারে বাড়ির গিন্নীর একটু প্রশংসা করো মামু, আমাদের এমন সাদরে সৎকার করল।

হাসিমুখে জ্যোতিরাণী মামাশ্বশুরের পায়ের ধুলো নিলেন। তিনি বললেন, আবার প্রণাম কিসের!

প্রণাম জ্যোতিরাণী কালীদাকেও করলেন। গম্ভীর মুখে কালীদা মন্তব্য করলেন, এই প্রণামটা গৌরবে, তুমি গুরুজন হলেও বাদ। শেষের উক্তি শিবেশ্বরকে লক্ষ্য করে।

শিবেশ্বর হাসছেন মৃদু মৃদু।

বিয়ের আগে বাপের বাড়িতে জ্যোতিরাণী যেভাবে কথা কইতেন, তেমনি স্বাভাবিক হাসিমুখে গৌরবিমলের দিকে ফিরলেন তিনি। বললেন, কদিন ধরে ভাবছিলাম আপনাকে আসার জন্য একটা চিঠি লিখব, সময় পাইনি। এসেছেন ভালই হল। এদিকে তো ক্ষমা-টমা চাওয়ার অভ্যাস নেই, অথচ মনে মনে ইচ্ছে আছে। তাই আমিই চেয়ে নিচ্ছি, আপনি কিছু মনে রাখবেন না।

গৌরবিমল অবাক যেমন, খুশিও তেমনি। আর কালীদা ভুরু চোখ টান করে

চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে। তিন বছর আগে জ্যোতিরাণীর সেই বাপের বাড়ির হাওয়াই ফিরে এসেছে যেন। সাড়ম্বরে ভবিষ্যৎবাণী করলেন, এবারে উল্টো ফোরকাস্ট করছি, আই-এ পরীক্ষা দিচ্ছ তো?…এবারেও ফার্স্ট ডিভিশন কেউ ঠেকাতে পারবে না।

মুখের হাসি নিভু-নিভু শুধু শিবেশ্বরের। যেটুকু দেখা গেল তা-ও জোর করে ধরে রেখেছেন বলে। তাঁর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে, ইচ্ছে করেই তা করা হয়েছে। ভিতরে ভিতরে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছেন। কিন্তু মুখে সেটা প্রকাশ করতে পারেননি।

তাঁরা দুজন চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছেন, মামুকে ও-কথা বলার মানে?

নির্বিকার মুখেই ফিরে তাকিয়েছেন জ্যোতিরাণী।—মানে তো সাদা। অন্যায় না বুঝলে কালীদাকে দিয়ে ওঁকে আসতে বলেছিলে কেন?

ধীরে-সুস্থে প্রস্থান করেছেন।

দু চোখ স্বভাবে উষ্ণ হয়েছে শিবেশ্বরের। কিন্তু ভিতরের আর একটা অনুভূতি তিনি অস্বীকার করতে পারেন না। বিরাগ সত্ত্বেও যা পুরুষের চোখ টানে, মন টানে। সেটা শুধু রমণীর রূপ নয়, সেটা অন্য কিছু। হাসিমুখে মামুকে যখন ক্ষমা চাওয়ার কথা বলছিল, রাগের থেকে তখনো এই অনুভূতিটাই বড় হয়ে উঠছিল। আবার এখনও। স্ত্রীটি যদি মুখরার মত ঝগড়া করত, যদি কান্নাকাটি করে ভাসাতো, দুঃখে বেদনায় যদি ভেঙে পড়ত—ওই রূপও তাহলে এতটাই টানত না বোধ হয়। প্রচণ্ড রাগ সত্ত্বেও তেমনি একটা আকর্ষণও অনুভব না করে পারেন না শিবেশ্বর। তাঁর আচরণও তাই এমন বিসদৃশ হয়।

বাড়িতে এর পরের আগন্তুক বিভাস দত্ত।

তাঁকেও কালীদাই এনেছেন। শিবেশ্বরের বাইরের মেজাজে চিড় খেতে দেখা যায়নি তাতেও। আড্ডা জমেছে। শেষের দিকে জ্যোতিরাণীর পড়াশুনার প্রসঙ্গ উঠেছে। কালীদা আর স্ত্রীকে অবাক করার মতই উদার মনোভাব দেখিয়েছেন নতুন সংসারের নতুন মালিক। বলেছেন, আমার সময় হয় না, তুমি তো মাঝে-সাঝে এসে একটু-আধটু দেখিয়ে শুনিয়ে দিয়ে গেলে পারো—তাহলে আর বাইরে ছোটাছুটি করতে হয় না।

জ্যোতিরাণী তখন পাড়ার এক বাড়ির কলেজে-পড়া পরীক্ষার্থিনীর সন্ধান পেয়েছেন। সেখানে যাতায়াত করেন, মেয়েটিও আসে। তাঁর যাওয়াটা যে ঘরের একজনের পছন্দ নয়, তাও খুব ভালো করেই জানেন। তাই এ আমন্ত্রণ শুনে অবাক হয়েছেন। বিভাস দত্ত খুশিমুখে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছেন, আর ঠাট্টা

করেছেন এত বড় স্কলারের স্ত্রীকে সাহায্য করতে পারলে আমারও টিউশনের পাবলিসিটি হবে—সার্টিফিকেট পাব তো ?

তাঁদের বিদায় দিয়ে ফিরে এসে জ্যোতিরাণী শিবেশ্বরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।—আসতে বললে, কিন্তু বিভাসবাবুর আসার সময়টা তোমার বাড়ি থাকার সময়ের সঙ্গে সর্বদা না মিলতেও পারে। সেটা সহ্য হবে তো ?

দু চোখ খরখরে হয়ে উঠতে চেয়েছে, কিন্তু তলায় তলায় সেই একই আকর্ষণ অনুভব করেছেন শিবেশ্বর। সহ্য করতে না পারার স্থূল ইঙ্গিত শোনার মধ্যেও এক ধরনের মাদকতা আছে। জবাব দিলেন, সহ্য করতে চেষ্টা করা যাবে, আর সময়টা যাতে মেলে তুমিও সেই চেষ্টা করতে পারো।

সময়টা মিলেছে। বিভাস দত্ত কালীদার মুখে কতটা শুনেছেন জ্যোতিরাণী জানেন না। কিন্তু সর্বদা বাড়ির মনিবের উপস্থিতিতেই এসেছেন।

গোড়ায় গোড়ায়, অর্থাৎ জ্যোতিরাণীর পরীক্ষা পর্যন্ত খুব কমই এসেছেন তিনি। বেশি আসুক জ্যোতিরাণী তা আদৌ চাননি। কুড়ি না পেরুতে অনেক দেখলেন। নিজের রূপের ওপরেই বোধ হয় সব থেকে বেশি ক্ষোভ তাঁর। এতটা রূপ না থাকলে একজন তাঁকে বিয়ে করার জন্য ক্ষেপে উঠত না, এতটা রূপ না থাকলে বিয়েটা ঘটিয়ে তাঁকে বাড়ি নিয়ে তোলার আগ্রহে কালীদাও এত করতেন কিনা সন্দেহ। এতটা রূপ না থাকলে বাড়ির মানুষের মাথা এমন খারাপ না-ও হতে পারত, অত্যাচার অপমানের বোঝা মাথায় করে ঘর-বাড়ি ছেড়ে এমন করে চলে আসতে হত না তাহলে। এতটা রূপ না থাকলে মামাশ্বশুর এই অপমানের পরে ভাগ্নেকে ক্ষমা করতেন কিনা সেই সংশয়ও উঁকিঝুঁকি দেয়। এতটা রূপ না থাকলে বন্ধুর বউকে পড়াশুনায় সাহায্য করার আগ্রহ বিভাস দত্তের হত কিনা সেই জিজ্ঞাসাও মনের তলায় অস্পষ্ট নয় এখন। বিশেষ করে যে বন্ধুর সঙ্গে তেমন হৃদ্যতা বা মাখামাখি নেই কিছু।

মোট কথা, রূপ অনেক বিপত্তি ঘটায় সেটা জ্যোতিরাণী হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন।

পালা-পার্বণে বা যে-কোন ছোটখাটো উপলক্ষ্যে বাড়িতে ডাক পড়ে জ্যোতিরাণীর। শাশুড়ীর মুখ দিয়ে শ্বশুরই ডাকেন সেটা বুঝতে পারেন। যেতে হয়। শ্বশুর সামনে বসিয়ে খাওয়ান, গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দেন। ছেলের খোঁজ-খবরও করেন। সেদিন বললেন, তুমি যেন রাগ করে অবুঝ হয়ো না জ্যোতি মা···তোমার ওপরেই বোকাটার ভালো-মন্দ নির্ভর করছে।

বাপের ব্যথা জ্যোতিরাণী অনুভব করতে পারেন। কষ্ট হয়। কিন্তু বোকা যাকে বলা হচ্ছে তাঁকে বোকা ভাবার মত সদয় জ্যোতিরাণী চেষ্টা করেও হতে পারেন

না। এরকম কথা শুনলে উল্টে ক্ষোভ বাড়ে তাঁর। অনেকদিন অনেক চেষ্টা করেছেন। নিজের ঋষিতুল্য বাপের ফটো হাতে নিয়ে পর্যন্ত বোঝাতে চেষ্টা করেছেন, আপস করতে চেষ্টা করেছেন। রাতের আচরণের কথা মনে হলে এখন আগের থেকেও গা বেশি রি-রি করে। কেবল একটা ব্যাপারের জন্য ওই মানুষের প্রতি মনে মনে কৃতজ্ঞ জ্যোতিরাণী।···ছেলে হবার সময়ে সেই অপারেশনটা হয়েছিল বলে। একটা দিকের দুর্ভাবনা গেছে। কি দুর্ভাবনা গেছে সে শুধু তিনিই উপলব্ধি করেন। নইলে পাগল হতে হত বোধ করি।···যে এসেছে থাক, আর চান না।

ও-বাড়ি থেকে একজনই শুধু তাঁর এই নতুন সংসার দেখতে এলেন না। তিনি সুরেশ্বর চাটুজ্যে।

আর এখান থেকেও একজনই শুধু ও-বাড়িতে পদার্পণ করলেন না। তিনি তাঁর ছেলে শিবেশ্বর চাটুজ্যে।

ছেলেকে যদি কেউ গলা ধাক্কা দিয়ে কর্মের রাস্তায় ঠেলে দিয়ে থাকেন, দিয়েছেন সুরেশ্বর চাটুজ্যে।

ঘরে বসে একদিকে লক্ষ্য রেখে শিবেশ্বর অবিরাম যে মনের জাল বুনে চলেছিলেন, এই ধাক্কার চোটে সেটা ছিঁড়ে-খুঁড়ে গেছে। বাস্তবের কঠিন মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়েছেন তিনি। আচ্ছন্নতার ঘোর কেটেছে। দু চোখ ঘরের দিকে না ঘুরে বাইরের দিকে ছুটছে। অপমানটা বুকে বড় বেশি লেগেছে। নিজের দুটো পায়ের ওপর শক্ত হয়ে দাঁড়াবার জন্যে এই প্রথম দিশেহারা হয়েছেন তিনি। অভাবের তাড়নায় আবার যদি বাপের আশ্রয়ে ফিরে যেতে হয়, তার আগে এ জীবন একেবারে বরবাদ করে দিতেও আপত্তি নেই। নিভৃতের লক্ষ্যটাই রাতারাতি ঘুরে গেছে শিবেশ্বরের। এ অপমানের জবাব তিনি দেবেন। সেটা না পারলে জ্যোতিরাণীর কাছেও মাথা হেঁট হবে। এই এক জবাব সার্থক হলে জবাব সকলকেই দেওয়া হবে। গর্ব চুম্বকের মত শুধু নিজেকে টানে, আর সকলকে দূরে ঠেলে দেয়। সেদিক থেকে জ্যোতিরাণীও দূরে সরে গেছেন। নিভৃতের ভোগের তাড়না শুধু অভ্যাসের মত স্বভাবের সঙ্গে মিশে আছে। এছাড়া সংশয়ের কাঁটা নেড়েচেড়ে দিন কাটানোর অবকাশও ঘুচে গেছে। এখন ঘর তাঁর দখলে, ঘরনী তাঁর দখলে—এই দখলটাকে এখন পাকা-পোক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করাতে চান তিনি। আর কিছু চান না।

এই এক ধাক্কায় শিবেশ্বরের আসল রোগটাই সেরে গেল বুঝি।

চাকরি ধাতে পোষাবে না। চাকরির চেষ্টা আর করেননি। গোড়াতেই

কলম নিয়ে বসেছেন। কলমও ঠিক নয়, টাইপ-রাইটার। অনেকদিন আগে কলমের জোরেই এটা পুরস্কার পেয়েছিলেন। অভ্যাসে আঙুলও অনেকটা রপ্ত হয়েছিল। বসে নিবিষ্ট মনে গোটাকয়েক রচনা লিখে উঠেছিলেন তিনি। অর্থনৈতিক আঙ্গিকে লেখা লঘু সুরের গুরু রচনা। নামকরা কয়েকটা ইংরেজী কাগজের সঙ্গে আগেই যোগাযোগ হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপের চটকের দরুন টাকা তেমন বেশি না পেলেও খাতির পেতেন। তাছাড়া তাঁর রচনার হাত আজ থেকে পাকতে শুরু করেনি।

একই সঙ্গে বাইরেও দুই-একটা রচনা পাঠিয়েছেন তিনি। বিষয়বস্তু নির্বাচনে সাফ মাথা। গোটা পৃথিবীর আকাশে তখনও অনেক দুর্যোগের কালো ছায়া পড়েছে। কোন্ দেশে জ্বালানী তেলের দাম চড়ছে আর কোন্ বিশেষ বস্তুর রপ্তানি কমছে তাই থেকে তাদের উৎপাদনের বিশেষ চেহারা তুলে ধরেছেন তিনি। সেটা যে কোনো এক বিশেষ লক্ষ্যের ব্যাপক প্রস্তুতি—সেই ইঙ্গিত করেছেন। বিভিন্ন রচনায় বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়েও ইতিহাসের নজির তুলে সেই একই ইঙ্গিত রেখে গেছেন। বাইরের কাগজে সাদরে ছাপা হয়েছে সেই সব রচনা। ফলে স্থানীয় কাগজে তাঁর সমাদর আরো বেড়েছে। বাংলাতেও হাত ভালো চলে। নিজের রচনা অনুবাদ করতে সময়ও বেশি লাগেনি—সেদিকের রাস্তাও খুলেছে কিছুটা।

কিন্তু খাটুনির অনুপাতে টাকা কম। ইংরেজী বাংলা মিলিয়ে সপ্তাহে চারটে রচনা লিখে উঠতে হয়েছে এমন দিনও গেছে। ভালো ইংরেজী কাগজে ছাপা হলে রচনা পিছু বড় জোর পঞ্চাশ টাকা পান তখন, বাংলা কাগজে পঁচিশ টাকা। শিবেশ্বরের হাঁপ ধরে যায় এক-একদিন। অর্থনীতির ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ আছে এরকম স্থানীয় ইংরেজী কাগজ একটাই তখন। সেখানকার এক অ-বাঙালী সহকারী সম্পাদকের সঙ্গে হৃদ্যতা শিবেশ্বরের জীবনের একটা শুভ সূচনা। ভদ্রলোকের নাম বিক্রম পাঠক। শিবেশ্বরের একটা সাম্প্রতিক রচনা বাইরের কাগজে অর্থনীতিগত রাজনীতিক দৃষ্টি-কোণ থেকে প্রচার পেয়েছে খুব। এখানকার অফিসে আসার সঙ্গে সঙ্গে বিক্রম পাঠক তাঁকে ইংরেজ সম্পাদকের খাস ঘরে নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন।

সম্পাদকও খাতির করলেন তাঁকে, ভালো মাইনের চাকরির প্রস্তাব দিলেন।

শিবেশ্বরের লোভ হল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই লোভ তিনি দমন করলেন। তাঁর লেখার চাহিদা বাড়ছে, এক কাগজে লেগে থাকলে অন্য কাগজের সঙ্গে সম্পর্ক ঘোচে। সব থেকে বড় কথা, স্বাধীনতা ঘোচে। শিবেশ্বর পাল্টা প্রস্তাব দিলেন,

চাকরি করার ইচ্ছে নেই, লেখা আর লেখার মর্যাদা বাড়ালে, খুশি হই।

শ্বেতাঙ্গ সম্পাদক দুঃখ প্রকাশ করেছেন বটে, কিন্তু চাকরি হাতে পেয়ে না নেবার দরুন শিবেশ্বরের মর্যাদা যথার্থই বেড়েছে। অধীনস্থ কর্মী হলে কি হত বলা যায় না, সেটা হয়নি বলেই বিক্রম পাঠকের সঙ্গেও হৃদ্যতা আরো বেড়েছে।

পাঠক লোকটি চৌকস, কিন্তু লোভী। বস্তুতন্ত্রীয় উদ্দীপনার খোরাক যোগাতে পারলে তার প্রিয় পাত্র হওয়া আরো সহজ। কাগজের পদস্থ কর্মচারী হিসেবে অনেক হোমরা-চোমরা লোকের সঙ্গে তার দহরম-মহরম। কিন্তু তাদের অনুপাতে নিজের রোজগার কিছুই না ভাবে বিক্রম পাঠক। সে টাকার স্বপ্ন দেখে। সেই স্বপ্নের ইন্ধন দিতে লাগলেন শিবেশ্বর। ইতিমধ্যে অবকাশ সময়ে তিনি শেয়ার-বাজার পর্যবেক্ষণ এবং পর্যালোচনায় মগ্ন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেখানে ঠায় দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দিতেও ক্লান্তি নেই। ক্রমশ বিক্রম পাঠককে একটা দুটো করো রোজগারের হদিস দিতে লাগলেন তিনি। এটা ধরে দেখো, ওটা ছাড়ো। গোড়ায় বিক্রম পাঠকের দ্বিধান্বিত পদক্ষেপ, পরে বেপরোয়া। লুব্ধ বিশ্বাস অনেকটাই অন্ধ। লাভ হলে গোড়ায় গোড়ায় শিবেশ্বরকে কৃতজ্ঞতার উপহার দান করত, ক্রমশ সেটা ভাগ-বাঁটোয়ারার দিকে এগুলো।

আশ্চর্য, ভাগ্যলক্ষ্মীটিকে একটা দিনের জন্যে এই মানুষের প্রতি অপ্রসন্ন হতে দেখা যায়নি।

দ্রব্যমূল্য আগুন নয় তখনো। লেখার রোজগার থেকে সংসার খরচ চালিয়েও বাঁচে কিছু। বাড়তি টুকটাক আয়ও জমা হয়। বিক্রম পাঠকের থেকে প্রাপ্য টাকাও থোকে আলাদা করা আছে। এমনি একসময় ভাগ্যের একটা বড় গোছের দাক্ষিণ্য হাতের মুঠোয় লুফে নিলেন শিবেশ্বর।

দিনতিনেক তাঁকে চিন্তামগ্ন দেখা গেল। বাড়িতে বসে থাকেন। কি ভাবেন আর লেখেন আর হিসেব করেন। এমন কি ঘরের প্রতি নিভৃতের দৃষ্টিও তেমন সজাগ নয় আর। তারপর দিনের বেশির ভাগ সময়ই দিনকতক বাড়ির বাইরে কাটালেন। ফেরার পরেও তেমনি চিন্তাচ্ছন্ন দেখা গেল। একটা ছেড়ে বাড়িতে দুটো খবরের কাগজ এলো। শিবেশ্বরের কাগজ পড়াই আর শেষ হয় না। অথচ সেই কাগজ জ্যোতিরাণীও উল্টেপাল্টে দেখেছেন। তন্ময় হবার মত কিছু পাননি।

হঠাৎ এক দুপুরে গা-মোড়া দিয়ে উঠে বসতে দেখা গেছে তাঁকে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা বিক্রম পাঠকের কাছে গেছেন। অফিস থেকে তাকে বার করে নিয়ে একটা রেস্তরাঁর নির্জন ক্যাবিনে গিয়ে বসেছেন। মানুষটাকে এই প্রথম একটু উত্তেজিত মনে হয়েছে পাঠকের।

যথাসম্ভব ঠাণ্ডা মাথায় তাঁর কাছে একটা প্রস্তাব পেশ করেছেন শিবেশ্বর। সেটা আর কিছু নয়, দুদিনের মধ্যে হাজার বিশেক টাকা ঢালতে হবে তাকে। দুদিনের মধ্যে কারণ, শিগ্‌গীরই এমন একটা সময় আসছে যে আর সময় পাওয়া যাবে না। পাঠকের সঙ্গে তিনিও নিজের সঞ্চয় পাঁচ হাজার টাকা ঢালবেন— সেটাই তাঁর যথাসর্বস্ব।

পাঠক চাঙ্গা হয়ে উঠল। বিশ হাজার টাকা শুনে ভিতরটা খচ-খচ করতে লাগল। কিন্তু সেই সঙ্গে নিজের পাঁচ হাজার ঢালতে রাজী শুনে বিষয়ের গুরুত্ব পাঁচ গুণ বেড়ে গেল।

কি দিন আসছে? কি কিনবে?

সেটা পরে শুনো, আগে রাজি কিনা বলো। তুমি রাজি না হলে বলে কি হবে, আমার যা আছে তাই নিয়ে নামব।

পাঠক ঘায়েল। এযাবৎ বিশ হাজার টাকার কাছাকাছি এই লোকের মারফতই রোজগার হয়েছে তার। তাছাড়া সব থেকে বড় তুরুপের তাস শিবেশ্বরের নিজের পাঁচ হাজার।

রাজি।

তোমার মূলধন তোমারই থাকবে, কিন্তু লাভের বখরা আধাআধি হবে।

পাঠক এবারে হতাশ একটু, বিশ হাজারের সঙ্গে পাঁচ হাজারের আধাআধি বখরা, তাহলে আর লাভ কি হল?

লাভটা কম করে এক লাখ দেড় লাখ ধরে নিয়ে হিসেব করো।

অতএব পাঠক রাজী। লাভ না হলে তো আর ভাগে হাত পড়ছে না।

আলোচনা হল। তারপর লেখাপড়া হল। দুদিনের মধ্যে শেয়ার-বাজারের পথে নগদ পঁচিশ হাজার টাকা উধাও হয়ে গেল। তারপর প্রতীক্ষা।

পরের দু সপ্তাহের মধ্যেছোট একটা যোগাযোগ আর বড় গোছের একটা ঘটনা ঘটে গেল। যোগাযোগটা আপাতত কিছু নয়, কিন্তু ঘটনার ফলে শিবেশ্বরের সাম্প্রতিক নিবিষ্টতার একটা বড় পরীক্ষা হয়ে গেল। চোখ থাকলে, বস্তুতন্ত্রীয় ভাগ্যের পরিণতি কোন্‌দিকে গড়াবে, জ্যোতিরাণী এই থেকেই আঁচ করতে পারতেন।

যোগাযোগটাই প্রথম। পরের বড় ঘটনার সঙ্গে এর কোনো যোগ নেই।

বিকেলে পাড়ার কলেজে-পড়া পরীক্ষার্থিনীর বাড়ি থেকে আসছিলেন জ্যোতিরাণী। উল্টো দিক থেকে একটি মহিলা তাঁকে দেখে থমকে তাকালেন।

মুখখানা চেনা-চেনা লাগল জ্যোতিরাণীর, কিন্তু ঠাওর করতে পারলেন না, কে। পাশ কাটালেন।

শুনুন।

জ্যোতিরাণী দাঁড়ালেন। মহিলাটি হাসিমুখে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি শিবেশ্বরবাবুর স্ত্রী না?

মাথা নাড়তে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল জ্যোতিরাণীর। দু বছর আগে একদিন মিনিট কয়েকের জন্য দেখেছিলেন। মহিলা তবু নিজের পরিচয় দিলেন, আমার নাম মৈত্রেয়ী চন্দ, অনেকদিন আগে একবার আপনাদের বাড়িতে গেছলাম —চিনেছেন?

অপ্রস্তুত হাসিমুখে জ্যোতিরাণীকে স্বীকার করতে হল, চিনেছেন। সুপরিচিতার মত আলাপের ধরন মৈত্রেয়ী চন্দর। বললেন, আমি কিন্তু দেখেই চিনেছি ভাই, যদিও যা দেখেছিলাম তার সঙ্গে রাত-দিনের তফাত, তবু একবার দেখলে না চিনে উপায় আছে! তারপরেই গলা খাটো করে জিজ্ঞাসা করলেন, ছেলে না মেয়ে?···এতকালের মধ্যে কারো সঙ্গে তো আর দেখা হয়নি, খবরও পাইনি।

জ্যোতিরাণী লজ্জা পেলেন একটু, বললেন, ছেলে।

বাঃ! মৈত্রেয়ী চন্দর আলাপ করার উৎসাহ, বললেন, আপনারা থাকেন তো সেই কোথায়, এদিকে একা কোথায় চলেছেন?

সামনের বাড়িটা দেখিয়ে জ্যোতিরাণী জানালেন, কিছুদিন হল ওখানে উঠে এসেছেন।

আমন্ত্রণ জানাতে হল না, মৈত্রেয়ী নিজেই সঙ্গ নিলেন। চলুন চলুন দেখে আসি, কি কাণ্ড, আমি তো প্রায়ই আসি এদিকে। শিবেশ্বরবাবু আছেন?

জ্যোতিরাণী সঠিক উত্তর দিতে পারলেন না, যখন বেরিয়েছেন তখন ছিলেন না। কিন্তু দোতলায় উঠতে উঠতেই টের পেলেন, আছেন। টাইপের শব্দ কানে আসছে।

মৈত্রেয়ীকে দেখে শিবেশ্বর খুশি যত না, বিস্মিত তার থেকে বেশি। তবু সাগ্রহেই অভ্যর্থনা জানালেন, আসুন, আপনি কোথা থেকে?

আকাশ থেকে। মৈত্রেয়ীর মিষ্টি অভিযোগ, খবর-টবর তো আর নেবেন না, ভাগ্যে দেখে ফেলেছিলাম। ভাবলাম, রাস্তা আলো করে কে যায়, তারপরই দেখি—ওমা, চেনা মানুষ তো! জ্যোতিরাণীকে আর এক পলক দেখে নিয়ে শিবেশ্বরকেই প্রশংসা করলেন, আপনি মশাই এখন বেশ যত্ন-টত্ন নিচ্ছেন বোঝা যায়।

জ্যোতিরাণী হাসছেন অল্প অল্প। বাইরের এ ভব্যতা ক্রমে রপ্ত হচ্ছে। হাসি

খুশি মহিলাটিকেও মন্দ লাগছে না তাঁর। এছাড়া কৌতূহল তো আছেই।

এই কৌতূহলের জায়গাটিতেই নাড়া দিলেন শিবেশ্বর। বললেন, কালীদা এসেছিলেন, এই একটু আগে গেলেন।

মৈত্রেয়ীর মুখে মিষ্টি বিড়ম্বনার কারুকার্য। চকিতে জ্যোতিরাণীর দিকেই তাকালেন আর একবার। তারপর সরস জবাব দিলেন, একটা ফাঁড়া কেটেছে বলুন তাহলে—উনি তো আমাকে গোটাগুটি বর্জন করেছেন, দেখলে হয়ত সিঁড়ি দিয়ে নামিয়েই দিতেন।

এক ঘণ্টার ওপর বসে আসর জমিয়ে গেলেন মৈত্রেয়ী চন্দ। নতুন আলাপ যাঁর সঙ্গে অর্থাৎ জ্যোতিরাণীর সঙ্গেই বেশি ভাব করলেন। রান্নাঘরে এসে নির্দ্বিধায় চা-জলখাবার তৈরীর সাহায্যে লেগে গেলেন। মুখ চলতেই লাগল। এখানে কবে আসা হয়েছে, ছেলে কোথায়, কর্তাটি কি চাকরি করছেন, জ্যোতিরাণী কি পরীক্ষা দেবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন, পরীক্ষার পরে কি করবেন—সবেতে সহজ কৌতূহল তাঁর। এক ঘণ্টার মধ্যেই 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে চলে এলেন। বললেন, আপনি-আপনি করলে কাছে আসা যায় না, কিছু মনে কোরো না ভাই। বয়সে তো কিছু বড়ই হব, আমাকে মিত্রাদি ডাকবে, আমার বয়স তেইশ হয়ে গেল, বুঝলে? তোমার কত?

কুড়ি।

মিত্রাদির চোখেরও পরদা নেই, মুখেরও লাগাম নেই। খুশি-ভরা চোখে যেন ওজন করে দেখছেন তাঁকে। বললেন, তোমার এই কুড়ি আরো কুড়ি বছর চলুক ভাই—তাই চলবে মনে হচ্ছে। দেখলে মেয়েদেরই কেমন লাগে, পুরুষের কেমন লাগে কে জানে।

জ্যোতিরাণীর মুখ রাঙা হয়েছে, কিন্তু শুনতে ভালো লাগেনি খুব। রূপের খেসারতের কথা মনে হয় বলেই বোধ হয়।

চায়ের আসরে মৈত্রেয়ী হালকা দাবি পেশ করেছেন শিবেশ্বরের কাছে, দেখুন মশাই আই-এ পাস করার পর বউকে আমার হাতে ছেড়ে দিতে হবে, আপনি ঘরে আটকে বসে থাকবেন তা হবে না।

আপনি নিয়ে কি করবেন?

কি আবার করব, চাকরিতে লাগিয়ে দেব। যাওয়া মাত্র লুফে নেবে… আপনার অবশ্য চোখে অন্ধকার দেখারই কথা।

আপনার ভদ্রলোকটি অন্ধকার দেখছেন?

মৈত্রেয়ীর চোখেমুখে অভিযোগের কারুকার্য।—আমার সঙ্গে এর তুলনা!

আলাপের এই বিষয়বস্তু আবার খারাপ লাগছে জ্যোতিরাণীর। কিন্তু ঘরের লোকটিও রসিকতা জানেন দেখা গেল। শিবেশ্বর বললেন, আয়নার সঙ্গে আপনি সম্পর্ক ছেড়েছেন মনে হচ্ছে।

সুচারু লজ্জা গোপনের চেষ্টায় মৈত্রেয়ী জোরেই হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, তা হলেও আমার ভদ্রলোক অন্ধকার দেখার জন্যে এখানে বসে নেই। ইংল্যাণ্ডে তিনি মনের সুখে আলো দেখে বেড়াচ্ছেন আর আমাকে লিখছেন ব্যারিস্টারি পড়ছেন। পাস করলেও ফেরার ইচ্ছে নেই, আমাকে নিয়ে যাবেন নাকি। আমার দায় পড়েছে—লিখে দিয়েছি কোর্টে কেসের ঠোকাঠুকি প্রথমে আমার সঙ্গেই লাগবে।

স্বামী-স্ত্রীর এই সম্পর্ক জ্যোতিরাণীর কল্পনার ব্যাপার। জিজ্ঞাসা করলেন, ফেরার ইচ্ছে নেই কেন?

ভ্রূভঙ্গি করে মৈত্রেয়ী জবাব দিলেন, আমার ভয়ে বুঝতে পারছ না? হাসছেন।—জানে আমি যাব না, ব্যস নিশ্চিন্ত। নিশ্চিন্তে থাকা বার করছি, পাসটা করুক না।

জ্যোতিরাণী শুধু এইটুকুই বুঝলেন—স্বামীটি মহিলার ভয়ে সদা কম্পমান। শিবেশ্বর টাইপের ওপর দু-চারবার আঙুল চালিয়ে হঠাৎ মন্তব্য করলেন, ইংল্যাণ্ডের অবস্থা শিগ্‌গীরই খুব খারাপ হবে।

মৈত্রেয়ী অবাক, সে আবার কি!

না, এমনিই বললাম। যা বলা হয়ে গেছে তা বলার ইচ্ছে ছিল না মনে হল জ্যোতিরাণীর। শিবেশ্বর অনুপ্রাস যুক্ত করলেন, ঘাবড়ে দিয়ে আপনার দাপট কত দেখলাম।

হুঁঃ, সেই মেয়ে পেয়েছেন। আপনারটির মতো অত ভালো মানুষ নই মশাই।

আবার ফাঁক পেলে আসবেন জানিয়ে মৈত্রেয়ী বিদায় নিলেন। জ্যোতিরাণী তাঁকে সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফিরে এসে দেখেন মনোযোগ সহকারে টাইপ চলছে আবার। ও-ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন তিনি, বাধা পড়ল।

কালীদা এসেছিল। বাবার অসুখ বেড়েছে বলে গেল।

কদিন ধরেই সর্দি-জ্বর চলছে শুনেছিলেন, দেখতে যাওয়া হয়নি। জ্যোতিরাণী অপেক্ষা করলেন একটু, কিন্তু ওদিকের নিবিষ্ট দু চোখ টাইপের দিকে। তাই তিনিই জিজ্ঞাসা করলেন, যেতে হবে বোধ করি?

হ্যাঁ, অসুখটা খারাপের দিকে যাচ্ছে শুনলাম। মুখ না তুলে জবাব দিলেন।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে জ্যোতিরাণী ফিরে এসে দাঁড়ালেন। খটাখট টাইপের থামার লক্ষণ দেখা গেল না।

সদাকে নিয়ে যাও। কাজে মগ্ন।—কালীদাকে বলে দিয়েছি কারো মুখ চেয়ে বাবার টাকা বাঁচানোর দরকার নেই, বড় ডাক্তার ডাকা হয় যেন। আনা হয়েছে কিনা খোঁজ কোরো।

জ্যোতিরাণী আরো একটু দাঁড়িয়ে থেকে চলে এলেন।

বড় ঘটনা এটাই। শ্বশুরের মৃত্যু।

পনের দিন টানা-হেঁচড়ার পর তিনি চোখ বুজেছেন। শেষের দিকে কথা বলতে পারেননি। কিন্তু জ্ঞান শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ছিল। এই পনের দিনের প্রত্যেকটা দিন দুঃসহ মনে হয়েছে জ্যোতিরাণীর। প্রতিটি মুহূর্ত পরপারযাত্রী কোন্ আশায় কাল গুনেছেন, সেটা অনুভব করতে পেরেছেন। যাতনায় দগ্ধ হয়ে ফিরেছেন এক-একদিন। ফিরে অটুট মনোযোগে একজনকে টাইপ নয়তো লেখায়, নয়তো কিছু একটা হিসেবনিকেশে নিবিষ্ট দেখেছেন। জ্যোতিরাণী কিছু বলতে পারেননি, রাগে জ্বলেছেন শুধু।

শিবেশ্বর অসুখের খবর নিয়েছেন। খারাপের দিকেই গড়াচ্ছে শুনে গম্ভীর হয়েছেন। জ্যোতিরাণী আশা করেছেন, তক্ষুনি না ছুটুক, পরদিন যাবে। যাননি। তাঁর যাবার সময়ে পরামর্শ দিয়েছেন, কালীদাকে বলো আরো বড় ডাক্তার ডাকতে। সেইখানেই শেষ। আবার টাইপ অথবা লেখায় মন দিয়েছেন।

জ্যোতিরাণী তবু নড়তে পারেননি। তবু দাঁড়িয়ে থেকেছেন। সেটাও বিরক্তির কারণ আর একজনের। ধমকের সুরে প্রশ্ন শুনেছেন, দাঁড়িয়ে আছ কেন, বলবে কিছু?

এরপরেও বলার মত রুচি হয়নি জ্যোতিরাণীর। বলার ফল কি হবে জানেন। নীরবে প্রস্থান করেছেন। নিষ্ঠুরতার এরকম নজির আর বুঝি দেখেননি তিনি।

শেষের দিকে রোজ ফিরতেও পারেননি। কালীদা আর মামাশ্বশুর যতটা পারেন করছেন। কিন্তু তাও যথেষ্ট নয়। আশঙ্কায় আর হতাশায় শাশুড়ী বোবা হয়ে গেছেন। প্রতি মুহূর্তে তিনিও আশা করেছেন ছেলে আসবে।

শেষ ঘনাবার আগের রাত্রিতে সদাকে সঙ্গে করে জ্যোতিরাণী ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখে ওপরে উঠলেন।

বুকে বালিশ চাপা দিয়ে শিবেশ্বর লিখছেন কি। ছলাৎ করে একঝলক রক্ত উঠল জ্যোতিরাণীর মাথায়। খপ করে কলমটা তুলে নিয়ে বিছানায় আছড়ে ফেললেন। হঠাৎ এরকম মূর্তি দেখার জন্য বা এই আচরণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন

না শিবেশ্বর। আস্তে আস্তে উঠে বসলেন। বিছানার সাদা চাদরে এক ছোপ কালি লেগে গেছে।

সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে তিক্ত রোষে জ্যোতিরাণী বলে উঠলেন, তোমার বাবা চললেন, বুঝেছ? দুপুর থেকে অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে, আর বেশি সময় লাগবে না—তুমি খুব মন দিয়ে লেখো—আমি তোমাকে শুধু এই কথাটাই একবার জানাতে এলাম, বুঝলে?

কলমটা তুলে নিয়ে ঠাণ্ডামুখে সরিয়ে রাখলেন শিবেশ্বর।—বুঝলাম। কিছু বলতে বা জানাতে এসে এরকম আর কোরো না—দেখতে অনেকের ভালো লাগতে পারে, আমার লাগে না।

দুর্বার ক্রোধে জ্যোতিরাণী তাঁর মুখখানা ঝলসে দিতে চেষ্টা করলেন, তারপর হন-হন করে দরজার দিকে এগোলেন।

দাঁড়াও।

দরজার কাছে ফিরে দাঁড়ালেন জ্যোতিরাণী।

আলনা থেকে জামাটা টেনে নিয়ে পরলেন শিবেশ্বর। জুতোয় পা গলাতে গলাতে বললেন, বাবা এখন যাবেন সেটা আমি চাইনি, বেঁচে থেকে কিছু দেখে যাবেন আশা করেছিলাম। চলো—

সুরেশ্বর ছেলেকে দেখলেন, চিনলেন। কথা বলার শক্তি নেই, হাত নেড়ে আশীর্বাদ করারও না। ঠোঁট দুটো নড়ল শুধু, চোখ দিয়ে জল গড়ালো। শাশুড়ী ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

রাত বাড়ছে। শিয়রে শাশুড়ী বসে, পায়ের কাছে কালীদা। অদূরের চেয়ারে গৌরবিমল। মাঝে মাঝে উঠছেন, দেখছেন, আবার বসছেন। তাঁরা দুজন দুদিকে বসে—জ্যোতিরাণী আর শিবেশ্বর। নিস্তব্ধ ঘর। জ্যোতিরাণীর দু চোখ নিজের অজ্ঞাতে শিবেশ্বরের মুখের ওপর ঘুরে আসছে এক-একবার। তখনো হৃদয় খুঁজছেন তিনি। আশা করছেন দেখতে পেয়েছেন। আশা করছেন দেখতে পাবেন আরো। কেবলই মনে হচ্ছে, দুজন যেন দুই তীরে বসে আছেন। মাঝখানে জীবন দিয়ে সেতু গড়ছেন একজন। গড়া হয়ে এলো। মৃত্যুর সেতু। মৃত্যুর বলেই সেটা একেবারে ঘুচে যাবে না, মুছে যাবে না হয়ত।...ভগবান এই যোগ যেন সত্যি হয়। এত বড় মৃত্যুও যেন মিথ্যে হয়ে না যায়।

মিথ্যে হল কিনা জানেন না।

সকালের দিকে চোখ বুজলেন সুরেশ্বর চাটুজ্যে।

॥ ষোল ॥

'ওয়র ! হোয়াট্ ম্যাড্ গেম্ দি ওয়ার্লড্ সো লাভ্স্ টু প্লে !'

পশ্চিম দিগন্তে যুদ্ধের সেই পাগলা খেলার আকস্মিক ঘোষণায় গোটা দুনিয়া নাড়াচাড়া খেল একপ্রস্থ। পৃথিবীতে রাজনীতিজ্ঞ কূটনীতিজ্ঞ থেকে সাধারণ মানুষের সংখ্যা কত হাজার গুণ বেশি তার হিসেব হয়নি। সাধারণ মানুষের হতচকিত বিস্ময় ততো গুণ হয়ে দেখা দিল বললে অত্যুক্তি হবে না বোধ হয়।

১৯৩৯ সালের পয়লা সেপ্টেম্বর অতর্কিতে পোল্যাণ্ড নিয়ে বসল জার্মানী। তার অবধারিত ফল দেখা গেল তেসরা সেপ্টেম্বর। পৃথিবীর ইতিহাসে নিঃসংশয়ে একটা কালো দিন বলা যেতে পারে তাকে।

পশ্চিম অঙ্গনে যুদ্ধের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার তারিখ সেটা।

সেই ঘোষণায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ছায়া হয়ত পড়েছিল। কিন্তু পৃথিবীর বৃহত্তম গোষ্ঠী তখনো সেই বিভীষিকা দেখবে বলে প্রস্তুত নয় আদৌ। ওই পাগলা খেলা কতদূর গড়াবে, কতখানি ছড়াবে, কত দেশ পোড়াবে, সে সম্বন্ধেও ধারণা সীমিত। দীর্ঘ একুশ বছর কেটেছে মাঝে। নতুন মানুষ, নতুন শক্তি, নতুন বুদ্ধির দরবারে এই পাগলা খেলার স্বরূপ অনেকটাই ঘষা-মোছা।

কিন্তু সব মানুষ সাধারণ মানুষ নয়।

দুনিয়ার কোথাও বড় রকমের কিছু ঘটেছে সেটা যেন জ্যোতিরাণী আঁচ করেছেন একটি মানুষের মুখ দেখে। সেই মুখ শিবেশ্বরের। এ-রকম নীরব উত্তেজনা আর উদ্দীপনা আর দেখেননি জ্যোতিরাণী। শ্বশুরের সদ্য মৃত্যু তখনো তাঁর ভিতরের অনেকটাই জুড়ে আছে। কিন্তু আর একজনের চিন্তা থেকে সেটা বুঝি গোটাগুটি মুছে গেছে। সকাল থেকে রাতের মধ্যে খাওয়ার সময় নেই, ঘুমনোর সময় নেই। খবরের কাগজ আসছে পাঁজা পাঁজা। কে একটা লোকও আসছে মাঝে মাঝে। দিবারাত্র হিসেব-নিকেশ, সলা পরামর্শ। শ্বশুরের কাজ হয়ে গেল। আনুষ্ঠানিক কাজে ত্রুটি কোথাও হল না। কিন্তু কাজ যিনি করলেন, তাঁর সমস্ত একাগ্রতা অন্যত্র উধাও। ব্যবস্থা সব করলেন কালীদা আর মামাশ্বশুর, ছেলের দ্বারা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল শুধু, তার বেশি কিছু নয়।

বাপ চলে যাবার পরেও ছেলে ভিন্ন বাড়িতে থাকবে সেটা কেউ আশা করেনি। শিবেশ্বরের মা তো নয়ই। ছেলের হাবভাব দেখে তিনি দ্বিতীয় দফা কান্নাকাটির

হাট বসালেন। কিন্তু মা-কে কি করে বোঝাতে হয় ছেলের সে মাথা পরিষ্কার। বাপের একটুও নিন্দা করলেন না শিবেশ্বর অথবা ক্ষোভ প্রকাশ করলেন না। বললেন, বাবা তাঁকে নিজের দু পায়ে দাঁড়াবার জন্যে বাড়ি থেকে সরিয়েছিলেন। দাঁড়াবার আগে তাঁর ফিরে আসাটা অশুভ হবে। তিনি ইষ্টনামে শপথ করেছিলেন, দাঁড়াবার আগে ফিরবেন না, ফিরলে যেন তাঁর মৃত্যু হয়। যখন ফিরলে বাবা খুশি হতেন, তখনই ফিরবেন তিনি। বাড়িতে কালীদা থাকল, নাতি থাকল, বউও যখন খুশি আসবে যাবে—মা যদি ছেলের কাছে এসে আপাতত থাকতে না-ই পারেন, তিনিও ফাঁক পেলেই এসে মা-কে দেখে যাবেন—কিন্তু ভিন্ন বাড়ি তুলে দিয়ে, তাঁর এখানে থাকাটা সম্ভব হবে না।

মা-কে শিবেশ্বর নিজের কাছে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন সত্যিই। কিন্তু ভিটে ছেড়ে, এত কালের স্মৃতির সম্পর্ক ঘুচিয়ে সদ্য শোকের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার কথা তিনিও ভাবতে পারেন না।

শিবেশ্বরের একাগ্র দৃষ্টিটা পৃথিবীর কোন্ রঙ্গমঞ্চের কোন্ নাটকের প্রতি তন্ময়, সে-সম্বন্ধে কারো কোনো ধারণা নেই।

…১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে জার্মানী ডেনমার্কের ওপর থাবা বসালে।

…মে মাসে বেলজিয়ামের ওপর।

…ওই মাসেরই আটাশ তারিখে মন্ত্রিত্বে ইস্তফা দিলেন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন। সেই আসরে বুক ঠুকে নামলেন চার্চিল।

ভালো, ভালো। শিবেশ্বর যা ভেবেছিলেন, ব্যাপারগতিক তার থেকে অনেক ভালো দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু তাঁর যে আবারও কিছু টাকা দরকার। দেশের বৃহত্তম গোষ্ঠী ঘুমুচ্ছে তখনো। ভালো করে তাদের ঘুম ভাঙার আগে আরো কিছু টাকা পেলে হত। বিক্রম পাঠকের সঙ্গে জোট বেঁধে যে-টাকা খাটিয়েছেন, বিকার জ্বরের মত তার মুনাফার তাপ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। অতটা হবে না, কিন্তু ঠিক মত টাকা লাগাতে পারলে এখনো আশাতীত কিছু হতে পারে।

বিক্রম পাঠক টাকার জন্য ছোটাছুটি করছে। একবারের মোটা টাকা খাটানোর ফলে তার চোখের সামনে যে লাভের অঙ্কটা নেচে বেড়াচ্ছে, তাতেই তার মাথা গরম। টাকা সংগ্রহের প্রতিশ্রুতি সে দিয়েছে, কিন্তু অন্যের টাকার সঙ্গে নিজের টাকার যোগ না হলে শিবেশ্বরের জোরের দিকটা শিথিল হয়ে পড়ে। তাই নতুন মূলধনের চিন্তা করছেন তিনি।

সেদিন কালীনাথের কাছেই প্রস্তাবটা করে ফেললেন, কিছু টাকার ভয়ানক দরকার, ব্যবস্থা করতে পারে ?

কালীনাথ ভাবলেন সংসারে টান ধরেছে। বললেন, পি সিমাকে বলি, কত চাই ?

…পাঁচ-ছ হাজার। কিন্তু বাবার টাকা নেব না।

টাকার অঙ্ক শুনে কালীনাথ হাঁ। ব্যবসায়ের ইচ্ছে জেনেও সে-রকম সাড়া দিলেন না। কিন্তু যুদ্ধের আগে যে ব্যবসায় নেমে গেছেন শিবেশ্বর, বর্তমানেই তার লাভের অঙ্ক শুনে হাঁ তিনি। সেই মালের দাম ইতিমধ্যেই প্রায় তিন গুণে দাঁড়িয়েছে। পঁচিশ-তিরিশ হাজার টাকা লাভ এক্ষুনি ঘরে তোলা নাকি জল-ভাত ব্যাপার-কারণ বিক্রমের সঙ্গে লাভের আধাআধি বখরা তাঁর।

তবে বেচে দিচ্ছিস না কেন ?

বিক্রমও ওই কথা বলায় তাকে আমি গলা ধাক্কা দিতে গেছলাম। যাক, তোমার বুদ্ধি চাইছি না, ব্যবস্থা কিছু করতে পারো কিনা দেখো।

কালীনাথ ব্যবস্থা করলেন। অর্থাৎ ছেলের নাম করে প্রস্তাবটা তার মায়ের কাছেই পেশ করলেন। ছেলের বুদ্ধির ওপর মায়ের চিরদিনই প্রবল আস্থা। তহবিলের অনেকটাই নিঃশেষ করে টাকা বার করে দিলেন তিনি।

কালীনাথ শিবেশ্বরকে বললেন, টাকা কোথা থেকে এলো সে খোঁজে তোর কাজ নেই, মনে করো ধার পেলে—ভালো সুদ দিও।

অতএব সেই আধাআধি বখরাতেই বিক্রমের সঙ্গে দ্বিতীয় দফা টাকা খাটানো হল। এবারের মূলধন গতবারের থেকে কম, এই টাকাটা দীর্ঘদিনের জন্য আটকে রাখার ইচ্ছেও নেই। দরকারও হবে না, সবকিছুতে ওলট-পালট শুরু হয়ে গেল বলে। যুদ্ধে কোনদিন কোন সমস্যার মীমাংসা হয় না—এই ভাবপ্রবণ দার্শনিকের উক্তির ধারে-কাছে নেই শিবেশ্বর। ব্যক্তি-জীবনের সুস্পষ্ট ফয়সালা তিনি হাতের নাগালের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন।

…১৯৪০ সালের তেরোই জুন জার্মানী প্যারিস দখল করলে। কে বলে তেরো একটা অশুভ সংখ্যা ? শিবেশ্বর প্রচণ্ড শুভ ভাবছেন।

…আঠেরই জুন ইংরাজ সরকার আত্মরক্ষার তাগিদে আচমকা বার্মা রোড বন্ধ করে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা নাড়চাড়া খেল একদফা। অনেক লোক তক্ষুনি ভাবলে যুদ্ধটা ঘরে এসে গেছে। কিছু লোক পালানোর হিড়িকও শুরু হয়ে গেল। সেটা আবার একটুও মনঃপূত নয় শিবেশ্বরের। সেই একদিনেই যুদ্ধগত অর্থনীতির ওপর দুটো রচনা লিখে উঠলেন তিনি। ইতিমধ্যেই রচনার কদর তাঁর তিন গুণ বেড়ে গেছে। সম্পাদকরা তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধ, তাঁরা জানেন, এই একজন ওই দুর্যোগের ইঙ্গিত কত আগে থেকে দিয়ে এসেছেন। প্রতিষ্ঠানের নামের দিক থেকে সেই সব রচনা প্রকাশের সুফল এখন পাচ্ছেন তাঁরা। রচনার

তাগিদ তাঁরাই দিচ্ছেন।

…বাইশে জুন জার্মানীর শর্তে ফ্রান্স শান্তিচুক্তি করতে বাধ্য হল। শিবেশ্বরের বিবেচনায় এটা আশাতিরিক্ত সুখবর। বিদেশের মাল আমদানি এবারে ভালোরকম হোঁচট খাবে। জিনিসের দাম দিকবিদিকশূন্য হয়ে মানের খোলস ছাড়বে।

…পনেরই আগস্ট শত্রুর হাজার বোমারু বিমানে ইংলণ্ডের আকাশ ছেয়ে গেল।

১৯৪০ সালে পৃথিবীর বহুকোটি মানুষ দুঃস্বপ্ন দেখেছে, বিনিদ্র কাটিয়েছে। চোখে অনেক রাত ঘুম ছিল না শিবেশ্বরেরও। কিন্তু তিনি দুঃস্বপ্ন দেখেননি।

ইতিমধ্যে জ্যোতিরাণীর পরীক্ষা হয়ে গেছে। ফল বেরিয়েছে। ভালো পাস করেছেন। কবে পরীক্ষা হল, কবে ফল বেরুলো, সে খবর শিবেশ্বরই শুধু ভালো করে রাখেন না। পরীক্ষা দেবার সময় শুধু দেখেছিলেন—পরীক্ষা দিচ্ছেন। আর মৈত্রেয়ী চন্দ এসে আনন্দ প্রকাশ করতে এবং খেতে চাইতে পাসের খবর জেনেছেন। বিভাস দত্ত পরামর্শ দিয়েছিলেন, কলেজে ভর্তি হলে দু বছরেই বি-এ পরীক্ষাও শেষ হতে পারে, নইলে একটা বছর লোকসান। কলেজে যেতে চাইলে বাড়িতে বাধার সৃষ্টি হবে কিনা জ্যোতিরাণী সঠিক জানেন না।…যে তালে আছে এখন, আপত্তি নাও হতে পারে। চোখে পড়ার মতই পরিবর্তন দেখছেন। তবু নিজেই সে চিন্তা বাতিল করেছেন। বলেছেন, এ বয়সে অল্পবয়সী মেয়েদের সঙ্গে বসে ক্লাস করতে লজ্জা করবে, অন্য কিছু ব্যবস্থা হলে ভালো হত।

মুখের দিকে চেয়ে বিভাস দত্ত মিটিমিটি হেসেছেন। জ্যোতিরাণী তাইতেই লজ্জা পেয়েছেন। কালীদা গম্ভীরমুখে তাঁকে সমর্থন করেছেন, তা বটে, মেয়ের বয়সী মেয়ে সব—

যাই হোক, ব্যবস্থার রাস্তা বিভাস দত্তই বাতলে দিয়েছেন। কোনো কলেজে নাম তো থাক, তারপর দেখা যাবে। কলেজে যেতে পারুক না পারুক, নাম থাকলে মেয়েদের ব্যাপারে অনেক রকম ফন্দি-ফিকির বার করা যায়।

জ্যোতিরাণী আপত্তি করেন নি, একটা বছর লোকসান করার ইচ্ছে তাঁরও নেই।

একচল্লিশের গোড়া থেকেই কমলার অলক্ষ্য পদার্পণ স্পষ্টতর হতে লাগল। শিবেশ্বরের একনিষ্ঠ প্রতীক্ষার গাছে সবে মুকুল ধরল বলা যেতে পারে।

জানুয়ারী মাসের এক বিশেষ দিন সেটা। বাংলা দেশের মানুষ, বিশেষ করে কলকাতার মানুষকে এই দিনটা আনন্দমিশ্রিত বিস্ময়ের খোরাক যুগিয়েছে। এই

দিনের সঙ্গে ভবিষ্যতের গর্ভে আরো কতবড় বিস্ময়ের যোগ নিহিত ছিল সেটা কারো জানা নেই। পরদেশী শাসন আর কড়া বিধিব্যবস্থার চোখে ধুলো দিয়ে সুভাষবাবু পালিয়েছেন। এই পালানোটা নিখুঁত শিল্পকর্মের মতই প্রচ্ছন্ন এবং পরিচ্ছন্ন মনে হয়েছিল সকলের। ইংরেজ মরীয়া হয়ে তাঁকে ধরার জন্যে চতুর্দিকে জাল বিস্তার করেছে।

যুদ্ধের চিন্তায় এমনিতেই তাদের মাথায় ঘা তখন। যুদ্ধের শুরু থেকেই যুক্ত বাংলার শাসনব্যবস্থার ভোল বদলেছে। কংগ্রেস বলেছে, এটা আমাদের যুদ্ধ নয়। তারা ক্ষমতা ছেড়ে সরে আসার ফলে মুস্লিম লীগের ক্ষমতা দ্রুত বেড়েছে। দেশের মধ্যে ইংরেজদের চোখে তখন তারাই শুধু ভালো মানুষ। সুভাষবাবু কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন বটে, তবু এই সময়ে তাঁর ওই অভিনব পলায়ন ইংরেজকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছে।

সন্ধ্যায় এই প্রসঙ্গেই আলোচনা হচ্ছিল বাড়িতে। একটু আগে গৌরবিমল এসেছিলেন, সেদিনই তিনি বাইরে চলে যাচ্ছেন কোথায়। চলে যাবার পর কালীনাথ মন্তব্য করেছেন, কোথায় যাচ্ছে বলল না, মামুর বোধ হয় কলকাতাতেই গা-ঢাকা দিয়ে থাকার মতলব। সুভাষবাবুর পালানোর ফলে সেবাপ্রতিষ্ঠানের বেচারারাই বেশি কুনজরে পড়েছে।

জ্যোতিরাণী শঙ্কা বোধ করেছেন, আবার প্রায়-বিস্মৃত দিনের উদ্দীপনার ছোঁয়াও পেয়েছেন।

এরপর কালীদা বিভাস দত্তকে ঠাট্টা করেছেন, তুমি তো সুভাষবাবুর ভক্ত হে, তুমিও খবর রাখো না ভদ্রলোক কোথায় গেলেন! নাকি পুলিস লেলিয়ে দেব?

এই আলোচনার মধ্যে শিবেশ্বরের আবির্ভাব। আলাপের বিষয়বস্তু শুনলেন, কিন্তু নিস্পৃহ। কালীদা তাঁর ব্যস্ততা নিয়েও ঠাট্টা-ঠিসারা করলেন একটু, সে-ও তেমন জমল না। বিভাস দত্ত ওঠার উপক্রম করতে শিবেশ্বর বললেন, কালীদা বোসো—কথা আছে।

বিভাস দত্ত চলে গেলেন। গম্ভীর মুখে হাতের পোর্টফোলিও ব্যাগ খুললেন শিবেশ্বর। এই গাম্ভীর্যে আত্মতুষ্টি প্রচ্ছন্ন দেখেছেন জ্যোতিরাণী। তিনিও দাঁড়িয়েই রইলেন।

একতাড়া নোট বেরুলো। কালীদার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে শিবেশ্বর বললেন, ধরো—

কালীনাথের দু চোখ খাড়া।—বেশ ভালো কথাই তো দেখি রে! কিসের টাকা?

সেই যে দিয়েছিলে, তোমার মোটা সুদসুদ্ধু আছে এতে, গুণে নাও।

কালীনাথ বললেন, এত টাকা গুণতে ভালো লাগবে বলে গুণতে ইচ্ছে করছে, তবু থাক। কিন্তু টাকা তো পিসিমার, আসলটা তাঁকে দিয়ে স্নদটা আমিই নিই তাহলে ?

মা-কে কিছু বলতে হবে না, রেখে দিতে বলো।

ব্যবসা ভালই হল বুঝি ?

মন্দ না।

এ-ব্যাপারেও কথা আর বাড়ল না দেখে টাকা নিয়ে কালীনাথ উঠে পড়লেন। জ্যোতিরাণী ভিতরের দিকে যাচ্ছিলেন, শিবেশ্বর বললেন, দাঁড়াও—

পোর্টফোলিও ব্যাগ থেকে আরো দুই তাড়া নোট বেরুলো।—এগুলো ট্রাঙ্কে রেখে দিতে হবে।

এর আগে একসঙ্গে এত টাকা জ্যোতিরাণী হাতে করেননি। জিজ্ঞাসা না করে পারলেন না, একসঙ্গে এত টাকা কোথায় পেলে ?

এত কি, টাকা শিগগীরই আরো অনেক দেখবে।···পাব আর কোথায়, কেউ দিয়ে যায়নি, মাথা খাটিয়ে উপার্জন করতে হয়েছে।

মিথ্যে দম্ভ নয়, এরপর অনেকবারই টাকার আনাগোনা দেখলেন তিনি।

ঘরের মানুষ নির্লিপ্ত। কর্মমগ্ন। টাকার এই অঙ্কগুলো সত্যিই তুচ্ছ যেন।

···জুন মাসে জার্মানী রাশিয়া আক্রমণ করল। যুদ্ধের বিস্তার অনেকগুণ বেড়ে গেল।

···এদিকে জাপানের হাব-ভাব স্নবিধের নয়। তারা ব্যবসা গোটাচ্ছে, রপ্তানি বন্ধ করেছে।

কিন্তু জ্যোতিরাণী অত সব খবর রাখেন না, ঘরের মানুষের চোখেমুখে তিনি শুধু চাপা আনন্দের ছটা দেখছেন, অশান্ত উদ্দীপনা দেখছেন। অনেক রাতে উঠে নিঃশব্দে পায়চারি করতে দেখেছেন তাঁকে। কিছু একটা প্রতীক্ষার অবসান হয়ে আসছে বুঝি। ঘরের দিকের দৃষ্টিটা গোটগুটি বাইরের দিকে ঘুরেছে। সেই লুব্ধ দৃষ্টি আর নিভৃতের প্রতীক্ষার ধরনও বদলেছে। জ্যোতিরাণী অনেকখানি অব্যাহতি পেয়েছেন। মাঝেসাঝে বেশি রাতে আধা-ঘুম চোখে চমকে উঠতে হয়। যে মানুষ কাছে আসে, সে শুধু বিস্মৃতির তাড়নায় আসে। উদ্দীপনাও যখন যন্ত্রণার মত হয়ে ওঠে, তখনই আসে বো ধহয়।

যে ভদ্রলোককে দুই-একদিন বাড়িতে দেখেছিলেন জ্যোতিরাণী, সেদিন সন্ধ্যায়ও তাকে দেখলেন। ঘরের লোকের সঙ্গেই এসেছে। জ্যোতিরাণী চেনেন না কে। কিন্তু সেদিন ঘরে ডাক পড়ল তাঁর। দুজনকেই বেশ খুশি মেজাজে দেখলেন

জ্যোতিরাণী। আর নাকে কি একটা অপরিচিত গন্ধ এলো।

পরিচয় করাবার ফুরসত দিল না আগন্তুক, জ্যোতিরাণীকে দেখেই শশব্যস্তে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল, তারপর স্থান-কাল ভুলে চেয়ে রইল মুখের দিকে। শিবেশ্বরের ঠোঁটের ফাঁকে হাসি।

আমি বিক্রম পাঠক, দাদার শাগরেদ। দাদার ঘরে আমার এ-রকম ভাবীজি আছে একদিনও বলেনি, জানলে আমি রোজ আসতুম—দাদা একটি হার্টলেস ক্রীচার।

শিবেশ্বর বললেন, ইনি খবরের কাগজের একজন নামকরা অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর···আমাদের খিদে পেয়েছে, একটু খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে বিক্রম পাঠক তড়বড় করে বাধা দিয়ে উঠল, নেভার মাইণ্ড। আপনি বসুন ভাবীজি, দাদাকে আমি বিশ্বাস করেছিলাম—কিন্তু আমাকে এমন ঠকানো ঠকিয়েছে জানতুম না। অ্যান একস্ট্রা-অর্ডিনারি সারপ্রাইজ! অবাধ্য দু চোখ দাদার দিকেই ফিরিয়েছে তারপর, তোমার ঘরে এ-রকম লেডি, এখানে টাকার বন্যা না এসে যাবে কোথায়—খোদ লছমী দেবীকে ঘরে আটকেছ তুমি! লেটেস্ট্ খবরটা ভাবীজি জানে তো?

জবাবে ঈষৎ বিরক্ত মুখে শিবেশ্বর ভুরু কোঁচকালেন।

সঙ্গে সঙ্গে বিক্রম পাঠকের দুই চক্ষু বিস্ফারিত, এখানেও গোপন! ইউ আর এ স্কাউণ্ড্রেল অ্যাণ্ড এ ড্যাম জিনিয়াস দাদা! হাত বার-দুই কপালে ঠেকিয়ে সম্মান জ্ঞাপন করল।—তুমি আই মিন আপনি এখনো জানেন না ভাবীজি, হোয়াট এ জিনিয়াস্ হি ইজ্—দু-চার দিনের মধ্যেই জানতে পারবে—আই মিন পারবেন, ইউ উইল সিম্পলি অ্যাডোর হিম্—দাদা, ভাবীজির সেই মুখ সেদিন তুমি একলা দেখলে চলবে না, আমিও ভাগ বসাবো বলে দিলাম!

জ্যোতিরাণী হাসছেন অল্প অল্প, কিন্তু কথার ধরন-ধারণ অসংলগ্ন আর বেশি ঢিলেঢালা লাগছে। কথার তোড়ে সেই গন্ধটা আরো বেশি নাকে আসছে।

খাওয়া-দাওয়া আর হৈ-চৈ করে বিক্রম পাঠক বিদায় হল যখন, রাত মন্দ নয়। তাও ওঠার ইচ্ছে ছিল না, শিবেশ্বরই প্রকারান্তরে ঠেলে পাঠিয়েছেন তাকে। নিজে সঙ্গে করে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে এসেছেন।

জ্যোতিরাণী চুপচাপ শয্যা আশ্রয় করেছেন। শিবেশ্বর হাসিমুখে বললেন, বিক্রমের মুখে প্রশংসা ধরে না, বাঙালী মেয়েদের মধ্যে এমন সুন্দর আর নাকি দেখেনি—

জ্যোতিরাণী ফিরলেন তাঁর দিকে। নজর করে দেখলেন একটু—আগে তো কেউ এত সুন্দর দেখলে তোমার ভালো লাগত না, আজ এত আনন্দের কারণটা কি?

আছে কারণ। শিগগীরই জানতে পারবে। পাশে বসলেন।

পাশে নয়, আরো কাছে এগুবে—এই মুখ দেখেই জ্যোতিরাণী বুঝেছেন। বললেন, আনন্দ করে তাই নতুন কিছু খেয়েও এসেছ?

স্ত্রীটির এই আচরণই বেশি কাছে টানে, আজ আরো ভালো লাগছে। এগিয়ে এলেন, বললেন, সামান্যই খেয়েছি। যে-ভাবনা চলেছে কদিন ধরে, মাথাটা বড় বেশি ঠাসা লাগছিল—

বেশ করেছ। গন্ধটাকেই ঠেলে সরাবার ইচ্ছে কি মানুষটাকে জানেন না।—এদিকে আসছ কি মতলবে, ও-সব পেটে পড়লে যেদিকে ঝোঁক হয় শুনেছি, আমাকে তাদের কারো মত লাগছে এখন?

শিবেশ্বরের নেশা হয়নি। ভালো লাগার আমেজটুকুও ছুটে গেল। শোনামাত্র সেই আগের দিনে ফিরে গেছেন তিনি। আগের দিনের মত বাসনা অত্যাচারী হয়ে উঠেছে। জ্যোতিরাণীর সেটা বরদাস্ত করতে আপত্তি নেই, মানুষটা তার ক্রোধ নিয়ে আর হিংসা নিয়ে আর প্রবৃত্তি নিয়েও সজাগ থাক তাঁর প্রতি। শুধুই বিস্মৃতির উপলক্ষ হতে আপত্তি। টাকা আসছে। আরো আসবে বুঝতে পারছেন। আসার শুরুতেই মদ খাওয়া হয়েছে। এই মানুষকে সজাগ রাখার তাড়নাটা আরো বেশি অনুভব করেছেন তাই।

দিন-সাতেকের মধ্যে এই গোছেরই একটা কথা আর একবার বললেন তিনি। যা আগে কখনো বলেননি। রমণীর মুখে যে কথা শুনলে আর যে বিরক্তি দেখলে পুরুষের স্নায়ু জ্বলে কিন্তু তার থেকে অনেক বেশি কামনা জ্বলে। বিশেষ করে শিবেশ্বরের মত পুরুষের। জ্যোতিরাণী জেনেই বলেছেন।

দিনটা ছিল শোকের দিন। সমস্ত দেশেরই শোকের দিন। সকাল থেকেই মন খারাপ ছিল জ্যোতিরাণীর। একটা দুঃসংবাদের আশঙ্কায় ঘুরেফিরে রেডিওয় কান পেতেছেন। বেলা বারোটা নাগাদ দুঃসংবাদ লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল।

একচল্লিশ সালের সাতই আগস্ট সেটা। রবীন্দ্রনাথ মারা গেলেন।

বিষণ্ণ মুখে চুপচাপ বসেছিলেন জ্যোতিরাণী। সঙ্গে সঙ্গে বাবার কথা মনে পড়ল। কি শ্রদ্ধাই না করতেন! বাবা বলতেন, দেশকে যে মহাবীর্যবতী মায়ের রূপে সাজিয়েছেন কবিগুরু, তেমনটি আর কেউ পারেননি। বিয়ের পরের অনেক বিষণ্ণ দিনে জ্যোতিরাণীও এই একজনের কবিতার আশ্রয় পেয়ে অনেক ব্যথা-বেদনার ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছেন। এখনো পারেন।

কবিতা থাকবে। কবি গেলেন।

দুপুরের দিকে বিভাস দত্ত এলেন। শুকনো বিমর্ষ মুখ। জ্যোতিরাণী জানেন ভদ্রলোকের সঙ্গে কবিগুরুর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। তিনি শ্মশানের দিকে যাচ্ছেন, জ্যোতিরাণীও যাবেন কিনা জিজ্ঞাসা করলেন।

কখনো কোথাও নিয়ে যাবার প্রস্তাব করা দূরে থাক, অসময়ে বাড়ি আসাও এই প্রথম বোধ হয়। অসময় বলতে যে-সময় শিবেশ্বর বাড়ি নেই অথবা কালীদা অনুপস্থিত। কিন্তু আজ তাঁর আসাটাই স্বাভাবিক মনে হয়েছে, জ্যোতিরাণীর যাবার ইচ্ছে আছে কিনা জিজ্ঞাসা করাটাও। জ্যোতিরাণী তক্ষুনি রাজি। দলে দলে মানুষ বেরিয়ে পড়েছে, তাঁরও ঘরে বসে থাকতে ভালো লাগছে না।

সাগ্রহে বললেন, যাব, আপনি বসুন একটু—

কিন্তু পাশের ঘরে এসে থমকালেন। আজকাল আর কেউ তাঁকে দু চোখের প্রহরায় আটকে রাখে না, তবু। এই যাওয়াটা কতখানি সুনজরে দেখবে আর একজন—সেই চিন্তা তক্ষুনি বাতিল করে দিলেন। বেরুবার কারণটা অনেক বড়। কিন্তু ভাবনা অন্য কারণে। বাক্সয় অনেকগুলো কাঁচা টাকা আছে। অবশ্য সদা আছে বাড়িতে, কিন্তু তাকেও দুধ আনা, জলখাবারের ব্যবস্থা করা—এ-সবের জন্য কবার করে বেরুতে হয়। তাছাড়া যত বিশ্বস্তই হোক, সর্বস্ব ওর ভরসায় ফেলে রেখে এভাবে বেরুনোটা সঙ্গত বোধ করছেন না।

কিন্তু এখন আর যাবেন না বললে ভদ্রলোকই বা কি ভাববেন? দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে একটা ব্যবস্থা করলেন। জামা-কাপড় বদলে প্রস্তুত হয়ে এ-ঘরটা তালা-বন্ধ করলেন।···বিকেলের আগেই ফেরা যাবে আশা করা যায়। সদাকে বললেন পাশের ঘরে থাকতে, তার বেরুবার দরকার হলে ওই ঘরও তালা-বন্ধ করতে। দ্বিতীয় ঘরের চাবিটা সদার কাছে রেখে গেলেন।

রাস্তায় বেরুবার পর বাড়ির কথা আর মনে থাকল না। শোকের পথের যত কাছে এসেছেন, ততো ভিড়। ভিড়ের চাপে গলদঘর্ম অবস্থা। এখানে মানুষ এসেছে হৃদয়ের টানে, শেষ অর্ঘ্য অর্পণ করতে। শোকের এই বৃহৎ স্তব্ধ সমাহিত চেহারাটাও অন্তর স্পর্শ করার মত। কোথা দিয়ে দিন কেটে গেল জ্যোতিরাণী টেরও পেলেন না।

বাড়ি ফিরলেন যখন, সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। ট্যাক্সিতে বিভাস দত্তর পরিচিত লোক ছিল, তাই তিনি নামলেন না আর, তাঁকে বাড়ির দরজায় নামিয়ে দিয়ে গেলেন। সদাকে নীচের দরজার কাছে দাঁড়ানো দেখে কি ভেবে জ্যোতিরাণীও তাঁদের নামার জন্যে জোর করলেন না।

সদা গম্ভীরমুখে জানালো, দাদাবাবু সেই থেকে ইদিকের ঘরে বসে আছেন।

শোনামাত্র কি-রকম যেন বিরক্তি বোধ করলেন জ্যোতিরাণী।...ফিরতে ইদানীং রোজই রাত হচ্ছিল, আজ তিনি বেরিয়েছেন, তাড়াতাড়ি ফিরবে বইকি।

কখন এসেছেন?

সেই বিকেলে।

জ্যোতিরাণী দোতলায় উঠে এলেন। চৌকিতে দু পা তুলে দিয়ে চেয়ারে মাথা রেখে ঘরের কড়িকাঠ দেখছেন শিবেশ্বর। তাঁর সামনে মাঝারি সাইজের নতুন চামড়ার সুটকেস একটা। স্ত্রীর পায়ের শব্দ শুনে সোজা হয়ে বসলেন। সঙ্গে আর কাউকে না দেখে দরজার দিকে ঝুঁকলেন একটু। সেখানে সদা।

দরজা বন্ধ করে কোথায় গেছলে? সেই দুপুরে বেরিয়েছ শুনলাম?

নিমতলার দিকে।

শিবেশ্বর তেতে উঠলেন, দেড় ঘণ্টা ধরে ঠায় বসে আছি, কোথায় গেছলে জিজ্ঞাসা করলেও আপত্তি?

দরজার দিকে এগিয়েও জ্যোতিরাণী ঘুরে দাঁড়ালেন।...সত্যি জবাব ভাবছে না, বক্রোক্তি ধরে নিয়েছে। আশ্চর্য, এই দিনে কে গেল না গেল জানে কিনা সন্দেহ। বললেন, আপত্তি কেন হবে, বললাম তো নিমতলার দিকে গেছলাম।

শিবেশ্বরের মুখে বিস্ময়ের ছায়া পড়ল এবারে। কিন্তু আজ নিজে তিনি অবাক হবার জন্যে প্রস্তুত নন একটুও, আজ তাঁরই অবাক করার পালা। দুনিয়া জয় করার মন নিয়ে আজ বাড়ি ফিরেছেন তিনি। স্ত্রী কতক্ষণ বাড়িতে অনুপস্থিত বা কার সঙ্গে বেরিয়েছিল সে-চিন্তাও মুহূর্তে তুচ্ছ হয়ে গেছে।

সুটকেসটা তুলে নিয়ে পিছন পিছন এ-ঘরে এলেন। জ্যোতিরাণী ঘরের জানলাগুলো খুলতে যাচ্ছিলেন, তিনি বাধা দিলেন, থাক, এখন খুলতে হবে না। বড় ট্রাঙ্কটা খোলো—

জ্যোতিরাণী ফিরে সুটকেসটার দিকে তাকালেন এবার।...টাকা এসেছে বোঝা গেল, নইলে জানালা খুলতে নিষেধ করার কথা নয়।

ট্রাঙ্ক খোলা হল। তারপর সুটকেস।

টাকার আচমকা আঘাতে লোকে হার্টফেলও করে শোনা গেছে। জ্যোতিরাণীর সে-রকম কিছু হল না। তিনি শুধু নিশ্চল হয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। যা দেখছেন সত্যিই কিনা ঠাওর করতে পারছেন না। সুটকেসে একশ টাকার বারো-তেরোটা মোটা বাণ্ডিল। দেখা মাত্র মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠেছে জ্যোতিরাণীর।

শিবেশ্বর গম্ভীর, কিন্তু ঠোঁটে চাপা হাসির আভাস। বললেন, আজ আর কিছু ব্যবস্থা করা গেল না, বাড়িতেই আনতে হল। এক লক্ষ সাতাশ হাজার টাকা আছে

ওখানে।

চিত্রার্পিতের মত জ্যোতিরাণী ফিরলেন তাঁর দিকে। কিসের এত টাকা, কেন এত টাকা, তাও জিজ্ঞাসা করে উঠতে পারলেন না।

এই মুখই দেখতে চেয়েছিলেন শিবেশ্বর। এবারে হাসতেই লাগলেন, বললেন, ধরে রাখতে পারলে আরো বেশ কিছু হতে পারত। বিক্রমের আর সবুর সইল না।

নির্দেশমত জ্যোতিরাণী টাকা তুলে রাখলেন। ঘরের লোকের দিকে চেয়ে এই প্রাপ্তিযোগেরই প্রস্তুতি দেখছিলেন তিনি কদিন ধরে—চাপা উদ্দীপনা দেখছিলেন। এই জন্যেই ওই বিক্রম পাঠক তাঁকে বলছিল সেদিন, দাদার প্রতিভা কি বস্তু দু-চার দিনের মধ্যেই জানা যাবে। প্রতিভার ছটায় জ্যোতিরাণী বিমূঢ় হয়েছেন বটে। অন্য দিনের মত আজ আর শিবেশ্বর মুখ শেলাই করে বসেছিলেন না। নিজের গুণে নিজে মুগ্ধ। এই টাকা আসবে বলে উনচল্লিশ সালে সেই যুদ্ধের আগে থেকে কি-ভাবে মাথা খাটাতে হয়েছে, স্ত্রীকে শুনিয়েছেন।

তারপরেও যতবার চোখ গেছে মুখখানা তুষ্টিতে বিভোর দেখেছেন জ্যোতিরাণী।

সোনা যদি মুখ খোলে আর সকলের মুখ বন্ধ হয়—জ্যোতিরাণীর ও সেই অবস্থা। টাকা কথা কইছে। আজকের কথা এমন রূপকথা যে স্নায়ুগুলোও নিষ্ক্রিয় হবার উপক্রম।···মাথা আছে, বিয়ের পর থেকেই জ্যোতিরাণী শুনে আসছেন। তাঁর ঘরের লোকের মাথা সাধারণ মাথা নয়। ওই মাথার খেলা অনেক দেখেছেন তারপর, দেখে ক্ষোভে বিদ্বেষে বহুদিন স্তব্ধ হয়েছেন। সেই খেলার সঙ্গে এই খেলা যোগ হতে পারে কোনদিন ভাবেননি।

সেই জন্যেই কি এই বিস্ময়ের ধাক্কায় ভিতরে ভিতরে একটা অজ্ঞাত অস্বস্তি বোধ করেছেন তিনি? কিছু ছিল না যখন, মায়া-মমতাশূন্য দাপটে জীবন দুঃসহ হয়েছে তখনই। এখন কিরকম হবে তাই ভাবছেন? জ্যোতিরাণী সঠিক জানেন না। আনন্দ তাঁরও হবার কথা।···ছেলে আছে। ভবিষ্যতের ভাবনায় উতলা কখনো হননি, তাও নয়। ভিন্ন সংসার পেতে বসার পর চিন্তা গোড়ায় গোড়ায় তিনিও করতেন। কিন্তু দুজনের একাত্ম ভাবনার বিনিময়ে এ-সংসার দাঁড়ায়নি। অভাব-চিন্তার গ্রন্থিতেও একদিনের জন্যে বাঁধা পড়েননি দুজনে।

ভাগ্যের এত বড় পরিবর্তনে জ্যোতিরাণীর মনের তলায় একটা ভয়ের ছায়া দুলেছে সম্ভবত এই কারণে। লোকটার বুকের ঠিকানা কখনো পাননি বলে। পাননি ভাবেন না, যা পেয়েছেন তার ওপর একটুও নির্ভর করতে পারেন না বলে। এত বড় প্রাপ্তিযোগেরও উর্ধ্বে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণার তাগিদ অনুভব করেছেন জ্যোতিরাণী সম্ভবত এই জন্যেই।

সমস্ত দিনের ক্লান্তি গেছে, হাতের কাজ সেরে অসময়ে চানই করে উঠেছেন প্রায়। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাথা আঁচড়েছেন। অগোচরে চোখ দুটো তখন নিজেরই সর্বাঙ্গে খরদৃষ্টি বুলিয়ে গেছে বারকয়েক। সন্ধানের এই দৃষ্টিটা নতুন। আয়নার ভিতর দিয়েই দু চোখ আর একজনের মুখের ওপর থমকেছে হঠাৎ। পরিতুষ্ট মনোযোগ লক্ষ্য করেছেন। আয়নার ভিতর দিয়ে চোখে চোখ মিলল দুই একবার। জ্যোতিরাণীর ঈষৎ অসহিষ্ণু অথচ নিস্পৃহ অভিব্যক্তিটা আজ স্পষ্টতর হলো আরো। ইচ্ছে করেই স্পষ্ট করে তুললেন। কারণ, উল্টে আজ এই মনোযোগটুকু ধরে রাখার প্রয়োজনই বেশি অনুভব করেছেন তিনি। টাকার ওপর দিয়ে কথা কইতে হলে এর দরকার আছে।

ধীরে সুস্থে সময় নিয়ে মাথা আঁচড়ালেন জ্যোতিরাণী।

···তারপর প্রতীক্ষাও এই এক রাত তিনিই করেছেন। প্রাপ্তির ছটার উর্ধ্বে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণার তাগিদে প্রতীক্ষা করেছেন। শয্যায় শিথিল দেহ বিছিয়ে দিয়েছেন। মাথার ওপর খোলা চুল ছড়ানো। পাখার হাওয়ায় টকটকে লালপেড়ে পাতলা শাড়িটা নাড়া খাচ্ছে অল্প অল্প।

শিবেশ্বর পায়চারি করছেন। এক-একবার এ-ঘরে এসে দাঁড়াচ্ছেন। বিত্তের চিন্তাই করছেন তিনি, সামনে সোনাবাঁধানো রাস্তা দেখছেন। স্ত্রীটির সাড়া পেলে আজ অন্তত খুশী মেজাজে তাঁকেও সেই রাস্তাটা দেখাতে পারতেন। সাড়া পেলেন না বলেই মাঝে মাঝে শয্যার দিকে চোখ গেল। ভালো লাগছে, চোখও টানছে। অসহিষ্ণুতা লক্ষ্য করছেন, জ্যোতিরাণীর প্রতীক্ষা জানেন না।

শিবেশ্বর পাশে এসে বসলেন একসময়। বললেন—কাল একবার বেরুতে হবে আমার সঙ্গে, ওগুলোর ব্যবস্থা-ট্যবস্থা করতে হবে।

জ্যোতিরাণী শুনলেন। তারপর একটা বাহুতে মুখের আধখানা ঢেকে শুয়ে রইলেন চুপচাপ।

শিবেশ্বরের অনেকক্ষণের একটা বিহ্বলতা ফিকে হতে লাগল এবারে। সজাগ হতে লাগলেন তিনি।···যে টাকা আজ ঘরে এনেছেন তা কল্পনারও বাইরে, অথচ স্ত্রীটির তেমন কিছু প্রতিক্রিয়া দেখলেন না।···বিভাস দত্তর সঙ্গে বেরিয়েছিল সেই দুপুরে, ফিরে আসার পর থেকে অন্যরকম লাগছে। তিনি অন্য ঝোঁকে ছিলেন বলে কোথায় গেছল তা নিয়েও চিন্তা করার অবকাশ হয়নি। দেখছেন শিবেশ্বর, এক লক্ষ [illegible] হাজার টাকা বাক্সে তুলেও উদাসীন থাকতে পারে যে রমণী, তাকেই দেখ[illegible]টা পারে মন কোন্ তারে বাধা থাকলে তাই বুঝতে চেষ্টা করছেন।

নেশা ছুটে যেতে লাগল, ঠিক আগের মতই মমতাশূন্য লোভে দু চোখ

চকচক করতে লাগল। আস্তে আস্তে তাঁর মুখের ওপর থেকে বাহুখানা সরিয়ে দিলেন শিবেশ্বর। সন্ধ্যার সেই একই প্রশ্নের পুনরুক্তি করলেন, কিন্তু গলার স্বর অন্যরকম।

বিভাসের সঙ্গে আজ কোথায় গেছলে?

চোখেমুখে চাপা বিরক্তি জ্যোতিরাণীর। বললেন, দেশের কে চলে গেল আজ সেই খবরও রাখো না বোধ হয়?

লুব্ধ চোখে বিস্ময়ের আঁচড় পড়ল। একটু থেমে বললেন, রবি ঠাকুর মারা গেছে শুনেছি…তুমি সেখানে গেছলে?

তুমি এত টাকা পেয়েছ যে তোমার কাছে সামান্য ব্যাপার। দয়া করে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে টাকার ব্যবস্থা কি করবে না করবে ও-ঘরে বসে ভাবগে যাও।

নিজের কান দুটোকে যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না শিবেশ্বর। শিক্ষা-দীক্ষা-শূন্য কোনো অসার লোক স্থূল কৌশলে হঠাৎ অনেক টাকা রোজগার করে বসেছেন যেন—অবজ্ঞাটা সেই গোছের। রবীন্দ্রনাথের মর্যাদা যেন কেবল এই স্ত্রী জানে আর বিভাস দত্ত জানে। টাকা ব্যবস্থার ভাবনা আপাতত সরে গেছে শিবেশ্বরের মাথা থেকে। রমণীকে দখলে আনার সেই চিরাচরিত ক্রূর অভিলাষ উদগ্র হয়ে উঠেছে।

মুখের দিকে চেয়ে সেটাও সুস্পষ্ট পাঠ করেছেন জ্যোতিরাণী। অসহিষ্ণুতার নীরব অভিব্যক্তি স্পষ্ট করে তুলেছেন আরো। তারপর চোখে চোখ রেখে উঠে বসেছেন। বুকের খসা আঁচলটা তুলে দিয়ে বলেছেন, ও-ঘরে গিয়ে আজ আমাকে তুমি অব্যাহতি দেবে? মন মেজাজ ভালো নেই আমার—

ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে আলোটা নিবিয়ে দিয়ে আবার শুয়ে পড়েছেন।

অব্যাহতি পাননি। পাবেন আশা করেও ও-কথা বলেননি তিনি। মাথায় এবার দ্বিগুণ রক্ত উঠবে জানেন। উঠেছে। সরীসৃপের মত দুটো হাত দখল নিতে এগিয়ে এসেছে, তারপর গ্রাস করতে চেয়েছে। বাধা দেওয়া রীতি নয় জ্যোতিরাণীর। আজ বাধা দেওয়ার চিন্তাও করেননি তিনি।

স্ত্রী তাকে এ-ভাবে ঘা দিয়ে সরাতে চেয়েছিল বলেই এই রাতের অধিকার বিস্তার অনেকখানি সম্পূর্ণ মনে হয়েছে শিবেশ্বরের।

…কিন্তু তিনি জানেন না, বৈভবের ঊর্ধ্বে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন জ্যোতিরাণী। সেই ঘোষণা সফল হয়েছে। অগোচরে শিবেশ্বর সেই অস্তিত্বই স্বীকার করেছেন। এর পাশে এক লক্ষ সাতাশ হাজার টাকার পাল্লাটা বেশি ভারী হতে পারেনি।

হৃদয়শূন্য মানুষের হাতে অত টাকা দেখে চোখের সামনে যে অজ্ঞাত ভয়ের ছায়া

জ্বলছিল জ্যোতিরাণীর, সেটা অনেকখানি দূরে সরেছে।

গোটাকতক ব্যাঙ্কে ঘুরে ঘুরে অনেকগুলো অ্যাকাউন্ট খুলে টাকা জমা করা হল। কতগুলো শিবেশ্বরের নামে আর কতগুলো জ্যোতিরাণীর নামে। হুবহু নামেও নয় সবগুলো। নির্দেশমত জ্যোতিরাণী কোথাও সই করলেন জ্যোতি চ্যাটার্জি, কোথাও রাণী চ্যাটার্জি, কোথাও বা জ্যোতিরাণী চ্যাটার্জি। কোথাও ঠিকানা লেখা হল এই বাড়ির, কোথাও বা পৈতৃক বাড়ির। আর একজন কি করেছে না করেছে জ্যোতিরাণী জানেন না।

ব্যাপারটা খুব সাদা চোখে দেখলেন না তিনি। ফেরার পথে জিজ্ঞাসা করলেন, টাকা তো ভালো রাস্তা ধরেই এসেছে শুনলাম, রাখার বেলায় এত গোপনতা কেন?

শিবেশ্বর জবাব দিলেন, রবি ঠাকুরের অতি-কালচার্ড ভক্তরা ঠিক বুঝবে না।

জ্যোতিরাণী আর কিছু জিজ্ঞাসা করেননি।

পরিবর্তনের মধ্যে দিনকতক না যেতে আরো একটু ভালো বাড়িতে উঠে আসা হল।

একচল্লিশের মাঝামাঝি থেকে বিয়াল্লিশের মধ্যে একদিকে যুদ্ধের ছায়া যেমন পৃথিবীর আকাশ কালো করে দিতে লাগল, অন্যদিকে দেশের চিত্রপটও দ্রুত বদলাতে লাগল। কিন্তু এ দুর্যোগের কোনোটাই শিবেশ্বরের ব্যক্তিগত দুর্যোগ নয়। এ-সময় কত মানুষ কত নৌকোয় পা ফেলে তর-তর করে লক্ষ্মীর বৈতরণী পার হয়ে যাচ্ছে সে-শুধু তিনিই জানেন। যুদ্ধগত আর সঙ্কটকালের সমাজগত অর্থনীতির ওপর চাবুক চালাচ্ছেন যে শিবেশ্বর চাটুজ্যে, আর বিবেকের তহবিল শূন্য করে দিয়ে টাকা ছেঁকে তুলছেন যিনি, তাঁরা একই মানুষ বটে—কিন্তু একই মানুষের প্রতিভার দুটো ভিন্ন দিক। এক প্রতিভা অন্যটির খবরও রাখে না যেন।

...একচল্লিশের ডিসেম্বরে আচমকা পার্লহার্বার আক্রমণ করে বসল জাপান। পরদিনই জাপানের বিরুদ্ধে আমেরিকার যুদ্ধ ঘোষণা। বিয়াল্লিশ সালের ফেব্রুয়ারীতে জাপান সিঙ্গাপুর দখল করলে, মার্চে রেঙ্গুন।

পূর্ব রণাঙ্গনের পটভূমি প্রস্তুত সম্পূর্ণ।

দেশের মানুষের সক্রিয় সহযোগিতা না পেলে সাম্রাজ্যবাদীর আসন টলমল। কংগ্রেস ডাক দিলে তবে জনসাধারণ সাড়া দেবে। এই কংগ্রেস বেঁকে বসে আছে। অতএব এই মার্চেই বোঝাপড়ার শুভেচ্ছা নিয়ে ছুটে এলেন সার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্‌। সকলে আশা করল ঝুলি ভরে কি না জানি দিতে এসেছেন দেশকে।

কিন্তু দিতে কিছু আসেননি। রাজনৈতিক বাণিজ্য করতে এসেছিলেন ক্রিপস

মুখে মহানুভবতার প্রলেপ মাখিয়ে।

সেই প্রলেপ মুছে দিলে দেশের মানুষ। বোঝাপড়া হল না।

আগস্ট মাসে জাতির বৃদ্ধ পিতা ঘোষণা করলেন, আমাদের সমস্যা আমরা বুঝব, তোমরা ভারত ছাড়ো। কুইট্ ইণ্ডিয়া!

নেতাদের জেলে নিয়ে পোরা হল তক্ষুনি। কিন্তু গণঅভ্যুত্থান ঠেকানো গেল না। নদীর অবধারিত গতি যেমন সাগরের দিকে, দেশের সংহত শক্তির গতি উদ্বেলিত ওই সাগরের দিকে।

ইংরেজ, তুমি ভারত ছাড়ো, ভারত ছাড়ো! কুইট্ ইণ্ডিয়া, কুইট্ ইণ্ডিয়া, কুইট্ ইণ্ডিয়া!

সাম্রাজ্যবাদীর নৃশংসতার মুখোশ খুলে গেল। তারা হত্যা করল। তারা রক্তস্নান করালো।

ঠিক এই সময় থেকেই জ্যোতিরাণীর ঘরেও দুটো বিপরীত প্রবাহ পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে। শিবেশ্বর তাঁর কলমের জোর বাড়িয়ে চলেছেন আর সঞ্চয়ের রাস্তা বড় করছেন। একদিকে কাগজের মানুষ ধরনা দিচ্ছে তাঁর কাছে, অন্যদিকে বৈষয়িক মানুষ। কিন্তু কি দিয়ে কি হচ্ছে, কখন কত টাকা আসছে জ্যোতিরাণী খবরও রাখেন না। দেশের ওই মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে একাত্মতা বোধের উদ্দীপনায় রূপ তাঁর জলজ্বল করেছে আরো। শেকল কাকে বলে সেটা যেন তিনি সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করেছেন। বিয়ের পর থেকে নিজের ব্যক্তিগত শেকলটাই দেশের শেকলের সঙ্গে এক হয়ে গেছে।

মেয়েরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে কোথায়, জ্যোতিরাণী ছুটে গেছেন। গোপনে লোক এসেছে অর্থসাহায্যের জন্য, তিনি অকাতরে দিয়েছেন। দিয়েছেন আর ঘরের মানুষের মুখের পরিবর্তন হয় কিনা লক্ষ্য করেছেন। একটু-আধটু পরিবর্তন হয়েছে কখনো-সখনো। শিবেশ্বর একদিন বলেছেন, খরচ একটু বুঝেসুঝে করা উচিত, এই দিন নাও থাকতে পারে।

এই দিন না যাতে থাকে সেই চেষ্টাই তো করছে সকলে।

টাকা এত আসছে যে স্ত্রীর খরচের স্বাধীনতায় কোনদিন হাত দেননি শিবেশ্বর। বরং কার টাকার জোরে এত জোর সে-কথা ভেবে তুষ্টি লাভ করেছেন। কিন্তু এ-রকম জবাব কে বরদাস্ত করে? বলেছেন, তুমি দান-খয়রাত করবে বলে দিন-রাত খেটে আমি টাকা রোজগার করছি না।

জ্যোতিরাণী জবাব দিয়েছেন, এটা দান-খয়রাত নয়।...আমার পাসবই-টই-গুলো আমার কাছে দিয়ে দিও, অনেক সময় দরকার হয়।

তোমার পাসবই ? . দিয়ে দেব ? শিবেশ্বর হাসিমুখে বিদ্রূপই করেছেন।

তা যদি না হয় তাহলে দিও না। তোমার দরকারেও কখনো সই করতে বোলো না। আমি তোমার মেঘনা নই যে শুধু হুকুমের অপেক্ষায় বসে থাকব।

দিনকতক আগে জ্যোতিরাণীই মেঘনাকে কাজে লাগিয়েছেন।

সত্যিই শিবেশ্বর স্ত্রীর পাসবই তাঁর হাতে দিয়ে দিয়েছেন। এ-বেলায় উদার হতে বাধেনি। করুক কত খরচ করবে। বিয়াল্লিশের শেষে কলকাতায় বোমা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কটা বাড়ি কিনেছেন আর কত সম্পত্তি করেছেন, স্ত্রীটি খবরও রাখে না ভালো করে।

জ্যোতিরাণীর দিন ক্রমশ আবার ঝিমিয়ে এসেছে। চেষ্টাচরিত্র করে সে-বছরেই বি. এ. পরীক্ষা দেবার কথা ছিল তাঁর। সে-চেষ্টা করেননি। পরীক্ষা দিলেন পরের বছর—তেতাল্লিশ সালে। পাসও করলেন।

এদিকে রাজনৈতিক তৎপরতা থিতিয়েছে। দেশের চেহারা বদলাচ্ছে। ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে আমেরিকার সৈন্যেও কলকাতা ছেয়ে গেছে। জিনিসের দাম বাড়ছে। সরকারী চক্রে পড়ে নীতির দাম কমছে। দেশের মানুষের এক অংশের জঠরের ক্ষুধা বাড়ছে, আর এক অংশের স্ফূর্তির। নাইট ক্লাব গজাচ্ছে, ভদ্রঘরের মেয়েদেরও অনেকের সুর বদলাচ্ছে। এক্ষেত্রেও শিবেশ্বর টাকার জোর দেখছেন, টাকার খেলা দেখছেন। শুধু বিভাস দত্ত নয়, সাহিত্যিকরা সামগ্রিকভাবেই যেন সংগ্রামী সাহিত্যে নেমেছে। বিভাস দত্ত আসেন প্রায়ই, তাঁর মুখে অভাবের ছায়া দেখেন জ্যোতিরাণী, কথাবার্তা ধার-ধার মনে হয়।

হিন্দুরা চাকরি পাচ্ছে না, কদর শুধু লীগপন্থী মুসলমানদের। রাজ্য শাসনভার তাদের ওপর। যুদ্ধের তাগিদে অঢেল টাকা ঢালছে ইংরেজ। সরকারী কণ্ট্রাক্ট আর পারমিট সব তাদের হাতে। পথের ছোকরারা রাতারাতি আমীর বনে যেতে লাগল। কিন্তু মাথার অধিকার হিন্দুদেরই। ওদের সামনে রেখে টাকার মুখ দেখছে যারা, শিবেশ্বরের মত তাদের সংখ্যাও কম নয়।

কংগ্রেসের প্রধান মুখপাত্ররা জেলে তখনো। অন্যান্য দল বাইরে আছেন যাঁরা তাঁদের মধ্যেও বিভেদ শুরু হয়েছে একটু-আধটু। তেতাল্লিশের লীগ মন্ত্রিসভার বিপক্ষ-শক্তি পাঁচমিশেলি দলের সমষ্টি। রাজনৈতিক দল নয়, সেখানে যেন হিন্দু আর মুসলমান মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে তখন। রাজশক্তি যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত, মন্ত্রীগোষ্ঠী নিজের নিজের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত। জনগণের স্বার্থ দেখবে যে কংগ্রেস—সেই কংগ্রেস জেলে।

বিপক্ষ দল রব তুললে; জিনিসের মূল্য বাড়ছে, দুর্ভিক্ষের পায়ের শব্দ শোনা

যাচ্ছে। সরকারী কুশাসনের অবশ্যম্ভাবী ফল এগিয়ে আসছে।

লীগ মন্ত্রিসভা ঘোষণা করলে, দুর্ভিক্ষ অলীক কল্পনা, দুর্ভিক্ষ আসছে না—সরকারী শাসনে খুঁত কিছু নেই।

তাল বুঝে একদিকে ব্যবসায়ী চাল মজুত করতে লেগে গেল, অন্যদিকে দুর্ভিক্ষ নেই প্রমাণ করার জন্য সরকার পক্ষও। শুরু হল অপ্রত্যক্ষ চালের খেলা।

কিন্তু ব্যবসায়ীরাও ভালো করে বোঝার আগে এই খেলার আসরে নেমেছেন শিবেশ্বর চাটুজ্যে। তাঁর কয়েকটা লেখা সরকারের ওপর প্রভাব আছে এমন এক বিশিষ্টজনের চোখে পড়েছে। বিক্রম পাঠকের মারফত সেই প্রবলপ্রতাপ মুসলমান ভদ্রলোকটির সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে, আলাপ হয়েছে, কিছুটা হৃদ্যতাও হয়েছে। শিবেশ্বর প্রস্তাব দিয়েছেন, তাঁর নামে চালের পারমিট বার করে দিলে এবং তাঁর প্ল্যান মত সংগ্রহের ব্যবস্থা করলে পনের-বিশ লক্ষ টাকা উপার্জন করা কিছু নয়।

টাকা কথা কইছে আবার, সে-কথা না শুনবে কে?

আলাপ-আলোচনা বিধিব্যবস্থার শেষপর্ব বিক্রম পাঠকের তাগিদে শিবেশ্বরের বাড়িতেই সম্পন্ন হল। ওই বিশেষ ক্ষমতাবান লোকটিকে তাঁর বাড়িতে আপ্যায়ন করে এনে ফয়সালার আগ্রহ কেন বিক্রম পাঠকের, শিবেশ্বর গোড়ায় বোঝেন নি। পরে বুঝেছেন। চোখ টিপে বিক্রম বলেছে, ভাবীজিকে কতদিন দেখিনি দাদা, আর দেখলে ওই ব্যাটারও মুণ্ডু ঘুরবে, নিজের লাভের অংশ নিয়ে টানা-হেঁচড়া করতে ভুলে যাবে, দেখো।

একটু-আধটু অস্বস্তি বোধ যদি করেও থাকেন শিবেশ্বর, সেটা প্রকাশ পায়নি। দিনের গতি বড় দ্রুত বদলাচ্ছে। এই সামান্য ব্যাপারে মাথা তিনি ঘামান না।

জ্যোতিরাণীকে বলে আপ্যায়নের ব্যবস্থা আগেই করে রেখেছিলেন। যথাসময়ে মানী অতিথি এলেন। গৃহস্থ এবং গৃহিণীর সঙ্গেও অন্তরঙ্গ আলাপ-পরিচয়ের পর্ব মিটল। বিক্রম পাঠকের খুশির ধারা অন্যরকম, এই বাড়ির গৃহিণীটির স্তাবকের ভূমিকা যেন তার। সম্বর্ধনার সঠিক কারণটা বুঝলেন না শুধু জ্যোতিরাণী। মানী অতিথিটিকে তাঁর প্রতি সৌজন্যে বিগলিত দেখলেন এবং মুহুর্মুহু কৃতার্থ হতে দেখলেন। আর সকলের অগোচরে ভদ্রলোকের অবাধ্য দৃষ্টিটা বহুবার তাঁর দিকে ফিরতে দেখলেন।

পরে বাইরে থেকে এদের আলাপ-আলোচনা যেটুকু কানে এলো, তারও বিন্দু-বিসর্গ স্পষ্ট মনে হল না। পারমিট্, গোডাউন সারপ্লাস এরিয়া ইত্যাদি শব্দগুলোর অর্থ জানলেও তাৎপর্য জানেন না। কেবল এটুকু বুঝলেন, তেমনে কিছু বড় স্বার্থেই মানী অতিথিকে বাড়িতে এনে এত খাতির করা হচ্ছে।

বাইরের মানুষেরা বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গে শিবেশ্বরের ভিন্ন মূর্তি হঠাৎ। এতক্ষণ অনেক হেসেছেন, অনেক কথা বলেছেন। ভিতরে কোনোরকম তাপ জমেছে জ্যোতিরাণী ধারণাও করেননি। শিবেশ্বর তিক্তকণ্ঠে বলে উঠলেন, বড় বড় লোকেরা আসতে পারে বলে গুচ্ছের টাকা খরচ করে স্পেশাল যেসব টী-সেট আর ডিশ কেনা হয়েছিল সেসব বার না করে এগুলো বার করেছ কোন্ আক্কেলে? তোমার মাথায় কিছু আছে?

সদা ঘরে ঢুকছিল, ফিরে গেল। সেদিকে একবার তাকিয়ে জ্যোতিরাণী অপমান-বোধটাকে সংযত করে নিলেন। তারপর জবাব দিলেন, এগুলোও তো প্রায় নতুনই, এমন কি খারাপ!

খারাপ ভালো বোঝার বুদ্ধি তোমার নেই, আমি জানতে চাই সেগুলি বার করা হয়নি কেন?

জ্যোতিরাণী চেয়ে আছেন। কি দেখছেন তিনিই জানেন। বললেন, পেয়ালা-প্লেট পছন্দ হয়নি বুঝতে পারছি···এখানে আমার আসাটাও ওগুলোর মতই··· আমাকে পছন্দ হয়েছে তো?

এরপর শিবেশ্বরের মাথায় রক্ত উঠতে দেরি হল না খুব। ঘরের মেঝেতে কাঁচের বস্তুগুলো সব গুঁড়িয়ে তছনছ হয়ে গেল। জ্যোতিরাণী তাও চেয়ে চেয়ে দেখলেন।

আর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হাঁ করে এই ধ্বংস-লীলা দেখল পাঁচ বছরের আর একটি মানব-শিশু। সাত্যকী—সিতু। এই লীলায় তারই একচেটিয়া অধিকার জানত। কিন্তু বাবার এই খেলা দেখে ভরসা করে এগিয়ে আসতে পারল না সে, সদার নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটল।

যথাসময়ে টাকা এসেছে। নিজের ভাগে চার লক্ষ টাকা পেয়েছেন শিবেশ্বর। কিন্তু জ্যোতিরাণী খবর রাখেন না। তাঁর নামের কোন্ পাসবইয়েতে আরো কত টাকা জমা পড়ল, তাও জানেন না। ব্যাঙ্কের ব্যক্তিগত সেফ-ডিপোজিট্ ভল্টের ওপর সরকারী নজর পড়েনি তখনো। সেই সব জায়গায়ও কত টাকা, কত স্বর্ণদণ্ড আশ্রয় পেল, জানেন না। দিন আরো বদলেছে, এইটুকুই অনুভব করলেন তিনি।

সব জায়গা থেকে দুর্ভিক্ষের পদ-সঞ্চার স্পষ্ট কানে আসছে এখন। ওই নিয়ে এখন আর জল্পনা-কল্পনার অবকাশ নেই। বিভাস দত্তর একখানা বই নিয়ে শোরগোল পড়েছে এই সময়ে। তাঁর দেখা বিশেষ পাওয়া যায় না। পেলেও হাব-ভাব এমন বদলাচ্ছে কেন জানেন না জ্যোতিরাণী। এর সঙ্গে অভাবেরও যোগ আছে

বোঝেন। কিন্তু তিনি নিরুপায়।

সেই বইয়ের দায়ে পুলিস ধরল বিভাস দত্তকে, বই বাজেয়াপ্ত করা হল। কিন্তু রেজিস্ট্রি ডাকে জ্যোতিরাণী সেই বই পেলেন। উত্তেজনায় হৃদ্‌যন্ত্র থেমে যাওয়ার উপক্রম—বইখানা তাঁরই নামে উৎসর্গ করেছেন বিভাস দত্ত।

পড়েছেন। 'শ্বেতবহ্নি'। পড়ে চিন্তাচ্ছন্ন হয়েছেন। দুর্ভিক্ষপীড়িত নায়ক-নায়িকাদের মুখ দিয়ে যে-সব কথাবার্তা বলেছেন বিভাস দত্ত, আর যে আগুন ছড়িয়েছেন, তা কেবল সরকারকেই স্পর্শ করেনি বোধ হয়। দুর্ভিক্ষের জন্য স্বার্থান্ধ অনেক লোককেই দায়ী করা হয়েছে, অনেক লোভের ওপর কশাঘাত হানা হয়েছে। জ্যোতিরাণীর মাথায় যেন ভালো করে ঢোকেনি কিছু। কিন্তু বইখানা পড়ার পর কেন যে অমন অস্বস্তি বোধ করেছিলেন তিনি, জানেন না।

অভিজাত পাড়ায় শিবেশ্বর আধুনিক ব্যবস্থাসম্পন্ন আরো বড় বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন এবার। নিজেদের গাড়িতে জ্যোতিরাণী সেই বাড়িতে বাস করতে চলেছেন।

॥ সতেরো ॥

"ভারত? দুনিয়ায় একটিই আছে। ওই একটি দেশ, চোখ-ধাঁধানো বিপুল বৈশিষ্ট্যে যার একমাত্র অধিকার। অন্যান্য দেশেরও অনেক বড় বড় ব্যাপার আছে, কিন্তু সে কেবল তাদেরই আছে আর কারো নেই—এমন দাবি করতে পারে না। কোনো না কোনো দেশে তার দোসর মিলবে। কিন্তু ভারত? তার কথা স্বতন্ত্র। তার বিস্ময়সম্ভার তার নিজেরই। তার বৈশিষ্ট্য অলঙ্ঘনীয়, অননুকরণীয়। ভারতের দুর্ভিক্ষ এমনি এক উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য। অন্য দেশের দুর্ভিক্ষ আয়তনে সামান্য, চোখে না পড়ার মত তুচ্ছ ঘটনা। কিন্তু ভারতের দুর্ভিক্ষ সর্বধ্বংসী প্লাবনের মত। লক্ষ লক্ষ জীবন তাতে অনায়াসে ধ্বংস হয়ে যায়।"

উক্তিটা মার্কিন রসিক লেখক স্যামুয়েল ল্যাংহর্ন ক্লিমেন্স-এর, বিশ্বশ্রুত ছদ্মনাম যাঁর মার্ক টোয়েন। সুরসিক মার্ক টোয়েন ভারতের ওপর সুবিচার করেছেন এ-কথা কোনো ভারতবাসী বলবে না। ভারত প্রসঙ্গে মার্কিন রসরাজের অভিজ্ঞতা ইংরেজ শাসনের মধ্যযুগের—শাসনের ভিত যখন পাকা। বলা বাহুল্য, সে-সময় ভারতের হৃদয় তাঁর চোখে পড়েনি, পরদেশী শাসনের স্বরূপও নয়। একশ পঁচাশী বছরের সাম্রাজ্যবাদী শাসনের প্রত্যেক পঞ্চাশ বৎসর অন্তর একটি করে কালান্তক দুর্ভিক্ষ হানা

দিয়ে গেছে এই দেশে—মানুষ মরেছে কীটের মত।

…পলাশীর যুদ্ধের পরেই বিস্তৃত পূর্বভারতে রাজ-শাসন কায়েম করেছে ইংরেজ। ওই পলাশীর ভাগ্য-মুকুট মাথায় পরার ঠিক বারো বছরের মধ্যে বাংলা আর বিহারের সেই করাল দুর্ভিক্ষের ভিতরের ছবিটি রসিক মার্কিন লেখকের চোখের সামনে কেউ তুলে ধরে দেয়নি। ইতিহাসে লেখা আছে অনাবৃষ্টি মানুষ খেয়েছে। কিন্তু শাসকদের সর্বস্ব হরণের রীতির যুপকাঠে কত শত লক্ষ মানুষের জীবন বলি হয়েছে সে-সময়ে, ইংরেজের ইতিহাসে অন্তত সে-কথা লেখা নেই। আর তারপর ওই শাসনের প্রতি পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস যে একটি করে দুর্ভিক্ষের ইতিহাস, রসিক মার্ক টোয়েনকে সেদিন সে-কথা বলে দেবারও সুযোগ ছিল না হয়ত।

ভারতের বৈশিষ্ট্য আবিষ্কারের রসিকতায় সেদিনের মার্কিন নাগরিকদের হাসাই স্বাভাবিক। তারপরেও দীর্ঘকাল পর্যন্ত ভারত অচেনাই ছিল তাদের কাছে। ওই রসিকতার দর্পণে কল্পনায় ভারতকে দেখেছে তারা। ভারতের কথা ভাবতে গিয়ে হাতী সাপ আর রাজা-মহারাজাদের সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী দুর্ভিক্ষও দেখা দিয়েছে তাদের মানসিক চিত্রপটে। মার্ক টোয়েনের 'ইনোসেন্টস অ্যাব্রড' পড়েই যে ভারতকে জেনে ফেলেছে তারা!

এই জানাটাই একটা বিরাট ধাক্কা খেল উনিশশ তেতাল্লিশের শেষে আর চুয়াল্লিশের গোড়ায়। ইংরেজের দুর্ভাগ্য যে বিশ্বযুদ্ধের ধকল সামলাবার দায়ে মার্কিন কূটনীতিজ্ঞ, রাজনীতিজ্ঞ আর সামরিক বাহিনী তখন এখানে উপস্থিত। এই বাংলাদেশে, এই কলকাতায়।…সেই মর্মছেঁড়া দৃশ্য দেখে অমর রসিকশিল্পীর রসিকতা মনেও পড়েনি তাদের। তারা হাসেনি।

এর পঞ্চাশ বছর আগে অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষের দুর্ভিক্ষে ভারতের যে দু কোটি জীবন বলি হয়েছিল, স্মরণের পাতা থেকে তার কালো দাগ মুছে যায়নি তখনো। কিন্তু বাইরের দুনিয়ার কাছে তখনো ইংরেজের মুখ রক্ষা হয়েছিল। সরকারী রেকর্ডে তার কারণ বিশ্লেষণ ছিল বইকি। লেখা ছিল বিশাল দেশ এই ভারত—তার আকাশ থেকে অনাবৃষ্টির আগুনে ঝরেছে, বন্যায় ঝড়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগে সমস্ত পরিকল্পনা তছনছ হয়ে গেছে—অনুন্নত দেশ—দুর্গত স্থানে পরিবহনের বাধা, পর্যাপ্ত যান-বাহনের অভাব।

কিন্তু বিশ শতকের বিজ্ঞান-যুগে এই দুর্ভিক্ষ কেন?

আর এক বিদেশী শক্তি যেখানে নাকের ডগায় বসে চোখে দেখছে সব কিছু, সেখানে এই দুর্ভিক্ষের কি কৈফিয়ত দেবে ইংরেজ? এতবড় সংহারের মত অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ তো কিছু দেখা যায়নি! বিজ্ঞানের দাক্ষিণ্যে

যান-বাহনের বা পরিবহনের সমস্যা যেখানে শূন্য, ইচ্ছে করলেই তড়ি-ঘড়ি সকল ব্যবস্থা সম্ভব যে কালে? কি বলবে ইংরেজ?

সাম্রাজ্যবাদী শাসকের মুখোশ খুলে যাবার উপক্রম। মার্কিন কূটনীতি রাজনীতি প্রচার-বিভাগ সামরিক বাহিনীর মানুষেরা ভয়ার্ত চোখে দেশের সেই চেহারা দেখছে। অনশনে অর্ধাশনে এই ব্যাপক মৃত্যু দেখে তারা স্তম্ভিত, বিভীষিকাগ্রস্ত। অন্নের সেই হাহাকার শুনে তারা দিশেহারা। মানুষের এই চরমতম অভিশাপ দেখতে তারা অভ্যস্ত নয়।

খবর পৌঁছুতে লাগল তাদের দেশে। সেখান থেকে অন্যত্র ছড়াতে লাগল। শাসনের অযোগ্যতা আর অক্ষমতার প্রচার বাড়তে লাগল। ইংরেজের মুখে চুন-কালি।

এ অপবাদ হজম করে চুপ করে বসে থাকা যায় কি করে? অতএব দোষস্খালনে তৎপর হয়ে উঠতে চাইল ইংরেজের প্রচার বিভাগ। যে টাকা ব্যবস্থামত খরচ করলে হয়ত বা এত বড় দুর্ভিক্ষটাই ঠেকানো যেত, সেই টাকা এখন মুখরক্ষার তাগিদে খরচ করতেও আপত্তি নেই সদা হাত-টান শাসকের।

কিন্তু কি তারা বলবে? এই ব্যাপক মৃত্যুর কি কৈফিয়ত দাখিল করে তারা এখন?

কমিশনের কাট-ছাঁট রিপোর্টেও যে দেখা যাচ্ছে সাত লক্ষ আটাত্তর হাজার দুশ পঁচাত্তর জন লোক মরেছে তেতাল্লিশের জুলাই থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে, আর চুয়াল্লিশের জানুয়ারী থেকে জুনের মধ্যে মরেছে চার লক্ষ বাইশ হাজার তিনশ একচল্লিশ জন লোক! মোট এই বারো লক্ষ ছশ' ষোলটি জীবনের হিসেব তারা কি করে দেবে? লোকে বলছে পঞ্চাশ লক্ষ—সে কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল।

কেমন করে তারা বলে, তাদেরই অতি প্রিয় লীগ মন্ত্রীসভা দর্শকের ভূমিকা নিয়ে বসেছিল? কি করে স্বীকার করে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থের একান্ত অনুগত সহযোগীদের হাতে ছিল সমস্ত বড় বড় কণ্ট্রাক্ট, আর সমস্ত ব্যবস্থার ভার? এই সুহৃদদের তো শাস্তি দেওয়া চলে না। তাদেরই সহায়তায় স্বার্থান্বেষীরা এই সামান্য বিপদটা ঘটিয়ে ফেলেছে এমন স্বীকৃতিও অভাবনীয়।

অথচ মুখরক্ষাও না করলেই নয়। কুৎসা বাড়ছেই। ইংরেজের প্রচার বিভাগ টাকা খরচ করে পাল্টা রটনার আসরে নামল। বললে, কমিশনের রিপোর্ট থেকে রোগ ম্যালেরিয়া ইত্যাদির একটা বড় সংখ্যার মৃত্যু বাদ পড়া উচিত। দুর্ভিক্ষের মৃত্যুর দায়টা গোটা দেশের মানুষের ওপরেই চালাতে চেষ্টা করলে তারা।...মানুষ মরবে না? সব দোষ একমাত্র দেশের লোকের। তাদের জাতিগত ধর্মগত মস্তিগত

দলগত বিরোধটা এমনই যে কোনো উন্নত প্রোগ্রাম কাজে খাটানোই গেল না। দেশের মানুষেরা নিজেরাই নিজেদের মৃত্যুর কারণ।

কিন্তু এই সাফাই গানও মনের মত জোরালো হয়ে উঠছে না।

সঙ্কট ত্রাণের চেষ্টায় ইংরেজ তখন অর্থব্যয় করেছে, আর বহুক্ষেত্র থেকে বহু যোগ্য মানুষ টেনেছে।

যাদের টানা হয়েছে এবং যারা অর্থ পেয়েছে, শিবেশ্বর চাটুজ্যে তাদের একজন।

দেশের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ উপলক্ষে অর্থনীতির ওপর আংশিক গণতন্ত্রের প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গে ইতিমধ্যে অনেকগুলো চিত্তাকর্ষক রচনা লিখেছেন তিনি। বিশ্লেষণের বাস্তব দিক দেখিয়ে অনেক পুঁথিগত জ্ঞান নাকচ করেছেন। কখনো বা শাসনব্যবস্থার চোখে আঙুল দিয়েছেন, কখনো বা মন্ত্রীপরিষদের। সেই সব রচনা বড় বড় কাগজে গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হয়েছে।

ইংরেজ প্রচার-সচিবদেরও মনে হয়েছে, তলোয়ারের থেকে কলমের জোরের ওপর নির্ভর করাই বেশি যুক্তিসঙ্গত। এই এক ভদ্রলোকের নামের সঙ্গে আগেও তারা অপরিচিত ছিল না। বাইরের বড় বড় কাগজেও শিবেশ্বর চাটুজ্যের রচনা ফলাও করে ছাপা হচ্ছে আজ থেকে নয়।

অতএব প্রচার দপ্তরের এক হর্তা-কর্তা একদিন সাদরে ডেকে পাঠালেন তাঁকে। শিবেশ্বরের ভাগ্যাকাশে আবার একটি নতুন তারার উদয় হল।

আলাপ-আলোচনা চলল। হর্তা-কর্তা ব্যক্তিটির সঙ্গে হৃদ্যতা দ্রুত তালে বাড়ল। তাঁর বাসনা বুঝেই লোভের টোপ ফেললেন শিবেশ্বর। সরকারের ব্যবস্থামত দুই একটা রেডিও বক্তৃতায় ইংরেজকে কৌশলে বাদ দিয়ে নিজেদের অবস্থা বিশ্লেষণ করলেন, দুই-একটা ছোটখাটো রচনাও লিখলেন। ইংরেজ তক্ষুনি ভারী যোগ্য লোকের সন্ধান পেল যেন।

এদের মুখপাত্র সেই মুরুব্বিটি আরো দশজন ইংরেজ হোমরাচোমরা ব্যক্তির সংশ্রবে নিয়ে এলেন তাঁকে। আলোচনা এবারে এক নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে গড়ালো। প্রস্তাবে ঠিক হল দুর্ভিক্ষকে কেন্দ্র করে শিবেশ্বর চাটুজ্যে গোটাকয়েক ছোট বই লিখবেন—তিরিশ চল্লিশ পৃষ্ঠার প্যাম্‌ফ্লেট গোছের বই। প্রচারের স্থূল দিক সম্পূর্ণ বর্জন করে মৌলিক গবেষণা জাতীয় চিত্তাকর্ষক রচনা হবে সেগুলো। ভারতের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সাম্প্রদায়িক নীতি ইত্যাদি বহু সমস্যার দর্পণে সত্যগত দুর্ভিক্ষটিকে কৌশলে প্রতিফলিত করতে হবে। প্রত্যেকটা বই শিবেশ্বর চাটুজ্যের নিজের নামে ছাপা হবে। যাবতীয় ব্যয়ভার এবং দেশে দেশে সেগুলো ছড়িয়ে দেবার দায়িত্ব ইংরেজের প্রচার দপ্তর নেবে বটে, কিন্তু সেটা প্রকাশ্যে নয়।

ভেবেচিন্তে শিবেশ্বর তাদের জানালেন, সকল দিক যুক্ত করে এ-রকম তিনখানা ছোট বই লেখা যেতে পারে। প্রত্যেকটা বইয়ে কি কি থাকবে তার ইতিবৃত্ত লোভনীয় মনে হল ইংরেজের চোখে। তারা তক্ষুনি রাজী।

অতঃপর দেনা-পাওনার প্রসঙ্গ। শিবেশ্বর জানতে চাইলেন প্রত্যেকটা বইয়ের সংখ্যা কত হবে। সংখ্যাটা তারাও ফলাও করে ঘোষণা করল। সমস্ত দেশে দেশে ছড়িয়ে দিতে হলে প্রত্যেকটা বই অন্তত চার লক্ষ করে তো ছাপতেই হবে।

উদ্যোগীদের চক্ষু স্থির এবারে। শিবেশ্বর জানালেন বই পিছু অন্তত বারো আনা তাঁর প্রাপ্য হওয়া উচিত।

তারা হাঁ-হাঁ করে উঠল। এই সামান্য কাজে এ-রকম দাবি অবিশ্বাস্য। শিবেশ্বর হাসিমুখে বললেন, সামান্য নয়, খাটুনি আছে। তাছাড়া তোমরা যা চাইছ সেটা খুব সামান্য কি? আমার নাম বাদ দিয়ে তোমাদের প্রচার দপ্তর থেকে করো— অর্ধেক পয়সায় লিখে দিচ্ছি।

জানেন, তাহলে তাদের উদ্দেশ্য মাটি। ব্যক্তিগত প্রাপ্তির অঙ্কটা দেখলে কর্ম-কর্তাদের সমস্যায় পড়ার কথা। কিন্তু তাদের সাম্রাজ্যগত দুর্নামের সঙ্কটের দিকে তাকালে এ টাকা কিছুই নয়। মাথায় যখন ঘা, সামান্য টোটকা ওষুধের দামও শতগুণ বেশি হতে পারে। তবু টানাটানিতে বই পিছু আট আনায় রফা হল। তিন-চারে বারো লক্ষ ছাপা হবে তিনখানা বই, লেখকের ছ লক্ষ টাকা প্রাপ্য হবে।

শিবেশ্বর চাটুজ্যে সানন্দে রাজি হলেন না, রাজি হয়ে অনুগ্রহ করলেন যেন তাদের। ফলে শ্বেতাঙ্গ কর্ণধারদের সঙ্গে যে হৃদ্যতার গ্রন্থি পুষ্ট হয়ে উঠল, তার পরোক্ষ ফল আরো লোভনীয়।

প্রথম পুস্তিকায় সুদূর কাল থেকে ভারতের দুর্ভিক্ষের চিত্র আঁকলেন শিবেশ্বর। ইংরেজের নামগন্ধও নেই তাতে। তাতে আছে এদেশের শাশ্বতকালের বহু প্রাকৃতিক বিভ্রাটের কথা আর ভৌগোলিক সমস্যার কথা। আর আছে তৎকালীন শাসকবর্গের অর্থনৈতিক মানসিকতা, যে মানসিকতা সমাজের কোন্ স্তরকে কি ভাবে ছুঁয়ে গেছে তার ইতিহাস। সত্যিই আশাতীত প্রচার লাভ করল ছোট্ট বইখানা। ব্যবস্থাপকরা খুশি, তাগিদ দিয়ে তারাই দ্বিতীয় পুস্তিকা লেখালে।

শাসনের থেকেও এবারে বড় হয়ে উঠল সমাজ-মানসিকতার প্রশ্ন। বৈষম্য-নীতির সঙ্গে রাজা-রাজড়ার আমল থেকে যে মানসিকতার সত্তার যোগ। বৃহৎ শাসকগোষ্ঠী ছেড়ে ছোটখাটো জমিদার-ভুঁইয়ারা পর্যন্ত অনুন্নত দেশের অর্থনীতিকে স্বার্থের পাষাণ-আস্তরণের তলায় রেখে এসেছে। এই সঙ্কটের সঙ্গে যুক্ত বৃহৎ দেশের সামগ্রিক অজ্ঞতা, সংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, রোগের বিভীষিকা।

ভালো ভালো—এটা যেন আরো ভালো, পরের বই কবে ধরা হবে, কবে শেষ হবে ?

টাকা হাতে এলে স্নায়ুবিভ্রম ঘটে যে মানুষের শিবেশ্বর চাটুজ্যে সেই মানুষ নন। নইলে যে টাকা আসছে তার বন্যায় এতদিনে হারিয়েই যেতেন বোধ হয়। তাই তাড়া নেই শিবেশ্বরের—তৃতীয় বইও হবে। সময়ে হবে। তার আগে দেশের এমন উঁচু মহলের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ফলপ্রসূ হোক। তাই হচ্ছে। যুদ্ধের কন্ট্রাক্টের লক্ষ লক্ষ টাকার এক-একটা কাজ জালে আটকানোর জন্যে ছোটাছুটি করছে যে-সব দিকপাল কন্ট্রাক্টররা—শিবেশ্বর চাটুজ্যেকে তারাও চিনেছে বইকি। তাঁর সহায়তায় কাজ যদি হয়, প্রাপ্যের একটা অংশ তাঁকে দিতে আপত্তিই বা কি, বাধাই বা কি। দিয়েছে, দিচ্ছে, দেবে। কারণ, শিবেশ্বর চাটুজ্যেকে চেনার ফলে তারা কাজ পেয়েছে, পাচ্ছে, পাবে। যুদ্ধের সঙ্কট-দাক্ষিণ্যে এই খাতেও যত টাকা আসতে লাগল, সে-ও মাথা ঘুরে যাবার মতই।

কিন্তু শিবেশ্বর চাটুজ্যের মাথা ঘোরেনি। যুদ্ধের সেটা শেষ অঙ্ক। ঠাণ্ডা মাথায় তিনি তৃতীয় পুস্তিকাও লিখে উঠলেন। আর এটিতে সব কিছুর সঙ্গে খুব সাদাসিধেভাবে যে বিষয়বস্তুটি তিনি তুলে দিয়ে গেলেন, সে-ও সেই রকম প্রতিভা ছাড়া সম্ভব নয় বোধ হয়। এই দেশের প্রতি আমেরিকার আগ্রহ যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যাবে না সে তো অবধারিত সত্য। অতএব এই পুস্তিকা লিখে মোট ছয় লক্ষ টাকার শেষের দু লক্ষ ঘরে তোলাই একমাত্র লক্ষ্য নয় শিবেশ্বরের। টাকাই টাকা আনার বুদ্ধি যোগায়।

শিবেশ্বর এবার দুর্ভিক্ষের বর্তমান সমস্যায় এসেছেন। দল-সম্প্রদায়-রাজনীতির সঙ্গে বিধিবদ্ধভাবেই অর্থনৈতিক কাঠামো রচনার সমস্যা বিস্তার করেছেন। এক-একটা বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে আংশিক গণতন্ত্রের ভিতের ওপর সুবিন্যস্ত অর্থনৈতিক কাঠামো দাঁড়ালো না কেন—তাই দেখিয়েছেন। দাঁড়ায়নি কারণ, আংশিক গণতন্ত্রের অজ্ঞতায় আর অপচয়ে সরকারের পরিচালন যন্ত্রটিই ভেঙে পড়েছিল। এতে অবশ্য ইংরেজ-সুহৃদ লীগ-সরকারের চামড়ায় আঁচড় কাটা হয়েছে, কিন্তু নিজের চামড়া বাঁচাবার তাগিদে ওটুকুতে আর আপত্তি কি। এই বইয়েরই শেষে ইংরেজের এক অভিনব সমালোচনা করলেন শিবেশ্বর। নিরপেক্ষ লেখক, সমালোচন তো থাকবেই। সেই সমালোচনা ইংরেজের গায়ে খুব লাগার কথা নয়, লাগলও না। কিন্তু শিবেশ্বরের সামনে এই থেকেই ভাগ্যের এক নতুন দিক খুলে গেল।

তিনি লিখলেন, এই দেশ শাসনের ব্যাপারে ইংরেজের একটা বড় রকমের ভুল

হয়ে গেছে। গোটা দেশটাকে একক বা এক ইউনিট ধরে নিয়ে তারা প্রশাসনের ভিত পাকা করতে চেয়েছে। ভুল সেইখানে। বিশাল এই মহাদেশ, তার আভ্যন্তরীণ রাজ্যগুলোর আচার-আচরণ, এমন কি আহার-বিহার পর্যন্ত বিভিন্ন। সকলের একক প্রশাসনের বিফলতার নজির ইতিহাসে আছে। এ ধরনের শাসন-কাঠামো পাঠান আমলে ব্যর্থ হয়েছে, মোগল আমলে ব্যর্থ হয়েছে। লেখকের মতে এখানকার অন্তর-রাজ্যের সমস্যাগুলো অনেকটা য়ুরোপের খণ্ডদেশগুলোর মতই। তাই ইংরেজ যদি এ-দেশের শাসন-ব্যবস্থা আর অর্থনীতি সংযুক্ত রাজ্যের ধারায় নিয়ন্ত্রণ করত বহু গোলযোগ পরিহার করা সম্ভব হত।

স্পষ্ট করে আমেরিকার নাম তিনি করেননি, কিন্তু তাদের পছন্দমত এমন উক্তি আর কে করেছে? ফাঁকা উক্তি নয়, বহু যুক্তিনির্ভর সুপটু বিশ্লেষণ। তাদের প্রচার আর সংযোগ-দপ্তরের কাছেও বড় চিন্তাবিদ্ হিসেবে শিবেশ্বর চাটুজ্যের নাম কম পরিচিত ছিল না। তাঁর রচনার অনেক অনুকূল অংশ আগেও তারা ফাইলজাত করে রেখেছে। শেষের পুস্তিকা প্রকাশের পরে তারা একজন নির্ভরযোগ্য সমঝদার লাভ করল।

যুদ্ধ থামল।

প্রলয়ের অবসান। কটা বছরে দুনিয়ার যত ক্ষতি যত ধ্বংস হয়ে গেছে তার পূরণ কতকালে হবে—কোনোকালে হবে কিনা, তাই নিয়ে কত কথা লেখা হল, কত কথা বলা হল ঠিক নেই। কিন্তু শিবেশ্বর চাটুজ্যে লিখলেন বড় মজার কথা। বিজ্ঞজনেরা হাসলেন, তারিফ করলেন। তিনি লিখলেন, এই কবরের শান্তি প্রসঙ্গে ভাবপ্রবণ হয়ে ওঠার মত কলমের জোর তাঁর নেই, তিনি ভাবছেন এক প্রবাদের কথা। বড় যুদ্ধের স্মৃতি দুনিয়ায় তিনটে অপ্রতিরোধ্য বাহিনী সৃষ্টি করে থাকে। এক—পঙ্গুবাহিনী, দুই—শোকার্তবাহিনী, তিন—তস্করবাহিনী। এই তিন বাহিনীর পাশাপাশি বিশ্বের নতুন অর্থনীতির বনিয়াদ কোন্ ছাঁদ নেবে সেটা যথাযথ কল্পনা করার মত তত্ত্ববিদ তিনি নন। তবু এতে ওই তিন বাহিনীর অবদান কিছু কিছু থাকবে বলেই তাঁর বিশ্বাস।

শিবেশ্বর চাটুজ্যে বুক দিয়ে কলম চালাননি কখনো, কলম চালিয়েছেন মাথা দিয়ে। তাই কলমের কথা স্বতন্ত্র। যে ঐশ্বর্য তাঁর নিজের দখলে এসেছে সেটা স্বপ্ন নয়, কল্পনাও নয়। এই ঐশ্বর্যের ভিত পাকা করতে তাঁর খুব বেগ পেতে হয়নি। এ ব্যাপারে আর একটি পাকা মাথার সাহায্য নিয়েছেন তিনি। সেই মাথা কালীনাথের। তাঁকে চাকরি করতে দেননি। চাকরির দ্বিগুণ মর্যাদা দিয়ে তাঁকে নিজের ডান হাতখানার মতই ধরে রেখেছেন। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে

সম্পদ বৃদ্ধির পাকা রাস্তা করেছেন শিবেশ্বর। পঁয়তাল্লিশ সাল পর্যন্ত দিশেহারা মানুষ জমিজমা বাড়ি-ঘর জলের দরে বিক্রি করেছে। বেছে বেছে বর্ধিষ্ণু এলাকায় বহু জমি কেনা হয়েছে, অনেকগুলো বাড়ি কেনা হয়েছে। ভবিষ্যতে সে সবের দাম কতগুণ চড়বে সে সম্বন্ধে শিবেশ্বরের ধারণা অন্তত অস্পষ্ট নয় খুব। এই বিশাল সম্পদের দেখাশুনা বিধি-ব্যবস্থার যাবতীয় ভার কালীনাথের। এই সময় থেকেই নতুন জমিতে তিন-রাস্তার ত্রি-কোণ জোড়া বাসগৃহ তোলার ব্যবস্থায় মন দিয়েছেন শিবেশ্বর।

জ্যোতিরাণীর দিন একভাবেই কাটছিল। এম-এ পড়ার শুরুতেই আর ভালো লাগেনি, ছেড়ে দিয়েছেন। নাটক নভেল পড়েই বা কাঁহাতক সময় কাটে। বসে বসেই ক্লান্ত মনে হয় এক-একসময়। সাহিত্য আলোচনা হয়। কালীদা আসেন বলতে গেলে রোজই, কিন্তু গল্প করার অবকাশ তাঁরও কমেছে। কলকাতায় থাকলে গৌরবিমলও আসেন। আসেন বিশেষ করে নাতির টানে। কিন্তু কলকাতায় একটানা থাকেন না তিনি, বাইরে বাইরে ঘোরেন। আর আসেন বিভাস দত্ত। জেল থেকে বেরুবার পরেই তাঁর সঙ্গে জ্যোতিরাণীর সম্পর্কটা আগের থেকেও অনেক সহজ হয়েছে। মুক্তির দিনের অভ্যর্থনায় জ্যোতিরাণীকে দেখে দেড় বছর জেলখাটার খেদ ভুলেছিলেন বিভাস দত্ত।

বাড়িতে কারো আসা না আসার ওপর খরদৃষ্টি ফেলে বসে থাকে না কেউ—টাকা আসার পর থেকে এই পরিবর্তনটাই বিশেষভাবে অনুভব করেছেন জ্যোতিরাণী। শুধু তাই নয়, সামাজিক মর্যাদা রক্ষার দায়ে শিবেশ্বরের সঙ্গে তাঁকেও অনেক উঁচুমহলের আমন্ত্রণে যোগ দিতে হয়। জ্যোতিরাণী আপত্তি করেন না। তাঁকে সঙ্গে নেবার আগ্রহ ঘরের লোকেরও কম নয়। জ্যোতিরাণী তাও অনুভব করেন। তিনি উপস্থিত থাকলে তাঁর প্রতি বহু চোখের মনোযোগে একজনের মর্যাদা আরো বাড়ে। অন্যান্য বিত্তবানেরা শিবেশ্বরের এই ভাগ্যটা ঈর্ষার চোখে দেখে।

তাই জ্যোতিরাণীর এত ক্লান্তি। রূপ নিয়ে ক্লান্তি, ঐশ্বর্যের স্রোতে পড়ে ক্লান্তি।

সিতু অসুখে ভোগে প্রায়ই। জন্মের থেকেই রুগ্ন। একটানা বেশিদিন ভালো থাকে না। অসুখ-বিসুখ করলে বৃদ্ধা ঠাকুমা সামলে উঠতে পারেন না। তখন মায়ের কাছেই থাকে সে। কিছুদিন হল ছোটখাটো একটা অসুখে ভুগে উঠেছে। কিছু হলেই বড় ডাক্তার আসে, ঢালা চিকিৎসার ফিরিস্তি দিয়ে যায়। চিকিৎসা চলে। জ্যোতিরাণীর এদিক থেকেও কিছু করার বা ভাবার থাকে না।

কিন্তু দিনকে দিন বেশ রোগাই হয়ে পড়ছে সে। ডাক্তার এবারে পরামর্শ

দিলেন, হাওয়া বদল করতে পারলে মন্দ হয় না।

পরামর্শটা জ্যোতিরাণীর পছন্দ হল।

বিকেলের দিকে বিভাস দত্তর সঙ্গে গল্প করছিলেন। বাইরের দরজায় গাড়ি দাঁড়ানোর শব্দ দুজনেরই কানে এলো। কে আসছে জানেন।

কিন্তু শিবেশ্বরের সঙ্গে হাসিমুখে ঘরে ঢুকলেন আর একজন। মৈত্রেয়ী চন্দ। এসেই অন্তরঙ্গ স্বরে জ্যোতিরাণীকে খোঁটা দিলেন, কি গো, এখন আর চিনতে টিনতে পারবে তো?

জ্যোতিরাণীও খুশি মুখে অভ্যর্থনা জানিয়ে পাল্টা খোঁটা দিলেন, আমি খুব চিনতে পারব, কথা দিয়ে গিয়ে তুমিই ভুলে গেছ।

কবে কি কথা দিলাম আবার?

পাস করে বেরুলে চাকরি দেবে কথা ছিল, পাস এর মধ্যে একটা ছেড়ে দুটো হয়ে গেল।

দু চোখ কপালে তুলে ফেললেন মৈত্রেয়ী, বললেন, দেখো ঠাট্টারও একটা সীমা আছে! আমি এক নম্বরের বোকা, নইলে কোন্ লোকের ঘর করছ তুমি তখনই বোঝা উচিত ছিল।

শিবেশ্বরের ঠোঁটে হাসির আভাস। জ্যোতিরাণী বিভাস দত্তর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন মিত্রাদির। মৈত্রেয়ী চন্দর খুশি ধরে না।—ওমা, আপনি সেই দিক্‌পাল সাহিত্যিক! ভাগ্যি এসেছিলাম, দেখে চক্ষু সার্থক হল।

বিভাস দত্ত বললেন, আমার কোনো নিদারুণ ভক্ত পাঠিকার মুখেও এত বড় প্রশ্রয়ের কথা শুনিনি।

জ্যোতিরাণী হেসে উঠলেন। রাঙা মুখ করে আর দু হাত জোড় করে মৈত্রেয়ী বললেন, আর মুখ খুলব না। কিন্তু আলাপ যখন হল, সহজে রেহাই পাচ্ছেন না, বাড়ির ঠিকানা দিন—কত লোক কত ফাংশানে সাহিত্যিক ধরে আনতে বলে। আমি কি ছাই একজনকেও চিনি! আপনাকে পেলে আমার দাম বেড়ে যাবে।

মহিলার স্বতঃস্ফূর্ত কথাবার্তার ধরন আগেও ভালো লেগেছিল জ্যোতিরাণীর, এখন যেন আরো ভালো লাগল। জামার বোতাম খুঁটতে খুঁটতে বিভাস দত্ত জবাব দিলেন, ভয় ধরালেন দেখছি—

শিবেশ্বর অভয় দিলেন, বললেন, মিসেস চন্দ এখন অনেক বড় বড় কালচারাল ফাংশানের কর্ত্রী—আজও তো এক মস্ত আসর থেকে তুলে নিয়ে এলাম। এর সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে তোমার পাবলিসিটি বেড়ে যাবে।

···বলছ?

আশ্বাসলাভের সুরে বললেন বিভাস দত্ত, তার প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপটুকু জ্যোতিরাণীই উপভোগ করলেন শুধু। কোপকটাক্ষে শিবেশ্বরের দিকে ফিরলেন মৈত্রেয়ী।—আপনি মশাই আর বাড়াবেন না, নিজের স্ত্রীটিকে ঘরে আটকে রেখে অন্যকে বাহবা দিয়ে বেড়ান।

অতঃপর বিভাস দত্তর লেখার প্রশংসায় মেতে উঠলেন তিনি। বিভাস দত্ত অখুশি হলেন না, কারণ মহিলা পড়েছেন যে কিছু আলোচনা থেকে সেটা বোঝা গেল। খানিক বাদে বিভাস দত্ত চলে যেতে সাহিত্য সিকেয় উঠল। শিবেশ্বরও ও-ঘরে গেছেন। মৈত্রেয়ী উঠে জ্যোতিরাণীর কাছ ঘেঁষে বসলেন। চোখ পাকিয়ে বললেন, তোমার ব্যাপারখানা কি ?

কি ?

বয়েসখানা কোন্ ব্যাঙ্কে জমা রেখেছ, শুধু সুদের ছটা বাড়ছে ! বলে আনন্দে তাকে জড়িয়েই ধরলেন একেবারে।

জ্যোতিরাণীর মুখ লাল। পাল্টা জবাব দিলেন, নিজের চেহারাটাও আয়নায় দেখে কথা বোলো। এতদিন আসনি কেন ?

ভয়ে। তোমার ভদ্রলোকের সঙ্গে মাঝে-সাঝে দেখা হয় আজকাল, নিজের ক্ষমতায় দেখতে দেখতে কি থেকে কি করে ফেললেন—এখন ধারে কাছে ঘেঁষে কার সাধ্য !

জ্যোতিরাণী সহজ মুখেই টিপ্পনী কাটলেন, ধারে কাছে ঘেঁষার কথা কে বলছে, এখানে আসনি কেন তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম।

মৈত্রেয়ী হাসতে লাগলেন।—এখন আমার আসল কাজ কি জানো ?—চাঁদা তোলা। কিছু একটা হলেই আমাকে সব এসে ধরবে, মিত্রাদি টাকা তুলে দাও। তা ভদ্রলোককে ছেড়ে তোমার দিকে ঘেঁষলে চাঁদা মিলবে ?

তাও মিলবে, চেষ্টা করে দেখতে পারো।

ভরসা পেয়ে মৈত্রেয়ীর আনন্দ বাড়ল।—তাহলে তোমার ভদ্রলোকের দিকে অন্তত বেশি ঘেঁষব না, নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।

মিত্রাদি সুরসিকা ইঙ্গিতজ্ঞাই বটে। জ্যোতিরাণীর তাই আরো বেশি ভালো লাগছে তাঁকে। হেসে ফেলে জবাব দিলেন, বেশি ঘেঁষলে চাঁদা আরো বেশি পাবে।

হাসাহাসির ফাঁকে জ্যোতিরাণীর মনে হল, মিত্রাদির সঙ্গে কালীদার বিয়েটি হলে সত্যিই বেশ হত। মিলত ভালো। মহিলাটিকে দেখলেই কালীদার কথা মনে হয় তাঁর। আগেও হয়েছে। কিন্তু স্বাভাবিক সঙ্কোচে আলাপটা সেদিকে নিয়ে যেতে

পারলেন না। জিজ্ঞাসা করলেন, এবারে তোমার ভদ্রলোকের খবর বলো, এত বড় যুদ্ধটা তো বলতে গেলে তাঁদের মাথার ওপর দিয়েই গেল, ভালো ছিলেন ?

মিত্রাদি হালকা জবাব দিলেন, যুদ্ধ গেল বলে আরো বেশি ভালো ছিল বোধ হয় —চিঠিপত্র থেকে মনে হয় টাকা রোজগার করছে খুব।

ব্যারিস্টারি পাস করেছে জ্যোতিরাণী ধরেই নিলেন।—সেখানেই প্র্যাকটিস করছেন নাকি ?

হ্যাঁ, করছেও—করবেও।

ভাবনা যেন জ্যোতিরাণীরই।—তাহলে ?

মিত্রাদি হেসে ফেললেন, তাহলে কি ?

তাহলে কি জ্যোতিরাণী বলে উঠতে পারলেন না। নির্দ্বিধায় মিত্রাদিই আবার বলে গেলেন, তোমাদের মত অত ভালো মেয়ে নই বাপু যে কাঁদতে বসে যাব। সে আসছে না দুটো কারণে, এক নম্বর আমার ভয়ে, দু নম্বর—সেখানে কিছু একটা কাণ্ড করে বসে আছে, কোনো সাদা চামড়ার মেয়ে দেখে মুণ্ডু ঘোরাও বিচিত্র নয়। যাই হোক, আমারও একবার যাবার ইচ্ছে আছে সেখানে, ফাঁক পেলেই যাব। ব্যাপারটা নিজের চোখে দেখে আসতে হবে, তাছাড়া আটঘাট বেঁধে টাকা-পয়সারও একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করে আসতে হবে। তারপর যে যার রাস্তায় চলুক, আমার একটুও আপত্তি নেই।

শুনে জ্যোতিরাণী অবাক। কোনো সমস্যাই নেই যেন। এত সহজে একথা কেউ বলতে পারে তাঁর ধারণা ছিল না। মিত্রাদি চলে যাবার পরেও আপন মনেই ভাবলেন খানিকক্ষণ।...বছর কয়েক আগে স্ত্রীর মনে কি আছে টেনে বার করার উদ্দেশ্যে প্রথম প্রেম-বৈচিত্র্য প্রসঙ্গে ঘরের লোকটিই বলেছিল, মৈত্রেয়ী চন্দ কালীদাকে ভুলতে পারে নি এখনো। আজ জ্যোতিরাণী সেটাই সম্ভব ভাবলেন। নইলে এতটা নির্লিপ্ত কেউ হতে পারে না।...আর সেই লোকটা, অর্থাৎ মিত্রাদির স্বামী লোকটাই বা কেমন কে জানে। সে-রকম হলে টান থাকবেই বা কি করে! কিন্তু একটা ব্যাপার মনের তলায় খচখচ করতে লাগল জ্যোতিরাণীর। টাকা-পয়সার পাকাপাকি বোঝাপড়া করার জন্য মিত্রাদির বিলেত যাওয়ার ইচ্ছেটা বড় বেশি বস্তুতন্ত্রীয় ব্যাপার মনে হল তাঁর। কালীদাকে ভুলতে না পারার দরুনই যদি মিত্রাদি স্বামীর প্রতি অতটা উদাসীন হতে পেরে থাকে, তাহলে শুধু টাকা আদায়ের ফাঁস গলায় পরানোর জন্য বিলেতে ছুটতে চায় কেন ? নিজের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা আছে, তাছাড়া একটুও তো সঙ্গতিশূন্য মনে হয় না মিত্রাদিকে দেখে।

পরদিন কালীদা আসতে জ্যোতিরাণী কাছাকাছি ঘুরঘুর করে গেলেন.বার

কয়েক, মিত্রাদির আসার প্রসঙ্গটা ওঠে কিনা সেই কৌতূহল। কিন্তু শিবেশ্বর ভুলেই গেছেন, বৈষয়িক আলাপে মগ্ন তিনি।

কালীদা ওঠার আগে জ্যোতিরাণী এসে চেঞ্জে যাবার কথাটা তুললেন। ডাক্তার বলেছে, সিতুর হাওয়া বদল দরকার।

শিবেশ্বর তক্ষুনি মত দিলেন, কোথায় যাবে ঠিক করো—কালীদাই নিয়ে যাক।

সোৎসাহে কালীদা বললেন, এক্ষুনি রাজি, তোর পাল্লায় পড়ে চেঞ্জ এখন আমারও দরকার হয়ে পড়েছে। ভালো কথা, মামু এসেছে, তাকেও ধরে নিয়ে যেতে পারি—মাস্টার সিতুর রিয়েল চেঞ্জ হবে। কিন্তু পিসিমা যে আবার একা পড়ে যাবে···

জ্যোতিরাণীর অলক্ষ্য দৃষ্টিটা দুজনের মুখের ওপর দিয়েই ঘুরে গেল একবার। এ প্রস্তাবেও সায় মিলল শিবেশ্বরের। বললেন, তার জন্যে আটকাবে না, সদা থাকবে'খন, তাছাড়া আমি তো আছিই।

কালীদা বললেন, কেন, তোমার থাকার দরকারটা কি, পিসিমাকে সুদ্ধ নিয়ে গেলেই তো হয়।

শিবেশ্বর মাথা নাড়লেন। তাঁর সময় হবে না।

সামনের মাসের গোড়ায় হাজারীবাগ যাওয়া স্থির। সামনের মাসে—কারণ, শিবেশ্বরের ইতিমধ্যে বার দুই দিল্লী ছোটাছুটি করা দরকার হয়ে পড়ল। সেখানকার মার্কিন সংযোগ দপ্তর সাদর আপ্যায়ন জানিয়েছে তাঁকে। তাদের সঙ্গে সম্পর্কটাও পুষ্ট হয়ে উঠছে বেশ।

এরই মধ্যে মৈত্রেয়ী চন্দও আরো বার দুই এসে গেছেন। শিবেশ্বরের অনুপস্থিতিতে নয় অবশ্য। একদিন এসেছেন এক মহিলাকে সঙ্গে করে চাঁদার খাতাপত্র নিয়ে। শিবেশ্বরকে বলেছেন, আপনার স্ত্রী চাঁদা দেবার লোভ দেখিয়েছে, আপনার পরোয়া করিনে আর।

সঙ্গের মহিলা কোন্ এক নামকরা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারী—মৈত্রেয়ী চন্দ তাঁকে একজন শাঁসালো পেট্রন ধরে দেবেন আশা দিয়ে নিয়ে এসেছেন। জ্যোতিরাণীকে তাগিদ দিয়েছেন, কি দেবে দিয়ে যাও চটপট, অনেক জায়গায় ঘুরতে হবে।

শিবেশ্বর কাজে ব্যস্ত। জ্যোতিরাণী তাঁদের এদিকের ঘরে এনে বসিয়েছেন। হাসিমুখেই চেক বই বার করেছেন তারপর। প্রতিষ্ঠানের নাম লেখা হতে কলম থামল।—কত?

অনেক। চাঁদা আদায়ের ব্যাপারে মিত্রাদি নিঃসংকোচ।—শিগ্‌গীরই যে চ্যারিটি ফাংশন আসছে কত টাকা লাগবে ঠিক নেই। সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি, মান-মর্যাদা রেখো বাপু।

সহজ অন্তরঙ্গতায় জ্যোতিরাণী কলম সুদ্ধু চেক বই তাঁর দিকে এগিয়ে দিলেন।—তোমার মর্যাদা কি আমি কি করে জানব, তুমিই লিখে নাও তাহলে।

মৈত্রেয়ী চন্দ প্রথমে থমকালেন একটু, তারপর হাসিমুখে বললেন, সাহস তো কম নয়, পাঁচ-সাতশ লিখে বসি যদি ?

লিখে বসলে কি আর করা যাবে, দেব।

ব্যস, আর কথা নেই, কলম নিয়ে খস-খস করে পাঁচশ টাকাই লিখলেন মৈত্রেয়ী। জ্যোতিরাণী সই করে দিলেন তক্ষুনি।

সঙ্গিনী মহিলাটির অর্থাৎ সেক্রেটারীর মুখে আশাতীত প্রাপ্তির আনন্দছটা। গম্ভীর মুখে তাঁর দিকে ফিরে মৈত্রেয়ী চোখ পাকালেন প্রায়।—দেখলে ? মিত্রাদির কেরামতি দেখলে এবার ? মুখেই শুধু মিত্রাদি-মিত্রাদি কোরো না, এবার থেকে কদর কোরো একটু।

পরের বারে মৈত্রেয়ী চন্দ একাই এসেছেন, অনেকক্ষণ বসে গল্প করে গেছেন। এসেই প্রথমে অনুযোগের সুরে বলেছেন, সেদিন পাঁচশ টাকা পেয়ে ভেবেছিলাম কতই না পেলাম, পরে দেখলাম ঠকে গেছি—ইস, তোমার চেক বইয়ের কত ওজন তখন যদি জানতুম ! খোদ কর্তার মুখের খবর চাপা দিতে পারবে না !

সঠিক বোধগম্য হল না জ্যোতিরাণীর, কি চাপা দিলাম আবার ?

মৈত্রেয়ী হাসতে লাগলেন। পরে বললেন, চাঁদার কথা বলে শিবেশ্বরবাবুর কাছে সেদিন তোমার উদারতার প্রশংসা করছিলাম। শুনে ভদ্রলোকই ফাঁস করে দিলেন সব, ঠাট্টা করে বললেন, তোমার সব কটা পাসবইয়ে কয়েক লক্ষ টাকা আছে—পাঁচ হাজার লিখলেও তুমি চোখ বুঝে সই করে দিতে। পাঁচশ লিখে আমি নাকি তাঁকেই বাঁচিয়েছি।

মিত্রাদির কথাবার্তা হাসি-খুশি ভালো লাগে জ্যোতিরাণীর, তবু মনে হয় টাকার ওপর টান আছে মিত্রাদির, টাকার কথা যেন বেশি বলে। স্বামীর সঙ্গে এই ব্যাপারের বোঝাপড়া নিয়ে বিলেতে ছুটতে চায় শোনার ফলেও এই ধারণাটা হয়ে থাকতে পারে।

চেঞ্জে যাবার দিন এসে গেল। আগের সন্ধ্যায় কালীনাথ এলেন। পরদিন সকালের দিকে হাজারিবাগের গাড়ি। জ্যোতিরাণী গোছগাছে ব্যস্ত। এটা-সেটা নেবার জন্য এ ঘরেও আসতে হচ্ছে। তাঁর দিকে লক্ষ্য নেই কারো। হঠাৎ কালীদার

একটা কথা কানে আসতে থমকালেন তিনি। ও-ধারের কোণের তাক থেকে কি একটা জিনিস নিতে এসেছিলেন। দাঁড়িয়েই গেলেন।

……মৈত্রেয়ী চন্দ আজকাল ঘন ঘন এ-বাড়িতে আসছে শুনলাম?

একটা জার্নালের পাতা ওল্টাচ্ছিলেন শিবেশ্বর, নিজের লেখা আছে ওতে। জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় শুনলে?

সেদিন এসেছিল, নিজেই বলছিল। জ্যোতির সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেছে নাকি!

ওদিকে মুখ করে বসে দুজনেই। তবু তাঁদের অগোচরে বেরিয়েই এলেন জ্যোতিরাণী। কিন্তু একেবারে সরে যেতে পারলেন না। দরজার এধারে দাঁড়িয়েই গেলেন। মিত্রাদির থেকেও কালীদাকে নিয়ে কৌতূহল বেশি তাঁর।

শিবেশ্বরের নির্লিপ্ত উক্তি কানে এলো।—হ্যাঁ, আসে মাঝে মাঝে।…মহিলা আজকাল কালচারাল ব্যাপার নিয়ে মেতে আছে খুব, হৈ-হৈ করে চাঁদা তোলে, বড় বড় ফাংশান-টাংশানেও দেখি প্রায়ই। তা তোমার কাছে চাঁদা আদায় করতে গেছল, না পুরনো সম্পর্ক ঝালাতে?

কানের কাছটা লাল জ্যোতিরাণীর। এভাবে দাঁড়িয়ে শোনাটা উচিত নয়, তবু যেতে পারছেন না। কালীদার হাসি শোনা গেল। এই মানুষটার হাসির রোগ আছে কিনা জ্যোতিরাণী জানেন না। জবাবও কানে এলো—আমার সব দিক ফাঁকা ও জানে। হাজব্যাণ্ডের সঙ্গে ফয়সলা করার জন্য আপাতত বিলেত যাবার ইচ্ছে, সঙ্গী খুঁজছে শুনলাম।……তোকে কিছু বলেছে নাকি?

আমাকে কি বলবে!

তোরও বাইরে যাবার নেমন্তন্ন এসেছে বলছিলি সেদিন?

সে তো আমেরিকা থেকে।……যাব কিনা ঠিক নেই।

আলাপে ছেদ পড়ল। ঘরে তৃতীয় ব্যক্তির পদার্পণ।…বিভাস দত্ত। কালীদা স-কলরবে অভ্যর্থনা জানালেন।—এসো সাহিত্যিক এসো, তোমাকেই ভাবছিলাম যেন।

বিভাস দত্ত বললেন, হঠাৎ এত ভাগ্য?

ভাগ্যের শিকে কখন কার মাথায় ছেঁড়ে বলা যায়? আমরা কাল হাওয়া হয়ে যাচ্ছি, তুমিও হাওয়া হতে চাও তো গেট রেডি উইথ ইওর ব্যাগ অ্যাণ্ড ব্যাগেজেস। ট্রেন অ্যাট টেন থার্টি এ.এম, জ্যোতি—জ্যোতি—!

এই রকমই কাণ্ড কালীদার। হাঁকডাকে জ্যোতিরাণী এ-ঘরে এসে দাঁড়াতে উৎফুল্ল মুখে তিনি বলে উঠলেন, দু নম্বর শিকার ধরেছি, তুমি বেশ ভালো কয়েক পেয়ালা কফি করে না পাঠালে জমছে না। বিভাস দত্তর দিকে ফিরলেন আবার,

মামুর দু পায়ে দু মণ তেল ঢেলে তবে তাঁকে রাজি করিয়েছি—এবারে তোমাকে ঘায়েল করতে পারলে অধ্যাত্মের সঙ্গে সাহিত্যের মিলন দেখে আমরা হাপুস নয়নে কেঁদে বাঁচি—জ্যোতিরাণী ত্বরা করো ত্বরা করো—কফি পাঠাও!

আলোর ধর্মে আলো হাসায়। বলার ঢং দেখে আর সকলে ছেড়ে শিবেশ্বরও অল্প অল্প হাসতে লাগলেন। কিন্তু ভিতরে ভিতরে জ্যোতিরাণী বিড়ম্বনা বোধ করলেন একটু। তাঁরা হাজারিবাগ যাচ্ছেন সে খবর বিভাস দত্ত কদিন আগেই শুনেছেন। জ্যোতিরাণীই বলেছিলেন। কিন্তু নিজে তিনি কখনো ভদ্রলোককে আমন্ত্রণ জানাননি।

বিভাস দত্ত টিপ্পনী কাটলেন, তোমার সাহিত্যপ্রীতি দেখে ঘাবড়ে যাচ্ছি।

বটে! চোখ পাকিয়ে কালীনাথ শিবেশ্বরকে দেখালেন, আর ও বড় বড় কালচারাল ফাংশান অ্যাটেণ্ড করছে শুনলে হার্টফেল করবে বোধ হয়?

আর একদফা হাসি। জ্যোতিরাণী কফি আনতে যাবেন, কিন্তু কালীদার কাণ্ড-কারখানা দেখে নড়তে পারছেন না। আবার তিনি বিভাস দত্তকেই চড়াও করেছেন, আমার তেল ফুরিয়ে গেছে, নো মোর তেল লেফ্‌ট্—তুমি হাজারিবাগে হাওয়া খাবে, না কলকাতায় ঘরে বসে পস্তাবে সাফসুফ জানিয়ে দাও, আই অ্যাম দি লীডার অফ দি পার্টি—অনেক দায়িত্ব, তুমি রাজি থাকলে এক্ষুণি তার করে ঘর বাড়াতে হবে।

বিভাস দত্ত হালকা জবাব দিলেন, তার করে কাজ নেই, গিয়ে খবর দিও, যে কোনদিন হাজির হতেও পারি।

ও-কে, জ্যোতিরাণী, কফির আর দরকার নেই।

জ্যোতিরাণী হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলেন। যেখানে কালীদা সেখানে হাসির ব্যাপার। তবু কালীদার এত আনন্দ ইদানীং যেন শিগগীর দেখেননি। বিভাস দত্তকে এমন বেপরোয়া আমন্ত্রণ জানিয়ে বসতে পারেন তাও ভাবেননি। কফি বানাতে বসে জ্যোতিরাণী অস্বস্তি বোধ করলেন কেমন।...কালীদার আগ্রহে ফাঁকি ছিল না।...বিভাস দত্ত ফাঁক পেলে হয়ত তাঁকেই বলে বসবেন, আমন্ত্রণটা নিছক কালীদার বলেই তাঁর যাওয়া উচিত হবে কি হবে না, ভাবছেন। ভদ্রলোকের মর্যাদাবোধ টনটনে।

জ্যোতিরাণী সে অবকাশ দেননি।

কিন্তু হাজারিবাগে সত্যিই অপ্রত্যাশিত পদার্পণ ঘটেছে তাঁর। তাঁকে পেয়ে সকলেই খুশি, জ্যোতিরাণীও অখুশি হয়নি।

এই চেঞ্জে ছেলের সত্যিই উপকার হয়েছে। তার ফুর্তি বেড়েছে, খাওয়া বেড়েছে, আর সর্বক্ষণের দোসর হিসেবে ছোটদাদুকে পেয়ে মেজাজও ভালো হয়েছে।

কিন্তু কেউ না বললেও এই একটা মাসে আসল উপকারটা হয়েছে বোধ করি জ্যোতিরাণীরই। কলকাতা ছাড়ার সঙ্গে একটানা ক্লান্তিকর দীর্ঘদিনের অতীতটাকেই যেন ঝেড়ে ফেলে আসতে পেরেছেন তিনি। তাঁর সঙ্গে যাঁরা আছেন সম্পর্কে তাঁরা একজন ভাসুর, আর একজন শ্বশুর। কিন্তু জ্যোতিরাণী মাঝের অতীতটাকে মুছে দিয়ে বাপের বাড়ির সেই অতীতে ফিরে গেছেন। তাঁকে সাহায্য করেছেন কালীদা, গাড়িতেই। তাঁকে বলেছেন, এই একটা মাস তোমার সামনে ভাসুরও নেই শ্বশুরও নেই—সঙ্কোচ করেছ কি পত্রপাঠ রিটার্ন টিকেট।

ভালো কেটেছে। বিভাস দত্ত আসার পরে তো কথাই নেই। হৈ-চৈ খাওয়া দাওয়া বেড়ানো ফুর্তি আরো বেড়েছে। আনন্দের যোগানদার হিসেবে কালীদা সর্বদা প্রস্তুত। কখনো মামুর পিছনে লাগছেন তিনি, কখনো বা বিভাস দত্তকে নিয়ে পড়ছেন। কোনো জটিলতার ছায়া ধারে কাছে ঘেঁষেনি।

...কেবল একদিন ছাড়া।

পাহাড়ের সেই উঁচু পাথরে উঠতে গিয়ে বিড়ম্বনার মধ্যে পড়েছিলেন যেদিন। সাহায্যের জন্য বিভাস দত্তর হাত মজুত ছিল। তুজনের সহজ অবস্থানের পক্ষে পাথরটা ছোট ছিল। কিন্তু নীচে কালীদার প্রগল্‌ভ চিৎকারে আর ছোটদাতুর কাঁধে চেপে ছেলের হাততালির দরুন তখনো কোনো সঙ্কোচ উঁকিঝুঁকি দেয়নি। কিন্তু জ্যোতিরাণীর ভিতরটা হঠাৎ হোঁচট খেয়েছিল মাঝরাতে ঘুম ভেঙে হোটেলের ঠাণ্ডা বারান্দায় সিগারেট মুখে বিভাস দত্তকে পায়চারি করতে দেখে। তখনো গল্পের প্লট ভাবা হচ্ছে ভেবেছিলেন। কিন্তু চাদর গায়ে জড়িয়ে কথা বলতে এসে চুরি ধরা-পড়ার মত মুখ দেখেছিলেন বিভাস দত্তর।

...ইচ্ছে করলেই তারপর জ্যোতিরাণী বিকেলের পাহাড় দেখার ভিতর দিয়ে আরো কিছুদূর পর্যন্ত দেখতে পারতেন।

কিন্তু সে রকম ইচ্ছে জ্যোতিরাণী করেননি। সেই দেখাটা সেখানেই শেষ করেছেন।

কলকাতায় ফেরার পর থেকে ছেলের স্বাস্থ্য আর বিগড়োয়নি। বরং দিনে দিনে পুষ্ট হয়েছে। এক মাস বাদে স্ত্রীটিকে হঠাৎ নতুন চোখে দেখেছেন শিবেশ্বর। তাঁর চোখে-মুখে যেন হালকা তাজা শামলা ছোপ লেগেছে একপ্রস্থ। নিজের ব্যস্ততার মধ্যেও দিনকতক আড়ে আড়ে লক্ষ্য করেছেন, আর রাতের প্রতীক্ষা করেছেন। স্ত্রীটির সহিষ্ণুতা আগের থেকে আরো একটু সহজ হয়েছে তাও লক্ষ্য করেছেন।

শিবেশ্বরের ব্যস্ততা আরো বেড়েছে বটে। তিন রাস্তার ত্রি-কোণ জোড়া অর্ধ-

চন্দ্র আকারের বাস-বাড়ি উঠছে—ব্যস্ততা সেজন্যও নয়। মস্ত কণ্ট্রাকটর লাগিয়েছেন, তাছাড়া ওসব দিক দেখাশুনার দায়িত্ব কালীদার। ব্যস্ত, কারণ ভাগ্যের রাস্তাটা নতুন করে বাঁধানোর শাঁসালো রসদ পেয়েছেন আবার।

তাঁর আমেরিকা যাওয়া স্থির প্রায়। তাগিদ আসছেই। এদিকে মৈত্রেয়ী চন্দও ঘন-ঘন আসছেন। তাঁর আর্জি, লণ্ডন হয়ে আমেরিকা যাবার ব্যবস্থা যদি করেন ভদ্রলোক, তাহলে তাঁরও একটা গতি হয়—তিনি সঙ্গ নিতে পারেন। শিবেশ্বর হাসিমুখে আশ্বাস দিয়েছেন সে সম্ভাবনা আছে, কারণ সেখানকার কর্তা-ব্যক্তিদের আগ্রহও তাঁর প্রতি কম নয়। তারাও আমন্ত্রণ জানিয়েছে। সেই আশাতেই মিত্রাদি ছোটাছুটি করছেন। জ্যোতিরাণীকেই বলেছেন, তুমি আমার হয়ে একটু তদ্বির-তদারক করো তো। পরে গলা খাটো করে ঠাট্টা করেছেন, তোমারও আগ্রহ হওয়া উচিত, জায়গা ভালো নয়, একজন কড়া পাহারাদার দরকার—বুঝলে?

জ্যোতিরাণী হেসে ঘাড় নেড়েছেন। মিত্রাদির মুখে কিছু আটকায় না বলেই বেফাঁস ঠাট্টা এক-একসময় তিনিও করে বসেন।—বুঝলাম তো, কিন্তু পাহারাদারই যদি গোল বাধায়?

মিত্রাদি চোখের ঝাঁপটা মেরেছেন তক্ষুনি, এই মেয়ে, আমি দিদি না?

ছেচল্লিশের জুন মাস সেটা। আবার একটা বিপুল অঙ্কের টাকা ঘরে তুলেছেন শিবেশ্বর চাটুজ্যে।

আমেরিকার দিল্লীর দপ্তর এই মানুষের মধ্যে তাদের খাঁটি বন্ধুর সন্ধান পেয়েছে। কলকাতার সংস্থাও তাঁর প্রতি উদাসীন নয়। এদেশের সঙ্গে অটুট প্রীতির সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে তিনি প্রধান মুখপাত্রদের একজন হয়ে বসেছেন এই এক বছরের মধ্যে। সাংস্কৃতিক বন্ধন পুষ্ট করার জন্য তিনি যে প্ল্যান দিয়েছেন তার মধ্যেও ফলপ্রসূ প্রতিভা দেখেছে তারা। অনেক বড় দপ্তরের মাথা হিসেবেই তারা তাঁকে টানতে চেয়েছিল। কিন্তু শিবেশ্বরের চাকরির মোহ নেই একটুও, হাত পেতে এক পয়সাও নেননি তাদের থেকে। তাদের অন্তরঙ্গ পরামর্শদাতার ভূমিকা তাঁর।

চাকরি করবেন কেন শিবেশ্বর চাটুজ্যে, সামান্য অনুগ্রহ নিয়ে হাতই বা কালো করবেন কেন? টাকা কত সহজে রোজগার করা যায় এমন আর কে জানে? টাকা বাতাসে উড়ছে। কুড়োতে জানলেই হয়। শিবেশ্বর চাটুজ্যে জানেন তা। এই হৃদ্যতার পর তিনি একটি কাজ করেছেন। দেশের অনেকের চোখ তখন মার্কিন টাকার ওপর। খাটাবার মত যোগ্য স্থান পেলে তারাও টাকা নিতে প্রস্তুত।

শিবেশ্বর এক নামজাদা শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিলেন—কয়েক কোটি টাকা না পেলে যাদের চলছিল না। শতকরা দেড় টাকা প্রাপ্তির কড়ারে অতি সহজে টাকার ব্যবস্থা করলেন তিনি। দেশের নামজাদা শিল্প-প্রতিষ্ঠান, তার ওপর তাঁর সুপারিশ—মার্কিন বদান্যতা বর্ষণে বাধা কোথায় ?

সাড়ে চার কোটি টাকা পাইয়ে দিয়ে দেড় টাকা হারে ছয় লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা ঘরে এনেছেন শিবেশ্বর চাটুজ্যে।...অভাবনীয় নয় কিছু। সবে শুরু।

আগস্ট মাসে আমেরিকা যাওয়ার ব্যবস্থা পাকা। লণ্ডন হয়েই যাবেন। ফিরবেনও লণ্ডন হয়েই। মৈত্রেয়ী চন্দর খুশি ধরে না। ফেরেন যদি নিঃসঙ্গ ফিরতে হবে না।

কিন্তু আগস্টের রায়টে গণ্ডগোল হয়ে গেল সব। এমন নৃশংস মারণ-যজ্ঞের জন্য প্রস্তুত ছিল না কেউই। এই তো গত ফেব্রুয়ারীতে আজাদ হিন্দ ফৌজ আর রসিদ আলি দিবসের ব্যাপার নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের জোয়ার দেখেছে সকলে। এক মাইলব্যাপী লক্ষ লোকের প্রোসেশন দেখেছে, কংগ্রেস আর লীগ ফ্ল্যাগের কোলাকুলি দেখেছে। আর তার পরে যখন পুলিসের গুলী চলেছে—হিন্দু আর মুসলমানের মিলিত রোষ দিকে দিকে জ্বলে উঠেছে। এরই মধ্যে এমন জিঘাংসু বিচ্ছেদ কে কল্পনা করতে পারে ?

শিবেশ্বর চাটুজ্যের এত টাকা এত সম্পদ—কিন্তু প্রাণ যে আরো কত বড় সম্পদ কটা দিনের দিশেহারা ত্রাসে শিবেশ্বর শুধু তাই অনুভব করেছেন। চোখের সামনে নির্মম বীভৎস হত্যা ছুলেছে। মাথাই খারাপ হয়েছিল তাঁর। আর সেই সময় জ্যোতিরাণীকে যে কথা বলেছিলেন তিনি—সুস্থ মাথায় ও রকম আঘাত কেউ কাউকে দিতে পারে না। তিনি বলে উঠেছিলেন, তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন ? তোমার ভয়ের কি আছে ? ওরা দরজা ভেঙে ঢোকেই যদি, আমাকে কাটবে, ছেলেকে কাটবে, চাকর ছুটোকে কাটবে—তোমাকে কিচ্ছু বলবে না, তোমাকে খুব আদর করে নিয়ে যাবে ওরা।

জ্যোতিরাণী আর্তনাদ করে উঠতে পারেননি, ভগবানকে ডাকতে পারেননি, বধির হতে পারেননি। পাথরের মত বসে ছিলেন শুধু। শুধু শুনেছিলেন।

...শিবেশ্বর চাটুজ্যের সেই মেজাজ পরেও ঠাণ্ডা হয়নি। বিভাস দত্ত বাঁচিয়েছেন তাঁদের। কিন্তু শিবেশ্বরের স্থির ধারণা তাঁর বাঁচাটা উপলক্ষ মাত্র। একজনকেই বাঁচানোর তাগিদে বিভাস দত্তর ছুটে আসা। সেই একজন তিনি নন। বিভাস দত্তর প্রতি তিনি কৃতজ্ঞ বইকি—চাইলে অনেক টাকা দিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু একই সঙ্গে তাঁর দৃষ্টি আবার ধারালো হয়েছে, ঘোরালো হয়েছে।...টাকার

প্রত্যাশায় কেউ জীবন রক্ষা করেনি।

আর অতবড় সর্বগ্রাসী দুর্যোগের দিনে ঘরের লোকের সেই আঘাত জ্যোতিরাণীও ভুলতে পারেননি। মানুষের অমন কদর্য রূপ আর বুঝি দেখেননি তিনি। মৃত্যুভয় মানুষকে দিশেহারা করে। কিন্তু এমন হিংস্র যে করে, জানতেন না। তাঁর দিক থেকে এরপর সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলার চেষ্টাটাও গেল।

সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি এই নতুন বাড়িতে পদার্পণ। কতখানি শুভ পদার্পণ জানেন না।

অক্টোবরের মাঝামাঝি বাইরে বেরুনো স্থির শিবেশ্বরের।

মৈত্রেয়ী এসেছেন সেদিন সন্ধ্যায়। জ্যোতিরাণীর সঙ্গেই কথা বলছিলেন, অদূরে বসে শিবেশ্বর একটা দরকারী চিঠি লিখছেন। নতুন বাড়িতে মিত্রাদি আর একদিনও এসেছিলেন। সেদিন কালীদা বাড়ী ছিলেন না। এইদিন ছিলেন।

কেউ ডাকেনি তাঁকে, নিজে থেকেই তিনি ঘরে এসে বসলেন। ভিতরে ভিতরে উৎসুক হয়ে উঠলেন জ্যোতিরাণী। দুজনকেই দেখছেন থেকে থেকে। কৌতুক বোধ করছেন, মিত্রাদির মুখে কি যে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করছেন, তিনিই জানেন।

দুই-এক কথার পর কালীদা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমারও যাওয়া স্থির নাকি?

স্থির মানে! মিত্রাদি উৎফুল্ল জবাব দিলেন, আমি তো রওনা হয়ে গেছি বলতে গেলে।

ভালো।...মেয়েকে রেখে যাচ্ছ?

হঠাৎ আকাশ থেকেই পড়লেন জ্যোতিরাণী। ওদিকে শিবেশ্বরও ঘুরে বসেছেন। তাঁরও গাম্ভীর্যের ফাটলে আচমকা বিস্ময়। আর এই দুজনের মুখের অবস্থা দেখেই যেন মৈত্রেয়ী চন্দরও বিড়ম্বনার একশেষ।

জবাব দিলেন, হ্যা।...একাই যেতে পারি না, আবার মেয়েকে নেব!

শিবেশ্বর বলে উঠলেন, কার মেয়ে—আপনার? কি আশ্চর্য, মেয়ের খবর তো জানতুম না!

নির্লিপ্ত মুখে কালীদা বললেন, কেন...ওর মেয়ে তো সিতুর থেকেও বছরটাক বড় হবে।

মৈত্রেয়ী চন্দ হাসিমুখে শিবেশ্বরের দিকে ফিরলেন, আপনার বন্ধু দয়া করে একটু খবর-টবর রাখে বলতে হবে।

শিবেশ্বরের সঙ্গে দুই-একটা বৈষয়িক কথা বলে কালীনাথ উঠে গেলেন।

জ্যোতিরাণীকে তখনো অবাক দেখে রাঙা মুখ করে মৈত্রেয়ী চন্দ বলে উঠলেন, হাঁ করে গেলে কেন—তোমাদের দিব্বি ছেলে থাকতে পারে, আর আমার মেয়ে থাকতে পারে না ?

জ্যোতিরাণী লজ্জা পেলেন।

নির্দিষ্ট দিনেই শিবেশ্বর আর মৈত্রেয়ী চন্দ রওনা হয়ে গেলেন। কালীনাথ প্লেনে তুলে দিয়ে এলেন। রাত মন্দ নয় তখন।

তাঁর ঘরে উঁকি দিয়ে জ্যোতিরাণী দেখেন, নিবিষ্ট গাম্ভীর্যে কালো বাঁধানো নোট বইয়ে কালীদা লিখছেন কি। শিবেশ্বরের মুখে ওই নোট-বইয়ের গল্প তিনিও শুনেছেন।···আজই কালীদা অত মনোযোগ দিয়ে লেখার মত কি পেলেন জ্যোতি-রাণী জানেন না। কৌতূহল নিজের কাছেই লজ্জার কারণ।

শিবেশ্বর ফিরলেন প্রায় মাস তিনেক বাদে। ফিরলেন মৈত্রেয়ী চন্দও। বিলেত ঘুরে এসে মিত্রাদির চেহারার চটক আর একটু বেড়েছে। হাসি-খুশিও। ফাঁক পেয়েই জ্যোতিরাণী তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হল, ফিরেই এলে যে ?

ফিরব না তো কি, আমি কি থাকতে গেছলাম ?

পরে বেশ হাসিমুখেই সমাচার জানিয়েছেন। মিত্রাদি যা আশা করেছিলেন তাই হয়েছে। ব্যারিস্টার সাহেব সেখানে দিব্বি সংসার পেতে বসেছে। মিত্রাদির সেজন্যে একটুও খেদ নেই—তিনি সংসার ভাঙতেও যাননি। ফয়সালা করতে গেছলেন, ফয়সালা করে এসেছেন। সঙ্কট দেখে হার্টফেল করার অবস্থা নাকি ব্যারিস্টার সাহেবের। এক কথায় রফা করেছেন। যে টাকা নিয়ে এসেছেন মিত্রাদি, তাতে মেয়ের আর তাঁর জীবন একরকম কেটে যাবে মনে হয়।···হ্যাঁ, শ্বেতাঙ্গিনী বউয়ের কোপ থেকে ভদ্রলোককে বাঁচিয়ে দিয়েই এসেছেন মিত্রাদি। ও ব্যাপারে তাঁর একটুও আক্রোশ নেই।

······এমনও হয়! জ্যোতিরাণী তাজ্জব।

দাঙ্গার সময় সেই যে নতুন ফাটল ধরেছিল দুজনের মধ্যে। শিবেশ্বর বিদেশ থেকে ফেরার পরেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। উল্টে আরো দাম্ভিক আরো অসহিষ্ণু আরো হৃদয়শূন্য মনে হয়েছে। নীরব ঔদ্ধত্যের গণ্ডীটা দিনে দিনে পুষ্ট হয়েছে। ঐশ্বর্য রচনার তন্ময়তায় ছেদ পড়ে মাঝে মাঝে। কি জন্যে পড়ে, জ্যোতিরাণী এখন আর সঠিক ঠাওর করে উঠতে পারেন না। চেষ্টাও করেন না।···এ ঘরের দরজা ঠেলে ঘরে আসেন তখন। জ্যোতিরাণী ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করেন না। করলে ক্ষিপ্ত আক্রোশে বন্ধ দরজায় যেভাবে ঘা পড়বে—বাড়ি সুদ্ধ মানুষ জেগে উঠবে। জ্যোতিরাণী তাও দেখেছেন।

······ফিরে যখন যান, ব্যবধান আরো বাড়ে।

তারপর এই দিন। সাতচল্লিশের পনেরই আগস্টের এই দিন, এই রাত্রি। দেশের এত বড় মুক্তির সঙ্গে নিজের মুক্তি এক করে ফেলেছিলেন জ্যোতিরাণী। গত সন্ধ্যা থেকে নিবেদন করে দেবার মত করেই প্রস্তুত করেছিলেন নিজেকে। সেই প্রস্তুতি ভেঙে গুঁড়িয়েছে। মুক্তি দূরে সরে গেছে।

আজ ঘরের দরজা বন্ধ করেছেন তিনি। কেন করেছেন শুধু তিনিই জানেন। ···সকাল থেকে আজ তাঁকে ছেলে দেখেছে, মেঘনা দেখেছে, কালীদা দেখেছেন, মামাশ্বশুর দেখেছেন···আর দেখেছে আর একজনও। সকলের দেখা মুছে গিয়ে শেষের দেখাটা গায়ে লেগে আছে। কিন্তু আজ জ্যোতিরাণী সত্যিই দরজা বন্ধ করেছেন!

ছেলের বিদ্বেষভরা চাউনিটা এখনো আঘাতের মত এসে লাগছে এক-একবার ···বাপ শাসন করেছে ছেলেকে···মেয়েটার চিবুক কেটে দুখানা করেছে বলে নয়··· গত রাতে বিভাস দত্ত থাকতে ঘরের আলো নিভিয়েছিল বলে···মায়ের তাড়সে জ্বর···বেড়ে গেল কিনা সে কথাও মনে হয়েছে। তন্দ্রার ঘোরে হিজিবিজি কি সব আবার আনাগোনা করে যাচ্ছে জ্যোতিরাণীর মাথার মধ্যে।···মানিকরাম··· প্রভুজী···সিতু···একগাছি পাকা চুল···শাশুড়ীর গায়ে কাঁটা দেওয়া মূর্তি··· শাশুড়ীর কথা···মামাশ্বশুরের কথা···কালীদার কথা···মানিকরাম···প্রভুজী··· আদিত্যরাম···হৈমবতী···শ্বশুর···শাশুড়ী···শিবেশ্বর···সিতু···

ধড়মড় করে শয্যায় উঠে বসলেন জ্যোতিরাণী। এক ঝটকায় সামনের চুলের গোছা সরিয়ে অন্ধকার ফুঁড়ে দরজার দিকে তাকালেন।

দরজায় অল্প অল্প শব্দ হচ্ছে। দরজা ঠেলছে কেউ।

স্রস্ত বেশ ঠিক করে নেবার ধৈর্য নেই। উঠে দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। বন্ধ দরজায় মৃদু ঘা পড়ছে।

লোকজন ডেকে দরজা ভাঙতে চেষ্টা করে দেখতে পারো! কথা কটা বলে দাঁতে করে নিজের ঠোঁট কামড়ে রইলেন জ্যোতিরাণী।

বন্ধ দরজায় আর ঘা পড়ল না। আর ঠেলল না কেউ।

জ্যোতিরাণী শয্যায় এসে বসলেন। অন্ধকারে দরজার দিকেই চেয়ে আছেন। দু চোখ ধক-ধক জ্বলছে।

দ্বিতীয় পর্ব

॥ আঠারো ॥

ষোলই আগস্ট।

দেশের মুক্তির একদিন বয়স। জ্যোতিরাণীর মুক্তির ওপর নতুন করে শেকল পড়ল একটা। সকালের এই প্রথম অনুভূতিটা জ্যোতিরাণী অস্বীকার করতে চাইলেন। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন। চৌদ্দই আগস্টের বিকেল থেকে পনেরই আগস্টের রাত পর্যন্ত একটানা এক স্বপ্নের ঘোরে কেটেছিল। সেটা ভেঙেছে। এর বেশি কিছু হয়নি, নতুন কিছু ঘটেনি।

রাতে ঘুমিয়েছিলেন কিনা সঠিক ঠাওর করতে পারলেন না। শরীর অবশ, মাথাটা ভার-ভার লাগছে। ঘড়ির দিকে চোখ গেল।···ঘুমিয়েই ছিলেন বোধ হয়, ঘড়ির কাঁটায় সাতটা বাজে। উঠলেন। সামনের টেবিলের ওপর বাবার সেই উপাসনা-লেখা গানের খাতাটা। রেডিও থেকেও স্তোত্রের মতই কি যেন কানে আসছে। জ্যোতিরাণী কান পাতলেন একটু। ভুরু কোঁচকালেন। বেখাপ্পা, বেসুরো লাগছে। আলমারি খুলে খাতাটা ভিতরে রেখে দিলেন। সকালের প্রথম কাজ।

তারপর দরজা খুললেন।···রাতে দরজা বন্ধ করেছিলেন সেটা স্বপ্ন নয়। আর, রাতে এই বন্ধ দরজায় ধাক্কা পড়েছিল সেটাও নয় বোধ হয়। কিন্তু জ্যোতিরাণী সাত-সকালে এসব চিন্তা নিয়ে বসতে চান না। সকালে উঠে লোক যেমন ঘর-দোরের আবর্জনা পরিষ্কার করে, ঠিক তেমনি করে বাসি চিন্তার ছায়াগুলো মাথা থেকে সরাতে চান তিনি। ছেলেটাকে একবার দেখে আসবেন ভাবলেন। বেতের ঘায়ে জ্বর—রাতে আরো বেড়েছিল কিনা কে জানে।

মেঘনা সামনের বারান্দা ঝাঁট দিচ্ছে। তাঁকে দেখেই ঝাঁটা-হাতে সামনে এসে দাঁড়াল। হাবভাব সচকিত কেমন। জিজ্ঞাসা করল, বাবু নীচে গেছেন, এই ফাঁকে চট্ করে তেনার ঘরটা ঝাঁট দিয়ে আসব?

বিরক্তির ছায়া পড়ল জ্যোতিরাণীর মুখে।—জিজ্ঞেস করার কি আছে?

কি জানি বাপু, সকালে উঠেই যে দাবড়ানি খেল সদাদাদা, ভয় করছে।

জ্যোতিরাণীর দু চোখ মেঘনার মুখের ওপর থমকালো এবার।—কেন?

কি করে জানব বলো, শুধোলে বলে নাকি কিছু, সে-বেলায় তোমাদের আদরের লোকের তো মুখে শেলাই।

জ্যোতিরাণী ঘরেই ফিরলেন আবার। মাথাটা বড় বেশি ভার-ভার লাগছে।

একেবারে স্নানের জন্য প্রস্তুত হয়ে বাথরুমে ঢুকলেন।

…কালও তাই করেছিলেন। কালকের কথা থাক, কাল স্বপ্ন দেখেছিলেন।

স্নান সেরে উঠতে বরাবরই সময় লাগে। দু চোখ জ্বালা-জ্বালা না করা পর্যন্ত স্নান চলে। আজও তার ব্যতিক্রম হল না। স্নানের পর মাথা আঁচড়ে নিলেন। ছোটখাটো সিঁদুরের টিপ একটা পরতে হয়। অভ্যাসে পরেন। তাছাড়া চোখে কম দেখলেও, এসব খুঁটিনাটির গাফিলতি শাশুড়ীর চোখ এড়ায় না।…কালই শুধু এই টিপটা বড় করে পরেছিলেন…সকলের চোখে পড়েছিল।…আর, সেই সিঁদুরের আভা ক্রমে তাঁর ভিতরে ছড়াচ্ছিল। আয়নায় নিজের মুখের ওপর বিরক্তির ঘন ছায়া দেখলেন জ্যোতিরাণী।

স্বপ্ন দেখেছিলেন কাল। যে-স্বপ্ন রিক্ত করে বার বার সেটা মনে আসে কেন?

ঘরের বাইরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে গতি শিথিল হল। মুহূর্তের তাগিদে নির্লিপ্ত আবরণের মধ্যে টেনে নিয়ে আসতে পারেন নিজেকে। সেই তাগিদই বোধ করলেন। পাশের ঘরের মানুষ ঘোরালো বারান্দার রেলিং-এ ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে। এক পলকে যেটুকু দেখে নিতে পেরেছেন জ্যোতিরাণী, তাই যথেষ্ট। আর তাকালেন না।

সামনের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিলেন শিবেশ্বর। ঘর থেকে কেউ বেরুলো টের পেয়েই ফিরে তাকালেন। থমথমে মুখ। ফর্সা মুখে লালচে আভাস।

জ্যোতিরাণী পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেছেন ততক্ষণে। একজোড়া ক্রূর চোখ তাঁর পিঠের ওপর আটকে আছে জানেন। যাঁর চোখ, তিনি কত লক্ষ টাকার মালিক এখন জ্যোতিরাণীর সঠিক ধারণা নেই। সেই কৃতী মানুষের অপমান হয়েছে। …কালকের দিনের সবটাই স্বপ্ন নয়। রাতে তিনি ঘরের দরজা বন্ধ করেছিলেন সেটা সত্যি। আর, আরো রাতে সেই বন্ধ দরজায় ঘা পড়েছিল তা-ও সত্যি।

ছেলে বিছানায় বসে আছে। মুখখানা ফ্যাকাশে। ঠাকুমা তার গায়ে-পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন, আর অত দুষ্টুমি করা যে ভালো নয়, সেটা তার মগজে ঢোকাতে চেষ্টা করছেন। অদূরে চেয়ারে বসে কালীদা কাগজ পড়ছেন। দূর থেকেই জ্যোতিরাণীর সন্ধানী দৃষ্টি ছেলের মুখখানা চড়াও করল। কাছে আসতে সিতুই প্রথম দেখল তাঁকে।…না, কালকের সেই চাউনি দেখলেন না জ্যোতিরাণী। ছেলেমানুষ, গত রাতে ঘুমের ঘোরে, জ্বরের ঘোরে আর ব্যথার ঘোরে যেভাবে তাকিয়েছিল—নিজের মানসিক বিপর্যয়ের ফলেই সে চাউনি দেখে জ্যোতিরাণী অমন ধাক্কা খেয়েছিলেন বোধ হয়। মোট কথা কালকের অবাঞ্ছিত স্মৃতিটা এই দিনের আলোয় আদৌ আমল দিতে চাইলেন না তিনি।

কালীদা কাগজ থেকে মুখ তুললেন। শাশুড়ীর মুখ অপ্রসন্ন হয়ে উঠল। কারো দিকে দৃকপাত না করে জ্যোতিরাণী এক হাতে ছেলের ঘাড়ের কাছটা ধরে অন্য হাতে তার কপাল পরীক্ষা করলেন। জ্বর নেই মনে হল।

শাশুড়ী চাপা রাগে গজগজ করে উঠলেন, দেখে আর কি হবে, আধমরা তো হয়েইছে।

অর্থাৎ এখন দরদ দেখাতে আসাটা তাঁর চক্ষুশূল। নির্লিপ্ত মুখে জ্যোতিরাণী ফিরলেন তাঁর দিকে। জবাব দিলেন, এ-রকম হওয়া ওর একটু দরকার ছিল।

ক্রোধে বৃদ্ধা শাশুড়ীর চেহারা বদলে গেল। খাট থেকে নেমে দাঁড়ালেন তিনি। —দরকার যা খুব ভালো করে করো তাহলে, আমার বাধা দিয়ে কাজ কি! কালীনাথের দিকে ফিরলেন, তুই আমাকে কাশী-টাশী কোথাও রেখে আসবি কিনা শুনি?

রেডি হয়ে নাও, কালীনাথ রসকসের ধার ধারেন না যেন, আজ তোমাকে বিদায় করেই ছাড়ব।

রাগের মাথায় আপাতত ঘর থেকে বিদায় হলেন শাশুড়ী। ছেলের চোখে আবার সেই রাতের ক্রোধ আর বিতৃষ্ণা উঁকিঝুঁকি দিতে দেখলেন যেন জ্যোতিরাণী। থমকালেন এক মুহূর্ত। তারপরেই চাপা গলায় ধমকে উঠলেন, চোখ পাকিয়ে দেখছিস কি, গিলবি নাকি তুই আমাকে?

সিতু অন্যদিকে মুখ ফেরালো। কাগজ রেখে কালীদা উঠে এলেন। হাতে জলের গেলাস আর একটা ওষুধের বড়ি। তেমনি গম্ভীর ধমকের স্বরেই সিতুকে বললেন, ট্যাবলেট গেলো।

অন্যদিন হলে জ্যোতিরাণী হেসে ফেলতেন। কিন্তু ভিতরটা সকাল থেকেই তেতো হয়ে আছে। কালীদার দিকে ফিরলেন তিনি। ইচ্ছে করলে ছেলের ব্যাপারে বাড়িতে শুধু এই একজনই তাঁকে নিশ্চিন্ত করতে পারেন। মুখের কথায় নিশ্চিন্ত করেছেনও অনেকদিন। কিন্তু চাড় যে নেই একটুও সেটা জ্যোতিরাণী ভালই বুঝে নিয়েছেন। সকালে একজন মাস্টার আসে, ঘণ্টা দুই পড়াবার কথা। কি পড়ায় জ্যোতিরাণী জানেন না। মাস্টার আসার এক ঘণ্টার মধ্যে ছেলের স্কুলের সময় হয়ে যায়। তাও সপ্তাহে ছদিনের জায়গায় বড়জোর চারদিন আসে মাস্টার। বড়লোকের বাড়ির মাস্টারি এটা বুঝে নিয়েছে। রাতে কালীদার নিয়ে বসার কথা। রোজ ছেড়ে যেদিন বসেন, সেদিনটাকে বরং ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে।

ওর সকালের টিউটরকে বলে দেবেন সপ্তাহে ছদিন যদি ঘড়িধরে দু ঘণ্টা করে পড়াতে না পারেন, তাহলে আমাদের অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।

কালীনাথ শুনলেন শুধু, কোনো মন্তব্য করলেন না। সিতুর মুখ বিরস। একে মনমেজাজ একটুও ভালো না, তার ওপর এই অপ্রিয় প্রসঙ্গ। ছুটি না থাকলে এই শরীর নিয়েই সে স্কুলে যাবার বায়না ধরত। বাড়ির থেকে স্কুল অনেক ভালো। তবে মারের দাগ-টাগগুলো নিয়ে একটু বিপদে পড়তে হত এই যা।

একটু থেমে জ্যোতিরাণী আবার বললেন, আর রাতে পড়াবার জন্যেও ভালো দেখে একজন টিউটর ঠিক করুন, এভাবে চলতে পারে না।

এবারে মুখ খুললেন কালীনাথ। বললেন, আচ্ছা। গম্ভীর।—সকালে উঠে তোমার চা-টা খাওয়া হয়েছে ?

উদ্গত রাগ চেপে জ্যোতিরাণী চলে এলেন। বাড়ির মালিককেই কালীদা কেয়ার করেন না, তাঁকে পরোয়া করবেন সেটা ভাবেন না। কিন্তু তাঁর সঙ্গে সম্পর্কটা বাড়ির মালিকের মত নয়, তাই একটুখানি দরদ অন্তত আশা করেন। করেন বলেই ঘা খান। আর আশা করবেন না।

চুপচাপ বসে পর পর দু পেয়ালা চা খেলেন। খাবার পড়ে থাকল। চা আজ নিজে করেননি, সদা করেছে। খাবারও সে-ই সাজিয়ে দিয়েছে। সদার মুখখানা দুই-একবার লক্ষ্য করলেন জ্যোতিরাণী। সকালে উঠেই মালিকের বিরাগভাজন হয়েছে সেটা বোঝা গেল না। সদার থেকে বরং মেঘনার মুখ বেশি গম্ভীর এখন। বাড়ির বাতাস তেমন সুবিধের নয়, সেটা সে-ই যেন বেশি অনুভব করছে। খাবার পড়ে থাকতে দেখলে অন্যদিন দু'কথা বলে, আজ আর সাহস করে মুখ খুলল না।

কর্তার তলব পেয়ে সদা চলে গেল। চায়ের পেয়ালা খালি করে জ্যোতিরাণী চুপচাপ বসে রইলেন খানিক। অন্যদিনে এ-সময়ে শাশুড়ীর ঘরে হাজিরা দিয়ে থাকেন একবার। এটা-সেটা এগিয়ে দেন, নয়তো খানিক দাঁড়িয়ে থেকে চলে আসেন। চায়ের টেবিল থেকে উঠে এসে জ্যোতিরাণী ও-ঘরে যাবেন-যাবেন করেও গেলেন না। তিক্ততা বাড়বে শুধু। বাতাসে কথা ছুঁড়বেন তিনি। এই মেজাজে জ্যোতিরাণীও চুপ করে থাকতে পারবেন কিনা সন্দেহ। থাক—।

নিজের ঘরের দিকে ফিরলেন। একরাশ কাগজপত্র নিয়ে সদা মনিবের ঘরের দিকে যাচ্ছে। শিবেশ্বর বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে তখনো। পাশ কাটিয়ে নিজের ঘরে ঢুকলেন জ্যোতিরাণী। রাতের অপমানে মানুষটা জ্বলছে এখনো। জ্বলুক। জ্যোতিরাণীর এটুকুই যা সান্ত্বনা। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল কি। চৌকাঠের বাইরে এসে দাঁড়ালেন আবার। সদা ফিরে যাচ্ছে।

সদা!

শুধু সদা নয়, সদার মনিবের দৃষ্টিও ঘুরল।

ড্রাইভারকে গাড়ি বার করতে বলো, আমি এক্ষুনি বেরুব।

চা খেতে খেতে ভেবেছিলেন বিভাস দত্তর বাড়িতে টেলিফোন করে মেয়েটার খবর নেবেন। এক্ষুনি মনে হল মেয়েটা যে আঘাত পেয়েছে, নিজে না গেলে কর্তব্যে ত্রুটি হবে। যাবেন।

পরা-শাড়িটা দেখলেন একবার। সাদা জমিনের ধোপের শাড়িই, সাজসজ্জার দরকার নেই, এতেই হবে। ঠিকঠাক করে নিলেন একটু, মাথায় আর একবার চিরুনি বুলিয়ে নেবার জন্য আয়নার সামনে দাঁড়ালেন। কিন্তু চিরুনি মাথা পর্যন্ত উঠল না। আয়নায় যাঁর ছায়া পড়ল তাঁকে ঘরে আশা করেননি, যাবার সময় আবার বারান্দায় দেখবেন ভেবেছিলেন।

ঘরে ঢুকে হাত-কয়েক পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন শিবেশ্বর। চিরুনির কাজ শেষ করে জ্যোতিরাণী ফিরলেন। চোখে চোখ রাখলেন।

কোথায় যাচ্ছ?

যাচ্ছেন কোথায়, সদাকে গাড়ি বার করার হুকুম দেবার সময়েই শোনাবার ইচ্ছে ছিল জ্যোতিরাণীর। কিন্তু সুযোগ ছিল না। বললেন, বিভাসবাবুর বাড়ি।

ফিরতে দেরি হবে?

বলতে পারি না। কেন?

মৈত্রেয়ী টেলিফোন করেছিল, রাতের কি ফাংশানে নেমন্তন্ন করার জন্য কয়েকজন ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলাকে সঙ্গে নিয়ে আসছে।

কাকে নেমন্তন্ন করার জন্য?

বিশেষ করে তোমাকেই। আমি আসতে বলেছি।

কি আর করা যাবে, এখন অপেক্ষা করতে পারছি না। টেলিফোন তোমাকে না করে আমাকে করলে সুবিধে-অসুবিধের কথা বলে দেওয়া যেত।

তাঁর মুখের ওপর থেকে শিবেশ্বরের দু চোখ নড়ল না একবারও।—তোমার সুবিধে অসুবিধেটা আমারও জানার কথা ভেবেছে বোধ হয়।

ড্রেসিং টেবিলের ওপর থেকে ভ্যানিটি ব্যাগটা তুলে নিলেন জ্যোতিরাণী। অসহিষ্ণু ক্ষোভের এই রূপটা নতুন লাগছে। বেরুবার আগে নির্লিপ্ত দৃষ্টি তাঁর মুখের ওপর আর একবার বুলিয়ে নিয়ে জবাব দিলেন, সেটা যে ঠিক নয় এলে জানিয়ে দিও।...আর রাতেও আনন্দ করতে যাবার মত সময় করে উঠতে পারব না, বলে দিও।

গাড়ি বিভাস দত্তর বাড়ির উদ্দেশে ছুটেছে। কিন্তু জ্যোতিরাণী কোথায় যাচ্ছেন বা কেন যাচ্ছেন সে-চিন্তা মাথায় নেই আপাতত। গত একটা দিনের স্বপ্ন যে ভেঙেছে, সেটা একেবারে অসহ্য লাগছে না এখন। জ্যোতিরাণীর ঠোঁটের ফাঁকে ধারালো হাসির আভাস একটু।

বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে হিন্দুস্থানী ড্রাইভার দরজা খুলে দিতে সচকিত হয়ে নামলেন তিনি। গাড়ি থামার শব্দে ওপর থেকে একজন মাঝবয়সী মহিলা গলা বাড়ালেন। জ্যোতিরাণীর যতদূর মনে পড়ে বিভাসবাবুর বউদি হবেন।

শশব্যস্তে নেমে এলেন মহিলাটি। সঙ্গে সঙ্গে আরো কয়েকজনকে উঁকিঝুঁকি দিতে দেখা গেল। বিশেষ কারো পদার্পণ ঘটলে যেমন ভাবভঙ্গী হয়, তেমনি। মহিলা যুক্তকরে নমস্কার জানিয়ে বললেন, আসুন, ঠাকুরপো তো একটু আগে বেরুলো···এক্ষুনি ফিরবে বোধ হয়।

জ্যোতিরাণী বললেন, আমি শমীকে দেখতে এলাম একবার, কেমন আছে ?

ভালো। ব্যস্তমুখে মহিলা ওপরে নিয়ে চললেন তাঁকে।

দিনের বেলাতেও আব্ছা অন্ধকার সিঁড়ি। বিভাস দত্ত তিনতলায় থাকেন জানেন। গেল বারে রায়টের সেই কদিন ওই তিনতলার ঘর দুখানাই তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। বাড়ির আবহাওয়া সেবারেও কেমন চাপ-চাপ মনে হয়েছিল। ওপরে উঠতে উঠতে এবারেও সেইরকম লাগল। একটানা তিনতলায় উঠতে জ্যোতিরাণীর হাঁপ ধরে গেছে একটু। তার মধ্যে কথাও বলছেন।—আমার ছেলের কাণ্ড, ভয়ানক দুষ্টু···কি যে করি। খুব লেগেছে মেয়েটার, জ্বর-টর হয়নি তো ?

না না, মহিলা তাঁকেই তোয়াজ করার জন্যে ব্যস্ত, ওরকম একটু-আধটু লাগলে কি হয়, তার জন্য আপনি ছুটে এসেছেন একেবারে···।

তিনতলায় ওঠা সত্ত্বেও ঠিক এই ব্যবস্থা আশা করেননি জ্যোতিরাণী। বিভাস দত্তর ঘরের এককোণে আর একটা ছোট চৌকি পাতা হয়েছে। বাপ-মা ছাড়া সাত বছরের মেয়েটার ওটাই আশ্রয় বোঝা গেল। অথচ এ-বাড়িতে ওর মায়ের বয়সী মেয়েছেলের অভাব নেই জানেন।

তাঁকে দেখামাত্র শমী বোসের বিষণ্ণ মুখে হাসি ফুটল। আনন্দে উঠে বসতেই চেষ্টা করল সে। জ্যোতিরাণী এগিয়ে এসে বাধা দিলেন।

শুয়ে থাকো, উঠতে হবে না, আমি দেখতে এলাম তোমাকে। ধরে শুইয়ে দিতে গিয়ে গায়ের তাপ পরীক্ষা করলেন। জ্বর একটু আছে মনে হল, চোখ-মুখও ফোলাফোলা, চিবুকের প্লাস্টারের নীচে খানিকটা রক্ত জমে আছে। তক্ষুনি ডাক্তারের কথা মনে হল তাঁর, কিন্তু সামনের মহিলাকে কিছু জিজ্ঞাসা করা-না-

করা বৃথা।

মহিলা আপ্যায়ন করলেন, বসুন, আমি চা করে আনি—

না। গলায় একটু জোর দিয়েই তাঁর অভ্যর্থনার অভিলাষ বাতিল করলেন জ্যোতিরাণী।—এ-সময় আমি চা বা অন্যকিছু খাই না, অসময়ে এসে আপনাদের কাজকর্মের ব্যাঘাত ঘটালাম বোধ হয়, আপনি যান, আমি ওর সঙ্গে বসে একটু গল্প করি।

অগত্যা চলেই গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটাও যেন স্বস্তি বোধ করল। হাসি-মুখে আবার উঠে বসল তৎক্ষণাৎ।

ও কি ?

স্টিচ্-করা বিবর্ণমুখে দুষ্টু-দুষ্টু হাসি।—আমি কি শুয়েছিলাম নাকি এতক্ষণ, ঘুরছিলাম তো, সিঁড়িতে শব্দ শুনে শুয়ে পড়েছি।

জ্যোতিরাণী হেসে ফেললেন।—ও তুমিও কম নও তাহলে ?

শমী কৈফিয়ৎ দিলে, এত একা থাকতে কারো ভালো লাগে! কাকু না থাকলেই একা—রোজ ওই রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখতে দেখতে তো চোখে ব্যথা ধরে যায়।

একা থাকো কেন, নীচে তো অনেক লোক আছে।

ঠোঁট উল্টে শমী জবাব দিলে, এক কাকু ছাড়া এখানে আর কেউ আমাকে ভালই বাসে না। কি এক স্মৃতিতে চোখের তারা উজ্জ্বল দেখালো একটু, জানো, বাড়িতে দাদারা দিনরাত আমার পিছনে লেগে থাকত, আমি রেগে গিয়ে এক-এক সময় যাচ্ছেতাই বলতুম...তবু আমাকে তারা কত ভালবাসত!

সাত বছরের মেয়েটার বুকের তলার চাপা হাহাকার অনুভব করামাত্র জ্যোতি-রাণী ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তার পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, এখানেও সকলে তোমাকে ভালোবাসবে—এই দেখো না, সকালেই তোমাকে দেখতে চলে এলাম আমি।

ফোলা-ফোলা আদুরে-আদুরে মুখে খুশির ছোঁয়া লাগল। এটুকুরই বড় অভাব এখানে। কি মনে হতে দু চোখ উৎসুক।—তোমার সেই চকচকে গাড়িতে চেপে এলে বুঝি ?

জ্যোতিরাণী মাথা নাড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে শমী উঠে বারান্দায় গিয়ে গাড়িটা দেখে এলো। তারপর তাঁর গা ঘেঁষে বসে জিজ্ঞাসা করল, তোমরা খু-উ-ব বড়লোক, না ?

গতকালও মেয়েটাকে ভারি ভালো লেগেছিল জ্যোতিরাণীর, আজও লাগল।

এই কচি শিশুর অদৃষ্টের বঞ্চনার কথা মনে হলে দম বন্ধ হতে চায়। আবার কথা শুনলে হাসিও পায়। ঠোঁট উল্টে মাথা নাড়লেন তিনি, অর্থাৎ একটুও বড়লোক না। তারপর বললেন, তুমি ভালো হয়ে নাও, ওই গাড়িতে করে তোমাকে নিয়ে কত জায়গায় বেড়াতে যাই দেখো।

এর থেকে বেশি আনন্দের প্রস্তাব আর হয় না যেন। কিন্তু কচিমুখে বিরস ছায়া পড়ল পরক্ষণে। আনন্দ গিয়ে অভিমান স্পষ্ট হতে লাগল। বলল, কি করে নিয়ে যাবে, আমি তো আর কক্ষনো তোমাদের বাড়ি যাব না, তোমার ছেলে একটুও ভালো না, একটুও না—জানো এখনো আমার কত ব্যথা করছে?

এখানে এসে জ্যোতিরাণী অনেকক্ষণের একটা তাপ ভুলেছিলেন যেন। সেটা ফিরে আসছে আবার। ব্যথা কতখানি পেয়েছে এখনো মুখের দিকে তাকালেই অনুভব করতে পারেন। এই মেয়ে বলেই ভুলে আছে। চুপচাপ তার মাথায় আর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন তিনি।

অভিযোগ একটা নয়, আরো কিছু মনে পড়েছে শমীর। জোর দিয়ে পুনরুক্তি করল, তোমার ছেলে একটুও ভালো না, শুধু ব্যথা দিয়েছে নাকি—তার আগে গাল ধরে টেনেছে, গা খিমচেছে, তারপর বলেছে, তোর নাম শমী বোস না, তোর নাম শমী ঘোষ!

পিঠের ওপর হাত থেমে গেছে জ্যোতিরাণীর। পুরো দশ হয়নি এখনো ছেলের বয়েস, বিসদৃশ কিছু যে মনে হল তা নয়। তবু অস্বস্তি বোধ করলেন কেমন। শেষেরটুকু শুনে হাসিও পেল। গম্ভীর মুখেই বললেন, খুব অন্যায় করেছে, ভয়ানক দুষ্টু ও।

মন্তব্য শুনে শমীর ক্ষোভ কমল হয়ত একটু। পরমুহূর্তে হেসে উঠল সে।—আমিও বলেছি, তোমার নাম সাত্যকি চ্যাটার্জি না, তোমার নাম সাত্যকি শিম্পাঞ্জী।

হেসেই ফেললেন জ্যোতিরাণী, পুঞ্জীভূত তাপ কমছে আবার। সায় দিলেন, একেবারে খাঁটি কথা বলা হয়েছে।

দু-দুবার এ-রকম সায় পেয়ে শমীর মেজাজ অনেকটাই নরম। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, তোমার ওই দুষ্টু ছেলেকে তুমি ভালবাসো?

তুমি কি বলো, ভালবাসব না?

তারই ওপর বিবেচনার ভার পড়তে শমী দোটানায় পড়ল। একটু ভেবে জবাব দিল, নিজের ছেলেকে একটুও ভাল না বেসে পারবে কি করে... আমার বাবা তো আমাকে কত ভালবাসত। কিন্তু তোমার ছেলে একটুও তোমার মত না।

আমি কেমন?

শমী কোলের কাছে মাথা এনে দু হাতে তাঁকে জড়িয়ে ধরল। লজ্জা করছে কিন্তু খুশিটা প্রকাশ না করেও পারছে না। বলল, তুমি খু-উ-ব ভালো।

মেয়েটা যেন একটু একটু করে বুকের ভিতরে এসে বসছে জ্যোতিরাণীর। স্নেহের ঠিক এই স্বাদ নিজের ছেলেকে দিয়েও আর কখনো অনুভব করেছেন কিনা জানেন না। নতুন টানে জড়িয়ে পড়ছেন, কিন্তু ভালো লাগছে। বললেন, আমাদের বাড়ি না গিয়ে তুমি পারবে কি করে, না গেলে তো আমার সঙ্গে দেখাই হবে না।

কেন, তুমি আর আসবে না?

উঁহু, তুমি যাবে।

কিন্তু তোমার ওই দুষ্টু ছেলে আবার যদি আমাকে ব্যথা দেয়?

আর দেবে না।

গাল টানবে না, গা খিমচোবে না?

বিব্রতমুখে মাথা নাড়লেন জ্যোতিরাণী। অর্থাৎ তাও করবে না। শমীর দুর্ভাবনা গেল। ব্যথাটা একটু কমলেই কাকুর সঙ্গে আবার যাবে কথা দিতেও দেরি হল না। তবে কাকুর সব সময় কাজ এই যা মুশকিল। যতক্ষণ বাড়ি থাকে কেবল লেখে, তারপর কাজ আছে বলে একাই বেরিয়ে যায়।

জ্যোতিরাণী আশ্বাস দিলেন, গাড়ি পাঠিয়ে তিনিই ওকে নেবার ব্যবস্থা করবেন। তাছাড়া কাকুকেও নিয়ে যাবার জন্যে বলে দেবেন। শেষে অন্য প্রসঙ্গে এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি রাত্রিতে কি খেয়েছিলে বলো।

রাতে খেয়েছিল কিনা তাই মনে পড়ছে না। বলল, জানি না তো···

আজ সকালে?

দুধ। কি মনে পড়তে উৎফুল্ল।—কাকু বলেছে আজ ফল নিয়ে আসবে।

নিজেকে অপরাধী মনে হল জ্যোতিরাণীর। কিছু যদি খেয়াল থাকত, বাড়িতে ফলের ছড়াছড়ি, নিয়ে এলেই হত।···যে মন নিয়ে বেরিয়েছেন খেয়াল হবে কি করে। ড্রাইভারকে পাঠিয়ে কিনে আনার ব্যবস্থা করবেন কিনা ভাবলেন একবার।···একতলায় গিয়ে বলে সকলের চোখের ওপর দিয়ে আবার তিনতলায় উঠে আসা ···থাক।

মেয়েটার মুখে যেন লজ্জা-লজ্জা ভাব, কিছু যেন বলার ইচ্ছে। বলেই ফেলল, আমার আবার খিদে পেয়ে গেছে—

জ্যোতিরাণী ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, ডাকব কাউকে? কি খাবে?

শমী বিস্মিত, একটু যেন সন্ত্রস্ত।—এখন ডেকে কি হবে, রুটি তো খাবো সেই

ভাত খাবার সময়।

তা হলে? অসহায় বুঝি জ্যোতিরাণীই।

শমীর মুখে আবার সেই লজ্জার আভাস। ব্যবস্থা আছে, কিন্তু বলতে সঙ্কোচ। আঙুলে করে অদূরের টেবিলের ওপর একটা হরলিক্স-এর শিশি দেখিয়ে দিল সে। সমস্যাটা ওই দিয়ে সমাধান হতে পারে। জানালো কাকু তার জন্যেই ওটা সকালে এনে রেখেছে।

ঘরেই হীটার আছে, সসপ্যান আছে, জলের কুঁজো আছে, অন্যান্য সরঞ্জাম আছে। সাহিত্যিক হলেও বিভাস দত্ত মানুষটা অগোছালো নন। দিনের মধ্যে অনেকবার চা খান বলে ব্যবস্থা রাখতে হয়। বাড়িতে লোক অনেক, কিন্তু মনের টান কম। করে-কর্মে দেবার কেউ নেই। গেল বারের রায়টে তিন দিন এখানে থাকার ফলে এই ছাড়া-ছাড়া ভাবটা জ্যোতিরাণী ভালো করেই অনুভব করে গেছেন। তাই নিজের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে উপায় কি। সেবারেই জ্যোতিরাণীর মনে হয়েছিল বিয়ে-থা করলে ভদ্রলোক আর একটু সুস্থির হয়ে সাহিত্যে মন দিতে পারতেন।

হীটারে জল বসিয়ে দিলেন। সর্বহারা এই মেয়েটাকে দিয়ে ভদ্রলোককে যেন চেনা গেল খানিকটা। তাঁর সাহিত্যে হৃদয়ের আবেগ প্রচ্ছন্ন, প্রায় অনুপস্থিত বলা চলে। বেশির ভাগই ধারালো, ঝাঁঝালো—সর্বদা একটা ক্ষোভ ফেটে ফেটে পড়তে চায়। কথাবার্তাও সেই রকমই। মেয়েটার আঘাত লাগার ফলে তাঁকে বিচলিত হতে দেখে কালও বলেছিলেন, অত ব্যস্ত হবেন না, ওর এখনো অনেক কাঁদতে বাকি। সত্যি কথাই হয়ত। কিন্তু খুব খারাপ লেগেছিল জ্যোতিরাণীর। সাহিত্যেও এমনি ধাক্কা দিয়ে খারাপ লাগানোরই আক্রোশ যেন। কিন্তু আজ একটুকুর মধ্যেই নিঃস্ব মেয়েটার প্রতি ভদ্রলোকের টান দেখলেন তিনি। হরলিক্স আনা ফল আনা দূরে থাক শুধু আশ্রয়টুকুই বা কজনে দেয়। এইটুকু না পেলে কি হত মেয়েটার ভাবতে গেলেও বুকের তলায় মোচড় পড়ে। এই প্রথম বোধ করি বিভাস দত্তকে সত্যিকারের হৃদয়বান মানুষ মনে হয়েছে তাঁর।

হঠাৎ সচকিত একটু। তারপর ঈষৎ উৎসুকও।

গরম জল চাপিয়ে ফিরতে গিয়ে দেয়ালের দিকে চোখ গেল। একটা ফোটো টাঙানো। বেশ সুন্দর করে ফ্রেমে বাঁধানো ফোটোখানা। দেখেই চিনলেন। হাজারিবাগের তোলা ছবি। সেখানে অনেক ছবি তোলা হয়েছিল। কালীদার কাছে ক্যামেরা ছিল, বিভাস দত্তর সঙ্গেও ছিল। ছবি সকলেই তুলেছিল। কালীদা, বিভাসবাবু, জ্যোতিরাণী নিজে, এমন কি মামাশ্বশুরও দলে পড়ে ছবি তোলায় হাত মক্স করেছিলেন। এ ফটোখানা নিশ্চয় কালীদার তোলা।...পাহাড়ের একটা বড়

পাথরে ঠেস দিয়ে বিভাস দত্ত হাসিমুখে দাঁড়িয়ে, তাঁর সামনের পাথরে জ্যোতিরাণী আর ছেলে বসে। আর কেউ নেই, মামাশ্বশুরও না।

...শুধু হাজারিবাগের ছবি দিয়েই জ্যোতিরাণীর একখানা অ্যালবাম প্রায় ভরতি হয়ে আছে। এই ফোটোখানাও আছে হয়ত তাতে। হয়ত কেন, আছেই। কিন্তু এই ঘরের দেয়ালে ফোটোটা দেখে হঠাৎ অস্বস্তি বোধ করলেন কেমন। ছবিতে শুধু তিনি আর ছেলে আর বিভাস দত্ত...কালীদা, মামাশ্বশুর এমন কি চাকরটা থাকলেও এরকম লাগত না।

সঙ্গে সঙ্গে আরো কি মনে পড়ল জ্যোতিরাণীর। দাঙ্গার দুর্যোগ থেকে উদ্ধার করে এনে তিন দিনের জন্য যখন এই ঘরটাই তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল ...দেওয়ালে তখন এই ফোটোটা ছিল না। হাজারিবাগ থেকে ফেরা হয়েছে দাঙ্গার অনেক আগে।...এই ঘরে তাঁদের থাকতে দেওয়া হবে বলেই ফোটোটা সরানো হয়েছিল।

হরলিক্স বানাতে হবে, জ্যোতিরাণী তাড়াতাড়ি জল গরম হয়েছে কিনা দেখার জন্য ঝুঁকলেন।...আর একটু হবে।

কিন্তু তাঁর ফোটো দেখার এই স্বল্প নিবিষ্টতার ফাঁক ধরে আরো কি যে বিড়ম্বনার প্রহসন প্রস্তুত, জানেন না।

নিজের ছবি দেখার ওই আগ্রহটুকু শমী বোস ভালো করেই লক্ষ্য করেছে। তার বিবেচনায় এটা আগ্রহ ছাড়া আর কিছু মনে হয়নি। নিজের মা কি জিনিস জানে না, এই একজনকে দেখে গত কাল থেকেই সে মুগ্ধ। মাঝখানে এত বড় ব্যথাটা পেয়েই যা একটু গণ্ডগোল হয়ে গেছল। কিন্তু আজ আবার নিজে তাকে দেখতে এসেছে, গাড়িতে নিয়ে বেড়াবে কথা দিয়েছে, দুষ্টু ছেলেটা তাকে আর মারধর করবে না আশ্বাস দিয়েছে, আর তারপর নিজের হাতে হরলিক্স করে খাওয়াচ্ছে—কৃতজ্ঞতার কি আর শেষ আছে শমীর। এমন সুন্দর আর এত ভালো আর তো সে কাউকে দেখেনি। অতএব তাকে খুশি করতে পারলে খুশি কি ও নিজেই কম হবে নাকি? নিজের ফোটো দেখতে দেখেই খুশি করার রসদ হাতে পেয়ে গেল।

জ্যোতিরাণী ফিরতেই হাসিমুখে দু চোখ বড় করে আর গলা একটু খাটো করে টেনে টেনে বলল, কাকুর কাছে তোমার এর থেকে ঢের সুন্দর আরো দুটো ছবি আছে—তোমার একলার ছবি!

জ্যোতিরাণী হকচকিয়ে গেলেন। তারপরেই গরম ঠেকল কানের কাছটা। ঘরের এদিক-ওদিক তাকালেন তিনি। আর কোনো ফোটো চোখে পড়ল না। এই

মুখ দেখে শমী কৌতুক বোধ করল, আগ্রহ দ্বিগুণ।—আমি জানি কোথায় আছে, দেখবে?

জ্যোতিরাণী মুখ ফুটে বলতে পারলেন না কিছু, মাথা নেড়েছেন কিনা তাও জানেন না।

চট করে উঠে শমী ওধারের দেয়াল আলমারিটা খুলে ফেলল। কাচের আলমারি, বইয়ে ঠাসা-মোটা চওড়া আকারের একটা বই টেনে বার করল। ওমর খৈয়াম। সেটা খুলতেই পোস্টকার্ড সাইজের দুটো ফোটো বেরুলো।

জ্যোতিরাণীর একলার ফোটোই বটে।

শমীর মুখ উদ্ভাসিত।—খুব সুন্দর না? একেবারে ঠিক তুমি—

নিজেকে সংযত করে মুখের রক্তকণাগুলো দ্রুত যথাস্থানে পাঠাতে চেষ্টা করছেন জ্যোতিরাণী। এও হাজারিবাগের তোলা ছবিই, কিন্তু কার তোলা—বিভাসবাবুর কি কালীদার সঠিক ঠাওর করা গেল না। হাতে নিয়ে দেখার ইচ্ছে হল, কিন্তু নিলেন না। শমীর হাত থেকেই দেখলেন। তাঁর একার এ-রকম ছবি কখনো তোলা হয়েছে তাও মনে পড়ছে না।

এ দুটো এই বইয়ে আছে তুমি জানলে কি করে?

শমীর খটকা লাগল কেমন, যত আনন্দ হবে ভেবেছিল তা যেন মোটেই দেখছে না।—আমি ভেবেছিলাম এটা ছবির বই।

যেমন ছিল রেখে এসো।

হঠাৎ এই পরিবর্তন দেখে শমী বিলক্ষণ ঘাবড়ালো। বইয়ের আলমারি খুললে কাকু রাগ করে, কেউ খোলে না, তাকেও নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু শমীর সময় আর কাটতে চায় না বলেই একদিন এক ফাঁকে ওটা খুলেছিল বটে। কাচের ভিতর দিয়ে রঙ-চঙা বইটা দেখে সত্যিই ছবির বই ভেবেছিল। তাড়াতাড়ি যথাস্থানে রেখে এলো ওটা, তারপর ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি কাকুকে বলে দেবে নাকি?

বললে কি হবে?

রাগ করবে যে, আমি একদিন শুধু ধরেছিলাম, আর কক্ষনো ছোঁব না—বলে দেবে?

জ্যোতিরাণী আত্মস্থ হলেন। ফোটো-প্রসঙ্গে মেয়েটা বিভাসবাবুকে কিছু বলেনি বা বলবে না বোঝা গেল। চিবুক প্লাস্টার করা করুণ মুখখানা দেখে বুকের ভিতরটা খচ-খচ করে উঠল। সব আশ্রয় খুইয়েছে বলেই যে-লোকের একটু স্নেহ পেয়েছে তার বিরাগের ভয়ে কাঠ। গভীর মমতায় মেয়েটাকে কাছে টেনে নিলেন

তিনি।—না, আমি কিছু বলব না, তোমার কোনো ভয় নেই।

হরলিক্স বানিয়ে তাকে কোলের কাছে বসিয়ে নিজেই খাইয়ে দিতে লাগলেন। খাওয়ানো হলেই চলে যাবেন ভাবছেন। মেয়েটার মন বুঝে দুই-এক কথা বলতে হচ্ছে বলেই বলছেন। নইলে ভিতরটা তিক্ত হয়ে গেছে আবার। যে অসহিষ্ণুতা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন সেটাই ফিরে আসছে, ওই ফোটো দুটো দেখার পর থেকেই স্নায়ু তেতেছে। মেয়েটাকে আশ্রয় দেবার দরুন খানিক আগেও ঘরের মালিকের প্রতি যে মন ভারী সদয় হয়ে উঠেছিল, এখন তাঁকেই এড়াতে চাইছেন তিনি।

এড়ানো গেল না।

কে এসেছে বিভাস দত্ত নীচে থেকে শুনেছেন। দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে শশব্যস্তে ঘরে ঢুকলেন। শমীকে কোলের কাছে বসিয়ে হরলিক্স খাওয়ানোর দৃশ্যটা আরো অপ্রত্যাশিত, আরো নয়নাভিরাম। হাসিমাখা বিস্ময়ে দৃশ্যটা উপভোগ করলেন কয়েক মুহূর্ত।

কি আশ্চর্য, আপনি ফোনে খবর নেবেন ভেবেছিলাম, নিজে আসবেন ভাবিনি। হঠাৎ এক পাবলিশারের তাগিদে বেরিয়ে যেতে হল—

মুখে ভেজা-হাত বুলিয়ে শমীর মুখখানা আগে মুছিয়ে দিলেন জ্যোতিরাণী। গম্ভীরও নন, হাসছেনও না। বললেন, তাতে কি হয়েছে, যার কাছে এসেছি তার সঙ্গে অনেক গল্প হয়েছে, এবার পালাব।

গলার স্বর একটু ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা লাগল বিভাস দত্তর। এতক্ষণ বাড়ি ছিলেন না চোখে-মুখে সেই আফসোস।—কতক্ষণ এসেছেন ?

অনেকক্ষণ। জ্যোতিরাণী চৌকি থেকে নেমে দাঁড়ালেন।—আমি বাড়ির ডাক্তারকে ফোনে খবর দেব শমীকে এসে দেখে যাবে, আপনি বিকেলে বাড়ি থাকবেন তো ?

থাকব, কিন্তু এত ব্যস্ত হবার কি আছে !

ব্যস্ত হইনি। শমী একটু সেরে উঠলেই ওর জন্যে গাড়ি পাঠিয়ে দেব, আর আপনিও ফাঁক পেলেই ওকে আমাদের বাড়ি নিয়ে যাবেন।

শমী খুশিতে আটখানা। কাকুকে এভাবে হুকুম করে কথা বলার মানুষ বাড়িতে দেখে না। হাসিমুখে বিভাস দত্ত তাকে বললেন, ব্যথাটা পেয়ে তোর তো বেশ ভালই হল দেখছি !

লজ্জা পেয়ে শমী অন্যদিকে মুখ ফেরাল। এবারে জ্যোতিরাণীর ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য হাসির রেখা দেখা দিল। বিভাস দত্ত ফিরতে চোখে চোখ রাখলেন, ওর

মত ভালো করতে আপনিও চেষ্টা করবেন না যেন।

পরিহাসের কথা, বিভাস দত্ত হেসে উঠতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু হাসি মাঝখানে থেমে গেল। জ্যোতিরাণীর নির্লিপ্ত দৃষ্টিটা দেয়ালের দিকে ঘুরেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে বিভাস দত্তের চোখ দুটো দেয়ালে টাঙানো ছবিটার সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে একপ্রস্থ।

এদিকে ফিরে আবার সেই মুখ দেখলেন জ্যোতিরাণী, পাহাড় থেকে ফিরে হাজারিবাগের হোটেলের বাইরের ঘরে রাতদুপুরে পায়চারি করতে দেখে উঠে এসে আচমকা যে ধরা-পড়া মূর্তি লক্ষ্য করেছিলেন—সেই রকম। এক হাতে ফলের ঠোঙা, অন্য হাতে সিগারেটের খোঁজে পকেট হাতড়াচ্ছেন।

চলি। এগিয়ে এসে খুব সহজ মুখেই শমীকে আদর করলেন একটু, খুব ভালো হয়ে থেকো কিন্তু, আমি তোমার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলব'খন।

শমী সানন্দে মাথা নাড়ল। অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভূতিটা জোর করেই কাটিয়ে তুলতে চেষ্টা করলেন বিভাস দত্ত।—সত্যি চললেন? আচ্ছা এক মিনিট, খানিক বাদে আমিও আবার বেরুতাম, কাজ আছে—আপনার সঙ্গেই যাই চলুন, আমাকে চৌরঙ্গীতে নামিয়ে দেবেন।

বিরক্তি গোপন করে জ্যোতিরাণী ফিরে তাকালেন আবার। শোনামাত্র তাঁর ধারণা হল কাজটা অজুহাত, সঙ্গে যাওয়াটাই উদ্দেশ্য। বললেন, এতক্ষণ বাদে এলেন, নেয়ে-খেয়ে বিশ্রাম করে বেরুলে হত না?

বিভাস দত্ত গম্ভীর একটু, ঘড়ি ধরে চলার সুখ আমাদের কপালে নেই, আপনার আপত্তি নেই তো?

ঠোঁটের ফাঁকে আবার সেই হাসির উন্মেষ জ্যোতিরাণীর।—চলুন তাহলে।

ফলের ঠোঙাটা টেবিলে রাখলেন বিভাস দত্ত। এক টুকরো কাগজে একটা ওষুধের বড়ি মুড়ে শমীর হাতে দিলেন, দুপুরে খাবার পর একটা খাবি—

পাশের দিকে ঘাড় ফিরিয়েই থমকালেন আর একপ্রস্থ। পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে জ্যোতিরাণী দেয়ালের ফোটোটার সামনে দাঁড়িয়েছেন। নির্লিপ্ত নিরুৎসুক মুখে দেখছেন ওটা।

চলুন। ডেকে বিভাস দত্তই আগে আগে সিঁড়ির দিকে এগোলেন।

গাড়ি এগোতে চাপা অস্বস্তিটা ব্যক্ত না করে পারলেন না বিভাস দত্ত। কিছু একটা ব্যতিক্রম ঘটেছে অনুভব করছেন। ওই ফোটোটাই কারণ মনে হল। সিগারেট টানছেন। পার্শ্ববর্তিনী পাশে নেই ঠিক, অন্য কোণে ঠেস দিয়ে চুপচাপ বসে আছেন।

আরো দুটো টান দিয়ে সিগারেট ফেলে বিভাস দত্ত ঘুরে বসলেন একটু।—আপনার মেজাজ আজ খুব ভালো নেই মনে হচ্ছে ?

মুখের ওপর কিছু বলে দিতে ইচ্ছে করল জ্যোতিরাণীর। সকলের সব নীতির মুখোশ টেনে খোলার বাসনা। কিন্তু মেয়েটার কথা ভেবেই ইচ্ছেটা দমন করলেন। ওর ওপর কাউকে বিরূপ করে তুলতে চান না। নিস্পৃহ মুখে বললেন, ভালো না থাকতেও পারে···কিন্তু আপনার মনে হচ্ছে কেন ?

অস্বস্তি আরো বাড়ল বই কমল না। ফলে লেখাতে যা করে থাকেন, সেদিকেই এগোলেন বিভাস দত্ত। যে আচরণ লোকে বলিষ্ঠ ভাবে। নিজের অস্বস্তিকর আশঙ্কাটার ওপরেই ঘা বসালেন সরাসরি। বললেন, ঘরে যে ফোটোখানা দেখছিলেন সেটাই আপনার অখুশির কারণ কিনা ভাবছি।

জ্যোতিরাণীর মুখে একটাও বাড়তি রেখা পড়ল না। তেমনি নিরুৎসুক মুখে কি যেন মনে করতে চেষ্টা করলেন। তারপর খুব সাদাসিধেভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, দাঙ্গার সময় আপনার ওখানে কদিন ছিলাম যখন, ওই ফোটোটা দেখেছি ?

বিভাস দত্ত চেয়ে আছেন। লাগার যেটুকু লেগেছে। তাঁদের আনতে যাবার আগে দেয়াল থেকে ফোটোটা সরিয়েছিলেন, সেটা তাঁর মনে না থাকার কথা নয়। তাঁর আত্মাভিমান এভাবে আর কখনো হোঁচট খায়নি। সর্বদা লেখকের একটা বাড়তি মর্যাদা বহন করে অভ্যস্ত তিনি। জবাব না দিয়ে গম্ভীরমুখে বললেন, ফোটোটা আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব।

আবারো শমীর দিক বিবেচনা করে জ্যোতিরাণী আরো কিছু বলার লোভ সংবরণ করলেন। ওমর খৈয়ামখানাও পাঠানো হবে কিনা জিজ্ঞাসা করতে পারলে খুশি হতেন। থাক, যেটুকু হয়েছে, তাই যথেষ্ট। সহজ সুরেই বললেন, পাঠাতে হবে না, ওই ফোটোর কপি আমার কাছে আছে।

চৌরঙ্গী। বিভাস দত্ত নেমে গেলেন। যাবার সময়ও অন্যদিকে মুখ করে বিড়বিড় করে বললেন, চলি···

হন-হন করে একদিকে হাঁটা দিলেন তারপর। জ্যোতিরাণীর খারাপ লাগছে এখন। বিচ্ছিরি লাগছে। মাথাটা সত্যি বিগড়েছে তাঁর, নইলে এ-রকম ছেলে-মানুষি কাণ্ড করে উঠলেন কেন। এমন কিছুই তো ঘটেনি, যা তিনি কল্পনা করতে পারেন না। তাছাড়া ফোটো তোলার আপত্তি হয়নি যখন, কোথাও না কোথাও সেটা থাকবেই। তাঁর চোখে পড়েছে বলেই এমন কি বেশি অপরাধ হয়ে গেল। ওই নিয়ে হাল্‌কা ঠাট্টা করলেও এর থেকে অনেক বেশি সুশোভন হত। একটা দিনের স্বপ্ন ভেঙেছে বলে জীবনের হাল্‌কা দিকটাই দূরে সরে গেল ? সেই ক্ষোভে

এভাবে অপদস্থ করলেন ভদ্রলোককে ?

···ওমর খৈয়ামের মধ্যে তাঁর ফোটো, একটা নয়, দু-দুটো। আর তা-ও ধরা পড়ল কিনা ওই একটা বাচ্চা মেয়ের হাতে। ভ্রূকুটি করেও হেসেই ফেললেন জ্যোতিরাণী। জব্দ করাই উচিত। উল্টোপাল্টা চিন্তা করে বিগত দিনটাকে আর এক দফা মন থেকে ছেঁটে দিতে চেষ্টা করলেন তিনি।

বাড়ির বাতাস এখনো হাল্কা নয় খুব। মালিকের গত রাতের আর আজ সকালের মেজাজ বুঝি এখনো থিতিয়ে আছে। জ্যোতিরাণী বাড়ি ফিরতে মেঘনা, শ্যামু আর ভোলা সচকিত একটু। সদা নির্লিপ্ত মুখে দেয়ালের ঘড়ির দিকে তাকালো। জ্যোতিরাণী কালীদার ঘরে উঁকি দিলেন একবার। সিতু বিছানায় নেই, বোধ হয় ঠাকুমার ঘরে আছে।

কিছুদিন আগে নতুন অফিস খোলা হয়েছে কোথায়। কালীদা আর বাড়ির মালিক দুজনেই অফিস করেন। কিসের অফিস, কি হয় সেখানে জ্যোতিরাণী খবর রাখেন না। কালীদা সন্ধ্যায় ফেরেন। শিবেশ্বর রাত্রিতে। অফিসের পর তাঁর ক্লাব থাকে, পার্টি থাকে, মিটিং থাকে, বড় বড় সংস্থার অনেক কূটনৈতিক ফয়সালার ব্যাপার থাকে। তাঁর সময় সোনার দরে বিকোয়। অতএব জ্যোতিরাণীর সময় কিছু আছে হাতে, আগের মতই নিজেকে ধীর-স্থির করে তোলার দীর্ঘ অবকাশ পাবেন।

খাওয়া-দাওয়া সারতে বেলা হয়ে গেল একটু। শাশুড়ীর ঘরের দিকে চললেন তারপর। তিনি ঘুমুচ্ছেন নিশ্চয়, কিন্তু ছেলে দিনে ঘুমোবার পাত্র নয়। কি করছে দেখতে চললেন। আসলে সকাল থেকেই ছেলেটার কথা মনে হচ্ছে বারবার। সকাল থেকে কেন, কাল রাতের থেকেই।

শাশুড়ীর ঘরেও নেই। গেল কোথায়···এই শরীরে রাস্তায় বেরিয়ে থাকলে আবার জ্বরে পড়বে। বিরক্ত মুখে কালীদার ঘরের দিকে আসছিলেন। দাঁড়িয়ে গেলেন। ওধারের বারান্দার রেলিংয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তা দেখছে। মুখে মাথায় রোদ লাগছে সে হুঁশ নেই। জ্যোতিরাণী দাঁড়িয়ে দেখলেন একটু। শুকনো মুখ, গায়ের বগলকাটা গেঞ্জির দু'দিকে চাবুকের দাগড়া-দাগড়া দাগ দেখা যাচ্ছে—পিঠেও কত আছে ঠিক নেই। আবার একটা উদ্গত রোষ সংযত করে পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেলেন।

এখানে রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে কি করছিস, আবার জ্বরটা আসুক, কেমন ?

শ্রীমান সাত্যকি মায়ের দিকে ফিরল, ঠিক এ-সময়ে মাকে এখানে আশা করেনি।

জ্যোতিরাণী তার একখানা বাহু ধরলেন। রোদের তাতেই গা-টা ছ্যাঁক-ছ্যাঁক করছে বোধ হয়। গম্ভীর রাগত মুখে নিজের ঘরের দিকে টেনে নিয়ে চললেন তাকে। ছেলেরও গোঁয়ার-গোঁয়ার মুখ।

ঘরে এসে বেড-কভার পাতা বিছানার ওপর একটা বালিশ আর পাশবালিশ ফেললেন।—যাও, শুয়ে থাকো চুপ করে।

ব্যাপারটা এবারে যেন নতুন ঠেকছে সিতুর। মিট-মিট করে চেয়ে মাকে দেখল একটু। তারপর বিনা প্রতিবাদে আদেশ পালন করল, অর্থাৎ খাটে উঠে শুয়ে পড়ল। জ্যোতিরাণী তার কাছ ঘেঁষেই বসলেন। তারপর তেমনি রাগত মুখ করে বললেন, কালকের সেই মেয়েটাকে দেখে এলাম, অমন সুন্দর মেয়ে…একেবারে খুন করেছিস তুই—তোকে মারাই উচিত।

সঙ্গে সঙ্গে ছেলের মেজাজ বদলালো, চোখ পাকিয়ে বলে উঠল, ও আমাকে শিম্পাঞ্জী বলেছিল!

অনুশাসনের গাম্ভীর্য ধরে রাখা শক্ত হল জ্যোতিরাণীর, ঠোঁটের ফাঁকে হাসি ভাঙার উপক্রম।—আর তার আগে তুই ওকে কি বলেছিলি?

সে কি বলেছিল তা-ও যে মায়ের কাছে বজ্জাত মেয়েটা বলে দিয়েছে সিতু ভাবেনি। অগত্যা অন্যদিকে মুখ ফেরাতে হল তাকে।

জ্যোতিরাণীর মুখে হাসির আভাস আর একটু স্পষ্ট হল এবারে। ছেলের পাশ ঘেঁষে একখানা কনুই আর হাতের ওপর মাথা রেখে তিনিও আধশোয়া হলেন। অন্য হাতে ছেলের মুখ নিজের দিকে ফিরিয়ে কাছে টানলেন।—তুই এত দুষ্টু কেন, একটু ভালো হয়ে থাকতে পারিস না?

জবাব দেবে কি, ছেলের হঠাৎ কি যেন অস্বস্তির কারণ ঘটল। চকিতে দৃষ্টিটা মায়ের মুখের ওপর নড়েচড়ে নীচের দিকে নামতেই হাত ছাড়িয়ে তাড়াতাড়ি সরে গেল একটু।

জ্যোতিরাণী হঠাৎ বুঝে উঠলেন না ব্যাপারটা।—কি হল?

ছোট বাহুতে মুখ ঢেকে হাসিমাখা সঙ্কোচে ছেলে জবাব দিল, আমার লজ্জা করছে।

জ্যোতিরাণী হতভম্ব প্রথম। সঙ্গে সঙ্গে কি মনে পড়তে ভিতরটা অশান্ত হল তাঁর। সাত বছরের মেয়েটা সকালে নালিশ করেছিল—তার গাল ধরে টেনেছে, গা খিমচেছে। মুখের ওপর থেকে হাত টেনে সরিয়ে দিলেন। গম্ভীর।—লজ্জা করছে কেন, তুই ঠাকুমার কাছে ঘুমোস না?

ঠাকুমা তো বুড়ী!

আমি কি ?

ছেলের সলজ্জ দু চোখ তাঁর মুখের ওপর ঘুরল আর একবার।—তুমি কি বুড়ী নাকি ?

দেব এক থাপ্পড়, যা ঘুমো চুপ করে !

অসম্ভব একটা চিন্তার ধাক্কা ভিতর থেকে ঠেলে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করলেন তিনি।…দশ পুরোয়নি এখনো ছেলের।…আর ফোলা-ফোলা ওই ফুটফুটে মেয়ে, দেখলে সকলেরই চটকাতে ইচ্ছে করে।…নিজেরই মাথা খারাপ হয়েছে। ছেলের এ-কথায় হাসারই কথা।

মনের তলায় খুব সূক্ষ্ম একটা অদৃশ্য কাঁটার মত কি একটা অস্বস্তি লেগেই থাকল তবু।

বিকেল।

ছেলে কখন উঠে চুপি চুপি পালিয়েছে জ্যোতিরাণী টের পাননি। ঘরের বাইরে পা দিয়ে বিভ্রান্ত এক মুহূর্ত। পাশের ঘরের দরজার সামনে সদা দাঁড়িয়ে। মনিব বাড়িতে থাকলে প্রায়ই ওইরকম দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় তাকে। ঘরের পরদা সামান্য গোটানো। যেতে যেতে বক্রদৃষ্টিটা জ্যোতিরাণী ঘরের ভিতরে চালান করলেন একবার।

…অসময়ে সদার মনিব ঘরেই আছে বটে।

জ্যোতিরাণীর চলার গতি দ্রুত হল একটু। উদ্গত অনুভূতিটা রাগের কি কি আনন্দের জানেন না। দুইয়েরই বোধ হয়।…কাজের মানুষের সময় আজ আর সোনার দরে বিকোয়নি তাহলে। এ-সময়ে বাড়ি ফেরার কারণ, মাথা ঠাণ্ডা নেই। মাথা সকাল থেকেই ঠাণ্ডা নেই জ্যোতিরাণী জানেন।…গত রাতে বন্ধ দরজায় ঘা দিয়ে ফিরে যাওয়ার অপমান ভুলতে পারেনি। বন্ধ দরজার এধারে জ্যোতিরাণী যা বলেছিলেন, তা-ও মগজে কেটে কেটে বসেছে বোধ হয়। বিয়ের পর থেকে এত বছরের মধ্যে এ-রকম এই প্রথম।

আসতে যেতে অনেকবার দেখা হল। শিবেশ্বর কখনো নিজের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কখনো বা বারান্দার রেলিংয়ের সামনে। জ্যোতিরাণী এসেছেন, গেছেন, মুখ ফিরিয়ে তাকাননি কখনো। কিন্তু লক্ষ্য করেছেন। রাগে কতখানি সাদা হয়ে আছে অনুভব করতে পেরেছেন। আনন্দ হচ্ছে বইকি তাঁর। গতকাল নিজে কতখানি অপমানিত হয়েছেন তিনি, কত বড় স্বপ্ন তাঁর ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে সেটা যে একজন একটুও টের পেল না তাতেই তাঁর আনন্দ। গতকাল সকাল থেকে

সন্ধ্যা পর্যন্ত আর এক জ্যোতিরাণী তাঁর সমস্ত সত্তা জুড়ে বসেছিল···উষালগ্নে স্নানের পর, বাবার ওই আবাহন-স্তোত্র পড়ার পর, মামাশ্বশুরের মুখে রাণীর সেই ক্ষমার গল্প শোনার পর, পথের মানুষের সেই উত্তাল মিলন দেখার পর—বুকের ভিতরটা সমুদ্র হতে চেয়েছিল তাঁরও। সমুদ্র হতেই পারত। কি হতে চেয়েছিল, কি হতে পারত, সেটা যে আর একজন টের পায়নি, সেটাই একমাত্র সান্ত্বনা এখন। তাঁর হতাশার স্মৃতি ওই একটা দিনের মধ্যেই ডুবে যাক।

হাতে সব কাজ সেরে নিজের ঘরে এলেন যখন, সন্ধ্যা অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেছে। চুল বাঁধছেন। রাত আসছে; জ্যোতিরাণীর সমস্ত মুখ আরো বেশি ঝকমক করছে। যে-মূর্তি দেখলেন বিকেল থেকে, আনন্দ হবে না তো কি। না, আজও ঘরের দরজা বন্ধ করার ইচ্ছে নেই। তার থেকে অনেক বেশি কিছু করার ইচ্ছে, নতুন কিছু। ···কোনো অজুহাতে একবার ও-ঘরে যেতে পারলে হত। সামনে দাঁড়িয়ে, চোখের সামনে দাঁড়িয়ে খুব সাদা-মাটা যা-হোক দুটো কথা বলে আসতে পারলে হত। চোখের সামনে স্ফুলিঙ্গ নড়া-চড়া করে গেলে পতঙ্গ কি করে? কি করে সে শুধু জ্যোতিরাণীই অনুমান করতে পারেন। কিন্তু কি উপলক্ষে যেতে পারেন তিনি এখন ও-ঘরে?

তার দরকার হল না। শিবেশ্বর নিজেই এ-ঘরে এসে দাঁড়ালেন।

তাঁর হাতের বস্তুটার দিকে চোখ পড়তে জ্যোতিরাণী সচকিত। সেই মাসিকপত্র যাতে বিভাস দত্তর 'অন্ধতামিস্র' রচনা ছাপা হয়েছে। মাসিকপত্রটা কখন এ-ঘর থেকে ও-ঘরে গেছে জানেন না।

শিবেশ্বর সামনে এসে দাঁড়ালেন। জ্যোতিরাণীর দু-তিন হাতের মধ্যে। তাঁর ফর্সা মুখ আরো সাদাটে দেখাচ্ছে এখন। খুব ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, বিভাস ভালই লেখে···কেমন?

হ্যাঁ, পড়লে লেখাটা?

শিবেশ্বর জবাব দিলেন না, মুখের দিকে চেয়ে মাথা নাড়লেন। তারপর মাসিক-পত্রটা টেবিলের দিকে ছুঁড়ে দিলেন। কোথায় গিয়ে পড়ল ফিরেও দেখলেন না। বললেন, আজকের একটা ফাংশানে দুজনের যাবার কথা ছিল, মৈত্রেয়ীকে টেলিফোন করে সেটা ক্যান্সেল করেছি। ভবিষ্যতে এ-রকম আর করতে হয় সেটা আমার ইচ্ছে নয়।

কি যেন চাই জ্যোতিরাণীর।···চুলের আর একটা ফিতে। ড্রেসিং-টেবিল থেকে সেটা নিয়ে এক-মাথা দাঁতে চেপে অন্য হাত পিছনে নিয়ে চুলের বাঁধন অাঁট করতে করতে তাঁর দিকে ফিরলেন। পরে দাঁতের ফিতে ছেড়ে দিয়ে বললেন, তোমার

ইচ্ছের সঙ্গে আমার ইচ্ছেটা সর্বদা না-ও মিলতে পারে।

মেলে যাতে সেই কথাই বলতে এসেছি। সাদাটে দৃষ্টিটা তাঁর মুখের ওপর কেটে বসিয়ে দিতে চান।—আমার ইচ্ছেমত এরপর এ-বাড়িতে অনেক কিছুই হবে বা হবে না। আমার ইচ্ছে না হলে কোনো রাস্‌কেলের কোনো ট্র্যাশ লেখা এ-বাড়িতে ঢুকবে না, আমার ইচ্ছে না হলে আর কোনো অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট ক্যান্‌সেলড্‌ হবে না···আর আমার ইচ্ছে হলে হয়ত তোমার এ-ঘরে বন্ধ করার মত একটা দরজাও থাকবে না—বুঝলে?

রাগ না, রাগ করলে এই মুহূর্তে জ্যোতিরাণীর থেকে বেশি আর কেউ ঠকবে না বোধ হয়। আয়নায় চুলের পাতা ঠিক করে নিলেন একটু।—বুঝলাম, কিন্তু এটা সুস্থ মাথার ইচ্ছে কেউ বলবে না···তোমার অনেক টাকা সেটা সকলেই জানে।

কিন্তু তুমি কি জানো? ওই টাকা ফেললে তোমার মত অনেক মেয়েকে হাতের মুঠোয় আনা যায়, সেটা জানো?

জ্যোতিরাণী ফিরে দাঁড়ালেন। চোখে চোখ রাখলেন। রাগ না, মুখে হাসি ঝলসালো।—টাকা না ফেলেই অনেক পুরুষমানুষও হাতের মুঠোয় আনা যায়, সেটা এমন কি বাহাদুরির কথা? দাঁড়াবার সময় নেই এখন, ছেলেটাকে খেতে দিতে হবে।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। বারান্দা ধরে চললেন।

গত দিনের স্বপ্ন ভাঙার আর কোনো খেদ নেই বুঝি জ্যোতিরাণীর। চোখ-মুখ জলজল করছে তাঁর। পতঙ্গ স্ফুলিঙ্গ দেখেছে।···জলন্ত আক্রোশে এখন ওই একজন রাতের প্রতীক্ষা করবে। দরজা বন্ধ করার থেকেও বেশি কিছু, নতুন কিছুই করতে পেরেছেন তিনি। আসুক। যত বেশি হিংস্র অন্ধ আক্রোশ নিয়ে আসবে, ব্যর্থতার ততখানি অসহিষ্ণু ক্ষোভ নিয়েই ফিরে যাবে আবার। দরজা বন্ধ না করেও, বাধা না দিয়েও—নীরব উপেক্ষা, ঠিক ততখানিই অসহ্য করে তুলতে পারেন জ্যোতিরাণী।

আজ আরো বেশি পারবেন।

॥ উনিশ ॥

টেলিফোনে বিভাস দত্তর গলা পেলেন জ্যোতিরাণী। তাই পাবেন জানেন। তাঁর ঘরে টেলিফোন, অন্য কারো ধরার কথা নয়, ধরেও না। কিন্তু গলার স্বর বেশি

ভারী লাগল কানে।

জ্যোতিরাণী জিজ্ঞাসা করলেন, শমী কেমন আছে?

ভালো, ধরুন একটু।

জ্যোতিরাণী ভাবলেন ভদ্রলোকের হাতে কিছু আছে যেটা রেখে অথবা ঘরে কেউ আছে যাকে কিছু নির্দেশ দিয়ে তারপর কথা কইবেন। কিন্তু একটু বাদে যার সাড়া পেলেন সে শমী। অর্থাৎ টেলিফোন ধরতে বলে তাকে ডেকে দেওয়া হয়েছে। জ্যোতিরাণীর ঠোঁটের একদিকে দাঁতের দাগ পড়ল একটু। দৃষ্টিও প্রসন্ন থাকল না খুব।···লেখকের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে গত কাল, তারই জের এটা। পরোক্ষ জের কিছুটা চলতে পারে সেটা কালই অনুমান করেছিলেন। ভদ্রলোক ওই মুখ করে গাড়ি থেকে নেমে যাবার পর জ্যোতিরাণীর নিজেরই খারাপ লেগেছিল। বারবার মনে হয়েছিল ওভাবে অপদস্থ না করলেই হত। আজ টেলিফোনে শমীর খবর নিতে গিয়েও কালকের ব্যাপারটা আগে মনে পড়েছে। নম্বর ডায়েল করার সময়ও ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাস ছিল। সাড়া পেতেই মনে হয়েছে কোথা থেকে টেলিফোন ভদ্রলোক অনুমান করেছেন, তাই গলা গম্ভীর। শমীর খবর নেবার পর প্রচ্ছন্ন কৌতুকে হয়ত দুটো মিষ্টি কথাই বলতেন জ্যোতিরাণী, হয়ত বা জিজ্ঞাসাই করে বসতেন, রাগ পড়েছে, নাকি সন্থ কোনো নায়িকার উপর দিয়ে সেটা উশুল করে নেওয়া হচ্ছে।

কিন্তু তা বলে বাইরের কারো কাছ থেকে এই আচরণ বরদাস্ত করার মেজাজ নয় তাঁরও। শমীকেও ডেকে দুটো কথা নিজে থেকেই বলতেন তিনি। বিভাস দত্তর এই পর্যায়ের আত্মাভিমান উল্টে বিরক্তির কারণ হল। মস্ত নির্লিপ্ত মানী মানুষকে ভয়ানক অপমান করা হয়েছে যেন। তবু তো শমীর মুখ চেয়ে ওমর খৈয়ামে লুকনো ফোটো দুটোর কথা কিছুই বলা হয়নি।···বলতে পারলেই ভালো হত।

মেয়েটা টেলিফোনে কথা বলতে অভ্যস্ত নয় এধার থেকে টের পাচ্ছেন। ওকে ডেকে যিনি দিলেন তাঁর অস্ফুট চাপা বিরক্তি কানে আসছে।···শক্ত করে কানে চেপে ধর···ওদিকটা মুখের কাছে তোল্···সাড়া দে, বল্ হ্যালো···

হ্যা-লো-ও!

কে শমী?

জবাবের বদলে ওধার থেকে পুরুষের চাপা ধমক কানে এলো, মাথা নাড়ছিস কি! তোকে কি ওদিক থেকে দেখতে পাচ্ছে কেউ? জবাব দে—

হ্যাঁ···শমী···তুমি মাসিমা?

সম্বোধনটা নতুন ঠেকল জ্যোতিরাণীর কানে। কাল বা আজই শেখানো

হয়েছে তাকে। নইলে এ দু দিন কিছুই ডাকেনি। চকিতগম্ভীর কৌতুকটুকু স্বতোৎসারিত। জবাব দিলেন, না, পিসিমা।

অাঁ?

আরো স্পষ্ট করে বললেন, মাসিমা না, তোমার পিসিমা কথা বলছি।

পিসিমা! কাকু যে বলল তুমি মাসিমা!

কাকু বলল? আচ্ছা তাহলে তাই। নীরব ব্যঙ্গ-ছটা সমস্ত মুখে ছড়ালো। টেলিফোন ছাড়লেই তাঁর উক্তি যথাস্থানে পৌঁছুবে। কিন্তু বেচারী মেয়েটা যেটুকু ফাঁস করেছে তাতেই না ধমক খেতে হয়। তাড়াতাড়ি কুশল প্রশ্ন করলেন, তুমি কেমন আছ বলো।

ভালো আছি। কচি গলার খুশির আমেজ খাদে নেমে গেল হঠাৎ।

জ্যোতিরাণীর ধারণা, ওর পাশে যিনি দাঁড়িয়ে এটা তাঁর ভ্রূকুটির ফল।—কাল বিকেলে তোমাকে ডাক্তার দেখে গেছে?

হ্যাঁ। তুমি আজ আসবে না?

না। এবার তুমি আসবে। খুব তাড়াতাড়ি সেরে ওঠা চাই—আমি তোমার বেড়াবার ব্যবস্থা করছি। আচ্ছা, আবার পরে কথা হবে।

রাগ ভাঙাবার জন্যে আবার তিনি ওকে কাকার হাতে টেলিফোন দিতে বলবেন এ যদি আশা করে থাকে তো থাক। জ্যোতিরাণী রিসিভার নামিয়ে রাখলেন।

পরদিন ঠিক এই সময়েই টেলিফোন করলেন আবার। যথারীতি বিভাস দত্তর গলা পেলেন।

শমীকে দিন।

শমীকে?…ইয়ে, আপনি বাড়ি থেকে কথা বলছেন নাকি?

আর কোথা থেকে বলব? শমী ঘরে নেই?

আছে, ধরুন।

কালকের ব্যবহারের জবাব দিলেন জ্যোতিরাণী। ঠোঁটের ফাঁকে হাসি ভাঙছে। ভদ্রলোকের আজকের গলার স্বর নরম ছিল। কিন্তু মানীর মান আবার ঘা খেয়েছে বোঝা গেল। টেলিফোন ধরে আহত গাম্ভীর্যটুকু কল্পনায় দেখছেন জ্যোতিরাণী। শমী এলো। গত দিনের মতোই শরীরের খবর নিলেন, গল্প করলেন একটু, তারপর ছেড়ে দিলেন।

টেলিফোন এরপর আরো দু-চার দিন করেছেন। বিভাস দত্তকে জব্দ করার

জন্য নয়, মেয়েটার ওপরে মায়া পড়েছে বলেই করেছেন। ঘরের মালিকের যে-সময় ঘরে থাকার সম্ভাবনা কম সেই সময় ধরে শমীকে ডেকেছেন। সেদিন ও অনুযোগই করল প্রায়।—সেলাই কেটে দিয়েছে, এখন ব্যথা তো সেরেই গেছে, তুমি কবে আর গাড়ি পাঠাবে? একটা ঘরের মধ্যে সমস্ত দিন কেউ থাকতে পারে? কাল কাকুকে বললাম তোমার কাছে নিয়ে যেতে, কাকু শুনতেই পেল না। আবার যেই বললাম, অমনি দিলে এক ধমক। আমি বারান্দায় এসে কাঁদতে লাগলাম।···কাকু আজকাল আমাকে আগের মত ভালবাসে না বোধ হয়।

আট বছরের মেয়ের কথাগুলো মিষ্টি। এ-ধরনের কথা তাই আরো বেশি কেটে বসে। ঘড়ির দিকে চেয়ে ভাবলেন দুই-এক মুহূর্ত। তিনটে বেজে গেছে। খানিক বাদে ছেলেকে স্কুল থেকে নিয়ে আসার জন্য গাড়ি বেরুবে। একবার ভাবলেন ড্রাইভারকে বলে দেবেন এই সঙ্গে ওকেও নিয়ে আসতে। কিন্তু ভরসা পেলেন না, যে ঠাণ্ডা ছেলে, আবার একটা ব্যথা-টেথা দিয়ে বসা বিচিত্র নয়। বাড়ির কর্তা দিল্লীতে, তাঁর গাড়িটা আছে।

দিল্লী প্রায়ই যেতে হয়, ইদানীং আরো বেড়েছে। বাতাস সাঁতরে যেতে আসতে কতই বা সময় লাগে। শাশুড়ীর মুখে শুনেছেন এবারে ফিরতে দেরি হবে। জ্যোতিরাণী নিঃসংশয়, আর এক পশলা টাকা আসবে ঘরে। যে-কোনো বাড়তি মনঃসংযোগের পিছনে এই এক ব্যাপারই দেখে আসছেন তিনি।

তোমার কাকু ফিরবেন কখন?

কাকু তো বাড়িতেই আছে, নীচে কে এসেছে তার সঙ্গে কথা কইছে, ডাকব?

ডাকতে হবে না। এক ঘণ্টার মধ্যে তোমার কাছে গাড়ি যাচ্ছে, কাকুকে বলে তুমি রেডি হয়ে থেকো, বুঝলে?

আজই? আনন্দে লাফিয়ে উঠল হয়ত, তারপরেই শঙ্কা।—কাকু যদি রাগ করে?

করবে না। ভ্রূকুটি ভদ্রলোকের উদ্দেশে। একমাত্র আশ্রয় যে, অসহায় মেয়েটা তাকেও ভয় করতে শুরু করেছে।—বোলো আমি বলেছি, গাড়ি গেলেই চলে এসো, বেড়াবার ইচ্ছে থাকে তো, দেরি কোরো না।

শুধু ড্রাইভারকে নয়, কি ভেবে তার সঙ্গে সদাকেও পাঠিয়েছেন জ্যোতিরাণী।

স্কুল থেকে ফেরার আগে মা কোথায় গাড়ি পাঠিয়েছে বা কাকে আনতে বলেছে শ্রীমান সাত্যকি খবর রাখে না। সকাল থেকে এ পর্যন্ত একটানা অনেকক্ষণ মোটামুটি বাঁধা-ধরা নিয়মের মধ্যে থাকতে হয় বলে বাড়ি ফিরেই একটা কিছু

উপদ্রব সম্পন্ন করতে না পারা পর্যন্ত তার মেজাজ গরমই থাকে। হামলাটা প্রধানতঃ ঠাকুমার ওপর দিয়েই হয়ে থাকে। আবার সামনা-সামনি পড়ে গেলে আর কোনোরকম ইন্ধন জুটলে শামু ভোলা এমন কি মেঘনারও অব্যাহতি নেই। তবে মেঘনা আবার ফাঁক পেলে মায়ের কাছে নালিশ করে বলে ওকে অনেক সময় ক্ষমা-ঘেন্না করে চলতে হয়। শামু আর ভোলাকে মানুষের মধ্যে গণ্য করে না। সামনে যাকে পায় তার গায়ে হাতের ব্যাগটা ছুঁড়ে মারে। এও মা দেখে ফেললে মুশকিল, কিন্তু দেখছে কিনা সে-চোখ সিতুর আছে। তবে ফেরার পর সচরাচর ঠাকুমার সঙ্গেই প্রথমে একপ্রস্থ হয়ে যায় তার। পাথরের থালায় বা বাটিতে প্রত্যহ তিনি কিছু না কিছু প্রসাদ রেখে থাকেন। দৈবাৎ কখনো না রাখলে সিতু তাঁর গায়ের মাংস চিবুতে আসে। কিন্তু রেখেও খটাখটি একদফা প্রায় রোজই লাগে। কোনোদিন প্রসাদ মনঃপূত হয় না, আর কোনদিন বা এমন মন্তব্য করে যে ঠাকুমার পিত্তি জ্বলে যায়।

অবশ্য স্কুলে যতক্ষণ থাকে, খুব যে খারাপ লাগে তা নয়। সেখানেও সমবয়সী অনেকের ওপরেই তার একটু-আধটু দাপট খাটে। কিন্তু খারাপ লাগে কয়েকটা মাস্টারের জন্য আর ওই ঘোড়া-মার্কা সময়ের জন্য। মাস্টারমশাই কিছু জিজ্ঞাসা করলেই বলার জন্য হাত তুলে ঘোড়ার মত লাফায় যে। পাড়ার অন্তরঙ্গ বন্ধুরা, অর্থাৎ দিগ্‌গজ দুলু, রোগা-পটকা অতুল, সজারু-মাথা সুবীর—এরা সব কাছা-কাছির অল্প মাইনের স্কুলে পড়ে। কম মাইনে বটে, কিন্তু মস্ত স্কুল—সিতু দেখেছে, হাজার হাজার ছেলে পড়ে সেখানে। তারও সেখানেই পড়ার ইচ্ছে, কিন্তু মা আর কালী জেঠুর জন্য তা হবার জো নেই। গাড়ি চেপে তাকে যেতে হয় সেই কোথায়। সমর ঠিক পাড়ায় থাকে না, কিন্তু কাছাকাছিই থাকে। ফাঁক পেলে এদিকে টহল দিতে আসে, আর চুপিচুপি পাড়ার বন্ধুদের কাছে অনেক সময়েই তার স্কুলের হেনস্থা ফাঁস করে দেয়। এদিকে আসে হয় চাকরের সঙ্গে নয় তো ওর দাদার সঙ্গে। আওতায় পেলে সিতু একদিন ঠিক ওর টুঁটি চেপে ধরবে।

জ্বরের পর এই চার দিন হল স্কুলে যাচ্ছে সে। এর মধ্যে গতকাল থেকেই দিন খারাপ যাচ্ছে তার। ড্রিল ক্লাসে কাঁধ-হাতা মোটা গেঞ্জি পরে ড্রিল করতে হয়। তখন বাবার মারের দাগ যে ড্রিল মাস্টারের চোখে পড়তে পারে ভাববে কি করে? নিজেরই তো মনে ছিল না। প্রথম দু'দিন লম্বা ট্রাউজার পরে এসেছিল, গতকাল হাফপ্যান্ট। ড্রিল মাস্টার ঘুরে ঘুরে ড্রিল করায় আর দেখে। হঠাৎ কাছে এসে তার মাথায় হাত দিয়ে ঘাড়ের দিকটা দেখেছে, তারপর পায়ের দিকে তাকিয়েছে। বাহুর দুই একটা কালচে দাগের দিকেও চোখ গেছে, শেষে পিঠের গেঞ্জিটাও

টেনে তুলেছে। তারপর অবধারিত প্রশ্ন করেছে, এসব কি?

সব ছেলের চোখ-কান তার দিকে। বাবার মারের থেকে সেটা অনেক বেশি দুঃসহ অপমানকর মনে হয়েছিল। প্রথম যা মাথায় এসেছিল সেই জবাবই দিয়েছে, পাড়ার দুটো গুণ্ডা ছেলের সঙ্গে মারামারি হয়েছিল। গুণ্ডা গোছের কয়েকটা ছেলে পাড়ায় আছে ঠিকই। কিন্তু ড্রিল মাস্টার তবু বলেছে, এগুলো তো চাবুকের দাগ। প্রাণের দায়ে সিতু জানিয়েছে খালি হাতে দু-দুটো চাবুকের বিরুদ্ধেই লড়তে হয়েছে তাকে। ড্রিল মাস্টারের খটকা যায়নি হয়ত, তবে দিনকাল যা পড়েছে একেবারে অবিশ্বাসও করেনি। ফলে এর পর অন্য ছেলেদের কাছে মারামারির এবং নিজের বীরত্বের একটা কল্পিত কাহিনী বিস্তার করতে হয়েছে তাকে। কিন্তু সিতুর সমস্যা দাঁড়িয়েছিল ওই ঘোড়ামার্কা সমরকে নিয়ে। ফাঁক পেলেই ও ঠিক পাড়ায় টহল দিতে আসবে, আর বন্ধুদের মারামারির কথা জিজ্ঞাসা করবে। তখনই একটা গণ্ডগোলের ব্যাপার হয়ে যাবে।

সমরকে ঠেকাবার চেষ্টা অবশ্য গতকালই সে করে রেখেছিল। তাকে আড়ালে ডেকে বন্ধুভাবে সাবধান করে দিয়েছিল, আমাদের ওদিক শিগ্গীর মাড়াস না যেন, খবরদার। সুবীর তলায় তলায় দল পাকিয়েছে, বাগে পেলে হাড় গুঁড়িয়ে দেবে তোর, সব সময় তাকে-তাকে আছে ও বলে দিলাম—

সজারু-মাথা সুবীর, যার বয়েসও একটু বেশি, গায়ের জোরও একটু বেশি। সমরের ওপর সেই সুবীরের বিরাগের একটু কারণ ছিল। সুবীরের হোমিওপ্যাথি শিশির নস্যির নেশাটা সমর তার দাদার কাছে ফাঁস করেছে, সমরের দাদা সুবীরের দাদার কাছে বলেছে, আর বাগে পেয়ে তখন সুবীরের মাত্র চার বছরের বড় দাদাটি তাকে বিলক্ষণ শাসন করেছে। সেই থেকে সমরের ওপর সুবীরের রাগ। এই ওয়ার্নিংএর ফলে সমর মুখে স্বীকার করুক আর না-ই করুক, ভিতরে ভিতরে একটু ঘাবড়েছে।

একটা মিথ্যে বলেই কি রেহাই আছে? তারপরেই মনে হয়েছে, ভায়ের কথাটা সমর যদি তার দাদাকে জানায় আর তার দাদা যদি আবার সুবীরের দাদাকে বলে, তাহলেই তো চিত্তির। অতএব বিকেলে আবার সুবীরকে বলতে হয়েছে, দাদার হাতে তোকে মার খাইয়ে সমরটা স্কুলে আজ অন্য ছেলেদের কাছে খুব তম্বাই করছিল। আমি তোর হয়ে বলে দিয়েছি, পাড়ায় এসে দেখিস, সুবীর তোর হাড় গুঁড়িয়ে দেবে।

সুবীরের মর্যাদাবোধ আশাপ্রদভাবেই তেতে উঠতে নিশ্চিন্ত। বলেছে, ঠিক করেছিস, আসুক ও।

আজও আবার ওই সময়ের জন্যেই তিরিক্ষি মেজাজে স্কুল থেকে ফিরেছে। অঙ্কের ক্লাসে যাকে বলে নাজেহাল হতে হয়েছে। কদিন কামাই হবার ফলে নতুন অঙ্ক শেখা হয়নি। কিন্তু অঙ্ক-টীচারকে তা বলারও দরকার বোধ করেনি, কারণ, পাশে সময়ের ধ্যাবড়া-লেখা খাতা দেখে বেশ টোকা গেছে। সমর সাত-তাড়াতাড়ি খাতা দিচ্ছে না দেখেই ওর সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল। সিতুই আগেভাগে খাতা দিয়ে এসেছে। ওর কারসাজি পরে টের পেয়েছে। টুকতে দেখে সমর আবোল-তাবোল ফল লিখেছে। পরে ফাঁক পেয়েই রাবার ঘষে ঠিক করে নিয়েছে। ওর চারটে অঙ্কই রাইট। আর সিতুর অঙ্কের ফল দেখে মাস্টারমশায়ের মাথায় আগুন জ্বলেছে। শেষের একটা ঘণ্টা ঠায় ঘরের বাইরে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে তাকে। তারপর সেই তিক্ততা নিয়ে বাড়ি ফিরেছে।

পিঠের ব্যাগটা দিয়ে ভোলার মাথায় ঠাস করে মেরে বসল। এ-সময়ে সামনে পড়াটাই অপরাধ, তার ওপর বসে আছে। অদূরের সিঁড়িতে বসেছিল মেঘনাও। অশ্রুত মন্তব্য করল, এলেন কমল-বনে মত্ত হাতী!

কিছু একটা বলা হল সিতু সেটা ঠিকই অনুমান করল। কাছে এসে ঝাঁঝিয়ে উঠল, এই ধুমসি কোথাকার, ওখানে বসলে আর ওঠার জায়গা থাকে, দয়া করে সরবে না গায়ের ওপর দিয়ে যাব ?

মুখঝামটা দিয়ে মেঘনা উঠল।—বাবা বাবা!

সিঁড়ি কাঁপিয়ে দোতলায় আরোহণ করল সাত্যকি, তারপর সোজা ঠাকুমার ঘরের দিকে। এখানকার পটভূমি আগে থাকতেই প্রস্তুত প্রায়। কিরণশশী হাঁ-হাঁ করে উঠলেন, ধুলো পায়ে বাইরের জামা-কাপড়ে ঘরে ঢুকলি, যা, শিগগীর সব ছেড়েছুড়ে আয় বলছি!

সঙ্গে সঙ্গে বিকৃত রসনা দর্শন করতে হল, বুড়ী কোথাকারের, সব ছেড়েছুড়ে দিগম্বর হয়ে আসতে হবে ওর কাছে—কি আছে আজ ?

দশ বছরের নাতির অনেক রকম বচন শুনে অভ্যস্ত তিনি। তবু ঝাঁঝালো রসিকতা করলেন প্রথম, আমার কাছে আসবি কেন রে পাজী ? ··যা, জুতো জামা ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে আয়, অনেক প্রসাদ আছে আজ—নারকেল-মুগের জালা, আম সত্ত্বর চাটনি, সাবুর পায়েস—

নিজে খেয়ে-দেয়ে আবার প্রসাদ! লালা লাগেনি তো কোনটাতে ?

এবারে ঠাকুমা ক্রুদ্ধ হবে জানা কথা, লেগেছে তো লেগেছে, নোলা বার করে কে তোকে খেতে আসতে বলেছে ? যা শিগগীর এখান থেকে—

অতঃপর মুখহাত ধুয়ে প্রথমে ঠাকুমার ঘরে একপ্রস্থ পরে নিজের বরাদ্দ এক-

গ্রস্থ জঠরে চালান দিয়ে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা মাথায় সবে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে, তার পরেই চমক। নীচে বাবার গাড়ি থামল, আর আদর করে সদা হাত ধরে নামালো একটা মেয়েকে।···সেই মেয়েটাকে।

দেখা-মাত্র মেজাজ আবার বিগড়ালো সিতুর। বাবার সেই প্রচণ্ড প্রহারের সঠিক হেতু তলিয়ে দেখেনি সে। মেয়েটার ব্যথা পাওয়ার সঙ্গে ওই রাতের সেই রামপিটুনির যোগ আছেই ধরে নিয়েছে। নইলে মা ওভাবে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে দেখছিল কেন? আর সেই মারের ফলেই তো স্কুলে অমন মুশকিলে পড়তে হয়েছিল তাকে। মোট কথা সিতুর মনে হল তার সব হেনস্থার মূলে এই মেয়েটা।

প্রথমেই স্থির করল, মুখদর্শনই করবে না ওর। মা ডাকলেও না। কিন্তু গাড়ি পাঠিয়ে কেন ওকে আনা হল সেই কৌতূহলও না মিটলেই নয়। মায়ের ঘরের দিকে না এগিয়ে পারল না শেষ পর্যন্ত।

ঘরের অন্তরঙ্গ দৃশ্য দেখেও দৃষ্টি ঘোরালো হল একটু। ওদিক ফিরে বসে মেয়েটার হাত ধরে মা হাসিমুখে শুনছে কি, মেয়েটা কথা বলছে আর চোখ দিয়ে মুখ দিয়ে খুশি যেন গলে গলে পড়ছে। থুতনিতে পটি আটকানো। গম্ভীর মুখে সিতু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, এদিকে ফিরে আছে বলে মেয়েটাই তাকে দেখল প্রথম। হাসি গেল।

ভয়ে ভয়ে শমী বলল, আজ আমি ওর সঙ্গে খেলা করতে যাব না—

তার চকিত দৃষ্টি অনুসরণ করে জ্যোতিরাণী ফিরে তাকিয়ে ছেলেকে দেখলেন। ভুরু কুঁচকে ডাকলেন, ওখানে দাঁড়িয়ে কি কচ্ছিস, এখানে আয়।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও সিতু না এসে পারল না। খেলবে না শুনে মেজাজ আরো তেতেছে। বলল, না খেললি তো বয়ে গেল, মেয়েদের সঙ্গে আমি খেলি না।

জ্যোতিরাণী চোখ পাকালেন, ফের? আঙুল দিয়ে দেখালেন, দেখ্ তো কি করেছিস, এখন তো তবু সেরে গেছে। আবার যদি কিছু হয় তো রক্ষে রাখব না, শমী খুব ভালো মেয়ে, ওর সঙ্গে ভাব করবি, আর কক্ষনো ওকে কিছু বলবি না, মনে থাকবে?

মনের কথা মনই জানে। বলার ইচ্ছে কিছু নেই, হাত দুটো আরো বেশি নিশপিশ করছে। বাচ্চা ছেলেমেয়ের সঙ্গে মা যে এত ভালো ব্যবহার করতে পারে সিতুর জানা ছিল না। গল্প করল, আদর করে খাওয়ালো, তারপর এখন কিনা ওকে নিয়ে বেড়াতে বেরুনো হবে, নিজে হাতে মেয়েটার মাথা আঁচড়ে দিচ্ছে।

যাবি তো চল্, চট্ করে জামা জুতো পরে আয়।

যেন গেলেও হয়, না গেলেও হয়। যাবে না বলে দেওয়ারই ইচ্ছে ছিল সিতুর।

সেই জবাবই ঠোঁটে এসে গেছল। সামলে নিতে হল। বললে সাধাসাধি না করে চলেই যাবে হয়ত।

গাড়ি ছুটেছে। ওরা দুজনে দু'দিকে, মা মাঝখানে। মেয়েটার স্ফূর্তি দেখেও রাগ হচ্ছে সিতুর। ঝুঁকে ঝুঁকে দেখছে আর সতের বার করে জিজ্ঞাসা করছে এটা কি, ওটা কি। একটুও বিরক্ত না হয়ে মা দিব্যি জবাব দিচ্ছে। নিজে থেকেও আবার এটা-ওটা চিনিয়ে দিচ্ছে। গম্ভীর মুখে সিতু আর একদিকে সরে আছে। আরো বেশি রাগ হচ্ছে মেয়েটা যখন ঝুঁকে দুই-একবার তাকেও নিরীক্ষণ করছে। বাইরের ওইসবের মত সেও যেন দ্রষ্টব্য কিছু।

এই একদিন নয়, এক সপ্তাহের মধ্যে আরো দু'দিন মায়ের নির্দেশে স্কুল-ফেরত গাড়ি বেরুলো আর খানিক বাদে গাড়ি ফিরে আসতে শমীকে নামতে দেখা গেল। তারপর তেমনি আদর-যত্ন, খাওয়া-দাওয়া, নিজের হাতে মায়ের ওকে সাজগোজ করানো, শেষে বেড়াতে বেরুনো। মায়ের ওপর কেউ এত অনায়াসে এ-রকম অধিকার বিস্তার করতে পারে সিতুর কাছে সেটাই বড় রকমের বিস্ময়।

তৃতীয় দিনে আদুরে মেয়ের মুখখানা কেমন ভার-ভার দেখা গেল। সেটা শুধু সিতু নয়, জ্যোতিরাণীও লক্ষ্য করলেন। ঘন ঘন গাড়ি পাঠিয়ে ওকে নিয়ে আসার ফলে কেউ কিছু বলেছে কিনা সেই খটকা লাগল। হাল্কা সুরেই জিজ্ঞাসা করলেন, শমী বোসের মুখ শুকনো কেন আজ, কেউ কিছু বলেছে ?

মাথা নাড়ল অর্থাৎ কেউ কিছু বলেনি। শুকনো মুখের হেতু জানালো তারপর। আসার আগে কাকু বলে দিয়েছে, আজও বেড়িয়ে নাও, এর পর কদিন বাড়ির বার হওয়া বন্ধ।

বন্ধ কেন ?

কাকু যে পরশু আট-ন দিনের জন্য কোথায় চলে যাচ্ছে। তখন কি কেউ আমাকে আসতে দেবে ? কাকুও বাড়ি থাকবে না, তোমাকেও দেখতে পাব না, সমস্ত দিনরাত তো আমাকে একলাই থাকতে হবে।

বিষণ্ণমুখে হাসি টানার চেষ্টাটা কান্নার মত লাগল। জ্যোতিরাণী বলতে যাচ্ছিলেন, কাকু না থাকলেও গাড়ি পাঠিয়ে ওকে আনা হবে। বললেন না। বিভাসবাবুর অনুপস্থিতিতে আনতে পাঠানোটা বাড়ির লোকের অস্বস্তির কারণ হতেই পারে। কিন্তু ওইটুকু মেয়ের নিঃসঙ্গতার চিত্র মনে আসতে তাঁর নিজেরই মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ওর খাবার সাজাবার ফাঁকে কি করা যায় ভাবছেন।

...এই কদিনের মধ্যে আসা দূরে থাক, বিভাস দত্ত একটা টেলিফোনও

করেননি। অর্থাৎ তাঁর আহত মর্যাদা এখনো সুস্থ হয়নি। আগে দু'দিনের জন্যেও কোথাও বেরুলে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে খবরটা জানিয়েছেন। সাহিত্যিক হওয়ার ঝামেলার কথা বলেছেন, হুজুগ কিছু পেলেই হল, ধরে নিয়ে এসো গোটাকতক সাহিত্যিক! সভা-সমিতিতে যোগদানের ব্যাপারে সর্বদাই ভারী বিরক্ত মনে হয়েছে তাঁকে।...এবারে আট-ন দিনের জন্য বাইরে বেরুনোর খবরটাও প্রকারান্তরে মেয়েটার মারফৎ জানালেন বলেই জ্যোতিরাণীর ধারণা।

বিরক্তি বাড়ছে।...মেয়েটার ওপর তাঁর মায়া পড়েছে ভদ্রলোক সেটা ভালই বুঝেছেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে গাড়ি পাঠালে মেয়েটা যাতে আসতে পারে, টেলিফোনে সেই অনুরোধ করা হবে ধরে নিয়েছেন। আর ফাঁক পেয়ে তখন দুই-একটা টীকা-টিপ্পনী জুড়বেন তিনি।

কিন্তু মায়া যে মেয়েটার ওপর সত্যিই কতখানি পড়েছে, বিভাস দত্তও অনুমান করতে পারেন কিনা সন্দেহ। ওর কচিমুখে ডাগর-চোখে, মিষ্টি-মিষ্টি আধ-পাকা আধ-কাঁচা কথায়, এমন কি ওর হাসিখুশিতেও বুকের তলায় সর্বস্ব খোয়ানোর একটা বোবা যাতনা অনুভব করেন জ্যোতিরাণী। তবু তো কিছুই বোঝে না এখনো, কিছুই জানে না এখনো, কথায় কথায় ভোলে এখনো। বোঝে জানে আর ভুলতে পারে না—এরকম কত আছে ঠিক নেই। কাগজে তাদের কথা লেখা হচ্ছে। এইসব মেয়েদের জন্য কিছু একটা গড়ে তোলার কথা হয়েছিল মিত্রাদির সঙ্গে। কথাই হয়েছিল, তাগিদ কিছু অনুভব করেননি। এখন করছেন। কাছে আসার ফলে এই এক মেয়ের কচিমুখে অনেক মেয়ের নালিশ লেখা দেখেন এক-একসময়।

সামনে লোভনীয় খাবার দেখেও বিমর্ষ ভাবটা গেল না একেবারে। জ্যোতিরাণী লক্ষ্য করলেন একটু, তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, কাকু যে কদিন থাকবে না, আমার কাছে থাকতে ভালো লাগবে তোর?

এরকম প্রস্তাব কানে শুনলেও বিশ্বাস করা যায় কি? নীরব বিস্ময় প্রত্যাশার সেই কারিকুরি দেখে জ্যোতিরাণী হেসে ফেললেন।—কি হল?

কাকু দেবে? আশা দুরাশাই বুঝি।

ছোট্ট শমীর মন ভালো করতে হবে যখন, দেখা যাক। এখন খেয়ে নে তাড়াতাড়ি।

মায়ের প্রস্তাব শুনে সিতুও অবাক একটু। কোথা থেকে কে একটা মেয়ে এসে দিব্যি আদর কাড়ছে কদিন ধরে, এটা সে খুব প্রীতির চোখে দেখছে না। তার বেলায় তো কেবল শাসন। তবু মেয়েটা কদিন এখানে থাকবে শুনে খুব

খারাপ লাগল না যেন। এখানে থাকলে ধরে দুই-একটা ঝাঁকুনি-টাকুনি দেবার সুযোগ নিশ্চয় পাবে। মায়ের আদুরে বলেই ওকে তার দাপট বোঝানোর তাড়না বেশি।

বেড়াতে বেরিয়ে সিতুর মেজাজ ক্রমে চড়ছে। তাদের বাড়িতে থাকবে শোনার পর থেকেই মেয়ে যেন পাখা বার করে উড়ছে। গাড়িতে উঠেও সেই থেকে কলকল করছে, হাসছে-লাফাচ্ছে, ধুপ-ধুপ করে বসছে, আর মায়ের কোলের ওপরেই যেন গলে গলে পড়ছে এক-একবার। কবার দু'হাতে জড়িয়ে ধরল মাকে ঠিক নেই।

সহ্য করা দায় হল শেষ পর্যন্ত। মুখ বিকৃত করে সিতু ধমকে উঠল, এই মেয়ে, অমন আদেখলের মত করছিস কেন, ভালো হয়ে বসে থাকতে পারিস না?

থতমত খেয়ে শমী মাসিমার দিকে তাকালো, সত্যিই কিছু অন্যায় করে ফেলেছে কিনা বুঝছে না। ছেলের দিকে ফিরে জ্যোতিরাণী পাল্টা ধমক দিয়ে উঠলেন, এই! ও তোর কি করেছে?

বারবার ও তোমার গায়ের ওপর এসে পড়ছে কেন?

বিরাগের এই হেতু শোনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। সঙ্গে সঙ্গে কেন যেন সেদিন দুপুরের দৃশ্যটা মনে পড়ে গেল। ওকে ধরে এনে যেদিন নিজের কাছে শুইয়েছিলেন। ঘাড় ফিরিয়ে লক্ষ্য করলেন কয়েক মুহূর্ত।

গায়ের ওপর এসেছে তাতে কি হয়েছে, তোর ইচ্ছে করে তো তুইও আয় না?

বিরক্ত-মুখ করে ছেলে ওদিক ফিরে আরো বেশি ব্যবধান রচনা করতে চাইল। জ্যোতিরাণী দেখছেন। এটা যে রাগ আর ঈর্ষা তাও বুঝছেন। কিন্তু সেই দুপুরে ঈর্ষা করার কেউ ছিল না। দশ বছরের ছেলের এ কোন্ চেতনার প্রতিক্রিয়া তিনি ঠাওর করে উঠতে পারেন না।

ফেরার পথে সিতুকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে জ্যোতিরাণী আজ শমীর সঙ্গে চললেন। কেন, বুঝতে পেরে মেয়েটার খুশি ধরে না। আশা সত্ত্বেও ও একটু অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিল। এবারে প্রায় নিশ্চিন্ত। কাকুটি তার চোখে ব্যক্তিত্বের প্রতিমূর্তি। কিন্তু কাকুর কথার ওপরে কথাও দুনিয়ায় এই একজনেরই খাটে বলে তার বিশ্বাস।

বিভাসবাবুকে এ-সময় বাড়িতে পাবেন কিনা জ্যোতিরাণী জানেন না। না পেলে চিঠি লিখে আসবেন নাকি বাড়ি ফিরে টেলিফোন করবেন ভাবছিলেন। ঠিক কিছুই করলেন না, কেন যে মনে হল বাড়িতেই পাবেন ভদ্রলোককে, নিজের কাছেই সেটা স্পষ্ট নয় খুব।

গাড়িতে বসেই দেখতে পেলেন তাঁকে। তিনতলার রেলিং-এ ঝুঁকে রাস্তা দেখছেন। বাড়ির সামনে গাড়ির গতি মন্থর হবার আগেই সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। তারপর অদৃশ্য হলেন।

নীচে নেমে আসতে সময় লাগেনি তাঁর। এসেই বিমূঢ় একটু। দোরগোড়ায় শমী দাঁড়িয়ে। গাড়িটা এগিয়ে যাচ্ছে। গাম্ভীর্যটুকু আরো বেশি এঁটে বসতে যাচ্ছিল মুখে। কিন্তু না, চলে যাচ্ছে না, সামনের ওই বাঁক থেকে গাড়িটা ঘোরানো হচ্ছে।

এই মূর্তি দেখামাত্র ভিতরে ভিতরে কেন যে একটু কৌতুক বোধ করলেন জ্যোতিরাণী জানেন না। কিন্তু দু চোখ থেকে সেটা মুখ বা ঠোঁটের দিকে নামতে দিলেন না। গাড়ি আবার থামতে বিভাস দত্ত পায়ে পায়ে সামনে এগিয়ে এলেন। মাসিমার প্রস্তাবে কাকু কি বলে শোনার আগ্রহে শমী দাঁড়িয়ে তখনো।

জ্যোতিরাণী জিজ্ঞাসা করলেন, আজ আপনার এদিকে কাজ নেই কিছু? সেদিন কাজ ছিল এবং সঙ্গ নেওয়া হয়েছিল—

কটাক্ষটা করে ফেলে নিজেই অপ্রস্তুত একটু।

বিভাস দত্ত মাথা নাড়লেন, কাজ নেই।

জ্যোতিরাণী গাড়ির দরজা খুলে দিলেন, তাহলে বিনা কাজেই উঠুন।

আত্মমর্যাদায় আঁচড় পড়তে দেবেন না বলেই সহজ নির্লিপ্ত মুখ বিভাস দত্তর। —কোথায়?

দুই ভুরুর মাঝখানটা কাঁপল একবার। আর সেই সঙ্গে বিদিকিচ্ছিরি জবাবও একটা মুখে এসে গেছল। বলতে যাচ্ছিলেন, জাহান্নমে, আপত্তি আছে? সামলে নিয়ে বললেন, আসুন, দেখা যাক—

ঝুঁকে হাত নেড়ে জ্যোতিরাণী শমীকে আশ্বাস দিলেন এবং তাকে ভিতরে যেতে ইশারা করলেন। গাড়ি একটু এগোতে পাশের দিকে ফিরলেন।—আপনার মাথা তাহলে এখনো ঠাণ্ডা হয়নি?

বিভাস দত্ত জবাব দিলেন, আমরা সামান্য লেখক, লিখে জীবনধারণ করতে হয়, মাথা ঠাণ্ডা না রাখলে চলে না।

সামান্য লেখকদের মাথা আমরা পাঠক-পাঠিকারাই বিগড়ে দিয়েছি, খাতির পেতে পেতে আপনাদের মান বাতাসে নড়ে।

আপনার মত পাঠিকার খাতির পেলে নড়ে বটে, কিন্তু খাতির পায় ভাবে যে সে নেহাৎ বোকা।

লেখক ভালো, জবাবও বুদ্ধিমানের মতই দিয়েছেন মনে মনে স্বীকার করতে হল। ভ্রূকুটি করেও জ্যোতিরাণী হেসেই ফেললেন, আপনাকে মশাই কবে খাতির

না করেছি শুনি ?

মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন বিভাস দত্তও।—যাক, এখন কি ধরনের খাতির করার জন্য গাড়িতে তুললেন বলুন।

খাতির-টাতির না, আজ ঝগড়া করব বলে আপনাকে গাড়িতে তুলেছি।

সেটা কিছুটা স্বাভাবিক হবে, শুরু করুন।

কিছু বলার আগে বক্রদৃষ্টিতে আবারো মুখখানা দেখে নিলেন একবার। আলাপ রসালাপের মতই বটে কিন্তু ভদ্রলোকের ভিতর-বার একরকম লাগছে না।

ওই বাচ্চা মেয়েটাকে রেখে আপনি আট-ন দিনের জন্য কোথায় যাচ্ছেন শুনলাম ?

সেটা কোন্ পর্যায়ের অপরাধ ঠিক বোঝা গেল না।

বোঝা ঠিকই গেছে জ্যোতিরাণী জানেন, মেয়েটার টানেই তাঁর আসা না বুঝলে অন্য স্বর শুনতেন।—আপনি যাচ্ছেন কোথায় ?

প্রথমে বর্ধমান। সেখান থেকে পাটনা।

হঠাৎ ?

পাটনায় সাহিত্য কনফারেন্স, যাবার জন্য ধরেছে।

শমীকে সঙ্গে নিচ্ছেন না কেন, এখানে আপনাকে ছাড়া আর কাকে চেনে ? এখন থেকেই মেয়েটার মুখ শুকনো দেখলাম, ওর কষ্ট হবে খুব।

এখন থেকে এইটুকু কষ্টও ওকে সইয়ে না দিতে দিলে ওর ওপরেই অবিচার করা হবে বোধ হয়।

শুনতে ভালো লাগল না জ্যোতিরাণীর। মনে হল মেয়েটার দিক চেয়ে নয়, তাঁকে জব্দ করার জন্যেই এভাবে বলা। বিয়ের পর থেকে একটানা এগারোটা বছর ঘরের একজনের সঙ্গে অবিরাম যোঝাযুঝির ফলে যে সত্তাবোধ সজাগ সর্বদা, অমনঃপূত সঙ্গত উক্তিও অনেক সময় বরদাস্ত করা সহজ হয় তার পক্ষে। এদিক থেকে স্বভাব কতটা বদলেছে, সে সম্বন্ধে জ্যোতিরাণী নিজেও সচেতন নন তেমন। ঈষৎ বিরক্তির সুরেই বললেন, থাক, ওই সাত বছরের মেয়েকে আপনার আর কষ্টের মাহাত্ম্য বোঝাতে হবে না, কষ্ট কি জিনিস সেটা পাঁচ মিনিট একলা থাকলেই ও টের পায়। শুনুন, ওকে আমি বলে দিয়েছি এই আট-ন দিন ও আমার কাছে থাকবে। আপনি পরশু কখন যাচ্ছেন ?

বিভাস দত্ত থমকালেন একটু। গাড়ি পাঠিয়ে সমীকে আনা-নেওয়ার প্রস্তাবটাই আসবে ধরে নিয়েছিলেন, এতটা আশা করেননি। দুই-এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ঠাণ্ডা জবাব দিলেন, বেলা তিনটের পর গাড়ি।

জ্যোতিরাণী চুপচাপ ভাবলেন কি, তারপর বললেন, আপনি চলে যাবার পর ওকে আনতে পাঠাতে ভালো লাগছে না, পরশু আপনার সঙ্গে ওকেও রেডি রাখবেন, একসঙ্গে বেরুব, স্টেশনে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে ওকে নিয়ে আমি বাড়ি ফিরব, মেয়েটা আরো খুশি হবে'খন—

খুশি আরো কেউ হবে আশা করেই জ্যোতিরাণী এদিকে ফিরেছিলেন, কিন্তু উল্টে ভদ্রলোককে হঠাৎ যেন গম্ভীর মনে হল। বললেন, ব্যবস্থাটা আপনার খুব পছন্দ হল না যেন ?

বলেই যখন দিয়েছেন ওকে, ব্যবস্থা আর অপছন্দ হবে কেন!

শোনামাত্র চাউনি খরখরে হয়ে উঠল, বলে না দিলে আপনি আপত্তি করতেন ?

এবার তাঁর দিকে ফিরে বিভাস দত্ত হাসলেন একটু, এই সামান্য কথায় আপনার রাগ হচ্ছে কেন ?

খুব সামান্য মনে হচ্ছে না বলে। আপনার বাড়িতে কারো আপত্তি হবে ?

না, তাদের ঝামেলা বাঁচবে।

তাহলে ?

অনেকটা নির্লিপ্ত মুখ করে বিভাস দত্ত জবাব দিলেন, মেয়েটা আপনার স্নেহ পেয়েছে সেটা ওর যেমন ভাগ্য আমারও তেমনি আনন্দের কথা। আপনার কাছে থাকলে ও ভালো থাকবে, আমিও কটা দিন নিশ্চিন্ত থাকতে পারব।...তবু ওর ভবিষ্যৎ ভেবেই আমার অস্বস্তি হয়। গত এক সপ্তাহের মধ্যে তিন দিন আপনার গাড়ি এসে ওকে নিয়ে গেছে, তার ফলে বাকি চার দিনও ও আশা করেছে গাড়ি আসতে পারে—গাড়ির হর্ন কানে এলেই দৌড়ে গিয়ে রেলিং-এ ঝুঁকেছে। শুধু বেড়ানো নয়, আপনার ওখানে যে-রকম খাওয়া-দাওয়া করে আসে, বাড়িতে সে-রকম জোটে না, জুটলেও ততোটা রোচে না। তারপর আপনি দুটো দামী জামা কিনে দিয়েছেন ওকে, মনের আনন্দে ও দুটো নিয়েই নাড়াচাড়া করে, যা আছে তার দিকে তাকায় না। একটা বাচ্চা মেয়ের কাছে এই টানগুলো সবই খুব স্বাভাবিক। কিন্তু বরাত যাকে এত বড় দুর্ভাগ্যের দিকে ঠেলে দিয়েছে, তার পক্ষে একটু-আধটু বঞ্চনার মধ্যে থেকে অভ্যস্ত হওয়াই ভালো, হাত বাড়ালেই খুশির নাগাল পাবে সেটা ঠিক নয় বোধ হয়।

কানের কাছটা একটু একটু করে লাল হচ্ছে জ্যোতিরাণীর। নির্বাক খানিকক্ষণ।...কথাগুলো তাঁকে শোনাবার জন্য ভদ্রলোক প্রস্তুত হয়েই ছিলেন বোধ হয়। শমীকে বাড়িতে এনে রাখার বদলে গাড়ি পাঠিয়ে এমনি মাঝে-মাঝে

ওকে আনার প্রস্তাব করলেও এই কথাগুলোই বলতেন হয়ত। কিন্তু বললেন যা, যুক্তির দিক থেকে তার প্রতিটি অক্ষর অকরুণ সত্যি বলেই আরো বেশি খারাপ লাগছে। মেয়েটার হাসি-খুশি আদুরে মুখখানা কিছুতে যেন চোখের সামনে থেকে সরাতে পারছেন না তিনি!···খুশি হলে আনন্দে দু হাতে জাপটে ধরে, অভিমান হলে কোলে মুখ গোঁজে। দেশে বাবার কথা, দাদাদের কথা মনে পড়লে অভিমানে ঠোঁট ফোলে মেয়েটার, আর সকলের কাছে হয়ত সামলাতে চেষ্টা করে কিন্তু তার নতুন-পাওয়া মাসিমার কোলে মুখ গুঁজে দেয়। বুকের ভেতরটা টন-টন করতে লাগল জ্যোতিরাণীর, ফলে যুক্তি ছাড়িয়ে রাগটাই চড়তে লাগল।

থাক তাহলে, আমার কাছে থেকে কাজ নেই। ওকে বলে দেবেন।

এই উক্তি আশা করেননি বিভাস দত্ত। গম্ভীরমুখেই জবাব দিলেন, এখন সেটা বললে ওর লাগবে।

লাগলেই বা, দুর্ভাগ্যের জন্য এখন থেকেই আরো ভালো করে তৈরি হোক।

ঘাড় ফিরিয়ে বিভাস দত্ত তাকালেন দুই-একবার। সিগারেটের খোঁজে পকেট হাতড়ালেন, প্যাকেট হাতে এলো। চাপা হাসিটুকু ঠোঁটের এ-ধারে স্পষ্ট হতে দিলেন না। এই উষ্মার আড়ালে রমণী-হৃদয়ের আর একটা রূপ চোখে পড়বে না তেমন সাহিত্যিক নন তিনি। বললেন, এটা তো আপনার রাগের কথা, সত্যিই অন্যায় কিছু বলা হয়েছে কিনা ভেবে দেখুন।

বলা হয়েছে। তেমনি তেতে উঠেই জ্যোতিরাণী ফিরলেন তাঁর দিকে, ওইটুকু মেয়ে, আপনার কাছে এসে পড়েছে যখন—হাত বাড়ালে খুশির নাগাল পাবে না-ই বা কেন? কেন ওকে এর পরেও শুধু দুর্ভাগ্যের জন্যই তৈরি হতে হবে? আপনারই বা আর কে আছে যে এই একটা মেয়েকেও ভালোভাবে মানুষ করতে পারবেন না?

চট করে মুখ খুললেন না বিভাস দত্ত। সিগারেট ধরাবার ফাঁকে হাসছেন মিটিমিটি। কিছু একটা তুষ্টির কারণ ঘটেছে যেন। বাইরের দিকে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে শেষে বললেন, কেউ নেই বটে। আচ্ছা, চেষ্টা করব···।

নিজের অগোচরে জ্যোতিরাণীর দু চোখ তাঁর মুখের ওপর থমকালো হঠাৎ। চুপ তারপর। ভিতরে অজ্ঞাত অস্বস্তি কি একটা।

হৃষ্টমুখে বিভাস দত্ত নেমে গেলেন এক জায়গায়। জ্যোতিরাণী ভেবেছিলেন, গাড়ি ঘুরিয়ে আবার তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দেবেন। বলা হল না। নেমে যাওয়ার সময় আড়চোখে একবার দেখলেন শুধু।

নীরব অস্বস্তি বাড়তেই থাকল। শুধু অস্বস্তি নয়, রাগই হতে থাকল নিজের

ওপর।...স্বভাবই খারাপ হয়ে যাচ্ছে তাঁর, নইলে সাত-পাঁচ না ভেবে যা মুখে আসে, বলে বসেন কেন। এতকালের হৃদ্যতার মধ্যে দেয়ালের সেই ফোটো নিয়ে এক সপ্তাহ ধরে ভদ্রলোক যে মান-অভিমানের ব্যাপারটা স্পষ্ট করে তুলছিলেন, ভিতরে ভিতরে তাইতেই তিনি অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছিলেন। আজ নেমে যাওয়ার সময়েও হৃষ্টমুখ কেন দেখলেন, তা-ও অনুমান করতে পারেন জ্যোতিরাণী।...রাগের মাথায় একটু আগে যা তাঁকে বলা হয়েছে, সেই উক্তিই প্রসন্নতার কারণ। বলা হয়েছে, তাঁরই বা আর কে আছে যে একটা মেয়েকেও ভালভাবে মানুষ করতে পারবেন না।...ভদ্রলোকের বয়েস মাত্র তেত্রিশ-চৌত্রিশ—কেউ না থাকার সময় একেবারে ফুরিয়ে যায়নি। কেউ আসতে অনায়াসেই পারে। কিন্তু আসবে যে না, কেন আসবে না—সেটা জ্যোতিরাণীও জানেন বলেই ধরে নিলেন ভদ্রলোক, নইলে রাগ হোক আর যাই হোক, কেউ না থাকার কথাটা এত জোর দিয়ে বলা হল কি করে?

সবে সন্ধ্যা, দিনের শেষ আলো মুছে যায়নি তখনো। বাড়ি ফিরেই নিজে ঘরে ঢুকেছিলেন, বিরক্তিকর অন্যমনস্কতা ঝেড়ে ফেলে দরজার দিকে পা বাড়িয়েছিলেন জ্যোতিরাণী। দাঁড়িয়ে গেলেন। চৌকাঠের ওধারে মেঘনা। কিছু বলতে এসেছে হয়ত, কিন্তু বলা হল না, হাসির দমকে মোটা শরীর বশে রাখা শক্ত হল। হাসতে হাসতে মাটিতে বসে পড়ল মেঘনা, স্রস্ত আঁচলটা মুখে চেপে হাসি সামলাতে চেষ্টা করল।

জ্যোতিরাণী বললেন, হেসে মরলি যে একেবারে, কি হয়েছে?

কি ছেলে গো তোমার বউদিমণি! বাবারে বাবা, এইটুকু ছেলে কি পাকা কি পাকা—! আবার হাসি।

অত হাসির হেতু ছেলে শুনেই জ্যোতিরাণীর মুখে বিরক্তির ছায়া পড়েছে।—কি করেছে?

কিছু করেনি, ছোট-মনিব আমাকে শাসন করেছে। মেজাজ-পত্র ভালো থাকলে সিতুকে ছোট-মনিব বলে তোয়াজ করে মেঘনা। কোন রকমে হাসি সামলে শাসনের সার ব্যক্ত করল। গরম লাগতে মেঘনা নীচে স্নানের ঘরে ঢুকেছিল। তখন শামু খবর দিল, তার বড় ছেলে ডাকছে, বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলে আসবে জানাই ছিল মেঘনার, কটা টাকার দরকার পড়েছিল তার। স্নান সারতে দেরি হবে বলে মেঘনা আগেই বেরিয়ে এসে ওপর থেকে টাকা এনে ছেলেকে দিয়ে আর তার সঙ্গে দুটো ভালো-মন্দ কথা বলে যেই ভিতরে পা দিয়েছে, অমনি ছোট-মনিবের মারমূর্তি একেবারে। বলেছে, উল্টোদিকের গলিতে নীলিদি দাঁড়িয়ে ছিল,

ছেলে তো এতক্ষণ দু চোখ দিয়ে ড্যাব-ড্যাব করে গিলেছিল তাকে, আবার তোমার এভাবে বাইরে আসতে লজ্জা করে না ধুমসি কোথাকারের। গায়ে একটা জামা পর্যন্ত নেই—লোকে দেখলে খুব ভালো লাগবে, না ?

আর একপ্রস্থ হেসে গড়ানো হল না মেঘনার, বউদিমণির মুখখানা হঠাৎ কি রকম যেন হয়ে গেল।

নিজের অগোচরে জ্যোতিরাণীর দু চোখ মেঘনার আদুড়-গায়ে আঁচল-জড়ানো থলথলে বুকের দিকে নেমে এলো একবার। ও চলে যাবার পরেও নিস্পন্দের মত দাঁড়িয়ে রইলেন খানিক। পায়ের দিকটা অবশ লাগছে।···দশ বছর মাত্র বয়েস ভেবে যে অস্বস্তিটা এ পর্যন্ত বারকয়েক মনের তলায় রেখাপাত করেও করেনি, অসম্ভব আর হাস্যকর ভেবে কাটিয়ে ওঠা গেছে—আজ এই সন্ধ্যায় সেটাই বুঝি আচমকা ঘা বসিয়েছে একটা।

কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন ঠিক নেই। বারান্দা ধরে এগোলেন। ওধারে কালীদার ঘর থেকে ছেলের পড়ার আওয়াজ কানে আসছে। রাতে ওই ঘরেই তার পড়ার ব্যবস্থা। পায়ে পায়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন জ্যোতিরাণী।

আলোর দিকে মুখ করে পরিপুষ্ট গলা ছেড়ে দুলে দুলে পড়ছে, গড্ ইজ্ গুড্ অ্যাণ্ড্ গড্ ইজ কাইণ্ড্···

জ্যোতিরাণী চেয়ে আছেন। দেখছেন।

॥ কুড়ি ॥

বর্ধমানের গাড়ি কখন ছেড়ে চলে গেল বিভাস দত্ত বা জ্যোতিরাণী কারোই হুঁশ নেই।

স্টেশনে আসার খানিকক্ষণের মধ্যে যে ব্যাপারটা ঘটে গেল, বিভাস দত্ত তার দায় সামলাতে ব্যস্ত। আর ঘটনার নগ্নতায় জ্যোতিরাণী এমনই হতচকিত বিমূঢ় যে, ট্রেন চোখের ওপর দিয়ে ছেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও তিনি খেয়াল করলেন না। তাঁর হাতের মুঠোয় শমীর হাতখানা শক্ত করে ধরা। মেয়েটাও কাঁপছে।

ট্যাক্সি থেকে নামার আগে পর্যন্ত জ্যোতিরাণী মোটামুটি গম্ভীর ছিলেন। মাঝের একটা দিন তাঁকে কিছু ভাবতে হয়েছে। ভাবনার বেশির ভাগই ছেলেকে নিয়ে। কিন্তু তার মধ্যে এই ভদ্রলোকও একেবারে অনুপস্থিত ছিলেন না। থেকে থেকে প্রায় অলক্ষ্য একটা জটিলতার ছায়া দেখছেন। সেটা তাঁর না

হোক, এই ভদ্রলোকের দুঃখের কারণ হতে পারে। তাঁর আলমারির ওপর খৈয়ামে নিজের ফোটো দেখার পর থেকে অবাঞ্ছিত চিন্তাটা মাথায় আনাগোনা করছে। …দেয়ালে টাঙানো ছবির প্রসঙ্গও না তোলাই ভালো ছিল বুঝি। মানুষ দুর্বলতা গোপন করতেই চায়, কিন্তু সেটা ধরা পড়লে অনেক সময় তার জোর বাড়ে, সঙ্কোচ কাটে। পরন্তু গাড়িতে বসে ভদ্রলোকের এই গোছের একটু পরিবর্তনই তিনি অনুভব করেছিলেন। বিশেষ করে জ্যোতিরাণীর সেই উক্তির পর—শমী ছাড়া আর তাঁর কে আছে বলে ঝাঁঝিয়ে ওঠার পর। বিভাস দত্তর পরিতুষ্ট মুখ দেখেছিলেন, প্রসন্ন স্বীকৃতি শুনেছিলেন। দুর্বলতা ধরা পড়ার দরুন আর যেন কোনো খেদ ছিল না।

গাড়িতে বসে জ্যোতিরাণী টুকটাক দুই-এক কথার জবাব দিচ্ছিলেন শুধু। শমীর প্রতি বরং বেশি মনোযোগী দেখা গেছে তাঁকে। বিভাস দত্ত সেটা লক্ষ্য করেছেন। স্টেশনে পা দিয়েই বক্রোক্তির সুযোগ পেলেন। বললেন, দুর্গত মেয়েদের ভালো করার ব্যাপারে মৈত্রেয়ী দেবীর সঙ্গে আপনার কি যেন আলোচনা শুনেছিলাম একদিন, তা শুধু পদ্মার শোকটাই ভালো করে চোখ চেয়ে দেখে নিন একবার।

জ্যোতিরাণী দেখতে চাননি, তবু চোখে আপনিই পড়েছে। যেদিকে চোখ ফেরান নরকই বটে। দম বন্ধ হবার মতই নরক। স্বাধীনতার প্রথম অঙ্কের এ-দৃশ্য কল্পনা করা যায় না।

বাইরের আমন্ত্র.। যাচ্ছেন বলেই বিভাস দত্ত নি-খরচায় প্রথম শ্রেণীর যাত্রী। নিজের টিকেট কাটা ছিল, আর দুটো প্ল্যাটফরম টিকেট কেটে ভিতরে ঢোকা হল।

দেশ ছেড়ে পালিয়ে আসার সেটা প্রথম হিড়িক। প্ল্যাটফরমের ভিতরেও আশ্রিতের সংখ্যা একেবারে কম নয়। খানিক দূরে দূরে সংসার পেতে বসে গেছে। কোনোদিকে না তাকাতেই চেষ্টা করলেন জ্যোতিরাণী। অনেকটা এগিয়ে ফাঁকা জায়গায় এসে হাঁফ ফেললেন।

ফাঁকা বলতে একেবারে ফাঁকা নয়। দশ-বিশ গজ দূরে দূরে এখানেও কয়েকদল শরণার্থী আস্তানা নিয়েছে। যাত্রীও আছে হয়ত, গাড়ির অপেক্ষায় বসে আছে।

এইখানে দাঁড়াবার পরেই আট-দশ গজ দূরে সামনের ওই মেয়েটার দিকে চোখ গেছল জ্যোতিরাণীর। মেয়েটির থেকে দু-তিন হাত দূরে শৌখিন গোছের একটি লোক দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে—পরনে ধোপদুরস্ত পাজামা-পাঞ্জাবি, হাতে সোনার ঘড়ি, জামায় সোনার বোতাম, চোখে সোনালী ফ্রেমের চশমা। লোকটা

সিগারেট টানছে আর মাঝে মাঝে মেয়েটির দিকে ফিরে মিটি-মিটি হাসছে।

এই হাসি আর তার জবাবে মেয়েটির কঠিন হাবভাব লক্ষ্য করেই জ্যোতিরাণীর কৌতূহল, মাঝে মাঝে ফিরে তাকাচ্ছেন তিনিও।

এই দুজনকে যাত্রী বলেই ধরে নিয়েছিলেন। মেয়েটি একটা মাদুর পেতে বসে আছে, পাশে ছোট তোরঙ্গ একটা আর টুকিটাকি কিছু সরঞ্জাম। হয়ত দূরের কোনো গাড়ি ধরবে তাই এভাবে বসে আছে। মেয়েটি বিবাহিতা, মাথায় খাটো ঘোমটা, কপালে বড়সড় জ্বলজ্বলে সিঁদুরের টিপ। বছর একুশ-বাইশ হবে বয়েস। এক পিঠ খোলা লালচে চুল। কিন্তু সঙ্গের লোকটির তুলনায় তার বেশবাস বড় বেশি সাদামাটা। পরনের শাড়িটা ফরসা হলেও পাট-ভাঙা নয়, গায়ের জামাটা ফিকে-গোলাপী বলেই হয়ত ময়লা বোঝা যায় না। হাতে দুগাছি সরু রুলি আর শাঁখা, গলায় খুব সরু হার একছড়া, কানে কিছু নেই।

রীতিমত সুশ্রী বলা চলে বউটিকে, কিন্তু যে-কারণেই হোক সঙ্গের লোকটির প্রতি ভয়ানক ক্রুদ্ধ। ভালো করে লক্ষ্য করতে একটু যেন অস্বাভাবিক লাগল জ্যোতিরাণীর। অমন সুশ্রী মুখে কমনীয়তার চিহ্নমাত্র নেই, ধারালো কঠিন। স্তব্ধ মূর্তির মতই বসে আছে আর সঙ্গের লোকটির দিকে তাকাচ্ছে এক-একবার। চাউনিটা শুধু খরখরে নয়, কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত মনে হল জ্যোতিরাণীর। বউটি তাঁকেও দেখল হঠাৎ, তারপর লক্ষ্য করছেন বুঝেই হয়ত তাকালো দুই-একবার।

কিন্তু লোকটির হাবভাব দেখে জ্যোতিরাণীর তখনো ধারণা ওদের মধ্যে শক্ত-গোছের রাগ-বিরাগের পালা চলেছে কিছু। বউটির নির্বাক ক্ষোভ যত বেশি স্পষ্ট, লোকটির হাসি-হাসি মুখে ততো বেশি আপসের অভিলাষ। তার চোখের ইঙ্গিতে দুই-একবার অনুনয়ের আভাসও দেখলেন মনে হল।

বিভাস দত্ত তাঁকে শুনিয়ে শমীকে এটা-সেটা বলছেন। ভালো হয়ে থাকার উপদেশ দিচ্ছেন, এটা-ওটা দেখাচ্ছেন। জ্যোতিরাণীর সেদিকে কান নেই, মনও নেই। সামনের দৃশ্যের আরো একটু পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন। পাজামা-পরা আরো দুটো লোক এসে দাঁড়ালো শৌখিন লোকটির সামনে। তিনজনে কথাবার্তা কইতে লাগল। তীব্র তীক্ষ্ণ চোখে বউটি চেয়ে আছে তাদের দিকে। দৃষ্টিটা জ্যোতিরাণীর দিকে ফিরল। তাঁকেও বিশেষভাবে লক্ষ্য করার দরকার হল কেন বুঝলেন না। চাউনি দেখে বউটির মাথায় কিছু গণ্ডগোল আছে কিনা সেই সংশয়ও মনে উঁকিঝুঁকি দিল।

সঙ্গের লোক দুটো চলে গেল। যাবার আগে ঠোঁটে হাসি চেপে বউটির দিকে একটা বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করে গেল দুজনেই।

তফাতে দাঁড়িয়ে আপস সম্ভব হল না বলেই হয়ত সিগারেট ফেলে হাসি-হাসি মুখে লোকটি এগিয়ে এসে ছোট তোরঙ্গটার ওপরে বসল। আর সরাসরি তাকানোটা শোভন নয় বলেই জ্যোতিরাণী অন্যদিকে মুখ ফেরালেন।

কিন্তু পরক্ষণে আঁতকে উঠলেন একেবারে। শুধু তিনি নয়, বিভাস দত্ত আর শমীও। এদিক-ওদিকের আরো অনেকে।

বউটি হঠাৎ বাঘিনীর মতই ঝাঁপিয়ে পড়েছে লোকটার ওপর। ছিঁড়ে খাবে বুঝি। ক্ষিপ্ত আক্রোশে দু হাতে তার পালিশ-করা চুলের গোছা ধরে ঝুলে পড়েছে। চোখের পলক পড়তে না পড়তে কৌটোজাতীয় কি একটা কঠিন পদার্থ তুলে নিয়ে তার মাথায় নাকে চোখে মুখে মেরে চলল পাগলের মত। লোকটা উঠতে চেষ্টা করেও পারছে না। এক হাতে চুলের গোছা ধরা, উদ্‌ভ্রান্ত আক্রোশে দেহের সমস্ত শক্তি দিয়েই বুঝি এই আক্রমণ।

বিভাস দত্ত এগিয়ে এলেন, শমীর হাত ধরে নিজের অগোচরে জ্যোতিরাণীও দু পা এগিয়েছেন। কিন্তু তার আগেই এধার-ওধারের অনেক লোক দৌড়ে এলো। পাজামা পরা সেই বাকি দুজন লোকও ছুটে এসেছে। বিপর্যস্ত লোকটাকে তারাই টেনেটুনে উদ্ধার করছে। লোকটা দাঁড়াতে দেখা গেল, চোখের সোনালী ফ্রেমের চশমাটা কোথায় ঠিকরে পড়েছে, নাকমুখ ফেটে রক্ত ঝরছে। আর বউটির পাগলের মূর্তি, রক্তবর্ণ মুখ, দু চোখ জলছে ধক-ধক করে।

আহত মানুষটাকে আড়াল করে সঙ্গের সেই লোক দুটোর একজন তার দিকে চেয়ে চাপা গর্জন করে উঠল, একেবারেই মাথা খারাপ হয়েছে! মাথাটা একেবারে গেছে, অ্যাঁ? অপরজনও সঙ্গে সঙ্গে ভিড় সরাবার চেষ্টা করে বলে উঠল, দয়া করে সরে যান মশাইরা, দেখছেন কি, বুঝতেই তো পারছেন, আমরা চিনি এদের, আমরাই যাহোক ব্যবস্থা করছি—

ত্রস্ত হরিণের দৃষ্টি বউটির চোখে। এদিক ওদিক চেয়ে চকিতে প্রায় ছুটে এসে জ্যোতিরাণীর হাত ধরল। তারপরেই সামনের বিমূঢ় ভিড়ের দিকে চেয়ে ঝলসে উঠল, মিথ্যে কথা! ওই পাজী লোকটা সকাল থেকে আমার পিছনে লেগে আছে, সকাল থেকে আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে লোভ দেখাচ্ছে, আমাদের মত দেশ-ছাড়া ভদ্রঘরের মেয়েদের জন্যেই ওরা সেবার আশ্রম খুলেছে বলেছে, আর যাইনি বলে শেষে আমার ওই তোরঙ্গের ওপর বসে পকেট থেকে নোট বার করে হাত টেনে গুঁজে দিতে চেয়েছে!

মার-খাওয়া লোকটা আর তার পরিচিত দুজন না-না না-না করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে অন্যদেরও উত্তেজিত কণ্ঠস্বর চড়তে লাগল। তাদের মধ্যে উদ্বাস্তু আছে,

যাত্রী আছে, এমনি দর্শকও আছে। সকলের গলা ছাপিয়ে একজন মাঝবয়সী লোকের উত্তেজিত কথা শোনা গেল।—ওই বউটির ওপাশেই তো আমি আছি দু'দিন ধরে, এক মরণাপন্ন বুড়োকে নিয়ে কাল একে গাড়ি থেকে নামতে দেখেছি, আজ সকালে বুড়োটা মরে যেতে সৎকার সমিতির লোক তুলে নিয়ে গেছে—আর তারপর থেকেই এই লোকটাকে বউটার কাছে কাছে দেখছি, তার আগে দেখিনি। জনতাকবলিত আহত লোকটাকে দেখিয়ে আবার বলল, পাছে কি ভাবি সেজন্য আমাকে দামী সিগারেট খাইয়ে আমার সঙ্গেও আলাপ করেছে, বলেছে, দেশের চেনা-জানা ঘরের বউ বিপাকে পড়ে চলে এসেছে, কলকাতায় পা দিয়েই অসুস্থ শ্বশুরটাও মরে গেল—ভালো একটা ব্যবস্থা করতে পারলেই একে নিয়ে যাবে, ওই বয়সের মেয়ের ভালো আশ্রয় পাওয়াও তো সহজ কথা নয়।

মুখের কথা ফুরোতে না ফুরোতে জনতার ভিতর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল কারা। হট্টগোল চিৎকার চেঁচামেচি প্রহার আর্তনাদ। মূল অপরাধীর সঙ্গী দুজনের একজন মার খেতে খেতেই ভিড়ের ফাঁকে পালালো কেমন করে। মারের চোটে বাকি দুজন মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। আক্রোশ তবু মেটে না।

আশ্চর্য, পুলিস আসেনি এখনো। লোক দুটোকে আটকাতে বলে দ্রুত পুলিসের খোঁজে চলে গেলেন বিভাস দত্ত।

প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে সর্বাঙ্গের স্নায়ুগুলি বুঝি অসাড় হয়ে গেছল জ্যোতিরাণীর। এক হাতে শমীকে ধরে আছেন, শমী কাঁপছে থরথর। আর এক হাত এই অচেনা বউটি ধরে আছে। ধরে যে আছে, তারও হুঁশ নেই।

হুঁশ ফিরল। ক্লান্ত অস্বাভাবিক দুটো চোখ জ্যোতিরাণীর মুখের ওপর স্থির হল।···ভেঙ্গে পড়ার মত শুধু একটু অবলম্বন খুঁজছে বুঝি, তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু চেহারা দেখে হোক, বেশবাস দেখে হোক, বা যে-কারণেই হোক এ অবলম্বন কাছের মনে হল না হয়ত। হাত ছেড়ে দিল। তারপরেও চেয়েই রইল।

অব্যক্ত নীরব স্বল্প কয়েক মুহূর্তের এই দৃষ্টির গভীরে কি যে দেখলেন জ্যোতিরাণী জানেন না। বিষাদের সমুদ্র দেখলেন আর যাতনা দেখলেন আর ক্ষোভ দেখলেন আর অসহায় বাঁচার তাড়না দেখলেন। বউটির হাত ছেড়ে দিয়েছিল, কিন্তু এবারে জ্যোতিরাণী তার হাত ধরলেন। মৃদু সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলেন, ভয় নেই, ভয় কি···

সামনের জনতার অনেকেরই লক্ষ্য এখন এই দুজনের দিকে। কিন্তু জ্যোতিরাণীর চোখের সামনে এই একখানি মুখ ছাড়া আর সবই মুছে গেছে।

বউটির চোখের সেই উদ্‌ভ্রান্ত খরখরে দৃষ্টি বদলাচ্ছে, সামান্য দুটো কথার স্পর্শে একটা উদ্‌গত অনুভূতি চোখের পাতায় বাষ্প হয়ে ঠেলে উঠেছে, হাতের মধ্যে হাতখানা কেঁপে কেঁপে উঠেছে বার-দুই। কিন্তু বাষ্প জল হয়ে গড়াতে দিল না সে, উদ্‌গত অনুভূতিটাও নিষ্পেষণ করল। দু চোখ জ্যোতিরাণীর মুখের ওপরে স্থির হল আবার। প্রায় শোনা যায় না এমন গলায় নিজের মনেই যেন বলল, সবদিকের এত কুৎসিতের মধ্যে আপনাকে বড় সুন্দর লাগছে। গলার স্বর ভাঙছে, কিন্তু ভাঙতে দিতে চায় না বলেই আরো অস্পষ্ট শোনালো পরের কথাগুলো।··· সকালে শ্বশুর চোখ বুজল, কারা নিয়ে গেলো···কি করল···এই লোকটার ভয়ে আমি সঙ্গে যেতে পারলাম না।···সঙ্গে সামান্য কিছু টাকা আছে, তবু একটু আশ্রয়ের খোঁজে ভয়ে আমি সমস্ত দিনের মধ্যে এখান থেকে নড়তে পারলাম না ···বাঁচার জন্যে এ আমরা কোথায় মরতে এলাম দিদি! কেন এলাম?

শোনা যায় না প্রায়, কিন্তু তবু কানের পর্দা বুঝি ছিঁড়েখুঁড়ে যাবে জ্যোতিরাণীর। নীরব, বোবা তিনি।

একজন রেল-পুলিস অফিসার আর জনতিনেক কন্সটেবল সঙ্গে করে ফিরলেন বিভাস দত্ত। ভিড় সরে গেল। দুজন কন্সটেবল আসামী দুজনকে মাটি থেকে টেনে তুলল হিড়হিড় করে। মুমূর্ষুর মত ধুঁকছে তারা। রক্তে জামা-পাজামা লাল, নাক-মুখ ফেটে রক্ত ঝরছে। মূল আসামী অর্থাৎ সেই শৌখিন লোকটার অবস্থা আরো কাহিল, মুখের দিকে তাকালে শিউরে ওঠার কথা। কিন্তু জ্যোতিরাণী শিউরে উঠলেন না, নিষ্পলক তাকিয়ে দেখলেন তাকে।

অফিসারটি এদিকে এগিয়ে এলো। এ-রকম সুরূপা সম্ভ্রান্ত একজন মহিলাকে দুর্গত মেয়েটির হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মুখে বিস্ময়ের আঁচড় পড়ল দুই-একটা। নীরবে তারপর বউটির আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল বার-দুই।

আপনার নাম কি?

···বীথি।

বীথি কি?

···ঘোষ।

কোথা থেকে এসেছেন?

···নারায়ণগঞ্জ।

নোট বইয়ে লেখা হল। বিভাস দত্ত বাইরে যাচ্ছেন শুনে অফিসারটি জ্যোতিরাণীর দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি বাইরে যাচ্ছেন?

জ্যোতিরাণী মাথা নাড়লেন, যাচ্ছেন না।

আপনার সাক্ষী হতে আপত্তি আছে ?

বিব্রত বোধ করে বিভাস দত্ত কিছু বলতে চাইলেন হয়ত। তার আগে জ্যোতিরাণী স্পষ্ট মৃদু জবাব দিলেন, আপত্তি নেই, লিখে নিন।

তাঁর নাম-ধাম লেখা হল। সাক্ষী হিসেবে এরপর ভিড়ের থেকে আরো তিন-চারজন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নাম লেখালো। নোট বই বন্ধ করে অফিসার বীথি ঘোষকে বলল, আপনাকেও আমার সঙ্গে আসতে হবে।

হঠাৎ ভয় পেয়ে বউটি জ্যোতিরাণীর হাতখানা আঁকড়ে ধরল, অস্ফুটস্বরে বলে উঠল, আমি কেন যাব...আমি কোথাও যাব না...এখানেই থাকব !

অফিসার বলল, কিছু ভয় নেই, চলুন। বিভাস দত্তও অভয় দিতে চেষ্টা করলেন, এঁর সঙ্গে গেলেই নিরাপদ।

কিন্তু আশ্বাস একটুও পেল না। জ্যোতিরাণী দেখছেন, তার চোখেমুখে আবার সেই উদ্‌ভ্রান্ত ছায়াটা এঁটে বসছে। চুপ করে থাকতে পারলেন না, অফিসারকে বললেন, আমার নামেই ফোন আছে, দরকার হলে বা কিছু ব্যবস্থা করতে না পারলে একটা খবর দেবেন।

বউটির জিনিসপত্র নিয়ে যাবার ভার তৃতীয় কন্সটেবলকে দিয়ে, তাকে আর আর দুই আসামীকে নিয়ে অফিসার প্রস্থান করল।

একটু বাদে ভিড় হাল্‌কা হয়ে গেল। তখনই বিভাস দত্ত আর জ্যোতিরাণীর খেয়াল হল, বিকেলের গাড়ি অনেকক্ষণ ছেড়ে গেছে। পরের গাড়ি সেই সন্ধ্যার পর।

বিভাস দত্ত বললেন, শমীকে নিয়ে আপনি চলে যান, পরের গাড়ির অনেক দেরি, কতক্ষণ আর অপেক্ষা করবেন।

একটা দুর্ভর অস্বস্তিতে যেন আচ্ছন্ন হয়ে আছেন জ্যোতিরাণী। শুনলেন শুধু। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, ওই মেয়েটিকে নিয়ে গিয়ে পুলিস কি করবে ?

ছেড়ে দেবে হয়ত, আর ওই লোক দুটোকেও ছেড়ে দিতে পারে।

সে কি ! ওদের ছেড়ে দেবে কেন ?

দেবেই বলছি না, তবে দিলে অবাক হব না।

দুই এক মুহূর্ত চেয়ে থেকে জ্যোতিরাণী আবার বলে উঠলেন, কিন্তু ওই মেয়েটিকে ছেড়ে দিলে কি হবে ? ও কি করবে ?

ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপের ভাঁজ পড়ছিল বিভাস দত্তর। কিন্তু ব্যাকুলতা লক্ষ্য করেই হয়ত প্রকাশ করলেন না। জবাব দিলেন, ছেড়ে আজই না-ও দিতে পারে, যখনই দিক, কিছু হবেও, আর, কিছু করবেও। কিন্তু এ নিয়ে আপনি ভেবে

কি করবেন ? খুঁজলে এ-রকম অনেক পাবেন—পদ্মার শোকের তল, কূল নেই।

বিদ্রূপ না করুক এই দার্শনিক জবাব একটুও ভালো লাগল না জ্যোতিরাণীর। বৈঠকখানায় বসে এই মেয়েদের ভালো করার চিন্তা-বিলাসিতায় মগ্ন হয়েছিলেন তাঁরা, মনে মনে হয়ত সেই কথা বলছেন। আর এখানে দাঁড়াতে বা অপেক্ষা করতে সত্যিই ভালো লাগছে না, এই বাতাসে সুস্থ শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে ফেলতেও অস্বস্তি।

একটা যন্ত্রণার বোঝা নিয়ে বাড়ি ফিরছেন যেন।···বউটির নাম বীথি, কপালে টক্‌টকে সিঁদুর কিন্তু পুরুষের লোভের গ্লানি ওই নিষেধ-চিহ্ন দিয়ে দূরে সরাতে পারেনি।···সঙ্গে বুড়ো রুগ্ন শ্বশুর এসেছিল শুধু, স্বামী কোথায় ? চকিত ব্যাকুলতায় শমীর দিকে ফিরলেন তিনি, ভয়ে ত্রাসে তাকেই কাছে টেনে নিলেন একটু। ভেতর থেকে কে যেন বলছে একই ভাগ্য এদের দুজনের।···বীথি ঘোষ, বীথি··· নামটা মনে হলে তো ফুল-লতা-পাতা-বাগান গোছের কিছু মনে আসে।···তাঁর হাত আঁকড়ে ধরেছিল—হাতে সেই স্পর্শটা এখনো লেগে আছে। বলেছিল, বাঁচার জন্যে এ কোথায় মরতে এলো—কথাগুলো কানে এখনো বিঁধে আছে। অদ্ভুত চোখে দেখছিল তাঁকে—সেই চাউনিটা বুকের তলায় এখনো কেটে বসে আছে।··· কদিন খাওয়া জোটেনি কে জানে। কেবল একটা চিত্র একটু সান্ত্বনার মত। শয়তান লোকটার ওপর পাগলের মত যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল···সেই চিত্রটা। ···বাঁচবে, এই মেয়ে নিশ্চয় বাঁচবে। শুচিতার এমন জলন্ত রোষ আর কি দেখেছেন জ্যোতিরাণী ?

গাড়িতে ওঠার পর শমীর সম্বিৎ ফিরেছে বুঝি। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যাচ্ছে সে। জ্যোতিরাণী হুঁ-না করছেন বা মাথা নেড়ে জবাব দিচ্ছেন। কিন্তু ব্যাপারটা শমীর বোধের অতীত সম্পূর্ণ। তাই প্রশ্নেরও বিরাম নেই। কে ওই বউটি, ও-রকম ভাবে ছুটে এলো কেন, অত ভয় পেল কেন, লোক দুটো কে, গুণ্ডা কিনা, ওদের এত মারা হল কেন, ওদের ডাক্তার দেখানো হবে কিনা, পুলিস ওদের নিয়ে গিয়ে কি করবে, বউটাকেই বা ধরে নিয়ে গেল কেন, ইত্যাদি।

অত কথা বলতে এখন ভালো লাগছে না শমী, ওসব না ভেবে চুপ করে বসে রাস্তা দেখ তো।

রাস্তা দেখার আগে বড় বড় চোখ মেলে শমী তাঁর মুখখানাই ভালো করে দেখে নিল একপ্রস্থ।

জ্যোতিরাণী বললেন বটে, একখানা হাত নিবিড় করে ওকে বেষ্টন করেই আছে। তাঁর বুকের তলায় ওই বীথি ঘোষ আর এই শমী বোস মিলে-মিশে

একাকার হয়ে যাচ্ছে।

ঝোঁকের মাথায় কিছু করা বা করতে চাওয়া অস্থির চিত্তের লক্ষণ। প্রায়ই সেটা পরিতাপের কারণ হয় নাকি। কিন্তু দুনিয়ায় বহু বৃহৎ সৃষ্টির মূলে হঠাৎ ঝোঁকের নজির আছে। ঝোঁক জুড়োলে ইচ্ছের জঠর থেকে যা হয়ত কোনদিনই ভূমিষ্ঠ হত না, আলোর মুখ দেখত না।

নীচের বসার ঘরে মিত্রাদির অবস্থান টের পাওয়া মাত্র জ্যোতিরাণী ভারী একটা উদ্দীপনা অনুভব করলেন। গত বিশ-বাইশ দিনের মধ্যে মিত্রাদির সঙ্গে দেখাও হয়নি কথাও হয়নি। শেষ কথা হয়েছিল সেই স্বাধীনতার রাত্রিতে—টেলিফোনে। যে-রাতে মামাশ্বশুরের গল্পের নজন ফাঁসির আসামীর মুক্তিদাত্রী রাণীর মত উদার হবার স্বপ্ন দেখেছিলেন জ্যোতিরাণী, আর যে-রাতে আগের দিনের আলো নেভানোর অপরাধে ছেলের ওপর বাপের ক্ষিপ্ত শাসনের প্রতিটি আঘাত জ্যোতিরাণীর গায়ে এসে লেগেছিল···স্বপ্ন ভেঙেছিল আর শিকলভাঙা দিনে হৃদয় খোঁজার এক দীর্ঘ প্রতীক্ষা নিষ্ঠুর বিদ্রূপের গহ্বরে নিশ্চিহ্ন হয়েছিল।···কর্তার সঙ্গে চন্দননগর থেকে ফিরে মিত্রাদি টেলিফোন করেছিল, ছেলের দুষ্টুমির কাণ্ড মনে পড়তে হেসেছিল খুব, আর হেসে হেসে বিচ্ছু ছেলেকে সামলাতে বলেছিল।··· জ্যোতিরাণী জবাব দিয়েছিলেন, চিন্তার কারণ নেই, ছেলে সামলাবার ব্যবস্থা তার বাবা ফিরে এসেই করেছেন।

একজনের প্রতি অপরিসীম বিরূপতার আঁচ কিছুটা মিত্রাদির গায়েও লেগেছিল ঠিকই। পরদিনও ঠাণ্ডা হতে পারেননি জ্যোতিরাণী, কিসের অনুষ্ঠানে দল বেঁধে মিত্রাদি আমন্ত্রণ জানাতে আসছে শুনেও শমীকে দেখতে বেরিয়ে গেছলেন, সেই অপমানে বাড়ির কর্তা টেলিফোনে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে তাদের আসা নাকচ করেছিল।

মাঝের এই তিন সপ্তাহের মধ্যে মিত্রাদির আর সাড়া-শব্দ মেলেনি। এ বাড়ির মানসিক সমাচার কুশল নয় টের পেয়েছে হয়ত। টের বহুদিন আগেই পেয়েছে। মিত্রাদি বোকা নয়। এবারে আরো একটু বেশি কিছু অনুমান করেছে হয়ত। কিন্তু রাগ তা বলে জ্যোতিরাণীর মিত্রাদির ওপরে নয় একটুও। ছেলের আলো নেভানোর কাণ্ড নিয়ে চন্দননগরের আসরে রসিকতা যদি করেই থাকে, সুরসিকা বলেই করেছে। আর আমন্ত্রণ জানাতে আসছে শুনেও তিনি যে বেরিয়ে গেছলেন সেও আর একজনের প্রতি দুর্জয় ক্ষোভবশতই। নইলে এই শমী মেয়েটা কাছে আসার পর মিত্রাদিকে অনেকবার মনে পড়েছে, অমনি ভাগ্যহত

অনেক অদেখা মেয়ের মুখ মনের তলায় ভিড় করেছে। দুর্ভাগ্য থেকে টেনে তোলার মত ওদের জন্য সত্যিই কিছু গড়ে তোলা যায় কিনা ঠাণ্ডা মাথায় মিত্রাদির সঙ্গে আবার সেই আলোচনা নিয়ে বসার কথা ভেবেছেন।

কিন্তু আজকের এই ঝোঁক, এই উদ্দীপনা সম্পূর্ণ অন্যরকম। মিত্রাদিকে আজ মনেও পড়েনি, তাঁকে আশাও করেননি। কিন্তু তাঁকে দেখা মাত্র মনে হল, এই মুহূর্তে তাঁর থেকে বেশি কাম্য আর বুঝি কেউ নয়।

গাড়িটা বাইরের ঘরের দরজা ছাড়িয়ে সিঁড়ির কাছে থামল। ঘাড় ফিরিয়ে মিত্রাদিও দেখেছে তাঁকে। পাশের দরজা দিয়ে ভিতরের বারান্দায় এসে শমীকে মেঘনার হাতে ছেড়ে দিলেন জ্যোতিরাণী, বললেন, ওপরে নিয়ে যা, সিতু যেন পেছনে লাগে না দেখিস। তখনো ধারণা, বাইরের ঘরে মিত্রাদি একাই বসে আছে। ভিতরে পা দিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। ওধারে অর্থাৎ দেয়ালের দিকের সোফায় কালীদা বসে। গম্ভীর দুজনেই। এক পলক দেখেই মনে হল, দুজনার মধ্যে কিছু একটা অপ্রীতিকর কথাবার্তা হয়ে গেছে।

কালীদা ডাকলেন, এসো, ভদ্রমহিলা তোমার জন্যে অনেকক্ষণ বসে আছেন।

মৈত্রেয়ী চন্দর মুখে দু'রকমের অভিব্যক্তি। একজনের ওপর তিনি বিরূপ, আর একজন আবার তাঁর ওপর বিরূপ কিনা সেই সংশয়। আর একজন বলতে জ্যোতিরাণী। সহজ হবার চেষ্টায় নালিশের সুরে কালীদার উক্তিটা ধরেই মোচড় দিলেন—অনেকক্ষণ বসে আছি দেখে কর্তব্যের খাতিরে সঙ্গ দিতে এসে একটু গঞ্জনা দেবার লোভও সামলানো গেল না, বুঝলে?

গম্ভীর মুখে কালীদা তাঁর দিকে দৃষ্টি ফেরালেন, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি আবার কবে বিলেত যাচ্ছ, তাতে তোমার অত রাগ হল কেন?

জ্যোতিরাণীর মুখের ওপর চোখ রেখেই মৈত্রেয়ী জবাব দিলেন, আর জিজ্ঞাসা করেছি বিলেত গিয়ে ব্যারিস্টার সাহেবের কাছ থেকে কত টাকা হাতিয়ে আনলে, আর জিজ্ঞাসা করেছি মাসে কটা পার্টি আর ফাংশান চলছে আজকাল, আর তারপর জিজ্ঞাসা করেছি মেয়ের বয়েস এগারো হল, মায়ের সঙ্গে সেও পার্টি-ফাংশান করা শুরু করেছে কিনা—টিপে টিপে মাত্র এই কটা কথা জিজ্ঞাসা করেছি, বুঝলে? হাল্কা রোষে কালীদার দিকে ফিরলেন, অত খোঁজে কাজ কি, কে তোমাকে আমার ওপর গার্জেনগিরি ফলাতে বলেছে?

কালীদাকে চেনেন জ্যোতিরাণী, গম্ভীর বটে কিন্তু চোখের পাতায় হাসি কাঁপছে সন্দেহ নেই। ভাসুর হোন আর যাই হোন, অন্য দিন হলে ভিতরে ভিতরে উৎফুল্ল হতেন, কৌতুকবোধ করতেন। এই দুজনকে নিয়ে অনেক দিনের

কৌতূহল তাঁর। কিন্তু মনটা গোটাগুটি অন্য তারে বাঁধা এখন, এই পরিস্থিতিও উপভোগ্য লাগল না তেমন। দ্বিতীয় দফা লঘু বিতর্ক জমে উঠতে না দিয়ে বললেন, তোমার সঙ্গে আমার দরকারী কথা ছিল মিত্রাদি।

শুধু মৈত্রেয়ীর নয়, কালীদার মনোযোগও তাঁর দিকেই ঘুরল। কিছু ব্যতিক্রম চোখে পড়ে থাকবে। জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় গেছলে?

···কাজ ছিল।

সোফা ছেড়ে কালীনাথ উঠে দাঁড়ালেন, ছদ্ম-রোষে আরো একটু গম্ভীর হবার চেষ্টা, ওটা কি রকম জবাব হল, তোমারও গার্জেন নেই ভেবেছ নাকি? আচ্ছা, দরকারী কথা শেষ করো····

চলে গেলেন। অজ্ঞাত কারণেই ভিতরে ভিতরে মৈত্রেয়ী উতলা একটু, এই মুখেরও ভাব-গতিক সুবিধের নয়। হাসিমুখেই কালীদার উদ্দেশ্যে তরল কোপ প্রকাশ করলেন, শুনলে! চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শুনলে গা জলে না?

মাথাটা ঠাণ্ডা করার তাগিদে এবারে জ্যোতিরাণীও গম্ভীর রসিকতাই করলেন একটু। খানিক চেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, খুব জলে?

তুমি আর জ্বালিও না বাপু, মুখখানা সরসই দেখালো, বুড়ী হয়ে গেলাম আমার আর গার্জেনে কাজ কি, সে বরং আরো এক যুগ-টাক তোমার লাগতে পারে।

মিত্রাদির এই গোছের স্তুতি জ্যোতিরাণী অনেক শুনেছেন। এখন আর ভালো লাগে না। তিন মাস বিলেত ঘুরে আসার পর মিত্রাদির শরীরের বাঁধন অনেক আঁট-সাঁট হয়েছে, বয়েসও আগের থেকে কম দেখায়। বেশবাসের দিকেও প্রচ্ছন্ন যত্ন বেড়েছে একটু, তাও জ্যোতিরাণীর নজর এড়ায়নি। পাল্টা ঠেস বা পাল্টা স্তুতি শুনলে খুশি হয় মিত্রাদি। কিন্তু লঘু বাক-বিন্যাস বিরক্তিকর এখন।

অনেকদিন আসোনি, খবরও নাওনি, কি ব্যাপার?

মৈত্রেয়ী স্বস্তি বোধ করছেন কিছুটা।—আসব কি, তোমার মেজাজ-পত্র ভালো ঠেকছে না আজকাল। ওমা সেই থেকে দাঁড়িয়েই আছ দেখি, দরকারী কথা ছিল বলছিলে না···?

হ্যাঁ। এখানে হবে না, ওপরে এসো।

মিত্রাদির মুখে চাপা বিস্ময়। জ্যোতিরাণী দরজার দিকে পা বাড়িয়েছেন।

তাঁর ওপরের ঘরের শয্যায় আর দুই ক্ষুদ্র ব্যক্তির জমাটি আসর বসেছে। বক্তা আজ শমী। উত্তেজনায় হাত-মুখ নেড়ে বিকেলের রোমাঞ্চকর ঘটনাটা বিস্তার করছে। তার গা-ঘেঁষে কনুইয়ের ভরে আধ-শোয়া হয়ে হাতের ওপর গাল রেখে সিতু শ্রবণে মগ্ন।

ঘরে পা দিয়ে জ্যোতিরাণী দাঁড়িয়ে গেলেন। ভুরুর মাঝে বিরক্তির আভাস। বিরক্ত মেঘনার ওপরেও। তার হেপাজতে ছেড়েছিলেন মেয়েটাকে, আগলে বসে থাকতে বলেননি। তবু।···চেষ্টা করেও ছেলের দশ বছর বয়েসটাকে আর জটিলতা-মুক্ত বয়েস ভাবা যাচ্ছে না।

মাসির পিছনে আর একজনকে দেখে শমীর মুখ বন্ধ হল। সিতুও ফিরে তাকালো। তারপর উঠে বসে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, মা, স্টেশনে একটা বউকে গুণ্ডায় ধরেছিল?

জ্যোতিরাণী ফস করে বলে বসলেন, হ্যাঁ ধরেছিল। তুই ওকে ধরবি তো ওই গুণ্ডার মত তোকেও আধমরা করব আমি।···ওকে নিয়ে ঠাকুমার কাছে যা!

অকারণে ধমক খেয়ে সিতু খাট থেকে নেমে দাঁড়াল। ছুদিন ধরে মাকে ভয়ানক রকম গম্ভীর দেখছে মনে পড়ল। শুধু গম্ভীর নয়, সর্বক্ষণ চোখ রেখেছে তার ওপর। পরশু সন্ধ্যায় জেঠুর ঘরে বসে পড়ছিল যখন, আধ ঘণ্টা ধরে ঠায় বাইরে দাঁড়িয়ে কি রকম করে যেন দেখছিল তাকে। তারপর থেকে কেবলই মনে হয়েছে কোনো একটা অজুহাত পেলেই মা তার টুঁটি টিপে ধরার মতলবে আছে। দোষ কি করেছে জানে না, তবু একটু ভয়ে ভয়েই আছে। কিন্তু মিত্রামাসীর সামনে এ-রকম বলায় মর্যাদায় লাগল একটু। গম্ভীর মুখে গটগট করে বেরিয়ে চলল সে, অর্থাৎ আর কাউকে নিয়ে যাবার দায় নেই তার।

এই, দাঁড়া! কি বললাম তোকে?

দ্বিগুণ ক্ষোভে এবার শমীর ওপর ফেটে পড়ার ইচ্ছে সিতুর।—আসতে পারিস না? কোলে করে নিয়ে যেতে হবে নাকি!

ঘাবড়ে গিয়ে সিতুর পিছনে শমীও প্রস্থান করল। বচন আর দৃশ্য ছুই-ই উপভোগ্য বটে, কিন্তু দরকারী কথা শোনানোর জন্যে ওপরে ডেকে আনার পর এই মেজাজ দেখে আবারও কেমন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলেন মিত্রাদি। লঘু বিস্ময় প্রকাশ করলেন তবু, কি ব্যাপার, ছেলেটার ওপর হঠাৎ মার-মুখো কেন?

নিরুপায় মুখ করে এবার হেসেই ফেললেন জ্যোতিরাণী।—আর বোলো না, পাজীর পা-ঝাড়া একেবারে, প্রথমদিন বাড়িতে পা দিতে না দিতে মেয়েটার চিবুক কেটে ছুখানা করে দিয়েছিল।

অস্বাচ্ছন্দ্য ভাবটা গেল একটু, মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করলেন, কার মেয়ে?

ছিল কারো, এখন কারো না। সব খুইয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে একা ভেসে এসেছে। বিভাসবাবুর কাছে আছে।

তাঁর আত্মীয়?

না, ওর বাবার সঙ্গে চেনা-জানা ছিল।

আহা, এইটুকু মেয়ে!···স্টেশনে বউকে গুণ্ডায় ধরার কথা কি বলছিল সিতু?

বলছি, বোসো একটু।

ভিতরের দরজা দিয়ে কলঘরে ঢুকে চট করে চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে ফিরলেন জ্যোতিরাণী। মাথাটা ঝিম-ঝিম করছিল তখনো। আঁচলে মুখ মুছতে মুছতে সামনে এসে বসলেন।—শোনো, তুমি তো সতেরো ব্যাপারে মাথা গলিয়ে বসে আছ, ঘর-বাড়ি ছেড়ে এসে যেসব মেয়েরা ভেসে বেড়াচ্ছে তাদের জন্য যে কিছু করার কথা হয়েছিল তার কি হল?

এবারে গোটাগুটি হাল্কা বোধ করলেন মিত্রাদি। এই প্রসঙ্গ আলোচনার জন্য আর একদিনও তাঁকে বাড়িতে ডাকা হয়েছিল মনে পড়ল, কিন্তু বিভাস দত্ত ছিলেন বলে কথা তেমন এগোয়নি।···গরবিনীর মাথায় এখনো সেটা আছে কল্পনা করতে পারেননি। শুধু আছে না, মুখ দেখে মনে হল সঙ্কল্পটা দানা পাকিয়েছে। জবাব দিলেন, কি হবে, তুমি আর গা করলে কই।

তোমাকে তো ভাবতে বলেছিলাম।

হেসে একটু জোর দিয়েই মিত্রাদি বললেন, ভাবনা তো দিনরাতই মাথায় ঘুরছে, কিন্তু আমার সাধ্যি তো জানো, টাকার কথা মনে হলে কোনো ভাবনাই আর এগোতে চায় না।

আঃ, টাকার চিন্তা তোমাকে কে করতে বলেছে! কোনো সমস্যার আমল দিতে চান না জ্যোতিরাণী, টাকা যা পারি দেব, কিছু একটা শুরু করতে পারলে টাকা তোলাও খুব শক্ত হবে না—সত্যি মিত্রাদি আর দেরি করার সময় নেই, নিজের চোখে যা দেখে এলাম আজ, উঃ! দেখলে তোমারও মাথা খারাপ হত—

মৈত্রেয়ীর আগ্রহ বাড়ছে, আর এই অস্বাভাবিক আকৃতি দেখে বিস্ময়ও।—কি ব্যাপার বলো তো? কি দেখেছ?

জ্যোতিরাণী বললেন কি ব্যাপার। বললেন কি দেখেছেন। সব যেন চোখের সামনে ভেসে উঠেছে আবার। উত্তেজনায় সমস্ত মুখ লাল, চোখ জ্বলছে। দুর্ভাবনায় বিচলিত পরমুহূর্তে।...বউটা থানায় যেতে চায়নি, তাঁর হাত আঁকড়ে ধরেছিল। কিছু করার কথা তখন ভাবতেও পারেননি জ্যোতিরাণী। তারপর থেকে উদ্বেগের পাথর বুকে চেপে আছে। যদি এই সন্ধ্যায় বা রাতেই তাকে থানা থেকে ছেড়ে দেয়? কি করবে? কোথায় যাবে?

চুপচাপ শুনছেন মৈত্রেয়ী চন্দ আর নিঃশব্দে চেয়ে আছেন। খুব নতুন কিছু

শুনছেন না, কিন্তু নতুন কিছু দেখছেন। উত্তেজনা উদ্দীপনা ক্ষোভ খেদ আর দুশ্চিন্তার এই আরক্ত মুখ নতুনই লাগছে। বললেন, নাম-ঠিকানা যখন দিয়ে এসেছ সে-রকম দায়ে পড়লে এখানেই এসে হাজির হবে দেখো।

নির্লিপ্ত জবাবটা একটুও ভালো লাগল না। ঠিকানা পুলিসের খাতায়, পাবে কি করে? পেলেও আসতে পারবে না।

ঠাণ্ডা মুখে মৈত্রেয়ী তবু বললেন, বিপদে পড়লে অনেকে অনেক কিছু পারে।

কি যে বলো ঠিক নেই, স্টেশনে এক ঘণ্টা দেখেই আমাকে একেবারে আপনার জন ভেবে বসে আছে? তাছাড়া পারলেও আসবে না, মেয়েটাকে দেখলে বুঝতে, সেই থেকে ভেবে অস্থির হয়ে যাচ্ছি আমি—রাত করে ছেড়ে যদি দেয় কি হবে?

দিনে ছাড়লেই বা কি হবে, আবার রাত আসবে না?

ছেলেমানুষের মত সদ্য সমস্যার দুশ্চিন্তায় কাতর হয়ে পড়েছিলেন জ্যোতিরাণী। সামনের এই রাতটাই আতঙ্কের কারণ যেন। সত্যিই তো, রাতে ছাড়লেই বা কি দিনে ছাড়লেই বা কি। স্টেশনের ওই ঘটনা তো দিনের আলোতেই ঘটে গেল। অসহায় বুঝি জ্যোতিরাণী।

কি নাম বললে বউটির, বীথি ঘোষ? দেখতে বেশ ভালো?

ভালোই। ভালো থাকতে পেলে আরো ভালো দেখাতো।

মৈত্রেয়ী মন্তব্য করলেন, তাহলে একটু ভাবনার কথাই বটে। কি চিন্তা করে জিজ্ঞাসা করলেন, শুধু শ্বশুরের সঙ্গে এসেছিল না স্বামীটা ফেলে পালিয়েছে?

জ্যোতিরাণী আঁতকে উঠলেন প্রায়, পালাবে কেন?

তাঁর মুখের দিকে খানিক চেয়ে থেকে মৈত্রেয়ী হঠাৎ হাসলেন একটু। বললেন, দেখো, তুমি নিতান্ত ভালো মেয়ে—কিছুই জানো না কিছুই দেখোনি, তাই মাথা খারাপ হবার দাখিল। এই সব মেয়েদের আমি কিছু দেখেছি। গোড়ায় গোড়ায় মাথা আমারও খারাপ হত···এদের জন্যে কিছু করতে যদি পারো সেটাই কাজের কথা হবে। নড়েচড়ে সোজা হয়ে বললেন মৈত্রেয়ী চন্দ, কিন্তু এ নিয়ে আজ আর কিছু ভেবো না, থানায় যারা নিয়ে গেছে তারাও মানুষ—নতুন জায়গায় বে-ঘোরে পড়ার জন্য অল্পবয়সী একটা বউকে রাত করে রাস্তায় বার করে দেবে না। তাছাড়া এসব মেয়েদের রাখার সরকারী ব্যবস্থাও কিছু আছে, যদিও··· যাকগে।

জ্যোতিরাণী জিজ্ঞাসু নেত্রে চেয়ে আছেন। ওভাবে থামলেন বলেই একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল না।

কিন্তু হাত-ঘড়ি দেখে উঠেই পড়লেন মিত্রাদি, জরুরী কাজ কিছু মনে পড়েছে। —আজ চলি ভাই, শিগগীরই অনেক কথা হবে, এবার থেকে ঘন ঘন আসব।

ব্যস্ত চরণে প্রস্থান করলেন। ঘোরানো বারান্দায় গতি আরো একটু দ্রুত হল। চাপা উদ্দীপনায় মুখখানা হাসি-হাসি দেখাচ্ছে। অস্থির ব্যাকুলতায় এই আশার কথা শোনানোর জন্যে তাঁকে ওপরে ডাকা হয়েছে, কল্পনাও করতে পারেননি। ওধারে কালীনাথের ঘর···চেনেন। কিন্তু এখন আবার দেখা হোক চান না। হাতে সময় সত্যিই নেই মৈত্রেয়ীর। বড়লোক কিছু দেখা আছে তাঁর, বড়লোকের খেয়াল কিছু জানা আছে—বড়লোকের গরবিনী ঘরনীদের খেয়াল-খুশির ওপর আস্থা তাঁর আরো কম। আজ যে বউটার দুঃখে বুক ভাঙছে, দু-দশ দিন বাদে তার কথা আর মনে না পড়লেও মৈত্রেয়ী অবাক হবেন না। তাই সময় নেই হাতে—করার যা, এই অস্থিরতা এই ছটফটানির মুখেই করতে হবে। কি হবে না হবে সেই প্ল্যান দেওয়া বা ভাবনা-চিন্তা করা পরের কথা। সঙ্কল্পের তরী একবার ভাসলে প্ল্যান আপনি গজাবে। আবেগের যে জোয়ার দেখে এলেন এই মাত্র, তরীটা আপাতত ওতেই ভাসাতে হবে। এই জোয়ারে ভাটা পড়তে দেবার ইচ্ছে নেই।

···সুদিনে এসেছেন মৈত্রেয়ী চন্দ, তাঁর হাতে সময় নেই।

একুশ

রাত্রিতে ভালো ঘুম হল না। আবার খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেল। কিছু একটা চিন্তা মাথায় ঢুকলে প্রথম হামলা ঘুমের ওপর। রাতের নিঃসঙ্গ শয্যায় ইচ্ছে করে ভাবনা-চিন্তা টেনে এনে জ্যোতিরাণী ঘুমের ব্যাঘাত ঘটান না। কখন কোন্ ভাবনাটা এই এক সময়ের জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকে আগে টেরও পান না অনেক সময়। বিছানায় গা ঠেকিয়ে চোখ বুজতে না বুজতে দেখা মেলে। আবার সব সময় যে দেখা মেলে তাও নয়, আধ-ঘুমের মধ্যে এমন কি প্রায়-জাগা অবস্থাতেও মাথার মধ্যে একটানা কি-সব হিজিবিজি চলতে থাকে। সচেতন হওয়া মাত্র সেগুলো মিলিয়ে যায়। এক মুহূর্ত আগে কি যে ভাবছিলেন চেষ্টা করেও মনে করতে পারেন না।

ফলে সকালের দিকে মাথাটা অনেকক্ষণ পর্যন্ত ভার হয়ে থাকে। মুখহাত ধুয়ে পেয়ালা দুই চা খেয়ে একেবারে স্নানটা সেরে উঠতে পারলে তবে সুস্থ বোধ

করেন। এটাই অভ্যেসে দাঁড়াচ্ছে আজকাল।

মাথাটা বেশি ঠাসা-ঠাসা লাগছে। শুয়েই আছেন। পাশে শমী ঘুমুচ্ছে। পাখার নীচে ঘুমিয়ে তেমন অভ্যেস নেই বোধ হয়, শীতে কুঁকড়ে আছে। ভোরের হাওয়াও ঠাণ্ডা আজকাল। চাদরটা ওর গায়ে ভালো করে টেনে দিলেন। রাতেও অনেকবার তাই করেছেন। ফেলে ফেলে দেয়। মেয়ের শোয়ার ছিরি ভালো নয়, ওর হাতের ধাক্কায় পায়ের ধাক্কায় রাতে বারকয়েক চমকে উঠতে হয়েছে।

মাসীর কাছে শোবে তাতে শমীর যত আনন্দ, ছেলের ততো গোমড়া মুখ। ছেলেটার হিংসে দেখে মনে মনে একটু অবাকই হয়েছিলেন জ্যোতিরাণী। জ্ঞান বয়সে কখনো তাঁর কাছে শোয়নি বা শুতে চায়নি। ঠাকুমার কোনো সময় শরীর খারাপ হলেও ওকে এই বিছানায় ধরে আনা যায়নি। দরকার হলে জেঠুর কাছে শুয়েছে, আর ছোট দাদু থাকলে তো কথাই নেই। কিন্তু নিজে শুক না শুক, আর কেউ তার মায়ের কাছে শোবে এটাও পছন্দ নয় মনে হল। রাতে এই খাটে বাড়তি বালিশ পড়তে দেখে ঘাড় বেঁকিয়ে শয্যা নিরীক্ষণ করেছে। এই সাত-সকালে জ্যোতিরাণীর কি যেন অস্বস্তি একটু, চকিতে মনে হল ছেলের সেই দেখার ধরন অনেকটা তার বাপের মত। নড়েচড়ে শমীর দিকে ফিরলেন তিনি।

...ব্যবস্থাটা অনুমান করেও সিতু অসন্তুষ্টি চাপতে পারেনি, ঠেস দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, আদুরে মেয়ের এখানেই শোয়া হবে বুঝি?

জ্যোতিরাণী ছেলেকে লক্ষ্য করেছেন, তারপর ফিরে জিজ্ঞাসা করেছেন, তুই কি ভেবেছিলি?

কেন, ঠাকুমার সঙ্গে তো ওর ভাব হয়েছে, সেখানে শুতে পারত না?

আর তুই?

ঠাকুমার শয্যায় তিনজনে কুলোবে না মনে হতে একটু ভেবে জবাব দিয়েছে, আমি জেঠুর কাছে যেতুম!

ঈর্ষা বুঝেও জ্যোতিরাণীর খারাপ লাগেনি খুব, বলেছেন, ইচ্ছে হয় তো তুইও চলে আয়, বড় খাট, দুজনে দুদিকে শুবি।

এখানে শুতে কেমন লাগবে সেটা মায়ের দিকে চেয়েই যেন অনুভব করতে চেষ্টা করেছে সিতু, সেই এক দুপুরের মত জ্যোতিরাণীর এটুকুই চোখে লেগেছে। ইচ্ছে থাকলেও প্রস্তাবটা অসম্ভব গোছের যেন। লোভ ছেঁটে দিয়ে শমীকে শুনিয়ে বলে গেছে, ঠাকুমার কাছে সমস্ত রাত ধরে রাক্ষসের গল্প শুনবে।

জানলা দিয়ে বিছানায় একফালি রোদ এসে পড়েছে জ্যোতিরাণীর খেয়াল নেই। ঘুমন্ত শমীর দিকেই ফিরে আছেন বটে, কিন্তু অন্যমনস্কের মত দেখছেন কালকের

সেই বউয়ের মুখখানা। বীথি ঘোষের।···ওর রাত কিভাবে কেটেছে? ভাবতে ভাল লাগছে যে-নরকের মধ্যে ছিল তার থেকে ভাল কেটেছে। ভাবতে ভাল লাগছে এই সকালের আলো দেখে সেও একটুখানি আশার আলো পেয়েছে। কিন্তু ভাল ভাবতে গেলেও খারাপটাই মনে ডাক দেয় আগে।···রাতে চোখেপাতায় এক করতে পেরেছে কিনা কে জানে, সকালে উঠেই মাথার ওপর খাঁড়া দেখছে কিনা কে জানে।···বিভাসবাবু বলেছিলেন, পদ্মার শোকের তলকূল নেই।

কি মনে পড়তে বুকের তলায় মোচড় পড়ল একটা, অথচ 'অনুভূতিটা মিষ্টি। সেই দিশেহারা অবস্থার মধ্যেও বউটা তাঁকে দেখেছিল চেয়ে চেয়ে, কাঁদে নি, কিন্তু থরথরে চোখের পাতা কান্নায় ভিজে উঠতে চেয়েছিল। বলেছিল, সব দিকের এত কুৎসিতের মধ্যে আপনাকে বড় সুন্দর লাগছে···

বিছানায় আর থাকা গেল না, জ্যোতিরাণী উঠে পড়লেন। একেবারে স্নান সেরেই ঘরে ঢুকলেন। সঙ্গে সঙ্গে দরজার পুরু পর্দার ওধারে মেঘনার গলা, আজ কি হল গো বউদিমণি, চা পর্যন্ত হয়ে গেল যে! নীচে আবার তোমার অতিথি বসে আছেন···

জ্যোতিরাণী অবাক। ঘড়ির দিকে তাকালেন, কোন্ ফাঁকে বেলা এত গড়িয়েছে টের পাননি। তবু এ-সময়ে অতিথি কে আসতে পারে!

ভেতরে আয়। কে?

মেঘনা বলল, তোমার মিত্রাদি। এখনও ওঠোনি শুনে বলল, ডাকতে হবে না, আমি বসছি, উঠলে খপর দিও—ও মা, তোমার চান সারা দেখি!

তেমন তাড়া না থাকলে মিত্রাদি আটটার আগে সকালের মুখ দেখে না। কাল উৎসাহ পেয়ে এরই মধ্যে মাথায় কিছু এসেছে বোঝা গেল। আগ্রহ জ্যোতিরাণীরও কম নয় এখন, তবু ঠিক এই সময়ে তাঁর আবির্ভাব খুব মনঃপূত হল না। ফিরে দেখেন শমীও উঠে বসে দু হাতে চোখ কচলাচ্ছে।

মিত্রাদি কতক্ষণ এসেছেন?

এই তো এলেন।

কালীদা কোথায়?

তাঁর ঘরেই তো বোধ হয়।

মিত্রাদিকে ওপরে ডাকবেন কি তিনি নীচে যাবেন ভাবলেন একটু। চা খেয়েই কালীদা নীচে নামেন···। বললেন, শমীকে নিয়ে যা, মুখ-হাত ধোয়া হলে খেতে দিবি, মিত্রাদিকে ওপরে আসতে বল্, আর শামু বা ভোলা আমাদের চা এখানে দিয়ে যায় যেন।

শমীকে নিয়ে মেঘনা হেলে-দুলে প্রস্থান করল। বিছানাটা ঝেড়ে বেড-কভারে ঢেকে দিয়ে জ্যোতিরাণী চিরুনি হাতে আয়নার সামনে দাঁড়ালেন।

একটু বাদে পর্দা সরল, আর মিত্রাদির হাসিমুখে কাব্য ঝরল, 'নহ মাতা নহ কন্যা নহ বধূ সুন্দরী রূপসী…' আসামাত্র মেঘনা যে বলল তুমি ঘুমুচ্ছ?

চিরুনি রেখে জ্যোতিরাণী ফিরলেন, মেঘনার ঘুম-দেখা রোগ আছে, তুমি এই সকালেই বেরিয়ে পড়েছ?

করি কি বল, বাঁশী শুনলে কি-বা দিন কি-বা রাত। খাটের ওপর আয়েস করে বসলেন মৈত্রেয়ী, আগে চা আনতে বলো, পরে কথা—

অন্য সময় হলে জ্যোতিরাণীও পাল্টা রসিকতা করতেন, নিরীহ মুখে হয়ত জিজ্ঞাসা করতেন, বাঁশী কোথাকার, বিলেতের কিনা।—চা আসছে, তুমি কথা শুরু করে দাও।

মৈত্রেয়ীর হাসিমুখে পর্যবেক্ষণের গাম্ভীর্য।—রাতে ঘুম হয়ে ছিল, না সমস্ত রাত ভেবেই কাটালে?

টেলিফোন না করে সকালে ছুটে এলো কেন জ্যোতিরাণী সরাসরি সে কথাটাই শুনতে চান। জবাব দিলেন, ঘুম তো তোমারই হয়নি মনে হচ্ছে।

তা যা বলেছ, রাতটা গণ্ডগোলের মধ্যে কেটেছে। আয়নায় কাল তোমার নিজের মুখখানা দেখোনি তো, সত্যি ঘাবড়ে গেছলাম। ভাবলাম একবার টেলিফোন করি, কিন্তু রাত তখন সাড়ে এগারোটা, যদিই ঘুমিয়ে থাক ভেবে আর ডাকলাম না।

মনে মনে জ্যোতিরাণী বিরক্ত একটু। তোষামোদের মত লাগল। ট্রে-তে ভোলা চা আর খাবার নিয়ে এসেছে, খাটের ওপর খবরের কাগজ পেতে দিতে সে ট্রে রেখে চলে গেল। খেয়াল না করে জ্যোতিরাণী দুটো পেয়ালাতেই আগে চা ঢাললেন। ফলে মৈত্রেয়ীও আগে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিলেন গোটাকতক, পরে খাবারের ডিশে মন দিলেন। বললেন, খিদেও পেয়েছে দেখছি।

মুখোমুখি জ্যোতিরাণী নিজের পেয়ালা নিয়ে বসেছেন। একটু বাদে যে প্রশ্ন শুনলেন তার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না।

মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করলেন, তা কালকের তোমার সেই স্টেশন-বউয়ের খবর জানার ইচ্ছে আছে বোধ হয়?

জ্যোতিরাণী সচকিত। মিত্রাদির হাসিচাপা খুশি-খুশি মুখ দেখে এতক্ষণে মনে হল কিছু একটা খবর দেবার জন্যেই এসেছে।—কেন, তুমি শুনেছ কিছু? রাতে থানাতেই ছিল?

না, রাত্রিতেই ছাড়া পেয়েছিল।

জ্যোতিরাণী উৎসুক, উৎকণ্ঠিতও।—কোথায় গেল তাহলে ?

গেল না কোথাও, ট্যাক্সি চেপে সটান তোমার মিত্রাদির বাড়ি চলে এলো।

বিস্ময় ধরে না জ্যোতিরাণীর। মিত্রাদি হাসছে মুখ টিপে। তার এই আসাটা ভাল লাগছে এখন, হাসিটা ভাল লাগছে। কিন্তু শুনলেন যা, বিশ্বাস করবেন কি করবেন না বুঝছেন না।

···তার মানে তুমি তাকে নিয়ে এসেছ ?

নিয়ে আসব না তো কি ঘরে বসে হা-হুতাশ করব ! রাত পোহালে ও-মেয়ে কার খপ্পরে গিয়ে পড়ত ঠিক আছে ?

কিন্তু ওকে পেলে কি করে ?

পেলেন কি করে উৎফুল্ল মুখে সেই অধ্যায় বিস্তার করলেন মৈত্রেয়ী। গতকাল জ্যোতিরাণীর যন্ত্রণা আর ছটফটানি দেখে তাঁরও অশান্তি কম হয় নি। ঘটনা যা শুনেছেন, সময়ে কিছু একটা না করতে পারলে মেয়েটা যে হারিয়েই যাবে তাতে তাঁর একটুও সন্দেহ ছিল না। বিপাকে পড়লে তেজ আর কতদিন থাকতে পারে ? কলকাতার আলোর নীচের অন্ধকারে ও-রকম অনেক বীথি ঘোষ হারিয়ে গেছে। সব জানেন বলেই জ্যোতিরাণীকে যা-হোক একটু সান্ত্বনা দিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন তিনি। বাড়ি ফিরে কি করা যায় ভাবতে ভাবতে সন্ধ্যে গড়িয়েছে। তারপর টেলিফোন নিয়ে বসেছেন। পুলিসের দুই-একজন পদস্থ লোকের সঙ্গে চেনা-জানা আছে বলে রক্ষা। তবু মেয়েটার হদিস পেতে পেতে রাত। তাদের সুপারিশের ব্যবস্থা করে ট্যাক্সি ধরে সোজা উত্তর কলকাতার দিকে ছুটেছেন তারপর।··মেয়েটা, মানে বীথি ঘোষ একটা অন্ধকার খুপরি ঘরে মোমের পুতুলের মত বসেছিল চুপচাপ, তাঁকে দেখে হাঁ। সকলে যত বোঝাচ্ছে এই মহিলা তাঁর আশ্রয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন তাকে, সে নড়েও না চড়েও না। শেষে মৈত্রেয়ী যখন চেহারা-পত্র বর্ণনা দিয়ে স্টেশনে-দেখা জ্যোতিরাণীর কথা বলেছেন আর তাঁর কথামতই তিনি ওকে নিতে এসেছেন জানিয়েছেন—তখনই চমক ভেঙেছে মেয়েটার, উপুড় হয়ে পড়ে সে কি কান্না তখন। জ্যোতিরাণীর নামও ভোলেনি মেয়েটা, পুলিসের নোট-বইয়ে লেখানোর সময় শুনেছিল—আসার পথেও কেঁদেছে আর বলেছে, স্টেশনে দেখেই মনে হয়েছিল ওঁর বাইরেটা যেমন সুন্দর, ভিতরটাও তেমনি সুন্দর তেমনি বড়।

কি লজ্জা, চোখে জল আসার উপক্রম জ্যোতিরাণীর। কথার ফাঁকে মৈত্রেয়ী দ্বিতীয় পেয়ালা চা ঢেলে নিয়েছেন, জ্যোতিরাণীর এক পেয়ালাই শেষ হয়নি।

মিত্রাদিকে দেখছেন তিনি। দশটা মিনিট আগেও এই মিত্রাদিকে তিনি যেন চিনতেন না। জ্যোতিরাণী কি করেছেন—গতকাল চোখের সামনে অমন বুক-ভাঙা ব্যাপার দেখেও কি করতে পেরেছেন তিনি? গাড়ি চেপে বাড়ি এসেছেন, তারপর হা-হুতাশ করেছেন আর ছটফট করেছেন। মিত্রাদির বাড়ির তুলনায় এ-বাড়িটা প্রাসাদ, আর মিত্রাদির সঙ্গতির তুলনায়…তুলনা চলেই না। তবু মিত্রাদি যা করতে পারল তা করার কথা তাঁর মনেও আসে নি। মিত্রাদি এলো শুনল, চটপট চলে গেল, টেলিফোনে খোঁজ নিল, ব্যবস্থা করল, তারপর নিজে ছুটে গিয়ে বুকে করে তুলে নিয়ে চলে এলো। একটা রাতের মধ্যে মিত্রাদি বুঝি পিচ্ছিল অন্ধকার থেকে জীবনের আলোয় এনে দাঁড় করিয়ে দিল বউটাকে।

ওমা, আমার দিকে এভাবে চেয়ে দেখছ কি?

তুমি বড় ভাল মিত্রাদি।

বাঁচা গেল, উৎফুল্ল মুখে মৈত্রেয়ী জবাব দিলেন, দেখো বাপু, আসল কথা হল তোমার জোরে আমার জোর। নইলে ভাল হই আর যাই হই আমার সাধ্য কি কিছু করি। কাল তোমাকে ওভাবে যন্ত্রণায় ছটফট করতে দেখে কষ্ট যেমন হয়েছিল, ভালও ততো লেগেছিল। ভাবলাম, কিছু যখন করবই এবার আমরা তখন যে মেয়েটা বুকে এভাবে দাগ কেটে গেল তোমার, তাকে ছেড়ে দিই কেন? তাকে দিয়েই তো শুরু হতে পারে। ব্যস, নিয়ে এলাম। এখন দায়-দায়িত্ব সব তোমার, আমি সঙ্গে আছি এই পর্যন্ত।

জ্যোতিরাণীর মুখে হাসি ফুটল, বললেন, উল্টো—

উল্টো কি?

দায়-দায়িত্ব সব তোমার, আমি সঙ্গে আছি।

হাসিমুখে ভুরু কোঁচকালেন মিত্রাদি, তারপর বললেন, তাতেও রাজি, কিন্তু তাহলে সঙ্গে নয় তোমাকে সামনে থাকতে হবে। তোমার ওই গাড়িটা পেলে আর ইচ্ছেমত তোমাকে সামনে ঠেলে দিতে পারলে মিত্রাদি অনেক বড় কাণ্ড ফেঁদে বসতে পারে। তুমি চাইলে কে যে কি না দেবে আমার সন্দেহ আছে।

তরল উক্তিও এখন খারাপ লাগছে না জ্যোতিরাণীর, বললেন, চাইতে বয়ে গেছে আমার। বীথিকে নিয়ে এলে না কেন?

ভেবেছিলাম আনব, কিন্তু কদিন খায় নি আর ক'রাত ঘুমোয়নি কে জানে। সকালে সাতবার ডেকেও সাড়া পেলাম না, মড়ার মত ঘুমুচ্ছে।

এর পর আরও যা শুনলেন জ্যোতিরাণী, কানের পর্দা ছিঁড়ে-খুঁড়ে যাবার দাখিল।…গরীব ঘরের মেয়ে ছিল বীথি, গরীব ঘরের বউ হয়ে এসেছে। বছর দুই

বিয়ে হয়েছে। অভাব ছিল, কিন্তু দুঃখ ছিল না। স্বামী আর অথর্ব শ্বশুর নিয়ে নির্ঝঞ্ঝাট সংসার। ঘরে পড়াশুনা করে একটা পরীক্ষা দেবার জন্যেও তৈরী হয়েছিল বীথি। স্বামী ব্যাঙ্কের সামান্য চাকরি করত। দুর্যোগের মধ্যেও অনেক কৌশলে আপিস করত, অনেক কৌশলে ফিরত। কিন্তু একদিন আর ফিরল না। তারপর কটা দিন গেল, কটা রাত গেল, একটা খবরও মিলল না। চারদিকে কাটাকাটি-হানাহানি, পড়শীরা যে যার ঘর-বাড়ি ফেলে পালাচ্ছে, কে কার খবর দেবে? শ্বশুর পাগলের মত হয়ে গেল, বীথি বলির পশুর মত থরথর কেঁপেছে।···কপালে সিঁদুর দিতে ভুলেছিল একদিন, শ্বশুর পাগলের মত গর্জন করে উঠেছে, সিঁদুর কই? সিঁদুর পরনি কেন? শাস্ত্রে আছে বারো বছর দেখতে হবে, বারো বছর অপেক্ষা করতে হবে—যাও সিঁদুর পরে এসো!

কিন্তু বারো বছর ছেড়ে ওখানে বসে বারো দিনও অপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি আর। আশপাশের খালি বাড়ি যারা দখল করে বসেছে, তারা জেনেছে অথর্ব বুড়োর ঘরে আর কে আছে। শ্বশুরকে একদিন তারা জানিয়েই দিয়েছে, তার জীবনরক্ষার ভার তারাই নেবে, যদি···

ভিতরে এসে শ্বশুর পাগলের মত চেয়ে চেয়ে দেখেছে বউকে। সে চাউনি দেখে বীথির যা মনে হয়েছিল শ্বশুর যদি তাই করত, ভাল হত। বীথির মনে হয়েছিল, বঁটিটা এনে এক্ষুনি বুঝি কুপিয়ে শেষ করবে তাকে। কিন্তু অসুস্থ রুগ্ন শ্বশুর তা করতে পারে নি। সেই রাতেই বউকে নিয়ে পালিয়েছে। কেমন পালানো সেটা? মৃত্যুর মুঠোয় জীবন সঁপে পালানো।···কলকাতায় পা দিয়েই শ্বশুরের পালানো শেষ হল বটে। বীথির হল না।

মিত্রাদিকে বারকতক থামতে বলার চেষ্টা করেছিলেন জ্যোতিরাণী। পারেননি। নির্বাক পুতুলের মত বসে শুনেছেন শুধু।

এতক্ষণ ধরে কি নিয়ে এত জটলা হচ্ছে ভেবে না পেয়ে সিতু আর শমী বার কয়েক এসে উকিঝুঁকি দিয়ে গেছে, মেঘনা আর সদাও বাইরে থেকে ঘুরে গেছে দুই-একবার—জ্যোতিরাণী টেরও পান নি।

মিত্রাদির কথায় লঘু-গুরুর সমাবেশ হয়েই থাকে। কি মনে পড়তে একগাল হেসে খানিকটা রসের যোগান দিলেন তিনি। বললেন, মেয়েটার বুদ্ধি-সুদ্ধি আছে বটে, আবার বোকাও একটু। স্টেশনে কাল বিভাসবাবু সঙ্গে তোমাকে আর ওই শমী মেয়েটাকে দেখে তাঁকেই তোমার ভদ্রলোক ভেবে বসে আছে। জিজ্ঞাসা করছিল, ওঁদের রেখে উনি কোথায় গেলেন। আমি হেসে বাঁচি না—

এ-রকম স্থূল রসিকতার ধারে-কাছেও ছিলেন না জ্যোতিরাণী। হঠাৎ একটা

ধাক্কা খেয়ে অতি-চেনা এক অভ্যস্ত বাস্তবের মধ্যে ফিরে এলেন আবার।···অভ্যস্ত কিন্তু অনুকূল নয় সর্বদা। খানিক আগে মিত্রাদিকে যত ভাল লেগেছিল, এই হাসি ততো লাগল না। চকিতে মনে পড়ল কি। রসের খোরাক পেলে মিত্রাদির মুখ-চাপা থাকে না···বিভাস দত্তর 'অন্ধতামিস্র' শুনছিলেন যখন, ছেলের আলো নিবিয়ে অন্ধতামিস্র ঘটানোর সরস খবরটাও চাপা থাকেনি। হেসে না বাঁচার মত এই রসের খবরটাও একজনের কানে গেলে প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে পলকের মধ্যে তাও বুঝি ভেবে নিতে চেষ্টা করলেন একবার। তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে বললেন, কোনদিন দেখে নি, চেনে না জানে না—বলল বলে একেবারে হেসে না বাঁচার কি হল ?

হাসি গিলে বিড়ম্বনায় পড়ার মত করে মৈত্রেয়ী বললেন, বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালার গল্প মনে পড়ে যায় যে! উপমা বেশি স্থূল হয়ে গেল, পরমুহূর্তে নিজেই সচেতন। ঘাবড়ে যাবার মত মুখ করে সামাল দিতে চেষ্টা করলেন, এই যাঃ, এবারে বোধ হয় রেগেই গেলে—

রাগ না হোক জ্যোতিরাণী বিরক্তি চাপতে চেষ্টা করছিলেন ঠিকই। মুশকিল, কিছুই ভোলেন না তিনি।—এগারো বছর আগে শ্বশুরের পৈতৃক বাড়িতে তাঁকে প্রথম দেখে বিভাস দত্তও ঘরের লোককে শুনিয়েই বলে উঠেছিলেন, এ কার গলায় কি মালা পড়ল কালীদা! কিন্তু এগারো বছর আগের সেই ঘরের লোক সকলের চোখেই আজ মুক্তোর মালার অধিকারী বটে।···রাগে সাদা হয়ে সেদিন নিজেই বলেছিল, টাকা ছড়ালে তাঁর মত অনেক মেয়েকে হাতের মুঠোয় আনা যায়।

জ্যোতিরাণী ফিরে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলেন, মুক্তোর মালার গল্পটা বাঁদরের গলায় পড়ার পরে তৈরী হয়েছিল না পড়েছে ভেবে ? কিন্তু সূক্ষ্ম ঠেস মিত্রাদির মগজে ঢুকবে কিনা সন্দেহ। মৃদু হেসেই জবাব দিলেন, রাগের কি আছে, তবে মুক্তোর মালাটা যে-গলায় পড়েছে সেই গলাখানা পেলে তুমি বর্তেই যেতে মনে হচ্ছে।···

চায়ের ট্রের ওপর দিয়ে ঝুঁকে দু হাত বাড়িয়ে মিত্রাদি হঠাৎ জড়িয়েই ধরতে চেষ্টা করলেন জ্যোতিরাণীকে। উচ্ছ্বাসের চপল আবেগে বলে উঠলেন, সত্যি বলছি ভাই বর্তে যেতাম, একেবারে ঠিক-ঠিক বলছি—ইস এত টাকা ভদ্রলোকের, একেবারে চণ্ডীমূর্তি ধরে যত পারি আদায় করে নিতাম, কি না করতে পারতাম, বীথি ঘোষের মত মেয়েটা দু-দণ্ড চোখের জল ফেলার সময়ও পেত না।···আমারটা যে থাকলই না, নইলে শুধু এই লোভেই বদলা-বদলির প্রস্তাব করে ফেলতাম ভাই।

হেসে সারা। হাসছেন জ্যোতিরাণীও। এই মিত্রাদিকেই খানিক আগে বড়

ভাল লেগেছিল তাঁর। আবারও লাগল। চপল উচ্ছ্বাসের ফাঁক দিয়ে আকাঙ্ক্ষার বড় রূপটাই চোখে পড়ল। তাছাড়া নিজের অজান্তে মিত্রাদি ভাবার মতই একটা কিছুর ওপর আঙুল ফেলেছে বুঝি।···নিজের স্বামী বিলেতে কার সঙ্গে ঘর করছে সেই খেদ নিয়ে বসে নেই। যে অবকাশ দুঃসহ বোঝা হতে পারত, সেটাই শমী বোস আর বীথি ঘোষেদের মুখে হাসি ফোটাবার প্রেরণা হতে পারে মিত্রাদির। কোথায় যেন পড়েছিলেন জ্যোতিরাণী, অল্প বস্তুই যদি ভাগ্যে জোটে, কপাল চাপড়ে বিলাপ করে কাটিয়ে দিও না—বসে নিবিষ্ট মনে আচার বানাও তাই দিয়ে, দেখবে একেবারে ব্যর্থ কিছুই নয়।

···এত অর্থ, এত সম্পদ, ভাগ্যের দিকে না চেয়ে জ্যোতিরাণী শুধু বিলাপের দিকটাই দেখছেন কেন?

মৈত্রেয়ী চন্দ পরদিন বিকেলে এলেন আবার। এলেন বীথি ঘোষকে নিয়ে। দোতলার বারান্দার সিতুর আপাত-সহচরী শমী বোস। নীচের সিঁড়ির গায়ে ট্যাক্সি আসার শব্দ হতে দুজনেই ঝুঁকে দেখেছে। ট্যাক্সিতে আর কে বসে আছে না আছে সিতু খেয়াল করেনি, কিন্তু মিত্রামাসীকে ঠিকই দেখেছে। দেখামাত্র দুই বুড়ো আঙুল শমীর মুখের কাছে ঠেকিয়ে বিকৃত ঘোষণা করেছে, আজও বেড়ানো হয়ে গেল!

কেন হয়ে গেল বুঝতে দেরি হয় নি শমীরও। হতাশারই ব্যাপার বটে। পরশু এসেছে এ-বাড়িতে, সেদিন তো এই মিত্রামাসী না কে—তাকে নিয়ে প্রায় সন্ধ্যে পর্যন্ত কাটাল মাসী। গতকাল সকালে এসেও ক'ঘণ্টা ধরে আটকে রাখল আর তারপর থেকে মাসী কি যে ভাবনা নিয়ে কাটাল সমস্ত দিন, কে জানে। ও যে এ-বাড়িতে মাত্র সাত-আট দিনের জন্য থাকতে এসেছে তাও যেন ভুলে গেছে—বিকেলে বেড়াতে বেরুবার নামও করল না। আজ আবার সেই একই বিঘ্ন।

মুখ ভার করে মাসীর কাছে চলল সে, মা-কে কিছু বলবে মনে হতে তার পিছনে সিতুও।

শাশুড়ীর ঘর থেকে ফিরছিলেন জ্যোতিরাণী, শমীর গাল ফোলা দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। তক্ষুনি ধারণা ছেলে কিছু দুষ্টুমি করেছে।

আজও বেড়াতে যাওয়া হবে না তো!

···ছেলের দুষ্টুমি নয় তাহলে, হাল্কা সুরে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, হবে না কেন?

সিতু জানান দিল, মিত্রামাসী এসেছে।

শমী বলল, একা না আবার, সঙ্গে স্টেশনের সেই বউকেও নিয়ে এসেছে।

শোনা মাত্র জ্যোতিরাণী ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু যেতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়লেন, শমীর আশাভঙ্গের মুখই বটে। অদূরে ঝাঁটা হাতে মেঘনা দাঁড়িয়ে। তাকে বললেন, মেঘনা, সদাকে বল্‌তো গাড়িটা নিয়ে ওদের দুজনকে একটু বেড়িয়ে আনুক। ছেলের দিকে ফিরলেন, একটা নালিশ শুনি তো কাল থেকে বেরুনো বন্ধ মনে থাকে যেন—

কিন্তু ওদিক থেকে মেঘনার জবাবটা অপ্রত্যাশিত। চাপা গলায় গজগজ করে উঠল, ডেকে দিচ্ছি, তুমি হুকুম দাও—এ-বাড়ির কারও মেজাজের ঠিক নেই আজকাল।

অবাক হবারই কথা, কারণ ওদের মধ্যে মুহুর্মুহু মেজাজের গরমিল হয় মেঘনারই। পরক্ষণে সদা বেরিয়ে এলো, তার পিছনে মেঘনা। সদার মূর্তি বরাবরই ঠাণ্ডা, তবু জ্যোতিরাণীর কেমন মনে হল এই ঠাণ্ডা মুখ বেশ কয়েকদিন ধরে বড় বেশি নির্লিপ্ত যেন। নির্দেশ শুনেও সদা দাঁড়িয়েই রইল। অতএব যেতে গিয়ে আবারও ফিরে তাকালেন জ্যোতিরাণী।

···আমার শরীরটা তেমন ভাল ঠেকছে না বউদিমণি, মেঘনাকে বল।

দুই-এক পলক মুখের দিকে চেয়ে দেখে নিলেন জ্যোতিরাণী, তারপর মেঘনাকেই যেতে হুকুম করে তাড়াতাড়ি সিঁড়ির দিকে এগোলেন।...সদার মুখ শুকনোই বটে, হতেও পারে শরীর খারাপ। তবু খটকা লেগেই থাকল। স্বাধীনতার পরদিন ভোরে উঠেই মেঘনার মুখে শুনেছিলেন সদা বাবুর কাছে বকুনি খেয়েছে খুব। মনে হল, তারপর থেকে সদাকে অন্যরকম দেখছেন একটু।···কেন যে সকালে উঠেই বকুনি খেয়েছিল আজও জানেন না। ভাবার অবকাশ পেলেন না, নীচে ওরা বসে আছে।

ঘরে পা দিতেই মৈত্রেয়ী বললেন, এই নাও ভাই, দিদিকে দেখার জন্যে মেয়ে অস্থির একেবারে।

এক নজর তাকিয়েই জ্যোতিরাণীর মনে হল মিত্রাদি বাড়িয়ে বললেন। দুর্ভাগ্যের অভিশাপ মাথায় নিয়ে যে মেয়ে দৃষ্টির আড়ালে মিশে যেতে চায়—সেই মুখ, সেই চাউনি। স্টেশনে-দেখা সেই অপ্রকৃতিস্থ খরখরে ভাবটা নেই বটে, কিন্তু জীবনের তাপও নেই বুঝি।···বিভাসবাবু বলেছিলেন, পদ্মার শোকের তল-কূল নেই।

মিত্রাদি যদি জোর করে টেনে এনেই থাকে তাকে, ভাল করেছে। অল্প-স্বল্প প্রসাধন করিয়েছে, বাসন্তী রঙের সুন্দর একটা দামী শাড়ি পরিয়ে এনেছে। কপালে কুমকুমের টিপ, সিঁথিতে সিঁদুর। বীথি ঘোষ মুখ তুলে দেখল তাঁকে, তারপর আস্তে

আস্তে উঠে দাঁড়াল। প্রণাম করার জন্য নত হবার আগেই জ্যোতিরাণী দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন তাকে, মিত্রাদির মত পদ্মার শোকটাকে আমল দিতে চাইলেন না তিনিও। বললেন, না এলে আজ সন্ধ্যেয় দিদিই তোমাকে দেখতে ছুটত, আমাদের ভাগ্য যে তোমাকে পেয়েছি—এখানে নয়, মিত্রাদি ওপরে চল।

হাত ধরে বীথিকে নিয়ে চললেন জ্যোতিরাণী। একেবারে নিজের ঘরে এনে বসালেন। মৈত্রেয়ী বীথির মুখখানা দেখে নিয়ে সকৌতুকে জ্যোতিরাণীর দিকে ফিরলেন।—আমার মতই উনিশ-বিশ অবস্থা ভেবেছিল বোধ হয় তোমারও—এখানে এসে হকচকিয়ে গেছে। কেন বাপু, তোমাকে তো বলেছিলাম, এই দিদিটির সঙ্গে ওই দিদির তুলনাও কোরো না।

শেষেরটুকু বীথির উদ্দেশে। মিত্রাদির কথার মাথামুণ্ডু নেই, সঙ্কোচ এড়াবার চেষ্টায় ছদ্মকোপে ভ্রূকুটি করলেন জ্যোতিরাণী, আবোল-তাবোল বকে ওকে ঘাবড়ে দিও না বলছি। বীথির গা ঘেঁষে বসে পড়লেন, এখন থেকে এই দুই দিদির অবস্থার সঙ্গে তোমার আর কোনো তফাৎ নেই, বুঝলে?

পদ্মার স্থির শোকেও সামান্য দোলা লাগল বুঝি। দু চোখ তুলে বীথি তাকালো তাঁর দিকে। কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস প্রকাশের শক্তি নেই, নীরব-নির্বাক একটুখানি ভাষা আছে শুধু।

ভিতরে ভিতরে জ্যোতিরাণী ব্যস্তই হয়ে উঠেছেন। এত আদরের কেউ আর যেন তাঁর ঘরে পদার্পণ করেনি। এই মুহূর্তে ওর জন্য অনেক কিছু করতে পারলে ভালো লাগত। কিন্তু কি করবেন বা কি বলবেন ভেবে পেলেন না। পাছে কোনো কিছুতে আতিশয্য প্রকাশ পায়, সেই সঙ্কোচ। গতকাল থেকে কিভাবে কেটেছে, মিত্রাদি সেই প্রসঙ্গ তুলতেই ঘর ছেড়ে চলে এলেন তিনি। মিত্রাদির দোষ কি, বোবার মত চুপচাপ তিনজনে বসে থাকে কি করে।

মেঘনা বাড়ি নেই, নিজেই জলখাবার আর চায়ের ব্যবস্থা করে নিয়ে ফিরলেন। সাধাসাধি করতে হল না, একবার বলতেই বীথি মুখে দিল কিছু। হাত গোটাতে মিত্রাদি তাড়া দিল, ও কি, ওগুলো পড়ে থাকবে নাকি—আমার ডিশ সাবাড় হয়ে এলো দেখছ না!

অগত্যা আরো কিছু মুখে তুলল। এই আতিথেয়তাও আনুষ্ঠানিক লাগছে জ্যোতিরাণীর। মিত্রাদির দ্বিতীয় তাড়ার ভয়ে বীথির এবারে হাত থামতে ট্রে-টা সরিয়ে ফেললেন তিনি। বললেন, যা পেরেছে খেয়েছে, তুমি ওকে ব্যস্ত কোরো না বাপু। পাশ ঘেঁষে বসলেন আবার, টুকটাক দুই-এক কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। ···ম্যাট্রিক কবে পাস করেছে, বিয়ের আগে না পরে, আত্মীয়পরিজন আর কেউ

কোথাও আছে কিনা।

জবাব পেয়েছেন। পাস বিয়ের আগেই করেছিল। আত্মীয়পরিজন ছিল। এখন আছে কিনা জানে না। কে কোথায় আছে, জানে না।

কথা ফুরোতে দু মিনিটও লাগল না। একটু চুপ করে থেকে জ্যোতিরাণী আস্তে আস্তে বললেন, ভোলার মত দুঃখ তো পাওনি, জলতে তো হবেই।… তবে যেখানে আছ, এরপর কি হবে সে দুশ্চিন্তা আর কোরো না।

হাল্‌কা সুরে মৈত্রেয়ী মন্তব্য করলেন, আমার বাড়িতে আছ বলে আমার কাছেই আছ ভেবে বসে থেকো না—আছ ওইখানে।

জ্যোতিরাণীকে দেখিয়ে দিলেন। শুনে বীথিও তাঁর দিকেই তাকালো। জ্যোতি-রাণী অস্বস্তি বোধ করলেন, কালো চোখের গভীরে পদ্মার শোক আর জমাট বেঁধে থাকবে না মনে হল। একটু জোর দিয়েই তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, তুমি কাঁদবে না বীথি, কক্ষনো কাঁদবে না—তোমার শক্তি তো আমি দেখেছি, পাজী লোকটাকে মাটিতে থেঁত্‌লে দিয়েছিলে তুমি, এই দু দিন যতবার তোমার কথা মনে হয়েছে, সব ভুলে আমি শুধু তোমার সেই মুখখানাই মনে করতে চেষ্টা করেছি। শোক বুকে বেঁধে তুমি না দাঁড়ালে আর কে দাঁড়াবে!

পদ্মার শোক চোখের দিকে ধাওয়া করল না আর, প্রাণপণ চেষ্টায় বীথিই রোধ করল। শোকের কিছু বাষ্প শুধু দু চোখের পাতায় লেগে থাকল। জ্যোতিরাণীর তপ্ত লালচে মুখের দিকে নিষ্পলক চেয়ে রইল সে।

কাগজে-কলমে এখনো প্ল্যান কিছু দেননি মৈত্রেয়ী চন্দ, কিন্তু তাঁর আসল প্ল্যানে একটুও ফাঁক ছিল না। শতকরা পুরোপুরি সেটা সফল হয়েছে।

বুকের তলায় একটা উদ্বেল মুহূর্তকে পাকাপোক্তভাবে বেঁধে ফেলা। যে-বুকের তলার খবর মোটামুটি তিনিই ভালোই রাখেন। আর তার থেকেও অনেক বেশি রাখেন তার টাকার খবর। তাঁর কল্পনায় শিবেশ্বর চাটুজ্যে টাকার পাহাড় রচনা করে চলেছেন দিনে দিনে—সে-টাকা যে কত টাকা তার সামান্য আঁচ একসঙ্গে বিদেশে যাওয়ার সময় পেয়েছিলেন। তারপর অনেক সময় কালীনাথের লঘু রসিকতার ফাঁক দিয়েও শিবেশ্বরের ঐশ্বর্যের আভাস কিছু মিলেছে, আর দিনে দিনে স্বয়ং কমলার সভা-পরিষদদের ওপর তাঁর প্রতিপত্তিও নিজের চোখেই কিছুটা দেখছেন। তবু যে-করেই হোক একটা ব্যাপার মৈত্রেয়ী চন্দ খুব ভালই উপলব্ধি করতে পারেন। এমন তেড়েফুঁড়ে বড়লোক হবার বহু আগে থেকেই ওই মানুষের ঘরের সমাচার আদৌ কুশল নয়। আর পরবর্তী কালে অঢেল অর্থও ফাঁক জুড়তে

পারেনি। কিন্তু পারুক না পারুক, মৈত্রেয়ী নিসংশয়, এহেন প্রতিপত্তিশালী মানুষটির ওপর অথবা তাঁর বিত্তের ওপর দখল নেবার জন্য জ্যোতিরাণী চাটুজ্যে হাত যদি বাড়ায়—ইচ্ছেয় হোক, অনিচ্ছেয় হোক সে হাতের মুঠো ভদ্রলোককে ভরে দিতে হবে।

এ শুধু মৈত্রেয়ীর ধারণা নয়। বিশ্বাস। এ বিশ্বাসে আতিশয্য থাকতে পারে, কিন্তু এরই ওপর নির্ভর করে তিনি সংকল্পের পথে পা ফেলেছেন।…মানুষটার ওপর দখল নেবার জন্য জ্যোতিরাণী চাটুজ্যে হাত কোনদিন বাড়াবে কিনা তা নিয়ে তিনি মাথা ঘামান না। তাঁর বিত্তের দিকে হাত বাড়াক এটুকুই তিনি চেয়েছেন। তাঁর সেই সংকল্প এতদিনে সফল হবার মুখে।

জ্যোতিরাণীর বুকের তলার উদ্বেল মুহূর্তটাকে মৈত্রেয়ী চন্দ পাকাপাকি বেঁধে ফেলেছেন রাতারাতি এক মেয়েকে থানা থেকে ছাড়িয়ে একেবারে নিজের বাড়িতে এনে ফেলে।

বীথি ঘোষকে।

চোখের সামনে ক্ষত তুলে ধরা এক ব্যাপার, আর অদেখা ক্ষত সারানোর কল্পনায় গা-ভাসানো আর এক। জ্যোতিরাণীর বুক-ছুমড়নো আকুতি দেখে সেই জীবন্ত ক্ষতটাই তাঁর সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিতে পেরেছেন মৈত্রেয়ী চন্দ।

এখন আর শুধু আশা নয়, এখন তাঁর বিশ্বাস এবারে কিছু হবে। কিছু গড়ে উঠবে।

বিশ্বাস দিনে দিনে পুষ্টিলাভ করছে।

বীথি ঘোষকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে শুধু তার নয়, বহু বীথি ঘোষেদের জন্য আর শমী বোসেদের জন্য কিছু গড়ে তোলার দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন জ্যোতিরাণী। কল্পনায় বিভোর হয়েছেন, বিহ্বল হয়ে কাটিয়েছেন কটা দিন। সত্যি কথা, বাস্তবের ওপর দিয়ে পা ফেলে চলেননি তিনি। ভেবেছেন, জীবন আর এমন একঘেয়ে কাটবে না, কাজের অভাব কি তাঁর? ওই বীথি ঘোষেরা যদি হাসে, আর শমী বোসেরা যদি হাসে—সেই হাসির আলোয় তাঁর ঘরে জীবনের একটুখানি অন্ধকার ঘুচে যেতে মুছে যেতে কতটুকু সময় লাগবে?

বীথিকে আরো একদিন নিয়ে এসেছেন মিত্রাদি, উদ্দীপনায় জলজল করেছে জ্যোতিরাণীর মুখ। সেদিনও বলেছেন, কাঁদবে না বীথি, কক্ষনো কাঁদবে না, আমার এখানেই সাত বছরের ছোট্ট ফুটফুটে একটা মেয়ে আছে, বাবা-মা-ভাই সব খুইয়ে তোমার মতই ভেসে এসেছে। বোবো, তোমার বয়েস নয়, সাত বছরের মেয়ে—হেসে-খেলে বেড়ায়, কিন্তু ওইটুকু মেয়েরও বুকের মধ্যে কি কান্না যে জমে

আছে আমি টের পাই। তুমি যদি কাঁদ বীথি, ওদের কান্না ভোলাবে কে? ওরা তোমার মত বীথি হবে কেমন করে?—শমী, শমী!—

জোরেই ডেকে উঠেছেন। শমী কাছে আসতে তাকে কোলে বসিয়ে মিত্রাদি আর বীথিকে দেখিয়ে বলেছেন, এই দেখ্ তোর আর এক মাসী, আর এই আর একটা—

স্টেশনে গুণ্ডায় ধরা এই বউকে শমী আগের দিনই চিনেছিল। বিস্ময় আর উত্তেজনা সিতুদার কাছে প্রকাশ করেছিল।

বীথির মুখে আলো তখনো ফোটেনি বটে, কিন্তু মুখখানা কোমল হয়েছে। মেয়েটাকে দেখেছে চেয়ে চেয়ে, তারপর দু হাত বাড়িয়ে শমীকে নিজের কাছে টেনে নিয়েছে। তাইতেই খুশি ধরে না জ্যোতিরাণীর।

সঙ্গে সঙ্গে মৈত্রেয়ীরও।···কিছু এবার হবেই একটা।

নতুন দু-দুটো মাসী লাভ করে খুশি শুধু ক্ষুদ্রকায়া শমী বোসই হতে পারেনি। একমাত্র যে-মাসীটির ওপর তার লোভ, এই সাত-আট দিনের মধ্যেও তাকে যেন মনের মত কাছে পায়নি। ওই মিত্রামাসীটি বলতে গেলে রোজই প্রায় তাকে দখল করে বসেছে। তারপরেও সারাক্ষণ কি ভাবনা নিয়ে যে কাটিয়েছে তার খাস মাসী, শমী তার হদিস করে উঠতে পারেনি।

ন' দিনের দিন কাকু এসে তাকে নিয়ে গেছে। ছোট বুকে একটু অভিমান নিয়েই যে চলে গেছে সে, মাসী তা-ও জানে কিনা সন্দেহ। বাড়ির থেকে ঢের ঢের ভালো থেকেছে বটে, তবু ঠিক যতখানি ভালো লাগবে মাসীর বাড়িতে ভেবেছিল, ততখানি লাগেনি। মাসীর চোখ ছিল না বলে ফাঁক পেয়ে সিতুদাও তার ওপর হামলা করেছে একটু-আধটু, তার গাল ধরে টেনে ব্যথা করে দিয়েছে, গা চটকেছে। আবার চোখ রাঙিয়েছে, খবরদার! মা-কে বলবি তো বিয়ে বন্ধ!

এক-একদিনের হৃদ্যতার ফলে সিতুদা আশ্বাস দিয়েছে বড় হয়ে বিয়েটা ওকেই করবে। সেটা খুব লোভনীয় মনে হয়নি শমীর কাছে। কারণ, তার মতে অমন ভালো মাসীর ছেলে হলেও সিতুদা এক নম্বরের বজ্জাত। কিন্তু বিয়েটা সিতুদার সঙ্গে হলে এ-বাড়িতে এই মাসীর কাছেই থাকতে পারবে বরাবর—এই লোভ বিসর্জন দেওয়া সহজ নয়। তাছাড়া নালিশ করলে মাসী বকবেই সিতুদাকে আর তারপর সিতুদাও আড়ি করে দেবেই তার সঙ্গে। মাসী নিজের মনে আছে, এর ওপর সিতুদাও আড়ি করলে কটা দিন এখানে কাটাবে কি করে। কালী-জেঠুর সঙ্গে অবশ্য ভাব-সাব মন্দ হয়নি তার, দুদিন চমৎকার টফি আর লজেন্স খাইয়েছে তাদের, তাছাড়া গল্প না করলেও এক-একসময় বেশ মজা করে ওদের নিয়ে।

কিন্তু তাকে তো সেই রাত্রিতে এক ঘণ্টার বেশি পাওয়া যায় না। আর পেলেও, যখন গম্ভীর মুখ করে থাকে কাছে ঘেঁষতে সাহস হয় না। অতএব অনিচ্ছা সত্ত্বেও সিতুদার কিছু অত্যাচার তাকে মুখ বুজে সহ্য করতে হয়েছে।

বিভাসবাবুর সঙ্গে সাক্ষাতে শমীর সম্পর্কে গোটাগুটি দ্বিধাশূন্য হতে পেরেছেন জ্যোতিরাণী। বলেছেন, আপনি কলকাতায় থাকুন আর না থাকুন, এরপর শমী মাঝে মাঝে আমার কাছে এসে থাকবে। আর একটা কথা, ভেসে-আসা মেয়ের মত করে ওকে মানুষ করার চিন্তা আপনি আর করবেন না, ওকে অভাব-অনটন চিনিয়ে কাজ নেই। আপনি তো আছেনই, তাছাড়াও ওর সব দায় নিতে পারে এমন কেউ আছে জানবেন—ও যত বড় হতে পারে, হবে।

বিভাস দত্ত মুখ তুলে দেখেছেন এক-একবার, মৃদু মৃদু হেসেছেন, জামার বোতাম খুঁটেছেন, সিগারেটের প্যাকেটের খোঁজে পকেট হাতড়েছেন। যাবার আগে আর স্টেশনের সেই বিভ্রাটের মধ্যে যাকে দেখে গেছলেন, সেই মুখ নয়। এই মুখে নতুন কিছুর কাঁচা তাজা আলো আশ্রয় নিয়েছে মনে হল। মাঝে মাঝে না তাকিয়ে পারছেন না তিনি। হেসেই জবাব দিলেন, আপনি সেদিন যা বলেছিলেন তাইতেই তো কথা দিয়েছিলাম ওকে ভালো রাখতে চেষ্টা করব—

জ্যোতিরাণী থতমত হঠাৎ।…সেদিন তিনি ঝাঁজিয়ে বলে উঠেছিলেন, আপনারই বা আর কে আছে যে এই একটা মেয়েকেও ভালোভাবে মানুষ করতে পারবেন না?…আর হৃষ্টমুখে বিভাস দত্ত স্বীকার করেছিলেন কেউ নেই বটে, আর বলেছিলেন চেষ্টা করবেন ভালভাবে মানুষ করতে।

কিন্তু পুরনো নিয়ে জট পাকাবার মন নয় এখন জ্যোতিরাণীর। হেসে ফেলে উক্তিটা প্রত্যাহার করলেন যেন।—সেদিন আপনার ওপর রাগ করে বলেছিলাম, আজ একটুও রাগ না করেই বলছি।

সেদিনের রাগটা বেশি মনে ধরেছিল কি আজকের রাগ না করাটা, বিভাস দত্ত জানেন। জিজ্ঞাসা করলেন, স্টেশনের সেই ব্যাপারটার কি হল, সাক্ষী দেবার জন্য ডাকটাক পড়ে নি তো?

না, আর পড়বেও না বোধ হয়

বলে ফেলেছেন, নইলে একটুও বলার ইচ্ছে ছিল না। বীথি ঘোষ দু'দিন এ-বাড়িতে এসেছে, শমীর কাছ থেকে পরে এ খবরটা জনতে পারবেন হয়ত, কিন্তু জ্যোতিরাণী আপাতত ব্যক্ত করতে চান না কিছু। পদ্মার জমাট-বাঁধা শোক একটুও তরল করা যায় কিনা দেখার সঙ্কল্প। পরে সবই জানবেন, কিন্তু এ নিয়ে একটা লঘু ইঙ্গিতও কাম্য নয় এখন।

মৈত্রেয়ী চন্দ প্রায় রোজই আসছেন, সেদিনও এলেন। ইদানীং নীচে অপেক্ষা না করে সোজা জ্যোতিরাণীর ঘরে চলে আসেন। কম করে ঘণ্টা দেড়-দুই আলোচনা হয়। সঙ্কল্প দুজনেরই এক বটে, কিন্তু মিত্রাদির চিন্তার সঙ্গে জ্যোতিরাণীর মানসিক চিত্রটা ঠিক যেন মেলে না। মিত্রাদি দুটো প্রস্তাব দিয়েছে। এক, কোন পরিচিত প্রতিষ্ঠানে হাজার কতক টাকা দিয়ে তাদের তত্ত্বাবধানে গুটিকতক মেয়েকে রাখা। কিন্তু এ-রাস্তায় এগনোটা মিত্রাদির নিজেরই মনঃপূত নয়, কারণ তাহলে তাদের আর করার কিছু থাকে না। দ্বিতীয় প্রস্তাব, সস্তায় কোথাও দু-তিনটে ঘর ভাড়া নিয়ে নিজেদেরই তত্ত্বাবধানে আট-দশটি মেয়েকে রাখা এবং নিজেদের সংস্থান তারা নিজেরা করে নিতে পারে যাতে সেই চেষ্টা করা।

এই দ্বিতীয় প্রস্তাবটাই অনেক—অনেক অনাবিল ব্যাপকতররূপে প্রতিফলিত করে তোলার বাসনা জ্যোতিরাণীর। গোটা চিত্রটা চোখে ভাসছে না বটে, কিন্তু যত ভাবছেন ততো বুঝি কাছাকাছি আসছে সেটা। সামনে বসে মিত্রাদির কাছে এই চিত্রটারই একটু আভাস দিতে চেষ্টা করলেন সেদিন।

তাঁর কল্পনা, শহর ছাড়িয়ে অনেক জায়গা-জমি নিয়ে মস্ত একটা বাড়ি থাকবে কোথাও। বাড়ি একটা ছেড়ে দুটো হলেই ভাল হয়। কম করে বিশ-পঁচিশটা ঘর থাকবে তাতে। আর গাছ-গাছড়া থাকবে, বাগান থাকবে। জনা যাটেক মেয়ে নেওয়া হবে প্রথমে নানা বয়সের। সব থেকে বেশি জোর দেওয়া হবে পড়াশুনার ওপর—মাস্টার থাকবে, ক্লাস বসবে। নানারকম হাতের কাজ শেখানোর জন্যেও লোক থাকবে, সরঞ্জাম থাকবে। যারা স্কুল-কলেজে পড়তে পারে তারা স্কুল-কলেজেই যাবে। যারা নার্স হতে চায় প্রতিষ্ঠানের খরচায় তারা নার্স হবার ট্রেনিং নেবে। কিন্তু নিজের পায়ে দাঁড়িয়েও কেউ প্রতিষ্ঠান ছেড়ে চলে যাবে না—সেটা আরো বড় করে তোলার দায়িত্ব নেবে। ছোট মেয়েদের দেখাশুনা করা আর গড়ে তোলার ভার থাকবে বড় মেয়েদের ওপর। বয়স্করা অবসর সময় হাতের কাজ শিখবে আর প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় সাংসারিক দায়িত্ব নেবে। চাকর-দারোয়ান কিছু থাকবে বটে, কিন্তু নিজেদের কাজ বেশির ভাগ নিজেরাই করবে সকলে। সেখানে জাত-বিচার থাকবে না, উঁচু-নীচু থাকবে না। আর খাওয়া-পরার একটুও দুশ্চিন্তা থাকবে না কারো। কি করে প্রতিষ্ঠান বড় হবে আর নিজেরা বড় হবে তারা শুধু এই ভাববে। যোগ্য হয়ে কেউ যদি সংসারী হতে চায়, হবে—কিন্তু এভাবে তৈরী হলে যেখানেই থাকুক, প্রতিষ্ঠানকে ভুলতে পারবে না নিশ্চয়···

মৈত্রেয়ী চন্দর মুখের ওপর একটা বড়-রকমের আশার আলো জ্বলে-জ্বলে উঠতে

লাগল। জ্যোতিরাণীর চিত্র-রচনা শেষ হতে না হতে বলে উঠলেন, এ যে স্বপ্নকথা গো! কিন্তু কত টাকা নিয়ে নামবে তুমি? এ-রকম করে শুরু করতে হলে' বাড়ি ছাড়াও লাখ দুই টাকার জোর থাকা দরকার বোধ হয়···তাতেও হবে কিনা সন্দেহ। সব সরঞ্জাম যোগাড় করা, আসবাবপত্র কেনা, গোছগাছ করা—শুরুতেই অনেক টাকা লাগবে, যেভাবে বলছ সেভাবে চালাতে হলে ব্যাঙ্কে মোটা পুঁজি থাকা দরকার।

বহু দুর্যোগোত্তর এই সাতচল্লিশ সালের টাকার মূল্য কম নয়। দু লক্ষ আড়াই লক্ষ টাকার পুঁজির অঙ্ক মাথায় আসতেই নিঃশ্বাস রুদ্ধ হওয়ার দাখিল মৈত্রেয়ীর।

একটু ভেবে জ্যোতিরাণী বললেন, আমি ঠিক জানি না, তবে লাখ দুই-আড়াই টাকার ব্যবস্থা করা খুব শক্ত হবে না হয়ত···তারপর টাকা তুলতে হবে। কিছু করলে এই-রকম করেই করতে হবে।

জ্যোতিরাণী ভাবছেন কি। একটু বাদে মৈত্রেয়ী উঠে পড়লেন। যাবার আগে জ্যোতিরাণীকে জড়িয়ে ধরলেন একবার। না, এত বড় আশা তিনি করতে পারেন নি। তাঁর আনন্দ ধরে না। ঘোরানো বারান্দা ধরে একটু দ্রুতই সিঁড়ির দিকে এগোলেন তিনি। চোখে-মুখে আর চলার গতিতে আনন্দ উপ্‌চে পড়ছে।

দাঁড়িয়ে যেতে হল। সিঁড়ির ওপাশের ঘরের সামনে যে মানুষটি দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে ঠিক এই সময়েই দেখা হোক চাননি হয়ত।

কালীনাথ। মৃদু হেসে চৌকাঠের বাইরে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, মিত্রাদিকে এ-বাড়িতে একটু যেন ঘন ঘন দেখা যাচ্ছে আজকাল?

তেমনি লঘু সুরে পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়লেন মৈত্রেয়ী, কালীদার কি সেটা অপছন্দের কারণ হয়েছে?

না, একটু ভয় ধরেছে বোধ হয়।

শিথিল চরণে মৈত্রেয়ী কাছে এসে দাঁড়ালেন, ভয় কেন?

সেটা এখনও তেমন স্পষ্ট হয়নি।

ডাক্তার দেখাও তাহলে।

কালীনাথের ঠোঁটের কোণে হাসির দাগ পড়ল কি পড়ল না। বললেন, সময় হলে উপদেশ স্মরণ করব।···তা মিত্রাদি কি অনুগ্রহ করে অভাজনের ঘরে পদার্পণ করবেন?

মুখ মচকে মৈত্রেয়ী এবারও পাল্টা ঠেস দিলেন, আমন্ত্রণটা আসতে কি একটু বেশি দেরি হয়ে গেল না? এ বয়সের পদার্পণ অভাজনের কি খুব ভাল লাগবে?

কালীনাথ গম্ভীর।—মিত্রাদি সুরসিকাই বটেন।

রসে কালীদাও কম যান না। অস্ফুট হেসে উঠলেন, কি বলবে?

…না, তেমন কিছু না। বলছিলাম, কর্তার ইচ্ছেয় আমারও একবার সমুদ্র পাড়ি দেবার কথা চলছে, আমি অবশ্য কাটান দেবার চেষ্টায় আছি।…যেতেই যদি হয়, তোমার ভদ্রলোকের ঠিকানাটা চাইব ভাবছিলাম—

বলতে বলতে কালীনাথ অন্যমনস্কের মতই যেন ঘরের ভিতরে ঢুকে গেলেন। মৈত্রেয়ীর মুখের হাসি মিলিয়েছে। পায়ে-পায়ে তিনিও ভিতরে এসে দাঁড়ালেন। খরখরে দৃষ্টিটা ভাল করে তাঁর মুখের ওপর বুলিয়ে নিলেন একপ্রস্থ।

বসো।

মৈত্রেয়ী বসলেন। দু চোখ তাঁর মুখে বিঁধে আছে।—ঠিকানা নিয়ে কি করবে, তাকে টেনে এনে আবার আমার সঙ্গে জুড়ে দিতে চেষ্টা করবে?

নির্লিপ্ত মুখ করে কালীনাথ বললেন, মহৎ চেষ্টায় দোষ কি।

কে তোমাকে মহৎ চেষ্টা করতে বলেছে? চাপা রাগে গলার স্বর প্রায় কর্কশ শোনাল, জলুনি আর থামছেই না, কেমন?

নির্বোধের মত খানিক তাঁর দিকে চেয়ে থেকে শেষে হাসলেন কালীনাথ।—কেউ এখন ঘরে এলে কে যে জ্বলছে ঠিক বুঝবে না।

ঠিক তখনই না হোক, খানিকক্ষণের মধ্যে ঘরের কাছাকাছি এসেও ফিরে গেছে একজন।

জ্যোতিরাণী।

॥ বাইশ ॥

ঘরে কালীনাথকে একলা পাওয়া যেত আধ ঘণ্টা বাদে এলেই। কিন্তু দুজনের অলক্ষ্যে সরে যেতে পেরে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে জ্যোতিরাণী এদিক মাড়াননি।

নিজের চিন্তার তাগিদে অতটা অন্যমনস্ক না থাকলে আর একটু দূর থেকেই হয়ত আর কারো অবস্থান টের পেতেন। প্রায় ঘরের দরজায় গা দিয়ে পালিয়েছেন বলতে গেলে। কালীদা ওদিক ফিরেছিলেন, দেখতে পাওয়ার কথা নয়। কিন্তু মিত্রাদির হাসি-মাখা দৃষ্টিটা অত মনোযোগে কালীদার মুখের ওপর আটকে না থাকলে তাঁকে দেখতে পেতই। সচকিত হয়ে ফেরার আগেই মিত্রাদির ঠোঁট-কাটা শ্লেষ কানে গেছে।—পুরুষের চৌতিরিশ তো কাঁচা বয়েস, ষোল বছরের কচি মেয়েরও অযোগ্য নয়, সময় থাকতে এখনো বিয়ে-থা করে ফেলো, মাথা থেকে অন্ন

নামবে।

ঘরে ফেরার পর জ্যোতিরাণীর মনে হয়েছে, মিত্রাদির হাসির মধ্যে ধার ছিল, কথাগুলোতে ঝাঁজ ছিল।

খুব মিথ্যে মনে হয়নি। হাল্কা হাসিমুখ করেই কালীনাথের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন মৈত্রেয়ী চন্দ। কিন্তু জ্যোতিরাণীর কাছ থেকে উঠে যাবার পরে মুখে যে হাসি লেগেছিল, এটা সে-রকম নয়। সিঁড়িতে পা দিতে না দিতে এই হাসি গিল্টি করা পুরনো গয়নার মত বিবর্ণ হয়েছে। তর-তর করে নীচে নেমে গেছেন। কিন্তু কেউ তখন লক্ষ্য করেনি তাঁকে।

কালীদার সঙ্গে কথা বলার তাগিদে জ্যোতিরাণী আবার এদিকে পা বাড়ালেন ঘণ্টা দুই বাদে। রাতের আনুষ্ঠানিক পড়ার পাট চুকিয়ে সিতু ঠাকুমার কাছে চলে যাবার পর।

শমীকে দেখার আগে, বীথি ঘোষের ব্যাপারে মনের বিপর্যয় ঘটারও অনেক আগে, মিত্রাদিকে জ্যোতিরাণী আশ্বাস দিয়েছিলেন টাকার জন্যে ভাবতে হবে না, কি করা যায় তাই ভাবো। আর, সে দিনও এই এক কথাই বলেছিলেন। বিকেলে মিত্রাদির কাছে মনের মত পরিকল্পনার চিত্র পেশ করছিলেন যখন, তখনো প্রত্যক্ষ চিন্তা কিছু মাথায় আসেনি। লাখ দুই-আড়াই টাকার ব্যবস্থা করা শক্ত হবে না বলে মিত্রাদিকে নিশ্চিত করার আগেও নয়।

বছর-আটেক আগে শ্বশুরের ভিটে ছাড়ার পর জ্যোতিরাণীর সোয়া দুজনের সংসারেও অনটনের ছায়া পড়-পড় হয়েছিল কিছুদিন। লাখ দুই-আড়াই টাকার স্বপ্ন দেখলেও তখন বাতুল ভাবত লোকে। কিন্তু বেশিতে চোখ যত সয়, কমেতে ততো নয়। বেশি বলতে একেবারে সৃষ্টিছাড়া বেশি। কটা বছর টাকার বন্যা দেখেছেন জ্যোতিরাণী। এখনো দেখছেন। মরুভূমির একঘটি জলে জীবন বিকোয়, বন্যার জল এক-পুকুর সরালেই বা কি। এই গোছের অনুভূতির মধ্যে বাস করছেন বলেই নির্দ্বিধায় কিছু করার তাগিদ দিতে পেরেছিলেন মিত্রাদিকে, আর এই কারণেই কিছু না ভেবে এত সহজে আশ্বাসও দিতে পেরেছিলেন।

কিন্তু তারপরেই ভিতরে একটা অলক্ষ্য ভাবনার ছায়া পড়েছে কোথায়। বন্যার জল আর টাকার বন্যা ঠিক এক বস্তু কিনা সেই সংশয়ও হতে পারে। আবার যে-টাকা ঘরে এসেছে বা আসছে, তার সঙ্গে তাঁর মানসিক যোগটা বহুদিন ধরে বিচ্ছিন্ন বলেও হতে পারে। এত টাকার ব্যবস্থা করার আগে একজনের অনুমোদন নিতে হবে কিনা সেই অবাঞ্ছিত সম্ভাবনাও মনের তলায় উঁকিঝুঁকি দিতে চেয়েছে। মোট কথা, ব্যবস্থার দায়টা সমূহ তাগিদের মত একেবারে সামনে এসে উপস্থিত হতে কেন

যে একটু অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলেন নিজেই সঠিক জানেন না।

মিত্রাদি উঠে যাবার পরেও চুপচাপ খানিকক্ষণ বসে নিজের ভেতর হাতড়াচ্ছিলেন জ্যোতিরাণী। গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়েছেন। সমস্যা নিয়ে জট পাকাতে বসলেই সমস্যা। ছেঁটে সরিয়ে দিতে পারলে সমস্যা গেল। এগারো বছরে এ তিনি অনেক দেখেছেন।...এগারো কেন, বারো বছরই হতে চলল। ছেঁটে দিতে পারেননি যতকাল, নিজের অস্তিত্বসুদ্ধ খুইয়ে বসেছিলেন। এখন পারেন। এত বড় একটা কাজে নামতে যাচ্ছেন বলেই ভাবনা। নইলে টাকার জন্য কারো কাছে হাত পাতারও দরকার হবে না বোধ হয়। দু লক্ষ আড়াই লক্ষ টাকা তাঁর নামের পাস আর সেফ্ ডিপোজিট ভোল্টগুলোতেই থাকার কথা। আগে তো ছিল, অনেক বেশিই ছিল। এক বছরে সেই সব টাকার অঙ্কের কতটা রকম-ফের হয়েছে তিনি জানেন না। পাসবই দেখা বা ডিপজিট ভোল্ট্-এর চাবি নাড়াচাড়া করা অনেকদিন ছেড়েছেন। ...সেই কুইট্ ইণ্ডিয়ার সময় গোপন সাহায্যের তাগিদে জ্যোতিরাণী ঘন ঘন কিছু চেক কেটেছিলেন, আর, তারপর বার দুই-তিন মিত্রাদিকে চাঁদা দেবার জন্যে। এ ছাড়া ওদিকে তাকানো আর দরকার হয়নি তাঁর। বড় খরচপত্র সব কালীদার হাত দিয়েই হয়, কাগজপত্রে কোনরকম সইয়ের দরকার হলে তিনি সইয়ের জায়গা দেখিয়ে দিলেই জ্যোতিরাণী সই করে দেন। কেন সই, কিসের সই খোঁজও করেন না।

জীবনে এই বোধ হয় সত্যিকারের আগ্রহ নিয়ে বড় আলমারিটা খুলেছেন জ্যোতিরাণী। পাসবইগুলোতে কি আছে না আছে দেখবেন। কিন্তু একটু বাদেই বিমূঢ় তিনি। দামী আলমারির চোরা-দেরাজে ওগুলো থাকত। সেখানে ছোট একটা চেক-বই শুধু পড়ে আছে, আর কিছু নেই।

কি আবার হল! তাকগুলোতে চোখ বুলিয়ে নিলেন একবার। বড় ট্রাঙ্কটায় রেখেছেন? ভাবতে গিয়ে মনে পড়ল। কিছু যদি মনে থাকত তাঁর। অনেক দিন আগে ওগুলো তো কালীদাই চেয়ে নিয়েছিলেন। প্রতিবারের জমার অঙ্ক খাতায় তোলা, সুদ কষানো, ইনকাম ট্যাক্সের হিসেব দাখিল করা—ইত্যাদির জন্য প্রায়ই ওগুলো নিয়ে টানাহেঁচড়া পড়ে।...কিন্তু শেষবার ওগুলো বার করে দেওয়া হয়েছিল তো সেই কতদিন আগে, কালীদা ফেরত দেননি তারপর? ভাবতে গিয়ে মনে পড়ল কেন দেননি। পাকা-পোক্ত অ্যাটর্নী অফিস খুলে বসার পর থেকে শুধু তাঁর নয়, মালিকেরও যাবতীয় সম্পত্তি বাড়ি ঘর টাকা পয়সার দলিল কাগজ বইপত্র সব কালীদার হেপাজতেই থাকে। সেগুলো অফিস সেফ-এ রাখা হয় কি বাড়ির, জ্যোতিরাণী খবর রাখেন না।

আলমারি বন্ধ করেছেন। খানিক আগের অজ্ঞাত অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভূতিটা আবার যেন অগোচরে কোথায় নড়াচড়া করে উঠল একবার। জ্যোতিরাণী তক্ষুনি ঠেলে সরালেন সেটা। পাসবই কালীদার কাছেই থাকে, তাঁর কাছেই আছে—তাতে কী? সমস্যার কি আছে! শুধু তাঁর পাসবই কেন, মালিকের নামেও কোথায় কি আছে না আছে সবই তাঁর জেনে রাখা দরকার এখন। টাকা লাগবে, বাড়িও একটা লাগবে। সুবিধেমত বাড়ি না পেলে টাকা আরো বেশি লাগবে। তবে যতদূর ধারণা, কয়েকটা বাড়ি আর বেশ কিছু জায়গা-জমি কেনাই আছে। কি অবস্থায় আছে সে-সব খোঁজ নিতে হবে, দেখতে হবে। মোট কথা, এত বড় ব্যাপারে হুট করে নেমে পড়ার আগে তাঁর জোরের দিকটা সবই খুঁটিয়ে দেখে নিতে হবে, জেনে নিতে হবে। তাঁদের প্রতিষ্ঠান বড়ও হবে, বাড়বেও—জোরের দিকটা জানা থাকলে অনেক নিশ্চিন্ত মনে এগোতে পারবেন।

কালীদার ঘরের উদ্দেশে পা বাড়িয়েছেন জ্যোতিরাণী।...কাজের ভাবনা ভাবা উচিত তাঁর এখন। কাজের মানুষ তো আপাতত দুজন মাত্র। তিনি আর মিত্রাদি। বীথিকে আপাতত বাদ দিয়েই রাখাই ভালো। যতই লেকচার দিন, তাঁর বুক ঠাণ্ডা হতে সময় লাগবে। আবার নিজেকেও খুব কাজের মানুষ ভাবেন না তিনি—কি দিয়ে যে কি হয় বা হতে পারে, ধারণাই নেই। মিত্রাদিই শুধু সর্বরকমে চৌকস। ...কিন্তু মেয়েছেলে কদিকই বা সামলাতে পারে। সবদিকে চোখ রাখার মত আর শক্ত হাতে গড়ে তোলার মত নির্ভরযোগ্য দুই-একজন পুরুষমানুষ না পেলে কি দিয়ে কি হবে? কাকে পাবেন?

...বিভাস দত্ত?

প্রথমেই তাঁর নামটা মনে এলো বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রায় বাতিলই করে দিলেন তাঁকে। দরকারে তাঁর সাহায্য নিতে আপত্তি নেই। কিন্তু এত বড় ব্যাপারে হাল ধরার মত শক্ত-সমর্থ মানুষ তাঁকে আদৌ ভাবেন না জ্যোতিরাণী। ভিতরের হাল ধরার জন্য মিত্রাদি আছে, পাশে তিনিও আছেন। কিন্তু অন্য সব দায়িত্ব কে নেবে?

...কালীদা?

ভিতর থেকে সায় পেলেন তক্ষুনি। বুদ্ধি-বিবেচনা আর সবদিকে লক্ষ্য রেখে ঠাণ্ডা মাথায় কাজ চালানোর ক্ষমতা কালীদার আছে বটে। তাঁকে মাথার ওপর বসাতে পারলে আর কোনো ভাবনাই থাকে না। আর নির্দেশমত কাজ করার যোগ্য লোকও অনায়াসে তিনিই যোগাড় করতে পারবেন।...কালীদাকে পাবেন না-ই বা কেন? অ্যাটর্নীর কাজে কত আর ব্যস্ত থাকেন? কবে যেন বলছিলেন,

ছুটির দিনে সময় কাটে না, আপিস থাকলে তবু আড্ডা দেবার লোক জোটে।

ছেলের সমস্যা নিয়ে মাথা গরম হওয়ার ফলে এই কালীদার ওপরেই কদিন ধরে সব থেকে বেশি অভিমান পুষছিলেন তিনি। ভদ্রলোকও সেটা টের না পেয়েছেন এমন নয়। কিন্তু সন্ত সন্ত তা আর মনেও থাকল না। তাঁর ধারণা, দায় চাপালে কালীদা দায়িত্ব না নিয়ে পারবেন না।

একটু নিশ্চিন্ত বোধ করা মাত্র আর একখানা মুখ চোখের সামনে উদয় হল। মামাশ্বশুরের।...তাঁকে টানতে পারলে? পারবেন না একবারও মনে হল না। কালীদার সঙ্গে তাঁকে পেলে আর ভাবনার কিছু থাকেই না। বুদ্ধি আর বিবেচনা দিয়ে প্রতিষ্ঠান চালাবেন একজন, বুক আর নিষ্ঠা দিয়ে আর একজন গড়বেন সেটা। দেখা যাক, সবই হতে পারে, সমস্যা কিছু নেই...

'পুরুষের চৌতিরিশ তো কাঁচা বয়েস, ষোল বছরের কচি মেয়েরও অযোগ্য নয়, সময় থাকতে এখনো...'

ঘরের মধ্যে মিত্রাদির ধারালো হাসি আর ঝাঁজালো শ্লেষ। কালীদা ওদিক ফিরে বসে, মিত্রাদির তাঁকে দেখতে পাওয়ার কথা, কারণ জ্যোতিরাণী চৌকাঠে পা-ই দিয়েছিলেন বলতে গেলে। কিন্তু দেখতে পায়নি। বিমূঢ় জ্যোতিরাণী চকিতে ফিরেছেন।

ফেরার পরেও সন্ত-ভাবনার মধ্যে আর কোনো লঘু চিন্তার প্রশ্রয় দিতে চাননি তিনি। তবু বিমনা হয়েছেন থেকে থেকে। এমন নিশ্চিন্তে ঘোরা-ফেরা করার মত বোঝা-পড়া মিত্রাদি নিজের সঙ্গে করে ফেলতে পারল কি করে, জ্যোতিরাণীর এ কৌতূহল পুরনো হয়ে এলো। বিলেত থেকে ফেরার পর আরো সহজ স্বচ্ছন্দ মনে হয়েছে মিত্রাদিকে। কিন্তু কালীদা কি সত্যি এভাবেই কাটিয়ে দেবেন নাকি চিরকাল?

চকিতে আরো কি মনে হতে জ্যোতিরাণীর মুখ আরক্ত একটু। পরমুহূর্তে নিজের ওপরেই দ্বিগুণ বিরক্ত তিনি। কালীদার পাশাপাশি প্রশ্নটা যেন ভিতর থেকে আপনিই ঠেলে উঠেছে...বিভাস দত্তই বা কি করবেন...? এটাও মেলাতে না মেলাতে আবার মামাশ্বশুরের মুখ ভেসে ওঠার উপক্রম।

ছি ছি! সেলফ্-এর ওপর থেকে তাড়াতাড়ি আধ-পড়া বইটা টেনে নিয়ে জ্যোতিরাণী শুয়ে পড়লেন। কদিনের মধ্যে পাতা ওল্টানো হয়নি...মজার নাম বইটার। 'এ পিক্চার ছাট্ ফ্যানস্ উইল নট সী'—মুগ্ধ ভক্তরাও যে-চিত্র দেখতে পাবে না। যখন ধরেছিলেন একটানা আধাআধি পড়ে ফেলেছিলেন জ্যোতিরাণী। নামজাদা এক রূপসী অভিনেত্রীর গল্প। সামান্য অবস্থার মেয়ে ছিল। তার প্রথম

যৌবন নিয়ে আর রূপ নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে একে একে তিনটি নগর-মুকুটমণি-সদৃশ সম্ভ্রান্ত পদস্থ ব্যক্তি। প্রত্যেকেই মেয়েটাকে সোনার দিনের আশা দিয়েছিল—যে-আশায় বোকা মেয়েটা একে একে তিনবার বুক বেঁধেছিল। কিন্তু দুঃখের সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে মেয়েটা হারিয়েই গেছে একদিন। দশ বছর বাদে বুদ্ধি যখন প্রকৃতিস্থ, রূপ যখন দেহযমুনায় ধরে না, তখন সে দুনিয়ার যৌবন চঞ্চল করার মতই প্রবাসিনী চিত্রতারকা। দেশে দেশে লক্ষ লক্ষ রূপমুগ্ধ গুণমুগ্ধ ভক্ত তার। কয়েক কোটি টাকার মালিক সে।…হঠাৎ এক মাসের অবকাশ যাপনের উদ্দেশ্যে রমণীটি সেই পরিত্যক্ত নগরে ফিরেছে। নগরে সাড়া পড়ে গেছে, চাঞ্চল্যের বান ডেকেছে। কিন্তু চিত্রাভিনেত্রী কেন ফিরেছে তা শুধু সে-ই জানে। একে একে সেই তিন নগর-মুকুটমণির ওপর তার বিচিত্র প্রতিশোধের কাহিনী—যে-কাহিনী ভক্তরা চিত্রে দেখবে না কোনদিন।

নামজাদা বই নয়, নামী লেখকেরও না, কিন্তু যতটা পড়া হয়েছে জ্যোতিরাণীর ভারী ভালো লেগেছিল।

বই রেখে কালীদার ঘরের দিকে আবার পা বাড়িয়েছেন ঘণ্টা দুই বাদে।… দরজার কাছে এসে আবারও দাঁড়াতে হয়েছে।…ঘরে একলাই আছেন বটে, টেবিলে ঝুঁকে বসে লিখছেন কি।…সামনে কালো মোটা বাঁধানো নোট-বই। ওই গোছের কালো লম্বা বাঁধানো খাতা বা নোট-বই কালীদার পছন্দ। এ-রকম একটাতেই যাবতীয় হিসেবপত্র আর দরকারী খুঁটিনাটি লেখা হয় আজকাল। অনেক সময় সেটা টেবিলে পড়েও থাকে। কিন্তু মিত্রাদি চলে যাবার পরে এই লেখার তন্ময়তা দেখে জ্যোতিরাণীর কেন যেন ধারণা হল এটা হিসেবের নোট বই নয়। এটা সেই জিনিস যার প্রতি তাদের অনেক দিনের কৌতূহল। কালীদার মুখের এক পাশ দেখা যাচ্ছে, খুব গম্ভীর লাগছে না।

আসব ?

কালীনাথ ঘাড় ফেরালেন। কিছুটা অপ্রত্যাশিত, জ্যোতিরাণীর শেষ আবির্ভাব ছেলের ব্যাপারে অভিযোগ আর নতুন ব্যবস্থার গুরুগম্ভীর সঙ্কল্প নিয়ে। সকালের মাস্টারকে ওয়ার্নিং দিতে বলেছিল আর রাতে নতুন মাস্টার রাখতে বলেছিল। দিনকতক একেবারে নিঃশব্দে কাটাতে দেখেছেন তারপর। নোট-বই সরিয়ে রেখে কলম বন্ধ করতে করতে বললেন, এসো—সিতু এই একটু আগে পড়া শেষ করে উঠে গেল।

জ্যোতিরাণীর হাসি পেল, ছেলেকে বাঁচিয়ে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা কালীদার। সিতুর দায়ে আবার কিছু শুনতে হবে মুখে সেই শঙ্কা। চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরে এসে দাঁড়ালেন।—আমার অন্য একটু দরকারী কথা ছিল আপনার সঙ্গে।

বাঁচা গেল, তোমাকে আসতে দেখলেই ভয় হয় কি আবার করলাম। লঘু মন্তব্য করে কালীনাথ উঠে চেয়ারটা দু'হাত ঘুরিয়ে দিলেন তাঁর দিকে।—বোসো।

নিজে শয্যায় বসলেন। চেয়ারের কাঁধে হাত রেখে আর টেবিলে সামান্য ঠেস দিয়ে জ্যোতিরাণী সোজা দরকারী কথাটাই তুললেন।—আমার কিছু টাকা চাই।

ঠিক এ-রকম কথা শুনবেন ভাবেননি কালীনাথ। জিজ্ঞাসা করলেন, কেন, তোমার কাছে চেক-বই তো থাকার কথা একটা—নেই ?

জ্যোতিরাণী জবাব দিলেন, একটাই আছে···ওই অ্যাকাউণ্টে কত টাকা আছে ?

তা বিশ-তিরিশ হাজার তো হবেই !

ওতে হবে না।

কালীনাথের তক্ষুনি মনে পড়ল কিছু, মিত্রা বলছিল কি একটা প্রতিষ্ঠান-টতিষ্ঠান গড়তে যাচ্ছ তোমরা—সেই ব্যাপার নাকি ?

প্রশ্নের ধরন বেশি হালকা, ছেলেমানুষি কোন ব্যাপারের খোঁজ নেবার মত। তাঁর দিকে চেয়ে জ্যোতিরাণী মাথা নাড়লেন, অর্থাৎ তাই। তারপর বললেন, আমার পাসবইটই তো সব আপনার কাছে, কত আছে ওগুলোতে ?

ওই মুখে পলকের দ্বিধা দেখলেন কিনা জ্যোতিরাণী ঠিক ঠাহর করতে পারলেন না।

আছে অনেক। তোমার চাই কত ?

জিজ্ঞাসা করা-মাত্র এক-কথায় সঠিক টাকার অঙ্ক বলে দেওয়া সম্ভব নয় হয়ত। তবু ভিতরে ভিতরে জ্যোতিরাণীর কেন যে উষ্মার আঁচ লাগল একটু জানেন না। জবাব দিলেন, অনেক। শুরুতেই দু লক্ষ আড়াই লক্ষ লাগতে পারে। আরো বেশিই লাগতে পারে। কোথায় কি আছে না আছে একবার দেখা দরকার, ওগুলো সব কাল পাওয়া যাবে ?

ওগুলো অর্থাৎ পাসবইগুলো। কালীনাথ হাঁ করে মুখের দিকে চেয়ে রইলেন খানিক। টাকার অঙ্কটা বিস্ময়ের কারণ কি পাসবই চাওয়াটা বোঝা গেল না। যাই হোক, জ্যোতিরাণীর সহিষ্ণুতা কমছে। যাঁর রোজগারে টাকা, মানসিক সম্পর্কটা তাঁর সঙ্গে এত জটিল না হলে ভদ্রলোকের এই মুখ দেখে হয়ত হেসেই ফেলতেন।

একটু বাদে কালীনাথ মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন। নিজের অসহিষ্ণুতার দরুনই হয়ত হাসিটা নিখাদ সরল লাগছে না জ্যোতিরাণীর। কিছু শোনার অপেক্ষায় আছেন। অগোচরে একটা হাত টেবিলের কালো নোট-বইটার ওপর এসে পড়েছিল, তুলে নিলেন। মনে হল, কালীদা তাও লক্ষ্য করলেন।

তেমনি লঘু স্বরে কৌতুকপ্রদ কিছু ব্যক্ত করলেন যেন।—দেখো, শিবুর ধারণা তুমি টাকা চেনো না, সে-রকম ঝোঁক চাপলে পাসবইটই সব সাদা করে দিয়ে বসে থাকতে পারো। সে-জন্যেই একটা চেক-বই তোমার হাতে দিয়ে বাকি সব আমার কাছে রেখে দিতে বলেছিল।…এখন দেখছি ওর ধারণাটা একেবারে ভুল নয়।

মুখের দিকটা ক্রমে ক্রমে লাল হচ্ছে জ্যোতিরাণীর। অথচ মাথা এখন খুব ঠাণ্ডা রাখা দরকার তাও জানেন।…বেশ কয়েক বছর আগে টাকা খরচ করা নিয়ে ঘরের লোকের সঙ্গে সামান্য কথা কাটাকাটি হয়েছিল মনে পড়ে, সেই কুইট্ ইণ্ডিয়ার গোপন সাহায্য-তহবিলে দেবার জন্য বারকয়েক টাকা তোলা হয়েছিল যখন। শিবেশ্বর দান-খয়রাতের খোঁটা দিতে জ্যোতিরাণী পাল্টা ঝাঁজে নিজের পাসবই নিজের কাছে রাখতে চেয়েছিলেন। পেয়েছিলেন এবং ঘুরেফিরে তাঁর কাছেই ছিল সেগুলো। ঠিক কবে থেকে যে নেই, মনে করতে পারছেন না। যাই হোক, সেই থেকে এযাবৎ আর একটাও বড় অঙ্কের চেক কেটেছেন বলে মনে পড়ে না। অথচ, টাকা যখন স্রোতের ধারার মত আসছে, তখনই এই সতর্কতার নির্দেশ কেন জ্যোতিরাণীর মাথায় এই প্রশ্নটাই কেটে বসছে।

এ পরামর্শ আপনাকে কবে দিয়েছেন?

তা অনেকদিনই তো হল, বোধ হয় গেল-বারের রায়টের পর।

…ভাবতে চেষ্টা করলে, ভাবার মত কিছু আছে কি? জ্যোতিরাণী জানেন না। ঠিক এই মুহূর্তে ভাবতে পারাও শক্ত। সাদা-মাটা মুখ করেই জবাব দিয়েছেন কালীদা, কিন্তু তাঁর দিকে তাকিয়ে নয়। জ্যোতিরাণীর ঠাণ্ডা দু চোখ তাঁর মুখের ওপর স্থির হয়ে আছে।—তাহলে ওগুলো আমাকে দেখাতে আপনার আপত্তি আছে?

কি আশ্চর্য, এবারে মুখ ফেরালেন, দেখবে তাতে কি!

টাকা তুললে আপত্তি আছে?

জবাবে কালীনাথ ফ্যালফ্যাল করে চেয়েই রইলেন খানিক।—চিনির বলদ দেখোনি?

এ-রকম নিরীহ অভিব্যক্তি দেখে বা এ-ধরনের বিড়ম্বিত উক্তি শুনে জ্যোতিরাণী বিয়ের আগে থেকেই অভ্যস্ত। তিনি জবাবের প্রতীক্ষা করছেন।

চিনির বলদ চিনি খায় না। মালিকের ইচ্ছেয় তার পিঠে বোঝা চাপানো হয় বা পিঠ থেকে বোঝা তোলা হয়। তা বোঝা চাপাবে কি তুলবে তোমরাই জানো। হাসতে লাগলেন, মোট কথা আমাকে কিছুতে টেনো না বা জিজ্ঞাসা কোরো না—যা চেয়েছ কাল পাবে।

মৃদু কিন্তু খুব স্পষ্ট করে জ্যোতিরাণী আবার বললেন, টাকা বাড়ি জায়গা-জমি আর কার নামে কি আছে না আছে সে-সবও একটু দেখে রাখব—।

অর্থাৎ মালিকের নামের অর্থ-বিষয়-আশয়ের বই আর দলিলপত্রও দেখতে চান। কালীদা কৌতুক বোধ করছেন কি সত্যিই ফাঁপরে পড়েছেন স্পষ্ট বোঝা গেল না। একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে-সবও কালই চাও না শিবু ফিরলে?

…কবে ফিরবেন?

যে-কোনদিন ফিরতে পারে আবার দশ দিন দেরিও হতে পারে, জানায়নি।

ওঁর নামের কিছুতে হাত দিতে হলে মত আর সই দুইই দরকার হবে, আমি শুধু দেখে রাখতে চেয়েছিলাম, তাতে বাধা আছে?

না, তবে হুকুমটা যদি লিখে জানাতে তাহলে অফিসিয়ালি একটু সুবিধে হত।

জ্যোতিরাণী আত্মস্থ হলেন একটু। হুকুম কিছু করেননি বটে কিন্তু কথায় সুরে ইচ্ছেটা বড় বেশি স্পষ্ট করে প্রকাশ করেছেন। আসার সময়ও কালীদাকে তাঁদের কাজের সব থেকে বেশি দায়িত্বের আসনে বসাবার কথা ভেবেছিলেন। তবু বৈষয়িক প্রসঙ্গ বাঁকা রাস্তায় গড়ানো মাত্র সহিষ্ণুতা কমে আসছিল যে, সেটা নিজেও অনুভব করলেন। আস্তে আস্তে বললেন, দেখা দরকার হয়েছে বলে আমি দাদার কাছে এসেছিলাম, হুকুম যদি মনে করেন তাহলে থাক্।…এ-বাড়িতে আসার অনেক আগে থেকে আমাকে চেনেন, এ-রকম বলবেন ভাবিনি।

এবারে কালীনাথ অল্প অল্প হাসতে লাগলেন, পরিবেশ তরল করার চেষ্টা, চাকরি রাখার দায়েও তো বলে থাকতে পারি!

সে ভয় আপনি করেন?

করি না! জবাবের সুরেই ভয় টেনে আনলেন, টাকার মেজাজ বড় অনিশ্চিত মেজাজ, শিবুর মাথায় হাত বুলিয়ে যা পাই আর কোথাও গেলে তার সিকিও পাব কিনা সন্দেহ। ওকে তোয়াজ করাই তো বলতে গেলে আসল চাকরি আমার!

শুনতে ভালো লাগল না বটে জ্যোতিরাণীর, তবু হাল্‌কা বোধ করলেন কিছুটা। দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছেঁটে দিয়েই কালীদা জবাব দিলেন যেন, আচ্ছা, দাদার কাছে এসেছ যখন চাকরি থাক আর যাক, যা চেয়েছ সব কাল পাবে।…কিন্তু খুব বড় গোছের কিছু একটা করতে যাচ্ছ মনে হচ্ছে?

হ্যাঁ। কিন্তু আপনাকে না পেলে আমরা কিছু করতে পারব না।

আমরা কারা?

আমি, মিত্রাদি…

একটু চুপ করে থেকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, প্ল্যানটা তোমার না তার ?

কেন যেন একটু বিব্রত বোধ করলেন জ্যোতিরাণী।—দুজনেরই।

এ-রকম কবে থেকে ভাবছ, ওই শমী মেয়েটিকে দেখার পর থেকে ?

হঠাৎ এ-প্রশ্নের তাৎপর্য বোঝা গেল না। তাদের প্ল্যানের পিছনে বিভাস দত্তর প্রেরণা কতটুকু ঘুরিয়ে তাই জানতে চান কিনা জ্যোতিরাণীর মনের তলায় সেই বক্র সংশয়ও উঁকিঝুঁকি দিয়ে গেল। শমীর সম্বন্ধে কি জানেন বা কতটা জানেন তাও ধারণা নেই। তবে, এ কদিনের মেলামেশায় জানাই সম্ভব, শাশুড়ীর কাছেও থাকতে পারেন। মেয়েটা কে জিজ্ঞাসা করতে জ্যোতিরাণী তাঁকে বলেছিলেন। জবাব দিলেন, শমীর প্রতিষ্ঠানে থাকার দরকার হবে না, তার আগে থেকেই ভাবছিলাম···ছোট-বড় ওরকম মেয়ে অনেক আছে।

ভালো। তা আমি কি করব ?

জবাব দেবার আগে জ্যোতিরাণীর একবার ইচ্ছে হল বীথি ঘোষের গল্পটা কালীদাকে বলেন। কিন্তু থাক। একটানা তাঁর সঙ্গে এত কথা এই এগারো বছরের মধ্যেও বলেছেন কিনা সন্দেহ।—আপনি গড়ে দেবেন, মাথার ওপর থাকবেন।

কালীনাথ প্রথমে মাথা নাড়লেন, তারপর স্পষ্ট করে বললেন, না আমি না।

একটুও হাল্কা করে বলেন নি, জবাবটা জবাবের মতই লাগল। জ্যোতিরাণী বিস্মিত, আহতও।—আপনার মত নেই ?

আমার মতামত বলে কিছু নেই, মোট কথা, কিছু করোই যদি, আমাকে বাতিল করে রেখো।

জ্যোতিরাণী চুপচাপ চেয়ে আছেন। মত নেই বুঝেছেন, কিন্তু কেন নেই সেটাই স্পষ্ট করে বুঝতে চাচ্ছেন। বোঝা গেল না। এ-রকম সাদা-সাপটা প্রত্যাখ্যান কল্পনাও করেননি। বাড়িতে শুধু এক জায়গাতেই এযাবৎকাল চাওয়ার সঙ্গে তাঁর পাওয়ার হিসেবটা মেলেনি। কিন্তু অন্যত্র চাওয়ার আগেই পেয়ে অভ্যস্ত তিনি। মুখের ওপর কেউ তাঁর কোনো ইচ্ছে এভাবে নাকচ করেনি। এটা শুধু ইচ্ছে নয়, কটা দিনের অনাবিল আবেগে আর অনমিত সঙ্কল্পে পুষ্ট আকাঙ্ক্ষার রূপ একটা। নিশ্চিত নির্ভরযোগ্য কারো নির্লিপ্ত রূঢ়তায় সেটারই রঙ চটে গেল বুঝি একপ্রস্থ।···দিল্লী থেকে ফেরার পর আর একজন তাঁদের প্রতিষ্ঠান গড়ার ব্যাপারে ভালো-মন্দ কিছু জিজ্ঞাসা করেই যদি—এই একজনকেই করতে পারে। তখনো যে ইনি সদয় মন্তব্য করবেন না এটা জ্যোতিরাণী ধরেই নিলেন। কিন্তু কেন ? স্ত্রীর কোনো কিছু প্রীতির চোখে

দেখে না যে মানুষ, তার অনিশ্চিত মেজাজের ভয়ে? তার বিরূপতার ভয়ে?....নাকি মিত্রাদির ওপর রাগে, এর মধ্যে মিত্রাদি আছে সেই জ্বালায়? যে কারণেই হোক সেটা ক্ষুদ্র আত্ম-স্বার্থ ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারলেন না জ্যোতিরাণী। একটানা এগারো বছরের দিনে দিনে জমা করা অনেক ব্যর্থতা অনেক হতাশা অনেক জ্বালা অনেক যাতনা এক পাশে ঠেলে সরিয়ে অনেক বড় সার্থকতার মধ্যে এসে দাঁড়াতে চেয়েছেন তিনি।...মিত্রাদিও জীবনের দোসর খোঁজার ব্যাপারে ভুল যদি করেই থাকে, সেই ভুলের মাশুল দিচ্ছে। কিন্তু সব ব্যর্থতা ঝেড়ে ফেলে এই বড় সার্থকতার দিকে ছুটে আসতে পেরেছে স্বামী-পরিত্যক্তা মিত্রাদিও।...আর একজনও পেরেছেন। ষোল-সতের বছরের এক মেয়ের মন জানার লোভে সকলের আগোচরে নিঃশব্দে ছাদে উঠে বিদায়ী সূর্যের আলোয় তাকে দেখার বিহ্বল তন্ময়তার ফাঁকে নিজের মনটাকেই প্রকাশ করে ফেলেছিলেন যিনি, পুরুষের ধীর সংযত শাসনের সেই কটা দুর্বল মুহূর্ত মুছে মুছে জীবনের নিঃসঙ্গ নিঃস্বার্থ বড় দিকটাও বেছে নিতে পেরেছেন তিনিও। জ্যোতিরাণীর ধারণা, অবকাশ যদি থাকে, ডাকলে মামাশ্বশুরকেও পাবেন।

...আত্মস্বার্থের উর্ধ্বে উঠতে পারলেন না শুধু একজন। এই কালীদা।

উদ্গত ক্ষোভ দমন করতে সময় লাগল একটু। সাহায্য করা সম্ভব হোক না হোক, সামান্য সহানুভূতির আভাসও পেতেন যদি, ভিতরটা এত ক্ষুব্ধ এত অশান্ত হয়ে উঠত না। এই নির্লিপ্ত প্রত্যাখ্যানের আড়ালে তাঁর অনিচ্ছাটাই যেন স্পষ্ট করে দেখে নিলেন জ্যোতিরাণী। খুব ধীর ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, মামাবাবু কোথায় আছেন আপনি জানেন?

জানি। তোমার ঠিকানা চাই?

তাঁর গম্ভীর মুখে এবারে একটু সদয় ঔৎসুক্য দেখলেন মনে হল জ্যোতিরাণীর। সামান্য মাথা নাড়লেন, চাই। কালীদা উঠে টেবিলের দিকে আসতে সরে দাঁড়ালেন একটু।

কালো নোট-বইটার ওপর একটুকরো কাগজ রেখে ঠিকানা লিখে তাঁর হাতে দিলেন।—নানা জায়গায় ঘোরেন, ঠিক এখানেই আছেন কিনা বলতে পারি না, তবে এই জায়গাতেই পাকা ডেরা মামুর, ঘুরে ফিরে ওখানেই আসেন। ওই ঠিকানায় লিখলে পাবেন।

এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করে জ্যোতিরাণী দরজার দিকে পা বাড়ালেন। কালীদা একটা উপকার করেছেন, সঙ্কল্পটা তাঁর সমস্ত মুখে এঁটে বসেছে। প্রতিষ্ঠান তিনি গড়বেন। এর আর নড়চড় হবে না।

শোনো।

দরজার সামনে থেকে আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়ালেন। কালীদা গম্ভীর তেমনি। চেয়ারটায় বসেছেন। হাতের কালো নোট-বইয়ের ভিতরের সব পাতাগুলো দু আঙুলের চাপে ফড়ফড় করে একসঙ্গে উল্টে নিলেন একবার।—সদা তোমাকে কিছু বলেছে ?

হঠাৎ এ-রকম প্রসঙ্গান্তরের প্রস্তুতি এত কম যে প্রশ্নটাই দুর্বোধ্য লাগল জ্যোতি-রাণীর। হাঁ-না কিছু জবাব না দিয়ে জিজ্ঞাসু নেত্রে চেয়ে রইলেন শুধু।

আঙুলের চাপে নোট-বইয়ের পাতাগুলো আর একবার উল্টে গেল—সদা বরাবরকার মত ছুটি চাইছে, সে দেশে চলে যেতে চায়।

জ্যোতিরাণী হতভম্ব।...ফি বছরই ছুটি নেয় একবার করে, দেশেও যায়। কর্তার আমলে দু-তিন বছরে একবার যেত। বরাবরকার মত ছুটি নিয়ে দেশে যেতে চায় সে, কল্পনা করাও শক্ত। কি একটা ব্যাপার যেন মাথায় আসি-আসি করছে জ্যোতিরাণীর।

যেতে চায় কেন ?

বলে তো বয়েস হয়েছে, ছেলেরা বড় হচ্ছে, ঘর জমি-জমা দেখাশুনা করারও দরকার হয়ে পড়েছে।...কিন্তু তা বোধ হয় না, আসলে ওর আর থাকারই ইচ্ছে নেই। বাড়ির কর্তার ফেরার জন্য অপেক্ষা করতে বলায় হাতেপায়ে ধরতে এলো। ওর পক্ষে সেটা খুব মুশকিল হবে বলল, বাচ্চা বয়েস থেকে আছে সেই বিবেচনাতেও এ-রকম মুশকিলে না ফেলার জন্যে হাতজোড় করল। কালই যেতে চায়। আমি ওকে তোমার সঙ্গে কথা কইতে বলে দিয়েছিলাম।...বলেনি দেখছি।

বিমূঢ় মুখে কালীদার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন জ্যোতিরাণী। এদিক-ওদিক চেয়ে সদা বা মেঘনা কাউকে দেখতে পেলেন না। নিজের ঘরে চলে এলেন। একটু আগে কি ভাবনা নিয়ে ছিলেন, তার ওপর আচমকা কি আবার একটা চিন্তার ঝাপ্টা এসে লাগল।

কিন্তু পুরনো ভাবনা-চিন্তাগুলো কি বইয়ের পাতার মত পর পর সাজানো আছে জ্যোতিরাণীর মাথায় ? স্বাধীনতার পরদিন সকালে উঠেই সদা মালিকের কাছে ভয়ানক বকুনি খেয়েছিল নাকি। এমন বকুনি খেয়েছিল যে বাবুর অনুপস্থিতি-তেও ঝাঁট দেবার জন্য ঘরে ঢুকতে ভয় করছিল মেঘনার। তাঁকে জিজ্ঞাসা করছিল চট করে ঢুকে ঝাঁটটা দিয়ে আসবে কিনা।...রাতে বন্ধ দরজায় ঘা দিয়ে অপমানিত হয়ে ফিরে যাবার পরের আক্রোশ জ্যোতিরাণী সকালে টের পেয়েছেন, সন্ধ্যায় টের পেয়েছেন, রাতেও টের পেয়েছেন। কিন্তু সদা কি দোষ করেছিল ?

মেঘনার মুখে শোনার পরেও ভেবেছিলেন স্নায়ু অতটা তেতে আছে বলেই সামান্য উপলক্ষে হয়ত কটূক্তি শুনতে হয়েছে সদাকে। তবু খটকা একটু লেগেছিল, কারণ এ-বাড়িতে সদার মান আলাদা। বাড়ির অন্য চাকর-বাকরেরা ভয় পেতে পারে এভাবে তাকে কখনো বকা-ঝকা করা হয়েছে বলে মনে পড়ে না। তাছাড়া, নীচে বা ওপরে—মনিব যতক্ষণ বাড়িতে উপস্থিত, সদা ততক্ষণ তাঁর ঘরে অথবা ঘরের দরজায় মোতায়েন। হাজার দরকারেও তখন আর কেউ তাকে পাবে না। বাড়ির মধ্যে একমাত্র সদাই মনিবের নাড়ী ভালো চেনে বোধ হয়—সে এমন কি দোষ করে থাকতে পারে? খুব খেয়াল না করলেও সেই থেকে সদার হাবভাবে জ্যোতিরাণী কিছু যেন নীরব পরিবর্তন দেখেছেন মাঝে-সাঝে। খেয়াল করেছিলেন যে-দিন মিত্রাদি বীথিকে নিয়ে প্রথম এলো। মেঘনাকে বলেছিলেন, সিতু আর শমীকে গাড়ি করে বেড়িয়ে আনার জন্য সদাকে বলে দিতে। মুখ ঝামটা দিয়ে মেঘনা বলেছিল এ বাড়ির কারো মেজাজের ঠিক নেই আজকাল—হুকুম কর্ত্রীই দিক। আর সদা বলেছিল, তার শরীর ভালো না, মেঘনা যাক।

দুপায়ে ভর করে দাঁড়াতে পারলে সদা কখনো এই জবাব দিয়েছে মনে পড়ে না। জ্যোতিরাণী তক্ষুনি বুঝেছিলেন সদার কিছু হয়েছে। কিন্তু বীথি আসার পর থেকে অন্য চিন্তায় অন্য স্বপ্নে বিভোর হয়েই ছিলেন কটা দিন। অবকাশ ছিল, কিন্তু কারো দিকে ভালো করে তাকাবার চোখ ছিল না।

...আজ কালীদার মুখে এই খবর। সদা বরাবরকার মতই চলে যেতে চায়। কালই। মনিব আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজি নয়।

জ্যোতিরাণীর একসময় মনে হল দরজার ওধার থেকে ঘুরে গেল কেউ। উঁকি দিয়ে দেখলেন। মেঘনা। একটু বাদে ঘরেই দেখা গেল মেঘনাকে। ঘরের কোণের কুঁজোটায় জল ভরা হয়েছে কিনা মনে নেই, দেখে যেতে এসেছে। এক নজর তাকিয়েই বুঝলেন ওরও মেজাজ সুস্থির নেই, কিছু বলার জন্য অথবা শোনার জন্য আসা-যাওয়া করছে।

মেঘনা, শোন্ তো!

এই ডাকের প্রত্যাশাতেই ছিল হয়ত, দরজার কাছ থেকে ফিরল।

সদা চলে যেতে চায় কেন?

আমি কি করে জানব। মেঘনার গলার স্বর নরম নয় একটুও, তারই ভিতরের কিছু চাপা ক্ষোভ প্রকাশ পেল যেন।—সারাটা জেবন কাটালে এখানে, আঁতে লাগলে যাবে না তো কি করবে, ঝি-চাকর বলে মানুষ নয় নাকি!

জ্যোতিরাণী চেয়ে আছেন।—তুই কার সঙ্গে কথা বলছিস?

এই সুরটাই ভালো চেনে মেঘনা। মুখ হাঁড়ি করে দাঁড়িয়ে রইল।

ঝি-চাকরকে মানুষ না ভাবার কি দেখেছিস ?

দেখব কেন, শুনেছি। জবাবের স্বর বদলেছে, ক্ষোভ যায়নি।—আজ মনিব চাবকে বাড়ি থেকে দূর করবে বলেছে, কাল হয়ত বসিয়েই দেবে ক'ঘা।

জ্যোতিরাণী চুপ খানিকক্ষণ।—সদাকে বলেছেন ?

মেঘনা নিরুত্তর, অর্থাৎ তাই।

কবে বলেছেন ?

মেঘনার কালো মুখে এবারে দ্বিধার ভাব একটু।—সেই একদিন সকালোয়, রাতে বাড়ি ফিরে বাবু যেদিন সিতুদাদাকে খুব মারলেন···তার পরদিন ভোরে।

অর্থাৎ স্বাধীনতার সেই রাতের পরদিনই, যেদিন মেঘনা ঘর ঝাঁট দেবার জন্য মনিবের ঘরে ঢুকতেও ভয় পাচ্ছিল।—কেন বলেছিলেন ?

আমি তার কি জানি! সেদিন কানে গেছল তাই বললাম, আমাকে কে বলতে গেছে!

মেঘনাকে ভালো করেই লক্ষ্য করছিলেন জ্যোতিরাণী, জেরার ফলে ওর হাব-ভাবে চাপা অস্বস্তি দেখছেন। যেটুকু ব্যক্ত করেছে তার থেকে ও আরো বেশি জানে বলেই ধারণা।

সদাকে ডেকে দে।

মেঘনা প্রস্থান করল। খানিক বাদে সদা এলো। কর্ত্রীর তলব কানে গেলে যত শিগগীর আসার কথা তার থেকে একটু দেরিই হল আসতে। ওর দিকে চেয়ে অনেক দিনের পুরনো মানুষের অভিমানাহত মুখ মনে হল না জ্যোতিরাণীর, একটা নির্লিপ্ত অথচ সঙ্কল্পবদ্ধ ক্ষোভ নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল যেন। আগে খেয়াল করেছিলেন কিনা জানেন না, ওর মাথার চারদিকের সাদা চুলের ভাগ আরো বেড়েছে।

তুমি চলে যেতে চাও শুনলাম ?

হ্যাঁ, বয়েস হয়ে গেল, আর পারি না।

এই লোক মেঘনা নয়, শ্বশুরের আমলে পর্যন্ত সংসারে ওর বিশেষ একটা স্থান ছিল জ্যোতিরাণী সেটা কোন সময় না ভুলতেই চেষ্টা করেন। তাছাড়া সদার ওপর নির্ভর করে অনেক ছুর্দিন কাটিয়ে উঠেছেন। কোমল স্বরেই বললেন, বয়েসের জন্য তুমি যাচ্ছ না, দাদাবাবু ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা না করে কালই যেতে চাইছ কেন ?

তাতে অসুবিধে হবে।

জ্যোতিরাণী ভাবলেন একটু, কিছুদিন আগে সকালে উঠেই দাদাবাবু তোমাকে খুব বকেছিলেন শুনলাম···কেন বকেছিলেন ?

আমার কাজ আজকাল পছন্দ হচ্ছে না।

সদার মুখের দিকে চেয়ে জ্যোতিরাণীর হঠাৎ মনে হল, শুধু হাতে একটা নারকেলের শুকনো খোলস ছাড়াতে চেষ্টা করছেন তিনি। চেষ্টার আগ্রহ তবু বাড়ছেই। জিজ্ঞাসা করলেন, কি কাজ পছন্দ হচ্ছে না ?

সদা নিরুত্তর। একটু অপেক্ষা করে জ্যোতিরাণী আবার বললেন, বেশ, দিনকতক থাকো আরো, বাইরে শিগ্‌গীরই আমরা একটা বড় কাজ শুরু করব, তোমার মত লোক অনেক লাগবে—সেখানে তোমাকে কেউ কিছু বলবে না।

সামনের সাদা দেয়ালের ওপর থেকে সদা এতক্ষণে দৃষ্টিটা তাঁর দিকে ঘোরালো। সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিরাণী অবাক একটু। এই চাউনিতে খুশি বা কৃতজ্ঞতার লেশমাত্র নেই। উল্টে তাঁরই মুখের ওপর যেন একটা বিরূপ ছায়া ফেলল সে। ঠাণ্ডা মুখে জবাব দিল, দাদাবাবুকে একসময় কোলে-পিঠে করেছি বউদিমণি, তিনি দু'ঘা বসিয়ে দিলেও খুব লাগবে না। কর্তার সময় থেকে এ-বাড়ির অনেক নুন খেয়েছি, নতুন করে আর কোথাও নুন খেতে ইচ্ছে নেই।

তাহলে তুমি যেতে চাও কেন ?

একটু চুপ করে থেকে সদা বলল, দাদাবাবুর কাজ আর আমার ভালো লাগছে না, সেই জন্য।

জবাবটা অস্বাভাবিক ঠেকল কানে। মেঘনাকে যেভাবে লক্ষ্য করছিলেন তার থেকে অনেক বেশি মনোযোগে সদাকে নিরীক্ষণ করছেন। একটা চাপা জিজ্ঞাসা ঠেলে উঠছে ভিতর থেকে, একটু আগে বলল, ওর কাজ আজকাল মালিকের পছন্দ হচ্ছে না বলে বকুনি খেয়েছে আর এখন বলছে মালিকের কাজই ওর আর ভালো লাগছে না। জিজ্ঞাসা করলেন, দাদাবাবুর কি কাজ তোমার ভালো লাগছে না ?

কাজ প্রসঙ্গে ঠিক একটু আগের মতই সদা নিরুত্তর। এ মেঘনা নয় যে জ্যোতিরাণী ধমকে কথা বার করবেন, কিন্তু সেই রকমই ইচ্ছে করছিল। সমূহ ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হোক আগে, পরে দেখা যাবে। উত্তরের প্রতীক্ষায় না থেকে ওর সমস্যার সমাধান করলেন, বেশ, আর তোমাকে কারো কাজ করতে হবে না, তুমি শুধু এখানে থাকো।

দেয়ালের দিকে মুখ করেই সদা আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল। অর্থাৎ এও সে পারবে না।

জ্যোতিরাণী বিরক্তি বোধ করছেন এবারে।—কেন ? আমি তো বলছি দাদা-

বাবুর কাজ আর তোমাকে করতে হবে না?

সদার মুখ আবার তাঁর দিকে ঘুরল। জ্যোতিরাণী অবাক, ওর এই চাউনিটা আরো অস্বাভাবিক আর ধার-ধার। যেন দোষটা তিনি কিছু করেছেন আর থাকার জন্যে ওকে সাধাসাধি করছেন।

যে কথা শুনলেন তারপর, তাও কল্পনার অতীত। খুব চেপে চেপে ভেঙে ভেঙে সদা বলল, বাচ্চা বয়েস থেকে আমি বুড়োকর্তার চাকর ছিলাম, তারপর দাদাবাবুর চাকর—সেই থেকে সদা শুধু তেনাদের কাজ করেছে, ভালো-মন্দ না ধরে শুধু তেনাদের হুকুম পালন করেছে। তোমাদের যেটুকু করেছি তেনাদের কাজ ভেবেই করেছি। যাঁদের নুন খেয়ে মানুষ তাঁদের মুখ তাকিয়ে ভিন্ন আর কারো কাজ সদা কখনো করেনি, তোমারও না। দাদাবাবুর কাজ আর করতে হবে না তুমি বললে কি হবে?

জ্যোতিরাণীর মুখে কথা সরে না। চেয়ে আছেন। বলল যা তার সাদা অর্থ বিগত শ্বশুরের পরে তাঁর ছেলে ছাড়া ওর দুনিয়ায় আর কারো কোনো অস্তিত্ব ছিল না, এখনো নেই। এই স্পষ্ট উক্তির পরে ওর চাউনিটা আরো চকচকে লাগছে। সদা বলে গেল, বুড়োকর্তার তুমি বড় আদরেরটি ছিলে, বউদিমণি, আর দাদাবাবুর বউ বলে এই সদা চাকরেরও কম আপনার নও। কিন্তু তোমার জন্য দাদাবাবুর গোটা মাথাটা বিগড়ে গেলে স্বগ্‌গে থেকে বাপের নিঃশ্বেস লাগুক না লাগুক সদার সেটা অসহ্য হবে। তখন তুমিও তাড়াতে চাইবে আমাকে। ধার-ধার চোখ দুটো এবারে অন্যদিকে ফেরোলো সে, বিড়বিড় করে বলল, তার থেকে আমাকে ছেড়ে দাও বউদিমণি…

নির্বাক, স্তম্ভিত জ্যোতিরাণী। যা শুনলেন আর যা বুঝলেন ও ঠিক তাই শোনাতে চেয়েছে কিনা, ঠিক তাই বোঝাতে চেয়েছে কিনা—নিঃসংশয় নন যেন। শ্বশুরের আমলের লোক, জ্যোতিরাণী কোনদিন চাকরের মত হেলা-ফেলা করেননি বটে, কিন্তু এত বড় আস্পর্ধার কথা শোনার মত সম্মানের আসনেও বসিয়ে রাখেননি তা বলে। যত পুরনোই হোক, শিক্ষা-দীক্ষাশূন্য এই শ্রেণীর একটা লোক সামনে দাঁড়িয়ে এমন কথা বলার মত প্রশ্রয় পেল কি করে ভাবতে পারেন না। অপলক কঠিন নেত্রে ওর দিকে চেয়ে রইলেন তিনি।…ঠিকই শুনেছেন, ওর কথা ঠিকই বুঝেছেন। মনিবের ওপরেই শুধু রাগ করে চলে যেতে চাচ্ছে না, নুন খেয়েছে যার সেই মনিব ভিন্ন ওর চোখে আর কেউ কিছু নয়, মনিবের চাবুকও গায়ে লাগবে না বলেছে—আসল রাগ আর বিদ্বেষ তাঁর ওপর যার জন্যে মনিবের মাথা এখন গোটাগুটি বিগড়ে যাচ্ছে বলে ওর বিশ্বাস। তাঁরই চাল-চলন-আচরণে ওর অশ্রদ্ধা,

অবিশ্বাস, বিতৃষ্ণা···

নিজেকে সংযত করলেন জ্যোতিরাণী, ওকে সামনে দাঁড় করিয়ে আর একটি কথা বলতেও রুচিতে বাধছে। অনুচ্চ মৃদু-কঠিন স্বরেই বিদায় করলেন তাকে।

—ঠিক আছে, তুমি কালই যেও।

॥ তেইশ ॥

সদা চলে গেল।

ভোরে যাবার কথা ছিল। তাই গেছে। যাবার আগে জ্যোতিরাণীর সঙ্গে দেখা হয়নি। বেলায় ঘুম ভেঙেছে, ঘর থেকে বেরুতে দেরি হয়েছে। দেখা করার জন্য সদা অপেক্ষা করেছিল কিনা জানেন না। সম্ভবত না। কারণ রাতেও ওর সঙ্গে আর দেখা হয়নি, সকালে কখন যাবে না যাবে তাঁকে অন্তত বলেনি।

বাইরে থেকে দেখতে গেলে সদার এই নিঃশব্দ বিদায় বড় বর্ণশূন্য মনে হবে। এক বছর দু বছর নয়, একটানা চল্লিশ বছর কাটিয়েছে এই সংসারে। বড়লোকের বাড়ির এত পুরনো চাকরের স্বাভাবিক বিদায়ের আগে একটু ঘটা হতে পারত, কিছু আড়ম্বর হতে পারত, চোখের জল ফেলা-ফেলিরও ব্যাপার হতে পারত একটু-আধটু। কিছুই হয়নি। রাতে বলেছে যাবে, সকালে চলে গেছে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তার এই বিদায়টা সত্যিই বর্ণশূন্য হয়েছে বলা যায় না। ওর যাওয়াটা এ বাড়ির বাতাসে ঘুরছে। সকলের মনের তলায় একটা দাগ ফেলে গেছে। আনুষ্ঠানিক বিদায়ের ঘটায় এটা হত না।

গত রাতেই খেতে বসে সদার কথা আবার তুলেছিলেন কালীদা, একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করেছেন, সদাকে কালই ছেড়ে দিতে রাজি হয়েছ শুনলাম?

অকারণেই ঘাড় ফিরিয়ে একবার মেঘনাকে দেখে নিয়েছিলেন জ্যোতিরাণী। খাবার সময় সচরাচর ও থাকে না। সদা থাকে। কাল রাতে মেঘনা ছিল। কথা উঠবে আশা করেই ছিল সন্দেহ নেই। মুখ থমথমে ভার। জ্যোতিরাণী জবাব দিয়েছেন, থাকবেই না যখন ছেড়ে না দিয়ে কি করব।···যেতে চায় যাক।

অনুমতি দেওয়াটা কালীদার মনঃপূত হয়নি বোঝা গেছে। আহারে মন দিয়ে ইতস্তত ভাবটা গোপন করে মনোভাব ব্যক্ত করেছেন, সদাই বলছিল শিবু তরশু ফিরবে, এ কটা দিন অপেক্ষা করলে হত না······।

আশ্চর্য, মনিব কবে ফিরবে তারও সঠিক খবর বাড়িতে একা সদা ভিন্ন আর

কেউ জানে না। অথচ এই সদাই তাকে এড়াতে চায়। কেন? থাকার জন্তে সাধাসাধি করে মনিব ওকে আটকে ফেলবে বলে? মনে হয় না। তার কাছে যাবে বলতে ওর সাহস কুলোবে না। তাহলে চাবকে বাড়ি থেকে তাড়াবে বলেছিল যেদিন, সেদিনই যেত। তার অনুপস্থিতিতে পালাবার সুযোগ খুঁজত না। সদার ক্ষোভ আর বিতৃষ্ণা কর্ত্রীর ওপর বটে, কিন্তু সমস্যা মনিবকে নিয়ে। মনিবের কাজ আর ওর ভালো লাগছে না এ-কথা ও খুব স্পষ্ট করেই বলেছে তাঁকে। কালীদার কথায় ভিতরে ভিতরে জ্যোতিরাণী উষ্ণ হয়ে উঠেছিলেন, ও থাকলে আমার আপত্তি কি, বলে দেখুন।

মাথা নেড়ে কালীদা জানিয়েছেন, তোমার অনুমতি পেয়েছে যখন আমি বললে আর কিছু হবে না। এ-মাসের ছাড়াও ওর মাস কয়েকের টাকা আমার কাছে জমা আছে, সকালের গাড়িতেই চলে যাবে বলে সে-সব বুঝে নিতে এসেছিল। খাওয়া-দাওয়ার পর দেব বলেছি। এর মধ্যে তুমি একবার বলে দেখতে পারো।

বিরক্তি বাড়ছিল জ্যোতিরাণীর। কারো পরামর্শের জন্য অপেক্ষা না করে বলা যে হয়েছিল, সেই আর প্রকাশ করেননি। সংযত মৃদু জবাব দিয়েছিলেন, থাক্ দিয়ে দিন।

কালীদা চুপচাপ আহারে মন দিয়েছেন। মেঘনা ঘর ছেড়ে চলে গেছে।

রাত্রিতে সদার চিন্তাটাই সর্বাগ্রে বাতিল করতে চেষ্টা করেছিলেন জ্যোতিরাণী। মাথার মধ্যে পর পর বহু চিন্তা সাজানো, তার মধ্যে সদার পাতাটাই আর একবারও না দেখে উল্টে যেতে চেয়েছেন। কিন্তু ঘর অন্ধকার করলেও যেমন জানলা-দরজার ফাঁক দিয়ে বাইরের দুই-একটা আলোর রেশ এসে পড়ে, তেমনি ভিতরের এক-একটা ফাঁক দিয়ে একটা-দুটো চিন্তার রেশ উঁকিঝুঁকি দিতেই থাকল। প্রতিষ্ঠান গড়ার ব্যাপারে কালীদার একটুও সায় কেন পাওয়া গেল না ভাবতে গিয়ে অন্য কিছু মনে পড়েছে। মিত্রাদি চলে যাবার পর আর সিতু পড়া শেষ করে উঠে যাবার পর কালীদা কালো খাতায় লিখছিলেন কি? তাঁর হিসেবের খাতাও ঠিক অমনি কালো আর ঠিক ওই-রকম কালো। হতে পারে কোনো কারণ নেই, তবু ঠিক এক-রকমই দেখতে কেন দুটোই? কালীদা হিসেব লিখছিলেন? কেন যেন জ্যোতিরাণীর একবারও তা মনে হল না। তাহলে কালো খাতায় কি লিখছিলেন কালীদা? মিত্রাদির কথা না সদার কথা? মিত্রাদির কথা লেখার মত কালীদা নতুন করে কি পেলেন আবার? মিত্রাদির কথা আর কথার ঝাঁজ তিনি নিজের কানে শুনেছেন অবশ্য, কিন্তু এও নতুন কিছু নয়। জ্যোতিরাণীর ধারণা, দেখা হলেই দুজনের মধ্যে এই গোছের খটাখটি বাধে।

...সদার কথা? চল্লিশ বছরের একটা লোক হঠাৎ এভাবে চলে যাবার জন্ম পা বাড়ালো কেন, সেই কথা?

কালীদা কি আঁচ করতে পেরেছেন ও কেন যাচ্ছে? ঘুরেফিরে নিজের অগোচরে সদার পাতাটাই কখন উল্টে বসেছেন আবার।

...সদা যাবেই, কিন্তু কেন যাবে? এগারো বছর পার হতে চলল, মস্তিষ্ক-বিকৃতির কত কাণ্ড হয়ে গেছে এর মধ্যে, সদা না জানে কি! ওর দাদাবাবুর নতুন করে গোটাগুটি মাথা বিগড়োবার কি লক্ষণ দেখল? এক জ্যোতিরাণী বাদে আর সকলের চোখে ওই মাথা তো আগের তুলনায় এখন ঢের ঢের বেশি ঠাণ্ডা! তার কি কাজ সদার ভালো লাগে না এখন?

...স্বাধীনতার রাতে চাবকে পিঠের ছাল তোলা হয়েছিল ছেলেটার। ছেলের অপরাধ বুঝতে কষ্ট হয়নি। আলো নেভানোটা অপরাধ নয়, যে-ঘরের আলো নেভানো হয়েছিল সেই ঘরে শুধু বিভাস দত্ত ছিলেন আর জ্যোতিরাণী ছিলেন—অপরাধ এটা। কিন্তু সকালে উঠেই সদাকে চাবকে তাড়াবার মত শাসন করার দরকার হল কেন?

অন্ধকারের মধ্যে খানিক যেন হাতড়ে বেড়িয়েছেন জ্যোতিরাণী, সমস্ত ব্যাপারটাই দুর্বোধ্য। তাঁর প্রতি সদার ক্ষোভ আর বিতৃষ্ণার হেতুও।

তারপর এই সকাল, যে-সকালে সদা চলেই গেছে। চায়ের পাট শেষ হতে না হতে ব্যস্ত মুখ করে সিতু এসে খবর দিয়েছে, ঠাকুমা ডাকছে।

সদার বিদায় যে একটুও বর্ণশূন্য হয়নি এই ডাক তারই নজির। কেন ডাকছেন বুঝতে দেরি হল না। যত বিরক্তিকরই হোক এ-পর্ব এড়ানোর উপায় নেই।

বল্‌গে আসছি।

সিতুর যাবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। বিস্ময়ে আর কৌতূহলে তারও টসটসে মুখ।—সদা একেবারে চলে গেল কেন মা?

তোকে কে বলল?

বা রে, ওই তো যাবার আগে ঠাকুমাকে বলে গেল আর আসবে না। বলল, বয়েস হয়েছে শরীর ভেঙেছে আর কাজ করতে পারছে না।

তাহলে তো শুনেছিস কেন গেল, আবার জিজ্ঞেস করছিস কেন? ঠাকুমা কি বলল?

ঠাকুমা প্রথমে বিশ্বাস করল না, তারপর বকল রাগ করল, শেষে জেঠুর কাছে ছুটল। সদা এই ফাঁকে হাওয়া।

জ্যোতিরাণী উঠে শাশুড়ীর ঘরের দিকে চললেন। পরক্ষণে মনে হল সিতুও

পিছনে আসছে। ঘুরে দাঁড়ালেন। অনুচ্চ ধমকের সুরে বললেন, পড়তে বোসোগে যাও!

হাত-পা ছড়িয়ে শাশুড়ী মেঝেতে বসে। মুখের দিকে তাকালেই ভিতর দেখা যায়।—হ্যাঁ গো মা, যাবে বলল বলেই চল্লিশ বছরের লোকটাকে এক কথায় ছেড়ে দিলে তুমি?

স্বাভাবিক সুরেই জ্যোতিরাণী জবাব দিলেন, এক কথায় ছাড়িনি।

কিন্তু তুমি আমাকে এসে বললে না কেন, আমার কাছে পাঠালে না কেন ওকে? শিবু পর্যন্ত বাড়ি নেই আর তুমি এত কালের লোকটাকে একেবারে যাবার অনুমতি দিয়ে বসলে? কেন? ও হঠাৎ এভাবে চলে গেল কেন?

আমি জানি না।···দাদাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন।

রাগ সামলাবার চেষ্টায় কিরণশশী বড় করে গোটাকয়েক নিঃশ্বাস নিলেন আর ফেললেন।—কেন যেতে চায় না জেনেই ওকে তুমি ছেড়ে দিয়েছ তাহলে? বেশ করেছ মা বেশ করেছ, আমরা হলে পারতুম না। পুরনো হলে কুকুর বেড়ালের জন্যেও লোকে কাঁদে শুনি, চল্লিশ বছর ধরে ও কি যে ছিল এ সংসারের তুমি জানবে কি করে! তোমাদেরই সব এখন, যা ভালো বুঝেছ করেছ, আমার ডেকে জিজ্ঞাসা করাই ভুল। আগে জানলে ওই সদাকেই বলতাম, আমাকেও নিয়ে চল্ কোথাও, তোর মত আমারও দরকার ফুরিয়েছে—

যেটুকু সময় দাঁড়িয়েছিলেন শাশুড়ী আর মুখ ফেরাননি তাঁর দিকে। জ্যোতিরাণী কথার পিঠে আর একটি কথাও না বলে চলে এসেছেন। এই গোছের উক্তি শুনতে একেবারে অনভ্যস্ত নন, আগে অনেক শুনেছেন। রাগ হয়নি, শাশুড়ীর কতখানি লেগে থাকতে পারে সে-বিবেচনা তাঁর আছে। সদা একেবারেই চলে গেছে ভাবতে জ্যোতিরাণীর নিজেরই কম অস্বাভাবিক লাগছে না এখনো। গত রাত থেকে কত কি অস্বাভাবিক লেগেছে শাশুড়ীকে বোঝাবেন কি করে। অনুমতি দেবার আগে চল্লিশ বছরের পুরনো লোক তাঁর মুখের সামনে দাঁড়িয়ে কি যে বলেছে আর কতখানি অপমান করেছে তা শুনলেও শাশুড়ীর এই রাগ ঠাণ্ডা হত না। শোনানো সম্ভবও নয়।

বাড়ির সব কটি মুখ পর্যবেক্ষণ করেছেন জ্যোতিরাণী। সদার বিদায়টা তাঁর চোখে অন্তত বর্ণশূন্য ঠেকছে না। শামু আর ভোলা এমনিতে অলস, ফাঁক পেলে বসে থাকে। সদার সেটা সহ্য হয় না বলে ধমক-ধামক করত আর মেঘনা ওদের হয়ে সদার সঙ্গে ঝগড়া করত। কিন্তু শামু-ভোলার মুখও বিমর্ষ। চল্লিশ বছরের

একটা লোকের ওপরেও অবিচার হয়েছে ভেবেই হয়ত খেদ ওদের।

সব থেকে বেশি লক্ষ্য করার মত মুখ মেঘনার। জ্যোতিরাণীর কেমন ধারণা হল ফাঁকে ফাঁকে ও একটু-আধটু কেঁদেও নিয়েছে। সদাকে ধরে রাখা হবে এই আশা শেষ পর্যন্ত ছিল বোধ হয়। টুঁ শব্দটি নেই, একেবারে মুখ বুজে কাজ করছে। অন্যদিন যা করে, তার থেকে বেশী করছে। কাজের ঝাঁপি দিয়ে বড় গোছের একটা ক্ষোভ চাপা দিয়ে চলেছে যেন। কিন্তু চাপা থাকছে না। ওকে লক্ষ্য করার ফাঁকে ফাঁকে জ্যোতিরাণী ভেবেছেন একটু। ওর রাগ তাঁর ওপর না যে লোকটা চলে গেল তার ওপর? বাড়ির মধ্যে সদার সঙ্গে সব থেকে কম বনিবনা হত ওরই। ঝগড়া করার জন্য জিভ সুড়সুড় করত। কিন্তু এই বিরাগের বিপরীত টানটা জ্যোতিরাণীর অস্তত অগোচর ছিল না। কখনো সেটা কদর্য হয়ে ওঠেনি, এই যা।···সদা সংসারী আর মেঘনা বিধবা, বড় বড় দুটো ছেলে আছে। সদার মত চরিত্রের লোকের কাছে ওর প্রত্যাশা কিছু ছিল এমন কুৎসিত সংশয় জ্যোতিরাণীর মনে ছিল না। তবু মেঘনার কর্কশ স্বভাবের আড়ালে হৃদয় নামে একটুখানি বস্তু আছে কোথাও, সদার প্রতি ওর বিরূপ আচরণের ফাঁক দিয়েই সেটা তাঁর চোখে অনেক সময় ধরা পড়েছে। আজও দেখে মনে হল, সেই বস্তুটারই কোনো একটা দিক খালি হয়ে গেছে। গোঁ-ধরে সদা চলেই গেল দেখে মেঘনার সত্যিকারের ক্ষোভ তাহলে কার ওপর?

জ্যোতিরাণীর ধারণা, সদা গেল কেন মেঘনা মোটামুটি তা জানে। এ নিয়ে অনেক কারণে অনেক রকমের জিজ্ঞাসা উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে মনে। কিন্তু ওকে ডেকে আবার জেরা করতে বসবেন তেমন রুচিও নয় তাঁর। যাই হোক, শাশুড়ীর ঘর থেকে ফেরার পর একটা কর্তব্য তাঁর মনে পড়েছে। চল্লিশ বছর যে ছিল, তার প্রতি তিনি অবিচার করবেন না। তাঁর সঙ্গে বেইমানী করেছে লোকটা, ওর সাহস ক্ষমার অযোগ্য—তবু না। ওর সুখ-সুবিধে তিনি যত দেখেছেন তেমন আর কেউ না। অশিক্ষিত লোক, কি দিয়ে কি বুঝেছে কে জানে। এদের মনিব-ভক্তি এই গোছের হওয়া বিচিত্র নয়।

কালীদার ঘরে এলেন। এখন এক নজর দেখেই মনে হল কালো খাতায় হিসেব লিখছেন কালীদা। কালও এই খাতাতেই আঁচড় পড়ছিল কিনা বোঝার উপায় নেই।

সদাকে ওর পাওনা থেকে বেশি কিছু দেননি?

ঈষৎ বিস্মিত নেত্রে তাকালেন কালীদা, এসব ব্যাপারে তিনি যা ভালো বোঝেন তাই করেন, কেউ কোনরকম খোঁজখবর করে না সচরাচর।—তিন মাসের মাইনে বেশি দিয়েছি। কেন?

একটু ভেবে জ্যোতিরাণী বললেন, ও যা পেত এখানে মাসে মাসে ওকে সেই টাকাটা পাঠালে ভালো হয়।

ভালো হলে পাঠানো হবে। হাসলেন কালীনাথ, সদার ভাগ্য ভালো, আমার জন্যে এ-রকম একটা ব্যবস্থা-ট্যাবস্থা হলে মনের আনন্দে কাশীবাসী হতেও আপত্তি ছিল না।···হয় না?

কালীদার কৌতুকে প্রচ্ছন্ন ঠেস থাকেই প্রায়, এখন খুশিই মনে হল তাঁকে। কিন্তু জ্যোতিরাণী খুশি নন একটুও। গতকালের প্রত্যাখ্যান ভোলেননি।··· দিল্লী থেকে যিনি ফিরছেন প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে কালীদার মনোভাব তাঁরও অগো-চর থাকবে না, এ তিনি ধরেই নিয়েছেন। নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ালেন জ্যোতিরাণী। পরশুই তো ফিরছেন, দেখা যাক।···সদার এই আচমকা বিদায়টা তিনি কি-ভাবে নেবেন? অনুমতি দেবার অপরাধে শাশুড়ীর মত তাঁরই ওপর জ্বলে উঠবেন না নিজেকে দুষবেন? দেখা যাক। মেঘনা বা কালীদা কতটা জানে অনুমান মাত্র, কিন্তু সদা কেন এভাবে বিদায় নিল দুজন অন্তত জানেই—একজন সদা নিজে আর একজন তার ওই মনিব। আসছেই তো, দেখা যাক।

সেদিনের কাগজটা বিছানায় পড়ে ছিল। অভ্যাস বশে ওল্টালেন। একটা সুপরিচিত নামের ওপর চোখ আটকালো, পড়ার জন্যে ঝুঁকলেন জ্যোতিরাণী। আগে হলে সাগ্রহে সবটাই পড়ে ফেলতেন, কিন্তু এখন ভালো লাগল না। পাতা উল্টে গেলেন।···মামাবাবুকে চিঠি লিখতে হবে একটা। নিজে লিখবেন না কালীদাকেই বলবেন লিখতে? সঙ্গে সঙ্গে নিজের ওপরেই বিরক্ত। যে কাজে হাত দিতে যাচ্ছেন কারো মুখ চেয়ে হাত গুটিয়ে থাকলে চলবে? চিঠি নিজেই লিখবেন। কাগজ ছেড়ে উঠলেন।

টেলিফোন।

বিভাস দত্তর গলা পেয়েই মাথাটাকে হাল্‌কা করার তাগিদ বোধ করলেন।— এই মাত্র কাগজে আপনার সাহিত্য কনফারেন্সের বক্তৃতা পড়লাম, এতদিনে বেরুলো?

বিভাস দত্ত হেসে জবাব দিলেন, মিনিস্টারের বক্তৃতাও নয় শিল্পপতিরও নয়, ছেঁটে-কেটে বেরিয়েছে যে এই ঢের। তা যাও পড়লেন তার সঙ্গে আপনি একমত নন নিশ্চয়?

এই যা! পড়েছি বলেছি, না? বিড়ম্বনার অভিব্যক্তি নিজের কাছেই উপ-ভোগ্য জ্যোতিরাণীর, পড়িনি এখনো, দেখলাম।

হাসির সঙ্গে ওধার থেকে বিভাস দত্তর উৎফুল্ল মন্তব্য, প্রাপ্য মর্যাদার অধিক

লাভ হল কেন ভেবে আমিও তো অবাক হচ্ছিলাম—ওটা দেখারই বস্তু, পড়ার বস্তু নয় আমি জানি।

শমী কেমন আছে? জ্যোতিরাণী প্রসঙ্গ ঘোরালেন।

ভালো···তবে মন খুব ভালো নয় সন্দেহ হচ্ছে।

কেন, গাড়ি পাঠাতে হবে?

সে-জন্যে নয়, কেমন ধারণা হয়েছে ওর ওপর মাসীর টান একটু কমেছে।

বক্র-রেখার সূচনা দেখা দিল মুখে, জ্যোতিরাণী জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলেন, ধারণাটা ওর মাথায় আর কেউ ঢোকাতে সাহায্য করেছে কিনা। কিন্তু বচন-বিন্যাস আর জটিল করে তোলার ইচ্ছে নেই। হাল্‌কা বিস্ময় প্রকাশ করলেন, দুষ্টু মেয়ে এই বলেছে? আচ্ছা দিন তো ওকে—

ঘরে নেই, নীচে খেতে গেছে বোধ হয়।

অতএব ঠোঁটের একটু ভঙ্গি করে আবার এই গলাই শোনার জন্যে প্রস্তুত হলেন তিনি। শমী ঘরে থাকলেও এরই মধ্যে খুশি চিত্তে ফোন ছেড়ে দিতেন কিনা সন্দেহ।

ওদিকের প্রশ্নে চাপা বিস্ময় ঝরল এবারে।—আচ্ছা, শমী বলছিল স্টেশনের সেই বউটি মিসেস চন্দর সঙ্গে দুদিন আপনার বাড়িতে এসে গেছে, আর এখন বীথিমাসী হয়ে বসেছে তাদের···কি ব্যাপার?

এবারের জবাবে সত্যিই জ্যোতিরাণীর লঘু সুর।—ব্যাপার আর কি, আপনার পদ্মার শোক নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করার বাসনা।

সে-দিন কিছু বললেন না তো?

আজও বলার ইচ্ছে ছিল না, আপনার হাসির খোরাক হতে কে চায়? কোন্ বইয়ে ফুল-ফোটানো একটা ব্যর্থ চেষ্টার চিত্রই দেখে বসব হয়ত।

তাহলে চেষ্টা কিছু করতে যাচ্ছেন?

যাই করি আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মশাই, পদ্মার শোকের মধ্যে টেনে আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করার কথা এখনো ভাবছি না। পরের কথা অবশ্য জানি না···

টেলিফোন ছেড়ে জ্যোতিরাণী নিজের মনেই হেসেছেন মৃদু মৃদু। কতখানি নিশ্চিন্ত করা হল ভদ্রলোককে সে শুধু তিনিই অনুভব করতে পারেন।

যাক, চিঠিটা মামাবাবুকে আজই লিখবেন, না দিনকতক বাদে? কিন্তু চিঠি পেতেই কদিন লেগে যাবে কে জানে। প্যাড আর কলম নিয়ে বসলেন।

শ্রীচরণেষু··

কিন্তু লিখবেন কি? পদ্মার শোক দূর করার মতই এক মস্ত প্রতিষ্ঠান গড়ে

তুলতে যাচ্ছেন তাঁরা—সেই ফিরিস্তি ? ও-রকম লিখলে হাসবেন। তবে হাসিটা কালীদার মত অথবা বিভাস দত্তর মত হবে না যে তাতে সন্দেহ নেই। তবু ও-ভাবে না লেখাই ভালো। শুধু লেখা যেতে পারে, দরকারী পরামর্শ ছিল একটু, সময় আর সুযোগমত একবার যদি কলকাতায় আসেন, ভালো হয়। তাঁর কাছ থেকে এ-রকম একটা চিঠি পেলে একটু বেশি চিন্তা করবেন হয়ত, তবু এই গোছেরই কিছু লিখতে হবে।

আবার টেলিফোন।

আগের জায়গা থেকেই কিনা সন্দেহ হল। এবারে শমীকে ধরিয়ে দিচ্ছেন হয়ত। না, মিত্রাদির গলা। সাড়া পেয়েই মিত্রাদি উদগ্রীব, কি-গো, তোমার কালকের নক্সার আরো স্বাস্থ্যোন্নতি হয়নি তো ? প্রতিষ্ঠানের যে ছবি কাল তুমি তুলে ধরলে আমার তো ভাই তাতেই ঘুম চটে গেছে।

কদিন ধরে মিত্রাদির সবই মিষ্টি লাগছে জ্যোতিরাণীর। এমন আর আগে কখনো লাগে নি। কাল কালীদাকে ওভাবে ঝাঁজিয়ে গেছে, মনে পড়তে তাও খারাপ লাগছে না। হেসে বললেন, নিজের হোক বা যার হোক স্বাস্থ্যোন্নতির কথা ভাবলেই তোমার ভয় ধরে বুঝি ?

এটুকুতেই রসের খোরাক পেলেন মৈত্রেয়ী চন্দ, হেসে উঠে সায় দিলেন, যা বলেছ, গতরখানা যা হচ্ছে দিন কে দিন—

হাল্কা বাতাসে মাথাটাকে ভরে তুলতে চান জ্যোতিরাণীও, ছদ্ম রাগে ধমকে উঠলেন, দেখো বাজে বোকো না, নিজের গতরের খবর ভালোই রাখো তুমি—এই দেখেই কতজনের মাথা ঘুরছে কে জানে!

টেলিফোন কানে জ্যোতিরাণী মুখ টিপে হাসছেন। ওদিকে মিত্রাদির হাসি ধরে না। হাসির পরে জবাব কি আসবে তাও জানাই আছে। রসের কথায় জানা-রসই ফিরে এলো সেদিক থেকে।—সে আশায় ছাই, পাশে তোমাকে দেখলে মাথা ঘোরা ছেড়ে অজ্ঞান হবে যে।

দেখবে না দেখবে না, তোমার আশার লোকেরা কেউ দেখবে না, নিশ্চিন্ত থাকো। প্রসঙ্গ ঘোরাতে গিয়ে বিভাস দত্তর উপমাটাই মনে এলো, জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের পদ্মার শোকের খবর কি ?

পদ্মার শোক! ও বীথি ?...সুন্দর বলেছ তো!

বিভাসবাবুর কথা। বীথি কি করছে ?

কি আর করবে, বসে আছে। কিছু করার নেই বলেই তো ওকে নিয়ে মুশকিল।

বসে বেশি দিন থাকবে না। ভালো কথা, টেলিফোন গাইডে দুই-একটা চ্যারিটি হোমের নাম দেখলাম, তারা কি করে না করে তুমি একটু ঘুরেটুরে দেখো তো, জানা থাকা দরকার—

আমার জানাও আছে দেখাও আছে, এখন আসল ব্যবস্থার কি করলে তাই বলো। কালকের প্ল্যান বদলায়নি তো?

সব ঠিক আছে, আর দিনকয়েক সবুর করো।

··· শিবেশ্বরবাবুর ফেরার অপেক্ষায় আছ বুঝি?

এক মুহূর্ত থমকে জ্যোতিরাণী হেসে লঘু জবাব দিলেন, হ্যাঁ, সে আসবে বলে হিয়ার মাঝে আঁচল পেতেছি—সবে ধন নীলমণি, আর কার অপেক্ষায় আছি ভাবো?

টেলিফোন ছাড়ার পর জ্যোতিরাণীর বারকয়েক মনে হয়েছে, গোচরে হোক অগোচরে হোক একজনের ফেরার অপেক্ষা তিনি ঠিকই করছেন। সেটা মিত্রাদির 'আসল ব্যবস্থা' এগিয়ে আনার কারণে হোক বা অন্য যে কারণেই হোক।

সন্ধ্যায় কালীদা একতাড়া পাসবই, একগোছা কোম্পানীর কাগজ, শেয়ার সার্টিফিকেটের ফাইল, একরাশ দলিলপত্র, আর কালো নোট-বই জ্যোতিরাণীর ঘরে এনে পৌঁছে দিলেন। পকেট থেকে কতগুলো চাবিও রাখলেন সামনে, বললেন, আপাতত এর বেশি আর তোমাকে কিছু দিতে পারছি না। এ-ছাড়া ব্যাঙ্কে আর গোটা দুই-তিন পাসবই আছে, ইনকাম ট্যাক্সের দপ্তরে কিছু কাগজপত্র আছে, আমার নামে তোমাদের কিছু বেনামদারী সম্পত্তি আছে আর ট্র্যানজাকশান হয়েছে যখন লাখ দেড়েক টাকা হয়ত দিল্লী থেকে শিবুর সঙ্গে আসছে—সে-সবের মোটামুটি হিসেব তুমি ওই নোট-বইয়ে পাবে—এ ছাড়া আমার দপ্তরে আর কিছু নেই। এর মধ্যে যেগুলো আমাকে ফেরত দেবে, পারো তো কালকের মধ্যেই দিও।

শেষের উক্তির একটাই কারণ ধরে নিলেন জ্যোতিরাণী। পরশু এসবের মালিক ফিরছেন, তার আগেই চান।

কালীদা গম্ভীর মুখে প্রস্থান করতে জ্যোতিরাণী চুপচাপ দাঁড়িয়ে বই ফাইল কাগজপত্রগুলি শুধু চেয়ে চেয়ে দেখলেন খানিক। তারপর কেন যে কালো নোট-বইটার দিকেই হাত বাড়ালেন প্রথম জানেন না। প্রায় অর্ধেকটা হিসেবে ভরাট, বাকিটা সাদা। হিসেবের অঙ্ক বা বিবরণও দুর্বোধ্য।

আগামী দিনের জন্য অপেক্ষা করেননি জ্যোতিরাণী। সেই রাতেই সব কিছু উল্টে-পাল্টে দেখেছেন। খুঁটিনাটি অনেক ব্যাপার বোঝেননি, কিন্তু মোটামুটি যে

চিত্রটা পেয়েছেন তাতেই নিঃশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম অনেকবার। খুব ধীর-স্থির মাথায় মন দিতে চেষ্টা করেছেন সব কিছুতে, তবু বার বার মনে হয়েছে তিনি বুঝি কি এক অবাস্তব গুপ্তধনের চাপ-ধরা সুড়ঙ্গের মধ্যে বিচরণ করছেন। যেদিকে তাকান ঐশ্বর্যের ছটায় চোখ ঠিকরোয়, নিঃশ্বাস ভারী হয়।

এই বিপুল সঞ্চয়ের প্রথম পদক্ষেপ চল্লিশ সালে। তেতাল্লিশ সাল পর্যন্ত জলের স্রোতের মতই টাকা এসেছে লক্ষ্য করেছিলেন তিনি। তার পরেও টাকা যে অজস্রধারে আসছে সে আভাস পেতেন বটে, কিন্তু সেদিকে তাঁর চোখ ছিল না। সব মিলিয়ে এই কটা বছরে বিত্তের পরিমাণ যা দাঁড়িয়েছে তিনিও কল্পনা করতে পারেন না।

নানা নামে নানান রকমের দলিলে জলের দরে জমি আর বাড়ি কেনা শুরু হয়েছে যুদ্ধের সময় বোমার ভয়ে লোক পালানোর হিড়িকে, বিয়াল্লিশের ভারত-ছাড়ো আন্দোলনের বিপ্লবে, দুর্ভিক্ষের আগের আর পরের করাল দুর্যোগে, এমন কি ছেচল্লিশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মৃত্যু নিয়ে ছিনিমিনি খেলার সেই সঙ্কটের ফাঁকে ফাঁকেও। এর কোনটা খোদ মালিকের নামে, কোনটা জ্যোতিরাণীর নামে, কোনটা শাশুড়ীর নামে, কোনটা বা নাবালক ছেলের নামে।

…জ্যোতি দেবী, জে চ্যাটার্জী, জ্যোতিরাণী চট্টোপাধ্যায়, রাণী দেবী, রাণী চ্যাটার্জী ইত্যাদি বিভিন্ন স্বাক্ষরে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের বিভিন্ন পাসবইয়ে জ্যোতিরাণীর একার নামেই লাখ ছয়েক টাকা আছে। দেখা গেল বিভিন্ন নামে বিভিন্ন ঠিকানায় থাকেন তিনি।—সেফ ডিপজিট ভল্টেও টাকা আছে আর আছে কয়েক লক্ষ টাকার সোনা। নাবালক ছেলের পাসবইগুলোর অঙ্কও এই গোছেরই প্রায়। তার কোনটার গার্জেন তিনি, কোনটার ছেলের বাবা, কোনটার বা কালীদা। স্বয়ং মালিকের বহু নামে আর বেনামে আছে তাঁদের দ্বিগুণেরও বেশি। অপরিচিত নামের পাসবইগুলো মালিকেরই বেনামে বলে ধরে নিলেন জ্যোতিরাণী। এর বাইরে কাগজ আর শেয়ার সার্টিফিকেট।

বাড়ি আর বিষয়-আশয়ের দলিলগুলোর মধ্যে নিজের নামের একটা দলিল পছন্দ হল জ্যোতিরাণীর। দলিলে তাঁর নিজের সই-ই বটে। কবে কিনেছেন বা কবে সই দিয়েছেন জানেন না—কালীদা সই নিতে এলে কোনদিনই কিছু উল্টে দেখেননি তিনি। সামনে ধরে দিলেই সই করে দিয়েছেন। নগর পারে, অর্থাৎ কলকাতার উত্তর প্রান্ত ছাড়িয়ে মাইল দশ-বারো দূরে বাড়িসমেত দশ বিঘের জমি বাড়ি একটা। ভিতরের বর্ণনা যা পড়লেন, বাড়ি না বলে প্রাসাদও বলা যেতে পারে। যতদূর ধারণা, বাড়িটা পুরনো। কিন্তু ভোল ফেরাতে কতক্ষণ? আরো

বেশি পছন্দ, কারণ তাঁর কল্পনার সঙ্গে অনেকটাই মিলছে। শুধু গাছ-গাছড়ার বাগান নয়, বড়সড় পুকুরও আছে একটা। আর গোটা এলাকা উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। শহর থেকে দূরেই চেয়েছিলেন তিনি, তাই হয়েছে। দূরে দূরেও বাড়ি আরো কয়েকটা আছে, সেগুলো মনের মত নয়। তাছাড়া, রিসিট-পত্র ঘেঁটে এ বাড়িটা থেকে কোনরকম সঞ্চয়ের হদিস পেলেন না। আশা করা যায় এটা খালিই আছে।

সবই আশার ব্যাপার, হতাশার কিছুই নেই। তবু সমস্তটা রাত কেন যে এক দুর্বোধ্য অস্বস্তির মধ্যে কাটালেন জ্যোতিরাণী জানেন না। থেকে থেকে মাথাটা কেবল ঝিমঝিম করেছে, স্নায়ুগুলোতে টান ধরে আছে, ঘুমের মধ্যেও যেন সম্পদ-সুড়ঙ্গে বিচরণের একটা চাপ অনুভব করেছেন।

সকালেই কালীদাকে ঘরে ডেকে বইখাতাপত্রগুলো ফেরত দিলেন। কেবল নিজের নামের পাস বই আর চেক-বইগুলো, সেফ ডিপজিট ভল্টের চাবি, আর নগরপারের ওই দশ বিঘে জমির বাড়ির দলিলটা রেখে দিয়ে বললেন, এগুলো আমার কাছে থাক।

মনঃপূত হল কিনা মুখ দেখে বোঝা গেল না, কোন্‌গুলো থাকবে কালীদা এক বার শুধু দেখে নিলেন। একটিও মন্তব্য করলেন না। কিন্তু জ্যোতিরাণী ধরেই নিলেন, তাঁদের সঙ্কল্পের সঙ্গে কোনরকম যোগ রাখতে চান না যখন—পছন্দ হয়ই নি। না হোক, কিছু যায় আসে না।

গত রাত্রি থেকে যে অস্বাচ্ছন্দ্যটা মনের তলায় বারকয়েক আনাগোনা করে গেছে, মুখ ফুটে সে সম্বন্ধে কালীদাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন বা করতে পারবেন ভাবেননি। রাতে অনেকবার বিভাস দত্তর সেই বইটার কথা মনে পড়েছে।··· 'শ্বেতবহ্নি'। যে বই লেখার ফলে জেল খাটতে হয়েছিল ভদ্রলোককে, যে বই স্বাধীনতার আগেও বাজেয়াপ্ত ছিল, যে বইয়ে শুধু বিদেশীর নয়, দেশের লোকেরও হৃদয়শূন্য সুড়ঙ্গপথে চলার অনেক ইশারা। বিদেশী শাসকের রোষে দণ্ডিত 'শ্বেতবহ্নি' ট্রাঙ্কের তলায় লুকিয়ে ছিলেন তিনি। আর বার করা হয়নি। কাল রাতে ওটা বার করে আর একবার পড়ার কথা মনে হয়েছিল।

সব গোছগাছ করে কালীদা মোড়া ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে প্রশ্নটা যেন আপনা থেকেই জ্যোতিরাণীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো।—এই সব কি সাদা পথে এসেছে?

কালীদা চুপচাপ চেয়ে রইলেন খানিক।—আর একটু খোলাখুলি বলো।

কিন্তু জ্যোতিরাণী শুধু অপেক্ষাই করলেন, ফিরে আর বললেন না কিছু। জিজ্ঞাসা যা করেছেন কালীদার তা বুঝতে একটুও দেরি হয়নি বলেই ধারণা।

শেষ পর্যন্ত খুব সরল জবাব দিলেন না, যদিও হাল্কা করেই বললেন কথাগুলো। —সাদা কি কালো সেটা দেখার ওপর নির্ভর করে। যার কিছু নেই সে সবটা কালো দেখে, যার কিছু আছে সে ঝাপসা দেখে, আর যার অনেক আছে—পথটা সে অনুসরণযোগ্য সাদা দেখে। তারপর একটু হেসে মন্তব্য করলেন, তবে যে যেমনই দেখুক শিবুর মত এমন কেরামতি দু-দশ লক্ষের মধ্যেও একজন যে দেখাতে পারে না সেটা ঠিক।

কালীদার উক্তি কেন যেন খুব অপছন্দ হল না জ্যোতিরাণীর। একটা অনুভূতিপ্রবণ আশঙ্কা তরল হল কিছুটা। বাড়ির দলিলটা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এ বাড়িটা কেমন, খালি আছে?

ঝুঁকে দলিলটা ভাল করে দেখে নিয়ে কালীনাথ মাথা নাড়লেন, খালি আছে। তারপর লঘু গাম্ভীর্যে প্রশ্ন করলেন, ওই ছোট্ট জায়গাটাই বেছে নিলে নাকি?

জ্যোতিরাণী নিরুত্তর। দিল্লী থেকে আর একজন ফিরলে তার কাছেও এরকম রসিকতা করে নিজের মন বোঝাবেন হয়ত।

বাড়ি ভাল, তবে কিছু মেরামতি আর চারদিকের জঙ্গল ছাঁটা দরকার হবে। তাছাড়া ওখানে থাকতে হলে দেখাশুনা করা আর পাহারা দেবার জন্য জনাদশেক লোক অন্তত লাগবে। কি মনে পড়তে হাসতে লাগলেন, দলিলটা দেখিয়ে আবার বললেন, পড়ে দেখ, তেতাল্লিশের শেষে ওটা খুব শস্তায় কেনা হয়েছিল। এই সাতচল্লিশের শেষে ওই জমির দামই বিঘেপিছু দু হাজার টাকা বেড়েছে—শিবু সেদিন হিসেব করছিল, সাতষট্টিতে কাঠাপিছু দু হাজার বাড়বে।

সাদা কথায় এ-রকম একটা লাভের সম্ভাবনা যাতে, সেটা কোনো ছেলেমানুষি ব্যাপারে আগলে রাখা ঠিক হবে কিনা সেদিকে দৃষ্টি টানার চেষ্টা। জ্যোতিরাণী অন্তত এ-ছাড়া আর কিছু ভাবলেন না। ভাসুরের সঙ্গে কথা কইছেন বলেই সামান্য হাসতে চেষ্টা করে মৃদু জবাব দিলেন, সাতষট্টি সালের এখনো অনেক দেরি। দুই-এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, বাড়ির চাবি-টাবিগুলো কোথায়?

আমার কাছে। আজই চাই?

অসুবিধে না হলে দেবেন।

আর, একসঙ্গে খুব বেশি টাকা তুলবে নাকি?…ব্যাঙ্কে তাহলে নোটিস্ দিয়ে রাখতে হবে।

জ্যোতিরাণী জানেন না কি করবেন বা কত তুলবেন। তবু জবাব দিলেন, একেবারে না হোক, আস্তে আস্তে আড়াই লক্ষ তিন লক্ষ পর্যন্ত তুলতে পারি।

গম্ভীর মুখে ফাইলপত্র বগলদাবা করে কালীদা প্রস্থান করলেন। কিন্তু তার

পরেও জ্যোতিরাণীর দৃষ্টিটা প্রসন্ন নয় খুব। ওই পল্‌কা গাম্ভীর্য তিনি ভালই চেনেন। তলায় তলায় যে হাসছেন একটুও সন্দেহ নেই।

টেলিফোনে মিত্রাদিকে খবর দিয়ে রেখেছিলেন, সেই দুপুরেই তাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গাড়িতে মোট আঠার-বিশ মাইল পথ ভেঙে জ্যোতিরাণী তাঁদের ভাবী প্রতিষ্ঠান-ভবন দেখে এলেন। পুরনো ড্রাইভার, ভোলাও সঙ্গে ছিল। সম্পত্তি আপাতত একজন দারোয়ান আগলাচ্ছে। ভোলার মুখে খোদ কর্ত্রীর আকস্মিক আগমনের খবর পেয়ে সে বিমূঢ় ব্যস্ততায় ছুটে এল।

অপছন্দ হয়নি। জঙ্গল দেখে দুজনেরই গা ছমছম করেছে আবার ভালও লেগেছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হলে মন্দ দাঁড়াবে না। বাড়িটা বড়ই, আর খুব বেশি পুরনোও নয়, তবে অযত্নে দুর্দশাগ্রস্ত চেহারা, ভালরকম মেরামতের দরকার হবে। আর ঘরও খুব বেশী নয়, ঢের জমি পড়ে আছে, দরকার হলে পাশেই আর একটা বাড়ি অনায়াসে তোলা যাবে। পুকুরটা মজে গেছে, সংস্কার করে নিতে হবে। খাবার জল আর ইলেকট্রিকের ব্যবস্থা কিছু নেই, তাও করতে হবে। আর একটা অসুবিধে, কাছাকাছি দোকানপাট হাট-বাজার নেই। সাইকেল-রিক্সা চলাচল আছে দেখেছেন অবশ্য। তবু শুরুতেই প্রতিষ্ঠানের নামে একটা গাড়ি কেনা হবে কিনা জ্যোতিরাণীর মাথায় সেই চিন্তা। এখান থেকে দেখাশোনা করবে যারা, দৌড়াদৌড়ি ছোটাছুটি তো তাদের হামেশা করতে হবে, তাছাড়া কতরকমের আপদ-বিপদ আছে, কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগও সর্বদাই রাখা দরকার—গাড়ি ছাড়া হবে না বোধহয়। আর ইলেকট্রিক এলে টেলিফোনও সঙ্গে সঙ্গে আনা যাবে, সেটা কঠিন কিছু নয়।

মৈত্রেয়ী চন্দ শোনেন আর উৎফুল্ল উচ্ছ্বাসে জ্যোতিরাণীকে জড়িয়ে জড়িয়ে ধরতে চান। ফেরার পথে খানিকটা এগোতেই চপল আনন্দে বলে উঠলেন, বৌদিই লক্ষ্মী, ভাগ্যে তুমি ওকে স্টেশনে দেখেছিলে! বাড়ি গিয়েই ওকে ধরে গোটাপাঁচেক চুমু খাব—

এই! ঠোঁটে হাসি চেপে ভ্রূকুটি করে জ্যোতিরাণী সামনের দিকে ইশারা করলেন। ড্রাইভার অবাঙালী হলেও তার পাশে ভোলা বসে।

মুখে আঁচল চাপা দিয়ে মৈত্রেয়ী হাসতে লাগলেন। একটু বাদে বললেন, কাজ আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে বেশ নামকরা জনাকতক পেট্রন যোগাড় করতে হবে কিন্তু, প্রচারের যুগ এটা—আমার চেনাজানা আছে জনাকয়েক, টাকাও কিছু পাওয়া যাবে। তবে আমি একলা বেরুতে পারব না বাপু, তোমাকেও থাকতে

হবে সঙ্গে—

এই প্রসঙ্গে একটা পুরনো অভিলাষ মনে পড়ে গেল জ্যোতিরাণীর। জিজ্ঞাসা করলেন, গান্ধীজী এখনো ব্যারাকপুরে আছেন কিনা জানো? কোথায় আছেন স্মরণ হচ্ছে না বলে মনে মনে নিজেই সঙ্কুচিত একটু।

জানেন না মৈত্রেয়ীও। মাথা নাড়লেন।—কেন তাঁকে দিয়ে ওপেন করাতে চাও নাকি?

পেলে মন্দ হত না, একবার দেখা করার ইচ্ছে ছিল।

সম্ভাব্য ব্যাপারটার মধ্যে পার্শ্ববর্তিনী যে তাঁর থেকেও গম্ভীরভাবে তলিয়ে গেছে, সেটুকু অনুভব করেই হয়ত মৈত্রেয়ী সাগ্রহে সায় দিলেন, তাহলে তো খুব ভালই হয়, আচ্ছা আমি খবর নিচ্ছি, থাকলে তুজনে গিয়ে হাজির হওয়া যাবে।

কিন্তু মৈত্রেয়ীর কাছে বাস্তব দিকটাই বড়, পাকাপাকিভাবে আর কাকে টানা যায়, তুমি ভেবেছ কিছু?

...মামাশ্বশুর আর দাদার কথা ভেবেছিলাম।

মৈত্রেয়ীর তু চোখ তাঁর মুখের ওপর থমকালো, দাদা মানে তোমাদের কালীদা?

তাঁর দিকে ফিরে জ্যোতিরাণী মাথা নাড়লেন, মিত্রাদির প্রশ্নের সুরে বিস্ময়ের আভাস কি অপছন্দের, ঠাওর করা গেল না।

সেটা উনিই বুঝিয়ে দিলেন, তড়বড় করে বলে উঠলেন, তাহলে আমি এর মধ্যে নেই, আমাকে বাদ দাও! মুখে সকোপ বিড়ম্বনার হাসি, সর্বকাজে ফোড়ন আর হুলফোটানো সমালোচনার ভাবনা মাথায় নিয়ে আমার দ্বারা কিছু হবে-টবে না বাপু।

জ্যোতিরাণীর দৃষ্টিটা তাঁর মুখের ওপর সজাগ হয়েছে একটু। মিত্রাদি আছে বলেই ওই একজনও এমনি মুখের ওপর জবাব দিয়ে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন কিনা সেই সংশয় উঁকিঝুঁকি দিয়ে গেল। হেসেই জবাব দিলেন, তোমার ভাবনা নেই, সেই ভদ্রলোক আমাদের এ কাজের সঙ্গে No-সম্পর্ক ঘোষণা করেইছেন।

বাঁচা গেছে। মিত্রাদির এই স্বস্তিবোধের সবটুকু কৃত্রিম কিনা সঠিক বোঝা গেল না।

রাতের শয্যায় আর কোনো জটিল চিন্তার প্রশ্রয় দিতে আপত্তি জ্যোতিরাণীর। পাশের ঘরের লোক কাল ফিরছে। সদার ব্যাপারে কৈফিয়ত নিতে আসবে কিনা ভেবে কাজ নেই। আগামীদিনের সার্থকতার চিত্রটাতেই রঙ বোলানোর তাগিদ জ্যোতিরাণীর। বিষয়সম্পদ আর সঞ্চয়ের হিসেব যা পেলেন মাথা ঘুরে যাবার দাখিল। তু-চার লাখের সম্বল নিয়ে নয়, একটু সহানুভূতি পেলে কালে দিনে দেশকে

দেখবার মতই বড় কিছু গড়ে তোলা যেতে পারে। মিত্রাদির সেদিনের ঠাট্টা মনে পড়ে গেল, টাকা আদায় করে বড় কিছু করার লোভে সম্ভব হলে তাঁর সঙ্গে মালিক বদলা-বদলি করতেও আপত্তি ছিল না তার। নিজের দখলে যা আছে দরকার হলে তার বাইরেও জ্যোতিরাণীই বা আদায় করতে পারবেন না কেন। অবশ্য সে প্রশ্ন এখন ওঠেই না, কারণ নিজের দখলেই প্রয়োজনের দ্বিগুণ তিনগুণ আছে। তবু আরো যে ঢের আছে সেটাও কম ভরসা নয়।

এত বড় ভরসাটাকে এখন আশীর্বাদ হিসেবেই গ্রহণ করতে চাইলেন জ্যোতিরাণী। আশীর্বাদ বই-কি। সবদিকই ব্যর্থ হয়ে যায়নি সেটা যেন এই প্রথম অনুভব করলেন তিনি। শুধু নিজের হাতেই যে-সম্বল নিয়ে সঙ্কল্পের দিকে পা বাড়াতে চলেছেন, ওপরঅলার আশীর্বাদ না হলে তাই বা আসত কোথা থেকে?...তাঁর এই পাশের ঘরের মানুষই এমন কিছু করে রেখেছে যা সচরাচর কেউ করতে পারে না। সকালেই কালীদা বলছিলেন, এমন কেরামতি দেখাতে দু-দশ লক্ষের মধ্যেও একজন পারে না। পারে না যে জ্যোতিরাণী আজ সেটা মনেপ্রাণে উপলব্ধি করেছেন, করতে চেষ্টা করছেন।

এই একটি মাত্র কারণে রাতের নিঃসঙ্গ শয্যায় জ্যোতিরাণী আজ পাশের ঘরের ওই অনুপস্থিত মানুষটির প্রতি যথার্থ কৃতজ্ঞ।

তবু...

তবু কি একটা বাস্তব আর কার একখানা মুখ নিভৃতের কোন্ অগোচরে অপেক্ষা করছে যেন।

পাশের ঘরের মানুষ কালই আসছে—সেই বাস্তব।...মুখটা সদার।

শিবেশ্বর এলেন। একটানা এত বেশিদিন বাড়িছাড়া কমই হয়েছেন।

তাঁর উপস্থিতিতে বাড়ির হাওয়া যেমন বদলায় একটু তেমনি বদলেছে। জ্যোতিরাণী লক্ষ্য রেখেছেন। ওই মুখে বিশেষ পরিবর্তনের ছাপ এঁটে বসতে দেখেছেন ঘণ্টা দুই বাদে। শাশুড়ী সম্ভবত ছেলের খাওয়া-দাওয়া সারা হওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন। তারপর মায়ের ঘরের দিকে যেতে দেখেছেন তাঁকে। একটা ব্যাপার অস্বীকার করার উপায় নেই, যত টাকাই হোক, মায়ের প্রতি আচরণ বদলায়নি। আগে যেমন, এখনো তেমনি। টান সত্যিই কত জ্যোতিরাণী জানেন না, তবু ফাঁক পেলে খোঁজখবর একটুআধটু ওই একজনেরই নিতে দেখেন। অনেকদিন ছিলেন না তাই খাওয়া-দাওয়ার পর বসে দু-চার কথা বলতে গেছলেন হয়ত। অথবা সদাকে না দেখে মনে কিছু খটকা লেগে থাকবে। এমনও হতে পারে

খাবার ঘরে জ্যোতিরাণী সারাক্ষণ উপস্থিত ছিলেন বলেই কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করার সুযোগ হয়নি।

থমথমে পরিবর্তন দেখলেন ঘণ্টাখানেক বাদে মায়ের ঘর থেকে ফেরার সময়। মুখোমুখি পড়ে গেছলেন জ্যোতিরাণী। হয়ত বা ইচ্ছে করেই পড়েছিলেন।

বিকেল আর রাতের মধ্যে তারপর অনেকবার দেখা হয়েছে, অনেকবার লক্ষ্য করেছেন জ্যোতিরাণী। কেবলই মনে হয়েছে একটা অদম্য ক্রোধ এক অব্যক্ত নীরবতার আড়াল নিয়েছে। অনেকবার দেখা হয়েছে কারণ লক্ষ্য আসলে ওই পাশের ঘরের মানুষ তাঁকেই করতে চেয়েছেন। জ্যোতিরাণী মুখ তুলতেই তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়েছেন।

তারপর রাতের শয্যায় অপেক্ষা করেছেন জ্যোতিরাণী। প্রবৃত্তির তাড়নায় আসবে কি সদার বিদায়ের কৈফিয়ত নিতে জানেন না। জিজ্ঞাসা করলে তিনি কৈফিয়ত নেবেন কি দেবেন তাও না। আসবে, এই শুধু ধরে নিয়েছিলেন।

কিন্তু ব্যতিক্রম দেখলেন। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, চোখ তাকাতে সকাল।

পরদিন থেকে পরিবর্তনটা আরো ভালো করে দাগ কাটতে থাকল জ্যোতিরাণীর মনে। পর্যবেক্ষণের এই রীতি নতুন। মনে হল সামনে এসে দাঁড়াতে চায় না, চোখে চোখ রাখতে চায় না, শুধু অলক্ষ্য থেকেই কিছু যেন দেখে নিতে চায় আর বুঝে নিতে চায়। কখনো ঘরের পরদার আড়ালে দাঁড়িয়ে, কখনো খাবার টেবিলে বসে, কখনো বা জ্যোতিরাণীর কাজের ফাঁকে।

কিন্তু অলক্ষ্য থেকে হঠাৎ তিনিই উল্টে আর এক মূর্তি দেখলেন মানুষটার। বিকেলের দিকে বারান্দার ও-ধারের একটা ঘরে পুরনো জিনিসপত্র গোছগাছ করে রাখছিলেন। ওই ঘরে আছেন টের পায়নি সম্ভবত। খুব ধীরে স্থির পায়ে ঘর থেকে এক-একবার তাকে বারান্দার রেলিংয়ের সামনে এসে দাঁড়াতে দেখেছেন আবার ঘরে ফিরতে দেখেছেন জ্যোতিরাণী। অনেকবার মনে হয়েছে চোখে-মুখে ঠিক এই ধরনের উগ্র আক্রোশ আর বুঝি দেখেননি। ঘোলাটে চোখ, দাঁত-চাপা কঠিন দুটো চোয়াল মুখের চামড়া ঠেলে উঁচিয়ে আছে।

হঠাৎ কি মনে হতে অমন আঁতকে উঠলেন জ্যোতিরাণী?

হ্যাঁ, হঠাৎ তাঁর মনে হয়েছে এই ভয়াল আক্রোশ তাঁর ওপর নয়। তাঁর ওপর হলে মুখে না বলুক, সামনাসামনি দাঁড়িয়ে ওই দুটো চোখ দিয়েই কৈফিয়ত তলব করত। তারপর রাত্রিতে আসত। তাঁর প্রতি দুর্বার আক্রোশ আর প্রতিশোধের রীতি একযুগ ধরে খুব ভালো করে জানা আছে। সেই অসহিষ্ণুতার প্রতিটি রেখা চেনেন জ্যোতিরাণী। এই অব্যক্ত ক্রোধ তাহলে হাতের নাগালের মধ্যে যে নেই

তার ওপর···সদার ওপর। সদা নেই বা আর আসবে না ভেবে ভয়ানক স্বস্তি বোধ করেছেন জ্যোতিরাণী। অনেককাল আগে শাশুড়ীর মুখে শোনা একটা কাহিনী মনে পড়তে স্নায়ু কেঁপে উঠেছিল তাঁর। বউয়ের ওপর আক্রোশে দাদাশ্বশুর আদিত্যরাম তাঁর পুরনো আর সব থেকে বিশ্বস্ত একটা চাকরকে কাঁটা চাবুকের আঘাতে আঘাতে নাকি হত্যাই করেছিলেন প্রায়। এই মুখ দেখে জ্যোতিরাণীর সভয়ে মনে হয়েছে, হাতের কাছে পেলে সদারও ওই দশা হতে পারত বুঝি।

আবার বারান্দায় দেখামাত্র ঘর ছেড়ে জ্যোতিরাণী আস্তে আস্তে এগিয়ে এসেছেন। দৃষ্টি সরাসরি তাঁর মুখের ওপর। কিন্তু চোখে চোখ পড়তে শিবেশ্বর মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছেন। তারপর সামনাসামনি হবার আগেই পরদা ঠেলে ঘরে ঢুকে গেছেন আবার।

জ্যোতিরাণী দাঁড়িয়ে সামনের পরদাটাকেই দেখেছেন একটু।

যতক্ষণ ঘুম না আসে, রাতের শয্যা থেকে খোলা দরজার দিকে চোখ রেখেছেন তিনি। কেউ আসেনি। পরদিনও না।

যে জন্যই হোক, জ্যোতিরাণী বুঝে নিয়েছেন কৈফিয়ত তাঁকে দাখিল করতে হবে না। উল্টে আর একজনেরই বরং কোনো অজ্ঞাত কৈফিয়ত এড়ানোর চেষ্টা। কিন্তু তবু জ্যোতিরাণী প্রতীক্ষা করেছেন। সন্ধ্যার আগে স্নান করে পরিচ্ছন্ন বেশবাস করেছেন। যত্ন করে চুল বেঁধেছেন। রাতে খাবারের টেবিলে একজনের লুব্ধ বাসনার গোপন চাঞ্চল্যও অনুভব করেছেন। তারপর বিছানায় শুয়ে দরজার দিকে চোখ রেখেছেন। কৈফিয়ত যদি দাখিল করতে না হয়, সদার প্রসঙ্গ তিনিও তুলবেন না। কৌতূহল অসংযত হতে দেবেন না ভেবে রেখেছেন। আসার আগে মানুষটার একটা ক্ষমতার দরুন কৃতজ্ঞ বোধ করেছিলেন। সেটুকুই সজাগ রাখতে চেয়েছেন। যে ক্ষমতা না থাকলে প্রতিষ্ঠান গড়ার স্বপ্ন বাতুলতার পর্যায়ে পড়ত। জ্যোতিরাণী নিজে থেকে একটাও ক্ষোভের প্রসঙ্গ তুলবেন না।···এলে নিঃশব্দে আসে আবার নিঃশব্দেই ফেরে। কিন্তু সম্ভব হলে জ্যোতিরাণী কথাও বলবেন। কোনো তিক্ত কথা নয়, কোনো শ্লেষের কথা নয়। তাঁরই সম্পদের জোরে নতুন কিছু করতে যাচ্ছেন তাঁরা, এই সঙ্কল্পটা জানিয়ে রাখবেন।···কালীদার কোনরকম বিরূপ মন্তব্য কানে যাবার আগে জানিয়ে রাখা দরকারও।

কিন্তু পরপর তিন রাত্রের মধ্যেও শিবেশ্বর এলেন না। আশ্চর্য ··! সদার বিদায় এর থেকে বেশি আর বুঝি মুখর হয়ে ওঠেনি কখনো।

পরদিন সকাল তখন দশটার কাছাকাছি। শামু এসে খবর দিল নীচের ঘরে

বাবু ডাকছেন।

জ্যোতিরাণী শামুর মুখের দিকে চেয়েই থমকেছেন একটু। তারপর জিজ্ঞাসা করে জেনেছেন, বসার ঘরে আর এক বাবুও এসেছেন।

মাঝেসাঝে এরকম ডাক না পড়ে এমন নয়। যেতে হয়, বড়লোকের ঘরণীর মতই আলাপ-পরিচয় করতে হয়, সামাজিকতা রক্ষা করতে হয়। অভ্যাগতের সামনে দুজনেই তখন হাসতে পারেন, কথাবার্তা কইতে পারেন, সহজতা বজায় রেখে চলতে পারেন।

এলেন। অভ্যাগত বিক্রম পাঠক। অনেক দিন পরে এলো। ঘরে পা দিতেই কলরব করে উঠল। ভাবীজীকে অনেকদিন না দেখে তার চোখে চড়া পড়ার দাখিল হয়েছে, ভাবীজীর হাসি না দেখে সময়টা বর্ষাকাল মনে হয়েছে, আর ভাবীজীর ভ্রূকুটি না দেখে সব কাজই নীরস লাগতে শুরু করেছে—তাই সকালে উঠেই ভাবীজী দর্শনের আশায় ছুটে এসেছে।

হাসিমুখে ভ্রূকুটি করলেন জ্যোতিরাণী, সকাল দশটায় উঠে?

শিবেশ্বরের ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাস। আর দৃষ্টিতে কিছু ফাঁক জোড়ার প্রয়াস। অতঃপর সবদিকেই দাদার ভাগ্যের প্রতি চিরাচরিত ছদ্ম ঈর্ষার পর্ব সম্পন্ন করল বিক্রম, তাদের তুলনায় দাদার ভাগ্য কাঞ্চনজঙ্ঘার মতই উঁচু—এখন ঘাড় উঁচিয়ে দেখতে হয় দাদাকে। আর তারপর জোরালো আরজি পেশ করল একটা। কলকাতার হাইয়েস্ট সার্কেলের সব থেকে গণ্যমান্য ক্লাবের রাতের অধিবেশনে দাদার সঙ্গে ভাবীজীকে আজ যোগদান করতেই হবে। স্বাধীনতার পর এটাই প্রথম অধিবেশন, অতএব মামুলী ব্যাপার নয়, সভ্যদের সঙ্গে তাদের ঘর-আলো-করা গৃহিণীরা সকলেই আসবে আজ—কিন্তু ভাবীজী না গেলে সে চোখে অন্ধকার দেখবে।

বছর তিনেক আগে এই ক্লাবে একবারই যাবার কথা হয়েছিল জ্যোতিরাণীর—যেবারে ঘরের লোকটি কলকাতার বিশিষ্টতম ওই ক্লাবের সভ্যতালিকাভুক্ত হতে পেরে গৌরববোধ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত কেন যে যাননি এখন আর মনে নেই। কিছুকাল আগেও ওই ক্লাবে হাতে-গোনা দু-দশজন ভাগ্যবান ভারতীয় সাহেব ছাড়া দিশি লোকের প্রবেশাধিকার ছিল না। ক্রমে কড়াকড়ি শিথিল হয়েছে, স্বাধীনতার দু-তিন বছর আগে থেকে ভারতীয়রাই দখল নিতে শুরু করেছে, এখন তো তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

তবু এই ক্লাবের মর্যাদা আলাদা। সামগ্রিক আভিজাত্যের এত গৌরব আর কোন প্রতিষ্ঠানের নেই। বিক্রম ওখানে ঢুকতে পেরেছিল শিবেশ্বর চাটুজ্যের পরের

বার—তাঁরই চেষ্টায়। সে প্রিয়পাত্র কারণ শুরু থেকে তারই সঙ্গে ভাগ্যের যোগ। বিক্রমের অবস্থাও ফিরেছে। কাগজের আপিসে চাকরি আর করে না। মস্ত ব্যবসা এখন, আর সেই ব্যবসার দাদাই খোদ পরামর্শদাতা। তবে দাদার নাগাল সে এই জীবনে আর পেল না, এই খেদ তার মুখে প্রায়ই শোনা যায়।

সাগ্রহে ঝুঁকে বসল বিক্রম পাঠক, ভাবীজী, সে ইয়েস। দাদা আমাকে বলল, বলে দেখো যাবে কিনা, আমি চ্যালেঞ্জ করলাম, আলবৎ যাবে—দাদার কাছে আমার প্রেস্টিজ্ নষ্ট কোরো না।

বিক্রম বাঙালী নয়, উচ্ছ্বাসের মুখে আপনি-তুমির ভেদ রাখে না। জ্যোতিরাণীর কানে এখন আর লাগে না সেটা। পাশের মানুষের দিকে না তাকিয়ে হাসিমুখে মন্তব্য করলেন, কিছুই তো শুনিনি, আপনার দাদারই হয়ত আমাকে নেবার ইচ্ছে নেই।

বিক্রম চোখ পাকালো তৎক্ষণাৎ, দাদা ইজ্ এ স্কাউণ্ড্রেল্! বাট্ ফর মি—সে ইয়েস!

জ্যোতিরাণী ভেবে নিলেন কি। এসব যোগাযোগ এখন হেলাফেলা করা ঠিক নয় বটে, অনেক কাজে লাগতে পারে। এই বিক্রমকেও তাঁর দরকার হবে মনে হল। হেসে জবাব দিলেন, যাব কিন্তু আমার কিছু কাজ আপনাকে করে দিতে হবে।

হুরুরে! অল্ওয়েজ্ ইওর সারভেণ্ট, ফরমাইয়ে।

এখন নয় পরে বলব।

শিবেশ্বরের দৃষ্টি আবার এদিকে, প্রচ্ছন্ন কৌতূহল। কাগজপত্র হাতে কালীদাকে পাশের খাস ড্রইংরুমে ঢুকতে দেখা গেল। অর্থাৎ কিছু সই-সাবুদ করতে হবে। শিবেশ্বর ওঠার ফাঁক পেয়ে খুশি একটু। বিক্রমের দিকে ফিরে উঠে দাঁড়ালেন, কথা বলো, আমি ততক্ষণে কাজ সারি···আজ বিকেলে তুমি এখানেই চলে এসো, একসঙ্গে যাওয়া যাবে—

বিক্রমের মুখ দেখে জ্যোতিরাণীর কেমন ধারণা হল এ প্রস্তাবটা পূর্ব-পরিকল্পিত নয়। তবু সানন্দে সায় দিল সে, থ্যাঙ্ক্ ইউ—

শিবেশ্বর ঘরের বাইরে পা দিতেই উৎফুল্ল মুখে সামনের দিকে ঝুঁকল।—ব্যাপারটা কি জানো ভাবীজী, আমাদের একটা মতলব আছে। এত বড় নামজাদা এরিস্টোক্রাট ক্লাব, ভারতের সেরা বলতে পারো—এখানে গুণী লোকেরও অভাব নেই, মাল্‌টি-মিলিয়নেয়ারেরও না—কিন্তু দাদার মত এমন মাথাওয়ালা লোক আর একটি আছে কিনা সন্দেহ। তাই আমরা ঠিক করেছি সামনের ইলেকশনে

দাদাকে প্রেসিডেন্ট করার জন্য আদা-জল খেয়ে লাগব। যদি পারি, দাদাই হবে প্রথম ওই ক্লাবের বাঙালী প্রেসিডেন্ট!

দাদার সৌভাগ্য কল্পনা করেই বিক্রমের মুখ উদ্ভাসিত। বলে গেল, এইজন্যেই দাদাকে একটু পপুলার করা দরকার, পাঁচজনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় না করে তুমি ঘরে বসে থাকলে চলে! একি সোজা অনার নাকি? এখনকার প্রেসিডেন্ট থাদানি ব্যাটার বউ আগের ইলেক্‌শনে অনেক আগে থাকতে সকলের সঙ্গে শুধু সোশ্যাল রিলেশন চালিয়েই কেমন প্রোপাগেণ্ডাটি করেছিল জানো?

জ্যোতিরাণী ফাঁপরে পড়লেন যেন, কিন্তু আমার দ্বারা প্রোপাগেণ্ডা-টোপাগেণ্ডা হবে না তো!

কিছু দরকার নেই, কিছু দরকার নেই, সোৎসাহে কাব্যই করে উঠল বিক্রম পাঠক, হোয়েন ফুল মুন ইজ দেয়ার, স্টারস্ আর বাট এন্‌জেলস্ মিউট্‌। তুমি দাদার পাশে একটু-আধটু থাকলেই ডবল প্রোপাগেণ্ডা হবে।

পেটে রাঙা জল না পড়লে বিক্রম পাঠক চতুর বাক্-কুশলী।

বিকেলে প্রস্তুত হবার আগে জ্যোতিরাণীর অনেকবার মনে হয়েছে, পাশের ঘরের পরদা ঠেলে একবার জিজ্ঞাসা করে আসেন, অমন বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিশেষ অধিবেশনে বিশেষ রকমের সাজসজ্জা কিছু করতে হবে কিনা। পারা গেল না। ঠিক সন্ধ্যায় বেরুবার কথা। জ্যোতিরাণী প্রস্তুত।

তকতকে চাঁপারঙের একটা দামী শিফন পরেছেন, গায়ে জলজলে সাদা চুমকি বসানো চাঁপা-রঙেরই পুরু ব্রোকেটের ব্লাউস। গায়ের রঙে শাড়ির রঙে মিশে আছে—ব্লাউসের চুমকিতে সাদা আলো ঠিকরোচ্ছে। দু হাতে একটি করে হীরের বালা, দু হাতের আঙুলে দুটো হীরের আংটি, কানে দুটো হীরের দুল, গলায় বড় একটা হীরের লকেট ঝোলানো হার, পায়ে জরির কাজ-করা চাঁপা-রঙা স্যাণ্ডাল।...পছন্দ হবে কিনা কে জানে, কিন্তু এতেই লজ্জা-লজ্জা করছে জ্যোতিরাণীর।

খবর পেলেন নীচে বিক্রম এসে বসে আছে। সে নিজেও দামী গাড়ি হাঁকিয়ে বেড়ায়। তাকে এখানে আসতে বলার একটাই কারণ খুঁজে পেলেন জ্যোতিরাণী। পাছে কোনো কারণে আবার তিনি যাবেন না বলে বসেন সেই আশঙ্কায় এই ব্যবস্থা।

শিবেশ্বর বারান্দায় অপেক্ষা করছিলেন। জ্যোতিরাণী ঘর থেকে বেরোলেন। পলকের দৃষ্টিবিভ্রম থেকেই বুঝে নিলেন সাজসজ্জা পছন্দ হয়েছে। মর্যাদার

গাম্ভীর্যে চট করে চোখ ফিরিয়ে নেওয়ার রীতিও কয়েক মুহূর্তের জন্য ভুলতে দেখেছেন।

আর, তাঁকে দেখে ফাজিল বিক্রম পাঠক হাত-পা আরো এলিয়ে দিয়ে সোফায় বসেই থাকল, আচমকা শেলবিদ্ধ যেন। গাম্ভীর্য সত্ত্বেও শিবেশ্বরের ঠোঁটে হাসি, চলো, দেরি হয়ে গেল—

নিজের গাড়ি ক্লাবে চলে যেতে নির্দেশ দিয়ে বিক্রম এই গাড়িতে উঠল। দুপাশে দুজন, মাঝে জ্যোতিরাণী। উৎফুল্ল মুখে বলে উঠল, দাদা, কালকের কাগজে কটা মেম্বারের যে হার্টফেলের খবর বেরুবে ঠিক নেই।

জ্যোতিরাণী সকোপে তাকালেন তার দিকে, গাড়ি থামাতে বলুন, নেমে যাই। বিক্রম হাসতে লাগল, কি মনে পড়তে ঈষৎ বিস্ময়ে জ্যোতিরাণী জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু আপনার স্ত্রী এলেন না যে?

বিক্রম গম্ভীর তৎক্ষণাৎ, তিনি হাসপাতালে।

যেভাবে বলল, এই হাসপাতালের অর্থ তক্ষুনি বোঝা গেল। আড়চোখে চেয়ে চেয়ে শিবেশ্বর স্ত্রীর মুখে লালচে আভা দেখেছেন।

বিশিষ্ট স্থানের বিশেষ অধিবেশনই বটে। একসঙ্গে এত ছেঁকে-তোলা গণ্যমান্য অভিজাত সমাবেশে জ্যোতিরাণী আর আসেননি। একে একে বহু মিসেস-যুক্ত মিস্টারের সঙ্গে পরিচয় হল। কেউ শিল্পপতি, কেউ নামজাদা ব্যবসায়ী, কেউ মস্ত ডিরেক্টর কোনো কোম্পানীর, কেউ দশবার বিলেত-জার্মানী ফেরত নামকরা ডাক্তার, কেউ বা ডাকসাইটে ব্যারিস্টার। কর্মজীবনে অসার্থক একটি মুখও নেই এখানে। তাঁকে আনার একটা তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারছেন। কুরূপ পুরুষ যদিও দুই-একজন চোখে পড়ছে, কুরূপা রমণী একটিও নেই বললে চলে। তবু যে ভদ্রলোকের সঙ্গেই বিক্রম পরিচয় করিয়ে দিয়েছে মার্জিত খুশির রূপটা একটু বেশি প্রসারিত হতে দেখেছেন জ্যোতিরাণী। এসে দাঁড়ানো মাত্র শুধু পুরুষের নয়, বহুজোড়া রমণীর চোখও ছেঁকে ধরেছিল। অবশ্য তার মধ্যেও সুমার্জিত ব্যবধান ছিলই। তারপর আলাপে অনেকের আগ্রহ দেখা গেছে—অবাঙালী অনেকের সঙ্গে হাত মেলাতেও হয়েছে। আসন নিয়ে জ্যোতিরাণী অনেককেই লক্ষ্য করেছেন। তাঁর ঘরের লোকের মত টাকার জোর এখানে অনেকেরই হয়ত, ঢের বেশি জোরও থাকা সম্ভব অনেকের। তাই টাকা এখানে শুধু প্রবেশপত্রের মত, এখানকার চটক আলাদা। তাঁর পাশে বিক্রম। তারপর শিবেশ্বর বসেছেন। অলক্ষ্যে জ্যোতিরাণী ওই মুখখানাও নিরীক্ষণ করেছেন বইকি। ঠিক কোন্ মর্যাদার প্রত্যাশায় বিক্রমের মারফৎ তাঁকে এখানে নিয়ে

আসা হয়েছে, না দেখলে অনুমান করা যেত না। অথচ বাইরে মুখখানা প্রায় নির্লিপ্ত। অনেক বিশিষ্টবর্গ 'ওয়াইফ'কে আগে আর না আনার জন্য মার্জিত কৌতুকে তাঁকে অনুযোগ করেছেন, জ্যোতিরাণী নিজের কানে শুনেছেন।

গান হল গোটা দুই, জনাকয়েকের ভাষণ হল, স্বাধীনতার নতুন কর্তব্য নতুন দায়িত্ব প্রসঙ্গে সচেতন করালেন কেউ কেউ। এটা শুধু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান নয়, দেশের শিক্ষার স্বাস্থ্যের আর সংস্কৃতির খাতে বছরে যে মোটা টাকা খরচ হয় এখান থেকে—তার সার্থকতারও নজির উপস্থিত করলেন দুই-একজন। শুনতে শুনতে জ্যোতিরাণীর হঠাৎ মনে হল, এদের কেউ কি কখনো বীথি ঘোষকে দেখেছে? শমী বোসকে দেখেছে?

জলযোগান্তে বিদায়পর্ব। এই পর্বেও জনাকতক হোমরাচোমরা সভ্যের সবিনয় দাবীর ফলে হাসিমুখে আন্তরিক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিতে হল জ্যোতিরাণীকে। কোন্ সহযোগিতার প্রত্যাশী তারা ধারণাও নেই। বিক্রম এক ফাঁকে চুপি চুপি উল্লাস প্রকাশ করল, কেমন, বলেছিলাম কিনা?

হাসি চেপে জ্যোতিরাণী জবাব দিয়েছেন, কারা কারা এসেছেন এখানে সব হিসেব রাখবেন, এঁদের সকলকে আমার দরকার হতে পারে। কাজের কথা মনে আছে তো?

বিক্রমের মুখে সেই প্রগলভ উচ্ছ্বাস।—অলওয়েজ্ ইয়োর সারভেণ্ট ম্যাদাম, দরকার হলে তো ওরা বর্তে যাবে। কিন্তু কি ব্যাপার?

জ্যোতিরাণী হেসে মাথা নাড়লেন, এখন না। পরে।

রাত্রি।

পাশের ঘরের মানুষের এই রাতে এ-ঘরে পদার্পণ ঘটবে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। যাবার সময় মনে হয়েছে, অধিবেশনে বসে মনে হয়েছে, ফেরার সময় আরো বেশি মনে হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে যে-মূর্তিটা সামনে এগিয়ে আসতে চেয়েছে, সেটা সদার মুখ। জ্যোতিরাণী ঠেলে সরিয়েছেন।

ঘরে নীল আলো জ্বলছে। সেই অল্প আলোয় শয্যায় উপুড় হয়ে বুক-চেপে শুয়ে 'এ পিক্‌চার ছাট্ ফ্যান্‌স্ উইল নট সী' পড়ছেন। নীল আলোয় পড়ার তাৎপর্য, পড়তে পড়তে ঘুম যদি এসে যায় তো গেলই। কিন্তু ঘুম আসার অনেক আগেই যে কেউ আসবে সন্দেহ নেই।

এলেন। জ্যোতিরাণী বই থেকে মুখ তুলে তাকালেন।

অন্ধকারে আনাগোনা করে অভ্যস্ত। তাই মুখে বিব্রত হাসির আভাস,

আলাপেও একেবারে অনিচ্ছা নেই মনে হল। ধীরেসুস্থে বিছানায় বসে মন্তব্য করলেন, এই আলোয় পড়া উচিত নয়।···কি বই ?

মুখের রেখাগুলোর সহজ অবস্থান একটুও নড়তে দিতে চান না জ্যোতিরাণী, কিন্তু সেটা আয়াসসাপেক্ষ ব্যাপার যেন। জবাবে বইয়ের মলাটটা উল্টে দেখালেন।

ঝুঁকে নাম দেখতে হল যখন কাছে আর একটু আসতে হয়েছে বইকি।— ভালো বই ?

মৃদু হাসি টেনে জ্যোতিরাণী বললেন, মজার বই।

চুপচাপ দুই-এক মুহূর্ত। নীরবতায় অস্বস্তি দুজনেরই। সহজ সুরেই জ্যোতিরাণীর যা মাথায় এলো তাই বললেন, দিল্লী থেকে ফিরতে এবারে অনেক দেরি হল।

হ্যাঁ, অনেকগুলো কাজ সেরে এলাম। ক্লাবে কি-রকম লাগল ?

উপুড় হয়ে ছিলেন, সোজা হয়ে বালিশে শুলেন জ্যোতিরাণী।—ভালোই। মস্ত ব্যাপার দেখলাম, এবারে তোমাকে প্রেসিডেন্ট করার ইচ্ছে শুনলাম ওদের ?

শিবেশ্বর সচকিত একটু, বিক্রমটা বললে বুঝি ?····সহজ ব্যাপার নয়, ভালো কথা, ওকে কি কাজের কথা বলছিলে সকালে ?

মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিলেন জ্যোতিরাণী।—কিছু টাকা তুলতে বলব, আমি আর মিত্রাদি একটা ব্যাপারে হাত দিতে যাচ্ছি।···তোমার টাকাতেই আরম্ভ করব অবশ্য।

এই সুরের আলাপ কি বছর কয়েকের মধ্যে হয়েছে ? কোনদিনও হয়েছে কিনা জ্যোতিরাণীর মনে পড়ে না। টাকা চাই বলতে কত টাকা বলেননি। শিবেশ্বরও সামান্য ব্যাপার ধরে নিলেন। লুব্ধ দৃষ্টিটা ইচ্ছার বিরুদ্ধেই অবাধ্য হয়ে উঠছে তাঁর। জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কাছে চেকবইটই এক-আধটা নেই কিছু ?

আছে। সবই যে আছে তা বললেন না।

কিছু যেন মনে পড়ল শিবেশ্বরের, বললেন, সদাটা হঠাৎ চলে গেল···তোমাকে কিছু বলে গেছে নাকি ?

নিমেষের জন্য দুই চোখ ওই মুখের ওপর প্রসারিত হল জ্যোতিরাণীর। আপনের এই গোছের মুখ কোথায় দেখেছিলেন ? মনে পড়ল। অনেক দিন হয়ে গেছে, অনেক বছর। তবু মনে পড়ল।···কথা বার করে নেবার উদ্দেশ্যে অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে এসেছিল, অনেক কথা বলেছিল, তারপর অনেকটা এই সুরে শোভাদার কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। কিন্তু জ্যোতিরাণী কিছুই মনে রাখতে চান না।

উপার্জনের যে ক্ষমতার কথা ভেবে গতরাতে কৃতজ্ঞবোধ করেছিলেন, এখনো সেটুকুই ধরে রাখতে চান শুধু।

না, বলল তো বয়েস হয়েছে, আর পারছে না। তুমি ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেছিলাম, তাও থাকল না। এতকালের লোক এভাবে চলে গেল কেন ভেবে পাচ্ছি না।

সংশয় একেবারে গেল না হয়ত, তবু অনেকটাই নিশ্চিন্ত হয়েছে মনে হল জ্যোতিরাণীর। ঘরে আসার পরেও যে বিড়ম্বনার ছায়া দেখেছিলেন মুখে, এই জবাব পেয়ে সেটুকু সরে যেতে লাগল। লুব্ধ অবাধ্য দৃষ্টিটাকে বশে রাখারও প্রয়োজন ফুরিয়েছে যেন।

সবুজ আলোটা নিজেরই এখন খারাপ লাগছে জ্যোতিরাণীর।

···তিনি কৃতজ্ঞ বটে, কিন্তু কৃতজ্ঞতার বিনিময়ে এক যুগের বিনিময়শূন্য নিভৃত অভ্যর্থনার রীতি বদলানো সহজ নয়।

তবু, আর সব রাতের মত এই রাতেও অপূর্ণতার হিংস্র ক্ষোভ নিয়েই ফিরে যায়নি হয়ত। জ্যোতিরাণীর এমনও মনে হয়েছিল রাতটা বুঝি এ-ঘরের এই শয্যার আশ্রয়েই কাটিয়ে যাবে।···না, নেমে গেছে একসময়।

এতক্ষণ ধরে যে অবাধ্য প্রশ্ন আর চিন্তাগুলোর দিক থেকে জোর করে মুখ ফিরিয়ে ছিলেন জ্যোতিরাণী, ঘরের বাইরে পা দেওয়া মাত্র সেগুলো ভিতর ঠেলে এগিয়ে আসতে চাইছে। দিল্লী থেকে ফেরার পর কটা দিনের অস্বাভাবিক আচরণ। অসহ্য রাগে ফুঁশেছে, আড়াল থেকে লক্ষ্য করেছে, কিন্তু সামনে এসে দাঁড়াতে চায় নি, মায়ের নালিশ সত্ত্বেও কৈফিয়ত নিতে আসেনি। কেন? রাতে ছেলের পিঠের ছাল তুলে সকালে উঠেই সদাকে চাবুক মেরে তাড়াবে বলে শাসানো হয়েছিল কেন? সদা মুখের ওপর অত কথা বলে গেল কেন? সদা গেল কেন?

না—জ্যোতিরাণী কিছু চিন্তা করতে চান না, কিছুই ভাবতে চান না। তিনি কৃতজ্ঞ। বীথিরা যদি হাসে, শমীরা যদি হাসে, তিনি কৃতজ্ঞই থাকবেন। চিন্তা করার অনেক কিছু আছে, ভাবার মত অনেক কিছু আছে।···নাম কি হবে প্রতিষ্ঠানের? খুব সুন্দর নাম চাই একটা। ভাবতে লাগলেন। মনের মত একটা নাম এক্ষুনি পাওয়া দরকার যেন।

সচকিত হঠাৎ। কি মনে পড়তে গায়ের রোমে রোমে শিহরণ। শ্বশুরের কথা। আর কেউ শোনে নি। শাশুড়ী না, ছেলে না, কালীদা না, মামাশ্বশুর না। চোখ বোজার দুরাত আগে তাঁর দিকে চেয়ে শ্বশুর শুধু তাঁকেই বলে গেছলেন কথাগুলো। ···মামাবাবু আর কালীদা একফাঁকে খেয়ে আসতে গেছেন,শাশুড়ী আহ্নিকে, ছেলে

আসেনি, নাতি পাশের ঘরে ঘুমিয়ে। হঠাৎ দেখেন ঘোলাটে চোখ মেলে তাঁর দিকেই চেয়ে আছেন শ্বশুর। জ্যোতিরাণী তাড়াতাড়ি সামনে ঝুঁকেছেন, বুকে হাত রেখেছেন। সেই হাতের ওপর শ্বশুর নিজের একখানা হাত রাখতে পেরেছেন। তারপর মৃদু স্পষ্ট গলায় বলেছেন, প্রভুজী আছেন। দরকারে তাঁকে ডেকো। আমার মা ডেকেছিলেন। তিনি এসেছিলেন। প্রভুজী আমাদের ছেড়ে যাননি।

শোয়া থেকে আস্তে আস্তে উঠে বসলেন জ্যোতিরাণী। কি যেন ভাবছিলেন তিনি···বীথিরা যেখানে শোক ভুলবে, শমীরা যেখানে হাসবে, সেই প্রতিষ্ঠানের নাম চাই একটা।

···নাম যদি হয় প্রভুজীধাম?

॥ চব্বিশ ॥

পরদিন থেকেই শিবেশ্বর চাটুজ্যের হাবভাব অনেকটা স্বাভাবিক। স্বাভাবিক বলতে ঐশ্বর্য যশ মান প্রতিপত্তির যে সচেতন গভীরে তাঁর বাস সেখানেই ফিরতে পেরেছেন আবার। কেউ বুঝি একটা হেঁচকা টানে আচম্‌কা তাঁকে তুলে এনেছিল সেখান থেকে। দুর্জয় ক্রোধও দুর্বলের নিষ্ফল আক্রোশের মত মনে হয়েছে তাই। এই সকাল থেকে আবার আগের মানুষ তিনি।

পরিবর্তনের মধ্যে রাত্রির প্রায় ঘড়ি-ধরা নিভৃতে পর পর আরো তিন রাত পাশের ঘরে পদার্পণ করেছেন—নিভৃতের লোলুপ আচরণে অনিঃশেষ পীড়নের চিরাচরিত ক্রূর অভিলাষ স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি আগের মত। আর পরিবর্তনের মধ্যে ঘরে পা দিয়ে নীল আলোটা জ্বালতে চেয়েছেন।···জ্বেলেছেন।

শ্বশুরের মৃত্যুতেও যে ফাঁক জোড়েনি, পুরনো চাকর সদার বিদায়ে সেই ফাঁকটা জুড়ে গেল এমন অদ্ভুত আশা জ্যোতিরাণী পোষণ করেন না। এটা পরিবর্তন নয়, এক ধরনের আত্মতুষ্টি। রমণীর কৃতজ্ঞতার ফলে দেহ-বাণিজ্যের রকমফের হয়েছে, সেই লোভে সদয় মুখ। রাতের ওই মুখ কৃত্রিম মনে হয়েছে, সকালে বরং স্বাভাবিক লেগেছে। জ্যোতিরাণী আশা করবেন না। এযাবৎ আশার বড় চড়া মাশুল দিতে হয়েছে। যাঁর ঐশ্বর্য আর ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে বুকের তলায় নতুন সৃষ্টির ধারা বইছে এখন, তিনি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ শুধু।

কিন্তু আচমকা মরুগ্রাসের ছায়া পড়ল? অকল্পিত আঘাতে কৃতজ্ঞতার সম্বল-টুকু বড় শিগগীর নিঃশেষ হয়ে গেলই বুঝি।

জীবনটা সমুদ্র। মনের মত দোসর পেলে সেই সমুদ্রে ঝড় উঠলেও নিরাপদ কূল মেলে। না পেলে নিরাপদ কূল থেকে উল্টে ঝড়ের দিকে টানে।

এটা সেই ঝড়।

জ্যোতিরাণী এ-ঝড়ের আভাসও পাননি আগে। সকালে তিনি যখন টেলিফোনে শমীর সঙ্গে কথা বলছেন, তখনো জানেন না ঠিক তাঁর নীচের তলায় কোন্ নাটক সম্পূর্ণ হতে চলেছে। জানেন না, রাতের লোভাতুর সদয় মানুষ সকালে নিজের ঘরে বসে কোন্ অকরুণ দুর্যোগের রসদ সংগ্রহে নিবিষ্ট।

জ্যোতিরাণী তখন শমীর বচনের প্রতিক্রিয়া সামলাতে ব্যস্ত। শমী ফোন করেছিল। বলেছে, কাকু তাকে টেলিফোন করতে বলে নীচে গেছে, এক্ষুনি আসছে। অর্থাৎ বেশি কথা বলার ফাঁক সে পাবে না, কাকু ফিরলেই টেলিফোন তাঁর দখলে যাবে। তারপরেই ওর অভিমানের স্বর আরো স্পষ্ট হয়েছে।—অত সেজেগুজে গাড়ি চড়ে সেদিন কোথায় গেছলে?

জ্যোতিরাণী সচকিত হঠাৎ।—কবে?

এই তো চারদিন হল। মেসোমশায় আর কে একটা লোকের সঙ্গে তুমি গাড়িতে উঠলে। তুমি হাসছিলে খুব, আর সমস্ত গা দিয়ে তোমার আলো ঠিকরে পড়ছিল। কি সুন্দর যে লাগছিল তোমাকে, আমি দৌড়ে গিয়ে ধরতে চাইলাম, কাকু যেতে দিলে না, ডাকতেও দিলে না। ফুটপাথ থেকেও গাড়ির ভিতরে দেখলাম তোমাদের, তুমি ফিরেও তাকালে না।

…কোন্ বিকেলে এসেছিল বোঝা গেল। শোনামাত্র অস্বস্তি বোধ করলেন জ্যোতিরাণী। কলকাতার বিশিষ্টতম ক্লাবের বিশিষ্ট জনেরা সেদিন বিশেষ চোখেই দেখেছিল তাঁকে। সেই উদ্দেশ্যেই তাঁকে নিয়ে যাওয়া। সেটা বুঝে যতটুকু সম্ভব প্রস্তুত হয়েই গেছলেন তিনি। ঘরের লোক বা বিক্রমের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়নি। শমী নয়, তার সঙ্গে আর যে ছিল, অগোচরের অস্বস্তি সম্ভবত তাঁর কারণে। উদ্দেশ্যের শর সেই মানুষকেও বিঁধুক এ তিনি একটুও চান নি।…কিন্তু না বিঁধলে সামনে এসে দাঁড়াত, মেয়েটাকে নিয়ে ওভাবে পালাত না।

কি কাণ্ড, তুই শুনলি কেন, ডাকলেই পারতিস! তুই আসবি জানব কি করে, একটু কাজে বেরুতে হয়েছিল—

হ্যাঁ, কাজ না আরো কিছু, আসলে আনন্দ করতে বেরিয়েছিলে।

তাই না-হয় হল, একটু আনন্দও করব না? পরিতোষণের লঘু স্বর জ্যোতিরাণীর, তুই কবে আসবি বল, কবে গাড়ি পাঠাব?

গিয়ে কি করব। শমীর অভিমান খুব পলকা নয়, জবাব দিল, গেলেই তো

দেখব মিত্রা মাসীর সঙ্গে তুমি গল্পই করছ গল্পই করছ, যে কদিন ছিলাম তোমার কাছে আমার দিকে ফিরেও তাকাওনি—ফাঁককালে সিতুদা পর্যন্ত আমার গাল টেনেছে গা খিমচেছে, এই'যাঃ—

এক অনুভূতির উপর হঠাৎ আর এক বিপরীত অনুভূতির ধাক্কা খেলেন যেন জ্যোতিরাণী। কটা দিন আর কোনো দিকেই তাঁর চোখ ছিল না বটে কিন্তু তা বলে···

তুমি সিতুদাকে কিছু বোলো না যেন মাসী, সত্যি বলছি আমার একটুও লাগেনি। বলবে না তো?

জ্যোতিরাণী জবাব দিয়ে উঠতে পারলেন না, ওকে আশ্বস্তও করতে পারলেন না।

কাকু এসেছে, এই নাও কাকুর সঙ্গে কথা বলো।

পরক্ষণে বিভাস দত্তর ভারী অথচ লঘু গলাই শোনা গেল।—শমী সবটা অভিমান উজাড় করতে পেরেছে, না আমি বাধা দিলাম?

পেরেছে। মেয়েটাকে এনেও সেদিন ফিরে গেলেন কেন?

তাতে কি, ব্যস্ত হয়ে বেরুচ্ছেন দেখলাম।

মোটেই ব্যস্ত হয়ে বেরুতে দেখেননি। সহজ সুরেই বললেন, আপনাদের হাই সোসাইটি থেকে উঁচুদরের আমন্ত্রণ-রক্ষার ডাক পড়েছিল, বেরুতেই হত, তবু দেখাটা অন্তত করে যেতে পারতেন।

আমাদের হাই সোসাইটি! বিভাস দত্ত হেসে উঠলেন, হাই সোসাইটির লোকেরা আপনার পাশে ছিলেন, আমরা নীচুদরের বলেই পালিয়েছি।

ছেলের কারণেই ভিতরটা বেশি তিক্ত কিনা জানেন না। হালকা হেসেই ঠেস দিলেন।—তাহলে হিংসেয় পালিয়েছেন বলছেন?

হিংসে? বিভাস দত্তর জবাবে প্রায় স্বীকৃতির আমেজ, তাও বলতে পারেন, আপনাকে অনেকদিন ও-রকম হাসতে দেখিনি।

জ্যোতিরাণীর এবারে ঝাঁজিয়ে বলে উঠতে ইচ্ছে করছিল, রাতে ঘুমুতে পেরেছিলেন তো? মুখে এলো না শেষপর্যন্ত।

ওধার থেকে বিভাস দত্ত বললেন, যাক্, আপনার সঙ্গে আমার একটু দরকারী পরামর্শ ছিল।

আমার সঙ্গে! কি ব্যাপার?

ব্যাপার টেলিফোনে হবে না, কবে দর্শনলাভ হবে বলুন।

দরকারী পরামর্শের প্রয়োজনে দর্শনলাভের বাসনা কি দর্শনলাভের বাসনায়

দরকারী পরামর্শ সেটা খুব অস্পষ্ট নয় জ্যোতিরাণীর কাছে। বিকেলে সেদিন না দেখে গেলে বা শমীকে নিয়ে পালিয়ে না গেলে হয়ত এতটা ভাবতেন না। ভদ্রলোকের নিজের আসার ইচ্ছে থাকলে এভাবে বলেন না, বড় জোর একটা টেলিফোনে জানিয়ে দেন ওমুক সময় আসছেন। সব সময় তাও করেন না, সোজা চলেই আসেন। ঘুরিয়ে তাঁকেই যেতে বলার ইচ্ছে হয়ত। কিন্তু জ্যোতিরাণীর সে-ইচ্ছেয় সায় দেবার ইচ্ছে নেই আপাতত। ভালো করে বোঝার জন্য হেসেই বললেন, চট করে দর্শনলাভ হওয়া একটু শক্ত বটে, কদিন ব্যস্তই আছি—তবু আপনিই বলুন কবে—

জবাব শোনা হল না ভালো করে, পিছনে পায়ের শব্দ পেয়ে রিসিভার কানে ফিরে তাকালেন।

শিবেশ্বর।

ওধার থেকে বিভাস দত্তর গলা একটা শব্দ হয়ে কানের পরদায় লাগছে শুধু। কি বললেন বা বলছেন এক বর্ণও কানে ঢুকল না। নিজের অগোচরে কান থেকে রিসিভারও সরে গেল জ্যোতিরাণীর। লোকটা দাঁড়িয়ে আছে, চেয়ে আছে। এই মূর্তি এই চাউনি জ্যোতিরাণী চেনেন। দু চোখ থেকে হিংসা রাগ বিদ্বেষ বুঝি গলে গলে পড়ছে।

আত্মস্থ হয়ে রিসিভার কানে লাগালেন আবার। ঠাণ্ডা গলায় বললেন, আমি পরে আবার আপনাকে ফোন করব'খন, এখন রাখলুম।

হঠাৎ বিসদৃশ কিছুই ঘটেছে, ওদিক থেকে বিভাসবাবুর সেটা অনুমান না করার কথা নয়। কিন্তু সে সম্বন্ধে ভাবার অবকাশ নেই আপাতত।

রিসিভার রেখে জ্যোতিরাণী আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়াতেই অসহ্য রাগে বিদ্রূপের সুরে শিবেশ্বর বলে উঠলেন, কেন পরে কেন? এখনি জেনে নাও কবে—আবার ভয়ানক দূরে কোথাও চলে যাচ্ছে বিভাস? স্টেশনে গিয়ে তাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসতে হবে আবার? সি-অফ করতে হবে?

জ্যোতিরাণী নির্বাক। জ্যোতিরাণী স্তব্ধ। হ্যাঁ, এই মুখই স্বাভাবিক বটে। রাতের মুখ নয়, এই মুখ। চেনা মুখ।···তবে ঠিক এই মুখ অনেকদিন দেখেননি বটে। ছেলে যেদিন চাবুক খেল সেই রাতে দেখেছিলেন। আর তার বহু আগে শ্বশুরের ভিটেয় থাকতে কত যে দেখেছিলেন ঠিক নেই। কিন্তু বিভাস দত্তকে স্টেশনে তুলে দেওয়ার খবর কে জানালে? মিত্রাদি? তিনি গোপনে যাননি, গোপন করার কিছু আছে তাও ভাবেন নি। কিন্তু সেটাকে কদর্য করে কে এই মানুষের কানে তুলে দিল···।

এ ধরনের পরিস্থিতিতে নিজেকে স্থির সংযত করে তুলতে সময় লাগে না জ্যোতিরাণীর। সেই চেষ্টাই করছেন ভিতরে ভিতরে। আর মুখের দিকে চেয়ে আছেন।

রাগে সাদা হয়ে উঠেছেন শিবেশ্বর, ধকধকে দৃষ্টিটা স্ত্রীর মুখের ওপর ফেলে যেন চিরে চিরে দেখছেন তাঁকে।—কথা বন্ধ হয়ে গেল কেন? এবারে কি জন্যে ডাকছে বিভাস? ট্রেনে তুলে দিতে না সঙ্গে করে নিয়েই যেতে চায়?

খুব চেষ্টা করে এখনো স্নায়ু বশে রাখতে চেষ্টা করছেন জ্যোতিরাণী। একটা কাজে হাত দিতে চলেছেন—হাত দিয়েইছেন, এর মধ্যে কোনো অবুঝ বিকৃতির বিঘ্ন ঘোরালো হয়ে উঠুক একটুও কাম্য নয়। মৃদু অথচ স্পষ্ট করেই জবাব দিলেন, কিছুই চায় না—এত জোরে কথা বোলো না, আশপাশে ঝি-চাকর যাওয়া আসা করছে। ঠাণ্ডা হয়ে ওখানে বাসো, তারপর বলো কি বলবে—

উদগ্র ক্রোধ বিদ্রূপ হয়ে ঝরল শিবেশ্বরের কথায়, ও…ঠাণ্ডা হয়ে ঠাণ্ডা মাথায় হাতজোড় করে নিবেদন করতে হবে, কেমন? সামনের দিকে ঝুঁকলেন আর একটু, ঝি-চাকরের মধ্যে যাকে নিয়ে ভাবনা তাকে তো যেতে চাওয়া মাত্র ছেড়ে দিয়েছ, আর ঝি-চাকরের জন্য ভাবনা কি?

দ্রুত মাথার মধ্যে কিছু একটা ওলটপালট হচ্ছে জ্যোতিরাণীর, কতগুলো প্রশ্ন সব সংযম ভেঙে যেন ধাক্কা দিয়ে দিয়ে এগিয়ে আসতে চাইছে। সদাকে নিয়ে তাঁর কোনো ভাবনার কারণ ছিল এটাই তাহলে ধরে নিয়েছে, কিন্তু কি ভাবনা তাঁর থাকতে পারে? এই প্রশ্নটাই সবার আগে ঠোঁটের ডগায় এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু না, এখনো তাঁর কিছু জানতে বাকি, কিছু বুঝতে বাকি। এখনো তিনি সমস্ত ব্যক্তিগত সংঘাত আর সমস্যা একপাশে সরিয়ে রেখে অনেক বড় স্বার্থে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে চান। বললেন, সদাকে নিয়ে আমার কি ভাবনা থাকতে পারে, সেটা এখনো আমার মাথায় ঢোকেনি, কেন এভাবে গেল তাও জানি না। আমার ধারণা সেটা তোমার থেকে ভালো আর কেউ জানে না।

চেয়ে আছেন। দুর্জয় ক্রোধের আড়ালেও হোঁচট খেতে দেখলেন যেন। স্নায়ুর ক্ষিপ্ত তাড়নায় সদার প্রসঙ্গ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে মনে হল। দুই-এক মুহূর্ত থমকে আক্রমণের অস্ত্র বদলালেন শিবেশ্বর।—বীথি ঘোষ কে?

জ্যোতিরাণী জবাব দেবেন, না দেখবেন, না ভাববেন!

তরল বিষ ঢালতে চাইলেন শিবেশ্বর, চিনতেও কষ্ট হচ্ছে বোধ হয়? স্টেশনে বিভাস দত্তকে আদর করে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসতে গিয়ে কার দুঃখে অস্থির হয়ে সাক্ষী হবার জন্যে পুলিসের খাতায় একেবারে নাম-ঠিকানা লিখে দিয়ে এসেছিলে?

কে বীথি ঘোষ ?

চোখে চোখ রেখে চেয়েই আছেন জ্যোতিরাণী। ছেলের আলো নেভানোর খবরটা মিত্রাদি কানে তুলেছিল নির্দোষ রসিকতার খবর বলে।...বিভাস দত্তকে আদর করে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসার খবরটা দিয়েছে বীথি ঘোষের শোকের কাহিনী বলার উপলক্ষে, না প্রতিষ্ঠান গড়ার সমাচার জানাতে গিয়ে ?

জবাব দিলেন, বীথি ঘোষ কে সে তো তুমি বেশ ভালই জানো দেখছি, কিন্তু তোমার এভাবে রেগে ওঠার মতই কিছু একটা গর্হিত কাজ আমি করেছি, এই সুখবরটা তোমাকে দিলে কে ?...মিত্রাদি ?

আবার একটা ধাক্কা খেতে খেতেই শিবেশ্বর চেঁচিয়ে উঠলেন প্রায়, মিত্রাদি খবর দিতে যাবে কেন—নিজে সব ব্যবস্থা করেছ, খবর দেবার লোকের অভাব কি ? খবরটা পেয়ে তোমার মিত্রাদিকে আমি ফোন করেছি, সে দেয়নি। সাক্ষী দেবার নেমন্তন্ন করার জন্যে একটু আগে সশরীরে পুলিসের লোক এসে হাজির হয়েছিল—অমন রূপ নিয়ে সাক্ষীর কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়ালে আসামীর ফাঁসির হুকুম হয়ে যাবে একেবারে—যাবে না সাক্ষী দিতে ?

এতক্ষণে বোধগম্য হল ব্যাপারটা। সামনে এই অকরুণ উগ্র মূর্তি দেখেও ভিতরে ভিতরে কত বড় একটা স্বস্তি অনুভব করলেন সে শুধু জ্যোতিরাণীই জানেন।...মিত্রাদি কিছু বলেনি, কোনো ছল-ছুতোয় মিত্রাদি কিছু কানে তোলেনি, এই স্বস্তি। জবাব দিলেন, গেলে অন্যায় কি, কি ঘটেছিল তা শুনেছ ?

শুনেছি, চমৎকার করে শুনেছি। একটু আগে পুলিসের লোক তোমার প্রশংসা পঞ্চমুখে ব্যাখ্যা করে গেছে। বলেছে, বিভাস দত্ত নামে ভদ্রলোকটিকে ট্রেনে তুলে দেবার জন্য তুমি সে-সময়ে সেখানে গিয়ে না পড়লে মেয়েটাকে কি যে বেঘোরে পড়তে হত! তারপর সেই রাত্রিতেই মৈত্রেয়ী তোমার মত বিশিষ্ট মহিলার নাম লিখিয়ে তাকে ছাড়িয়ে এনেছে—এত বড় হৃদয়ের প্রশংসাও তো তোমারই প্রাপ্য! বলতে বলতে মুখ আর একদফা বিকৃত হয়ে উঠল শিবেশ্বরের।—কিন্তু আমি আবার হৃদয়-টিদয়ের কথা কম বুঝি বলে বড় অসুবিধে হয়ে গেল তোমার, পুলিসের দু-চারটে মাথার সঙ্গে একটু জানাশুনা আছে...টেলিফোনে সাক্ষীর ব্যাপারটা বাতিল করে দিলাম। এত বড় আদর্শের কাজে বড় রকমের ব্যাঘাত ঘটালাম, না ?

নিজের সহিষ্ণুতা নিজের কাছেই প্রায় বিচিত্র লাগছে জ্যোতিরাণীর। মুখের কোনো প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট হয়ে উঠতে দিচ্ছেন না তিনি। নির্লিপ্ত সুরে মন্তব্য করার মত করে বললেন, না, ভালই করেছ, লোকটার ভালো হাতে শাস্তি হওয়া উচিত... তবু আর হাঙ্গামার মধ্যে যাবার ইচ্ছে নেই।

স্থির হাবভাব আর নিরুত্তাপ উক্তির কতটা খাঁটি আর কতটা মেকী কয়েক নিমেষের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিবাণে শিবেশ্বর তাই আগে বুঝে নিতে চেষ্টা করলেন। অকরুণ শুদ্ধতায় রমণীর গোপন দুর্বলতার একেবারে মুখোমুখি দাঁড়াতে চান তিনি। আরো কাছে ঝুঁকে গলার স্বর বদলে এক অব্যর্থ শর নিক্ষেপ করতে চাইলেন বুঝি।—বিভাস কাছে থেকে কাছে গেলেও ট্রেনে তুলে দিতে যাও, আর আমি এত জায়গায় ঘুরি, কখনো এ-রকম ইচ্ছে দেখিনি তো ? বিলেতে গেলাম যখন, তখনো তো সী-অফ করার জন্যে এরোড্রোমে আসনি তুমি ?

এই রোষের উৎস কোথায় জ্যোতিরাণী সেটা অনেক আগেই বুঝেছেন। কিন্তু স্নায়ুতে স্নায়ুতে যার অবিশ্বাসের বিকৃত স্রোত বইছে, কোনো কিছুই সে এখন সাদা চোখে দেখবে না। কোন্ যোগাযোগে আর কোন্ খেয়ালের মাথায় তিনি স্টেশনে গেছলেন, সেটা বোঝাতে চেষ্টা করাও পাঁক ঘেঁটে নিজেকে টেনে তোলার মত।

তুমি কখনও চাওনি। চাইলে যাব।

ও…! শ্লেষে মুখের চেহারা বদলে গেল আবার, আমি চাইনি কখনো আর বিভাস দত্ত চেয়েছে, কেমন ? কেবল চাইলেই করুণা বর্ষণ করে থাকো তুমি ?

বিভাস দত্তও চাননি, আমি করুণাও কিছু বর্ষণ করিনি। যার কোনো অস্তিত্ব নেই, শূন্য থেকে তাই টেনে এনে অনেককাল তো কষ্ট পেয়েছ আর কষ্ট দিয়েছ, এতে কি লাভ হয়েছে তোমার ? লাভ-লোকসান এত বোঝো, আর এত বছরেও এটুকু বুঝে উঠতে পারলে না কেন ?

রাগ যে দেখাচ্ছে না, পাল্টা ঝাঁজে স্ত্রীর চোখে-মুখে আগুন যে ঝরছে না, শিবেশ্বরের তপ্ত মস্তিষ্কের বিবেচনায় এটাই এক মস্ত দুর্বলতা। কথাগুলো মন-ভুলানো নীতি-বাক্যের মত লাগল। বিকৃত শ্লেষে হেসে উঠতে চেষ্টা করলেন আবার, বেশ বেশ ! তোমার উপদেশ শুনে পরম নিশ্চিন্তে নাকে তেল দিয়ে ঘুমোই তাহলে, কি বলো ?

জ্যোতিরাণীর দু চোখ তাঁর মুখের ওপর স্থির হয়ে বসল, জবাব দিলেন, পারলে লোকসান হবে না, তবে তোমার পক্ষে পারা কঠিন—তবু চেষ্টা করো।

ওয়াণ্ডারফুল ! হাসির আকারে বিদ্বেষ গলে গলে পড়তে লাগল, উপদেশ আজকাল লোককে আমিই দিয়ে থাকি আর তার বদলে তারা মোটা টাকা দেয়, কিন্তু তোমার এই দুর্মূল্য উপদেশের তুলনায় সে-সব একেবারে জলো।…তা আমি তো ঘুমুতে চেষ্টা করব, তুমি কি করবে ? স্টেশন থেকে মেয়ে কুড়িয়ে মিত্রার ওখানে রেখেছ, ওদের নিয়ে এখন আদর্শের একটা দোকান-টোকান খুলে বসবে বোধ হয় ? টেলিফোনে সে-রকমই কি-যেন একটা সুখবর শুনিয়ে প্রশংসায় মেতে ওঠার

চেষ্টায় ছিল তোমার মিত্রাদিও···সেইজন্তেই তোমার এখন টাকার দরকার হয়ে পড়েছে বলছিলে, তাই না ?

জ্যোতিরাণী নীরবে চেয়ে আছেন। যে বিঘ্নের ছায়াটা ঠেলে সরিয়ে দিয়েছেন অনেকবার, এই অকারণ প্রসঙ্গ-বদলের ফলে সেটাই আবার কাছে এগিয়ে আসছে।

সেইজন্তেই বিক্রমেও সাহায্য চাই, কেমন ? আদর্শের বন্যা নামিয়ে দেবে একেবারে। সেই বন্যায় হাবুডুবু খেয়ে বিভাস দত্ত সাতশ' পাতার একখানা বই লিখে ফেলবে না ? কি আশ্চর্য, কত বড় বড় ব্যাপার সামনে তোমার আর আমি কিনা শূন্য থেকে ঝামেলা টেনে এনে কেবল কষ্টই পাচ্ছি আর কষ্টই দিচ্ছি! · এই নির্বোধ লোকটাকে চিনতে এখনো একটু বাকি আছে তোমার, রোসো, সবই করাচ্ছি আমি—

দুর্বহ আক্রোশ নিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। জ্যোতিরাণী পাথরের মত দাঁড়িয়ে। এখনো নিজের সঙ্গে যুঝছেন তিনি। দাঁড়িয়ে আছেন আর অবাধ্য টানধরা স্নায়ুগুলো সব বশে আনতে চেষ্টা করছেন। ভাবতে চেষ্টা করছেন, এমন কিছু ঘটেনি, নতুন কিছু ঘটেনি—যা তাঁর সহের সীমা ছাড়াবে, সহিষ্ণুতায় ফাটল ধরাবে। তাঁর ধারণায় সামান্য একটু ভুল থেকে গেছল কেবল। শ্বশুরবাড়ি থেকে তাড়ানোর পর টাকা করার ঝোঁকে বিকৃত সন্দেহের রোগ প্রায় ছেড়েই গেছে মনে হয়েছিল। টাকা করার পর মানুষটার ক্ষোভের আকার বদলেছিল, রূপ বদলেছিল। আষ্টেপৃষ্ঠে টাকার শেকল পরিয়ে প্রভুত্ব করার অভিলাষ সফল হয়নি, টাকা দিয়ে স্ত্রীর সত্তাসুদ্ধ কিনে ফেলা যায়নি—পরের ক্ষোভ আর আক্রোশের এটাই কারণ ধরে নিয়েছিলেন জ্যোতিরাণী। ভুল কিছুটা ধরা পড়েছিল সেই স্বাধীনতার রাতে, ঘরের আলো নেভানোর অপরাধে ছেলের পিঠে একের পর এক যখন চাবুকের দাগ বসাচ্ছিলেন। আর ধরা পড়ল আজ। সেই পুরনো রোগ সারেনি, প্রকাশের আড়ালে ছিল শুধু। টাকার মর্যাদায় টাকার দম্ভে আচরণ বদলেছিল, আর কিছু না।

যে কারণে ছেলের পিঠ চাবুকের ঘায়ে রক্তাক্ত হয়েছিল, আজকের এই ক্ষিপ্ত বিকারের মূলেও সেই একই কারণ। বিভাস দত্তকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসার জন্য তিনি স্টেশনে গেছলেন, কারণ শুধু এই। আর কিছু না। নতুন কিছু না। তাঁর চিন্তা আর বড় সঙ্কল্পের নিবিষ্টতায় ছেদ পড়তে পারে—নতুন তেমন কিছুই ঘটেনি।

টেলিফোন। জ্যোতিরাণী ঘুরে দাঁড়ালেন। মিত্রাদির ছাড়া আর কারো নয়। সাড়া দেওয়া মাত্র ভিতরে ভিতরে মিত্রাদি যে বেশ উদ্বিগ্ন বোঝা গেল।—কি ব্যাপার ? সকালেই তোমার কর্তার অমন মারমুখো টেলিফোন কেন ?

জ্যোতিরাণীর মনে হল এই মিত্রাদির প্রতি মনে মনে বড়গোছেরই একটা

অপরাধ করে ফেলেছিলেন তিনি—বিভাস দত্তকে স্টেশনে তুলে দিয়ে আসার খবর সরবরাহের ব্যাপারে মিত্রাদিকেই সন্দেহ করেছিলেন প্রথম। সেই সংশয় গেছে বলেই তাঁরই প্রতি সব থেকে বেশি সদয় এখন।· শান্তমুখে জবাব দিলেন, বেশ ঘাবড়েছ মনে হচ্ছে।…পয়সাঅলা লোকের মার-মুখ মাঝেসাঝে দেখতেই হয়, সে-ও তো তুমি টেলিফোনে দেখেছ, নাগালের মধ্যে তো আর ছিলে না—কড়া জবাব দিলেই পারতে, তোমার ভয়টা কি ?

কি জানি ভাই, আমার ভয়ই ধরে গেছে, তখন থেকে তোমাকে টেলিফোন করার ফাঁক খুঁজছি, বীথিটা ছায়ার মত সঙ্গে লেগেছিল বলে পারছিলাম না। তা হঠাৎ কি হল বলো তো ? সকালবেলাতেই হঠাৎ টেলিফোনে বীথির নাড়ি-নক্ষত্র জানার বাসনা কেন ভদ্রলোকের ?

সকালবেলা বলেই বাসনাটা ভয়ের কিছু না।

মিত্রাদির ভয় দূর হল বোধ হয়, টেলিফোনে খিলখিল হাসি।—তোমার ঠোঁটের ডগায় কথার পিঠে কথাও আসে ভাই, আমাকে সকলে সুরসিকা বলে কিন্তু তোমার চাপা রস দেখলে সকলে পাগল হয়ে যেত—

তোমাকে তো অভয় দিয়েছি সেদিন, কেউ দেখবে না। তা বীথির নাড়িনক্ষত্র কি জানতে চাইলেন ?

রসের কথা অথচ গলার স্বরে কেমন খটকা লাগছে মৈত্রেয়ী চন্দর। জবাব দিলেন, সে-কি একটা ! জেরার পর জেরা—বীথি ঘোষ কে, বয়েস কত, কার বউ, স্টেশনে তুমি তাকে দেখেছ অথচ জেলখানা থেকে ও আমার বাড়িতে এসে ঠাঁই নিল কি করে, মেয়েটাকে নিয়ে এখন আমরা কি করব—প্রশ্নের পর প্রশ্ন। সত্যি ভাই ঘাবড়ে গেছি, ভদ্রলোক একটুও খুশি নন, মনে হল—স্টেশনে কি অবস্থার মধ্যে তুমি বীথিকে পেয়েছ উনি জানেন সব ?

…জানেন বোধ হয়।

তুমি বলোনি ?

না। থানা থেকে সাক্ষীর ব্যাপারে লোক এসেছিল, তার মুখেই শুনেছেন।

…ও। মৈত্রেয়ী চন্দ আবারও উতলা একটু, কিন্তু এত ভালো খবর শুনেও তোমার মালিকটির হাবভাব এত গরম কেন ? যে-ব্যাপারে এগোতে যাচ্ছি সব ঠিক আছে তো নাকি ভেস্তে গেল ?

মিত্রাদির আসল শঙ্কা যে এটাই টেলিফোন পেয়েই জ্যোতিরাণীর তা বুঝতে দেরি হয়নি। এতটুকু দ্বিধার প্রশ্রয় না দিয়ে খুব স্পষ্ট করে জবাব দিলেন, স-ব ঠিক আছে। আমার মালিকের গরম হাবভাব ঠাণ্ডা করার দায়টা আমারই ওপর ছেড়ে

দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে তুমি কাজে এগোতে পারো।

বাঁচালে ভাই, মিত্রাদির তরল হাসি, ঘাবড়াই কি সাধে! নিজের জোর থাকলে অত ঘাবড়াতুম না, এক-চোখো ওপরঅলা সেদিক থেকে মেরে রেখেছে যে।

টেলিফোন রেখে জ্যোতিরাণী বহুক্ষণ নীরবে ছটফট করে কাটালেন।...মিত্রাদির জোর নেই, মিত্রাদিকে ওপরঅলা মেরে রেখেছে। আর জ্যোতিরাণীর জোর আছে, তাঁকে ওপরঅলা মেরে রাখেনি। বাইরের চোখে এই সংসার-মঞ্চের নাটক সবই তো ঠিক ঠিক চলছে, লোকে জোর দেখবে না কেন, ভাববে না কেন। কিন্তু এই জোরের ঠাট বজায় রাখতে বুকের তলার কত কি পুড়ে-পুড়ে ছাই হয়ে গেল। তাঁকে মেরে রাখেনি মিত্রাদির মত, অথচ এও এক বিচিত্র মার। পায়ের তলার মাটি নড়ে যায়, সরে যায়—এমন মার। কত সুন্দর হতে পারত, কত অকৃত্রিম হতে পারত, হৃদয়ের স্পর্শে কত পুষ্ট হতে পারত এই জোরের দিকটাই। না হবার তো কিছু ছিল না। এত বড় শূন্য থেকে কেড়ে কেড়ে জোর সঞ্চয় কি যে প্রাণান্তকর, তা যেন আবার নতুন করে উপলব্ধি করলেন জ্যোতিরাণী।

তবু জোরই বটে। দুর্লভ জোর। এটুকুর জন্যেই ওপরঅলার কাছে কৃতজ্ঞ তিনি। বিপুল বৈভবের যে-জোরটা তিনি দিয়েছেন, দিচ্ছেন—তাঁর আর সব মার ভুলে জীবন-আঙিনার অনেক অন্ধকার ঠেলে ঠেলে সার্থকতার এক নতুন পথে পা বাড়াবার মতই পাথেয় সেটা। এটুকুও না থাকলে একেবারেই নিঃস্ব দেউলে হতেন বোধ করি। মিত্রাদিকে মিথ্যে আশ্বাস দেননি তিনি, মিথ্যে আশায় ভোলাননি। সঙ্কল্পের নতুন বাঁকে পা তিনি রেখেইছেন। কোনো কারণে কোনো সংঘাতে সেখান থেকে ফেরা আলোর নিশানা ছেড়ে অন্ধকারের গহ্বরে ফিরে আসার মতই। তা তিনি করবেন না। তাঁর এই জোরের সঙ্গে আর কোনো কিছুর আপস নেই।

কিন্তু সঙ্কল্প এক, বাস্তব আর।

সঙ্কল্প যত অটুট হোক, বাস্তবের অকরুণ আঘাত যেখানে এসে লাগে, সেখান দিয়ে রক্ত ঝরে।

একটানা নীরবতার মধ্যে কেটেছে সকাল দুপুর আর প্রায় বিকেলও। এই নীরবতা ক্রমে থিতিয়েছে, ক্রমে ভারী হয়েছে। ভারী হয়ে হয়ে বাতাস ভারী করেছে। জ্যোতিরাণী তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন সর্বত্র। আসতে-যেতে বিশেষ করে কালীদাকে লক্ষ্য করেছেন। প্রতিষ্ঠান গড়ার ব্যাপারে তাঁর অননুকূল মনোভাব মালিকের এই চিত্তদাহের মুহূর্তে ব্যক্ত করা হয়ে গেছে কিনা সেটা যেন মুখ দেখেই বুঝে নিতে পারবেন তিনি।

বোঝা যায়নি।

বিকেল না হতে পাশের ঘরের মানুষ ঘরে ফিরেছে। ঘুরে-ফিরে জ্যোতিরাণীর চোখ দরজার ভারী পরদা থেকে ফিরে ফিরে আসছে।···আজও রাত্রিতে তাঁর ঘরে পা পড়বে কিনা তিনি জানেন না। পড়েও যদি সেটা এই কদিনের মত হবে না, ঘরে নীল আলো জ্বলবে না। আসেও যদি, অশান্ত ইন্দ্রিয়-পথে তাঁর সত্তার ওপর উদ্‌ভ্রান্ত আঘাত হানার তাড়না নিয়ে আসবে। আসুক, জ্যোতিরাণী অনভ্যস্ত নন। কিন্তু সেই প্রতীক্ষায় থাকবেন না তিনি। কারণ সে-অবকাশ জ্যোতিরাণীর অবকাশ নয়। তার অনেক আগে ওই ভারী পরদা ঠেলে ওই ঘরে ঢুকবেন জ্যোতিরাণী নিজেই। তাঁর যে জোরের উপর মিত্রাদির আস্থা, আর যে জোরের দরুন নিজেও কৃতজ্ঞ তিনি—আজই সেটাকে সর্বরকমে সংশয়মুক্ত করে নিয়ে আসতে চান। সঙ্কল্পটা খুব স্পষ্ট করে জানিয়ে রাখতে চান। সকালে ওভাবে শাসানো হয়েছে বলেই তাঁর সঙ্কল্প সম্পর্কে আর কোনো অস্পষ্টতার মধ্যে রাখতে চান না এই একজনকে অন্তত। তাই রাতের প্রতীক্ষায় থাকবেন না জ্যোতিরাণী। অন্ধকারের অন্ধ প্রবৃত্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দরবার চলে না।

কিন্তু সঙ্কল্প এক, বাস্তব আর।

সন্ধ্যা পার হতেই নিজের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলেন, কাগজ-ফাইল দলিলপত্র বগলদাবা করে কালীদা আসছেন এদিকে। না, তাঁর কাছে নয়, তাঁর ঘরেও নয়। পাশের ঘরে ঢুকে গেলেন কালীদা। জ্যোতিরাণী গম্ভীর মুখই দেখলেন বটে তাঁর, কিন্তু চোখে নীরব কৌতুকও যে দেখেছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

···দাঁড়িয়ে শুনবেন কি কথা হয়? একটা বাজে খেয়ালে কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা অপব্যয় হতে যাচ্ছে, কোন্ সুরে সে খবরটা জানিয়ে তাতিয়ে তোলার ইন্ধন যোগান কালীদা—শুনবেন দাঁড়িয়ে? দরকার নেই। জ্যোতিরাণী ঘরে চলে এলেন। যেমন করে খুশি বলুন, তাঁর সঙ্কল্পে কোনো দ্বিধার জায়গা নেই, তাঁর এই জোরটার সঙ্গে কোনো কিছুর আপস নেই।

কিন্তু তিনি চান না চান চলে আসার পরেও কান দুটো সজাগ। আরো সজাগ কারণ, দেয়ালের ওধার থেকেও একটাই অসহিষ্ণু ভারী গলা কানে আসছে। সেই গলা কালীদার নয়। শয্যায় বসে থাকা সম্ভব হল না খানিকক্ষণের মধ্যে। ওই ভারী গলা চড়তেই লাগল। ক্রুদ্ধ গর্জন আর হুঙ্কারে ফেটে ফেটে পড়তে লাগল। জ্যোতিরাণী নিস্পন্দের মত দাঁড়িয়ে খানিক। হতচকিত যেন। এই মর্মান্তিক আক্রোশ, এই হুঙ্কার তর্জন-গর্জন কার ওপর?

পায়ে পায়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন আবার। নিজের অগোচরেই বুঝি পাশের ঘরের দরজার সামনে এলেন। পরমুহূর্তে স্তব্ধ।

আমি জানতে চাই কার হুকুমে তুমি পাসবই চেক-বই বাড়ির দলিলপত্র সব বার করে দিয়েছ? কার হুকুমে দিয়েছ?

কালীদার মৃদু জবাব, তোর বউ চাইলে না দিয়ে কি করব?

বউ চাক আর বউয়ের বাবা চাক, তুমি দেবে কেন? তোমাকে আমি বারণ করে দিয়েছিলাম না? অমন সুন্দর মুখ তোমাদের বউয়ের, চাইলে আর অমনি তুমি সব হাতে তুলে দিলে, কেমন? কেন তুমি আমাকে ট্রাঙ্ক-কলে জিজ্ঞাসা করে নিলে না দেবে কিনা? আবার জানাতে এসেছ ওর থেকে জ্যোতি আড়াই লক্ষ তিন লক্ষ টাকা নেবে, আর ওই বাড়িটা—আড়াই-তিন লক্ষ টাকা আর ওই বাড়ি তোমার হাতের ফাঁক দিয়ে গলে যায়, না?

আবারও মৃদু শান্ত জবাব কালীদার, আমার না যাক তোর যেতে পারে—ইনকাম ট্যাক্সের ঝামেলা যে রকম বাড়ছে, ওই গোছের কোনো চ্যারিটি ইউনিটে কিছু টাকা সরিয়ে দিলে হাঙ্গামাও কিছু বাঁচবে, তুই টেরও পাবি না কি গেল না গেল।

আবার সেই ক্ষিপ্ত গর্জন টাকার মালিকের।—তোমার এই বক্তৃতা আমি শুনতে চাই না! আমি দশগুণ ইনকাম ট্যাক্স ঢালব তাতে তোমার কি? আমি জানতে চাই কেন দেবে? কেন তোমার এত স্পর্ধা হবে?

হাতে করে কখন পরদা ঠেলে সরিয়েছেন জ্যোতিরাণী জানেন না। চৌকাঠ পেরিয়ে ভিতরে এসে দাঁড়িয়েছেন। টাকার এই মেজাজও আর কি দেখেছেন তিনি? এত বীভৎস এত কঠিন এত বিকৃত রোষে এ-ভাবেও কেউ অপমান করতে পারে কাউকে? কিন্তু আশ্চর্য, কালীদার মুখে এত বড় অপমানেরও বড় গোছের ছাপ কিছু পড়েনি। মানুষটা ঘরের মধ্যে দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে, আর কালীদা সামনে বসে চুপচাপ। কালীদা ভাঙানি দেবেন ধরে নিয়েছিলেন, তা দেননি। কিন্তু এই সহিষ্ণুতারই বা কি রূপ। এরই নাম দাসত্ব? যে-চাকরির মায়ার কথা ঠাট্টার ছলে বলেছিলেন সেদিন—সেই মায়া?

তাঁকে দেখা মাত্র রুদ্ধ আক্রোশে থমকে দাঁড়ালেন শিবেশ্বর। দু চোখের একটা আগুনের ঝাপটা এসে লাগল জ্যোতিরাণীর মুখে। কালীদাও ঘাড় ফেরালেন। তারপরেও কোনো অনুভূতির প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না মুখে। নির্লিপ্ত আহ্বান জানালেন, এসো জ্যোতি এসো—শিবুর ধারণা আমি মারাত্মক রকমের একটা অবিশ্বাসের কাজ করে ফেলেছি, এখন ওর বক্তব্য শোনো আর কি বোঝাবে

বোঝাও—আমি উঠি।

শোনো! শিবেশ্বরের হুঙ্কারে কালীদা চেয়ার ছেড়ে উঠেও দাঁড়িয়ে গেলেন।—আমি কারো কোনো কথা শুনতেও চাই না বুঝতেও চাই না। চেক-বই পাসবই দলিল সব তোমার জিম্মায় ছিল—সে-সব যেখান থেকে হোক যেমন করে হোক কাল তুমি আমাকে একটি একটি করে বুঝিয়ে ফেরত দেবে! কে নিয়েছে না নিয়েছে আমি কোনো কথা শুনতে চাই না। কালকের মধ্যেই সে-সব আমার চাই মনে থাকে যেন। আমি না বললে, কারো কোনো খেয়াল মেটাবার জন্য আমার একটা পয়সা খরচ হবে না সেটা আজ শেষবারের মত তুমি বেশ ভালো করে বুঝে নিয়ে যাও—আমার টাকা দাতব্য করার জন্যে আমি তোমাকে এ-কাজে বসাইনি মনে রেখো।

জবাবে নির্লিপ্ত দৃষ্টিটা কালীনাথ শিবেশ্বরের মুখের ওপর থেকে ফিরিয়ে জ্যোতিরাণীর মুখের ওপর বসালেন কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপর একটি কথাও না বলে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

সরোষ পায়চারিতে বাধা পড়ল শিবেশ্বরের। আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে জ্যোতিরাণী তাঁর মুখোমুখি দাঁড়ালেন। শোনার জন্য আর তারপর হিংস্র আঘাত হানার জন্য শিবেশ্বরও প্রস্তুত। কিন্তু কিছু বলার আগে দেখছেন জ্যোতিরাণী, শুধু দেখছেন। চোখের গল-গলে আগুন দেখছেন, মুখের কঠিন টানা-টানা রেখা-গুলো দেখছেন, প্রস্তুতি দেখছেন। এই আক্রোশ সেই অন্ধকারের আক্রোশ, দেহ ছিন্নভিন্ন করে নারীসত্তা-গ্রাসের সেই তিমির আক্রোশ।

কিন্তু এও দেখা আছে, জানা আছে। খুব ধীর ঠাণ্ডা স্বরে জ্যোতিরাণী জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ খেয়াল মেটাবার জন্যে আমার টাকার দরকার, সেটা ভালো করে জেনেছ?

চাপা শ্লেষ ঝরল শিবেশ্বরের গলায়, কেন? আমার জানার কি দরকার?

জানলে বুঝতে পারতে এটা কোনো খেয়াল নয়।

দাঁতে দাঁত ঘষে শিবেশ্বর জবাব দিলেন, আমি কিচ্ছু জানতে চাই না, কিচ্ছু বুঝতে চাই না—আমার হুকুম ছাড়া আমার একটি পয়সা কোনো কিছুতে খরচ হবে না।

হুকুম দাও তাহলে। টাকা আমার দরকার।

টাকা তোমার দরকার! হুকুমটা তাহলে তুমিই দিচ্ছ? রক্তবর্ণ মুখ ক্রোধে বিকৃত হয়ে উঠছে আবার, তোমার ওই রূপ নিয়ে আর যার কাছে খুশি দাঁড়াওগে যাও, এখানে নয়। আমার খুব ভালো চেনা আছে, এখানে এক পয়সাও হবে না, তুমি আদর্শ নিয়ে মেতে উঠবে আমি তা হতে দেব না দেব না! বুঝলে?

ঠেকাবে কি করে?

কি? কি বললে?

বললাম, ঠেকাবে কি করে? সকলে তোমাকে বুদ্ধিমান বলে, কালীদাকে এ-ভাবে অপমান করলে কেন? ব্যাঙ্কে আমার নামে টাকা, আমার সইয়ে টাকা ওঠে—বাড়ির দলিলে আমার সই, আমার নামে রেজিস্ট্রি করা। ব্যাঙ্কের চেক-বই পাসবই হারিয়ে গেছে জানালে নতুন পাসবই চেক-বই তারা দেবে না? রেজিস্ট্রি আপিসে বাড়ির দলিলের নকল পাওয়া যাবে না? পাসবই চেক-বই বাড়ির দলিল সব চাই তোমার? একটা ছেড়ে দশটা করে চেক-বই এনে টাকা তুলতে পারি কিনা দেখবে?

দিশেহারা ক্রোধে বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয় বটে। শুনলেন যা তাও যে দুঃসহ সত্যি, সেটা নতুন করে উপলব্ধি করতে হল যেন। মুহূর্তের জন্য অসহায় বোধ করেছেন বলেই দ্বিগুণ উত্তেজনায় শিবেশ্বর চেঁচিয়েই উঠলেন প্রায়, আমি বলছি হবে না, হবে না—টাকা ঢেলে ডাক্তারের সার্টিফিকেট এনে তোমাকে আমি তার আগে পাগল প্রমাণ করব, তোমার সইয়ে একটা পয়সাও উঠবে না, একটা টাকাও তুমি তুলতে পারবে না!, লোকে জানবে শিবেশ্বর চাটুজ্যের বউ পাগল হয়ে গেছে—বুঝলে?

জ্যোতিরাণী চেয়ে আছেন। দেখছেন দেখছেন দেখছেন। কয়েকটা নিমেষের মধ্যে অন্তহীন দেখা।—তাহলেই বা তুমি ধরে রাখবে কি করে? একজন বীথিকে নিয়েও আমি যে-কাজে নামতে যাচ্ছি, নামব। লোকের দরজায় দরজায় হাত পেতে ভিক্ষে করব। শিবেশ্বর চাটুজ্যের বউকে লোকে তখন কি বলবে?

ও···! দৃষ্টি-দহনে আগুন ধরানো যায় না এটুকুই খেদ।—ধরে রাখা তোমাকে যাবেই না তাহলে?

ধরে রাখার মত গুণ তোমার কমই আছে। চল্লিশ বছরের লোক সদাকে পর্যন্ত ধরে রাখতে পারোনি। আমাকে ধরে রাখা যাবে কিনা সেটা ভাবার সময় এখনো আসেনি। আমি যা করতে যাচ্ছি তাতে তোমার এত আপত্তি কেন?

সদার প্রসঙ্গমাত্রে রোষারক্ত মুখের ওপর একটা বিপরীত প্রতিক্রিয়া ছায়াপাত করে গেল যেন। বিকৃত কণ্ঠে বলে উঠলেন, আপত্তি না করে আনন্দে তাহলে নেচেই উঠি, কেমন?

নাচতে হবে না, আপত্তি কেন তাই বলো।

আপত্তি কেন? যত সব রাসকেলের কথায় ভাবে ভেসে আমি তিন লক্ষ টাকা আর অমন একখানা বাড়ি দাতব্য করে ফেলব ভেবেছ তুমি? টাকা গাছে ফলে? তিন লক্ষ টাকা একসঙ্গে দেখেছ কখনো?

না দেখব কেন, তুমিই দেখিয়েছ। পিছন ফিরে তাকালেন একবার জ্যোতিরাণী। পিছনে শয্যা। মুখের ওপর চোখ রেখে বসলেন। এই শয্যা অনেক কালের মধ্যে স্পর্শও করেননি। ওখানে বসার ফলে তাঁর ব্যক্তিত্বের দিকটাই যেন আরো পুষ্ট হয়ে উঠল। বললেন, বোসো, আমি ছেলেখেলা করতে আসিনি, বসে ঠাণ্ডা মাথায় জবাব দাও। টাকার জন্য তোমার আপত্তি নয়, টাকা আর বাড়ি তোমার এত আছে যে ওই টাকা আর ওই একটা বাড়ির অভাব তোমার টের পাওয়ারও কথা নয়—

কথার মাঝেই শিবেশ্বর বাধা দিয়ে উঠলেন, এই জন্যেই আটঘাট বেঁধে কালীদার থেকে খাতাপত্র তলব করে সব দেখে রেখেছ, কেমন? অনেক দেখেছ? আর ভেবেছ এর কোনো দাম নেই—অপদার্থ লোকটা আকাশে হাত বাড়িয়েছে আর অমনি সব হাতে এসে গেছে—না?

না। বরং তোমার শক্তির কথা ভেবেছি। তুমি এতটা পেরেছ বলেই এগোতে সাহস করেছি। ভগবান তোমাকে এতবড় ক্ষমতা দিয়েছেন বলেই আমার জোর বেড়েছে।

শিবেশ্বরের স্নায়ু একটুও ঠাণ্ডা হওয়া দূরে থাক আরো বুঝি টান দিয়ে উঠল। কথার চিনিতে মন একটুও গলবে না, কারণ এত বিদ্বেষ বর্ষণ আর এক পয়সাও দেবে না বলে মুখের ওপর এভাবে হুমকি দেওয়া সত্ত্বেও সঙ্কল্প থেকে এক চুলও যে নড়ানো যায়নি—রমণীমুখে সেটুকুই সব থেকে বেশি স্পষ্ট। চোখে-মুখে গলিত শ্লেষের ঝাপটা দিতে চেষ্টা করলেন আবার, এখন শক্তির কথা ভেবেছ, এখন আমার ক্ষমতার ওপর নির্ভর! কেন, এখন টাকার জন্যে এখানে এসে হাত পাততে লজ্জা করে না তোমার?

লজ্জা করার কথা নয়, মেয়েরা এখানেই এসে হাত পেতে থাকে। অপলক দৃষ্টি তাঁর মুখের ওপর স্থির তেমনি।—আমার কথার তুমি জবাব দাওনি এখনো। আমি এ-কাজে হাত দিই তুমি চাও না কেন?

হঠাৎ কাছে এগিয়ে এলেন শিবেশ্বর। খুব কাছে। প্রায় মুখের কাছে। একটা পা স্ত্রীর পাশ ঘেঁষে শয্যায় তুলে দিয়ে আরো ঝুঁকলেন।—তোমার এমন বিরাট আদর্শের উৎসাহদাতাটি কে? এমন অভিনব আদর্শের কাজে আর কে থাকছে তোমার পাশে? বিভাস দত্ত বোধ হয়?

এত কাছে ঝুঁকে পড়া সত্ত্বেও জ্যোতিরাণী একটুও নড়লেন না, মুখ সরালেন না, দৃষ্টি লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে দিলেন না।—ভেবে দেখিনি। উৎসাহ আমাকে কেউ দেয়নি, নিজেই সংগ্রহ করেছি। তোমার আপত্তি থাকলে তিনি থাকবেন না।

কিন্তু তুমি ডাক্তার দেখাও, টাকায় অসুখ সারে না।

ছিটকে সরে দাঁড়ালেন শিবেশ্বর। রমণীর সত্তাগ্রাসী সেই হিংস্র অভিলাষ গলার শিরায় মুখের রেখায় আর চোখের তারায় এঁটে বসতে লাগল। এত রাগ, এত ক্ষিপ্ত রোষ, এত অপমানে জর্জরিত করার পরেও নিজেই যেন তিনি কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন। চিৎকার করে উঠলেন, আমার অসুখ বলে হাজারিবাগে বসে বিভাস দত্তর সঙ্গে তুমি ছবি তুলে বেড়াও, আমার অসুখ বলে তার সঙ্গে অন্ধকার ঘরে বসে তুমি অন্ধতামিস্র শোনো, আমার অসুখ বলে তার কুড়নো কে একটা মেয়েকে পরম আদরে তুমি বুকে তুলে নাও, আমার অসুখ সেই দুঃখে নিজের গাড়িতে করে বিভাস দত্তকে স্টেশনে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসতে যাও—কেমন? আমি ডাক্তার দেখাব আর আমার টাকায় পরম আনন্দে তুমি এই সব আদর্শের জোয়ারে সাঁতার কেটে বেড়াবে—অ্যাঁ?

শয্যা ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন জ্যোতিরাণী। কয়েক মুহূর্ত মাথার মধ্যে কি-সব ওলট-পালট হতে থাকল। সব থেকে বেশি নড়াচড়া করে বসল হাজারিবাগে বিভাস দত্তর সঙ্গে ছবি তুলে বেড়ানোর কটূক্তিটা। কিন্তু ভাবার অবকাশ নেই। বললেন, এবারে তুমি সত্যি কথা বলেছ—এই জন্যেই তোমার আপত্তি, এই জন্যেই চাও না। বিভাস দত্তর আগেও তুমি এই রোগে ভুগেছ, এই বিভীষিকা দেখেছ। অল্প বয়সের গুলি খেয়ে মরা একটা ছেলেকেও এই রোগে ভুগে তুমি অপমান করেছ, তোমার এই রোগের প্রশ্রয় দিলে আজ কালীদা আর মামাবাবুকেও ছাড়তে হত, তোমার এই রোগ তাড়ানোর জন্যেই তোমার বাবা তোমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়েছিলেন। আজ বিভাস দত্তর বিভীষিকা দেখছ তুমি, কাল হয়ত বিক্রম পাঠক আসবে। যাক্, তোমার রোগ ছাড়ে যদি, আর কাউকে না হোক বিভাস দত্তকে অন্তত বরাবরকার মত ছেঁটে দিতে রাজি আছি আমি—কিন্তু তাঁর ওই কুড়নো মেয়েটাকে নয়। এখন যা আমি করব ঠিক করেছি, করব। এর নড়চড় হবে না।

দরজার দিকে পা বাড়ালেন জ্যোতিরাণী। পারলে শিবেশ্বর দুহাতের থাবায় আবার তাঁকে টেনে এনে শয্যার ওপর আছড়ে ফেলেন। সেটা না পেয়ে চিৎকার করেই শেষবারের মত তাঁর সঙ্কল্পটা তছনছ করে দিতে চাইলেন বুঝি।—হবে না, হবে না! একটি পয়সাও তুমি আমার কাছ থেকে আদায় করতে পারবে না, আমি যা চাই না তা তুমি করতে পাবে না—আমি করতে দেব না, কিছু হবে না—বুঝলে?

জ্যোতিরাণী ফিরে দাঁড়ালেন, একটু চেয়ে থেকে শেষ কথা বুঝি তিনিও বলে

গেলেন।—হবে। মিথ্যে বাধা দিতে চেষ্টা করে অশান্তি বাড়িও না।

রাত পোহালো। সকাল থেকেই এ-বাড়ির হাওয়া-বাতাস বুঝি থমকে রইল আবার। মেঘনা শামু ভোলা পারতপক্ষে কেউ মনিব বা মনিবানির মুখোমুখি পড়তে চাইল না। সিতু সারাক্ষণ এর মুখ তার মুখ চেয়ে শেষে একটু তাড়াতাড়িই গাড়ি চেপে স্কুলে রওনা হয়ে গেল।

বেলা গড়াতে লাগল। জ্যোতিরাণী একটা বিশেষ কোনো ভাবনা নিয়ে বসে নেই। তিনি কোনো কিছুর প্রতীক্ষা করছেন না। সঙ্কল্প নড়েনি, কিন্তু সঙ্কল্পে এগনোর কোন্ রাস্তা ধরবেন তাও ভাবছেন না। অসংলগ্ন এক-একটা ছায়ার মত মাথার মধ্যে কি সব আনাগোনা করে যাচ্ছে। তার মধ্যে একটা ছায়াই থেকে থেকে একটু ঘন হয়ে উঠছিল বুঝি।

একসময় উঠে দাঁড়িয়ে ভাবলেন কি একটু। তারপর বড় আলমারিটা খুললেন। এদিক-ওদিকে হাত চালিয়ে খোঁজাখুঁজি করলেন কি যেন। পেলেন না।···কোথায় রেখেছেন? ড্রেসিং টেবিলের বড় ড্রয়ারটা খুললেন। হ্যাঁ, এখানেই আছে।

বেশ মোটা দুটো অ্যালবাম। নানা আকারের ফোটো ভরতি। সব ছবি কুলোয়নি, অ্যালবামে অাঁটা হয়নি। খামের মধ্যে রয়েছে অনেক। পাতা উল্টে আর খাম দেখে হাজারিবাগের ছবিতে এসে থামলেন তিনি। একে একে দেখে যেতে লাগলেন। প্রথম ওমর খৈয়ামের সেই ফোটো দুটোর কপি চোখে পড়ল। কিন্তু যা খুঁজছেন সেটা কোথায়?···আছে, খামের মধ্যে বিভাস দত্তর দেয়ালে টাঙানো সেই ফোটোর কপিও আছে দেখলেন। বিভাস দত্ত তাঁর কপি এনলার্জ করিয়ে নিয়েছেন।

···কিন্তু আর একজন এই ছবির খবর কি করে পেল? বিভাস দত্তর ঘরের দেয়াল থেকে না বাড়ির এই অ্যালবাম থেকে? অ্যালবাম যথাস্থানে রেখে দেরাজ বন্ধ করলেন জ্যোতিরাণী।

বিকেলের অনেক আগেই আজ পাশের ঘরের মালিকের উপস্থিতি টের পেলেন। পায়ে পায়ে জ্যোতিরাণী বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। রেলিংয়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। পাশের ঘরের পুরু পরদা সত্ত্বেও ভিতরে অশান্ত পায়চারি করে চলেছে কেউ বোঝা গেল।

একটু বাদে পরদা ঠেলে শিবেশ্বর বাইরে এসে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে আক্রোশ-ভরা দৃষ্টিটা জ্যোতিরাণীর মুখের ওপর থমকালো। সদার বিদায়ের পর যে মুখ

আর চোখ বার বার স্ত্রীর লক্ষ্য এড়াতে চেয়েছিল—সে-রকম নয়। বারান্দায় পা দিয়েও সরাসরি চেয়েই আছেন। অশান্ত পায়ে বারান্দা ধরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন তারপর। মিনিট পনের বাদে ফিরলেন। জ্যোতিরাণী সেখানেই দাঁড়িয়ে।

পরদা ঠেলে আবার নিজের ঘরের ভিতরে ঢুকে যেতে দেখলেন তাঁকে। অসহিষ্ণু হাতের তাড়নায় বিক্ষিপ্ত পরদাটা স্থির হতে সময় লাগল। ঘরের মধ্যে আবার অস্থির পায়চারির আভাস পেলেন জ্যোতিরাণী।

একটু বাদে ভোলা এসে খবর দিল, ঠাকুমা ডাকছেন।···ঘর থেকে বেরিয়ে ছেলে তাহলে মায়ের কাছেই কিছু বলে এসেছে বোঝা গেল।

তাঁকে দেখামাত্র শাশুড়ী খেদ-ভরা বিস্ময়ে ভেঙে পড়লেন যেন, তোমাদের সব হল কি, বাড়িটাতে এ কার চোখ পড়ল, অ্যাঁ? সেদিন সদা চলে গেল, আজ শুনছি কালীও কালই এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে, কি ব্যাপার?

বিস্ময়ের আঁচড় পড়তে লাগল জ্যোতিরাণীর মুখেও।···এই জন্যেই পাশের ঘরের মানুষের অমন অশান্ত মূর্তি কি? অস্ফুট জবাব দিলেন, আমি জানি না তো···

কেউ তো কিছু জানো না তোমরা, অথচ একে একে সব চলে যাচ্ছে। রোষ চাপতে চেষ্টা করলেন না শাশুড়ী, বলে উঠলেন, আপিসে শিবুর কাছে সব চাবি-টাবি পর্যন্ত দিয়ে দেওয়া হয়েছে শুনলাম। বারণ করা হয়েছিল শোনেনি, শিবু বলল আমার কথাও শুনবে না। সব গেলে খুশি যদি না হও, তাহলে ও আসামাত্র শোনো কি হয়েছে, ওকে আটকাতে চেষ্টা করো। কালীও যদি যায়, তারপর কোন্‌দিন আমাকেও তাড়াবে সেই আশায় আমি বসে থাকব এখানে ভাবো?

কালীদার জন্যে আলাদা ধরনের একটা শ্রদ্ধার আসন পাতাই ছিল জ্যোতি-রাণীর মনে, মাঝের কটা দিন যেন সেখান থেকে সরে গেছলেন তিনি। খবরটা শোনার পর এখন আবার মনে হল, সেই আসনে বসেই কালীদা হাসছেন মিটিমিটি। বেশ ধীর ঠাণ্ডা মুখেই জ্যোতিরাণী জবাব দিলেন, আমি কাউকে তাড়াইনি। সদা কেন গেছে আর কালীদা কেন যাবেন সেটা আপনার ছেলের থেকে বেশি কেউ জানে না। সত্যিই যদি আটকানো দরকার মনে করেন, আপনার ছেলেকে ডেকে বলুন—কাল তাঁকে যে অপমান হতে দেখেছি একটুও আত্মসম্মান থাকলে যেতে চাওয়ারই কথা।

দ্বিতীয় কথা শোনার জন্যে জ্যোতিরাণী আর দাঁড়ালেন না শাশুড়ীর সামনে। সোজা নিজের ঘরে চলে এলেন। কালীদা চলেই যাবেন সেটা একটুও কাম্য নয়, কিন্তু যেতে চেয়েছেন বলেই তাঁর মর্যাদা দ্বিগুণ বেড়েছে। তবু ভিতরে ভিতরে

জ্যোতিরাণী এক ধরনের জ্বালা-ধরা তুষ্টিই বোধ করছেন যেন। দেখুক, চাবুক সকলের ওপরেই কতটা চলে দেখুক।

কালীদা সন্ধ্যার পরে এসেছেন টের পেলেন। জ্যোতিরাণী নিজেই তাঁর খাবারট দিতে যাবেন ভেবে এসে দেখেন মেঘনার খাবার দেওয়া সারা। ও কর্তব্যই করেছে, জ্যোতিরাণী সামনে না থাকলে সদা দিত। এখন সদা নেই, ও দিয়েছে। তবু কালীদার ঘরে একবার ঢুকবেন কিনা ভাবলেন। খুব ইচ্ছে করছে। কিন্তু গিয়ে কি করবেন, কি বলবেন? ঘরেই ফিরলেন আবার।

ঘরেও ভালো লাগছে না। কিন্তু যাবেনই বা কোথায়। এত বড় বাড়িটা হঠাৎ যেন কেমন ছোট হয়ে গেছে। সেল্‌ফ্‌ থেকে সেই মজার বইটা টেনে নিলেন —এ পিক্‌চার ছাট্‌ ফ্যান্‌স্‌ উইল নট্‌ সী। একদিনের প্রবঞ্চিত সর্বস্বলুণ্ঠিত নায়িকার প্রতিশোধের কাণ্ডকারখানাগুলো মজারই বটে। কিন্তু সেই থেকে পাতা আর এগোচ্ছেই না।

আজও এগলো না, একটু বাদেই রেখে দিলেন বইটা। সিতুকে ঘরে ডেকে এনে পড়াতে বসালে কি হয়। ছেলেটা অবাক হবে ভাবতে ইচ্ছেটা বাতিল করে দিলেন। কিন্তু ওর ব্যবস্থা একটা করতে হবে। গতকাল টেলিফোনে শমীর নালিশ মনে পড়ল। শুধু অসভ্যতা করেনি, মায়ের কানে যাতে না ওঠে সে-জন্য মেয়েটাকে শাসিয়েছেও নিশ্চয়, নইলে ওকে কিছু বলতে অত করে অনুনয় করল কেন শমী। জ্যোতিরাণী বলবেন না কিছু, ব্যবস্থাই করবেন। ব্যবস্থা একটা মনে মনে এঁচেই রেখেছেন, এখানে রাখবেন না ওকে। কিন্তু সিতুর চিন্তাও ভালো লাগছে না এখন, মনটা বার বার ঘর ছেড়ে অন্যদিকে ছুটছে। কালীদার ঘরে যেতে ইচ্ছে করছে। পাশের ঘরের মানুষের মুখখানাও একবার দেখতে ইচ্ছে করছে।

যেতে হল না, পাশের ঘরের মানুষই এ-ঘরে এসে দাঁড়ালেন হঠাৎ। ভেবে-চিন্তে আশা নয়, অসহিষ্ণু ঝোঁকের মাথায় আসার মত।

কালীদা কালই এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে মায়ের কাছে শুনেছ?

শুনেছি।

তাকে আটকাতে চেষ্টা করবে না সে চলেই যাবে?

অপমান তুমি করেছ, চেষ্টাও তুমি করো।

গলার স্বর একটু চড়িয়ে মাথা নেড়ে শিবেশ্বর বললেন, অপমানের জন্য সে যাচ্ছে না, যাচ্ছে তোমার জন্যে, তোমার প্রতি তার দরদ উথলে উঠেছে—সেই জন্যে, খুশি হয়েছ?

জ্যোতিরাণীর বোধগম্য হল না হঠাৎ। পরক্ষণে মনে হল, চেক্‌-বই পাসবই

আর বাড়ির দলিল তাঁর কাছে আছে, সেগুলো কালীদা চেয়ে নিতে পারছেন না বলেই এই উক্তি। একভাবে বসে থাকতে দেখে শিবেশ্বরের ধৈর্য কমছে। আবার বললেন, আজ অফিসে চাবি-টাবি আর একটি ছাড়া সব কাগজপত্র বুঝিয়ে দিয়েছে, সকাল হলেই আর তাকে পাওয়া যাবে না, বুঝলে? এখন দয়া করে উঠে তুমি তাকে কিছু বলবে কি বলবে না?

কেন, এত টাকার জোর তোমার, তুমি পারছ না ধরে রাখতে?

এক মুহূর্ত থমকে তেমনি অসহিষ্ণু পায়েই ঘর থেকে চলে গেলেন শিবেশ্বর। একটু বাদে জ্যোতিরাণী উঠলেন আস্তে আস্তে।···কালীদা চলে যাবেন বলেই বিকেল থেকে এই অশান্ত মূর্তি বুঝেছেন। শুধু অশান্ত নয়, উতলাও। প্রকারান্তরে অনুরোধই করতে আসা হয়েছিল তাঁকে। ক্ষোভের মুখে অনুরোধ যে-ভাবে করা যায়, তাই করা হয়েছে।

আলমারি খুলে চেকবই আর পাসবইগুলো আর বাড়ির দলিলটা নিলেন। বেরিয়ে এসে দেখলেন আর একজনের এখন ঘর ছেড়ে বারান্দায় পায়চারি চলছে। জ্যোতিরাণী তাকালেন না, সোজা কালীদার ঘরে এলেন।

তারপর অবাকই একটু। পায়ের ওপর পা তুলে কালীদা চেয়ারে বসে হাল্‌কা শিস দিচ্ছেন। কিছু একটা ঘটেছে বা ঘটতে যাচ্ছে সেই আভাসও নেই। তাঁকে দেখে পা নামিয়ে সোজা হয়ে বসলেন।

এগুলো নিন।

কালীদা অবাকই যেন একটু।—ফেরত দিচ্ছ যে? যা করবে ঠিক করেছ, করবে না?

দেখি। এগুলো দিয়ে ফেলে আমার জন্য আপনি অনেক অপমান সহ্য করেছেন, আর না। এতটা হতে পারে আমার ধারণা ছিল না। এখন কাল উঠেই আপনি কোথাও যাচ্ছেন না বলে দিয়ে ওদের নিশ্চিন্ত করুন।

চেকবই পাসবই বা বাড়ির দলিলের দিকে কালীদা ফিরেও তাকালেন না। হাসছেন মিটিমিটি। বললেন, ওগুলো তোমার কাছেই থাক, এক তোমার ছাড়া আর কারো ওগুলোর দরকার হবে না বোধহয়···আর খুব সম্ভব আমিও যাচ্ছি না। আমি শিবুকে একটা আলটিমেটাম দিয়েছি, আজ রাতটা পর্যন্ত সময়, এর মধ্যে আমি যা চেয়েছি তাতে রাজি না হলে সকালে চলে যাব বলেছি। মনে হয় আমার কথাও শুনবে।

সহজ সরল উক্তি। কিন্তু সবটাই দুর্বোধ্য জ্যোতিরাণীর কাছে। আগেও বহুবার মনে হয়েছে একমাত্র এই ভদ্রলোকেরই কোথায় যেন মস্ত একটা জোর

রয়েছে বহুবিকৃত গোঁ আর দম্ভভরা বিপুল-ধনী বাড়ির ওই মালিকটির ওপর। কালীদার উক্তি একবর্ণ না বুঝেও আজ সেই অজ্ঞাত জোরের দিকটাই যেন সব থেকে বেশি চোখে পড়েছে তাঁর।

বাইরে থেকে ঘরের মেঝেয় বড় ছায়া পড়ল একটা। শিবেশ্বর।

দুজনকেই দেখে নিলেন একবার। তারপর দু পা ভিতরে এসে সরোষে কালীদার দিকে ফিরলেন।—কি, মত বদলেছে না যাবেই ঠিক করেছ?

নির্লিপ্ত মুখ করে কালীদা জবাব দিলেন, একটু আগে জ্যোতিকে বলছিলাম আমি থাকব কি যাব সেটা তোর উপর নির্ভর করে।

নির্ভরই করো তাহলে, দয়া করে থেকে যাও! নিরুপায় রাগে ক্ষোভে বিকৃত মুখ শিবেশ্বরের।—আমাকে তুমি এভাবে জব্দ করেছ সেটা আমার মনে থাকবে। জ্বলন্ত দৃষ্টিটা জ্যোতিরাণীর দিকে ফেরালেন। তেমনি নিরুপায় শ্লেষে বলে উঠলেন, এবারে তুমি মনের আনন্দে আদর্শে ভেসে যেতে পারো, বুঝলে? কালীদা আলটিমেটাম দিয়েছে—যেজন্যে বাড়িতে এত বড় বুক-ভাঙা ব্যাপার ঘটে গেল, এরপর তোমার সেই আদর্শের প্রতিষ্ঠান হতে না দিলে এখান থেকে চলে যাবে—তোমার ওই চেক-বই পাসবই বাড়ির দলিলের দিকে আমি হাত বাড়ালে সে এ বাড়িতে আর থাকবে না—তোমার ওপর এত দরদ আর পরের টাকায় এত বড় দাতা আর দেখেছ?

জ্যোতিরাণী চিত্রার্পিত দর্শক না চিত্রার্পিত শ্রোতা? তিনি ঠিক শুনছেন না ঠিক দেখছেন? মুখ টিপে টিপে হেসেই চলেছেন কালীদা।

বড় একটা দম নিয়ে দু চোখ ঘোরালো করে শিবেশ্বর বিড়বিড় করে আবার বললেন, কিন্তু টাকায় হাত না দিলেও কি-ভাবে কত বড় আদর্শের ব্যাপার গড়ে উঠতে যাচ্ছে আমি আগে সব দেখে শুনে বুঝে নেব বলে দিলাম। দুজনের দিকে শেষ অগ্নি-দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই যেন এক ঝটকায় ঘর ছেড়ে চলে গেলেন শিবেশ্বর চাটুজ্যে।

জ্যোতিরাণী ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়েই আছেন। কালীদাকেই দেখছেন বটে। হাসতে দেখছেন।

কেরামতিখানা দেখলে তো আমার, কম লোক ভাবো নাকি? সেই চিরাচরিত চপল গাম্ভীর্য কালীদার। তারপর আবারও হেসেই বললেন, বেজায় চটেছে।··· ওগুলো জায়গামত তুলে রেখে দাওগে যাও।

রাত্রি। এক পাশের ঘরের লোক ছাড়া বাড়িতে আর কেউ জেগে নেই বোধ হয়।

এমন নিশ্চিন্ত আরামের শয্যায় জ্যোতিরাণী আর কি কখনো শুয়েছেন ? এত হাল্‌কা আর কখনো মনে হয়েছে ভিতরটা ? আদর্শের আলোটা থেকে থেকে বড়ই হয়ে উঠেছে। প্রতিষ্ঠান হবে। শমী বোসেরা আর বীথি ঘোষেরা হাসবে। কোনো বিঘ্ন নেই, কোনো বাধার আশঙ্কা নেই। তবু, এত বড় আনন্দের মধ্যেও কেবলই তিনি এপাশ ওপাশ করছেন কেন ?

…এই কালীদাকে সন্দেহ করেছিলেন, এই কালীদাই বিরূপ মন্তব্য করে একজনের কান বিষোবেন ধরে নিয়েছিলেন তিনি। কত ছোট করেছিলেন এই কালীদাকে। আদর্শের আলো জ্বলবে, প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে—এই আনন্দের অনুভূতিটা ভিতরে যে কতবার প্রণাম হয়ে উঠেছে ঠিক নেই। আর তক্ষুনি প্রণাম করার মত দুটো পা সামনে ভেসেছে জ্যোতিরাণীর।

সেই পা কালীদার।

দরজার দিকে ঘাড় ফেরালেন হঠাৎ। কোনো ষষ্ঠ চেতনার ক্রিয়া কিনা কে জানে। না, ঠিকই টের পেয়েছেন। তাঁর অন্ধকার ঘরে নিঃশব্দ পদসঞ্চার ঘটেছে পাশের ঘরের মানুষের।

আসুক…।

কি যেন ভাবছিলেন জ্যোতিরাণী।…আর বাধা আসবে না বিঘ্ন আসবে না, প্রতিষ্ঠান হবে, প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে। প্রতিষ্ঠানের নামও তো ভেবে রেখেছিলেন তিনি।

ভেবেছিলেন নাম যদি হয় প্রভুজীধাম…

॥ পঁচিশ ॥

পরের দিনটা কাটল দুর্যোগ-শেষের মৌন-শিথিল একটা ছুটি-পাওয়া দিনের মত। আগের দিনগুলোর ক্লান্তির ছাপ আছে, আগামী দিনের প্রস্তুতির উদ্বেগও আছে—তবু এই দিনটা ওই দুইয়ের কোনটারই ভার বইতে রাজি নয় যেন।

তার পরদিন সকাল নটা নাগাত রাস্তার দিকের বারান্দা থেকে জ্যোতিরাণী রিকশায় ছোট বিছানা আর সুটকেস চাপিয়ে যে-মানুষটিকে আসতে দেখলেন, গত কয়দিনে তাঁর কথা একবারও মনে পড়েনি। চিঠি যে লেখা হয়েছিল, তাও ভুলে গেছলেন। তাছাড়া ভদ্রলোক এরই মধ্যে চিঠি পাবেন আর চলে আসবেন ভাবেননি।

মামাশ্বশুর গৌরবিমল।

রেলিংয়ের থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়েই অন্যমনস্কের মত নিজের চুলের বোঝায় তেলের হাত চালিয়ে নিচ্ছিলেন জ্যোতিরাণী। রিকশাটা ঢুকতে দেখে হাত থেমে গেল। সঙ্কল্পে কোনো দ্বিধার জায়গা নেই, সেই গোছের একটা অনুভূতি বড় করে তোলার তাড়নায় চিঠিটা লিখতে দেরি করেননি। আর তখন লিখে ফেলার পিছনে কালীদার প্রতি অভিমানও একটা কারণ। তিনি তখন ওভাবে সরে না দাঁড়ালে দু-পাঁচ দিন সবুর করা চলত। কিন্তু মাঝের কটা দিন ঠিক এই পর্যায়ের ধকল যাবে কে জানত। জানলে তাড়াহুড়ো করে লিখতেন না।

তাঁকে দেখে মনে হল, বাড়ির এই বাতাসটা কেটে যাওয়ার কিছুদিন বাদে উনি এলে ভালো হত।

সিঁড়িতে বাড়ির মালিকের সঙ্গেই দেখা প্রথম। শিবেশ্বর তাঁর নীচের ঘরে গিয়ে বসার উদ্দেশে সবে সিঁড়ির দিকে এগিয়েছিলেন, মামুকে উঠে আসতে দেখে সেখানেই দাঁড়িয়ে গেলেন। এই মামুটি কোন সময় নোটিস দিয়ে আসেন না বা নোটিস দিয়ে বাড়ি ছেড়ে যান না, তবু ঈষৎ বিস্ময়ের সুরে শিবেশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি হঠাৎ কোথা থেকে?

এলাম। বাড়ির খবর সব ভালো তো?

ভিতরে ভিতরে গৌরবিমল উতলা ছিলেন একটু। জ্যোতিরাণীর অপ্রত্যাশিত সাদামাটা চিঠিটা তাঁর দুশ্চিন্তার কারণই হয়েছিল। চিঠি পেয়ে পরদিনই হরিদ্বার থেকে রওনা হয়েছেন। ভাগ্নে চিঠির খবর রাখে না, সেটা প্রথম সাক্ষাৎ আর প্রশ্ন থেকেই বোঝা গেল। বাড়ির ধারা ভালই জানেন। অতএব কিছু না বলে তিনি ফিরে শুধু কুশল প্রশ্নই করলেন।

গম্ভীর মুখে শিবেশ্বর বললেন, খুব ভালো। সুসময়ে এসেছ।

পায়ে পায়ে জ্যোতিরাণী এসে দাঁড়ালেন। শিবেশ্বর ফিরে একবার তাকালেন শুধু। কি সুসময় গৌরবিমল জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও করলেন না। জ্যোতিরাণী প্রণাম সারলেন। এই অবকাশটুকুতে চিন্তা করে নিয়েছেন কিছু। সহজ সুরেই জিজ্ঞাসা করলেন, এত তাড়াতাড়ি আসতে পারবেন ভাবিনি, চিঠি পেয়েই রওনা হয়েছেন বুঝি?

ফলে ভদ্রলোককে যে বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলা হল একটু জ্যোতিরাণী খেয়াল করলেন না। শিবেশ্বরের দিকে ফিরে জানালেন, মামাবাবুকে আসার জন্যে আমি চিঠি লিখেছিলাম।

কয়েক নিমেষের প্রতিক্রিয়াটুকু সুস্পষ্ট। সাফল্যের যে-চূড়ায় শিবেশ্বরের বিচরণ

তাতে মনের ভাব গোপন করার মত পরোয়া কাউকে করেন না আজকাল। গম্ভীর মুখে ঠাণ্ডা একটু হাসির আভাস ফোটাতে চেষ্টা করলেন।—চিঠি লিখেছ সেটা চেপে যাওয়া দরকার কিনা না জানার ফলে মামু বলল, এলাম। মামুর মুখখানাই চড়াও করলেন তারপর, এরোপ্লেনে চেপে এলেও ভাড়া পেতে, বুঝলে? সময় নষ্ট করার সময় নেই এখন—

গৌরবিমল ফাঁপরেই পড়লেন, কি ব্যাপার?

পরিস্থিতি তরল হল কালীদার কল্যাণে। তাঁর ঘর থেকে উঁকি দিয়েই লঘু বিস্ময়ে চেঁচামেচি করতে করতে এগিয়ে এলেন, রাত্রি হতে ভোর এ কি অবাক কাণ্ড ঘোর! তাড়াতাড়ি সামনে তাঁর গায়ে পিঠে মুখে হাত বুলিয়ে মন্তব্য করলেন, ঠিকই তো দেখছি—

একজন ভাশুর একজন শ্বশুর, তবু স্বস্তিবোধ করলেন জ্যোতিরাণী। গৌরবিমল মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, কি ঠিক আছে?

সূক্ষ্ম দেহে আবির্ভাব কি স্থূল দেহে দেখে নিলাম।

দ্রষ্টার মতই শিবেশ্বর আনন্দের আতিশয্য লক্ষ্য করলেন কালীদার। ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাস ফোটার উপক্রম আবার। নির্লিপ্ত হাল্কা প্রশ্নটা সোজা তাঁর মুখের ওপর নিক্ষেপ করলেন।—অর্থাৎ তুমি বলতে চাও মামুকে আসতে লেখা হয়েছে তুমিও জানতে না?

জ্যোতিরাণী নির্বাক। এই-ই রীতি মানুষটার। কালীদার মুখে বিস্ময়ের পলকা কারুকার্য। তারপর জ্যোতিরাণীর দিকে ফিরে চোখ পাকালেন, ওর কাছে সব ফাঁস করে দিয়েছ বুঝি?

অর্থাৎ দুজনে পরামর্শ করেই মামাশ্বশুরকে আসতে লেখা হয়েছে সেই স্বীকৃতি। কালীদার প্রতি কৃতজ্ঞতার শেষ নেই জ্যোতিরাণীর, তবু চিঠি লেখার একলার দায় থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেবার চেষ্টাটা একটুও ভালো লাগল না। এদিকে দুদিনের পথ ভেঙে এসে ভদ্রলোক এখনো ঘরে ঢুকতে পাননি, এসেই হকচকিয়ে গেছেন বোঝা যায়।

ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করার কথাই বলতে যাচ্ছিলেন, দরকার হল না। ছোট দাদুর আগমন-বার্তা কানে আসতে লাফাতে লাফাতে সিতু এসে হাজির। এত লোকের মধ্যে বুড়োছেলেকে ছোট দাদু যে দুষ্টুমি করে টুক করে কোলে তুলে ফেলতে পারে সেজন্যে প্রস্তুত ছিল না। লজ্জায় লাল, হাঁচড়ে-পাঁচড়ে নামার চেষ্টা। কালীনাথের সরস গম্ভীর টিপ্পনীতে পরিস্থিতি তরল আবার। তিনি মন্তব্য করলেন, শত্রুপুরীতে বিপদতারণ মধুসূদনের কোল পেল বাছা।

কোন্ কাজে নীচে যাচ্ছিলেন শিবেশ্বর ভুলে গেছেন। নিজের ঘরেই ফিরে এসেছেন আবার। তাঁর ইচ্ছা আর শাসানির বিরুদ্ধেই কিছু গড়ে উঠতে যাচ্ছে সেই ক্ষোভ আছেই। কিন্তু মামুকে আসতে লেখা হয়েছে জেনে তিনি রুষ্ট একটুও হননি। বরং তুষ্ট হয়েছেন। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবার অবকাশ পেলে মামুকে ডাকার পরামর্শটা হয়ত বা তিনি নিজেই দিতেন। কালীদা আর মামু পিছনে থাকে যদি ছোট ব্যাপার না হোক অপচয়ের ব্যাপার কিছু হবে না। কিন্তু টাকা এত আছে যে, সত্যিই অপচয়ের পরোয়া খুব করেন না তিনি। আসলে নিশ্চিন্ত অন্য কারণে। স্ত্রীর আদর্শ নিয়ে মেতে ওঠার ঝোঁকটার কানাকড়িও দাম দেননি। কোথাকার কে একটা উদ্বাস্তু মেয়েকে কুড়িয়েছে স্টেশনে বিভাস দত্তকে ট্রেনে তুলে দিতে গিয়ে। আদর্শের পরিকল্পনার খবর কানে আসা মাত্র তাঁর মগজ সক্রিয় হয়েছিল তাই। এই জটিলতার যেমন রীতি। ঘোরালো ছায়া পড়েছিল। আর স্ত্রীর অনমিত মনোভাবে সেটা দ্বিগুণ পুষ্ট হয়ে তাঁকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল। পরশু রাতে কালীদার বেপরোয়া ফায়সালার পরে ক্ষোভ যায়নি বটে, কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁরও গোঁ দেখে সেই কালো ছায়াটা আগের মত ভিতর বিষোয়নি অত। আজ আবার ওই একই উপলক্ষে মামুর পদার্পণের ফলে ওটা ফিকেই হয়ে গেল।

শুধু তাই নয়, শিবেশ্বর চাটুজ্যের উর্বর মস্তিষ্কে এক অভিনব বুদ্ধির খেলা উঁকিঝুঁকি দিতে শুরু করেছে। এই খেলায় নেমে পড়ার মত হঠাৎ এমন বিপরীত জোরটা কোথা থেকে পেলেন জানেন না। ঘরের মধ্যে পায়চারি করছেন আর হাসছেন মৃদু মৃদু। আর কল্পনায় দেখছেন কিছু।

ও-ঘরে কালীদা আর একদফা ফাঁপরে ফেলেছেন মামুকে। সিতু বেচারা মুখখানা বেজার করে স্কুলের জন্য তৈরি হতে গেছে। স্কুলের কি একটা বিগত অনুষ্ঠান উপলক্ষে আগামীকাল তার ছুটি এটুকুই যা সান্ত্বনা। শুধু তারই ছুটি, জেঠু আর বাবার অফিস আছে, অতএব ছোট দাদুর ওপর অনেকক্ষণের কায়েমী দখল পাবে সে। জ্যোতিরাণী শুধু দু পেয়ালা কফি নিয়ে ঘরে ঢুকেছেন, মামাশ্বশুরকে বলেছেন, একেবারে স্নান সেরে নিন, তারপর খাবার দিই।

কফির কাপে চুমুক দিয়ে কালীদা সায় দিয়েছেন, সেই ভালো···। পরক্ষণে দ্বিধাগ্রস্ত, জ্যোতিরাণীকে জিজ্ঞাসা করেছেন, কিন্তু শুধু চানে হবে না, আমি একটা আইস-ব্যাগের খোঁজে যাব ?

পরশু সন্ধ্যার আগে পর্যন্ত এই বিদ্রূপ কানে এলে রাগে জ্বলতেন জ্যোতিরাণী। আজ হেসেই ফেললেন।

গৌরবিমলের বিস্ময়ভরা বিড়ম্বিত মুখ।—সকলে মিলে তোরা যে ঘাবড়েই

দিলি আমাকে! জ্যোতিরাণীর দিকে তাকালেন, কি ব্যাপার বলো তো?

হাসিমুখে জ্যোতিরাণী মৃদু জবাব দিলেন, আপনার ভয় পাওয়ার মত কিছু নয়—।

বিপুল উৎসাহে কালীদা তক্ষুনি সায় দিলেন আবার, নাহি ভয় হবে জয়—জ্যোতিরাণী তোমার মাথায় একটি মর্যাদার মুকুট আর কাঁধে একটি দায়িত্বের পাহাড় বসাবে স্থির করেছে। এর বেশি কিছু নয়—

মামাশ্বশুর আসাতে ভদ্রলোক যে যথার্থ খুশি জ্যোতিরাণী সেটা ভালই লক্ষ্য করেছেন। অনুযোগের স্বরে বললেন, জ্যোতিরাণী আপনাকেও বাদ দিতে চায়নি।

এক মুখে দুই নাম করে গুরুচণ্ডালি দোষ ঘটিও না। কালীদার ধমকের স্বর।

কেবল ফাজলামিই করছিস, কি ব্যাপার বলবি তো? গৌরবিমল তাগিদই দিলেন এবার, কিছু যেন একটা হতে যাচ্ছে?

হুঁ। খোঁয়াড়। কালীনাথের ফাজলামি বর্জনের মুখ।—হাঁ করে চেয়ে আছ কি, খোঁয়াড় দেখোনি?

তা তো দেখেছি। তোদের জন্যে?

না। আমাদের জন্যে জ্যোতিরাণীর অত দরদ নেই। প্রমীলাদের জন্যে।

জ্যোতিরাণী হাসছেন মুখ টিপে। যে চাপের মধ্যে ছিলেন কটা দিন, এই লঘু আলাপ বন্ধ ঘরের দুই-একটা জানলা খুলে দেওয়ার মত। কালীদা যেভাবেই বলুন বিদ্রূপের ছায়া আর পড়বে না।

কি হতে যাচ্ছে বা কেন তাঁকে চিঠি লিখে আসতে অনুরোধ করা হয়েছে গৌরবিমল এই থেকেই মোটামুটি একটু আঁচ পেলেন। অল্প হেসে জ্যোতিরাণীর দিকে ফিরলেন তিনি, হঠাৎ এ খেয়াল কেন?

সর্বনাশ, সর্বনাশ করেছে! আচমকা প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন কালীনাথ।—হোলড্ ইওর টাং মামু! খেয়াল বলছ, প্রাণে ভয়-ডর নেই তোমার?

গৌরবিমল ঈষৎ অপ্রস্তুত। জ্যোতিরাণী ঘর ছেড়ে পালানো শ্রেয় ভাবলেন আপাতত। কিন্তু বাধা পড়ল। কালীদার গম্ভীর আশ্বাস, জ্যোতিরাণী! অজ্ঞজনের কথা কান থেকেই বিদায় করো, মরমে নিও না। মামুকে আমি বেশ করে সমঝে দিচ্ছি। সমঝে দেবার জন্য আসামীর দিকেই ফিরলেন যেন, এটাকে খেয়াল ভাবা হয়েছিল বলে বাড়ির টেম্পারেচার একটানা চার দিন একশ' একুশ ডিগ্রীতে উঠে বসেছিল সে খবর রাখো? তারপর মাত্র দশ বিঘে জমির ওপর ছোট্ট একটা প্রাসাদ আর মাত্র লাখ-ছয়েক টাকার দখল নিতে পেরে সেই খরতাপ

কিছু ঠাণ্ডা হয়েছে। আমার আর শিবুর গণ্ডারের চামড়া বলে বেঁচে গেছি, তোমাকে কে রক্ষা করবে ?

জ্যোতিরাণী পালিয়েই এলেন। কালীদার সামনে দরকারী কথা হবার জো নেই। হাসলেন। খানিক আগে রিকশায় মামাশ্বশুরকে দেখে মনে হয়েছিল এই হাওয়ায় না এলেই ভালো ছিল। এখন ভাবছেন, এসেছেন ভালো হয়েছে। একটা অসহ্য গুমোট কেটেছে।

পরক্ষণে হাসি মিলিয়ে যেতে লাগল। তাঁকে হাসতে দেখলে আঁচড় পড়ে এমন লোকও বাড়িতে আছে। এবং সেই লোক দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। এই দিকেই চোখ। কিন্তু জ্যোতিরাণীর মনে হল, কদিনের সেই ঘোরালো ধারালো চাউনিটা বদলেছে। গম্ভীরই বটে, তবে অনেকটাই আত্মস্থ গাম্ভীর্য। নিজের সম্বন্ধে সর্বদা সকলকে সচেতন রাখার জন্যে যেমন থাকেন।

শোনো।

নিঃশব্দে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলেন। দাঁড়ালেন।

একটা কথা ভাবছিলাম, সহজ সুরে একটা মানসিক চিন্তাই ব্যক্ত করছেন যেন, মামু এসে গেল, কালীদা আছে, মৈত্রেয়ীও আছে বলছ, তুমি কি চাও বলে দিলে যা করার তারাই তো করতে পারে। তোমার নিজের এর মধ্যে থাকার খুব দরকার আছে ?

নিজে কোনো বক্তব্য প্যাঁচালো করে প্রকাশ করেন না জ্যোতিরাণী। কিন্তু তা বলে প্যাঁচের কথা ধরতে পারেন না এমন নয়। ক্ষোভ বা উষ্মা প্রকাশ না করে খুব সহজভাবেই জবাব দিলেন, গোড়ায় দরকার আছে, শুরুর আগে সরে দাঁড়ালে কেউ গা করবে না। পরে দরকার নেই বুঝলে চলে আসব।

ও, আচ্ছা··· ।

ঠোঁটের ফাঁকে হাসির অস্পষ্ট রেখাও দেখলেন কিনা জ্যোতিরাণী সঠিক ঠাওর করতে পারলেন না।—ভাবছিলে কেন ?

আমার নিজের কাজেও তো তোমাকে দরকার হতে পারে।

তোমাদের সেই ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ইলেকশনের কাজে ?

শিবেশ্বর অন্যমনস্ক যেন একটু, শুধু তা কেন···দেখলে কত দিকই তো দেখার আছে।

মুখের ওপর চোখ রেখে আবারও তেমনি সুরে জ্যোতিরাণী জবাব দিলেন, সত্যি সে-রকম দরকার পড়ে যদি, বোলো—আগেই ছেড়ে আসব।

ঘরে এসে জ্যোতিরাণী স্নানের জন্যে ব্যস্ত হলেন। মাথায় সেই কখন তেল

মেখে বসে আছেন ঠিক নেই। ব্যস্ততার ফাঁকে একটা অবাঞ্ছিত অনুভূতি, ঠেলে সরানোর চেষ্টা।···ডেকে কোনরকম কটু কথাও বলা হয়নি তাঁকে, তিক্ত কথাও না। তবু স্নায়ুতে এ-রকম টান ধরে কেন ? টান ধরার উপক্রম হয়েছিল সেটা অস্বীকারের তাড়নায় জ্যোতিরাণীর স্নানের তাড়া।

সিতুরই ভাগ্য প্রসন্ন বলতে হবে। নইলে তার ছুটির দিনের সকালের কাগজে খবরটা বেরুবে কেন ?

মা চায়ের ব্যবস্থা করছিল। খাবার আগেই দেওয়া হয়েছে। জেঠু কাগজ পড়ছিল। আর সিতু সকলের অলক্ষ্যে ছোট দাদুকে ঠেলছিল একটা গল্প শুরু করার জন্যে। রাতেই সে বায়না পেশ করে রেখেছিল সকালে চায়ের টেবিলে সেবারের মত সাঙ্ঘাতিক একটা গল্প বলতে হবে। সেবারের মত মানে স্বাধীনতার দিনের সেই গল্পের মত। বায়না করার সঙ্গে সঙ্গে কিছু প্রেরণাও যোগাতে চেষ্টা করেছে সে, বলেছে, তোমার গল্প আমি একা শুনি ভাবো নাকি, মা আর জেঠুও খুব মন দিয়ে শোনে। আমি খুব ভালো করে লক্ষ্য করেছি, বুঝলে ?

জেঠু শোনে বটে কিন্তু তার উল্লেখ গৌরবে। আসলে মায়ের আগ্রহের দিকটা বিবেচনা করেই সিতুর রাতের লোভ ছেড়ে সকালে গল্প শোনার বায়না। স্বাধীনতার দিন সকালে সেই রাণী আর নটি ফাঁসির আসামীর গল্প শুনতে শুনতে মায়ের মুখখানা যা হয়েছিল সিতু ভোলেনি। মা যেন দম বন্ধ করে শুনছিল, মুখ কিরকম লাল হয়েছিল, আর চোখ দিয়ে মুখ দিয়ে যেন আলো ঠিকরে পড়ছিল। কি ভালো যে লাগছিল মাকে সেদিন শুধু সিতুই জানে। গল্প শোনার ঝোঁক তো আছেই, ভিতরে ভিতরে সিতুর আবারও মায়ের সেই মুখ দেখার বাসনা।

কিন্তু চায়ের টেবিলে বসে সিতু সরবে তাগিদ দিতে পারছিল না ছোট দাদুকে। কারণ, তার প্রথমবারের তাগিদ কানে যেতে ওই মা-ই চাপা ধমকের সুরে বলেছে, সকালে বিরক্ত করতে হবে না, খেয়ে-দেয়ে বই নিয়ে বোস্‌গে যা।

এ-সময়ে সিতুর ভয়টা মায়ের জন্যে ততো না, জেঠুর জন্যে যত। ঘাড়ে হাত দিয়ে তার ঘরের দিকে রওনা হলেই হল। তাকে কাগজ পড়ায় নিবিষ্ট দেখে পাছে তন্ময়তা ভাঙে, সেই আশঙ্কায় আজ যে স্কুল ছুটি সেই প্রতিবাদ করতেও ভরসা পেল না। তাই হাবভাবে আর এক-একবার বাকি দুজনের অলক্ষ্যে ছোট দাদুকে ঠেলা মেরে গল্পের দিকে টানতে চেষ্টা করছিল। আর ছোট দাদুও দুষ্টুমি করে চোখ পাকিয়ে ইশারায় একবার মাকে দেখাচ্ছে, একবার জেঠুকে—অর্থাৎ আবার ঠেলা-ঠেলি করলে তাদের বলে দেবে।

মুখের কাছ থেকে কাগজ সরিয়ে কালীনাথ হঠাৎ হেসে উঠলেন একটু, তারপর বললেন, রাস্তার কুকুরদের সব ডেকে সভা করে তাদের গলায় মালা দেওয়া উচিত।

কোন্ খবর প্রসঙ্গে এই মন্তব্য, পরক্ষণেই সেটা স্পষ্ট হল। খবর বেরিয়েছে, গতকাল বেশি রাতে কোন্ রাস্তা দিয়ে এক ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা পায়ে হেঁটে যাচ্ছিল। কোথা থেকে দুটো ভদ্র-চেহারার গুণ্ডা এসে ভদ্রলোকের ঘড়ি, টাকা আর মহিলার গায়ের গয়না ছিনিয়ে নেবার শুভেচ্ছায় ছোরা উঁচিয়ে দাঁড়াল। অর্থাৎ বাধা দিতে চেষ্টা করলে বা টুঁ-টা শব্দ করলে রক্ষা নেই। কিন্তু সব পণ্ড রাস্তার দুটো কুকুরের জন্য। পরোপকারের আশায় কোথায় যে ঘাপটি মেরে বসে ছিল, কেউ লক্ষ্য করেনি। বিকট ঘেউ ঘেউ শব্দ করে তীরের মত ছুটে এসে গুণ্ডা দুটোর পা কামড়ে ধরল তারা। আর তারপর আঁচড়ে কামড়ে একেবারে নাজেহাল করে ছাড়ল—সঙ্গে বিকট ঘেউ ঘেউ। প্রাণ ফিরে পেয়ে ভদ্রলোক আর মহিলাও চিৎকার চেঁচামেচি করে সাহায্য করল তাদের। কুকুর দুটোর কবল থেকে গুণ্ডা দুটো পালাবার অবকাশ পেল না—কুকুরের চিৎকারের সঙ্গে মানুষের চিৎকার যুক্ত হতেই আশপাশের বাড়ি থেকে লোকজন বেরিয়ে গুণ্ডা দুটোকে ধরে ফেলল।

ভালো লাগার মতই খবর বটে। গৌরবিমল শুনলেন, পট থেকে পেয়ালায় চা ঢালতে ঢালতে জ্যোতিরাণীও শুনলেন। আর সিতু হাঁ করে গিলল। জেঠু বলল বলেই খাঁটি খবর কি বানানো, বুঝছে না। একটু বাদে ছোট দাদুর উক্তি কানে আসতে নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল সে।

গৌরবিমল বললেন, আমি এক ভদ্রলোকের গল্প জানি একটানা চল্লিশ বছর ধরে যে কম করে চল্লিশ হাজার লোকের প্রাণ বাঁচিয়েছে আর কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি জলের হাত থেকে রক্ষা করেছে।

পথের কুকুরের সঙ্গে ভদ্রলোকের গল্প যুক্ত হওয়া খুব স্বাভাবিক নয়। কালীনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, কুকুর গোছের ভদ্রলোক?

না, ডল্‌ফিন্ গোছের বলতে পারিস।

সকালবেলায় গল্প শোনার বাসনা জ্যোতিরাণীর খুব ছিল না। এরপর সিতু বই নিয়ে আর কালীদা কাজ নিয়ে বসলে মামাশ্বশুরকে চিঠি লেখার কারণটা সবিস্তারে ব্যক্ত করবেন ভাবছিলেন। আর এক-একবার ভাবছিলেন, মিত্রাদিকে টেলিফোন করে বীথিকে নিয়ে আসতে বলবেন কিনা। স্বচক্ষে ওই পন্নার শোক দেখলে আর সব শুনলে জ্যোতিরাণীর এই খেয়াল কেন সেটা বুক দিয়ে উপলব্ধি করতে পারবেন। গতকাল মামাশ্বশুর খেয়ালই বলেছিলেন মনে আছে। কিন্তু

কুকুর থেকে হঠাৎ ডল্‌ফিন্‌ গোছের ভদ্রলোকের কম করে চল্লিশ হাজার লোকের প্রাণ বাঁচানো আর কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি রক্ষার কথায় কৌতুককর বা চমকপ্রদ কিছু শুনবেন মনে হল তাঁরও। কারণ মামাশ্বশুরের গল্পের রীতি ভালই জানেন, বানিয়ে কিছু বলেন না তিনি।

কিন্তু ডল্‌ফিন্‌ জাতীয় ভদ্রলোক কি ব্যাপার বোঝা গেল না। ডল্‌ফিন্‌ শুশুক জাতীয় সমুদ্রের জীব। নদীতেও দুই-একটা ছটকে আসে।

কালীনাথের মুখেও কৌতূহল দেখা গেল। ডল্‌ফিন্‌ কি সিতু বোঝেনি, কিন্তু সেটা প্রকাশের ইচ্ছে নেই, ছোট দাদুকে গল্পে টানার আগ্রহই প্রবল।—বলো না, ভদ্রলোক কি করেছিল ?

দাঁড়া, ভদ্রলোকের নামটা মনে করি আগে। চিন্তা করার আগেই মনে পড়ে গেল।—নাম হল পেলোরাস্‌ জ্যাক্‌—পেলোরাস্‌ জ্যাক্‌, দি পে-লেস্‌ পাইলট। বুঝলি কিছু ? ভদ্রলোকের নাম পেলোরাস্‌ জ্যাক্‌, একটি পয়সাও না নিয়ে একটানা চল্লিশ বছর বিনা বেতনে যে সমুদ্রের ঝড়ে দুর্যোগে জল সাঁতরে কাণ্ডারীর কাজ করে গেছে, শ'য়ে শ'য়ে জাহাজ রক্ষা করেছে আর হাজার হাজার প্রাণ বাঁচিয়েছে—ওই রাস্তার কুকুর দুটোর মতই অবস্থা, কেউ তার মনিব নয়, কেউ তাকে কাজের ভার দেয়নি,—নিজেই নিজেকে পাইলটের কাজে বসিয়েছে। টানা চল্লিশ বছরের মধ্যে মাত্র দু সপ্তাহ সে কামাই করেছিল, কেউ তাকে এক দিনের জন্যেও বেতন নিয়ে সাধেনি, পেলোরাস্‌ জ্যাকও কোনদিন কারো কাছ থেকে কিছু আশা করেনি। বিলেতের ওয়েলিংটনে নাবিকেরা ঘটা করে তার স্মৃতিস্তম্ভ বানিয়েছে, গেলে দেখবি।

ধেৎ। কি-চ্ছু বুঝতে পারছি না। সিতু অসহিষ্ণু, জাহাজের পাইলট জলে সাঁতরাবে কেন ? আর কেউ চাকরি না দিলে সে চাকরি করবে কি করে ? মাইনে না পেলে চল্লিশ বছর ধরে খাবে কি ?

বুঝতে জ্যোতিরাণী বা কালীনাথও পারেন নি। কাহিনীর ভণিতাটুকুই শুধু অদ্ভুত লাগছে তাঁদের।

মুখ টিপে হাসছেন গৌরবিমল।—তুই একটা গাধা, পেলোরাস্‌ জ্যাক্‌ হল একটা পর্‌পয়েজ্‌, যাকে বলে শুশুক—শুশুক দেখেছিস ? সেখানকার নাবিকেরা ওই নাম দিয়েছিল।

সিতু ভ্যাবাচাকা। শুশুক গঙ্গায় দুই-একটা দেখেছে বইকি।—ওই গোল হয়ে যেগুলো ডিগবাজী খায় ?

তোর মত ফুর্তি হলে ডিগবাজী খায়, নইলে গোল নয় একটুও, দিব্বি মোটা-

মোটা আর বিরাট লম্বা।

…মামাশ্বশুরের মুখে শোনা এমন অবিশ্বাস্য বিচিত্র গল্পটাও জ্যোতিরাণী জীবনে কখনো ভুলবেন না, কারণ, গল্পের শেষে স্তব্ধ বিস্ময়ে নিজের অগোচরে হঠাৎ ছেলের মুখের দিকে চেয়ে কি যে আশ্বাসের সম্বল পেয়েছিলেন, সে-শুধু তিনিই জানেন। বুকের ভিতরটা উথলে ওঠার মতই গল্প বটে, শুধু তিনি বা সিতু নয়, কালীদাও হাঁ করে শুনেছেন পে-লেস্ পাইলট পেলোরাস্ জ্যাকের গল্প।

…১৮৭১ সালের এক সকাল সেটা। বোস্টন থেকে সিড্‌নি যাচ্ছে মাল আর যন্ত্রপাতি বোঝাই এক জাহাজ—নাম ব্রিগুল্। সকাল থেকেই ঝড়ের লক্ষণ। সকলেরই শুকনো মুখ। জাহাজ ঢুকেছে সেই ভয়াবহ ফ্রেঞ্চ-পাস্এ। এই ফ্রেঞ্চ-পাসের নামেই ভয়ে বুকের ভিতরটা গুড়গুড় করে না এমন নাবিক নেই। শান্ত আকাশ আর শান্ত সমুদ্রেও এই ফ্রেঞ্চ-পাসে যে কত জাহাজ ডুবেছে আর কত শত প্রাণ গেছে ঠিক নেই। এই বিশাল ফ্রেঞ্চ-পাস্ শুরু হয়েছে পেলেরাস সাউণ্ড থেকে, শেষ হয়েছে টাস্মান বে-তে এসে। এই লম্বা রাস্তা পাড়ি না দেওয়া পর্যন্ত সর্বক্ষণ সংকট সর্বক্ষণ জীবন-সংশয়। সেখানকার বিশ্বাসঘাতক জলের স্রোত কোন জাহাজ কোথায় নিয়ে গিয়ে ডোবাবে ঠিক নেই, সেখানকার জলের তলার কোন্ লুকোনো পাহাড়ে ধাক্কা লেগে কোন্ জাহাজটা যে খানখান হয়ে যাবে তারও ঠিক নেই। তার ওপর এই ফ্রেঞ্চ-পাসএ ঢুকে পড়ার পর দুর্যোগ এলে জাহাজ বাঁচানো বা প্রাণ বাঁচানো তো এক আশ্চর্য ব্যাপার।

জাহাজ চলেছে। দিনের আর সমুদ্রের অবস্থা দেখে নাবিকেরা বিষণ্ণ, ক্যাপ্টেন চিন্তিত। হঠাৎ নাবিকেরা দেখে জাহাজের সামনেই বিশাল একটা শুশুক লাফিয়ে উঠল। ঝকঝকে তকতকে গাঢ় নীল রঙ। এত বড় যে নাবিকেরা প্রথম ভাবল তিমির বাচ্চা হবে। জাহাজের ঠিক আগে আগে তরতর করে সাঁতরে চলল সে, ফুর্তিতে ডিগবাজী খাচ্ছে এক-একবার। এমনভাবে চলেছে যেন জাহাজটা তার বন্ধু, অনেকদিন বাদে বন্ধুর দেখা পেয়েই আনন্দ যেন ধরে না তার।

নাবিকেরা কেউ কেউ ধারালো হারপুন দিয়ে ওটাকে খতম করে জাহাজে তুলতে চাইলে। তিমি শিকারের জন্য হারপুন জাহাজে থাকেই। কিন্তু ক্যাপ্টেনের বউ ভয়ানক আপত্তি করলে, আ-হা, মেরো না বাপু, ওটাকে কেউ মেরো না তোমরা।

আশ্চর্য, ওটা সঙ্গে চলল তো চললই। এদিকে কুয়াশা, দুর্যোগ—দূরের কিছুই দেখা যায় না। নিরুপায় ক্যাপ্টেনের নির্দেশে জাহাজ তখন ওই জলের জীবটাকেই অনুসরণ করে চলেছে। সে যেখান দিয়ে যাচ্ছে আশা করা যায় সেখানকার অজ্ঞাত

স্রোত বিপদের কারণ হবে না, আর আশা করা যায় সে-পথে জলের নীচে লুকনো পাহাড়ও থাকবে না। জাহাজ চলেছে—সামনের ওই প্রাণীটা তার কাণ্ডারী।

ফ্রেঞ্চ-পাস নির্বিঘ্নে পার! নাবিকেরা সব আনন্দে আত্মহারা। কিন্তু তাদের বন্ধু? বন্ধু গেল কোথায়? দেখা গেল বন্ধু ফিরে চলেছে।

সেই শুরু। এরপর পেলোরাস সাউণ্ডএর কাছে কোনো জাহাজ এলেই অব্যর্থ সাক্ষাৎ মিলবে তার। জলের ওপর থেকে বারকয়েক লাফিয়ে উঠে জাহাজটাকে অভ্যর্থনা জানাবে সে। তারপর হেসে খেলে নির্বিঘ্নে পার করে দেবে সেই ভয়াবহ ফ্রেঞ্চ-পাস। কোনো একটা জাহাজকে সে অবহেলায় ছেড়ে দেবে না, সঙ্গশূন্য করবে না। একেবারে ফ্রেঞ্চ-পাসের শেষে এসে তবে ফিরবে।

বিপদের শুরু পেলোরাস সাউণ্ডের মুখেই বাস করে প্রাণীটা, তাই নাবিকেরা তার নাম দিল পেলোরাস্ জ্যাক্। দেখতে দেখতে তামাম দুনিয়ার নাবিকের কাছে ছড়িয়ে পড়ল পেলোরাস জ্যাকের নাম। ফ্রেঞ্চ-পাস এর ভয় কেটে গেল, সঙ্কট কেটে গেল। জাহাজের মালিকেরা ফ্রেঞ্চ-পাসএর যাত্রাকে অনিশ্চিত যাত্রা ভাবতে ভুলে গেল। রোজ জাহাজ চলতে লাগল। পেলোরাস্ সাউণ্ডের মুখেই প্রতিদিন প্রতিটি জাহাজের জন্য অপেক্ষা করছে বন্ধু পেলোরাস্ জ্যাক্—ভাবনা কি! জাহাজ পেলোরাস সাউণ্ডের মুখে এলেই প্রতিটি নাবিক, ক্যাপ্তেন, সকলে সমুদ্রের দিকে ঝুঁকবে, রেলিংএ হুমড়ি খেয়ে পড়বে।

পেলোরাস জ্যাক্! পেলোরাস জ্যাক্! পেলোরাস জ্যাক্!

ওই যে! ওই যে—পেলোরাস জ্যাক!

জলের ওপর বারকয়েক মস্ত মস্ত ডিগবাজী খেয়ে দেখা দেবে সাড়া দেবে অভ্যর্থনা জানাবে পেলোরাস জ্যাক্। শত মানুষের চিৎকারে আর উল্লাসে জাহাজ যেন ফেটে যাবে। তারপর নিশ্চিন্ত। সব দায়িত্ব এখন পেলোরাস জ্যাকের। সে যে পথে যায় সেই পথে চলো! পরম নিশ্চিন্তে চলো। বিপদ গোটাগুটি পার করে দিয়ে তবে ফিরবে পেলোরাস জ্যাক্। নাবিকেরা, ক্যাপ্তেন সকলে সমস্বরে আবার বিদায় সম্ভাষণ জানাবে তাকে, পেলোরাস জ্যাক্! পেলোরাস জ্যাক্!

পেলোরাস জ্যাক্ ফিরে তাকাবে না, সম্ভাষণের জবাবে বারকয়েক শুধু ডিগবাজী খেয়ে মনের আনন্দে ফিরে যাবে যেখান থেকে তার ডিউটি শুরু সেইখানে।

১৮৭১ থেকে ১৯০২ অবধি অর্থাৎ একটানা প্রথম একত্রিশ বছরের মধ্যে প্রচণ্ড ঝড়ে দুর্যোগেও একটি জাহাজ ফ্রেঞ্চ-পাসএর মধ্যে তলিয়ে গেল না, একটি প্রাণও নষ্ট হল না। কারণ ভালো সময় হোক আর মন্দ সময় হোক, ওই একত্রিশ বছরে একটি

জাহাজকেও পেলোরাস জ্যাকের সঙ্গ বা নিশানা বঞ্চিত হয়ে পার হতে হয়নি।

তারপর এলো ১৯০৩ সাল আর ১৯০৩ সালের সেই দুর্ভাগা পেঙ্গুইন জাহাজ। সকলে নিশ্চিন্ত। পেলোরাস জ্যাক্ পাইলট, সে-ই জাহাজ নিয়ে চলেছে ফ্রেঞ্চ-পাসএর ভিতর দিয়ে।

জাহাজে ছিল এক মাতাল যাত্রী। সকালেই আচ্ছা করে মদ খেয়েছে। তারপর দেখেছে জীবটা চলেছে জাহাজের পাশে পাশে। কি দুর্মতি হল তার। পিস্তল বার করে দিলে গুলি চালিয়ে।

জাহাজের নাবিকেরা চমকে লাফিয়ে উঠল। চমকে লাফিয়ে উঠল পেলোরাস জ্যাকও। কিন্তু এটা তার আনন্দে লাফিয়ে ওঠা নয়, রক্তাক্ত যাতনায়। তারপরেই ডুব দিল পেলোরাস জ্যাক।

আর্তনাদ করতে করতে নাবিকেরা ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই মাতাল যাত্রিটির ওপর। তাকে খুন করবে, খুন তাকে করবেই তারা। তাদের সেই জিঘাংসু রোষ থেকে তাকে রক্ষা করা যাত্রীদের আর ক্যাপ্তেনের কাছে এক প্রাণান্তকর ব্যাপার। লোকটা প্রাণে বাঁচল কোনরকমে।

একত্রিশ বছর বাদে পর পর দু সপ্তাহের জন্য দেখা গেল না পেলোরাস জ্যাক্‌কে।

জাহাজ পেলোরাস সাউণ্ডের কাছে এলেই নাবিকেরা ঝুঁকে পড়ে, ক্যাপ্তেন ঝুঁকে পড়ে—যাত্রীরাও।

পেলোরাস জ্যাক্! পেলোরাস জ্যাক্!

দু সপ্তাহ পর্যন্ত কেবল ডাকাডাকি সার। পেলোরাস সাউণ্ডের মুখে জাহাজ দেখে বা ডাক শুনে জলের তলা থেকে কেউ লাফিয়ে উঠল না, কেউ অভ্যর্থনা জানালো না। সকলে ধরে নিল পেলোরাস জ্যাক্ মাতাল যাত্রীর গুলি খেয়ে মরে গেছে। নিউজিল্যাণ্ডের সমুদ্রে শোকের ছায়া নামল।

গল্পের এই জায়গায় এসে অপ্রত্যাশিত ছেদ পড়ল একটু। দোরগোড়ায় শিবেশ্বর এসে দাঁড়িয়েছেন। তিন জোড়া উদ্‌গ্রীব চোখ মামুর মুখখানা ছেঁকে ধরে আছে দেখে হঠাৎ অবাকই হয়েছেন তিনি। গৌরবিমলই প্রথম দেখেছেন তাঁকে। হেসে বলেছেন, আয়, সিতু গল্প শুনছে।

পায়ে পায়ে শিবেশ্বর চায়ের টেবিলে এসে বসলেন। এ-রকম সচরাচর হয় না। মনিবের কখন ঘুম ভাঙল, মুখ-হাত ধোয়া হল কিনা, সে-সম্বন্ধে সদাই আগে সজাগ থাকত। ঠিক সময়ে নিজের হাতে সে চায়ের পট আর সকালের খাবার ঘরে পৌঁছে দিত। এ দায়িত্বটা এখন ভোলার। কিন্তু মুখ-হাত ধোয়া হতে মনিবকে ধীরেসুস্থে

খাবার ঘরের দিকে এগোতে দেখে সে কি করবে ভেবে পায়নি।

এই ব্যতিক্রমটুকু একেবারে লক্ষ্য না করার মত নয়। কিন্তু গল্প যে পর্যায়ে এসেছে, লক্ষ্য করার বিশেষ মন খুব সচেতন নয় তখন। জ্যোতিরাণী না, এমন কি কালীদারও না। সিতুর তো নয়ই। শোনার আশায় সে ধৈর্য রাখতে পারছে না। জ্যোতিরাণী ধরে নিলেন, মামাশ্বশুর আর কালীদার সামনে কিছু আলোচনার উদ্দেশ্য আছে। আর খুব সম্ভব সেটা যে-প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার ব্যাপারে বাধা দেওয়া গেল না, তারই প্রসঙ্গে। কারণ, কি হতে যাচ্ছে না যাচ্ছে তা দেখে শুনে বুঝে নেবার সঙ্কল্প সেই রাতে কালীদার সামনেই শুনিয়ে রাখা হয়েছিল। জ্যোতিরাণী নিজেই এগিয়ে এসে সামনে খাবার রাখলেন, চা দিলেন।

খাবার পড়ে থাকল। সকালের খাবার সাধারণত পড়েই থাকে। চায়ের পেয়ালা টেনে নিয়ে শিবেশ্বর বললেন, তোমার গল্প শীতের পাহাড়ের ডগার বরফের মত জমেছে, শেষ করে ফেল।

গল্প বলার বা গল্প শোনার নিবিষ্টতা হোঁচট খেয়ে আবার সেখানেই ফিরবে সে আশা কম। কিন্তু প্রাণের স্পর্শের রীতি ভিন্ন। ওটা হিসেব করে তাপ যোগায় না। কান সজাগ রেখে কাগজে চোখ রেখেছেন কালীনাথ, আর কয়েক নিমেষের মধ্যে জ্যোতিরাণীও প্রায় আগের মতই তন্ময় হয়েছেন।

পেলোরাস্ জ্যাক্ মরেনি।

টানা একত্রিশ বছরের মধ্যে ঠিক দুটি সপ্তাহ ছুটি নিয়েছিল। গুলির ঘা সারাবার জন্য হয়ত ছুটির দরকার হয়েছিল। আর হয়ত সেই সঙ্গে কিছু অভিমানও জমা হয়েছিল।

পেলোরাস্ জ্যাক্! পেলোরাস জ্যাক্! পেলোরাস সাউণ্ডের মুখে ওই যে লাফিয়ে লাফিয়ে ডিগবাজী খাচ্ছে পেলোরাস জ্যাক্, কদিন আসতে পারেনি বলে দ্বিগুণ উৎসাহে জাহাজকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। আনন্দে দিশেহারা নাবিকেরা পারলে জাহাজ থেকে লাফিয়ে পড়ে তাকে জড়িয়ে ধরে। সমুদ্রের আকাশে দু সপ্তাহ ধরে যে অনাগত দুর্যোগ আর সঙ্কট জমাট বেঁধে উঠেছিল সেটা নিমেষে সরে গেল। নিঃশঙ্ক নীল আকাশ হেসে উঠল, নীল সমুদ্র হেসে উঠল। বেতনশূন্য পাইলট পেলোরাস্ জ্যাক্ জাহাজ নিয়ে চলল আবার।

আবার সাড়া পড়ে গেল। ভয় নেই, একত্রিশ বছরের উপোসী ফ্রেঞ্চ-পাস্ আবার হাঁ করবে না, জাহাজ গিলবে না, মানুষ গিলবে না। তার যম এসে গেছে। পেলোরাস জ্যাক্ আবার এসে কাজে লেগেছে।

ওয়েলিংটন কাউন্সিল থেকে অর্ডিনান্স জারি হয়ে গেল, পেলোরাস জ্যাকের

যে এতটুকু ক্ষতি করবে তার কঠিন শাস্তি হবে। কিন্তু আইন মান্য করা হচ্ছে কিনা সেটা কে দেখবে? জাহাজের নাবিকরাই দেখবে, কারো অসৎ উদ্দেশ্য দেখলে তারাই প্রতিকার করবে। তারা সানন্দে রাজি। এ-রকম বন্ধু তাদের আর কে আছে?

কিন্তু আশ্চর্য! কিছুদিনের মধ্যে আবার এলো সেই পেঙ্গুইন জাহাজ। যে জাহাজের মাতাল যাত্রী গুলি করেছিল পেলোরাস জ্যাক্‌কে। পেলোরাস সাউণ্ডের মুখে নাবিকেরা সব ঝুঁকে পড়ল, তারস্বরে ডাকতে লাগল, পেলোরাস জ্যাক্! পেলোরাস জ্যাক!

পেলোরাস জ্যাক্ অদৃশ্য। নিপাত্তা। ওই জাহাজটাকে সে ভোলেনি, ওই জাহাজ থেকে মারাত্মক যন্ত্রণার মত যে পুরস্কার তার দেহে বিঁধেছে, তাকে সে ক্ষমা করেনি। পেঙ্গুইন ফ্রেঞ্চ-পাস পাড়ি দিয়েছে—নিঃসঙ্গ, কাণ্ডারীশূন্য।

একবার নয়, প্রতিবার। ভয়াবহ ফ্রেঞ্চ-পাস পাড়ি দেবার সময় শুধু ওই একটি জাহাজকেই পরিত্যাগ করেছে পেলোরাস্ জ্যাক্। আর সমস্ত জাহাজের সে বন্ধু, কাণ্ডারী।

পেঙ্গুইনের আকাল পড়ল। নাবিক পাওয়া ভার। তারা ওই জাহাজে চাকরি করতে চায় না, পেঙ্গুইনের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে চায় না। বলে ওটা অপয়া, অভিশপ্ত।

অভিশপ্তই বটে। ১৯০৯ সালে অর্থাৎ দীর্ঘ আটত্রিশ বছরের মধ্যে ফ্রেঞ্চ-পাসের ক্ষুধা মাত্র একবারের জন্য মিটল। কাণ্ডারীশূন্য পেঙ্গুইনকে নিঃশেষে গ্রাস করল সে। কত জীবন গেল আর সম্পত্তি গেল ঠিক নেই।

কিন্তু ওই একটিই। বাকি সব জাহাজের সঙ্গে পেলোরাস জ্যাক্ আছে।

এমনি কেটে গেল আরো তিন বছর। এলো ১৯১২ সালের এপ্রিল মাস। পেলোরাস জ্যাকের দিবা-রাত্র চাকরির চল্লিশ বছর পুরিয়েছে।

হঠাৎ পেলোরাস জ্যাক্ অদৃশ্য একদিন। চল্লিশ বছর আগে যেমন হঠাৎ একদিন তার দেখা মিলেছিল তেমনি হঠাৎ অদৃশ্য।

পেলোরাস জ্যাক্! পেলোরাস জ্যাক্! পেলোরাস জ্যাক্!

বুক-ফাটা যাতনায় আর্ত হাহাকার করে অবিশ্রান্ত ডাকতে থাকে নাবিকেরা তাদের বন্ধুকে, পেলোরাস জ্যাক্! পেলোরাস জ্যাক্!

কেউ আর লাফিয়ে ওঠে না, কেউ আর ডিগবাজী খেয়ে অভ্যর্থনা জানায় না। তবু ডাকের বিরাম নেই তাদের। সব জাহাজের সব নাবিক ঝুঁকে পড়ে পেলোরাস সাউণ্ডের মুখে। কাণ্ডারীশূন্য হয়েছে তারা বিশ্বাস করতে চায় না। তাই ডাকে,

বন্ধু পেলোরাস জ্যাক্! পেলোরাস জ্যাক্!

সব শূন্য। বিরাট সমুদ্রটা শূন্য। সামনে ভয়াল কুটিল ফ্রেঞ্চ-পাস।

গল্প যে শেষ হয়েছে জ্যোতিরাণীর হুঁশ নেই। নিজের অজ্ঞাতে মামাশ্বশুরের দিকেই চেয়েছিলেন তিনি। কালীদার কথায় সচেতন হলেন। ছেলের উদ্দেশে কালীদা হঠাৎ বলে উঠেছেন, ও কি রে?

জ্যোতিরাণী দেখলেন, সিতু উসখুস করছে কেমন আর বোকার মত হেসে মুখটা সকলের দৃষ্টি থেকে আড়াল করতে চাইছে। কিন্তু সেটা সম্ভব হল না। কালীজেঠুর কথায় ছোট দাদু এমন কি তার বাবার দৃষ্টিও তার দিকেই। ফলে বোকার মত আরো বেশি হাসতে চেষ্টা করলে সে। দু চোখে জল ঠেলে বেরিয়ে আসছেই তবু। এক ঝটকা মেরে উঠে ছুটে পালিয়েই গেল।

কালীদা আর মামাশ্বশুর হাসছেন মৃদু মৃদু। শিবেশ্বরের গম্ভীর মুখেও কৌতুকের আভাস। কিন্তু ছেলের দিকে চেয়ে মুহূর্তের জন্য জ্যোতিরাণী কি যে দেখলেন আর বুকের তলায় কোন্ আশ্বাসের স্পর্শ পেলেন—তিনিই জানেন।

ছেলের মুখের এই হাসিতে নিখাদ খানিকটা সোনা গলতে দেখলেন তিনি। আর তার জল-ভরা দু চোখে দুর্লভ দুটো মুক্তো দেখলেন।

॥ ছাব্বিশ ॥

হঠাৎ ধাক্কা খেলে যেভাবে সুখ-তন্দ্রা ছোটে, শামু এসে খবরটা দেওয়া মাত্র জ্যোতিরাণীর কয়েক মুহূর্তের আবেশ সেই গোছের একটা ধাক্কা খেল।

কালীনাথ আবার কাগজ টেনে নিয়েছিলেন, শিবেশ্বর দ্বিতীয় পেয়ালা চায়ে মন দিয়েছিলেন। গৌরবিমল কালীনাথের হাতে-ধরা কাগজটার পিছন দিকে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলেন। শিবেশ্বরের পেয়ালা খালি হলে চায়ের আসর ভাঙবে।

জ্যোতিরাণী ভাবছিলেন শুধু তাঁর পরিকল্পনার রূপ দেবার জন্য মামাশ্বশুরকে প্রয়োজন না, সিতুর রূপ বদলাবার জন্যও এই একজনকেই দরকার। তাঁকে ধরে রাখতে পারলে অনেক ভাবনা ঘোচে।

শামু এসে সংবাদ দিল, নীচে বিভাসবাবু এসেছেন। ঘরের চৌকাঠের সামনে দাঁড়িয়ে জ্যোতিরাণীর দিকে চেয়ে তাঁকেই খবরটা দিয়ে গেল।

কালীদা কাগজের থেকে মুখ সরালেন না, কেউ কিছু বলে গেল মনে হতে গৌরবিমল শুধু ফিরে তাকালেন। পর পর গোটাকয়েক চুমুক দিয়ে পেয়ালাটা

আধা-আধি খালি করে শিবেশ্বর মুখ তুললেন।

স্ত্রীর মুখের চকিত বিড়ম্বনা আর বিরক্তি উপভোগ্য। কিন্তু মুখে প্রকাশ পেল না। মোলায়েম করে বললেন, তুমি যাও, আমার আর দরকার নেই। অদূরে প্রতীক্ষারত ভোলার দিকে ফিরলেন, নীচে চা-টা কি দিবি দিয়ে আয়—।

ঠাণ্ডা মুখে জ্যোতিরাণী ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। ওই অমায়িক উক্তি বা ভোলার প্রতি নির্দেশ বিদ্রূপের মতই কানে এসে লেগেছে। মামাশ্বশুর ভব্যতাই ভেবেছেন হয়ত, কিন্তু কালীদার তা ভাবার কথা নয়।

হঠাৎ এ-সময়ে এসে হাজির হলেন কেন জানেন না। সকালে কচিৎ কখনো আসেন। হয়ত দরকারী কাজেই এসেছেন। টেলিফোনে সেদিন দেখা হওয়া দরকার বলেও ছিলেন। পিছনে পাশের ঘরের মালিককে সেই মূর্তিতে এসে দাঁড়াতে দেখে আর কিছু শোনা হয়নি বা বলা হয়নি। পরে কথা বলবেন জানিয়ে টেলিফোন রেখে দিয়েছিলেন তিনি। এ-কদিনে ফোন করার কথা মনেও ছিল না। মনে থাকলেও করতেন না। কিন্তু যে-দরকারই থাক, জ্যোতিরাণী ভিতরে ভিতরে অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। সম্ভব হলে ওপরে চায়ের পাট চুকিয়ে ঘর থেকে সব বেরিয়ে আসার আগেই দু'কথায় ভদ্রলোককে বিদায় করে ফেরার ইচ্ছে তাঁর। শুধু ইচ্ছে নয়, এই গোছের একটা সঙ্কল্প নিয়েই নীচে নেমে এলেন তিনি।

বিভাস দত্ত বসেননি তখনো। সোফাসেটির মাঝের ফাঁকে দাঁড়িয়ে সিগারেট হাতে পিছন ফিরে রাস্তা দেখছেন।

কি আশ্চর্য, আপনি হঠাৎ এ সময়ে?

বিভাস দত্ত ফিরলেন। দুই-এক মুহূর্ত চেয়ে রইলেন চুপচাপ। তারপর হাতের সিগারেট রাস্তার দিকেই ছুঁড়ে ফেলে সামনের সোফাটায় পা ছড়িয়ে বসে পড়লেন। দাঁড়িয়ে থেকে জ্যোতিরাণী একটা প্রশ্নেরই অপেক্ষা করছেন। ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করবেন, অসময়ে এসে বিরক্ত করা হল কিনা বা তিনি ব্যস্ত ছিলেন কিনা। ব্যস্ততার জরুরী দায়টা মামাশ্বশুরের ওপর চাপিয়ে ফেরার জন্য প্রস্তুত বলেই সাক্ষাৎমাত্রে জ্যোতিরাণী শমীর কথাও জিজ্ঞাসা করেননি।

বসুন। বিভাস দত্তর মুখে পাল্টা চাপা বিস্ময় একটু।—এ সময়ে আমি কেন ভেবে না পেয়ে নিজেই তো ঘাবড়ে আছি।...আপনার উঁচু মহলের ভদ্রলোকটির হঠাৎ এই অধমকে দরকার হয়ে পড়ল কেন, জোর তলব একেবারে?

জ্যোতিরাণীর সঙ্কল্প ওলট-পালট হয়ে গেল। কি শুনলেন বোধগম্য নয় যেন। বিমূঢ় মুখে চেয়ে রইলেন খানিক।—আপনাকে তলব...কে?

অবাক জ্যোতিরাণী যেমন বিভাস দত্তও তেমনি। তবু মুখের সহজ অভিব্যক্তি-

টুকুই বজায় রাখতে চেষ্টা করলেন ভদ্রলোক।—আজ এ সময়ে আসার জন্য শিবেশ্বর কাল টেলিফোনে বিশেষ করে বলে রেখেছিল, দরকারী কি পরামর্শ আছে নাকি, আপনি জানেন না?

আচমকা প্রতিক্রিয়া এত দ্রুত সামলে নিতে শেখেননি জ্যোতিরাণী যাতে করে বিভাস দত্তর চোখে কিছু পড়বে না। বাইরের কারো উপস্থিতিতে এর পরেও হয়ত এতটা স্তব্ধ হতে চাননি। কিন্তু তিনি চান আর না চান, সমস্ত মুখ ছেড়ে দুই কানে পর্যন্ত লালের আভা ছড়িয়েছে। বসলেন। মাথাও নাড়লেন, জানেন না। অস্ফুটস্বরে বললেন, আপনি এসেছেন খবর পেয়েছেন, এক্ষুনি নামবেন তাহলে।

সামলে নিতে পারলে এই কথা কটাই অন্য সুরে বলা যেতে পারত। এর থেকেও হালকা জবাব কিছু দেওয়া যেতে পারত। বলতে পারতেন, উঁচু মহলের ভদ্রলোকদের তেমনি উঁচু দরের লোকের সঙ্গেই পরামর্শের দরকার হয়, তিনি অতশত খবর রাখেন না। কিন্তু জ্যোতিরাণী কিছুই পারেননি। পারেননি অন্য কারণে। তাঁর অগোচরে টেলিফোনে আসতে বলা হয়েছে বা দরকারী পরামর্শের তাগিদে ডাকা হয়েছে সেই কারণে নয়।…শামু খবরটা দেবার পরেও চুপ করে থেকে শুধু মজাই দেখা হয়েছে। ভদ্রলোককে আসতে বলা হয়েছে সেটা তখনো চাপা। সকলের সামনে আর এই ভদ্রলোকের সামনেও এভাবে জব্দ করা আর মজা দেখার অকরুণ প্রবৃত্তিটাই জ্যোতিরাণীকে এত স্তব্ধ করেছে।

আর কিছু বলা বা ভাবার আগে ভোলা চা-প্রাতরাশ নিয়ে হাজির। বিভাস দত্ত চায়ের পেয়ালাটাই তুলে নিলেন শুধু। চা অথবা সিগারেট কিছু একটা দরকার। শিবেশ্বর চাটুজ্যের টেলিফোন পেয়ে অবাক হয়েছিলেন। এখন আরো অবাক। ভোলা খাবারের ট্রে হাতে চলে যাচ্ছিল, শিবেশ্বর ঘরে ঢুকলেন। পরিতুষ্ট গাম্ভীর্য। —খেলে না কিছু?

বিভাস দত্ত হাল্‌কা জবাব দিলেন, তোমার টেলিফোন পেয়ে আপাতত খাবি খাচ্ছি।

তাঁর মুখোমুখি বসলেন তিনি। নির্লিপ্ত মন্তব্য কিছু করতেন হয়ত। ঘরে কালীনাথ আর গৌরবিমলের পদার্পণ ঘটল। জ্যোতিরাণী তক্ষুনি বুঝলেন তাঁদেরও ডাকা হয়েছে। নইলে এভাবে আসার কথা নয়, বিনা আহ্বানে এসে বসার কথা নয়। মামাশ্বশুরের স্বাভাবিক মুখ, কালীদার অতিরিক্ত গাম্ভীর্যে কৌতুক গোপনের প্রয়াস।

স্ত্রীর মূর্তিটি একবার দেখে নিয়ে খুব সাদাসিধেভাবে শিবেশ্বর বললেন, তোমার

ওই ব্যাপারে পরামর্শের জন্য বিভাসকে আমিই আসতে বলেছিলাম। মামু আছে কালীদা আছে, সকলে মিলে ঠিক করে ফেলা যাক—

জ্যোতিরাণীর ঠোঁটের ডগায় একটাই প্রশ্ন এঁটে বসতে চেয়েছিল। ডাকা :য় হয়েছে ভদ্রলোক আসার পরেও তাঁকে জানানো হল না কেন। কিন্তু থাক। মামাশ্বশুর আর এই ভদ্রলোকের সামনে কিছু বলতে বা শুনতেও রুচিতে বাধছে।

পেয়ালা রেখে সিগারেটের খোঁজে বিভাস দত্ত পকেটে হাত ঢোকালেন।— ঘাবড়ে যাচ্ছি, কি ব্যাপার?

—ব্যাপার গুরুচরণ। চতুস্পর্শ যোগ। কালীদার গাম্ভীর্যে অনুশাসনের সুর, আরামের শয্যায় শুয়ে শুধু বইয়েতেই আদর্শ ছড়াবে, কেমন? এবারে বাস্তব ফসল ফলাও, দেখি মুরোদ কত!

রসিকতা বিরক্তিকর, তবু জ্যোতিরাণী যতটা সম্ভব স্থির নির্লিপ্ত। তাঁর মনে হয়েছে, শুধু কালীদা মামাশ্বশুর আর বিভাস দত্ত নয়, সম্ভব হলে এই আসরে শোভাদারও ডাক পড়ত। রোগ একে একে এঁদের সকলকে নিয়ে বাসা বেঁধেছিল সেকথা সেদিন মুখের ওপরই বলেছিলেন তিনি। তারই জবাব এটা।

শিবেশ্বর গৌরবিমলের দিকে ফিরলেন, জ্যোতি কি করতে চায় শুনেছ তো?

ভালো করে শুনিনি, কালী বলছিল কি-সব।

তুমি জানো তো? প্রশ্ন বিভাস দত্তকে।

তিনি মাথা নাড়লেন, জানেন না।

অবিশ্বাস্য বিদ্রূপের দৃষ্টিটা তাঁর মুখের ওপর স্থির হবার আগেই জ্যোতিরাণী বললেন, উনি জানবেন কি করে, এক মিত্রাদির সঙ্গে ছাড়া এ ব্যাপারে আর কারো সঙ্গে আমার কোনো কথা হয়নি। আলোচনা করবে ঠিক করেছ যখন, সকলের আগে তাঁকে ডাকা উচিত ছিল। টেলিফোনে খবর পেলে এখনো চলে আসতে পারেন।

কুশনের কাঁধে মাথা রেখে কালীদা ঘরের ছাদে চোখ রাখলেন। মিত্রাদিকে ডাকার প্রস্তাবে শিবেশ্বরেরও কিছুমাত্র আগ্রহ দেখা গেল না। বললেন, অতক্ষণ সময় দিতে পারব না, তোমার কাছ থেকেই শুনে নেবে'খন।···ভালো করে কেউ কিছু জানে না, এদের বলে দাও কি করতে চাও, আমি নিজেও ঠিক জানি না।

খুব ঠাণ্ডা মুখে দু'কথায় বক্তব্য শেষ করলেন জ্যোতিরাণী। সার মর্ম, ঠাঁই নেই এমন গৃহস্থ মেয়েদের জন্য প্রতিষ্ঠান গড়া হবে একটা, আর নিজের পায়ে তারা যাতে দাঁড়াতে পারে সেই চেষ্টা আর সব-রকম ব্যবস্থা করতে হবে।

সব থেকে বেশি মন দিয়ে শিবেশ্বরই শুনলেন যেন। আর একটু বিস্তারিত

করে জানাবার সুরে গৌরবিমলের দিকে চেয়ে যোগ করলেন, এ জন্যে আমার দশ বিঘে জমির ওপর বড় একটা বাড়ি আর লাখ-তিনেক টাকা দরকার হয়েছে—তিন লক্ষই বলেছিলে, না ?

শেষেরটুকু কালীনাথের উদ্দেশে, এদিক থেকে জ্যোতিরাণী জবাব দিলেন, এখন এতেই হবে, পরে আরো দু-তিন লক্ষ লাগতে পারে।

শোনার পর ভিতরে ভিতরে শুধু বিভাস দত্তই একটু অস্বস্তি বোধ করলেন হয়ত। দশ বিঘে জমির বড় বাড়ি আর তিন লক্ষেরও ওপর দু-তিন লক্ষ টাকার অঙ্কের বাস্তব নিয়ে কখনো মাথা ঘামাননি। কিন্তু বললেন যিনি, শ'তিনেক টাকার ওপর আরো দু-তিনশ বেশি লাগার মত করেই বললেন যেন।

বেশ। লাগলেও টাকা তো তোমাকে কালীদা দান করেই রেখেছে। শিবেশ্বরের নিশ্চিন্ত মুখ।

আপত্তিকর! কালীনাথ সোজা হয়ে বসলেন, যেখানে হুকুম করা হয়েছে চিনির বলদ সেখানেই চিনির বস্তা পৌঁছে দিয়েছে।

গৌরবিমলই শুধু হাসছেন একটু একটু। শিবেশ্বর আলোচনায় এগোতে চান। —প্রতিষ্ঠানের তো আর নিজের হাত-পা নেই, ব্যবস্থা কি হচ্ছে ?

এবারের প্রশ্ন স্ত্রীর দিকে ফিরে, কিন্তু ওধার থেকে জবাব দিলেন কালীদা, আগে একটা ট্রাস্ট করে নিলে ভালো হয়, টাকা ট্রাস্ট ফাণ্ডে জমা করা যেতে পারে।

উত্তর কালীদা দিলেন বলেই শিবেশ্বর তুষ্ট নন খুব।—ট্রাস্ট-এ কে কে থাকছে ? চেক-এ কার সইয়ে টাকা উঠবে ?

বিভাস দত্ত নীরব শ্রোতা। গৌরবিমল পরামর্শ দিলেন, তোর আর জ্যোতির সইয়ে তোলার ব্যবস্থা করাই তো ভালো।

আমার সময় নেই। নেহাৎ উপার্জনের টাকা বলেই কি ব্যবস্থা হবে জেনে নিচ্ছি। কাজের কথা বলো—

গৌরবিমল চুপ। কাজের কথা কিছু মাথায় এলো না। মাথা কালীদাই বেশি ঘামাচ্ছেন ধরে নিয়ে শিবেশ্বর তাঁর দিকে ফিরলেন।—ট্রাস্ট-বোর্ড-এ কারা থাকবে, তুমি, মামু, বিভাস আর জ্যোতি ?

তিনজন বা পাঁচজন হলে ভালো হয়, আমাকে বাদ দিলে তিনজন হবে। আমি আগেই জ্যোতিরাণীর কাছ থেকে ছাড়পত্র নিয়ে নিয়েছি।

এবারে শিবেশ্বর বিস্মিত একটু, তার মানে ?

তার মানে আমি বাদ।

আর একজনও যদি নিজে থেকেই নিজেকে বাদ দিত জ্যোতিরাণী খুশি হতেন। সেইরকমই আশা করেছিলেন তিনি। বিভাস দত্ত। কিন্তু নীরব শ্রোতা আর দ্রষ্টার মতই বসে আছেন। বিরক্তি চেপে জ্যোতিরাণী বললেন, প্রতিষ্ঠানের আসল মানুষ মিত্রাদি, তিনি থাকবেন।

গম্ভীর দৃষ্টিটা এবারে তাঁর মুখের ওপর রাখলেন শিবেশ্বর।—চেক্এ টাকা তোলার ক্ষমতাও থাকবে তার ?

জ্যোতিরাণী এদিক ভেবে বলেননি। জবাব দিয়ে উঠতে পারলেন না।

আবার কালীনাথের দিকে ফিরলেন শিবেশ্বর।—তুমি বাদ কেন ?

অযোগ্য বলে।

মুখের দিকে চেয়ে থেকে কি বুঝতে চেষ্টা করলেন তিনিই জানেন। পরে একটু ভেবে মাথা নাড়লেন। তুমি না থাকলে হবে না, আমার মনে হয় চেক্ সই করার ভার তোমার আর মামুর ওপর থাকা উচিত।

কালীনাথ মাথাও নাড়লেন, স্পষ্ট করে জবাবও দিলেন, আমি না। ও ভার তাহলে জ্যোতি আর মামুর ওপরে থাক।

শিবেশ্বরের চোখে কিছু একটা ঘোরালো জিজ্ঞাসার ছায়া উঁকি দিয়ে গেল। কিন্তু তাঁর প্রথম প্রস্তাবে গৌরবিমল মনে মনে আঁতকে উঠেছিলেন প্রায়, কালীনাথের কথায় বিড়ম্বনার একশেষ যেন। দ্বিধা কাটিয়ে বললেন, এ-সবের মধ্যে আবার আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন ?

অসহিষ্ণুতা চাপতে চেষ্টা করেও গোটাগুটি পারা গেল না, জ্যোতিরাণী বললেন, সে-ভার তাহলে আমার ওপরই থাকুক, চেক্ আমিই কাটতে পারব।

সঙ্গে সঙ্গে গৌরবিমলের উদ্দেশে কালীনাথের চোখ গরম।—হল তো ? দিলে তো মেজাজখানা ঠিক করে !

মামাশ্বশুরের বিড়ম্বিত হাসিমুখ এক পলক দেখে নিয়ে জ্যোতিরাণী সোজা কালীদার দিকে তাকালেন। তিনি সহায় বলে উল্টে তাঁরই ওপর বেশি তেতে ওঠার দাবি যেন। বললেন, কোনো কিছুতে একেবারে থাকাই চলবে না আপনারই বা এ-রকম প্রতিজ্ঞা কেন ?

বিভাস দত্তর নির্বাক দৃষ্টি একজন ছেড়ে আর একজনের মুখের ওপর ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছে শুধু। কালীনাথ আকাশ থেকেই পড়লেন প্রায়, এ-রকম পাল্টা আক্রমণের অবিচার আশা করা যায় না যেন।—আমাকে বলছ ! সকলকেই সালিশ মানার অভিব্যক্তি, দেখলে কাণ্ড, আমি উপকার করতে গেলাম, আর উল্টে আমাকেই কিনা…

কাণ্ডর সমর্থনে এবারে গৌরবিমলও হাসিমুখে অনুযোগ করলেন, ঠিকই বলেছে। আমি তো ঠায় এখানেই থেকে যেতে পারব না, মাসের মধ্যে বড় জোর দশ-পনের দিন থাকতে পারি, তাই টাকা-পয়সার হাঙ্গামার মধ্যে যেতে চাই না। তুই এখানেই বসে আছিস, তোর আপত্তি কেন?

কালীনাথ তৎক্ষণাৎ তাঁর দিকে ফিরে দু হাত জোড় করলেন, অর্থাৎ পিছনে লাগার ফল হাতেনাতে পেয়েছেন, ক্ষমা-ঘেন্না করে এবারের মত তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হোক।

এ আসরে বিভাস দত্তকে ডেকে আনার মানসিক তুষ্টি যতটা উপভোগ্য হবে আশা করা গেছল তা যেন হল না। স্টেশনে তাঁকে তুলে দিতে গিয়ে কে এক বীথি ঘোষকে কুড়নোর ফলেই স্ত্রীটি আদর্শ নিয়ে মেতেছে আর বিভাস দত্ত তাতে উদ্দীপনার খোরাক যুগিয়েছে শিবেশ্বরের এই বিশ্বাসই বদ্ধমূল ছিল। কিন্তু লেখক বলেছে পরিকল্পনার খবর কিছুই রাখে না আর স্ত্রী জানিয়েছে এক মৈত্রেয়ী ছাড়া এ ব্যাপারে আর কারো সঙ্গে তার কথা হয়নি। দুজনার কারো উক্তিই এখনো নির্জলা সত্যি ভাবতে পারছেন না, তবু তাঁর বদ্ধ ধারণা কিছুটা ঢিলে হয়ে গেছে। বিভাস দত্তকে অনেকবারই লক্ষ্য করেছেন, তাঁর নির্বাক নিবিষ্টতায় চাপা উৎসাহেরও আঁচ পাচ্ছেন না। ফলে মাথাওয়ালা লোকের মতই উদ্দীপনার খোরাক যোগাবার ঝুঁকি তিনিই নিয়ে বসলেন।

মন্তব্যের সুরে বললেন, বাইরের ডোনারদের থেকেও চাঁদা-টাঁদা তোলার প্ল্যান আছে শুনেছি, পাঁচজনের টাকা নাড়াচাড়া করতে গেলেই অনেক হিসেব-নিকেশের ঝামেলা—চেক্ সইয়ের ব্যাপারটা একজনের হাতে থাকা ঠিক নয়।···জ্যোতির সঙ্গে এ দায়িত্বটা তাহলে বিভাসকেই দিতে হয়।

বেঁধে গঞ্জনা দেওয়ার থেকেও উদারতার চাবুক বরদাস্ত করা আরো কঠিন কি? সামনে মামাশ্বশুর, কালীদা, বিভাসবাবু—কিন্তু জ্যোতিরাণীর দু চোখ স্থির ওই মানুষটার মুখের ওপর। যে উক্তি মুখে এসেছিল, সামলে নিলেন। তিনি বলতে যাচ্ছিলেন, বাঁচা গেল, সেই ভালো।

কিন্তু প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার খুব অবকাশ কারো মেলেনি। কারণ, বিভাস দত্ত এতক্ষণে একটা বড়গোছের নাড়াচাড়া খেয়ে সচেতন হয়েছেন যেন। তিনি সভয়ে বলে উঠলেন, মাথা খারাপ নাকি! আমি সামান্য মানুষ, লিখে খাই, ওসব লাখ-বেলাখের মধ্যে আমি নেই—তোমাদের ওই ট্রাস্ট কমিটির থেকেও আমার নাম কেটে দাও, আমার দ্বারা যদি কিছু হয়, এমনিই হবে।

এতক্ষণে জ্যোতিরাণীর ভালো লাগল। খুব ভালো লাগল। বিকৃত তুষ্টির

লোভে এই আসরে তাঁকে ডাকার সমুচিত জবাব হয়েছে তা শুধু জ্যোতিরাণীই অনুভব করতে পারেন। আর কেউ না, জবাব যিনি দিলেন তিনিও না। বিভাস দত্তকে ছেড়ে জ্যোতিরাণীর দৃষ্টিটা আবার শিবেশ্বরের মুখের ওপরেই নিবিষ্ট হল। শুধু মামাশ্বশুর সামনে বসে না থাকলেই হয়ত উষ্মা চেপে এবারে তিনি রসিকতাই করতেন, চেক সইয়ের দায়িত্ব তাহলে তুমি আর আমিই নিই!

একটু পরে সমস্যা নিষ্পত্তি করার মত করেই বললেন, মামাবাবু মাসে দশ-পনের দিন এখানে থাকেন যদি তাতেই হবে। তাছাড়া সে-রকম দরকার পড়লে ডাকেও চেক সই করিয়ে আনা যেতে পারে।

খানিক আগের বিড়ম্বনা ভুলে কালীনাথ তক্ষুনি সায় দিলেন, আমারও তাই মত।

আর আপত্তি করা সম্ভব নয় বলেই গৌরবিমল আপত্তি করলেন না। সমস্যার দো-টানা ভাবটা একেবারে কাটিয়ে উঠতে পারলেন না তবু। একটু ভেবে শেষে চূড়ান্ত ফায়সালাই করলেন যেন।—ঠিক আছে। চেক সইয়ের ব্যাপারে আমার কালীর আর জ্যোতির তিনজনেরই অথরিটি থাক—যে-কোনো দুজনের সইয়ে টাকা উঠবে। এ ব্যবস্থা হলে হঠাৎ কোনো ঝামেলায় পড়তে হবে না, ডাকে চেক সই করে আনার জন্যেও বসে থাকতে হবে না। হাসিমুখে কালীনাথকে শাসালেন তারপর, তোতে আমাতে একত্র হয়ে কিছু গুছিয়ে নেবার এ সুযোগ ছাড়িস যদি ভালো হবে না বলে দিলাম।

নিরুপায় কালীনাথ বললেন, তথাস্তু। সামনে এনে ধরলেই আমি সই করে দেব, কেন টাকার দরকার, কি জন্যে টাকার দরকার, তা নিয়ে মাথা ঘামাতে পারব না বলে দিলাম।

মামাশ্বশুরের প্রস্তাব জ্যোতিরাণীর পছন্দ হয়েছে, কিন্তু সব থেকে বেশি মনঃপূত হয়েছে শিবেশ্বরের। বললেন, সেরকম ঠেকে না পড়লে তোমার তো সই করার দরকারই নেই—এই ব্যবস্থাই ভালো।

তাড়া আছে বলে মিত্রাদিকে ডাকতে দেওয়া হল না, তাই জ্যোতিরাণী আশা করেছিলেন আলোচনা এখানেই শেষ হতে পারে। একটু বাদেই বোঝা গেল তা হবে না। অন্যান্য ব্যবস্থার কথা তুললেন শিবেশ্বর। কত মেয়ে নেওয়া হবে, কি-ভাবে নেওয়া হবে, তাদের নিজের পায়ে দাঁড় করানোর চেষ্টা আর ব্যবস্থাটা কি—ইত্যাদি।

জ্যোতিরাণী সংক্ষেপে জবাব সারলেন, সে-সব কিছুই এখনো ভাবা হয়নি, সময় হলে মামাবাবু মিত্রাদি আর তিনি বসে ঠিক করবেন। তার আগে যত

তাড়াতাড়ি সম্ভব জঙ্গল পরিষ্কার করা, বাড়িটা মেরামত করা আর জল-লাইট-ফোন আনার ব্যবস্থা করা দরকার।

শিবেশ্বরের তবু বড়গোছের দায় সুসম্পন্ন করে তোলার মত চিন্তিত মুখ।—তোমার প্রতিষ্ঠান চালাবে কে? খরচাপত্রের ভার নেওয়া, সেখান থেকে সর্বদিক দেখাশোনা করা—এসব কে করবে?

বিরক্তি বাড়ছে জ্যোতিরাণীর। প্রকাশ পেল না।—মিত্রাদি। আমিও সাহায্য করব।

সে সেখানে থাকতে রাজি হয়েছে?

প্রচ্ছন্ন বিস্ময় কি প্রচ্ছন্ন অবিশ্বাস জ্যোতিরাণী ঠিক ধরতে পারলেন না। মিত্রাদি মিটিং পার্টি আর ফাংশান নিয়ে হৈ-চৈ করে বেড়ায় বলেই হয়ত এই প্রশ্ন। জবাব দিলেন, দরকার হলে মাসের মধ্যে ত্রিশ দিনও থাকবে। আরো একটু যোগ করার ইচ্ছে ছিল, বলার ইচ্ছে ছিল, দরকার হলে তিনিও গিয়ে থাকবেন। বললেন না। এ নিয়ে আবার কোনো বিকারের সূত্রপাত হোক, চান না। মন্তব্য করলেন, তা ছাড়া দূরের রাস্তা কিছু নয়, গাড়ি থাকলে দিনের মধ্যে যতবার খুশি যাতায়াত করা যেতে পারে। কালীদার দিকে চোখ ছিল না জ্যোতিরাণীর। থাকলে দেখতেন কুশনে মাথা রেখে আবার তিনি ঘরের ছাদ দর্শনে মগ্ন।

বেশ। সমস্যা নিষ্পত্তির হৃষ্ট অভিব্যক্তি শিবেশ্বরের মুখে। সামান্য আড়মোড়া ভাঙার ফাঁকে লঘু দৃষ্টিটা বিভাস দত্তর মুখের ওপর বুলিয়ে নিলেন একপ্রস্থ। তারপর স্ত্রীর দিকেই ফিরলেন আবার। হাল্‌কা গাম্ভীর্যে বললেন, কিন্তু বিভাস এত বড় বড় সব আদর্শের কথা লেখে, ওর কি কাজ বুঝলাম না—ও এর মধ্যে কি করবে তাহলে?

এবারে আর মামাশ্বশুর আছে বলে ঢোঁক চেপে চুপ করে বসে থাকলেন না জ্যোতিরাণী। বিভাস দত্ত উসখুস করে উঠেছিলেন, কিন্তু তার আগেই খুব সহজ হাল্‌কা সুরে জবাব ছুঁড়লেন তিনি। চাউনিটাও হাসি-মাখা করে তুলতে পেরেছেন।—তুমি যা করবে তাই করবেন। সমালোচনা করবেন, টিকা-টিপ্পনী কাটবেন—উনি বড় বড় আদর্শের কথা লেখেন, তুমিও বড় বড় ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাও—ওঁরই বা এর থেকে আর বেশি কিছু করার সময় কোথায়?

কালীদা আর মামাশ্বশুর জোরেই হেসে উঠেছেন। সঙ্গে বিভাস দত্তও। তাঁর হাসির আড়ালে প্রয়াস কতটুকু জ্যোতিরাণী লক্ষ্য করেননি। হাসির চেষ্টায় মুখ শুধু একজনেরই বিকৃত হতে দেখলেন। জবাবটা যাঁর মুখের ওপর ছোঁড়া হয়েছে, তাঁর। লক্ষ লক্ষ টাকা আর বিষয়সম্পত্তির মানী মহাজনের সমপর্যায়ে তোলা

হয়েছে দুচোখের বিষ প্রায় অস্তিত্বশূন্য একটা লেখককে—এ-রকম ঠাট্টাও বরদাস্ত করা কঠিন বইকি। বিশেষ করে, আলোচনার আসর বসানোর তুষ্টি ষোলকলায় পূর্ণ করার উদ্দেশ্যেই শুধু যাঁকে ডাকা।

ওধার থেকে কালীদা বলে উঠলেন, মধুরেণ সমাপয়েৎ। কিন্তু গল্প ব্যাপারটার একটুখানি বাকি থেকে গেল যে! উক্তি জ্যোতিরাণীকে লক্ষ্য করে, রেজিস্ট্রেশন টেজিস্ট্রেশন যা দরকার আগে করে নেবে তো, নাকি এমনিতেই ঝাঁপ দেবে?

কি দরকার জ্যোতিরাণীর ধারণাও নেই, মাথাও ঘামাননি।—যা দরকার করুন, আমি তার কি জানি!

তাহলে সর্বাগ্রে তোমার আদর্শ কেন্দ্রটির একটি নাম দরকার, কালীনাথ আশ্রম তো আর নাম দিচ্ছ না।

হাসিমুখে গৌরবিমল এবারে বিভাস দত্তর দিকে ফিরলেন, নাম দেওয়ার ভারটা অন্তত লেখকের ওপর ছেড়ে দেওয়া উচিত।

উচিত কাজ তক্ষুনি সম্পন্ন করতে চাইলেন বিভাস দত্ত। হাসিমুখে সঠিক নাম বাতলে ফেললেন।—নাম নিয়ে মাথা ঘামানোর কি আছে, আদর্শ কেন্দ্রের প্রাণসঞ্চার হবে শিবেশ্বরের টাকায়, আর সেই প্রাণধারণ করবেন দুই প্রধানা—জ্যোতিরাণী আর তাঁর মিত্রাদি—নাম দেওয়া যেতে পারে শিবজ্যোতিমিত্রালয়।

বা-বা-বা-বা! খুশি আর বিস্ময়ের অমিত কারু কালীনাথের মুখে, শিবু টাকা স্যাংশন করলে তোমার মাথাখানা আমি সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিতে রাজি।

গৌরবিমলের পছন্দ হয়েছে, হাসি-মাখা দৃষ্টিটা শিবেশ্বরের দিকে ঘুরল, নামটা মন্দ বলেনি কিন্তু বিভাস···

কাজের লোকের বাজে কথায় অরুচি গোছের বিরক্তি শিবেশ্বরের মুখে, আমি কিছুতে নেই আগেই তো বলেছি, ওই নামেই যদি মধু ঝরে তাহলে আমার নামটা বাদ দিয়ে তোমাদের যে-কারো নাম জুড়ে দাও—কালীজ্যোতিমিত্রালয় করতে পারো, গৌরজ্যোতিমিত্রালয় করতে পারো—জ্যোতিবিভাসমিত্রালয়ও খারাপ শোনাবে না।

এই কথাগুলোই সুরে বললে আর একদফা হাসির খোরাক হতে পারত। উল্টে প্রচ্ছন্ন অস্বস্তির ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল যেন। নামবিন্যাস সব থেকে বেশি বিরক্তিকর লেগেছে জ্যোতিরাণীর। ঠাণ্ডা মুখে বললেন, নামের জন্যে ভাবতে হবে না, নাম ঠিক করাই আছে।

চার জোড়া জিজ্ঞাসু চোখ তাঁর দিকে ফিরল। একটু অপেক্ষা করে শিবেশ্বরই জিজ্ঞাসা করলেন, কি নাম?

প্রভুজীধাম।

চার জোড়ার মধ্যে তিন জোড়া চোখ নিঃশব্দে তাঁর মুখের ওপর হোঁচট খেয়ে উঠল একদফা। এ নামের তাৎপর্য শুধু বিভাস দত্তর জানা নেই। মুগ্ধ হবার মত বা হতভম্ব হবার মত নাম কিছু নয়। তবু তাৎপর্য কিছু আছে সেটা বাকি তিন মুখের দিকে চেয়ে একটু বেশিই স্পষ্ট মনে হল তাঁর।

হতচকিত ভাবটা সব থেকে বেশি স্পষ্ট শিবেশ্বরের চোখেমুখে। বাকি দুজনও নির্বাক বটে, কিন্তু নির্লিপ্ত নয় একটুও। অপ্রত্যাশিত নামটা যেন ঘরের বাতাসের ওপরেও একধরনের স্থির-শান্ত প্রভাব বিস্তার করেছে।

আসন ছেড়ে জ্যোতিরাণী উঠে দাঁড়ালেন। খুব সহজ স্বরেই বিভাস দত্তর উদ্দেশে বললেন, আমি আর বসতে পারছি না কিন্তু, সকালের কাজ একটাও সারা হয়নি, আপনারা কথা বলুন, আমি চলি—

সহজ পদক্ষেপে সুচারু প্রস্থান। ভিতরের ছোট বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠছেন। গতি ঈষৎ মন্থর। এই মুখে প্রসন্নতা যেন নিঃশব্দে কাড়াকাড়ি করে জায়গা দখলের খেলায় মেতেছে।

নিজেকে পেতে চাও যদি, সাহসে বুক বেঁধে দামী কিছু দাও—

কারো মুখে শুনেছিলেন কি কোথাও পড়েছিলেন জ্যোতিরাণীর মনে নেই। কথাগুলো অন্তর্মুখী কোন্ গহনে ঘুমিয়েছিল কে জানে। সময়ে জেগে উঠেছে। জ্যোতিরাণী সাহসে বুক বেঁধেছেন। দামী কিছু দিতেও চলেছেন। সেটা দশ বিঘে জমির একটা বাড়ি নয়। কয়েক লক্ষ টাকাও নয়। ওর থেকে অনেক দামী বুকের তলার সম্পদ কিছু। ঠিক যে কি, সেটা জ্যোতিরাণী জানেন না। শুধু অনুভব করছেন। আর আশ্চর্য, নিজেকে যেন এরই মধ্যে চারগুণ করে ফিরে পাচ্ছেন তিনি। পাওয়ার অনুভূতিটা এমন যে নিজেকে নিজের মধ্যে ধরে না।

বাড়ির খোদকর্তা আর কালীদা বেরিয়ে গেলেই এ-বাড়িতে দুপুর নামে আজকাল। সিতু তাঁদের অনেক আগে স্কুলে রওনা হয়। তবে আজ তার স্কুল নেই, সকাল থেকে টিকির দেখাও নেই। থাকত যদি ছোট দাদুর সঙ্গ পেত। তিনিও কালীদার সঙ্গেই বেরিয়েছেন। সকালে জলের জীবের ওই অদ্ভুত গল্পটা শোনার পর কান্না চাপার তাড়নায় ছেলের ওই মেকী হাসির মূর্তিটা জ্যোতিরাণীর চোখে লেগে আছে। মনে পড়তে নিজের মনেই হাসছেন মুখ টিপে।

বেলা এগারোটার পর থেকেই দুপুর। জ্যোতিরাণী অকারণে লঘু পায়ে ওপর নীচ করলেন বারকয়েক। শাশুড়ীর ঘরেও উঁকি দিলেন। খানিক আগে তাঁর

খাওয়ার সময় এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি সকাল-সকালই খেয়ে নেন। দ্বিতীয় দফায় এসে দেখলেন তাঁর খাওয়া সারা। গালে হরতকী পুরে বসে আছেন। ফিরে এসে আবার এঘর ওঘর করলেন খানিক। বারান্দার ওধারের কোণে হাত-পা ছড়িয়ে মেঘনা পান সাজছে নিজের জন্য। এই কদিন ওর গজর-গজর কানে আসছে না তেমন। ওকে দেখলেই সদার কথা মনে পড়ে জ্যোতিরাণীর। আজ মন ভালো, আরো বেশি মনে পড়ল। অকারণে পরদা ঠেলে পায়ে পায়ে একবার পাশের ঘরেও ঢুকলেন জ্যোতিরাণী। শূন্য ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিক। চারদিকে তাকালেন একবার। কিছুই দেখলেন না। কি যেন অনুভব করতে চেষ্টা করলেন শুধু। কী?···সব কিছুর মধ্যে কোথাও বুঝি সব-ভালোর একটা মূল রয়েছে, শিকড় রয়েছে।

সর্বাঙ্গে শিহরণ একপ্রস্থ। বেরিয়ে এসে নিজের ঘরের ড্রেসিং টেবিলটার সামনে দাঁড়ালেন। লজ্জা পেলেন একটু, কারণ, আয়নায় নিজেকে দেখতেও ভালো লাগছে। টেবিলের ওপর বাবার সেই স্তোত্র লেখা বাঁধানো গানের খাতাটা পড়ে আছে। ঘণ্টাখানেক আগে ড্রেসিং টেবিলের দেরাজ থেকে বার করেছিলেন ওটা। বসে ওটাই টেনে নিলেন আবার। সামনে কলমটাও আছে। জ্যোতিরাণী হাসছেন আপন মনে।···একটু আগে তিনি কিছু পেয়েছেন। আবার কখন কোন্ আঘাতে এই পাওয়াটুকু হারিয়ে যাবে কে জানে। কলম খুলে বাবার ওই স্তোত্রের মাঝে অনেকটা ফাঁক দিয়ে একটু আগের সঞ্চয়টুকু লিখে রাখলেন।—সব কিছুর মধ্যে কোথাও সব-ভালোর একটা মূল রয়েছে, শিকড় রয়েছে। নীচে তারিখ বসালেন। অনেক সময় তো খোলেন খাতাটা, দেখলে দুর্দিনেও মনে পড়বে।

কিন্তু লেখার পর লজ্জা পেলেন। একটু বেশিই আবেগে ভাসছেন বোধ হয়। খাতাটা দেরাজে ঢুকিয়ে টেলিফোনের দিকে এগোলেন। মিত্রাদিকে আসতে বলবেন। এতক্ষণে খাওয়া-দাওয়া সারা হয়েছে নিশ্চয়। আগে তার দুশ্চিন্তা ঘোচানো দরকার। কিন্তু রিসিভার তুলেও টেলিফোন করলেন না। বাড়িতে ভালো লাগছে না, তিনিই যাবেন। তাছাড়া কথায় কথায় ডেকে না পাঠিয়ে নিজেরই যাওয়া উচিত।

যেমন ভাবা তেমনি কাজ। পাঁচ মিনিটের মধ্যে রেডি। মেঘনাকে ডেকে বলে দিলেন ঘণ্টাখানেক ঘণ্টাদেড়েকের মধ্যে ঘুরে আসছেন। পা বাড়াতে গিয়ে সিতুর কথা মনে পড়ল।···গেল কোথায় ছেলেটা! নীচের বারান্দায় দেখা পেলেন তার। বন্ধুবান্ধবরা স্কুলে, তাই ছুটি নীরস লাগছে। তিনি বাড়ি থেকে বেরুলেই ও-যে টো-টো করে ঘুরবে সন্দেহ নেই। জ্যোতিরাণী লক্ষ্য করে দেখলেন, পরনের

জামা প্যাণ্ট ফর্সা'ই। বললেন, চল্ আমার সঙ্গে, জুতোটা পরে আয়।

কোথায় যাওয়া হবে না জেনেই সিতু সানন্দে জুতো পরতে ছুটল।

মিত্রাদির বাড়ি গড়িয়াহাট ছাড়িয়ে আরো খানিক দূরে। সিতু গাড়িতে বসে শুনেছে কোথায় যাওয়া হচ্ছে। শোনার পর আর তেমন উৎসাহ বোধ করছে না।

বাড়ি থেকে বেরুতে পেরে জ্যোতিরাণীর সত্যিই ভালো লাগছে। মেঘলা আকাশ। শরতের ঠাণ্ডা বাতাস দিয়েছে। আর দিনকয়েক বাদে পুজো। এপাশ ওপাশের খালি অঙ্গনে বাঁশ বাঁধার তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে।

মিত্রাদির বাড়ির ভিতরে আগে আর কখনো আসেননি জ্যোতিরাণী। প্রতিষ্ঠানের বাড়ি দেখার জন্য যেদিন তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেদিনও তাড়া ছিল বলে ভিতরে ঢোকেননি। মিত্রাদিই নেমে এসে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল। ফেরার সময় তাঁকেই নিজের ওখানে নিয়ে গেছলেন।

ড্রাইভার হর্ন বাজাতে ওপরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন মৈত্রেয়ী চন্দ। তারপরেই শশব্যস্তে নেমে এলেন।—কি ভাগ্যি, অ্যাঁ? এসো এসো—সিতু আয়। খুশি ধরে না, একটা টেলিফোনও তো করোনি, আর আধ ঘণ্টা পরে এলেই তো বেরিয়ে যেতাম—কি হত বলো তো?

জ্যোতিরাণী হাসছেন।—কি আর হত। যাওনি তো।

দোতলায় এলেন। সিতু তক্ষুনি তাদের ছেড়ে দোতলা বারান্দার রেলিংএ গিয়ে দাঁড়াল। জ্যোতিরাণীকে সাদরে বসতে দিয়ে মৈত্রেয়ী বললেন, গরিবের এ-ই স্বর্গবাস—নীচের তিন-ঘর ভাড়া দিয়ে দিয়েছি, ওপরটা আমার।

জ্যোতিরাণী অবাক। ছেচল্লিশ বা সাতচল্লিশের গোড়ায় এসব জায়গার বাড়ির দাম বেশি ছিল না অবশ্য। বিলেত থেকে ফিরে মিত্রাদির বাড়ি বদলানোর কথাই শুনেছিলেন, কিনেছে ধারণা ছিল না। বললেন, এ বাড়ি তোমার জানতুম না তো!

মৈত্রেয়ী চন্দ হেসে উঠলেন, কিনিনি, পরের জিনিস কিছুকালের জন্য নিজের করে নিয়েছি।

সানন্দে রহস্য ব্যক্ত করলেন তারপর। কেনা হয়নি, খুব সুবিধে দরে পঁচিশ বছরের মিয়াদে লীজ্ নেওয়া হয়েছে। মুসলমানের বাড়ি, বড় দাঙ্গার সময় ভদ্রলোক সেই যে বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিল, আর এখানে বাস করতে আসেনি। বিলেত থেকে ফেরার পর এক পরিচিতজনের মারফৎ বরাতজোরে যোগাযোগ। সেই পরিচিত লোকটির ওপরই তখন এই বাড়ি রক্ষার ভার ছিল। মিত্রাদি হেসে সারা হঠাৎ, বিলেত-ফেরতার চটকে সেজেগুজে কম করে চারদিন মাঝ-কলকাতার বড় হোটেলে বাড়ির মালিকের সঙ্গে ফয়সালায় বসতে হয়েছে, তবে তার মুণ্ডু ঘুরেছে।

এত সস্তায় লীজ, দিয়ে লোকটা বোধ হয় এখন হাত কামড়াচ্ছে। তিন মাস অন্তর যা দিতে হয় নীচের তলায় ভাড়াটের কাছ থেকে তার বেশি আসে।

উৎফুল্ল মুখে একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলেছেন মৈত্রেয়ী চন্দ।—সাহস করে আর একটু খাতির জমাতে পারলে জলের দরে বাড়িটা হয়ত কিনেই ফেলতে পারতাম ভাই। এখন আফসোস হচ্ছে।

জ্যোতিরাণীও হেসে ফেললেন।

ছোটর উপর ছিমছাম বাড়িটা। লীজ, নেওয়ার পর মিত্রাদির কিছু খরচ হয়েছে শুনলেন। তার ফলে একেবারে নি-খরচায় থাকা যাচ্ছে এখন। নীচের তলার মাঝ-বয়সী সিন্ধী ভাড়াটে মাসের তিন তারিখে ভাড়া গুণে দিয়ে যায়—লীজ,-নেওয়া বাড়ি, পাকা রিসিট দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপার নেই। তাছাড়া লোকও ভালো, ঘরের দরজা বন্ধ করে রাত নটা থেকে বারোটা পর্যন্ত মদ খায়, কিন্তু হৈ-হল্লা করে না।

জ্যোতিরাণী শুনছেন আর ভাবছেন চৌকস বটে মিত্রাদি। ঠাট্টা করলেন, অবাঙালী নিয়ে ঘর করছ তাহলে?

কি করব, অবাঙালী বলে রক্ষে, বাঙালী হলে দুদিন বাদে আমাকেই বাড়িছাড়া করার ফিকির খুঁজত।

এসেছেন মিনিট-পনের হল, এতক্ষণের মধ্যে বীথির সাড়া না পেয়ে জ্যোতিরাণী জিজ্ঞাসা করলেন, বীথি কোথায়?

ওমা, বীথিকে তো ওই ওদিকের এক বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে সিনেমায় পাঠালাম। সারাক্ষণ গোমড়া মুখ করে ঘরে বসে থেকে কি করবে, তাই দিলাম পাঠিয়ে।

নিজের হাতঘড়ির দিকে চোখ গেল।—সিনেমার তো অনেক দেরি এখনো!

তুমি না এলে আমি তো বেরিয়ে পড়তাম, তখন যেত কিনা ঠিক কি। তাই আগেই ওই বাড়ির মেয়েদের কাছে জিম্মা করে দিয়ে এলাম।

মিত্রাদি ভালো কাজই করেছে, তবু এই ভালোটা কেন যে হঠাৎ মনে ধরল না জ্যোতিরাণী ভেবে পেলেন না। স্টেশনে পদ্মার যে শোক স্বচক্ষে দেখেছেন তিনি তার তুলনায় সিনেমা জিনিসটা বড় বেশি বে খাপ্পা লেগেছে হয়ত। তক্ষুনি আবার কি মনে পড়তে উৎসুক একটু, তোমার মেয়েকেও তো দেখলাম না, মামাবাড়িতে থাকে বুঝি?

মেয়ের প্রসঙ্গ খুব যেন আশা করেনি মিত্রাদি। তবু লঘু জবাবই পেলেন।—তুমি সব খবরই রাখো দেখছি, মেয়ে তো সেই কবে থেকেই দার্জিলিংএ, সেখানে বোর্ডিংএ থেকে পড়ে।

মুখের দিকে চেয়ে মিত্রাদির জোরের দিকটাই যেন অনুভব করেছেন জ্যোতিরাণী। এমন নির্লিপ্ত অথচ সহজ হাসিখুশির মধ্যে জীবনটাকে বাঁধতে পারল কি করে সেই বিস্ময়। স্বামীর তো ওই ব্যাপার, একটা মাত্র মেয়ে—সেও দার্জিলিংএ। মেয়েকে মনের মত বড় করে তোলার আকাঙ্ক্ষাতেই সেখানে রাখা হয়েছে সন্দেহ নেই। তবু এই মুখে নিঃসঙ্গতার পরিতাপ কখনো দেখেছেন বলে মনে পড়ে না।

বারান্দার রেলিংএ দাঁড়িয়ে শ্রীমান সাত্যকির বিরক্তি ধরেছে। ঘরে পদার্পণ করে গম্ভীর মুখে বলল, আমি নীচে গাড়িতে গিয়ে বসছি।

গাড়িতে কেন রে! মৈত্রেয়ী ব্যস্ত হলেন, মাসীর বাড়ি বুঝি ভালো লাগছে না? দাঁড়া, কি খাবি বল্?

সিতু বলতে পারলে বলত, ঘোড়ার ডিম। এখানে আসার পরে বুঝেছে মা তাকে আটকে রাখার জন্যেই সঙ্গে ধরে এনেছে।—আসার আগে ঠাকুমার ঘরে খেয়ে এসেছি, এক ফোঁটাও খিদে নেই। তুমি মায়ের সঙ্গে প্রাণভরে গল্প করো, আমি গাড়িতে গিয়ে বসি।

মায়ের ভ্রূকুটি এড়িয়ে প্রস্থান। মিত্রাদির খিলখিল হাসি। জ্যোতিরাণীও হেসে ফেললেন।

বাপের মতই ভারিক্কি চাল হচ্ছে দেখি, অ্যাঁ?

মিত্রাদির লঘু উপমা কানে সুধাবর্ষী ঠেকল না খুব। হেসেই জবাব দিলেন, আর বোলো না, দিনকে দিন যা হয়ে উঠছে।—যাক, কাজের কথা শোনো, এ-দিকের সব ব্যবস্থা তো রেডি, এবারে তোমার কেরামতি দেখাও।

তাকে দেখামাত্র এই সুখবরেরই প্রত্যাশায় ছিলেন মৈত্রেয়ী চন্দ। সুখবর ধরেই নিয়েছিলেন, নয়তো নিজে আসত না। আর এই কারণেই মুখ ফুটে নিজে কিছু জিজ্ঞাসা না করে সাগ্রহে প্রতীক্ষায় ছিলেন। কোন্ ব্যবস্থা রেডি খুঁটিয়ে শুনলেন। আনন্দে আটখানা মৈত্রেয়ী চন্দ। জ্যোতিরাণীকে কাছে টেনে নিয়ে চুমু খেয়ে বসার মতলব প্রায়। হাসিমুখেই নিজেকে ছাড়িয়ে বাঁচলেন তিনি।

আসল কেরামতি তো তুমিই দেখালে, এত বড় একটা ব্যাপারে তোমার ভদ্রলোক এত সহজে রাজি হয়ে গেলেন? মৈত্রেয়ী চন্দর বিশ্বাস হয় না যেন।

না হলে আর এগোলাম কি করে?

সত্যি, তোমার টেলিফোনে সেদিন দিল্লী থেকে ফেরার আশায় আঁচল পেতে বসে আছ শুনেও আমার ভাবনা যাচ্ছিল না। এখন দেখছি আঁচলের জোর বটে তোমার। কি করে কি হল শুনি না, দিল্লী থেকে ফিরে আঁচল বিছানো দেখেই মজে গেলেন ভদ্রলোক?

অনেকটা। মুখ টিপে হাসছেন জ্যোতিরাণী।

আর তুমি আলটিমেটাম দিলে, হয় কথা রাখো, নয় আঁচল ছাড়ো?

ভিতরে ভিতরে একটুখানি বক্র আঁচড় পড়ল জ্যোতিরাণীর। মিত্রাদির এত কৌতূহল কেন, অনুমান করতে পারেন। ঘরের লোকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ধারাটা আঁচ করতে পারেনি এমন নীরেট মিত্রাদি নয়। এই জন্যেই তার ভাবনা ছিল, আর এ-জন্যেই এখন কৌতূহল। তাই সাদা-সাপটা রসের জবাবটাই দিলেন তিনি।—তা আঁচল ছাড়া না ছাড়ার ধকল তো কিছু গেলই।

রসের কথার মূলে না পৌঁছে তৃপ্তি নেই মিত্রাদির।—কথা রেখে আঁচল ধরলেন ভদ্রলোক, সেই ধকল?

ছদ্ম কোপে এবার ভ্রূকুটি করলেন জ্যোতিরাণী।—তুমি একটি অসভ্য, রস ছেড়ে ভালো করে কাজে মন দাও এখন।

প্রতিষ্ঠানের নামটা মৈত্রেয়ীর মনে ধরেনি। সরাসরি সেটা প্রকাশ না করে ঘুরিয়ে বললেন, প্রভুজীধাম নামটা বড় সেকেলে হয়ে গেল না?

নাম-প্রসঙ্গে একটুও দ্বিধার আমল দিতে রাজি নন জ্যোতিরাণী।—হল তাতে কি। ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী হয়ে তুমি যাজ্ঞবল্কের ঘর করেছিল সেই মহাভারতের যুগে, এখনো তো দিব্বি সেই সেকেলে নাম ধরে বসে আছ।

অতএব মৈত্রেয়ীরও দ্বিধা বিসর্জন।

গাড়ি গড়িয়াহাট ধরে ফিরছে। জ্যোতিরাণী সকৌতুকে ছেলের গোমড়া মুখ দেখছেন। ওর যেন অনেকটা মূল্যবান সময় নষ্ট করা হয়েছে। সকালের সেই গল্প শোনার মুখও মনে পড়ল। প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার জন্যেই জিজ্ঞাসা করলেন, ছোট দাদু সকালে সেই সমুদ্রের গুণ্ডকটার কি নাম বলেছিল যেন?

পেলোরাস্ জ্যাক। ছেলেরই বয়োজ্যেষ্ঠের ভূমিকা।

লঘু কৌতুকে জ্যোতিরাণী পেলোরাস্ জ্যাকের ফুর্তির সঙ্গে ছেলের গোমড়া মুখের কিছু একটা তুলনামূলক মন্তব্য করতে যাচ্ছিলেন। অকস্মাৎ বিষম আঁতকে উঠলেন তিনি। সিতু অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল। গাড়িটা ঘ্যাঁচ করে থেমে গেল। দিনে-দুপুরে মহানগরীর বুকে বুঝি আকস্মিক বজ্রপাত হয়ে গেল একটা। পথের মানুষও নিস্পন্দ বিমূঢ়।

সামনে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের শাখাভবন। জ্যোতিরাণীর গাড়ি অতিক্রম করার আগেই আচমকা গুলির শব্দ। ব্যাঙ্কের সামনে একটা ভ্যান দাঁড়িয়ে। ভ্যান থেকে একটি বাঙালী ভদ্রলোক সবে পিছনের দরজাটা খুলেছে—সঙ্গে সঙ্গে

এক ঝাঁক গুলি। ভদ্রলোক রাস্তায় লুটিয়ে পড়ল। আর বন্দুকধারী একজন পশ্চিমী রক্ষী গাড়ির ভিতরে—আচমকা গুলিতে তারও হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হয়ে গেল। ভ্যানের লাগোয়া আর একটা মোটর দাঁড়িয়ে। তারই আরোহীরা গুলি চালিয়েছে, তাদের হাতে স্টেন-গান, পিস্তল।

ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি চালিয়েছে তারা। তাদের গাড়িটা সামনে পড়ায় আর লোকজনের ছুটোছুটির ত্রাসে জ্যোতিরাণীর গাড়ি বাধা পেয়ে নিশ্চল হঠাৎ—ব্যাপারটা বুঝে চোখের নিমেষে আত্মস্থ হয়ে ড্রাইভার চেষ্টা করছে ওধার দিয়ে পাশ কাটাতে। কিন্তু পায়ে-হাঁটা গতি গাড়ির। ঘুরে ঘুরে গুলি ছুঁড়ছে লোকগুলো—জীবিত কাউকে কাছে ঘেঁষতে দেবে না। হ্যাঁচকা টানে জানালার দিক থেকে সিতুকে দু'হাতে বুকের মধ্যে জড়িয়ে জ্যোতিরাণী নিস্পন্দ কাঠ। একটা লোকের পিস্তল এদিকেও ঘুরেছে। লোকটার সঙ্গে চোখাচোখি হয়েছে জ্যোতিরাণীর। মুহূর্তের মধ্যে তার চোখেমুখে অটল জিঘাংসার বীভৎস নরক দেখেছেন তিনি। এক মুহূর্ত থমকে লোকটা ড্রাইভারের দিকে পিস্তল বাগিয়ে দূরে সরে যেতে ইশারা করেছে। জ্যোতিরাণীর ড্রাইভার দিশেহারার মত গাড়ি ওধারের ফুটপাথের দিকে ঘুরিয়েছে।

চোখের পলকে কয়েকটা লোক ভ্যান থেকে বড় একটা ক্যাশ বাক্স নামিয়ে নিজেদের গাড়িতে তুলেছে। আর একজন মৃত রক্ষীর বন্দুকটা ছিনিয়ে নিয়েছে। তারপর গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে চোখের পলকে তারা গাড়ি নিয়ে উধাও।

গোটা ব্যাপারটা ঘটে যেতে কতক্ষণ লেগেছে? সম্ভবত কয়েক মিনিট মাত্র। তারপরেই লোকে লোকারণ্য। জনতা আর গাড়ির ভিড়ে এগোবার উপায় নেই। উপায় থাকলেও যেন হুঁশ নেই কারো। জ্যোতিরাণীর বুকের ভিতরটা এখনো কাঁপছে থর-থর করে।

আবার চমকে উঠলেন তিনি। হঠাৎ দরজা খুলে সিতু ভিড়ের দিকে ছুটেছে। জ্যোতিরাণী ব্যাকুল ক্ষোভে ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলেন, শিগ্‌গীর ধরে নিয়ে এসো ওকে!

ড্রাইভারও দরজা খুলে ছুটল। সিতুকে ধরে নিয়ে ফিরল মিনিট পাঁচ-সাত বাদে। সরোষে জ্যোতিরাণী তাকে কাছে টেনে নিয়ে গোটা দুই ঝাঁকুনি দিয়ে বলে উঠলেন, কেন গেছলি? কেন গেছলি?

সিতু জবাব দিল, ওরা তো পালিয়েছে, এখনো ভয় পাচ্ছ কেন?

ধীর গতিতে গাড়ি এগিয়ে নিয়ে গেল ড্রাইভার। মা-কে যাই বলুক, নিজে উত্তেজনায় ফুটছে সিতু। বলছে, ভদ্রলোকের নাম গণেশ মিত্র—ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার

আর ওই যে মরে কাঠ বন্দুকধারী সিপাইটা—ওর নাম লোকবাহাদুর। লোকগুলো সাতানব্বুই হাজার টাকার ক্যাশবাক্স নিয়ে হাওয়া হয়ে গেছে।

জ্যোতিরাণী শুনলেন। কিন্তু তখনো হুঁশ নেই যেন।

…মিত্রাদির কাছে কেন এসেছিলেন? কি নিয়ে যেন ভাবছিলেন তাঁরা। বাঁচার সম্বল নেই যাদের, তাদের কেমন করে বাঁচানো যেতে পারে তাই নিয়ে। শোকে যারা হাসতে ভুলেছে তাদের মুখে কেমন করে হাসি ফোটানো যেতে পারে, তাই নিয়ে।

…আর সকালে একটা গল্প শুনেছিলেন মামাশ্বশুরের মুখে। একটা সমুদ্রের জীব চল্লিশ বছর ধরে চল্লিশ হাজার লোকের প্রাণ বাঁচিয়েছে। আর তাদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে আর তাদের কোটি কোটি টাকার সম্পদ রক্ষা করেছে।

কিন্তু চোখের সামনে এ কি দেখলেন তিনি? ক্ষুদ্র লোভে মানুষের হাতে মানুষের এ কি নিষ্ঠুর হত্যা দেখলেন, চিরদিনের মত মুখের হাসি নেভানোর এ কি ভয়াল করাল অন্ধকারের মুখব্যাদান দেখে উঠলেন তিনি? সত্যি দেখলেন না দুঃস্বপ্ন?

বাড়ির সিঁড়ির সামনে গাড়িটা এসে থামল। জ্যোতিরাণী তখনো নিস্পন্দের মত বসে।

॥ সাতাশ ॥

পেলোরাস জ্যাকের মানুষ বাঁচানোর গল্প ছেলের চোখে জল এনেছিল। জ্যোতিরাণী জল দেখেননি, আশার মুক্তো দেখেছিলেন। কিন্তু লোভের বশে চোখের ওপর মানুষ মারতে দেখার প্রতিক্রিয়াটা ছেলের দিকে চেয়ে তিনি লক্ষ্য করেননি। কটা দিন নিজেই তিনি আচ্ছন্ন হয়ে ছিলেন। ছেলের বিপরীত উত্তেজনা প্রায় উদ্দীপনার মতই। গুলিবিদ্ধ দু-দুটো লোকের বরাত মন্দ অস্বীকার করে না সিতু। কিন্তু অন্যদিকে রোমাঞ্চকর সাহসিকতার এক অনন্য নজির দেখেছে সে। ছোটদের ডাকাতির বই কিছু পড়া আছে—এর কাছে সবই জলো। লোক দুটোকে না মেরে শুধু গুলি ছুঁড়ে ওইরকম ধাঁধাঁ-লাগানো তৎপরতায় গাড়ি-হাঁকানো ভদ্র-ডাকাতগুলো টাকার বাক্স নিয়ে হাওয়া হতে পারলে সিতু এর দ্বিগুণ অভিভূত হত। আর তারপর যদি শোনা যেত রবিনহুডের মত ওই টাকা গরিব-দুঃখীদের বিলনো হয়েছে, সিতুর তাদের ভক্ত হতেও আপত্তি ছিল না।

মাত্র এগারো বছরে পা দেবে যে ছেলে, বিপদ আর ভয়ের ঝুঁকি নেবার

তড়িৎগতি রোমাঞ্চ আর আনন্দের প্রতি তার এই টান লক্ষ্য করলে জ্যোতিরাণীর শঙ্কাই হত হয়ত।

বন্ধুমহলে কটা দিন প্রায় নায়কের সম্মান পেয়েছে সিতু। পরদিন সমস্ত কাগজে যে গায়ে-কাঁটা-দেওয়া খবর পড়ে স্তম্ভিত সকলে, ও সেটা স্বচক্ষে দেখেছে। শুধু দেখা নয়, কাগজে তার আর মায়েরও মৃত্যুর খবর বেরুতে পারত। একটা ডাকাত তো সোজা মুখের ওপর রিভলবার বাগিয়েই ধরেছিল—আর তার ধারালো চোখ দিয়ে যেন আলো ঠিকরোচ্ছিল। সিতুকে ঘিরে শ্বাসরুদ্ধ বন্ধুরা কবার করে আদ্যোপান্ত শুনেছে ঠিক নেই। স্কুলে ক্লাসের ছেলেরাও দম-বন্ধ করে শুনেছে, মাস্টারমশাইরাও। পাড়ার বড় ছেলেরা তাকে ডেকে চাক্ষুষ ঘটনা শুনেছে, ঘোড়া-মার্কা সমরের দাদা আর সজারু-মাথা সুবীরের দাদা তো তাকে আদর করে পার্কে ডেকে নিয়ে গিয়ে নিবিষ্ট বিস্ময়ে শুনেছে সব। এটা কম সম্মান ভাবে না সিতু। তারপর চালবাজ ত্নলুর দিদি নীলিদি—যে নীলিদি একদিন সিতুকে হনুমান বলেছিল, আর রোগা-পটকা অতুলের দিদি রঞ্জুদি—যে রঞ্জুদি ভাইকে মারা হয়েছিল সেই রাগে একদিন ওকে মায়ের কাছে টেনে নিয়ে যেতে চেয়েছিল—স্তব্ধ মুগ্ধ বিস্মিত কণ্টকিত তারাও। নীলিদি, রঞ্জুদি, তাদের মায়েরা, আর, পাড়ার আরো অনেকের মা-মাসী-পিসীরা গোল হয়ে বসে জোড়া-জোড়া চোখ টান করে ওর বর্ণনা গিলেছে, আর শিউরে উঠে গলা দিয়ে নানা রকমের শব্দ বার করেছে।

বলার ঝোঁকে সিতু একটু-আধটু বাড়িয়েই যদি বলে থাকে, তাও নিজের কাছেই অবিশ্বাস্য নয় খুব। যেমন, তাদের গাড়ি ডাকাতগুলোর গাড়ির রাস্তা আগলে ফেলেছিল বলেই রিভলবারের তাড়া খেতে হয়েছিল, একটা ডাকাত পাঁচ হাতের মধ্যে এসে তাকে আর মাকে দেখেছে আর ভেবেছে গুলি করবে কি করবে না, ইত্যাদি।

ঘটনাটা ছেলের অপরিণত মনে কত বড় ছাপ ফেলে গেল, তা নিয়ে জ্যোতিরাণী মাথা ঘামাননি বা চোখ তাকিয়ে দেখেননি। কিন্তু ছেলে যে তাঁকে মাঝে-সাঝে ঈষৎ কৌতূহলে চুপচাপ লক্ষ্য করে, মুখের দিকে চেয়ে থাকে—এটা খেয়াল করলেন। তৃতীয় দিনে স্কুল-ফেরত জলখাবার খেতে খেতে খাওয়া ভুলে ওমনি চেয়েছিল।

কি দেখছিস?

না তো। সিতু তাড়াতাড়ি খাবারের দিকে মন দিয়েছে।

পরদিন একটা ধাক্কা খেয়েই জ্যোতিরাণীর চোখ আর চিন্তা ছেলের দিকে ঘুরল। সকালে শমী ফোন করেছিল আজ সে মাসীর কাছে আসবেই। তার

মনে হয়েছে মাসীর ওপর নিজের দাবি পেশ না করে অভিমান নিয়ে বসে থাকলে মাসী হয়ত তাকে ভুলেই যাবে। কড়া নোটিশ পেয়ে জ্যোতিরাণী শামুকে দিয়ে গাড়ি পাঠিয়ে বিকেলের আগেই ওকে আনিয়ে নিয়েছেন।

বিকেল পর্যন্ত শমী মাসীর কাছেই ছিল। সিতুদা স্কুল থেকে ফেরার পর সজ্জ বদলেছে। ঘণ্টা দুই বাদে ঘরে এসে হঠাৎ দু হাতে মাসীকে জড়িয়ে ধরল সে।

জ্যোতিরাণী প্রথমে ভাবলেন, রাতটা এখানে থেকে যাবার ইচ্ছে সেই বায়না বোধ হয়। কিন্তু সে-রকমও লাগল না। মেয়েটার চোখেমুখে উত্তেজনার ছাপ—ভয়েরও।—কি হল?

কি হল বার করতে সময় লাগল একটু। শমীর কাঁদ-কাঁদ মুখ। সিতুদার মুখে ডাকাতদের কথা সব শুনেছে। তার এখনো ভয় করছে।

জ্যোতিরাণী হাল্কা অভয়ই দিলেন, এখনো ভয় করছে কেন, মেরে তো ফেলেনি।

ঠোঁট ফুলিয়ে শমী বলল, তোমাকে মারবে কেন, আর একটু সময় থাকলে সিতুদাকে মারত, তোমাকে তো ধরে নিয়ে যেত—

কথাগুলো জ্যোতিরাণীর কানে খট্ করে লাগল কেমন। শমীর মুখের ভয়ের ছাপটা ভালো করে লক্ষ্য করলেন এবার।—সিতু তোকে কি বলেছে শুনি?

শুনলেন কি বলেছে। ডাকাতদের গুলিগোলার মধ্যে পড়ার ব্যাপারটা ফেনিয়ে বলে যতখানি সম্ভব ত্রাস সঞ্চার করেছে মেয়েটার মনে। রিভলবার হাতে ডাকাতটা ওদের গাড়ির দরজা ধরে দাঁড়িয়েছিল একেবারে। আর ওর মাকে দেখেই ভেবেছে ছেলেটাকে খতম করে দেবে কিনা। বলেছে, ডাকাতটা একা না থাকলে বা হাতে আর একটু সময় থাকলে বোকার মত শুধু টাকা নিয়ে পালাতো না, নির্ঘাত ওকে মেরে মা-কে নিজেদের গাড়িতে টেনে তুলে নিয়ে হাওয়া হয়ে যেত।

জ্যোতিরাণীর দু চোখ নীরবে শমীর কচি মুখের ওপর ঘুরল এক চক্কর।—ওকে মেরে আমাকে নিয়ে যেত কেন?

যেত যে তাতে শমীরও খুব সংশয় নেই। কারণ সিতুদা যা বলেছে সেটা ও নিজেও অবিশ্বাস করতে পারেনি। সিতুদা বলেছে, ডাকাতরা তার মায়ের মত এমন আর কাউকে দেখেছে নাকি! মায়ের মত এত সুন্দর আর কজন আছে? যে-মেয়েরা সিনেমা করে তাদের থেকেও তার মা ঢের ঢের সুন্দর। তাই ফাঁক পেলে মা-কে তারা নিয়ে যেতই। একজনের বেশি ডাকাত তার মা-কে দেখলে টাকা ফেলেই নিয়ে যেত হয়ত। টাকা তো যে-কোনো ব্যাঙ্কে এসে ডাকাতি

করলেই পাওয়া যায়, কিন্তু ওর মায়ের মত কজনকে পাবে ?

ছু দিন ধরে তাঁর দিকে চেয়ে কি ছাখে সিতু, তা যেন অনুমান করা গেল। দশ-পনের মিনিটের মধ্যে শামুকে সঙ্গে দিয়ে গাড়ি করে শমীকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন জ্যোতিরাণী। তারপর নিঃশব্দে ছেলেকে খুঁজলেন। বাড়িতে নেই। রাস্তার দিকের বারান্দায় এসে এদিক-ওদিক ঝুঁকে দেখলেন, অন্য ছুই-একটা ছেলের সঙ্গে অদূরের একটা বাড়ির রকে বসে আছে। ভোলাকে পাঠালেন ডেকে আনতে।

মিনিট পাঁচ-সাতের মধ্যেই সিতু এলো। একটু আশা নিয়েই এসেছিল, আছুরে মেয়ে এসেছে, মা হয়ত তাদের নিয়ে বেড়াতে বেরুবে। কিন্তু ঘরে এসে শমীকে না দেখে সে অবাক একটু। তারপরেই হকচকিয়ে গেল। মুখে ভয়ের ছায়া নামল। ও ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে মা নিঃশব্দে এগিয়ে এসে ঘরের দরজা বন্ধ করল, ছিটকিনি আটকে দিল। আর সেই ছ-চার মুহূর্তের মধ্যেই সিতু বিকেলটুকুর মধ্যে মারাত্মক অপরাধ কি করেছে হাতড়ে বেড়াতে লাগল।

দরজা বন্ধ করে জ্যোতিরাণী ঘুরে দাঁড়ালেন। ছেলে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে। আঙুল দিয়ে শয্যা দেখিয়ে দিলেন।—বোস্ ওখানে।

বিমূঢ় সিতু আদেশ পালন করল।

শমীকে কি বলেছিস ?

সিতুর মুখে নির্বাক বিস্ময়ের ছাপ পড়তে লাগল এবার। ওই মেয়ে মায়ের কাছে সাংঘাতিক কিছু নালিশ করে গেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু মায়ের এই মূর্তি দেখার মত কি সে বলে থাকতে পারে হঠাৎ ভেবে পেল না। পরের মুহূর্তে কি মনে পড়তে পাংশু মুখ।...বড় হয়ে ওকে যে বিয়ে করবে বলেছিল বজ্জাত মেয়ে আজ সেটাই মায়ের কাছে ফাঁস করেছে নিশ্চয়।

জ্যোতিরাণী ছেলের ছু হাতের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছেন। দেখছেন।—একটা মিথ্যে কথা বলবি যদি আজ তোকে আমি মেরে ফেলব, সত্যি বললে কিছু করব না। ডাকাতেরা ফাঁক পেলে আমাকে তুলে নিয়ে যেত তোকে কে বলেছে ?

বিপদ কেটেছে কিনা জানে না, কিন্তু এ কথা শোনার পর হঠাৎ বুঝি আশার আলো দেখল সিতু। ওই সম্ভাবনার চিত্রটা চুপি চুপি রোগা অতুল তার কাছে পেশ করেছিল। তারপর সিতু ওতে রঙ চড়িয়েছে। রং চড়াবার আগে ছুটো দিন মা-কে কিছুটা নতুন চোখে নিরীক্ষণও করেছিল সে। সত্যি জবাব দিল। রঞ্জুদির ভাই অতুল বলেছে। নীলিদিদের কথা ও শুনে ফেলে তাকে বলেছে।

তাদের কি কথা ?

সিতুর কলে-পড়া মুখ। অতুলের নির্জলা রিপোর্টটুকুই ব্যক্ত করল। ডাকাতির

ব্যাপারটা সব শোনার পর নীলিদি রঞ্জুদি আর গলির অন্য মেয়েরা নিজেদের মধ্যে কি সব বলাবলি করছিল আর হাসাহাসি করছিল। অতুল তখন চুপি চুপি উঠোনের সামনেই দরজার পাশে দাঁড়িয়ে তাদের কথা শুনেছে। সার কথা, নীলিদি হাসছিল আর বলছিল, ডাকাতটা এক-নম্বরের বোকা বলেই সিতুর মা বেঁচে গেছে, নইলে টাকা ফেলে তাকেই নিয়ে পালাতো। আর এক মেয়ে হেসেছে আর বলেছে, এখন হয়তো সেই ডাকাতটা টাকা ভুলে নিজের হাত কামড়াচ্ছে। তারপর আরো একটা মেয়ে বলেছে, ডাকাতি করতে এসে সময় পায়নি বলেই ছেড়ে দিয়ে গেছে, ফাঁক পেলে কি আর ছেড়ে দিত, নাকের ডগায় রিভলবার উঁচিয়ে ঠিক নিজেদের গাড়িতে টেনে নিয়ে যেত—তার আগে ছেলেটার কি দুর্দশা করত কে জানে। ওদের মধ্যে শুধু রঞ্জুদিই চুপ করে শুনছিল, কিছু বলেনি।

জ্যোতিরাণী অবিশ্বাস করলেন না। দু চোখ ছেলের মুখের ওপর আটকে রেখেছেন।—আর সিনেমার মেয়েদের কথা কে বলেছে?

সিতু দ্বিতীয় দফা ফাঁপরে পড়ল। পাজী মেয়েটা কোনো কথাই আর বলতে বাকি রাখেনি। কিন্তু সে কার নাম করবে? মায়ের চেহারা সম্পর্কে তো কত সময় ওই নীলিদিরা আর তাদের মা-মাসীরা কতরকম প্রশংসা করে। টিপ্পনীও কাটে। সেদিনও নীলিদি একগাদা মেয়ের সামনে ওকে বলেছিল, তুই মেয়ে হলে তোর মায়ের নাম ডোবাতিস, কেউ তোকে ওই মায়ের মেয়ে বলত না। জবাবে আর একটা মেয়ে—নীলিদির কোনো বে-পাড়ার বন্ধু হবে—বলেছিল, কেন ওর চেহারা তো বেশ সুন্দর। তাতে নীলিদি বলেছিল, ওর মা-কে তো দেখিসনি, চোখ ফেরানো যায় না, বিকেলের দিক বারান্দায় এলে দেখাব'খন। মায়ের চেহারা নিয়ে বন্ধুদের দাদাদের মধ্যেও যে একটু-আধটু আলোচনা হয় সিতু তাও জানে। তাছাড়া সেদিন সুবীরের দাদা প্রবীর আর সমরের দাদা অমর তাকে পার্কে ডেকে নিয়ে ডাকাতের ব্যাপারটা শোনার পর মায়ের সম্পর্কে তাদের একটা মন্তব্য সিতুর কানে লেগেছিল। ও যাতে বুঝতে না পারে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে সুবীরের দাদা ইংরেজীতে সমরের দাদার কাছে তার মায়ের সম্পর্কে যা বলেছিল, তার মধ্যে 'বিউটি স্টার' শব্দটা ছিল। কি বলা হল সিতু যে মোটামুটি ঠিকই বুঝেছে ওরা তা জানে না। ফুটবল খেলায় একটা ভালো গোল হলে সকলে 'বিউটি বিউটি' বলে চেঁচিয়ে ওঠে। পাড়া থেকে একটু এগোলেই বিরাট সাইনবোর্ডে সুন্দর একটা মেয়ের ছবি আঁকা দোকানের নাম 'বিউটি স্টোরস'। পাড়ার বড় ছেলেদের উচ্ছ্বাসেও অনেক সময় 'বিউটি-লাভলি' শব্দগুলো কানে আসে। অতএব বিউটি শব্দটার অর্থ সম্বন্ধে প্রায় স্পষ্টই ধারণা আছে। আর স্টার বলতে দু'রকমের স্টার জানে সে। এক, আকাশের স্টার, আর

এক ফিল্মস্টার। তা মা-কে আর আকাশের স্টার বলবে কেন ওরা। মায়ের চেহারা সম্পর্কে এইসব আলোচনা কোন সময়ে খারাপ লাগে না সিতুর, বরং আনন্দ হয়, গর্ব হয়। কিন্তু এ আবার কি ফ্যাসাদ হল তার!

কে বলেছে? জবাব না পেয়ে মায়ের গলার অনুচ্চ স্বর আর স্থির চাউনি দুই-ই আরো কঠিন।

সেদিকে চেয়ে সিতুর কেমন মনে হল মিথ্যে বললেই ধরা পড়বে। কপাল ঠুকেই করুণ জবাব দিল, আমি—

ছেলের মুখ আবার কয়েক নিমেষ দু চোখের আওতায় আটকে রাখলেন জ্যোতিরাণী।—তুই সিনেমার মেয়ে দেখেছিস?

কি জবাব দেবে সিতু হঠাৎ ভেবে পেল না। কিছুকাল আগে মায়ের সঙ্গেই তো বিষ্ণুপ্রিয়া আর টারজানের ছবি দেখেছে। কিন্তু মা সিনেমায় দেখার কথা জিজ্ঞাসা করছে না নিশ্চয়। মাথা নাড়ল, দেখেনি।

তবে শমীকে বললি কি করে?

তুমি দেখতে কত সুন্দর ওকে বোঝাবার জন্যে।

জ্যোতিরাণীর হেসে ফেলাও বিচিত্র ছিল না। কিন্তু এই মেজাজে হাসির বদলে ভিতরটা রাগে রি-রি করে উঠল। ইচ্ছে করল এক থাপ্পড়ে খাট থেকে ওকে মাটিতে ফেলে দিতে। সংযত করলেন নিজেকে। সত্যি বললে কিছু করবেন না কথা দিয়েছিলেন, কথা রাখলেন। বাড়ির আর বাইরের যে বাতাসে ও বড় হচ্ছে, সেই বাতাসটাই বদলানো দরকার। তাছাড়া মার-ধর করে কিছু হবে না। আর দেরি না করে সেই ব্যবস্থাই করবেন তিনি।

দরজা খুলে দিয়ে বললেন, যাও। ফের যদি কারো বাড়ির রকে বসে আড্ডা দিতে দেখি তো আস্ত রাখব না বলে দিলাম।

সুবোধ বালকের মত সিতু প্রস্থান করল। মায়ের শেষের অনুশাসন নতুন কিছু নয়। দুই-একটা দিন সামলেসুমলে থাকতে হবে এই যা। আসলে মায়ের আজকের এই আচরণ তার কৌতূহলের কারণ। ওই মুখ করে ঘরে আটকে দরজা বন্ধ করতে দেখে প্রথমে তার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়েছিল।

ব্যবস্থার কথা জ্যোতিরাণী কিছুদিন আগে থেকেই ভেবে রেখেছিলেন। আদুড় গায়ে মেঘনা এসে যেদিন হেসে গড়িয়েছিল, আর ছোট মনিবের শাসনের কথা বলেছিল—সেদিন থেকেই। নিয়মের কড়াকড়ি আর সংযমের মধ্যে ছেলে মানুষ করা হয় সে-রকম কয়েকটা ভালো সংস্থার নাম-ঠিকানাও সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। সেই রাতেই যাবতীয় বিধি-ব্যবস্থার কাগজপত্র পাঠাবার জন্য অনুরোধ করে কাছে-

দূরের চার-পাঁচ জায়গায় চিঠি লিখলেন তিনি। খরচ যত লাগুক আপত্তি নেই, সব থেকে ভালো ব্যবস্থা কাদের তাই জেনে নিতে চান। জবাব এলে নিজে গিয়ে দেখে আসবেন।

গৌরবিমলের অনাড়ম্বর তত্ত্বাবধানে, জ্যোতিরাণীর একাগ্র উদ্দীপনায় আর মৈত্রেয়ী চন্দের উচ্ছ্বসিত তৎপরতায় প্রভুজীধাম রূপ নিচ্ছে, আকার নিচ্ছে।

রেজিস্ট্রেশনের কাজ চুকে গেছে। ব্যাঙ্কে দু'রকমের অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। ছোট অ্যাকাউন্টের লেন-দেন জ্যোতিরাণী একাই করতে পারবেন। বড় অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তোলার ব্যাপারে আগের ব্যবস্থাই বহাল আছে। গৌরবিমল, কালীনাথ আর জ্যোতিরাণী—যে-কোন দুজনের সইয়ে টাকা উঠবে। এই তিনজনের বাইরে ট্রাস্ট কমিটিতে শুধু মৈত্রেয়ী চন্দ আছেন। গৌরবিমল বিভাস দত্তর নামটা রাখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু জ্যোতিরাণী এক কথায় সে-প্রস্তাব ছেঁটে দিয়েছেন। বলেছেন, দরকার নেই, ওঁকে এ-সবের মধ্যে পাওয়া যাবে না।

কালীনাথের সামনেই মৈত্রেয়ী চন্দ আর একটা নাম দেখিয়ে গম্ভীর মুখে বলেছেন, এই নামটাতেও আমার আপত্তি—এও বাতিল করলে ভালো হয়।

নামটা কালীনাথের। মামাশ্বশুর সামনে বসে বলেই জ্যোতিরাণী একটু বিরক্ত হয়েছেন। আবার বিব্রতও বোধ করেছেন। কিন্তু গৌরবিমল অবাক, কালী থাকলে আপনার আপত্তি···?

আরো গম্ভীর হয়ে মৈত্রেয়ী মাথা নেড়েছেন।—হ্যাঁ, এ-বয়সে মাস্টারমশায় সহ্য হয় না।

রসিকতা ধরে নিয়ে গৌরবিমল হেসেছেন। আর হেসে ফেলেছিলেন জ্যোতিরাণীও। কালীনাথ ঘরের ছাদে চোখ রেখে মন্তব্য করেছেন, এই আপত্তিতে আমার সমর্থন আছে, কারণ মাস্টার থাকলেই তার হাতে ছড়ি থাকবে।

যাই হোক, আপত্তি এবং সমর্থন দুই-ই নাকচ করা হয়েছে। ট্রাস্ট কমিটির প্রধানা জ্যোতিরাণী এবং সংস্থার সর্বময়ী কর্মাধ্যক্ষা মৈত্রেয়ী চন্দ। গৌরবিমল প্রভুজী-ধাম সংস্কারে মন দিয়েছেন। জঙ্গল পরিষ্কার করা হচ্ছে, পুকুর সাফ করা হচ্ছে, বাড়িটারও ভোল ফেরাবার জন্য অনেক লোক লেগে গেছে। মৈত্রেয়ীকে নিয়ে জ্যোতিরাণী প্রায়ই দেখতে যান, এক-একদিন বীথিকেও সঙ্গে নেন। আর তখন ধমকেই তাকে একটু-আধটু সাজ-পোশাক করিয়ে ছাড়েন মৈত্রেয়ী। তার প্রতি মিত্রাদির প্রচ্ছন্ন টানটুকু জ্যোতিরাণী অনুভব করতে পারেন।

কাগজে সেদিন ছোট খবর বেরুলো একটা। জ্যোতিরাণীর চোখে পড়েনি।

তাঁকে খবরটা দেখালো সিতু। ইদানীং তাকে খুব মনোযোগসহকারে কাগজ পড়তে দেখা যাচ্ছে। জ্যোতিরাণীর ধারণা খেলার খবর পড়ে, ক্রিকেট মৌসুম আসছে। ছেলের ওপর সেই থেকেই যতটুকু সম্ভব নজর রেখে চলেছেন তিনি। কাগজ এনে যা দেখালো সেটা প্রভুজীধামের খবর। অল্প দু-চার কথায় জ্যোতিরাণী আর মৈত্রেয়ীর প্রশস্তি। যে উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে সরকার হিমশিম খাচ্ছে, তারই এক অংশকে সুস্থ নির্বিঘ্ন জীবনে ফিরিয়ে আনার আদর্শ পরিকল্পনায় দুটি অভিজাত মহিলার এই প্রয়াসকে সাধুবাদ জানানো হয়েছে। প্রশংসা জ্যোতিরাণীরই বেশি —নগর পারে তাঁর বিরাট সৌধ আর চার-পাঁচ লক্ষ টাকা নিয়ে এগিয়ে আসার খবরটাও বাদ পড়েনি।

কাগজে খবরটা কে পাঠালো জ্যোতিরাণী ভেবে পেলেন না। মিত্রাদি রোজই আসছে। আলোচনা করে, এখন কাগজে লেখা হবে কি না হবে, সাজ-সরঞ্জাম কি থাকবে না থাকবে। তাকে জিজ্ঞাসা করে বোঝা গেল খবরের কাগজে তার মারফত কোনো রিপোর্ট যায়নি। খবর পড়ে খুশিতে আটখানা হয়ে ফিরে তাঁকেই জিজ্ঞাসা করেছে, খবরটা কে ছাপতে দিলে। আর তাহলে বাকি থাকল কালীদা আর বিভাস দত্ত। মামাশ্বশুর এ-সবের মধ্যে যাবেন না জানা কথা, তিনি প্রচারের ধার ধারেন না। কালীদার কাজ তাও মনে হয় না, জ্যোতিরাণীর ধারণা কাগজের আপিসে খবরটা বিভাস দত্তই পাঠিয়েছেন। কাগজের আপিসের সঙ্গে একটু-আধটু যোগাযোগ ওই ভদ্রলোকেরই আছে। তাছাড়া রিপোর্টের প্রশংসার মধ্যে জ্যোতিরাণীর নাম আর সহৃদয় দানের বিশেষ উল্লেখ দেখেও তাঁর কথাই মনে হয়েছে।

দুদিন বাদে বিকেলের দিকে বাড়িতে এক অপরিচিত ভদ্রলোকের সাক্ষাৎ মিলল। বয়েস তিরিশ-বত্রিশের মধ্যে। হাতে ক্যামেরা, ফ্ল্যাশ বাল্ব-এর ছোট চামড়ার থলে। নীচের বসার ঘরে জ্যোতিরাণী ছিলেন আর মৈত্রেয়ী ছিলেন। গোড়ায় কটি মেয়ে নেওয়া হবে, কিভাবে নেওয়া হবে, কোন্ গোছের মেয়ে নেওয়া হবে, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে কিনা—সেই ফয়সালাই হয়ে ওঠেনি এখনো।

এরই মধ্যে ওই ভদ্রলোকের আবির্ভাব। নামী কাগজের রিপোর্টার। সপ্রতিভ হাবভাব। ভুল জায়গায় আসার পাত্র নন। বারান্দা থেকে রমণী দুটিকে দেখামাত্র দৃষ্টি প্রসন্ন। অনুমতি নিয়ে ঘরে ঢুকলেন. নিজের পরিচয় দিলেন। তারপর একে একে দুজনের দিকে চেয়েই নির্ভুল অনুমানের কৃতিত্ব দেখালেন।—আপনি মিসেস জ্যোতিরাণী চ্যাটার্জি আর আপনি মিসেস মৈত্রেয়ী চন্দ তো?

জ্যোতিরাণী বিস্মিত একটু। মৈত্রেয়ীর চোখে-মুখে চাপা খুশির ছটা।

পকেট নোট-বই বার করে রিপোর্টার অসময়ে বিরক্তি করার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন। প্রভুজীধাম সম্পর্কে তাঁদের কাগজে যে ছোট রিপোর্টটা বেরিয়েছে, তারই বিশদ বিবরণ সংগ্রহের তাগিদে আসা। বলা বাহুল্য, এখানে আসার পর আর বিশেষ করে প্রতিষ্ঠান-প্রধানাকে দেখার পর তাঁর বিবরণ সংগ্রহের তাগিদ আগ্রহের আকার নিয়েছে।

কিন্তু জ্যোতিরাণী বেশির ভাগ সময় চুপচাপ। সকৌতুকে মিত্রাদিকে লক্ষ্য করছেন। পারেও। রিপোর্টার এক কথা জিজ্ঞাসা করলে মৈত্রেয়ী সাত কথা বলছেন। শেষে জিজ্ঞাসা করারও দরকার হল না। কি হতে যাচ্ছে, কি হবে আর দেশের মানুষ সাড়া দিলে কি হতে পারে—এ নিয়ে ছোটখাটো একটা লেকচার দিয়ে বসলেন তিনি। এত বড় আদর্শ পরিকল্পনার মধ্যে বারবার করে জ্যোতিরাণীর দাক্ষিণ্যের প্রচারটা যখন পুষ্ট করে তুলছিলেন তিনি, তখনই শুধু অস্বস্তি। প্রভুজীধাম সম্পর্কে এক বিস্তৃত চিত্র সংগ্রহ করে রিপোর্টার জ্যোতিরাণীর দিকে ফিরলেন।—এরকম একটা সংকল্প আপনার মনে এলো কি করে?

জ্যোতিরাণী তক্ষুনি মৈত্রেয়ীকে দেখিয়ে দিলেন।—ওঁর জন্যে।

মৈত্রেয়ী চন্দ খুশি মুখে চোখ পাকালেন। কাগজের মানুষটি এ-রকম সংক্ষিপ্ত জবাবে তুষ্ট নন। প্রতিষ্ঠানের টাকা-পয়সা আর ঘর-বাড়ির প্রসঙ্গে নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন। কিন্তু ওই-রকম এক কথা দু'কথার বেশি জবাব যোগালো না জ্যোতিরাণীর মুখে। অগত্যা নোট-বই বন্ধ করে ভদ্রলোক ক্যামেরার দিকে মন দিলেন। নরম চামড়ার ব্যাগ থেকে ফ্ল্যাশ বাল্ব বার করতে করতে বললেন, আপনাদের আর একটু কষ্ট দেব, আলাদা দুটি ছবি তুলব আর একসঙ্গে একটা—

জ্যোতিরাণীর মুখে বিড়ম্বনার চকিত ছায়া। কি ভেবে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। —একটু বসুন, আসছি—

দোতলার সিঁড়িতে পা দেবার আগেই বাধা পেলেন, তাঁর পিছনে মৈত্রেয়ীও উঠে এসেছেন। চাপা গলায় ডেকে থামালেন। তাঁর অনুমান, ফোটো তোলা হবে বলে একটু প্রসাধন সেরে আসতে যাচ্ছেন। ডাকলে তিনিও সঙ্গ নিতে পারেন। কিন্তু একটা কর্তব্য-কর্ম স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যেই উঠে এসেছেন তিনি। বললেন, শোনো, কাগজের লোকদের সর্বদা পায়া ভারী, এলে একটু চা-টা দিয়ে খাতির-যত্ন করতে হয় কিন্তু…।

ও, মিত্রাদির উদ্দীপনা দেখে জ্যোতিরাণীর হাসি পেল—কাগজের লোকেরা যে তোমার গুরুঠাকুর বোঝা গেছে, করছি খাতির-যত্ন, তুমি বোসোগে যাও।

ওপরে উঠে গেলেন। মুখের কি ছিরি হয়ে আছে কে জানে—বলার আর

অবকাশ পেলেন না মৈত্রেয়ী। অগত্যা ঘরেই ফিরলেন।

দু-চারজনের জলযোগের ব্যবস্থা মজুতই থাকে। ভোলার চা তৈরিও সারা। কর্ত্রীর নির্দেশে তক্ষুনি চা-জলখাবার সাজিয়ে নিয়ে ছুটল সে।

জ্যোতিরাণী নেমে এলেন মিনিট আট-দশ বাদে। দেখলেন, মিত্রাদি সাধাসাধি করে খাওয়াচ্ছে ভদ্রলোককে। নিজের খাবারটা তেমনি পড়ে আছে।

পরিতুষ্ট সাংবাদিক জলযোগ সেরে আবার ক্যামেরা হাতে নিলেন। আর তক্ষুনি একবার ওপর থেকে ঘুরে আসার বাসনা ব্যক্ত করতে গিয়ে থমকালেন মৈত্রেয়ী চন্দ। জ্যোতিরাণীর দিকে চেয়ে কোনরকম প্রসাধন বিন্যাসের আভাসও পেলেন না।

ওদিকে রিপোর্টার ভদ্রলোকও ক্যামেরায় মন দেবার অবকাশ পেলেন না। জ্যোতিরাণী বললেন, আমাদের ছবি তোলার দরকার নেই, আপনি এটা নিয়ে যান। একটা পাসপোর্ট সাইজের ফটো তাঁর দিকে এগিয়ে দিলেন।

অপ্রস্তুত মুখে ভদ্রলোক সেটা হাতে নিয়ে দেখলেন।—ইনি মিস্টার চ্যাটার্জি বোধ হয়?

হ্যাঁ। ছবি যদি ছাপতেই হয় এইটে ছাপুন। আমরা যা-কিছু করতে যাচ্ছি, এঁর জন্যেই সম্ভব হয়েছে।

মৈত্রেয়ীর দু চোখ জ্যোতিরাণীর মুখের ওপর বিচরণ করে ফিরল একপ্রস্থ। কাজ সহজ হয়ে গেল বলে রিপোর্টারটি গাত্রোত্থান করলেন না তক্ষুনি। বললেন, বেশ তো, কিন্তু এই সঙ্গে আপনাদেরও একখানা করে ছবি নেব, আসল কাজ তো আপনারাই করবেন।

জ্যোতিরাণী মিষ্টি করেই বাধা দিলেন, আসল কাজ বলে কিছু নেই, এর পিছনে আরো অনেকে আছেন—ছবি যদি ছাপতেই হয়, দয়া করে ওইটেই ছাপুন।

এবারে মৈত্রেয়ীও সায় দিলেন, আসল মানুষকেই যদি খোঁজেন, তাহলে ওই ছবিখানা ছাপলেই হবে, এই ভদ্রলোকের টাকা আর সহানুভূতি না থাকলে এত বড় এক ব্যাপারে হাত দেবার কথা ভাবাও যেত না।

অগত্যা আসল মানুষের ছবি নিয়েই বিদায় নিতে হল ভদ্রলোককে। সঙ্গে সঙ্গে একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে মৈত্রেয়ী বললেন, এভাবে হতাশ করলে বেচারাকে?

জ্যোতিরাণী হাসিমুখে পাল্টা ঠেস দিলেন, হতাশ একটু তুমিও হয়েছ মনে হচ্ছে।

তা যা বলেছ ভাই, সানন্দে স্বীকারই করলেন মৈত্রেয়ী চন্দ, ছবি তোলার জন্য আমি আরো আঁট-সাঁট হয়ে বসতে যাচ্ছিলাম—ভাগ্যি বলে ফেলিনি কিছু! হেসেই অনুযোগ করলেন, তোমার যদি কিছু শখ থাকত, পাশাপাশি দিব্বি তিনজনের ছবি

বেরুতো, হাজার হাজার লোক দেখত, আর সত্যি কিছু করতে যাচ্ছি বলে নিজেদেরও আনন্দ হত, তুমি দিলে পণ্ড করে।

আগে বললে না কেন, তিনজন ছেড়ে পাশাপাশি না হয় দুজনেরই বেরুতো।

থাক্, অত ভাগ্যে কাজ নেই। ছবি তুলতে পারলে কাগজে যা বেরুবার বেরুতো। কিন্তু বউকে লুকিয়ে রিপোর্টার ভদ্রলোকের নিজস্ব ফাইলে শুধু একখানি ছবিরই জায়গা হত, বুঝলে?

জ্যোতিরাণী হেসে ফেললেন।—না তুলতে দিয়ে তাহলে ভালো করেছি বলো।

খবরের কাগজের রিপোর্টারকে দেখে ভিতরে ভিতরে একটাই খবর জানার জন্যে উৎসুক হয়েছিলেন জ্যোতিরাণী। প্রভুজীধাম সম্পর্কে যে রিপোর্ট গোড়ায় ছাপা হয়েছে, সেটা তারা পেল কোথায়। কিন্তু মিত্রাদি ছিল বলেই জিজ্ঞাসা করে উঠতে পারেননি। কারণ তখনো ধারণা জিজ্ঞাসা করলে বিভাস দত্তর নামটাই শুনবেন। সেই রিপোর্টে জ্যোতিরাণীর প্রশংসায় বিশেষ উল্লেখের দরুন মিত্রাদিকে রসের খোরাক যোগাতে রাজি নন তিনি।

ইতিমধ্যে রোজই কাগজ উল্টে মৈত্রেয়ী সত্যিই হতাশ হয়েছেন। অনুযোগ করেছেন, ছবি তুলতে দাওনি সেই আক্কেল দিচ্ছে ভদ্রলোক, রাগ করে কোনো খবরই বার করলে না।

খবর চার দিনের দিন বেরুলো। বেশ বিস্তৃত খবর। ওপরে শিবেশ্বর চাটুজ্যের ছবি। বড় বড় হরপে তাঁর অবদানের শিরোনামা।

প্রথমেই কাগজ দেখেছেন কালীদা, তিনি মামাশ্বশুরকে দেখিয়েছেন। তাঁরা যেমন অবাক তেমনি খুশি। সিতুও সাগ্রহে বাবার ছবি দেখেছে, খবর পড়েছে। আনন্দে মিত্রাদি পনের মিনিট ধরে টেলিফোনে বক-বক করেছে। বলেছে, কাগজের ওই ছবির পাশে তুমিও থাকলে ভালো হত—বেশ ভরাট দেখাতো—এখন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। জিজ্ঞেস করেছে, শিবেশ্বরবাবু কি বলেন?

দুই-একটা হাল্কা জবাব দিয়ে জ্যোতিরাণী তাকে আরো খুশি করেছেন।

গত রাতে বাড়ির মালিক কখন বাড়ি ফিরছেন জ্যোতিরাণী টের পাননি। বেশি রাতেই ফিরেছেন মনে হয়। যতক্ষণ জেগে ছিলেন পাশের ঘরে আলোর আভাস দেখেননি।

সকালের কাগজে ছবি আর খবর বেরুবার পর এই একটি মুখের প্রতিক্রিয়া দেখার বাসনা জ্যোতিরাণীরও মনে মনে ছিল। বেশ বেলা পর্যন্ত ঘরের বাইরে তাঁর সাক্ষাৎ মেলেনি বলে ভিতরে ভিতরে অস্বস্তিও একটু। এই সামান্য ব্যাপারেও

মাথা গরম হল কিনা কে জানে। মানের পরদা তো বাতাসে নড়ে এখন।

শামু খবর দিল একজন শিল্পী দেখা করতে এসেছেন। ব্যস্ত হয়ে জ্যোতিরাণী নেমে এলেন। ভালো আঁকতে পারে মিত্রাদির কাছে এমন একজন শিল্পীর সন্ধান চেয়েছিলেন তিনি। একই ব্যাপারে মামাশ্বশুরের সামনে কালীদাকেও অনুরোধ করেছিলেন। উদ্দেশ্য, প্রভুজীধামে প্রভুজীর একখানা প্রমাণ আয়তনের রঙিন ছবি থাকবে। কালীদা অবাক হয়েছিলেন, পরে ঠাট্টা করেছিলেন, মানিকরাম নাম শুনেই ছবি এঁকে দেবে এমন শিল্পী তো দেখিনে—তবে আমাকে আর মামুকে দেখে কমবাইন্ করে আঁকলে কাছাকাছি কিছু একটা হতে পারে বটে। শুনেছি ভদ্রলোক ধার্মিকও ছিলেন আবার ঝানু বাস্তববাদীও ছিলেন। আর মিত্রাদি এক মস্ত শিল্পীর নাম করেছিল। বলেছিল, একটু-আধটু পরিচয় আছে, ভয়ানক খেয়ালী মানুষ, কাজ হবে কিনা বলা শক্ত—তবে আলাপ করে দেখা যেতে পারে।

সেই নাম-করা শিল্পীই বাড়িতে হাজির।

এদিকে নীচে আপাতদৃষ্টিতে ছোট্ট একটা যোগাযোগের খবর জ্যোতিরাণী রাখেন না। ঘরে ঢুকেই অবাক তিনি। শিল্পীর সামনে গম্ভীর মুখে সিতু বসে আছে, আর তার দিকে চোখ রেখে ভদ্রলোক একটা সাদা কাগজে খস-খস আঁচড় ফেলেছেন।

আধ মিনিটের মধ্যে সাদা কাগজে সিতুর মুখের আদল ভেসে উঠল। ভদ্রলোক সেটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে একগাল হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন—পাস, না ফেল?

বিস্ফারিত সিতু সাদা কাগজ দেখছে কি ম্যাজিক দেখছে জানে না। জ্যোতিরাণীও সাগ্রহে লক্ষ্য করলেন কাগজটা। হুবহু সিতুর মুখই বটে। ভিতরে ভিতরে কি অনুভূতির ফলে হঠাৎ যেন নির্বাক তিনি। ধরা-ছোঁয়ার বাইরে কি আনন্দের স্পর্শ যেন। কিসের আনন্দ, কেন আনন্দ জানেন না।

শিল্পীর বয়েস খুব বেশি নয়, বছর পঞ্চাশের মধ্যে। ঝাঁকড়া একমাথা কাঁচা-পাঁকা চুল, খোঁচা-খোঁচা একগাল কাঁচা-পাঁকা দাড়ি। পরনের মোটা জামা-কাপড়ও ফরসা নয় তেমন। পান-খাওয়া ঠোঁট। হাসিমুখে জ্যোতিরাণীর দিকে ফিরলেন। কিন্তু দৃষ্টিটা মুখের ওপর থেকে যেন নড়তে চাইল না তারপর। দু হাত জোড় করে জ্যোতিরাণী নমস্কার জানালেন, কিন্তু তারও উত্তর মিলল না।

জ্যোতিরাণী অস্বস্তি বোধ করেও করলেন না। পুরুষের নিবিষ্ট চোখ নয়। সরল চাউনি। ভালো লেগেছে তাই চেয়ে আছেন যেন। অবশ্য কয়েক মিনিট মাত্র, আত্মস্থ হয়ে শিল্পী হাত বাড়িয়ে ছেলেকে কাছে টেনে নিলেন।—আপনার ছেলে?

এ ধরনের আলাপে অভ্যস্ত নন, জ্যোতিরাণী কৌতুক বোধ করছেন। মাথা নাড়তে একগাল হেসে ভদ্রলোক তাঁর পরীক্ষার ফিরিস্তি দিলেন। অর্থাৎ একজন শিল্পী দেখা করতে এসেছেন খবর পাঠাতে শুনে ছেলে দূরে দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগে তাঁকে লক্ষ্য করছিল, তার মা কোনো পাগলের পাল্লায় পড়বে কিনা ভাবছিল বোধ হয়। তিনি ইশারায় ডাকতেকাছে এসে জিজ্ঞাসা করেছে, তুমি কিসের শিল্পী—ছবি আঁক, না গান করো, না সিনেমা করো? ছবি আঁকেন শুনে ছেলে তক্ষুনি একটা কাগজ-পেন্সিল এনে দিয়ে হুকুম করেছে, এঁকে দেখাও।

জ্যোতিরাণীর ভালো লাগছে। কেন যে এত ভালো লাগছে জানেন না। হেসে বললেন, ও ভয়ানক দুষ্টু। আপনি নিজে এসেছেন, আমার খুব ভাগ্য।

সাদাসিধেভাবেই শিল্পী জানালেন, মিসেস চন্দ তাঁকে আসতে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর মনে ছিল না। সকালের কাগজে প্রভুজীধামের খবর দেখে মনে পড়েছে। এই নামের কি এক প্রতিষ্ঠানের কথাই বলেছিলেন তিনি। কাগজ পড়েই চলে এসেছেন।

কাজের কথায় আসার জন্য ছেলেকে যেতে বলতে গিয়েও কেন যে বললেন না, তাও নিজের কাছে স্পষ্ট নয় খুব। শুধু মনে হল, আছে থাক। সবিনয়ে আরজি পেশ করলেন। বক্তব্য সংক্ষিপ্ত। শিল্পী যদি দয়া করে একবার সাগরে যান আর সেখানকার বিগ্রহ কপিলদেবের একখানা বড় অয়েল পেন্টিং করে দেন…প্রভুজীধামের জন্য বিশেষ দরকার।

ভদ্রলোক হাঁ-না কিছুই বললেন না। তাঁর দিকে চেয়ে ছেলের মাথার চুলগুলো নিয়ে খেলা করছেন। জ্যোতিরাণীর আরো একটু অভিলাষ ব্যক্ত করার ইচ্ছে। সঙ্কোচ কাটিয়ে বলেই ফেললেন, সাগরের কপিলদেবের বিগ্রহ আমি দেখিনি…কিন্তু হুবহু বিগ্রহই আমি চাইনে—তাঁর মধ্যে মানুষের আদল এনে দিতে পারলে ভালো হয়।

সিতুর মাথার ওপর শিল্পীরা আঙুল থেমে গেল, সরল চাউনিটা জিজ্ঞাসু হয়ে উঠতে লাগল। লজ্জা পেয়ে জ্যোতিরাণী একটু হেসে বললেন, এ-রকম সম্ভব কিনা জানি না, মন ও-রকম কিছু চাইছিল তাই বলে ফেললাম।

শিল্পীর চোখে কৌতূহলের আভাস, ঠিক বোঝা গেল না, আর একটু বুঝিয়ে বলুন।

ভরসা পেয়ে জ্যোতিরাণী এবারে বিশদ করেই বললেন। এ-বংশের পূর্বপুরুষদের যিনি প্রধান, তাঁর অর্থাৎ মানিকরামের উপাস্য ওই কপিলদেব। তিনি তাঁকে প্রভুজী ডাকতেন। পরের বংশধরদের চিন্তায় আর কল্পনায় মানিকরাম আর

প্রভুজী এক হয়ে গেছেন। মানিকরামই প্রভুজী। কিন্তু মানিকরামের কোনো ছবি নেই। তাই জ্যোতিরাণীর এই গোছের একটা কল্পনা মাথায় এসেছে। বিগ্রহের মধ্যে মানুষের আদল ফুটিয়ে তুললে যা দাঁড়াবে, প্রভুজীর আলেখ্য হিসেবে সেটাই প্রভুজীধামে স্থাপন করবেন।

সিতু হাঁ করে মায়ের কথা গিলছে। মা আবার এ-সব নিয়ে মাথা ঘামায় তার ধারণা ছিল না। ও বরং ঠাকুমার মুখে তাদের আগের কালের কত গল্প শুনেছে। এদিকে শিল্পীকে লক্ষ্য করছেন জ্যোতিরাণী, তাঁর উদ্ভট প্রস্তাব শুনেও হেসে উঠলেন না। উল্টে একটু তন্ময়তা দেখালেন যেন। ভাবছেন কিছু।

পূর্বপুরুষদের কার কার ছবি আছে আনুন তো। আর হালের কারো ছবি থাকলেও আনবেন।

সাগ্রহে জ্যোতিরাণী ঘর ছেড়ে তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে এলেন। পূর্বপুরুষ বলতে আদিত্যরামের ছোট একখানা রঙ-চটা হাতে আঁকা ছবি আছে। আর শ্বশুরের তো আছেই। সে-দুটো নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরতে গিয়ে জ্যোতিরাণী থমকালেন একটু। তারপর কি ভেবে ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার খুলে অ্যালবাম থেকে শিবেশ্বরেরও একটা ফোটো বেছে নিলেন।

গভীর মনোযোগে শিল্পী ছবি তিনখানা উল্টে-পাল্টে দেখলেন। তারপর হঠাৎ দু হাতে দু গাল ধরে সিতুর মুখখানা নিজের দিকে ফেরালেন তিনি। কি দেখলেন তিনিই জানেন। ওর হাত থেকে একটু আগের পেন্সিল-এ আঁকা কাগজটা টেনে নিয়ে বাকি তিনখানা ছবিসহ উঠে দাঁড়ালেন।—আচ্ছা, যদি কিছু করতে পারি তো আসব, নয়তো এগুলো ফেরত পাঠিয়ে দেব।

কোনরকম সম্ভাষণ না জানিয়ে ভদ্রলোক চলে যাবার খানিক বাদে জ্যোতিরাণীর হুঁশ ফিরল যেন। ছেলে সকৌতুকে মা-কে নিরীক্ষণ করছে।

হ্যাঁ, মাত্র কয়েকটা মুহূর্তের জন্যে জ্যোতিরাণীর কি যেন হয়েছিল। হঠাৎ বুকের ভিতরে কাঁপুনি ধরেছিল।···ভদ্রলোক সিতুর মুখটা নিজের দিকে ঘোরানো মাত্র, পেন্সিলে ওর মুখ-আঁকা কাগজটা টেনে নেওয়ার পরেও কিছুক্ষণ পর্যন্ত। কাঁপুনিটা ভয়ের নয় আদৌ, উত্তেজনারও নয়। কিসের যে, জ্যোতিরাণী জানেন না। শুধু বড় আশ্চর্য অনুভূতি একটা।

জ্যোতিরাণী বি-এ পাস করেছেন, এম-এও পড়েছেন কিছুদিন। কদিন আগেও বিলিতি নভেল পড়ে আর বিলিতি ছবি দেখে বেশির ভাগ সময় কেটেছে। শাশুড়ীর মুখে পূর্বপুরুষদের অনেক অলৌকিক আখ্যান শুনেছেন। বলতে বলতে শাশুড়ীর গায়ে কাঁটা দিয়েছে, কিন্তু জ্যোতিরাণীর বুদ্ধির দরবারে ওসব কিছু পৌঁছয়নি।

শাশুড়ী নাতির মাথায় পাকা চুল দেখে অনেক বিচিত্র কল্পনায় গা ভাসিয়েছেন আগে—জ্যোতিরাণী কখনো হেসেছেন, কখনো বিরক্ত হয়েছেন। স্বাধীনতার রাতে ওর বাবা যেদিন চাবুকের ঘায়ে ছেলের পিঠের ছাল-চামড়া তুলে দিয়েছিল, আর তারপর ঘুম-ভাঙা জ্বরের ঘোরে ছেলের চোখের গলানো বিদ্বেষের ঝাপটা খেয়ে জ্যোতিরাণী যখন নিজের ঘরে ফিরে এসেছিলেন—হতাশার সেই এক রাতেই শুধু এই গোছের একটা দুর্বোধ্য শিহরণ তিনি অনুভব করেছিলেন, মনে পড়ে। কিন্তু তাও ঠিক এই রকমই নয় বোধ হয়।

শিল্পী চলে যাবার পর খেয়াল হল টাকা-পয়সার কথা বা সাগরে যাতায়াতের ব্যবস্থা করে দেওয়ার কথা কিছুই বলা হল না। অবশ্য ভদ্রলোককে যে-রকম দেখলেন, খেয়াল থাকলেও মুখ ফুটে বলতে পারতেন কিনা সন্দেহ।

ছেলেকে স্কুলের তাড়া দিয়ে গভীর একটা পরিতৃপ্তি নিয়ে তিনি ওপরে উঠে এলেন। অনেক—অনেককালের গ্লানি অনেক তাপ অনেক ক্ষোভে ক্লিষ্ট স্নায়ুগুলোর ওপর ভারী আশ্চর্যরকমের একটা ঠাণ্ডা প্রলেপ পড়েছে। কি, সেটা এখনো ঠাওর করতে পারছেন না। সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করছেন আর আস্বাদন করছেন শুধু। এখন গোটাগুটি বাস্তবে ফিরেছেন, কিন্তু অনুভূতিটুকু ছড়িয়ে আছে। বাস্তবে ফিরেছেন, তবু ভাবছেন, বাড়িতে কত লোকই তো আসে যায়, শিল্পীর সঙ্গে ছেলেটার এমন একটা কৌতুককর যোগাযোগ হল কি করে…।

দোতলায় পা দিয়েই জ্যোতিরাণী ব্যস্তসমস্ত ভোলাকে মনিবের ঘর থেকে বেরুতে দেখলেন, ব্যস্ততা তাঁরই উদ্দেশে। খবর দিল, বাবু ডাকছেন—

কিছু জিজ্ঞাসা না করে পায়ে পায়ে এগোলেন। নটা বেজে গেছে সকাল, ওদের মনিব এখনো ঘরে কেন জানেন না। এই গোছের ডাক শুনলে গোচরে হোক বা অগোচরে হোক প্রস্তুতির দরকার হয় একটু। তাই শিথিল গতি। কোনো বিরাগের কারণ ঘটে থাকতে পারে কিনা চকিতে ভেবে নিলেন। সকালের কাগজে প্রভুজীধামের খবর আর ছবি ছাড়া আর কিছু তো দেখছেন না। কিন্তু যা-ই হোক, একটুও উতলা নন তিনি। একটু আগে ওই খেয়ালী শিল্পী কি যে দিয়ে গেলেন তাঁকে, কে জানে। সেই প্রশান্তি নিয়েই পুরু পরদা সরিয়ে ঘরে ঢুকতে পারলেন তিনি।

শিবেশ্বর শয্যায় শুয়ে আছেন, বুক পর্যন্ত চাদরে ঢাকা। পাশে গোটা দুই-তিন খবরের কাগজ পড়ে আছে। নীরব মনোযোগে একটা বিদেশী ইন্ডাস্ট্রিয়াল জার্নাল পড়ছেন।

মুখখানা শুকনো মনে হল জ্যোতিরাণীর। কাছে এসে দাঁড়ালেন।

জার্নাল থেকে চোখ সরল। আঙুল দিয়ে বিছানার লাগোয়া টেলিফোন স্ট্যাণ্ডটা দেখিয়ে দিলেন শিবেশ্বর।

জ্যোতিরাণী ওটা লক্ষ্য করেননি আগে। রিসিভারটা নামানো দেখলেন। অর্থাৎ তাঁর টেলিফোন এবং সেইজন্যেই তলব।

সাড়া দিতে ওধার থেকে যার প্রগল্ভ উচ্ছ্বাস ভেসে এলো সে বিক্রম পাঠক। —নমস্তে ভাবীজী, এক্ষুনি ছুটে গিয়ে তোমার মুখখানা দেখে আসতে ইচ্ছে করছে!

জ্যোতিরাণী হাল্কা জবাব দিলেন, আমার মুখ দেখে কি হবে, হাসপাতালে যাঁকে পাঠিয়েছিলেন তিনি ফেরেননি এখনো?

ওদিক থেকে হা-হা হাসির শব্দের তোড়ে কানের পরদা ঝালাপালা। রিসিভার একটু সরিয়ে জ্যোতিরাণী জার্নালে নিবিষ্ট সামনের মানুষটাকে দেখে নিলেন এক পলক।

হাসি থামিয়ে বিক্রম জানালো, ফিরেছে—একেবারে মেয়ে নিয়ে ফিরেছে। ভাবীজীকে আর একটু কাছে পাবার লোভে এখন থেকেই ছুঁড়িটার সঙ্গে দাদার ছেলের বিয়ে দেবার বাসনা। বলেই আর একপ্রস্থ হাসি।

জ্যোতিরাণী পাল্টা ঠাট্টা করলেন, মেয়ের বিয়ের বয়েস পর্যন্ত ওই লোভে ভাঁটা পড়বে আশা করা যায়।

বিক্রম সবিক্রমে প্রতিবাদ জানালো, নেভার! তার আগে আমি যেন অন্ধ হয়ে যাই। যাক, যে-জন্যে ডেকেছিলাম, তুমি যে আমাদের একেবারে ম্যাজিক দেখিয়ে ছেড়ে দিলে, অ্যাঁ?

কি করলাম?

সকালের কাগজ খুলে আমি হাঁ। কি করে কি হল, দাদাও কিছু জানে না শুনলাম। ওদিকে দাদার মুখে তোমার প্রতিষ্ঠানের গল্প শুনে প্ল্যান কষে কাগজের আপিসে প্রথমবারের সেই রিপোর্ট পাঠিয়ে আর তদবির-তদারক করে এসে আমি কি আশা নিয়ে বসেছিলাম—তার বদলে এই!

অভিযোগ শুনে জ্যোতিরাণী অবাক।—প্রথমবারের ওই রিপোর্ট আপনি পাঠিয়েছিলেন?

না তো কি? জানুয়ারীর গোড়ায় আমাদের সেই ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট ইলেকশন না? আমি দাদার প্রচারসচিব, তোমাকে সঙ্গে করে যুদ্ধে নামব বলে সুযোগ পেয়ে কাগজে তোমারও একদফা জাঁকালো প্রচারের ব্যবস্থা করেছিলাম—রিপোর্টারকে লোভ দেখিয়ে এসেছিলাম, এমন রূপসী মহিলা আর দেখোনি বাছা, চোখ জুড়োতে চাও তো বাড়ি গিয়ে দেখা করো, তারপর ঢালা খবর আর ছবি

ছাপো। একটু আগে ওদেরও ফোন করেছিলাম, ওরা বললে নিজের ছবি ছাপতে দিতে তুমি কিছুতে রাজি হলে না। দাদার ছবি দিয়েছ। বেশ করেছ, কিন্তু পাশে তুমি নেই কেন?

কথা শোনার ফাঁকে জ্যোতিরাণী চকিতে আর একবার সামনের শোয়া-মানুষটার দিকে তাকিয়েছেন। পড়ায় ছেদ পড়েছে, জার্নাল সামনে ধরে এদিকেই চেয়ে ছিলেন। বিক্রম বেফাঁস কিছু বলছে কিনা বোঝার চেষ্টা মনে হল। চোখো-চোখি হতে দৃষ্টি আবার জার্নালের দিকে ঘুরেছে।

হাসিমুখেই জ্যোতিরাণী জবাব দিলেন, এত-সব প্ল্যানের কথা কি করে জানব বলুন। তবু পাশে না থাকি, কাগজটা পড়ে দেখুন, ভিতরে বেশিই আছে। তাছাড়া ঘরের বউয়ের একটু আড়ালে থাকাই ভালো।

বিক্রমের আর একদফা দরাজ হাসি।

জার্নালে মনোযোগ দেখেও রিসিভার রেখে জ্যোতিরাণী তক্ষুনি চলে গেলেন না। খানিক আগের প্রশান্তির প্রলেপে এখনো আঁচড় পড়েনি, পড়তে দেননি তিনি। দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলেন একটু।—তোমার শরীর খারাপ নাকি?

জার্নাল রেখে নির্লিপ্তমুখে শিবেশ্বর ফিরলেন তাঁর দিকে। জবাব না দিয়ে সামনের কাগজটা তুলে নিয়ে প্রভুজীধামের খবরের পাতাটা খুললেন।—এটা কি ব্যাপার?

বিক্রমের টেলিফোন ধরার জন্য তাঁকে ডেকে পাঠাবার আগে ব্যাপার সম্বন্ধে আলোচনা হয়েইছে জানেন। আর, এখন কথাবার্তা যা হল তাও সবটুকুই কানে গেছে। জ্যোতিরাণী কি বলবেন? নরম সুরেই ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, অন্যায় করেছি?

তোমাকে তো সেদিন বলেছিলাম এর মধ্যে আমি নেই।

তুমি আছ সে-কথা তো বলা হয়নি, বরং আমার সম্বন্ধেই বেশি-বেশি লেখা হয়েছে। তুমি ভিন্ন এক পা-ও এগনো যেত না সে-কথাই বলেছি, আর সেইজন্যেই তোমার ছবি দিয়েছি।...তাও ভদ্রলোক ছবির জন্যে ঝকাঝকি করল বলে।

কাগজ রেখে শিবেশ্বর আবার জার্নালটা তুলে নিলেন। নিস্পৃহ, ভাবলেশ-শূন্য। জ্যোতিরাণী তবু অপেক্ষা করলেন একটু। তারপর চলে এলেন। কোন-রকম অপ্রিয় বাদানুবাদের ব্যাপার দাঁড়ালো না তাতেই স্বস্তি। খেয়ালী শিল্পীর যোগাযোগে খানিক আগের ওই দুর্বোধ্য পরিতৃপ্তির অনুভূতিটুকু কেটে যায়নি।

বিকেলের দিকে মৈত্রেয়ী এলেন। নিয়মমতই আসছেন এখন। উৎসাহে ভর-

পুর। সকালের কাগজে ওই প্রশস্তি দেখার পর উদ্দীপনা আরো বেশি হবার কথা। অথচ আজই তাঁকে কেমন বিমনা দেখালো একটু। সে-রকম হাসি নেই, সে-রকম খুশিও ঠিকরে পড়ছে না।

থেকে থেকে জ্যোতিরাণীর মনে হয়েছে, ভিতরে ভিতরে মিত্রাদির কিছু একটা অস্বস্তির কারণ ঘটেছে।

এ-কথা সে-কথার পর মৈত্রেয়ী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, শিবেশ্বরবাবু আজ আপিসে যাননি বুঝি ?

না। তোমাকে কে বললে ?

মৈত্রেয়ী হাসতে চেষ্টা করলেন, দুপুরে টেলিফোন করেছিলেন—

হাসির আড়ালে মিত্রাদির অস্বাচ্ছন্দ্যটুকু জ্যোতিরাণী ঠিকই লক্ষ্য করলেন। জিজ্ঞাসু চোখে কিছু শোনার অপেক্ষা।

কিছু একটা প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হয়ে গেছে বলেই মৈত্রেয়ী আরো বিড়ম্বিত যেন। একটু থেমে আস্তে আস্তে বললেন, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ভাবছিলাম···তুমি আবার কিছু বলে ভদ্রলোককে আরো রাগিয়ে দেবে না তো আমার ওপর ?

জ্যোতিরাণী ফিরে প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন ভদ্রলোকের রাগ-বিরাগে তার কি আসে যায়। মিত্রাদির অস্বস্তি লক্ষ্য করেই বললেন না। তাছাড়া, শোনার কৌতূহলও কম নয়। মাথা নাড়লেন, কিছু বললেন না।

আশ্বস্ত হয়ে মৈত্রেয়ী বললেন, সেদিন রিপোর্টার এলো, দুজনের সঙ্গেই কথা-বার্তা হল, ভদ্রলোক ছবি তোলার আগ্রহ দেখাতে শিবেশ্বরবাবুর ফোটো তুমিই জোর করে গছিয়ে দিলে—এর মধ্যে আমি কি দোষ করলাম ?

সেই এক ব্যাপার। কেবল জট, কেবল জটিলতা। তবু অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করলেন না জ্যোতিরাণী।—তুমি দোষ করেছ বলেছেন ?

প্রায়। তোমার ভদ্রলোকটির ধারণা তোমাতে আমাতে ষড়যন্ত্র করেই এই ব্যাপারটি করেছি। নইলে এর পরেও এক ফাংশনে দেখা হয়েছিল যখন, তখনো খবরটা আমি চেপে গেলাম কেন ? আচ্ছা বলো তো, এ যে রাগ করার মত কিছু এ কি আমরা জানি, না ও কথা মনে করে বসে আছি। মাঝখান থেকে দুপুরে টেলিফোনে আমার ওপর ঝাঁজ।

জ্যোতিরাণীর মনে পড়ল টেলিফোনে আর একদিনও কড়া কথা শুনতে হয়েছিল মিত্রাদিকে। পুলিসের লোকের মারফৎ স্টেশনে বীথি ঘোষের সমাচার জানতে পেরে মিত্রাদিকে জেরা করে খবর সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছিল। মিত্রাদি

সেদিনও ঘাবড়েছিল। চাপা রাগে জ্যোতিরাণী বলে উঠলেন, আমি ভেবে পাই না, ঝাঁজ তুমি বরদাস্ত করো কেন? তোমার কিসের ভয়?

মৈত্রেয়ী থতমত খেলেন।—কি জানি ভাই, এতটা এগোবার পর আবার না গণ্ডগোল হয়ে যায় আমার সর্বদা সেই ভয়।

তোমাকে কি বলেছেন?

...আমরা সোজা পথে না চললে আদর্শের স্বপ্ন নাকি এখানেই ভেঙে যেতে পারে। কিন্তু এসব যেন তুমি তাঁকে বোলো না কিছু!

মিত্রাদির এই ভয় আরো বিরক্তিকর।—আমরা সোজা পথেই চলেছি। শোনো মিত্রাদি, তোমাকে আমি আগেও বলেছি, এখনো বলছি, তোমার কোনো দুর্ভাবনার কারণ নেই। স্বপ্ন হোক আর যা-ই হোক, এখন আর কেউ সেটা ভেঙে দিতে পারবে না। আমাদের যা দরকার তার থেকে ঢের বেশি আমি নিজের হাতে নিয়েই নেমেছি। কারো মুখ চেয়ে আমাদের বসে থাকতে হবে না—বুঝলে?

জ্যোতিরাণীর ফর্সা মুখ লাল হয়েছে। মৈত্রেয়ী চেয়ে রইলেন। আপসশূন্য জোরের দিকটাই দেখছেন।

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ পার হয়ে গেছে। জ্যোতিরাণী নিজের ঘরেই বসে ছিলেন। খেয়ালী শিল্পী আসা আর চলে যাওয়ার পর থেকে যে অগোচরের প্রশান্তির গভীরে ডুবে ছিলেন বিকেল পর্যন্ত, মিত্রাদি আসার পর তার সুর কেটেছে। কিন্তু দুর্লভ বস্তুর মত জ্যোতিরাণী ওটুকু ধরে রাখতেই চান। অন্য দিন হলে নিজের ঘরে আসার আগে পরদা ঠেলে ওই পাশের ঘরে ঢুকতেন। মিত্রাদির ওপর রাগারাগি করে তাঁকে অপমান করার অর্থ কি জিজ্ঞাসা করতেন।

নিজেকে সংযত করতে পেরেছেন। পেরেছেন বলেই সমস্ত দিনের প্রশান্তিটুকু আবার ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে আসছে। সামান্য কারণে উত্তপ্ত না হবার মত শক্তি অর্জন করা দরকার। জ্যোতিরাণী সেই চেষ্টাই করবেন।

·· সকাল থেকে মানুষটা ঘরের থেকে বেরোয়নি। অসুস্থই হয়ে পড়েছে মনে হয়। এতকালের মধ্যে শরীর খারাপ বড় হতে দেখেননি। সকালে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কি হয়েছে, জবাব পাননি। দুপুরের খাবারটাও ভোলা সবই ফেরত এনেছে প্রায়, বলেছে, বাবু তো কিছুই খেলেন না। তার খানিক বাদে খবর নেবার জন্য জ্যোতিরাণী পরদা সরিয়ে ভিতরে ঢুকেছিলেন। ঘুমুচ্ছে মনে হতে ফিরে এসেছেন।

উঠলেন। অনভ্যাসের বাধা ঠেলে পায়ে পায়ে এ-ঘরেই এলেন আবার।

বুক পর্যন্ত চাদরে ঢাকা, শিবেশ্বর শুয়েই আছেন। শুয়ে শুয়ে কাগজপত্র দেখছেন।

শিয়রের দু-তিন হাত দূরে দাঁড়িয়ে জ্যোতিরাণী লক্ষ্য করলেন একটু। মুখ চোখ এখন আরো শুকনো মনে হল। এগিয়ে এসে শয্যার পাশে দাঁড়ালেন।

শিবেশ্বরের তন্ময়তায় ছেদ পড়ল।

সকাল থেকে সমস্ত দিন শুয়ে আছ, কি হয়েছে?

শিবেশ্বর সামান্য মাথা নাড়লেন কি নাড়লেন না। কিছু হয়নি। হাতের কাগজে গভীরতর মনোযোগ।

শরীর বেশি খারাপ লাগে তো ডাক্তারকে খবর দিলে হত?

শিবেশ্বর নিরুত্তর।

খবর দেব?

কাগজ সরিয়ে শিবেশ্বর তাকালেন একবার। নির্লিপ্ত ঠাণ্ডা মুখে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার এত সময় আছে?

আছে। কাকে ডাকব?

দরকার হলে এটুকু আমি নিজেই পারব।

জ্যোতিরাণী চুপচাপ চেয়ে রইলন খানিক, সমস্ত দিন তো না খেয়েই কাটল একরকম, রাতে কি খাবে?

দুই ভুরুর মাঝে ভাঁজ পড়ল শিবেশ্বরের, টাইপ-করা কাগজের গোছা পড়ে ওঠাই জরুরী যেন। মাথা নাড়লেন। কিছু খাবেন না।

জ্যোতিরাণীর মনে হল জিজ্ঞাসা করলেন বলেই রাতের খাওয়ার ব্যবস্থা গোটা-গুটি বাতিল। এরপর না-খাওয়াটাই লক্ষ্য হবে। এবারে তাঁর চলে যাবার কথা। গেলেন না। চুপচাপ চেয়েই রইলেন খানিক। টান-ধরা মুখ-চোখের চেহারা ভালো ঠেকছে না। শরীর বেতালা না হল এভাবে শুয়ে থাকার মানুষ নয়। রাগ-বিরাগ মান-অভিমান তুচ্ছ করার মত শান্ত প্রসন্ন শক্তি অর্জনের যে সঙ্কল্প নিয়ে তিনি ঘরে ঢুকেছিলেন, তার প্রসাদগুণ বড় বিচিত্র। জ্যোতিরাণীর হঠাৎ মনে হল অহঙ্কার দম্ভ আর বিকৃত চিন্তার মধ্যে ডুবে থেকে এই মানুষও কি শান্তি পেয়েছে কখনো? ভিতরে ভিতরে যে অশান্ত ক্ষত সৃষ্টি করে চলেছে তার জ্বালা-পোড়া থেকে অব্যাহতি কোথায়? আজ এই প্রথম বোধ করি মানুষটাকে বড় নিঃসঙ্গ মনে হল তাঁর।...সকাল থেকে ঘরে পড়ে আছে, খায়নি—
—কিন্তু জ্যোতিরাণী কবার ঘরে এসেছেন, কবার খোঁজ করেছেন, ক-মিনিট কাটিয়েছেন এখানে? অবশ্য এখানে আসা খোঁজ করা বা সময় কাটানো সহজ

নয়। কিন্তু সহজ নয় বলে এড়াতেই বা চেষ্টা করবেন কেন তিনি ?

আর একটু এগিয়ে এসে শয্যায় শিয়রের কাছে মাথা ঘেঁষে বসলেন। কপালে একখানা হাত রাখতে রাখতে বললেন, গায় ঢাকা দিয়ে আছ কেন, জরটর আসে নি তো…।

শিবেশ্বরের ঝকঝকে দু চোখ তাঁর মুখের ওপর স্থির হয়েছে। তিনি ব্যতিক্রম দেখছেন। ব্যতিক্রম দেখে বিশ্লেষণ করছেন। নিজে থেকে এত কাছে এসে, ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে এমন অন্তরঙ্গ হয়ে বসাটা বিস্ময়কর ব্যতিক্রম বইকি। বিগলিত হবার বদলে মুখের দিকে চেয়ে কারণ অনুসন্ধান করছেন তিনি।

চোখে চোখ রেখেছেন জ্যোতিরাণীও। চোখের ভিতর দিয়ে নিজের ভিতর দেখানোর সুযোগ দিচ্ছেন যেন। দেখুক, কোনো স্বার্থ নিয়ে যে তিনি আসেন নি দেখে একটু অন্তত বিশ্বাস হোক। তেমনি চেয়ে থেকে একটু বাদে আস্তে আস্তে বললেন, মিছিমিছি তুমি আমার ওপর রাগ করে আছ কেন, ওরা ছবি নেবার আগ্রহ দেখাতে যা করা উচিত আমি শুধু তাই করেছি—এজন্যে তুমি কিছু ভাবতে পারো আমার মনেও হয়নি। হলে দিতুম না। যার জন্যে সব হল তাকে ছেড়ে নিজের ছবি দেব ভাবতেও আমার খারাপ লেগেছে। মিথ্যে কেন কষ্ট পাও ?

শিবেশ্বর দেখছেন না শুধু, কথার এই সুরও নতুন ঠেকছে। জ্যোতিরাণীর হাত তখনো তাঁর কপালের ওপর।

মিত্রাদির মুখে যা শুনেছেন তার ধার দিয়েও গেলেন না জ্যোতিরাণী। সান্বনয়ে নিষেধ করেছে বলে নয়, খানিক আগের উষ্মার লেশমাত্রও নেই আর। সকাল থেকে যে অজানা আশ্বাসের তরঙ্গ ভিতরে ভিতরে বহুবার ওঠা-নামা করে গেছে, তাই যেন দ্বিগুণ করে আবার ফিরে পাচ্ছেন তিনি। সমস্ত গ্লানি সমস্ত যাতনা ভুলে, একটা বারো বছরের নির্দয় অতীতকে মুছে দিয়েই আবার বুঝি নতুন করে শুরু করা যায় সবকিছু। যেটুকু দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন তাতেই যেন নিজের ওপর আশ্চর্যরকমের একটা অধিকার লাভ হয়েছে তাঁর। ভারী সহজ অথচ ভারী সবল অধিকার। এটুকুর ফলেই অনায়াসে আরো কিছু পারলেন তিনি, যা ভেবে-চিন্তে পারতেন না। কপালের ওপর থেকে হাতখানা মাথার দিকে সরল। বললেন, কপাল তো গরমই লাগছে একটু। আরো ভালো করে বোঝার জন্য প্রথমে কপালের ওপর, তারপর তাঁর গালের ওপর নিজের গাল রাখলেন। মাথার হাতখানা চাদর ঠেলে জামার ভিতর দিয়ে তাপ অনুভব করার মত করে বুকের ওপর নড়াচড়া করল, তারপর সেখানেই স্থির হল। সে-ভাবেই থাকলেন একটু। আরো নরম করে বললেন, রাতে ভাত না খাওয়াই ভালো, আমি ব্যবস্থা

করে নিয়ে ছি, তুমি না খেয়ে ক আমাকে জব্দ কোরো না।

মুখ তুলে র দুই ঠোঁ শুকনো দুটো ঠোঁট আলতো করে স্পর্শ করলেন একবার। ত ছেড়ে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন।

দু চোখ টান ন শিবেশ্বর। ঘাড় উঁচিয়ে দরজা পর্যন্ত দেখলেন। বিস্ময়ের অন্ত নেই উপর দিয়ে নিজের আধিপত্য-বোধ উঁচিয়ে রাখা মজ্জাগত স্বভাব তাঁর। এক জায়গা থেকে পাল্টা আঘাতে সেটা অনেকবার ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তিনি আপস করেন নি, আধিপত্য খোয়ানো বরদাস্ত করা চরিত্রে নেই তাঁর। কিন্তু খাবার আসরে যে গেল, স্বল্পক্ষণের মধ্যে সে তাঁর সমস্ত আধিপত্যের অস্তিত্ব সুদ্ধু মুছে দিয়ে গেল বুঝি। এও তিনি চান না হয়ত। কিন্তু চান বা চান, আজকের এই আধিপত্য খোয়ানোর স্বাদ যে বিচিত্ররকমের আলাদা, সে বুঝি তিনি দেহের স্নায়ুতে স্নায়ুতে অনুভব না করে পারলেন না। এখনো করছেন।

যে আশার ঝলক হতাশার মেঘ ফুঁড়ে আসে তার রঙ সব থেকে চড়া। একটা মাস এই চড়া রঙের মধ্যেই বাস করেছেন জ্যোতিরাণী। সেই রঙে গোটা বাড়ির নিভৃতের রঙ বদলাচ্ছে বললেও বেশি বলা হবে না। সকলেই সেটা অনুভব করছেন। গৌরবিমল কালীনাথ সিতু এমন কি মেঘনা ভোলা শামুও।

সব থেকে বেশি অনুভব করছেন সম্ভবত শিবেশ্বর চাটুজ্যে।

এই এক মাসে গত বারো বছরের চেহারাই বদলে গেল বুঝি। চাপা উদ্বেগ নেই, স্নায়ুযুদ্ধ নেই, ক্ষোভের তাপ-ছড়ানো নিঃশ্বাস নেই, হিসেব করে পা-ফেলা নেই।

জ্যোতিরাণীর দিবারাত্র ফুরসত নেই। ঝরনার অবিরাম ধারায় ক্লান্তি নেই। প্রভুজীধাম রূপ নিচ্ছে, আকার নিচ্ছে। অজানা অচেনা মেয়েরা বাড়ির ঠিকানা সংগ্রহ করে, দেখা করে যায়। কেউ কাজ চায়, কেউ আশ্রয়। কেউ দুই-ই। জ্যোতিরাণী ধৈর্য ধরে দেখা করেন সকলের সঙ্গে, আবেদন শোনেন, নাম-ঠিকানা লিখে রাখেন। কাউকে বা মিত্রাদির সঙ্গে দেখা করতে পাঠিয়ে দেন। সপ্তাহে দু-তিনদিন মিত্রাদি আর বীথিকে নিয়ে প্রভুজীধাম দেখতে ছোটেন। বীথির মুখে এখনো হাসি ফোটেনি, তবে ফুটবে যে সে-সম্ভাবনা অস্পষ্ট নয় খুব। মিত্রাদি তার পিছনে লেগেই আছে, তাঁর মনের মত সাজগোজ না করলে বকুনি, কোথাও যেতে আসতে না চাইলে বকুনি, মুখ বুজে থাকলেও বকুনি। অতটা আবার জ্যোতিরাণীর কেন যেন ভালো লাগে না। ওই মেয়ের মধ্যে আগুন

আছে, সে তো মিত্রাদি খুব ভালো করে জানে। অত ব্যস্ত হবার কি আছে।

প্রভুজীধাম থেকে ঘুরে এসেই মামাশ্বশুরকে অবধারিত তাগিদ দেবেন জ্যোতি-রাণী, কিছুই তো যেন এগোচ্ছে না এখনো, আরও লোক লাগালে তাড়াতাড়ি হয় কিনা।

পরিকল্পনার একটাই ফাইল হয়েছে এখন পর্যন্ত। সেটা জ্যোতিরাণীর হেপাজতে আছে। দিনের মধ্যে কতবার ওটা নিয়ে বসতে হয় ঠিক নেই। জায়গায় জায়গায় নিজের হাতে সব দরকারী চিঠি লেখেন, জিনিসপত্রের অর্ডার দেন, চেক কাটেন, হিসেব রাখেন। মিত্রাদির সঙ্গে দেখা প্রায় রোজই হয়, তবু দিনের মধ্যে কম করে চার-পাঁচবার টেলিফোনে কথা বলারও দরকার হয়ই। ফাঁক পেলে এরই মধ্যে ছেলেকে ডেকে পড়াতে বসেন। সিতু গোড়ায় গোড়ায় দু-চার দিন অবাক হয়েছে, কিন্তু মায়ের কাছে পড়তে খুব যেন মন্দ লাগে না। মায়ের পড়ানোটা কেমন এলোমেলো আনাড়ি ধরনের। সেই কারণেই বেশি পছন্দ হয়ত। ওদিকে শাশুড়ীর দেখাশোনাও আগের থেকে একটু বেশিই করছেন জ্যোতিরাণী। সকলের ক্ষোভ মুছে দেওয়ার ইচ্ছে তাঁর। এমন কি শমীর অনুযোগের ভয়ে তার জন্যেও গাড়ি পাঠাতে ভোলেন না। যে সময়ে বিভাস দত্তর বাড়ি থাকার সম্ভাবনা কম, সে সময়ে তুষ্ট করার জন্য টেলিফোনেও ওর সঙ্গে কথা বলেন মাঝে মাঝে।

...আর, এত ব্যস্ততা সত্ত্বেও কারণে হোক অকারণে হোক দিন আর রাত্রির মধ্যে বারকয়েক পাশের ঘরে এসে দাঁড়ানোর অবকাশ মেলেই।

শিবেশ্বরের কি চোখ নেই? আছে। যে আনুগত্য তিনি চান, সেই গোছেরই কিছু পাচ্ছেন। কিন্তু এ বুঝি কেউ তাঁকে দিয়ে চলেছে, নিজের জোরে কিছু তিনি দখল করেননি। তিনি শিকলে বিশ্বাস করেন বলেই বিড়ম্বনা। ভীরু সমর্পণের ওপরেও ভ্রূকুটি চলে বোধ হয়, এর ওপর চলে না।

দু'দিন বিক্রম এসেছে। শিবেশ্বর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেছেন, আমাদের সঙ্গে একটু বেরুতে পারবে, দুই-এক জায়গায় যাব...

জ্যোতিরাণী তক্ষুনি প্রস্তুত। একবারও জিজ্ঞাসা করেননি কোথায় যেতে হবে, কেন যেতে হবে। জানাই আছে অবশ্য। উঁচু-মহলের সেই অনন্য সংস্থার নির্বাচনের তোড়জোড়। এই আনুগত্যও তিনি দিতে চান কি চান না একটুও বুঝতে দেননি। গেছেন। সমাদর লাভ করেছেন। যে-যে জায়গায় গেছেন, তাঁদের প্রচ্ছন্ন মার্জিত আশ্বাস কানে এসেছে। তাঁরা তো সমর্থন করবেনই, অন্যেরাও যাতে করেন সেই চেষ্টা করবেন। ফেরার পথে বিক্রমের উচ্ছ্বাস প্রায়

অশালীন হয়ে উঠতে চেয়েছে, বলেছে, ক্লাবের প্রেসিডেন্ট কোন্ ছার, ভাবীজীকে যদি ভরসা করে আমার হাতে ছেড়ে দাও দাদা, তোমাকে আমি প্রাইম মিনিস্টার বানিয়ে দিতে পারি বোধ হয়।

জ্যোতিরাণী ভ্রূকুটি করেছেন। হেসেছেন। এই সহজতা কৃত্রিম কিনা ভালো করে লক্ষ্য করেও শিবেশ্বর ঠাওর করে উঠতে পারেন নি। কিন্তু এর পর সস্ত্রীক নির্বাচনের সংগঠনে বেরুনোর উৎসাহ তাঁর আপনা থেকেই কিছুটা স্তিমিত।

কিন্তু সব-কিছুর তলায় তলায় জ্যোতিরাণীর কি বুঝি একটা প্রতীক্ষা। এই প্রতীক্ষাটুকুই প্রেরণার মত। উদ্দীপনার মত।

ঠিক এক মাসের মাথায় খবর পেলেন, শিল্পী এসেছেন। জ্যোতিরাণী প্রায় ছুটেই নীচে নেমে এলেন। বুকের ভিতরে ধপ-ধপ করছে যেন।

রিকশায় চাপিয়ে পূর্ণ আয়তনের অয়েলপেন্টিং এনেছেন শিল্পী। কাগজে মোড়া। জ্যোতিরাণী ঘরে ঢুকতেই আঙুল তুলে অদূরের দেয়াল দেখালেন শিল্পী। ওইখানে দাঁড়ান।

কিছু না বুঝে ছোট মেয়ের মত হুকুম পালন করলেন জ্যোতিরাণী। শিল্পী ওপরের কাগজ টেনে ছিঁড়লেন।—দেখুন।

জ্যোতিরাণী দু চোখ টান করে দেখছেন। একটু একটু করে তাঁর চোখে রঙ বসছে, রূপ বসছে। নিখুঁত সুন্দর মূর্তিই বটে। বিগ্রহের মুখে মানুষের আদল। একেবারে অচেনা মানুষের নয় যেন। অনেকক্ষণ ধরে দেখতে দেখতে মনে হল, মানুষের ঠিক নয়, কচি ছেলের আদল মিশেছে।

এই প্রতীক্ষায় ছিলেন জ্যোতিরাণী? এই প্রত্যাশায়? জানেন না। তলিয়ে ভাবতে গেলে হাস্যকর। তিনি ভাবতেও চান না, হাসতেও চান না। নির্নিমেষে দেখছেন শুধু।

চিত্র সোফায় শুইয়ে দিয়ে শিল্পী বললেন, চলি—

জ্যোতিরাণীর সম্বিৎ ফিরল যেন। কি আশ্চর্য, বসুন বসুন, কোনো কথাই হল না—

খোঁচা খোঁচা কাঁচা-পাকা দাড়ি আর পানখাওয়া মুখে একগাল হাসলেন শিল্পী। বললেন, কথা হয়ে গেছে, দামও পেয়েছি, চললাম—

হাসতে হাসতে সত্যিই চলে গেলেন। জ্যোতিরাণী বিমূঢ় খানিকক্ষণ।

প্রভুজীর প্রায়-কল্পিত আলেখ্য মামাশ্বশুর দেখলেন, কালীদা দেখলেন। বেশ নিরীক্ষণ করেই দেখলেন। দুজনেই তারপর একবাক্যে শিল্পীর প্রশংসা করলেন।

কিন্তু এর বেশি আর আর কিছু বললেন না তাঁরা।

জ্যোতিরাণী কি আর কিছু শুনবেন আশা করেছিলেন ?

ছেলেও সকৌতুকে দেখল। তারপর ভারিক্কি মন্তব্য করল, এমন কি ভালো—

ছদ্মকোপে জ্যোতিরাণী চোখ পাকালেন, ভাগ্‌ এখান থেকে!

শাশুড়ী দেখলেন। পুলকিত, রোমাঞ্চিত। ছবির উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে উঠলেন তিনি।

শিবেশ্বরও ভালো করেই দেখলেন। পরে মন্তব্য করলেন, বেশ—

...বাস্তবের সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে ওই ছবির মধ্যে বিশেষ কিছু কি শুধু জ্যোতিরাণীই দেখলেন তাহলে? হোক কল্পনা, গোপন সঞ্চয়ের মত গোপনই থাক ওটুকু। শাশুড়ী যখন নাতিকে নিয়ে উদ্ভট কল্পনা করতেন, সকলের সঙ্গে জ্যোতিরাণীও হাসতেন। বিরক্ত হতেন। এখন তাঁরই এ দুর্বলতা প্রকাশ পেলে মাথা খারাপ ভাববে সকলে।

তবু, প্রকারান্তরে শুধু শিবেশ্বরকেই ভালো করে দেখার সূত্র ধরিয়ে দিয়েছেন তিনি। বলেছেন, বিগ্রহের সঙ্গে প্রভুজীকে ধরার জন্য শিল্পী তোমাদের সকলের ছবি নিয়ে গেছলেন, দাদাশ্বশুরের, শ্বশুরের, তোমার, সিতুর।

কিন্তু না। বিশেষ কিছুই চোখে পড়েনি তাঁরও।

শেষে শিল্পীর প্রশংসা করলেন জ্যোতিরাণী। কত পরিশ্রম হয়েছে, কত খরচ হয়েছে—কিন্তু কিছু দেবার কথা বলারও ফুরসত মিলল না, উল্টে এই এই বলে গেলেন তিনি। আনন্দে আর কৃতজ্ঞতায় বলে উঠলেন, এমন ভালো লোকও হয়......

শিবেশ্বর তক্ষুনি টিপ্পনী কাটলেন, এমন হাতেই পড়েছ, দুনিয়ায় দু-চারজন ভালো লোক আছে তাও ভুল হবার দাখিল।

জ্যোতিরাণী থতমত খেলেন। তারপর হাসিমুখেই বললেন, তোমার কেবল প্যাঁচের কথা—

গৌরবিমলের কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল, জ্যোতিরাণীর সদ্য বর্তমানের মেজাজই সেদিক থেকে সবচেয়ে অনুকূল মনে হল। সেদিন বিকেলের দিকে তাঁর হাতে লম্বা গোছের একটা খাম দিলেন। ডাকে এসেছে। খামের ওপর বাইরের কোনো একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাপ।

খামটা নিয়ে জ্যোতিরাণী উল্টে-পাল্টে দেখলেন শুধু একবার। মামাশ্বশুর তাঁর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন দেখে যেতে পারলেন না।

আমতা আমতা করে গৌরবিমল বললেন, কালী বলছিল, বাইরের নানা

জায়গার ইন্‌সটিটিউট্‌ থেকে তোমার নাকে এ-রকম আরো গোটাকতক চিঠি এসেছে —কি ব্যাপার ?

সিতুকে রাখার জন্য একটা ভালো জায়গার খোঁজ করছি।

এই আশঙ্কাই করছিলেন যেন।—ওকে এখানে রাখবে না ?

এখানে থাকলে ও মানুষ হবে না।···দিন-কে-দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে, বাজে ছেলের সঙ্গে মিশছে।

এর বেশি জ্যোতিরাণী কি আর বলতে পারেন। মামাশ্বশুর বা আর কারো যে এ ব্যবস্থা মনঃপূত হবে না জানা কথাই। তিনি বললেন।—মানুষ না হবার বয়েস একেবারে চলে যায়নি, তা ছাড়া আমি তো এখন প্রায়ই আছি এখানে, আরো কিছুদিন দেখো না—

জ্যোতিরাণী নিজের ঘরে চলে এলেন। আরো কিছুদিন দেখতে গেলে এ বছরের সময় পার হয়ে যাবে। যে-মন নিয়ে ছেলেকে দূরে সরানোর সঙ্কল্প করে-ছিলেন, সেই মন অনেক ঠাণ্ডা, অনেক প্রসন্ন। তবু কিছুই স্থির করে উঠতে পারলেন না। ভিতরটা খুঁত-খুত করতে লাগল। ভবিষ্যতের আশায় মিত্রাদি পর্যন্ত তাঁর ওই একমাত্র মেয়েকে দার্জিলিংএ রেখেছে। তবে মামাশ্বশুর আছেন এখন এ একটা ভরসার কথা বটে। তাঁর পেলোরাস জ্যাকের গল্প শোনার পর ছেলের সেই মূর্তি তিনি ভোলেননি।

জ্যোতিরাণীর মনে হল, এই সঙ্কট কাটিয়ে তোলার জন্যেই তাহলে ছেলের পড়ার আর কালীদারও পড়ানোর একটু চাড় দেখা যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, ফাঁক পেলে সন্ধ্যার পর মামাশ্বশুরও কদিন হাঁকডাক করে নাতিকে নিয়ে পড়াতে বসেছেন। আজ তার কারণ বুঝতে পেরে জ্যোতিরাণী হাসবেন, না রাগ করবেন ভেবে পাচ্ছেন না।

পরদিন সন্ধ্যায় প্রভুজীধামের কি একটা অর্ডারের কথা জিজ্ঞাসা করার জন্য জ্যোতিরাণী কালীদার ঘরে এলেন। মামাশ্বশুরকেও এখানেই পাবেন জানেন। তাঁর পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে সিতু মাথা গোঁজ করে তারস্বরে পড়তে লাগল, গড্‌ ইজ্‌ গুড্‌ অ্যাণ্ড্‌ গড্‌ ইজ্‌ কাইণ্ড! গড্‌ ইজ্‌ গুড্‌ অ্যাণ্ড······

জ্যোতিরাণী থমকালেন। ভুরু কুঁচকে তাকালেন ছেলের দিকে।—তোকে তো এই পড়া দেড় মাস দু মাস আগে পড়তে শুনেছি আমি!

সিতু হকচকিয়ে গেল। গৌরবিমলও ঈষৎ শঙ্কিত যেন। গম্ভীর মুখে কালীনাথ সিতুর দিকে ঘুরে বসলেন।

পুরনো পড়াই পড়ছিলাম—

কালীনাথের কঠিন হাবভাব।—পুরনো পড়া সে-কথা আমাকে আগে বলোনি কেন? দেখি কেমন পুরনো পড়া পড়ছিস তুই। খপ্ করে বইটা টেনে নিলেন তিনি।—গড্ মানে কি?

ঈশ্বর।

আর কাইণ্ড মানে?

দয়ালু।

কালীনাথ আরো গম্ভীর। গড্ মানে ঈশ্বর আর কাইণ্ড মানে দয়ালু—উ?

সিতু মাথা নাড়ল, তাই।

সঙ্গে সঙ্গে কালীনাথ হাত বাড়িয়ে তার চুলের মুঠি ধরে কোলের কাছে টেনে এনে পিঠের ওপর বেশ জোরেই গুম গুম কিল দুটো বসিয়ে দিলেন।

জ্যোতিরাণী অবাক, গৌরবিমল অবাক। আর সব থেকে বেশি অবাক সিতু নিজে।—ঠিক হয়নি?

হয়েছে। জেঠুর মুখ নির্দয়, কঠিন।—তবু কেন মারলাম বল্ তো?

সিতু ভ্যাবাচাকা।

তেমনি অটল গাম্ভীর্যে কালীনাথ বললেন, পারলি বলেই এই—না পারলে তোমার গড্ কেমন কাইণ্ড ভালো করে জেনে রাখো!

বলতে যা এসেছিলেন আর বলা হল না, মুখে আঁচল চাপা দিয়ে জ্যোতিরাণী সোজা নিজের ঘরে। সেখানে এসেও হেসে বাঁচেন না।

ওদিকের ঘরে গৌরবিমল হা-হা শব্দে হাসছেন। জ্যোতিরাণী চলে যাবার পর কালীনাথও হাসছেন মিটিমিটি। সিতুকে বললেন, যা ছোঁড়া—এ-যাত্রা তোর ফাঁড়া কাটল মনে হচ্ছে।

॥ আটাশ ॥

মনের খবর যাঁরা রাখেন, তাঁরা বলেন শিশুর সঙ্গে সঙ্গে তার ভিতরের জগৎ বা চিন্তার জগৎটাকেও ছোট করে দেখি বলে ওদের সম্বন্ধে হামেশাই আমাদের মারাত্মক ভুল হয়। সিতু শিশু নয়। এই অশান্ত যুগের বাতাস টেনে সে দশ ছাড়িয়ে এগারোয় পা দিয়েছে। তাছাড়া বাড়ির বাতাসও তাকে অনেক এগিয়ে দিয়েছে, অনেক চতুর করেছে। এই সঙ্গে পুরোমাত্রায় বাপের মাথা আর কিছু পরিমাণ মায়ের গোঁ আর হৃদয়ের উপকরণ যোগ হয়েছে।

শ্রীমান সাত্যকির ভিতরের জগতের খবর জানা থাকলে তার ফাঁড়া কাটানোর ব্যাপারে কালীনাথ বা গৌরবিমল এত উৎসাহ বোধ করতেন কিনা সন্দেহ। আর, উতলা হবার মত কিছু কিছু আভাস পেয়েও ছেলের ভিতরটা জ্যোতিরাণী যদি সঠিক দেখে নিতে পারতেন, তিনিও সঙ্কল্প বদলাতেন না হয়ত।

ছোট দাদু আর বিশেষ করে জেঠুর প্রতি সিতু কৃতজ্ঞ। গত কটা দিন জেঠুর হাল্কা শাসানি থেকেই বুঝে নিয়েছিল তার সম্বন্ধে মা কিছু একটা মতলব আঁটছে। আগেই বোঝা উচিত ছিল। সুযোগ পেলেই সিতুকে মেরে ডাকাতেরা মা-কে ধরে নিয়ে যেত আর তার মা সিনেমার মেয়েদের থেকেও ঢের-ঢের সুন্দর দেখতে —এই দুই নির্দোষ প্রচারের আসামী হয়ে সেদিন মায়ের হাতে পড়ার পর থেকেই তার হাবভাব অন্যরকম দেখছে। যত নষ্টের গোড়া ওই শমী। কোনো কথা যদি ওর পেটে থাকত। ওকে বিয়ে করবে না হাতী। আর করেও যদি বিয়ে, ধরে থেঁতলাবে।...জেঠু আর ছোট দাদুর এই কদিনের কথাবার্তা থেকে মায়ের মতলবটা সে বুঝেই ফেলেছে। মা তাকে অনেক দূরে বাইরে কোথাও পড়তে পাঠাবার ফন্দী এঁটেছে, যে সব জায়গায় গেলে নির্ঘাৎ হাতে-পায়ে শিকল আর বন্দীদশা। সিতু ঘাবড়েই গেছল।

ফাঁড়া কাটতে সে ভিতরে ভিতরে মায়ের ওপর রীতিমত চটেছে। মনে মনে মা-কে মুখ ভেঙচেছে। আর একটু বড় হয়ে নিক, তখন দেখা যাবে শাসন কোথায় থাকে। বড় হয়েইছে, শুধু বয়সে আর মাথায় ছোট বলেই তেমন জুত করে উঠতে পারছে না।

সম্ভব-অসম্ভব অনেক কিছু কল্পনায় দেখার ঝোঁক তার। ফাঁড়া কাটার পর বাইরের স্কুলের আর বোর্ডিংয়ের বন্দীদশা কেমন হতে পারত ভাবতে চেষ্টা করেছে। এই বাড়ি-গাড়ি, খাওয়া-দাওয়া, ঠাকুমা, ছোট দাদু, চাল-বাজ দুলু, ভীতু অতুল, সজারু মাথা সুবীর, এমন কি ক্লাসের ঘোড়া-মার্কা সমর, নীলিদি, রঞ্জুদি, শোম্বোস— এই সব কিছু ছেড়ে যেতে হলে সিতুর দুনিয়া অন্ধকার। ভাবতে গিয়ে আরো কি কারণে যেন ভিতরটা খালি-খালি লেগেছে।

সেটা যে এই অকরুণ মায়েরই অভাব, জানে না।

আপাতত ভিতরে রাগ পুষে বাইরে মায়ের সামনে দিনকতক বেশ শান্ত-শিষ্ট হয়েই থাকতে চেষ্টা করল সে।

এদিকে ব্যাঙ্ক লুঠের চকচকে চটপটে ডাকাতেরা তার মনে বেশ পাকাপোক্ত বীরত্বের ছাপ রেখে গেছে একটা। স্কুলের ছেলেদের কাছে গল্পটা পুরনো হয়ে গেছে, কিন্তু তার ভিতরে ওই দিনটা এখনো তাজা। অক্টোবর গিয়ে নভেম্বরের

গোড়াতেই সেই তাজা দিনের ব্যাপারটা তরতজা হয়ে উত্তেজনার খবর যোগালো একপ্রস্থ। যোগাতে থাকল। এইজন্যেই সকালের খবরের কাগজ আসা মাত্র তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে সে।

খবরটা প্রথম চোখে পড়ামাত্র যেন 'শক্' খেয়ে লাফিয়ে উঠেছিল সে। কাগজ হাতে ছুটে মায়ের কাছে এসেছে।—মা, সেই ব্যাঙ্ক-ডাকাতির একটা লোক ধরা পড়েছে, পুলিস ভাবছে সে-ই দলের পাণ্ডা।

শোনামাত্র জ্যোতিরাণীও কাগজটা টেনে নিয়ে দেখলেন, তারপর সরোষে বলে উঠলেন, বেশ হয়েছে—এবারে ফাঁসি হবে।

ফাঁসি হবে! সিতুর উত্তেজনা নিষ্প্রভ একটু।

হবেই তো, লোক মেরেছে ফাঁসি হবে না—বেশ হবে।

সিতু বলল, বিচার হবে, প্রমাণ হবে, তবে তো···

মোট কথা, মায়ের রায় তার খুব মনে ধরেনি। লোকটার ছবি বেরিয়েছে কাগজে, ফিট-ফাট সুন্দর চেহারা, চোখে-মুখে বুদ্ধির ছাপ। চোখের সামনে তাজা লোককে ওভাবে গুলি করে মেরে ফেলাটাই ওই ডাকাতির মধ্যে সব থেকে খারাপ ব্যাপার ঠিকই, আর ফাঁক পেলে তার মা-কে যে ওরা ধরেই নিয়ে যেত এ ধারণাও বদলায়নি—তবু একেবারে ফাঁসি ভাবতে কেমন যেন লাগছে।

দিনে দিনে চমকপ্রদ খবর তারপর। একে একে দলের আরো পাঁচজন ধরা পড়ল। পুলিস যেন মাকড়শার জাল বিছিয়ে ধরছে একে একে। দলের পাণ্ডার যে ডান হাত সেও ধরা পড়েছে। আর পুলিস অনেক কিছু বার করে নিয়েছে সোনা নামে তার এক ভালবাসার মেয়েকে ফাঁদে ফেলে। ওদিকে ডাকাতির ক্যাশবাক্স একটা ডোবার মধ্যে পাওয়া গেছে—টাকা ভাগাভাগি করে নিয়ে বাক্সটা জলে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ডাকাতদের আড্ডা একটা পুরনো ছাড়া বাড়ির সন্ধান মিলেছে, সেখানে আরো কিছু হদিস পাওয়া গেছে। শুধু এই নয়, ডাকাতির বাহন সেই গাড়িটাও ধরা পড়েছে—তার রঙ আর ভোল বদলে ফেলা হয়েছিল—তবু। ডিসেম্বরের মধ্যেই ধরপাকড় আর পরের কয়েক মাসের মধ্যে পুলিসের তদন্ত সারা।

এরপর বিচার। ওই ঘোড়া-মার্কা সমরের মুখেই সিতু শুনেছে, তার দাদা নাকি বলেছে, বাইরের লোকও যে খুশি বিচার দেখতে পারে। পরে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ছোট দাদুর মুখ থেকেই জেনেছে, খুব মিথ্যে নয়। তারপর থেকে সিতু ভিতরে ভিতরে অস্থির উদ্‌গ্রীব একেবারে।

তার এই চাঞ্চল্যের খবর জ্যোতিরাণী বা আর কেউ রাখেন না।

বাড়ির বাতাসের গতি একটু একটু করে আবার পুরনো দিকে ফিরছে। জ্যোতিরাণীর ব্যস্ততা বেড়েছে, মিত্রাদিকে সঙ্গে করে ছোটাছুটি আর তদ্বির-তদারক বেড়েছে। তাই অবকাশ কম। তবু এরই ফাঁকে পাশের ঘরের মানুষকে লক্ষ্য করেন তিনি, চাপা অসন্তোষের কারণ খোঁজেন। প্রভুজীধাম নিয়ে তাঁর উৎসাহ উদ্দীপনাই যদি কারণ হয় তিনি নিরুপায়। অনুগত হতে আপত্তি নেই জ্যোতিরাণীর, দাসত্ব চাইলে আপত্তি। ওদিকে সে-রকম চাওয়াটাই বহুদিনের স্বভাব। দিন-কতকের বৈচিত্র্যে প্রশ্রয় দিয়ে এখন আবার আত্মস্থ হয়েছে—এই ভাব।

জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে হাই সোসাইটির সেই ক্লাবের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সংবাদ কাগজে বেরুলো। এর দুদিন আগে থেকে জ্যোতিরাণী ভয়ানক গম্ভীর আর অসহিষ্ণু দেখেছেন মানুষটাকে। কেন ধারণা করতে পারেননি। আর মাস দেড়েকের মধ্যে প্রভুজীধামের দ্বারোদ্ঘাটন হবার কথা, এই নির্বাচনের ব্যাপারটা ভুলেই বসেছিলেন তিনি। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রচারের উদ্দেশ্যে সেই দুদিন ছাড়া তাঁকে আর ডাকাও হয়নি বা কিছু বলাও হয়নি।

কাগজে নতুন প্রেসিডেন্ট-এর ছবি আর সংবাদ দেখে জ্যোতিরাণী সচকিত। নতুন প্রেসিডেন্ট শিবেশ্বর চাটুজ্যে নন।

কাগজ হাতে তক্ষুনি পাশের ঘরে এলেন। শিবেশ্বরও কাগজ পড়ছেন, তবে অন্য পাতা। নির্লিপ্ত গম্ভীর।

বিক্রম বলেছিল প্রেসিডেন্ট তোমারই হবার সম্ভাবনা···হল না যে ?

কাগজ ছেড়ে শিবেশ্বরের দৃষ্টিটা তাঁর মুখের ওপর উঠে এলো। পরাজয়ের তাপ নিয়ে বসে নেই তিনি, কিন্তু অনুকম্পা সহ্য হবে না। তাই স্ত্রী-পর্যবেক্ষণ সরল বা তরল নয় আদৌ।—হল না বলে তোমার খুব দুঃখ হয়েছে ?

জ্যোতিরাণীর কানে সেই পুরনো সুরটাই লাগল খট্ করে। তবু হাসতে চেষ্টা করে বললেন, তুমি আশা করেছিলে যখন, খুব না হোক একটু তো হয়েইছে। হল না কেন ?

এই হার-জিত স্ত্রীও গায়ে না মাখলে বিরক্ত হতেন না শিবেশ্বর। মুখে হাসি টেনে সশ্লেষে বলে উঠলেন, তোমার স্বামী নির্বাচনের মত এরাও ভুল করল না বলে বোধ হয়।

জ্যোতিরাণী হেসেই জবাব দিলেন, সে নির্বাচন আমি করিনি, ভুল যদি হয়ে থাকে তো তোমারই হয়েছে।

শিবেশ্বর কাগজে চোখ ফেরালেন। হাসির ঝাপটা সকলের বরদাস্ত হয় না।

কথা না বাড়িয়ে জ্যোতিরাণী বেরিয়ে এলেন। স্নায়ুর টানা-হেঁচড়া আর একটুও চান না তিনি। ত্রুটি তো তাঁরই। হাই সোসাইটির অনুষ্ঠানের ব্যাপারটা মনে থাকলে আগে থাকতে খোঁজখবর নিতে পারতেন। মনেই ছিল না কি আর করবেন। নিজেরই ভুল। কিন্তু যে কাজে ব্যস্ত তিনি, এইটুকু ভুল একজন ক্ষমার চোখে দেখবে এ আশা এখনো ভিতর থেকে যায় না কেন?

তিরিশে জানুয়ারীর বিকেল। বেরুবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে জ্যোতিরাণী মাথায় চিরুনি বুলিয়ে নিচ্ছেন একটু। মিত্রাদিকে তুলে নিয়ে ফার্নিচারের আড়তে যাবেন। প্রভুজীধামের আসবাবপত্র প্রায় ডেলিভারি পাবার কথা, কিন্তু এতদিনে নমুনা অনুমোদনের জন্য ডাকা হল। সর্ব ব্যাপারেই এমনি দেরি হচ্ছে, সামনের ফেব্রুয়ারী ছাড়িয়ে মার্চেও প্রতিষ্ঠান চালু করা যাবে কিনা সন্দেহ।

গোটা দেশের বুকের ঠিক মধ্যখানে হঠাৎ বুঝি কামানের গোলা এসে লাগল একটা। আপাতত জ্যোতিরাণীর বুকে।

মা-মা-মা! ডাকতে ডাকতে সিতু ছুটে এসে ঘরে ঢুকল, উত্তেজনায় টসটস করছে সমস্ত মুখ।—মা! গান্ধীজী খতম, প্রার্থনা সভায় যাচ্ছিল, গুলি করে মেরে দিয়েছে।

কি বললি? মাথার মধ্যে আচমকা কি হয়ে গেল, ঠাস করে ছেলের গালে চড় বসিয়ে দিলেন একটা।—কি বলছিস? কি বলছিস তুই?

চড়টা খেয়ে সিতু বিমূঢ়। গালের সেদিকটা লাল হয়ে গেছে। কিন্তু আঘাতের থেকেও বিস্ময় বেশি। থতমত খেয়ে বলল, নীলিদিদের রেডিওতে এই মাত্র শুনলাম যে।

ছেলেকে ঠেলে সরিয়ে জ্যোতিরাণী দ্রুত এসে রেডিও খুললেন। সর্বাঙ্গে থর-থর কাঁপুনি। ঘরের বাতাস চলাচল থেমে গেছে বুঝি।

…জওহরলাল বলছেন। বাপুজী নেই। কাঁদছেন আর বলছেন, আমাদের বাপুজী নেই। এক উন্মাদ সব শেষ করে দিল। বাপুজী আর নেই…

অবসন্নের মত জ্যোতিরাণী মেঝেতে বসে পড়লেন।

এক মুহূর্তে দুনিয়ার কত কি যে নেই হয়ে গেল ঠিক নেই।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিতু মায়ের এই প্রতিক্রিয়া দেখল। তার গম্ভীর দৃষ্টি কৌতুকপ্রচ্ছন্ন। চড়টাও ঠিক চড়ের মত লাগছে না। মা একটু-আধটু গান্ধীভক্ত এরকম একটা ধারণা সিতুর ছিল। আর ছোট দাদুর মুখে মায়ের বাবারও কিছু গল্প শোনা ছিল তার। আগে গুলি-গোলা ছুঁড়ে ইংরেজদের কাছ থেকে দেশ কেড়ে

নেবার দলে ভিড়ে শেষে মায়ের সেই বাবাটিও নাকি গান্ধীভক্ত হয়ে উঠেছিল। সিতুর মতে মায়ের বাবার ওই আগের জীবনটাই রোমাঞ্চকর, শেষেরটা ম্যাড়মেড়ে।

কিন্তু মায়ের স্তম্ভিত মূর্তি একটু অদ্ভুতই লাগছে তার।

উত্তেজনা চেপে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা গেল না। আসার সময়ই দেখেছে রাস্তায় সাড়া পড়েছে। ছুটে বেরিয়ে গেল আবার।

দু গজ দশ গজ দূরে দূরে মানুষ দাঁড়িয়ে গেছে। দুর্ঘটনার আকস্মিকতা বাতাস ছেয়েছে।

···প্রভুজীধামের আদর্শের আলোটাই কি জ্যোতিরাণীর চোখে নিষ্প্রভ হয়ে এলো? মনে মনে তাঁর যে একটা সঙ্কল্প ছিল। সম্ভব হোক না হোক চেষ্টা করবেনই স্থির করেছিলেন। প্রথম প্রতিষ্ঠান-কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজীর কথা মনে হয়েছিল তাঁর, সেদিন তিনি এই কলকাতাতেই ছিলেন। গত কয়েকদিন পাশের ঘরের মানুষের কাছে একটা প্রস্তাব তোলার কথা মনে হয়েছে। শিগগীর তাঁর দিল্লী যাবার সম্ভাবনা আছে কিনা, থাকলে মিত্রাদিকে নিয়ে তিনিও সঙ্গে যাবেন। জিজ্ঞাসা করা হয়নি, অনুকূল অবকাশের অপেক্ষায় ছিলেন তিনি। তাঁকে না পেলে কালীদাকে ধরে নিয়ে যাবার সঙ্কল্প। যাঁর সঙ্গে হোক, যেতেনই একবার। গান্ধীজীর সামনে গিয়ে উপস্থিত ঠিকই হতেন, বাবার পরিচয়ও দিতেন, আর অনুষ্ঠানের দিন টেনে আনতেই চেষ্টা করতেন তাঁকে। জ্যোতিরাণীর কেমন একটা আশা ছিল, খুব অসম্ভব না হলে জাতির বৃদ্ধ জনক তাঁর আবেদন নাকচ করে দেবেন না। অন্তত তাঁর শুভেচ্ছা নিয়ে যে ফিরতেন, তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। এ কাজে শুভেচ্ছা সম্বল করার মত এমন আর দ্বিতীয় কে আছে?

আকাশে-বাতাসে এক মৃত্যু মূর্ত হয়ে থাকল কটা দিন।

আর, সেই মৃত্যুর ছায়া বুঝি জ্যোতিরাণীর আদর্শের আলোর ওপর দুলে-দুলে যেতে লাগল। জীবনের সব থেকে শুভ সূচনার মুখে এ কি হয়ে গেল? আদর্শের শিখা আরো বড় করে তোলার তাগিদ এখন, নইলে ওই মৃত্যুর মহিমা সার্থক হবে না। অথচ উদ্দীপনার সলতেটাই নিভে গেছে আপাতত।

এই অসময়ে জ্যোতিরাণী তুচ্ছ ভুলই করে বসলেন আবার একটা। আধিপত্যের বজ্রমুষ্টি অপরের স্বাধীন ইচ্ছের কোনো ফাঁক বরদাস্ত করে না। তাই ভুলের ফসল তুচ্ছ হবার কথা নয়।

প্রভুজীধামের ফাইল নিয়ে বসেছিলেন সেদিন, শিবেশ্বর ঘরে এসে বললেন, আজ বিকেলের দিকে একটু বেরুনো দরকার, সময় হবে?

মুখের দিকে চেয়ে জ্যোতিরাণী প্রথমে দরকারটা বুঝতে চেষ্টা করলেন, তারপর

জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় ?

ক্লাবে। গান্ধীজীর কনডোলেন্স মিটিং।

কিন্তু এই ডাকে সায় দিতে পারলেন না। গত কদিন ধরে রেডিও আর খবরের কাগজ শোকেও ক্লান্তি এনে দিয়েছে। চারদিকে শোকের উৎসব চলেছে যেন। উঁচু-মহলের ওই অতি-অভিজাত পুরুষ-রমণীর শোক সমাবেশের সম্ভাব্য দৃশ্যটা মুহূর্তে কল্পনায় দেখে নিলেন জ্যোতিরাণী। সেখানে শোক ঘেঁষবে কেমন করে তিনি জানেন না। বাড়ির এই এক সভ্যের মুখে অন্তত শোকের ছায়া পড়তে দেখেননি। পড়লে দেখতেন ঠিকই। সেখানকার আনুষ্ঠানিক শোকের আড়ম্বরের মধ্যে সেজেগুজে গিয়ে বসার কথা ভাবতেই ভিতর বিমুখ। খুব নরম করেই বললেন, আমার ভালো লাগবে না, তুমি একাই যাও না··· ?

বলে ফেলেই অবশ্য মনে হল, ভালো করলেন না। কিন্তু মুখের কথা খসলে ফেরে না। শিবেশ্বরের ঠাণ্ডা দু চোখ তাঁর মুখের ওপর থেকে সামনের ফাইলে নামল, ফাইল থেকে আবার মুখে উঠল। তারপর চলে গেলেন।

সভাপতি নির্বাচনের পর এই প্রথম অধিবেশন। তাঁকে যেতে হবে কারণ, এ-যাত্রা নির্বাচনে হেরেছেন তিনি। না গেলে লোকের চোখে হারটা বড় হবে। স্ত্রীকে সঙ্গে নেবার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। নির্বাচনের জাল গোটাবার চেষ্টায় কেন যে শেষ পর্যন্ত বিক্রমের সঙ্গে স্ত্রীটিকে জুড়ে দিতে পারেননি তিনিই জানেন। নিজের মজ্জাগত দুর্বলতার দরুন হতে পারে, বিক্রমের অতি-আগ্রহের ফলে হতে পারে, আবার নিভৃতের অতনু মুহূর্তে কটা দিন যে বৈচিত্র্যের স্বাদ পেয়েছিলেন—সেই টানেও হতে পারে। কিন্তু কদিনের মধ্যে স্নায়ু স্বভাবের রাস্তায় ঘুরে দাঁড়াতে চেয়েছে আবার। স্ত্রীর ব্যস্ততা দেখে মনে হয়েছে অনুরাগের তিনি উপলক্ষ—লক্ষ্য প্রভুজীধাম। অতএব নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁকে না টেনে ভুলই করেছেন। রমণীর রূপের প্রভাব সম্পর্কে শিবেশ্বরের ধারণা অস্পষ্ট নয় একটুও। নিজেকে দিয়েই বিচার করতে পারেন। গেল-বারে স্ত্রীকে ক্লাবে আনার ফলে বহুজনের ঈর্ষার পাত্র হয়েছিলেন তিনি। এবারে তাদের দৃষ্টি সেদিকে আরো বেশি ফেরাবার ইচ্ছে। সম্ভব হলে গান্ধীর সম্পর্কে স্ত্রীকে দিয়ে কিছু বলানোর জন্যে বিক্রমকে হয়ত উসকে দিতেন তিনি।

যে-মাথা জট পাকাতে জানে, সে-মাথা জট পাকানোর ইন্ধনও সহজে পায়। শিবেশ্বর পেলেন। পেলেন যে, জ্যোতিরাণী শুধু সেটুকুই অনুভব করলেন।

আরো বেশি অনুভব করলেন সেই সন্ধ্যাতেই।

বিভাস দত্ত এসেছেন।

অনেক দিন পরে এলেন। প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনার অছিলায় তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। সেও প্রায় তিন মাস আগে। তারপর এই এলেন।

শমী আসার পর থেকে যে-যোগটা পুষ্ট হয়ে উঠছিল তার গতি জ্যোতিরাণীর চোখে সরল ঠেকেনি সর্বদা। তাঁর ঘরে টাঙানো সেই ফোটো আর ওমর খৈয়ামের মধ্যে যত্নে রাখা ওই ছবি দুটোও চাপা অস্বস্তির কারণ হয়েছিল। ভদ্রলোকের কথাবার্তার ধরন-ধারনও বদলাচ্ছিল। বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। ঘরের লোকের বিকৃতির দরুন নয়, জ্যোতিরাণী নিজে থেকেই একটু সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন বোধ করেছেন।···এযাবৎ অনেক উপকার পেয়েছেন, তাঁর ভালো চান। সহজ অন্তরঙ্গতা সেই ভালোর রাস্তায় গড়াচ্ছে না মনে হয়েছিল। প্রতিষ্ঠান নিয়ে ব্যস্ততার ফাঁকে জ্যোতিরাণী নিজেকে কিছুটা সরিয়ে আনতে পেরেছেন।

একলা যে···শমী কই ?

প্রশ্নটা হঠাৎ উপভোগ্য হল কেন সঠিক বুঝলেন না। তাঁর দিকে চেয়ে বিভাস দত্ত হাসছেন আর সিগারেট টানছেন। অ্যাশপটে চাপা দেওয়া দুই ইঞ্চি প্রমাণ একটুকরো ছেঁড়া কাগজ টেনে নিয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে দিলেন।

তাতে লেখা, শমীকে আনলেন না ?

বিভাস দত্ত জোরেই হেসে উঠলেন, দেখুন খুব বাজে লেখক নই, আপনার আসতে দেরি দেখে এক মিনিট আগে ওটুকু লিখেছি। আর একদিনও প্রথমে একথাই জিজ্ঞাসা করেছিলেন—

জ্যোতিরাণী অপ্রস্তুত, বিব্রতও। পরিহাস বটে কিন্তু ইঙ্গিত ঠাসা। হাসির আড়ালে কিছু তাপও জমেছে মনে হল। হাসিমুখেই জবাব দিলেন, বাজে লেখক আপনাকে কে বলেছে ? জিজ্ঞেস করব না, সঙ্গী-সাথী নেই, বেচারী একেবারে একলা—

তা বটে, আমি বাড়িতে না থাকলে ও হয় আপনার গাড়ি নয়তো আপনার টেলিফোন আশা করে।

অর্থাৎ তাঁর অনুপস্থিতিতে শমী গাড়ি বা টেলিফোন পেয়ে অভ্যস্ত। আগে হলে জ্যোতিরাণী সহজ কৌতুকে আরো কিছু শোনার ইন্ধনও যোগাতে পারতেন। সেদিক না ঘেঁষে লঘু ঠেসের সুরে বললেন, করবেই তো, আপনার আশায় থাকার তো এই ফল।

বিভাস দত্ত হাসছেন। নিজের জামার বোতাম ধরে টানাটানি করলেন দুই একবার, তারপর সিগারেটের খোঁজে পকেটে হাত ঢোকালেন। চাপা অস্থিরতার

এই লক্ষণ জ্যোতিরাণীর ভালই জানা আছে।

ফলটা খুব ইচ্ছাকৃত নয়। কাজে বেরিয়েছিলাম, ভালো লাগছিল না, ঘুরতে ঘুরতে চলে এলাম।

প্রসঙ্গ বদলানোর ফাঁক পেয়ে জ্যোতিরাণী তক্ষুনি বললেন, ভালো লাগবে কি করে, যে সর্বনাশ হয়ে গেল—

সিগারেট ধরিয়ে বিভাস দত্ত টান দিলেন গোটাকতক।—বাড়ির কর্তাটি কোথায়? শোকসভায়?

হ্যাঁ। শোকসভার খবর আপনি জানলেন কি করে?

হাই সোসাইটির খবর কাগজের প্রথম পাতায় বেরোয়। আপনি গেলেন না?

না।...আমি তো ভাবছিলাম আপনি হয়ত দিল্লীতেই চলে যাবেন।

মুখ থেকে সিগারেট নামল। দু চোখ তাঁর দিকে ফিরল। পলকা বিস্ময়।—আপনি ভাবছিলেন? কবে?

কানের কাছটা উষ্ণ ঠেকল জ্যোতিরাণীর, ভাবেননি ঠিকই। কথার পিঠে কথা যোগানা ছাড়া এ উক্তির আর কোন তাৎপর্য ছিল না। ভাবেননি বলেই বিদ্রূপ আরো বেশি স্পষ্ট মনে হল। তিন মাসের সঞ্চিত ক্ষোভ ক্ষয় করার তাড়নাতেই যেন এসে পড়েছেন ভদ্রলোক।

আপনাকে হিসেব দেবার জন্যে দিনক্ষণ মনে করে বসে আছি নাকি?

তা নয়, সিগারেট টানার ফাঁকে গলার স্বর মোলায়েম করার চেষ্টা, আমার কথা ভাবতে সময় পেলেন শুনে অবাক লাগল।...আপনার প্রভুজীধাম কতদূর এগলো, কাগজে কবে যেন হাঁকডাক দেখলাম বেশ।

প্রশ্নটা বড় বেশি নির্লিপ্ত ঠেকল কানে, জবাব দিলেন, এই মাসের শেষে বা সামনের মাসের গোড়ায় কাজ শুরু হবে আশা করছি।

কিন্তু প্রভুজীধাম শুধু আমার কেন, সকলেরই তো।

সিগারেট অ্যাশপটে গুঁজে নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলেন বিভাস দত্ত, আবারও কৌতুকের আড়াল নেবার মত রসদ কিছু পেয়েছেন।—শমীর সান্ত্বনা আপনার গাড়ি আর টেলিফোন, আর এটুকু বোধ হয় আমার?

জ্যোতিরাণীর দৃষ্টি এবারে তাঁর মুখের ওপর থমকালো একটু। কথার লুকোচুরির মধ্যে না গিয়ে সোজাই বললেন, ভাবগতিক সুবিধের দেখছি না আজ, আপনার আবার সান্ত্বনা দরকার হবার মত কি হল?

বিভাস দত্ত রসিয়েই জবাব দিলেন, এ-ঘরে আপনাদের সেই একদিনের আলোচনার আসর ভারী জমেছিল।...একদিকে আপনার কর্তাটির ঝোঁক প্রতিষ্ঠানের

সঙ্গে আমার নামটা যোগ করে দেবেন, অন্যদিকে আপনার সেটা বাতিল করার তাগিদ।

মিথ্যে নয় বলেই জ্যোতিরাণীর সহজতায় টান ধরছে। বলে উঠলেন, শুধু আপনাকে কেন, সমান যোগ্য ভেবে আমার কর্তাকেও বাতিল করেছি। তা আক্ষেপ হয়ে থাকে তো বলুন আবার যোগ করে দিচ্ছি।

বিভাস দত্ত জোরেই হেসে উঠতে পারলেন এবার। বললেন, দিলেও এই যোগে ফল বাড়বে না বোধ হয়, তাছাড়া আমারও আক্ষেপ নেই।

সম্ভব হলে জ্যোতিরাণী বলতেন, আক্ষেপ আছে কিনা দেখাই যাচ্ছে, আর, বলতেন, যোগের ফল বাড়ার ভয়েই বাতিল করা হয়েছে। কথার মারপ্যাঁচ ছেঁটে দিয়ে বিভাস দত্তই অন্য প্রসঙ্গে ঘুরলেন এবার। নিজেকে গুটিয়ে নেবার সুরে বললেন, যাক, আপনার এত ব্যস্ততা শমীরই শুধু বুঝতে আপত্তি, আমার বুঝতে কিছু অসুবিধে হচ্ছে না।...অনেক দিন আগে টেলিফোনে বলেছিলাম, আপনার সঙ্গে একটু দরকারী পরামর্শ ছিল, কথার মাঝেই হঠাৎ টেলিফোন কেটে দিলেন, বললেন পরে কথা হবে—আপনার মনে নেই বোধ হয়।

জবাব না দিয়ে জ্যোতিরাণী চেয়ে রইলেন চুপচাপ। মনে আছে। কথা যখন বলছিলেন, বাড়ির মালিক তখন পুলিসের লোকের মারফৎ বীথি ঘোষের খবর আর এই একজনকে স্টেশনে তুলে দিয়ে আসার খবর সংগ্রহ করে নিঃশব্দে পিছনে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সে-দিনটা অন্তত ভোলবার কথা নয় জ্যোতিরাণীর।

বিভাস দত্ত ধীরেসুস্থে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন।—ইচ্ছে ছিল, আপনাকে নিয়ে বীথি ঘোষের সঙ্গে ভালো করে একটু আলাপ পরিচয় করব। কিন্তু আপনার তো সময় নেই, ভাবছিলাম, মিসেস চন্দকে আপনি একবার টেলিফোন করে দিলে তাঁরই শরণাপন্ন হতে পারি।

বীথিকে নিয়ে লিখবেন?

যোগাযোগে কি দাঁড়ায় দেখা যাক, আপনার কি মনে হয়, লেখার মত পাব কিছু?

পেতে পারেন। কিন্তু আমার মনে হয় এখন থাক, বীথির মুখে যদি হাসি ফোটে কোনদিন তখন লিখবেন, আমরা সকলেই তখন আপনাকে সাহায্য করব।

এ জবাব আশা করেননি বিভাস দত্ত। তাপ ছিলই, আরো বেশি ক্ষুব্ধ। তার ওপর হাসির প্রলেপ।—আপনার আপত্তি হলে থাক। কিন্তু সব বীথি ঘোষের ভাগ্যেই তো জ্যোতিরাণী চ্যাটার্জীর সঙ্গে যোগাযোগ হয়নি। সকলের মুখে হাসি নাও ফুটতে পারে। তাছাড়া, হাসি ফোটাবার বায়না নিয়েই যে লিখতে

বসব তাই বা আপনাকে কে বললে ?

হেসে খোঁচা দেবার লোভ দমন করতে পারলে না জ্যোতিরাণী। বলে ফেললেন, তাই বসুন না, সাহিত্যের কিছু উপকার হয় তাহলে—

সাহিত্যের আসরে বিভাস দত্তর জায়গা সামনের সারিতে, এ কটাক্ষ বরদাস্ত হবার কথা নয়। হাসির প্রলেপেও টান ধরল। সামাল দেবার জন্য হাসিমুখে জ্যোতিরাণী নিজেই নিজের অনধিকার-চর্চার সমালোচনা করতে যাচ্ছিলেন। বাধা পড়ল।

সিঁড়ির পাশে গাড়ি থামল। শিবেশ্বর ফিরলেন। তাঁর দামী গাড়ি, শব্দ হয় না তেমন। স্টার্ট বন্ধ হওয়ার আওয়াজ কানে আসতে জ্যোতিরাণী বাইরের দিকে তাকিয়েছেন।···ক্লাব থেকে এত শিগগীর ফেরার কথা নয়।

গাড়িতে বসেই স্ত্রীর হাসি-মুখ চোখে পড়েছে শিবেশ্বরের। দেয়ালের আড়ালে উল্টো দিকে কে আছে দেখা না গেলেও ভেবেছিলেন মৈত্রেয়ী হবে। ঘরে পা দিয়ে যাঁকে দেখলেন, অনেক দিনের অদর্শনের ফলে তাঁর কথা মনে হয়নি।

বিরাগ নয়, শিবেশ্বর পরিতুষ্ট। রসদের অভাব হলে ভিতরের তাপ নিজেকে দগ্ধায়। রসদ পেলেন। চোখের কোণে খুশির আমেজ। স্ত্রীর হাসি-মুখের পরিবর্তনটুকুও কম উপভোগ্য নয়। তাঁর দিকেই ফিরলেন, আর যিনি উপস্থিত তাঁকে মানুষের মধ্যে গণ্য করেন না।—তোমারও শোক-সভা আছে এখানে তখন বললে না কেন, অত সাধাসাধি করতাম না তাহলে।

মুখ লাল হচ্ছে জ্যোতিরাণীর। অপরের সামনে মর্যাদা রক্ষার তাগিদটুকুই হয়ত সব থেকে বড় দুর্বলতা তাঁর। এই এক কারণেই গাড়িটা চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন। তবু হিংস্র আক্রমণের মত এই উক্তি আশা করেন নি। প্রতিক্রিয়া সামলে কিছু বলার অবকাশ পেলেন না, তার আগেই বিভাস দত্ত তাড়াতাড়ি হাল্কা কৈফিয়ত দিলেন, এই শোক-সভার খবর উনি রাখতেন না, আমাকে রবাহুত শোক-সভ্য বলতে পারো।

দায় ঘাড়ে নেওয়া গোছের এই কথাগুলো জ্যোতিরাণীর মুখের ওপর অপমানের দ্বিতীয় প্রস্থ ঝাপটা মেরে গেলে। তবু নিজেকে সংবরণ করতেই চেষ্টা করছেন তিনি। শিবেশ্বর বিভাস দত্তর দিকে ঘুরে দাঁড়াতে তাঁর মুখ আড়ালে পড়েছে।

চোখে চোখ রেখে আপ্যায়নের সুরেই শিবেশ্বর বললেন, শোকের মুখে দরদীরা রবাহুতই এসে থাকে। তা তুমি কতক্ষণ ?

এই কিছুক্ষণ। এরই মধ্যে তোমাদের শোক করা হয়ে গেল ?

শিবেশ্বরের ঠোঁটের হাসি আরো স্পষ্ট।—গেল। এ তো ঘরের অন্তরঙ্গ শোক

নয়, বাইরের অনুষ্ঠান। শোক চলুক তোমাদের, বিঘ্ন ঘটাব না—

যাবার জন্য পা বাড়াবার ফাঁকে দু চোখ স্ত্রীর মুখের ওপর আটকালো। জ্যোতিরাণী নিষ্পলক চেয়ে আছেন তাঁর দিকে। পিছন থেকে বিভাস দত্তর লঘু তাগিদ, বিঘ্ন হবে না, তুমিও বসতে পারো—কোন্ সাহিত্য করলে উপকার হয় তোমার স্ত্রীর কাছ থেকে আপাতত আমি সেই পাঠ নিচ্ছিলাম—

অতএব আবারও এদিকেই ফিরলেন শিবেশ্বর। স্ত্রীর প্রতিক্রিয়া দেখার প্রেরণায় এই একজনকে অনায়াসে এখন ঘর থেকে বারও করে দিতে পারেন তিনি। অতটা না করে সশ্লেষে পর্যবেক্ষণ করলেন একটু।—সেটা কি রকম পাঠ, অন্ধতামিস্র গোছের ?

বিভাস দত্ত হকচকিয়ে গেলেন। বাড়ির একচ্ছত্র মালিকের মতই শিবেশ্বর ধীরেসুস্থে প্রস্থান করলেন।

ঘরের বাতাস অস্বস্তিকর নীরবতায় ঠাসা।

অস্ফুট স্বরে বিভাস দত্ত হেসে উঠলেন একটু। সোফার হাতলে চাপ দিয়ে ওঠার ভঙ্গি করে সামনের দিকে তাকালেন।—এবারে আমিও চলি তাহলে ?

আত্মস্থ হবার তাড়নায় এখনো নিজের সঙ্গে যুঝছেন জ্যোতিরাণী।—তাড়া আছে?

তাড়া ছিল না, এখন হল। উঠে দাঁড়ালেন। সত্যি কথাটা বলতে পেরে খুশি। ঠোঁটের ফাঁকে হাসি চেপে মোলায়েম স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, কর্তার এই মেজাজ কেন, শোক-সভায় যান নি বলে ?

মুখের দিকে চেয়ে জ্যোতিরাণীর মনে হল ক্ষোভ জুড়িয়েছে ভদ্রলোকের। শেষের প্রশ্নটা করে বিড়ম্বনা আড়াল করার সুযোগ দিলেন একটা, তাও অনুভব করতে পারেন। নইলে কর্তার এই মেজাজ কেন বা কতদিনের, কারো থেকে কম জানেন না ইনি। ঠোঁটের ফাঁকে হাসি ফুটিয়ে ওই হাসিমুখ নিজের দু চোখে আটকে নিতে পারলেন জ্যোতিরাণী, সরস কথারও যোগান দিতে পারলেন। এটুকু পারার ধকল শিরায় শিরায় অনুভব করছেন। বললেন, বোধ হয়…। পুরুষের মেজাজ মেয়েদের গয়নার মত। ছাড়তে কষ্ট—

একলা ঘরে বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারলেন না জ্যোতিরাণী। বিভাস দত্ত ঘর ছেড়ে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে সেই চিরাচরিত তিক্ততা ক্ষোভ আর বিদ্বেষের জ্বলন্ত কণাগুলো তাঁর দিকে ধেয়ে আসছে। ওগুলো নেভেনি, তাঁর অস্তিত্ব থেকে চেতনা থেকে সরে যায়নি। নিভৃতের কোনো সুড়ঙ্গ-পথে ওঁত পেতে বসে ছিল, সুযোগের অপেক্ষায় ছিল।

জ্যোতিরাণী কি করবেন? আবার তাদের অভ্যর্থনা জানাবেন? আবার ধিকিধিকি জলবেন আর পাশের ঘরের মানুষকে সেই আঁচে ঝলসাবার উদ্দীপনায় মেতে উঠবেন? বুকের তলায় যে-আলোর স্পর্শ পেয়েছিলেন সত্যি নয় সেটা? অন্ধতামিস্র ঘোচাবার মত জোরালো নয়?

সমস্ত অন্তরাত্মা দিয়ে নিজেকে সংযমে বাঁধতে চেষ্টা করলেন জ্যোতিরাণী। ওটুকুই একমাত্র সত্যি, আর কিছু সত্যি নয়। রাগ রাখবেন না। বিদ্বেষ পুষবেন না।

জ্যোতিরাণী হাল ছাড়বেন না।

আলো নিভিয়ে দোতলায় উঠে গেলেন। আগে হলে সোজা নিজের ঘরে ঢুকতেন। ব্যবধানের ফাঁদ পেতে তার মধ্যে নিজে আগুনের শিখা হয়ে বসতেন। পতঙ্গের মত উদ্‌ভ্রান্ত হতই কেউ। পোড়বার জন্যে ছুটে আসতই।

জ্যোতিরাণী হাল ছাড়বেন না। দম্ভের খাঁচায় নিজেকে রাখবেন না। প্রাণপণ করে তিনি শুধু আলোর খবর দেবেন। একটুখানি আলো অনেক অন্ধকার ঘোচাতে পারে।

নিজের ঘরে নয়, পরদা ঠেলে সোজা পাশের ঘরে ঢুকলেন জ্যোতিরাণী।

শিবেশ্বর শয্যায় আধ-শোয়া। পাশে অর্থনীতি-ব্যবসা-বাণিজ্যের বিলিতি জার্নাল গোটা-কতক। ঘরে থাকলে বেশির ভাগ সময় এগুলোই সঙ্গী। এখন পড়ছেন না। শিয়রের বালিশের ওপর পাশবালিশ, তার ওপর পিঠ রেখে পরিতুষ্ট মুখে ভাবছেন কিছু।

বিছানায় তাঁর গা-ঘেঁষে মুখোমুখি বসলেন জ্যোতিরাণী। শয্যার এদিকে শয়ান বলে এদিকের বসার পরিসর এমনিতেই ছোট। শিবেশ্বরের কোমরের দিকটা, গোটানো হাঁটু, আর পাঁজরের দিকের খানিকটা জ্যোতিরাণীর গায়ের সঙ্গে ঠেকে থাকল। এই মুখ আর এই আবির্ভাবের জন্যে যেন প্রস্তুত ছিলেন না। চোখে চোখ রাখলেন তিনিও।

গলার স্বরও বুঝি দ্বিধাশূন্য সংযমে বাঁধতে পেরেছেন জ্যোতিরাণী। স্পষ্ট, তবু মৃদু। তোমাদের শোক-সভায় যাবার জন্য তুমি আমাকে কবার সেধেছ?

সাধাসাধির ধার ধারি না।

ধারো না জানি, কিন্তু একটু আগে বলে তো এলে?

কথার প্যাঁচে কোণঠাসা হবার ইচ্ছে নেই শিবেশ্বরের, চোখে চোখ রেখেই নির্লিপ্ত জবাব নিক্ষেপ করলেন, কথা মেপে বলারও ধাত নয়।

কিন্তু খুব হিসেব করে মেপেই তো বলে এলে? তোমার সঙ্গে না গিয়ে অন্যায়

করেছি বুঝতে পারছি, তা'বলে একজন বাইরের লোকের সামনে আমাকে তুমি এভাবে অপমান করে এলে ?

সুষ্ট গাম্ভীর্যে শিবেশ্বর অনুযোগটা বুঝতে চেষ্টা করলেন যেন।—অপমান কি করা হল···আর বাইরের লোকই বা কে ?

বাইরের লোক বিভাস দত্ত, আর তুমি যা করে এলে সেটাই অপমান। ক'মাস আগেও আমাকে না জানিয়ে দরকারী পরামর্শের নাম করে ভদ্রলোককে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর সামনে আমাকে অপ্রস্তুত করেছ। নিজেকে মানী লোক ভাবো তুমি, লোকের চোখে আমি ছোট হয়ে গেলে তোমার মান-সম্ভ্রম বাড়বে ?

উগ্র জবাবটা মোলায়েম শ্লেষের রসে ভিজিয়ে দিলেন শিবেশ্বর।—না, তার থেকে বিভোর হয়ে তুমি অন্ধতামিস্র শুনলে বরং আমার মান-সম্ভ্রম একটু বাড়তে পারে। আর ছেলে ঘরের আলো নিবিয়ে দিলে তো কথাই নেই—

পুরনো দিকে ফিরে তাকাতে চান না জ্যোতিরাণী। তবু এ-কথা শোনার পর কেন যেন প্রসঙ্গচ্যুত সেই এক প্রশ্নই ঠেলে উঠতে চাইল ভিতর থেকে।·· চল্লিশ বছর যে-মানুষটা এ সংসারের সঙ্গে মিশে গেল, সেই সদা হঠাৎ ওভাবে চলে গেল কেন। থাক, তিনি বোঝাপড়া করতে আসেননি। চেয়ে আছেন। জিজ্ঞাসা করলেন, ভদ্রলোককে সত্যি এত অসহ্য তোমার ?

গাম্ভীর্য ঘন করে তোলার প্রয়াস, জবাব দিলেন, অসহ্য কেন হবে, অত বড় রায়টের সময় নিজের জীবন তুচ্ছ করে তোমার প্রাণ বাঁচিয়েছে—উল্টে কেনা হয়ে আছি।

তোমার আর সিতুর প্রাণ বাঁচায়নি ?

ঠোঁটের ফাঁকে তুষ্টির রেখা স্পষ্টই হল এবারে, গলার স্বর আর সুরও বদলালো শিবেশ্বরের। বললেন, আমরা ফাউ। ওই সঙ্গে বেঁচে গেছি···

পাশের বিলিতি জার্নালটার দিকে ঘাড় ফেরালেন তিনি। গায়ে গা ঠেকিয়ে এ-রকম অন্তরঙ্গ ফয়সালা করে ওঠার মত তৃপ্তি কমই পেয়েছেন। বিলিতি জার্নালের বড় বড় চকচকে হরপগুলোই যেন দর্শনীয় বস্তু আপাতত।

জ্যোতিরাণী স্থির বসে আছেন। চেয়ে আছেন তেমনি। হাত বাড়িয়ে জার্নালটা তুলে পাশের ছোট টেবিলে সরিয়ে রেখে দর্শনীয় বস্তু থেকে ওই দৃষ্টি আবার নিজের দিকে টেনে নিলেন।—আমি যা বলতে এসেছি, সেকথাটাই আগে মন দিয়ে শুনে নাও। আগেও অনেকের সামনেই তুমি আমাকে ছোট করেছ, আজও তাই করে এলে। তবু আমি অন্যরকম আশা করব। লোকের সামনে এভাবে আমাকে অপমান করতে কবে তোমার মায়া হবে, এর পরেও আমি সেই অপেক্ষাতেই

থাকব—বুঝলে ?

উঠলেন। খুব শান্ত মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ঘাড় ফিরিয়ে দরজার দিকে চেয়ে রইলেন শিবেশ্বর। ভাঙার বদলে যে আঘাত বল যোগায়, সে-আঘাতের খানিকটা নিজের দিকেই ফেরে।

শিবেশ্বরের চোখে অনুতাপ নয়, শুধু তাপ।

॥ উনত্রিশ ॥

মনের ইচ্ছে ষোল-কলায় পূর্ণ কমই হয়। কিন্তু সিতুর বেলায় তাই যেন হচ্ছে। না চাইতেই একের পর এক সুযোগ-সুবিধেগুলো যেন লাফিয়ে লাফিয়ে তার সামনে এসে ধরা দিচ্ছে।

এই এক নতুন উত্তেজনায় ভিতরটা তার টগবগ করে ফুটছে সর্বদা। সে-খবর বাড়ির কেউ রাখে না। রাখে কেবল চালবাজ দুলু আর সজারু-মাথা সুবীর। সম্প্রতি তিনজনেই একাত্ম। উত্তেজনায় ভরপুর তারাও। এই সঙ্গে গোপনতা আর স্বাধীনতার নতুন রোমাঞ্চও কম নয়।

বিশেষ একটা উদ্দেশ্যে তিনজনেই মাঝে মাঝে স্কুল ফাঁকি দিচ্ছে এখন; এর মধ্যে সিতুর স্কুলের কড়াকড়ি একটু বেশি। স্কুলে গিয়ে পালাতে হলে হঠাৎ পেট ব্যথা হতে পারে, পেট কামড়াতে পারে খুব, গা বমি করতে পারে। তার ফলে টীচারকে বলে ছুটি নিয়ে আসা যায়। কিন্তু একেবারে ডুব দিতে হলে দরখাস্ত লাগে। সেটাই দরকার হয়ে পড়ছিল প্রায়ই। মায়ের ব্যস্ততার ফাঁকে সে সুযোগ পাচ্ছে। ঘটা করে প্রভুজীধামের উৎসব হয়ে যাবার পর থেকে এই ক'মাস ধরে মা সপ্তাহে খুব কম করে তিন-চার দিন অন্তত সেখানে ছোটে। কোনদিন বিকেলে ফেরে, কোনদিন সন্ধ্যায়। এদিকে ছোট দাদুও মায়ের ওই ব্যাপারেই ব্যস্ত খুব। মা তো তবু দুপুরে বেরিয়ে বিকেলে হোক সন্ধ্যায় হোক ফেরে, ছোটদাদু ফেরেই না অনেকদিন। প্রভুজীধামেই থেকে যায়। সিতুর সেটা পছন্দ নয়, কিন্তু আজকাল পছন্দ করছে।

কারণ, সকলের অলক্ষ্যে এখন তার প্রচুর অবকাশ দরকার। এদিক থেকেই ওপরওয়ালা আপাতত ভারী সদয় তার ওপর। প্রথম তো ঠাকুমা-বুড়ী দিব্বি ভুগতে শুরু করেছে আজকাল। সর্দিজ্বর এটা-সেটা লেগেই আছে। ফাঁকতালে তাকে চুপিচুপি ধরলেই ঠাকুমা স্কুল-কামাইয়ের ব্যবস্থা করে দেয়। মাকে বলে,

সিতু দুটো দিন বাড়িতে থাক, তোমরা তো সকলেই ব্যস্ত, দরকারে এক গেলাস জল গড়িয়ে দেবার লোক পাওয়া যায় না, শরীরটা বেশিই খারাপ লাগছে আজ—

জ্যোতিরাণী আপত্তি করেন না। সকালে আর রাত্রিতে ভিন্ন তাঁর ফুরসত নেই ঠিকই। মেঘনাকে সারাক্ষণ শাশুড়ীর কাছে বসিয়ে রাখতে পারেন, কিন্তু সেটা মনঃপূত হবে না। তাছাড়া মাত্র মাস-তিনেক হল নতুন ক্লাস শুরু হয়েছে ছেলের—এর মধ্যে ছুটি-ছাটা আর বাইরের নানা গণ্ডগোলে স্কুল অনেক সময় এমনিতেই বন্ধ থাকছে। অতএব সামান্য ব্যাপারে শাশুড়ীর মেজাজ চড়ুক এ তিনি চান না। ছুটি মঞ্জুর হয়ে যায়, আর তখন কামাইয়ের দরখাস্ত সামনে ধরলেই তিনি সই করে দেন।

মাঝে মধ্যে গাড়ি নিয়ে সকালেও বেরিয়ে পড়তে হয় তাঁকে। বিকেলের আগে ফিরবেন না বলেই যান। প্রভুজীধামে মিত্রাদি বীথি আর সকলের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করেন, কাজ-কর্ম দেখাশুনা করেন। তাতে একাত্মতা বাড়ে। সিতুর সেদিন পেট কন্‌কন করবে বা সেই গোছের কিছু হবে। আর ঠাকুমার মারফৎ জেঠুর কানে সেটা পৌঁছুলেই স্কুল বন্ধ। জেঠুই বলবে স্কুলে যেতে হবে না। তখন দরখাস্ত জেঠুই সই করবে। মা সেদিন টেরও পাবে না ও স্কুলে গেল কি গেল না। সিতুর পক্ষে সব থেকে সুবিধে হত ঠাকুমা ইংরেজীতে নাম সই করতে জানলে, কিন্তু সে ব্যাপারে বুড়ী দিগ্‌গজ একেবারে, বাংলায় সই করতেই কলম ভাঙে।

সিতু, সুবীর আর দুলুর স্কুল কামাই করা বা স্কুলে গিয়ে পালিয়ে আসার তাগিদটা নিছক ফুর্তির কারণে নয়। যে অ্যাডভেঞ্চারে মেতেছে, তার ফলে বয়সের তুলনায় দেখতে দেখতে তারা আরো অনেকখানি এগিয়ে গেছে। কোন্ নেশায় রক্ত গরম তাদের এখন, সেটা বাড়ির কেউ বুঝবে না। আর, কদর তো করবেই না। জানলে উল্টে বাধা দেবে।

সেই নেশা প্রথমে সিতুর মাথায় ঘুরপাক খেয়েছে ক্রমাগত। ঘোড়া-মার্কা সমরের মুখে যে-দিন শুনেছিল ওর দাদা বলেছে বাইরের লোক আদালতের বিচার দেখতে যেতে পারে, তখন থেকেই কথাটা কেবলই মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল তার। তারপর ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ছোট দাদুর কাছ থেকে যখন জানা গেল কথাটা সত্যি, একটা প্রবল ইচ্ছা সে আর তখন নিজের মগজে চেপে রাখতে পারেনি। দুলুকে আর সুবীরকে বলেছে।

ব্যাঙ্ক লুঠের ডাকাতদের বিচার শুরু হয়ে গেছে। কাগজে যে-সব খবর বেরিয়েছে আর বেরুচ্ছে তাই পড়েই উত্তেজনা চেপে রাখা দায় সিতুর। আর এতদিনে সেই উত্তেজনা কিছুটা ওদের মধ্যেও ঢুকিয়ে দিতে পেরেছে। দিনেদুপুরে

মোটরে করে এসে স্টেন-গান চালিয়ে চোখের পলকে ব্যাঙ্কের বন্দুকধারী সিপাইকে মেরে ক্যাশিয়ারকে গুলি করে আর রিভলভার উঁচিয়ে সকলকে বোবা বানিয়ে সাতানব্বই হাজার টাকার বাক্স নিয়ে উধাও হয়েছিল যে ডাকাতরা—আবার তাদের চোখে দেখতে পাওয়াই তো সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। আর সেই লোকগুলোর কিনা বিচার হবে, আর যার খুশি সে কিনা ইচ্ছে করলে সেই বিচার দেখতেও পাবে! এমন এক রোমাঞ্চকর সম্ভাবনা সিতু নিজের মধ্যে চেপে রাখে কি করে?

দু'তিন দিনের আলোচনার ফলে সুবীর আর দুলুর মধ্যেও বিচার দেখার বাসনাটা দানা পাকিয়ে উঠতে লাগল। শুধু লোক মারা আর টাকা লুট করাই নয়, আর একটু সময় পেলে যে-ডাকাতেরা সিতুর ওই মা-টিকে পর্যন্ত গাড়িতে তুলে নিয়ে হাওয়া হয়ে যেতোই—সশরীরে তাদের চোখে দেখার লোভ হওয়াই স্বাভাবিক। তার ওপর এমন গরম এক বিচার-পর্ব।

তিনজনের মধ্যে সুবীরই মাথায় একটু বড়সড়। কিন্তু ধুতি পরলেও ওকে বয়স্ক লোক বলে চালানো যায় না তা বলে। অতএব ছেলেমানুষ দেখে ঢুকতে দেবে কিনা সেই চিন্তা। মাথা খাটিয়ে চালিয়াৎ দুলুই একটা মতলব বার করল। তাদের বাড়ির সামনের স্টোভ-সাইকেল-মোটরবাইক মেরামতের দোকানের নিতাইদাকে সঙ্গে জোটাতে পারলে কেমন হয়? খুব ভালো হয়। এ-সবে খুব উৎসাহ তার। বয়েস ওদের ডবলের বেশি ছাড়া কম নয়, নিজেও গুণ্ডা গোছের। মারামারি করতে সোডার বোতল আর অ্যাসিড বাল্‌ব ছুঁড়তে ওস্তাদ। পাড়ায় বেশ কদর আছে তার। ওই সাইকেলের দোকানে চাকরি করে, পকেটে দু-চারটে বাড়তি টাকা এলে একটু মদ-টদও খায়। আর তখন বেশ বুক ফুলিয়ে শোনার মত দু-পাঁচ কথা বলেও।

এই নিতাইদাকে পেলে আর কথা! মস্ত অভিজ্ঞ লোক, ঝামেলায় পড়ে এ পর্যন্ত বার দুই হাজত-বাসও করেছে।

নিতাইদা শোনামাত্র রাজি। তার ওপর রেস্টুরেন্টে চপ-কাটলেটের মুখ দেখার সম্ভাবনা আছে শুনে রীতিমত ফুর্তি। এই খুদেগুলো এভাবে মানুষ হয়ে উঠছে ভেবেও খুশি। সিতুর মা-কে সে অনেকদিনই দেখেছে। কিন্তু সে খবর এরা কেউ রাখে না। দেখে পাড়ার অনেকের মতই তারও চোখ জুড়িয়েছে। নিতাইদার উৎসাহ বাড়াবার তাগিদে দুলু বলে ছিল, ফাঁক পেলে সিতুর মা-কেও তো ধরে নিয়ে যেত এমন দুর্ধর্ষ ওই ডাকাতগুলো। নিতাইদা তক্ষুনি চোখ পাকিয়ে বুক ঠুকে বলেছে, এই শর্মাই তাহলে ওই কলকাতা চষে ওই ডাকাতদের বার করত আর একে একে মাথাগুলো ধড় থেকে আলাদা করে দিত—পুলিসের

দরকার হত না।

অতএব নিতাইদাটিকে সিতুর বেশ বীর গোছের ভালো লোক মনে হবারই কথা।

ব্যবস্থামত তিনজনে স্কুলে ডুব দিয়ে নিতাইদার সঙ্গে দুরুদুরু বুকে কোর্টে গেছে তারা। আর ফিরেছে যখন, শিরায় রক্ত টগবগ করে ফুটেছে তিনজনেরই। কোথায় লাগে এর কাছে খেলা দেখা বা সিনেমা দেখা! ডাকাতদের দেখেছে, সাক্ষীসাবুদদের কথা শুনেছে, উকীলদের জেরা শুনে তাক লেগেছে। আবার কবে যেতে পারবে তারা? না যেতে পারলে এই নতুন রোমাঞ্চের সমস্ত স্বাদ নষ্ট।

সুযোগ আপনি এলো। মায়ের গাড়ি পাঠাতে দেরি হয়ে গেল সেদিন। প্রভুজীধামের জন্য একটা স্টেশন ওয়াগন কেনা হয়েছে। কিন্তু সেটা ওখানকার কাজেই আটকে থাকে। মায়ের গাড়ি আজকাল প্রায়ই দরকার হয় মিত্রামাসীর। মায়ের নিজেরও দরকার বেড়েছে। তাই ছুটির পর ওকে নিতে আসার ব্যাপারে বিশ-পঁচিশ মিনিট বা আধ ঘণ্টা দেরি হয়েই যায়। মায়ের হুকুম, দেরি হলেও গাড়ি না আসা পর্যন্ত বসে থাকবি, খবরদার একা বেরুবি না।

ঠিক তিন দিনের মাথায় সেই স্বর্ণ সুযোগ। গাড়ি সেদিন পাঠানোই সম্ভব হবে না। প্রভুজীধাম থেকে গাড়ি ফিরতে সন্ধ্যা হবে। মা শামুকে দিয়ে ওকে আনার ব্যবস্থা করছিল। সিতুর মাথায় চমকপ্রদ বুদ্ধি খেলল। সে মা-কে বলল, কারো যাওয়ার দরকার নেই, ক্লাসের অমুক বন্ধুর গাড়ি সামনের বড় রাস্তা দিয়ে তো যায়ই, কতদিন তো ওকে পৌঁছে দেবার জন্য সাধাসাধি করে। তার গাড়িতেই চলে আসবে। মোড়ের মাথায় নামিয়ে দিলে হেঁটে বাড়ি আসতে তো দেড় মিনিটের পথ।

ব্যস, মা নিশ্চিন্ত। বড় রাস্তা পার করে মোড়ের মাথায় নামিয়ে দিলে আর কথা কি। বরং উল্টে বোকা ভেবেছে ছেলেটাকে, বলেছে, এই সুবিধে আছে তো এতদিন বলিসনি কেন?

মা-কে একটুও কম বুদ্ধিমতী ভাবে না সিতু, তাকে এভাবে ভাঁওতা দিতে পেরে নিজের ওপর অটুট আস্থা নিয়ে সে তক্ষুনি ছুটেছে দুলু সুবীরের কাছে। আজ আবার কোর্টে যাবে। স্কুল পালিয়েই যাবে।

এই ব্যাপারটাই চলতে লাগল মাঝে মাঝে। বিচার-পর্ব সাঙ্ঘাতিক জমবে মনে হলে একেবারে ডুব দেয়, নয়তো স্কুল পালায়। নিতাইদাকেও সঙ্গে নেবার দরকার হল না আর। কারণ গেলে কেউ যে ভ্রূক্ষেপ করে না সেটা প্রথম দিনই দেখেছে। কিন্তু কোর্টের বিচার এমনই জমে উঠতে লাগল যে, স্কুল পালিয়ে বা

স্কুলে ডুব দিয়েও ঠিক সুবিধে হচ্ছে না। কদিন পালাবে আর কদিন ডুব দেবে? ডুব দিলে মায়ের নজর এড়িয়ে বেরুতে দুপুর হয়ে যায়, আবার ডুব না দিলেও কোর্টে পৌঁছুতে দেরি তো হয়ই। ফিরতে এক-আধসময় দেরি হয়ে যায়। তখন মায়ের সামনে পড়ে গেলে কৈফিয়ত দিতে হয়, বন্ধু তাদের বাড়িতে ধরে নিয়ে গেল, খাওয়ালো-দাওয়ালো, সেইজন্যই দেরি। অতএব বেরুনোটাই শুধু সমস্যা।

সমস্যা হলে সমাধানও আছেই। তিন বন্ধুর মধ্যে সমস্যা শুধু সিতুরই। ওরা দুজন যে স্কুলে পড়ে সেখানে নিয়ম সবই আছে কিন্তু সেটা রক্ষা করার কড়াকড়ি নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। ওদের কামাই করাও সহজ, পালানোও সহজ। তিনজনে মিলে ভালো করে মাথা খেলাতেই রাস্তা বেরিয়ে গেল।

সিতু বলেছিল, বাবার নামটা সই করার মত একজন বিশ্বাসী লোক পেলেই হত।

দুলাল তক্ষুনি বলেছে, কেন, নিতাইদা তো আছে, ক্লাস নাইনে তিনবার ফেল করে পড়া ছেড়েছিল, দোকানের ও-ই শিক্ষিত লোক—একটা নাম সই করতে পারবে না?

সুবীরের খটকা লাগলো, কিন্তু স্কুলে যদি বিশ্বাস না করে?

সিতুই দুর্ভাবনার নিরসন করল, বাবার ছাপা প্যাডের কাগজ যোগাড় করি যদি তাহলে বিশ্বাস করবে না কেন?

ব্যস, এক জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। নিতাইদাকে শুধু আর একদিন চপ-কাটলেট খাওয়ানোর দায়। ছুটির চিঠির বয়ান সিতুর খাতায় লেখাই ছিল। চারটে পয়সা খরচ করলেই টাইপের দোকানে দরখাস্ত টাইপ করে নেওয়া সহজ, হাতে লেখার ঝামেলা নেই। ওদিকে কিনা চপকাটলেটেই নিতাইদা সই লাগাতে প্রস্তুত প্রায়। একদিনের বেশি খাওয়াতেও হল না। প্রস্তাব শুনে প্রথমদিনই হেসে চোখ টিপে বলেছিল, নিতাই ঘোষ তোর বাপের হয়ে সই করবে এ তো ভাগ্যের কথা রে! আ-হা, আ-হা, দে-দে—

নিতাইদার রসিকতার মর্ম না বুঝে হেসেছে তারাও। কলম বাগিয়ে নিতাইদা এস চ্যাটার্জি সই করেছে। অবিশ্বাস করার মত হয়নি। আসল দরখাস্তে সই করার আগে নিতাইদা বারদশেক এস চ্যাটার্জি সই করে নিয়েছিল।

এরপর বিশেষ বিশেষ দিনে কোর্টে হাজিরা দেওয়া অনেক সহজ হয়ে গেছে। খাওয়া-দাওয়া সেরে বইপত্র বগলে নিয়ে সিতু গাড়ি চেপে স্কুলে বেরুলো। গেটের সামনে তাকে ছেড়ে দিয়ে গাড়ি আড়াল হওয়া মাত্র সে স্কুল গেটের উল্টো রাস্তা

ধরবে। কোথায় দেখা হবে তিন বন্ধুর সে তো পাকা করাই আছে। আবার স্কুল ছুটির আগে আগে ফিরে এসে গেটের অদূরে দাঁড়িয়ে থাকলেই হল—একটু এগিয়ে এসে গাড়ি ধরলে ড্রাইভার কি আর ভাববে। আর বন্ধুর গাড়িতে ফেরার ব্যবস্থার সুযোগ করতে পারলে অর্থাৎ গাড়ি আসা বন্ধ করতে পারলে তো কথাই নেই। তাড়াহুড়ো করে স্কুলের কাছে ফিরে আসার দায় ফুরলো। সে-ব্যবস্থার সুযোগও খুব মন্দ পাচ্ছে না।

একে একে মাস গড়াতে লাগল। খুব নির্বোধের মত কাজ করছে না ওরা। অর্থাৎ মাসের মধ্যে পাঁচ-সাত দিনের বেশি এভাবে ডুব দিচ্ছে না। যেদিন বিচার খুব জমবে আশা করে সেদিনই শুধু হাজির না হয়ে পারে না। কিন্তু পারুক না পারুক, এ এক নেশার মত হয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু মুশকিল হল ফিরে আবার আগস্ট গিয়ে সেপ্টেম্বর আসতে। বিচারের শেষ পালা চলছে তখন। আর কত তাজ্জব ব্যাপার যে প্রকাশ হয়ে পড়ছে ঠিক নেই। সে-রকম আগেও হয়েছে। কিন্তু এই শেষের দিকের তুলনা নেই বুঝি। মেয়েছেলে পর্যন্ত আসছে সাক্ষী দিতে, উকীলের জেরায় হিমশিম খাচ্ছে। মেয়েছেলের সঙ্গে আবার ঐ ডাকাতদের কি সব সম্পর্ক আছে। ওই যে সোনা মেয়েটা, ও তো কত কি ফাঁস করে দিয়েছে ঠিক নেই। সুবীর বলছিল, ও খারাপ মেয়েছেলে। খারাপ মেয়েছেলে বলতে ঠিক কি যে ব্যাপার, সেটা কারো কাছেই একবারে অস্পষ্ট নয় যেন। অথচ মেয়েটা দেখতে মন্দ নয়, মোটা-সোটা, জেরার জবাবে বয়েস বলছিল বাইশ না তেইশ। মেয়েটা ডাকাতদের একজনকে ভালবাসত, পুলিস সেই ফাঁকে তাকে মোক্ষম কলে ফেলেছে।

আর ওই যে ডাকাত দলের পাণ্ডা, ভারী ফিটফাট শিক্ষিত নিশ্চিন্ত গোছের মুখ করে ছিল এতদিন, এখন সে-ও যেন ভাঙতে শুরু করেছে। হাবভাব এখন আর অত বেপরোয়া নির্দোষী গোছের নয়। ডাকাতদের মধ্যে শুধু একজনকেই চিনেছে সিতু, যে তাদের গাড়ির দিকে রিভলবার উঁচিয়ে ধরেছিল। সেই লোকটার তো ঝড়ো কাকের মত অবস্থা এখন। ভয়ে ত্রাসে মুখচোখ বসা।

এখন যে প্রায় রোজই কোর্টে আসতে না পারলে ভাতই হজম হবে না তিন সঙ্গীর। কিন্তু একটানা এভাবে কামাই করবে কি করে সিতু?

মনের এই বাসনাই ষোল আনায় পূর্ণ হয়েছে সিতুর। ওপরওয়ালা যথার্থ সদয় তার ওপর।

বলা নেই কওয়া নেই, জেঠু দিন-পনেরোর জন্য দক্ষিণ ভারতের কোথায় বেড়াতে বেরুচ্ছে। গতরাতেই মা-কে বলছিল, একঘেয়ে কলকাতায় ভালো লাগছে না,

কাজের চাপও কম। দিন-পনেরোর জন্যে ঘুরে এলে অসুবিধে হবে কিনা জিজ্ঞাসা করছিল। মা বলেছে অসুবিধে হবে না।

এদিকে ছোট দাদু এখনো আগের মতই ব্যস্ত। নিজের কাজে আর প্রভুজীধামের কাজে বাড়ি আসার ফুরসত কমই হয়। এলেও হুট-হাট রাত্রিতে এসে হাজির হয়। ঠাকুমা-বুড়ীর শরীর এখন দিব্বি খারাপ বোধ হয়, বেশির ভাগ সময় ঝিমোয় আর ঘুমোয়। মাঝে মাঝে ডাক্তার এসে বুড়ীকে দেখে যায়। তার হাঁক-ডাকও কিছু কমেছে। ওদিকে বাবার মেজাজ আগের চেয়েও বেশি টঙে চড়া মনে হয় সিতুর। মায়ের ওপর রেগে থাকলে যেমন হয়। বয়েস এগারো ছাড়িয়ে এখন বারোয় পড়তে চলল। বোঝার শক্তিও আগের থেকে এখন অনেক বেড়েছে। বাবা এ-রকম গুরুগম্ভীর মেজাজে থাকলে মা-ও সুস্থির থাকতে পারে না খুব, আর অন্যমনস্কও হয়। মোট কথা, মায়ের মনোযোগ এড়ানো তখন অনেক সহজ হয় সিতুর।...প্রভুজীধাম নিয়ে মায়ের এত ব্যস্ততা বাবার খুব পছন্দ নয় বলেই ধারণা, কিন্তু মায়ের ব্যস্ততা কমার লক্ষণ না দেখে সিতু অনেকটা নিশ্চিন্ত।

অতএব মোটমাট ভাগ্যটা যে তার আপাতত অতি ভালো তাতে আর সন্দেহ কি?

জেঠু বাড়ি থেকে বেরুবার পরই দুলু সুবীরের সঙ্গে পরামর্শ করে সিতু একটা পাকা ব্যবস্থা করে ফেলল। নিতাইদাকে দিয়ে একটানা দশ দিনের ছুটির দরখাস্ত সই করিয়ে নিল। তার মধ্যেই বিচারের ফয়সালা হয়ে যাবে আশা করা যায়।

॥ ত্রিশ ॥

সকাল থেকে জ্যোতিরাণী তাড়ার মধ্যে ছিলেন একটু। ভিতরও সুস্থির নয় খুব। গত রাতে প্রভুজীধাম থেকে বেশ দেরিতে ফিরেছেন। সকাল সকাল যাওয়া দরকার। কি করবেন, তিন-চার দিনের জন্য মিত্রাদিকে নিজেই ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। আজ ফেরার কথা, ফিরলে বাঁচেন। গত কমাসের মধ্যে মিত্রাদি একটা দিনের জন্যেও ছুটি চায়নি। তাঁর দ্বিগুণ পরিশ্রম করেছে। সপ্তাহের মধ্যে দুই-একদিনের বেশি বাড়িতেও ফিরতে পারেনি। অবশ্য প্রধান পরিচালিকা হিসেবে আলাদা থাকার ঘর, অফিস ঘর সব কিছুর যাবতীয় আলাদা ব্যবস্থা করেই সমমর্যাদায় মিত্রাদিকে বসানো হয়েছে সেখানে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাটাই কেবল

পৃথক নয়, একতার সুর কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা তাহলে। কমাস ধরে বেশ দাপটেই প্রতিষ্ঠান চালিয়ে আসছে মিত্রাদি, নানা বয়সের তেত্রিশটা মেয়েই তাকে ভয়ও করে, সমীহও করে। মিত্রাদির দাপটে বীথি ঘোষও সচল হয়েছে একটু-আধটু। ওখানে সে-ই তার ডান হাত। অথচ উঠতে বসতে বকুনি ও-ই বোধ হয় বেশি খায়। কিন্তু চাপা স্নেহটা যে তারই ওপর সকলের থেকে বেশি মিত্রাদির, তাও জ্যোতিরাণী ভালই জানেন। অথচ মিত্রাদিকে সব থেকে বেশি ভয় করে বোধ হয় বীথি। কারণ তার প্রতি ব্যাপারে মিত্রাদির শ্যেনদৃষ্টি। ঘরে বসে থাকলে রাগ, বেশি খাটা-খাটনি করলেও রাগ, বেশিক্ষণ চুপ করে থাকতে দেখলে রাগ, মুখে হাসি না দেখলেও রাগ। পরিচিত শাঁসালো দুই-একজন করে ডোনার ধরে নিয়ে আসে মিত্রাদি, ঘটা করে প্রতিষ্ঠান দেখায় তাদের, কি হচ্ছে বা হবে বোঝায়, আবার অনেক সময় ব্যস্ততার অজুহাতে প্রধান সহকারিণী হিসেবে সে ভার বীথির ওপরেও ছেড়ে দিয়ে তাকে চালু করে তুলতে চেষ্টা করে। তার আড়ালে হেসে জ্যোতিরাণীকে বলে, তোমার এই মেয়েটা শামুকের মত, খোলা ছেড়ে আর বেরুতেই চায় না।

কিন্তু মিত্রাদির পাল্লায় পড়ে খোলা ছেড়ে যে না বেরিয়ে উপায় নেই বীথির তাও জ্যোতিরাণী লক্ষ্য করেন আর মনে মনে হাসেন।

মেয়ের কি একটা ব্যবস্থা করার জন্য মিত্রাদির দার্জিলিং-এ যাওয়া দরকার হয়েছে হঠাৎ। জ্যোতিরাণী বাধা দেন কি করে। তবু ট্রেন বাতিল করে প্রতিষ্ঠানের টাকাতে প্লেনে যাতায়াত করতে বলে দিয়েছেন তিনি। যাতায়াতের সময়টা বাঁচলে সাত দিনের বদলে তিন-চার দিনের মধ্যেই ফেরা সম্ভব হবে। গতকাল তিন দিন পার হয়েছে, আজ বিকেলের মধ্যে ফিরবেই আশা করা যায়।

মিত্রাদি এই কটা দিন তাকে প্রভুজীধামে থাকার কথা বলেছিল। জ্যোতিরাণী বিব্রত বোধ করেছিলেন। মাসের পর মাস যে এখানে কাটাচ্ছে তাকে অসুবিধের কথা বলতে সঙ্কোচ। আর কোন্ অসুবিধের কথাই বা বলবেন? অসুবিধে তাঁর বাড়ির বাতাসে। তবু বলেছেন, না, রাত্রিতে থাকতে পারব না, শাশুড়ীর শরীর ভালো না, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যতক্ষণ পারি থাকব'খন, তুমি নিশ্চিন্ত মনে যাও।

ওই অজুহাতের মধ্যেও মিত্রাদি ফাঁকি না হোক ফাঁক দেখেছেন। ছদ্ম গাম্ভীর্যে সায় দিয়েছে, সেই ভালো, তাছাড়া তিন রাতের জন্য একেবারে গা-ঢাকা দিলে বাড়িতে কেউ আবার অন্ধকার দেখবে কিনা ঠিক কি!

হেসে জ্যোতিরাণী সেই সম্ভাবনাও প্রায় স্বীকারই করে নিয়েছিলেন।

অন্ধকার না দেখুক, অন্ধকার ছড়াবার মেজাজ কারো,—সেটা জ্যোতিরাণী প্রথম দিন সকালে বেরিয়ে আর রাতে ফিরেই অনুভব করেছেন। বারান্দা ধরে ফেরার সময় পাশের ঘরের মালিকের ধার-ধার দৃষ্টি মুখের ওপর আটকেছে। পরনের জামা-কাপড় দেখে মনে হয় বেরুনোর জন্য প্রস্তুত।

জ্যোতিরাণী দাঁড়িয়েছেন। কথা বেশির ভাগ একতরফাই বলেন। বললেন, মিত্রাদি সকালে দার্জিলিং-এ চলে গেল, এ কটা দিন ফিরতে একটু দেরীই হয়ে যাবে, কি করি—

কি করবেন সে-সমাধানের জন্যে দাঁড়িয়ে নেই শিবেশ্বর। ঘরে ঢুকলেন আর তার পাঁচ মিনিটের মধ্যে বেরিয়েও গেলেন। মেঘনা খবর দিল, বাবু সন্ধ্যে থেকে বেরুবার জন্য তৈরি হয়েও বেরুতে পারছিলেন না। কেবল ছটফট করেছেন, আর এক-একবার ঠাকুমার ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। বাড়িতে কেউ নেই বলেই বেরুতে পারছিলেন না বোধ হয়, বিকেলে ডাক্তারকেও ডেকে পাঠিয়েছিলেন একবার —তার আগে বাবুর সামনে ঠাকুমা কান্নাকাটিও করেছেন।

জ্যোতিরাণী উতলা, কেন, মায়ের আবার শরীর খারাপ হয়েছে নাকি?

মেঘনা জানে না, ডাক্তার এসে শাশুড়ীকে দেখে গেল তাই শুধু দেখেছে।

পায়ে পায়ে জ্যোতিরাণী শাশুড়ীর ঘরে এসেছেন। শয্যায় বসেই আছেন তিনি। আফিমের ঝিমুনি ছাড়া বাড়তি কোনো উপসর্গ চোখে পড়ল না। তবু জিজ্ঞাসা করলেন, ডাক্তারকে খবর দিতে হয়েছিল শুনলাম, কি হয়েছে?

শাশুড়ীর বিরস জবাব, নতুন আর কি হবে, নাড়ির টান যার আছে সে-ই ডাক্তারকে খবর দেয়—কিছু হবার জন্য বসে থাকে না। কিছু হবার আশায় তো দিন গুণছি, হয়ও তো না —

ফিরে এসে কালীদার ঘর থেকে ধমকে ছেলেকে ঠাকুমার কাছে পাঠালেন তিনি। মুশকিলই হয়েছে, কালীদা বাড়ি থাকলেও এতটা অসহায় বোধ করতেন না।

বাড়ির কর্তা বেশি রাতেই বাড়ি ফিরেছেন বোধ হয়, কারণ কখন ফিরেছেন জ্যোতিরাণী টের পাননি। সকালে যতবার দেখা হয়েছে, গম্ভীর এবং অপ্রসন্ন। কিন্তু না বেরিয়েই বা করবেন কি তিনি। তাছাড়া শাশুড়ীর মেজাজ যেমনই থাক, শরীর একরকমই আছে মনে হয়েছে তাঁর। তবে সেদিন রাত না করে সন্ধ্যের সঙ্গে সঙ্গেই ফিরতে পেরেছেন তিনি। এসে একই ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন। তিনি ফেরার পর কর্তা বেরুলেন আর আগের দিনের মতই বেশি রাতে ফিরলেন হয়ত।

এই অসময়ে বেরুনো আর অসময়ে ফেরাটা যে তাঁর ওপর রাগ করে সেটা জ্যোতিরাণী দ্বিতীয় দিনেও বুঝতে পারেননি। কারণ আগেও অনেক দিন সকালে বেরিয়ে মাঝরাতে ফিরতে দেখে অভ্যস্ত তিনি। মাঝে কিছুদিন ছেদ পড়েছিল, এই যা। কিন্তু টের পেলেন তৃতীয় দিনে, অর্থাৎ পরের রাত্রিতে। এ-দিন আবার কি হিসেবনিকেশের ঝামেলায় পড়ে প্রভুজীধাম থেকে ফিরতে প্রথম দিনের থেকেও বেশি রাত হয়ে গেল জ্যোতিরাণীর। গাড়িতে বসেও ছটফট করেছেন আর ঘড়ি দেখেছেন। আর তারপর বারান্দার ওই মূর্তি দেখেও অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন। গাড়ির আওয়াজ পেয়েই দরজার সামনে এসে দাঁড়ায় বোধ হয়, নইলে পরপর তিন দিনই একই গুরুগম্ভীর প্রতীক্ষা দেখলেন কি করে। একরকম নয়, মুখ আরো থমথমে।

কিন্তু এই রাতে জ্যোতিরাণী ঘুমিয়ে পড়েননি। সমস্ত দিনের পরিশ্রম সত্ত্বেও ঘুম চট করে আসেনি। পর পর দু রাত ও-ঘরের খাবার ঢাকা দেওয়া ছিল, কেউ স্পর্শও করেনি। বাইরে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা থাকলে বাড়িতে, তাঁকে না হোক, একজন কাউকে ডেকে বলে যান। আগে সদাকে বলতেন। রাতে ইচ্ছাকৃত উপোস চলছে কিনা সেই খটকা লাগল একটু। তাই গত রাতে সঙ্কোচ কাটিয়ে ঘর-বদল এবং শয্যা-বদল করেছিলেন তিনি। রাত একটু বাড়তে এবং দোতলা নিরিবিলি হতে পাশের ঘরের শয্যায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। ফিরলে টের পাবেন। খাবারটা ঢাকা থাকে কেন তাও বুঝতে পারবেন, আর দরকার মত বোঝাতেও পারবেন।

অনভ্যস্ততার দরুন হোক বা যে জন্যেই হোক ঘুম আসতেও চায়নি চট করে। আজও যখন ফিরল না, কাল বিকেলের মধ্যে মিত্রাদি ফিরবেই। বাঁচা যায়। রাত দুটো পর্যন্ত জেগেছিলেন জ্যোতিরাণী, রাস্তায় গাড়ির আওয়াজ শুনে অনেকবার উৎকর্ণ হয়েছিলেন। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন জানেন না। ঘুম ভেঙেছে বেলা ছটা নাগাত। সঙ্গে সঙ্গে নতুন শয্যার একটা অস্বস্তি নিয়ে উঠে বসেছেন। না, আর কেউ নেই, এ-শয্যায় আর এই ঘরে একাই রাত কাটিয়েছেন তিনি। উঠে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে চলে এসেছেন। মুখ-হাত ধুয়ে খানিকক্ষণের মধ্যেই বেরিয়ে এসেছেন আবার। দোতলার এদিক-ওদিক লক্ষ্য করেছেন। নীচেও ঘুরে এসেছেন একবার।

আর, তারপরেই বুঝেছেন রাগ একজনের কোন্ পর্দায় চড়ে আছে। রাতে বাড়িই ফেরা হয়নি, এই সকাল সাতটা পর্যন্তও না।

রাতে না ফেরার নজিরও আছে। বাইরে কোনো অনুষ্ঠান-টনুষ্ঠান থাকলে বাড়ি ফেরেননি এমন রাত অনেক গেছে। কিন্তু খবর না দিয়ে বাইরে থাকার নজির

নেই। সে-ব্যাপারে বুড়ী মায়ের ওপর টান আছে একটু। খবর না দিয়ে বাইরে থাকেন না। তাছাড়া, কলকাতার বাইরে না গেলে যত রাতই হোক ঘরে ফেরা অভ্যাস। ওপরে ফিরে এসেই জ্যোতিরাণী শাশুড়ীর তলব পেলেন। না, ছেলের রাতে বাড়ি না ফেরার খবর তিনিও আগে জানতেন না, কারণ তাঁর দর্শনমাত্রে তিনি উতলা।—শিবু রাতে ফেরেইনি শুনলাম, কিছু বলে গেছল?

শামু বা ভোলার মুখে জেনে থাকবেন শাশুড়ী। মনে মনে জ্যোতিরাণী ওদের ওপরেই বিরক্ত। মাথা নাড়লেন, কিছু বলে যাননি।

এখনো তো ফেরেনি, বলি তোমার চিন্তা-ভাবনা কিছু আছে? চুপ করে বসেই আছ নাকি খোঁজখবর করেছ?

মৃদু গলায় জ্যোতিরাণী তাঁকে আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করলেন, হঠাৎ কোথাও চলে যেতে হয়েছে বোধ হয়, আপনি ঠাণ্ডা হয়ে বসুন, আমি দেখছি—

চলে এলেন, কারণ, সামনে থাকলেই শাশুড়ীর ক্ষোভ বাড়বে, খেদ বাড়বে। দেখার নাম করে নিজের ঘরে এসে বসলেন তিনি। দেখার কি আছে, এই অনুপস্থিতি যে তাঁর পর পর তিন দিন প্রভুজীধাম নিয়ে ব্যস্ত থাকার জবাব—এটা খুব ভালো করেই জানেন। আর কোনো কারণ নেই।

আজ আর সকাল সকাল বেরুনো চলবে না, সেটা বেশ বুঝতে পারছেন। সাড়ে আটটা বেজে গেল এখনো দেখা নেই। না ফেরা পর্যন্ত শাশুড়ীর ঘরের দিকে মাড়াতে পারছেন না তিনি। আলমারি থেকে টাকা বার করে মন দিয়েই গুনতে চেষ্টা করেছেন। প্রভুজীধাম থেকে লোক আসার কথা, টাকা নিয়ে যাবে। পাঁচশ সত্তর টাকা মামাশ্বশুরের কাছে সকালের মধ্যে পৌঁছে দেবার কথা—কি কি সব লাগবে, তাছাড়া আগামীকাল জন্মাষ্টমীর খরচ আছে। হিসেব করে মামাশ্বশুর ওই টাকাটাই পাঠাতে বলেছিলেন। মিত্রাদির কাছ থেকে ক্যাশবাক্সের চাবি রাখেননি জ্যোতিরাণী, বলেছেন, ও তুমি নিয়েই যাও, অত হিসেব মাথায় আসে না, একটু এদিক-ওদিক হলেই তো তোমার মাথা গরম হবে। এদিকের যা দরকার আমি চালিয়ে নেব'খন, ফিরে এসে তুমি হিসেব লিখো।

মন দিয়ে গুনছেন কারণ, গোনাগুনির ব্যাপারে প্রায়ই তাঁর ভুল হয়। ও-জায়গায় ভাঙাতে অসুবিধে হয় বলেই আলমারিতে দশ-টাকা পাঁচ-টাকার নোট মজুত থাকে। তিনশ টাকার তিরিশখানা নোট পর্যন্ত ধৈর্য ধরে গুনেছেন জ্যোতিরাণী, তার পরেই কান খাড়া। পাশের ঘরের লোকের ফেরা হল টের পেলেন। বলতে গেলে বাতাসেই টের পান তিনি। টাকা গোনার মন থাকল না। আর দুশ সত্তর দরকার। একশ টাকার দুখানা নোট বার করলেন, মামাশ্বশুর ভাঙিয়ে নেবেন'খন। পাঁচ

টাকার নোটও কিছু চেয়েছিলেন, মনে পড়ল। অতএব ধৈর্য ধরে আবার চৌদ্দখানা পাঁচ টাকার নোটও গুনে সরাতে হল। মোট পাঁচশ সত্তর টাকা আলাদা করে খামে পুরে আলমারি বন্ধ করলেন, টাকাটা ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে রেখে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন।

পাশের ঘরের দরজার সামনে দাঁড়ালেন। ভারি পরদার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সকালের ডাকের চিঠি-পত্র পড়ছেন। পায়ে পায়ে জ্যোতিরাণী বারান্দা ধরে এগিয়ে গেলেন। কালীদার ঘরে সিতু গভীর মনোযোগে কাগজ পড়ছে। সেখান দিয়ে যেতে যেতে মা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে গেছে টেরও পায়নি।

বেলা নটা পর্যন্ত কাগজ পড়া হচ্ছে, স্কুলের পড়া নেই?

সিতু চমকে মুখ ফেরালো।—সব পড়া মুখস্থ। মা—ইয়ে, আজ বোধ হয় বিচারের রায় বেরুবে।

এক বছর আগের ঘটনা জ্যোতিরাণীর মাথায় বসে নেই।—কিসের বিচার?

বা রে! সেই যে লোক খুন করে ব্যাঙ্ক ডাকাতির পর সব ধরা পড়ল—এতদিন ধরে তো তাদের বিচার চলছে!

অত আগ্রহ করে কাগজ পড়া মানে খেলার পাতায় মনোযোগ ধরে নিয়েছিলেন জ্যোতিরাণী। ছেলের চোখে-মুখে চাপা উত্তেজনা লক্ষ্য করলেন হয়ত। কিন্তু ভিতরটা তাঁর নিজেরই খুব সুস্থির নয়। বাড়ির সেই চিরাচরিত আপসশূন্য ঠাণ্ডা ভাবটা বেড়েই চলেছে। তিনি ব্যস্ত বটে, কিন্তু এত ব্যস্ততার ফাঁকেও সব দিক বজায় রাখার চেষ্টা তো কম করছেন না। ব্যস্ত যখন ছিলেন না, তখনো এত করেননি। আঘাত পেলে তখন অতি সহজে তাঁরও ভিতর তেতে উঠত। এখন ওঠে না। উঠলেও নিজেকে তিনি উদ্ধার করেন তার থেকে। বিভাস দত্ত চলে যাবার পর সে রাতে যে সঙ্কল্প নিয়ে ওই পাশের ঘরে ঢুকেছিলেন তিনি, তার নড়চড় হতে দেননি। দ্বিগুণ সংযমে বেঁধেছেন নিজেকে। ছেলেমানুষের মত এখন এক-একসময় মনে হয় তাঁর, ছেলেটা চট করে অনেক বড় হয়ে গেলে বেশ হত। তাঁর পিছনে দাঁড়াত, সহায় হত। ছোট দাদুর মুখে জলের জীবের সেই গল্প শোনার প্রতিক্রিয়া দেখার পর আর প্রভুজীধামে খেয়ালী শিল্পীর ওই অয়েল-পেন্টিং টাঙানোর পর ছেলের ব্যাপারে মনে আর কোনো হতাশার ছায়া পড়তে দিতে চান না তিনি। তাই এ-সব ডাকাতি বা বিচারের প্রসঙ্গ ভালো লাগল না।

আচ্ছা, এ-সব নিয়ে তোকে অত মাথা ঘামাতে হবে না। শোন্, স্কুল থেকে আজও তোর ওই বন্ধুর গাড়িতে চলে আসিস, আমার ফিরতে দেরি হবে।

সুবোধ ছেলের মতই সিতু মাথা নাড়ল। গত তিন দিন ধরেই মা এই ব্যবস্থা

করছে। ভাবলে হাসিই পায় সিতুর, সে যে কত সেয়ানা হয়েছে মায়ের যদি একটুও ধারণা থাকত। মুখখানা গম্ভীর করে বলল, আজ একটু তাড়াতাড়িই স্কুল যেতে হবে, জেঠু নেই, আগে গেলে অঙ্ক টীচার কয়েকটা অঙ্ক বুঝিয়ে দেবে—

উঁচু ক্লাসের ছেলেরা অনেকসময় আগে গিয়ে টীচারদের কাছ থেকে এটা-সেটা বুঝে নেয় এটা সে অনেকদিনই লক্ষ্য করেছে।

জ্যোতিরাণী শাশুড়ীর ঘরের দিকে এগোলেন। ছেলের জন্যে চিন্তায় আছেন, ফেরার খবরটা দেওয়া দরকার। কিন্তু মেঘনাকে সামনে দেখে নিজে আর গেলেন না, গেলেই তো পাঁচ কথার জবাব দিতে হবে আর পাঁচ কথা শুনতে হবে। মেঘনাকে পাঠালেন বাবুর ফেরার খবরটা শাশুড়ীকে বলে আসতে।

পায়ে-পায়ে এদিকেই ফিরলেন আবার। সিতু এরই মধ্যে কোথায় হাওয়া হয়ে গেছে। বারান্দা ধরে খুব মন্থর পায়ে ফিরে এসে পাশের ঘরের সামনে দাঁড়ালেন, তারপর পরদা সরিয়ে ভিতরে ঢুকলেন।

গায়ের জামা খুলে শুধু গেঞ্জি গায়ে শিবেশ্বর শয্যায় বসে সকালের ডাক দেখছেন। মুখ শুকনো একটু, রাতে ঘুমের ব্যাঘাত হয়েছে লক্ষ্য করলে বোঝা যায়। স্ত্রীর পদার্পণ টের পেয়ে চিঠি পত্র পড়ায় মনোযোগ পড়ল একটু।

হাতের চিঠিটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত জ্যোতিরাণী চুপচাপ অপেক্ষা করলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, রাতে ফিরলেই না, কোথায় ছিলে ?

অন্য চিঠি তুলতে তুলতে শিবেশ্বর নির্লিপ্ত মুখে বলেছেন, ঠিকানা চাই…?

না, বাইরে কোথাও ফাংশান-টাংশান ছিল নাকি ?

শিবেশ্বর জবাব দিলেন না, অন্য খামগুলো দেখছেন।

কিছু বলে যাওনি, মা খুব ভাবছিলেন।

শিবেশ্বর নিস্পৃহ মন্তব্য করলেন, মা যখন…একটু-আধটু ভাবারই কথা।

গম্ভীরই বটে, কিন্তু যতখানি রাগের আঁচ পাবেন ভেবেছিলেন জ্যোতিরাণী তা পাচ্ছেন না। আর চোখও এ পর্যন্ত এদিকে ফেরেনি। হেসেই বললেন, তার মানে এক মা ছাড়া তোমার জন্যে বাড়িতে আর ভাবার কেউ নেই, এই তো ?

মনোযোগ দেবার মতই একটা চিঠি হয়ত পেলেন শিবেশ্বর। সেটা দেখছেন বা পড়ছেন।

জ্যোতিরাণী আবার বললেন, কদিনের জন্য মিত্রাদি নেই, কি করব বলো। …আজই ফেরার কথা। নিজে এত করছে, কটা দিন একটু দেখাশুনা না করলে ফিরে এসে ভাববে কি।

এবারে শিবেশ্বর মুখ তুলে তাকালেন তাঁর দিকে।—কেউ আপত্তি করেছে ?

চোখে চোখ রেখে জ্যোতিরাণী আবারও হাসলেন একটু।—করেনি বলছ?

দরজার পরদা নড়তে বাধা পড়ল। পরদার ফাঁকে শামুর বিনয়-নম্র বদন। সে জানান দিল, প্রভুজীধাম থেকে একজন লোক এসেছেন, নীচে অপেক্ষা করছেন—।

আসার কথা আছে। টাকা নিয়ে যাবে। তবু ঠিক এই মুহূর্তে না এলেই যেন ভালো হত। অগত্যা জ্যোতিরাণী বেরিয়ে এলেন। চেনা লোক, খামটা তার হাতে দিয়ে বললেন, বাবুর হাতে দিও, পাঁচশ সত্তর টাকা আছে, দেখে নাও—

বাবু, অর্থাৎ মামাশ্বশুর। যেতে দেরি হবে এই লোকের মারফৎই বীথিকে জানিয়ে দেবেন ভাবলেন জ্যোতিরাণী। কিন্তু নোট-গোনা শেষ করে লোকটা ঈষৎ সঙ্কোচে তাকালো তাঁর দিকে।—পাঁচশ সত্তর বলছিলেন···

কেন, ভুল হয়েছে নাকি? দেখি—

নোটগুলো নিয়ে জ্যোতিরাণী নিজেই গুনলেন। অপ্রস্তুত তারপর। পনের টাকা কম, একটা দশটাকার নোট আর একটা পাঁচটাকার নোট।

তাড়াতাড়িতে ভুল হয়ে গেছে, এক্ষুনি নিয়ে আসছি।

নিজের ওপর বিরক্ত। এই রকমই কাণ্ড তাঁর। ভুল করে এক-আধখানা বেশিও তো হতে পারে, না কমই হওয়া চাই। আর একবার মামাশ্বশুরের হাতে টাকা গুনে দিয়েও এমনি অপ্রস্তুত হয়েছিলেন—একটা দশ টাকার নোট কম। তবে আজ অবশ্য পাশের ঘরের লোকের ফেরার আভাস পেয়ে টাকা গোনায় মন ছিল না।

তাড়াতাড়ি আর পনেরটা টাকা এনে দিয়ে লোকটাকে বিদায় করলেন। মাঝখান থেকে তাঁর যেতে দেরি হবে সে-কথা জানানো হল না। মনে পড়তে আবার বিরক্ত। বীথিকে টেলিফোনে বলে দিলেই হবে।

কিন্তু বেলা প্রায় একটা পর্যন্ত পাশের ঘরের লোককে ঘর থেকে বেরুতে না দেখে মুশকিলে পড়লেন। হুট্ করে নাকের ডগা দিয়ে বেরুতে সঙ্কোচ। কিন্তু না গেলেও নয়। অগত্যা বলেই যাবেন ঠিক করলেন। কিন্তু বলতে এসেও বলা হল না।

ঘুমে অচেতন, নাক ডাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

মিনিট দশেকের মধ্যেই জ্যোতিরাণীর ভাবনার অবসান। প্রভুজীধাম থেকে মিত্রাদির টেলিফোন।

ফিরেছ তাহলে, বাঁচালে!

কেন জলে পড়েছিলে না অন্ধকার দেখছিলে ?

জলেও পড়েছিলাম, অন্ধকারও দেখছিলাম। তোমার দার্জিলিংয়ের খবর ভালো তো ?

হ্যাঁ। আমি ফিরেছি সেই সকালের প্লেনে। বাড়ি হয়ে তারপর আরো কতক-গুলো দরকারী কাজ সেরে এইমাত্র প্রভুজীধামে পা দিয়েই তোমাকে টেলিফোন করছি। ভালো কথা, তোমাদের কালীদা না বাইরে কোথায় ছিলেন শুনেছিলাম, কবে ফিরলেন ?

ফেরেননি তো! ফেরার সময় হয়েছে অবশ্য, কেন ?

ওদিকে মিত্রাদির গলায় বিস্ময় ঝরল, ওমা, আমি তো আজ স্বচক্ষে এই কলকাতাতেই দেখলাম তাঁকে। আমার বাড়ির মালিকের সঙ্গে দেখা করতে নেমেছিলাম, লোকটার বয়েস হলেও রস আছে, দোতলার নিরিবিলিতে নিয়ে গিয়ে তুলেছিল আমাকে, নীচেরতলার বে-আইনী ভাড়াটে তুলে দেবার বায়না,—আমাকে মাথার ওপরে রেখে নীচে তার নিজের থাকার বাসনা—খুশি মেজাজে আমি আর একটু হাসতে-টাসতে পারলে কিছু ভাড়াও দিতে রাজি হত বোধ হয়। মিত্রাদির অস্ফুট হাসি।...যাক, লোকটার মুণ্ডু ঘুরিয়ে নীচে নামতেই মুণ্ডু ঘুরে গেল। তোমাদের কালীদাকে দেখলাম আর কার সঙ্গে দিব্বি মনের আনন্দে বসে চা খাচ্ছেন, আমাকে দেখেননি অবশ্য...সঙ্গে অন্য ভদ্রলোক দেখে আমিও আর এগোইনি।

কালীদার কোনো কাজই খুব অবাক হবার মত কিছু নয়। কলকাতায় পা দিয়েই হয়ত কোনো দরকারী কাজ সারার কথা মনে হয়েছে। অ্যাটর্নীদের মাথায় সর্বদাই প্ল্যান ঘোরে। এদিক থেকে জ্যোতিরাণী স্বস্তি জ্ঞাপন করলেন, বাঁচালে, আমি ভাবলাম কোনো ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখে তোমার মুণ্ডু ঘুরেছিল বুঝি।

ওধার থেকে অনুনয়ের স্বরে হাল্‌কা জবাব এলো, দাও না ভাই একটা জুটিয়ে, মাথা ঠাণ্ডা হলে আমি তো হাঁপ ফেলে বাঁচি।

টেলিফোনের কথা শেষ করে জ্যোতিরাণী হাসছিলেন বটে একটু, কিন্তু মনের তলায় সমস্যা গোছের কিছুও যেন উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল। কালীদাকে বোঝা ভার। কিন্তু মিত্রাদির ভিতরের ক্ষতটা মাঝে মাঝে যেন প্রকাশ হয়ে পড়ে। এই দুজনের ব্যাপার শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে যে দাঁড়াবে তিনি ভেবে পান না।

এই দিনের মত নিশ্চিন্ত। মিত্রাদিকে বলে দিয়েছেন, আজ আর প্রভুজীধামে যাচ্ছেন না।

একটানা পরিশ্রমের পর অবকাশ ভালো লাগছিল। কিন্তু দুপুরই কাটতে

চায় না। শমীকে মনে পড়ল। অনেক দিন আসেনি, অনেকদিন তিনিও খবর নেননি। বিভাস দত্তর আসায় ছেদ পড়েছে। মেয়েটার কোনো জটিলতা বোঝার কথা নয়। মাসীর আর আগের মত টান নেই তাই ভেবেছে বোধ হয়। অনেক হারিয়েছে বলেই এটুকুও হারাবার আশঙ্কার উৎকণ্ঠা। আগে আগে টেলিফোনে রাগ করেছে, অভিমান করেছে, মাসীর সব ব্যস্ততার ওপরে আগের মত নিজের দাবি উঁচিয়ে রাখতে চেয়েছে। কিন্তু এখন আশাও ছেড়েছে বোধ হয়। আগের মত টেলিফোনও করে না। ওর কথা মনে হলে জ্যোতিরাণীর কষ্ট হয়, কিন্তু অনেকটাই যেন নিরুপায় তিনি। বিভাস দত্ত নিজে না আসুক, মাঝে-সাঝে মেয়েটাকে পাঠিয়ে দিলে খুশি হন। কিন্তু ভদ্রলোক ইচ্ছে করেই তা দেন না জানা কথাই।

শমী স্কুলে ভর্তি হয়েছে এ বছরের গোড়া থেকেই। বাড়ির কাছের সকালে স্কুল। বেলা এগারোটার মধ্যে ফিরে আসে। শমীর মুখেই স্কুলের গল্প শুনে একটুও ভালো লাগেনি তাঁর। বিভাস দত্তকে বলেও ছিলেন, দেখে-শুনে একটা ভালো স্কুলে দিলে হত না মেয়েটাকে?

বিভাসবাবু বলেছেন, বাড়ির কাছে খুব, এই ভালো। হাজারের ওপর মেয়ে পড়ছে।

জ্যোতিরাণী মুখ ফুটে বলতে পারেননি এজন্যেই তাঁর আপত্তি। দূরের নামী স্কুলে মেয়ে ভর্তি করলে মাইনে বেশি, স্কুল-বাসের চার্জ, পোশাক-পরিচ্ছদের কড়াকড়ি, এ-ছাড়াও অনেক রকমের আনুষঙ্গিক খরচ আছে। বাবা বেঁচে ছিলেন বলে তিনিও বড় স্কুলেই পড়েছিলেন। জানেন সব। জ্যোতিরাণী অনায়াসে সমস্ত দায়িত্ব নিতে পারেন, অথচ পারার উপায় নেই বলেই অসহায়। এই খরচ টানা বিভাস দত্তর পক্ষেও অসম্ভব ভাবেন না তিনি। কিন্তু ভদ্রলোকের নীতির দৃষ্টি অন্যরকম—হাজার মেয়ের থেকে ওকে তফাতে রাখার প্রস্তাব শুনলেও উল্টে ঠেস দেবেন।

শমীকে ফোন করতে গিয়েও করলেন না। ড্রাইভারের হাতে চিঠি দিয়ে গাড়িই পাঠিয়ে দিলেন। ওকে আনার জন্যে হঠাৎ একেবারে গাড়ি হাজির দেখলে তবু একটু নরম হবে।

এক ঘণ্টার মধ্যে শমীকে নিয়ে গাড়ি ফিরল। জ্যোতিরাণী দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলেন মেয়ের গাল ফোলা। ওপর থেকে ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলেন সিতুর স্কুলে চলে যেতে। ছুটির সময় হয়ে এলো, গাড়ি আছেই যখন অন্যের গাড়িতে আসার কি দরকার।

শমীর মান ভাঙাতে সময় লাগেনি খুব। সে তো বিশ্বাসই করতে চায় মাসীর টান একটুও কমেনি। জ্যোতিরাণী গোড়া থেকেই নিজের বয়েসটা প্রায় ওর কাছাকাছি টেনে নামালেন। অনেক দিন পরে দেখার আনন্দে প্রথমে দু'গালে চুমু খেলেন গোটাকতক, আর মাথার রিবন-বাঁধা ঝাঁকড়া চুল এলোমেলো করে দিয়ে হাসতে লাগলেন। তারপর কেন আজকাল এত ব্যস্ত খুব সহজ করে সেই কৈফিয়ত দিতে বসলেন। মেয়েটার অনেক হারানোর ব্যথা মনে পড়ে যেতে পারে তাই সন্তর্পণে সেদিকটা এড়িয়েই বললেন। যারা গরিব, যাদের থাকার জায়গা নেই, লেখাপড়ার ব্যবস্থা নেই, তাদের জন্যে প্রভুজীধামে অনেক কিছু করা হচ্ছে। শমীই তো বড় হয়ে আর লেখাপড়া শিখে সেটা চালাবে—মাসী তো ততোদিনে বুড়ো হয়ে যাবে।

শমীর অভিমান জল হয়ে এলো। মাসী যে কত ভালো ঠিক নেই। এর ওপর আবার চমৎকার ফ্রকের কাপড় কিনে রাখা হয়েছে তার জন্য, আর সামনের পূজোয় খুব ভালো একখানা শাড়ি পাবার প্রতিশ্রুতি। শাড়ির বাসনার কথা প্রকারান্তরে ও-ই মাসীকে জানিয়েছিল একদিন—বলেছিল তার একখানাও শাড়ি নেই।

জ্যোতিরাণী শাড়ির প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেলেই আবার সাবধান করেছেন, শাড়ির কথা আগে কাউকে বলবি না, তোকে এখানে এনে শাড়ি পরিয়ে সাজিয়ে-টাজিয়ে বাড়ি পাঠাব—সকলে তখন অবাক হয়ে ভাববে, এ-মেয়েটা আবার কে এলো।··· আমার চিঠি কাকে দেখিয়ে এলি, জেঠিকে ?

না কাকুকে, কাকু তো বাড়িতেই ছিল।

জ্যোতিরাণী আরো শুনল, কাকু আজকাল বেশির ভাগই বাড়িতে থাকে, আর দিন-রাত মাথা গুঁজে কেবল লেখে। শমীর মান-অভিমান তো গেছেই, অনেক দিন বাদে মাসীকে এভাবে পেয়ে আর একটা অভিলাষ প্রায় অদম্য হয়ে উঠেছে। এখন মাসী সেটা মঞ্জুর করার ব্যবস্থা করলেই আনন্দটা এইদিনের মত ষোলকলায় পূর্ণ হয়। ব্যক্ত না করে পারল না, আজকের রাতটা সে মাসীর কাছেই থেকে যেতে চায়।

না ভেবে জ্যোতিরাণী বললেন, কাল যে আবার সকালে স্কুল তোর ?

বা রে, কাল তো সক্কলের ছুটি, কাল জন্মাষ্টমী না ?

জ্যোতিরাণীর মনে ছিল না বটে। কাল এইজন্যেই একটু সকাল সকাল প্রভুজীধাম যেতে হবে। উৎসব কিছু হবে না, ওই উপলক্ষে বঞ্চিত মেয়েগুলো দিনটা যাতে আনন্দে কাটাতে পারে, সেই ব্যবস্থা করেছেন শুধু। অন্য দিনের থেকে

ভালো খাওয়া-দাওয়া হবে একটু, বিকেলে সকলকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হবে বলে একটা বাড়তি বাস ভাড়া হয়েছে।

জ্যোতিরাণী আরজি মঞ্জুর করলেন।—আচ্ছা, কাল তোকে আর সিতুকে প্রভুজীধাম নিয়ে যাব'খন, ভালো দিনেই তোকে এনেছি এখানে।

কাকুকে ফোনে বলে দাও তা'হলে।

ব্যবস্থাটা একেবারে পাকা না হওয়া পর্যন্ত শমী গোটাগুটি নিশ্চিন্ত হতে পারছে না।

আচ্ছা সে হবে'খন। জ্যোতিরাণী উঠে দাঁড়ালেন, বোস তুই, সিতুর ঠাকুমার কিছু লাগবে কিনা দেখে আসি।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। পাশের ঘরের পরদা সরিয়ে দেখলেন একনজর। ঘুম ভাঙেনি এখনো। পর পর কটা রাত ঘুমের ব্যাঘাত হয়েছে, আর কাল তো ফেরাই হয়নি।···সেই জন্যেই, নইলে এই বেলা পর্যন্ত এমন অঘোরে ঘুমুতে বড় দেখা যায় না। অন্যমনস্কের মত বারান্দা ধরে এগোলেন। শমীকে কথা দিয়েছেন যখন, বিভাস দত্তর বাড়িতে টেলিফোন একটা করতে হবে। আরো বিকেলের দিকে করবেন, যে সময়ে ভদ্রলোক বাড়িতে নাও থাকতে পারেন। শমীর জেঠী বা আর কাউকে ডেকে বলে দেবেন।···পাশের ঘরের লোকের কাণ্ডকারখানায় এমনই ব্যাপার দাঁড়িয়েছে যে টেলিফোনের সহজ যোগাযোগটুকু এড়ানোর জন্যেও ফাঁক খুঁজতে হয়।

দাঁড়িয়ে গেলেন। সিঁড়ির মুখে ভোলা জানালো, ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে ফিরে এসেছে। ছুটি হবার আগেই গেছল, কিন্তু ছুটির পর সিতুদাদার দেখা পায়নি। শেষে ভিতরে খবর নিয়ে কার কাছে শুনেছে সিতুদাদা স্কুলেই যায়নি।

জ্যোতিরাণী অবাক। ড্রাইভার সকালে ওকে গাড়ি করে স্কুলে পৌঁছে দিল আর স্কুলে যায়নি মানে?

ভোলা জানালো, ড্রাইভার সেজন্যেই ঘাবড়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি ওকে খবর দিতে পাঠিয়েছে।

জ্যোতিরাণী ভাবলেন একটু।—ঠিক সময়ে গেছল তো না ছুটির পরে গিয়ে হাজির হয়েছে?

বলছে তো ছুটির দশ-বারো মিনিট আগে গেছল।

ঠিক আছে। জ্যোতিরাণী নিশ্চিন্ত মনেই বিদায় দিলেন তাকে। হয়ত কোনো কারণে এক-আধ ঘণ্টা আগে ওদের ক্লাস ছুটি হয়ে গেছে। বন্ধুর গাড়িতে তাদের বাড়িতেই চলে গেছে, আড্ডা দেবার ফাঁক পেলে তো ছেলের চার পা।

স্কুলে ঢুকে ড্রাইভার কার খবর নিতে কার খবর এনেছে কে জানে।

॥ একত্রিশ ॥

ছটা বেজে গেল বিকেল। আসন্ন শীতের টান-ধরা দিনে সন্ধ্যার ছায়া নেমেছে। জ্যোতিরাণীর ভাবনা হল ছেলে তখনো ফিরছে না দেখে। শুধু ছেলের ওপর নয়, নিজের ওপরও রাগ হচ্ছে তাঁর। কোন্ ছেলের অর্থাৎ কাদের বাড়ির গাড়িতে ফেরে ঠিকানা কি, বাড়িতে ফোন আছে কিনা—এসব তাঁর জেনে রাখা উচিত ছিল। জানা থাকলে ফোন করতে পারতেন, লোক পাঠাতে পারতেন।

কিন্তু এসব তাঁর খেয়ালও হয়নি।

তবু চিন্তা করতেন না হয়ত। চিন্তার কারণ ঘটিয়েছেন শাশুড়ী। বারকয়েক নাতির খোঁজ করে তখনো ফেরেনি শুনে মুখ ভার করে বলেছেন, তুমি তো এখন বা'র নিয়ে ব্যস্ত, ছেলেটার স্কুল থেকে ফিরতেই প্রায় সন্ধ্যা হয় কেন আজকাল? জিজ্ঞেস করলে খেলতে গেছল, পড়তে গেছল—এইসব নানানখানা বলে। রাগ করলে ফিরে চোখ রাঙায়, এ-ঘরে আসাই বন্ধ করে দেবে। ওইটুকু ছেলে, তোমার না-হয় চিন্তা-ভাবনা নেই, কিন্তু আমি তো না ভেবে পারি না। খাবারটাও অমনি পড়ে থাকে, বলে পেট ঢ াঁই করে খেয়ে এসেছে—রোজরোজ ওকে এত খাওয়াবার কুটুমই বা কে এলো?

এ-সবই জ্যোতিরাণীর কাছে খবর-বিশেষ। তাঁর ব্যস্ততার সুযোগে ছেলে যে এতখানি লায়েক হয়ে উঠেছে ভাবতে পারেননি। সামনাসামনি পড়লে আগের থেকে একটু শান্তশিষ্ট হাবভাবই দেখেছেন, আর পড়াশুনায়ও মনোযোগ বেড়েছে মনে হয়েছিল। তলায়-তলায় ও এই করে বেড়াচ্ছে ভাববেন কি করে। তার ওপর কালীদা নেই কদিন, খুব সুবিধে হয়েছে।

রাগ হলে শাশুড়ী তিলকে তাল করেন অনেকসময়। জ্যোতিরাণী মেঘনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, স্কুল থেকে সিতু প্রায়ই দেরিতে ফেরে আজকাল?

মেঘনার চোখ টান, ওমা দেরি কি, কোনদিন সন্ধ্যা, কোনদিন একেবারে সন্ধ্যা পার! তোমার ফিরতে দেরি হলেই ওনারও দেরি। জিজ্ঞেস করতে গেলেও তিরিক্ষি হয়ে ওঠে সেদিন তো চোখ পাকিয়ে বলে বসল, কোথায় ছিলাম রোজ রোজ তোমার সে-খোঁজে দরকার কি ধুমসি কোথাকারের—ফের এ-নিয়ে কচকচ করতে শুনি তো গলা টিপে দেব!

রাগ সামলাতে না পেরে জ্যোতিরাণী মেঘনার ওপরেই বিরক্ত।—আমাকে বলিসনি কেন?

সোজাসুজি জবাব না দিয়ে মেঘনা গজগজ করতে করতে চলে গেল। তার ক্ষোভের মর্ম, বাড়ির ঝি তার অন্তের কথায় থেকে কাজ কি, ওইটুকু ছেলে গলা টিপতে আসে, নাতির নামে লাগানো হয়েছে শুনলে ওই ঠাকুমা হয়ত গলা কাটতে আসবে।

যত রাগই হোক, তখনো জ্যোতিরাণীর ধারণা মায়ের নজর নেই বলে ছেলে তার গাড়িঅলা বন্ধুর বাড়িতেই থাকে—সেখানে সন্ধ্যে পর্যন্ত আড্ডা দেয়।

সিতু বাড়িতে পা দিল প্রায় সাতটা নাগাত। বিচারের শেষ পর্ব দেখে আর শুনে উত্তেজনায় ভরপুর হয়ে ফিরেছে। মাথার ওপরে যে নিজের বিচারের খাঁড়া ঝুলছে, কল্পনাও করেনি। আপাতত তার মাথায় শুধু ডাকাতগুলোর মুখ কিলবিল করছে। বিচারকের রায় দেবার মুখে উত্তেজনায় সিতুরই বুকের ভেতরটা অসম্ভব রকম ধড়াস-ধড়াস করছিল।

বাড়িতে ঢোকার আগে আচমকা একটা ধাক্কাই খেল বুঝি। মায়ের গাড়ি দাঁড়িয়ে। ডাকাতেরা আর বিচারক মাথা থেকে সবুতে শুরু করল। মুশকিলের ব্যাপার···মায়ের গাড়ি কেন? মায়ের তো খুব কম হলেও আটটার আগে ফেরার কথা নয়। আজ তো আরো দেরি হবে বলে গেছল! বিচার শেষ হবার পরেও সেই জন্যেই সাত-তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার তাড়া ছিল না। বন্ধুদের সঙ্গে রেস্টুরেন্টে খাওয়া-দাওয়ার ফাঁকে বিচার আর ডাকাতদের প্রসঙ্গ এমন জমে উঠেছিল যে, কখন সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হয়েছে খেয়ালই ছিল না। এখনো নিশ্চিন্ত মনেই পান চিবুতে চিবুতে ঢুকেছে—মা আসার আগে ভালো করে দাঁত মেজে ফেলে বলে পানের দাগও থাকে না।

···কিন্তু এ আবার কি ফ্যাসাদ!

ভয়ে ভয়েই ভিতরে ঢুকল। সামনে মেঘনা।···ও তার দিকে এভাবে তাকাচ্ছে কেন?

কাছে গিয়ে গলা খাটো করে জিজ্ঞাসা করল, গাড়িটা দেখছি, মা ফিরেছে বুঝি?

জবাব না দিয়ে মেঘনা চেয়ে রইল তার দিকে। আক্কেল-দেখা-গোছের চাউনি। আর তাইতেই সিতু বিপদের গন্ধ পেল। গলার স্বর শুধু খাটো নয়, খুব নরম। আবার জিজ্ঞাসা করল, মা কতক্ষণ ফিরেছে?

গম্ভীরমুখে মেঘনা পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ল, কোত্থেকে ফিরবে?

...ইয়ে, প্রভুজীধাম থেকে ?

মেঘনারই দিন আজ, বিচ্ছু ছেলেকে জব্দ করার মত রসদ পেয়েছে। বাড়িতে তাকে নিয়ে ঘোরালো কিছু ঘটে গেছে সেটা বোঝাবার জন্যেই গোল দু চোখ ঘুরিয়ে আর একপ্রস্থ দেখে নিল ভালো করে।—মা আজ কোথাও বেরোননি, সমস্ত দিন বাড়িতেই ছিলেন। ড্রাইভার ইস্কুল থেকে আনতে গিয়ে তুমি সেখানে যাওই-নি খপর নিয়ে ফিরে এসেছে—ওপরে যাও, আজ হবে'খন।

সিতুর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। ছোটখাটো ব্যাপার হলে আবার না-হয় খানিকক্ষণের জন্য গা-ঢাকা দিয়ে থাকার চেষ্টা করত। কিন্তু শোনামাত্র মাথার ঘিলু-গুলো যেন সব অবশ হয়ে গেল। স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল খানিক। তারপর বিপদ-তারিণী ঠাকুমাকেই মনে পড়ল প্রথম। মুখের পান ফেলা বা নীচের থেকে মুখটা ভালো করে ধুয়ে ওপরে ওঠার কথাও মনে থাকল না। ঠাকুমার আশ্রয়ের আশায় পা-টিপে ওপরে উঠে গেল।

তারপর পা-দুটো আবার মাটির সঙ্গে আটকে গেল যেন। আর ঠাকুমার আশ্রয়ের আশাটুকুও ধোঁয়া হয়ে মিলিয়ে যেতে লাগল।

সামনে, বারান্দার মাঝামাঝি মা দাঁড়িয়ে।—এদিকে আয়।

নিজের অপরাধের গুরুত্ব জানে বলেই আদেশ দুর্লঙ্ঘ্য মনে হল। সামনে এসে মাথা গোঁজ করে দাঁড়াল।

কপালে আর চুলে একসঙ্গে হাত দিয়ে জ্যোতিরাণী তার মুখটা নিজের দিকে তুললেন। ঠোঁটের নীচে পর্যন্ত লাল করে পান চিবুতে দেখে সর্বাঙ্গ রি-রি করে উঠল তাঁর। কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করার আগেই গালে ঠাস্-ঠাস্ চড় বসিয়ে দিতে ইচ্ছে করল। কিন্তু তার আগে ছেলের এতটা হতচকিত ফ্যাকাশে মূর্তি দেখে খট্‌কা লেগেছে।—কোথায় গেছলি ?

সিতুকে কেউ যদি ডুবিয়ে থাকে তো সেটা করেছে মেঘনা। মায়ের যে তখনো ধারণা সে বন্ধুর বাড়িতে এতক্ষণ আড্ডা দিয়ে ফিরল, তা জানলে তো প্রাণটা নিজের হাতের মুঠোতেই আছে ভাবত। কিন্তু এসেই শুনেছে ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে স্কুলে গেছল, আর সেখান থেকে খবর নিয়ে এসেছে ও স্কুলেই যায়নি। অতএব মায়ের কাছে ব্যাপারটা ধরা পড়েইছে—এখন কতটা ধরা পড়েছে, কত দিনের কথা ধরা পড়েছে, তারই ওপর মরণ-বাঁচন নির্ভর করছে যেন।

গলা দিয়ে স্বর বেরোয় না প্রায়। বলল, কোর্টে—

রাগের মুখেই আকাশ থেকে পড়ার দাখিল জ্যোতিরাণীর। জবাবটা ধরতেই পারলেন না।—কোথায় গেছলি ?

আলিপুর কোর্টে।

কোর্টে! কোর্টে কি?

মায়ের বিস্ময় উদ্রেক করতে পারলেও যেন ভরসা একটু।—সেই ডাকাতদের বিচারের আজ রায় হয়ে গেল, দুলু আর সুবীর স্কুলে গিয়ে ডাকল, চল্ দেখে আসি, অনেক লোক যাচ্ছে, তাই—

জ্যোতিরাণী তাজ্জব কয়েক মুহূর্ত। পুরো এক বছর আগেকার ঘটনা তাঁর মাথায়ও ছিল না আর। ছেলে নিয়ে নিজে অমন প্রাণান্তকর বিপদের মধ্যে পড়েছিলেন বলেই ছেলের অপরাধ ভুলে প্রথমেই কৌতূহল।—বিচারে তাদের কি হল?

হে ভগবান! সিতুর কি তাহলে বাঁচার আশা আছে? সাগ্রহে বলল, ফাঁসি কারো হয়নি, তবু একেবারে গায়ে কাঁটা দেবার মত ব্যাপার মা! দলের সেই পাণ্ডার সমস্ত জীবন জেল, যে-লোকটা আমাদের দিকে রিভলবার উঁচিয়ে ধরেছিল, তার আর আর-একটা লোকের দশ বছর করে জেল, সন্দেহ থাকল বলে একজন খালাস পেয়ে গেল, আর ধরা পড়ে দলের যে লোকটা পুলিসের পক্ষে গিয়ে ফাঁস করে দিল—সে ছাড়া পেয়ে গেল।

বিচারের রায় শোনার কৌতূহল মিটল, আবার ছেলেকেই চেয়ে চেয়ে দেখছেন তিনি। দিন-কাল হল কি ভেবে পাচ্ছেন না। বারো পেরোয়নি ছেলের, স্কুল পালিয়ে কোর্টের ডাকাতদের বিচার দেখতে চলে গেল।

তোমার সঙ্গে আর বড় কে ছিল?

নি-নিতাইদা।

নিতাইদা কে?

ওই···ওই সাইকেলের দোকানের, বেশ ভদ্রলোকের ছেলে—

কখন গেছলি?

মায়ের গলার স্বর গম্ভীর হচ্ছে আবার, তবু ভিতরের কাঁপুনি কমেছে সিতুর। যত অন্যায় সব এই দিনটার ঘাড়ে চাপানোই ভালো। শুকনো জবাব দিল, সাড়ে দশটায়।

জ্যোতিরাণীর রাগ চড়ছে আবার, ভালো-মুখো ছেলেকে ধরে কি যে করতে ইচ্ছে করছে ঠিক নেই।—কোর্টের বিচার কখন শেষ হয়েছে?

সা-সাড়ে চারটেয়।

এই সাতটা পর্যন্ত কোথায় ছিলি?

দুলু উল্টোদিকের গলিতে থাকে, অতএব সুবীরের নাম করল।—সুবীরদের বাড়িতে, সকলে এই নিয়ে জিজ্ঞেস করছিল, জানতে চাইছিল—

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। সিতু ঘাড় ফেরালো, জ্যোতিরাণীও তাকালেন সেদিকে।

ফাঁড়া কি সত্যিই কাটল সিতুর? এমন ভাগ্যও বিশ্বাস করবে? প্রথমে বাবা, তাঁর পাশ ঘেঁষে জেঠুর হাসিমুখ।

দোতলায় পা দিয়ে কালীনাথ এমন কি শিবেশ্বরও টের পেলেন কিছু একটা দোষ করে ফেলে ছেলে হাতে-নাতে ধরা পড়েছে। ঘরের দিকে এগিয়েও ব্যাপার বোঝার জন্ম শিবেশ্বর দাঁড়ালেন একটু।

বাপের ভরসা রাখে না, দুর্দশাগ্রস্ত করুণ মুখ করে সিতু জেঠুর দিকে তাকালো। অর্থাৎ, এ-যাত্রা রক্ষা না করলেই নয়।

শরণাগতকে রক্ষা করার চিরচরিত রাস্তাই ধরলেন কালীনাথ। এগিয়ে এসে সিতুর বাহু ধরে হ্যাঁচকা টানে নিজের দিকে ফেরালেন তাকে। দাঁত কড়মড় করে বলে উঠলেন, তোকে আজ আমি আস্তই রাখব না, পা থেকে মাথা পর্যন্ত আজ তোকে পালিশ করা হবে, বুঝলি? যাও ঘরে যাও, আসছি আমি—এই ক'দিনেরটা একদিনে উশুল করব।

বিপদ শিরোধার্য করেই যেন সিতু বেঁকতে বেঁকতে ঘরের দিকে এগলো।

ঠোঁটের ডগায় হাসি চেপে কালীনাথ জ্যোতিরাণীর দিকে ফিরলেন।—কি করেছে?

হুমকির পরে এভাবে জিজ্ঞাসা করতে জ্যোতিরাণীও হেসেই ফেললেন। কিন্তু অদূরে প্রস্থানরত ছেলের দিকে চোখ পড়তে হাসি টেনে নিলেন। মায়ের দিকে চোখ রেখেই ঘরের দিকে চলেছে সে। মুখে হাসি দেখে যতখানি সঙ্কটে পড়েছিল ততখানিই নিশ্চিন্ত। মায়ের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই পালালো।

জ্যোতিরাণী অদূরের মানুষকে শুনিয়েই রাগত স্বরে বললেন, আস্কারা তো দিচ্ছেন, দিনকে-দিন কি যে হচ্ছে ও সেদিকে চোখ আছে কারো! গাড়ি চেপে সময়মত স্কুলে চলে গেছে, তারপর সেখান থেকে দল বেঁধে পালিয়ে কোর্টে গেছে ডাকাতদের বিচার দেখতে—এই একটু আগে ফিরল!

শুনে কালীনাথও অবাক কয়েক মুহূর্ত।—ও···সেই ব্যাঙ্ক রবারির কেস! ও স্কুল পালিয়ে দেখতে গেছল? শিবেশ্বরের দিকে তাকালেন কালীনাথ, এরই মধ্যে দিব্বি যে মানুষ হয়ে উঠেছে দেখি, অ্যাঁ!

হাসি চেপে শিবেশ্বর ততক্ষণে ঘরের দিকে এগিয়েছেন।

সকৌতুকে আবার জ্যোতিরাণীর দিকে ফিরে গলা খাটো করে কালীনাথ বললেন, স্কুল আমিও পালাতাম মাঝে-সাঝে—তবে উঁচু ক্লাসে উঠে অবশ্য। ওর

বাবা একদিনও পালাতো না বলে আমার রাগই হত, আর নাকের ডগায় সব সময় বই নিয়েই বসে থাকত বলে ইচ্ছে করত ওর বই-পত্র সব জালিয়ে দিই। ওর বাবাকে না পারলেও ওর ভবিষ্যৎ ঠিক ঝরঝরে করে দেব—কিচ্ছু ভেব না।

জ্যোতিরাণীও এবারে কালীদাকেই লক্ষ্য করলেন একটু। পনের দিনে চেহারা তেমন না ফিরুক, হাওয়া-বদলের ফলে খুশির হাবভাব অত চাপা নয়। জিজ্ঞাসা করলেন, সেই সকালে না দুপুরে ফিরেছেন শুনলাম, এতক্ষণে এলেন?

তুমি কোথায় শুনলে?

বিস্ময়ের আভাস খাঁটি কি মেকী ঠিক ধরা গেল না।—দুপুরে কোন্ হোটেলে মিত্রাদি আপনাকে দেখেছেন বললেন।

কালীনাথের মুখে হালকা গাম্ভীর্যের কারুকার্য।—ও, প্রভুজীধাম ছেড়ে তিনি কি হোটেলে বাস করছেন নাকি আজকাল?

প্রসঙ্গ কৌতুককর! কিন্তু মিত্রাদিকে নিয়ে ভাসুর সম্পর্কের লোকটির সঙ্গে এই প্রথম কথাবার্তা সম্ভবত। তাই সঙ্কোচও একটু। কিন্তু এবারে মুখ দেখে আর কথা শুনে মনে হয়েছে, হোটেলে মিত্রাদিকে ইনিও দেখেছেন কোনো ভুল নেই। সহজ অনুযোগের সুরেই বললেন, প্রভুজীধাম ছাড়া অত সহজ নয়, বাড়ি-অলার সঙ্গে দেখা করতে গেছলেন।

বাড়িঅলা! কার বাড়িঅলা?

জ্যোতিরাণীর হাসিই পাচ্ছে, বাড়িঅলা নামে কোনো জীবের অস্তিত্ব এই প্রথম শুনলেন যেন।—মিত্রাদির বাড়িঅলা।

ও…। ছদ্ম গাম্ভীর্য ঘন দেখালো আরো, যাক্, তোমার প্রভুজীধামের খবর ভালো তো?

জ্যোতিরাণী মাথা নাড়লেন। ভালো।

মামু কোথায়?

সেখানেই।

বেশ। কালীনাথের হৃষ্ট মুখ আবার। বাইরে থাকতে মামুর একখানা চিঠি পেয়েছিলাম, অবশ্য তার আগে আমিই এমনি লিখেছিলাম তাঁকে। ভদ্রলোকের উচ্ছ্বাস কম, তবু চিঠিতে তোমার প্রশংসাই বেশি। লিখেছেন, প্রভুজীধামের ব্যবস্থাপত্র নিয়ে তুমি যেভাবে মাথা ঘামাচ্ছো, এরপর অনেকে হয়ত ঘর-বাড়ি ছেড়ে এখানে এসে থাকতে চাইবে, আর, তোমার মনের মত প্রভুজীধাম বড় হতে থাকলে সব দিক দেখাশোনার জন্য দু বছরের মধ্যে মামুর মত আরো জনাদশেক লোক লাগবে।

জ্যোতিরাণী খুশিই হলেন হয়ত, তবু বিশেষ করে কালীদাকে শোনাবার জন্যেই সাদাসিধে ভাবে বললেন, আমি আর কতটুকু করছি, করছেন তো আসলে মিত্রাদি—

অতএব আর কথা বাড়ল না, কালীদা নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন।

জ্যোতিরাণী প্রতিষ্ঠানের এই কদিনের একটু হিসেবপত্র সেরে রাখছিলেন। মিত্রাদিকে কাল বুঝিয়ে দিতে হবে। খানিকক্ষণের মধ্যে বাইরে কালীদার সাড়া পেলেন। শাড়ির আঁচলটা মাথায় তুলে দিয়ে দরজার কাছে আসতে তিনি বললেন, মামুর সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয় না, একবার ঘুরে আসি, আমার ফিরতে একটু দেরি হতে পারে।

জ্যোতিরাণী মাথা নাড়লেন শুধু। কালীদা চলে গেলেন।

পনের দিন বাদে এসে এসময়ে প্রভুজীধামে যাওয়াটা কেন যেন নিছক মামা-শ্বশুরের টানে বলে মনে হল না জ্যোতিরাণীর।

হিসেব নিয়ে বসতে আর ভালো লাগল না। শমী অনেকক্ষণ ধরে কাছে নেই খেয়াল হল। তাদের বাড়িতে যখন ফোন করেছিলেন, আশানুযায়ী বিভাস দত্ত বাড়ি ছিলেন না ঠিকই। তাঁর বড় ভাইয়ের বউকে জানিয়ে দিয়েছেন রাতটা শমী এখানে থাকবে।…অনুপস্থিতিতে ফোন করার এই রীতি নিয়ে বিভাস দত্ত মুখের ওপর একদিন ঠাট্টাও করেছিলেন। করুনগে।

শমী সিতুর সঙ্গেই আছে কোথাও। তবু কি করছে দেখে আসতে গেলেন। ছেলেটাকে নিয়ে নতুন করে আবার একটা চিন্তার ছায়া পড়ছে থেকে থেকে।… চোখের সামনে ডাকাতির সেই ভয়ানক ব্যাপারটা দেখার ফলে বিচার দেখার লোভে আর ঝোঁকের বশে সঙ্গীসাথীর সঙ্গে স্কুল পালানোটা খুব অস্বাভাবিক নয় ভাবতে চেষ্টা করছেন তিনি। অথচ সেই থেকে তাঁর ওঠা-বসা-চলাফেরার ফাঁকে একটা অজ্ঞাত অস্বস্তিও যেন ঘুরছে সঙ্গে সঙ্গে।

বেশি নিশ্চিন্তবোধ বিপদ ডেকে আনে। সিতুর বরাতেও সেই গোছের এক বিপদ এগিয়ে আসছে, ধারণা নেই।

আপাততঃ যত বড় ত্রাসের মধ্যে সে পড়েছিল তার থেকে এমন অপ্রত্যাশিত-ভাবে বেরিয়ে আসতে পারার আনন্দের স্বাদও ঠিক ততো বড়ই। এই নিশ্চিন্ততার ফলেই কালীদার ঘরে বসে শমীর মনে রোমাঞ্চ সৃষ্টির উদ্দীপনায় মেতেছে। স্কুল পালিয়ে স্ব-চক্ষে আর স্বকর্ণে ডাকাতদের বিচার দেখেছে আর শুনেছে সেটা বলার মত অত বোকা নয়। কিন্তু এই বিচার-পর্বে উপস্থিত ছিল এমন লোকের মুখে

শোনা আর কাগজে যেটুকু বেরিয়েছে তার বিবরণ বলে চালিয়ে গোটা ব্যাপারটার একটা রোমাঞ্চকর কাঠামো দাঁড় করাতে অসুবিধে কি ?

দরজার কাছাকাছি আসতে সিতুর কয়েকটা কথা ঠাস করে যেন কানের পরদায় ঘা বসালো জ্যোতিরাণীর।

সিতু বেশ বিরক্তির ঝাঁজে বলছে, মেয়েছেলেগুলোর মত অপয়া পৃথিবীতে আর কিচ্ছু নেই, বুঝলি? যেখানে মেয়েছেলে সেখানে গণ্ডগোল—পুলিস কোনো আসামীর মেয়েছেলেকে ধরতে পারলেই কেল্লা মাত—ব্যস, সব বার করে নেবে। ওই ডাকাতগুলো সব এভাবে ধরা পড়ল কেন, আর তাদের দোষও এত সহজে প্রমাণ হয়ে গেল কি করে? ওই সোনা মেয়েটা ছিল বলেই তো! তাকে ধরে যেই মোক্ষম ফাঁদ পাতলে একটা, অমনি দিলে সব গল-গল করে ফাঁস করে। মেয়েছেলে-গুলো বিচ্ছিরি—

সোনা কে ? নিজে মেয়েছেলে এটুকু জ্ঞান আছে বলেই সম্ভবত শমীর সঙ্কুচিত প্রশ্ন।

একটা খারাপ মেয়ে, ওই ডাকাতদের একজনের ভালবাসার লোক। নইলে ওই ডাকাত দলের সর্দারটার যা মাথা না, টিকিতে হাত দিতে হত না।

কানের কাছটা গরম ঠেকছে জ্যোতিরাণীর।

কত মাথা খাটিয়ে দলটাকে গড়েছিল জানিস ? দু বছর আগের সেই রায়টের সময় বন্দুক আর রিভলবার-টিভলবার যোগাড় করেছে। প্রাণে বাঁচার জন্য তখন তো ভালো ভালো লোকেরাই ওদের হাতে এসব যুগিয়েছে। গণ্ডগোল থেমে যাবার পর ওসব হাতে পেয়েও তারা বোকার বসে থাকবে নাকি ? বাছাই লোক নিয়েছে দলে, রীতিমত ট্রেনিং দিয়েছে সকলকে, একটা পড়ো-জংলা বাড়িতে আড্ডা না থাকলে আজকাল কখনো বড় ডাকাতি করা যায়! ব্যাঙ্কে ডাকাতির আগে গাড়ি কি করে যোগাড় করেছিল শুনলে তোর গায়ে কাঁটা দেবে। তারা থাকে উত্তর কলকাতায়, একেবারে দক্ষিণ কলকাতায় এসে অনেক দূরের একটা নির্জন জায়গায় ওঁত পেতে অপেক্ষা করেছিল সকলে। তখন সবে সন্ধ্যা হয়েছে। একজন মিলিটারির চাকুরে একা গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল। দু-তিনজন লোক রাস্তার মাঝে এসে হাত তুলে গাড়িটা থামাল। ওদিকে তাদের আর একজন আগে থাকতেই পথের ধারে শুয়ে কাতরাচ্ছে। ডাকাতেরা ড্রাইভারকে অনুনয় করে বলল, তাদের সঙ্গের লোক হঠাৎ ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েছে, দয়া করে ড্রাইভার যদি তাদের তুলে নিয়ে ওই পথেই তাদের বাড়ির কাছে নামিয়ে দেয় তো তারা কেনা হয়ে থাকবে।

যে-রকম সাজিয়ে বলছে ছেলে জ্যোতিরাণী পর্যন্ত দরজার এধারে ঠায় দাঁড়িয়েই

আছেন।

ড্রাইভার রোগীসুদ্ধ তাদের তুলে নিল। ভদ্রলোকেরা বিপদে পড়েছে, আর যাবার পথেই যখন, এটুকু উপকার করবে না কেন।—সে কি আর জানত উপকার করতে গিয়ে নিজের কবর খুঁড়ছে! জায়গা বুঝে ডাকাতের সর্দার আর পিছন থেকে একজন আচমকা ধরলে তার টুঁটি চেপে, আর চোখের পলক না ফেলতে দরজা খুলে সকলে মিলে দিলে তাকে রামধাক্কা মেরে বাইরে ফেলে। সর্দারটা নিজে গাড়ি চালাতে ওস্তাদ, মুহূর্তের মধ্যে গাড়ি নিয়ে হাওয়া। সেই গাড়ি আবার যখন রাস্তায় বেরুলো তখন সেটার রঙও বদলে গেছে, নম্বরও বদলে গেছে। ধরবে কে? সর্দার নিজেই তখন ও-গাড়ির মালিক।

ইচ্ছে করে নয়, আপনা থেকেই জ্যোতিরাণী ঘরে এসে দাঁড়ালেন। ছেলের দিকেই চোখ। উদ্দীপনার মুখে মা-কে দেখে সিতু অপ্রস্তুত একটু। আর শমী কণ্টকিত হয়ে বলে উঠল, কি সাঙ্ঘাতিক সেই ডাকাতগুলো মাসীমা। সিতুদা বলছে আর আমার গা কাঁপছে। তারপর কি হল সিতুদা?

কিন্তু সিতুর উৎসাহ আপাতত কম। মা আবার ওভাবে তার দিকে চেয়ে দেখছে কি!

জ্যোতিরাণী দেখছেন কারণ ছেলের মুখে ঘটনা শোনার ফাঁকে চকিতে একটা কথা মনে পড়েছে তাঁর। আজ এই একদিন নয়, রাগত অনুযোগে শাশুড়ী তাঁকেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন, নাতির স্কুল থেকে ফিরতে প্রায়ই সন্ধ্যা হয় কেন আজকাল। আর মেঘনা বলছিল, ফিরতে সন্ধ্যা পারই হয়ে যায় এক-একদিন। মনে পড়া মাত্র কি যেন ভাবতে চেষ্টা করছেন তিনি।

ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুই এত কথা জানলি কি করে?

মাতৃসন্নিধানে স্বস্তি বোধ করেনি সিতু, প্রশ্ন শুনেও না। তাড়াতাড়ি জবাব দিল, ইয়ে, ওই নিতাইদার কাছে, আর দুলু, আর সুবীরও তো কয়েকবার গেছে—তাছাড়া কাগজেও তো অনেক কথা বেরিয়েছে।

শুনেও থাকতে পারে, কাগজে পড়েও থাকতে পারে। কিন্তু জ্যোতিরাণীর চাপা উদ্বেগ গেল না। তিনি না থাকলেই সন্ধ্যে আর রাত করে বাড়ি ফেরে যখন …কোর্টের বিচার শুনতে আজ এই একদিনই গেছে না আরো গেছে?

….এত কথার মধ্যে খারাপ মেয়েছেলের সম্পর্কে ছেলের উক্তিটা কানে লেগে আছে এখনো। কিন্তু আগে ভালো করে বুঝে নিতে চান তিনি। সাদাসিধেভাবেই জিজ্ঞাসা করলেন, আর কি জানিস?

ছেলের বলার উৎসাহ কমেছে। যেটুকু বার করা গেল, তারও জটিলতা কম

নয়। কিন্তু ওইটুকু ছেলের কাছে গোটা ব্যাপারটা একেবারে স্বচ্ছ, স্পষ্ট।—দলের পাণ্ডার সম্পর্কে কয়েকটা খবর পেয়ে পুলিস তার ওপর চোখ রাখে আর পরে সন্দেহের বশে তাকে অ্যারেস্ট করে। কিন্তু প্রমাণের ছিটেফোঁটাও নেই কোথাও। পুলিস তারপর সেদিককার কতগুলো মেয়েছেলের বাড়িতে হানা দিয়ে সোনা নামে একটা মেয়ের কাছে অনেক দামী গহনাপত্র পেল। তাকে ধরে এনে ভাঁওতা দিয়ে আর ভয় দেখিয়ে পুলিস অনেক কথা জেনে ফেলল। যে খাতিরের লোক তাকে অত সব গহনাপত্র দিয়েছে, দেখা গেল সে ওই পাণ্ডা লোকটার প্রাণের বন্ধু। পুলিস তাকেও ধরল। শেষে দুজনকে আলাদা-আলাদা ভাবে সব ফাঁস হয়ে গেছে বলে এমন ভাঁওতা দিল যে, তাতে ঘাবড়ে গিয়ে মেয়েটা আরো অনেক কিছু ফাঁস করে দিল। কিন্তু তার খাতিরের লোক এখনো স্বীকার করছে না কিছু। ভয় দেখিয়ে পুলিস তারপর দুজনেরই সাঙ্ঘাতিক বিপদের কথা বলে মেয়েটাকে ভয়ানক ঘাবড়ে দিল। এত ঘাবড়ে দিল যে, মেয়েটা অস্থির হয়ে কেবল কাঁদতে লাগল। তাকে বোঝানো হল তার খাতিরের লোক সব স্বীকার করে রাজসাক্ষী হলে তারা ছাড়া পাবে। পুলিস তারপর স্বীকার করাবার জন্যে লোকটাকে তার কাছে নিয়ে এলো। মেয়েটা তখন এত কাঁদতে লাগল যে লোকটা সে-কষ্ট সহ্য করতে না পেরে সব স্বীকার করল, আর সরকারের সাক্ষী হয়ে প্রমাণসুদ্ধ সব বলে দিল। বিচারে দলের পাণ্ডার আর তার প্রধান শাগরেদের সমস্ত জীবন জেল হয়েছে, দুজনের দশ বছর করে জেল হয়েছে, দুটো লোক এমন ফেরারী হয়েছে যে পুলিস তাদের ধরতেই পারেনি, আর সোনার যে খাতিরের লোকটা সরকারের সাক্ষী হয়েছে, তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

শমী উদগ্রীব হয়ে শুনছিল। জিজ্ঞাসা করল, ওই সোনা মেয়েটাকেও তুমি দেখেছ সিতুদা?

মায়ের সামনে এই কৌতূহল কেন যেন খুব পছন্দ হল না সিতুর। মাথা নাড়ল শুধু, দেখেছে।

খাতিরের লোককে ছেড়ে দিতে তার খুব আনন্দ হয়নি?

সিতু বিরক্ত।—আমি দেখতে গেছি? দলের লোকের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বলে ওকে গুলি করে মারা উচিত।

বিশ্বাসঘাতকতার গুরুত্ব শমীর ঠিক বোধগম্য হল না। সে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। এই উক্তি শুনে ছেলেকে জ্যোতিরাণীর ধমকে ওঠার কথা, কিন্তু তিনিও কিছু বললেন না। ঘটনা যা শুনলেন, অবাক হবার মতই। কিন্তু শোনার ফাঁকে আর পরেও ছেলের মুখখানাই লক্ষ্য করেছেন তিনি। তাঁর কেবলই মনে

হয়েছে, ওর এত কিছু জানার মধ্যে কোথায় একটা গোপনতা লুকিয়ে আছে।

শমী আর সিতু একসঙ্গে খেতে বসেছিল। সিতু ফেলে-ছড়িয়ে খেয়ে উঠে গেল। তার ঘুম পাচ্ছে খুব। খাওয়া দেখেও জ্যোতিরাণী বিরক্ত। কোথায় কি খেয়ে আসে—

আচমকা কি মনে হতেই জ্যোতিরাণী নিস্পন্দ কয়েক মুহূর্ত। একটা চকিত চিন্তার প্রতিক্রিয়ায় সর্বাঙ্গ অবশ যেন।...শাশুড়ী জিজ্ঞাসা করছিলেন, বিকেলের খাবারও অমনি পড়ে থাকে, রোজ রোজ ওকে এত খাওয়াবার কুটুমই বা কে এলো?

এর পর ঘরে আর বারান্দায় অনেকক্ষণ ছটফট করেছেন জ্যোতিরাণী। বয়েস অনুযায়ী ছেলে অনেক বেশি পেকেছে, এটা নতুন সমস্যা কিছু নয়। বিচার দেখার নেশায় স্কুল থেকে এই একদিনই পালায়নি হয়ত। যে মারাত্মক ব্যাপার শুনলেন, ঝোঁক হওয়া অস্বাভাবিক নয়। জ্যোতিরাণী সেজন্যেও ছটফট করছেন না, বাইরে কোথায় কি খেয়ে আসে, সেই দুশ্চিন্তায়ও নয়।

রাত সাড়ে নটার কাছাকাছি। মাসীর গল্প করার মেজাজ নয় দেখে শমী ঘুমিয়ে পড়েছে।

পায়ে পায়ে জ্যোতিরাণী শাশুড়ীর দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন। জড়াজড়ি করে শাশুড়ী-নাতি ঘুমে অচেতন। চলে এলেন। তাঁর এই মুখের দিকে তাকালে যে কেউ ঘাবড়ে যেত। বিদ্যুতের ধাক্কার মত যে সম্ভাবনার চিন্তাটা মাথায় ঢুকেছে, প্রাণপণে নিজেই তিনি সেটা অবিশ্বাস করতে চেয়েছেন। পারেননি।

ফিরে এসে জ্যোতিরাণী কালীদার ঘরে ঢুকলেন। আলনায় সিতুর জামা ঝুলছে গোটা দুই-তিন। একে একে প্রত্যেকটার পকেট হাতড়ে দেখলেন। কিছু না পেয়ে জ্যোতিরাণীর চোখে-মুখে সঙ্কট-মুক্তির আশা। সিতুর পড়ার ছোট টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালেন। একদিকের ড্রয়ার ধরে টানলেন। খোলা গেল না, বন্ধ। পাশের ড্রয়ার ধরে টানলেন, সেটা খুলে এলো। কিন্তু ওটার মধ্যে কিছু নেই।

জ্যোতিরাণী ঘরের চারদিকে তাকালেন একবার। বন্ধ ড্রয়ারটা জোরে টানলেন এবার। খোলা গেল না। সাজানো বই আর খাতার পাঁজার ফাঁকে চাবি পেলেন। ড্রয়ারের চাবি।

বন্ধ ড্রয়ারটা খোলার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিরাণী নিস্পন্দ কাঠ কয়েক মুহূর্ত। ড্রয়ারের মধ্যে যা দেখলেন তা তিনি দেখতে চাননি। তাঁর ভাবনা মিথ্যে হোক এটুকুই সর্বান্তঃকরণে চেয়েছিলেন তিনি।

ড্রয়ারে চারটে টাকা আর খুচরো দশ আনা পয়সা।

না, জ্যোতিরাণী এখনো বিশ্বাস করতে চেষ্টা করছেন যা তিনি ভাবছেন সেটা ঠিক নয়। বাড়িতে টাকার ছড়াছড়ি, যে কেউ দিতে পারে। নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করছেন, গত সন্ধ্যায় আর রাতে যে গোপনতার পরদা ছেলের মুখের ওপর ঝুলতে দেখেছেন তিনি সেটা এ পর্যন্ত গড়ায়নি। এখনো ভাবতে চেষ্টা করছেন টাকা গোনাগুনির ব্যাপারে তাঁর ভুল হয়—প্রভুজীধামে পাঠাবার জন্যে পাঁচশ সত্তর টাকার মধ্যে পনেরো টাকা কম পড়েছিল তাঁর গোনার ভুলে, আর সেবারে গুনতে ভুল করেই মামাশ্বশুরকে দশ টাকা কম দিয়েছিলেন তিনি।

পারা গেল না ভাবতে।

নিস্পন্দের মত নিজের ঘরের শয্যায় এসে বসেছেন জ্যোতিরাণী। আপনা থেকেই ড্রেসিং টেবিলের দেরাজের দিকে চোখ গেছে।...যা মনে না পড়লেও চলত, তাই মনে পড়ছে। দেরাজ খুলে অনেক সময়েই টাকা-পয়সা যা রেখেছিলেন তার থেকে কম-কম ঠেকেছে। কিন্তু কোনরকম সন্দেহ রেখাপাত করেনি। কাকে কখন কি দিয়েছেন মনে নেই ভেবেছেন।

কিন্তু এখন তাও ভাবতে পারছেন না।

পরদিন সন্ধ্যায় শুধু শমীকে নিয়ে প্রভুজীধাম থেকে ফিরলেন তিনি। রাতটা সিতু ছোট দাদুর কাছে থাকার বাসনা প্রকাশ করতে একটু ভেবে জ্যোতিরাণী রাজি হলেন। গৌরবিমলই বরং জিজ্ঞাসা করেছেন, কাল স্কুল আছে না?

মায়ের জবাব শুনে সিতু আনন্দে আটখানা। প্রভুজীধামের ওপর মায়ের টান বটে। ছোট দাদুকে বলেছে, একদিন কামাই হলে ক্ষতি হবে না।

সেখানে হয়ত বীথি তাঁকে লক্ষ্য করেছে একটু, আর মৈত্রেয়ী চন্দ একবার জিজ্ঞাসা করেছেন, গম্ভীর-গম্ভীর দেখছি, কি ব্যাপার?

জ্যোতিরাণী বলেছেন, কিছু না, শরীরটা ভালো না, তাড়াতাড়ি ফিরব।

আসার পথে শমীকে ওদের বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে আসতে পারতেন। তা না করে বাড়ি ফিরে ওকে পাঠিয়ে দিলেন।

পরদিন সময় মত শিবেশ্বর আর কালীদা কাজে চলে গেলেন।

শাশুড়ীর দুপুরের পথ্য সামনে সাজিয়ে দিতে দিতে জ্যোতিরাণী জিজ্ঞাসা করলেন, সিতুকে কি শিগগীর আপনি কিছু টাকা দিয়েছেন?

শাশুড়ী প্রথমে থতমত খেলেন একটু। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, ক'টাকা?

দশ-পনের—

শাশুড়ী সঙ্গে সঙ্গে তেতে উঠলেন, আমার কি মাথা খারাপ হয়েছে যে ওই

শিশুর হাতে অত টাকা দিতে যাব। মাঝে মধ্যে চার আনা, আট আনা নেয়, সেদিন শুধু কেড়েকুড়ে একটা টাকাই নিয়ে পালালো—তাও তো পনের দিন হয়ে গেল। কেন?

জবাব না পেয়ে বিরস মুখ তাঁর।

ঘরে এসে জ্যোতিরাণী টেলিফোন গাইড খুলে বসলেন। থমথমে মুখ। যে নম্বর খুঁজছেন পেলেন। নম্বর ডায়েল করেছেন তিনি।

সিতুর স্কুলের অফিসে টেলিফোন করলেন। সাড়া পেলেন।

নিজের পরিচয় দিয়ে আর ছেলে কোন্ ক্লাসে পড়ে জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, সে এর মধ্যে কদিন স্কুলে অনুপস্থিত ছিল।

রেজিস্ট্রি দেখে নিয়ে ওধার থেকে কেরানী জবাব দিল, আজ নিয়ে এগারো দিন সে আসছে না। তার মধ্যে দশ দিনের ছুটির দরখাস্ত দেওয়া আছে।

মাথা খুব স্থির আর ঠাণ্ডা রাখতে চেষ্টা করছেন জ্যোতিরাণী। কিন্তু পায়ের দিকটা সিরসির করছে। সামলে নেবার জন্য একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, দশ দিনের ছুটির দরখাস্ত আপনারা পেয়েছেন?

জবাব এলো, পেয়েছে।

কার সই আছে ওতে?

দরখাস্তটা বার করার জন্যেই মিনিট খানেক সময় লাগল হয়ত। তারপর শুনলেন কার সই। এস চ্যাটার্জি। লেটার হেড-এ শিবেশ্বর চ্যাটার্জি নাম ছাপা। দরখাস্তয় লেখা তাঁর ছেলে বিশেষ কারণে দিন দশেক স্কুলে আসতে পারবে না।

নিজের মুখ নিজে দেখতে পাচ্ছেন না জ্যোতিরাণী। ঘরে যেন বাতাস নেই। —এর আগে আর কামাই হয়েছে?

রেজিস্ট্রির পাতা ওল্টানোর শব্দ। তারপর শুনলেন, গত দু মাসের মধ্যে মাঝে মাঝেই কামাই হয়েছে।

তারও দরখাস্ত সব ঠিক মত পেয়েছেন?

ওধারের জবাব—পেয়েছে। ছেলের বাবাই দরখাস্ত পাঠিয়েছেন।

ধন্যবাদ জানিয়ে জ্যোতিরাণী টেলিফোন রাখলেন।

শুয়ে আছেন। দুপুর গড়ালো। বিকেল হল। ঘড়ি দেখে জ্যোতিরাণী নিচে নেমে এলেন। চুপচাপ বসার ঘরে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। বাইরে রাস্তার দিকে সজাগ দৃষ্টি। অপেক্ষা করছেন।

আধ ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। তারপর হঠাৎ উঠে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন।

হাতের ইশারায় যে ছেলেটাকে ডাকলেন, সে সুবীর। বিকেলের নৈমিত্তিক আড্ডার সঙ্গীর খোঁজে সেও এ-বাড়ির দিকেই তাকাচ্ছিল। হকচকিয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি কাছে এলো।

তোমার নাম সুবীর তো?

মাথা নাড়ল। কৃতার্থ হবে কি অবাক হবে জানে না।

খুব সহজ মুখেই জ্যোতিরাণী বললেন, ওই গলির ভিতর থেকে দুলুকে একটু ডেকে নিয়ে এসো তো।

সুবীর দুলুর খোঁজে গলির দিকে ছুটল তৎক্ষণাৎ। দু মিনিটের মধ্যে দুটি বিস্মিত মূর্তি জ্যোতিরাণীর সামনে হাজির।

এসো।

জ্যোতিরাণী বসার ঘরে ঢুকলেন, তারা যন্ত্রচালিতের মত অনুসরণ করল।

এক মুহূর্ত ভেবে জ্যোতিরাণী বললেন, এখানে নয়, ওপরে এসো।

হতভম্বের মতই দাঁড়িয়ে গেছল তারা। জ্যোতিরাণীর সটান দু চোখ আবার তাদের দিকে ঘুরতেই তাড়াতাড়ি ভিতরের দরজার দিকে এগলো তারা।

ছেলে দুটোকে নিয়ে দোতলায় সোজা নিজের ঘরে ঢুকলেন তিনি। কি ব্যাপার আন্দাজ করতে না পেরে শামু, ভোলা, মেঘনাও অবাক।

বোসো। আঙুল দিয়ে খাট দেখিয়ে দিলেন তিনি।

ছেলে দুটো বসল। চোখে-মুখে অজ্ঞাত ভয়ের ছায়া পড়েছে এখন। দোতলায় উঠেও সিতুকে না দেখে আরো ঘাবড়েছে। খানিক চুপ করে থেকে জ্যোতিরাণী তাদের আরো একটু ঘাবড়াবার অবকাশ দিলেন।

কি খাবে তোমরা?

প্রায় খাবি খেতে খেতে মাথা নাড়ল দুজন, কিছু খাবে না।

রেস্টুরেন্টে ছাড়া খেতে ভালো লাগে না? যেখানে সেখানে খাওয়া ভালো না, তিনজনে মিলে কাল যেখানে দশ টাকার খেয়েছ তোমরা সেটা কেমন জায়গা?

নির্বাক, বিমূঢ় তারা।

দুজনেই কানে কম শোনো তোমরা? কেমন জায়গা?

ভা-ভালো। সভয়ে গলির দুলুই তাড়াতাড়ি জবাব দিল।

কি কি খেয়েছিলে?

ওরা ভাবল, রেস্টুরেন্টে খেয়ে সিতুর অসুখ করেছে আর সেই কারণে এই ফ্যাসাদ। শুকনো গলায় সুবীর বলল, চপ কাটলেট মাংস……

জ্যোতিরাণীর গলার স্বর অনুচ্চ, কিন্তু চাউনিটা কঠিন। ছেলে দুটো ঘেমে

উঠেছে।

সুইচ টিপে পাখাটা চালিয়ে দিলেন।—গত দশ দিনের মধ্যে এইসব কদিন খেয়েছো ?

পাঁ-পাঁচ ছদিন। ডুলুর প্রাণান্ত অবস্থা, কারণ সিতুর মায়ের চোখ বেশির ভাগ সময় তার মুখের উপর।

আর অন্য কদিন ?

ডুলু তার সঙ্গীর দিকে তাকালো। সুবীর ঢোঁক গিলে জবাব দিল, মিষ্টি-টিষ্টি।

সবদিনই সিতু তোমাদের খাইয়েছে তো ?

দুজনে একসঙ্গে ঘাড় কাত করল।

পর পর এই দশ দিন কোর্টে বিচার দেখতে যাওয়ার আগে মাসে কদিন করে গেছ ?

একসঙ্গে চমকে উঠল দুজনে। সিতুর মায়ের সুন্দর মুখের মত এমন ভয়াবহ মুখ আর বুঝি দেখেনি।

সত্যি জবাব দাও, কদিন ?

জিব দিয়ে ঠোঁট চেটে সুবীর বলল, চার-পাঁচ দিন—

জ্যোতিরাণীর নিষ্পলক দৃষ্টি ডুলুর দিকে ঘুরল, ও ঠিক বলছে ?

ডুলুর হিসেবে তাল-গোল পাকিয়ে গেল। গলা দিয়ে শব্দ বার করল কোন-রকমে, পাঁচ-ছ'দিন···

সিতুর ছুটির দরখাস্তয় এস চ্যাটার্জি কে সই করেছে ?

দুজনেই বোবা। সত্রাসে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল একবার। এতদিন বিচার দেখতে গিয়ে অনেক রকম জেরা শুনেছে। কিন্তু জেরা কাকে বলে এই যেন প্রথম টের পাচ্ছে।

তেমনি অনুচ্চ কিন্তু আরো কঠিন গলায় জ্যোতিরাণী আবার জিজ্ঞাসা করলেন, ওর সব দরখাস্ত কে সই করে ?

প্রাণের দায়ে একসঙ্গেই মুখ খুলল দুজনে, নি-নিতাইদা—

জ্যোতিরাণী মনে করতে চেষ্টা করলেন। ছেলের মুখেই এই নাম শুনেছেন।

আচ্ছা, এসো তোমরা।

কলের পুতুলের মত একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল দুজনে, ঘর ছেড়ে বেরুলো, তারপর দ্রুত প্রস্থান করে বাঁচল।

নিজের ওপর নির্মম রকমের কঠিন হয়েই যেন মাথা ঠাণ্ডা রাখছেন জ্যোতি-

রাণী। ঠাণ্ডা রাখতে চেষ্টা করছেন।

আঘাতে আঘাতে এ পর্যন্ত তাঁর অনেক কল্পনা মিথ্যে হয়ে গেছে। আশার সব থেকে বড় পুঁজি আর শেষ পুঁজিতে টান ধরেছে এবার।

কিন্তু এবারে এটা তিনি বরদাস্ত করবেন না। এই পুঁজিটুকু নিঃশেষ হতে দেবেন না। এই শেষ আশা তিনি ছাড়বেন না।

সিতু সন্ধ্যার পর ছোট দাতুর সঙ্গে বাড়ি ফিরে কিছুই টের পেল না। পরদিন যথারীতি স্কুলে গেল এবং ফিরল। তখনো তার মনের কোণায় দুর্যোগের ছায়াও পড়েনি। খেয়েদেয়ে বিকেলে বেরুলো। কেউ বাধা দিল না।

তারপর মাথায় বজ্রাঘাত। বাড়ি ছাড়িয়ে অনেকটা দূরে গিয়ে দুলু আর সুবীরের দেখা পেয়েছে।

প্রথম ত্রাসে সিতু স্থির করে ফেলল আর বাড়ি ফিরবে না। যেদিকে দু চোখ যায় চলে যেতে হবে। ওই বাড়িতে আর ফিরতেই পারবে না। বিচারে যে ডাকাত দুটোর সমস্ত জীবন জেল হয়ে গেল তাদের প্রাণও সিতুর মত এমন বিপন্ন নয় বুঝি।

কিন্তু এই প্রাণান্তকর সংকটের মধ্যে দুর্বোধ্য বিস্ময়। একসঙ্গে এতগুলো ব্যাপার ধরা পড়া সত্ত্বেও শাস্তি দেওয়া দূরে যাক, গতকাল সন্ধ্যা থেকে মা তাকে একবারও ডাকল না, কিছু জিজ্ঞাসা করল না পর্যন্ত। কেন ?

মেরে মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দিলেও সিতু এত অবাক হত না বা এত অস্বস্তি বোধ করত না। শাস্তির থেকেও অনাগত শাস্তির বিভীষিকায় বুকের ভিতরে ক্রমাগত হাতুড়ীর ঘা পড়ছে তার।

যে-দিকে দু চোখ যায় চলে যাওয়ার সঙ্কল্প ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মিইয়ে যেতে লাগল। বিকেলের আলোয় টান ধরার আগেই কে বুঝি ধাক্কা দিয়ে তুলে দিল তাকে। তারপর ঠেলে ঠেলে বাড়ির দিকেই নিয়ে চলল।

দোতলার বারান্দায় মা দাঁড়িয়ে। তাকেই দেখছে।

সিতু কি করবে ? ওই মায়ের হাত থেকে বাঁচার তাড়নায় এখনো ছুটে পালাবে ?

মায়ের ওই চাউনিটাই বুঝি ভিতরে টেনে নিয়ে চলল তাকে, তারপর দোতলায় তুলল।

ওদিকের বারান্দা ছেড়ে মা ভিতরের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। আর সেই মুহূর্তে সিতুর পা দুটো মাটির সঙ্গে আটকে গেছে।

মা দেখছে তাকে। শুধু দেখেই চলছে। সিতু মুখ তুলতে পারছে না।

মাটির দিকেও চেয়ে থাকতে পারছে না। দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। নড়তেও পারছে না। তার মনে হচ্ছে মায়ের এই দেখা বুঝি আর শেষ হবে না। তাকে ধরে পা থেকে মাথা পর্যন্ত পিটতে শুরু করে দিলেও যেন সহ্য করা সহজ হত।

এদিকে আয়।

চমকে মুখ তুলল একবার, তারপর বিবর্ণ পাংশু মুখে সামনে এসে দাঁড়াল।

যে উদ্দেশ্যে বিকেলে বেরুবার আগে বাধা দেননি তা কতকটা সফল হয়েছে। জ্যোতিরাণী আর একদফা ভালো করে দেখে নিলেন।

তোর অ্যানুয়াল পরীক্ষা কবে ?

পরিস্থিতি অনুযায়ী ঠাণ্ডা প্রশ্নটা অবাক হবার মতই অপ্রত্যাশিত।—মা-মাস দেড়েক বাদে, নভেম্বরের গোড়ায়।

এই দেড় মাস দুবেলা মন দিয়ে পড়বি। আর বিকেলে আমার বা বাড়ির লোকের সঙ্গে ছাড়া একদিনও বেরুবি না। মনে থাকবে ?

শাস্তির ধরতাইটা বড় বেশি অস্বাভাবিক লাগছে সিতুর। কলের মূর্তির মত মাথা নাড়ল। মনে থাকবে।

তারপরেই হতভম্ব বিমূঢ় সে। এমন অসম্ভব ভাগ্যও বিশ্বাস করবে ? এইটুকুই শাস্তি—আর কিছুই না !

অবাক বিস্ময়ে সিতু দেখছে মা নিজের ঘরের দিকে চলে যাচ্ছে।

॥ বত্রিশ ॥

সেপ্টেম্বর গিয়ে অক্টোবর শেষ হতে চলল।

জ্যোতিরাণী সঙ্কল্প করে সংযমে বেঁধেছিলেন নিজেকে। বাঁধনটা ঢিলে হতে দেননি।

প্রভুজীধামের কাজে ক্লান্তি নেই, বাড়ির ছাড়া-ছাড়া খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলোতেও শৃঙ্খলার বুনট পড়ছে। অথচ এক-ধরনের নীরবতা থিতিয়ে উঠছে যেটা কোন বিরোধের প্রস্তুতি নয় বা কোনো বিরোধের ফলও নয়।

জ্যোতিরাণী নিয়মিত প্রভুজীধামে যান। সপ্তাহে তিন-চারদিন যানই, দরকার পড়লে তার বেশিও যান।

কিন্তু এরই ফাঁকে ফাঁকে আর কোথাও যে যান সে-খবর এক ড্রাইভার ভিন্ন আর কেউ রাখে না। গত এক মাসের মধ্যে কম করে ছ-সাত দিন ড্রাইভারকে

অবাক করেছেন তিনি। খেয়ে দেয়ে দুপুরে যেমন বেরোন তেমনি বেরিয়েছেন। কিন্তু তাঁর নির্দেশে গাড়ি প্রভুজীধামের দিকে ছোটেনি। কলকাতা থেকে পনের বিশ তিরিশ মাইল দূরে দূরে এক-একটা অপরিচিত জায়গায় গিয়েছে।

সিতুর অ্যানুয়াল পরীক্ষা হয়ে গেল। এর মধ্যে মায়ের ব্যবহারে সব থেকে বেশি অবাক হয়েছে সিতু। অতগুলো মারাত্মক অপরাধ মা যেন ভুলেই গেছে। রোজ রাত্রিতে তাকে ঘরে ডেকে নিয়ে বসিয়েছে। নিজে পড়িয়েছে। বাড়িতে থাকলে বিকেলে সঙ্গে করে এক-একদিন বেড়াতে বেরিয়েছে। মায়ের অনুপস্থিতিতে মাঝেসাঝে চুরি করে বেরুনো ধরা-পড়া সত্ত্বেও বকা-ঝকা করেনি। বন্ধুদের একেবারে না দেখে সে থাকতে পারে কি করে এটা বোধ হয় মা বুঝেছে। আর, স্বচক্ষে দেখা ডাকাতদের ও-রকম একটা বিচার না দেখেও যে থাকা যায় না, মা হয়ত সেই বিবেচনাও করেছে। মায়ের বিবেচনার ওপর সিতুর আস্থা বাড়ছে।

প্রভুজীধামকে বড় করে তোলার একাগ্রতায় ছেদ পড়েনি, কিন্তু জ্যোতিরাণীর বাইরের উচ্ছ্বাস কমেছে। আর কেউ না হোক, মৈত্রেয়ী চন্দ সেটা ভালো করেই লক্ষ্য করেছেন। করছেন। একদিন জিজ্ঞাসা করেছেন, কি ব্যাপার বলো তো, প্রায়ই এত গম্ভীর কেন আজকাল? বীথির মত আবার তোমার পিছনে লাগতে হবে নাকি?

বীথিকে জীবনের আলোয় খানিকটা টেনে তোলার গর্ব মিত্রাদি করতে পারে বটে। পিছনে লেগে থেকে আর ধমকে আর শাসন করে করে মিত্রাদি এখন তাকে অনেকটাই নিজের ইচ্ছেমত চালাতে পারছে বটে। তার আচ্ছন্ন ভাব কমে এসেছে, দায়িত্ব চাপালে সেটা সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন করে। মিত্রাদির রাগের ভয়ে সময় মত গা ধোয়, একটু-আধটু প্রসাধন করে, পরিচ্ছন্ন বেশবাস করে বিকেলে মেয়েদের নিয়ে বেড়াতে বেরোয়। হাসিমুখে এক-একসময় তাদের সঙ্গে ওকে গল্প করতেও দেখেন জ্যোতিরাণী। ওই বীথির প্রতি ভিতরে ভিতরে সব থেকে বেশি দুর্বলতা মিত্রাদির। এত তাড়াতাড়ি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার সে-ই প্রধান উপলক্ষ্য বলেই হয়ত। বীথির মত অতটা না হোক, এখানে সুশ্রী মেয়ে আরো আছে। সকলেরই দৈন্যদশা না হলে এখানে আসবে কেন? কিন্তু মিত্রাদির পক্ষপাতিত্ব শুধু ওই বীথিকে নিয়ে। মাস তিনেক আগে একদিন বলেছিলেন, মেয়েটার হাত খালি গলা খালি কান খালি— কটকট করে চোখে লাগে। কি যে করা যায় ভাবছি···

তার দিন তিনেকের মধ্যেই জ্যোতিরাণী একছড়া হার, ছগাছা চুড়ি আর একজোড়া দুল এনে মিত্রাদির হাতে গুঁজে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আমার তো তোলাই থাকে, ওকে পরাও।

মৈত্রেয়ী চন্দ প্রথমে অবাক, পরে খুশি।—এত সব দামী দামী গয়না ওকে দিয়ে দেবে? তোমাকে বলাই আমার ভুল হয়েছে—

জ্যোতিরাণী তাড়াতাড়ি বাধা দিয়েছেন, আমি দিয়েছি ওকে বলতে হবে না। ওর জন্যে তুমি যা করেছ এই কটা গয়নার থেকে তার অনেক বেশি দাম।

মৈত্রেয়ী চন্দ তক্ষুনি বীথিকে ডেকেছেন। গম্ভীর মুখে একে একে গয়নাগুলো পরিয়েছেন। বীথি আড়ষ্ট। তারপর দু চোখ পাকিয়ে মৈত্রেয়ী তাঁকে বলেছেন, এই সব তোমাকে আমি দিয়েছি ধরে নাও, বুঝলে? কারণ, তোমার জন্যে আমি যা করেছি তার নাকি এ-সবের থেকে ঢের বেশি দাম—তোমার হাত-গলা খালি এ আক্ষেপও আমিই এঁর কাছে করেছিলাম। আমি ছাড়া আর কেউ তোমার জন্যে একটুও ভাবে যদি মনে করো তো এই সব আবার খুলে নেব বলে দিলাম!

মাস তিনেক আগে মনের অবস্থা অন্যরকম ছিল জ্যোতিরাণীর। তিনি হেসে-ছিলেন। মিত্রাদিকে ভারী ভালো লেগেছিল। খুশি মুখে মৈত্রেয়ী বলে উঠেছিলেন, দেখো দেখি কেমন দেখাচ্ছে আমাদের গোমড়ামুখী বীথিরাণীকে এখন! তারপরেই ধমক, এই মেয়ে! কদিন বারণ করেছি এ-রকম আধময়লা কাপড় পরে তুমি আমাদের সামনে আসবে না? এটা অনাথ আশ্রম ভেবেছ, নাকি শোকের মায়া আর ছাড়তেই ইচ্ছে করে না?

বীথি সভয়ে উঠে পালিয়েছে।

শুধু বীথি কেন, মিত্রাদির দাপটের ভয় সকলেই করে। তার কথায় সকলে ওঠে-বসে নড়েচড়ে। তাকেই এখানকার প্রধান কর্ত্রী বলে জানে সকলে। জ্যোতি-রাণীও তাই চেয়েছিলেন। মিত্রাদির ঘর নেই, প্রভুজীধাম তার ঘর হোক।

প্রতিষ্ঠানের যে যাই ভাবুক, মৈত্রেয়ীর সমস্ত নির্ভর যাঁর ওপর, কিছুদিন ধরে তাঁকে এমন ধীর স্থির নীরবতার মধ্যে ডুবে যেতে দেখে তিনি অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন। শেষে পরিহাসের সুরে বীথির মত আবার তাঁর পিছনেও লাগতে হবে কিনা জিজ্ঞাসা করেছেন।

জ্যোতিরাণী হেসেই জবাব দিয়েছিলেন, অতটা দরকার হবে না, বীথি অনেক হারিয়ে চুপ করে গেছল—আমার কিছু পাওয়ার আশা।

মৈত্রেয়ীর হেঁয়ালী মনে হয়েছে। কিন্তু জ্যোতিরাণী সত্যিই সমস্ত সত্তা দিয়ে এই আশার বলটুকু সংগ্রহ করতে চেষ্টা করছেন।

নভেম্বর গিয়ে ডিসেম্বর এলো। ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে সিতুর পরীক্ষার ফল বেরুলো। টেনেটুনে পাস করেছে।

জ্যোতিরাণী আরো ঠাণ্ডা, আরো ধীর, আরো স্থির।

কিন্তু এই সঙ্গে ভিতরে ভিতরে উতলাও একটু। কারণ, শাশুড়ীর শরীরের হাল ভালো না। ডাক্তার বুকের সর্দির কিছু কিনারা করতে পারেনি। প্রায়ই হাঁপ ধরে, যার ফলে একটু নিস্তেজ হয়ে পড়েছেন। আহারেও তেমন রুচি নেই।

বছরের শেষ। দু-তিন দিন বাদে শিবেশ্বর চাটুজ্যে দিল্লী যাবেন। সেখানকার বে-সরকারী হোমরাচোমরা ব্যক্তিরা এ-সময়ে নতুন বছরের নানান পরিকল্পনা নিয়ে মাথা ঘামান। দিশী-বিদেশী গোটাতিনেক প্রতিষ্ঠান থেকে সাদর আমন্ত্রণ এসেছে। গেলে লাভ ভিন্ন লোকসান নেই। প্রতি বছরই গিয়ে থাকেন, এ বছরও যাচ্ছেন।

রাত্রিতে খাওয়া-দাওয়ার পর জ্যোতিরাণী পাশের ঘরে এলেন। যে কোনো প্রয়োজনে তিনি এসে থাকেন। তাঁর সঙ্কল্প নড়েনি। এ ঘরের মানুষের অকারণ অসহিষ্ণুতার আঁচ গায়ে এসে লাগলেও মাথায় পাল্টা জবাবের দাহ নিয়ে থাকেন না। বিচ্ছিন্নতার কঠিন আবরণের মধ্যে লোভের আগুন জ্বেলে বিনিময়শূন্য ব্যর্থতার আঘাতে পতঙ্গ দগ্ধাবার আক্রোশ নিয়ে বসে থাকেন না। বাড়ি ছেড়ে বাইরের কোনো অজ্ঞাত কারণে মন-মেজাজ বেশি তিক্ত বা বিক্ষিপ্ত মনে হলেও এ-ঘরের পুরু পরদা সরিয়ে দরকার ছাড়াই জ্যোতিরাণী ঘরে ঢোকেন। কাছে এসে দাঁড়ান। দেখেন। জিজ্ঞাসা করেন, কি হয়েছে?

জবাব পান না। পেলেও সেটা শ্লেষশূন্য হয় না বড়। জ্যোতিরাণীর সঙ্কল্প নড়েনি। তবু আসেন। আসেন বলেই নিভৃতের হিংস্র লোভে তাঁর ঘরে ওই মানুষের অকরুণ পদার্পণ কমে এসেছে। জ্যোতিরাণীর মনে হয় অশান্ত মুহূর্তেও আগের মত রাতের অন্ধকারে রমণীদেহ দীর্ণ করার ক্রুর প্রবৃত্তি আপনা থেকেই বাধা পায়। কেন বাধা, কিসের বাধা জ্যোতিরাণী জানেন না। কিন্তু অনুভব করতে পারেন।

তাই রাত্রির এই ধরনের অবকাশে তিনি এসে দাঁড়ালে এ-ঘরের মানুষের দু চোখ চক-চক করে উঠতে দেখা যায়। সেই চিরাচরিত ক্ষোভ সত্ত্বেও ওই চোখে বাসনা জমাট বেঁধে উঠতে দেখেন। পাল্টা দাপটে তখনো তিনি নিজেকে আগলে রাখার প্রতিরোধ গড়ে তোলেন না। অপেক্ষা করেন। ক্ষোভ দম্ভ অহমিকার আড়ালে প্রশ্রয়লুব্ধ বাসনাটাকে শূন্য শয্যায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সরে আসেন না।

মাঝের কটা দিন এক বিশেষ চিন্তার মধ্যে ডুবে ছিলেন জ্যোতিরাণী। এ ঘরের লোকের সঙ্গে তেমন দেখ-সাক্ষাৎও হয়নি।...আজও ওই চোখে তাপ দেখবেন, অভিলাষ দেখবেন, বাসনা জমাট বেঁধে উঠতে দেখবেন হয়ত।

কিন্তু আজ তিনি বড় কঠিন প্রয়োজনের তাগিদে এসেছেন।

পরশু না তরশু তুমি দিল্লী যাচ্ছ শুনলাম ?

প্রাক্‌নিদ্রার অবকাশে শিবেশ্বর অর্থনীতির দিশী-বিদেশী জার্নাল ওলটান সাধারণত। সেই গোছেরই কিছু একটা দেখছিলেন। মুখ ফিরিয়ে একবার তাকালেন শুধু। এটুকুই জবাব।

কবে ফিরবে ?.. দু-চার দিনের মধ্যে ফিরতে পারবে ?

এই গোছের প্রশ্ন খুব স্বাভাবিক ঠেকল না হয়ত।—না। কেন ?

সিতুকে আমি অন্য জায়গায় রাখার ব্যবস্থা করেছি। সেখানে থাকবে, পড়বে। কলকাতায় রাখব না।

জার্নাল ফেলে শিবেশ্বর আস্তে আস্তে ফিরলেন তাঁর দিকে। নির্লিপ্ত গাম্ভীর্যে উষ্মার আঁচড় পড়তে লাগল।—কোথায় সেটা ?

কোথায় নাম বললেন। কলকাতার থেকে মাইল কুড়ি দূরে। দিন তিনেক নিজে গিয়ে সেখানকার সব কিছু দেখে এসেছেন জানালেন। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা ভালো, পড়াশুনা ভালো, ছেলেরা নিয়মের মধ্যে থাকে—সকলের ওপর বিশেষভাবে নজর রাখা হয়।

ধৈর্য দ্রুত কমে আসছে শিবেশ্বরের। উঠে বসলেন। মুখ লাল, চোখও।—হঠাৎ ওর ওপর বিশেষভাবে নজর রাখার এত দরকার হয়ে পড়ল কেন ? এ বাড়িতে থাকলে আমার মতই অমানুষ হবে সেই জন্যে ?

না। নরম সুরে বোঝাবার মত করে জ্যোতিরাণী বললেন, তোমার যা-কিছু ব্যাপার সে তো আমার জন্যে, আমার বদলে আর কেউ এ সংসারে এলে তুমি অন্যরকম হতে বোধ হয়। কিন্তু সিতুকে এখান থেকে সরানো দরকার হয়েছে।

শিবেশ্বরের অসহিষ্ণুতা বাড়ল বই কমল না। মুহূর্তের জন্য ছেলের প্রসঙ্গও বিস্মৃত হলেন তিনি। জ্যোতিরাণীর আগের কথাগুলোর একটাই বক্র ইঙ্গিত মগজে টেনে নিলেন। অর্থাৎ, স্ত্রীর এত রূপ দেখেই মাথা খারাপ হয়েছে তাঁর, এতখানি রূপের যোগ্য নন বলেই। তাঁর দিকে চেয়ে চেয়ে উক্তির এই তাৎপর্য ছাড়া আর কিছু দেখছেন না।

জ্যোতিরাণী পাশে বসলেন। তেমনি নরম সুরে বললেন, এটা রাগের ব্যাপার নয়, রাগ কোরো না—অনেক ভেবেই আমি এই ব্যবস্থা করেছি।

এভাবে গা-ঘেঁষে বসাটা এখন আর নতুন ঠেকে না শিবেশ্বরের চোখে। নিজের রূপের ওপর অফুরন্ত আস্থা বলেই বসে। দখল ছেড়ে দিয়ে দখল নিতে পারার গর্ব রাখে তাই এ ব্যতিক্রম। কিছুদিনের এই নরম অনুগত হাবভাব দেখেও অন্তর্তুষ্টিতে ভরপুর হয়ে উঠতে পারেন না তিনি। কারণ, আনুগত্য আর নম্রতার

ভিতর স্ত্রীটির শান্ত ব্যক্তিত্ব উল্টে আরো যেন পুষ্টিলাভ করছে মনে হয় তাঁর। এটুকুই বরদাস্ত করা কঠিন।

অনেক ভেবে ব্যবস্থা একেবারে করেই ফেলেছ ?

হ্যাঁ, ভর্তি করা হয়ে গেছে।···দোসরা জানুয়ারী ওর জন্মদিন, চার তারিখে নিয়ে যাব।

চমৎকার! মুখ ক্রমেই লাল হচ্ছে শিবেশ্বরের।—একেবারে বিদেয় করে খবরটা দিলেই তো হত, দয়া করে এই কটা দিন আগে আর বলার দরকার ছিল কি ? মা-কে বলেছ ? মায়ের কষ্ট হবে কিনা ভেবেছ ?

ভেবেছি। এ-জন্যেই এত দিন কিছু বলিনি।···কষ্ট আমারও কম হবে না, কিন্তু পাঠানো দরকার। একটু চুপ করে থেকে সহজ আন্তরিকতার সুরেই বললেন, তুমি থাকলে ভালো হত, দুজনে একসঙ্গে গিয়ে রেখে এলে ছেলেটার ভালো লাগত।

কারোই রেখে আসার দরকার হবে না। গলার স্বরও আর সংযত থাকল না শিবেশ্বরের, সরোষে বলে উঠলেন, তোমার এই সুব্যবস্থা আমার পছন্দ হয়নি—হবে না—বুঝলে ?

অবিচল শান্ত দু চোখ মেলে জ্যোতিরাণী চেয়ে রইলেন। এটুকুর জন্যে প্রায় প্রস্তুত হয়েই এসেছিলেন, তবু এই পর্যায়ের উষ্ণ ঝাপটার ওপর সংকল্প স্থির রাখতে সময় লাগল একটু। বললেন, সব জানলে তোমারও পছন্দ হবে। এক বছর আগেই ওকে আমি এখান থেকে সরাব ভেবেছিলাম, তখনো মন শক্ত করতে পারিনি। এখনো না পারলে দেরি হয়ে যাবে।···টাকা চুরিতে তোমার ছেলের হাত খুব ভালো রকম পেকেছে, এক বছর ধরে সে স্কুল পালাতে শিখেছে, সাইকেলের দোকানের লোককে দিয়ে তোমার প্যাডে তোমার নাম সই করিয়ে সেদিনও একসঙ্গে দশ দিনের ছুটি নিয়েছে, স্কুলে যাচ্ছে বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোর্টে গেছে কেস দেখতে—এর আগেও অনেক দিন তাই করেছে। শুধু এটুকু হলেও ভাবতুম না, এই জানুয়ারীতে তেরোয় পা দেবে ও, এর অনেক আগে থেকেই ও মেয়েছেলে চিনতে শুরু করেছে, এখন খারাপ মেয়েছেলে কাদের বলে তাও জেনেছে—এই সংসর্গ থেকে ওকে এখনো না সরালে কি হবে বুঝতে পারছ ?

শেষেরটুকু শোনার সঙ্গে সঙ্গে শিবেশ্বরের রাগের মুখে হঠাৎ এক পশলা ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা পড়ল যেন। শুধু বিস্মিত বা বিমূঢ় নয়, চাপা অস্বস্তিও একটা। দু চোখের খরখরে চাউনি বদলেছে। দৃষ্টিটা স্ত্রীর মুখের ওপর আগের মত ধরে রাখা যাচ্ছে না।

তেমনি বিনম্র অথচ ধীর স্বরেই জ্যোতিরাণী আবার বললেন, একটা মাত্র ছেলে বাড়িতে থাকবে না এ কারোই ভালো লাগার কথা নয়, শুধু ওর মুখ চেয়েই আমি এই ব্যবস্থা করেছি—আপত্তি কোরো না।

এরপর আর কথা বাড়াতে চান না জ্যোতিরাণী। কয়েক নিমেষ চুপচাপ চেয়ে থেকে ওই মুখে যে-চাপা বিড়ম্বনা লক্ষ্য করলেন, সেটুকু কাটিয়ে ওঠার আগেই আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন। ছেলের প্রসঙ্গে এই আলোচনার পরে সকল সমস্যা ছাপিয়ে এ অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যের প্রতিক্রিয়া বড় হয়ে উঠলে আজ অন্তত ভালো লাগবে না। ঘরের চারিদিকে একবার তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে, মশারি টাঙিয়ে দেব ?

শিবেশ্বর মাথা নাড়লেন শুধু। দরকার নেই। জ্যোতিরাণী চলে গেলেন।

শূন্য শয্যায় খানিক ছটফট করলেন শিবেশ্বর। তারপর উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন। ছেলেকে দূরে সরানোর স্থির সঙ্কল্পের মধ্যে স্ত্রীর শান্ত ব্যক্তিত্ব আজই বোধ হয় সব থেকে বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর চোখে। কিন্তু এই অস্থিরতা সে কারণে নয়। ওতে বরং শিরায় শিরায় লোভের আঁচ লাগে, দখলের নেশা জাগে। আজও লেগেছিল, আজও জেগেছিল। ওই ব্যক্তিত্বের গভীরে ভোগের বিস্মৃতি আজ আরো নিবিড়তর হতে পারত। হয়নি। চলে গেছে। কিন্তু শিবেশ্বরের এই চাপা অস্থিরতা সে কারণেও নয়।

···ছেলে টাকা চুরি করে, স্কুল পালায়, বাপের নাম-ছাপা প্যাডের কাগজ চুরি করে অন্যকে দিয়ে তাঁর নাম সই করিয়ে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে স্কুল কামাই করে ···শুধু এটুকু হলেও স্ত্রী অত ভাবত না বলেছে।···ছেলে মেয়েছেলে চেনা শুরু করেছে, খারাপ মেয়েছেলে কাদের বলে জেনেছে···এজন্যেই তাকে দূরে সরানোর নীরব সঙ্কল্পের সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ।

স্ত্রী ঘর ছেড়ে চলে যাবার আগেই ছেলের চিন্তা দূরে সরেছে। তার জন্যেও উদ্বিগ্ন নন শিবেশ্বর। তবু এ অস্থিরতা কেন নিজেই সেটা হাতড়ে বেড়াচ্ছেন।

···ছেলের প্রবৃত্তিশাসনের ওই অমোঘ রূপ দেখে ? আপসশূন্য অমনি কোনো ছায়া তাঁকেও স্পর্শ করে গেল ? ছায়া···অনাগত ছায়া ?

চিন্তাটা মাথায় আসামাত্র হঠাৎই কি কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন তিনি। ছেলের প্রবৃত্তিশাসনের সকল ব্যবস্থা এই মুহূর্তে একেবারে নির্মূল করে দিতে পারলে স্বস্তি বোধ করেন। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। পাশের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। অনাগত ছায়াটার নড়াচড়া বেড়েই চলেছে নিভৃতের কোথাও। অন্ধকারে, নগ্ন-ক্রূর প্রবৃত্তির দ্বিগুণ উল্লাসে শয্যালগ্ন রমণীর দেহ বিদীর্ণ করে আঘাতে আঘাতে তার

সত্তাসুদ্ধ সমর্পণের গ্রাসে টেনে আনতে পারলেই শুধু ওই অস্বস্তিকর ছায়াটার মুক্তি সম্ভব যেন।

স্নায়ুতে-স্নায়ুতে, রক্ত-মাংস-হাড়-পাঁজরে সত্তাগ্রাসের সেই তাড়না গুমরে গুমরে সামনের দিকে ঠেলছে তাঁকে। পরদা ঠেলে পা বাড়ালেই ঘর।

পরদা ছোঁয়া গেল না। পা বাড়ানো গেল না। যেমন এসেছিলেন, তেমনি নিঃশব্দে আবার নিজের ঘরে ফিরে গেলেন শিবেশ্বর চাটুজ্যে।

যথাসময়ে দিল্লী চলে গেলেন তিনি। তাঁর দিক থেকে কোনো বাধা এলো না। আপত্তি উঠল না।

মায়ের মুখে বেশি কথা নেই, হাবভাবও ঠাণ্ডা, কিন্তু তার উদারতা দেখে সব থেকে অবাক লেগেছে সিতুর। জন্মদিন উপলক্ষে আগেই বেশ কয়েকপ্রস্থ নতুন প্যান্ট-শার্ট-ট্রাউজার এসেছে। নতুন জুতো হয়েছে। একটা বড় আর একটা ছোট ঝকঝকে দুটো স্যুটকেসও এলো। টুকিটাকি আরো কত কি ঠিক নেই। তার জন্মদিনে এত ঘটা এই প্রথম। বন্ধু-বান্ধবদের নেমন্তন্ন করার ঢালা অনুমতি মিলেছে। ছোট দাদু তো আছেই, প্রভুজীধাম থেকে মিত্রামাসী আর বীথিমাসীও এসেছে। আর সকালে গাড়ি পাঠিয়ে মায়ের আদুরে মেয়ে শমীকেও আনা হয়েছে। প্রভুজীধামের অন্য সকলের খাওয়ায় জন্যেও মা-কে টাকা পাঠাতে দেখেছে।

সকাল থেকে আনন্দে কেটেছে বটে। বন্ধু-বান্ধবদের কাছেও আজ এই প্রথম যোগ্য মর্যাদা লাভ করেছে সে। একটা ছেলের জন্মদিনের ঘটা দেখে তাদের তাক লেগে গেছে। বিকেলের দিকে মা তাকে আর মিত্রামাসী আর বীথিমাসীকে নিয়ে গাড়িতে চেপে প্রভুজীধামে এলো। শমীকে আগেই বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিল। এখানে এসে শিল্পীর আঁকা সেই মস্ত ছবির সামনে দাঁড়িয়ে মায়ের প্রণামের ঘটা দেখেও সিতু কৌতুক বোধ করছে। মায়ের ইঙ্গিতে তাকেও ছবির সামনে হাতজোড় করে দাঁড়াতে হয়েছে। কিন্তু প্রণাম শুধু মা-ই করেছে অনেকক্ষণ ধরে। পাগলাটে একটা লোক সেদিন এটা এঁকে দিয়ে গেল, ছবি ছেড়ে সেটা ঠাকুর-দেবতা হয়ে বসল কি করে সিতুর মাথায় আসে না।

এত আনন্দ সত্ত্বেও সিতুর কাছে যা-কিছু দুর্বোধ্য লাগছিল, সব স্পষ্ট হয়ে গেল পরদিন। আর সে স্পষ্টতার ধাক্কায় সিতু বোবা একেবারে। শুধু সিতু নয়, বাড়ির আরো অনেকে।

সকালের দিকে ছোট দাদু তাকে ঘরে ডেকে কোলের কাছে বসিয়ে আদর-টাদর করল প্রথম। অথচ খবরের কাগজের আড়ালে জেঠুর মুখ হঠাৎ এত গম্ভীর যে,

তার সামনে বসে আদর খেতে সিতুর অস্বস্তি লাগছিল। নানা কথার পর ছোট দাদু বহু ছেলের সঙ্গে বাইরে থাকা, বাইরে থেকে পড়াশুনা, খেলাধুলো করা, আর তারপর মানুষের মত মানুষ হয়ে ওঠার যে ঝকমকে মূর্তি আঁকতে লাগল, শুনতে শুনতে সিতুর মুখ ফ্যাকাশে। ছোট দাদুর কথার শেষে কি আসছে তা যেন সে বুঝতে পেরেছে। বুকের ভিতরের ছোট যন্ত্রটা যেন থেমে আসছে ক্রমশ। শেষে শেষ ধাক্কার মতই মায়ের ব্যবস্থা জানল সে।...কালই তাকে এখান থেকে যেতে হবে।

গত রাত্রিতে জ্যোতিরাণী মামাশ্বশুর আর কালীদার কাছে সঙ্কল্প ব্যক্ত করেছেন। তাঁরাও আকাশ থেকে পড়েছিলেন প্রথমে। ভর্তি করা আর থাকার ব্যবস্থা দু মাস আগেই হয়ে গেছে শুনে হতভম্ব। খুব ঠাণ্ডামুখে এই সঙ্কল্পের কারণটা জানিয়েছেন জ্যোতিরাণী। যতটা বলা সম্ভব বলেছেন। মামাশ্বশুরকে অনুরোধ করেছেন সিতুকে বলার জন্য, আর শাশুড়ীকে যদি তাঁরা দুজনেই একটু বোঝান ভালো হয়।

কালীনাথ বা গৌরবিমলের পক্ষে আপত্তির একটা কথা তোলাও সম্ভব হয়নি।

ছোট দাদু হেসে বললেন, কি রে, এই ব্যাটাছেলে তুই? কোথায় ফুর্তিতে লাফিয়ে উঠবি তার বদলে এই!

প্রাণপণে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করছে সিতু। তার একটুও কষ্ট হচ্ছে না। বরং বাড়ি থেকে এই মুহূর্তে ছুটে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে তার। মা যা-কিছু দিয়েছে সব তছনছ লণ্ডভণ্ড করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে যেতে ইচ্ছে করছে। একবার বেরিয়ে এ-বাড়ির দিকে আর ফিরে তাকাতেও চায় না সে। একটুও কষ্ট হচ্ছে না, তবু চোখ ঠেলে যদি জল আসে, তাহলে নিজের এই দু চোখের ওপরই বুঝি চরম প্রতিশোধ নেবে। না যাতে আসে, সেই চেষ্টা করছে। না, তার কষ্ট হচ্ছে না, ঘরটা আর খাট-চৌকি সব বেশ দুলছে শুধু।

...মায়ের মত এত নির্মম এত অকরুণ আর বুঝি এই পৃথিবীতে কেউ নেই। ও গাধা বলেই এতদিন ধরে মায়ের মতলব বোঝেনি। অন্যকে দিয়ে দরখাস্ত সই করিয়ে স্কুল পালানো, ডাকাতদের কেস দেখা আর টাকা চুরি যেদিন ধরা পড়েছে, ও নেহাত গাধা না হলে সেদিন থেকেই মায়ের মতলব বোঝা উচিত ছিল। অত বড় অপরাধের পরেও মা তাকে শাস্তি দিল না বা একটি কথাও বলল না বলেই তার ধরা উচিত ছিল, চুপচাপ মা কত বড় শাস্তির ব্যবস্থা ঠিক করছে।

একটি কথাও না বলে সিতু উঠে এসেছে। দূর থেকে মা-কে দেখেছে। যত দেখেছে, ততো নির্মম ততো অকরুণ মনে হয়েছে। দু মাস ধরে রাগ পুষে এত

নিঃশব্দে এত ঠাণ্ডা মুখে তাকে বাড়ি থেকে তাড়াবার ব্যবস্থা করেছে, তার মত দয়ামায়া শূন্য আর কে হতে পারে? ব্যবস্থার আর নড়চড় হবে না এটা সে মর্মে মর্মে অনুভব করতে পারে এখন।

ছেলেকে ওভাবে চেয়ে থাকতে দেখে জ্যোতিরাণী দু-দুবার থমকেছেন।···এই গোছের চাউনি আর যেন কবে দেখেছিলেন। এই গোছের রাগ আর বিদ্বেষের ঝাপটা খেয়েছিলেন। স্বাধীনতার সেই রাতে। বাবার চাবুকের ঘায়ে গায়ে জ্বর উঠে গেছল, অনেকক্ষণ বাদে জ্যোতিরাণী দেখতে গেছলেন তাকে, যন্ত্রণায় কুঁকড়ে ছেলে ঘুমের ঘোরে তাকিয়েছিল তার দিকে—সেইদিন। তখন। সেদিন জ্যোতিরাণী তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে চলে এসেছিলেন। কিন্তু আজ নড়েননি, চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়েই ছিলেন। হাত তুলে একবার কাছে ডেকেছিলেন তাকে, আর একবার নিজেই এগিয়ে ছিলেন।

দুবারই ছেলে বড় বড় পা ফেলে সরে গেছে।

শোনামাত্র তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছেন শাশুড়ী কিরণশশী। বয়েস বেড়ে নানা উপসর্গে দেহ বিকল হয়ে আসছে। তার মধ্যে নাতি কালই বাড়ি ছেড়ে বাইরে পড়তে চলে যাচ্ছে শুনে রাগে একেবারে ফেটেই পড়লেন প্রথম। গলা ছেড়ে চিৎকার করে উঠলেন, যাক্ দেখি কোথায় যাবে—এত সাহস যে আমাকে একবার জানানো পর্যন্ত দরকার মনে করল না—ছেলে শুধু ওর, আর কারো কিছু না?

গৌরবিমল আর কালীনাথ মুখ খুলতে গিয়ে দ্বিগুণ চিৎকার চেঁচামিচির মুখে পড়লেন।

পায়ে পায়ে জ্যোতিরাণী দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ালেন।

কিরণশশী ফিরেও তাকালেন না তার দিকে, অন্য দুজনকে ধমকে বলে উঠলেন, তোরা কি বলতে এসেছিস? কি পরামর্শ করতে এসেছিস আমার সঙ্গে? ওই দুধের ছেলে বাড়ি ছাড়া হোক তোদেরও সেই ইচ্ছে?

মাথা চুলকে গৌরবিমল বললেন, না, কষ্ট তো আমাদের একটু হবেই···তবে সিতুর খুব ভালো লাগবে···বাড়ি ছাড়া হয়ে শ-তিনেক ছেলে তো আছে সেখানে।

কিরণশশী ঝাঁজিয়ে উঠলেন, থাকবে না কেন। যে দিনকাল পড়েছে, হাজারে হাজারে থাকবে—মায়েদের সব কাজের অন্ত নেই, থাকবে না তো যাবে কোথায়?

শান্ত মুখে জ্যোতিরাণী বললেন, বেশি দূরে ও যাচ্ছে না, গাড়িতে এক-ঘণ্টারও

পথ নয়, ছুটি-ছাটায় যখন খুশি আসতে পারবে—

থাক্ মা থাক, আমার অত ফিরিস্তি শুনে কাজ নেই। আমি চোখ বুজলে যেখানে খুশি পাঠিও, দেরি তো নেই বেশি, ছুটো দিন সবুর করো।

জ্যোতিরাণী বললেন, কষ্ট হলেও আপনি ওকে আশীর্বাদ করে মত দেবেন, আপনিই ওকে মানুষ হতে দেখবেন—

কি? ওর বাপ-দাদারা সব অমানুষ হয়ে গেছে, কেমন? রাগের মাথায় তপ্ত রসনা সংযত করা গেলই না।—তুমি এমন মস্ত মানুষের ঘর থেকে এসেছ যে, ছেলে এখানে থাকলে মানুষই হবে না? কি ভাবো তুমি নিজেকে? কেন তোমার এত আস্পর্ধা?

গৌরবিমলের বিড়ম্বিত মুখ, কালীনাথের ঘাড় গোঁজা। শুধু জ্যোতিরাণীর মুখেই কোনরকম অনুভূতির আঁচড় পর্যন্ত নেই। কিরণশশী আবার বলে উঠলেন, আমি না-হয় কেউ নই, ওর বাবার মতামতেরও কোনো দাম নেই, কেমন? সে নেই এখানে, আর তুমি হোস্টেলে ছেলে রাখতে যাচ্ছ?

তেমনি ধীর মৃদু স্বরে জ্যোতিরাণী জবাব দিলেন, তাঁর মত নেওয়া হয়েছে, তিনি জেনেই গেছেন।

কিরণশশীর সবটুকু জোর যেন এক মুহূর্তে কেড়ে নিল কেউ। ঘোলাটে ছু চোখ মেলে চেয়ে রইলেন খানিক। তারপরেই বুঝলেন তাঁর রাগ চিৎকার চেঁচামিচি সব ব্যর্থ। খুব চাপা আর্তনাদের মত শোনালো কথাগুলো।—ছুজনে পরামর্শ করেই তাহলে এই ব্যবস্থা করেছ, শিবুকেও বুঝিয়েছ তাহলে…ও-ও আমাকে একবার জানানো পর্যন্ত দরকার মনে করল না! গৌর, কালী তোরা আবার আমাকে কি বলতে এসেছিস্—ও আমার কে যে আমার কষ্ট হবে! যাও মা যাও, আমি আশীর্বাদ করছি, মনের সাধে ছেলে মানুষ করো গে তোমরা, যাও, যাও—

বলতে বলতে শুয়ে পড়লেন তিনি।

গাড়িতে ওঠার আগে পর্যন্ত সিতু লক্ষ্য করেছে বইকি, সকলকে লক্ষ্য করেছে। ঠাকুমা তো গতকাল থেকে তাকে কোলে করেই রেখেছে, আর কেঁদেছে। জেঠু ব্যস্ত, আগেই কাজে বেরিয়ে গেছে। যাবার আগে তার গাল ধরে নেড়েছে আর মাথা ধরে ঝাঁকিয়েছে আর হেসে বলেছে, খুব বেঁচে গেলি, আমার হাতে মানুষ হওয়া হল না তোর।

কিন্তু সিতু জানে জেঠুর কষ্ট হয়েছে। কষ্ট হলেও জেঠু ওই রকম বলতে পারে,

হাসতে পারে। ছোট দাছু তাকে ভোলাবার জন্য কত ভালো ভালো কথা বলেছে ঠিক নেই। প্রত্যেক শনিবারে এসে এসে তাকে দেখে যাবে তাও বলেছে।…যত হাম্বুক আর যাই বলুক, সব থেকে বেশি কষ্ট ছোট দাছুরই হচ্ছে।

…আর মেঘনা তাকে ছুচক্ষে দেখতে পারত না, কিন্তু গাড়িতে ওঠার আগে স্পষ্ট তার চোখেও জল দেখেছে সিতু। শামু-ভোলারও সকাল থেকে চোখমুখ কাঁদো-কাঁদো।

…মোট কথা, ও বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছে বলে কষ্ট সকলের হয়েছে। শুধু একজন ছাড়া। যে তার ডান পাশে বসে আছে। যে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছেও তার দিকে। ওপাশ থেকে মামুর কথা শুনে যে হাসছেও মুখ টিপে এক-একবার। সিতু সেই থেকে আর ফিরেও তাকায়নি তার দিকে, না তাকিয়েও টের পেয়েছে।

কষ্ট শুধু এই মায়েরই হয়নি।

গাড়ি ছুটেছে। এপাশে ছোট দাছু ওপাশে মা, মাঝে ও। ছোট দাছুর দিকের জানলার ভিতর দিয়ে মন দিয়ে রাস্তা দেখছে সিতু। সম্ভব হলে গাড়িটা থামাতে বলে ও নেমে ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসত। ছোট দাছুর কথা শুনতেও ভালো না, ছোট দাছু খুনসুড়িও করছে এক-একবার। সিতুর তাতে রাগ বাড়ছে।

গাড়ি বিশাল এলাকার মধ্যে ঢোকামাত্র সিতুর ভিতরটা আগে চুপসে গেল; কিন্তু তবু ওই অকরুণ মায়ের দিকে একবার তাকালো না সে।

ওখানকার তিন-চারজন অচেনা লোক এগিয়ে এলো। একটা বাড়িতে অনেক ক্লাস-ঘর আর ছেলে চোখে পড়ল।

অচেনা লোকেরা তাদের নিয়ে আর একটা বাড়ির দোতলায় উঠল। মস্ত একটা ঘর। ছু কোণে ছুটো বিছানা পাতা। আর এক কোণে খালি চৌকি একটা। বলার আগেই সিতু বুঝল ওটা তার। লোকগুলো চলে গেল।

একজন চাকর তার বাক্স-বিছানা নিয়ে ঘরে ঢুকল। কারো সাহায্য না নিয়ে মা নিজেই সামনের তাকের ওপর তার জিনিসপত্র বার করে গোছালো। আলনায় কয়েকটা জামা-প্যান্ট সাজিয়ে রাখল। স্যুটকেস ছুটোর চাবি তাকে দেখিয়ে ড্রয়ারে রাখল। কখন কি করতে হবে না হবে সেই উপদেশ দিল।

সিতু তখন তার দিকে তাকিয়েছে বটে, কিন্তু কথা বলেনি। শোনার বদলে মা-কে তখনো শুধু দেখেছে সে।

খানিক বাদে ছুটির ঘণ্টা বেজেছে। ঘরে ঘরে ছেলেরা ঢুকেছে। এ-ঘরের বাসিন্দা ছুটির একজন সিতুর থেকেও ছোট আর একজন সমবয়সী। সকৌতুকে নতুন আগন্তুক দেখল তারা। জ্যোতিরাণী হাসিমুখে তাদের সঙ্গে আলাপ

করলেন, ছেলেকে বললেন আলাপ করতে। সিতু ঘাড় বাঁকিয়ে শুধু নিরীক্ষণ করল তাদের, একটি কথাও বলল না। বিকেলের খাবার ঘণ্টা বাজল, তারা ওকে খেতে ডাকল। সিতু মাথা নাড়ল, তার খিদে নেই।

ফেরার সময় হল। অফিসেও একবার দেখা করে যেতে হবে। গৌরবিমল উঠলেন, জ্যোতিরাণীও উঠলেন। সিতু জানলা ধরে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু নীচের মাঠে ছেলেদের খেলাধুলো ছুটোছুটি কিছুই দেখছে না।

গৌরবিমল আর একদফা পিঠ চাপড়ে তাকে চাঙ্গা করে তুলতে চেষ্টা করলেন। সিতুর থমথমে মুখ। কিন্তু না, চোখে জল আসতে সে দেবে না। যা সচরাচর করে না, তাই করল। হেঁট হয়ে ছোট দাছুকে একটা প্রণাম করে উঠল।

গৌরবিমল হেসে বললেন, মা-কে প্রণাম করলি না?

ঘুরে সিতু এবারে দু হাতে জানলা ধরে দাঁড়াল।

গৌরবিমল অপ্রস্তুত একটু। জ্যোতিরাণী হাসছেন এখনো।

গাড়ি ফিরছে। দুজনে দুধারে বসেছেন। সিতুর প্রসঙ্গেই মাঝে মাঝে এটা-সেটা বলছেন গৌরবিমল। যেখানে তাকে রেখে আসা হল, সেখানকার ব্যবস্থাদি, খাওয়া-দাওয়া, লেখাপড়ার খোঁজখবর নিচ্ছেন। জ্যোতিরাণী দুই-এক কথায় জবাব দিচ্ছেন।

বিকেলের আলোয় টান ধরেছে। ওদিকে কথাও একসময় ফুরিয়েছে। দুজনেই চুপচাপ।

এরই ফাঁকে গৌরবিমল লক্ষ্য করেছেন কিছু। ছেলের মায়ের তেমনি ঠাণ্ডা নির্লিপ্ত মুখ। তেমনি নয়, আরো বেশি। কিন্তু চোখ দুটি চকচক করছে।

···দু চোখ যেন ঠিক এমনিই চকচক করতে দেখে এসেছেন ছেলেটারও।

॥ তেত্রিশ ॥

মিলনে ফুল ফোটে, ফল ধরে। ফুল অবজ্ঞা করলে তার ক্ষত ফলে এসে লাগে।

এই অবজ্ঞার দিকটার প্রতি সচেতন থাকলে ছেলেকে দূরে না সরিয়ে জ্যোতিরাণী উল্টে তাকে আরও বেশি কাছে টানার কথা ভাবতেন হয়ত। মনোবিজ্ঞানীর মতে শিশুর ভিতরের জগৎটা বাইরের মত অত ছোট নয়। বেশীর ভাগ বাবা-মায়েরা এ-খবর রাখেন না। জটিল এই চিন্তাদাহের যুগে ছোট ছোট

ছেলেমেয়েরাও যে আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে, সেটা ওই ভুলের ফসল। যে ছেলের অত দাপট আর অত চতুর কার্যকলাপ, বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র থাকার নামে তার পায়ের নীচের মাটি কেন অত দুলে উঠেছিল সে সম্বন্ধে জ্যোতিরাণীরও কোন ধারণা নেই, শিবেশ্বরেরও না।

দুলে উঠেছিল সিতুর অনুভূতিপ্রবণ নিরাপত্তাবোধের অভাবে। যে-অভাবের বাইরে কোনো অস্তিত্ব নেই। সজাগ শিশুর জীবনে এই আবেগের বিপর্যয় ঘটে শুধু তার বাবা-মায়ের সক্রিয় মনোযোগের অভাবে। এই অভাবের পটভূমিতেই সিতুর আবির্ভাব। তার অবোধ চেতনার ওপর বাবা-মায়ের মিলিত হাসির আলো কখনো পড়েনি। বরং তার বিপরীত ছাপ পড়েছে। আজও সিতু বাবা-মায়ের বিরোধ কি নিয়ে জানে না, কিন্তু চেতনা স্ফুরণের বহু আগে থেকেই তার অনুভূতির ওপর ওই বিরোধের ছাপ পড়েছে—পড়ে এসেছে। অসুখে ভুগেছে জন্মের পর থেকে বছর কতক। শিশুর চেতনায় নিরাপত্তার অভাব ছায়াপাত করে গেছে তখন থেকে। আশ্রয় মিলেছে ঠাকুমার কাছে, ছোট দাদুর কাছে। কিন্তু শিশুর মানসিক পুষ্টির পক্ষে সেটা যথেষ্ট নয়।

...ভিতরটা তীক্ষ্ণ অনুভূতিপ্রবণ বলে আজও সিতু রাতে একা শুয়ে চোখ বুজলে একটা অদ্ভুত আবছা ধোঁয়াটে দৃশ্য কল্পনা করতে পারে। সে যেন কবে কোথায় একটা দৈত্য গোছের কারো ভয়াবহ কাণ্ড দেখেছিল। দৈত্যটার দয়া নেই, মায়া নেই,—সে কেবল হাতের কাছে যা পায় ভেঙে-চুরে তছনছ করে। বিষম আক্রোশে সে কেবল ভাঙে আর ভাঙে।

কল্পনাটা মনে এলে এখনও সিতু অস্বস্তি বোধ করে। আর মনে মনে অবাকও হয়।

কিন্তু জানে না এ কল্পনা কেমন করে দানা পাকালো। তার চার বছর বয়সের কথা মনে থাকার কথা নয়। মনে নেইও। সে জানবে কি করে—বাবা-মায়ের এক প্রত্যক্ষ বিবাদের দৃশ্যই ঘষা-মোছা হতে হতে এই উদ্ভট কল্পনায় এসে ঠেকেছে।...দুর্ভিক্ষের পদসঞ্চারের আগে চাল আটকে লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফার লোভে এক বিশিষ্টজনকে বিক্রমের মারফত বাড়িতে আমন্ত্রণ করে আনা হয়েছিল একদা, আর, তার আপ্যায়নের জন্য যে চায়ের সেট্ জ্যোতিরাণী বার করেছিলেন শিবেশ্বরের তাতে মান খোয়া গেছল। অতিথিরা বিদায় নেবার পর তাই নিয়ে তর্কের ফলে শিবেশ্বর সে-দিন ওই চায়ের সেট্ সংহার করেছিলেন। আর, চার বছরের সিতু অবাক বিস্ময়ে সেই সংহারপর্ব দেখেছিল। আসল ঘটনা বিস্মৃতির অতলে ডুবে গেছে বলেই অনুভূতির রাজ্যে ওই গোছের ছাপ পড়ে আছে।

মনোবিজ্ঞানীর মতে এই রকমই হয়ে থাকে।

সিতুর ছোট জীবনে এরকম প্রতিকূল ছাপ কত যে পড়েছে ঠিক নেই।

তারপর যা স্বাভাবিক তাই হয়েছে। এই অবস্থায় প্রতিটি শিশুর একই পরিণতি। বাবা-মায়ের সদয় মনোযোগের অভাব তাকে দেউলে করে বলেই ভিতরে ভিতরে সে নিরাপত্তার কাল্পনিক দুর্গ রচনা করে। তখন সেটাই তার পুষ্টির রসদ যোগায়। এই সঙ্গে খাওয়া-পরা ভালো পেলে বাইরের স্বাস্থ্য ফেরে। অনুভূতিপ্রবণ স্নায়ু তখন ওই নিরাপত্তার অভাব দূর করার তাগিদে বাইরের দিকে ছোটে, ধ্বংসের ভিতর দিয়েও সে নিজের শক্তির স্বাদ পেতে চায়। শক্তি অনুভব করার কৃত্রিম প্রেরণার ফলে প্রবৃত্তি হয়ে ওঠে উদ্ধত অনমনীয় দাম্ভিক সন্দিগ্ধ জেদী রোমাঞ্চসন্ধানী।

সিতুর বেলায়ও তাই হয়েছে। তার অপরিণত মনে বাবা-মায়ের সদয় মনোযোগের ছাপ পড়েনি, তাই বাঁকা রাস্তা ধরেও পাঁচজনের মন সে নিজের দিকে টানতে চেষ্টা করেছে। তাঁদের বাহবা জোটেনি বলেই এক-একটা কাণ্ড করে পাঁচজনের বাহবা কুড়োবার ঝোঁক। সেই কাল্পনিক দুর্গ থেকে শক্তি টেনে টেনে সর্বদা নিজের বৈশিষ্ট্য বড় করে তোলার তাগিদ।

বছর দুই আগে নিজের নামের বৈশিষ্ট্যের ওপর অপমানের কালি ঢেলেছিল বলে সজারু-মাথা সুবীরের সঙ্গে তো বেদম মারামারিই হয়ে গেছল তার। মারামারির ফলে লপটা-লপটি করে এক বাড়ির রক থেকে দুজনে রাস্তায় এসে পড়েছিল। সুবীর বয়সে বড়, গায়ের জোরও কিছু বেশি—মার হয়ত সিতুই বেশি খেয়েছিল। কিন্তু কুরু-কুল নিধন যজ্ঞের মতই তার অমিত আক্রোশ দেখেছিল বন্ধুরা সেদিন। হোমিওপ্যাথি শিশিতে নস্যি পুরে সুবীরের নেশা-করা দেখানোর চাল সিতু ঘুচিয়ে দিয়েছিল প্রায়। ধস্তাধস্তির ফলে সুবীরের শার্টের পকেটের শিশি ভেঙে গুড়িয়েছিল আর সেই কাচ বিঁধে সুবীরের জামা-প্যান্ট রক্তাক্ত হয়েছিল। ফলে মার বেশি খাওয়া সত্ত্বেও সিতুর নামের মর্যাদা রক্ষার শৌর্য অন্ত বন্ধুদের চোখে ছোট হয়ে যায়নি।

নিজের সাত্যকি নামের বৈশিষ্ট্য সিতু নিজেই আবিষ্কার করেছিল। আর পাঁচজনের মত সাদামাটা নাম নয়, ওই নামের মহিমা ঠাকুমার কাছে কিছু শোনা ছিল। ঠাকুমার নাম-কীর্তনে নাতিকে খুশি করার উপকরণ ছিল। বন্ধুদের কাছে বলার সময় সিতু তার ওপর বেপরোয়া রঙ চড়াতে কার্পণ্য করেনি। যেমন জন্মের পর অনেক লক্ষণ বিচার করে ওই নাম রাখা হয়েছিল তার। মাথায় পাকা চুল ছিল একটা, সেটা জ্ঞান-বুদ্ধির লক্ষণ। শূন্যের ওপর দু হাত মুঠো করে চিৎকার

করত—সেটা বীরত্বের আর জেদের লক্ষণ। কেষ্ট ঠাকুরের ফটোর দিকে তাকালেই চার মাস বয়েস থেকে খিল-খিল করে হাসত আর সানন্দে হাত-পা ছুঁড়ত—সেটা কোনো এক জীবনের আপন-জনকে চিনতে পারার লক্ষণ। ও জন্মাবার আগে ঠাকুমা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছে কিছু—পরে ঠাকুরমশাইরা ঠাকুমাকে বলেছে সেই সব স্বপ্নেরও বিশেষ অর্থ আছে। তাই অনেক ভেবে-চিন্তে তার নাম রাখা হয়েছে সাত্যকি।—সাত্যকি কে ছিল জানিস তো? মহাভারতের মস্ত যাদব বীর একজন। রাজা শিনির ছেলে। শ্রীকৃষ্ণের রথ চালাতো, কেষ্ট ঠাকুর ভারী ভালবাসত তাকে। রথ চালাতো মানে কি গাড়োয়ান? যেমন তোদের বুদ্ধি! কেষ্ট ঠাকুর তো অর্জুনের রথ চালাতো—সে কি গাড়োয়ান? সব থেকে সাহসী বিশ্বাসী আর চালাক লোককেই এ কাজের ভার দেওয়া হত। হেঁজিপেঁজি বা ভীতু লোক হলে রথ কোন্ বেঘোরে টেনে এনে ফেলবে ঠিক কি—যুদ্ধ করা তখন মাথায় উঠবে।

বন্ধুরা কেউ নির্বাক কৌতূহলে, কেউ হিংসামেশানো বিস্ময়ে সাত্যকি নামের লোভনীয় গুণাবলী শুনেছে। ফলে কলিযুগের ক্ষুদ্র সাত্যকির গাম্ভীর্যমণ্ডিত ব্যাখ্যা আরো অনায়াস বিস্তৃতি লাভ করেছে।—সাত্যকির অস্ত্রবিদ্যার গুরু কে ছিল জানিস? স্বয়ং অর্জুন—কেষ্ট ঠাকুর যাকে ভালবাসে তাকে না শিখিয়ে যাবে কোথায়? আর, সাত্যকির মেজাজখানা কি রকম ছিল তোরা ভাবতেই পারবি না—কেষ্ট ঠাকুরের দাদা বলরামকে পর্যন্ত একবার গালাগাল করে ভূত ভাগিয়ে দিয়েছিল। আর, অত বড় বীর ছিল বলেই তো কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবদের নামজাদা একজন সেনাপতি হয়ে বসতে পেরেছিল। শুধু বীর নাকি, চালাকও তেমনি। তার চালাকির কাছে ধরা না পড়লে কেষ্ট ঠাকুর তো দুর্যোধনের ফাঁদে পা দিয়ে বন্দী হয়ে বসেছিল প্রায়। সাত্যকিই তো দিলে দুর্যোধনের প্ল্যান বানচাল করে। ওদিকে প্রতিশোধ নিতেও তেমনি ওস্তাদ। মহাভারতের যুদ্ধের পাঁচ দিনের দিন চন্দ্র-বংশের রাজা ভূরিশ্রবা শয়তানি করে দিলে সাত্যকির দশ-দশটা ছেলেকে একেবারে খতম করে। সাত্যকি তখন কি করল জানিস তোরা? ছেলের শোকে হাপুস নয়নে কাঁদল নাকি বসে বসে? হুঁঃ! সেই পাত্র আর কি—সোজা একদিন নিজে হাতে ভূরিশ্রবার মাথাটা কেটে দুখানা করে নিয়ে এলো।

সিতুর মুখখানা দেখে বন্ধুদের কারো কারো মনে হয়েছিল সে-ও ওই পুরাণের সাত্যকি—কয়েক যুগ বাদে আবার এসে হাজির হয়েছে। সব বন্ধুদের এতটা সহ্য হয়নি। সুবীরের তো হয়ইনি। কিন্তু সেদিনের মত কিছু বলা সম্ভব হয়নি, কারণ সাত্যকি নামে যে পুরাণে কোনো মহারথীর আবির্ভাব ঘটেছিল তাও আগে জানা ছিল না। দলের মধ্যে সকলের থেকে বয়সে আর মাথায় কিছু বড় বলে দস্তুরমত

হিংসাই হয়েছিল তার। কিন্তু পাঁচ-নাম জড়িয়ে গুণাবলীর যে ব্যাখ্যা শুনলো তা নিছক বানানো যে নয় সেটুকু বোঝার মত বুদ্ধিও আছে। তাই সেদিনের মত শুধু টিপ্পনী কেটেই ক্ষান্ত হতে চেষ্টা করেছিল, তা নিজেকে কি তুই সেই মহাভারতের বীর ভাবিস নাকি ?

নামের সার্থকতা বুঝিয়ে দিতে পেরে সিতু পরিতুষ্ট। পুরাণের সাত্যকির মতই চতুর জবাবও তাই মুখে এসে গেছল। বলেছিল, তা কেন, এ যুগের বীরদের নাম তো সুবীর হয়।

তাৎপর্য থাক না থাক, চটপটে জবাব শুনে অন্য বন্ধুরা হেসে উঠেছিল। তার ফলে সুবীরের দ্বিগুণ রাগ হয়েছিল। আর সেই রাগেই সে পুরাণের সাত্যকি সম্পর্কে একটু অনুসন্ধানে তৎপর হয়েছিল। আশাতীত ফলও পেয়েছে। পরের আসর সুবীর মাত করেছে।

সাত্যকি নামের মহিমা-বর্ণনায় সিতুর ভাবগত অতিরঞ্জন হয়ত ছিল, সজ্ঞানে পুরাণগত তথ্যের বিকৃতি সে কিছু ঘটায়নি কিন্তু পুরাণের সাত্যকিচরিতের বিকৃত দিকটাও তেমনি ভারী যা সিতুর অজ্ঞাত। সেই দিকটাই হাতের মুঠোয় নিয়ে সুবীর তাকে নাকের জলে চোখের জলে করতে চেয়েছে। সকলের সামনে তার বুকের ওপর একটা বিষাক্ত তীর ছুঁড়েছে যেন সুবীর।—কি রে শিনির ছেলে মহাবীর সাত্যকি, ওই নামের গর্ব করতে লজ্জাও করে না তোর! অ্যাঁ? আমরা হলে যে লজ্জায় মরে যেতাম রে! শেষকালে কিনা সকলে মিলে এঁটো বাসন-পেটা করে মারল তোকে! ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা—

সাত্যকি অবাক, বন্ধুরাও অবাক। সুবীর আনন্দে ডগমগ। অন্য বন্ধুদের দিকে চেয়ে সোৎসাহে বলে উঠল, ও খুব চালিয়াতি করে গেল সেদিন, কেমন বীরপুরুষ ছিল সাত্যকি জানিস তোরা? দাদুর মহাভারত আমি নিজে পড়ে দেখেছি, তার আগে দাদুর কাছে শুনেছি। ভূরিশ্রবা যুদ্ধের পাঁচ দিনের দিন সাত্যকির দশ ছেলেকে খতম করেছিল আর চৌদ্দ দিনের দিন সাত্যকিকে যুদ্ধে হারিয়ে মাটিতে ফেলে পায়ে করে থেঁতলেছিল। মনের সুখে থেঁতলে শেষে তলোয়ার বার করে সাত্যকির মাথা কাটতে গেছল। নির্ঘাত কেটে ফেলত, বুঝলি ?

সিতু নির্বাক হঠাৎ রাগে ফুঁসছে। এক বর্ণও বিশ্বাস করেনি, কিন্তু পুরাণের সাত্যকির বদলে সুবীর যেন তাকেই মাটিতে ফেলে থেঁতলাচ্ছে। মিথ্যে বলে রুখে ওঠার আগে তুলু অতুল ওরা সুবীরের উদ্দীপনার ইন্ধন যোগাল।—কেটে ফেলে নি? ফেলত ?

হ্যাঁ, কাটবে কি করে, অর্জুন বেইমানী করল যে! অর্জুন যেই দেখে সাত্যকির

মাথা যায়-যায় অমনি যুদ্ধের নিয়ম ভেঙে তীর ছুঁড়ে ভূরিশ্রবার সেই তলোয়ার-ধরা ডান হাতটা দিলে কেটে।

সকলে শুনছে, স্তব্ধ রাগে সিতুও শুনছে।

সুবীর বলল, ভূরিশ্রবাই সত্যিকারের বীর ছিল, বুঝলি? অর্জুনের এই বেইমানী দেখে দিলে সব অস্ত্র ফেলে আর যাচ্ছেতাই করে বকলে অর্জুনকে। তারপর বাঁ হাতে মাটিতে শর পুঁতে-পুঁতে আসন বানিয়ে তার ওপর বসে উপোস করতে লাগল। বোঝ একবার, এমন অন্যায় যারা করে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতেও ঘেন্না—তার থেকে যুদ্ধের জায়গায় বসেই উপোস করে মরবে।

বন্ধুরা উদ্‌গ্রীব। সিতু স্তব্ধ। সে এখনও বিশ্বাস করছে না, কিন্তু সুবীর এভাবে বানিয়ে বলছে কি করে ভেবে পাচ্ছে না।

ওদিকে সিতুর বীর সেনাপতি সাত্যকির অবস্থা কি জানিস? সুবীরের চোখে-মুখে প্রায় নৃশংস উল্লাস, বলে গেল, ভূরিশ্রবার পায়ের থেঁতলানোর চোটেই একেবারে অজ্ঞান—অজ্ঞান হয়ে মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছিলেন। ভূরিশ্রবা যখন শরাসনে উপোসে বসেছে তখন তার জ্ঞান ফিরল। বীরপুরুষ তখন গা-ঝেড়ে উঠে দেখে ভূরিশ্রবার হাতে অস্ত্র নেই—তীরের আসনে বসে আছে। কাপুরুষের মত ওই সুযোগে সে তলোয়ার নিয়ে ছুটে গেল। সকলে বারণ করলে, কিন্তু বীর সেনাপতি এ-রকম সুযোগ ছাড়ে কখনো! কারো কথা না শুনে নিরস্ত্র লোকটার মাথা কেটেই নিল। আর সিতু বলে কিনা এটাই মস্ত প্রতিশোধ।

সুবীর এখানেই থামেনি। তার তহবিলে আও কিছু হুল ছিল।—তারপর আরও কত গুণ মহাভারতের বীর সাত্যকির শোন—পাঁড় মাতাল ছিল লোকটা, জল খেত কিনা সন্দেহ, শুধু মদই খেত। মাতাল অবস্থায় কৃতবর্মাকে তলোয়ারের এক ঘায়ে দিলে সাবড়ে, তারপর যাদবদেরও মারতে লাগল। ভোজরা আর অন্ধকরা তাতে এয়সা রেগে গেল যে, দিলে চিরকালের মত তার বীরত্ব ঘুচিয়ে। খেতে-টেতে বসেছিল বোধ হয় তখন তারা, সেই এঁটো বাসন দিয়েই রাম পিটুনি। সে কি যে-সে পিটুনি, পিটুনির চোটে সাত্যকি একেবারে অক্কা—

কি-রকম অক্কা দেখাবার জন্যেই হাত-পা ছড়িয়ে দাওয়ার ওপর শুয়ে পড়েছিল সুবীর।

মিথ্যে মিথ্যে মিথ্যে মিথ্যে! সেই মুহূর্তে টুঁটি ছিঁড়ে নেবার মত করেই সিতু তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

এ-রকম আচমকা আক্রমণের জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না, সুবীর নিজেও না! সকলেই হকচকিয়ে গেছল। কিন্তু সুবীরও ছাড়েনি বা কেউ ছাড়িয়েও দেয়নি।

ধস্তাধস্তি লপটা-লপটি রাস্তা পর্যন্ত গড়িয়েছিল।

সিতুর ওই রকম মারাত্মক ক্রোধের পিছনেও একটাই কারণ। তার শক্তির কল্পিত দুর্গ ধূলিসাৎ করার উপক্রম করেছিল সুবীর। ওটাতে আঘাত পড়লে তার অস্তিত্বের ওপর আঘাত পড়ে। মারামারির দুই-একদিন পর মহাভারতের সাত্যকির পূর্ণ সমাচার জানার আগ্রহে সেও তৎপর হয়েছিল। ঠাকুমাকে জিজ্ঞাসা করেছে, ছোট দাদুকেও জিজ্ঞাসা করেছে। তাঁরা কেউ পছন্দমত জবাব দিতে পারেননি। ঠাকুমার মুখে তো শুধু শুধু সেই একঘেয়ে প্রশংসার কথাই শুনেছে। মহাভারত একখানা তাঁরও আছে। সিতু সেটাই খুলে বসেছে শেষ পর্যন্ত। আর তারপর হতাশ হয়েছে, ঠাকুমা বাবা-মা—যারাই তার নামের জন্য দায়ী, সকলের ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছে। ওই নামের ওপর সুবীর কালি একটু বেশি লেপেছে বটে কিন্তু বানিয়ে কিছুই বলেনি। কেন যে এ-রকম একটা নাম রাখা হয়েছিল তার, আশ্চর্য! আর নামটা এখনও বদলানো যায় কিনা সে-কথাও ভেবেছে।

এমনি নানান ভাবনা দিয়েই শক্তির কাল্পনিক দুর্গটা সর্বদা সুরক্ষিত করতে চেয়েছে সে। নিজেরই অনেকগুণ বড় একটা চেহারা সামনে ধরে রাখতে না পারলে বাবা-মায়ের মনোযোগের অভাবজনিত অপুষ্ট সত্তার অভাব-বোধ ঘুচবে কি করে? সেই বড় চেহারা গড়ার উপাদানও বাইরে থেকেই সংগ্রহ করেছে। বাইরের দিকে চোখ তাকালেই তো বাহাদুরি দেখাবার উপকরণ চোখে পড়ে। প্রয়োজনের প্রতি ক্ষেত্রে মানুষকে লাইনে দাঁড়াতে দেখে, লাইনের অগ্রভাগ দখলের চেষ্টায় মারামারি করতে দেখে। মনে মনে সিতু তক্ষুনি এক বিশাল লাইন কল্পনা করে, শেষ নেই এত বড়!

লাইন আর সেই লাইনের অবধারিত সর্বপ্রথম মানুষটি সে নিজেই—যার দাপটে অন্য কারো মুখে টুঁ শব্দটি নেই। পাড়ার বড় ছেলেরা দল বেঁধে মারামারি করে বেপাড়ার দলের সঙ্গে। সোডার বোতল ছোঁড়ে অ্যাসিড বালব ছোঁড়ে, লাঠি-ছোরা নিয়েও ছোটে। বছরে দু-চারবার অন্তত হুলস্থূল কাণ্ড বেধে যায়। প্রত্যক্ষ রোমাঞ্চ জুড়িয়ে যাবার পর সিতুর কল্পনার ঘোড়া ছোটে। পাড়ার অপ্রতিহত সর্দারের আসনে নিজেকেই বসায় সে। তারপর বেপাড়ার দলকে যথেচ্ছ শিক্ষা দেয়—এমন চমকপ্রদ শিক্ষা যা তাদের মনে থাকতে পারে। এই জন্যেই স্বচক্ষে ব্যাঙ্ক লুঠের ডাকাতদের দেখে এত রোমাঞ্চ তার। ডাকাত দলের সর্দারের সঙ্গে একটা মানসিক একাত্মতা গড়ে উঠেছিল বলেই মায়ের সেই কথায় অমন চমকে উঠেছিল সে। ধরা-পড়ার খবর পেয়ে মা সরোষে বলে উঠেছিল, বেশ হয়েছে, এবারে ফাঁসি হবে।

শুধু এই ব্যাপারে নয়, বড় হতে হলে অনেক কিছুই বোঝা দরকার আরো, অনেক কিছুরই অস্পষ্টতা কাটিয়ে ওঠা দরকার। বড় ছেলেরাও আলাদা রকে বসে আড্ডা দেয়, রাজা-উজীর মারে। খেলার গল্প করে, সিনেমার গল্প করে। সিতু লক্ষ্য করেছে, মেয়েদের পাশ কাটাতে দেখলে তাদের হাবভাব বদলায়। চোখে চোখে চাপা ইশারা খেলে, পরে কি-সব চটুল মন্তব্যে মেতে ওঠে। সিতু সঠিক বোঝে না, কিন্তু বোঝার আগ্রহ কম নয়। পাড়ার মধ্যেই দুই-একটা ভালবাসাবাসির ব্যাপার ঘটে। কোন্ বাড়ির ছেলে আর কোন্ বাড়ির মেয়ে নিখোঁজ তাই নিয়ে চাপা উত্তেজনা দেখা যায়—ছেলের দলের আর মেয়ের দলের রোমাঞ্চকর আলাপ কানে আসে। সিতুরা ছোটর দলে, তাদের নীরব বিস্ময় বা কৌতূহল চোখে পড়েও পড়ে না কারো। এ ছাড়াও নীলিদিরা চুপিসাড়ে নিজেদের মধ্যে কি সব আলোচনা করে আর হাসাহাসি করে। সিতুরা তাদের চোখে ছেলেমানুষ, শুনে ফেললেও কিছু বুঝেছে ভাবে না। না বুঝলেও সিতু অন্তত আবছা কিছু রহস্যের সন্ধান পায়। হাঁ করে গিলতে দেখলে নীলিদি বা আর কেউ হয়ত হাসি চেপে ধমকে ওঠে, এই ছেলে, কি শুনছিস—যা পালা এখান থেকে।

ফলে সিতুর চোখে রহস্য ঘনীভূত হয়ে ওঠে, মেয়েদের দিকে চেয়ে চেয়ে রহস্য আবিষ্কার করতে চেষ্টা করে সে। না পারা মানেই তো ছেলেমানুষ থেকে যাওয়া। শুধু নীলিদিদের নয়, মায়ের দিকে চেয়েও কত সময় রহস্য বুঝতে চেষ্টা করে সে। মাকে দেখতে তার খুব ভালো লাগে আর খুব সুন্দর লাগে। তবু পাড়ার ছেলেরা গোপনে আর মেয়েরা খোলাখুলি মায়ের চেহারার এত যে প্রশংসা করে, তাও প্রায় রহস্যের মতই লাগে তার। নিজেকে বড় ভাবার তাগিদে এই রহস্য নিয়েও সে মাথা ঘামায়। আর, একদিন তো বলতে গেলে ওই সুবীরই চোখ খুলে দিয়েছিল তার। নইলে দুপুরের নিরিবিলিতে বস্তিঘরের মেয়েদের কত সময়েই তো রাস্তার কলে চান করতে দেখেছে, চোখে তো কিছু পড়েনি। সুবীরই একদিন পাঁজরে খোঁচা দিয়ে দেখাল তাকে, কেমন বেহায়ার মত চান করছে দেখ্—

সিতু দেখেছে, প্রায় মেঘনার বয়সী আর তার মতই মোটাসোটা এক মেয়েলোক চান করছে। ভাল করে লক্ষ্য করেও সিতু বেহায়াপনার নজির ঠিক ধরে উঠতে পারছিল না।—কেন, কি হয়েছে?

গলা খাটো করে ধমকের সুরে সুবীর বলেছিল, আঃ, কি-সব দেখা যাচ্ছে দেখছিস না!

অতঃপর সিতু দেখেছে। রহস্যের পর্দা খানিকটা নড়েছে।...নীলিদিদের এমন কি মায়েরও বুকের আঁচল খসে গেলে ঈষৎ ব্যস্ততায় সামলাতে দেখেছে।

এমনি সব ভাবনা-চিন্তার মধ্য দিয়ে সিতুর বড় চেহারাটা নিজের কাছে বেশ বড়ই হয়ে উঠেছিল। ফলে শক্তির কাল্পনিক দুর্গটাও প্রায় দুর্ভেদ্য বাস্তবই ভাবত সে। কিন্তু মা তাকে দূরে সরানোর সঙ্গে সঙ্গে সেটা ভেঙে-চুরে খান-খান হয়ে গেল। তার আশ্রয়টুকু গেল যেন। সেই অনুভূতিপ্রবণ নিরাপত্তার অভাববোধ চারিদিক থেকে ছেঁকে ধরল তাকে। বাইরে থাকার নামে এজন্যেই তার পায়ের নীচের মাটি দুলে উঠেছিল।

পরের ছ মাসের মধ্যেও নতুন পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারল না সিতু। ভিতরে ভিতরে আবার একটা শক্তির দুর্গ গড়ে তুলতে না পারা পর্যন্ত সে অসহায়। এই পরিবেশে তার সুযোগ কম।

রাগ তার সব থেকে বেশি মায়ের ওপর।

ছ মাসের মধ্যে বারতিনেক তাকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আসার সময় প্রতিবার তার ভিতরটা নিঃশব্দে আর্তনাদ করেছে। আরও বেশি পরিত্যক্ত মনে হয়েছে নিজেকে। ফলে মায়ের সঙ্গে দুর্ব্যবহারই করেছে সে। ঠাকুমা জেঠু ছোট দাদু এমন কি শামু ভোলা মেঘনার সঙ্গেও ডবল ভাব তার। শুধু মায়ের সঙ্গে নয়। যাবার সময় থমথমে মুখে মাকে শুধু লক্ষ্যই করেছে দূর থেকে। কাছে আসতে চায়নি।

এ ছাড়া মাসে বার দুই অন্তত জ্যোতিরাণী এসেছেন ছেলেকে দেখতে। প্রথম প্রথম মামাশ্বশুরকে সঙ্গে এনেছেন। ছেলে তার সঙ্গে স্কুলের খেলাধুলোর খাওয়া-দাওয়ার গল্প করেছে। হাবভাবে মা-কে সে বোঝাতে চেষ্টা করেছে বাড়ির থেকে এখানে সে ঢের-ঢের ভালো আছে।—এত ভালো আছে যে, জীবনে বাড়িতে আর না গেলেও চলে। কথাবার্তা সব ছোট দাদুর সঙ্গে।

এর পর ইচ্ছে করেই বার দুই একলা এসেছেন জ্যোতিরাণী। ছেলের মুখ বিমর্ষ বিরস। কিছু জিজ্ঞাসা করলে বা খোঁজখবর করলে ঘাড় নেড়ে জবাব দেয়। খানিক বাদেই প্যান্ট-জামা বদলে প্রস্তুত হয়, খেলতে যাবে। মুখ দেখে জ্যোতি-রাণীর সন্দেহ হয় তিনি চলে যাবার পর সত্যি খেলতে যাবে কিনা।

একবার শমীকে সঙ্গে এনেছেন। ভেবেছিলেন ওকে দেখে খুব খুশি হবে। আর শমী তো খুশিতে নাচতে নাচতে এসেছিল। কিন্তু ফিরেছে বিমর্ষ মুখে। কারণ এত দিন পরে দেখেও সিতুদা তার সঙ্গে হাসিমুখে খেলা করেনি, গল্প করেনি, এমন কি ভালো ব্যবহারও করেনি।

ফিরেন যে জ্যোতিরাণীও সেটা লক্ষ্য করেছেন।

ভালো ব্যবহার সিতু করবে কি করে। মায়ের সঙ্গে হাসিমুখে শমীকে আসতে দেখে তার ভিতরটা খচখচ করে উঠেছে।···মা তাকে একটুও ভালবাসে না, ভালবাসলে এভাবে তাকে দূরে সরিয়ে দেয় কি করে। কিন্তু ওই আদরের মেয়েকে দিব্যি ভালবাসে বলে ধারণা। সিতু বাড়ি থাকে না, এই সুযোগে ওই মেয়ে নিশ্চয় মা-কে আগের থেকে অনেক বেশি দখল করেছে—করছে। এই সম্ভাবনাটা সব থেকে বেশি অসহ্য। মা সামনে বসে না থাকলে ওকে ধরে সিতু এখানেও দুই-এক ঘা বসিয়ে দিতে পারত। হাতে যা পারেনি মুখে তাই করেছে। শমীর সব প্রশ্ন আর কৌতূহলের জবাবে খেঁকিয়ে উঠেছে।

বেগতিক দেখে নিজে না এসে একলা মামাশ্বশুরকে পাঠিয়েছেন জ্যোতিরাণী। কিন্তু ফিরে এসে তিনি যে খবর দিয়েছেন তাতেও অবাক হয়েছেন। মামাশ্বশুর বলেছেন, তুমি যাওনি বলে ছেলেটার মন খারাপ হয়েছে—ভালো করে কথাই কইল না।···আশা করে থাকে তো, ছুটি-ছাটার দিনে নিজেই যেও। তারপর হাসিমুখে জানিয়েছেন, ব্যাটার পেটে পেটে হিংসে আছে, কম করে পাঁচ-সাতবার জেরা করেছে, শমী আজকাল প্রায়ই আসে কিনা, সপ্তাহে কদিন আসে—মা গাড়ি পাঠিয়ে আদর করে তাকে নিয়ে আসে কিনা।

কিন্তু এরপর যখন জ্যোতিরাণী এসেছেন—ছেলের সেই একই মুখ। বরং আরো বেশি অসহিষ্ণু আরো বেশি ক্ষুব্ধ। তিন কথার একটা জবাব মেলে না। শেষে জ্যোতিরাণী বলেছেন, আমি এলে তোর যদি রাগ হয় আর ভালো করে কথাই না বলিস, এবার থেকে তাহলে শুধু ছোট দাদুকেই পাঠাব—তাহলে ভালো লাগবে তো?

খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে সিতু বলেছে, কাউকে পাঠাতে হবে না!

ছমাসের মধ্যেও ছেলের এখানে মন বসল না কেন জ্যোতিরাণী ঠিক বুঝে ওঠেন না। যখনি আসেন শুকনো মুখ দেখেন, আর একটু রোগাও হয়েছে মনে হয়।

মন বসেনি কারণ সিতু এখানে নির্বাসন দণ্ড ভোগ করছে। সেই অনুভূতি-প্রবণ নিরাপত্তাবোধের একটা শূন্যতা সর্বদা হাঁ করে আছে যেন। সেই শূন্যতা তাকে গিলতে আসে। সকালে গিলতে চায়, দুপুরে গিলতে চায়, বিকেলে গিলতে চায়, আর রাত্রিতে তো প্রায় তাকে ধরেই ফেলে এক-একদিন। সিতুকে যুঝতে হয়। হয় বলেই মুখ শুকনো, ঠোঁট শুকনো, জিব শুকনো। প্রতি দিনের থেকে প্রতিটি দিন অসহ্য তার কাছে।

হঠাৎ এই নির্বাসন দণ্ডের মেয়াদ ফুরাল।

ছুটি-ছাটা কিছু নেই, এক সকালে ছোট দাদু এসে হাজির। কিন্তু নির্বাসনের মেয়াদ যে একেবারেই ফুরাল সেটা তখনও কেউ জানে না। ছোট দাদুও না, সিতুও না। আপাতত পনেরো-বিশ দিনের জন্য বাঁচতে চলেছে সিতু। ঠাকুমার খুব অসুখ তাই নীচের অফিসে কথাবার্তা বলে আর দরখাস্ত দিয়ে ছোট দাদু পনেরো বিশ দিনের জন্য তাকে নিতে এসেছে।

···ঠাকুমাকে সিতু ভালই বাসে। খুবই ভালবাসে। তবু এই হঠাৎ অসুখটার জন্যে মনে মনে ঠাকুমার প্রতি সে কৃতজ্ঞ। ঠাকুমার বিবেচনা আছে। আসতে আসতে ছোট দাদুর কাছে শুনেছে, ঠাকুমা নাকি তাকে দেখার জন্য বায়না ধরেছে, এমন কি এক্ষুনি তাকে নিয়ে যাবার জন্য বাবাকেও বলেছেন।···ভুগছে তো অনেক দিন ধরেই, এ-রকম বায়না বুড়ী মাঝে-সাঝে করলেই তো পারে। এবারে সে চুপি-চুপি সেই পরামর্শই দিয়ে আসবে।

কিরণশশী চোখ বুজলেন।

অনেক দিন ধরে ভুগছিলেন, সময় ঘনিয়েছে এ-কথাও প্রায়ই বলতেন। তবু মৃত্যু এত কাছে এগিয়েছে এ কারো মনে হয়নি। এমনি ভুগতে ভুগতে আরো দু-চার বছর কেটে যাওয়াও অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। চিন্তিত হবার মত বা আড়ম্বর করার মত ব্যাধির প্রকোপও খুব দেখা যায়নি। দেহগত জ্বালাযন্ত্রণা মুখ বুজে সহ্য করতেন। মুখ খুলতে দেখা যেত শুধু বউয়ের ওপর মেজাজ বিগড়োলে।

সিতু যাবার পর থেকে মেজাজ বিগড়েই ছিল। কদিন ধরে নাতির জন্যে কান্নাকাটি করছিলেন খুব। কিন্তু জ্যোতিরাণীর কাছে নয়। ছেলের কাছে, কালীনাথের কাছে, গৌরবিমল এলে তাঁর কাছে। কেঁদেছেন, অনুনয় করেছেন, আবার রাগও করেছেন।—ছেলেটাকে এখনো আনলি না তোরা, কবে আছি কবে নেই, কাছে দেখবও না কটা দিন?

জ্যোতিরাণীর সামনে চুপ। তখন অভিমানটাই বড়।

তাঁর যাবার সময় হয়েছে তখনো ভাবেননি জ্যোতিরাণী। তবে দেখতে দেখতে শরীর বেশ খারাপ হয়েছে বটে। খাওয়ার এত অরুচিও আগে দেখেননি। সমস্ত দিনরাতও উপোসে কাটল দুই-একদিন। শিবেশ্বরকে বলেছেন। তক্ষুনি আরো বড় ডাক্তার তলব করা হয়েছে। শেষ সময়ের আভাস তিনিও দেননি। কি কষ্ট হচ্ছে জিজ্ঞাসা করতে বিড়বিড় করে বলেছেন, নাতিটাকে আনার ব্যবস্থা করো বাবা, আর কিছু কষ্ট নেই।

শুনে শিবেশ্বর জ্যোতিরাণীর দিকে তাকিয়েছেন। চাউনিটা গম্ভীর, অপ্রসন্ন

ছেলেকে আনা দরকার সেটা জ্যোতিরাণীও সেই রাতেই অনুভব করেছেন। মামাশ্বশুরকে বলেছেন, কাল সকালেই গিয়ে সিতুকে নিয়ে আসুন।

সিতু এসেছে। ঠাকুমার যে অসুখের প্রতি সে কৃতজ্ঞ, তিন দিন না যেতে সেটা যে এমন এক ওলট-পালট কাণ্ড ঘটিয়ে যাবে কল্পনাও করেনি। এসে অবধি বুড়ীকে আগের থেকে একটু বেশি নিঝুম মনে হয়েছে শুধু তার। কথাবার্তা কানে ঢোকেও না যেন সব। ঘুমে পেয়েছে ঠাকুমাকে। গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে ঘুমোয়, ঘুম ভাঙলে গায়ে হাত বোলাবার জন্যে আবার খোঁজে তাকে। এই তিনটে দিন খুব বেশিক্ষণ সে থাকতেও পারেনি ঠাকুমার কাছে। এতদিন অদর্শনের ফলে সকাল-দুপুর আর বিকেলের বেশির ভাগ সময় সুবীর-দুলুর সঙ্গে কেটেছে। তাকে ঘন ঘন নিয়ে আসার ব্যাপারে ঠাকুমার সঙ্গে পরামর্শটা সময় বুঝে ধীরে-সুস্থে করলেই হবে ভেবেছিল।

কিন্তু সময় আর পেল না। চার দিনের দিন সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত বাড়িসুদ্ধ সকলকে দিশেহারার মত ছোটাছুটি করতে দেখেছে, ঠাকুমাকে নিয়ে ব্যস্ত হতে দেখেছে, একসঙ্গে দুটো তিনটে ডাক্তার আসতে দেখেছে।

আর ঠাকুমার শ্বাসকষ্ট দেখেছে। আর রাত প্রায় বারোটার সময় তাঁকে একেবারে স্তব্ধ হতে দেখেছে।

জেনেছে এরই নাম মৃত্যু। ঠাকুমা আর জাগবে না, আর কথা বলবে না।

মৃত্যুর আগে যদি অবাঞ্ছিত কোন দাগ পড়ে, সেই দাগ নাকি ক্ষতর মতই লেগে থাকে। কথাটা সম্ভবত সত্যি।

শিবেশ্বরের বিক্ষিপ্ত চিত্তে এই গোছেরই একটা দাগ পড়েছে। এই রাতেই মৃত্যু আসছে কেউ জানত না। শিবেশ্বর না, জ্যোতিরাণী না, কালীনাথ না, গৌরবিমল না। কিন্তু এই না-জানার ভিতর দিয়ে মহাযাত্রিণীর প্রতি অবহেলার একটা নীরব অথচ মর্মান্তিক অভিযোগ জ্যোতিরাণীর মাথায় এসে পড়েছে।

•••এও যোগাযোগ।

বেলা দুটোর সময়ও দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে শাশুড়ীকে ঘুমুতে দেখে গেছেন তিনি। দু'দিন ধরে অবস্থা অবশ্য সন্দেহজনকই দেখা গেছে। তবু অবস্থার অবনতি কিছুই চোখে পড়েনি। বাড়ির কর্তা আর কালীদাও মোটামুটি ভালো দেখেই বেলায় অফিসে বেরিয়েছেন। মামাশ্বশুরও কাজে গেছেন।

এই সময়ে মিত্রাদির টেলিফোন। মিত্রাদির অসহিষ্ণু উত্তেজিত গলা।—কই তুমি এলে না এখনো, বাড়িতেই বসে আছ—আর কতক্ষণ আমি এভাবে থাকব!

জ্যোতিরাণী হতভম্ব।—কেন? কি হয়েছে?

কি হয়েছে।···সেই বেলা এগারোটায় টেলিফোন করেছি, শিবেশ্বরবাবু এ পর্যন্ত তোমাকে কিছু বলেননি!

মিত্রাদির গলায় কান্নার স্বর। কিছু একটা ঘটেছে বোঝা গেল। জ্যোতিরাণী থমকালেন একটু।—না তো···মায়ের শরীর ভালো না, ভুলে গেছেন বোধ হয়।··· কি হয়েছে?

বীথির, ইয়ে—

আর শোনা গেল না। মিত্রাদি চুপ হঠাৎ।

বীথির কি হয়েছে? বলছ না কেন? জ্যোতিরাণী ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

এবারে খুব চাপা গলা শোনা গেল মিত্রাদির।—টেলিফোনে বলতে পারছি না, ঘরে লোক এসে গেছে। বিশেষ কিছুই হয়েছে, তুমি এসো শিগ্গীর, আমার মাথা খারাপ হওয়ার দাখিল—দেরি করো না।

ওধার থেকে রিসিভার রাখার শব্দ। জ্যোতিরাণী বিমূঢ় খানিকক্ষণ। তারপরেই আতঙ্ক। কি হয়েছে বীথির? কি হতে পারে? টেলিফোনে বলা গেল না কেন? হঠাৎ সাঙ্ঘাতিক কিছু অসুখ-বিসুখ হয়ে থাকলে বলা যেত। তা নয় নিশ্চয়। আর কি হতে পারে? বেলা এগারোটায় টেলিফোনে কি জানিয়েছিল মিত্রাদি···আর ঘরের লোকও মিত্রাদির টেলিফোন সম্পর্কে কোনরকম উচ্চবাচ্য করল না কেন?

বেরোবার আগে মেঘনাকে শাশুড়ীর ঘরে বসিয়ে রেখে গেছলেন জ্যোতিরাণী।

গাড়িতে বসেও আতঙ্ক কমেনি জ্যোতিরাণীর। কি দেখতে চলেছেন প্রভুজীধামে জানেন না। বীথির কপালে জলজলে সিঁদুরের টিপ-পরা সেই স্টেশনের মুখখানাই এতদিন বাদে আবার চোখের সামনে দেখছেন তিনি। মিত্রাদির এই তাড়া আর এই গলা কেন? গোটা প্রভুজীধামে ওই এক মেয়েই বোধ হয় সত্যিকারের ভালবাসা পেয়েছে মিত্রাদির। উঠতে বসতে ফিরতে তার দিকে চোখ। তার কি হল? কি হতে পারে? নিজের ওপর দিয়ে সাঙ্ঘাতিক কিছু ঘটিয়ে বসল মেয়েটা? জ্যোতিরাণী শিউরে উঠলেন। কিন্তু পরে সে-রকম কিছুও মনে হল না। পদ্মার শোক ভোলবার নয় বটে, কিন্তু মিত্রাদির দাপটে পড়ে অনেকটাই ভুলতে হয়েছিল। আড়ালে আবডালে মিত্রাদি ইদানীং বীথির নামে উল্টো রকমের দুই-এক কথা বলতে শুরু করেছিল। সন্ধ্যার পরেও সেদিন ওকে ফিরতে না দেখে রাগ করেই বলেছিল, একটু বেশি এগিয়ে যাচ্ছে মেয়েটা,

এবারে রাশ টানতে হবে—প্রায়ই দেরি করে ফিরতে, বেশি কিছু বললে একটু-আধটু ফোঁসফাসও করে আজকাল. গুণ বাড়ছে—

শুনে কেন যেন অস্বস্তি বোধ করেছিলেন জ্যোতিরাণী। পদ্মার শোক নিয়ে বসে থাক এ চাননি বটে, কিন্তু ঠিক এ-রকম শুনতেও চাননি। বেশি এগিয়ে যদি গিয়েই থাকে তো মিত্রাদির জন্যেই গেছে সেটা, আর মুখ ফুটে বলতে পারেননি। এগিয়ে দেবার তাড়ায় মিত্রাদির শাসন এক-একদিন মাত্রা ছাড়িয়েছে এ তিনি নিজেই দেখেছেন। সেদিনও মিত্রাদি মুখে যেটুকু ক্ষোভ প্রকাশ করুক না কেন, ভিতরে ভিতরে ওকে নিয়ে বেশ গর্ব আছে তাঁর। যে মেয়ে শোকের আসন পেতে বসেছিল একেবারে, নড়ে বসতে চাইত না, মুখ ফুটে কথা বলতে চাইত না—সে এখন দিব্যি হাসে, বেশ গুছিয়ে কথা বলে, পদস্থ জনের পদর্পণ ঘটলে সপ্রতিভ মুখে প্রতিষ্ঠান দেখায়, এ পর্যন্ত চাঁদাও কম আদায় করেনি। সম্প্রতি কোন্ এক বড়লোকের কাছ থেকে আট-দশ হাজার টাকার ডোনেশান পাওয়ার আশ্বাস পাওয়া গেছে নাকি—খুশিতে আটখানা হয়ে বীথির কেরামতির কথা জানিয়েছিল মিত্রাদি। প্রথম যোগাযোগ অবশ্য মিত্রাদিই করিয়ে দেয়, বীথি তারপর লেগে থেকে বেশ গুছিয়ে আদায় করে নিয়ে আসতে পারে।

পৌঁছুলেন।

গাড়ি দেখেই দারোয়ান শশব্যস্তে ফটক খুলে দিল। ভিতরে মেয়েরা কেউ বাগানে ঘুরছে, গাছের ছায়ায় বসে গল্প করছে কয়েকজন, নিয়মিত কাজেও ব্যস্ত অনেকে। জ্যোতিরাণীর চিন্তার বোঝা হাল্‌কা হল একটু, বড় গোছের কোনো অঘটন ঘটেছে বলে তো মনে হয় না। অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ছে না।

শুধু মিত্রাদির মুখখানা ছাড়া। অস্বাভাবিক গম্ভীর।

অফিস ঘরে দু চারজন মেয়ে ছিল. তাদের বিদায় করে জ্যোতিরাণীকে নিয়ে মৈত্রেয়ী চন্দ নিজের ঘরে এলেন। তারপর নিজেই আগে ধুপ করে বিছানায় বসে পড়ে বললেন, শুনেছ? শিবেশ্বরবাবু বলেছেন কিছু?

জ্যোতিরাণী মাথা নাড়লেন, শোনেননি। তারপর ঈষৎ শঙ্কিত মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে?

দুধ কলা দিয়ে আমরা কাল-সাপ পুষেছিলাম। বীথি চলে গেছে।

জ্যোতিরাণী বিমূঢ়।—কোথায়?

মরতে। মৈত্রেয়ী চন্দ সক্ষোভে বলে উঠলেন, সেই মরা মরল, আমাদের মুখে চুন-কালি দিয়ে মরল—তুমি দুঃখ কোরো না, এ-রকম মেয়ে গেছে ভালই হয়েছে।

জ্যোতিরাণী নির্বাক। মিত্রাদিকেই দেখছেন। এই ভালো হওয়াটা মিত্রাদি নিজেই বরদাস্ত করতে পারছে না বোঝা যায়।

ঘটনা শুনলেন। চালচলন ইদানীং বড় বেশি দ্রুত বদলাচ্ছিল বীথির। লোকজনের সঙ্গে মেলা-মেশা বাড়ছিল। যা করছে প্রভুজীধামের স্বার্থেই করছে ভেবে মিত্রাদি অনেক দিন লক্ষ্য করেও করেনি। পরে খটকা লেগেছে তার। বীথিকে ডেকে বুঝিয়েছে, শাসনও করেছে। শুনলে জ্যোতিরাণীর মন খারাপ হবে, তাছাড়া মেয়েটার ওপরেও মিত্রাদির মায়া পড়েছিল—তাই তাঁকে কিছু জানানো হয়নি। কিন্তু বীথি মাত্রা ছাড়িয়েই যাচ্ছিল। যে অবাঙালী লোকটি আট-দশ হাজার টাকা চাঁদা দেবে আশা করা গেছল—মেশামিশিটা তার সঙ্গেই দৃষ্টিকটু হয়ে উঠেছিল। চুপি চুপি কদিন দুপুরে বেরিয়ে গেছে, সিনেমা দেখে সন্ধ্যায় ফিরেছে। দিন-তিনেক আগে বিকেলে বেরিয়ে রাত নটায় ফিরেছিল। মিত্রাদির জেরায় পড়ে শেষে স্বীকার করেছে সিনেমায় গেছল। সেই রাতে মিত্রাদি কঠিন শাসন করেছিল তাকে, জ্যোতিরাণীকে জানিয়ে এর বিহিত করা হবে বলেছিল। ফলে দুটো দিন চুপচাপ ছিল বীথি। তারপর কাল বিকেল থেকে নিখোঁজ। ফিরবে আশা করে রাত দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে মিত্রাদি। তারপর গাড়ি নিয়ে খুঁজতে বেরিয়েছে। কিন্তু আন্দাজে খুঁজবেই বা কোথায়, পাবেই বা কোথায়। অত রাতে আর টেলিফোন করে জ্যোতিরাণীর মাথায় ভাবনার বোঝা চাপায়নি। সকালে বেরিয়ে আবার দশটা সাড়ে দশটা পর্যন্ত খোঁজাখুজি করা হয়েছে। সেই বড়লোকের বাড়িও গেছল মিত্রাদি, না বাড়িতে নয়—হোটেলে, হোটেলেই একটা সুইট ভাড়া করে থাকত লোকটা। গিয়ে শুনল, আগের দিন সে ওখানকার বাস তুলে দিয়ে মাদ্রাজ না কোথায় চলে গেছে। মিত্রাদি বেয়ারাদের কাছে খোঁজ নিয়ে জেনেছে, হোটেলে লোকটার সঙ্গে একজন বাঙালী মেয়েকেও দেখেছে তারা।

চিত্রার্পিতের মত বসে শুনলেন জ্যোতিরাণী। মুখে কথা সরে না। অনেকক্ষণ বাদে অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে সকলে জেনেছে তো?

পাগল! চাপা আক্রোশে মৈত্রেয়ী চন্দ বললেন, ঢাক-ঢোল বাজিয়ে ওই কালামুখীর খোঁজ করেছি, না শোক করেছি, কাউকে জানতেও দিইনি। এক ড্রাইভার যদি কিছুটা আঁচ করে থাকে। এখানে সকলকে বলেছি, এক আত্মীয়ের খোঁজ পেয়ে বীথি সেখানে গেছে, কবে ফিরবে বা তারা আর ওকে এখানে পাঠাবে কিনা তারও ঠিক নেই।

গাড়ির কোণে গা ছেড়ে দিয়ে বসে আছেন জ্যোতিরাণী। তাঁর বড় একটা আশার দিক যেন পায়ে করে মাড়িয়ে দিয়ে গেছে কেউ। সব জানার পরেও এ যেন তিনি বিশ্বাস করে উঠতে পারছেন না। আর কারো ব্যাপার হলে এমন অবিশ্বাস্য লাগত না, এতটা বিচলিতও হতেন না। বসে আছেন, কঠিন মুখে লালচে আভা। মিত্রাদির মতই বীথির প্রসঙ্গ একেবারে মুছে দিতে চেষ্টা করছেন তিনি।···কিন্তু মুখে যতই রাগ দেখাক, ভিতর পুড়ছে মিত্রাদিরও, আর নিজেও তিনি পুড়ছেন—ভিতরটা দুমড়ে ভাঙছে তাঁরও।

সেই মেয়ে এই করল!

স্টেশনের সেই একদিনের দৃশ্য···সেই ঘটনা কি ভোলবার। বছর ঘুরতে চলল, কিন্তু মনে হচ্ছে মাত্র সেদিনের ব্যাপার—চোখে লেগে আছে, কানে লেগে আছে, অনুভূতির সঙ্গে মিশে আছে সেই একদিনের সব কিছু।···মাথায় খাটো ঘোমটা, কপালে আর সিঁথিতে জলজলে সিঁদুর, এক পিঠ খোলা লালচে চুল, খরখরে উদ্ভ্রান্ত চাউনি। বাঘিনীর মত ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ভদ্রতার মুখোশ-পরা এক শয়তানের ওপর—যে তাকে পিচ্ছিল নরকে টানার চেষ্টায় হাত বাড়িয়েছিল। হাতের কৌটো দিয়ে আঘাত করে করে সেই শয়তানের নাক-মুখ রক্তাক্ত করে দিয়েছিল। তার পরেও পাগলের মূর্তি বীথির, দু চোখ সে কি ধক-ধক করে জলছিল! ছুটে এসে তাঁর হাত ধরেছিল, বলেছিল, সব দিকের এত কুৎসিতের মধ্যে আপনাকে বড় সুন্দর লাগছে···আর বলেছিল, বাঁচার জন্যে এ আমরা কোথায় মরতে এলাম দিদি, কেন এলাম?

সেই মূর্তি সেই স্পর্শ সেই কথা জ্যোতিরাণী ভুলবেন কেমন করে? সেই দিনটা সত্যি, না আজ যা শুনে এলেন এটা সত্যি? দুই-ই সত্যি হয় কি করে?

···সেই বীথি এই করল?

অতটা অন্যমনস্ক না থাকলে বাড়ি ঢোকামাত্র কিছু একটা ব্যতিক্রম টের পেতেন। শূন্য পুরীতে ঢুকেছেন মনে হত। কিন্তু নিজের ঘরে এসেও বীথির কথাই ভাবছিলেন তিনি। ছেদ পড়ল মেঘনার ব্যস্ত পদার্পণে।

বউদিমণি, এই ফিরলে তুমি! ওদিকে যে হুলুস্থূলু বেধেছে, ঠাকরোন বোধ হয় চলল!

জ্যোতিরাণী বিষম চমকে উঠলেন প্রথম। সর্বাঙ্গ সিরসির করে উঠল। এতক্ষণের ভিন্ন এক নিবিষ্টতার ওপর খবরটা এমন আচমকা ঘা দিয়েছে যে, ফ্যাল ফ্যাল করে খানিক মেঘনার মুখের দিকেই চেয়ে রইলেন তিনি।

সেই অবকাশে উত্তেজিত মেঘনা ঘটনা জানাবার ফাঁকে নিজের দোষও একটু

লাঘব করে গেল।...বিকেল পর্যন্ত সে ঠাকরোনের ঘরের দোরেই ছিল আর সারাক্ষণ চোখ রেখেছিল। কিন্তু বুড়ীমা নিঃসাড়ে পড়ে আছে দেখে সে বিকেলের একটু কাজ সারতে আর গা-হাত ধুতে ঘর ছেড়ে চলে এসেছিল। ভোলাকে বলেছিল নজর রাখতে। সন্ধ্যার মুখে বাবু ফিরতে সেও পিছনে পিছনে উপরে উঠে এসেছে। বুড়ীমার ঘরে ঢুকেই বাবুরও চক্ষুস্থির, তারও। ঠাকরোন ভয়ানক ছটফট করছে আর গড়াগড়ি খাচ্ছে—মুখ দিয়ে ফেনা উঠছে, নিঃশ্বেস নিতে পারছে না, চোখ এক-একবার কপালে উঠছে—

মেঘনার মুখের কথা শেষ হল না, আত্মস্থ হয়ে জ্যোতিরাণী শাশুড়ীর ঘরের দিকে ছুটলেন।

কালীদা অক্সিজেনের নল ধরে বসে আছেন, ওপাশে মামাশ্বশুর। ঘরের মাঝখানে শিবেশ্বর দাঁড়িয়ে, অন্যধারে চিত্রার্পিতের মত সিতু। দরজার পাশে শামু আর ভোলা।

ঘরে ঢুকতে গিয়েও নীরব দুই চোখের ঝাপ্টায় জ্যোতিরাণী বাধা পেলেন যেন। শিবেশ্বরের এই চাউনি অকরুণ নিষেধের মতই প্রায়। কিন্তু তা বলে শামু-ভোলা-মেঘনার মত দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না তিনি।

একটু বাদে বাদে শিবেশ্বর চামচেয় করে মায়ের মুখে জল দিচ্ছেন। জলের পাত্রটা জ্যোতিরাণীর পাশেই। কষ্ট দেখে তিনিও একবার মুখে জল দেবার জন্য চামচের দিকে হাত বাড়িয়েছিলেন। তার আগেই শিবেশ্বর জলের পাত্রটা নিজের হাতে নিয়েছেন। জল দিয়ে পাত্রটা একটু দূরে সরিয়ে রেখে তাকিয়েছেন স্ত্রীর দিকে। অর্থাৎ এই শেষ সময়ে এটুকু তিনিই পারবেন, তিনিই করবেন।

বুকের ভিতরে কিছু একটা হচ্ছে জ্যোতিরাণীর। মুখ বুজে তার যন্ত্রণা সহ্য করছেন। কেবলই মনে হচ্ছে, একলা ঘরে এই একটু জলের জন্য শাশুড়ী অনেকক্ষণ ছটফট করেছেন। জলের পাত্রটা এই জন্যেই তার কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া হল। শেষ সময়ের এই অপরাধ জ্যোতিরাণীর নিজের কাছেও ছোট নয়।

ডাক্তাররা আরো দুই-একবার আনাগোনা করে গেল। করার কিছু নেই। এখন শুধু প্রতীক্ষা। সকলে তাই করছেন।

জ্যোতিরাণী বাদে। প্রাণপণে এখনো আশা করছেন তিনি। অনিচ্ছাকৃত ওই অবহেলার বোঝাটা প্রায় মৃত্যুর মতই অসহ্য।

কিন্তু আশা যে নেই তাও জানেন।...থেকে থেকে আর এক মৃত্যুর চিত্র চোখে ভেসেছে তাঁর। শ্বশুরের মৃত্যুর। সেদিনের কথা যেন। স্তব্ধতার সেই একই চিত্র।

মামাশ্বশুর জায়গা খালি করে দিয়েছেন। সেখানে এখন শিবেশ্বর বসেছেন।

এপাশে জ্যোতিরাণী। মাঝে শাশুড়ী।···সেবারেও শেষ সময়ে তাঁরা দুজনে দুদিকে বসেছিলেন, মাঝে শ্বশুর ছিলেন। সেবারেও একজনের অবহেলায় মৃত্যুর স্তব্ধতা ভারাক্রান্ত হয়ে ছিল। অজ্ঞাত বা অনিচ্ছাকৃত অবহেলা নয় আজকের মত। শেষ সময়ে ওই লোককে তপ্ত আক্রোশে জ্যোতিরাণীর টেনে নিয়ে আসতে হয়েছিল।···সেই অন্তিম সময়ে, তারপর দুজনে দুদিকে বসেছিলেন। নিজের অজ্ঞাতে সেদিনও জ্যোতিরাণীর দু চোখ এই সামনের মানুষের মুখের ওপর ঘুরে এসেছে এক-একবার।

···সেদিন সেই মুহূর্তেও তিনি হৃদয় খুঁজছিলেন। মনে হয়েছিল, দুজনে দুই তীরে বসে আছেন···মাঝখানে জীবন দিয়ে সেতু গড়ছেন একজন।

কিন্তু আজ কি দেখছেন তিনি? আজ তাঁর মনে হচ্ছে, দুই তীরের মাঝে যে পল্‌কা সেতুটা ছিল, তাও শেষ হতে চলল।

···সেদিনের সেই ইচ্ছাকৃত অবহেলার আর অস্তিত্ব নেই, দাগও নেই। কিন্তু আজকের এই অগোচরের অবহেলার দাগ আর বুঝি মুছবে না।

রাত্রি বারোটার কাছাকাছি সব শেষ।

সিতুর দিকে কারো চোখ ছিল না। চোখ গেল শবদেহ নেবার আগে। জ্যোতিরাণী ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন। কান্না থেমে গেল। শিবেশ্বরের গাল বেয়ে ধারা নেমেছিল। তিনিও হতচকিত। আচম্‌কা আর্তনাদ করে সিতু ঠাকুমার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। পাগলের মত দু হাতে আঁকড়ে ধরেছে তাঁকে, আগলে রাখতে চেয়েছে। সকলে বুঝি শেষ আশ্রয়টুকু ছিনিয়ে নিচ্ছে তার। তা সে নিতে দেবে না—দেবে না।

তাকে সরাবার চেষ্টায় কালীদা আর মামাশ্বশুর হিমশিম খেয়ে গেলেন। তাকে টেনে তুলে জ্যোতিরাণীর কাছে এনে দিলেন তাঁরা। কিন্তু জ্যোতিরাণীর তাকে ধরে রাখার সাধ্য নেই। এক ঝটকায় মায়ের হাত ছাড়িয়ে ছিটকে আবার ঠাকুমাকে আঁকড়ে ধরতে গেল সে। হাত বাড়িয়ে এবার শিবেশ্বর টেনে আনলেন তাকে। জোর করতে হল না। এই হাতের মুঠো সিতুর শক্তি কেড়েছে।

ঘটা করে এগারো দিনের শ্রাদ্ধ-শান্তি হয়ে গেল। শ্বশুরের সময় এর সিকিও হয়নি। অবস্থা তখন এত বড় ছিল না, যা হল তাই স্বাভাবিক বোধ হয়। তবু তফাতটা মনে এসেছে জ্যোতিরাণীর। বার বার মনে হয়েছে এটা শেষ অধ্যায়, তাই তার অবসানও এত বৃহৎ।

কাজের বাড়ির ফাঁকে ফাঁকেও ছেলের দিকে চোখ গেছে তাঁর। ঠাকুমাকে

ভালবাসত, শোক হতেই পারে। কিন্তু এত বড় উৎসবের মধ্যেও সেটা চোখে-মুখে এ-রকম থিতিয়ে থাকার কথা নয়। বিশেষ করে এই বয়সে। বাড়িতে যা হচ্ছে তার সঙ্গে ওই ছেলের খুব একটা যোগ নেই যেন। হঠাৎ-হঠাৎ চোখোচোখি হয়েছে তার সঙ্গে। চাউনিটা স্বাভাবিক লাগেনি তেমন। তাঁর দিকে তপ্ত দৃষ্টি রেখে ছেলে যেন কিছু একটা অশান্ত জল্পনা-কল্পনায় মগ্ন।

ওইটুকু ছেলের বুকের তলায় কোন্ ভীতির কাটা-ছেঁড়া চলেছে জ্যোতিরাণী ভাবতেও পারেন না।

যে গেল, সিতু তার শোক নিয়ে বসে নেই। তার নিরাপত্তার কল্পিত দুর্গটা হঠাৎ আবার ধূলিসাৎ হয়েছে। তার অনুভূতির মধ্যে যে আশ্রয়ের অভাব-বোধ বাসা বেঁধে আছে, ঠাকুমা চোখ বোজার ফলে সেটার সঙ্গেই এখন ডবল যুঝতে হচ্ছে তাকে। বাড়িতে থাকতে না দিয়ে মা তাকে অথৈ জলে ঠেলে দিয়েছে। তবু এতদিন তার কোমরে যেন একটা দড়ি বাঁধা ছিল। সেটা ঠাকুমার স্নেহের দড়ি। সেটাই বুঝি এতদিন ডুবতে দেয়নি তাকে। বার বার টেনে টেনে তুলেছে। এখন কি হবে? কে রক্ষা করবে?

এক-একটা দিন যায়, সিতুর ভিতরটা অশান্ত হয়ে ওঠে। আবার তাকে সেইখানে যেতে হবে। এদিকটা একটু ঠাণ্ডা হলেই মা তাকে আবার পাঠাবে। একটা দিন গেল মানেই একটা দিন এগিয়ে এলো। এই এগিয়ে আসাটা তার কাছে মৃত্যু এগিয়ে আসার মতই।

কল্পনায় সিতু তাই অনেক অস্ত্র শানিয়েছে। যেতে যাতে না হয় সেই অস্ত্র। মায়ের ব্যবস্থা নাকচ করে দেবার মত অস্ত্র। কিন্তু অস্ত্রগুলো কল্পনার অস্ত্রই। একটাও যে টিকবে না, তা ও ভালই জানে। অশান্ত উদ্‌ভ্রান্ত চোখে তাই মা-কে দেখে এক-একসময় লক্ষ্য করে।

মনের কথা খুলে বলতে পারে এখন একমাত্র ছোট দাদুকে। বলতে পারে, ছোট দাদু আমাকে বাঁচাও, আমাকে যেতে দিও না। বলার জন্যে উন্মুখ হয়েছে কত বার। বুকের ভিতরে ঠক-ঠক হাতুড়ি পেটার শব্দ হয়েছে। কিন্তু বলতে পারেনি শেষ পর্যন্ত। এইখানে তার গোঁ-ও বটে, গর্বও বটে। এত ভীতু সে, এটা কেউ জেনে ফেললে সবই গেল বুঝি। আর জানার পরেও যদি জোর করে পাঠানোই হয় তাকে—তখন? ছোট দাদু শুধু তার কথাই শুনবে, মায়ের কথা শুনবে না এতখানি ভরসাও তার নেই। বরং মা যখন কথা বলে, ইচ্ছেয় হোক আর অনিচ্ছেয় হোক, সকলকে তা শুনতে হয়, সেটাই দেখে অভ্যস্ত সে।

অতএব সিতু নিজের মধ্যেই অবিশ্রান্ত গুমরে চলেছে শুধু। তার এমন

ভয়াবহ সমস্যা যে এক মুহূর্তে দূর হয়ে যাবে কল্পনাও করেনি।

একরাশ ঠাসা অন্ধকারের মধ্যে দপ করে একটা জোরালো আলো জ্বলে উঠলে কি হয়? অন্ধকারের আর লেশমাত্রও থাকে না। সিতুর সব ভাবনা-চিন্তার এই গোছেরই অবসান।

তিন সপ্তাহের কিছু আগেই জ্যোতিরাণী ছেলেকে স্কুল-বোর্ডিংএ পাঠাবার কথা ভাবছিলেন। এখানকার এই ফাঁকার মধ্যে না থেকে সঙ্গী-সাথীদের পেলে বরং ভালো লাগবে মনে হয়েছিল। সাড়া দিয়ে মামাশ্বশুর ঘরে ঢুকলেন। আমতা আমতা করে বললেন, কাল তো একবার সিতুর স্কুলে যেতে হয়—

সন্ধ্যার পরে মামাশ্বশুরকে পাশের ঘরে ঢুকতে দেখেছেন জ্যোতিরাণী। আধ ঘণ্টার মধ্যে সেখান থেকে বেরিয়ে হঠাৎ এই প্রসঙ্গ শুনে বিস্মিত তিনি। কিছু না বলে চুপচাপ চেয়ে রইলেন।

শিবু তো সাফ বলে দিলে, সিতু বাড়িতেই থাকবে, আর কোথাও যাবে না। ওর ওই স্কুলে নিজে হাতে একটা চিঠিও লিখে দিল।

এমনই অবিশ্বাস্য যে, জ্যোতিরাণী হকচকিয়ে গেলেন প্রথম।

গৌরবিমল আবার বললেন, ছ-সাত মাস গেছে এ বছরটার, পরে যা-হয় করা যেত—তা কথা কানেই তুলল না, কালই ছাড়িয়ে আনার ব্যবস্থা করতে বলল। কি যে খেয়াল···

জ্যোতিরাণী নির্বাক। আর একটু অপেক্ষা করে গৌরবিমল চলে গেলেন।

খেয়াল নয় সেটা শুধু জ্যোতিরাণীই অনুভব করতে পারেন। খুব ভালো করেই অনুভব করছেন। এটা রাগ আর অনুশাসন। ছেলের ওপর নয়, তাঁরই ওপর। নাতিকে বাড়ি-ছাড়া করা হয়েছে বলে শাশুড়ী মনের কষ্টে ছিলেন। ···সেই রাগ, সেই ক্ষোভ? না আর কিছু?

···কেন ছেলেকে বাড়ি থেকে সরানো হয়েছিল সেও খুব ভালো করেই জানা আছে, জ্যোতিরাণী নিজেই জানিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও এই হুকুম। শুধু তাঁকে আক্কেল দেবার জন্যে। অনেক দিন ধরেই নিজেকে সংযমে বেঁধে রেখেছেন জ্যোতিরাণী। তবু ছেলের ব্যাপারে এ রকম অবুঝ ঘা পড়তে ভিতরে ভিতরে ছটফট করতে লাগলেন তিনি। বাইরে শান্ত।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর পাশের ঘরে এলেন। শাশুড়ী চোখ বোজার পর থেকে এ-ঘরের মানুষ রূঢ় বিচ্ছিন্নতার মধ্যে নিজেকে আগলে রেখেছেন। শয্যায় বসেছিলেন। এই পদার্পণের জন্য মনে মনে প্রস্তুতও ছিলেন সম্ভবত।

সিতুকে স্কুল-বোর্ডিং থেকে ছাড়িয়ে আনতে বলেছ?

শিবেশ্বর জবাব দেবার দরকার বোধ করলেন না।

জ্যোতিরাণী আবার বললেন, বছরের অর্ধেকের বেশি কেটে গেছে, এ-সময়ে ছাড়িয়ে আনলে ওর একটা বছর নষ্ট হতে পারে—

হলে ভয়ানক গোছের কিছু অনিষ্ট হবে ভাবছ ?

জবাব না দিয়ে মুখের দিকে চেয়ে জ্যোতিরাণী চুপচাপ অপেক্ষা করলেন খানিক। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, ওকে ছাড়িয়ে আনতে চাও কেন ?

ছাড়িয়ে আনতে চাই ও এখানে থাকবে বলে, এটুকু বুঝতে তোমার খুব অসুবিধে হচ্ছে ? ওকে নিয়ে আর তোমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই, বুঝলে ?

আরো খানিক দাঁড়িয়ে থেকে জ্যোতিরাণী বুঝতেই চেষ্টা করলেন। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

আশার যে আলোটা হঠাৎ বড় বেশি নিষ্প্রভ ঠেকছে তার ফলে জ্যোতিরাণী চোখেই শুধু ঝাপ্‌সা দেখছেন না, মাথার ভিতরে আর বুকের ভিতরেও কি-রকম যেন করছে। ঠিক এই মুহূর্তে যোঝার আর শক্তিও নেই বুঝি।

পরদিন ছোট দাদুর কাছ থেকেই সিতু জানল আর তাকে স্কুল-বোর্ডিংএ যেতে হবে না। খবরটা যেমন অবিশ্বাস্য, তেমনি দুর্বোধ্য লাগল তার কাছে। আজই নাকি ছোট দাদু তার ট্রান্সফার সার্টিফিকেট আনতে যাচ্ছে—এখানকার স্কুলেই আবার ভর্তি করা হবে তাকে, বাড়িতে থেকেই পড়বে। কালী জেঠুকে বলল, দুবেলার জন্য খুব ভালো দুজন প্রোফেসার ঠিক করতে, আর তাকে শাসালো, এই ক'মাসের মধ্যে মন দিয়ে পড়াশুনা করে ভালো পাস করতে না পারলে তোর বাপ পিঠের ছালচামড়া তুলে নেবে মনে থাকে যেন।

তখনো সিতু জানে না এমন খবরটা বিশ্বাস করবে কি করবে না। জেঠুর গম্ভীর ঠাট্টা বা মন্তব্য থেকেও বোঝা গেল না যা শুনল তা সত্যি কিনা। কিন্তু খানিক বাদেই বুঝল। সত্যিই বটে। বুঝল মায়ের দিকে তাকিয়ে। মায়ের এই মুখ দেখামাত্র অনেক কিছু স্পষ্ট তার কাছে। আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া গোছের এই ব্যবস্থা ছোট দাদুও করেনি, কালী জেঠুও না…এই মা তো নয়ই। করেছে বাবা। আর সেই ব্যবস্থা নড়চড় হবার নয় বলেই মায়ের ওই ফ্যাকাশে মুখ।

সিতু তারপর বারকয়েক দেখেছে মাকে। বুকের তলায় তার নতুন তাজা রক্তের দাপাদাপি শুরু হয়ে গেছে। চোখের কোণে চাঁপা উল্লাস, কারো দর্প প্রতিহত করতে পারার মতই চাউনিটা উদ্ধত।

ছেলের এই নিরীক্ষণের তাৎপর্য জ্যোতিরাণী কি অনুভব করতে পেরেছেন ? ভিতরটা তাঁর এত অবসন্ন লাগছে কেন ?

॥ চৌত্রিশ ॥

একে একে দুটো বছর গত হল।

দুটো বছরে জ্যোতিরাণী দু ধাপও সামনের দিকে এগোতে পেরেছেন কি? বরং পিছনের দিকে সরছেন কিনা এক-একসময় সন্দেহ হয়। কাজের সঙ্গে মিশে আছেন তিনি। কর্তব্য করে চলেছেন। আনন্দশূন্য কর্তব্য বোঝার মত। স্থির ধৈর্যে তিনি তা বহন করছেন। মাঝে মাঝে হাঁপ ধরে। মন খুলে তখন মিত্রাদির সঙ্গেই শুধু যা দুটো কথা বলেন। মিত্রাদিই এখন একমাত্র অন্তরঙ্গজন তাঁর।

মৈত্রেয়ী চন্দর উৎসাহে ভাঁটা পরেনি বটে, কিন্তু মেজাজপত্র তাঁরও ভালো না। ভালো না থাকার কারণ আছে। আরো শক্ত হাতে প্রতিষ্ঠানের বিধি-ব্যবস্থার রাশ টেনে ধরতে চান তিনি। মেয়েদের প্রতি তাঁর আচরণ আর অনুশাসন আরো অকরুণ আরো রুক্ষ! তারও কারণ আছে।

শুধু বীথি ঘোষ নয়, বীথি ঘোষের পথে আরো কেউ কেউ পা দিয়েছে।

একজন বিয়ে করেছে। দুজন নিখোঁজ হয়েছে। বিয়ে যে করেছে তাকেও অন্যদের থেকে খুব তফাত করে দেখেন না মৈত্রেয়ী চন্দ।

বিয়ে? জ্যোতিরাণীর বিবেচনায় সহানুভূতির আভাস পেয়ে মুখের ওপর ঝাঁজিয়ে উঠেছিলেন মৈত্রেয়ী চন্দ।—দুদিন বাদে চিবুনো ছিবড়ের মত ছুঁড়ে ফেলে দেবে দেখো, এসব বিয়ে আমার খুব জানা আছে।

প্রয়োজনেও জ্যোতিরাণী একটু শক্ত হতে পারেন না মিত্রাদির এই অভিযোগ। শুধু অভিযোগ কেন, মিত্রাদির সস্নেহ অনুশাসনও তিনি মুখ বুজে মেনে নেন। তার কর্তৃত্বের ওপর হাত দেন না।

নতুন বছরে বিধি-ব্যবস্থার নতুন তোড়জোড় দেখে জ্যোতিরাণী বলেছিলেন, এই দুটো বছরে আমরা কিছু এগোলাম না পেছোলাম?

মৈত্রেয়ী চন্দ কাগজ-কলম নিয়ে বসে গেছলেন। মুখ তুলে তাকিয়েছেন। তারপর দৃষ্টিটা বেশ করে তাঁর সর্বাঙ্গে বুলিয়ে নিয়েছেন। গম্ভীর। খুশির আমেজ লাগলে ঠাট্টার মাত্রা-জ্ঞান নেই এখনো। কিন্তু খুশি বা ঠাট্টা কিছুই বোঝা যায়নি। —তিনশ পঁয়ষট্টি দুগুণে কত?

কত নিজেই হিসেব করেছেন। সাতশ তিরিশ। তেমনি গম্ভীর মুখে মন্তব্য করেছেন তারপর, দু বছরে তুমি গোটাগুটি সাতশ তিরিশ দিনই পিছিয়েছ মনে

হচ্ছে। আশ্চর্য……।

নতুন কোনো অভিযোগ কিনা জ্যোতিরাণী তখনো বুঝে ওঠেননি।—আমি আবার কি করলাম।

কি করলে আয়নায় দেখো গে যাও, একচোখো ওপরঅলার যেন কাঁচা বানাবার নেশা লেগেছে।

বিরক্ত হতে গিয়েও জ্যোতিরাণী হেসে ফেলেছিলেন।

আনন্দের সঙ্গে যোগ কমই এখন। এই নির্লিপ্ত দিনযাপনের মধ্যে সকালের কাগজ খুলে সেদিন অপ্রত্যাশিত আনন্দ আর রোমাঞ্চের খোরাক পেলেন যেন।

বিভাস দত্ত প্রাইজ পেয়েছেন। কাগজে ছবি বেরিয়েছে। প্রাইজ আরো অনেকে পেয়েছেন। ছবি আরো অনেকের বেরিয়েছে। স্বাধীন সরকারের পরি-পোষকতায় সংস্কৃতির উপাসকদের এই প্রথম স্বীকৃতিলাভ। প্রাক্-স্বাধীনতায় বিদেশী শাসনের ভ্রূকুটি তুচ্ছ করেও দেশের দিকে চোখ রেখে সৃষ্টির উপাসনা করেছেন যাঁরা এই সম্মান তাঁদের প্রাপ্য। সংস্কৃতির বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে সাহিত্যের পুরস্কার পেয়েছেন বিভাস দত্ত।

জ্যোতিরাণী সাগ্রহে তাঁর খবরটা পড়লেন আর বারকয়েক তাঁর ছবিটাই দেখলেন।

চার হাজার না পাঁচ হাজার টাকার পুরস্কার। টাকার অঙ্কটা বড় কিছু নয়। এই স্বীকৃতিলাভের সঙ্গে জ্যোতিরাণী যেন প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। পুরস্কার পেয়েছে দুর্ভিক্ষের কালে লেখা বিভাস দত্তর সেই বই।

……শ্বেতবহ্নি!

বিদেশী সরকার যে বই বাজেয়াপ্ত করেছিল। যে বই লেখার ফলে বিভাস দত্তর জেল হয়েছিল। যে বইয়ের উৎসর্গের পাতায় জ্যোতিরাণীর নাম লেখা।

বইটা বার করে আর একবার ভালো করে পড়বেন ভেবেছিলেন। কিন্তু পড়া আর হয়ে ওঠেনি।

কাগজ ফেলে তক্ষুনি টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিলেন। নম্বর ডায়েল করলেন। তারপরেই সঙ্কোচ। দেখাসাক্ষাৎ আজকাল আরো কমেছে। টেলি-ফোনের যোগাযোগও। এই একজনের কাছ থেকে জ্যোতিরাণী নিজেকে গুটিয়ে রেখেছেন সেটা অস্পষ্ট নয় আদৌ। শমীর কাছেও নয়। বছরখানেক আগে ঠোঁট ফুলিয়ে জিজ্ঞাসা করে বসেছিল, কাকুর সঙ্গে তোমার ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে?

জ্যোতিরাণী থমকেছিলেন। তারপর বলেছেন, আমি কি তোর মত ছোট মেয়ে যে ঝগড়া হবে।…কেন?

কাকু আজকাল আসতেই চায় না, বেশি বললে রেগে যায়।

লেখা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, বেশি বলতে যাস কেন ?

মেয়েটা বোকা নয়। এখন এগারো পেরুতে চলল, বুদ্ধি আরো পেকেছে। কাকুর প্রসঙ্গ নিজে থেকে তোলে না বড়, কিন্তু কখনো-সখনো ভদ্রলোক ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এলে সকৌতুকে দুজনকে লক্ষ্য করে। তার ধারণা মাসী আর কাকুর মধ্যে কিছু একটা গণ্ডগোল চলেছে।

রিং হয়ে যাচ্ছে। ঘরে কেউ নেই বোধ হয়। এই ফাঁকে জ্যোতিরাণী টেলিফোন ছেড়ে দেবেন কিনা ভাবলেন। কাগজে এত বড় খবরটা বেরুবার পরে অভিনন্দন না জানানো আরো বিসদৃশ। 'শ্বেতবহ্নি'র অন্তত এটুকু দাবি আছেই। সে দাবি অস্বীকার করার নয় বলেই রাজদণ্ডের মেয়াদ ফুরোতে ভদ্রলোককে সম্বর্ধনা জানাবার জন্যে তিনি জেলখানা পর্যন্ত ছুটে গেছলেন একদিন। আজও এড়ানোর চেষ্টা পুরস্কারটাকেই অসম্মান করার শামিল।

হ্যালো! শমীর হাঁফ-ধরা গলা, কোথাও থেকে ছুটে এসে সাড়া দিয়েছে।

কোথায় ছিলি এতক্ষণ ?

নীচে। টেলিফোন বাজছে শুনে দৌড়ে এসে ধরলাম, ঠিক মনে হয়েছে তুমি —কাগজে কাকুর ছবি আর প্রাইজের খবর দেখেছ ? কাল রেডিওতে শোনোনি বুঝি ? রাত্তিরে বলেছিল···আমরা তো পরশুই জেনেছি, কাকুর কাছে আগেই চিঠি এসেছে।

শমীর উচ্ছ্বাসের ফাঁকে জ্যোতিরাণী নীরব একটু।···আগে হলে পরশুর তাজা খবরটা সকলের আগে তাঁর কাছে পৌঁছুত। ঠোঁটের ফাঁকে কৌতুকের রেখা পড়ল একটু। ভদ্রলোকের এই নিস্পৃহতাও কম স্পষ্ট নয়।

কাকু কোথায় ?

একতলার বসার ঘরে। কাকু তিন দিন ধরে জ্বরে পড়ে আছে জানো না বুঝি, আজ একটু ভালো। একধার থেকে লোক আসছে তো দেখা করতে, কবার করে ওঠানামা করবে বলো—নীচেই বসে আছে। পাকা মেয়ের মতই কথাবার্তা আজকাল শমীর।—আমি তো ভেবেছিলাম তুমিও আসবে, কাকুকে ডাকব ?

থাক, ডাকতে হবে না···বিকেলের দিকে আমিই যাব'খন।

সত্যি ? শমীর গলায় খুশি ঝরল, সকাল সকাল এসো তাহলে—সন্ধ্যে না হতেই তো আবার মাস্টারমশাই এসে হাজির হবে।

গত বছর শমীর পরীক্ষার ফল খারাপ হতে বিভাস দত্ত তার জন্য অল্প মাইনের প্রাইভেট টিউটর রেখেছেন একজন।

টেলিফোন রেখে আবার একটু বিড়ম্বনার মধ্যে পড়লেন জ্যোতিরাণী। যাবেন তো বলে দিলেন। যাওয়া উচিতও। কিন্তু সঙ্কোচের আরো কিছু কারণ ঘটছে সম্প্রতি। এতক্ষণ মনে ছিল না।···পম্মার শোক নিয়ে কিছু লেখার ইচ্ছে ছিল ভদ্রলোকের, তাঁর সঙ্গে আলোচনার অভিলাষও ব্যক্ত করে ছিলেন। ইচ্ছেটা জ্যোতিরাণী তাঁর মুখের ওপরেই নাকচ করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, বীথির মুখে যদি হাসি ফোটে কোনদিন তখন লিখবেন।···বীথি বা তার মত আরো কটা মেয়ের শোকের শেষ কোথায় গিয়ে ঠেকেছে সে খবর কারো মুখে পেয়েছেন কিনা জানেন না। কিন্তু জ্যোতিরাণীর সঙ্কোচ ঠিক সেই কারণেও নয়। নামী এক সাপ্তাহিক কাগজে বেশ কিছুদিন ধরে আর একখানা উপন্যাস ফেঁদে বসেছেন ভদ্রলোক।···'ছাড়পত্রবাহ'। পড়তে পড়তে জ্যোতিরাণী অনেক সময় বিরক্ত হয়েছেন, কোনো কোনো বারের সাপ্তাহিকপত্র ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাগ্রহে না পড়েও পারেন না। এই উপন্যাস যেন পম্মার শোক নিয়ে লেখার ইচ্ছে বাতিল করার প্রতিশোধ।

উপন্যাসের শেষ ঠিক কোন্ বক্তব্যে গিয়ে দাঁড়াবে এখনো জানেন না অবশ্য। কিন্তু সামাজিক ছাড়পত্রের যে-পর্যায়ে বিচরণ করছেন লেখক তার মূল সুরে প্রচ্ছন্ন একটা কটাক্ষ জ্যোতিরাণীর চোখে অন্তত বিঁধছে।

উপন্যাস শুরু হয়েছিল তিন বান্ধবীকে নিয়ে। যাদের শিক্ষা আছে রুচি আছে বুদ্ধিও আছে। কম-বেশি রূপও আছে। তাদের দুজনের জীবনে যথাসময়ে পুরুষ এসেছে। একজন মিলিটারী চাকুরে আর একজন যাত্রীবাহী বিমানের আকাশচারী এঞ্জিনিয়ার। সুপুরুষ, সুযোগ্য পুরুষ। তাদের দুই নায়িকা প্রথমে হিসেবের রাস্তায় চলতে ভুল করেনি। মেলামেশা করেছে, তাদের কাছে টেনেছে। বিপজ্জনক কাছে নয়। যতটা কাছে এলে আরো কাছে আসার নেশা লাগে ততটাই। কিন্তু ব্যবধান বরদাস্ত করা হৃদয়ের রীতি নয়। পরস্পরের হৃদয়ের তাপে ততদিনে বিশ্বাস পুষ্ট, আকাঙ্ক্ষা নিবিড়। দুই জোড়া নারী-পুরুষের সেই চিরাচরিত প্রতীক্ষার জগতে বিচরণ।

চার-পাঁচ মাসের মধ্যেই দুজনেরই বিয়ে। কোথাও বিঘ্ন হয়নি, মাঝের এই চার-পাঁচ মাস সময়টাই দুঃসহ বিঘ্নের মত। মিলিটারী চাকরের কপালে মিলিটারী তলব আসার ফলে এই দেরি। ছুটি ক্যানসেল করে তাকে ছুটতে হবে। চার-পাঁচ মাস বাদে আবার ছুটি মিলবেই আশা। বড় জোর আরো দুই-এক মাস দেরি হতে পারে। তখন বিয়ে তথা অবিচ্ছেদ্য মিলন।

গণ্ডগোলটা হয়ে গেল ঠিক এই পর্যায়ে এসে—ছেলেটি চলে যাবার তিন-চার দিন

আগে। বিদায়-পূর্ব নিবিড়তায় মিলিটারী চাকুরের ভাবী বধূর ব্যবধানরক্ষার সব হিসেব তলিয়ে গেল। তলিয়ে যে যাবে দশ দণ্ড আগেও কেউ তার জন্যে প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু গেল। বিরহতপ্ত বিদায়ী পুরুষকে রমণী গ্রহণ না করে পারল না। তিন দিনের সেই দুর্বার দুরন্ত মিলনে কোনো ফাঁক থাকল না, ফাঁকি থাকল না।

তারপর পুরুষ চলে গেল। রমণী পরের মুহূর্ত থেকে দিন গুনতে লাগল।

ঘটনাটা জানল শুধু তৃতীয় বান্ধবী, যার জীবনে মনের মত পুরুষ সমাগম তখনো ঘটেনি। তিন মেয়ের মধ্যে সে-ই সকলের থেকে সুশ্রী, সুচতুরা। দুই বান্ধবীর প্রণয়-পর্বের প্রতিটি অধ্যায়ের খবর রাখত। স্বাধীনচেতা মেয়ে, বাবা নেই, মা আছে। একমাত্র কন্যা হিসেবে বিগত ধাপের ছোট বাড়ি আর স্বল্প বিত্তের অধিকারিণী। স্বভাবতই তার আঙিনায় প্রত্যাশিত পুরুষের ভিড় বেশি। আর স্বভাবতই এই মেয়ের ছাঁটাই-বাছাই আর বিচার-বিশ্লেষণের বেড়া টপকে যোগ্য পুরুষের আবির্ভাব ঘটতে দেরি হচ্ছে।

কিন্তু বান্ধবীদের ক্ষেত্রে সে উদার আবার সুপরামর্শদাত্রী। মিলিটারী চাকুরের ভাবী বধূ সন্তবিরহের প্রথম যাতনায় আর সেই সঙ্গে সহজাত দুশ্চিন্তা লাঘবের তাড়নায় প্রিয় বান্ধবীর কাছে শেষের তিন দিনের গোপনতম ব্যাপারটাও উদ্ঘাটন না করে পারেনি।

দ্বিতীয় বান্ধবীর বিয়ের লগ্ন পিছোবার কারণটা পারিবারিক। গুরুদশাজনিত অশৌচের মেয়াদ ফুরোতে মাস তিনেক দেরি। মিলনের সামাজিক বাধা ঘুচতেও দীর্ঘ তিন মাসের ধাক্কা। আকাশচারী এঞ্জিনিয়ারের কাছে এই গুরুদশা দুর্দশার শামিল। আর তার ভাবী দিগঙ্গনাটির স্বভাবও এক নম্বর বান্ধবীর তুলনায় একটু বেশি চপল চটুল। ফলে শেষ পর্যন্ত পিপাসার কোনো নিবিড়তম মুহূর্তে গুরুদশার বাধা নিয়ে মাথা ঘামায়নি তারা। তারপর থেকে গোপন অভিসারের অবাধ উত্তাল জোয়ারে ভাসছে দুজনে। তিন মাসের দূরের তারিখটা তখন আর ধু-ধু মরু-প্রান্তের ওপারে মনে হয়নি। ওইটুকু গোপনতার ব্যঞ্জনায় দেহলীলার উৎসব বরং শাসনশূন্য আদিমতর রসের খোরাক যোগাচ্ছে।

বলতে হয়নি, প্রণয়ীশূন্য ওই সুচতুরা তৃতীয়াটি দিনকয়েক বান্ধবীর আচরণ লক্ষ্য করেই কন্দর্পের অব্যর্থ শর-সন্ধান আবিষ্কার করেছে। সরাসরি জেরার ফলে দ্বিতীয়টিও স্বীকৃতির আনন্দে মুখর হয়ে উঠেছে।

অতঃপর দুটি মেয়েই অন্তঃসত্তা। কিছুটা ভীতত্রস্তাও।

দ্বিতীয়ার ভাবনা ঘুচল। আগন্তুক আবির্ভাবের ঘোষণা স্পষ্ট হয়ে ওঠার আগেই গুরুদশার বাধা শেষ। যথাস্থানে তার বিয়ে হয়ে গেল।

কিন্তু সঙ্কট দাঁড়াল প্রথমা অর্থাৎ মিলিটারী চাকুরের ভাবী রমণীটিকে নিয়ে। তিন মাসের আগেই বাড়িতে জানাজানি হয়ে গেল। ধাক্কাটা মুখ বুজে হজম করল সকলে, বিয়ে স্থির—লোকের চোখে পড়ার আগে লৌকিক অনুষ্ঠানটুকু কোনমতে হয়ে গেলে রক্ষা। মেয়েকে নিয়ে গিয়েও সঁপে দিয়ে আসা যেত, কিন্তু ভদ্রলোককে তখন উত্তর সীমান্তের এমারজেন্সি এরিয়ায় ঠেলে দেওয়া হয়েছে। সাধারণ নাগরিকের সে-এলাকায় প্রবেশ নিষেধ।

জরুরী পত্রাঘাতে ভাবী বধূ বিপদ জানিয়েছে তাকে। দু-তিন দিনের জন্যেও এসে বিয়েটা না করে গেলে মান বাঁচে না। জবাব এসেছে, ভেবো না, ছুটির দরখাস্ত করেছি, এলাম বলে।

তার বদলে দুঃসংবাদ এলো। এমন দুঃসংবাদ যে মাথায় বজ্রাঘাত। রাতে সীমান্ত এলাকা প্রদক্ষিণের সময়ে প্রতিবেশী শত্রুর চোরা গুলিতে মিলিটারী চাকুরেটির জীবন-নাশ হয়েছে। কাগজে ফলাও করে তার ছবি আর মৃত্যুর বিবরণ বেরিয়েছে। সামরিক শোকলিপিতে শহীদের স্থান তার। মর্মন্তুদ হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রতি সরকারের তীব্র প্রতিবাদ নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

এদিকে মেয়েটির অবস্থা শোচনীয়। বাড়ির মানুষদের ভ্রূকুটি কুটীল। শোকের ওপরে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা মুখ বুজে সহ্য করছিল সে। কিন্তু ত্রাসে আঁতকে উঠল যখন পরিত্রাণের তোড়জোড়ের আভাস পেল। এক অনাগত শিশুর আবির্ভাব নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্র। তার দেহের অভ্যন্তরে যে-শিশুর জীবনের সূচনা দিনে দিনে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এ ছাড়া গতি নেই নাকি। আগে হলে সে নিজেও সায় দিত কিনা জানে না, কিন্তু চার মাস শেষ হতে চলেছে—দেহে মনে মাতৃত্ব বাসা বেঁধেছে। এখন সে শুধু শিউরে উঠছে আর নিঃশব্দ আর্তনাদে মাথা খুঁড়ছে—না না না না!

মেয়েটি বাড়ি থেকে পালালো একদিন। এলো সেই অনূঢ়া তৃতীয় বান্ধবীটির কাছে, প্রণয়ী-বিরহিত জীবন যার। ব্যাকুল হয়ে তারই আশ্রয় ভিক্ষা করল, পাগলের মত বলতে লাগল, শুধু ক্ষণিকের দুর্বলতার নয়, যে আসছে দুটি জীবনের নিখাদ ভালবাসার সুদৃঢ় শক্তিতে জন্ম তার। তাকে সে হত্যা করতে পারবে না, পারবে না।

আশ্রয় মিলল। আশ্রয় যে দিল বিভাস দত্তর কাহিনির নায়িকা সেই মেয়েটিই। বান্ধবীকে সে কাছে রাখল না, তখনকার মত তাকে নিয়ে সে দূরে চলে গেল। তার অজ্ঞাতবাসের পাকা ব্যবস্থা করে তবে ফিরল।

যথাসময়ে প্রথমা এবং দ্বিতীয়া দুই বান্ধবীরই সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। দুটিই মেয়ে।

আর তারপর ছ মাসের মধ্যে এক অঘটনের সংবাদ এলো নায়িকার অর্থাৎ তৃতীয়ার কানে। এরোপ্লেন দুর্ঘটনায় দ্বিতীয়ার আকাশচারী এঞ্জিনিয়ার স্বামী মারা গেছে।

নায়িকার অর্থাৎ তৃতীয়ার ততদিনে পদবী বদল হয়েছে। তার বিয়ে হয়ে গেছে। সে প্রণয়ী খোঁজেনি, মেয়ের জন্য তার মা মনের মতঘর আর বর খুঁজেছে। পেয়েছে। বড় ঘর আর বড় মানুষের ঘর। কিন্তু সেই বড় ঘর আর বড় ঘরের বড় মানুষ যে এমন হবে মা-মেয়ে কেউ আশা করেনি। অবধারিত বিরোধ শুরু হয়েছে মাস কয়েকের মধ্যেই। বছরের পর বছর ধরে সেই বিরোধ পুষ্টিলাভ করেছে, করছে। কারণে বিরোধ অকারণে বিরোধ, শুধু বিরোধের জন্যে বিরোধ। বুদ্ধিমতী যুক্তিবোধসম্পন্না নায়িকার সঙ্গে তার স্বামীর চলনে বলনে আচরণে স্বভাবে রুচিতে এক পরিপুষ্ট বিরোধ বাসা বেঁধে আছে।

এক কথায় দুটি জীবনে প্রেম-প্রীতির অস্তিত্ব নেই কোথাও।

এই বিরোধ বর্ণনার বাস্তব নজিরগুলি পড়তে পড়তে এক-একসময় সাপ্তাহিক পত্র ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে করেছে জ্যোতিরাণীর। অনেক রেখে-ঢেকে বিভাস দত্ত একখানা চেনা মুখ টেনে আনতে চেষ্টা করেছেন বার বার। বলা বাহুল্য সেই চেনা মুখ জ্যোতিরাণীরই। বিরোধের নজিরগুলো মেলেনি আদৌ, কিন্তু বিরোধের চেহারার একটা প্রচ্ছন্ন মিল আছেই।

সব থেকে বেশি ধাক্কা খেয়েছেন জ্যোতিরাণী নায়িকার চিন্তার ভিতর দিয়ে যে বেপরোয়া সামাজিক প্রশ্নটা উত্থাপন করেছেন লেখক—সেটা পড়ে।

...এই নায়িকার কোলেও বিয়ের দেড়-দুই বছরের মধ্যে সন্তান এসেছে। ছেলে। কাহিনীর বর্তমান পর্যায়ে সেই ছেলের বয়েস ছয়। যে পর্যায়ে নায়ক-নায়িকার পরস্পরের সান্নিধ্যটুকু পর্যন্ত অসহ্য। ঠিক এই সময়েই এক বাস্তব বিশ্লেষণ অশান্ত করে তুলেছে নায়িকাকে, ছ বছরের ছেলেটার প্রতি পর্যন্ত বিমুখ করে তুলতে চাইছে। বার বার কে যেন মগজের মধ্যে এক নগ্ন প্রশ্নের ঘা বসাচ্ছে।

সে কেবল ভাবে ভাবে আর ভাবে। দুই বান্ধবীর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি। প্রথমার সঙ্গে দেখা হয়। যে মেয়ে পদস্থ মিলিটারী চাকুরের ঘরনী হতে পারত। ভাগ্যের বিড়ম্বনায় হয়েছে শুধু তার সন্তানের জননী। বান্ধবীর কথাগুলো আজও কানে লেগে আছে তার। সে বলেছিল, দুটি জীবনের নিখাদ ভালবাসার সুদৃঢ় শক্তিতে জন্ম ওই সন্তানের।

...সমাজের বিবেচনায়, আত্মজনের বিবেচনায়ও ওই মায়ের কপালে অসতীর ছাপ।

দ্বিতীয় বান্ধবীর সঙ্গেও দেখা হয়। সময়ে দুটো মন্ত্র উচ্চারণ করে আকাশচারী এঞ্জিনিয়ারের ঘরনী হতে পেরেছিল। কিন্তু মাত্র মাস কয়েক আগে ওই এরোপ্লেন দুর্ঘটনা ঘটলে এই বান্ধবীর কপালেও সেই অসতীর ছাপ পড়ত।

...সমাজের বিবেচনায় আত্মজনের বিবেচনায় এখন সে সতী, তার সন্তান সতীর সন্তান।

...আর নায়িকার নিজের সন্তান? তার ছাড়পত্রের কোনো প্রশ্নই নেই। সমাজ-বিধানে সে বড়ঘরের ভাগ্যবান ছাড়পত্রবাহ। কিন্তু প্রশ্নের ঝড় উঠেছে নায়িকার মনে। এমন যুক্তিশূন্য বুদ্ধিশূন্য বিধান আঁকড়ে ধরে সত্তার ক্ষয় পূরণ করা যাচ্ছে না কেন? দুঃশীলতা কাকে বলে? কাকে বলে ব্যভিচার? মন্ত্রবদ্ধ বিবাহিত জীবনে যে নারী-পুরুষের মধ্যে প্রেম নেই, অনুরাগের বন্ধন নেই— তাই কি চরম দুঃশীলতা নয়? চরম ব্যভিচার নয়?

মা!

বিষম চমকে উঠলেন জ্যোতিরাণী। ঘুরে ছেলেকে দেখা-মাত্র ভিতরের কিছু একটা ক্লেদাক্ত অনুভূতি প্রাণপণে বুঝি নির্মূল করে ফেলতে চাইলেন তিনি। যে অনুভূতিটা তিনি গ্রহণ করতেও চান না, স্বীকার করতেও চান না। হঠাৎ বিভাস দত্তর ওপরেই ক্রুদ্ধ তিনি। ওই সাপ্তাহিক পত্র হাতে এলে সত্যিই ছুঁড়ে ফেলে দেবেন এবার।

মুখ কাঁচুমাচু করে সিতু বলল, নীলিদি তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে চায়, কদিন ধরেই বলছিল আমাকে, আজ এসেছে। একবারটি এসো না—

ছেলের এই নরম মুখ নতুন ঠেকল। দু বছর ধরে ওর এক ধরনের চাপা উদ্ধত ভাব দেখে আসছেন। মায়ের অকরুণ শাসন থেকে নিজেকে উদ্ধার করতে পেরেছে। অকরুণ মা হার মেনেছে, হাল ছেড়েছে। তার চালচলন চাউনিতে এটুকুই লক্ষ্য করেন জ্যোতিরাণী। ফেল করা দূরে থাক দু বছর ধরেই পরীক্ষার ফল রীতিমত ভালো হচ্ছে। সেও যেন মাকে জব্দ করার জন্য, মা-কে নিজের গোঁ দেখানোর জন্য।

...হার সত্যিই মেনেছেন কিনা জানেন না, কিন্তু ছেলের সম্পর্কে নির্লিপ্ত যে হয়েছেন তাতে কোনো ভুল নেই। ছেলেকে স্কুল-বোর্ডিং থেকে ছাড়িয়ে এনে জ্যোতিরাণীর মুখের ওপর চাবুক হেনেছিল তার বাবা, বলেছিল, ওকে নিয়ে আর তোমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই—বুঝলে?

...বড় মর্মান্তিক বোঝা বুঝেছিলেন জ্যোতিরাণী সেই রাতে। এই দু বছর ধরে তারপর মাথা না ঘামাতেই চেষ্টা করছেন। দিনকয়েক আগে ছেলের মুখে

সিগারেটের গন্ধ পেয়ে মাথায় হঠাৎ রক্ত উঠেছিল। দুর্বার রোষে পাশের ঘরের পরদা ঠেলে ভিতরে ঢুকতে যাচ্ছিলেন। বলতে যাচ্ছিলেন, মাথা ঘামাচ্ছি না, তোমার ছেলে সিগারেট ধরেছে—খবরটা তোমাকে জানালাম।

কিন্তু যাননি। বলেননি কিছু। সিগারেট খাওয়াটা হয়ত দোষের ভাববে না, শুধু তাঁর মুখ থেকে শুনতে হল সেই আক্রোশেই হয়ত ঘরে ডাক পড়বে ছেলের, হাতে চাবুক উঠবে। ফলে তাঁর দিকে সিতুর চাউনিই শুধু আরো বদলাবে, তার বেশি কিছুই হবে না। তার থেকে মাথা ঘামাতে চেষ্টা না করাই ভালো। দু বছর ধরে নিজেকে এমনি করেই টেনে রেখেছেন তিনি।

নীলিদি কে?

দুলুর দিদি, ওই যে গলিতে থাকে।

...বিভাস দত্তর উপন্যাসের নায়িকার মন নায়িকার চিন্তা যে তাঁর মন নয় তাঁর চিন্তা নয় আদৌ, নিজের কাছে সেটা নিঃসংশয়ে ঘোষণা করার তাড়না প্রবল এখনো। তাই ছেলের ওপর তক্ষুনি সদয় তিনি।—বসতে বল্, আসছি।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সিতুর প্রস্থান। নীলিদির কাছে মান বজায় থাকবে কিনা সেই ভাবনা ধরেছিল তার।

এই দু বছরে সিতু মাথায় বেড়েছে বেশ। বয়েস চৌদ্দ হল। নাকের নীচে পাতলা কালো দাগ পড়ছে। কিন্তু ভিতরের পরিবর্তন আরো দ্রুত হারে এগোচ্ছে। এগারো বছরের শমীকে নেহাতই ছেলেমানুষ ভাবে। নীলিদির বয়স আঠের। ভীতু অতুলের দিদি রঞ্জুদিরও ওই বয়েসই হবে। দেখতে ওদেরই ভালো লাগে এখন। যে রহস্য নিয়ে সিতু অনেক চিন্তা করেছে, ভালো করে এখন তাদের দিকে তাকালে অনেকটাই যেন হদিস মেলে তার। নীলিদির থেকেও ভালো রঞ্জুদিকেই বেশি লাগে। ভাইয়ের ওপর হামলা করেছিল বলে এককালে রঞ্জুদি মায়ের কাছে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যেতে চেয়েছিল তাকে। সিতুর ভালো লাগলে কি হবে, এখনো তেমনি কড়া মেজাজের হাবভাব রঞ্জুদির। ছেলে-মানুষের দিকে তাকাবার মত করে তাকায় তার দিকে।

সে তুলনায় নীলিদি বরং দিনকতক ধরে বেশ খাতির-টাতির করছে তাকে। বাড়িতে ডেকে নিয়ে আদর করে ঘরের তৈরি নাড়ু টাড়ু খেতে দিচ্ছে। এই ফাঁকে সিতু তাকে খুব কাছ থেকে খুব ভালো করে দেখার সুযোগ পাচ্ছে। কেন নীলিদির মায়ের সঙ্গে দেখা করার এত আগ্রহ এখনো জানে না। ওকেই মুরুব্বি ধরে এসেছে।

বোঝা গেল মা আসতে। উঠে প্রথমে ভক্তিভরে প্রণাম সারল।

জ্যোতিরাণী বললেন, দেখি তো রোজই, নাম কি তোমার ?

নীলা।

তারপর আমতা আমতা করে কোন্ আশায় আসা তাও বলল। স্কুল ফাইন্যালে পাস করতে পারেনি। আর পড়া হবে না। তাঁদের প্রতিষ্ঠানে অর্থাৎ প্রভুজী-ধামে যদি কাজ-টাজ পায় কিছু।

জ্যোতিরাণী হতভম্ব প্রথম। পরে বিরক্ত মনে মনে। জানালেন সেখানে যাদের কোনো ঠাঁই নেই আশ্রয় নেই তারা থাকে, কিছু শিখেটিখে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করে—তার মত মেয়েদের নেবার তেমন সুবিধে নেই। কিন্তু মেয়েটা মাথা গোঁজ করে বসেই রইল তবু। জ্যোতিরাণীর মায়াই হল একটু। শক্ত হতে পারে না বলে মিত্রাদি মিথ্যে রাগ করে না। ছেলের দিকে চোখ পড়তে মনে হল পারলে ও এক্ষুনি আরজি মঞ্জুর করে ফেলে। মেয়েটার হয়ে ছেলেও যেন নীরব আবেদন পেশ করছে। একটু আগের তাড়না এখনো মুছে যায়নি···ছেলের প্রতি সদয় হবার তাড়না। আশ্বাসের সুরেই বলে ফেললেন, আচ্ছা, যিনি সেখানকার সব দেখাশুনা করছেন তাঁর সঙ্গে কথা বলে দেখি।

শমীকে বলে দিয়েছেন বিকেলে যাবেন। শ্বেতবহ্নি আর ছাড়পত্রবাহ এক বই নয়, তাই, ইচ্ছে থাক না থাক, না গেলেও নয়।

বেলা সাড়ে তিনটে চারটে নাগাত প্রভুজীধামে এসেছিলেন। মিত্রাদির কাছে সিতুর নীলিদির কাজের তদ্বিরেই নয় ঠিক। মাঝে মাঝে যেমন এসে থাকেন তেমনি এসেছেন। মিত্রাদির মেজাজ ভালো দেখলে বলতেন, নইলে আজ বলতেনই না হয়ত। নতুন কোনো মেয়ে নেবার কথা উঠলে মিত্রাদি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করে, দেখতে কেমন। ভালো বা সুশ্রী শুনলে চাপা রাগে গরগর করে ওঠে, কাজ নেই বাপু, অন্য রাস্তা দেখতে বলো, খুব শিক্ষা হয়েছে।

সুন্দরী আর সুশ্রী মেয়েগুলোর ওপরেই মিত্রাদির বেশি রাগ। বীথি ঘোষের অভাব সর্বরকমে ছেঁটে দেবার জন্যে একে একে আরো তিনটে মেয়েকে কাছে টেনেছিলেন। বাসন্তী, রমা আর কমলা। সংগঠনের কাজে সুশ্রী চালাক-চতুর চৌকস মেয়েই দরকার। তাতে সুবিধে যে হয় সেটা জ্যোতিরাণীও অস্বীকার করতে পারেন না। কিন্তু দেখেশুনে দুজনেরই ঘেন্না ধরে গেছে। তাদের একটা বিয়ে করে বসল আর দুটো বীথির মতই উধাও। ভাবতেও গা ঘিনঘিন করে, আবার সমস্যার কথা মনে হলে বুকে চিন্তার পাথর চেপে বসে। মোটামুটি আরো দু-তিনটে সুশ্রী মেয়েকে আড়ালে দেখিয়ে রেখেছে মিত্রাদি। ওদেরও চালচলন

ভালো না নাকি। কোনো ছলছুতোয় আগেই ওদের এখান থেকে তাড়াবে কিনা সেই পরামর্শও করেছে। জ্যোতিরাণী এখানে এলেই শ্যেন দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেন তাদের, ডেকে প্রায় অকারণেই রূঢ় ব্যবহার করেন। আরো রাগ হয়, কারণ ওরা সামনে এসে দাঁড়ালে মনে হয়, ভাজা মাছখানা উল্টে খেতে জানে না পর্যন্ত।

যাই হোক, সিতুর নীলিদিকে নিয়ে এসব সমস্যা কম। সুন্দরী তো নয়ই, সুশ্রীও নয়। মিত্রাদিকে রাজি করানো যেতেও পারে। বাড়ির উল্টো দিকে থাকে যখন, গড়ে-পিটে নিতে পারলে মন্দ হয় না। কিন্তু ওদিকে তো আবার স্কুল ফাইন্যাল টপকাবারও বিদ্যে নেই।

বিরক্ত মুখে গাড়িতে চেপে ফিরতি পথ ধরলেন জ্যোতিরাণী। মিত্রাদির সঙ্গে দেখাই হল না। দুপুরে খেয়েদেয়ে বাড়ির কি কাজে বেরিয়েছে শুনলেন। ফিরতে রাত হবে। বেশি রাত হলে আজ না-ও ফিরতে পারে বলে গেছে নাকি। মাঝে মাঝে মিত্রাদি এই রকমই করে বসে। জ্যোতিরাণী বলে দিয়েছেন, হঠাৎ কলকাতায় চলে আসার দরকার হলে বা বেশিক্ষণের জন্য প্রভুজীধামের বাইরে থাকতে হলে তাঁকে একটা টেলিফোন করে যেন জানিয়ে দেয়। কিন্তু মাথায় কিছুর ঝোঁক চাপলে তার আর মনেই থাকে না কিছু—অমনি ছুটল।

গাড়ি এখন যাঁর বাড়ির রাস্তায় চলেছে, জ্যোতিরাণী জোর করেই এতক্ষণ তাঁর চিন্তাটা সরিয়ে রেখেছিলেন। ঘড়ি দেখলেন। পাঁচটা বেজে গেছে। প্রভুজীধাম থেকে আর একটু আগে বেরুলে ভালো হত।...খানিক বাদে শমীর মাস্টার আসবে। অগ্রহায়ণের বিকেলের আলোয় টান ধরেছে।

তিনতলার বারান্দার রেলিংএ শমী দাঁড়িয়ে। গাড়ি চোখে পড়তে ছুটে নেমে এলো। কাছে এসে বড় করে দম নিয়ে গড়গড় করে একদফা অভিযোগ সারল। যথা, দেরি দেখে ও ভাবল মাসী ভুলেই গেছে। টেলিফোন করার ইচ্ছে ছিল, কাকু ঘরে থাকতে হল না। কাকু বলল, করতে হবে না, তুমি ভোলো নি।

তার হাত ধরে জ্যোতিরাণী হাসিমুখে বাড়িতে ঢুকলেন। দেরির কৈফিয়ত দিতে দিতে তিনতলায় উঠলেন। দোতলার মহিলাদের কাউকে দেখতে পেলেন না। তিনি এলে ইচ্ছে করেই তাঁরা আড়াল নেন কিনা জানেন না।

বিভাস দত্ত শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিলেন। উঠে বসতে বসতে অভ্যর্থনা জানালেন। তারপর বললেন, শমীর ঘড়ি দেখা বাড়ছিল আর আপনার ওপর রাগ হচ্ছিল।

এক হাতে শমীকে জড়িয়ে ধরে রেখে জ্যোতিরাণী চামড়ার গদি-আঁটা মোড়ার ওপর বসে পড়লেন।—ওকে টেলিফোন করতে দেননি কেন, যদি ভুলে যেতাম?

হাসির ফাঁকে দু চোখ তাঁর মুখের ওপর থমকালো একটু। মাস তিনেক বাদে

দেখা, বেশ রোগা রোগা লাগছে ভদ্রলোককে, কদিনের জ্বরে এতটা হবার কথা নয়। অসময়ে বয়সের ছাপ পড়ছে।

হালকা উক্তির মধ্যে ঠেস দেবার মত হালকা কৌতুকের রসদ পেলেন বিভাস দত্ত।—ভুলে গেলে কি আর মনে করানো ঠিক হত, সে দুর্ভাগ্যও আমরা পাওনা ভাবতাম।

ফাঁক পেলে ভদ্রলোক কথা শোনাবেন জেনেই এসেছেন। জ্যোতিরাণী সে-রকম সুযোগ বিশেষ দিতে চান না। শমীকে টেনে নিয়ে বসার ফাঁকে দেয়ালের দিকে এক পলক দেখে নিয়েছিলেন। হাজারীবাগের সেই ফোটোটা টাঙানোই আছে—যে ফোটোতে সিতুর সঙ্গে তিনি আর বিভাস দত্ত আছেন। ও নিয়ে যে কথাবার্তা হয়ে গেছে একদিন, তারপর ওটা সরানোই ছেলেমানুষি হত। তবু তিনতলায় পা দেবার আগে জ্যোতিরাণীর ওটার আর আলমারিতে ওমর খৈয়ামের ফোটো দুটোর কথা মনে হয়েছে।

বললেন, লেখকদের তো দুর্ভাগ্যের জাল বুনতে ভালই লাগে, তার মধ্যে আবার শমীকে টানছেন কেন। যাক, শরীরের হাল তো ভালই করেছেন, ডাক্তার-টাক্তার দেখাচ্ছেন ?

বিভাস দত্ত জবাব দেবার ফুরসত পেলেন না। তার আগে শমী হেসে উঠল। —কাকুর নিজের ডাক্তার নিজেই, মোটা মোটা দুটো হোমিওপ্যাথি বই পড়ে আর ওষুধ কিনে খায়। কমাস ধরে রাত্তিরে তো আদ্ধেক দিন কিচ্ছু খায় না, আজ বলে পেট খারাপ, কাল জ্বর-জ্বর—সেদিন এক ডাক্তার বন্ধু এসে খুব বকেছে কাকুকে।

বেশ করেছে, এরপর হোমিওপ্যাথি বই চুপিচুপি একদিন রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিস।

হৃষ্ট গাম্ভীর্যে বিভাস দত্ত বললেন, নিজের ওপর দিয়ে হাত পাকাচ্ছি, ওটা সেকেণ্ড ফ্রন্ট—সাহিত্য করে কদিন চলবে ঠিক কি। শমীর দিকে তাকালেন, এই পাকা মেয়ে, হীটারে একটু চায়ের জল চাপা না।

শমীকে তেমনি আগলে রেখেই জ্যোতিরাণী বাধা দিলেন, আমার চায়ের দরকার নেই, আপনারও এতক্ষণে বারকয়েক হয়ে গেছে নিশ্চয়। যেজন্তে এসেছেন, সে প্রসঙ্গে দুই এক কথা না বললে নয়। শমীকে জিজ্ঞাসা করলেন, সকাল থেকে লোক আসছে বলেছিলি টেলিফোনে—কাকুর অভ্যর্থনা-টভ্যর্থনা কেমন হল বল্—

সোৎসাহে শমী যে ফিরিস্তি দিল, শুনে বিভাস দত্তও হাসছেন অল্প অল্প।...

সকাল থেকে লোক কেবল এসেছে আর এসেছে, তার ধারণা চল্লিশজনের কম নয়। চা করতে করতে জগু হিমশিম খেয়ে গেছে, শেষে দুধ ফুরিয়ে যেতে দোকান থেকে চা এনে দিয়েছে। লোকেরা সব মস্ত মস্ত ফুলের তোড়া আর সুন্দর সুন্দর মালা এনেছে—মালা পরে-পরে এক-একবার কাকুর কান পর্যন্ত ঢেকে গেছল। শমী একসঙ্গে কাউকে এত মালা আর তোড়া পেতে দেখেনি কখনো। সেই সব মালা আর তোড়া দিয়ে শমী সুন্দর করে এই ঘরখানা সাজাচ্ছিল, কিন্তু কাকু দিলে না, সব ওঘরে পাঠিয়ে দিলে। তারপর অনেকে আবার ক্যামেরা এনেছিল, মুখের ওপর দপ-দপ আলো জেলে ছবি তুলেছে—সকলের সঙ্গে যে-সব ছবি তোলা হয়েছে, তার মধ্যে শমীও আছে। উপসংহারে জানিয়েছে, বিকেলেও কারা কারা আসবে বলে কম করে পাঁচ-ছটা টেলিফোন এসেছিল—কাকু সকলকে কাল সকালে আসতে বলে দিয়েছে, তুমি আসছ জানে তো, সেইজন্যেই—

শেষের উচ্ছ্বাসের ফলে পরে মেয়েটার ধমক খাওয়ার সম্ভাবনা। আগ্রহের খবরটা ফাঁস করার দরুন তার কাকুর কতটা মানহানি হল, জ্যোতিরাণী একবার দেখে নিয়ে শমীকেই বললেন, আমি ফুল-টুল কিছুই আনিনি, তবু আমার খাতির দেখ্, তা কাকুর প্রাইজ পাওয়ার আনন্দে তুই কি করলি শুনি।

আমি আবার কি করব, এক-একবার কাকুর কাছে গিয়ে বসেছি, লোকেরা কাকুর সঙ্গে আমাকেও দেখল। শমী হেসে উঠল, একজন আবার বলছিল বড় হয়ে আমি নাকি কাকুর থেকে ভালো লিখব—

ঠিকই বলেছে। জ্যোতিরাণী সায় দিলেন।

ঠাট্টা কিনা শমী ধরতে পারছে না। ঘরের আলো আরো কমে এসেছে। হাত বাড়িয়ে বিভাস দত্ত সুইচ টিপে দিলেন। ঠোঁটের ফাঁকে হাসি লেগে আছে তখনো। ইতিমধ্যে শমীর আবার কি মনে পড়েছে, সাগ্রহে মাসীর দিকে ঘুরে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, জেঠিরা বলছিল প্রাইজ তো তোর মাসীর বই পেয়েছে, তোর কাকুর কি? সত্যি?

এইবার অস্বস্তি জ্যোতিরাণীর। তবু তার দিকে চোখ রেখে গম্ভীর মুখে মাথা নাড়লেন। সত্যি।

দাবিটা স্বীকার করছে কিনা বোঝার জন্যে শমী কাকুকে একবার দেখে নিল। স্বীকার করার মুখ মনে হল।—কিন্তু বইটা তো কাকু লিখেছে!

লিখলেও ওটা আমার বই, গোড়াতেই আমার নাম লেখা আছে দেখিসনি?

প্রাইজের পাঁচ হাজার টাকা তাহলে তুমি পাবে না কাকু পাবে?

বিভাস দত্ত হাসতে লাগলেন। জবাব হাতড়ে না পেয়ে জ্যোতিরাণী ফিরে

জিজ্ঞাসা করলেন, কে পেলে তোর বেশি আনন্দ হবে?

সঙ্কোচে সলজ্জ হেসে শমী জবাব দিল, কাকু···

ওরে মেয়ে! আমার ওপর এই দরদ তোর?

এটা পক্ষপাতিত্ব বলে স্বীকার করতে শমীর আপত্তি। বলে উঠল, তোমার যে অনেক টাকা আছে, কাকুর তো নেই!

তরল আলাপ এই পর্যায়ে এসে ঠেকবে ভাবা যায়নি। জ্যোতিরাণী হেসেই উঠতে পারতেন, কিন্তু বিভাস দত্তর ঠোঁটের হাসি মিলিয়েছে। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। বিভাস দত্ত ঝুঁকে দরজার দিকে তাকালেন একবার, তারপর শমীকে বললেন, আর পাকামো করতে হবে না, এখন যাও, তোমার যম এসে গেছে।

দরজা পেরিয়ে মাঝবয়সী এক ভদ্রলোককে পাশের ঘরের দিকে যেতে দেখা গেল। শমীর মাস্টার। মুখ বেজার করে শমী চলে গেল। হাসিমুখে জ্যোতিরাণী বললেন, বেচারী। বিভাস দত্তর দিকে চেয়ে ওর দোষ লাঘব করতে চেষ্টা করলেন তিনি, ওর পাকামোর দোষ কি, যা শোনে তাই বলে। একটু আগেই শুনল, সাহিত্য করে আপনার কদ্দিন চলবে ঠিক নেই, হোমিওপ্যাথি শিখে সেকেণ্ড ফ্রণ্ট খোলা দরকার।

বিভাস দত্ত শুনলেন, মন্তব্য না করে মুখে হাসি টেনে আনলেন একটু। এতক্ষণে তাঁর সিগারেটের খোঁজ পড়ল। জ্যোতিরাণীরও মনে হল, আর দু-চার কথার পরে উঠলে ভালো হয়।

সিগারেট ধরিয়ে বিভাস দত্ত জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার প্রভুজীধামের কাজকর্ম ভালো চলছে?

চলছে।···আপনার চেহারা সত্যি খারাপ হয়েছে, এ-ব্যাপারে নিজের বিদ্যের কুলোবে না, ডাক্তার-টাক্তার দেখান।

জবাবে একটু সাহিত্য করলেন বিভাস দত্ত, মুচকি হেসে মন্তব্য করলেন, সময় ঘনালে কারো বিদ্যেতেই কুলোয় না। স্বাস্থ্য আলোচনায় আগ্রহ নেই, জিজ্ঞাসা করলেন, কালীদা আর মামাবাবুর খবর কি, অনেকদিন দেখা হয়নি।

অনেকদিন দেখা হয়নি কারণ অনেকদিন তিনি যাননি। কিন্তু এই প্রত্যাশিত অনুযোগটুকু জ্যোতিরাণী করে উঠতে পারলেন না। অল্প মাথা নাড়লেন শুধু। অর্থাৎ খবর ভালো।

আর আপনার গ্রেটম্যানের মেজাজপত্র?

আসল প্রশ্ন এটাই, আগেরগুলো ভূমিকা। ভদ্রলোকের অনেক জানা আছে বলেই আরো জানার কৌতূহল বিরক্তিকর। তবু হাসিমুখে প্রসঙ্গ বাতিল করতে

চাইলেন জ্যোতিরাণী।—আমি মশাই কারো মেজাজের ফিরিস্তি দিতে এখানে আসিনি, সকালে প্রাইজের খবরটা পড়ে আনন্দ হল তাই এলাম। আপনি তো পরশুই খবর পেয়েছেন শুনলাম, জানাননি কেন?

সিগারেট অর্ধেক পুড়েছে এরই মধ্যে।—জানালে আনন্দের দায়টুকু টেলিফোনেই শেষ করতে পারতেন।

প্রতিবাদের ছলেও কারো অভিমান নিয়ে নাড়াচাড়া করার ইচ্ছে নেই। সহজ ঠাট্টার সুরে জ্যোতিরাণী বললেন, দায় সারা হয়েছে, এখন উঠি তাহলে।···বাড়ি গিয়ে আপনার শ্বেতবহ্নি আর একবার পড়ব ভাবছি, কি লিখেছেন এতদিনে ভুলেও গেছি।

ওঠার অবকাশ দিলেন না বিভাস দত্ত। শ্বেতবহ্নি যেতে দিন, এ বইটা পড়ছেন?

মুহূর্তের মধ্যে একটা অস্বস্তি ছেঁকে ধরার উপক্রম করল বুঝি।—কোন্ বইটা?

যেটা লেখা হচ্ছে···ছাড়পত্রবাহ।

এইজন্যেই আসবেন কি আসবেন না ভাবছিলেন জ্যোতিরাণী। শুধু এই তিক্ততার পাশ কাটাবার জন্যে। বিভাস দত্তর এ চাউনি তরল না হোক, সরলও নয়। ঈষৎ-চঞ্চল চাপা আগ্রহে ভরপুর।

পড়ছি তো এখন পর্যন্ত।

সিগারেট অ্যাশপটে গুঁজতে লাগলেন বিভাস দত্ত। আঙুল কটাও শান্ত নয় খুব। হাসতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু এবারের দৃষ্টিটা সরাসরি মুখের ওপর তুললেন না।—তার মানে শেষ পর্যন্ত পড়ে উঠতে পারবেন কিনা সন্দেহ?

খুব। জবাবের সুর হাল্‌কা, আর স্পষ্ট।

ভালো লাগছে না?

না-নাঃ।

জবাবটা নিভৃতের কোনো দুর্বলতার ওপর ঘা বসানোর শামিল। যে দুর্বলতা সঙ্গোপনে সমর্থন আশা করে, না পেলে আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। বিভাস দত্তর চোখে-মুখে এই গোছের অভিব্যক্তি এঁটে বসতে লাগল।—উপন্যাসটা শেষ হবার আগেই এক বিজ্ঞ সমালোচকের মস্ত সমালোচনা বেরিয়েছে, সেটা পড়েছেন বোধ হয়?

না।···কেন?

তিনি রায় দিয়েছেন, আমার লেখার ধার কমেছে, অবাস্তব গল্প ফেঁদে এখন মনস্তত্ত্বের অন্তঃপুরে ঢোকার চমক দেখাতে চেষ্টা করছি। ভাবলাম আপনার

একেবারে ভালো না লাগাটা এই মন্তব্য পড়ার ফল কিনা।

জ্যোতিরাণী শুনলেন, চুপচাপ দেখলেনও একটু। কথাটা ওঠার পর বিরূপ সমালোচকের থেকেও আরো স্পষ্ট করে কিছু বুঝিয়ে দেবার তাগিদ। বললেন, পড়িনি, শুনে এখন পড়তে ইচ্ছে করছে।...এই বইটা আমার ভালো লাগবে আপনি আশা করেছিলেন?

লেখক আশা করে থাকে।

আর, ভালো লাগলেও সমালোচনা পড়ে সেটা অস্বীকার করার সুযোগ নিতে পারি ভাবছেন কেন? পরের প্রশ্নটা মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়েই হাসলেন একটু। উষ্মার আঁচ পেলেও লেখা সার্থক ভাবার সম্ভাবনা।—আমার ভালো লাগছে না ভালো লাগার মত ওতে কিছু পাচ্ছি না বলে। শমী আপনার নিজের কেউ নয়, তবু ছেলেমেয়ের মায়া কি জিনিস সে তো ওকে দিয়েই টের পাচ্ছেন। নিজের ছেলেকে নিয়ে আপনার নায়িকা বেচারীকে অমন মন-বিষানো সমস্যার ধোঁয়ায় ডোবাচ্ছেন কেন? হাসতে হাসতেই উঠে দাঁড়ালেন, পালাই—

বিভাস দত্তর দুই হল্‌দে আঙুলে দ্বিতীয় সিগারেট জ্বলছে। ঠোঁটের ফাঁকে তাঁরও হাসির আভাস এখন। এতটা শোনা গেল বলেই ছাড়পত্রবাহ প্রত্যাশিত দাগ ফেলতে পেরেছে ভাবছেন হয়ত।

গাড়িতে বসে জ্যোতিরাণী সামনের রাস্তা দেখছেন, দোকানপাট দেখছেন, লোক চলাচল দেখছেন। আসলে বাইরের কিছুই দেখছেন না তিনি, নিজের ভিতর দেখছেন। দাগ সত্যিই কোথাও পড়েছে কিনা খুঁজছেন। পড়েনি। তিনি পড়তে দেননি। বিভাস দত্ত চান পড়ুক। ভাবছেন পড়েছে।...কেউ ভাবল বলেই তাঁর এই অসহিষ্ণুতা কেন, অস্থিরতা কেন?

বাইরের দিকে মন ছিল না জ্যোতিরাণীর, শুধু চোখ ছিল। সর্বাঙ্গ ঝাঁকিয়ে দেবার মত কি বাইরে থেকে সেই চোখে প্রচণ্ড বিষাক্ত একটা কাঁটা এসে ঢুকল হঠাৎ? চোখের ভিতর দিয়ে গিয়ে একেবারে বুকের ভিতর পর্যন্ত জ্বালিয়ে বিষিয়ে মুহূর্তের মধ্যে অবশ করে দিতে পারে এমন কাঁটা? জ্যোতিরাণী স্বপ্ন দেখছেন? কি দেখছেন? কাকে দেখছেন?

দেখলেন বীথিকে। দেখছেন বীথি ঘোষকে।

সামনের গাড়িগুলোতে বাধা পেয়ে পেয়েও জ্যোতিরাণীর গাড়ি গজ তিরিশেক এগিয়ে গেছে। তারপর তাঁর আচমকা নির্দেশে ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গেছে। তিনি পালাতেই চান কিন্তু প্রায় চেঁচিয়ে উঠেই গাড়ি থামাতে বলেছেন, হুঁশ নেই।

জানলা দিয়ে ঝুঁকে পিছনের দিকে চেয়ে আছেন, সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে এক মর্মান্তিক দেখাই দেখেছেন।

দেখেছে বীথি ঘোষও।...হাত নেড়ে বিদায়ী সঙ্গী সামনের ঝকঝকে হলদে গাড়িতে উঠল। একরাশ হাসি ঝরিয়ে বীথি ঘোষও হাত নেড়ে বিদায় দিল তাকে। ...হলদে গাড়ি অদৃশ্য হল। বীথি ঘোষ এবারে আস্তে আস্তে ফিরল তাঁর দিকে। তাঁর গাড়ির দিকে। যেখানটায় দাঁড়িয়েছে গাড়ি, সেখানে সাদাটে আলো নেই ওখানকার মত। শহরের নামজাদা বিলিতী হোটেলের গাড়িবারান্দার নীচের ফুটপাথ ওটা। রাতেও ওইটুকু জায়গা দিনের আলোর মত সাদা। বীথি ওইখানেই দাঁড়িয়ে। গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেছে দেখেছে।...দেখছে।

বৃহৎ সৃষ্টির মূলে যে যোগাযোগ, বৃহৎ ধ্বংসের মূলেও কি তাই?

বড় চার রাস্তার মাঝে ট্র্যাফিক কন্ট্রোল পোস্ট-এর পুলিস গাড়ির ভিড় সামলাবার চেষ্টায় মেন রোডের দুদিকের গাড়িগুলোকে বেশ কিছুক্ষণ আটকে রেখেছিল। ফলে মেন রোডের দুদিকেও একগাদা করে গাড়ি দাঁড়িয়ে গেছে ছাড়া পাবার পরেও গাড়ি নড়ে না প্রায়। রাস্তা পেরুলেই আবার বাস স্ট্যাণ্ড সেখানে দু-তিনটে বাস আবার জনতার ব্যূহ ভেদ করতে না পেরে ঠুঁটোর মত দাঁড়িয়ে আছে। ফলে ফুটপাথের দিকের গাড়িগুলো লোকের প্রাণ আর গাড়ির ঠোকাঠুকি বাঁচিয়ে হাঁটা-বেগে পাশ কাটাতে চেষ্টা করছে। ওই হোটেলের কাছাকাছি এসে গোটাকয়েক গাড়ির পিছনে জ্যোতিরাণীর গাড়ি দাঁড়িয়েই গেছল। দূরের ওই ছোট মোড়ে পুলিস আবার হাত দেখিয়েছে সম্ভবত।

তখনি সেই প্রচণ্ড ধাক্কা। দু-তিনটে গাড়ি আগের ওই হলদে গাড়িটা বিরক্তিকর হর্নের দাপটে একটু জায়গা করে নিয়ে লাইনের জঠর থেকে সে গাড়িবারান্দার ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়াল। সেই গাড়ি থেকে বীথি নামল আর সে ফিটফাট মাঝবয়সী ভদ্রলোক।

ধাক্কা খেয়েও জ্যোতিরাণী নিজের অগোচরে জানলার বাইরে ঝুঁকে পড়ে ছিলেন। বিলিতী হোটেলে বোধ হয় বীথি একাই ঢুকবে, সঙ্গের লোকটার এ হাত গাড়িতে—সে আবার উঠবে মনে হল।

বীথিও দেখল। জ্যোতিরাণী যেভাবে জানলার বাইরে ঝুঁকে পড়েছিলে এত কাছ থেকে না দেখার কথা নয়।

দেখা মাত্র বীথি খুব একটা চমকে উঠল বলে মনে হল না তাঁর। তবে সঙ্গী উদ্দেশে হাসি-মুখের বিদায়ী আপ্যায়নে ছেদ পড়ল বটে। দৃষ্টিটা তাঁর মুখের ওপ এসে স্থির হয়ে থাকল কয়েক নিমেষ। সঙ্গিনীর দর্শন-ব্যতিক্রম অনুসরণ ক

লোকটাও এদিকে তাকালো একবার।…তারপর লঘু কিছু একটা মন্তব্যও করল বোধ হয়।

গাড়ি এগোতে লাগল একটু একটু করে। জ্যোতিরাণীর গাড়ি হলদে গাড়ির পাশ কাটালো। তারপর গজ তিরিশেক যেতে না যেতে তাঁর আচমকা নির্দেশে ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়িয়েই গেল।

তাঁকে দেখা মাত্র বীথি যদি সত্রাসে গা-ঢাকা দিত, শশব্যস্তে যদি হোটেলে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে যেত, জ্যোতিরাণী তাহলে নামার কথা একবারও ভাবতেন না। আত্মস্থ হবার অবকাশ পেলেই ড্রাইভারকে আবার গাড়ি ছোটাবার হুকুম দিতেন। বীথিকে আবার এভাবে দেখার স্পর্শটাও মুছে ফেলতে ফেলতে বাড়ি ফিরতেন।

কিন্তু বীথি গেল না। বীথি নড়ল না।

বীথি সেইভাবেই দাঁড়িয়ে আছে। ওখানকার সাদাটে আলোয় কান-গলা-হাতের দামী গয়নার ছটা ঠিকরোচ্ছে। রাজেন্দ্রাণীর মত দাঁড়িয়ে বীথি যেন অপেক্ষা করছে।

জ্যোতিরাণীর চমক ভাঙল। মাথায় রক্ত উঠেছে একঝলক। বুকের তলায় শিয়ালদা স্টেশনে দেখা আর এক বীথির মুখ ভেসে উঠেছে, তাই রক্ত উঠেছে। বুকের তলায় কাউকে আশ্রয় দিলে এত সহজে তাকে ভোলা যায় না, তাই রক্ত উঠেছে মাথায়। শুধু আশ্রয় দেননি, সেই মুখখানা তিনি ভালবেসে-ছিলেন, সেই মুখে তিনি পদ্মার শোক নিঃশেষ করার মতই আলো দেখেছিলেন, আগুন দেখেছিলেন। এই বীথিকে তিনি ক্ষমা করবেন কি করে?

গাড়ি থেকে নামলেন জ্যোতিরাণী। কি করবেন, কি বলবেন জানেন না। কিছু না পারুন এই বীথিকে খুব—খুব ভালো করে দেখবেন একবার।

বীথি নড়ছে না, এগিয়ে আসছে না। তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। অপেক্ষা করছে।

জ্যোতিরাণী দেখলেন। একেবারে সামনে, মুখোমুখি দাঁড়িয়েই দেখলেন। তারপর কথাও তিনিই আগে বললেন।—চিনতে পারছ?

কথা নয়। শব্দের চাপা আগুন এক ঝলক। কিন্তু ওটুকুতে বীথির কান ঝলসে গেল না। চেয়ে আছে সেও। তার ঠোঁটের ডগায় হাসির আভাস। বলল, চিনতে পেরেছি বলেই দাঁড়িয়ে আছি, নইলে তো ছুটে পালাতুম।

শেষের উক্তি খট্ করে কানে লাগল বটে, কিন্তু এই রোষের মুহূর্তে জ্যোতিরাণী সেটা মাথায় নিলেন না। উদ্গত ঘৃণায় আর কঠিন দুই চোখের আগুনে তার মুখখানা ঝলসালেন আর একপ্রস্থ।—কপালে সিঁথিতে এখনো

সিঁদুর দেখছি, এগুলো শোভা না নতুন শেকল ?

শেকল শুনলে জ্যোতিরাণী কি এখনো একটু সান্ত্বনা পেতে পারেন ? নিজেকে বিধবা ধরে নিয়ে বিয়ে যদি আবার করে থাকে সেই আশা ?

বীথি ঘোষের দু চোখ তাঁর মুখের ওপর নড়েচড়ে স্থির হল আবার। ঠোঁটের হাসি স্পষ্টতর।—এগুলো শোভার শেকল।

তিন কথার জবাবে একটা কথা শোনা যেত না···সেই বীথি। এখন তার ঠোঁটে হাসি চোখে হাসি। কথার থেকেও এ হাসির ধার বেশি।

কি দেখছেন ? খুব চাপা ঠাণ্ডা বিদ্রূপের সুর বীথির গলায়।

অস্ফুট স্বরে জ্যোতিরাণী বললেন, কত নীচে নেমেছ তাই···

বীথির মুখে তেমনি বিদ্রূপের মতই পল্‌কা বিস্ময়, নামব কেন! আপনাদের বিচারে তো অনেক উঠেছি!—আসবেন ? চোখের ইঙ্গিতে অভিজাত হোটেলের দরজার দিকটা দেখালো।

না। শেষবারের মত দেখে নিয়ে ঘৃণার একটা শেষ ঝাপটা মারতে চাইলেন যেন।—খুব···খুব ভালো আছ, কেমন ?

বীথির ঠোঁটের হাসি গালের দিকে ছড়ালো এবার। কথার সুরে বিস্ময়ের আমেজ।—শোক ভোলবার জন্যে মিত্রাদির হাতে দিয়েছিলেন, তাঁর কেরামতির ওপর বিশ্বাস কমেছে নাকি আজকাল আপনার ?

আবারও খচ করে কানে বিঁধল জ্যোতিরাণীর। গাড়িতে ফিরবেন ভেবেও পা বাড়াতে পারলেন না, কি বলতে চায় বুঝতে চেষ্টা করলেন।

এবারে ঈষৎ গম্ভীর অথচ আগ্রহের সুরে বীথি বলল, যতখানি ঘৃণা নিয়ে আপনি আমাকে দেখছেন তার সবটুকু যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে আপনি ভালই বাসতেন আমাকে, আর সেটা মিত্রাদির ভালবাসা নয়।···তাই যদি হয়, হোটেলে আমার ঘরে আসুন একটু, আপাতত আমি একাই আছি এখানে। শুনলে আপনার প্রভুজীধামের কিছু উপকার হতে পারে, অবশ্য উপকার যদি সত্যিই চান—এখানে আশপাশের লোকের চোখ আমার থেকেও আপনাকে বেশি ছেঁকে ধরেছে—

জ্যোতিরাণী বিমূঢ় কয়েক মুহূর্ত। পিছন ফিরে তাকালেন একবার। এদিক-ওদিকে অনেকেই দাঁড়িয়ে আছে বটে। কিন্তু জ্যোতিরাণীর দেখার বস্তু বীথির মুখখানাই। চোখে চোখ রেখে তাকাতে পারছে কি করে ? বীথি এই ঝাঁজে কথা বলছে কি করে ? কি বলতে চায়, প্রভুজীধামের উপকার হতে পারে এমন কি বলতে পারে ?

দ্বিধা লক্ষ্য করেই বীথি আবার বলল, আপনাকে আমার এখনো সেই দিদিই ভাবতে ইচ্ছে করে।…কিন্তু ভাবা শক্ত। দু বছর বাদে কলকাতায় পা দিয়ে প্রথমেই আপনার কথা মনে হয়েছে, শুধু আপনার কথা। মনে হয়েছে একবার দেখা হলে বেশ হয়। দেখা যখন হলই আসুন একটু, আপনার ভয় কি ?

দুর্বোধ্য বিস্ময়ে জ্যোতিরাণী হোটেলের দরজার দিকে না এগিয়ে পারলেন না। কি এক অজ্ঞাত আকর্ষণে বীথি বুঝি টেনে নিয়ে চলল তাঁকে। অবসর বিনোদনের বিশাল অভিজাত পরিবেশের পাশ কাটিয়ে আর একদিকে এসে তার সঙ্গে লিফ্‌ট-এ উঠলেন। দোতলায় এলেন।

হালফ্যাশানের মত ঝকঝকে একটা স্যুইট-এ এনে দাঁড় করাল বীথি তাকে। রুচির ছাঁচে-ঢালা পরিপাটী বিলাস-কক্ষ। নির্বাক জ্যোতিরাণী ঘরের চারিদিকে দেখলেন একবার। বীথি বলল, এখানকার ব্যবস্থা আমার ভালো লাগছে না, পাঁচ-সাতদিন মাত্র থাকার কথা, তাই আছি। লণ্ডনেও নয়, আরামে ছিলাম বটে আপনার প্যারিসে, দেখলে মিত্রাদিরও হিংসেয় ভেতর টাটাতো। বসুন, চা-কফি কিছু আনতে বলব ?

বসলেন। মাথা নাড়লেন, চা-কফির দরকার নেই। কথা শুনে সর্বাঙ্গ রি-রি করে উঠল। মিত্রাদির সম্পর্কে এই দ্বিতীয়বারের শ্লেষও কান এড়ালো না। মিত্রাদির স্নেহ মাড়িয়েছে বলেই তার ওপর বেশি রাগ ভাবলেন। দেখছেন জ্যোতিরাণী ওকে। এই দু বছরে অনেক সুন্দর হয়েছে, ধারালো হয়েছে। শুধু সাজে-পোশাকে-গয়নায় নয়, চেহারার মধ্যেও আরামে থাকার রঙ ধরেছে, পেলবতা এসেছে।

এই বীথির মুখে হাসি ফোটাতে চেয়েছিলেন জ্যোতিরাণী। বীথি হাসছে। আর এ হাসি দেখে জ্যোতিরাণীর ভেতর কাটছে। এই হাসির আড়ালেও আঁতি-পাতি করে একটুখানি কান্না খুঁজছেন তিনি। তাও পাচ্ছেন না বলেই যাতনার মতই অপরিসীম তিক্ততা। বললেন, পদ্মার শোক একেবারে মুছে দিতে পেরেছ তাহলে ?

বীথি চটপট জবাব দিল, ও-সব জ্বলে-টলে ছাই হয়ে গেছে।

এ জবাব শোনার পরেও অপমানে ওকে বিধ্বস্ত করার আক্রোশে জ্যোতিরাণী বলে উঠলেন, কত সহজে ছাই হতে পারো জেনেও শিয়ালদা স্টেশনে অমন আগুনের অভিনয় করেছিলে কি করে ? স্টেশনের সেই লোকটা কি দোষ করেছিল তাহলে ? তার রক্তপাত ঘটিয়ে ছেড়েছিলে কেন, লণ্ডন-প্যারিস করাতে পারবে না বলে ?

বীথি দেখছে তাঁকে। শুনছে। চোখের কোণে কৌতুক ঝরছে। রয়ে-সয়ে জবাব দিল, অপটু হাতে লোকটা একসঙ্গে হঠাৎ একডেলা আফিং গেলাতে এসেছিল, মিত্রাদির মত পাকা হাতে একটু একটু করে—

দোষ ঢাকার জন্যে কথায় কথায় আর মিত্রাদিকে টেনো না, তাকে আমি চিনি।

বীথির চাউনি বদলালো, হাসি-ছোঁয়া নির্লিপ্ত কৌতুক মুছে যেতে লাগল। সোজা হয়ে বসল আস্তে আস্তে, খরখরে দু চোখ তাঁর মুখের ওপর বিঁধিয়ে রাখল কয়েক মুহূর্ত। তারপরেই হিস-হিস আগুন ঝরালো যেন গলা দিয়ে।—চেনেন? মিত্রাদিকে চেনেন আপনি? তাহলে আপনার এত রাগ কেন? অভিনয় তাহলে এতক্ষণ ধরে আপনি করছেন? আমাকে দেখে গাড়ি থেকে নেমে এসেছেন কোন্ মতলবে? যান—মিত্রাদিকে চেনেন যখন আর আপনাকে দরকার নেই—চলে যান্!

জ্যোতিরাণী হতভম্ব। হঠাৎই যেন কপালে সিঁথিতে জ্বলজ্বলে সিঁদুর-পরা স্টেশনের সেই মেয়েটাকে দেখলেন তিনি। এই মুখে সেই আগুন দেখলেন এক ঝলক। নির্বাক চেয়ে আছেন।

তীক্ষ্ণ চোখে তাঁর এই বিমূঢ় মূর্তি লক্ষ্য করল বীথিও। তার ফলেই একটু একটু করে ওর মুখে সংশয়ের ছায়া পড়তে লাগল আবার। কিন্তু দু চোখ জ্যোতিরাণীর মুখের ওপর থেকে নড়ল না, গলার স্বর অপেক্ষাকৃত সংযত শোনালো শুধু। বলল, দূরে পা বাড়াবার আগে ঠাণ্ডা মাথায় কিছু ভাবার শক্তিও ছিল না আমার। পরে কেবলই মনে হয়েছে, অতদিন ধরে মিত্রাদি আমাকে যা বুঝিয়েছে তার সবটাই মিথ্যে, সবটাই ভুল, হয়ত বা আপনি অনেক বড় তাই এতদিনের খাতির সত্ত্বেও মিত্রাদিকে আপনি চেনেনই না। একটু আগে আপনার অত রাগ আর ঘৃণা দেখে আমার সেই বিশ্বাস বেড়েছিল, আমার আশা হয়েছিল, আনন্দ হয়েছিল···

বীথি, তোমার কথা আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

বুঝতে পারছেন কিনা ঘোরালো দৃষ্টি ফেলে বীথি তাই যেন যাচাই করে নিতে চায়। ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাস চিকিয়ে উঠল।—বিভাসবাবু কেমন আছেন? লেখক বিভাস দত্ত?

এত ঠাণ্ডা অথচ এমন আচমকা ছুঁড়ল প্রশ্নটা যে রাগে লাল হওয়ার বদলে জ্যোতিরাণী হকচকিয়ে গেলেন প্রথম। জিজ্ঞাসা করলেন, হঠাৎ তাঁর কথা?

মুখের ওপর থেকে যাচাইয়ের দু চোখ নড়ছে না বীথির, কিন্তু হেসে উঠেছে।—শুধু তাঁর কথা কেন, শোক ভোলার রাস্তা যারা করে নিয়েছে তাঁদের সকলের কথাই

তো শুনেছি ··শিবেশ্বর চ্যাটার্জির কথা, কালীনাথবাবুর কথা, মিত্রাদির নিজের কথা, আপনার আর বিভাসবাবুর কথা—শুকনো শোক পুষে হাঁদার মত আমিই নাকি বসেছিলাম শুধু—

বুকের ওপর হাতুড়ির ঘা পড়ছে জ্যোতিরাণীর আর সেই সঙ্গে বুদ্ধি-বিভ্রমও ঘটছে যেন।—মিত্রাদি এসব তোমাকে বলেছে?

বীথি ঘোষ হেসে উঠল আবারও, কেন, চিনতে অসুবিধে হচ্ছে মিত্রাদিকে? জবাব না পেয়ে হাসি মিলিয়ে যেতে লাগল। জ্বলজ্বলে চাউনি গন্‌গনে মুখ। বলে গেল, একদিন না, আঁটঘাট বেঁধে আপনার কাছ থেকে আমাকে দিনের পর দিন আগলে রেখেছে আর বলেছে। একটু একটু করে আমাকে শোক ভোলাবার রাস্তায় টেনে নিয়ে গেছে আর বলেছে, তাঁর হিসেবের রাস্তায় পা চলতে চায়নি বলে উঠতে বসতে শাসন করেছে আর বলেছে—বলেছে, ওই একই আনন্দের রাস্তায় পা দিয়েছেন বলে আপনিও তাঁর হাতের মুঠোয়—বলেছে, একটি কথাও যদি আপনার কানে যায়, ফিরে আবার আস্তাকুঁড়ে মুখ থুবড়ে পড়তে হবে আমাকে, কেউ রক্ষা করতে পারবে না—উঠতে বসতে আমাকে বলেছে বুঝিয়েছে শাসিয়েছে—চাঁদা আদায়ের নামে আদর করে সাজিয়েগুজিয়ে দিনের পর দিন পয়সাঅলা এক দঙ্গল নেকড়ের চোখের সামনে আমাকে টেনে টেনে নিয়ে গেছে—তাদের থেকে একজনকে বেছে নিয়ে আমাকে তার দিকে ঠেলেছে—মিত্রাদির ভয়ে আমি ঠক-ঠক করে কেঁপেছি, ত্রাসে পাগল হয়ে আপনার কাছে ছুটে যেতে চেয়েছি—কিন্তু ততদিনে মিত্রাদি আমার সব বিশ্বাস খেয়ে দিয়েছে···আর আমার সম্পর্কেও আপনার কান বিষিয়েছে। শেষে ছবি দেখাবার নাম করে এক রাতে আমাকে নেকড়ের দলের সেই একজনের কাছে ছেড়ে দিয়ে এসেছে।···চেনেন? মিত্রাদিকে চেনেন আপনি?

জ্যোতিরাণী কি নিস্পন্দ হয়ে গেলেন? নিষ্প্রাণ হয়ে গেলেন? দুঃস্বপ্ন দেখছেন? দুঃস্বপ্নের ঘোরে শুনছেন কিছু?

বড় করে দম নিল একটা বীথি। চোখের আগুনে হাসির ছোঁয়া লেগেছে। এমনি কাঠ হবে মনে সে আশাই ছিল যেন। লঘু স্বরে বলে উঠল, শুধু আমি কেন, দেখতে ভালো এমন আরো তিনটে মেয়ের ওপর চোখ ছিল মিত্রাদির—বাসন্তী রমা আর কমলা—তাদের ওপরেও সদয় হয়ে উঠছিল—দূরে গিয়ে মনে হয়েছিল ওদেরও কাল ঘনিয়েছে—নিজের বুদ্ধির ওপর বড় বিশ্বাস মিত্রাদির, কাপুরের আশ্বাস পেয়ে ধরে নিয়েছিল ও আমাকে সাগরপারেই ফেলে আসবে, এই দেশে অন্তত আর আমার মুখ কেউ দেখবে না—এখানে থাকব না অবশ্য, তবু

এসেছি। এসেই প্রভুজীধামে ফোন করে বাসন্তী রমা আর কমলার খোঁজ করেছিলাম। আরো একটু জোরে হেসে উঠল বীথি। আমাকে নিয়েই যা একটু বেগ হয়েছিল মিত্রাদির—ওরা তো তার হাতের খেলনা, খেলনা বেচা সারা—আমাকে গছিয়ে কাপুরের কাছ থেকে মিত্রাদি পনের হাজার টাকা পেয়েছিল শুনেছি—ওরা কি দরে বিকোলো কে জানে—

মিথ্যে মিথ্যে মিথ্যে! আচম্‌কা চিৎকার করে ছিটকে উঠে দাঁড়ালেন জ্যোতিরাণী।—মিথ্যে মিথ্যে। আমি একটুও বিশ্বাস করি না—তুমি অতি ছোট অতি নীচ অতি জঘন্য!

শব্দ করে নয়, নীরবেই হাসছে বীথি। খুশি যেন, তৃপ্ত যেন।—গাড়িতে আমাকে যার সঙ্গে দেখেছিলেন সে-ই কাপুর…চারদিনের জন্য প্লেনে মাদ্রাজ গেল আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে। সে ফিরলে মিত্রাদিকে নিয়ে আসুন, দেখুন আসে কিনা। অত কেন, আমার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে তাকে বলুন গিয়ে, দেখুন কি হয়—

শরীরের মধ্য দিয়ে যেন একটা বিষের স্রোত বয়ে চলেছে জ্যোতিরাণীর। সেই জ্বালায় আর যাতনায় ঘর ছেড়ে প্রায় ছুটে বেরিয়ে এলেন তিনি। সামনে লিফট্ চোখে পড়ল না—টলতে টলতে সিঁড়ি দিয়ে নামলেন। বড় হল্ পেরিয়ে বাইরে এলেন। গাড়িতে উঠলেন। অব্যক্ত যাতনায় ভিতরটা ডুকরে উঠছে তখনো। মিথ্যে মিথ্যে মিথ্যে মিথ্যে—

মাথার ভিতরটা ছিঁড়ে-খুঁড়ে যাবে বুঝি। তাঁর নির্দেশে গাড়ি মিত্রাদির বাড়ির রাস্তায় ছুটেছে। প্রভুজীধামে শুনেছিলেন নিজের বাড়ির কি কাজে বেরিয়েছে মিত্রাদি, ফিরতে রাত হতে পারে—বেশি রাত হলে প্রভুজীধামে নাও ফিরতে পারে। চমকে উঠলেন, ছায়া-ভীতি যেন।…বলা সত্ত্বেও মিত্রাদি না জানিয়ে মাঝে-মাঝেই এমন নিখোঁজ হয় কেন? না, মিথ্যে বিষ ঢেলেছে বীথি, মিথ্যে মিথ্যে—

মিত্রাদির বাড়ির দরজায় গাড়ি থামল। অভ্যাসে শৌখিন বড় ব্যাগটা হাতে করেই দরজা খুলে নামলেন। দোতলার দিকে তাকালেন। আছে… ঘরে আলো জ্বলছে। কিন্তু পা বাড়াবার আগেই আবার এক ধাক্কা।

সামনে আর একটা গাড়ি। চেনা গাড়ি। অতি চেনা। নিজের বাড়ির মালিকের গাড়ি। গাড়িতে ঠেস দিয়ে ড্রাইভার দাঁড়িয়ে। প্রভুপত্নীকেই দেখছে। নিজের অগোচরেই জ্যোতিরাণী এগিয়ে গেলেন দু পা।—কি ব্যাপার, বাবু এখানে?

ড্রাইভার মাথা নাড়ল। অত আলো নেই বলে হোক বা জ্যোতিরাণীর মাথায় আর কিছু ঠাসা বলে হোক, ড্রাইভারের বিব্রত ভাব চোখে পড়ল না।

অবাক তিনি। সব তাল-গোল পাকিয়ে যাচ্ছে কেমন।…এখানে আবার কেন! আবার কি ফাংশন-টাংশান এলো…কি এমন আলোচনার দরকার হয়ে পড়ল। বিরক্ত, সঙ্গে আরো কারা আছে কে জানে। কিন্তু এই মুহূর্তে মিত্রাদিকে না পেলেই নয়—যে-ই থাক জ্যোতিরাণী বিদায় করতে চেষ্টা করবেন, না পারেন অপেক্ষা করবেন।

ওপরে এলেন। সামনের বড় ঘরে পা দিলেন। কেউ নেই। বাড়িতেই জনপ্রাণী নেই যেন। জ্যোতিরাণীর মাথায় কিছু ঢুকছে না, নিজের অজ্ঞাতে ব্যাগটা টেবিলে রেখেছেন।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতই দাঁড়িয়ে গেলেন তারপর। ঘরের ও-মাথায় শোবার ঘরের দরজা দুটো ভিতর থেকে বন্ধ।

কানের মধ্যে মাথার মধ্যে বুকের তলায় চেতনার একশ দামামা একসঙ্গে বেজে উঠল বুঝি। পা থেকে মাথা পর্যন্ত সমস্ত অস্তিত্বের ওপর সেই চেতনার আঘাত বেজে চলল। পড়ে যেতে গিয়েও টেবিলটা আঁকড়ে ধরে দাঁড়ালেন।

…সামনে বন্ধ দরজা। অপলক কয়েকটা মুহূর্ত।

ঊর্ধ্বশ্বাসে আবার ঘর থেকে ছুটে বেরুলেন জ্যোতিরাণী।

গাড়িটা বেগে চলেছে।

অস্তিত্বগ্রাসী সেই দামামা থেমেছে। মস্তিষ্কের কোষে কোষে চেতনার বিদ্যুৎ-চমক স্থির হয়েছে। ঝাঁকুনিখাওয়া স্নায়ুগুলো আর ছিঁড়ে-খুঁড়ে যাচ্ছে না। শিরায় শিরায় রক্ত আর দাপাদাপি করছে না। বুকের স্পন্দনও থেমে আছে বুঝি। আলো নেই, বাতাস নেই, শব্দ নেই, গতি নেই, প্রলয়-শেষের এমনি এক নিথর শূন্যতার গভীরে ডুবে গেছেন জ্যোতিরাণী।

গাড়ি বাড়ির সিঁড়ির পাশে এসে দাঁড়াল। ড্রাইভার নেমে পিছনের দরজা খুলে দিল।

নামতে হবে। অভ্যাসে হাত বাড়িয়ে এপাশ-ওপাশে কি খুঁজলেন তিনি। ভ্যানিটি ব্যাগটা। পেলেন না।…ওখানকার ওই ঘরের টেবিলের ওপর রেখেছিলেন। সেখানেই ফেলে এসেছেন। মুহূর্তের জন্য ভিতরটা সঙ্কুচিত হয়ে উঠল।…ওই বন্ধ দরজা খুললেই ওটা চোখে পড়বে।

পড়ুক। ভালই হয়েছে। এই তুচ্ছটুকু অন্তত ওপরঅলার সদয় পরিহাস।

দরজা খুলে যারা ওটা দেখবে, তারা ভুল ভাববে না, ইচ্ছে করেই রেখে আসা হয়েছে ভাববে। যা জানবার জানবে। যা বোঝবার বুঝবে। কিছু একটা দায় বাঁচল জ্যোতিরাণীর। মস্ত দায়। ওটা দেখার পর বাড়ির মালিক এই রাতে আর বাড়ি ফিরবে না মনে হয়।...তার ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলেও সে বলে দেবে কে এসেছিল, কখন এসেছিল, কখন চলে গেছে।

নেমে এলেন। এই রাতের মত অবকাশ মিলবে আশা করা যায়। অবকাশ কেন দরকার সঠিক জানেন না।

সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠে গেলেন। কারো চোখের সামনে পড়তে চান না তিনি। কালীদার ঘরে আলো জ্বলছে। ওধারে শাশুড়ীর ঘর থেকে সিতুর গলা শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ বড় হবার ফলে ওটাই এখন পড়ার ঘর করে নিয়েছে। পড়ে যখন গলা ছেড়ে পড়ে।

ঘোরানো বারান্দা ধরে নিঃশব্দে পা বাড়ালেন জ্যোতিরাণী। ঘরে ঢোকার তাড়া। অলক্ষ্যেই ঘরে ঢুকতে পারলেন। অন্ধকার কাম্য, তবু আলোটা জ্বাললেন। শয্যায় এসে বসার পর অদ্ভুত লাগছে। যোল বছর বয়সে এই সংসারে এসেছিলেন। মিত্রাদি বলে, এ-জীবনে তাঁর আর তেইশ পেরুবে না, কিন্তু আসলে তিরিশ পেরুতে চলল। এর মাঝে অনেক প্রাণান্তক ঘা খেয়েছেন, অনেকবার বুকের ভিতরটা দুমড়ে ভাঙতে চেয়েছে। তবু বাইরে থেকে যখন ফিরেছেন, সংসারের চিত্রটা মুছে যায়নি—সংসারেই ফিরেছেন মনে হয়েছে।

...কিন্তু আজ তিনি কোথা থেকে কোথায় ফিরলেন? ওই সিঁড়ি ধরে উঠে, ঘোরানো বারান্দা পেরিয়ে, এযাবৎ কত সহস্রবার এই ঘরে এসে ঢুকেছেন, কত দিন কত মাস কত বছর এই শয্যার আশ্রয়ে কেটেছে। তবু আজ কোথা থেকে কোথায় ফিরলেন তিনি? তাঁর বাড়িতে? তাঁরই ঘরে?

বসেই আছেন। এত দিনের এত কালের সব যোগ যেন বাষ্প হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। অধিকারের সবগুলো গ্রন্থি ঢিলে হয়ে খুলে খুলে পড়ছে। এটা সাজঘর? এখান থেকে সেজেগুজে অধিকারের অভিনয় করছিলেন? কি করবেন এর পরে, অভিনয়ের এই দখলটুকুই আঁকড়ে থাকবেন?

চমকে উঠলেন। পাশের ঘরে আলো জ্বলছে। ভেনটিলেটর দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে।...না। ফিরলে ওই গাড়ির শব্দ অন্তত কানে আসত। শামু বা ভোলা কেউ হবে। কিছু রেখে গেল বা দেখে গেল মনিবের ঘর ঠিক আছে কিনা। চেষ্টা করেও এক সদার জায়গা ওরা দুজনে মিলে জুড়তে পারছে না, সর্বদাই ভয়।

রাধা গেল কেন? আশ্চর্য, কবছর আগের প্রশ্ন এত তাজা হয়ে ভিতরে

লুকিয়েছিল।

ভেন্‌টিলেটারের ওদিকটা অন্ধকার আবার। যে এসেছিল চলে গেছে। আর একবার এসে মনিবের রাতের খাবার ঢেকে রেখে যাবে। যার জন্যে রাখা আজ তার ফেরা সম্ভব নয়। সম্ভব-অসম্ভবের রাস্তা ধরে আর চিন্তা করার কথা নয় জ্যোতিরাণীর। তবু ধারণা এই রাতের অবকাশটুকু মিলবে।

…শাশুড়ী গত হবার পর থেকে রাতের বাড়ি ফেরায় ছেদ পড়ছিল মাঝে মাঝে। মা চোখ বোজার পর বাড়ির টান গেছে সেটাই বোঝাবার চেষ্টা ধরে নিয়েছিলেন। তাছাড়া স্বয়ংসফল মানুষের গাড়ি হাঁকিয়ে দূরপাল্লায় ছোটাছুটি আছে, সংস্কৃতির অনুষ্ঠান আছে, ক্লাব আছে, পার্টি আছে, রাতের মজলিশ আছে—রাতে না ফিরলেও কোনদিন কুৎসিত আঁচড় পড়েনি।

…পড়েনি কেন? না পড়ার কথা নয়, তবু কেন পড়েনি? জ্যোতিরাণীর বড় বেশি আস্থা ছিল নিজের ওপর?

তাঁর চেহারা নিয়ে মিত্রাদি কতদিন কত গর্ব করেছে, কত ঠাট্টা করেছে, কত টীকা-টিপ্পনী কেটেছে। ভালও লেগেছে কত সময়। স্তুতির আড়ালে মিত্রাদি ব্যঙ্গ করেছে আর নিজে আড়াল নিয়েছে। এ-বাড়ির ঘরোয়া ব্যাপারে তার অনেক দিনের অনেক কৌতূহলের তাৎপর্য অস্পষ্ট নয় আর। বাড়ির মালিকের মেজাজের এত পরোয়া কেন করে, তাও না।…খেয়াল-খুশি মত প্রভুজীধাম থেকে নিখোঁজ হয়। জানিয়ে যেতে বললেও জানাতে ভুলে যায়। বাড়ির জরুরী কাজে আটকানোর ফলে রাতে আর নাও ফিরতে পারে বলে যায় সেখানে। মাসে কদিন করাত এ-রকম জরুরী কাজ পড়ে, সেটা জ্যোতিরাণীকে জানাবার মত বুকের পাটা সেখানকার কোনো মেয়ের নেই। থাকলে বীথি ভেসে যেত না। মিত্রাদিকে চিনেও, জেনেও তার গ্রাস থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি। বীথির পরে আরো তিনটে মেয়ে গেছে। বীথি বলেছে তার তুলনায় মিত্রাদির হাতের খেলনা ওরা। খেলনার মতই সহজে বিকিয়েছে।…এখনো মোটামুটি ছুটো সুশ্রী মেয়ের ওপর চোখ মিত্রাদির। ওদের সম্পর্কে তাঁর কানে নালিশ তোলা শুরু করেছে, আড়ালে সন্দেহের বীজ ফেলতে শুরু করেছে। যেমন করেছিল শেষের দিকে বীথির নামে। যেমন করেছিল বাসন্তী কমলা রমার নামে। এভাবে সংশয়ের উদ্রেক করে আর সুশ্রী মেয়ে নেবার নামে বিতৃষ্ণা দেখিয়ে চোখে ঠুলি পরিয়ে রেখেছিল জ্যোতিরাণীর।

…শেষের এই মেয়ে ছুটো বেঁচে গেল। ভবিষ্যতের কথা জানেন না, আপাতত বাঁচল। মিত্রাদির জরুরী কাজ শিগগীর আর শেষ হবে না আশা করা যায়।…

ভ্যানিটি ব্যাগ ফেলে আসাটা সব দিক থেকেই দামী ভুল। বীথির খবরটা আজ আর জানবে না। কিন্তু শিগগীরই জানবে। জ্যোতিরাণীই ব্যবস্থা করবেন।

স্থির নিশ্চল বসে আছেন। তপ্ত রক্তকণা আবার মুখের দিকে জমাট বাঁধছে।

এর পর প্রভুজীধামের কি হবে প্রভুজী জানেন। তিনি সজাগ থাকলে এ-রকম হবে কেন? তাঁর আশ্রয় থেকে একজনের বিকৃত লোভ এভাবে মেয়েগুলোকে সর্বনাশের রাস্তায় টেনে নিয়ে যেতে পারল কেন? না, জ্যোতিরাণীর আর কোনো দায় নেই, আর কিছুমাত্র মোহ নেই।

কিন্তু এদিকের এই ব্যাপার কতদিন ধরে চলছে?

বিয়ের পর থেকে ও-ঘরের মানুষ সন্দেহের বিষ ঢেলে ঢেলে জীবন বিষিয়েছে তাঁর। সন্দেহ এখনো ঘোচেনি। অনেক কুৎসিত আচরণের পর মামাশ্বশুর আর কালীদাকে অব্যাহতি দিয়েছে, কিন্তু, বিভাস দত্তকে দেখলে ওই কদর্য সন্দেহের বিষে দু'চোখ ছুরির ফলার মত চকচকিয়ে ওঠে। জ্যোতিরাণী কত দেখেছেন ঠিক নেই। নিজেকে জানে বলেই এত অবিশ্বাস, এমন বিকৃতি।···কিন্তু এই গোপন উৎসব কত দিনের কত কালের ব্যাপার?

চিন্তাটা নিরর্থক, দশ দিনের হলেই বা কি দশ বছরের হলেই বা কি। একাগ্র নিবিষ্টতায় তবু ভেবে চলেছেন। স্বাধীনতার আগের সন্ধ্যায় বিভাসবাবুর অন্ধতামিস্র পড়ার সময় ছেলের আলো নেভানোর কাণ্ডটা পরদিন চন্দননগরের মজলিশে হাসির ব্যাপার হয়েছিল নাকি। নেহাত হাসির ব্যাপার বলেই মিত্রাদি না বলে থাকতে পারেনি।···বাড়ির মালিক আগের দিন থেকে অনুপস্থিত, কিন্তু জোর তলব পেয়ে মিত্রাদি চন্দননগর ছুটেছিল পরদিন সকালে, সেখানে গিয়ে দেখে এ-বাড়ির মালিকও উপস্থিত। রাতে তাঁর গাড়িতে তাঁর সঙ্গেই পালিয়ে এসেছিল। যোগাযোগ বটে।

···সংস্কৃতির আসরে আর সামাজিক মজলিশে ও-রকম অন্তরঙ্গ যোগাযোগের নজির একটা নয়। জ্যোতিরাণী আগেও শুনেছেন। মিত্রাদিই গল্প করত। বিলেত যাবার কিছু আগে থেকে সংস্কৃতি আর সামাজিক অনুষ্ঠানের যোগাযোগ বেড়েছিল মনে পড়ে। ও-ঘরের ওই লোকের সঙ্গেই তারপর বিলেত গিয়ে ব্যারিস্টার স্বামীর কাছ থেকে টাকা আদায় করে সম্পর্ক ছিঁড়ে এসেছে।···ও-ঘরের মানুষের যাবার কথা ছিল আমেরিকা, কিন্তু মিত্রাদিকে সঙ্গে করে গেছেও লণ্ডন হয়ে, ফিরেছেও লণ্ডন হয়ে।

সেখান থেকেই সূত্রপাত? এক সম্পর্ক ছিঁড়ে মিত্রাদি আর এক সম্পর্ক বুনেছেন?

কিন্তু আবারও মনে পড়ছে কি। বিলেত যাবার আগে কালীদার মুখ, কালীদার কথাবার্তা। ততদিন পর্যন্ত মিত্রাদির যে সিতুর থেকেও বড় মেয়ে আছে, জ্যোতিরাণী কেন, তার বিলেতের সঙ্গীও জানত না। কালীদা জিজ্ঞাসা করে বসেছিলেন, মেয়েকে রেখে যাচ্ছে কিনা।···সকলে অবাক হয়েছিল আর মিত্রাদি হকচকিয়ে গেছল। আর, তাদের প্লেনে তুলে দিয়ে এসে অত রাতে বাড়ি ফিরেও কালীদা তাঁর কালো বাঁধানো নোটবই নিয়ে বসে গেছলেন মনে আছে। সেই রাতেই কালীদা অত মনোযোগ দিয়ে লেখার কি পেয়েছিলেন ?

চিন্তার এক ছায়া আর এক ছায়া টানে বোধ হয়।··· মিত্রাদি বিলেত যাবার অনেক আগে থেকেই তার প্রতি কালীদার ব্যবহার স্বাভাবিক মনে হত না। বিলেত থেকে ফেরার পর সেটা আরো বিসদৃশ লাগত। আবার যে মানুষ টাকার গর্বে আর আত্মগর্বে ধরাকে সরা দেখে, সেই লোক দুনিয়ায় এই একজনকেই ভিতরে ভিতরে সমীহ করে চলে। শুধু কালীদাকে। শুধু তাঁর বিরাগের ভয়ে বিকৃত ক্ষোভের সেই চরম মুহূর্তেও প্রভুজীধামের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা আর ওই বাড়ি ছেড়ে দিয়ে রফা করতে বাধ্য হয় শেষ পর্যন্ত। কালীদা শুধু বলেছিলেন, না দিলে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন। ওটুকুতেই অমন জাদুমন্ত্রের মত কাজ হল কেন ? কেন কেন কেন ?

কেন, এবারে জানতে পারবেন বোধ হয়। জ্যোতিরাণীর ধারালো দু চোখে পলক পড়ে না। যেখানে জানা সম্ভব সেখান থেকেই কিছু জেনে নিতে পারবেন, বুঝে নিতে পারবেন। কালীদার কাছ থেকেই। আজ আর জ্যোতিরাণীর কোনো দ্বিধা নেই, সঙ্কোচ নেই। আর, ওই ভদ্রলোকেরও কিছু জানা দরকার কিছু বোঝা দরকার। যতটা সম্ভব তিনি জানিয়ে দেবেন, বুঝিয়ে দেবেন। চোখা-চোখা বাক্যবাণে আর বিদ্রূপবাণে মিত্রাদিকে যতই বিদ্ধ করুক, তার প্রতি এখনো কালীদার টান আছে মায়া আছে দুর্বলতা আছে, এ জ্যোতিরাণী বিশ্বাস করেন। সে-জন্যেই সবার আগে তাঁকে জানাবার আক্রোশ।···জানলে উপকার হবে, মোহ খসে পড়বে।

ঘড়ির দিকে চোখ পড়ল। সবে আটটা রাত্রি। শীতের রাত, তাও কম নয়। একজন ফিরবে না বলে সমস্ত রাতটাই তাঁর হাতে নেই। উঠলেন। স্যুটকেস খুলে কিছু জামা-কাপড় গুছিয়ে নিলেন। পোশাক শাড়ি বা জামার দিকে ফিরেও তাকালেন না। টুকিটাকি কয়েকটা নৈমিত্তিক দরকারী জিনিসও স্যুটকেসেই পুরে নিলেন। তারপরে সমস্যা।

···টাকা।

আলমারি খুলে গোছা গোছা নোট বার করে নিতে পারেন। ব্যাঙ্কে নিজের নামে চেকবই পাসবইগুলো নিলেও টাকার সমস্যা বরাবরকার মত মিটতে পারে। কিন্তু ভাবতেও বিতৃষ্ণা। দু-দশ দিনের জন্যে যা না হলে নয় তাই নিলেন শুধু। গুণে একশটি টাকা। এ-বাড়ির এই সাজঘরে বসে একটানা প্রায় পনের বছর অধিকারের অভিনয় করলেন···অভিনয়েরও তো দক্ষিণা মেলে। সেই বিবেচনায়ও বেশি নিতে পারতেন। থাক, ওতেই হবে, বেশিতে রুচি নেই। কিছুদিন চলার মত নিজস্ব কিছুও আছে।···কোথায় কোন্ ট্রাঙ্কে রেখেছেন সে-সব ঠিক মনে পড়ছে না।

গয়নার ওই ছোট ট্রাঙ্কেই হবে। আরো অনেক দামী গয়না আছে ওতে। ব্যাঙ্কেও কত আছে ঠিক নেই। উপার্জনের প্রথম দিকের বন্যায় আনুষঙ্গিক ঝামেলা সামলাবার জন্যেই ও-ঘরের মানুষ মাথা খাটিয়ে স্ত্রীর গয়নার আকারে অনেক টাকা আটকে রেখেছিল। আর, তার পরেও এত এসেছে যে ওদিকে আর তাকানোর দরকার হয়নি। ট্রাঙ্কটা টেনে সামনে আনলেন। নিজের হাত দুটো আর গলার দিকে তাকালেন একবার। গায়ে গয়নার বোঝা নেই অবশ্য, যাও আছে নেহাত কম নয়, কম দামী তো নয়ই।

একে একে সবগুলো খুলে ফেললেন। বাঁধানো শাঁখা-জোড়া থাকল শুধু। ও দুটো শ্বশুরের দেওয়া। ট্রাঙ্কে সে-সব গুছিয়ে রাখলেন, আর যা খুঁজছিলেন তাও পেলেন। ছোট-বড় আর কতগুলো গয়নার কেস-এর পুঁটলি। বাবার অবশিষ্ট টাকা দিয়ে মা সাধ্যমত সাজিয়েগুজিয়ে মেয়েকে বড়ঘরে পাঠিয়েছিলেন। সে-দিনের তুলনায় কম নয় খুব। গয়নাপত্র দেখে শ্বশুরবাড়িতে মায়ের দরাজ হাতের প্রশংসা হয়েছিল মনে আছে। শ্বশুরবাড়ি থেকে তাড়ানোর পর কিছুকালের অনটনের সময়েও মানী লোক এ-সবে হাত দেয়নি। টাকা আসা শুরুর পর হাত দেবার তো প্রশ্নই ছিল না। উল্টে একের পর এক নতুনের আমদানিতে পুরনোগুলো ওই পুঁটলির আশ্রয়ে গেছে।

বেছে সরু একছড়া হার আর সাধারণ দুটো দুল পরে নিলেন জ্যোতিরাণী। চুড়িগুলো একটাও হাতে ঢুকল না, অনেকটাই মোটা হয়েছেন দেখা যাচ্ছে,···সুখে ছিলেন বলতে হবে। সুখ! বুকের তাপ বাড়ছে ক্রমাগত। গয়না বাছা বা গয়না পরার সময় নয় এটা। উল্টে বিরক্তিকর লাগছে। কিন্তু হাত একেবারে খালি করে ব্যতিক্রমটা কারো চোখেই বড় করে তোলার ইচ্ছে নেই। নিজের চোখেও নয়। দু হাতে দুটো বালা শুধু পরা গেল। পুঁটলিটা আবার বেঁধে সুটকেসএ ফেললেন। যা থাকল ওতে, এ চড়া বাজারে তারও অনেক দাম। দুই-

একখানা বিক্রি করে নগদ একশ টাকাও ফেরত পাঠানো যেতে পারবে।

সাড়ে আটটা। জ্যোতিরাণী প্রস্তুত।

এ-সময়েই সিতু খেতে বসে। কালীদার কাছে সময় লাগতে পারে একটু, ততক্ষণে ওর খাওয়া হয়ে যাবে। স্যুটকেসটা খাটের ওপর তুলে রেখে ঘর থেকে বেরুলেন। বুকের ভেতরটা কাঁপছে না, মুখে একটা রেখাও পড়ছে না। কাঁপতে দিচ্ছেন না, পড়তে দিচ্ছেন না।

মেঘনা সিতুর খাওয়ার কাছে দাঁড়িয়েছে। এই রকমই আশা করেছিলেন জ্যোতিরাণী। পায়ে পায়ে কালীদার ঘরে ঢুকলেন।

টেবিলে খোলা কাগজপত্র কিছু। চেয়ারে ঠেস দিয়ে টেবিলের ওপর দু পা তুলে হাল্‌কা মেজাজে সামনের দেয়াল দেখছিলেন আর এক-একবার একটু একটু শিস দিচ্ছিলেন কালীদা। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন একবার। টেবিল থেকে পা নামিয়ে সোজা হয়ে বসলেন। তারপর ভালো করে লক্ষ্য করলেন যেন। নিজেই আগে জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার, চোখ-মুখ এ রকম দেখছি কেন?

কি রকম দেখছেন কালীদাই জানেন, জ্যোতিরাণী অস্বাভাবিক কিছু দেখাতে চাননি। কিন্তু কালীদার দেখার ধার আলাদা, সময়ে এই ধার কাজে লাগালে আজ এই দিনে এসে ঠেকতে হত কিনা কে জানে। বললেন, আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে—

কালীদার কৌতুক সর্বদাই গাম্ভীর্যে মোড়া। কিন্তু কেন যেন সেটা সহজাত ভাবে এলো না তেমন। চেষ্টা করে লঘু ব্যঞ্জনা মেশাতে হল।—ভয়ের ব্যাপার মনে হচ্ছে, বোসো না...।

জ্যোতিরাণী দাঁড়িয়েই রইলেন। স্থির নিষ্পলক দু চোখ তাঁর মুখের ওপর রেখেই জিজ্ঞাসা করলেন, প্রভুজীধামে বীথি নামে একটা মেয়ে দু বছর আগে কার সঙ্গে চলে গেছল, আপনি শুনেছিলেন?

আর যাই হোক, হঠাৎ এ প্রসঙ্গ আশা করেননি কালীনাথ। অবাক তাই। —মামু বলেছিল। তারপরে একে একে আরো কটা মেয়ে চলে গেছে বলে তোমরা খুব ভাবনায় পড়েছ শুনেছিলাম—

হ্যাঁ। বাসন্তী কমলা আর রমা।

বক্তব্য কিছুই বুঝছেন না কালীনাথ।—তা কি হয়েছে, আরো কেউ গেছে নাকি?

যায়নি। আপনি ব্যবস্থা না করলে আরো দুটো মেয়ে যাবে।

কয়েক নিমেষের জন্য মাত্র হতচকিত কালীনাথ। তারপরেই কুশাগ্রবুদ্ধি

মানুষটার মুখে ঘোরালো ছায়া নেমে আসতে লাগল। সবই দুর্বোধ্য তবু অজ্ঞাত কোনো বিপাকের ঘ্রাণ পেলেন যেন। চেয়ারসুদ্ধ আর একটু ঘুরে ভালো করে তাঁর মুখোমুখি হলেন।—বুঝলাম না, সোজাসুজি বলো।

সোজাসুজিই বলবেন জ্যোতিরাণী। সোজাসুজি বলবেন, সোজাসুজি কিছু শুনতেও চাইবেন। ভাসুর সম্পর্কের কৃত্রিম সঙ্কোচ ছেঁটে দিয়েই ঘরে ঢুকেছেন। খুব ধীরে, খুব স্পষ্ট করে বললেন, বীথি আর তার পরের ওই তিন মেয়ে ইচ্ছে করে কোথাও যায়নি। মিত্রাদি তাদের যেতে বাধ্য করেছে। খুব হিসেব করে বেঁধে-ছেঁধে মিত্রাদি একে একে জালে আটকেছে তাদের, তারপর টাকা নিয়ে বেচে দিয়েছে। বীথির জন্যে পনের হাজার টাকা পেয়েছিল, বাকি তিন জনের জন্য কত পেয়েছে জানি না। এখন আর দুটো মেয়ের ওপর চোখ পড়েছে তার—

কালীদাকে চমকে উঠতে বা আঁতকে উঠতে দেখবেন ভেবেছিলেন। তিনি বিভ্রান্ত বটে, কিন্তু প্রতিক্রিয়া যতটা আশা করা গেছল ততটা নয়।

কালীনাথ গম্ভীর, নির্বাক খানিকক্ষণ।—এ খবর তুমি কবে জেনেছ?

আজ। বীথি আর দেশে ফিরতে পারবে মিত্রাদি ভাবেনি।...আমার সঙ্গে আজ তার দেখা হয়েছে।

বীথি সত্যি বলেছে?

হ্যাঁ। আপনি বিশ্বাস করেন না?

করি।

জিজ্ঞাসা করা মাত্র দ্বিধাশূন্য এই জবাব পাবেন ভাবেননি। চেয়ে আছেন। —মিত্রাদি এ-কাজও করতে পারে আপনি জানতেন?

না। তবে তার দ্বারা অনেক কিছু সম্ভব জানতাম।

ঈষৎ অসহিষ্ণু স্বরে জ্যোতিরাণী বললেন, এত বড় একটা কাজে নামা সত্ত্বেও আপনি আমাকে সে-রকম আভাস দেননি তো?

অভিযোগের এই সুরটা কানে লাগল কালীনাথের। নির্লিপ্ত গম্ভীর দু চোখ তাঁর মুখের ওপর তুললেন।—যতটা সম্ভব দিয়েছিলাম। ঠাট্টা ভেবে হোক বা আর কিছু ভেবে হোক তুমি তা নিয়ে চিন্তা করা দরকার মনে করোনি। যাক, এখন কি করতে চাও?

পুলিসে খবর দিতে পারেন। জ্যোতিরাণী আরো কিছু বুঝিয়ে দেবেন, কিন্তু তার আগে এখনো দেখে নিতে চান প্রতিক্রিয়া কি-রকম হয়।

কালীনাথ ভাবলেন একটু।—বীথিকে সাক্ষী পাবে?

দুই-এক মুহূর্ত সময় নিয়ে জ্যোতিরাণী মাথা নাড়লেন, পাবেন না।

আর যারা গেছে তাদের কাউকে ?

তাদের কারো সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।

পুলিস টানলে তুমিই সব থেকে বেশি জড়াবে তাহলে। তোমার প্রতিষ্ঠান, দায়িত্বও তোমার। তা ছাড়া যারা গেছে তারা নাবালিকা নয়, সাক্ষীপ্রমাণ ছাড়া নালিশ কেউ কানে তুলবে না, মাঝখান থেকে দুর্নামে তোমার প্রভুজীধাম অচল হবে। তার থেকে আর কি করা যায় ভাবো—

এবারে সময় হয়েছে, আরো ঠাণ্ডা আর স্পষ্ট স্বরে জ্যোতিরাণী বললেন, প্রভুজী-ধাম অচল হবে কিনা বা আর কিছু করা দরকার কিনা এখন থেকে সেটা আপনি ভাবুন। আমি আর এখানে থাকছি না।

শেষের উক্তি সঠিক বুঝে উঠলেন না।—কোথায় থাকছ না ?

এখানে। এই বাড়িতে।

নির্বাক বিস্ময়ে কালীনাথ চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। যা শুনলেন স্পষ্ট নয় যেন খুব। কিন্তু স্পষ্ট হতে থাকল একটু একটু করে। কিছু একটা সম্ভাব্য ব্যাপার মগজের দিকে ঠিকই এগিয়ে আসতে লাগল। একজন মেয়ে বেচেছে বলেই আর একজনের বাড়ি ছাড়ার কথা নয়। আরো কিছু ঘটেছে। এতক্ষণের স্থৈর্য তোল-পাড় করে যে সন্দেহটা ধরাছোঁয়ার মধ্যে এগিয়ে আসছে, সেই গোছেরই কিছু ঘটেছে।

সামনে যে দাঁড়িয়ে সম্পর্কে তাঁর ভাসুর তিনি ভুলে গেছেন। ওই কঠিন মুখের অদৃশ্য রেখাগুলোই দেখে নিচ্ছেন বুঝি। আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এখন কোথা থেকে আসছ ?

মিত্রাদির বাড়ি থেকে।

সে জেনেছে এ-সব ?

না।

তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি ?

না।

বাড়ি ছিল না ?

ছিল।

কালীনাথ চেয়ারে বসে থাকতে পারলেন না আর। একটা উদ্গত উত্তেজনা সামলাবার চেষ্টায় উঠে তাড়াতাড়ি জানলার কাছে চলে গেলেন। উত্তেজিত হন না বড়। কিন্তু এ একটা স্বতন্ত্র মুহূর্ত। কত স্বতন্ত্র তিনিই জানেন। বুঝতে সময় লাগে না তাঁর, যা বোঝবার খুব স্পষ্ট বুঝেছেন। তবু ফিরলেন আবার, কাছে

এসে দাঁড়ালেন।—শিবুও ওখানে ছিল তাহলে?

জ্যোতিরাণী জবাব দিলেন না। এটাই জবাব। ভদ্রলোক বুঝেছেন। এত সহজে বোঝার কথা নয়, তবু বুঝেছেন। কিন্তু এই স্তব্ধ মুহূর্তেও ভিতরে ভিতরে অবাক তিনি। দুর্ভাবনা নয়, দুশ্চিন্তা নয়, কালীদার দু চোখ চকচক করছে। এই গাম্ভীর্যের তলায় তলায় কঠিন কৌতুকের আভাস ঝিলিক দিচ্ছে, দাগ ফেলতে চাইছে। জানতেন জানতেন, এই ভদ্রলোক অনেক আগে থেকে অনেক কিছু জানতেন!

অস্ফুটস্বরে কালীনাথ প্রায় স্বীকারই করলেন যেন, মাথা গরম করে কি লাভ, সবই দুর্ভাগ্য...

কিন্তু জ্যোতিরাণী ঠিক দেখছেন? সে-রকম বিচলিত হওয়া দূরে থাক, তিনি ঘর ছেড়ে বেরুলে ভদ্রলোক হাসতেও পারেন মনে হচ্ছে। চেয়ে আছেন।—দুর্ভাগ্যের ব্যাপারটা আপনি কবে থেকে জানেন?...স্বামীর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে আর টাকা আনতে মিত্রাদি একসঙ্গে যখন বিলেত গেল, তখন থেকে?

কালীনাথ সময় নিলেন একটু, জবাবটা হাল্‌কা না শোনায় সেই চেষ্টা। বললেন, বিলেতে মিত্রাদির স্বামী বলে কেউ নেই, কেউ কোনদিন ছিলও না। সে কারো সঙ্গে বোঝাপড়া করতে যায়নি, টাকা আনতেও না।...শিবুর সঙ্গে লণ্ডন হয়ে আমেরিকায় গেছল, শিবুর সঙ্গেই ফিরেছে।

জীবনের এমন এক মর্মান্তিক ক্ষণেও জ্যোতিরাণী হতভম্ব বিমূঢ় কয়েক মুহূর্ত।—মিত্রাদির স্বামী নেই?

আছে। কোয়েমবেটোরের এক হাসপাতালের আধা চ্যারিটেবল বেডএ পড়ে আছে। কোমর থেকে পা অবধি প্যারালিসিস, আর উঠবে না। বছর আটেক আগে তোমার মিত্রাদি সেই হাসপাতালের মুরুব্বিদের হাতে একবারে কিছু টাকা দিয়ে সম্পর্ক চুকিয়ে এসেছে।...সেবারে আমি সাউথ্‌এ গেছলাম স্বচক্ষে ভদ্রলোককে একবার দেখে আসতে। তার ফলে টাকাও বেশ খসেছে, ভদ্রলোক বছরের পর বছর টিকে আছে দেখে হাসপাতালের লোকেরা কেউ খুশি নয়।

জ্যোতিরাণীর মনে আছে। দিন পনেরোর জন্যে কালীদার হঠাৎ দক্ষিণে ঘুরে আসার কথা মনে আছে। এই মুহূর্তের সব রাগ আর ক্ষোভ কালীদার ওপরে।—দুজনে একসঙ্গে বিলেত যাচ্ছে দেখেও আপনি আমাকে কিছু জানালেন না?

একটু ভাবার মত করে কালীনাথ জবাব দিলেন, তারও বছর দেড়েক আগে জানালে ফল হতে পারত। কিন্তু তখন নিজেই খুব ভালো বুঝে উঠতে পারিনি।

অর্থাৎ জটটা তারও দেড় বছর আগে পাকিয়েছে। ক্ষমা যেন জ্যোতিরাণী

কালীদাকেই করতে পারছেন না।—তবু এতদিনের মধ্যে আপনি আমাকে কিছুই বলেননি কেন?

চেয়ারটা টেনে আবার বসলেন কালীদা। উত্তরে নির্লিপ্তগোছের সাদাসিধে মন্তব্য করলেন, এ-সব ব্যাপার শেষ পর্যন্ত চাপা থাকে না বলেই অশান্তি…।

জ্যোতিরাণী শান্ত থাকতে চেয়েছিলেন, ঠাণ্ডা থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দুঃসহ একটা তাপ মুখের দিকে ধেয়ে আসছে, চোখ দুটো জ্বালা-জ্বালা করছে।—আপনি এত সব খবর রাখেন সেটা এদিকেরও জানা আছে বোধ হয়?

কার, শিবুর…?

বিড়ম্বিত গাম্ভীর্যের আড়ালে আবারও একটা কৌতুকতরঙ্গ ঝিলিক দিয়ে গেল কিনা ঠাওর করা গেল না। জ্যোতিরাণী অপেক্ষা করছেন।

আগে জানত না। বিলেত থেকে ফেরার পর আমার বোকামিতে জেনেছে।

বোকামিটা যেন এখনো মুখে লেগে আছে কালীদার। সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিরাণী বলে উঠতে যাচ্ছিলেন, সেই বোকামির ফলেই আজ তিনি এ-বাড়ির মালিকের ওপর দিয়ে মাথা উঁচিয়ে আছেন কিনা। সামলে নিলেন। মনে হল, এই মানুষের ভিতরেও একটা যন্ত্রণা লুকিয়ে আছে, এত বড় নগ্ন ব্যাপারটা লঘু করে তোলার চেষ্টা সত্ত্বেও তারই তাপ থেকে থেকে চিকচিক করে উঠছে। যাক, অনেক জানা হয়েছে, আর একটু বাকি। কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, চল্লিশ বছর কাটিয়ে সদা হঠাৎ এখানকার কাজ ছেড়ে চলে গেছে কেন?

এবারের বিড়ম্বিত মুখে বিব্রত হাসি। বললেন, তুমি তো মুশকিলে ফেললে দেখছি! আজ আর নয়, সময়ে জানবে।

অসহিষ্ণু নীরবতায় জ্যোতিরাণী অপেক্ষা করলেন একটু, তারপর ধীর কঠিন স্বরে বললেন, সময় আর না-ও আসতে পারে, আমি আজই এখান থেকে চলে যাচ্ছি।

এবারে যথার্থই বিড়ম্বনার মধ্যে পড়লেন যেন কালীনাথ। আবার চেয়ার ছেড়ে উঠতে হল। অনুচ্চ অনুশাসনের স্বরে বললেন, পাগলামি কোরো না, মিথ্যে অশান্তি বাড়িয়ে লাভ কি?

কার অশান্তি বাড়বে?

সকলেরই, তোমারও।

আপনি তাহলে কি করতে বলেন?

কি বিপদ, ঘরে গিয়ে এখনকার মত মাথা ঠাণ্ডা করো তো, পরে ভেবে-চিন্তে দেখা যাবে।

অসহ্য লাগছে, তবু তেমনি ধীর অনমনীয় স্বরে জ্যোতিরাণী বললেন, ঠাণ্ডা মাথায় ভাবার জন্তেই এখান থেকে যাওয়া দরকার। আপনি গুরুজন, স্নেহ করেন, বাধা দিতে চেষ্টা করে আমাকে অস্থবিধের মধ্যে ফেলবেন না।

সঙ্কল্পের নড়চড় হবে না সেটা স্পষ্টই বুঝে নিলেন কালীনাথ। সেভাবে বাধা দিতে চেষ্টা করলেন না আর। শুধু বললেন, কিন্তু এই রাতে তুমি যাবে কোথায়? প্রভুজীধামে?

জবাব পেলেন না। সেখানে যাবে না ধরে নিলেন।...বাপের বাড়ি যেতে পারে, কিন্তু মা মারা যাবার পর এই দীর্ঘকালের মধ্যে সেখানকার সঙ্গেও সম্পর্ক নেই বললেই চলে।...শমীকে মেয়ের মত দেখে, তা বলে বিভাস দত্তর ওখানে গিয়ে উঠবে তাও ভাবা যায় না। মুখভাব দ্রুত বদলাচ্ছে কালীনাথের। শান্ত।

কোথায় যাচ্ছ আমাকে জানানো যায় না?

দরকার হলে জানাব।...যেখানেই যাই এর থেকে বেঘোরে গিয়ে পড়ব না হয়ত, আপনি ভাববেন না।

আমার ভাবার ধাত খুব নয়। যাক, এক্ষুনি যাবে?

হ্যাঁ।

সঙ্গে কি নিচ্ছ?

স্থটকেস।

টাকা নিয়েছ?

হ্যাঁ, একশ টাকা। আর মায়ের দেওয়া বিয়ের গয়না কটা। বাকি সব ট্রাঙ্কে থাকল, সরিয়ে রাখতে বলবেন।

একটু চুপ করে থেকে কালীনাথ বললেন, এখানকার এই বড় চাকরির ওপর ভরসা কম বলে বাইরের কাজও একটু-আধটু করি, কিছু উপার্জনও হয়।...দেব কিছু?

দরকার হলে নেব। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল কি, মুহূর্তের দ্বিধা সরিয়ে তেমনি শান্ত মুখে বললেন, টাকা নয়, ইচ্ছে করলে আর কিছু দিতে পারেন।

কালীনাথ জিজ্ঞাস্থ।

হিসেবের নোটবই ছাড়াও আর একটা কালো নোটবইয়ে আপনি কিছু লেখেন।...সেটা।

পলকের বিস্ময়। তারপর চোখে মুখে ঠোঁটের ফাঁকে সেই হাসির ঝিলিক। জবাব দেবার আগে হাসিটুকু এবারে ঠোঁটের ডগায় থেকেই গেল। বললেন, আচ্ছা...সেও সময়ে পাবে।

থমথমে মুখে ঘর থেকে বেরিয়েই জ্যোতিরাণীর পা থেমে এলো। ঘোরানো বারান্দার মুখে সিতু দাঁড়িয়ে। ফ্যালফ্যাল করে সিতু তাকালো তাঁর দিকে। কিছু হয়ত শুনেছে, কিছু হয়ত বুঝেছে, কিছু যে ঘটতে যাচ্ছে টের পেয়েছে। অদূরের আব্‌ছা আলোয় মেঘনা দাঁড়িয়ে। তারও সন্ত্রস্ত মূর্তি।

…জেঠুর সঙ্গে মা এত কি কথা বলে জানার কৌতূহলে একটু আগে সিতু দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে কানে যেন গোটাকতক গরম শলা ঢুকেছে তার। জেঠুকে মা বলছে, আজই এখান থেকে চলে যাচ্ছে…বাধা দিতে বারণ করছে…একশ টাকা সঙ্গে নিল বলছে…গয়না ট্রাঙ্কে থাকল বলছে!

হঠাৎ একটা ত্রাসে পেয়ে বসেছে যেন তাকে, ছুটে গিয়ে মেঘনাকে জিজ্ঞাসা করেছে, কি ব্যাপার!

জ্যোতিরাণীর সর্বশরীরে আবার একটা উষ্ণ স্রোত ওঠানামা করে গেল বুঝি। সেই সঙ্গে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণাও ঠেলে সরালেন তিনি। মেঘনা!

মেঘনা দৌড়ে এলো।

শামু বা ভোলাকে বল একটা ট্যাক্সি ডেকে দেবে।

দ্রুত ঘরের দিকে এগোলেন তিনি। নির্দেশ শুনেও মেঘনা বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইল। অবাক বিস্ময়ে সিতু শুনল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কালীনাথও শুনলেন।

জ্যোতিরাণী পাথরের মতই বসে আছেন। অপেক্ষা করছেন। কোনো দিকে তাকাচ্ছেন না। ঘরের কোনো কিছুর ওপর চোখ ফেলছেন না। কোনো স্মৃতির মায়া কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছেন না।

শুধু অপেক্ষা করছেন।

পরদার ফাঁকে ভোলার মুখ দেখা গেল। অর্থাৎ ট্যাক্সি আনা হয়েছে। জ্যোতিরাণী উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, সুটকেসটা তুলে দাও।

বিভ্রান্ত মুখে ভোলা আদেশ পালন করতে এলো। জ্যোতিরাণী ঘর ছেড়ে বারান্দায় এলেন। সিঁড়ির দিকে এগোলেন। সিতু তেমনি দাঁড়িয়ে। মেঘনা তেমনি দাঁড়িয়ে। কালীদাও তেমনি দাঁড়িয়ে।

দাঁড়াতে হল একবার জ্যোতিরাণীকেও। ছেলে যেভাবে দাঁড়িয়ে আছে, যেভাবে চেয়ে আছে—কঠিন নীরবতায় নিজেকে ছিঁড়ে নিয়ে আসতে পারলেন না তিনি। দাঁড়ালেন। তাকালেন। দেখলেন। তারপরেই বিষম নাড়াচাড়া খেলেন একটা।…বিভাসবাবুর ছাড়পত্রবাহ?

না, তা তিনি এখনো ভাবেন না। তা তিনি এখনো ভাবতে চান না।···তবে অসুবিধে হবে না, মাথা তুলে ঠিকই দাঁড়াবে। দাঁড়াচ্ছে যে দেখেই যাচ্ছেন। তবু বড় দুঃসহ মুহূর্ত যেন।

সিতুও চেয়ে আছে। কলের মূর্তি। বিহ্বল, বিস্ফারিত।

জ্যোতিরাণী কাছে এলেন। মাথায় একখানা হাত রাখলেন। বললেন, ভালো থাকিস্—

সিঁড়ি ধরে নেমে গেলেন। দু চোখ শুকনো খরখরে।

দরজা খুলে বীথি শুধু অবাক নয় ঘাবড়েও গেল। জ্যোতিরাণী দাঁড়িয়ে। পাশে হোটেলের বেয়ারার হাতে স্যুটকেস্। মুখের দিকে চেয়ে কথা সরে না। জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও থমকালো, বেয়ারাটা বাংলা বোঝে, তাছাড়া অবাক হচ্ছে।

তার ইশারায় স্যুটকেস ভিতরে রেখে বেয়ারা চলে গেল। ব্যস্ত হয়ে বীথি ঘরে নিয়ে এল তাঁকে, বুকের ভিতরটা হঠাৎ টিপটিপ করে উঠেছে—জীবনে অনেক দুর্যোগ দেখেছে, এ স্তব্ধতা সে যেন চেনে। তাই জিজ্ঞাসা করতেও ভয়।

ভয়ানক অবসন্ন লাগছে জ্যোতিরাণীর, শ্রান্ত দুচোখ মেলে বীথির দিকে তাকালেন, নিজে থেকেই বললেন, তুমি তো একা আছ, দুই-একটা রাত তোমার কাছে থাকব। অসুবিধে হবে?

জবাব দেবার আগে বীথি তাড়াতাড়ি তাঁকে ধরে একটা সোফায় বসিয়ে দিল। অবিশ্বাস্য বিস্ময়ে খানিক চেয়ে থেকে বলল, অসুবিধে একটুও হবে না···কিন্তু এত রাতে আপনি বাড়ি ছেড়ে এখানে থাকবেন···সঙ্গে স্যুটকেস, কি হয়েছে দিদি?

জ্যোতিরাণী ক্ষুদ্র জবাব দিলেন, আপাতত আমার বাড়ি বলে কিছু নেই।

বীথির অবাক হওয়াই স্বাভাবিক, অবাক-বিস্ময়ে পাঁচ কথা জিজ্ঞাসা করাও স্বাভাবিক। কিন্তু এত শ্রান্ত লাগছে জ্যোতিরাণীর হঠাৎ, যে কথাও বলতে ইচ্ছে করছে না।

বীথি তাও অনুভব করছে যেন। কথা বলছে না, কৌতূহলে উদগ্রীব হয়ে উঠছে না। দেখছে শুধু। বিস্ময়ের সঙ্গে কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কার ছায়া মিশছে। শেষে চুপ করে থাকতে পারল না, আস্তে আস্তে বলল, আমার ঘর নেই··· একদিন ছিল···আমিই আপনার সর্বনেশে ক্ষতি কিছু করে বসলাম না তো দিদি?

এখনো কি পাথর হয়ে যাননি জ্যোতিরাণী···তাপ পেলে এখনো ভেতরে মোচড় পড়ে? আর এখনো হতভাগ্য মেয়েটা সেই হৃদয় নিয়ে বসে আছে! একখানা হাত ধরে কাছে টানলেন তাকে, অস্ফুট স্বরে বললেন, বীথি, তুমি আমার কত

উপকার করেছ জান না···এমন আর কেউ করেনি। সেইজন্যই কিছু না ভেবে প্রথমে তোমার কাছে চলে এলাম। কিন্তু আজ আমি বড় ক্লান্ত বীথি, ঘুম পাচ্ছে, একটু শোবার ব্যবস্থা করে দাও—

বীথি সচকিত হয়ে উঠল, আপনার খাওয়াও তো হয়নি বোধ হয়?

হয়েছে, তুমি ব্যস্ত হয়ো না।

গাল্‌চের ওপর সোফা সেটি গদি পাতা, বসার ঘর এটা। বীথি শশব্যস্তে শোবার ঘরের দিকে এগলো।

বীথি।

ডেকে থামালেন তাকে। দ্বিধা কাটিয়ে বললেন, এখানে তো অনেক কিছু আছে দেখছি, এরই একটার ওপর চাদর-টাদর কিছু পেতে দিয়ে তুমি শুয়ে পড়ো গে যাও, আমার অসুবিধে হবে না।

তাঁর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েই থাকল বীথি। মুখে বিষণ্ণ ছায়া পড়ছে। ওই ঘরের আবিল ভোগশয্যার আশ্রয়ে রাত কাটাতে বিতৃষ্ণা ভাবছে। খুব মিথ্যে নয় বলেই জ্যোতিরাণীর সঙ্কোচ। কিন্তু তিনি এত স্পষ্ট করে ভাবেননি, এত স্পষ্ট করে বোঝাতেও চাননি। রাতটা একলা থাকতে চান এটুকুই বোঝাতে চেয়েছিলেন। বললেন, বীথি, তোমাকে সত্যিই ভালো না বাসলে এখানে আসতে পারতুম না। যা বললাম করো—

বীথি তাড়াতাড়ি চলে গেল।

স্নায়ুগুলো সব স্বাভাবিক বোধ হারিয়েছে। ক্লান্তিতে অবসাদে জ্যোতিরাণী বসেও থাকতে পারছিলেন না। রাজ্যের ঘুম ছেয়ে আসছিল চোখে। ভেবেছিলেন, দুঃস্বপ্নের মত এই রাত অচেতন ঘুমের গভীরে ডুবে যাবে। তারপর কালকের কথা কাল, আজ শুধু এটুকু শান্তির আশায় লালায়িত হয়ে উঠেছিলেন জ্যোতিরাণী।

ঘুম এলো না। একলা ঘরের শূন্যতার ছোঁয়া পেয়ে মৃত্যুর মত গাঢ় ঘন চাপ-চাপ ঘুম যেন বাষ্প হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। তবু ওই ঘুম জ্যোতিরাণী আঁকড়ে ধরে থাকতে চেষ্টা করছেন। চোখের সামনে যারা ভিড় করে আসছে, এই রাতটুকুর মত অন্তত সরিয়ে রাখতে চান তাদের।

কিন্তু আসছেই তারা। ঘুরেফিরে বারবার করে আসছে ছেলে—ছেলের ওই মুখখানা। আসার সময় যেমন দেখেছিলেন।···প্রভুজীধামে খেয়ালী শিল্পীর আঁকা প্রভুজীর সেই মস্ত ছবিখানাও আসছে চোখে। ওই ছবির মুখের সঙ্গে ছেলের মুখের আদল আবিষ্কার করেছিলেন তিনি।···শুধু তিনি, আর কেউ না। মিল নেই। এ ভুল তিনি দু বছর আগেই বুঝেছিলেন, শাশুড়ী চোখ বোজার পর

ছেলেকে যেদিন স্কুল-বোর্ডিং থেকে ছাড়িয়ে আনা হল—সেইদিনই। অথচ আজ আবার…থাক, ভাববেন না।

শক্ত করে চোখ বুজলেন জ্যোতিরাণী। তবু একের পর এক মুখগুলো সব চোখের সামনে ঘোরাফেরা করে যাচ্ছেই। ওই মুখগুলো যেন নতুন করে নতুন চোখে দেখে যাচ্ছে তাঁকে।…ছেলের মুখ, প্রভুজীর মুখ, প্রভুজীধামের মেয়েগুলোর মুখ, মিত্রাদির মুখ, ও-ঘরে বীথির মুখ, রমা কমলা বাসন্তীর মুখ, শমী আর বিভাস দত্তর মুখ, সদা মেঘনা শামু আর ভোলার মুখ, কালীদার মুখ…

আর একজনের মুখও। শিবেশ্বরের মুখ। সবশেষে এই মুখখানাই সামনে থেকে নড়ছে না। ঘুমের চেষ্টার ফাঁকে কি এক চিন্তা উঁকিঝুঁকি দিয়ে গেল।… আজ এই রাতে ফিরতেও পারে বাড়ি। ফেরাই সম্ভব। কারণ তিনি বেরিয়ে আসার পর কালীদা টেলিফোন না করে পারেন না। টেলিফোনে নিশ্চয় জানানো হয়েছে…

চিন্তাটা সবলে ঠেলে সরিয়ে ছোট মেয়ের মতই আবার শক্ত করে চোখ বুজলেন জ্যোতিরাণী।

কালীনাথ টেলিফোন করেননি। খবরও দেননি। কিন্তু সেই রাতেই বাড়ি ফিরেছেন বটে শিবেশ্বর। একটু বেশি রাতে ফিরেছেন।

কারণ, সেই অনাগত ছায়াটা শেষ পর্যন্ত তাঁকে বাড়ির দিকে তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে। ছেলের প্রবৃত্তিশাসনের সঙ্কল্পে যে-রাতে তাকে স্কুল বোর্ডিং-এ পাঠানোর ব্যবস্থার কথা শুনেছিলেন তিনি—সেই রাতে ওই অনাগত ছায়াটা দেখেছিলেন তিনি। স্ত্রী বলেছিল, ছেলে মেয়েছেলে চেনা শুরু করেছে…খারাপ মেয়েছেলে কাদের বলে জেনেছে। সেই কারণেই তাকে দূরে সরানোর অটুট সঙ্কল্প। ছেলের প্রবৃত্তিশাসনের মত আপসশূন্য এমনি কোনো অনাগত ছায়া সেই রাতে তাঁকেও স্পর্শ করে গেছে…অস্থির ক্রুদ্ধ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন শিবেশ্বর।

সেটা এই দিনের ছায়া?

প্রবৃত্তিশাসনের নামে ছেলেকে দূরে সরিয়েছিল। তার বেলায় কি করবে?

মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাগ বেড়েছে, আত্মবোধ টগবগ করে ফুটে উঠেছে, ভ্রূক্ষেপ না করার প্রবৃত্তি দ্বিগুণ দুর্দম হয়ে উঠতে চেয়েছে। কিন্তু সব কিছুর তলায় তলায় অস্বস্তি বেড়েছে। বাড়তে বাড়তে সেটা অসহ্য হয়ে উঠেছে একসময় থাকতে না পেরে শেষে বাড়ির দিকেই রওনা হয়েছেন তিনি। একটা সময় আসে যখন সব শেষ জানলেও স্বস্তি, তবু না জানলে নয়।

তার আগে সমাধির স্তব্ধতার গ্রাসে ডুবেছে তিন রাস্তার ওপরের ত্রিকোণ বাড়িটা। সিঁড়ি দিয়ে নেমে বারান্দা ধরে জ্যোতিরাণী ট্যাক্সিতে ওঠার আর ট্যাক্সি ছেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে।

সিতু হাঁ করে দাঁড়িয়েই ছিল। এগিয়ে গিয়ে দেখতেও পারেনি সত্যিই মায়ের কাণ্ডখানা কি, সত্যিই মা চলে যাচ্ছে কিনা। ট্যাক্সি একটা চলে গেল টের পেল, তবু দাঁড়িয়েই ছিল। খেয়াল হতে দেখে, বারান্দায় সে একলাই আছে, জেঠু ঘরে ঢুকে গেছে। বড় অদ্ভুত লাগছে তার, ভারী অদ্ভুত! যতদুর বুঝেছে মা এ-বাড়িতে আর থাকবে না, মা এ-বাড়ি থেকে চলে গেল।...জন্মের মত নাকি! তা আবার কি করে হয় সিতুর মাথায় আসছে না। অথচ হতে পারার সম্ভাবনাটাই যেন মগজের মধ্যে ঠুক-ঠুক ঘা বসাচ্ছে। সবার আগে মেঘনাকে খুঁজে বার করল। হাঁড়িমুখ কালী করে ওধারের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে। ভাবনা চেপে একটু ভারিক্কী স্বরে জিজ্ঞাসা করল, মায়ের কি হয়েছে শুনি?

জবাব না দিয়ে মেঘনা শুধু মুখ তুলে তাকিয়েছে তার দিকে।

সিতু খেঁকিয়ে উঠল, মা এ-বাড়ি ছেড়ে চলে গেল তার মানে কি? এ-বাড়িতে আর আসবে না? অন্য বাড়ি ভাড়া করে থাকবে?

মেঘনা জবাব দিল, আমি জানি না।

বিরক্ত হয়ে সিতু ফিরে এলো। সঙ্গে সঙ্গে কি এক অজানা আশঙ্কায় ভেতরটা কি-রকম করতে লাগল। ঠাকুমা মারা যাবার আগে যেরকম হয়েছিল অনেকটা সেইরকম। না, তার থেকেও বেশি। উঠতে বসতে মা তাকে শাসন করত, পারলে এখনো করে—আর সে সব সময়েই মা-কে জব্দ করার ফিকির খোঁজে। মা-কে আক্কেল দেবার ঝোঁক তার এখনো কমেনি, ওই শমীটাকে অত পছন্দ করে বলে তার এখনো রাগ মায়ের ওপর। কিন্তু মা এখান থেকে চলে গেলে আক্কেল আর কাকে দেবে? চলতে-ফিরতে তো খালি মেঘনার হাঁড়ি মুখ দেখতে হবে।

না, শুধু এজন্যে নয়, আরো কি একটা গণ্ডগোলের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে সিতু। মা যখন স্কুল-বোর্ডিংএ পাঠিয়েছিল তাকে, তখন মায়ের থেকে বড় শত্রু আর কাউকে ভাবত না। শাস্তি দিয়ে দিয়ে মা-কে মনে মনে এক-একসময় প্রায় ধ্বংসই করে ফেলতে চেয়েছে সে। তবু সেই মা—সেই শত্রু এ-বাড়িতে থাকবে না, সেও যেন এক অসহ্য রকমের অদ্ভুত ব্যাপার।

জেঠুর ঘরে আলো জ্বলছে। জেঠু হাত-পা ছড়িয়ে চেয়ারে বসে আছে। ঘরে ঢুকল। জিজ্ঞাসা করল, মা বরাবরকার মত এ-বাড়ি থেকে চলে গেল?

কালীনাথ ফিরলেন তার দিকে, কথার চিরাচরিত ঢংটাই বজায় রাখলেন।—

গেলে তোর কি? গোল্লায় যাবার সুবিধে হল আরো?

সিতু হাসতে চেষ্টা করল একটু।

যা ঘুমোগে যা, রাত হয়েছে।

চলে এলো। ঠাকুমার ঘরে ঘুমোয়। দরজার কাছে বারান্দায় শামু শোয়। শুয়ে আছে। সিতুও ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়ল। ভাবতে চেষ্টা করল, যায়ই যদি, একপক্ষে ভালই হবে। শাসন-টাসন আজকাল অবশ্য করছিল না, কিন্তু প্রায়ই যেভাবে তাকাতো তার দিকে, চেয়ে চেয়ে দেখত—তাও শাসনের মতই লাগত। অথচ চেষ্টা করেও এটা এখন খুব একটা সুবিধে বলে ভাবতে পারছে না সিতু। উল্টে এই সুবিধে কি এক আতঙ্কের মত কাছে এগোতে চাইছে। অদ্ভুত ফাঁকা ফাঁকা গোছের আতঙ্ক একটা।

রাত বাড়ছে। সিতুর ছটফটানি বাড়ছে। ঘুমের লেশমাত্র নেই চোখে। মা এ-বাড়িতে থাকবে না ঘরের বাতাসে শুধু এ চিন্তাটাই যেন ঠেসে ঠেসে দিচ্ছে কেউ। ঘরের বাতাসে, তারপর বারান্দার বাতাসে, তারপর সমস্ত বাড়িটার বাতাসে।

শুয়ে থাকা গেল না। ছটফট করতে করতে উঠে বসল একসময়। দরজার বাইরে এসে দাঁড়াল। নিঃশব্দে ঘুমন্ত শামুর পাশ কাটিয়ে এদিকে এলো। জেঠুর ঘরের দরজা বন্ধ, কিন্তু এখনো আলো জ্বলছে। ঘোরানো বারান্দাটা আবছা অন্ধকার। পায়ে পায়ে এগোতে লাগল। মাঝামাঝি এসে দাঁড়িয়ে একবার পিছনে আর একবার সামনের দিকে তাকালো।

...আশ্চর্য, মা আর এই বারান্দা দিয়ে যাতায়াত করবে না? অদ্ভুত কথা!

মায়ের ঘরের দিকে এগলো। দরজাগুলো ভেজানো। ঠেলতে খুলে গেল। ভিতরে ঢুকল। আলো জ্বালল।

চারিদিক চেয়ে চেয়ে দেখল।...মা আর এই ঘরেও আসবে না, এখানে থাকবে না, শোবে না? অসম্ভব একটা কৌতুকের মত লাগছে, দেখছে আর হাসিই পাচ্ছে। যেদিকে তাকাচ্ছে একটা মা-মা ছাপ। পরা শাড়িটা আলনায় ঝুলছে। এগিয়ে এসে ওটা ধরে হাত দিয়ে অনুভব করল।...মা-মা স্পর্শ। অভ্যস্ত নয় বলে মা-কে ছুঁলে যেমন ভালো লাগত আবার অস্বস্তি বোধ করত, তেমনি লাগছে। জোরে নিঃশ্বাস নিল একটা, বাতাসেও মা-মা গন্ধ।

...এই ঘরেও মা আর আসবে না, শোবে না, থাকবে না?

আচমকা রক্ত উঠল বুঝি সিতুর মাথায়। এজন্যে নিজেও সে প্রস্তুত ছিল না একটুও। ড্রেসিং-টেবিলের সুন্দর টেবিল ক্লথটা ধরে জিঘাংসু টান মেরে বসল একটা। ড্রেসিং-টেবিলের ওপর যা-কিছু ছিল ঝনঝন শব্দে মাটিতে পড়ল, ছড়ালো,

ভাঙল।

অন্ধকার বারান্দার ওধারে মুখ চুন করে মেঘনা বসেছিল। সিতুকে আসতে দেখেছে, ও-ঘরে ঢুকতেও দেখেছে। পড়ার এবং ভাঙার ঝনঝন শব্দ শুনে দৌড়ে এলো।

ও কি করলে?

সিতু চমকে উঠল একটু। মাথার রক্ত চোখে নামল পরমুহূর্তে।—বেশ করেছি, যা বেরো এখান থেকে—দূর হ বলছি!

মারমূর্তি দেখে মেঘনা সভয়ে সরে গেল।

এরও আধ ঘণ্টা পরে শিবেশ্বরের গাড়ি সিঁড়ির দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। নীচে থেকে স্ত্রীর ঘরে আলো দেখে নতুন করে একদফা শক্তি সংগ্রহ করে নিতে হয়েছে। দম্ভের শক্তি। ওপরে উঠেছেন, তারপরেই থমকেছেন।

নিজের ঘরের খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন কালীদা। যেন তাঁরই অপেক্ষা করছেন। মুখোমুখি ঘুরে দাঁড়ালেন।

কালীনাথ বললেন, জ্যোতি চলে গেছে।

শব্দ তিনটে শিবেশ্বরের পা থেকে মাথা পর্যন্ত বুঝি ওঠা-নামা করল বার কতক।—কোথায় গেছে?

বলেনি।

শেষ শুনেছেন। শেষ জেনেছেন। এবারে রাগে ফেটে পড়তে বাধা নেই, জ্বলে ওঠার মতই মুখ শিবেশ্বরের।—তুমি এত রাতে জেগে আছ কেন? এই সুখবরটা দেবার জন্যে?

যা ভাবো। আমার দরকার ফুরোলো কিনা সেটা জানার জন্যও হতে পারে।

শিবেশ্বর প্রচণ্ড রাগে জ্বলছেন, ফুঁসছেন। তবু গলার স্বর একটু সংযত করে জিজ্ঞাসা করলেন, কি বলে গেছে?

বলেছে—একশ টাকা নিয়ে গেল, আর গয়না-পত্র সব ট্রাঙ্কে থাকল, সরিয়ে রাখা হয় যেন।

আগুনে ঘি পড়ল আর একদফা। প্রবৃত্তি শাসন করা হয়েছে সেই অন্ধ রাগ, অন্ধ আক্রোশ যেন। গলা চড়িয়ে বলে উঠলেন, যেখানে খুশি যাক! দেখা হলে বলে দিও—ওর মত মেয়ে অনেক দেখা আছে, শিবেশ্বর চাটুজ্যে কারো তোয়াক্কা রাখে না—বুঝলে?

উত্তেজনায় নিঃশ্বাস রোধ করে দ্রুত নিজের ঘরের দিকে এগোলেন তিনি। এক

ঝটকায় ভারী পরদা সরালেন, কিন্তু ঘরে ঢোকা হল না।

ও-ঘরে আলো জ্বলছে। তপ্ত আক্রোশে শূন্য ঘরটাকেই দেখে নেবার জন্যে পা বাড়ালেন।

ঘরে ঢুকে হতচকিত।

মায়ের একটা কোঁচানো শাড়ি বুকে জড়িয়ে সিতু ঘুমুচ্ছে। আর মেঝেতে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে মেঘনা ঘুমুচ্ছে।

শিবেশ্বর স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে।

তৃতীয় পর্ব

॥ পঁইত্রিশ ॥

…মহাভারতে একটি বই চরিত্র নেই। চরিত্র অর্থাৎ পুরুষের চরিত্র। সেই মহাযুগে মেয়েরা পাঁচ হাত ঘুরলেও মহাসতী। অতি আধুনিকা বহুবল্লভারা কি দোষ করল আমার মাথায় আসে না। তাদের দুর্ভাগ্য একালের আইনে মহাভারতের নজির অচল। পরাশর-মৎস্যকন্যা ভোগসংযোগের ফলে আবির্ভাব স্বয়ং মহাভারতকারের। সেই কুমারী মাতা অদূরকালের কুরুকুললক্ষ্মী মহাসতী সত্যবতী। আবার ওই মায়ের নির্দেশে মহাভারতকারই প্রয়োগ-জনক পরের কুরু-পাণ্ডবকুলের। অতএব তাঁর রচনার শত-সহস্র মহাসতীরা মহাভোগ্যা শুধু—রমণী-চরিত্র নিয়ে এর বেশী তিনি মাথা ঘামাননি। তবু এরই মধ্যে গান্ধারীকে নিয়ে আমার একটু খটকা লাগে। অন্ধ রাজার হাতে তাঁকে দিতে আপত্তি করেছিলেন তাঁর বাবা সুবল আর নিরেনব্বুইটি ভাই। কুরু-রোষে কারাগারে তাঁদের নিধন-যজ্ঞ সম্পন্ন হয়েছিল। গান্ধারী নিজের চোখ বেঁধেছিলেন স্বামী অন্ধ বলে না তাঁর মুখ দেখতে চাননি বলে?

"থাক্ রমণীচরিত্র নিয়ে টানাটানিতে আমারও রুচি নেই। বলছিলাম, গোটা মহাভারতে একটি বই পুরুষ-চরিত্র মেলা ভার। তিনি পরম কুরুপ্রিয় অবশিষ্ট সুবল-নন্দন শকুনি। তুলনা নেই, তাঁর তুলনা নেই। এ-রকম লক্ষ্য ভেদ অর্জুন করেছেন না এ-রকম প্রতিজ্ঞা ভীষ্ম করেছেন? কর্ণকে এলাউ করলে সে-ই অনায়াসে মাছের চোখ ফুটো করে দিতে পারত, আর, সে-কাল ছেড়ে এ-কালেও কত ভীষ্ম বাপের বিয়ে দিয়ে ভেরেণ্ডা ভাঁজছে ঠিক নেই। কিন্তু শকুনি? তুলনা নেই, তুলনা নেই! উভয়কুলের ইষ্ট করতে এসে স্বয়ং কেষ্ট-ঠাকুরের চক্ষু ছানাবড়া হয়েছিল কার অভীষ্ট টের পেয়ে? এই শকুনির, শুধু শকুনির। শকুনিকে মহাভারতের সহস্র বিশিষ্ট পুরুষদের একজন ভাবলে তাঁর চরিত্রে দাগ পড়বে। আকাশের শকুনিকে পাখি বললে যেমন পাখি আর শকুনি দুয়েরই চরিত্র খোয়া যায়, তেমনি। অমন অমোঘ লক্ষ্য যার সেই শকুনি। আ-হা, চরিত্র বটে একখানা। তাঁর বাপের হাড়ের তৈরি ক্ষুধিত পাশার দান খটখট করে পড়ছিল আর পাণ্ডবসর্বস্ব গ্রাস করছিল, খটখটিয়ে হাড়ের পাশার দান পড়ছিল দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের উল্লাস লেগেছিল—সেই উল্লাস ছাপিয়ে শকুনির অট্টহাসির অর্থ সেদিন কেউ বোঝেনি। শুধু রক্ততৃষাতুর ওই হাড়ের পাশারা ছাড়া। কুরুকুলের শেষ

রক্তবিন্দু পানের পর সুবলের অস্থির তৃষ্ণার শান্তি, আর শকুনির পিতৃতর্পণ, ভ্রাতৃতর্পণ সাঙ্গ। পাণ্ডব অপমানের খড়গে সেই লগ্ন আসন্ন।

"কুরুপ্রিয় শকুনি, তোমার তুলনা নেই। তোমাকে নমস্কার।"

জ্যোতিরাণীর হাতে কালীনাথের সেই কালো বাঁধানো নোটবই। মনের এক ঝড়ের মুখে, তিন রাস্তার ত্রিকোণ জোড়া বাড়িটা ছেড়ে আসার আগে কালীদার কাছ থেকে জ্যোতিরাণী এই জিনিসটি চেয়ে বসেছিলেন। কালীদা বলেছিলেন, সময়ে পাবে।

...কালীদার সময়ের বিচারও বিচিত্র বটে। সেই সময় আজ হয়েছে। এই তিন বছর বাদে।

মাঝে একটানা তিনটে বছর কেটে গেছে। এই তিন বছর ধরে জীবন যে নতুন রাস্তায় গড়িয়ে চলেছে তার গতি শিথিল। দিনের অবকাশ জীবিকা সংগ্রহের রুটিনে বাঁধা, রাতের রঙ বর্ণশূন্য। স্থির সহিষ্ণুতায় এই দিনগুলি আর রাতগুলি বহন করে চলেছেন জ্যোতিরাণী। তারই মধ্যে আঘাত আসছে এক-একটা, কিন্তু জীবনের তটে সে-আঘাত নতুন করে ভাঙন ধরাতে পারেনি কিছু। স্নায়ু ছিঁড়ে দিয়ে যেতে পারেনি। অমনি অবিচল সহিষ্ণুতায় সে-আঘাত তিনি গ্রহণ করেছেন, তারপর একপাশে সেটা সরিয়ে রেখে দিনের কাজে নিবিষ্ট হয়েছেন, রাতের চিন্তা থেকেও সেটা তফাতে রাখতে চেষ্টা করেছেন।

তিন রাস্তার ত্রিকোণ-জোড়া অর্ধচন্দ্র আকারের বিরাট বাড়িটার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বিধিবদ্ধভাবে ঘুচেছে মাত্র তিন দিন আগে। এই বিচ্ছেদের বারতা আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে জানানো হয়েছে। এটাও আঘাত কিছু নয়। তিন বছর আগে এ সম্পর্ক নিজেই তিনি ছিঁড়ে দিয়ে এসেছেন। সেটা ফিরে আবার জোড়া লাগানোর তাগিদও কখনো অনুভব করেননি। যে আঘাতে তাঁর আহত সত্তা বিমুখ হয়ে ঘর ছেড়েছে, সে-ক্ষত আজও তেমনি আছে। পরোক্ষ আর প্রত্যক্ষভাবে তাঁকে ফেরানোর চেষ্টা অবশ্য হয়েছে। পরোক্ষ চেষ্টা করেছেন কালীদা আর মামাশ্বশুর। প্রত্যক্ষ চেষ্টাটা যার ঘর ছেড়ে আসা হয়েছে, তার।

শিবেশ্বরের। কিন্তু তাঁর চেষ্টাটা ক্ষিপ্ত বাঘের ফসকানো শিকার ধরার মতই হিংস্র নির্মম। তিনি আপস করতে আসেননি, দীর্ঘ অপরাধের বোঝায় পিঠ নুইয়ে আসেননি, বিবেকের যাতনায় দগ্ধ হয়ে আসেননি। না, মোটে আসেনইনি তিনি। ঘরে বসেই অপমানের চাবুক চালিয়ে ঘর-পালানো জীবের মতই তাঁকে ফেরাতে চেষ্টা করেছেন। অধিকার দখলের চরম ব্যবস্থার হুমকি দিয়েছেন, সমস্ত

জানিয়েছেন।

তার আগেই জ্যোতিরাণী জবাব পাঠিয়েছেন। সেটা এমনই জবাব যে, শিবেশ্বর চাটুজ্যের আর ফেরানোর চেষ্টা করা দূরে থাক, আক্রোশে একেবারেই থেমে গেছেন তিনি। বিচ্ছিন্নতার যে সাময়িক অধিকার জ্যোতিরাণী লাভ করেছেন, তাতে কোন রকম বাধা পর্যন্ত পেশ করেননি। দুর্বার ক্রোধে তার বদলে আরো প্রকাশ্য নগ্নতায় মেতে উঠেছিলেন তিনি। শুধু ধারণা নয়, জ্যোতিরাণীর বিশ্বাস—বাড়ির মালিকের রোষের ইন্ধন যুগিয়ে মৈত্রেয়ী চন্দর সেখানে অবাধ প্রতিপত্তি লাভে বাদ যদি কেউ সেধে থাকে তো সেটা কালীদার কাজ। মেঘনার মুখ থেকে সেই গোছেরই আভাস পেয়েছিলেন জ্যোতিরাণী। কিন্তু এ নিয়ে কালীদাকে কিছু জিজ্ঞাসা করেননি তিনি। অপ্রয়োজনীয় একটা গ্লানির প্রসঙ্গ মন থেকে ঠেলে সরাতে চেষ্টা করেছেন শুধু।

সম্পর্ক ঘোচার শেষ পর্ব সম্পন্ন হয়েছে মাত্র তিন দিন আগে। আনুষ্ঠানিক সংবাদও তাঁর কাছে এসেছে। আসবে তার জন্য মাসকতক আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন। এসেছে যখন, অদরকারী কাগজপত্রের মতই একপাশে সরিয়ে রেখেছেন। অস্বাচ্ছন্দ্য যদি একটুও বোধ করে থাকেন তো সেটা অন্য কারণে। …এখানকার স্কুলের খাতায় তাঁর নাম লেখানো হয়েছিল জ্যোতিরাণী দেবী। চাকরি বিভাস দত্ত সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। স্কুল কর্তৃপক্ষ তাঁর পরিচিত। জ্যোতিরাণী চাকরির বাজারের খবর রাখেন না, নইলে এত সহজে চাকরি পেলেন কি করে ভেবে অবাক হতেন। বিভাসবাবু বলেছিলেন, চেনা-জানা ছিল, তায় অনার্স গ্রাজুয়েট বলে আর একটু সুবিধে হল। জ্যোতিরাণী সেটাই সত্যি ধরে নিয়েছেন। জীবনের সঙ্কট মুহূর্তগুলিতেই যেন এই ভদ্রলোকের সঙ্গে বিশেষ যোগ তাঁর।…নতুন বয়সের সেই নতুন সংসারে একজনের বিকৃতির ফলে জীবনের আশা আলো তাপ সব যখন নিঃশেষে ক্ষয় হতে বসেছিল, তখন থেকে। শাশুড়ীর সঙ্গে কালীঘাট মন্দিরে তাঁকে দেখে বিভাস দত্তর মনে হয়েছিল গরদে আর সিঁদুরে সেজে বলির পশুর মতই কোন অন্তিম সমর্পণের দিকে পা বাড়িয়েছেন তিনি। পড়াশুনার রাস্তাটা তিনিই দেখিয়েছিলেন, লিখেছিলেন, মন না টানলে মন্দিরের দরজা খোলে না, কিন্তু আর এক মন্দিরের দরজা সামনে খোলা আছে। আর লিখেছিলেন, ভয়ের মুখোশে যত বিশ্বাস করবেন ভয়ের পীড়নও ততো সত্যি হয়ে উঠবে। ভয় করবেন না। সেই চিঠি তাঁকে জীবন দিয়েছিল, তিনি পথ পেয়েছিলেন। না পেলে এই স্কুলের দরজাও আজ খোলা পেতেন না।…তারপর সেই দাঙ্গার বিভীষিকা। সেই দুঃস্বপ্ন ভোলবার নয়। সব বিপদ তুচ্ছ করে সেদিনও

এই ভদ্রলোকই ছুটে এসেছিলেন, মৃত্যুর তাণ্ডব থেকে জীবন উদ্ধার করে নিয়ে গেছলেন। আর, সব শেষে নিজের দু পায়ে দাঁড়ানোর এই চরম বিপর্যয়ের মুখেও এই একজনই তাঁকে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অপমানের এত বড় বোঝা মাথায় নিয়ে আবার তাঁকে দরজায় দরজায় ঘুরতে হয়নি।

প্রত্যাশা হয়ত ছিল। হয়ত আছে। সবল পুরুষের প্রত্যাশা হলে আগেই কোন্ জটিলতার মুখোমুখি দাঁড়াতে হত কে জানে। সে প্রত্যাশা কোনদিন অবাধ্য হয়ে ওঠেনি বলেই নিষেধের আবরণটা জ্যোতিরাণী শক্ত-পোক্ত করে তোলার অবকাশ পেয়েছিলেন। কোন রকম দুর্বলতার আঁচ পেলে প্রকারান্তরে চোখ উল্টে বরং তিনি রাঙিয়েছেন। কিন্তু স্কুলের এই চাকরির বেলায় এক অদ্ভুত কাণ্ড করেছেন ভদ্রলোক। তাঁর নাম লিখিয়েছেন জ্যোতিরাণী দেবী। মুখ দেখানো গোছের ইণ্টারভিউ একটা হয়েছে, কেউ কোন রকম জেরা করেনি। এমন কি অনার্স পাসের সার্টিফিকেটের তলব পর্যন্ত পড়েনি। মুখে বলাতেই কাজ হয়েছে। চাকরিটা যেন তাঁর জন্যেই অপেক্ষা করছিল। তিনি এসেছেন আর বসে গেছেন। বাড়ি ছেড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার মালিকের পদবী-সুদ্ধ বর্জন করে এসেছেন কিনা সেটা মাথায়ও ছিল না।

তাই পদবীশূন্য নিজের নামটা দেখে সচকিত হয়েছিলেন জ্যোতিরাণী। চাকরি যারা দিয়েছেন তাঁদের কাছে বিভাস দত্ত কি বলেছেন বা কতটা বলেছেন জানেন না। পরে সহশিক্ষয়িত্রীদের কেউ কেউ কৌতূহলী হয়েছে, জিজ্ঞাসা করেছে, দেবী বলতে কোন্ দেবী, পদবী কি?

জ্যোতিরাণী পাশ কাটাতে চেষ্টা করেছেন, বলেছেন, ওটাই পদবী।

এ-রকম পদবী হয় কি হয় না, তা নিয়ে লঘু গবেষণায় মেতে ওঠেনি কেউ। সেটা জ্যোতিরাণীর ব্যক্তিত্বগুণেও হতে পারে, এখানে হাল্কা অবকাশ বিনোদনের সময় কম বলেও হতে পারে। স্কুল চলে এক লোকহিত সংস্থার দাক্ষিণ্যে। শিক্ষা বিস্তারের আদর্শই বড় লক্ষ্য, আর পাঁচটা সাধারণ স্কুলের মত নয় এখানকার বিধিব্যবস্থা। এখানে মেয়ে বেশি, সে তুলনায় শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা কম। মাইনে ভাল বটে, কিন্তু কাজের চাপও তেমনি। কিছুদিনের মধ্যেই জ্যোতিরাণী এখানে মিসেস দেবী হয়েছেন। খটকা যাদের লেগেছিল, তাদেরও মনে হয়েছে এই দেবী মানিয়েছে বটে! মেয়েদের কানও অভ্যস্ত হতে সময় লাগেনি। তারা বলে, অমুক ঘণ্টায় মিসেস দেবীর ক্লাস, বা অমুক সাবজেক্টের খাতা দেখবেন তো মিসেস দেবী, নম্বর দেবার হাত কেমন কে জানে।

সম্পর্ক ছেঁড়ার আনুষ্ঠানিক বার্তা আসার সঙ্গে সঙ্গে অলিখিত পদবীটা বাস্তবে

নিশ্চিহ্ন হয়েছে। স্কুলের খাতায় চ্যাটার্জি কেটে দেবী বসানোর বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তে হবে না তাঁকে। নিঃশব্দে কত বড় এক দায় থেকে যে অব্যাহতি পেয়েছেন তিনিই জানেন। তবু খবরটা পাওয়া মাত্র অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছিলেন অন্য কারণে। তাঁর নাম থেকে চ্যাটার্জির অস্তিত্ব ঘোচানো হয়েছিল যখন, হিন্দু বিয়ে নাকচ বিধি তখনো আইনের আলোর কাছাকাছি আসেনি। আসতে পারে সে সম্বন্ধে জ্যোতিরাণীর অন্তত কোন ধারণা ছিল না। চাকরির খাতায় তাঁর নাম থেকে চ্যাটার্জি উঠে যেতে দেখে তিনি সচকিত হয়েছিলেন, কারণ তাঁর জীবনে এক পুরুষের আবির্ভাবের চিহ্নটুকুও মুছে দেবার ইচ্ছা দেখেছিলেন তিনি আর এক-জনের মুখের দিকে চেয়ে। সেই একজনের প্রত্যাশা এখনো দাবির আকারে হাত বাড়ায়নি। সে-প্রত্যাশা এখনো দুর্বল। কিন্তু আগের মত অস্পষ্ট নয় অত। সেটা প্রকাশের রাস্তা খুঁজছে অনুভব করতে পারেন। ভদ্রলোক ভুগছেন ক্রমাগত। অসুস্থতার আড়ালে মান-অভিমান আরো বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠছে। পদবী বিলুপ্তির পরোয়ানা হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিরাণীর মনে হয়েছে এই দিনের আশায় সকলের অগোচরে একজনই শুধু দিন গুনছিলেন। এর পর তাঁর দুর্বল প্রত্যাশা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠার সম্ভাবনা।

কিন্তু ঠিক এই সময়টাই নোটবই পাঠাবার মত সুসময় বেছে নিলেন কেন কালীদা? এটার কথা তো তিনি ভুলেই গেছলেন প্রায়।

আজ আর এই কালো নোটবই খুব এক বৃহৎ বস্তু নয় তাঁর কাছে। ডাকে এসেছে। প্যাকেট খোলার আগেও বুঝতে পারেননি জিনিসটা কি। খোলার পর বুঝেছেন। এখন আর ওটার থেকে নতুন করে কিছু সংগ্রহ করার তাগিদ নেই। কি পাবেন বা কি হারাবেন সেই দুর্ভাবনাও নেই আর।...এজন্যেই কি কালীদা এ-সময়ে পাঠালেন এটা? স্মৃতির কোন দুর্বলতার ছিঁটে-ফোঁটাও যদি থেকে থাকে এখনো, তাও নির্মূল করা সহজ হবে বলে?

তবু আগ্রহভরেই খুলেছিলেন ওটা। কালো বাঁধানো এই বস্তুটার সঙ্গে অনেক দিনের অনেক কৌতূহল জড়িত। গোড়াতেই ছোটখাটো একটা ধাক্কা খেয়ে উঠলেন।

শকুনি-স্তুতি পড়ে হতভম্ব।

গোড়াতে কটা পাতা সাদা, এই লেখাটার পরেও কটা পাতা সাদা। পরের সব লেখায় তারিখ আছে, এটাতেই শুধু নেই। জ্যোতিরাণীর কেমন মনে হল পরে কোন একসময়ের লেখা ভূমিকা এটা। ভূমিকা সচরাচর পরেই লেখা হয়ে থাকে। একটা অজ্ঞাত অস্বস্তি নিয়ে জ্যোতিরাণী পাতা উল্টে চলেছেন।

"···মৌমাছি যদি কথা দেয় ফাল্গুনের নেমন্তন্ন শুনবে না, ফুলে ফুলে ঘুরবে না—বৈশাখের চাঁদটা যদি কথা দিয়ে বসে পূর্ণিমা বুকে করে বসে থাকবে, জ্যোৎস্না ঢালবে না—আর বসন্তের কোকিল যদি কথা দেয় ভরা-সবুজের দিকে তাকাবে না, ডেকে ডেকে প্রেমিক-প্রেমিকার বুকের তলায় ঋতুর খবর ছড়াবে না—তাহলে? তাহলে এ-রকম কথা যে আদায় করে সে একটি বদ্ধ পাগল। আর আদায় করার পর সে-কথার খেলাপ হবে না এমন বিশ্বাস নিয়ে যে বসে থাকে সে পাগল ছাড়াও আরো কিছু। সে বোধ হয় গাধার মত গরু। কালীনাথ ঘোষাল, আয়নায় নিজের মুখখানা ভাল করে দেখো।

"মিত্রা কথার খেলাপ করেছে। মৈত্রেয়ী মজুমদার মৈত্রেয়ী চন্দ হয়েছে। বামুনের মেয়ে কায়েতের ঘরনী হয়েছে। তাতে কি? তোমার মত চাল-কলা মার্কা বামুন ধুয়ে জল খেতে চায় এ-কালের কোন্ মেয়ে? বিয়ে শুনে জলতে জলতে সটান মিত্রাদের বাড়ি গিয়ে হাজির হয়েছিলাম, রাগের মুখে তার মা এই গোছেরই কি যেন বলছিল। আমার অদেখা-বাপের চাল-কলার যজমানির খবরটা শিবুই মিত্রার কানে তুলেছে মনে হয়। আর তার বাপের খড়ম নিয়ে তাড়া করার খবরটাও। মিত্রার সঙ্গে হঠাৎ একদিন দেখা হওয়ার কথা শিবুই বলেছিল। কিন্তু এ শর্মা কার কাছে কোন্ খবরটা চেপে গেছল, চাল-কলার খবর না চালচুলো নেই সে-খবর? শিবুটা ওই রকমই। আমাকে ছাড়া তার চলে না, আবার কোন ব্যাপারে তার ওপর টেক্কা দেওয়াটাও বরদাস্ত করে না। যার সঙ্গে জলজ্যান্ত এক চকচকে মেয়ের হৃদয়ের কারবার সে যে নিতান্ত করুণার পাত্র তাদের, এটুকু শুনিয়ে নিজের মর্যাদা বড় করার লোভ ছাড়তে পারেনি, শিবুর আর কোন উদ্দেশ্য ছিল মনে হয় না। যাক, বেশ করেছে। চন্দর জয় হোক। বিয়েটা চুকিয়ে ফেলে মিত্রা টেলিফোনে জানিয়েছে কারো সংসারে অশান্তি আনতে চায় না, তাই অন্য পথ বেছে নিয়েছে। আর তার নিজের লেখা চিঠিগুলো ফেরত চেয়েছে। সে ধন পোড়ানো সারা, ছাইটুকুও ধরে রাখিনি যে ফেরৎ দেব। ভাবছি, রেস্তরাঁর ক্যাবিনে আর সন্ধ্যার নিরিবিলি গঙ্গার ধারে, এমন কি কথা দেবার দিনেও যা সে দিয়েছিল তা আর ফেরত নেবে কি করে? তবু চন্দর জয় হোক। ঝকঝকে গাড়ি দেখিয়ে সে যে তার মন জয় করতে পেরেছে সে জন্য কৃতজ্ঞ। পরে দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ার থেকে আগে পড়লে ক্ষতি কম।

"কিন্তু ক্ষতটা আপাতত আর একদিক থেকে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। বাড়ির ন্যায়নিষ্ঠ আচারনিষ্ঠ প্রাচীন কর্তাটির দিক থেকে। তোমাকে শ্রদ্ধা করি, ভয় করি, ভক্তি করি, আর মনে মনে ভিক্ষুকের মত তোমার ছেলের ভাগ নিয়ে কাড়াকাড়ি করি।

আশ্রিতের চরিত্রশোধনের কর্তব্যে তুমি নির্মম কড়া শাসন করেছ, বেশ করেছ। কেবল জানতে ইচ্ছে করে আমার বদলে তোমার ছেলে যদি কোন ব্রাহ্মণ-কন্যাকে ঘরে আনার জন্য আমার মত এমনি অবিরাম মাথা খুঁড়ত, তাহলেও তুমি ঠিক এমনি কড়া শাসনই করতে কিনা ...।"

* * *

"...বাল্মীকির বুকে প্রথম কবিতার বান ডেকেছিল ক্রৌঞ্চমিথুন বধ দেখে। হতেই পারে। সেদিন কোথায় যেন পড়লাম না শুনলাম, চব্বিশ বছর বয়সের এক বোবা ছেলের ফট করে মুখ দিয়ে কথা বেরুলো নদীর ধারে স্যুইমিং কস্টিয়ুম-পরা এক যুবতী মেয়েকে দেখে। রমণী-কাণ্ড এমনি অবাক কাণ্ডই বটে। আমাদের শিবুবাবুও প্রেমে পড়েছেন জ্যোতিরাণীকে দেখে। অবাক হব, না হাসব, না কাঁদব! পরীক্ষার প্রশ্ন আর পরীক্ষায় প্রথম হওয়া ছাড়া আর কোন দ্রষ্টব্য বা লক্ষ্যের বস্তু ভূভারতে আছে তাই জানত না যে, সেই শিবুবাবু প্রেমজ্বরে অজ্ঞান। ইদানীং অবশ্য বিলিতি ছবির নায়িকাদের দেখে রমণীরহস্য নিয়ে একটু-আধটু মাথা ঘামাতে শুরু করেছিল সে, আর তাই দেখেই ওকে জ্যোতিরাণী-দর্শনে নিয়ে আসা আমার—তবুও সতের বছরের একটা মেয়েকে দেখামাত্র এতটা ঘায়েল হবে সেটা এই পাষণ্ডও কল্পনা করেনি। শরবিদ্ধ জন্তুর মত সেটা ছটফটানি দেখলে ডাক্তারেরও ঘাবড়াবার কথা। কিন্তু এরকম কিছুই তো আশা করছিলাম আমি। ...প্রভুজী মানিকরামের সত্তাধ্বজী প্রবীণ প্রাজ্ঞ ন্যায়াধীশ, তোমার এবারের বিচার-খানা কেমন হবে? আশ্রিত দূরাত্মীয়ের চরিত্রশোধনের কঠিন কর্তব্যে পায়ের থেকে খড়ম খুলতে চেয়েছিলে, চাবকে লাল করতে চেয়েছিলে, মৈত্রেয়ীর সঙ্গে সম্পর্ক না ঘোচালে এ বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে না বলে শাসিয়েছিলে। কিন্তু এবারে কি হবে? এবারে যে স্বয়ং যুবরাজের রোগ! খড়ম খুলবে না চাবুক তুলবে না সম্পর্ক ছাড়বে—নাকি পুরুত ডাকবে?"

*

"কালীনাথ, তোমার কালী মুখের হাসি সামলাও! ন্যায়াধীশের অমন অসহায় মূর্তি দেখে তোমার হাসার কি হল? নিতান্ত আশ্রিত দূরের আত্মীয়ের চিকিৎসা আর যুবরাজের চিকিৎসা এক-রকম হবে আশা করেছিলে? হলই বা এক রোগ। তোমার বেলায় খড়ম খোলা হয়েছিল, চাবুক তোলা হয়েছিল, ওইতেই রোগ ছেড়েছে। কিন্তু যুবরাজের যে পুরুত ডাকা ছাড়া উপায় নেই, উপায় নেই! মজা দেখার আসরে নেমেছ, চুপচাপ বসে মজা দেখো। হেসো না, কাঙালপনা কোরো না। অজ্ঞান বয়েস থেকে এ বাড়ির আশ্রয়ে এসে পিসীকে মা ভেবে আর পিসেকে

মনে মনে যুবরাজের মতই বাবা ডেকে মা-বাবা না চেনার ঘাটতি পূরণ করতে চেয়েছ, তাঁদের ব্যবহারে এতটুকু তারতম্য দেখলে তোমার বুকের হাড়-পাঁজর টনটন করে উঠেছে, যুবরাজের একচ্ছত্র দাবির আসনে মনের মত ভাগ বসাতে না পেরে হিংসেয় কত সময় তাকে তুমি মনে মনে উৎখাত করেছ—তোমার কপালে খড়ম আর চাবুক জুটবে না তো কি শানাই বাজবে? হেসো না, আর কাঙালপনা কোরো না, চুপচাপ বসে মজা দেখো।"

যন্ত্রণার মত এই রাগ, চাপা বিদ্বেষ কার ওপর জ্যোতিরাণী অনুমান করতে পারেন। শ্বশুর-শাশুড়ীর ওপর। বিশেষ করে শ্বশুরের ওপর।......না, একদিন যিনি শ্বশুর ছিলেন তাঁর ওপর।

... ...

"মামু, তুমি একটি নরাধম, তুমি একটি পাষণ্ড, তুমি তার থেকেও যাচ্ছেতাই, তুমি একটি বর্ণচোরা কলির কেষ্ট! ওইটুকু মেয়ে, আমি তবু ফ্রক-পরা থেকে দেখে আসছি—তুমি তো তারও আগে থেকে। এতদিন প্রেমের ফাঁদ পাতা কবির পিণ্ডি চটকেছি, এখন যে তোমার পিণ্ডি ছটকাতে ইচ্ছে করছে! এত লেখা-পড়া শিখে, এত স্বদেশী করে বীরদর্পে সাহেব ঠেঙিয়ে আর একের পর এক চাকরি ছেড়ে শেষে নদী যথা সাগরে ধায় তুমি তথা জ্যোতিরাণীর প্রেমে? তোমাকে ফাঁসি-কাঠে ঝোলানো উচিত না পাগলা-গারদে চালান করা উচিত নাকি ব্রজধামে নির্বাসন দেওয়া উচিত? রাধাকে নিয়ে কেষ্ট-কংসের মধ্যেও তো লেগেছিল বলে শুনিনি! তুমি বর্ণচোরা কলির কেষ্ট হলেও তোমাকে কংস-বধ করাই উচিত বোধ হয়। শিবুর সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব শুনে জ্যোতিরাণীর মা আর জ্ঞাতি দাদাদের হাবভাব দেখে আর সকলেই তারা তোমার খোঁজ করছে দেখে খটকা লেগেছিল, বাড়ি ফিরে খবরটা তোমার কানে ঢুকিয়ে মুখের দিকে চাওয়া মাত্র ব্যাপার জল। সতের বছরের জ্যোতিরাণীর রূপের জোর বুঝতেই পারছি, জল ঘোলা করতে আপত্তি না হলে প্যাঁচ কষে এখনো তাকে তোমার সঙ্গে জুড়ে দিতে রাজি আছি। ছেলের ভাবী বউ দেখে এসে বুড়ো আনন্দে ডগমগ, এই গোছের একটা ম্যাজিক ঘটিয়ে তাঁর মুখখানা দেখার বড় লোভ। কিন্তু তুমি পাষণ্ড উদারতার আগুনে ঝাঁপ দেবে জানা কথাই। তাহলে কি আর করবে। জ্যোতিশূন্য হয়ে তুমি নরকে পচে মরো, আমি স্বর্গে বসে হাসি।"

পড়তে পড়তে দু কান লাল হয়েছে জ্যোতিরাণীর। তাড়াতাড়ি পাতা উল্টে গেছেন।

... ...

"সন্ধ্যে থেকে বাড়িতে আনন্দের হাট লেগে গেছে। বাড়ির একমাত্র ছেলের বউভাত ফুলশয্যা, ঘটা হবেই তো। ওঘরে সেই সতের বছরের জ্যোতিরাণী সিঁদুর পরে ঘোমটা দিয়ে মুকুট পরে বসে আছে যেন বালিকা রাজেশ্বরী। মামু পাষণ্ডের দোষ দেব কি, আজ আমিও চোখ ফেরাতে পারছি না। বউয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ সকলে। বুড়ীর মুখে হাসি ধরে না, বুড়োর গম্ভীর মুখের ফাটল দিয়ে খুশি ঝরছে। সকলকে ছেড়ে চেয়ে চেয়ে আমি শুধু কর্তার মুখখানাই দেখছি। আমার ওপর কর্তার আজ বড় স্নেহ, এত খাটতে দেখে বার বার করে বলেছেন, পাখার নিচে ঠাণ্ডা হয়ে বোস্ একটু, দুদণ্ড জিরিয়ে নে, ছোটাছুটি করে অস্থির হলি যে একেবারে! আমি ব্যস্ত হয়ে সরে গেছি, আবার দূরে দাঁড়িয়ে তাঁকেই দেখেছি।

"এমন একটা সুন্দর মেয়ে ঘরে এলো, আনন্দ আমারও হওয়া উচিত। অনেক তো হেসেছি আর অনেক কাজও করেছি। মামুর পিছনেও কম লাগিনি। কিন্তু হাসি আর আনন্দ এক জিনিস? উৎসবের এত হৈ-চৈ হট্টগোলের মধ্যে আমার ভিতরটা সারাক্ষণ কেবল চিনচিন করেছে। বাড়িতে খুশির বাতাসে আর ফুলের বাতাসে একাকার, সে বাতাস বুক-ভরে টানতে পারিনি। কর্তার খুশি-মুখ সামনে পড়া মাত্র আমার মেকী হাসির মুখোশ খসে পড়তে চেয়েছে।...এ বাড়ির ছেলে তো নই-ই, আত্মজন কেউ হলেও এত বড় না হোক ছোটখাটো একটু খুশির উৎসবের মধ্য দিয়ে আর একটি মেয়ে কপালে সিঁদুর মাথায় ঘোমটা দিয়ে এই বাড়িতে এসে দাঁড়াতে পারত। তাহলে পিঠময় দগদগে চাবুকের দাগ নিয়ে আজ তাকে প্রাণের দায়ে পালিয়ে বেড়াতে হত না। সে দাগ আমি নিজের চোখে দেখিনি, বড় গলা করে চন্দ আমাকে বলেছিল। মিস্টার চাণ্ডা। সেদিন আমার অফিসে এসে হাজির। বিকেলেই বেশ গিলে এসেছিল। পা টলছিল, মুখ তেল-তেলে লাল। মিত্রার নামের আগে একটা অশ্লীল গালাগাল জুড়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, হোয়্যার ইজ সী, ডু ইউ নো? আগে আপনার নাম করত আর দাঁত বার করে হাসত, বাট আ-অ্যাম সিওর সী স্থুন রিপেনটেড্ ডেসার্টিং ইউ—ছাট ফাইন বীচ—সী রিকোয়ার্স সাম মোর ল্যাশেস—ইজ সী উইথ ইউ নাউ? আমার হতভম্ব মূর্তিও চাণ্ডা সাহেবের হাসির কারণ হয়েছিল, বলেছিল, ইয়েস সার, ইওর লেডি—সে আমাকে মাতাল বলেছিল লম্পট বলেছিল জোচ্চোর বলেছিল, আরো অনেক মধুর কথা বলেছিল—অ্যাণ্ড সী গট সামথিং ক্রম মি। আমি তার মুখ বেঁধে নিয়ে পিঠে হাণ্টার বুলিয়েছিলাম, এচ্‌ড্ সাম ফাইন আর্ট-ওয়ার্ক অন হার ব্যাক—ভেরি ফাইন ইনডিড্, পিঠময় সে দাগ আর জীবনে উঠবে না। অ্যাণ্ড সী বিকেম অ্যাজ মীক অ্যাজ বাটার অ্যাণ্ড টুক মি ছাট ভেরি নাইট অ্যাজ এ

উওম্যান মুড—ওনলি ছাট ব্লাডি আর্ট-ওয়ার্ক অন হার ব্যাক ডিস্টার্বড হার ইমেন্‌স্‌লি। বাট আ-অ্যাম এ সোয়াইন, ওর মতলব বুঝিনি। এক মাস হয়ে গেল আমার চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছে, মেয়েটাকে শ্বশুরবাড়িতে রেখে গেছে—বাট হোয়্যার? নাউ কাম, ডোণ্ট প্লীড সাচ ভার্জিন ইনোসেন্স—ইজ সী উইথ ইউ?

দরোয়ান ডেকে লোকটাকে ঘাড় ধরে বার করে দিতে বলেছিলাম।

"তার পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত দম আটকে আটকে আসছিল। গাড়ির ফাঁদে পা দিয়ে মিত্রা ঠকেছে জানতাম, সুখে নেই তাও জানতাম, তবু এতটা জানতাম না। মিত্রা বলেছিল তার শ্বশুরবাড়ির সকলে উৎকট সাহেব, পিঠে হাণ্টারের দাগও বসায় বলেনি।...অল্প বয়সে চাকরিতে নেমে তার সুখের লোভ বেড়েছিল আর পুরুষের ওপর বিশ্বাস কিছু কমে গেছল। তবু সিঁদুর পরে ঘোমটা দিয়ে এ-বাড়ির উঠোন পেরিয়ে আসতে পেত যদি, জ্যোতিরাণীর মত অত সুন্দর না হোক খুব কি কুৎসিত লাগত? ওটুকু লোভ আর অবিশ্বাস থেকে সহজ সুস্থ একটা মেয়েকে টেনে তোলা যেত না? সে কি মস্ত অনাচারের কিছু হত? যাক, তবু জ্যোতিরাণী তুমি সুখেই থেকো। তোমার মুখ চেয়ে ভাবতে ইচ্ছে করছে, যার কাঁধে ঝুলেছ সেও সুখেই থাকুক। কিন্তু ওই সুখ আর কারো মুখে ছড়ালে নরাধম কালীনাথের চোখে সেটা কাঁটা হয়ে বিঁধবে।"

জ্যোতিরাণীর হাত থেমে গেছল, খানিকক্ষণ পাতা ওলটাতে পারেননি। তাঁর মত এত ক্ষতি মৈত্রেয়ী চন্দ আর কারো করেননি। তবু মৈত্রেয়ী চন্দর নয়, কালীদার মুখখানাই সামনে দেখছিলেন জ্যোতিরাণী। এই একজনের মনের হদিস এখনো ঠিকমত পেয়েছেন কিনা জানেন না।

... ...

"পুরুষ প্রেমের স্বপ্ন দেখে, কিন্তু বিয়ের পরেই জেগে ওঠে। শুরু থেকেই শিবুবাবু বড় কড়া রকমের জেগেছেন। অহঙ্কারের শুনি তিন আবাস, প্রথমে স্বর্গ পরে মর্ত্য শেষে পাতাল। শিবুবাবুর অহঙ্কার স্বর্গ থেকে আছাড় খেয়ে মর্ত্যের চাকরি চেখে বেড়াচ্ছিল, এখন সেটা পাতালের দিকে ঝুঁকেছে বেশ বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু জ্যোতিরাণীর সেই পাতালের নিঃশ্বাস সইছে না বোধ হয়, তার সোনার রঙে কালচে ছোপ লেগেছে।...কোনো এক ক্লাউনের সঙ্গে এক রুচিশীলা মেয়ের বিয়ে হয়েছিল। ছদিন না যেতে খটাখটি। হতাশ হয়ে মেয়েটি এক অভিজ্ঞজনের উপদেশ নিতে গেছল। সে পরামর্শ দিয়েছিল, বিয়ে যখন হয়েই গেছে, উঠে পড়ে নিজের চরিত্রে ক্লাউনের স্থূলতা আনতে চেষ্টা করো। যদি আসে তো বাঁচলে, ন

যদি আসে—ঝড় আসবে। অর্থাৎ পুরুষ যেমন তার রমণীটিও তেমনি না হলে গোল। কিন্তু জ্যোতিরাণীকে এই পরামর্শটা দেয় কে? মামু পাষণ্ড তো কলকাতা থেকেই গা-ঢাকা দিয়ে বসে আছে। মেয়েটার জন্ত দুঃখ হয়, সন্দেহের বিষে-বিষে একেবারে কালী করে দিলে। ছেলেপুলে হবে, কিন্তু চেহারার যা হাল টিকলে হয়। হঠাৎ দুপুরে সেদিন মৈত্রেয়ী একেবারে বাড়ি এসে হাজির। পিঠের দাগ আর কি করে দেখব, মুখে হাসির চটক দেখলাম। তখনই শুনলাম তার স্বামী ব্যারিস্টারি পড়ার জন্ত বিলেত যাব-যাব করছে। মিত্রা নাকি তাকে ব্যারিস্টারি পাস করে প্রথমেই তার সঙ্গে মামলা করতে বলেছে। স্বামীর সম্পর্কে যে-কটা কথা বলেছে বেশ মিষ্টি করে হেসে হেসে বলেছে। মিত্রা নতুন অফিসে চাকরিও করছে শুনলাম। নতুন অফিসের ঠিকানা দিয়ে গেল, যেতে বলল, দরকারী পরামর্শ আছে নাকি। যদি পিঠের দাগ দেখতে হয় আর দরকারী পরামর্শটা যদি তাই নিয়েই হয়—সেই ভয়ে যেতে পারিনি। কিন্তু মিত্রার পালানোর মিয়াদ শেষ হল কি করে, ভাবী ব্যারিস্টার সাহেবটি কোথায় এখন?

"···শিবুবাবুর সন্দেহের ধাক্কায় এবার আমারও পালাই-পালাই অবস্থা। উঠতে বসতে চলতে ফিরতে অবিশ্বাসী দুটো চোখ আমাকে ছেঁকে ধরে আছে টের পাচ্ছি। বউ আমার সঙ্গে তার রুগ্না মাকে দেখতে যায়, তাতেও সন্দেহ আর অবিশ্বাস। মহিলা শেষ পর্যন্ত মরে প্রমাণ করলেন তিনি অসুস্থই ছিলেন। সন্দেহ সকলের আগে নিজেকে বিষোয়, তারপর অন্যকে। এই নোটবইয়ের খোঁজে শিবু আমার ট্রাঙ্ক খুলেছিল। পায়নি। না যাতে পায় আমার সেদিকে চোখ ছিল। পার্কে সেদিন ডাকলাম ওকে, হাত ধরে বললাম, এরকম পাগলের মত করে বেড়াচ্ছিস কেন? শিবু কেঁদেও ফেলতে পারত, বিড়বিড় করে বলল, আমার মাথাটাই বোধ হয় খারাপ হয়ে যাবে কালীদা। হঠাৎ হাত ধরে অনুনয় করে জানতে চাইল, তার আগে আর কার সঙ্গে জ্যোতিরাণীর বিয়ের কথা হয়েছিল—বলল, শুধু এটুকু জানতে পারলেই তার মন ঠাণ্ডা হবে, সুস্থির হবে, স্বাভাবিক হবে—গোপনতা চলে গেলে ওদের দুজনেরই মন হাল্কা হবে। আমি মামুর নাম করে দিলাম, সন্দেহটা আমার দিক থেকে মামুর দিকে চালান হয়ে গেল তাও বুঝলাম। মামু তখন এখানেই, মামুকেও বলেছি। কি করব, মামুর সহ্যগুণ আমার থেকে বেশি, এবারে মামু সামলাক।

"এদিকটা নিরানন্দের বটে, কিন্তু আনন্দের দিকটাও আমার কাছে একটুও ছোট নয়। আমি দেখছি কর্তার মুখের হাসি গেছে, দুর্ভাবনার ছটফটানি বেশ ভালো রকম শুরু হয়ে গেছে। কর্ত্রীর মনেও শান্তি নেই। আমি নিজেকেই

নিজে পাষণ্ড বলি, কারণ তাঁদের দিকে তাকালে আমার কেবল হাসি পায়। কর্তা এক-একদিন আমার কাছে এসে বসেন, জিজ্ঞাসা করেন, কি করা যায় বল তো? আমার কেবল হাসিই পায়, বলতে ইচ্ছে করে, কেন, তোমার আচার-নিষ্ঠার জোরে সব কিছু ঠিক করে ফেলতে পারছ না?"

জ্যোতিরাণী পাতা উল্টে গেলেন। এরপর অনেকগুলো লেখা একজনের সন্দেহের সেই ঘাত-প্রতিঘাত নিয়েই। সবটাই মামাশ্বশুরকে কেন্দ্র করে। তার ফলে কালীদাকে নিয়ে শ্বশুরের ডাক্তারের কাছে ছোটা, জ্যোতিরাণীদের বাড়ি ছাড়া। এই লেখাগুলো এসে থেমেছে শ্বশুরের মৃত্যুতে এসে। মৃত্যুর পর কালীদা লিখেছেন, মৃতের সঙ্গে মানুষের বিবাদ নেই, আর যেন এই কালো খাতায় মনের কালী ছড়াতে না হয়।

কিন্তু একটানা বছর দুই বাদে ওই কালো খাতা নিয়ে তিনি আবারও বসেছেন।

... ...

"শিবু টাকা করছে। অনেক টাকা। ওর মাথা আছে, যা ধরছে তাতেই সোনা ফলছে। মাথা আছে বলেই ধরার বাহাদুরি। এই যুদ্ধটা ওর কাছে আশীর্বাদ। কিন্তু শিবু টাকা করছে বলেই এই কালো খাতায় টান পড়ার কথা নয়। সন্দেহ রোগের জন্যেও নয়, আমাকে আর মামুকে অব্যাহতি দিয়েছে, এখন ওর সামনে বিভাস দত্ত। তা নিয়েও আমার কোনো মাথা-ব্যথা নেই। কিন্তু হঠাৎ মিত্রার সঙ্গে ওদের এত সদ্ভাব হয়ে গেল কি করে বুঝতে পারছি না। তার স্বামী নাকি ব্যারিস্টারি পড়তে চলেই গেছে বিলেতে, ফিরবে কি ফিরবে না ঠিক নেই। খোঁজ নিয়ে জেনেছি মিত্রা চাকরিও করে না এখন, অথচ আছে বেশ বহাল তবিয়তেই।

"সন্দেহটা ছোঁয়াচে রোগের মত। শিবুকে দুষতাম। কিন্তু সেটা এখন আমাকেই ছেঁকে ধরছে। ধরে আছে। শিবু আরো বড় বাড়ি ভাড়া করেছে, আরো বড় গাড়ি হয়েছে তার। আর সেই বাড়ি আর গাড়ির সঙ্গে মিত্রার যোগও বাড়ছেই। সংস্কৃতির অনুষ্ঠানে প্রায়ই ডাক পড়ে নাকি দুজনেরই। খোঁজ-খবর আরো নিয়েছি। মিত্রার সংস্কৃতি-প্রীতির লক্ষ্য কিছুটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু শিবুর সংস্কৃতি-ভক্ত হওয়া আর কষাইয়ের বুকে জীব-প্রেম উথলে ওঠা প্রায় এক ব্যাপারই। মিত্রাই তাকে এই আনন্দের রাস্তায় টানছে অনুমান করতে পারি। মোটা টাকার চাঁদা আদায় করে দিলে কে না মস্ত সংস্কৃতি-রসিক বলে দু হাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা জানাবে।

"কিন্তু ব্যাপারটা এর থেকেও জটিল ঠেকছিল আমার কাছে। কেন ঠিক বলতে পারব না। এই যোগাযোগটাই আমার কাছে ঠিক স্বাভাবিক লাগছিল না হয়ত। জটিলতার রেখাপাত বাড়তেই থাকল। অনেক কিছুই বিসদৃশ ঠেকতে লাগল। শিবুর চেক বই খুলে মিত্রার নামে কাটা কয়েকটা চেকের হদিসও পেয়েছি। একেবারে তুচ্ছ অঙ্কের চেক নয়। রাতের ফাংশনে ডাক পড়লে খোঁজ নিয়ে দেখেছি মিত্রা সেখানে আছেই। নতুন করে আবার অশান্তির আগুন জলেছে আমার মাথায়। আমি কেবল খুঁজে বেরিয়েছি চন্দ গেল কোথায়। বিলেত যদি গিয়েই থাকে, ব্যারিস্টার যে হয়নি বা হবার জন্যে সেখানে বসে নেই তাতে আমার একটুও সন্দেহ ছিল না। মিত্রার কপালে সিঁথিতে সিঁদুরের টিপের ওপরেও আমার বিশ্বাস ছিল না। বিশ্বাস ছিল কেবল ওর পিঠের চাবুকের দাগগুলোর ওপর—যা আমি চোখে দেখিনি কখনো। সেই চাবুক যেন আমার পিঠেও পড়ে আছে। তার যাতনাও আছে, রাগও আছে। ভিতরটা আমার আজও সেই দাগ মুছে দেবার জন্য লালায়িত, কিন্তু কেমন করে যে তা সম্ভব ভেবে পাইনে। ওর স্বামীর অস্তিত্ব যদি মুছে গিয়েই থাকে ও আমাকে জানায় না কেন? আজ তো খড়ম নিয়ে তাড়া করার কেউ নেই। কিন্তু কিছু বলা দূরে থাক, আমাকে দেখলেই ও কেমন সচকিত হয়ে ওঠে, সব থেকে বেশি আমাকেই এড়িয়ে চলতে চায়। কেন? কেন?

"চিন্তাটা অসহ্য হয়ে উঠেছিল, তাই একদিন জানাও গেল সব কিছু। দিন কয়েকের জন্য শিবু বাইরে গেছে। পরে শুনলাম মিত্রাও কলকাতায় নেই, বাইরের কি এক ফাংশনে কর্তৃত্বের ভার নিয়েছে। সেই রাতেই বিক্রমকে ধরলাম আমি, বিক্রম পাঠক। শিবুর গুণমুগ্ধ ভক্ত, আবার বিলক্ষণ ভয়ও করে তাকে। হোটেলে নিয়ে গিয়ে তাকে আকণ্ঠ মদ গেলালাম। তারপর ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বাড়ির অশান্তির কথা তুললাম। বলা বাহুল্য, সেই কল্পিত অশান্তি শিবু আর মিত্রাকে নিয়ে। বললাম, এবারও দুজনে এক জায়গাতেই গেছে কে আর না জানে। মদের নেশায় বিক্রম হোঁচট খেল যেন, সন্ত্রস্ত বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল, ভাবীজী জানে? ছেলেটা ভালো, ভাবীজীর ওপর তার টানও আছে। কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল, দেখো তো, ঘরে এমন বউ থাকতে এরকম নচ্ছার মেয়েমানুষের পাল্লায় কেউ পড়ে, দাদার এত বুদ্ধি, কিন্তু চোখ নেই। ভাবীজীর দুঃখে এরপরে গলগল করে অনেক কথাই বলেছে সে। তার প্রত্যেকটা কথা আমার কানে আর মাথায় এক-একটা বিষাক্ত তীরের মত ঢুকেছে। বিক্রম সব জানে বলে, আর এ বাড়ির সঙ্গে তার একটু-আধটু যোগ আছে বলে শিবুর অগোচরে মিত্রার সাদর আপ্যায়ন থেকে সেও একেবারে বাদ

পড়েনি। জানার যেটুকু জানা হয়েছে, ওঠার আগে বিক্রমকে শাসিয়ে এসেছি, এই নিয়ে আলোচনা হয়েছে শিবু জানতে পারলে তার বিপদ হবে।

"না, শিবু যা করেছে তা আর কেউ করেনি। পিসেমশাইর খড়ম মিত্রাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারেনি, চন্দর চাবুক তাকে বরং আরো আমার কাছে এগিয়ে দিয়েছিল। জীবনে তাকে পাব না জানতুম, তবু সে আমার কাছেই ছিল। কত কাছে সে শুধু আমিই জানি। কিন্তু এ বাড়ির সুরেশ্বর চাটুজ্যের ছেলে শিবেশ্বর চাটুজ্যের টাকা তার সব নিয়েছে, সব নিয়ে তাকে ভোগের সঙ্গিনী করেছে। অপমানের সব থেকে বড় চাবুকটা শিবু আমারই মুখের ওপর মেরে দিয়ে গেছে। মনে পড়ছে, ওর বাবার ভয়ে মিত্রাকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারছিলাম না বলে ও বলেছিল, অত যদি ভয় তো ছেড়ে দাও, আমিই চেষ্টা-চরিত্র করে দেখি বিয়েটা করে ফেলতে পারি কিনা। শুনে সেদিনও আমার ভালো লাগেনি, কিন্তু বুঝতে পারিনি মিত্রাকে ঘিরে তখন থেকেই ওর ভিতরে বাসনার খেলা চলছিল। ...জ্যোতিরাণী, তোমাকে সাবধান করার সময় পেলে সাবধান করতাম, আর করে লাভ নেই। যে কদিন পারো সুখেই থাকো। পাপ এলে বিনাশ আসবেই, সেটা এবার কেমন করে কার হাত দিয়ে আসবে আমি জানি না। আমি সেই প্রতীক্ষায় আছি।"

সর্বাঙ্গ সিরসির করছে জ্যোতিরাণীর। রুদ্ধশ্বাসে পাতা উল্টে চলেছেন। পর পর কটা লেখায় হাসি-ঠাট্টার মধ্যেও প্রতিশোধের একটা নীরব সঙ্কল্প যেন ঝিলিক দিয়ে গেছে। এমন কি ছেলেটারও যেন অব্যাহতি নেই তা থেকে। বিভাস দত্তকে ঘিরে টীকা-টিপ্পনীও কম নেই।

... ...

"ওরা বিলেত চলে গেল। আমি হাসিমুখে ওদের প্লেনে তুলে দিয়ে এলাম। মিত্রা গেল তার ব্যারিস্টার স্বামীর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে আর টাকা আনতে। আর শিবেশ্বরবাবু যাবেন অ্যামেরিকায়। ভালো ভালো, জমুক নাটক। জমে জমে শেষ অঙ্কে আসুক। আমি যে ওদের মুখের ওপর হা-হা শব্দে হেসে উঠিনি আমার বাবার ভাগ্যি। যাবার আগে শিবু আমাকে আড়ালে ডেকে বলল, জ্যোতির ওপর যেন একটু চোখ রাখি। অর্থাৎ বিভাস যেন এই ফাঁকে আবার বেশি না এগোয়। আমি আশ্বাস দিয়েছি চোখ রাখব। চোখ রাখবার জন্যে সে যে সদাকে মোতায়েন করে গেছে তাও জানি। তবু সাবধানের মার নেই বোধ হয়। আমি তো হাবাগোবা ভালোমানুষ, আমাকে নিয়ে ওদের নিজেদের ভয় নেই। টাকা হলে তবে লোকে চালাক হয়। শিবেশ্বর ভারী চালাক, আর জ্যোতিরাণীর মিত্রাদিও। জ্যোতিরাণীকে

বলব সব? বললে বিভাস এগোয় কিনা দেখব? কিন্তু তুমি একটি রামমূর্খ কালীনাথ, জ্যোতির এগনোর সম্ভাবনা দেখলে বলতে পারতে, বিভাস এগোলে কি লাভ? তার থেকে হাতে ছুরি, বুকে ছুরি, চোখে ছুরি, মগজে ছুরি নিয়ে যেমন বসে আছ তেমনি বসে থাকো। গলা যারা বাড়াবার তারা ঠিক একদিন গলা বাড়াবে।"

জ্যোতিরাণীর মনে আছে, যেদিন রওনা হয়ে গেল দুজনে, সেই রাতেই ফিরে এসে কালীদা এই কালো খাতা খুলে বসেছিলেন। আর তিনি অবাক হয়ে ভেবে-ছিলেন, এই রাতে ভদ্রলোক লেখার মত কি পেলেন আবার। পরের তারিখটা অনেকদিন পরের—দুজনে বিলেত থেকে ফিরে আসারও পরের।

"...মিত্রার কথাবার্তায় চালচলনে, হাসিখুশিতে বিলেতের রঙ লেগেছে। ফেরার পরেও ওর গায়ে যেন বিলেতের বাতাসই লেগে আছে। মোটা শরীর বেশ আঁট হয়েছে। কি কাণ্ড, আমার চোখেও লোভ লাগছে নাকি। কালীনাথ সাবধান।...মনের আনন্দে জ্যোতিরাণীকে বিলেতের গল্প শোনাচ্ছে। ওর স্বামীর সঙ্গে মোক্ষম বোঝাপড়া করে আসার গল্পও। জ্যোতিরাণী হাঁ করে শুনছে। হায় গো জ্যোতিরাণী, তুমি একালে জন্মালে কেন?...থেকে থেকে আজকাল প্রায়ই একটা অদ্ভুত কথা মনে পড়ে আমার। বাড়ির কর্তা সুরেশ্বর চাটুজ্যে অনেকদিন বলেছেন, জ্যোতিরাণীকে দেখে দেখে নাকি নিজের মা-কে মনে পড়ত তাঁর, সেই রকমই মনে হত। সুরেশ্বর চাটুজ্যের মা মানে তো সেই তেজস্বিনী হৈমবতী। আমারও আজকাল সে-রকম ভাবতে একেবারে মন্দ লাগে না। কিন্তু শিবু তাহলে কে? আদিত্যরাম? আদিত্যরাম আর যাই হোক, নমস্য বীর্যবান। শিবু তার প্রেত হবে। কিন্তু আমিই বা তাহলে কে? নীলগোপাল নয় তো? আর মিত্রা সৌদামিনী? নীলগোপালের কাছ থেকে আদিত্যরাম সৌদামিনীকে কেড়ে নিয়েছিল বলেই তো আদিত্যরামের কাল হয়েছিল! মিলছে মন্দ না। কালীনাথ তুমি শুধু অপেক্ষা করো, ব্যস্ত হয়ো না।...মৈত্রেয়ী চন্দ ঝকঝকে একটা নতুন বাড়িতে উঠেছে, কোন এক মুসলমান বাড়িঅলার কাছ থেকে মওকায় লীজ নিয়েছে নাকি। আমি শুধু শুনছি আর অপেক্ষা করছি।"

জ্যোতিরাণীর সব দীর্ঘনিঃশ্বাস এখনো কি একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি? বড় নিঃশ্বাসই বেরিয়ে এলো একটা। পাতা ওলটানো মাত্র উদ্‌গ্রীব আবার।

... ...

"শিবেশ্বরের মুখের ওপর যেন আচমকা জোরালো সার্চলাইট ফেলা হল একটা। প্রথমে সচকিত, তারপর বিমূঢ়।

"খাতাপত্র খুলে ব্যবসা সংক্রান্ত আলোচনা চলছিল। আমি জিজ্ঞাসা করেছি, বালীগঞ্জের দোতলা বাড়িটা মৈত্রেয়ী চন্দর নামে কেনা হল, এর খরচাপত্র তো কিছু খাতায় নেই দেখছি।

"এটুকু সামলাতেই সময় লাগল বিলক্ষণ। মুখ ফ্যাকাশে হয়ে ওঠার দাখিল। কিন্তু সত্যিই ফ্যাকাশে হলে মর্যাদা থাকে না। আমি তার অ্যাটর্নী অথচ চুপচাপ কাজটা করিয়েছে অন্য অ্যাটর্নীকে দিয়ে। ঢোঁক গিলে গম্ভীর জবাব দিল, ওটা আমার পার্সোন্যাল অ্যাকাউণ্ট থেকে গেছে, খাতায় আনার দরকার নেই। একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, তোমাকে কে বলল?

"জানালাম যে অ্যাটর্নী কাজ করেছে, তার সঙ্গেই দেখা হয়েছিল। শুনে শিবেশ্বর মন্তব্য করল, মৈত্রেয়ীর চেনা-জানা অ্যাটর্নী, তাকে দিয়েই করালে। এও যথেষ্ট নয়, আরো একটু কৈফিয়ত দেবার তাগিদ বোধ করল। হাসতে চেষ্টা করে বলল, এমন ধরল যে টাকা না দিয়ে পারা গেল না, একতলাটা ভাড়া দিয়ে শোধ করে দেবে···সস্তার বাড়ি, হাতছাড়া হয়ে যায়, বিলেতে ওর স্বামীর কাছ থেকে তেমন বিশেষ কিছু তো আনতে পারেনি···।

"নির্বোধ বিস্ময়ের কারুকার্য নিজের মুখে কতটা ফোটাতে পেরেছিলাম জানি না। হতভম্বের মতই আমি বলে উঠেছি, স্বামী! বিলেতে আবার তার স্বামী এলো কোত্থেকে? তার স্বামী তো সেই কবছর ধরে কোয়েমবেটোরের হাসপাতালে পড়ে আছে, মোটর অ্যাক্সিডেন্ট থেকে প্যারালিসিস—

"বড় আফসোস, শিবুবাবুর সেই মুখ আমি ছাড়া আর কেউ দেখল না। আমার ভয় ধরেছিল ও বোবা হয়ে গেল কিনা। না, তারপরেও ও আমার হাতে-পায়ে ধরে নি। আগের দিন হলে ধরত বোধ হয়। শুধু মুখের দিকে চেয়ে থেকে যেটুকু পারে বুঝিয়ে দিয়েছে। ধনপতি শিবেশ্বর চাটুজ্যে মুখের দিকে চেয়ে থেকে শুধু দুটো চোখ দিয়েই যেটুকু বলতে পারে—বলেছে। আমি বোকা কালীনাথ তেমনি নিঃশব্দেই তাকে আশ্বাস দিয়েছি।

"এর পর দিনে দিনে আমার কদর বেড়েছে। লাফিয়ে লাফিয়ে মাইনে বেড়েছে। ওর টাকা-পয়সার ওপর অধিকার বেড়েছে। দরকারে ওর ওপর কর্তৃত্বও বেড়েছে। ও নির্বোধ না, মিত্রাকে ও কিছু বলবে না আমি জানতাম। আমার মুখ যদি সেলাই করা থাকে তাহলে মিত্রার না জানাই ভাল। জানলে পরিস্থিতি অস্বস্তিকর হবে। ··কিন্তু মিত্রা কি আভাস কিছু পেয়েছে? আমার সঙ্গে সেই ব্যবহারে আবার সেই ঘনিষ্ঠতার সুর কেন? একটু হাতছানি পেলে ও ছুটে আসতে পারে বোধ হয়। সে কি অনেক টাকা নাড়াচাড়া করি বলে, নাকি আর কিছু?"

জ্যোতিরাণী উদ্‌গ্রীব হয়ে পাতা ওলটাচ্ছেন, মাঝের এই তিনটে বিচ্ছিন্ন বছরও বুঝি মন থেকে মুছে গেছে।

... ...

"চাবুক মেরে মেরে ছেলেটার ছাল-চামড়া তুলে দিয়েছে। বসার ঘরে বিভাস আর জ্যোতিরাণী ছিল, বিভাস পড়ছিল আর জ্যোতিরাণী শুনছিল—ছেলেটা তখন ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে পালিয়েছিল। এই অপরাধ। নাটক জমছে বই কি, বেশ দ্রুত তালে জমছে। শিবু খবরটা শুনেছে চন্দননগরে মৈত্রেয়ীর কাছ থেকে। সেখানকার ফাংশান শেষ করে সেই রাতেই কলকাতায় ফিরেছে দুজনে। কালীনাথ, ছেলেটার জন্যে তোমার দুঃখ হওয়া উচিত, তার ঠাকুমাকে কাঁদতে দেখে তোমার দুঃখ হওয়া উচিত, জ্যোতিরাণীর জন্যেও দুঃখ হওয়া উচিত। স্বাধীনতার সকালে মামুর মুখে রাণীর নয়জন ফাঁসির আসামীর গল্প শুনে সকলের মুখে আলো দেখেছিলে, সেটা এভাবে নিভল বলে তোমার দুঃখ হওয়া উচিত। কিন্তু দুঃখ না হলে জোর করে আর দুঃখ করবে কি করে। ছেলেকে চাবুক মারার পরেও বাবুর রাগ পড়েনি। সদাকে চাবকে লাল করবে বলে শাসিয়েছে। বাড়ি থেকে দূর করে দেবে বলেছে। তারও অপরাধ কম নাকি! সে সঠিক করে বলতে পারেনি আলো নেভার আগে বিভাস দত্ত কতক্ষণ ধরে বসার ঘরে ছিল, সঠিক বলতে পারেনি আলো নেভার কতক্ষণ পরে সে গেছে, তার বউদিমণি কতক্ষণ বাদে ওপরে উঠেছে। এই ব্যাপারে চোখ রাখাই সদার আসল কাজ এখন, আসল কাজে গাফিলতি হলে রাগ হবে না? এর কিছুদিন আগে সদাকে জ্যোতিরাণী কি বই না কি একটা লেখা আনার জন্যে বিভাসের কাছে পাঠিয়েছিল। সদাকে সোজা তিনতলায় বিভাসের ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছিল তার বাড়ির লোক। সে-ঘরে বউদিমণি আর সিতুর সঙ্গে শুধু বিভাসবাবুর ছবি টাঙানো দেখে সদা খবরটা তার দাদাবাবুকে দিয়ে পুরস্কার পেয়েছিল, এ-বেলায় তিরস্কার মিলবে না? কিন্তু সদা সেই থেকে গজরাচ্ছে, এ-বাড়িতে সে আর থাকবে না, এসব ঘেন্নার কাজ তার দ্বারা আর হবে না। ও আর থাকবে না।...চল্লিশ বছরের সদা, গেলে মন্দ হয় না বটে। নাটকের এই অঙ্ক সদার বিদায় চাইছে।"

চোখের সামনে দিয়ে পর্দায় এক-একটা ছবি সরে সরে যাচ্ছে যেন জ্যোতিরাণীর। তাঁর চোখ লাল, মুখ লাল। পাতার পর পাতা উল্টে চলেছেন। থামলেন, শুরুতে সিতুর কথা।

... ...

"ছেলেটা এক নম্বরের বিচ্ছু। কখনো মনে হয় মায়ের ছেলে, কখনো বাপের।

মায়ের ছেলে মনে হলে ভালবাসতে ইচ্ছে করে। কিন্তু শিবুর ছেলে মনে হলে আমার ভেতরের ছুরিগুলো ওর দিকেও উঁচিয়ে উঠতে চায়। বাপের মত বই নিয়ে পড়ে থাকার ধৈর্য নেই, অথচ বাপের মতই মাথা। ওইটুকু ছেলে, পুরুষের চোখ নিয়েই যেন ওই ছোট মেয়েটার দিকে তাকায়—শমীর দিকে। নাকি, ওর বাপের ওপর রাগে এমন মাথা খারাপের মত দেখি আমি! শেষ পর্যন্ত মায়ের মত হবে কি বাপের মত, ঠিক বুঝতে পারি না। ছোট দাদুর পেলোরাস জ্যাকের গল্প শুনে ওর চোখে জল আসে। আবার ডাকাতদের চোখের সামনে মানুষ মারতে দেখলেও বীরত্বের উদ্দীপনা—তখন মনে হয় এও আর একটি খুদে শিবু। আমি চেয়ে চেয়ে দেখি। কেন দেখি কে জানে। এক-একসময় মনে পড়ে, এই ছোঁড়ার মাথায় পাকা চুল দেখেই না ওর ঠাকুমা কাঁপতে কাঁপতে আর্তনাদ করে উঠেছিল, প্রভুজী এলো!"

... ...

সামনে কালো নোটবই পড়ে আছে। জ্যোতিরাণী নিস্পন্দের মত বসে। কোন যোগ নেই আর, তবু অগোচরের কি একটা অস্বস্তি ভেতরে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। গোড়ার লেখাটা মনে পড়ছে থেকে থেকে। শকুনি-স্তুতি। আরো বার দুই পড়েছেন ওটা তিনি। শকুনির অট্টহাসির জায়গাটায় এসে প্রত্যেকবার থমকেছেন। অস্বস্তি বেড়েছে। থেকে থেকে মনে হয়েছে, অট্টহাসি না হোক, অমনি একটা সর্বধ্বংসী নিঃশব্দ হাসি যেন ছড়িয়ে আছে কালীদার লেখা এই কালো খাতাটার পাতায় পাতায়।

মাসী!

হাঁপাতে-হাঁপাতে শমী ঘরে ঢুকল। নীচের কম্পাউণ্ডে মেয়েদের সঙ্গে খেলছিল, ছুটে এসেছে। চৌদ্দ বছর বয়েস আন্দাজে, এখনো একটু মোটার দিক ঘেঁষা, তাই হাঁপ ধরেছে।

মাসী, আজও সিতুদা গেটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল! আজ আবার ট্যাক্সি চেপে এসেছিল! আজ কিন্তু আমি ভয় পাইনি, ও-রকম গম্ভীর মুখ করে গেটের ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেও খেলার দানটা শেষ হলেই ঠিক গেটের সামনে যাব ভেবেছিলাম। তার আগেই ট্যাক্সিতে উঠে চলে গেল—

॥ ছত্রিশ ॥

শমী আগেও লক্ষ্য করেছে, সিতুদার এ-রকম হঠাৎ আসা আর কারো সঙ্গে দেখা না করে কথা না বলে চলে যাওয়ার খবর শুনলে মাসীর মুখখানা কি রকম হয়ে যায়। দিনকয়েক আগেও এই কাণ্ড হয়েছিল। সেই সকালেই মাসীর মুখে সিতুদার সম্পর্কে মোটামুটি একটা ভালো খবরই শুনেছিল। শুনে শমী খুব যে খুশি হয়েছিল তা নয়। কারণ পরীক্ষার ফল নিয়ে তারও আজকাল মাথা ঘামাতে হচ্ছে। মাসী যেভাবে লেগে থাকে, কোনো বিষয়ে খারাপ করে পার পাবার উপায় নেই। খারাপ হোক না হোক খারাপ হবার ভয় লেগেই থাকে। সেদিন সকালে খুব মন দিয়ে মাসী স্কুল ফাইন্যালের রিপোর্ট দেখছিল। শমীর ধারণা, স্কুলের মেয়েরা কে কেমন করল তাই দেখছে। রিপোর্ট দেখা শেষ করে মাসী বলল, তোর সিতুদা ভালো পাস করেছে, স্টার পেয়েছে দেখছি।

সিতুদা স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়েছে, সেটা শমীর আর স্মরণের মধ্যে ছিল না। একে দেখা-সাক্ষাৎ নেই, তায় মুখ ফুটে মাসীকে সিতুদার কথা কখনো বলতে শোনেনি। গোড়ায় গোড়ায় সিতুদার সম্পর্কে এটা-সেটা বরং সে-ই জিজ্ঞাসা করত। আর মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবত, যত দুষ্টুই হোক, নিজের ছেলেকে মাসী এভাবে ভুলে গেল কি করে। আর এই কারণে মাসীকে একটু ভয়ও করতে শুরু করেছিল, পাছে নিজের পরীক্ষার ফল-টল খারাপ হলে তার ওপরেও বিগড়ে যায়। বাইরে যত নরম-সরমই দেখুক, ভিতরে ভিতরে তাঁকে কড়া ভাবার অনেক নজির দেখেছে। অত বড় বাড়ি, অমন গাড়ি, অত টাকা-পয়সার মায়া কেউ এভাবে ছেড়ে আসতে পারে—এ তার কাছে এখনো এক প্রচণ্ড বিস্ময়।

সিতুদার ব্যাপারে মাসীর চাপা আগ্রহ শমী সেইদিনই শুধু টের পেয়েছিল। আর সেদিনই সিতুদা স্কুল গেটে এসে হাজির। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়নি তখনো। কি একটা ব্যাপারে স্কুল ছুটি। মাসীর চোখে ধুলো দিয়ে শমী নিচে নেমে এসেছিল। বোর্ডিংএর আরো গোটাকতক মেয়ে এদিক-সেদিক ঘুরছে। শমীকে বোর্ডিংএর প্রায় পুরানো বাসিন্দাই বলা চলে এখন। আড়াই বছর ধরে এখানে মাসীর কাছে আছে। তাই অদূরের ওই অত বড় গেটটা আর ভালো লাগে না এখন। ফাঁক পেলে ওর বাইরে পা দেবার জন্য ভেতর উসখুস করে। কিন্তু সেদিন ওই গেটের ভেতর দিয়ে চোখ চালাতেই পা দুটো যেন মাটির সঙ্গে

আটকে গেছল। গেটের ওধারে সিতুদা দাঁড়িয়ে। গম্ভীর মুখে এদিকেই চেয়ে আছে।

আনন্দের ঝোঁকে তারপর কয়েক পা এগিয়ে গেছল শমী। কিন্তু তারপর সভয়ে দাঁড়িয়ে গেছল আবারও। এগিয়ে এসে সিতুদা গেটের গরাদ ধরে দাঁড়িয়েছিল। আর তার মুখের দিকে চেয়ে শমীর বেশ ভয় ধরেছিল। একবারও মনে হয়নি পরীক্ষা-পাসের ভালো খবর নিয়ে এসেছে। এতদিন পরে ওকে দেখে একটুও হাসেনি। আর এমন করে তাকাচ্ছিল যে শমীর কাছে আসার সাহস উবে গেছে। তার কেবল মনে হয়েছে মাসীকে ও একলা দখল করে বসে আছে, সিতুদার চোখে-মুখে সেই রাগ ঠিকরে বেরুচ্ছে। তাকে হাতের কাছে পেলে গণ্ডগোলের ব্যাপার হতে পারে। চৌদ্দ বছর হল শমীর, ওখানে যে দাঁড়িয়ে আছে নাগালের মধ্যে পেলে তাকে সে খাতির করবে বলে মনে হল না।

সে এগোচ্ছে না বলে সিতুদা হাত তুলে তাকে কাছে ডেকেওছিল। আর তক্ষুনি খুব মুশকিলে পড়ে গেছল শমী। কিন্তু ইতিমধ্যে ওধার থেকে মালীর তাড়া খেয়ে সিতুদা আস্তে আস্তে গেট ছেড়ে সরে দাঁড়িয়েছে। আক্রোশভরে মালীটাকে দেখেছে, তারপর তাকে দেখেছে, তারপর চলে গেছে।

শমী সেদিনও মাসীর কাছে ছুটে এসেছিল, খবর দিয়েছিল। মাসীর আগ্রহ শমীর চোখে খুব স্পষ্ট করে ধরা পড়েছিল। মাসী ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কোথায়? ডাকলি না কেন? চলে গেল?

শমী বলেছিল, ডাকব কি করে, যে মুখ করে তাকাচ্ছিল হাতের কাছে পেলে আমাকে ধরে ঠিক মারত—

বিরক্তির স্বরেই মাসী সেদিন বলেছিল, তোকে শুধুমুদু মারতে যাবে কেন?

কিন্তু আজ আবার তার আসার খবর শুনে মাসী একটা কথাও বলল না। শমীর কেবলই মনে হল খবরটা শোনার পর কি রকম যেন হয়ে গেল মাসীর মুখখানা।

শমী কাছে কাছে ঘুরঘুর করল খানিক। বার দুই নীচ-ওপর করে এলো। তারপরেও মাসীকে একভাবে বসা দেখল। শেষে ভয়ে ভয়ে বলেই ফেলল, আজ কাকুর ওখানে যাবে বলেছিলে…যাবে না?

আত্মস্থ হতে চেষ্টা করলেন জ্যোতিরাণী। কালীদার নোটবই পড়ার ধকল এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেননি। তার ওপর এই দিনেই ছেলের আসার আর ট্যাক্সি করে চলে যাওয়ার খবর শুনে ভিতরের কি এক অজ্ঞাত অস্থিরতা আরো বেড়েছিল। আজ আর মুখ ফুটে বলতে পারেননি, ডাকলি না কেন। তিন বছর

আগের বিচ্ছেদ গত তিন দিন আগে সুসম্পূর্ণ হয়ে গেছে। তফাতটা জ্যোতিরাণী এখন অনুভব করতে পারেন। ছেলে এত বড় খবরটা জানে না মনে হল না। উল্টে জেনেই এসেছিল মনে হল।

শমীর কথা কানে আসতে নিজেকে গোটাতে চেষ্টা করলেন আবার। বেরুবার আগ্রহ একটুও নেই। থাকেও না বড়। তবু বেরুতে হয়। যে বাস্তবের মধ্যে এসে পড়েছেন তার মুখোমুখি না দাঁড়ালেও অব্যাহতি নেই। যাবেন বলে না গেলে বিভাস দত্ত রাগ করেন না, অসুস্থ শরীরে অভিমান নিয়ে বসে থাকেন। এড়াতে চেষ্টা করলেই বরং গণ্ডগোল বাড়ে দেখেছেন। আজ বছর আড়াই হল, বাড়ি ছেড়ে দু ঘরের একটা আলাদা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে আছেন তিনিও। বাড়িতে একসঙ্গে থাকা পোষালো না নাকি। সেই সমস্যার মুখেই জ্যোতিরাণী শমীকে চেয়ে নিয়ে নিজের কাছে রেখেছেন। আপত্তি করা দূরে থাক, বিভাস দত্ত উল্টে বরং খুশি হয়েছিলন। বলেছিলেন, একটা দুর্ভাবনা গেল।

কিন্তু জ্যোতিরাণীর দুর্ভাবনা বেড়েছিল। পোষালো না বলে এতকালের পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে আসাটা খুব সাদা মনে নিতে পারেননি তিনি। শরীর তখন থেকেই ভালো যাচ্ছিল না ভদ্রলোকের, তবু বাড়িতে থাকা নাকি আর চলেই না বলেছিলেন। বলেছিলেন শমীকে নিয়ে সমস্যায় না পড়লে ও-বাড়ি আরো অনেক আগেই ছাড়তেন। কিন্তু মুখের কথা আর মনের কথা এক ভাবার দিন গেছে জ্যোতিরাণীর। তাই সদা সংশয়। নিজে তিনি বাড়ি ছেড়ে আসার পর প্রথম ছ মাসের মধ্যে একদিনও আর বিভাস দত্তর পৈতৃক বাড়িতে যাননি। শমীর রাগ-অভিমান বায়না সত্ত্বেও না। তারপর বিভাস দত্ত বাড়ি ছেড়ে ফ্ল্যাট নিলেন। তখন আর না গিয়ে উপায় ছিল না। মাঝে শমী আছে, কৃতজ্ঞতার ব্যাপারও আছে কিছু। আর, বিভাস দত্তর এখানে এই মেয়েদের হোস্টেলে ঘন ঘন আসা বন্ধ করার তাগিদও আছে।

পরের দু-আড়াই বছরে ভদ্রলোকের শরীর আরো বেশি ভেঙেছে। ভেঙেছে সত্যিই। দিনে দিনে শুকিয়ে যাচ্ছেন। অসুখটা কি বার করতে জ্যোতিরাণীর সময় লেগেছিল। মুখ ফুটে সহজে বলতে চাননি। ডায়বেটিস। এরই ওপর খাওয়া-দাওয়ার অনিয়ম। জ্যোতিরাণীর মনে মনে ধারণা অসুখটাকে ভদ্রলোক প্রশ্রয় দিচ্ছেন। ওটা তাঁর দুর্বলতার দিকও বটে, আবার জোরের দিকও বটে। রবিবার বা ছুটির দিনের প্রত্যাশার জবাবে শমীকে সঙ্গে করে তাঁকে যেতে হয়, বসতে হয়, কথাবার্তা কইতে হয়। তাঁর এই ফ্ল্যাটে টেলিফোন নেই যে না এলেও কর্তব্য সারা যেতে পারে। টেলিফোনের কথা জ্যোতিরাণী বলেওছিলেন। একা মানুষ,

অসুখ লেগে আছে, টেলিফোন একটা থাকা দরকার। বিভাস দত্ত বলেন, লাইন ট্রান্সফারের অনেক ঝামেলা আজকাল, চাইলেই মেলে না। তাছাড়া ওটা থাকলেই বড় উত্ত্যক্ত করে সব—নেই এই বেশ আছেন। কতটা সত্যি জ্যোতিরাণী জানেন না। আলাদা ফ্ল্যাট ভাড়া করে থাকার ফলে খরচ অনেক বেড়েছে, ফোন সম্পর্কে নিস্পৃহ হওয়ার সেটাও একটা কারণ হতে পারে।

শমী হাঁ শুনবে কি না, সেই অপেক্ষায় আছে। বললেন, যাবো, তুই তৈরি হয়ে নে। মুখ-হাত ধুয়ে নে, চান করবি নে।

শমী ছুটল। তারপরেই জ্যোতিরাণী অন্যমনস্ক আবার।···ছেলে আজও এসেছিল। আজও এসে চলে গেছে।

গত তিন বছরের মধ্যে মাত্র ছুটিবার চোখে দেখেছেন তাকে। সেই দেখার দাগ থেকেই গেছে। প্রথম দেখা বাড়ি ছেড়ে আসার দিনকতকের মধ্যে। বীথির কাছে থাকার ইচ্ছে নিয়ে তিনি আসেননি। পরদিনই জায়গা খুঁজতে আরম্ভ করেছিলেন। বীথি অসহায়, ছাড়তে মন চায় না আবার থাকতেই বা বলে কি করে। উল্টে জায়গা খোঁজার কাজে মুখ বুজে সহায় না হয়ে পারেনি। আন্দাজে ঘোরাই সার হচ্ছিল কেবল। এই বাস্তবে দুজনের কেউ কোন দিন পা দেয়নি, জানবে কি করে কোথায় কি আছে। অনেকক্ষণ দিশেহারার মত ঘোরাঘুরির পর একটা ছোট রেস্তরাঁয় ঢুকেছিলেন চা খেতে। সেখানকার একটা ছোকরাকে জিজ্ঞাসা করতে সে একটা আস্তানার হদিস দিয়েছিল।

বড় রাস্তা থেকে দূরে নোংরা গলির মধ্যে একটা বাড়ি। স্বল্প আয়ের মেয়েরা থাকে সেখানে। স্কুল মাস্টার, হাসপাতালের নার্স, টেলিফোন অপারেটার, গানের শিক্ষয়িত্রী—এঁরা পদস্থ বাসিন্দা সেখানকার। একতলায় ধাত্রী ঝিয়ের পর্যায়ের বাসিন্দাও আছে। পরে জেনেছেন কিছু করে না এমন মেয়েছেলেও আছে সেখানে। খাওয়া-থাকার মাশুল যোগায় কি করে সেটা বুঝতে সময় লেগেছিল। দু-চারজন মাত্র এক-একখানা ঘর নিয়ে আছে, বেশির ভাগ ঘরেই তিন-চারটে করে মেয়ে। জ্যোতিরাণীও আলাদা একটা ঘরই নিয়েছিলেন। সম্পূর্ণ ঘর নেওয়াটা কারো বিস্ময় কারো বা কৌতূহলের কারণ হয়েছিল। তারা প্রথম হতবুদ্ধি হয়েছিল এই চেহারার একজন এখানে থাকতে চায় শুনে। পরের বিস্ময়, এখানে থেকে চাকরি খুঁজে নেবার আশা, অথচ আলাদা একটা ঘরের মাশুল গুনতে প্রস্তুত শুনে। ঘর দেবার মালিক যে, সে আগাম এক মাসের খাওয়া-থাকার নগদ মূল্য হাতে না নিয়ে কথা কয়নি।

সে-ঘর দেখে শুধু বীথির বুকেই মোচড় পড়েছে। বলেছিল, দিদি, সত্যিই

এখানে আপনি থাকবেন কি করে?

ঘর পেয়ে জ্যোতিরাণী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন তখনকার মত। চুপচাপ কয়েক মুহূর্ত দেখেছিলেন বীথিকে। তারপর ফিরে জিজ্ঞাসা করেছেন, আমি একাই থাকব বলছ?

প্রশ্নটা বীথির মাথায় ঢোকেনি, অবাক মুখে জিজ্ঞাসা করেছে, আর কে থাকবে?

জ্যোতিরাণী পুনরুক্তি করেননি, শুধু চেয়ে ছিলেন মুখের দিকে। অপেক্ষা করে ছিলেন। বীথি বুঝেছে। হঠাৎ-খুশির ঢেউ লেগেছে বুকের তলায়। চোখে মুখে সেটা উপচে ওঠার আগেই মিলিয়েছে আবার। আমন্ত্রণের এই লোভ নাকচ করার জন্য যুঝতে হয়েছে খানিক। ফলে ফ্যাকাশে বিবর্ণ দেখিয়েছে মুখখানা। আস্তে আস্তে মাথা নেড়েছে। বলেছে, তা আর হবে না দিদি। বীথি আবারও হারাবে…কথা দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না।

জ্যোতিরাণীর চাউনি তীক্ষ্ণ ধারালো হয়ে উঠছিল। মুখে বিতৃষ্ণা জমাট বাঁধছিল। সাদা কথায় ভোগের প্রতিশ্রুতির মধ্যেই ফিরে যাবে ও। সেই চাউনি আর বিতৃষ্ণা বীথিকে আরো বেশি আঘাত করেছিল বোধ হয়। আস্তে আস্তে অনেক কথা বলেছিল সে। বলেছিল, আমি আপনার কাছে মিত্রাদির বিচার চেয়েছিলাম। আমার যা গেছে তা আর ফিরবে না।…বিশ্বাসঘাতকতা আমার সঙ্গে আর একজনের করার কথা ছিল। বিদেশে সে বিশ্বাসঘাতকতার চেহারা আমি দেখেছি। হাড়জমানো শীতে, হিমে, মাঝরাতেও অলিতে-গলিতে তারা দাঁড়িয়ে থাকে, বাঁচার চেষ্টায় দু চোখ দিয়ে কেমন করে মানুষ টানতে চায় দেখলে আপনার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠত। সে-রকম পাঁচটা মেয়ের সঙ্গে আমি কথা বলেছি, একজন ইউ. পি'র, একজন করাচীর, একজন সীলোনের আর দুজন ইন্দোনেশিয়ার। সীলোনের মেয়েটা বলেছিল, তারা তিনজন ছিল, দুজন মরে গেছে। ওই দেশেরও এ-রকম কত আছে ঠিক নেই। মিত্রাদি আমাকে এই বিশ্বাসঘাতকতার মুখে ঠেলে দিয়েছিল। কিন্তু এ লোকটা তা করেনি। উল্টে আমাকে নিয়ে কলকাতায় ফিরতে আপত্তি ছিল পাছে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করি। আমি তাকে আজও ঘৃণা করি, কিন্তু মিত্রাদির থেকে বেশি শ্রদ্ধা করি। আপনার কাছে ফেরার ভাগ্য যদি হয় কোনদিন, বলে আসব, পালিয়ে আসব না।

জীবন নিয়ে এই বিচার জ্যোতিরাণীর বুঝতে পারার কথা নয়। সে চেষ্টাও আর করেননি। বিতৃষ্ণা আর ছিল না। ওর মুখের দিকে চেয়ে সত্তার ক্ষতটাই শুধু অনুভব করতে চেষ্টা করেছেন।

নতুন বাসস্থানে আসার দ্বিতীয় দিনে কালীদা এসে হাজির। জ্যোতিরাণী

অবাক। এখানে আছেন সেই হদিস পেলেন কি করে! বীথির কাছ থেকে নিশ্চয়। কিন্তু বীথির নাগালও তাঁর পাবার কথা নয়। সেই রকমই কৌতুক-ঠাসা গম্ভীর মুখ কালীদার। ছুনিয়া একভাবেই চলছে বোঝানোর চেষ্টা। বললেন, ড্রাইভারটার দোষ নেই, যে রাতে তুমি চলে এসে সেই সন্ধ্যায় ঘণ্টাখানেক ধরে বীথির সঙ্গে তুমি কোন্ হোটেলে বসে গল্প করেছিলে জিজ্ঞাসা করলে সেটা আর না বলে পারে কি করে। আর তুমি আবার ঘরে ফিরবে সেই আশায় বীথিও শেষ পর্যন্ত ঠিকানাটা না দিয়ে পারেনি।

আধ ঘণ্টা ছিলেন কালীদা। যেন গল্প করতে এসেছিলেন, গল্প করে চলে গেলেন। যাবার আগে শুধু বলেছিলেন, যে জায়গায় এসে উঠেছ, রাগ পড়তে সময় লাগবে মনে হচ্ছে।

জবাবে জ্যোতিরাণী বলেছিলেন, পারেন তো একটা কাজ দেখে দিন, এখানে থাকার ইচ্ছে নেই।

চুপচাপ খানিক মুখের দিকে চেয়ে কালীনাথ উঠে গেছেন। তাঁর মনে হয়েছে, আপসে আপসে বছর ছুই যে মেয়েটা ঝিমিয়ে পড়েছিল, তার মধ্যে নতুন করে স্ফুলিঙ্গ দেখছেন আবার।

তার পরদিন এসেছেন বিভাস দত্ত। তাঁকে দেখা মাত্র কালীদার ওপর যথার্থ অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন জ্যোতিরাণী। কালীদা সত্যিই মজা দেখছেন কিনা ঠাওর করে উঠতে পারেননি। কথা তাঁর সঙ্গেও বেশি হয়নি। চুপচাপ বসে থেকে এই ছুর্যোগের ভাগ নিতে চেয়েছেন যেন। শেষে বলেছেন, এভাবে তো থাকা যায় না, কি করবেন এখন?

এই সহানুভূতির ওপর জ্যোতিরাণীর সেদিন অন্তত বিন্দুমাত্র আস্থা ছিল না। তাঁর তির্যক দৃষ্টি ঘুরেফিরে ভদ্রলোকের মুখের ওপর এসে পড়েছিল। যা ঘটে গেছে তার ফলে খুশি মাত্র একজনেরই হওয়া সম্ভব। এই একজনের। জবাব দিয়েছিলেন, দেখা যাক। আপাতত খবরের কাগজ দেখে কয়েকটা চাকরির দরখাস্ত করছি। সব কটাই কলকাতার বাইরে।

চিন্তিত মুখে বিভাস দত্ত মন্তব্য করেছিলেন, দরখাস্ত করে কবে চাকরি হবে সে আশায় বসে থাকা···ওতে সহজে হয় না।

তাহলে কি করতে বলেন?

প্রশ্নটা নিজের কানেই ঝাঁজালো ঠেকেছিল জ্যোতিরাণীর। কিন্তু বিভাস দত্ত কিছু মনে করেননি, ওটুকু সমস্যাজনিত অসহিষ্ণুতা ধরে নিয়েছিলেন হয়ত।

বাড়ি ছাড়ার ঠিক তের দিনের দিন অ্যাটর্নীর কড়া নোটিস পেয়েছেন

জ্যোতিরাণী। অ্যাটর্নী কালীনাথ। তাঁর সম্মানী ক্লায়েন্ট শিবেশ্বর চ্যাটার্জির নির্দেশমত তাঁকে জানানো হচ্ছে, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের সুনাম ব্যাহত করে আর গৃহ-শান্তির ব্যাঘাত ঘটিয়ে তিনি যে ইচ্ছেমত বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র বাস করছেন, সম্মানী ক্লায়েন্টের পক্ষে তা বরদাস্ত করা সম্ভব নয়। এই নোটিস হস্তগত হওয়ার পনের দিনের মধ্যে তিনি যদি শান্তিমত গৃহে বসবাস করার জন্য স্বেচ্ছায় ফিরে না আসেন তাহলে স্বামীর অধিকারে সম্মানী ক্লায়েন্ট আইনের আশ্রয় গ্রহণ করে তাঁকে ফেরাবার ব্যবস্থা করতে বাধ্য হবেন। সম্মানী ক্লায়েন্ট আশা করছেন, এই অপ্রীতিকর ব্যবস্থায় অগ্রসর হবার আগে জ্যোতিরাণী চ্যাটার্জি উক্ত সময়ের মধ্যে তাঁর স্বামীর গৃহে প্রত্যাবর্তন করবেন।

জ্যোতিরাণীর প্রতিক্রিয়া যা হয়েছিল সেটা কালীনাথ ঘোষালের নাম সই দেখে। কালীদা আর অ্যাটর্নী কালীনাথকে আলাদা করে দেখতে অভ্যস্ত নন বলেই। টাকা যার আছে তার উকিলের অভাব নেই—এ কাজ কালীদা নিজের হাতে না করলেও পারতেন। জ্যোতিরাণীর সেই রূপ আর সেই সঙ্কল্প এখন। সেই আঠেরো-উনিশের রূপ আর সঙ্কল্প। যে রূপ আর যে সঙ্কল্প নিয়ে অনমিত বলে একজনের বিকৃত স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে যুঝেছিলেন, মৃত্যুকে ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে নিজেকে উদ্ধার করেছিলেন, আপন সত্তার ওপর ভর করে নিজের দু পায়ে দাঁড়িয়ে-ছিলেন। ফিরে আবার আপসের রাস্তায় হাঁটার চিন্তা আগেও মনে ঠাঁই দেননি। কিন্তু এই অপমানকর পত্রাঘাতের ফলেই রুখে দাঁড়াবার শক্তিটুকুও দ্বিগুণ হয়ে উঠল বুঝি।

বিকেল পর্যন্ত ভাবলেন। চারটের আগেই বেরিয়ে পড়লেন। একটা টেলিফোন করার জন্যে বাইরে বেরুতে হয়, অনভ্যাসের ফলে সেটাও কম বিরক্তিকর নয়। মিনিট দশেক হাঁটার পর একটা দোকান থেকে টেলিফোন করার সুযোগ পেলেন। অফিসে কালীদাকে ধরলেন। বললেন, আমি জ্যোতি, অফিস-ফেরত একবার আসতে হবে।

ওধারে কালীদার গলার স্বরে কৃত্রিম দুশ্চিন্তা, কি ব্যাপার, খুব জরুরী?

হ্যাঁ।

অফিস-ফেরত যেতে বলছ, খাওয়াবে তো?

না। খেয়ে আসবেন।

খেয়ে এসেছিলেন কিনা জ্যোতিরাণী জিজ্ঞাসা করেননি। নবাগতা বেকার কিন্তু পরম রূপসী বাসিন্দার ঘরে মাঝে মাঝে পুরুষের পদার্পণ দেখে অন্য মেয়েদের বক্র কৌতূহল বাড়ছে, জ্যোতিরাণী তাও অনুভব করছিলেন। কালীদা আসতে

অনেকে উঁকিঝুঁকি দিল।

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে রেজিষ্ট্রি নোটিসটা হাতে নিয়ে কালীদার সামনে বসলেন।—এটা আজ পেলাম।

ও। কালীনাথ যথাসম্ভব নির্লিপ্ত।

এটা পাঠাতে রাজি না হলে আপনার চাকরি যেত?

ছদ্ম বিস্ময়ে ভ্রু চোখ কপালে তুলতে চেষ্টা করলেন কালীনাথ, আমি আবার কে! ও তো পাঠিয়েছে শিবেশ্বর চ্যাটার্জির অ্যাটর্নী!

সমস্ত মুখ ছেড়ে জ্যোতিরাণীর দৃষ্টিটাও গনগনে। অপেক্ষা করলেন একটু। —আমি এরপর শিবেশ্বর চ্যাটার্জি'র অ্যাটর্নীর সঙ্গে কথা বলব, না দাদার সঙ্গে?

কালীনাথ এবারে হাসলেন মুখ টিপে। জবাব দিলেন, বিপক্ষের অ্যাটর্নীকে ডাকলেই সে ছুটে আসে না।

অর্থাৎ দাদার সঙ্গেই কথা বলছেন জ্যোতিরাণী। এই জবাবই চেয়েছেন। এই জবাবই বিশ্বাস করতে চেয়েছেন।—আমি এখন কি করব?

একটুও না ভেবে কালীনাথ তক্ষুনি জবাব দিলেন, আমি ট্যাক্সি ডাকি আর তুমি ফেরার জন্য রেডি হও, আমার মতে ওটাই সব থেকে সোজা কাজ।

অনুচ্চ কঠিন স্বরে জ্যোতিরাণী বললেন, অত সোজা কাজ করার ইচ্ছে নেই।

তাহলে তুমিও এক পাল্টা হুমকি দাও।

কিছু যদি না করি?

তাহলে শিবু তো কেস করবে বলে শাসিয়েছে। কেসে হারলে যেতে হবে।

না গেলে?

যাতে যাও, কোর্ট সেই চেষ্টাই করবে।

জ্যোতিরাণী তেতে উঠলেন, কি চেষ্টা করবে, ঘাড়ে করে তুলে নিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবে?

কালীনাথ হেসে ফেললেন, অতটা নাও করতে পারে।

জ্যোতিরাণী চুপচাপ চিন্তা করলেন একটু।—জুডিসিয়াল সেপারেশন কি ব্যাপার? এই প্রশ্নটার জন্যও বিভাস দত্তর কাছেই কৃতজ্ঞ তিনি। তার কোন্ বইয়ে পড়েছিলেন হিন্দু বিয়েতে তখনো ডাইভোর্স নেই, কোর্টে নায়ক-নায়িকার জুডিসিয়াল সেপারেশনের কেস্ উঠেছে।

কালীনাথের হাসিমুখে বক্র আঁচড় পড়তে লাগল। দৃষ্টিও বদলাল একটু। জবাবে সেটা প্রকাশ পেল না।—শব্দ দুটোর অর্থ যা তাই ব্যাপার, আইনের আশ্রয় নিয়ে পৃথক থাকা। কিন্তু এ আবার তোমার মাথায় কে ঢোকালে?

কেউ না। জুডিসিয়াল সেপারেশন পেতে হলে আমাকে কি করতে হবে?

কোর্টে স্যুট ফাইল করতে হবে। মুখ গাম্ভীর্যের আবরণে ঢাকলেন কালীনাথ।—শিবু ঢিল ছুঁড়েছে, বদলে পাটকেল না ছুঁড়ে তুমি একেবারে বন্দুক ছুঁড়বে?

আপনি সেই ব্যবস্থা করে দিন।

কালীনাথ ফাঁপরে পড়লেন যেন।—আমি এ-পক্ষের অ্যাটর্নী আর ব্যবস্থা করব বিপক্ষের হয়ে?

খুব ঠাণ্ডা গলায় জ্যোতিরাণী জবাব দিলেন, একটু আগে আপনি বলেছেন, আমি কারো অ্যাটর্নীর সঙ্গে কথা বলছি না। যাকে ভার দেওয়া দরকার আপনি দিন, আর কি করতে হবে তাও তাকে বুঝিয়ে দেবেন।

কালীনাথ চুপ খানিক। তারপর বললেন, অত তাড়াহুড়ো করার দরকার কি, দিনকয়েক ভেবে নাও না।

ভাবা হয়েছে। যদি সম্ভব হয় কালই আপনি কেস্ ফাইল করার ব্যবস্থা করুন।...

পরদিন না হোক, তিন দিনের মধ্যে কেস্ ফাইল করা হয়েছিল। কাগজপত্র রেডি করে জ্যোতিরাণীর উকিলসহ কালীনাথ আবার এসেছেন। বিচ্ছেদ প্রার্থনার অনুকূলে শিবেশ্বর চ্যাটার্জির বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ দাঁড় করানো হয়েছে, তাতে মৈত্রেয়ী চন্দর অথবা অন্য কোনো মেয়েছেলের নাম নেই বটে, তবু পড়তে পড়তে জ্যোতিরাণীর কান-মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। তাড়াতাড়ি সইটা করে দিয়ে অব্যাহতি পেয়েছেন যেন তিনি।

এর দুদিন বাদে বিভাস দত্ত আবার এসেছেন। এসেই বলেছেন, শরীরটা ভালো ছিল না বলে এ কদিন খবর নিতে পারেননি। জ্যোতিরাণী আগের দিনও খুশী হতে পারেননি, এই দিনেও না। এখানে ঘন ঘন খবর নিতে এলে সেটা অসুবিধের কারণ হতে পারে ফাঁক পেলে এই আভাসও দেবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু তাঁর আসার উদ্দেশ্য শুনে অপ্রস্তুত একটু। একটা স্কুলে তাঁর চাকরির ব্যাপারে কথাবার্তা হয়ে গেছে। ভালো স্কুল। জ্যোতিরাণীর আপত্তি না হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেখানে গিয়ে দেখা করতে হবে।

জ্যোতিরাণী তখনো আশা করতে পারেননি। তবু ভদ্রলোকের স্বতঃপর চেষ্টার জন্য কৃতজ্ঞ বোধ করতে চেষ্টা করেছেন। গেছেনও। বিভাস দত্তই সঙ্গে করে এই স্কুলে নিয়ে এসেছেন। হেডমিস্ট্রেসের সঙ্গে দেখা হয়েছে। আর, দু-চার কথার পর জ্যোতিরাণীর চাকরি হয়েছে। হবে যে, সেটা যেন স্থির হয়েই

ছিল। হেডমিস্ট্রেস তাঁকে কি কি বিষয় পড়াতে হবে জানালেন, অনার্স গ্রাজুয়েট শিক্ষয়িত্রীর মাইনে কত জানালেন, আর পরদিনই তাঁকে কাজে জয়েন করতে বললেন। ব্যস, আর কিছু না।

হেডমিস্ট্রেসের সঙ্গে কথা বলে স্কুল-বোর্ডিংএ তাঁর থাকার ব্যবস্থাও বিভাস দত্তই করেছেন। তাতেও আপত্তি ওঠেনি। হেডমিস্ট্রেস শুধু জানিয়েছেন, আলাদা একটা ঘরের ব্যবস্থা করতে দিনকতক সময় লাগবে।

বাইরে এসে বিভাস দত্ত জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যাক্, কিছুটা নিশ্চিন্ত তো?

তখনকার মত কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না জ্যোতিরাণীর। নিশ্চিন্ততার এই স্বাদ ভোলার নয়। অনেক হীনমন্যতা আর অনেক তিক্ত সম্ভাবনার থেকে নিশ্চিন্ত। দুদিন আগেও তাঁর নতুন ঘরে এই একজনের পদার্পণে মন বিরূপই হয়েছিল। সেই হেডমিস্ট্রেস যে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করলেন না, বা তাঁর ঘরবাড়ি নিয়ে দুটো মৌখিক আলাপসুলভ প্রশ্নও তুললেন না, সেটা স্বাভাবিক ঠেকেনি। ভদ্রলোক কতদূর কি জানিয়ে রেখেছেন জানেন না, কিন্তু যন্ত্রণার মত একটা বিড়ম্বনা থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন বলে কৃতজ্ঞ তিনি। একটু চুপ করে থেকে জবাব দিয়েছেন, আপনাকে কি আর বলব···।

খুশিমুখে বিভাস দত্ত তাড়াতাড়ি মাথা নেড়েছেন, বলে কাজ নেই, উক্ত কথার থেকে অনুক্ত কথার সার বেশি।

যেখানে ছিলেন, দিনকতক আরো সেখানেই থাকতে হয়েছিল। সেখানকার প্রতিটি দিন অসহ্য হয়ে উঠেছিল। বাড়ির গলি থেকে বেরিয়ে হাঁটাপথে বেশ খানিকটা পেরিয়ে ট্রামে ওঠা পর্যন্ত আসতে যেতে পুরুষের প্রতীক্ষারত বা অনুসরণ-রত লোভাতুর দৃষ্টির সংখ্যা বেড়ে উঠছিল। ওই একটা বাড়িতে তাঁর অবস্থান সম্পর্কে অনেকগুলো মুখ সজাগ হতে দেখেছেন তিনি। এলাকাটা খুব ভালো না বুঝেছিলেন, বাড়িটাও না। বাড়ির যত কাছে এগোতেন ততো যেন দম বন্ধ হয়ে আসত। তখন বিভাস দত্তকে দেখে যথার্থ খুশি হতেন তিনি, মনে বল পেতেন। আর স্কুলে আসতে আসতে রোজই আশা করতেন, হেডমিস্ট্রেস ডেকে বলবেন—তাঁর ঘরের ব্যবস্থা হয়েছে।

···দুর্যোগের দিন সেটা। সেদিনটা শুধু নয়, পর পর কয়েকটা দিনই। তুচ্ছ কারণ থেকে কলকাতার শান্তি লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল, আগুন জ্বলে উঠল। বাহান্ন সালের কথা, প্রায় তিন বছর আগের কথা। এক পয়সা ট্রাম ভাড়া বাড়ানো নিয়ে ইংরেজ মালিকানার ট্রাম কোম্পানীর সঙ্গে দেশের মানুষের তুমুল লেগে গেল। দেখতে দেখতে পরিস্থিতি চরমে গড়ালো। স্বাধীন দেশের

শান্তিরক্ষকরা অস্ত্রহাতে তার মোকাবিলা করতে এলো। একদিকে ট্রাম জ্বলতে লাগল, সরকারী সম্পদও বিনষ্ট হতে লাগল। অন্যদিকে লাঠি চলল, টিয়ারগ্যাস ছুটল, বুলেট ছুটল। কাগজে তেরটি মৃত্যুর খবর বেরুলো আর তার কয়েকগুণ আহতের। শহর তখনকার মত মিলিটারীর দখলে ছেড়ে দেওয়া হল।

শহরের জীবন-যাত্রা শুব্ধ। পথে জনমানব নেই। বিকেল তখন চারটে। অন্যমনস্কের মত জ্যোতিরাণী জানলার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বাড়ির পিছন দিকে বিশ-তিরিশ গজ দূরে ছাল তোলা উঠোনের মত ছোট্ট পার্ক একটা। সেদিকে চোখ পড়তে আচমকা বিষম এক ঝাঁকুনি খেলেন জ্যোতিরাণী। একটা বেঞ্চির গায়ে ঠেস দিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে সিতু। চারদিকের থমথমে নির্জনতার মধ্যে আর দ্বিতীয় প্রাণী নেই। ঠিক দেখছেন কি ভুল দেখছেন, জ্যোতিরাণীর প্রায় সেই বিভ্রম। ঠিক যে দেখছেন সন্দেহ নেই। এই জানলার দিকে চেয়েই দাঁড়িয়ে আছে সিতু। দু হাত বগলে গোঁজা চৌদ্দ বছরের ছেলের দৃপ্ত ভঙ্গি।

আবারও একটা ঝাঁকুনি খেয়েই যেন সচেতন হলেন জ্যোতিরাণী। দুশ্চিন্তায় অস্থির, ব্যাকুল পরমুহূর্তে। এইদিনে বেরুলো কি করে? বাড়ি থেকে কম করে আড়াই মাইল পথ, ট্রাম-বাস-ট্যাক্সি কিছুই নেই—এলো কি করে? ফিরবে কি করে? বন্দুক উঁচিয়ে রাস্তায় মিলিটারী টহল দিচ্ছে, কি বিপদ ঘটবে কে জানে!

বুকে হাতুড়ীর ঘা পড়ছে, কি করবেন ভেবে না পেয়ে জ্যোতিরাণী জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে ঈশারায় ডাকলেন তাকে। ছুটে বাড়ির মধ্যে চলে আসতে বললেন। সিতু তেমনি চেয়ে আছে, তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। জ্যোতিরাণী তক্ষুনি বুঝলেন ও আসবে না, বিপদ হতে পারে জেনেই ও এইদিনে এসেছে। বিপদের মধ্যে দাঁড়িয়ে অবাধ্য হবার জন্যেই এসেছে। বাড়ির লোকের ওপর এমন কি মেঘনার ওপর পর্যন্ত আগুন হয়ে উঠলেন জ্যোতিরাণী। এইদিনে তো কেউ বেরুতে পারেনি, ছেলেটা বাড়ি নেই—চোখে পড়ল না কারো! অসহিষ্ণু তাড়নায় প্রায় শাসনের মত করেই আরো জোরে হাত নেড়ে চলে আসতে ইশারা করলেন তাকে।

আর একটু সময় পেলে জ্যোতিরাণী হয়ত ছুটে বেরিয়েই যেতেন। দুই গালে দুই চড় বসিয়ে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে আসতেন। কিন্তু সিতু সে সুযোগ দিল না। বগল থেকে হাত নামাল। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে হনহন করে পার্ক পেরিয়ে ফিরে চলল।

জ্যোতিরাণী নিস্পন্দের মত দাঁড়িয়ে।

ঘণ্টা দেড়েক বাদে এখানকার ঠাকুরকে এক টাকা বখশিশ দিয়ে বাইরে থেকে বাড়িতে কালীদার ঘরে ফোন করিয়েছেন। সিতু ফিরেছে। কিন্তু এই খবর পাওয়ার পরেও সমস্ত রাত ঘুমুতে পারেননি জ্যোতিরাণী।

বোর্ডিং-এ যাওয়ার আগের সন্ধ্যায় গৌরবিমলকে সঙ্গে করে কালীনাথ এসেছিলেন। এসেই বলেছেন, মামুর আর ফুরসতই হয় না, আজ ধরে নিয়ে এলাম।

ফুরসত না হওয়ার কারণ জ্যোতিরাণী অনুমান করতে পারেন। এখনো ধরে নিয়ে আসতে হয়েছে শুনে খুব খুশি হতে পারলেন না। অথচ বাড়ি থেকে বেরুবার পর কিভাবে দিন চলতে পারে ভেবে না পেয়ে এই একজনের কথাই সবার আগে মনে হয়েছিল তাঁর। বিভাস দত্ত ইতিমধ্যে চাকরির ব্যবস্থা না করে দিলে আলোচনার জন্য হয়ত তাঁকেই একবার আসতে অনুরোধ করতেন।

ভিতরে ভিতরে বিরূপ কিনা বা কতখানি বিরূপ গৌরবিমলের মুখে তা প্রকাশ পেল না। হেসেই বললেন, সময় পেলাম কোথায়, প্রভুজীধাম গোটানোর তাড়ায় তো অস্থির করে মেরেছিস এ কদিন। জ্যোতিরাণীর দিকে তাকালেন।— পারলে ওখানকার মেয়েগুলোকে সুদ্ধই তালা আটকে চলে আসে, আর রোজই শাসায় দেরি হলে খরচা বন্ধ করে দেবে।

জ্যোতিরাণী সঙ্কোচ ভুলে উৎসুক হয়ে উঠলেন। কম মেয়ে নেই সেখানে, আশ্রয়চ্যুত হয়ে তারা কি করতে পারে ভেবে পেলেন না। জিজ্ঞাসা করলেন, সব চলে গেছে?

কালীনাথ জবাব দিলেন, প্রভুজীধামের পরমায়ু শেষ জেনে প্রাণের দায়ে অনেকে নিজেরাই সরেছে। অন্য-কতকের সদ্গতি মামু করেছে। আর যে কজন আছে, তারা যদি এ মাসের মধ্যে না যায় তো মামুর কাঁধে ঝুলিয়েই বিদেয় করব।

জ্যোতিরাণীর মুখে কথা সরল না। যেতে যারা পারছে না জোর করে আর তাড়াহুড়ো করে তাদের তাড়ানো দরকার কি, এ কথাও মুখ ফুটে বলতে পারলেন না। কত ধকল কত যত্ন কত দুশ্চিন্তার ভিতর দিয়ে একটা জিনিস গড়ে উঠেছিল, কিন্তু ভাঙতে সময় লাগল না। ভিতে টান পড়েছে, আর সবই হুড়মুড় করে ভেঙেছে।

প্রভুজী-প্রসঙ্গ সাঙ্গ করে দিলেন কালীনাথ। জ্যোতিরাণীর উদ্দেশে বললেন, তোমার ব্যাপার যথাসময়ে যথাস্থানে পেশ করা হয়েছে, মাননীয় ক্লায়েন্টের কাছে নোটিসও এসেছে কোর্ট থেকে। ক্লায়েন্ট এবারে কি করবেন তাঁর অ্যাটর্নীর কাছে সে নির্দেশ এখনো আসেনি। এলে যথাসময়ে তুমিও আবার কোর্টের নির্দেশ পাবে।

কথা কটা কালীদা জলভাতের মত সহজ করে বললেও কানের কাছটা গরম ঠেকেছে জ্যোতিরাণীর। মামাশ্বশুরও সবই জানেন সন্দেহ নেই, তবু তাঁর সামনে এ আলোচনা উঠুক, চাননি। কোর্টের নির্দেশ এলে এ ঠিকানায় পাবেন না জানানো দরকার। একটু চুপ করে থেকে বললেন, কাল থেকে আমি আর এখানে থাকছি না।

স্কুলের চাকরির খবর জ্যোতিরাণী কালীদাকে বলেননি। মাঝে দেখা হলে বলতেন হয়ত। দেখা হয়নি। কিন্তু খবর কালীদা রাখেন দেখা গেল। জিজ্ঞাসা করলেন, স্কুল-বোর্ডিংএ ঘরের ব্যবস্থা হয়ে গেছে? ঠিকানাটা দাও তাহলে, তোমার কাগজপত্রে তো এখানকার ঠিকানা লেখা হয়ে আছে।

বিভাস দত্তর সঙ্গে কালীদার দেখা এবং কথা হয়েছে বোঝা গেল। হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়, তবু জ্যোতিরাণীর মনে হল এই দুজনের দেখা-সাক্ষাৎ আগে কমই হত। ঠিকানা লেখার জন্য কাগজ-কলম নিলেন। কালীদা মামাশ্বশুরের দিকে ফিরলেন, জ্যোতি কোন্ একটা স্কুলে কাজ নিয়েছে তোমাকে বলেছিলাম?

গৌরবিমল মাথা নাড়লেন। বলা হয়েছে। জ্যোতিরাণীর ঠিকানা লেখা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। তারপর তাকেই জিজ্ঞাসা করলেন, সেখানে থাকার ব্যবস্থা-ট্যবস্থা ভালো?

জ্যোতিরাণী ক্ষুদ্র জবাব দিলেন এখান থেকে ভালো।

গৌরবিমল চিন্তাচ্ছন্ন একটু। কিছু বলার ইচ্ছে। বললেন, ছেলেটার মুখ চেয়েও বাড়ি ফেরা চলে না?

আর কেউ এ প্রস্তাব তুললে বিরক্তি ছেড়ে বিতৃষ্ণার কারণ হত। যিনি বললেন তাঁর মনের গভীরতা জানেন বলেই চুপ একটু।...দুর্যোগের দিনে ছেলের পার্কে এসে দাঁড়ানোর ব্যাপারটা মনে লেগে আছে। চৌদ্দ বছরের ছেলের সেই অবাধ্য বেপরোয়া মুখ ভোলার নয়। ঠাণ্ডা সংযত জবাব দিলেন, ছেলের মুখ চেয়ে কিছু যদি করতে চান, তাহলে আমাকে ফিরতে না বলে ওকে আমার কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। আমি ফিরলে ওর মুখ চাওয়া হবে না। এরপর আরো ক্ষতি হবে।

গৌরবিমল বলতে যাচ্ছিলেন, মেয়েদের বোর্ডিং-এ ওই বয়সের ছেলে নিয়ে থাকতে দেবে না হয়ত। বললেন না। কারণ ছেলে এলে তাকে নিয়ে কোথায় থাকবে সেটা কোনো সমস্যা নয়। এই ব্যবস্থায় তার বাপকে রাজি করানো যাবে না জানা কথাই। গেলে গৌরবিমল সেই চেষ্টাও করে দেখতেন হয়ত।

এই আলোচনার মধ্যে কালীনাথ অনেকটা নির্লিপ্ত। গৌরবিমল তাঁকে

বললেন, চল্ ওঠা যাক—। নিজে উঠে দাঁড়িয়ে বিষণ্ণ দু চোখ জ্যোতিরাণীর দিকে ফেরালেন—তোমাদের ব্যাপার যে-দিকে গড়িয়েছে কি যে বলি কিছুই মাথায় আসছে না। এরপর আমিও কলকাতায় বিশেষ থাকব না। ছেলেটার জন্যেই ভাবনা…। যাক, যা অদৃষ্টে আছে, হবে।

চলে গেলেন। শেষের উক্তিটুকু ক্ষোভের মত। ক্ষোভ ছেলের বাবা-মা দুজনার ওপরেই হতে পারে, আবার অদৃষ্টের ওপরেও হতে পারে। কিন্তু জ্যোতিরাণী হঠাৎ অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন অন্য কারণে। প্রভুজীধামে তালা লাগানো হয়ে গেলে মামাশ্বশুরের কলকাতায় বসে থাকার কথা নয় বটে। এ অবস্থায় তাঁরও না থাকাটা ছেলেকে গোটাগুটি অদৃষ্টের হাতে ছেড়ে দেওয়ার মতই। এই শূন্যতা আগে অনুভব করেননি, এখন করছেন। কিন্তু নিজে বাড়ি ছেড়ে এসে ছেলের জন্য তাঁকে বরাবর এখানে থেকে যেতে বলা সম্ভব নয়।

স্কুল-বোর্ডিংএ আসার মাস-কয়েকের মধ্যে পৃথক বাসের একতরফা ডিক্রি পেয়েছেন কোর্ট থেকে। এর মধ্যে কালীদার হাত কতখানি জানেন না। শিবেশ্বর চাটুজ্যের রুখে দাঁড়ানো দূরে থাক, জ্যোতিরাণীর আবেদনের প্রতিবাদও করেননি। বিভাস দত্তর ধারণা অ্যাটর্নীর চিঠির জবাবে তিনি যে সোজা কোর্টে হাজির হবেন মানী ভদ্রলোক সেটাই নাকি কল্পনা করেননি। বিভাস দত্তর ধারণা শোনার ব্যাপারে জ্যোতিরাণী এতটুকু উৎসাহ দেখাননি। তাঁর চাপা আগ্রহও ভালো লাগেনি। ইদানীং কালীদার সঙ্গে যে তাঁর দেখা-সাক্ষাৎ বা যোগাযোগ বেড়েছে কথাবার্তার ফাঁকে তাও টের পান। কেস্ সম্পর্কে জ্যোতিরাণী নিজে থেকে তাঁকে একটি কথাও বলেননি। যা শুনেছেন কালীদার কাছেই শুনেছেন।

যাই হোক, জ্যোতিরাণী যেমন চেয়েছিলেন তেমনি হয়েছে, নিঃশব্দে মিটেছে।

এক ছুটির দিনের দুপুরে হঠাৎ মেঘনা এসে হাজির। দোরগোড়ায় তাকে দেখে জ্যোতিরাণী চমকে উঠেছিলেন, সাগ্রহে ঘরে ডেকেছেন তারপর। মাদুর পেতে তাকে বসতে দিয়েছেন, নিজেও সামনে বসেছেন। দেখে খুশি হবে কিনা ভেবে মেঘনা ভয়ে ভয়ে এসেছিল। বউদিমণির এই আপ্যায়নে চোখে জল এসে গেল তার। হাসতে গিয়ে কেঁদে ফেলল। বলল, কালীদার থেকে ঠিকানা নিয়ে লুকিয়ে এলাম, বাবু শুনলে আবার কোন্ মূর্তি ধরবে কে জানে।

এত ভয় তো এলি কেন?

না এসে থাকতে পারলাম না যে গো। সেই কবে থেকে আসার ফাঁক খুঁজছি। তুমি ফিরে চলো বউদিমণি, কি যে লক্ষ্মীছাড়া বাড়ি হয়ে গেল, না দেখলে বুঝতে

পারবে না।

মুখরা মেঘনার এই মুখও দেখার বস্তু যেন। আজ তিনি বাড়ি গাড়ি আর লক্ষ লক্ষ টাকার কর্ত্রী নন বলেই যেন এই মেঘনাও অনেক কাছের মানুষ। চোখ মুছতে মুছতে বলল, সেই ক'বছর আগে সদাদাদাকে সাবধান করেছিলাম, এ-বাড়ির ভালো চাও তো বউদিমণির কাছে সব খুলে বলো, বাবুর মাথার ঠিক নেই—পরে আর সামলানো যাবে না। সদাদাদা তখন ভয় পেল, সমিস্তেয়ও পড়ল, দাদাবাবুর সঙ্গে বেইমানী করবে কি করে। এখন কি হয়ে গেল জানলে চোখের জল রাখতে পারত!

সঙ্কোচ সত্ত্বেও একটু স্বস্তি বোধ করলেন জ্যোতিরাণী। কেন এত বড় ব্যাপারটা ঘটে গেল মেঘনা সঠিক জানে না মনে হল। না জানলেও দু-দশ কথার পর মিত্রাদির সম্পর্কে তপ্ত অভিযোগ শুনলেন।

যথা, বউদিমণি বাড়ি ছেড়ে আসার কদিন পর থেকেই 'ঠাক্‌রোণে'র আনা-গোনা বাড়ছিল। ইদানীং তো সকালে এসে রাতে যেতে শুরু করেছিলেন। বউদিমণির গাড়িখানা পর্যন্ত আগলে বসেছিলেন। যেন তেনারই ঘর-বাড়ি, তেনারই সব। কালীদাদা একদিন কি বলতে আগুন-পানা মুখ করে বেরিয়ে গেলেন। সেই রেতেই কালীদাদার সঙ্গে বাবুরও কি সব চটাচটির কথাবার্তা হল য়েন, বাবুর রাগ দেখে ওরা ভাবল এবারে কালীদাদারও এখানকার বাস উঠল বুঝি। তারপর থেকে ঠাক্‌রোণের আসাযাওয়া একটু কমেছে দেখা যাচ্ছে। বউদি-মণির গাড়ি গ্যারেজে তালাবন্ধ রেখে কালীদাদা ড্রাইভারকে একেবারে বিদেয় করে দিয়েছেন।

মেঘনার মুখ থেকে এসব শুনতে সঙ্কোচ জ্যোতিরাণীর, তবু সন্তর্পণ আগ্রহেই শুনেছেন। কালীদার প্রতি শ্রদ্ধার অন্ত নেই। মৈত্রেয়ী চন্দকে কি বলেছেন বা ওদের মনিবের সঙ্গে চটাচটির কি কথা হয়েছে না শুনলেও অনুমান করতে পারেন। কালীদা কোন্ প্রয়োজনে কাকে কি বলতে পারেন তাঁর জানা আছে।

মনিবের মেজাজ থেকে মেঘনার সমাচার বিস্তার ছোট মনিবের অর্থাৎ সিতুর প্রসঙ্গে ঘুরেছে। বলেছে, দিনকে-দিন কি যে হচ্ছে বউদিমণি; সামনে এসে দাঁড়ালে পর্যন্ত ভয়ে বুকের ভেতর গুড়গুড় করে। ভাত খেতে এসে একটু এদিক-ওদিক হল কি থালা-বাসন ছুঁড়ে মারবে, শুতে গিয়ে বিছানার চাদর একটু কোঁচকানো দেখল কি অমনি সব তুলে ঘরের বাইরে ফেলে দেবে। এক কালীদাদাকে যা একটু সমীহ করে, আর সকলের ওপর মারমুখো হয়েই আছে। স্কুলের আগে সময়মত খেতে আসে না, শেষে আধপেটা খেয়ে ছোটে, ফিরে এসেও যে ঠাণ্ডা হয়ে বসে

খাবে পেট ভরে তা নয়। কিছু বললে তেড়ে মারতে আসে। মেঘনা তবু বলতে ছাড়ে না বলে তার ওপরেই সব থেকে বেশি রাগ। ধুমসী বলে, কানে আঙুল দেবার মত গালাগালি করে ওঠে এক-একসময়, দিনে কবার করে যে বাড়ি থেকে বার করে দেয় ঠিক নেই। সর্বদা রাগে গনগন করছে, সেদিন আবার বাইরের কার সঙ্গে মারামারি করে চোখ-মুখ ফুলিয়ে এসেছিল। বড় হলে কি যে হবে ওই ছেলে, ভাবতে বড় খারাপ লাগে বউদিমণি।

জ্যোতিরাণীর বুকের তলায় একের পর এক মোচড় পড়ছে মেঘনা সেটা টের পাচ্ছে না। ছেলের কথা মনে হলেই সেই দুর্যোগের দিনে মাঠে এসে দাঁড়ানোর মূর্তি চোখে ভাসে। একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, ওর ছোট দাদু কোথায়?

তিনি তো দু মাস ধরেই বাড়ি ছাড়া, কোথায় আছেন এক যদি কালীদাদা খবর রাখেন।

মাঝে একটা কোর্টের ব্যাপার হয়ে গেছে মেঘনার তা জানার কথা নয়। আবারও অনুনয় করল, বাড়ি-ঘর ছেড়ে আর কতকাল রাগ করে থাকবে বউদিমণি, ভালয় ভালয় এবারে ফিরে এসো। তুমি চাকরি করছ শুনে হাসব না কাঁদব ভেবে পাই না। এ-রকম ইস্কুল করে নিজেই ইচ্ছে করলে কত লোক পুষতে পারো!

আবেদন বা স্তুতিতে ফল হবে না মনে হতে মেঘনারও মেজাজ বিগড়োবার উপক্রম। বলল, আর দিনকতক দেখে আমিও যেখানে হোক একটা কাজ জুটিয়ে নেব, এত ধকল পোহানো আমাকে দিয়ে আর পোষাবে না।

ভিতরে ভিতরে জ্যোতিরাণীর আবার সেই শূন্যতা আর সেই চাপা অস্থিরতা। মামাশ্বশুর কলকাতায় কমই থাকবেন শুনে যেমন হয়েছিল। তিনি নেই, মেঘনারও না থাকাটা বুকের ওপর চেপে বসছে। তাঁকে যা বলতে পারেননি মেঘনাকে তাই বললেন।—পাগলামি করিস না মেঘনা, আমাকে সত্যি ভালবাসিস তো ও-বাড়ি ছেড়ে নড়বি না।…আর এক কাজ কর, সিতুকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দে, বলিস আমি ডেকেছি।

মুখ ভার করে মেঘনা মাথা নাড়ল।—ও-ছেলেকে আমি কিছু বলতে-টলতে পারব না, একবার বলে প্রাণে বেঁচেছি। প্রাণে বাঁচার সমাচারও গোপন রাখল না মেঘনা। কালীদা বাড়িতে না থাকলে ছোট মনিব আজকাল ঘরে বসেই সিগারেট খায়—বাপের ভয় করবে কি, তার সঙ্গে তো দেখা একরকম হয়ই না। বেশি দিনের কথা নয়, সেই তখন একসময়ে রাগ করে মেঘনা বলেছিল, বউদিমণি ফিরলে তোমার পায়ের ওপর পা তুলে সিগারেট খাওয়া বার করবে। তাই শুনেও

ছোট মনিব হেসে জিব ভেঙচে বলেছিল, তোর বউদিমণি এখানে আর ফিরছে না, ফিরলে তাকে দেখিয়ে তোর মাথার ওপর পা তুলে সিগারেট খেতাম। ছোট মনিবকে হাসতে দেখে মেঘনা একটু নরম হয়েই পরামর্শ দিয়েছিল, চুপি চুপি গিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করে জোরজার করে ধরে নিয়ে আসতে। শোনামাত্র মুখখানা যা হয়ে উঠল ছোট মনিবের, বলার নয়। মাথায় যেন খুন চাপল। সিগারেটের ছাই-ফেলা পাত্রটা তুলে এমন ছুঁড়ে মারল যে লাগলে রক্ষা ছিল না। কান ঘেঁষে ওটা গিয়ে দরজায় লাগতে দরজার কাচ খানখান।

জ্যোতিরাণী নির্বাক। বাতাস নিতে ফেলতে লাগছে কোথায়। মাঠে দাঁড়ানো সেই রাগত মূর্তি মনে দাগ কেটে আছে। আর, এই রাগের বার্তাও তেমনি দাগ কেটে বসেছে। ওকে আসতে বলার জন্য মেঘনাকে আর দ্বিতীয়বার অনুরোধ করতে পারলেন না। মায়ের ওপর এমনি রাগ এমনি বিদ্বেষ তো স্বচক্ষেও দেখেছেন। বাপের চাবুকের ঘায়ে জ্বর এসে গেছল যে-রাতে। সেই জ্বরের ঘোরেও তাঁকে দেখে ন বছরের ছেলের দু চোখের যে ঝাপটা খেয়ে নিজের ঘরে পালিয়ে এসেছিলেন, ভোলেননি। তাঁর ধারণা, মেঘনা না জানলেও কোর্টের ব্যাপারটা সিতু জানে। চৌদ্দ বছরের ছেলেকে আর চৌদ্দ বছর ভাবেন না তিনি। অনেক আগে থেকেই ভাবতেন না। সিতু জানে বলেই ওই মূর্তিতে সেদিন মাঠে এসে দাঁড়িয়েছিল, আর কোর্টের ফয়সালাও জানে বলেই মেঘনাকে বলেছিল, মা আর ফিরবে না।···না, মা বলেনি, বলেছিল, তোর বউদিমণি আর ফিরবে না।

তবু, এই ছেলেকে নিয়েই সব থেকে বেশি বিভ্রান্ত তিনি। মেঘনা চলে যাবার পরেও থেকে থেকে কেবলই মনে হয়েছে, রাগ ছাড়াও ওর ভিতরে ভিতরে আরো কিছু আছে যা তিনি ধরতে ছুঁতে পারছেন না। তক্ষুনি শমীকে নিয়ে ওর হিংসের ব্যাপারটা মনে পড়েছে। মায়ের ওপর ভাগ বসালে ও যে হিংসেয় জ্বলত, অনেক দিনই লক্ষ্য করেছেন।

মনে পড়া মাত্র দুর্বোধ্য একটা অস্থিরতা ভোগ করেছেন।

ওকে আবার দেখেছেন গেল বছর, চুয়ান্ন সালে। সেও এক দুর্যোগেরই দিন। সেকেণ্ডারি স্কুলের টিচারদের মাইনে কম, যা পায় তাতে গ্রাসাচ্ছাদন চলে না। অনেকদিনের অনেক জটলা আর আবেদন-নিবেদনের পর মাইনে বাড়ানোর উদ্দেশ্যে তারা শান্তিপূর্ণ প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নেমেছিল—পীসফুল ডাইরেক্ট অ্যাকশন। ছাত্ররা যোগ দিয়েছিল তাদের সঙ্গে। সেই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পরিণামও আগুন জেল লাঠি বুলেট। সরকারী রিপোর্ট অনুযায়ী সাত জন নিহত, বহু আহত।

এই সংগ্রামের সঙ্গে জ্যোতিরাণীদের প্রতিষ্ঠান-চালিত স্কুলের কোন যোগ ছিল না। এখানকার শিক্ষকরাও কোনরকম দাবি ঘোষণা করেনি। শহরের সব স্কুল যখন বন্ধ, দূরের বিচ্ছিন্ন এই স্কুলের শান্তি খুব ব্যাহত হয়নি। অর্ধেক মেয়ে কম্পাউণ্ডের ভিতরে বোর্ডিংএ থাকে, তাই গোলযোগের আশঙ্কা আরো কম।

কিন্তু গণ্ডগোল হল। কোথা থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশটি ছেলে এসে স্কুল-গেট খোলার দাবি জানালো, স্কুল বন্ধ করার দাবি জানালো। হট্টগোল চিৎকার চেঁচামেচি বাড়তে টিচাররা বেরিয়ে এসেছে, মেয়েরা বেরিয়ে এসেছে। হেডমিস্ট্রেস ছেলেদের জানালেন স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ছেলের দঙ্গল নড়ল না, তারা চায় গেট খোলা হোক, টিচাররা তাদের সঙ্গে বেরিয়ে আসুক। জনকয়েক পাণ্ডার উত্তেজনার ইন্ধন পেয়ে বাকি ছেলের দঙ্গল মারমুখী হয়ে উঠতে লাগল।

পাণ্ডাদের একজন সাত্যকি। সিতু।

বিচ্ছিন্ন করে শুধু জ্যোতিরাণী দেখছেন তাকে। দেখছেন। শমী ভয়ে এধারে আসেনি, তার চোখে পড়েনি।

সিতুর হাতে ফ্ল্যাগ। রক্তবর্ণ মূর্তি। পারলে শুধু স্কুল-গেট নয়, পারলে ও স্কুলের এই ঘর-বাড়ি পর্যন্ত ভেঙে গুঁড়িয়ে একাকার করে দেয়। বড় একটা পাথর তুলে নিয়ে শেকলে ঝোলানো গেটের পেল্লায় তালার ওপর ঘা বসাতে লাগল।

হঠাৎ ছেলেরা দেখল ধীর পায়ে গেটের দিকে এক মহিলা এগিয়ে আসছেন। টিচাররা আর সামনের দিকের বড় মেয়েরা দেখল ওই মারমুখী অবুঝ ছেলেদের দিকে এগিয়ে চলেছেন তাদের মিসেস দেবী।

সিতুর হাতের পাথর হাতে থেকে গেল। ক্ষিপ্ত আক্রোশে মায়ের দিকে চেয়ে আছে সে। মা-কে একেবারে গেটের গায়ে এসে দাঁড়াতে দেখে সরোষে দু পা সরে দাঁড়িয়েছে। জ্যোতিরাণী নিষ্পলক চেয়ে আছেন তার দিকে। অবাধ্য বেপরোয়া আক্রোশে সিতুও। ব্যাপারটার ফলে হকচকিয়ে যাওয়ার দরুন ছেলের দলের চেঁচামেচিও শমে নেমেছে।

তারপর যে কাণ্ডটা হল সেটা তাদের কাছে আরো অপ্রত্যাশিত। এত করে উদ্দীপনা যুগিয়ে আর খাওয়ানোর লোভ দেখিয়ে যে-খোদ পাণ্ডাটি তাদের নিয়ে এই হামলায় এসেছে—হঠাৎ সে হাতের পেল্লায় পাথরটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হনহন করে ফিরে চলল।

একবার করে গেটের ওধারে নিঃশব্দ গভীর আগুন-রঙা মহিলাকে দেখে আর ফিরে ফিরে এক-একবার পাণ্ডাটিকে পায়ে পায়ে মাটি আছড়ে চলেই যেতে দেখে তারাও আস্তে আস্তে সরতে লাগল।

এধারে টিচাররা আর মেয়েরা চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে যেন দৃশ্য দেখছে একটা। গেট ধরে স্থির একখানা মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছেন মিসেস দেবী। ছেলের দঙ্গল চলে যাচ্ছে।

ছেলের সঙ্গে এই সাক্ষাৎকারের মানসিক ধকল কাটিয়ে উঠতেও সময় লেগেছিল জ্যোতিরাণীর। কোর্ট থেকে পৃথক থাকার অনুমতি পাবার পর সেই প্রথম আবার তিনি ভেবেছেন, কালীদাকে ডেকে পাঠিয়ে ছেলেকে নিজের কাছে রাখার প্রস্তাব আর একবার দিয়ে দেখবেন কিনা। লাভ হবে না জানেন, ছেলের বাপ রাজি হবে না। তবু জ্যোতিরাণী ভেবেছেন। শুধু ভেবেছেন।

তারপর এই পঞ্চান্ন সাল।

নির্লিপ্ত কর্মব্যস্ততার মধ্যে গোড়ার দিকটা মন্দ কাটেনি। স্কুলের সহকারী হেডমিস্ট্রেস অন্য স্কুলের হেডমিস্ট্রেসের চাকরি পেয়ে চলে যেতে জ্যোতিরাণী সহকারী হেডমিস্ট্রেস হয়েছেন। তিনি অনার্স গ্র্যাজুয়েট, কাজের রিপোর্ট অনবদ্য। তবু দু-তিনজনকে ডিঙিয়ে ওই শূন্য আসন পেলেন বলে নিজেই বিস্মিত হয়েছিলেন।

বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন পাস হয়ে গেল। আর তার কিছুদিনের মধ্যেই কোর্টে আইনগত বিচ্ছেদ দাবি করেছেন একজন, জ্যোতিরাণী সে খবর পেলেন কোর্টের নোটিস আসার আগেই। খবরটা দিলেন বিভাস দত্ত। তারপর যথাসময়ে কোর্টের নোটিস এসেছে, শিবেশ্বর ডাইভোর্সের মামলা রুজু করেছেন।

পৃথক থাকার মামলায় শিবেশ্বর যা করেছিলেন, জ্যোতিরাণীও এবারে ঠিক তাই করলেন। তিনি জবাব দিলেন না, উকিল দিলেন না, মামলায় যুঝলেন না। তিন দিন আগে একতরফা ডিক্রী পেয়েছেন শিবেশ্বর চাটুজ্যে। নিয়ম-মাফিক তাঁকে কোর্টের ফয়সালা জানানো হয়েছে।

এরই দিনকতক আগে, স্কুল ফাইন্যালে ছেলের পরীক্ষার ফল দেখে যেদিন তিনি অবাক হয়েছিলেন, সেদিনও সিতু স্কুল-গেটএ এসে দাঁড়িয়েছিল। হাঁপাতে হাঁপাতে সেদিনও শমী এসে খবরটা দিয়েছিল। জ্যোতিরাণী হঠাৎ-ঝোঁকে বলে উঠেছিলেন, ডাকলিনে কেন! তারপরেই মনে হয়েছে, ছেলে পরীক্ষা-ফলের সুখবর দিতে আসেনি। এসেছিল হয়ত পরীক্ষার ফল ভালো করে তাঁকে জব্দ করার আক্রোশ মেটাতে। সেটা শুনিয়ে যাবে বলেই হাত তুলে শমীকে কাছে ডেকেছিল সেদিন।

...কিন্তু আজ কেন এসেছিল? বিচ্ছেদের রায় বেরুবার ঠিক এই তিন দিনের মুখে আজ কেন এসেছিল?

...শুধু সিতু নয়, কালীদার এতদিনের রহস্য-ছোঁয়া ঝকঝকে কালো চামড়া-মোড়া ডায়রীও রেজিস্ট্রি-ডাকে আজই এসেছে। যা পড়ার পর দুর্বোধ্য অস্বস্তি আর আশঙ্কায় ভিতরটা ছেয়ে আছে।

শমীকে নিয়ে ট্যাক্সিতেই উঠতে হল। কম করে সাড়ে তিন টাকা খরচ হবে। কিন্তু কি করা যাবে, ট্রাম-বাসের এই ভিড়ের চাপ এখনো বরদাস্ত করে উঠতে পারেন না।

শমীর দরকারী জিনিসপত্র কিনে, ওর মাইনে দিয়ে, বোর্ডিংয়ের চার্জ মিটিয়ে আর এই ট্যাক্সি ভাড়া গুণে মাসের শেষে ফাঁপরে পড়েন জ্যোতিরাণী। স্কুল থেকে যে টাকা হাতে পান গোড়ায়-গোড়ায় সেটা টাকাই মনে হয়নি। অন্য আর দশজন তাইতেই দিব্বি চালাচ্ছে ভেবে তিনিও নিশ্চিন্ত বোধ করতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু মাসের শেষে একই হাল। সহকারী হেডমিস্ট্রেস হবার পরেও। টাকা কটা কিভাবে যে নিঃশেষ হয়ে যায় ঠাওর করে উঠতে পারেন না। অথচ খরচ যখন করেন নিতান্ত দরকার ভেবেই করেন। কিছু সঞ্চয় হওয়া দূরে থাক, গয়না যা ছিল, সংগোপনে তার থেকে দু-চারখানা কমেছে।

সপ্তাহে একদিন অন্তত শমীকে নিয়ে বিভাসবাবুর ফ্ল্যাটে যেতে হয়। সুস্থ থাকলে বিভাস দত্তর আসতে আপত্তি ছিল না। গোড়ার দিকে ঘনঘনই আসতেন। শমীকে আনার পরেও। এটা স্কুল। জ্যোতিরাণী অসুবিধেতেই পড়তেন। শেষে এই অসুবিধের আভাস বিভাস দত্তকে না দিয়ে পারেননি। ঘুরিয়ে আর মোলায়েম করেই বলেছিলেন, ফাঁক পেলে শমীকে নিয়ে তিনিই যাবেন—অসুস্থ শরীর নিয়ে এতদূর আসা, তাছাড়া—স্কুলেরও কে কি ভাবে ঠিক নেই—।

আগে হলে বিভাস দত্ত অভিমানের একটা দেয়াল খাড়া করাতেন সামনে। কিন্তু আগের সঙ্গে অনেক যেন তফাৎ হয়ে গেছে। রাগ করা দূরে থাক, উল্টে হেসেছেন। বলেছেন, বুঝি তো, আবার না এসেও পারি না। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত একলা কাটে—

তাঁর ওখানে যাওয়া-আসার জন্যেই জ্যোতিরাণীর ট্যাক্সি-খরচ। এও বাঁচাবার চেষ্টাই করেন তিনি। কিন্তু ট্রাম-বাসের অত ভিড় অসহ্য লাগে। সেই চাপাচাপির মধ্যে অনেক নীরব হ্যাংলামিও দেখেছেন তিনি। গা ঘিন ঘিন করে। এখন অন্তত জ্যোতিরাণী চান এই রূপের বাঁধন ভেঙে পড়ুক, মুছে যাক। এরই জন্যে পায়ে পায়ে অসুবিধে এখন। এ আর না থাকলে অনেক দিক থেকে স্বস্তির কারণ হতে পারে এখন। কিন্তু তিনি চাইলে কি হবে। বয়েস চৌত্রিশে গড়ালো,

হ্যাংলামি যারা করে তারা চব্বিশের বেশি দেখে না তাঁকে। স্কুলের এক সহ-শিক্ষয়িত্রীও চৌত্রিশ শুনে ঠাট্টা করে নিজের বয়েস বলেছিল চৌষট্টি।

দোতলায় ফ্ল্যাট। তর তর করে উঠে শমী আগে ঘরে ঢুকেছে। একটু বাদে জ্যোতিরাণী। ঘরে ঢুকে দেখলেন উঠে বসে বিভাস দত্ত বালিশের তলায় রাখলেন কি। বালিশজোড়া উঁচিয়ে রইল। তারপর হাসিমুখে সেই বালিশে ঠেস দিয়ে এদিকে ফিরলেন।

আজ এত দেরি দেখে ভাবলাম, এলেন না।

শমী জানান দিল, আরো দেরি হত, মাসী দুপুর থেকে কেবল বসেই কাটালো, আমি ঠেলে তুলে নিয়ে এলাম।

হাল্‌কা টিপ্পনীর সুরে বিভাস দত্ত তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ট্যাক্সিতে এলি তো?

ঠেসটা যে মাসীর উদ্দেশে শমী ভালই জানে। মাসীর খরচের হাত নিয়ে কাকুকে মাঝে-সাজে ঠাট্টা করতে শোনে। তাই মাসীর হয়ে সে পাকা মেয়ের মত জবাবদিহি করল, কি করব, যে ভিড় ট্রামে-বাসে, আর লোকগুলোও যে আ-দেখলের মত চেয়ে থাকে মাসীর দিকে—

মাসির রুষ্ট চোখ দেখে শমী থেমে গেল। কিন্তু চৌদ্দ বছরের শমীরই বা দোষ কি, তারও তো চোখ বাঁধা নেই।

শমীর কথায় ঠোঁটে হাসি নিয়ে বিভাস দত্ত তাঁর দিকে ফিরেছেন। জ্যোতিরাণী ভদ্রলোকের চোখেমুখে চাপা খুশি দেখছেন আজ।...এক নজর তাকিয়েই জ্যোতিরাণী বুঝে নিয়েছেন, কোর্টের রায় তাঁরও জানা হয়ে গেছে। কেস্ ওঠার আগে যে খবরটা তিনিই প্রথম দিয়েছিলেন, এই তিন দিন ধরে তার ফল না জেনেও তিনি বসে নেই। জ্যোতিরাণীর হঠাৎ মনে হল, অনেক দিন ধরে কে যেন তার চারদিকে একটা জাল ফেলে রেখে প্রায় অলক্ষ্য কিন্তু ধীর অমোঘ গতিতে গোটাতে শুরু করেছে এখন।

গম্ভীর। চিন্তাটা সবলে ঝেড়ে ফেলে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন ছিলেন এ কদিন?

বেশ ভালো।

এই জবাবটুকুর মধ্যেও কি আলগা-ব্যঞ্জনার ধাক্কা খেলেন জ্যোতিরাণী?

এদিকে চার দিন আগেও রক্ত পরীক্ষা করিয়েছেন বিভাস দত্ত, ব্লাড-সুগার হাই। যা শুনলে ফিরে আবার পরীক্ষা না করা পর্যন্ত মেজাজ বিগড়েই থাকে তাঁর। অথচ জবাব দিলেন, বেশ ভালো।

জ্যোতিরাণী বললেন, বেশ ভালো তো বিকেলে হেঁটে চলে বেড়ালেও পারেন, বন্ধ ঘরের মধ্যে একলা শুয়ে বসে কাটান কেন ?

বিভাস দত্তর ঠোঁটের হাসি আর একটু বিস্তৃত হয়েও হল না, শিথিল আলস্যে আরও একটু নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলেন। তারপর হাল্‌কা গোছের জবাব দিলেন, একেবারে একলা ছিলাম না।

বিভাস দত্তর দু চোখ শমীর বিস্মিত মুখের দিকে ঘুরল। আর সেইটুকুর ফাঁকেই জ্যোতিরাণী সচকিত। মুহূর্তের মানসিক বিড়ম্বনার ধাক্কা একটা। নড়াচড়ার ফলে বিছানার বালিশ জোড়া সামান্য সরেছে।

তার ফাঁক দিয়ে মোটা ওমর খৈয়ামের একটু অংশ দেখা যাচ্ছে।

…বিভাস দত্ত ওমর খৈয়াম পড়ছিলেন না। তাহলে ওটা বালিশ-চাপা দেওয়ার দরকার হত না। ওতে জ্যোতিরাণীর ছুটো ফোটো আছে।

…বিভাস দত্ত একা ছিলেন না।

॥ সাঁইত্রিশ ॥

মৃতদেহ বিভাস দত্তর।

জ্যোতিরাণী সামনে বসে আছেন। দেখছেন চেয়ে চেয়ে। কাঁপছেন। তাঁর সত্তাসুদ্ধ কাঁপছে। মৃত বিভাস দত্ত তাঁর সামনে শয়ান। শবের জীবন্ত অভিযোগ দেখছেন তিনি। অভিযোগ তাঁরই ওপর, তাঁরই প্রতি। দুর্বহ নিঃসঙ্গতার অভিযোগ, অপরিপূর্ণ বাসনার অভিযোগ, জীবনের বহু ব্যর্থতা বহু সঙ্কট থেকে তাঁকে টেনে তোলার বিনিময়ে নিষ্ঠুর নির্লিপ্ত অবজ্ঞার অভিযোগ, উত্তর-যৌবনের সব আশা আকাঙ্ক্ষা আকূতি আমন্ত্রণ উপেক্ষার অভিযোগ—অসময়ে এই জীবনান্ত ঘটানোর অভিযোগ। আভাসে আচরণে এই অভিযোগ বিভাস দত্ত গত ছ মাস ধরে করে আসছেন। কোর্টের বিবাহবিচ্ছেদ ঘোষণার তৃতীয় দিনে বালিশের তলায় ওমর খৈয়াম চাপা দিয়ে বলেছিলেন, ঘরে তিনি একলা ছিলেন না। প্রত্যক্ষ-ভাবে সেটাই শুরু। তারপর এই ছ মাস ধরে কখনো অসুস্থতার আড়াল থেকে নির্বাক ব্যথাতুর আবেদনে তাঁকে বিচলিত করতে চেয়েছেন, কখনো বা কঠিন দুর্ভেদ্য অভিমানের আড়াল থেকে। কখনো কালীদার মুখে শোনা তিন-রাস্তার ত্রিকোণ দালানের মালিকের অনেক ব্যভিচারের নগ্ন-বার্তা সামনে তুলে ধরে বিগত স্মৃতি নির্মূল করে দিতে চেয়েছেন, কখনো বা কলমের ডগায় ক্ষোভ ঢেলে রমণীর

ছিন্ন-ভিন্ন ভগ্নজীবনের আত্মবঞ্চনাকারী অন্ধ অবুঝ সংস্কারের প্রতি নির্দয় আঘাত হানতে চেষ্টা করেছেন।

জ্যোতিরাণী কাঁপছেন থরো-থরো, আর সত্তা-দুমড়ানো শবের অভিযোগ দেখছেন। দেখছেন, ওই অব্যক্ত অভিযোগ কানেও শুনছেন। তিনি দেখতে চান না, শুনতে চান না। তবু দেখতে হচ্ছে, তবু শুনতে হচ্ছে। অভিযোগের এই রূপ এই বাণী তিনি কল্পনাও করেননি। চিৎকার করে তিনি ওই ঘুম ভাঙাতে চান, ওই নিষ্প্রাণ দেহ ঠেলে তুলে দিতে চান, আত্মহননের এই মর্মান্তিক দায় থেকে তাঁকে নিষ্কৃতি দিতে বলতে চান। কিন্তু বাইরে তিনি পাথর হয়ে গেছেন, টুঁ শব্দটিও করতে পারছেন না। তিনি শুধু দেখছেন। অভিযোগ দেখছেন। চরম প্রতিশোধ দেখছেন।

…আরো কি যেন দেখছেন জ্যোতিরাণী। আরো কাদের দেখছেন। দেখছেন না, ওই নিশ্চল দেহ তাঁর দু চোখ আগলে রেখেছে—দেখার মত করে অনুভব করছেন। শমীটা আর্তনাদ করে কাঁদছে, অথচ কান্নার এতটুকু শব্দ তাঁর কানে আসছে না। কারা সব কথা বলছে, কিন্তু জ্যোতিরাণী কিছুই শুনতে পাচ্ছেন না। শব্দ এখানে অনুভূতির গ্রাসের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে, স্পর্শবাহী নৈঃশব্দ্যের গভীরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

নিষ্পলক চেয়ে-চেয়ে জ্যোতিরাণী দেখছেন শুধু। দেখছেন আর কাঁপছেন থর-থর করে। কাঁপুনিটা সত্তার এত গভীরে যে বাইরে তারও প্রকাশ নেই। কিন্তু আর পারছেন না তিনি দেখতে, আর পারছেন না এই শব্দশূন্য অভিযোগ শুনতে।

প্রাণপণে একবার ডেকে দেখবেন ওই নিস্পন্দ দেহে সাড়া জাগানো যায় কিনা? শেষবারের মত চেষ্টা করে দেখবেন ওই আত্মবিনাশী দেহটাকে ডেকে তোলা যায় কিনা?

ধড়মড় করে উঠে বসলেন জ্যোতিরাণী। কোথা থেকে কোথায় উঠে বসলেন ঠাওর করতে পারলেন না। ঘর ভর্তি আবছা অন্ধকার। চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছেন না। বুকের কাঁপুনি ধপ্-ধপ্ করে কানে বাজছে এখন। ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে। সত্রাসে সামনে খুঁজছেন কি। না, কিছু না, শমী ঘুমুচ্ছে। তিনি শয্যায় বসে আছেন। বোর্ডিং-এ, নিজের ঘরে। আঁচলে করে কপালের আর গলার ঘাম মুছে নিলেন। তারপর চোখ বড় করে চারদিক দেখলেন আবার। কাঁপুনির রেশ লেগেই আছে তবু।

জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চোখ গেল। সঙ্গে সঙ্গে আবার ছাঁত করে উঠল ভিতরটা। পূবের আকাশের অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে। একটু বাদে ভোর

হবে। ভোর রাতে এ কি দেখে উঠলেন তিনি। ভোরের স্বপ্ন সম্পর্কে ছেলে-বেলার সংস্কার ভয়াবহ চিত্রটা মুছে যেতে দিল না। কিছু ঘটে গেল?

সকাল হয়েছে। মেয়েদের ঘুম ভেঙেছে। বোর্ডিং-এ সাড়া জেগেছে। চা-টা খেয়ে শমী পড়তে বসে গেছে। দিনের আলোয় স্বপ্নের বিভীষিকা মুছে ফেলতে চেষ্টা করছেন জ্যোতিরাণী। কিন্তু মোছা যাচ্ছে না। ঘরের বাইরে পায়ের শব্দ শুনলে চমকে উঠছেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে সচকিত হয়ে উঠছেন। একটা কিছু দুঃসংবাদ আসতে পারে যেন। আসা সম্ভব নয়। বিভাস দত্তর ভাল-মন্দ কোন খবর এখানে পৌঁছে দেবার মত পরিচিত কেউ নেই। তাঁর বাড়ির বাদ-বাকী ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা সব অবাঙালী। তেমন মুখ-চেনাও নেই কারো সঙ্গে। কিন্তু এ আবার কি ভাবছেন জ্যোতিরাণী? স্বপ্ন স্বপ্নই—খবর আবার কি আসবে?

কিন্তু ভাবনার কারণ আছে। তাই বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও বাড়ছে। স্বপ্নটা বাস্তবের মতই ভিতরে ভিতরে ছায়া বিস্তার করে চলেছে।

…দিন আঠার-কুড়ি আগে একটা বড় রকমের বোঝাপড়া হয়ে গেছে বিভাস দত্তর সঙ্গে। কোনরকম শোরগোলের বোঝাপড়া নয়, প্রত্যাশা বিলোপের বোঝা-পড়া। আর মাত্র গত সন্ধ্যায় বিভাস দত্তর কিছু অব্যবস্থিত চিত্ত হাবভাব কার্যকলাপ দেখে এসেছেন

কোর্ট থেকে বিচ্ছেদের রায় বেরুবার পরে এই একটানা ছ মাস ধরে যথার্থই যুঝে আসছিলেন জ্যোতিরাণী। এই একজনের অবুঝ প্রত্যাশার সঙ্গে। নিবিড় প্রতীক্ষার সঙ্গে। প্রত্যাশা আর প্রতীক্ষা দিনে দিনে উন্মুখ হয়ে উঠছিল। কথায়-বার্তায় মানে-অভিমানে, অসহিষ্ণুতায়-অস্থিরতায়, কলমের আঘাতে-আবেদনে বড় বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। আর সেই তাড়নায় ভদ্রলোক আরো বেশী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

কোন কোন ছুটির দিনে জ্যোতিরাণী শমীকে নিয়ে আসা বন্ধ করতে শুরু করেছিলেন। তার জবাবে বিভাস দত্ত নিজেই পর-পর কদিন বোর্ডিং-এ গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। স্কুল ছুটির পরে গেছেন, শমীর পড়ার ব্যাঘাত হচ্ছে সেই আভাস ব্যক্ত না করা পর্যন্ত ওঠার নাম করেননি। ওঠার সময় বলে গেছেন পরদিন আবার আসবেন। তখন পর্যন্ত জ্যোতিরাণী মুখ ফুটে বলেননি কিছু। কারণ এবারের এই আসাটা তাঁর অসুবিধের কথা না জেনে না বুঝে আসা নয়। জেনেই আসা, বুঝেই আসা। প্রতিরোধ ভেঙে দেবার সঙ্কল্প নিয়ে আসা।

তবু বলার সময় এলো। দিন কুড়ি আগের কথা। সেদিন শমীকে নিয়ে জ্যোতিরাণী এসেছিলেন তাঁর ফ্ল্যাটে। একটা ছুটির দিন এড়িয়ে গেলে সপ্তাহের মধ্যে মধ্যে কম করে তিন-চারদিন নিজে হাজির হয়ে তার শোধ তুলবেন।...দু পাঁচ মিনিট থেকে শমী ওধারের ফ্ল্যাটে চলে গেছল। পাশের ফ্ল্যাটের সমবয়সী অবাঙালী মেয়েটির সঙ্গে তার ভাব হয়েছে। কিন্তু জ্যোতিরাণীর মনে হয়, ইদানীং এই মেয়েটার চোখেও কিছু ব্যতিক্রম ধরা পড়ছে বলেই পালায়—ঠায় সামনে বসে থাকতে পারে না।

ও বেরিয়ে যেতে বিভাস দত্ত নিস্পৃহ গাম্ভীর্যে বলেছিলেন, ট্যাক্সি খরচ করে আসার কি দরকার ছিল, খানিক বাদে আমিই তো যেতাম।

জ্যোতিরাণী তক্ষুনি অনুভব করেছিলেন—বলার সময় এলো। চুপচাপ চেয়েছিলেন একটু, তারপর বলেওছিলেন, সেটা ভাল হত?

মুহূর্তে অশান্ত মুখ বিভাস দত্তর।—কেন? কেউ কিছু ভাববে? ভাবলেও লজ্জা পাওয়ার মত এমন কি অস্বাভাবিক ব্যাপার হবে সেটা?

হবে না?

না। অশান্ত হাতে পকেট হাতড়ালেন, বালিশ ওলটালেন। সিগারেটের প্যাকেট বার করে সিগারেট ধরালেন।

জ্যোতিরাণী সেইটুকু সময় অপেক্ষা করলেন।—আপনার ব্লাড সুগার কত এখন?

বিভাস দত্ত সচকিত। অনুকূল ফয়সালার তাড়নার মুখে প্রশ্নটা আঘাতের মত। চঞ্চল দৃষ্টিটা জ্যোতিরাণীর মুখের ওপর দু-চার মুহূর্ত নড়েচড়ে বেড়াল।—শিগগীর দেখাইনি।...বেশি হলে নিশ্চিন্ত হতে পারেন?

আমি নিশ্চিন্তই আছি, দুর্ভাবনা যেটুকু তা আপনাকে নিয়ে। জীবনে আপনি যত উপকার করেছেন ততো আর কেউ করেনি, আপনার ভাল ছাড়া আর কি চাইতে পারি?

সিগারেটে অসহিষ্ণু টান পড়েছে বারকয়েক। তেমনি অশান্ত গাম্ভীর্যে সামনে ঝুঁকেছেন হঠাৎ।—ভাল চান? সত্যি ভাল চান?

হ্যাঁ।

তাহলে আমি কি চাই সেটা না বোঝার এত চেষ্টা কেন?

ধীর ঠাণ্ডা মুখে জ্যোতিরাণী জবাব দিয়েছেন, না বোঝার চেষ্টা নয়, বুঝতে আমি চাই না। আপনার ভাল চাই বলেই চাই না।

বিভাস দত্ত বসে থাকতে পারেন নি। উঠে ঘরের এ-মাথা ও-মাথা করেছেন

বারকয়েক। অসুস্থ মুখের কালচে ছোপ ঘন হয়েছে। সিগারেট ফেলে সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।—ভাল চাওয়ার এটাই লক্ষণ তাহলে ?

হ্যাঁ। আমি ঘর করব বলে কারো ঘর ছেড়ে আসিনি। এই ভাঙা-জীবন জুড়তে চেয়ে আপনি নিজেও কষ্ট পাবেন না, আমাকে কষ্ট দেবেন না।

…চোখের দৃষ্টি তখনই অস্বাভাবিক উদগ্র হয়ে উঠেছিল বিভাস দত্তর। পায়চারি করছিলেন। অস্থিরতা বাড়ছিল। সিগারেট ফেলে নতুন সিগারেট ধরিয়েছিলেন। ফিরে আবার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন যখন, দুই চোখ ঘোলাটে, প্রায় ক্রূর।—আপনার নিজের কথা থাক, আমার সম্পর্কে আপনার এটাই শেষ চিন্তা ?

হ্যাঁ।

আর আজকের আসাটাও এটা জানাবার জন্যেই বোধ হয় ?

হ্যাঁ, যত দেরি হচ্ছিল ততো আপনার ক্ষতি হচ্ছিল।

আমার ক্ষতি, আমার ক্ষতি ? বিভাস দত্ত হেসে উঠেছিলেন। হাসি ঠিক নয়, হাসির মতই কিছু। তাও তক্ষুনি মিলিয়ে গিয়েছিল। বলেছিলেন, আচ্ছা, ক্ষতি আর তাহলে করব না।

প্রত্যাশা বিলোপের ওই আঘাত মুছে দেবার জন্যে জ্যোতিরাণী আরো কিছু বলতে পারলে বলতেন, অশান্ত অবুঝ ক্ষোভ দূর করার হাত থাকলে করতেন। কিছুই বলতে পারেননি, কিছুই করতে পারেননি। শমী ফিরতে নিঃশব্দে উঠে এসেছিলেন।…

সময় ভোলায়। তাই সময়ের প্রতীক্ষা করেছেন। আঘাত দিতে হয়েছে, কিন্তু সব থেকে উপকারী মানুষকে পরিত্যাগ করে অপমান করতে চাননি। বরং দুই-একবার আসা-যাওয়ার পর ফিরে আবার প্রত্যাশাশূন্য সহজ যোগাযোগ স্থাপন করার আশা পোষণ করেছেন। তাই শমীকে নিয়ে পরের সপ্তাহে আবার যথারীতি এসেছিলেন। না আসার মত তাঁর দিক থেকে অন্তত বড় কিছুই ঘটেনি বোঝাবার চেষ্টা।

কথা বিভাস দত্ত কমই বলেছেন। মুখে কালচে ছাপ, চোখ বসা। ক'রাত ধরে ভাল ঘুমোননি মনে হয়। সেদিন শমীকে আর অন্য ঘরে যেতে দেননি জ্যোতিরাণী। বলেছেন, কাকুর শরীর ভাল না দেখছিস, বোস্।

এতেও বিভাস দত্তর অসহিষ্ণুতা গোপন থাকেনি। শমীর সামনেই ঘোলাটে দু চোখ তাঁর মুখের উপর আটকেছে।—শরীর ভাল না আপনাকে কে বললে ?

দেখতে পাচ্ছি।

জ্যোতিরাণীর মনে হয়েছিল ভদ্রলোক এবার বলবেন, কর্তব্যের দায় সারার জন্ম কষ্ট করে আসার আর প্রয়োজন নেই। বললেন না। একটু বাদে উঠে টেবিলের ড্রয়ার খুলে কি একটা ছাপা কাগজ বার করলেন। ইশারায় শমীকে কাছে ডেকে কলম এগিয়ে দিয়ে বললেন, এখানে নাম সই কর।

বিমূঢ় মুখে শমী আদেশ পালন করল। কাগজ আর কলম বিভাস দত্ত জ্যোতিরাণীর সামনে ধরলেন। ছাপার অক্ষরে গার্জেন লেখা জায়গাটা দেখিয়ে বললেন, আপনি এখানটায় সই করুন।

ছাপা ফর্মের উল্টো দিকে সই করার ঘর। ছাপার অক্ষরে কি সব লেখাও আছে। কিন্তু ভদ্রলোকের সহিষ্ণুতায় আরো চিড় খাবার ভয়ে জ্যোতিরাণী পড়ে দেখার অবকাশ পেলেন না।—কি এটা?

বিড়বিড় করে বিভাস দত্ত জবাব দিলেন, শমীর গার্জেন হিসেবে নামটা শুধু সই করুন, ভয়ের কিছু না। অবশ্য গার্জেন হতে যদি আপনার আপত্তি থাকে তাহলে আলাদা কথা—

জ্যোতিরাণী তাড়াতাড়ি সই করে দিয়ে বাঁচলেন। যত দূর মনে হল ভদ্রলোক শমীর ব্যাপারে বৈষয়িক কিছু চিন্তা করছেন।

তার পরের সপ্তাহেও এসেছেন। দেখা হয়নি। ঘর তালা-বন্ধ ছিল।

গতকাল স্কুলে তাঁর টেলিফোন।...স্কুল ছুটির পর সন্ধ্যার দিকে একবার এলে ভাল হয়, দরকারী কথা আছে। টেলিফোনে বিভাস দত্তর গলায় হাসির রেশও কানে এসেছে একটু, বলেছেন, আপনার ভয় পাওয়ার বা ঘাবড়ে যাওয়ার মত কোন কথা নয়, নিশ্চিন্ত মনেই আসতে পারেন।

জ্যোতিরাণী তক্ষুনি কথা দিয়েছেন যাবেন।

যেতে যেতে সন্ধ্যা গড়িয়েছিল। শমীকে পড়তে বসিয়ে একাই বেরিয়েছিলেন। একলা যেতে অস্বস্তি বোধ করেছেন, কিন্তু দরকারী কথা আছে শুনেও ওকে সঙ্গে নেওয়াটা আর একজনের চোখে নিশ্চিন্তে যেতে না পারার নজির হবে।

বিভাস দত্ত বুক পর্যন্ত চাদর টেনে শুয়েছিলেন। পাশের অ্যাশপট সিগারেটের টুকরোয় ভরে গেছে। মাঝে ডাক্তারের সতর্কতায় সিগারেট খাওয়া কমাতে হয়েছিল। অন্য দিন হলে অত খাওয়া সিগারেট দেখে জ্যোতিরাণীও বলতেন কিছু। আগে বলেছেন। কিন্তু তাঁকে দেখে মনে হয়েছে ও সব-সতর্কতার যেন দিন ফুরিয়েছে। ঝড়ের পরে ঠাণ্ডা মূর্তি।

শুয়ে যে, শরীর কেমন?

ফ্যাকাশে মুখে বিভাস দত্ত হাসতে চেষ্টা করেছেন একটু। জবাব দেননি।

অর্থাৎ শরীর সম্পর্কে আগ্রহ নেই। জিজ্ঞাসা করেছেন, এ-সময়ে ডেকে অসুবিধেয় ফেলেছি বোধ হয়?

না অসুবিধে আর কি।

ট্যাক্সিতে এলেন?

জ্যোতিরাণীরও সহজ হবার চেষ্টা। হেসে জবাব দিয়েছেন, শেষের অর্ধেকটা—ট্রাম বদল করতে নেমে আর ওঠা গেল না।···রোববারে কোথায় ছিলেন, এসে দেখি ঘর তালা-বন্ধ।

বিভাস দত্তর মুখে সেই রকমই নিষ্প্রভ নির্লিপ্ত হাসি। পাবলিশারদের বাড়ি-বাড়ি পাওনা কুড়োবার নোটিস দিতে গেছলাম।

জ্যোতিরাণী প্রাচুর্য থেকে বেরিয়ে এসেছেন তিন বছরের ওপর হয়ে গেল। তবু অনটনের কথা বলা বা শোনার ব্যাপারে সহজ হতে পারেননি। হঠাৎ বেশি টাকার কেন দরকার হল জানেন না। এই দরকারে আরো কিছু গয়না অনায়াসে বার করে দিতে পারেন। কিন্তু আভাসেও তা ব্যক্ত করলে বিপর্যয়ের সম্ভাবনা। কোন্ দরকারী কারণে তাঁকে ডাকা হয়েছে শোনার প্রতীক্ষা।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বিভাস দত্ত আঙুলের ইশারায় ঘরের কোণের সুটকেসটা দেখিয়ে বলেছেন, ওটা খুলুন একটু, ওপরেই একটা খাম আছে দেখুন—

জ্যোতিরাণী অবাক, ভিতরে ভিতরে সচকিতও। কিন্তু কেন জিজ্ঞাসা করা থেকেও যা বললেন সেটা করা সহজ। উঠে সুটকেস খুললেন। কাপড়-জামার সঙ্গে আরো কি একটা চোখে পড়ল। ওষুধের ফাইল। মন বাদামী রঙের লম্বাটে খামটার দিকে, তাই দেখেও খেয়াল করলেন না। খাম হাতে নিয়ে ফিরলেন।

আপনার কাছে রেখে দিন, ওটা শমীর। দরকার মত ভাঙাবেন, নয় তো বছর-বছর বদলে নেবেন।

জ্যোতিরাণীর দ্বিগুণ বিস্ময়। কিছু না বুঝে খামে হাত ঢোকালেন। কিছু দিন আগে কি একটা ফর্ম সই করেছিলেন মনে পড়ল।

খামের মধ্যে ছাপা-কাগজসহ তিন হাজার টাকার সরকারী বণ্ড একটা শমীর নামে। তিনি তার গার্জেন।

কি ব্যাপার?

সামান্যই। ওর দায় তো সব আপনিই নিলেন। মেয়েটার ভাগ্য ভাল, সব গেলেও শেষ পর্যন্ত আবার মা পেয়েছে। তবু নিজের সান্ত্বনার জন্যে যেটুকু করা গেল···আমার ক্ষমতা তো আপনি ভালই জানেন।

কিন্তু এই সান্ত্বনার ব্যবস্থাও পরে করলে চলত না? সময় ফুরিয়ে যাচ্ছিল?

বিভাস দত্তর নির্লিপ্ত হাসি নরম মনে হয়নি একটুও। জবাব দিয়েছেন, যাচ্ছে না এই গ্যারাণ্টিই বা কে দেবে। কিছু হয়ে বসলে তো মেয়েটা এক পয়সাও পাবে না।...শিগগীরই কোথাও পাড়ি দেবার মতলব আছে, কবে আর দেখা হবে না হবে ঠিক কি।

সেই বোঝাপড়ার পর গত পনেরো দিন ধরে ভদ্রলোককে সুস্থ ঠাণ্ডা মেজাজে ফিরিয়ে আনার তাগিদ বোধ করেছিলেন জ্যোতিরাণী। কিন্তু এই শুনে নিজের মেজাজই তেতে উঠেছিল। এও আর এক ধরনের প্রতিশোধ ভিন্ন আর কিছু ভাবা সম্ভব হয়নি।—কোথায় যাচ্ছেন ?

দূরেই বোধ হয়, তবে কত দূরে এক্ষুনি ঠিক বলতে পারব না।

এও পুরুষের জবাব মনে হয়নি জ্যোতিরাণীর। প্রতিশোধের ছকে-বাঁধা দুর্বল অস্ত্র ভিন্ন সেই মুহূর্তে আর কিছু ভাবেননি। নিজেকে সংযত করে কিছু বলতেন হয়ত। হাতের খামটা তাঁর শয্যায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলেও যেতে পারতেন। কিন্তু তার আগেই দোরগোড়ায় অচেনা আগন্তুকের সাড়া পাওয়া গেল। বিভাস দত্ত ভিতরে ডেকে বসতে বললেন তাঁকে। ভদ্রলোক ভিতরে ঢুকে অপ্রস্তুত একটু।

জ্যোতিরাণীর তক্ষুনি মনে হল এযাবৎ তাঁর উপস্থিতিতে ঘরে পরিচিত বা অপরিচিত কোনো আগন্তুকের পদার্পণ ঘটেনি। বিভাস দত্তর আচরণে আরো একটু ব্যতিক্রম অনুভব করলেন। গম্ভীর মুখেই তাঁর দিকে ফিরে বলেছেন, রাত হল, অনেকদূর যাবেন, আপনার আর দেরি করা উচিত নয়।

অর্থাৎ তাঁর দরকারী কথা ফুরিয়েছে। নিজে থেকে কখনো যেতে বলেছেন মনে পড়ে না। অগত্যা খামটা হাতে করেই উঠতে হয়েছে।—আপনি কবে যাচ্ছেন ?

শিগগীরই বোধ হয়। যাবার আগে জানাব।

রাজ্যের বিরক্তি নিয়েই জ্যোতিরাণী ঘরে ফিরেছিলেন। আত্মপীড়নের এই রাস্তা বেছে নেওয়া হবে ভাবেননি। শরীর সুস্থ নয় বলেই দূর যাওয়ার অনড় অভিমান, আর টাকা-পয়সার অবস্থা সচ্ছল নয় বলেই শমীর নামে তিন হাজার টাকার বণ্ড কিনে দিয়ে তাঁকে বেঁধার চেষ্টা। এই করে তাঁকেই শুধু আক্কেল দেওয়া হল। এর থেকে আর একটু বলিষ্ঠ আচরণ অন্তত জ্যোতিরাণী আশা করেছিলেন।

কিন্তু ঘরে ফেরার পর বিরক্তি আর ক্ষোভের তলায় কি এক অজ্ঞাত অশান্তি উঁকিঝুঁকি দিতে চেয়েছে। রাতের নিরিবিলি শয্যায় সেই অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ আরো বেড়েছে। অথচ তিনি ধরতে পারেননি এ-রকম লাগছে কেন। জীবনের গোড়া থেকে একটা লোক উপকারের বিনিময়ে অবুঝ আক্রোশে যে আত্মপীড়নের পথে চলেছে তার নির্মম ফলাফলের সম্ভাবনা চিন্তা করে ?

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তারপর রাতের এই স্বপ্ন। রাতের নয়, ভোর রাতের।

বেলা বাড়ার পরেও অস্থিরতা দূর হয়নি। স্বপ্নের দৃশ্য যতবার মনে পড়েছে ততবার কেঁপে উঠেছেন তিনি। কিছু ঘটেই গেল? খবর পাবেন কি করে? ...থেকে থেকে মানুষটার বিগত সন্ধ্যার কথাবার্তা হাবভাব মনে পড়েছে। অশান্তির তাড়নায় শমীকে আড়াল করে এক-একবার জানলার সামনে স্থির হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছেন তিনি। যেন ওই জানলা দিয়েই কাউকে দেখতে পাবেন, কিছু একটা খবর পাবেন।

...বলেছিল কবে আর দেখা হবে না হবে ঠিক কি! এ কথার অর্থ তো অনেক কিছুই হতে পারে।

...কোথায় যাওয়া হচ্ছে জিজ্ঞাসা করতে বলেছিল, দূরেই বোধ হয়, তবে কত দূরে এক্ষুনি ঠিক বলতে পারব না।

এ-কথারই বা অর্থ কি? দূরে মানে কত দূর? এক্ষুনি ঠিক বলতে পারব না বলার অর্থ আরো কি হতে পারে?

যা হতে পারে ভাবতে গিয়ে চোখে-মুখে আতঙ্কের ছায়া ঘন হয়ে উঠল আরো। সঙ্গে সঙ্গে আবার কি মনে পড়তে চমকেই উঠলেন। বণ্ড-এর খাম বার করার জন্য ভদ্রলোকের স্যুটকেস খুলতে প্রথমে যে জিনিসটা চোখে পড়েছিল তা ঠিক এই মুহূর্তেই মনে পড়ল কেন? ঘুমের ওষুধের ফাইল একটা। অত ঘুমের ওষুধ কেন? ওটা স্যুটকেসেই বা কেন? বিলিতি বইয়ে স্লিপিং পীল্-এর অনেক মর্মান্তিক ভূমিকার কথা পড়া আছে। বিভাস দত্তর কি মতলব?

স্কুলে যেতে পারলেন না। গেলেন না। শমীকে বললেন—শরীরটা ভালো লাগছে না। ও স্কুলে চলে গেল। যত ভাবছেন রাতের দৃশ্য ততো কাছে এগিয়ে আসতে চাইছে। খবর দেবার কেউ নেই, থেকে থেকে তবু উৎকর্ণ সচকিত হয়ে হয়ে উঠলেন জ্যোতিরাণী। কেউ যেন কিছু একটা খবর দিয়ে যেতে পারে। অঘটন কল্পনা করে বেদনা বা অনুকম্পায় অস্থির হয়ে উঠছেন না তিনি। উল্টে চোখে-মুখে শুকনো কঠিন ছাপ পড়ছে একটা। এত বড় আঘাতের বোঝা যদি কেউ তাঁর ওপর চাপিয়ে দেয় তাকে তিনি কোনদিন ক্ষমা করবেন না।

একটায় শমী টিফিন খেতে আসবে। সে পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। টিফিন খেয়ে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন। দুপুরে ভিড় কম, অনায়াসেই ট্রামে-বাসে যেতে পারতেন। কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা ট্যাক্সিতে উঠলেন।

ফ্ল্যাট বাড়ির দোতলায় বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়াবার পর এতক্ষণের আচ্ছন্ন ভাব কেটে আসতে লাগল। না কিছু হয়নি। যা দেখেছেন তা স্বপ্নই। অবচেতন মনের নানা ভাবনা-চিন্তার প্রতিক্রিয়া। এবারে সঙ্কোচ। যেমন নিঃশব্দে এসেছেন তেমনি ফিরে যাবেন কিনা ভাবলেন একবার। কিন্তু অস্বস্তি একেবারে মিলিয়ে যায়নি। আর দেখা না হতে পারে বলেছেন, অনেক দূরে পাড়ি দেবার কথা বলেছেন, সুটকেস-এ একগাদা ঘুমের ওষুধ রেখেছেন।··· আর ভোর-রাতের ওই স্বপ্ন। ওটা পূর্বগামিনী ছায়া কিনা কে জানে?

দরজার কড়া নাড়তে হবে ভেবেছিলেন। তার আগে ঠেলে দেখলেন। ভেজানো ছিল, খুলে গেল।

বিভাস দত্ত অপ্রস্তুত। অবাক।

তাঁকে দেখলেই বোঝা যায় ভিতর সুস্থির নয় একটুও। ঘরের মধ্যে পায়চারি করছিলেন। উসকো-খুসকো মূর্তি। চোখের কোণে কালি। ভিতরে ভিতরে অশান্ত কিছুর বোঝাপড়া চলছিল। মানসিক অস্থিরতার মুখে হাতে-নাতে ধরা পড়লেন যেন।

জ্যোতিরাণীর মনে হল তিন সপ্তাহ আগে সেই প্রত্যাশা নাকচের দিনেও অনেকটা এই গোছের অসহিষ্ণুতা, এই-রকম উদ্‌ভ্রান্ত মুখ দেখেছিলেন। আজ তার থেকে বেশি দেখছেন। গতকাল তিনি আসবেন জেনেই নিজেকে তিনি সংযত রেখেছিলেন, এই চেহারাটা গোপন রেখেছিলেন।

কি ব্যাপার, এ সময়ে যে······স্কুল নেই?

যাইনি।

ও, আমারই ভাগ্য বলতে হবে, বসুন।

বললেন বটে, কিন্তু স্নায়ুর যে নিপীড়নে মানুষ দোর বন্ধ করে একলা থাকতে চায় সেই গোছের বিরস মুখ এখনো। জ্যোতিরাণীর মনে হল স্বপ্নের অঘটন এই মানুষই শুধু ঘটাতে পারে। ঘরের চেয়ার দুটো দেয়ালের কোণে সরানো, শয্যার একধারে বসলেন তিনি। বললেন, কাল লোক এসে যেতে আপনার মনে কি আছে শোনা হল না। তাই এলাম।

বিভাস দত্ত হাসতে চেষ্টা করলেন একটু। হাসির বদলে মুখে বিদ্রূপের দাগ কেটে বসল। বালিশ উল্টে সিগারেটের প্যাকেট হাতে নিলেন। সিগারেট ধরালেন। নিজেকে প্রকৃতিস্থ করার তাগিদ। কিন্তু পেরে উঠছেন না। কয়েক পা এগিয়ে একটুও খেয়াল না করেই দরজা দুটো ঠেলে ভেজিয়ে দিলেন। ঘরে একলা থাকলে যা করতেন। তারপর বললেন, আপনার অশেষ অনুকম্পা।

জ্যোতিরাণীর নিষ্পলক দু চোখ তাঁর মুখের ওপর থেকে নড়েনি। একটু চুপ করে থেকে বললেন, কাল তো মোটামুটি ভালই দেখে গেছলাম, আজ খারাপ দেখছি কেন?

বিড়বিড় করে বিভাস দত্ত জবাব দিলেন, ও কিছু না, রাতে ভাল ঘুম হয়নি।

জ্যোতিরাণীর দৃষ্টি ওই মুখের ওপর আরো এঁটে বসেছে। বললেন, না ঘুমিয়ে শরীর খারাপ করার থেকে এক-আধটা ঘুমের ওষুধ-টষুধ খেয়ে ঘুমুলেও তো পারতেন।

ঘরের কোণ থেকে চেয়ার মাঝখানে টেনে এনে বসলেন বিভাস দত্ত। সহজতার বিবরে ঢোকার চেষ্টার ত্রুটি নেই। বললেন, খেয়েছিলাম, কাজ হয়নি। খেয়ে খেয়ে অভ্যাস হয়ে গেছে বোধ হয়—

ভিতরের একটা জমাট-বাঁধা শঙ্কা হাল্কা হতে থাকল। বললেন, তাহলে ওসব না খাওয়াই ভাল।

সিগারেট মুখে তুলতে গিয়েও তোলা হল না। সহিষ্ণুতায় চিড় খেল হঠাৎ। —আপনি আমার ভাল-মন্দ নিয়ে উতলা হতে চেষ্টা করছেন কেন?

উক্তিটা কানে লাগার মত। জ্যোতিরাণী চুপচাপ চেয়ে রইলেন খানিক। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কোথায় যাবেন ঠিক করেছেন?

জবাব দেবার আগে আবার ঠাণ্ডা হবার চেষ্টা। চেষ্টাই শুধু। কিন্তু ক্ষোভের জবাবটা আপনিই ঠেলে বেরুলো।—যাবার ইচ্ছে তো অনেক দূরে, এত দূরে যে ভাবতে নিজেরই খারাপ লাগে, বুঝলেন?

জ্যোতিরাণী কি ভিতরে ভিতরে নাড়া খেলেন একপ্রস্থ? বাইরে বোঝা গেল না। দু চোখের আওতা থেকে ওই মুখের একটা রেখাও অলক্ষ্যে নেই। বললেন, আপনি পুরুষ মানুষ, তার ওপর এত বড় লেখক, একথা আপনার সাজে?

এই সামান্য কথা-কটার মধ্যে কি যে ছিল জ্যোতিরাণী জানতেন না। নিজের ওপর দখল আনার শেষ ঐকান্তিক চেষ্টাও হঠাৎ ধূলিসাৎ বুঝি। কালি-পড়া দু চোখের গভীরের এক অনাবৃত তপ্ত যাতনা ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। আসছেই। সিগারেট ফেলে বিভাস দত্ত উঠে এসেছেন। কাছে। ঈষৎ ঝুঁকে তাকিয়েছেন। স্নায়ুর তাড়নায় দুই ঠোঁট কাঁপছে।—পুরুষ মানুষ…এত বড় লেখক…সাজে না… না? গলার স্বরও হিসহিস শব্দের মত।—সাজে না বলেই তাকে আমি ক্ষমা করতে চাই না, তাকে আমি শাস্তি দিতে চাই…এক-একসময় এত কঠিন শাস্তির কথা মনে হয় যা শুনলে আপনি শিউরে উঠবেন। কিন্তু পারি না কেন? কেন পারি না? কেন পারি না? তিলে তিলে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছি, শেষ হয়ে যাচ্ছি, বুকের

হাড়-পাঁজর সব বরফ হয়ে গেল, তবু কেন পারি না ?

জ্যোতিরাণী নিশ্চল নিস্পন্দ।

আরো কাছে এগোলেন বিভাস দত্ত, আরো ঝুঁকলেন। দু হাত তাঁর দুই কাঁধে উঠে এলো। ঠোঁট দুটো শুধু নয়, ওই হাতের স্পর্শে মানুষটার সর্বাঙ্গ কাঁপছে টের পেলেন। গলার স্বর, কথাগুলো কানের পর্দায় বিঁধেই চলল।—আজ থেকে নয়—সতেরো বছর ধরে এই যন্ত্রণা পুষছি আমি। শিবেশ্বরের ছোট বাড়িতে যেদিন প্রথম দেখেছিলাম, সেইদিন থেকে—কালীঘাটের মন্দিরে যেদিন দেখেছিলাম, তখন থেকে—। যেদিন চিঠি লিখেছিলাম, তখন থেকে—দাঙ্গায় কাটাকাটির মধ্যে ত্রাসে হিম হয়েও যখন ছুটে না গিয়ে পারিনি তখন থেকে—প্রতিদিন প্রত্যেক দিন। এ যন্ত্রণার খবর তুমি জান না ? বোঝ না ? যখন উপায় ছিল না তখন জেনেও জানতে চাওনি কেন বুঝি, কিন্তু এখনো চাও না কেন ?

কাঠ হয়েই ছিলেন জ্যোতিরাণী। কিন্তু সচকিত হঠাৎ। হাত দুটো তাঁর কাঁধে, কিন্তু মানুষটা টলছে। চোখে অন্ধকার দেখছেন যেন। বাতাসের অভাবে যেন চেহারা কি রকম হয়ে যাচ্ছে। মনে হল মাটিতেই পড়ে যাবেন। সামলাতে চেষ্টা করে শয্যায় বসে পড়লেন বিভাস দত্ত। তারপর শুয়ে পড়লেন। মুখ ঘেমে জবজবে হয়ে গেছে। ইশারায় পাখাটা দেখালেন।

ত্রস্তে উঠে জ্যোতিরাণী সুইচ টিপে পাখাটা চালিয়ে দিলেন। তারপর কাছে এসে সামনে ঝুঁকলেন। বিবর্ণ মূর্তি দেখে বিষম ভয় পেয়েছেন। বুকে হাত রাখতে গিয়েও পারলেন না। অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হল ?

জবাব দেবার আগে বিভাস দত্ত বড় করে দম নিতে চেষ্টা করলেন একটা। এবারে নিতে পারলেন। তারপর এক হাত বাড়িয়ে জ্যোতিরাণীর ঝুঁকে-পড়া কাঁধের দিকটা সজোরে আঁকড়ে ধরলেন, অন্য হাতে তাঁর হাত ধরে তাঁকে কাছে টেনে বসালেন। তেমনি অসহিষ্ণু উত্তেজনায় বললেন, ও কিছু না, কদিন ধরে মাঝে মাঝে এ-রকম হচ্ছে। আমার কথার জবাব দাও, এই যন্ত্রণা নিয়ে আমি থাকব কেন ? বাঁচতে চাইব কেন ? শিবেশ্বরের ঘর ছাড়তে হল বলে আমি দুঃখিত হতে চেষ্টা করেছি, তোমার দুঃখটা বড় করে দেখা উচিত বলে নিজেকে আমি চোখ রাঙিয়েছি—পারিনি। এতকাল ধরে ভিতরে যার তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল, সে পিপাসার জল দেখে উল্টে লাফিয়ে উঠেছে। এখনো তুমি তাকে ফেরালে সে কি করবে ? কি করবে ?

শুধু কথায় নয়, তপ্ত নিঃশ্বাসের ঝাপটা লাগছে জ্যোতিরাণীর চোখে-মুখে। সর্বাঙ্গ অবশ পঙ্গু যেন। দুটো হাত নয়, এক উদ্‌ভ্রান্ত তপ্ত বুভুক্ষু যাতনা অমোঘ

আকর্ষণে তাঁকে কাছে ধরে রেখেছে। টেনে রেখেছে। অপ্রকৃতিস্থ জলজলে দুটো চোখ আধ হাতের মধ্যে তাঁর মুখের ওপর স্থির হতে চেষ্টা করছে। বিচলিত আবেগে গলার স্বর কাঁপছে।—জ্যোতিরাণী আমাকে তুমি বাঁচাতে পার না? আমাকে দয়া করতে পার না? আমি কেমন বড় লেখক জান তুমি? বই বিক্রি অর্ধেকের বেশি নেমে গেছে, প্রকাশকরা এখন আর দৌড়ে আসে না, সকলে বলে আমার লেখা পড়ে গেছে। আমি জানি মিথ্যে বলে না, ঠাণ্ডা মাথায় আমি দু ঘণ্টা বসে লিখতে পারি না, ভাল লিখব কি করে? তোমার জন্যে আমার লেখার এই হাল, শরীরের এই হাল, শুধু তোমার জন্যে! তোমার শুকনো কৃতজ্ঞতা দিয়ে আমি কি করব? কৃতজ্ঞতার কোন কাজ আমি করিনি, যেটুকু করেছি নিজের প্রাণের দায়ে করেছি—তোমার ওই স্কুলের চাকরির ব্যবস্থাও আমি করিনি, সব করেছে তোমার মামাশ্বশুর গৌরবিমল—তাদেরই প্রতিষ্ঠানের স্কুল ওটা। আমাকে বলতে নিষেধ করেছিল—আর তোমার কৃতজ্ঞতা চাইনে বলেই বললাম। আমি শুধু তোমাকে চাই, বাঁচতে চাই, তুমি রক্ষা কর, আমাকে বাঁচতে দাও—

দুই হাতের প্রবল তাড়নায় আধ হাতের ব্যবধান ঘুচে গেল। জ্যোতিরাণী নিস্পন্দ তেমনি। বাধা দেননি, বাধা দিতে পারেননি। নিজের অস্তিত্বের বৃন্ত থেকে এক অন্ধ আবেগের আবর্তের মধ্যে খসে পড়েছেন। যে আবেগ এই অস্তিত্বের অণুতে-অণুতে আশ্রয় খুঁজছে, কাঁপছে থরো-থরো। ওই কাঁপুনি জ্যোতিরাণী টের পাচ্ছেন, সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করছেন। অধরে, বক্ষপঞ্জরে, কটিদেশে ন তৃষ্ণার এই উদ্ভ্রান্ত নিপীড়নে সব ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। তারই মধ্যে আশ্রয় খুঁজছে মানুষটা আর কাঁপছে।

জ্যোতিরাণী অসহায়।

কতক্ষণ কেটেছে, একটা যুগের অবসান হয়ে গেল কিনা জানেন না। কাঁপুনি থেমেছে, কিন্তু আশ্রয় পেল কিনা সেই সংশয় এখনো ঘোচেনি। দুটো চোখ তাঁর মুখের ওপর স্থির হয়ে আছে দেখলেন, স্থির কিন্তু সেই দৃষ্টির গভীরে অস্থিরতার ঢেউ। ফিসফিস কথাগুলো বুঝি কানের পর্দা কুরে-কুরে মগজে ঢুকল।

জ্যোতিরাণী, তোমাকে ছেড়ে আমি কোনদিন দূরে যাইনি, এই সতেরো বছরের মধ্যেও যেতে পারিনি। আমি দূরে যেতে চাই না, আমি কোথাও যেতে চাই না। আমি তোমাকে চাই, তোমাকে নিয়ে সংসার গড়তে চাই—গত তিন বছর ধরে এই সংসারের তৃষ্ণা আমাকে পাগল করেছে। এই সংসার পেলে আমি আবার সুস্থ হব, আবার লিখতে পারব, তুমি বলো, বলো—

আস্তে আস্তে উঠে বসেছেন জ্যোতিরাণী। নিজের অগোচরে স্রস্ত বসন সংবৃত

করেছেন একটু। তবু আত্মস্থ হতে সময় লেগেছে। আচ্ছন্নতার ঘোর কাটতে সময় লেগেছে। এখনো কেটেছে কিনা জানেন না। দুটো ব্যগ্র চোখ তাঁর মুখের ওপর আটকে আছে। তাঁকে আগলে রেখেছে, ব্যাকুল তৃষ্ণার তাপ ছড়াচ্ছে।

অনেক—অনেকক্ষণ বাদে কিছু বলেছেন তিনি। কি বলেছেন সঠিক জানেন না। নিজের জ্ঞাতসারে বলেননি যেন। বলেছেল, সে সংসার থেকে কি পাওয়া যাবে···আমাতেই শেষ, নতুন কেউ আসবে না···।

কোন কথা তলিয়ে বোঝার মত মানসিক অবস্থা নয় বিভাস দত্তর। কিন্তু এই উক্তির তাৎপর্য মুহূর্তের মধ্যেই বুঝে নিলেন। প্রথম সন্তান আসার পর অপারেশনের খবরটাও অজ্ঞাত ছিল না তাঁর। জ্যোতিরাণীর এই কথা কটাই সব সংশয় ঘোচার মত, হাতের মুঠোয় অপ্রত্যাশিত ছাড়পত্র পাওয়ার মত। নিবিড় আগ্রহে দু হাত বাড়িয়ে আবার তাঁর কাছ থেকেই তাঁকে ছিনিয়ে আনলেন যেন। বলে উঠলেন, চাইনে, তোমার বাইরে আর কি-চ্ছু চাইনে আমি—কিছু না—বুঝলে ?

সদ্য-পাওয়া আশ্রয়ের উৎস দু হাতে আগলে রেখে তার মধ্যে নিঃশেষে ডুবে যাবার তাড়না, নিঃশেষে হারিয়ে যাবার আকুতি।

জ্যোতিরাণী তেমনি অসহায়। ভবিতব্যের হাতের তিনি কি পুতুল একখানা ?

ডান চোখটা কাঁপছে থেকে থেকে। মাঝের কতগুলো দিন একটা আচ্ছন্নের ঘোরে কেটেছে। আজ হঠাৎ ডান চোখটা কাঁপছে কেন বিকেল থেকে ? তিন রাস্তার ত্রিকোণ জোড়া বড় দালানের এক বৃদ্ধা বলতেন, মেয়েদের ডান চোখ কাঁপলে অশুভ। মন বলে নিজস্ব কিছু আর তো ধরে রাখতে চান না জ্যোতিরাণী, তবু মনে পড়ল কেন ?

কাগজে-কলমে সই হয়ে গেছে। লোকে তাঁকে মিসেস দত্ত বলবে। এখনো কেউ বলেনি। বলবে। খুব নিঃশব্দে মিসেস বিভাস দত্ত হয়েছেন তিনি। জনা-দুই সাক্ষী ভিন্ন বাড়তি কেউ ছিল না। বাড়তি কাউকে চাননি, সেটা মুখ ফুটে বলতেও হয়নি। যাঁর বোঝবার তিনি বুঝে নিয়েছেন। কিন্তু গোপন থাকার ব্যাপার নয়। যাঁর ঘরে এসেছেন তাঁর অন্তরঙ্গ কেউ আছে জানতেন না। দেখা গেল আছেই দু-দশজন। অন্তত এই ব্যাপারের পর সানন্দ আগ্রহ দেখাবার মত কেউ কেউ আছে। তাদের ডেকে একদিন আপ্যায়নের ব্যবস্থা না করলে বিসদৃশ দেখায় শুনেছেন।

বিভাস দত্ত অনুমতি নেবার মত করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। জ্যোতিরাণী

আপত্তি করেননি। তাঁর যাই হোক, একজনের জীবনের উৎসব যে, সেটা অস্বীকার করবেন কি করে ?

লেখকের অন্তরঙ্গজনেরা রাত্রিতে আসছেন। শমী ব্যস্ত, তার কাকু ব্যস্ত। কিন্তু বিকেল থেকে ডান চোখটা কাঁপছে।

তিনি মিসেস দত্ত, জ্যোতিরাণী দত্ত···এ সত্যটায় অভ্যস্ত হতে আর কত দিন লাগবে ? অভ্যস্ত হতে হবে ভাবতেও অদ্ভুত লেগেছে। বসন্ত প্রাঙ্গণের দ্বিতীয় বাসরে পুরুষ এসেছে। তাকে গ্রহণ করতে হয়েছে। একজনের হাসি মিইয়ে যায় দেখেই তাঁকে হাসতে হয়েছে। অতনু-সান্নিধ্যের প্রথম পুরুষ হিংস্র নগ্ন নির্দয় অত্যাচারী ছিল, তুলনায় দ্বিতীয় বাসরের দ্বিতীয় পুরুষের অনেক ভদ্র অনেক সদয় ভীরু সচেতন পদক্ষেপ। অথচ এই দ্বিতীয় অধ্যায়টাই ব্যভিচারের মত লেগেছিল। বিলিতী উপন্যাসে পড়া যুদ্ধ-অঙ্গনের এক নার্সে'র কথা ভাবতে চেষ্টা করেছিলেন তিনি। অকরুণ শীতের হিমেল রাত্রিতে পর্যাপ্ত আচ্ছাদনশূন্য এক আহত সৈনিককে সমস্ত রাত নিজের নগ্ন দেহের তাপ ছড়িয়ে জিইয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিল। সেখানে কোন নীতির প্রশ্ন আঁচড় ফেলে নি। এও তাই। জীবন-যুদ্ধের এক মুমূর্ষুকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনার মতই।

কিন্তু আজ আবার ডান চোখটা কাঁপছে কেন থেকে থেকে ?

···তিন রাস্তার ত্রিকোণ জোড়া বাড়ির কজনে জেনেছে খবরটা ? কালীদা জানেন ? মাঝে তাঁরই সঙ্গে শমীর কাকার প্রীতির সম্পর্কটা আগের থেকে বেশি পুষ্ট হয়ে উঠেছিল। কালো নোটবইয়ে কালীদার সেই লেখাগুলো পড়ার পর এই প্রীতির সম্পর্ক বজায় রাখাটা একেবারে উদ্দেশ্যশূন্য মনে হয়নি জ্যোতিরাণীর।··· কালীদার সঙ্গে নাকি কোথায় দেখা হয়ে গেছল, বিয়ের খবরটা তাঁকে জানানো হয়েছে। বিভাস দত্তর কাছে সবার আগে ও-বাড়িতে পৌঁছে দেবার মতই খবর বটে এটা। জ্যোতিরাণী দোষ ধরেননি। আজকের প্রীতির অনুষ্ঠানে কালীদারও নিমন্ত্রণ হয়েছে নাকি ? জ্যোতিরাণী জিজ্ঞাসা করেননি। তবে মনে হয় না, অতটা নির্দয় হবার সম্ভাবনা কম।

অতীতের যোগ সবই ছিঁড়েছে, তবু কালীদার ওই লেখাগুলো আর তাঁর শকুনিস্তুতি পড়ার অস্বাচ্ছন্দ্য মনের কোথাও লেগেই আছে। খবরটা কালীদা ও-বাড়ির কার কার কানে দিয়েছেন ? সবার আগে ও-বাড়ির মালিকের কানেই দেবার কথা। গম্ভীর মুখে কালীদার সেই খবর দেবার প্রহসন জ্যোতিরাণী কল্পনায় দেখতে চেষ্টা করছেন কেন ?

সেখানকার আর একজনের জানাটা জ্যোতিরাণী বড় আচমকা অনুভব

করেছিলেন। তার আগে ওই ভদ্রলোকও কালীদার কাছ থেকেই শুনেছিলেন নিশ্চয়।...মামাশ্বশুর গৌরবিমল। কি আশ্চর্য। এখন আবার মামাশ্বশুর ভাবছেন কেন! সেই অসহ্য বিড়ম্বনার ছাপ এখনো মুছে যায়নি।

দিন দশেক আগের কথা।

টানা দু মাসের ছুটি নিয়েছিলেন স্কুল থেকে। বিশ দিনও কাটেনি। কপালে সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে কেমন করে আবার ওই স্কুলে সকলের সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন সেই অস্বস্তি মনের তলায় গোপন ছিল। তিনি লম্বা ছুটি নিলেও শমীর স্কুল আছে। ওকে নিয়েই সমস্যা। মাঝে ট্রাম বদল করা আছে। এই কদিন জ্যোতিরাণী ওকে পৌঁছে দিয়ে আসছিলেন। একেবারে স্কুল গেট পর্যন্ত নয়। ট্রাম থেকে নেমে স্কুলের রাস্তার মোড়ে ওকে ছেড়ে দিতেন। ছুটি হলে বিভাস দত্ত নিয়ে আসতেন।

ঘটনাটা ঘটল বিয়ের ঠিক দশ দিনের মাথায়। শমীকে ছেড়ে দিয়ে ডিপো থেকে ফাঁকা ট্রামেই উঠেছিলেন জ্যোতিরাণী। পাঁচ-সাতজনের বেশি লোক ছিল না ট্রামে। পরের স্টপেজে যিনি উঠলেন, দেখা মাত্র জ্যোতিরাণীর হৃৎস্পন্দন থেমে যাওয়ার উপক্রম।

গৌরবিমলবাবু।

লেডীস সীট ছাড়িয়ে সামনে বসেছেন, তারপর খেয়াল হতে ফিরে তাকিয়েছেন। ধরণী দ্বিধা হলেও জ্যোতিরাণী তখন বাঁচতেন বোধ হয়।

গৌরবিমল চেয়েই রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর ঘুরে বসলেন আবার। গম্ভীর ঠাণ্ডা দু চোখ সামনের দিকে ফেরালেন। তাঁর এত গম্ভীর নিস্পৃহ মুখ জ্যোতিরাণী আর দেখেননি।...টিকিটের পয়সা দেবার জন্য ভদ্রলোক পকেটে হাত ঢুকিয়েছেন দেখলেন। পয়সাও বার করলেন। কিন্তু সামনেই স্টপেজ আর একটা।

গৌরবিমল উঠে পড়লেন। দু সারির সরু ফাঁক দিয়ে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এলেন। আর ফিরেও তাকালেন না। চেনেন না কাউকে। চেনার ইচ্ছেও নেই। কণ্ডাক্টরের হাতে পয়সা গুঁজে দিয়ে ট্রাম ভাল করে থামার আগেই নেমে গেলেন।

জ্যোতিরাণীর সমস্ত মুখ লাল। কানের দু পাশ গরম ঠেকেছে। নিশ্চল বসেছিলেন তিনি। তার পরেই মনে পড়েছে, ওই ভদ্রলোকের অনুকম্পাতেই সাড়ে তিন বছর ধরে স্কুলের চাকরি করছেন তিনি। অনায়াসে সহকারী হেডমিস্ট্রেস হতে পেরেছেন।...ছুটির পরে আবার তাঁরই দেওয়া অনুগ্রহের মধ্যে ফিরে যেতে হবে।

আবার একটা বড় বোঝা যুঝতে হল নিঃশব্দে। বোঝার অবকাশ কম বলে আরো মুশকিল। ততোখানি চেষ্টা করেই ঠোঁটের ডগায় হাসি ফোটাতে পারলেন জ্যোতিরাণী। মাথাও নাড়লেন একটু। আপত্তি নেই। বললেন, এর পর ওমর খৈয়ামের লুকোনা ফটো দুটোও টাঙাবে নাকি?

বিভাস দত্ত অপ্রস্তুত কয়েক মুহূর্ত। বিস্ময় আর খুশির আতিশয্যে আটখানা তারপর!—ও ছবির খবর তুমি কি করে জানলে? এর মধ্যে বইটা খুলেছিলে বুঝি?

এর মধ্যে নয়, বছর আটেক আগে। ওই ফটো যেদিন দেয়ালে দেখেছিলাম, সেদিনই।

কি কাণ্ড! আর আমি বোকার মত ও দুটো তোমার চোখের আড়ালে রাখার জন্য আগলে আগলে বেড়াচ্ছিলাম।

বোকামির অবসান করে নেবার আগ্রহেই যেন আলমারি খুলে ওমর খৈয়ামের ফাঁক থেকে ফটো দুটো বার করলেন। তারপর নির্নিমেষে একবার দেখে নিয়ে তাঁর সামনে ধরলেন। ওই ফটো দুটোর নীচে লিখে রেখেছেন কিছু, তাই দেখালেন।

জ্যোতিরাণী দেখলেন। পড়লেন। একটার নীচে লেখা, "বিশ্বের পালনী শক্তি নিজ বীর্যে বহ চুপে চুপে, মাধুরীর রূপে।" অপরটার নীচে লেখা, "আমার মন চুরি গেছে, মন চুরি যাবার পর দু' চোখ তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তুমি কোথায়?"

ফটো দুটো হাতে নেননি জ্যোতিরাণী, বিভাস দত্তর হাত থেকেই দেখেছেন, পড়েছেন। শরীরের ভিতরটা কেমন সিরসির করছে তাঁর। নিজের অগোচরে এখনো বুঝি কোথাও একটা প্রতিরোধ বাসা বেঁধে আছে—সেটাতে ধাক্কা লাগছে।

হাল্কা মেজাজে বিভাস দত্ত আবার বললেন, সত্যি, এই চুরির কথা এতদিন ধরে জানতে তুমি?

জ্যোতিরাণী হাসলেন। হাল্কা কথার হাল্কা জবাবই দিলেন।—শুধু আমি কেন, শমীও জানত। ছেলেমানুষ, এত দিনে ভুলে গেছে। লজ্জা পেতে না চাও তো আর কোথাও সরিয়ে রেখে দাও, টাঙিয়ে কাজ নেই।

লঘু প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলেন বিভাস দত্ত। বাধা পড়ল।

মাসী, মাসী!

শমীর এই উত্তেজিত গলা কানে আসার সঙ্গে সঙ্গে কি-এক ষষ্ঠ চেতনা তাঁকে বলে দিল কি হতে পারে, কেন ওভাবে ডাকতে ডাকতে এমন হন্তদন্ত হয়ে আসছে শমী। এতটা উত্তেজিত না হলেও ওর এই গোছের আচমকা ডাক আগে আরো

বারকয়েক শুনেছেন। কিন্তু আজ বুকে যেন হাতুড়ির ঘা পড়ছে জ্যোতিরাণীর।

মাসী, সিতুদা! সিতুদা নীচের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে!

বিমূঢ় মুখে বিভাস দত্ত শমীর দিকে তাকালেন, তারপর জ্যোতিরাণীর দিকে। তার পরেই কর্তব্য স্থির করে তাড়াতাড়ি বললেন, কই? চল্ ডেকে নিয়ে আসি—

বেরিয়ে গেলেন। তাঁর পিছনে শমীও।

জ্যোতিরাণী স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে। শুধু তিনিই জানেন, এই বাড়িতে ঢোকার জন্তে ও এসে দাঁড়ায়নি। ডাকলেও আসবে না। কাছে গিয়ে ডাকার সুযোগও দেবে না।

॥ আটত্রিশ ॥

সিতু জ্বলতে জ্বলতে ফিরে গেল।

নেমে এসে কলা দেখবে। দোতলা থেকে বিভাস কাকা তাকে দোতলায় চলে আসতে বলছিল। অশ্লীল গোছের একটা কটূক্তি করে রাগের মুখে সিতু হঠাৎ নিজের মনেই হেসে উঠল একটু।···বিভাস কাকা বলবে না বিভাস বাবা বলবে এখন? মরুক গে। বিভাস কাকার হাসি-হাসি মুখ দেখেই তার পিত্তি জ্বলে উঠেছিল। তার ওপর কিনা তাকে ওপরে ডাকার সাহস! ওই বজ্জাত মেয়েও বেড়ালের মত মুখ করে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল আর দেখছিল তাকে। ওর ওই ড্যাবডেবে চোখ দুটোও গেলে দিতে ইচ্ছে করছিল। কাকাকে ডেকে নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল, যেন ওদের দেখতেই গেছল সিতু। শমীকে যাও সহ্য করতে পারত ওর কাকাকে সহ্য করা অসম্ভব। সিতু আসছে না দেখে বিভাস কাকা হাত তুলে তাকে অপেক্ষা করতে বলে নীচে নেমে আসছিল নিশ্চয়। আপ্যায়ন করে ভিতরে নিয়ে যাবার ইচ্ছে। এই ইচ্ছের মনের মত জবাব দেওয়া সম্ভব নয় বলেই সিতু চলে এসেছে। সামনে পেলে কি আবার করে বসত রাগের মাথায় কে জানে। বয়েস সতেরো পেরোতে চলল, আই. এসসি পড়ছে, আর দু দিন বাদে সেকেণ্ড ইয়ার হবে—তবু সব তছনছ করে ওলট-পালট করে দেবার সেই ছেলেবেলার আক্রোশ যেন মাথায় উঠে দপদপ করতে থাকে।

···শমীটা একলা থাকলেও ও কিছুক্ষণ দাঁড়াত হয়ত। দেখতে এসেছিল অবশু মা-কেই—না মা ভাবছে কেন, দেখতে এসেছিল 'ওই একজনকে'। বিয়ের ব্যাপারটা স্পষ্ট করে বোঝার পর মাকে চিন্তার মধ্যেও 'ওই একজন' বলা শুরু

করেছে। ছ মাসে ন মাসে বছরে হঠাৎ-হঠাৎ যেমন এক-একদিন হয়, তেমনি হয়েছিল। মাথায় আগুন জ্বলে। তখন মা-কে দেখতে ছোটে। ভস্ম করতে ছোটে। কিছুই করতে না পেরে দ্বিগুণ আক্রোশে ফেরে। আবার হাসিও পায় এক-এক সময়ে। বয়েস হয়েছে, বুদ্ধি পেকেছে, তাই নিজেরই মনে হয় মা-রোগে পেয়েছে ওকে। কিন্তু রোগটা চাড়িয়ে ওঠে যখন তখন আর বয়েস বুদ্ধি বিবেচনা কিছুই নিজের বশে থাকে না। তখন আর ছুটে না বেরিয়ে পারেই না।

আজকের আসার তাড়নাটা আগের থেকে অনেক বেশীই ছিল। তবু শমীটাকে খারাপ লাগেনি খুব। বাদামী ডুরে শাড়ি পরেছে আজ। শাড়ি-পরা শমীকে এই প্রথম দেখল। বেশ মেয়ে-মেয়েই লাগছিল। কোঁকড়া চুলের একদিক গলার পাশ দিয়ে বুকের যেখানটায় এসে ঠেকেছিল, সেদিকটা বেশ ভাল করে দেখার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু একটু হাঁ করে চেয়ে থেকেই পাজী মেয়ে ছুটে গিয়ে কাকাকে ডেকে নিয়ে এলো। তোর কাকা সব করবে আমার। ছুটে যখন চলে গেল তখনও খারাপ লাগেনি, শাড়ির আঁচল খসে গেছল—ওদিক ফিরে দৌড়েছিল বলেই ভাল দেখতে পারেনি।

মেয়েদের নিয়ে এখন তার বিশ্লেষণ অনেক পাকা-পোক্ত। শাড়ি পরে এখনই যেমন দেখাচ্ছিল, আর একটু বড় হলে ওটা না ধুমসি হয়। ওই একজনের কাছে একলা আদর পাচ্ছে, দিব্যি খাচ্ছে-দাচ্ছে, মোটা হবে না কেন? মায়ের ওপর ওর একলার দখল মনে হতেই রক্ত আবার গরম হয়ে উঠল সিতুর। মাকে নির্মম রকমের কিছু একটা আক্কেল দেবার সুযোগ পেলে ও আর কিছু চায় না। গেল কটা বছর ধরে এই আক্রোশই পুষছে সে। এত বড় হয়েছে, পাড়ার সমবয়সীরা ছেড়ে বড়রাও সমীহ করে তাকে এখন। কলেজের ছেলেরা তাকে তোয়াজ-তোষামোদ করে চলে, মাথা খেলানোর ব্যাপারে ওস্তাদ ভাবে তাকে। কিন্তু মায়ের ওপর আক্রোশ মেটাবার রাস্তাটা অনেক মাথা খাটিয়েও পেয়ে ওঠে না। আজ হঠাৎ একটা বুদ্ধি ঝিলিক দিয়ে গেল মাথায়। ওই শমীটার কিছু একটা প্রচণ্ড রকমের ক্ষতি করে বসতে পারলে মা জব্দ হতে পারে। শমীর তো শাস্তি পাওনাই, একলা আদর খাওয়ার শোধ নেবার সঙ্কল্প সেই ক' বছর আগে থেকেই ঠিক করা ছিল—সিতুকে যখন স্কুল-বোর্ডিংএ পাঠানো হয়েছিল, তখন থেকে। ওকে শাস্তি দিতে পারলে মায়ের ওপরেও মোক্ষম শোধ নেওয়া হবে মনে হতেই বেশ একটা ক্রুর উদ্দীপনা বোধ করল। এই উদ্দীপনার মুখে বড় হবার কথা, বুদ্ধি-বিবেচনার কথা কিছুই আর মনে থাকল না। ছেলেবেলায় পায়ের তলার চেয়ার সরিয়ে নিয়ে ওর থুতনি কেটে দুখানা করে দিয়েছিল, সেই

কাটা দাগ চিবুকটাকে এখনও দু ভাগ করে রেখেছে। এবারে আর চেয়ার সরিয়ে নয়, হাতে পেলে দাঁতে করেই ওখানটা আবার ডবল করে ছিঁড়ে দিতে পারে সে। মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিশোধের নেশাটা মগজ থেকে নেমে শরীরের পেশীর ভিতর দিয়ে, শিরাগুলোর ভিতর দিয়ে হাড়ের ভিতরে ছড়াতে লাগল। ট্রাম-বাসে উঠতে ভুলে হেঁটেই চলেছে। রাস্তার এত লোকজন গাড়ি-টাড়ি কিছু চোখেও পড়ছে না, তার সামনে শুধু দুটো মুখ। মায়ের আর শমীর। শাড়ি-পরা শমীর।

গত কয়েকদিন ধরে বাড়ির বাতাসের রকমফের টের পাচ্ছিল সিতু। ও যে কি করে টের পায় বাড়ির কারও ধারণা নেই। এমন কি অত সেয়ানা জেঠুরও না। একটা সুবিধে বাড়ির সকলে তেমনি ছেলেমানুষই ভাবে ওকে। জেঠুও বাবাও, আর ছোট দাদুর তো কথাই নেই। আরও সুবিধে, ওই মেঘনা বজ্জাত আর ছোট দাদু ছাড়া কারও চোখই নেই তার ওপর। চোখ থাকলেও এখন কাউকে পরোয়া করে না। তবু নেই যে সেটা আরও ভাল। তাছাড়া ছোট দাদু বছরে কটা মাসই বা থাকে এখানে। যাই হোক, কুকুরের মত বাতাস টেনে বাড়ির বাতাস বুঝতে পারে সে। অন্তত গণ্ডগোল কিছু হলে টের পায়। তারপর কি গণ্ডগোল সেটা বার করতে আর কতক্ষণ? ঠিক-ঠিক কিনা জেনেছে সে, মা বাবার নামে উকীলের নোটিশ পাঠিয়েছিল জেনেছে, মা কখন কোথায় বাস করছে জেনেছে, বাবার ডাইভোর্সের মামলার খবর জেনেছে, কোর্টের রায়ের খবর জেনেছে—আর এখন কি নিয়ে বাড়ির বাতাস অন্যরকম তাও ঠিক টেনে বার করেছে।

···কদিন ধরে জেঠু ছোট দাদুকে কি যেন ফিস-ফিস করে বলে লক্ষ্য করছিল। এখন আর ছেলেমানুষটি নয় যে আড়ি পেতে শুনবে। শোনার ব্যাপারে অনেক রকম বয়সোচিত ছল-চাতুরির রাস্তা নিতে হয়। ভোলা তার খুব পেয়ারের লোক হয়েছে এখন। এজন্যে ব্যাটা কম পয়সা খায় না ওর থেকে। কাজের অছিলায় হঠাৎ-হঠাৎ ঢুকে কি ঘটছে না ঘটছে ও-ই অনেক সময় সুতো ধরিয়ে দেয়। এই শেষের ব্যাপারটা অন্তত দিয়েছিল। জেঠুকে একরকমই দেখত সিতু, কিন্তু ছোট দাদুকে হঠাৎ বড় বেশীরকম গম্ভীর মনে হয়েছিল তার। আর বাবার মুখের চেহারাও হঠাৎ কি রকম যেন হয়ে গিয়েছিল। কদিন বাড়ি থেকে বেরোয়নি, হঠাৎ মৌনী নিয়েছে মনে হচ্ছিল।

সন্দেহ দানা বেঁধে উঠতে সিতু আবার সময় আর সুযোগের প্রত্যাশায় ছিল। এরকম হলেই সে অবধারিত ধরে নেয় মায়ের ব্যাপারে বা মাকে নিয়ে কিছু ঘটেছে। জেঠু বাড়ি না থাকলে তখন নিরিবিলি অবকাশে তার ঘর তল্লাসী শুরু

করে দেয় সে। আলমারি খোলে, তালা-বন্ধ ড্রয়ার খোলে, সুটকেস খোলে। এই বাড়ির সব কিছুই তার নখদর্পণে এখন। অফিসে বেরুবার সময়েই শুধু জেঠু এ-পকেট ও-পকেট বা বিছানার তলা থেকে হাতড়ে চাবি নিয়ে যায়। বিকেলের দিকে বা অন্য সময়ে বেরুলে এক জায়গায় রাখা চাবি স্বাভাবিক আর এক জায়গায় সরিয়ে রাখলেই হল। তখন আর খোঁজ পড়বে না। তাছাড়া ফিরতে দেরি হলে জেঠু যাকে সামনে পায় তাকে বলেই যায় দেরি হবে। কখন আবার বাবার ডাকাডাকি শুরু হবে সেই জন্যেই জানান দিয়ে বেরোয় বোধ হয়। আর বাবার চাবির গোছার বাসস্থান তো বিছানার তলায়। ওটা বাবার সঙ্গে সঙ্গে কমই ঘোরে। তবে চাবি বলতে জেঠুর চাবির ওপরেই লোভ সিতুর। বিশেষ করে বাড়ির এই গোছের হাওয়া বদল দেখলে। বাবার চাবির প্রয়োজন শুধু টাকার দরকার হলে। সিন্দুকে বোঝাই নোট আছে. আলমারিতেও কম নেই। টাকা দেখলে এখন আর সিতুর সে-রকম একটা উত্তেজনা হয় না। দু-চারখানা করে নোট সরাতে হাতও কাঁপে না।

জেঠুর ড্রয়ার বা সুটকেস খুলে এবারে একটা জিনিসেরই সন্ধান পেতে চেষ্টা করেছিল। সেই কালো মোটা বাঁধানো ডায়েরী বইটা। মাস আষ্টেক আগে যেটা হাতে পেয়ে তার বিস্ময়ের অন্ত ছিল না। সেটা পড়ে জেঠুকে ভারী মজার মানুষ মনে হয়েছিল তার। জেঠুর হাতে ওই বস্তুটা অনেকদিনই দেখেছিল। আর ওটার সম্পর্কে একটু য়েন কৌতূহলও ছিল বাড়ির লোকের। জেঠু যে ওটা খুব সাবধানে রাখত তাও টের পেত। কিন্তু মা চলে যাবার পর আর সব কিছু ছাড়া-ছাড়া হয়ে যাবার পর জেঠু আর ওটা সেভাবে আগলে রাখার দরকার বোধ করেনি বোধ হয়। নইলে ডাইভোর্সের কাগজপত্র দেখার লোভে তাঁর দেয়াল-আলমারি খুলেই ওটা হাতে পেয়েছিল কেন? হাতে পেয়েও অত লেখা পড়ার ধৈর্য থাকত কিনা সন্দেহ। কিন্তু প্রথমেই মহাভারতের শকুনির ওপর জেঠুর অত টান দেখে অদ্ভুতই লেগেছিল। আর তারপর যত পাতা উল্টেছে ততো চমক। একের পর এক গোগ্রাসে গিলেছে। এক-একটা লেখা ভাল করে বোঝার জন্য অনেক বারও পড়তে হয়েছে। বাবা যে মাকে বিয়ের আগে দেখেছিল আর তারপর বিয়ে করার জন্য ক্ষেপে উঠেছিল সেটা তার কাছে একটা খবরের মত খবর। ছোট দাদুর সম্পর্কে কি সব লিখে রেখেছে জেঠু, সেটা তেমন স্পষ্ট হয় নি। মাকে বিয়ের আগেও ছোট দাদুর ভাল লাগত বোঝা যায়, সে তো এখনও লাগে নিশ্চয়—কিন্তু সেজন্যে ছোট দাদুকে জেঠু মরতে লিখেছে কেন ঠিক বোঝা গেলই না। সবই বোঝার মত পাকা-পোক্ত সে ঠিকই হয়েছে, কিন্তু এই দুজনকে

কাছাকাছি আনার চিন্তাটা তার মনে আসেনি। তারপর যত এগিয়েছে ততো বিস্ময়, ততো রোমাঞ্চ। মিত্রা মাসীর সঙ্গে জেঠুরই তাহলে দিব্যি জট-পাকানো ব্যাপার ছিল একটা! আর তারপর মা-কে নিয়ে বাবার এ কি সব অদ্ভুত অদ্ভুত সন্দেহের কাণ্ড! জেঠু, ছোট দাদু, বিভাস কাকা কাউকে সন্দেহ করতে বাকি রাখে নি বাবা! এমন সন্দেহ যে দাদু বাড়ি থেকে তাড়িয়েই দিল বাবাকে! ও হবার আগে আর পরে মায়ের ওপর বাবার অত অত্যাচারের ফিরিস্তি পড়ে বাবার ওপর রাগ হয়েছিল, আর নিজের অজ্ঞাতেই মায়ের ওপর সদয় হয়ে উঠেছিল সিতু। ও জন্মাবার আগে মা তো মরেই যেতে পারত দেখছে! কিন্তু তার পরেই মনে পড়েছে, মা নেই, মা এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে—আর আসবে না। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিগুণ ক্রুদ্ধ। বাবা ঠিক করেছে, আরও করা দরকার ছিল।...কিন্তু তারপর মিত্রা মাসীর এ কি কাণ্ড! কাণ্ডটা যোল আনা ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে নয়, তবু যতটুকু বুঝেছে তাতেই অদ্ভুত অস্বস্তি। মিত্রা মাসীকে কোনদিন দুচক্ষে দেখতে পারে পারে না সে। মা চলে যাবার পর আরও চক্ষুশূল হয়েছিল। হাসিমুখে আসত, ওকে আদর করতে চেষ্টা করত, বাবার ঘরে ঢুকত। একদিন মায়ের ঘরেও গিয়ে জাঁকিয়ে বসেছিল যখন তখন তো ধাক্কা দিয়ে বার করে দিতে ইচ্ছে করেছিল সিতুর। নোটবইটা হাতে পাবার অনেক আগেও বাবার সঙ্গে মিত্রা মাসীর সেই হঠাৎ-ভাব দেখে রাগ হত সিতুর। মিত্রা মাসীকে আরও খারাপ লাগত তখন। জেঠুর এই লেখা পড়েছে যখন তার স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়া সারা, মা-কে ঠকিয়ে বাবার সঙ্গে মিত্রা মাসীর বিলেত যাওয়ার তাৎপর্য খুব দুর্বোধ্য ঠেকে নি তাই। আরও স্পষ্ট হয়েছে জেঠুর পরের লেখাগুলো থেকে। মায়ের প্রতি সমবেদনা এসেছে আবার। আর তক্ষুনি সেটা নির্মূল করেছে। যাই করুক বাবা, মা কেন যাবে এখান থেকে, কেন আসবে না? জেঠুর শেষ লেখাটা পড়ে খুব মজা লেগেছে তার। যেটাতে তার কথা আছে। বাপের ছেলে ভাবলে রাগ হয়, মায়ের ছেলে ভাবলে ভাল লাগে নাকি। আর সেয়ানা বটে জেঠু, শমীটার দিকে ও ওই বয়সে কিভাবে তাকাতো তাও লক্ষ্য করেছে! কিন্তু সব থেকে আশ্চর্য লেগেছিল তার জেঠুর লেখাগুলোই। সেগুলোর ভিতরে যেন জেঠুর কি একটা মন ছড়িয়ে আছে যার অনেকখানি ধোঁয়াটে তার কাছে, অথচ বেশ ধারাল গোছের কিছু একটা আছে তার তলায়। প্রত্যেকটা লেখার পিছনে দাঁড়িয়ে জেঠু যেন হাসছে মুখ টিপে, অথচ সে হাসির সবটুকুই কৌতুক নয়।

বাড়ির এবারের হাওয়া-বদল অনুভব করে সিতু হদিস মেলার মত অন্য কাগজপত্র না পেয়ে ওই ডায়েরীটাকেই খুঁজল তন্নতন্ন করে। কি ঘটেছে জেঠু,

হয়ত ওতেই লিখে রেখেছে। ওটা যে ততদিনে মায়ের কাছে চালান হয়ে গেছে তার ধারণা নেই। ওর চোখে ধুলো দিয়ে কোথায় ওটা রাখা সম্ভব ভেবে পেল না। ফলে কৌতূহল বাড়ল আরও। ওদিকে বাবার ঘরের টেলিফোন ধরেও সেদিন কম অবাক হয়নি। ওধারে কথা বলছিল মিত্রা মাসী, বাবা নেই শুনে জেঠুর খোঁজ করল মিত্রা মাসী। জেঠু ছিল। ডাকবে কিনা জিজ্ঞাসা করতে তাড়াতাড়ি বলল, ডাকতে হবে না। তারপরেই হেসে জিজ্ঞাসা করল, তোদের নেমন্তন্ন-টেমন্তন্ন হয়নি কোথাও?

সিতুর মাথায় ঢোকেনি কিছু জবাব দেবে কি। মা চলে যাবার পরে গোড়ায় গোড়ায় মিত্রা মাসী তার সঙ্গেই সব থেকে বেশী ভাব করতে চেষ্টা করেছে। বাড়িতে ধরে নিয়ে গিয়ে খাইয়েছে পর্যন্ত। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে মায়ের সম্পর্কে কত কথা জিজ্ঞাসা করেছে ঠিক নেই। তখনো অকারণেই গা জলত সিতুর। জেঠুর ওই লেখাগুলো পড়ার পর তো সামনাসামনি দেখা হলেও মুখ ফিরিয়ে চলে যেতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু ফোনের কথাগুলো শুনে সেদিন মনে হয়েছিল, ওকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে মিত্রা মাসীর কিছু খবর জানার ইচ্ছে। হেসে নেমন্তন্নের কথা বলার পরেই গলা খাটো করে জিজ্ঞাসা করেছে, হ্যাঁ রে, তোর মায়ের কিছু খবর-টবর এসেছে? সিতু চুপ করে ছিল, আর মিত্রা মাসী আরও আপনজনের মত বলেছে, বল্ না, মাসীর কাছে লজ্জা কি—

কিছু একটা ঘটেছে সিতু তক্ষুনি ধরে নিয়েছে। জানার কৌতূহলও কয়েক গুণ বেড়েছে। তবু মিত্রা মাসীর মুখে মায়ের নাম শুনেই তার মাথা গরম। সেও যে কলেজে পড়ছে, ছেলেমানুষ নয়, সেটা বুঝিয়ে দেবার ইচ্ছে। জবাব দিয়েছে, আমি কিছু জানি না, অত করে জানতে চাও যখন, ধরে থাকো, জেঠুকে ডেকে দিচ্ছি।

যা আশা করছিল তাই ঘটল তক্ষুনি। জেঠুকে যে কতখানি ডরায় সিতুর জানতে বাকী নেই। নইলে এতদিনে নিজের বাড়ি ছেড়ে হয়ত এ বাড়িতেই থাকা শুরু করত মিত্রা মাসী। ফোন ছাড়তে পারলে বাঁচে।—না না, ডাকতে হবে না, অনেকদিন খবর-টবর পাই না তাই জিজ্ঞেস করছিলাম। তুই তো ভুলেও আসিস না আজকাল, আসিস একদিন, বুঝলি?

ফোন ছেড়ে সিতু হাসতে গিয়েও হাসতে পারেনি।···মায়ের কি খবর জানতে চায়? তার আগে নেমন্তন্ন-টেমন্তন্নর কথা কি বলছিল? ছোট দাদুর সঙ্গেই বা জেঠুর চুপি চুপি এত কি কথাবার্তা চলছে? জেঠু সেদিন বাবার ঘরে গিয়েও খানিকক্ষণ ধরে কি কথাবার্তা বলে মিটিমিটি হাসতে হাসতে বেরিয়ে এসেছিল।

আর তারপর থেকেই বাবাকে বেশ অন্যরকম দেখছে সিতু। অনেক রাত পর্যন্ত খুব মদ চালাচ্ছে। ভোলাকে ততক্ষণ পর্যন্ত দোরগোড়ায় ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। মোট কথা, বাড়ির বাতাস রীতিমত গোলমেলে লেগেছে আবার।

তারপর গত সন্ধ্যার পরে ভোলার দৌলতে ব্যাপারটা টের পেয়েছে। ইশারায় তাকে ডেকে ভোলা নীচের এক নিরিবিলিতে চলে গেছল। চাপা উত্তেজনায় তার দু চোখ কপালে। বলেছে, বউদিমণি আবার বিয়েয় বসেছে গো ছোট মালিক, বিভাসবাবুর সঙ্গে—আমি নিজের কানে শুনলাম—

ফ্যাল-ফ্যাল করে সিতু ভোলার মুখের দিকে চেয়ে ছিল খানিক। আর তারপরেই যা ঘটে গেল তার জন্য ও নিজেও প্রস্তুত ছিল না, ভোলাও না। আচমকা প্রচণ্ড একটা চড় খেয়ে 'ও বাবা গো' বলে ভোলা তিন হাত দূরে গিয়ে বসে পড়ল। তার পরেও ছোট মালিক আবার ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য এগিয়ে আসছে দেখে চোখের নিমেষে উঠে প্রাণ নিয়ে পালাল সে।

সিতু দোতলায় উঠে এলো। সামনেই মেঘনা। এধারের ঘরে ছোট দাদু আর জেঠু। বাবার ঘরে এতক্ষণে যে লোকটা বসেছিল চলে গেছে, কিন্তু বাবা ঘরেই আছে। মাথায় হঠাৎ যে আগুন জ্বলে উঠেছে সেটা নেভাবার মত নিরিবিলি একটা জায়গা খুঁজছে সিতু। এই তিন বছর ধরে সে বাবার পাশের ঘরে, অর্থাৎ, মা যে ঘরে থাকত সেই ঘরে থাকে। কিন্তু ওদিকে যেতেই ভাল লাগল না। ঠাকুমার ঘরে গিয়ে ঢুকল। বসল। ভোলা কি বলল ভাবতে চেষ্টা করল।

ঘণ্টাখানেক বাদে মেজাজ বশে এলো। হঠাৎ মাথার মধ্যে এ-রকম হয়ে গেল কেন নিজেই জানে না। ভাল করে শোনা বা জানার আগে ভোলাটাকে মেরে বসল। এ বাড়িতে ও-ই সব থেকে অনুগত। আর বলবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু ব্যাপারটা ভাল করে না জানা পর্যন্ত স্থির থাকে কি করে। আবার তারই খোঁজে চলল।

দূর থেকে তাকে দেখেই ভোলা সচকিত। পালাবার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু তার আগেই ভরসার কারণ ঘটল। অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তিযোগের আশ্বাস। ছোট মালিক তাকে দশ টাকার একটা নোট দেখাচ্ছে। এক টাকা দু টাকা পেয়ে অভ্যস্ত, দশ টাকা অবিশ্বাস্য।

তার কাছ থেকে যেটুকু শোনার সিতু শুনেছে। সন্ধ্যায় বিক্রমবাবু এসেছিল। কয়েক গেলাস করে দুজনেই সাবাড় করেছে। ভোলা দরজার ধারে মোতায়েন ছিল, আর দরকার মত সোডার বোতল খুলে দিয়ে আসছিল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ভোলা বাবুকে বলতে শুনেছে, বউদিমণি বিভাসবাবুকে বিয়ে করেছে।

রাতটা ভাল ঘুম হয়নি। বাবা ঘরে না থাকলে বোতলের জিনিস সেও খানিকটা গলায় ঢেলে আসত। মাঝে-সাঝে এই কর্ম করেও থাকে। প্রথমে বিচ্ছিরি লাগে, গলা বুক জ্বলে। তারপরে মন্দ লাগে না। সজারু-মাথা সুবীরের সেই নেশার পর্ব এখনো আছে। হোমিওপ্যাথি শিশির নস্তির কাল গেছে, বিড়ি-সিগারেট ছেড়ে পয়সা হাতে থাকলে মাঝে মাঝে গাবদা চুরুট টেনে দেখায়। তার কাছে জাহির করার জন্তেই বাবার বোতল থেকে সিতুর প্রথম মদ গলায় ঢালা। শুনে প্রায় হার মেনে তাকেও একটু খাওয়াবার জন্ম ধরেছিল সুবীর। সিতু বাবার বোতল থেকে খাওয়াতে না পারলেও দোকানে নিয়ে গিয়ে দুই-একদিন খাইয়েছে। সেই প্রসাদ থেকে চালবাজ তুলুও বাদ পড়েনি।

পরদিন কলেজ পালিয়ে মায়ের আগের স্কুলে এলো সে। গেটের বাইরে দারোয়ানকে ডেকে খোঁজ নিয়ে জানল মা এখানে নেই। কি এক ঝোঁক ঘেড়েই চলল সিতুর। ভেবে-চিন্তে বিভাসকাকার পুরনো বাড়িতে এলো। সেখান থেকে তার ফ্ল্যাটের সন্ধান মিলেছে।

তারপর ওই ফ্ল্যাটের সামনে এসেও না দাঁড়িয়ে পারেনি। যাকে দেখতে এসেছিল তার দেখা মেলেনি। শমী আর তার কাকাকে দেখে এসেছে। ওকে ডাকার অর্থই মা ভিতরে আছে। অর্থ হোক না হোক, ভিতরে যে আছে তাতে একটুও সন্দেহ নেই। বাড়ি ফেরার পরেও দুর্বার আক্রোশটা ঘুরে-ফিরে শমীর ওপর। শাড়ি-পরা শমীর ওপর। ওকে ঢিট করতে পারলে মায়ের ওপর শোধ নেবার সাধ মেটে।

স্কুল ফাইনালে স্টার পেয়ে পাস করার পর সিতু নিজস্ব একটা ছোট গাড়ির দাবি পেশ করেছিল। দাবিটা বাবা আর জেঠুর কানে তোলার জন্ম জানানো হয়েছিল ছোট দাদুকে। খেতে বসে ছোট দাদু জেঠু আর বাবার কানে কথাটা তুলেছিল বটে, কিন্তু সে-রকম গুরুত্ব দিয়ে নয়। ভাল পাস করার জন্ম এদের সকলকেই একটু খুশি-খুশি দেখেছিল সিতু। কিন্তু সিতু কাউকে খুশি করার জন্ম পরীক্ষার এক বছর আগে থেকে আদা-জল খেয়ে লাগেনি। ভাল পাস করে শুধু একজনকেই জব্দ করার ইচ্ছে ছিল, যে এ-বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। তাকে দেখানোর ক্রুদ্ধ তাগিদ ছিল, ভাল সে ইচ্ছে করলেই করতে পারে। তাই দেখিয়েছে। এদের খুশি হবার কথা ভাবেওনি। তবু হলই যখন, সেটা কাজে লাগানোর ইচ্ছেটাই প্রথমে মনে এসেছিল।

বাবা আপত্তি করত না হয়ত। করবে কেন, কত টাকা আছে বাবার সে

আর তার জানতে বাকী নেই। কিন্তু জেঠু সাফ না করে বসল। বলল, গাড়ির সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে না। অ্যাক্সিডেন্ট লেগেই আছে—

মুণ্ডু আছে। মনে মনে জেঠুর মুণ্ডুপাতই করেছিল সিতু। ভিতরটা অবিরাম ছোটাছুটি করছে। আধ ঘণ্টা এক জায়গায় একভাবে থাকতে ইচ্ছে করে না। নিজের একটা গাড়ি হাঁকিয়ে ছুটিয়ে বেড়াতে পারলে ভাল লাগত। ছোট দাদু ঠাট্টা করেছিল, হাত তো কম বাড়ায়নি দেখি, এরই মধ্যে গাড়ি চাই!

তার হাত বাড়ানোর সঠিক খবর এঁরা কেউ রাখেন না। গাড়ি চোখে ধুলো দিয়ে ঢেকে রাখা সম্ভব হলে কাউকে না জানিয়েই কিনে ফেলার কথা ভাবত সে। মা চলে যাবার পর রাগের বশেই একদিন তার আলমারি খুলেছিল। থাকে-থাকে অত টাকা দেখে প্রথম দু'দিনই যা দোটানার মধ্যে পড়েছিল। খরচ করতে করতে খরচের হাত বেড়েছে। ঝোঁকের মাথায় টাকা নিয়ে খরচ করেছে, যে নেই তার ওপর আক্রোশেও। শেষে আলমারির সব টাকাই অন্যত্র সরিয়ে রেখেছে, পাছে বাবা বা আর কেউ সন্ধান পায়। তখন মনে হয়েছিল ও টাকায় সারা জীবনের হাতখরচ চলে যাবে। কিন্তু এই ক'বছরের মধ্যে অর্থাৎ স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার আগেই সে টাকা শেষ। পরীক্ষার পর টাকা আরও বেশী দরকার হয়েছে। মায়ের এক বাক্স গয়না আছে দেখে রেখেছে। ওগুলোকেও নির্মূল করার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু কি যে হল, পারা গেল না শেষ পর্যন্ত। ওগুলো যেমন ছিল তেমনি আছে।

চাইলে জেঠুর কাছে যা পায় সে টাকা নস্যি। অতএব তাঁর অনুপস্থিতিতে সুযোগ মত একদিন সরাসরি বাবাকে বাজিয়ে দেখেছিল। সুফলই পেয়েছে। বাবা তখন নীচে তাঁর বসার ঘরে কি কাজে ব্যস্ত। সোজা গিয়ে বলেছিল, জেঠু বাড়ি নেই, আমার কয়েকটা টাকা দরকার।

সেই প্রথম টাকা চাওয়া আর সেই শেষ। শিবেশ্বর চাটুজ্যে ছেলের মুখের দিকে চেয়ে কয়েক মুহূর্ত কি ভেবেছিলেন তিনিই জানেন। ওর প্রতি মনোযোগের অভাবের কথা মনে হয়েছিল কিনা বলা যায় না।

কত টাকা?

গোটা পঞ্চাশেক।

দেবার ব্যাপারে পঞ্চাশ ছেড়ে পাঁচশ হাজারও ধর্তব্যের মধ্যে নয়। তবু জানার কর্তব্য হিসেবে জিজ্ঞাসা করেছেন, কি হবে?

দরকার আছে, পছন্দমত দুই একটা বইটইও কিনব। সিতুর আসার উদ্দেশ্য তখনো শেষ হয়নি। বলেছে, আজই নয়, প্রায়ই এরকম অসুবিধের

পড়তে হয়।

দাবির এই স্মার্ট মূর্তিটাই শিবেশ্বর মনে মনে পছন্দ করেছিলেন বোধ হয়। অসুবিধেয় পড়তে হয় শুনে খারাপ লেগেছে। নিঃসঙ্গ ছেলেটা হঠাৎ যেন বড় হয়ে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। যে কারণেই হোক, যা চাওয়া হয়েছে তার থেকে অনেক বেশি উদার হবার তাড়না অনুভব করেছেন তিনি। বলেছেন, বিছানার তলায় সেফ-এর চাবি আছে, যা লাগে নিয়ে নিও। বুঝে শুনে খরচ কোরো।

ঠিক এতবড় পরোয়ানা আশা করে আসেনি সিতু। পেল্লায় সিন্ধুক খুলে দু চোখ স্থির তার। একসঙ্গে এত কাঁচা নোট দেখেনি। ওর থেকে খাবলা খাবলা সরালেও কেউ টের পাবে কিনা সন্দেহ। তাছাড়া এর থেকে টাকা যাচ্ছেও যেমন, আসছেও হয়ত তেমনি। অতএব নিশ্চিন্ত। জেঠুর আলমারি খুলে এরপর আরো অবাক হয়েছিল। সিতুর নিজের নামের পাসবই কটাতে যে এত টাকা আছে তাও কি কল্পনা করা যায়। মায়ের নামের পাস বইতেও কম নেই. আর বাবার নামে যে কত, ধারণাই করা যায় না।

অতএব সিতুর একটা গাড়ি চাওয়ার হাত হবে সে আর বেশি কি? ওর ভিতরের ছোটার তাড়নাটা কেউ অনুভব করতে পারে না। অন্য নেশা গিয়ে সিতুর এখন ছোটার নেশা। শাড়ি-পরা শমীকে দেখার পর নতুন করে আবার নিজের গাড়ির কথা কেন মনে হয়েছে, সিতু জানে না।

সুবীরের উস্কানিতে সিগারেট-বিড়ি-চুরুটের স্বাদ দুদিনে পুরনো হয়েছে। বাবার বোতলের জিনিস গলায় ঢালার বৈচিত্র্যও। কিছুদিন হল আর এক নেশায় মেতেছে। ছাপার অক্ষরের সরু চটি বই। বিশ-তিরিশ পাতার বেশি নয়। কোন্ অন্ধকার থেকে ওগুলো আসে, আবার পড়া হয়ে গেলে কোন্ অন্ধকারে মিলিয়ে যায়, সিতু তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। এ বইয়ের যোগানদার সাইকেলের দোকানের নিতাইদা। সিতুর স্কুল ছুটির দরখাস্তয় তার বাবার নাম সই করত যে। প্রত্যেকটা বই পড়ার জন্যে তাকে এক টাকা করে দিতে হয়। ওরকম বই একসঙ্গে তিনটে-চারটে করেও হাতে আসে। নিতাইদার কাছ থেকে সংগ্রহ করে সুবীর সেগুলো সিতুর হাতে দেয়। দুজনেই গোগ্রাসে পড়ে। পড়ার দামটা শুধু সিতু একা দেয়।

ফেরত-বই আর টাকাই নয়, নতুন বইয়ের ঘন ঘন তাগিদ আসে নিতাইদার কাছে। মুচকি হেসে নিতাইদা বলে, এসব বই ধীরে সুস্থে রসিয়ে-টসিয়ে পড়তে হয়,

এ বইয়ের কি আড়ত আছে যে কাঁড়ি-কাঁড়ি এনে হাজির করব! যেরকম লাভের ব্যবসা, ছাপাখানা থাকলে কি আর এ শালা সাইকেলের দোকানে পড়ে থাকতুম! নিজেই ওর থেকে ঢের ঢের ভালো বই লিখতাম, ছাপতাম আর বেচতাম।

বাবার বোতলের জিনিস গলায় ঢেলে যা হয়নি, গোড়ায় গোড়ায় এই বই হাতে পেয়ে তার থেকে বেশি কাজ হতে লাগল। ভোগের এক বিচিত্র স্বাদের কল্পনায় রক্ত ফোটে, মাথার ঘিলুগুলি গরম হয়ে হয়ে শেষে অসাড় হতে চায়। পাতায় পাতায় লাইনে লাইনে মেয়ে-পুরুষের কি বিষম নগ্ন ভোগের মাতামাতি। মেয়েদের নিঃশেষে ধ্বংস করে করে পুরুষের ভোগের উল্লাস। মেয়ে দেখলে এই গোছের একটা ধ্বংসের আগুন সিতুর শিরায় শিরায় আর মগজের মধ্যেও জ্বলে জ্বলে ওঠে। সে-মেয়ে দেখতে ভালো হলে কথাই নেই। না হলেও ভালো আর সুন্দর কল্পনা করে নেয়। ওর ভিতরের ধ্বংসের ওই জ্বলন্ত কামনা কেবল সুন্দরকে ঘিরে।

কিন্তু বই পড়ার উত্তেজনা স্বাভাবিক নিয়মেই ঠাণ্ডা হতে লাগল। একই ব্যাপারের চর্বিত-চর্বণ। শেষে আবার এক-একটা পড়ে গা ঘুলোয়ও। ভালো লাগে না! ফেলে দিতে ইচ্ছে করে। অথচ সিতুর মাথার আগুন উদগ্র আক্রোশের মত জ্বলতেই থাকে। বইয়ের টান কমে আসছে দেখে নিতাইদা এবারে ছবি সংগ্রহ করে দিতে লাগল। ছবি দেখার খরচা বই পড়ার থেকেও বেশি। এই দেখার ব্যাপারেও একমাত্র সুবীরই দোসর, নীলিদির ভাই চালিয়াত তুলু নয়। তৃতীয় বিভাগে স্কুল ফাইনাল টপকে কোন্ এক ফ্যাক্টরীতে অ্যাপ্রেন্টিস হয়েছে, কলেজের মুখ দেখার রসদ জোটেনি। তুলুর সঙ্গে খাতির কমেনি কিছু, কিন্তু সিতু অন্তত এখন আর সম-পর্যায়ের ভাবে না ওকে। ভাবে না কারণ, নীলিদির ও অনেক ছোট। নীলিদি তলায় তলায় সিতুকে দস্তুরমত খাতির করে এখন। টাকা-পয়সার দরকার হলে নীলিদি চুপি চুপি এসে ওর কাছেই চায়। হলে কেন, টাকার দরকার নীলিদির প্রায়ই হয়। কোনো ভালো সিনেমা এলে নীলিদি ফাঁক খুঁজে এসে জিজ্ঞাসা করে, দেখবি নাকি, খুব ভালো হয়েছে শুনছি।

সিতু টিকিট কেটে রাখে। পাশাপাশি বসে দেখে। থিয়েটারে খরচা অনেক বেশি। তাও দেখে। নিতাইদার বই পড়ে বা ছবি দেখে এই নীলিদিকে নিয়েও মনে মনে কিছু বিশ্লেষণ করেছে সে। কিন্তু মগজের ধ্বংসের আগুনে তাতেও যেন ঠাণ্ডা জলের ছিটে পড়ে। তার থেকে ভীতু অতুলের দিদি রঞ্জুদির ওপর বরং আক্রোশ কিছুটা তাতিয়ে তুলতে পারে। পঁচাত্তর না একশ টাকা মাইনের কোনো এক বিদেশী কোম্পানীতে প্যাকিং আর কি সব জোড়া-টোড়ার চাকরি করে নাকি। ওই পঁচাত্তর-একশর দেমাকেই এখনো আগের মতই গম্ভীর মেজাজ রঞ্জুদির। নীলিদির মুখেই

সিতু শুনেছে, এ পর্যন্ত বারতিনেক মেয়ে অর্থাৎ রঞ্জুদিকে দেখানো হয়েছে। কারো পছন্দ হয়নি, কারো সঙ্গে বা টাকায় বনেনি। শেষে রঞ্জুদি নাকি তার মাকে সাফ বলে দিয়েছে, আর সে সঙের মত নিজেকে দেখাতে বসতে পারবে না।

সিতু গম্ভীর মুখে ঠাট্টা করেছে, আমার থেকে যে বছর চারেকের বড় রঞ্জুদি, নইলে আমিই ভেবে দেখতে পারতাম।

নীলিদি প্রথম চোখ পাকিয়েছে, পরে হি-হি করে হেসেছে।—তুই ভয়ানক দুষ্টু, দাঁড়া রঞ্জুকে বলে দিচ্ছি।

বললে সিতু অখুশি হত না। কিন্তু রঞ্জুদিকে কিছু বলার সাহস যে নীলিদির হবে না, সেটাও খুব ভালো করেই জানে।

চুপি চুপি সুবীর একদিন এক বিচিত্র প্রস্তাব কানে দিল। এত বিচিত্র যে সিতু চমকেই উঠেছিল। নিতাইদা তাদের এক জায়গায় নিয়ে যেতে পারে। খুব ভালো আর ভদ্র ঘরের। মেয়েটা অভাবে পড়ে দিনকতক মাত্র এই রাস্তায় এসেছে। তাই টাকা কিছু বেশি লাগবে।

তখনকার মত প্রস্তাব নাকচ করেছে বটে, কিন্তু দুই বন্ধুর আলাপ-আলোচনার বাসনা দানা পাকিয়ে উঠতে লাগল। সেকেণ্ড ইয়ারে উঠবে এবার, বয়েস আঠারো। ভয়-ডর আরো কমেছে। শেষে সুবীর একদিন হেসে জানালো, নিতাইদা এখনো আশা ছাড়েনি। নিতাইদা নাকি ঠাট্টাও করেছে, বলেছে, বাপ হয়ে ছুটির দরখাস্ত সই করার পর থেকেই সিতুর ওপর কেমন মায়া পড়ে গেছে তার, তাই ওর সামনে হেঁজি-পেঁজি কিছু ধরে দেবে না।

বাপ হয়ে ছুটির দরখাস্ত সই করার কথাটা শোনামাত্র মাকে মনে পড়েছে। ধরা পড়ার পর মায়ের ব্যবহার মনে পড়েছে। বাড়ি থেকে তাড়িয়ে ওকে স্কুল-বোর্ডিংএ ঠেলে পাঠানো হয়েছিলো। ওর ভালোর জন্য পাঠিয়েছিল নাকি। মনে পড়তে মাথায় আগুন জ্বলা শুরু হয়েছে। যাবে।

নিতাইদার হাতে টাকা গুঁজে দিয়েছে। গেছে।

কিন্তু সন্ত্রাসে পালিয়ে এসেছে সিতু। কোথাও থেকে এমন উর্ধ্বশ্বাসে আর বুঝি কখনো পালায়নি। ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের একটা মেয়ের সামনে গিয়ে বসেছিল এক সন্ধ্যায় মনে পড়ে। একা নয়, তিনজন। কিন্তু সিতু একাই পঙ্গু হয়ে গেছল বোধ হয়। শরীরের রক্ত সিরসির করে জল হয়ে যাচ্ছিল। কেবল মনে হচ্ছিল, কে বুঝি তাকে গ্রাস করতে আসছে। সিতুর সর্বাঙ্গ অবশ। নিতাইদার ইশারায় হেসে মেয়েটা তার হাত ধরেছিল। আর তক্ষুনি সিতু যেন মুহূর্তের জন্য প্রাণ বাঁচানোর শক্তি খুঁজে পেয়েছিল। উঠে ঝড়ের মতো ছুটে বেরিয়ে গেছল।

তারপরেও কাঁপুনি থামেনি। গা ঘুলনো থামেনি। একধার থেকে চান করেছে। শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে হাড় সুদ্ধ ঠাণ্ডা করতে চেয়েছে। আর তারপরেও এক অদ্ভুত কাণ্ড হয়েছে। বুকের তলা থেকে জমাট-বাঁধা একটা অচেনা কান্না গুম্‌রে গুম্‌রে ওপরের দিকে আসতে চেয়েছে।

কদিনের মধ্যে এ ভাবটা আবার কেটে গেল বটে। কিন্তু মারমূর্তি দেখে সুবীরও তার পালানো নিয়ে ঠাট্টা করতে ভরসা পেল না। এই বন্ধু বিগড়োলে তার অনেক লোকসান।

বই না, ছবি না, বাবার বোতলের জিনিস না, সুবীর আর নিতাইদার পাল্লায় পড়ে যেখানে গিয়েছিল সেই জায়গাও না—কিছুই উত্তেজনার ইন্ধন যোগাতে পারেনি। অথচ উত্তেজনাশূন্য জীবন এক মুহূর্তও ভালো লাগে না। মগজের মধ্যে বাসনার একটা ক্রূর আগুন ধিকি-ধিকি জ্বলছেই। সেই ধ্বংসের আগুনেই টেনে আনতে চায় কাউকে। কিন্তু কাকে? একখানা মুখ আবছা থেকে স্পষ্ট হয়েছে ক্রমশ। যত স্পষ্ট হয়েছে রক্ত ততো উত্তেজনার খোরাক পেয়েছে। চোদ্দ-পনের বছরের একটা মেয়ের মুখ। তার পরনে বাদামী ডুরে শাড়ি, একদিকের কোঁকড়া চুলের গোছা সাপের মত এঁকেবেঁকে গলা ঘেঁষে বুকে এসে পড়েছিল। যে মেয়েটাকে 'ওই একজন' এখন খুব ভালবাসে—খুব।

পড়ার বইপত্রগুলোতে ধুলো পড়ে গেল। সেকেণ্ড ইয়ার গড়িয়ে চলেছে, এবারে ওগুলো ঝেড়ে-মুছে নিয়ে বসা দরকার। খোলা দরকার। বসেছে, খুলেছে। কিন্তু দু চোখ বইয়ের অক্ষরে আটকে রাখা দায়। ঘরে হাঁপ ধরে, বাড়িতেও। বেরিয়ে পড়ে। অদ্ভুত অদ্ভুত কল্পনা করে। কল্পনায় অদৃশ্য মানুষ হয়ে যায়। সেই অদৃশ্য মানুষের অবধারিত গন্তব্যস্থল ওই ফ্ল্যাট বাড়ি। যেখানে 'ওই একজন' আছে আর কোঁকড়া চুল, ডুরে-শাড়ি-পরা একটা আদুরে মেয়ে আছে। অদৃশ্য মানুষ হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কত কি দেখে ঠিক নেই, হাসে মুখ টিপে, হিংস্র ক্ষিপ্ত বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে আনন্দের চিত্রটাকে রক্তাক্ত করে দেবার মুহূর্ত কল্পনা করে।

কিন্তু কাল্পনিক মুহূর্ত নিয়ে কতক্ষণ তুষ্ট থাকা যায়? কল্পনা ভাঙে যখন, বাস্তব খোরাক না পেয়ে হিংসা তখন নিজেকেই বিধ্বস্ত করতে চায়।

অদৃশ্য মানুষ হতে না পারুক, নিজে অদৃশ্য থেকে কিছু সন্ধান-পর্ব সম্পন্ন করেছে। যেমন, মা আর আগের স্কুলে যায় না, ঠিক সাড়ে নটায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে উল্টোদিকের ট্রামে উঠে মাইলটাক দূরের এক নতুন স্কুলে যায়। বাড়ি

ফেরে পৌনে পাঁচটা থেকে পাঁচটার মধ্যে। শমী বাসে চেপে স্কুলে যায়, বাড়িতে বাস আসে সকাল পৌনে নটায়। ফেরে সাড়ে চারটার মধ্যে। সেও মাইল খানেকের মধ্যে একটা নতুন স্কুল। বাসটা একগাদা মেয়ে নিয়ে স্কুল কম্পাউণ্ডের মধ্যে ঢুকে পড়ে। শমী স্কুলে আসে স্কার্ট ফ্রক পরে, কোমরে টাইট করে রিবন-বাঁধা, মাথার ঝাঁকড়া চুলও সেই রং-এর রিবনে টেনে হর্স-টেল করে বাঁধা। চুলের বিন্যাস বোধ হয় 'ওই একজনই' করে দেয়।

অদৃশ্য থেকে দৃশ্যে আসার তাগিদ ঠেকিয়ে রাখা গেল না। স্কুলে ঢোকার মুখে বাসটা প্রায় থেমেই যায়। দু-তিন দিন সে-সময় ওখানটায় ঘোরাঘুরির পর শমী দেখল ওকে। সিতুর ভাবখানা যেন স্কুলের গা-ঘেঁষা ফুটপাথ ধরে হেঁটে যাচ্ছিল, বাসটা ফটকে ঢুকছে বলে বাধা পেয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। তাকে দেখামাত্র শমীর দু চোখ উৎসুক হয়ে উঠেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে সিতু যা করেছে আর কোনদিন তা করেনি। হাসিমুখে তার উদ্দেশে হাত নেড়েছে। আর অপ্রত্যাশিত খুশির ব্যস্ততায় শমীও হাত নেড়েছে। তার সত্যিকারের আনন্দ হয়েছে। কম্পাউণ্ডের মধ্যে বাস আড়াল না হওয়া পর্যন্ত সাগ্রহে এদিকে ঘাড় ফিরিয়ে ছিল। তার মনে হয়েছিল, সিতুদার শুধু খুশিমুখ দেখেনি, হাত নেড়ে কিছু যেন একটা আশ্বাসও দিল।

এর দুদিন বাদে স্কুল কম্পাউণ্ডের ভিতরে ঢুকেছে সিতু। দুপুরে, ঠিক টিফিন টাইমে। ভিতরের কম্পাউণ্ডে গাদা গাদা মেয়ে ঘুরছে মাঠে বাগানে এদিক-ওদিকে। চারদিক চোখ চালিয়ে একজনকে ছেঁকে তুলতে চেষ্টা করল। কিন্তু প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করল তার বোন শমী বোসকে ডেকে দিতে পারে কিনা। তারপরেই ফ্যাসাদ, দরোয়ান প্রশ্ন করেছে, কোন্ ক্লাসের মেয়ে। মেয়েদের একটা দঙ্গলের দিকে ফিরে সিতু যেন কোনো চেনা মেয়েকেই দেখে নিচ্ছে, কিন্তু আসলে সে দ্রুত চিন্তা করছে কোন্ ক্লাস হতে পারে। প্রথম যে ক্লাসে ভর্তি হয়েছিল মনে আছে, কিন্তু কোন্ বছরে ভর্তি হয়েছিল সঠিক মনে পড়ছে না। এই ফাঁকেই মুশকিল আসান হয়ে গেল। কোথা থেকে তাকে দেখে শমীই ছুটতে ছুটতে আসছে। অতএব দরোয়ানের প্রশ্নের আর জবাব দেবার দরকার হল না।

আনন্দে আর উত্তেজনায় এত জোরে ছুটে এসেছে যে শমীর মুখ লাল। একটু মোটা-সোটা বলে হাঁপ ধরেছে।—সিতুদা তুমি!

সমান তালে চোখে-মুখে খুশি ছড়ালো সিতুও। দীর্ঘ অদর্শনের পর সামনা-সামনি দেখার আনন্দের মতই। বলল, আমি তো প্রায়ই এই রাস্তা দিয়ে যাই,

সামনেই এক ইয়ং প্রোফেসারের বাড়ি, তার সঙ্গে পড়াশুনার আলোচনা হয়, আড্ডা হয়। তা তুই আজকাল এই স্কুলে পড়িস ?

ওকে বুঝতে না দিয়েই কথার ফাঁকে সামনের গাছটার আড়ালে এসে দাঁড়াল। শমী বলল, হ্যাঁ, মাসী আর আমি দুজনেই আগের স্কুল ছেড়ে দিয়েছি। আনন্দে কি যে বলবে শমী ঠিক পাচ্ছে না, মুখে লজ্জা-মেশানো সঙ্কোচ।—আমি আগের মতই মাসী ডাকি, মাসী বলে দিয়েছে কাকীমা ডাকতে হবে না।

বেড়াল নখ গোটায় কি করে সিতুর দেখা আছে। সেও সেই চেষ্টাই করছে। খুশিতে টান ধরতে দেবে না। শব্দ করেই হাসল, হোয়াট্ ইজ্ ইন্ এ নেম্—বুঝলি কিছু ? কোন্ ক্লাস হল তোর ?

নাইন, এবারে টেন-এ উঠব। তুমি স্কুলে এলে যে ?

পকেটে হাত ঢুকিয়ে মস্ত বড় একটা দামী চকোলেট বার করল সিতু।—নে খা।···সেদিন বাসে তোকে দেখে আজ ঢুকে পড়লাম। কেন, কেউ কিছু বলবে নাকি তোকে ?

শমী চকোলেট পেয়ে খুশি, ওটা সিতুদার দেওয়া বলে খুশি, আর সিতুদার এমন অপ্রত্যাশিত ভব্যসভ্য হাসিমুখ দেখে আরো খুশি। ঠোঁট উল্টে জবাব দিল, কে আবার কি বলবে, কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে আমি বলব আমার দাদা। হ্যাঁ সিতুদা, আমার ওপর আর তোমার একটুও রাগ নেই আর, না ?

হাসি বজায় রাখা এত কঠিন সিতু জানত না। চেষ্টার ত্রুটি নেই। বলল, রাগের বয়েস আছে ? তাছাড়া তোর ওপর রাগতে যাব কেন ? সেই একবার অন্য স্কুল গেট থেকে তোকে ডেকেছিলাম, তুই এলিই না।···বাস থেকে আমাকে পরশু দেখলি, বাড়ি গিয়েই মা-কে বলেছিস তো ?

ঈষৎ অপ্রস্তুত মুখ করে শমী মাথা নাড়ল। বলেছে। সিতুদা তাকে দেখে হাসিমুখে হাত নেড়েছিল—সেটা তার কাছে আনন্দের দিনই তো।

মা শুনে কি বলল ?

কিছু বলেনি। শমীর উৎসুক আগ্রহ।—তুমি বাড়িতে আস না কেন ? যতবার দেখা হয় পালিয়ে যাও। এজন্যে মাসীর কত কষ্ট হয় জানো ?

সিতু প্রাণপণে ভাবতে চেষ্টা করছে এটা স্কুল। মাসীর ওপর দরদের কথা শুনে দু হাত নিশপিশ করছে, রক্ত মাথার দিকে ধাওয়া করতে চাইছে। যে বলছে, এক চড়ে তাকে অজ্ঞান করে ফেলতে ইচ্ছে করছে। আবার নিজেই ভাবছে, শমীর এতটুকু সন্দেহ হলে সেটা গাধার মত কাজ হবে। দুর্বার রাগ সত্ত্বেও মাথা দ্রুত কাজ করছে তার। বড় নিঃশ্বাস ফেলল, আমারই কি কম কষ্ট হয় ভাবিস ?

মায়ের কষ্ট হয় জানলি কি করে, কিছু বলে?

শমী মাথা নাড়ল, বলে না। কিন্তু পাছে মাসীর কষ্টের ব্যাপারে সিতুদার সন্দেহ হয় তাই তাড়াতাড়ি বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে চেষ্টা করল।—না বললেও আমি ঠিক বুঝতে পারি। মাসী যে এখনো তোমাকে খুব ভালবাসে। তুমি একবারটি বাড়িতে এলেই বুঝতে পারবে। আসবে?

ভালবাসার কথা শোনামাত্র আবার নিজেকে সংযত করার জন্য মুষ্টিবদ্ধ হাত দুটো ট্রাউজারের পকেটে ঢোকাতে হল। ভিতরের ক্রুর তাপ মুখের মেকী হাসিটুকু শুষে নিচ্ছে বুঝি। অতএব বিমর্ষ মুখ করে ভাবতে হল একটু। জবাব দিল, যেতে পারি, কিন্তু তোর জন্যেই যাওয়া হবে না।

কেন, কেন? শমীর মুখে শঙ্কা।

আজও তুই বাড়ি গিয়েই মাকে বলবি তো সিতুদা স্কুলে এসেছিল?

প্রশ্ন শুনে শমী হকচকিয়ে গেল কেমন। কি জবাব দেবে ভেবে পেল না।

সিতু বড় করে নিঃশ্বাস ফেলল একটা, বলল, তোর জন্যেই বোধ হয় মায়েতে ছেলেতে আর এ জীবনে দেখা হবে না।

শমী রীতিমত ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কেন?

আমার একটা প্রতিজ্ঞা আছে, এক ভয়ানক জায়গায় গিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। নইলে গিয়ে গিয়েও কেন ফিরে আসি বুঝতে পারছিস না? আর কয়েকদিনের মধ্যেই প্রতিজ্ঞার সময় ফুরোবে, তখন যেতে পাব। কিন্তু তার আগে যদি মা জেনে ফেলে আমি দেখা করার জন্য হাঁকপাঁক করছি, তোর এখানে এসেছি, বা শিগগীরই যাব ভাবছি—তাহলে এ জীবনে আর দেখা তো হবেই না, উল্টে আমার মরা মুখ দেখতে হবে তোদের।

শমী পনেরোয় পা দিয়েছে বটে কিন্তু সিতুর তুলনায় অনেক সরল। তার বড় বড় চোখে রাজ্যের বিভ্রম। দুর্বোধ্য ভয়ও। শেষে উদ্‌গ্রীব মুখে মাথা ঝাঁকালো, তাহলে আমি বলব না, মাসীকে কিছু বলব না—বুঝলে?

হুঁঃ, তোর পেটে আবার কথা থাকবে, কোনো একটা কথা উঠলেই গলগল করে বলে ফেলবি।

কখ্‌খনো না! বলছি তো বলব না, কিন্তু তুমি কতদিনের মধ্যে যাবে?

খুব শিগ্‌গীরই। তার আগে এক-আধদিন তোর এখানে এসে বুঝে যাব মাকে কিছু বলেছিস কিনা।…হঠাৎ একদিন তোর সঙ্গে গিয়ে হাজির হব, মা একেবারে আকাশ থেকে পড়বে, খুব ভালো হবে না? আর আমাকে নিয়ে যাওয়ার ক্রেডিটটাও তো তোরই হবে। আগে কিচ্ছু বলবি না তো?

শমী সজোরে মাথা ঝাঁকিয়ে আশ্বাস দিল, কিচ্ছু বলবে না।

হাসিমাখা দু চোখ আর একবার ওর সর্বাঙ্গে বুলিয়ে নিয়ে সিতু বিদায় নিল। দুটো দিন ধৈর্য ধরে কাটালো কোনরকমে। দুটো দিন দুটো বছরের মত। তৃতীয় দিনে সেই টিফিন টাইমে আবার এলো। শমীকে খুঁজে বার করতে হল না। টিফিন হতে এ দুদিন ও-ই দশবার করে গেটের দিকে তাকিয়েছে।

বলিসনি তো কিছু ?

শমী বিশ্বাসযোগ্যভাবেই মাথা নাড়ল। বলেনি তো বটেই, মাসীর সামনে সিতুদার কথা মনে হলেও বুকের ভিতরটা ধুকপুক করেছে।

হৃষ্ট মুখে সিতু এদিনও পকেট থেকে দামী চকোলেট বার করে ওর হাতে দিল। প্রতিজ্ঞা সম্পর্কে আবারও সাবধান করল। আর ফেরার আগে আশ্বাস দিল আর তিন-চার দিনের মধ্যেই হুট করে একদিন ওকে নিয়ে মায়ের কাছে গিয়ে হাজির হবে।

আবারও একে একে তিনটে দিন বাড়িতে বসে কেটেছে সিতুর। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত কি এক অস্থির তাড়না। নিতাইদার বই পড়ে, ছবি দেখে বা তার সঙ্গে সেই এক জায়গায় যাবার সময়ও এরকম হয়নি। এই দুনিয়াটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে লণ্ডভণ্ড করার মত মেজাজ। অথচ বাইরেটা একেবারে স্তব্ধ।

ঠিক চার দিনের দিন শমীর স্কুলে এলো আবার। টিফিন টাইমে নয়। ঘড়ি দেখে টিফিন টাইমের আধ ঘণ্টা বাদে। ফিরে আবার স্কুল বসেছে তখন। শুকনো খরখরে মুখ সিতুর। গেটের দরোয়ানের কাছে গিয়ে স্কুল-অফিসের খোঁজ করল। দরোয়ান অফিস-ঘর দেখিয়ে দিল।

...মিনিট পাঁচ-সাত বাদে ক্লাস থেকে অফিস-ঘরে ডাক পড়ল শমীর। দরোয়ানের মারফত তাকে বইখাতা নিয়ে আসতে বলা হয়েছে। বিলক্ষণ অবাক হয়েই এসেছিল শমী, অফিস-ঘরের লেডি ক্লার্কের সামনে সিতুদাকে দেখে ভয়ে বিস্ময়ে বুক দুরু দুরু।

লেডি ক্লার্ক অর্থাৎ ওদের কনকদি জিজ্ঞাসা করল, এ তোমার দাদা ?

বিমূঢ় মুখে শমী মাথা নাড়ল। তাই। সিতু বলল, বাড়ি চল্, মায়ের শরীরটা হঠাৎ খারাপ হয়েছে।

আকাশ থেকে পড়ার মুখ শমীর। কনকদি গেট পাস সই করে তার হাতে দিতে হতভম্ব মুখে সিতুদার সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। সিতুদা হনহন করে আগে আগে গেটের দিকে চলেছে। একবার ফিরে তাগিদ দিল, তাড়াতাড়ি,

এক্ষুনি ট্যাক্সি ধরতে হবে—

দ্বিগুণ ঘাবড়ে গিয়ে শমী হন্তদন্ত হয়ে এগলো, তবু বাইরে আসার আগে সিতুদার নাগাল পেল না।

গেট পেরিয়েই চলন্ত ট্যাক্সি থামালো সিতু। দরজা খুলতে আগে শমী উঠল, পরে ও। ঠাস করে দরজা বন্ধ করল।—সিধা।

শমীর বুকের কাঁপুনি বেড়েই চলেছে। ঘুরে বসল।—মাসীর কি হয়েছে ?

খুব অসুখ।

তোমাকে কে বলল ?

বিভাস কাকা বাড়িতে ফোন করেছিল। আমি বললাম, তোকে নিয়ে যাচ্ছি। আমার প্রতিজ্ঞার সময়ও শেষ হয়েছে, যেতে আর বাধা কি।

কিন্তু মাসী তো সকালেও ভালো ছিল, কাকুরই শরীর ভালো ছিল না।

সিতু তেতে উঠল, তোর মাসীর শরীর কি মা-দুর্গার শরীর, খারাপ হতে পারে না ?

শমী চুপ মেরে গেল। এই মুখ দেখেও ভয়-ভয় করছে তার। মাসীর হঠাৎ এমন কি সাঙ্ঘাতিক অসুখ করতে পারে ভেবে পাচ্ছে না।

ফাঁকা রাস্তায় গাড়ি জোরে ছুটেছে। এই রাস্তা শমীর চেনার কথা নয়, চিনলও না। নির্দেশমত ট্যাক্সি আর একটা বড় রাস্তার বাঁক ধরে চলেছে। বেশ খানিক চুপচাপ থাকার পর সিতু বিরক্ত মুখ করে বলে উঠল, পনের বছর বয়েস হল, এখনো ফ্রক পরিস কেন, শাড়ি পরতে পারিস না ?

শমীর বড় বড় দু চোখ তার মুখের ওপর, এই পরিস্থিতিতে ফ্রক-পরা হেতু বিরাগ কল্পনাও করতে পারে না। এ দুদিন টিফিন টাইমে যে সিতুদাকে দেখেছে, সে-রকম লাগছে না একটুও।

খোলা চুলে শাড়ি পরে সেদিন বাড়ির রেলিংএ দাঁড়িয়েছিলি—এর থেকে ঢের ভালো লাগছিল দেখতে।

তাকে খুশি করার জন্যেই শমী হাসতে চেষ্টা করল একটু, স্কুলে ওরকম আসা যায় !

ও-রকম না হোক শাড়ি পরে তো আসা যায় !

খানিক বাদে এক বড় রাস্তার ফুটপাথের পাশে ট্যাক্সিটা দাঁড় করানো হল। আর সিতুদা সেখানে নেমে তাকেও নামতে বলল দেখে শমীর বিস্ময়ের অন্ত নেই। গম্ভীর মুখে ট্যাক্সি-ভাড়াও মেটাতে দেখল। শমী চারিদিক তাকাচ্ছে। সামনেই ঝকঝকে মস্ত দালান একটা, তার দেয়ালে সাহেব মেমসাহেবের বড় বড় রঙিন

ছবি। দালানের মাথায় নাম পড়ে বুঝল এটা একটা ইংরেজি সিনেমা হল্। সামনের বারান্দায় লোকের ভিড়।

ঘুরে এতক্ষণে সিতুদার চোখে-মুখে চাপা হাসি দেখল। তবু ভয়ে ভয়েই জিজ্ঞাসা করল, এখানে নামলে যে?

এবারে সিতুদা হেসে উঠল। দুদিন স্কুলে যেমন দেখা গেছে তেমনি হল মুখখানা। সস্নেহে তার একখানা হাতও ধরল, বলল, তুই ভারী বোকা তো, এতক্ষণ তোর দিকে চেয়ে কি মজাই না লাগছিল।

শমী অপ্রস্তুত, কিন্তু শঙ্কার ছায়া মিলায়নি।

তোকে বলেছিলাম না, হুট করে একদিন তোকে নিয়ে মায়ের কাছে গিয়ে হাজির হব। স্কুলে ওরকম না বললে তোকে আনতে পারতুম? ঘড়ি দেখল, আয়, তিনটে বাজে—

সিতু এগিয়ে গেল। উদ্দেশ্য না বুঝে বিমূঢ়ের মতই শমী তার পাশে এলো আবার।—মাসীর কিছু হয়নি?

মনে মনে একটা কটূক্তি করে সিতু হেসেই মাথা নাড়ল। কিছুই হয়নি।

তাহলে বাড়ি যাচ্ছ না কেন, এখানে কোথায় যাচ্ছ?

চাপা অসহিষ্ণুতা দানা বেঁধে ওঠার আগেই সিতু আবার হাসল, কি যে বুদ্ধি তোর, দুদিন বাদে না ক্লাস টেনএ উঠবি? এখন বাড়ি গেলে মা-কে পাব? মা স্কুলে না এখন!

শমীর মনে হল, তাই বটে। কিন্তু এভাবে অসুখের কথা বলে কেউ তাকে স্কুল থেকে নিয়ে আসতে পারে, সেটা যেন এখনো কল্পনা করতে পারছে না।

সিতু বলল, তার থেকে ফুর্তি করে সিনেমা দেখি চল্, ইংরেজি ছবি তো দেখিস না কখনো, দুজনের টিকিট আমি কেটেই রেখেছি। তোকে কি-চ্ছু ভাবতে হবে না, মা বাড়ি ফেরার সময়-সময়ই ফিরব'খন, দুজনকে একসঙ্গে দেখে একেবারে হাঁ হয়ে যাবে।

হাঁ আপাতত শমীই হচ্ছে। লোকের ভিড়ের মধ্য দিয়ে গালচে পাতা তক্‌তকে সিঁড়ি ধরে তাকে দোতলায় এনে তোলা হল। তার একখানা হাত তখনো সিতুদার হাতে ধরা। চারিদিকের চোখ-ঠিকরানো সাজ-সজ্জা আর আলো দেখেই কিনা বলা যায় না। শমী বিহ্বল।

একটা লোক টিকিট দেখে হলের এক কোণে নরম তুকতুকে দুটো গদি আঁটা চেয়ার দেখিয়ে দিল। চেয়ার যে তখনো বোঝেনি। সিতুদা হাতে করে টানতেই ও-দুটো চেয়ার হয়ে গেল। পাশাপাশি বসল দুজনে। পিছনের সারি, সামনে

আর আশপাশে জোড়া জোড়া আরো কতগুলো মেয়ে পুরুষ, সাহেব-মেমসাহেবই বেশি। সামনের সাদা পর্দা থেকে সুন্দর বাজনা আসছে।

তবু এই বৈচিত্র্যের মধ্যে তেমন মন বসছে না শমীর। গলা খাটো করে বলল, বাড়ি ফিরে আমাকে না দেখলে কিন্তু মাসী ভাববে—

চাপা রাগে সিতু বলে উঠল, কিচ্ছু, ভাববে না।

একটু বাদেই চঞ্চল হয়ে উঠল সে। মাথায় আরো কিছু এসেছে। চট করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চুপ করে বসে থাক একটু, আমি তোর ভাবনা দূর করে আসছি—

হন হন করে তাকে হলের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখল। কোথায় যেতে পারে শমীর মাথায় ঢুকল না। একলা থাকার অস্বস্তিতে উন্মুখ হয়ে দরজার দিকে চেয়ে রইল।···ওমা, দরজা যে বন্ধ হয়ে গেল, লাইট নিভে ঘর অন্ধকার হচ্ছে—একেবারে ঘুটঘুটি অন্ধকারই হয়ে গেল—তাকে ফেলে রেখে সিতুদা গেল কোথায়?

আর একটু দেরি হলে ঘাবড়ে গিয়ে শমী চেয়ার ছেড়ে উঠেই পড়ত হয়ত। ওদিকে অর্থাৎ দরজার দিকে মুখ ফিরিয়েছিল, হঠাৎ কাঁধে হাত দিয়ে পাশে কে বসে পড়তে আঁতকে উঠল।···যাক সিতুদাই। খুশিমুখে ফিস-ফিস করে সিতুদা বলল, মা-কে ফোন করে জানিয়ে এলাম, দেরি হলেও আর ভাববে না। নিশ্চিন্ত?

ফোন করলে! কোথায়?

আস্তে! ওই ইয়ে—স্কুলে।

মাসী কি বলল?

বলবে আবার কি, তোকে নিয়ে যাচ্ছি শুনেই আনন্দে আটখানা। বললাম, সিনেমা ভাঙলে রেস্টুরেন্টে খেয়েদেয়ে ফিরতে একটু দেরিই হবে। কলকাতার বড় রেস্টুরেন্টে তো খাসনি কখনো। এই দিনে একটু ফুর্তি করে বাড়ি ফিরছি শুনে মা খুশিই হল—

অন্ধকার চোখে সয়েছে খানিকটা, তবু সিতুদার মুখ দেখা গেল না ভালো। রেস্টুরেন্টে খাবার লোভ যে নেই তা নয়, কিন্তু সিতুদার কাণ্ড দেখে ও আপাতত খাবি খাচ্ছে। সবদিকেরই ফয়সালা হল বলে নিশ্চিন্ত একটু বটেই, তবু ভয়ানক অদ্ভুত লাগছে তার। এতদিন বাদে ছেলেকে পাবে, মাসীর আনন্দে আটখানা হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। যে গোঁয়ার ছেলে, কিছু বললে পাছে বিগড়োয় সেইজন্তেই হয়ত টেলিফোনে যা বলেছে তাতেই রাজি হয়েছে।

প্রথমে হিজিবিজি কি সব দেখানোর পর আলো জলেছে, তার খানিক বাদে আবার আলো নিভেছে—এবারে আসল ছবি শুরু নাকি। ছবি চলেছে, শমী

এক বর্ণও বুঝছে না, হাঁ করে দেখছে শুধু। মাঝে মাঝে এদিক-ওদিক থেকে হাসির শব্দ কানে আসছে। এক শমীই বোকার মত দেখে চলেছে। এক জায়গায় ছবির সাহেবটা মেমসাহেব মেয়েটাকে জাপটে ধরে চুমু খেতে লাগল। শমী মনে মনে বলে উঠল, কি অসভ্য!

তার পরেই সচকিত। সিতুদার একখানা হাত তার কাঁধে, আঙুলে করে অল্প অল্প চাপ দিচ্ছে। খানিক বাদে ছবিতে আর একবার ওই রকম হতে কাঁধ ছেড়ে হাঁটুর ওপর সিতুদার হাতের চাপ টের পেল। অন্ধকারে শমীর মুখ লাল, কি রকম একটা অস্বস্তি লাগছে তার।

ছবি শেষ হল একসময়। আলো জ্বলল। অত আলোর জন্যে কিনা বলা যায় না, সিতুদার মুখখানাও লালচে ঠেকছে। সিঁড়ি ধরে নীচে নামল, বাইরে বেরিয়ে এলো। বিকেল পেরিয়ে আবছা অন্ধকার নেমেছে।

চল্, এবারে খেয়ে নিই ভালো করে।

খাওয়ার স্পৃহা কেন যেন কমে গেছে শমীর। বইয়ের ব্যাগটা একবার হাতে দুলিয়ে বলল, এখন আর দেরি না করে একেবারে বাড়ি গিয়েই খাবে চলো না—

বাড়িতে তো পোলাও-কালিয়া রেঁধে বসে আছে তোর জন্যে, অমন জায়গায় কখনো খাসনি, চল্—

যেতে হল। লোকের ভিড়, তবু সিতুদা হাত ধরে আছে বলে কেমন-কেমন লাগছে। বড় রেস্তোরাঁই বটে। শমীর হাঁ হয়ে যাবার দাখিল। তার মধ্যে একটা খুপরি ঘরে ওরা দুজনে গিয়ে বসল। অর্ডার মত অনেক খাবার এলো। ভালও লাগছে খেতে, কিন্তু ও যত চটপট খাচ্ছে, সিতুদা ততো নয়। মাঝে মাঝে তার দিকে তাকাচ্ছে, দু চোখ অত চকচক করছে কেন, বুঝছে না। সিতুদা কথাও বেশি বলছে না এখন।

প্রায় তিন-পো-ঘণ্টা বাদে পকেট থেকে একগোছা নোট বার করে খাবারের দাম দিল সিতুদা। বেরিয়ে এলো যখন সন্ধ্যা পার। কোন্ দিকে যেতে হবে শমী জানে না, তার হাত ধরে সিতুদা সামনের বড় রাস্তা পার হল। তারপর ট্রাম লাইন ছাড়িয়ে ময়দানের দিকে পা বাড়ালো।

ওই মাঠে একটু বসব।

এই অন্ধকারে! শমী আঁতকেই উঠল, না না, রাত হয়ে গেল, বাড়ি চলো। তাছাড়া শীত-শীত করছে।

শীত করবে না, চল্ না। আমার ভয়ানক মাথা ধরেছে, একটু খোলা হাওয়ায় বসব। টেলিফোন তো করা হয়েছে, তোর ভয় কি?

হাত ধরে টেনে নিয়ে চলেছে, শমীর বাধা দেবার শক্তি নেই। অথচ এখনো বাড়ি না ফেরাটা তার ভয়ানক খারাপ লাগছে। নির্জন অন্ধকারের মাঝে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল আবার।—আর হাঁটতে পারি না, এবার চলো।

সিতু থমকালো। হাত ছেড়ে দিল। তাহলে একাই যা, আমি যাব না।

একা যাওয়ার নামে শমী চমকে উঠল। ব্যাগে অবশ্য টাকা আছে একটা, মাসী দিয়ে রাখে, আর কত নম্বর বাসে যেতে হয় তাও জানে। কিন্তু একা কোনদিন ট্রামে-বাসে ওঠেনি। তাছাড়া এরপর সিতুদা সত্যি না গেলে কি হবে?

অগত্যা আরো খানিক এগিয়ে একটা বেঞ্চিতে বসতে হল। সিতুদাও গা ঘেঁষে বসল। এত বেশি গা ঘেঁষে যে শমীর অস্বস্তি। কাঁধ ধরে আছে, নড়ার উপায় নেই।

খানিক চুপচাপ থেকে সিতু বলল, আমার কি ইচ্ছে করছে জানিস?

ভয়ে ভয়ে শমী তার দিকে তাকালো।

খুন করতে।

মুখ শুকিয়ে আমসি শমীর।—কাকে?

তোকে আমাকে মা-কে সকলকে।

সকলকে শুনে তবু স্বস্তি। কি যে গণ্ডগোলের মধ্যে পড়ছে বুঝছে না।

ওদিকে সরতে চাস কেন, কাছে আয় না। জোর করেই আরো কাছে টানল।—বিয়ে হলে তখন তো কাছে আসতেই হবে, অত লজ্জাই বা কি, ভয়ই বা কি।

ধেৎ। ভয়ে সঙ্কোচে শমী সরতে চেষ্টা করল।

সঙ্গে সঙ্গে কি যে হল নিজেও বোঝার অবকাশ পেল না। অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল শমী। প্রথমে ভাবল সিতুদা খুন করার জন্যেই তাকে ভুলিয়ে এনেছে। পরক্ষণে আরো ত্রাস, গালে ঠোঁটে তার দাঁত বসে গেল। যেভাবে ধরেছে নড়তে পারছে না। অসহ্য যন্ত্রণা। শমী প্রাণপণে চেষ্টা করছে ছাড়াতে। সঙ্গে সঙ্গে চাপা গর্জন, চুপ করে থাক, নইলে খুনই করব তোকে আজ—

ভয়ে ত্রাসে দুই চোখ বিস্ফারিত শমীর। বুঝতেও পারছে। শুধু গালে ঠোঁটে দাঁত বসে যাচ্ছে না, গায়ের মাংসও যেন ছিঁড়ে খুবলে নিচ্ছে। আর্তনাদ করে উঠতে গিয়েও পারছে না, দাঁত দিয়ে ঠোঁট দিয়ে তার মুখ চেপে রেখেছে। আর দু হাতে তাকে টেনে-টেনে নিজের শরীরটার সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চাইছে।

ছাড়ো সিতুদা, ছাড়ো, মরে গেলাম!

জোর করলে মরবি, ছাড়ব বলে তোকে এ পর্যন্ত এনেছি!

এলোমেলো টানা-হেঁচড়ার ফাঁকে এক ঝটকায় তাকে ঠেলে শমী উঠে দাঁড়াল। দিশেহারা ভয়ে এক মুহূর্তের জন্য তাকে দেখল। তারপরেই ব্যাগটা তুলে নিয়ে অন্ধকার মাঠের মধ্য দিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল সে। জীবন বাঁচানোর তাগিদে ছোটা।

ছোটাছুটি বাড়িতেও শুরু হয়েছে। স্কুলে হাসপাতালে খোঁজাখুঁজি করে বিভাস দত্ত এবার থানায় গেছেন। তারপর কি করবেন জানেন না। আর দুর্ভাবনায় ত্রাসে জ্যোতিরাণী ক্রমাগত ঘর-বার করছেন। স্কুলে যখন খোঁজ করা হয়েছে তখন সেখানে কেউ নেই। তারপর থেকে প্রতি মুহূর্তেই এই পাগল-করা ছটফটানি।

দরজা ঠেলে শমী ঘরে ঢুকল। ওর দিকে চোখ পড়তে উঠে দাঁড়াতে গিয়েও পারলেন না। অজানা আশঙ্কায় স্তব্ধ কয়েক মুহূর্ত। টলতে টলতে শমী এগিয়ে এলো। ঠোঁটে গালে ক্ষতচিহ্ন। হাতের ব্যাগ ফেলে শমী দু হাতে জ্যোতি-রাণীকে জড়িয়ে ধরল।

সম্বিত ফিরল যেন।—কি হয়েছে? কোথায় ছিলি এতক্ষণ? এই চেহারা কেন? বল্ না?

সিতুদা…!

আর্তনাদের মত শুধু এই একটা শব্দই বেরুলো মুখ দিয়ে। দু হাতে তাঁকে জড়িয়ে ধরে কোলে মুখ গুঁজে শমী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

জ্যোতিরাণীর সর্বাঙ্গ অবশ সেই মুহূর্তে। এক অকল্পিত আঘাতে বুকের স্পন্দনও থেমে এলো বুঝি।

॥ উনচল্লিশ ॥

ঘটনার আয়নায় সর্বদা দুর্যোগ চেনা যায় না।

শমী সময়মত স্কুলে গেছল, সময়মত ফেরেনি, বিকেল গিয়ে সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত গড়াতে চলেছিল—এটা একটা ঘটনা। আর জ্যোতিরাণী ছটফট করছিলেন, আর বিভাস দত্ত তিনবার করে ছুটে ছুটে খবর করতে বেরিয়েছিলেন। শমী ফিরল কিনা খবর নেবার জন্য ঘুরে এসে আবার বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, এও ঘটনার ফল। কিন্তু শমী ফেরার পর সেই রাতেই দুর্যোগের যে চেহারা

জ্যোতিরাণীর মনের তলায় ছায়াপাত করে গেল, তার সঙ্গে এই ঘটনার প্রত্যক্ষ যোগ নেই।

এই ছায়া বিভাস দত্তকে নিয়েই।

জ্যোতিরাণী স্কুল থেকে ফিরেছিলেন যখন, বিভাস দত্ত তখন বুক পর্যন্ত চাদর টেনে শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিলেন। পাশের ঘরে শমীকে না দেখে জ্যোতিরাণী ধরে নিয়েছিলেন ওধারের ফ্ল্যাটের সমবয়সী অবাঙালী মেয়েটার সঙ্গে গল্পে মেতেছে। চা-জলখাবার করে ওকে ডাকতে গিয়ে শোনেন ওখানে নেই। বিভাস দত্তকে জিজ্ঞাসা করেছেন, শমীকে দেখছি না, ওধারের ফ্ল্যাটেও নেই বলল, স্কুল থেকে ফেরেনি ?

গত চার-পাঁচ দিন ধরে স্কুল থেকে ফিরে জ্যোতিরাণী তাঁকে এইভাবে শুয়ে শুয়ে বই পড়তে দেখছেন। সাধারণত সকালে লেখেন, দুপুরেও খানিকক্ষণ লিখে বেরোন, বিকেলে শমীর বাস আসার আগে বাড়ি ফেরেন, সন্ধ্যা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত আবার লেখা। এককালে নিজের পছন্দমত এটা-সেটা রাঁধতেন জ্যোতিরাণী। সেটা কোনরকম নিয়মের মধ্যে ছিল না। এখন নিয়মে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য ঝামেলা সামান্যই। দুটো ইলেকট্রিক হিটারে চটপট কাজ চুকে যায়। তবু বিভাস দত্ত লোক রাখতে চেয়েছিলেন। জ্যোতিরাণী বলেছেন দরকার নেই। তিনি অবকাশ চান না। অবকাশ নেইও। রান্না ছাড়া শমীকে দুবেলা পড়ানো আছে। স্কুলের খাতাপত্রও নিয়ে আসতে হয়। বিড়ম্বনায় পড়েন রাত দশটার পরে। সময়টা তখন আর একজনের দখলে। তাঁর লেখা পড়তে হয়, লেখা শুনতে হয়, লেখা নিয়ে আলোচনা করতে হয়, আর তারও পরে নিভৃতের বিরামে এক ভীরু-চঞ্চল প্রত্যাশার দোসরের ভূমিকায় নিজেকে সঁপে দিতে হয়। দ্বিতীয় জীবনে সব থেকে অমোঘ অবাঞ্ছিত অধ্যায় এটাই।

কিন্তু গত চার-পাঁচ দিন ধরে এর ব্যতিক্রম দেখছিলেন। লেখা বন্ধ, বাইরে বেরুনোয় সাময়িক ছেদ পড়েছে, আলোচনার অবকাশ কম, আর কদিনের নিভৃতের বিরামও বিঘ্নশূন্য। পড়ায় অখণ্ড মনোযোগ। শিয়রের কাছে মোটা মোটা বই খানকতক। কি বই জ্যোতিরাণী উল্টে দেখেননি, তবে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন। জিজ্ঞাসার আগ্রহটুকুও না দেখালে মন খারাপ হয়, তাই। বিভাস দত্ত হাসিমুখে জানিয়েছিলেন, দিনকতক এখন কলম ধরবেন না, ভালো করে কতগুলো বিষয়ে আগে পড়াশুনা করে নেবেন।

শমী স্কুল থেকে ফিরেছে কিনা প্রশ্নটা কানে গেলেও নিবিষ্টতায় ছেদ পড়েনি। বই না সরিয়ে জবাব দিয়েছেন, দেখিনি তো।

স্কুল থেকে ফেরার পরে তাঁর থেকেও বইয়ের প্রতি মনোযোগটা নতুন ঠেকেছিল জ্যোতিরাণীর। সেটা অখুশির কারণ নয় একটুকুও। এই মনোযোগের আড়াল পান যদি, উল্টে স্বস্তি। চা-জল খাবার খেতে খেতেও বইয়ের পাতা উল্টেছেন।

কিন্তু বিকেল গড়িয়ে যাচ্ছে, মেয়েটার দেখা নেই। এরকম একদিনও হয় না, হয়নি। ঘুরে ফিরে বারান্দায় এসেছেন, রাস্তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছেন। রীতিমত উতলা হয়েছেন শেষে। ঘরে এসে বলেছেন, মেয়েটা এখনো ফিরছে না, কি ব্যাপার? স্কুল তো ছুটি হয়েছে দু ঘণ্টারও আগে, কি হল একটু খোঁজ করা দরকার না?

বই সরিয়ে বিভাস দত্ত তাকিয়েছেন তাঁর দিকে, বিকেল পেরুতে চলল অথচ এখনো ফিরল না বলে চিন্তিতও হয়েছেন। কিন্তু উঠে খোঁজখবর করার সে-রকম আগ্রহ দেখা গেল না। বলেছেন, স্কুলেরই কোনো ব্যাপারে মেতে আছে নিশ্চয়, নইলে যাবে আর কোথায়। বাসেই তো আসবে, ভাবনা কি—

একটু বিরক্ত হয়েই জ্যোতিরাণী আবার বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন। ভাবতে চেষ্টা করেছেন, হয়ত স্কুলের কোনো উৎসব আছে যার জন্য দেরি। কিন্তু দিনের আলোয় টান ধরার পরেও বাস আসছে না দেখে আর স্থির থাকা গেল না।

ঘরে ফিরে দেখেন, ওপাশে নিশ্চিন্তে পড়াশুনা চলছে। চুপচাপ অপেক্ষা করেছেন একটু, তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়েছেন। মিনিট পনেরোর মধ্যেই ফিরেছেন। বিবর্ণ মুখ।—বই রেখে উঠবে এখন একটু?

এই কণ্ঠস্বরের সঙ্গে পরিচিত নন বিভাস দত্ত। বই ফেলে তাড়াতাড়ি উঠে বসেছেন।

ওদের স্কুলে এইমাত্র ফোন করে এলাম, সেখানে এক দারোয়ান ছাড়া আর কেউ নেই। স্কুল ঠিক সময়েই ছুটি হয়েছে, মেয়েদের সব বাড়ি পৌঁছে দিয়ে স্কুল-বাসের ড্রাইভারও বহুক্ষণ আগে বাড়ি চলে গেছে।

বিভাস দত্ত বিমূঢ়, তাহলে শমী কোথায় গেল?

উত্তেজনায় দুশ্চিন্তায় জ্যোতিরাণী বলে উঠেছেন, সেটা আমাকে জিজ্ঞেস করলে কাজ হবে, না এক্ষুনি বেরিয়ে খোঁজ করতে হবে?

বিভাস দত্ত জামাকাপড় বদলে আর চাদরটা টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেছেন। কিন্তু উৎকণ্ঠা সত্ত্বেও বেরুনোর তাড়াটা জ্যোতিরাণীর চোখে মন্থর ঠেকেছিল। তিনি যেন ঠেলে মানুষটাকে ঘর থেকে বার করেছেন। যতবার ঘুরে ঘুরে এসেছেন, ততোবার ওই মুখ বিবর্ণ পাংশু দেখেছেন। এসে খোঁজ নিয়েছেন শমী

ফিরল কিনা, তারপর আবার ছুটে বেরিয়েছেন। শেষবার ফিরেছেন যখন, রাত মন্দ নয়। শ্রান্ত অবসন্ন ভগ্নোদ্যম। টলতে টলতে বিছানায় এসে বসেছেন, বড় বড় গোটাকয়েক দম নিয়ে বলতে চেষ্টা করেছেন, সব থানায় থানায়, হাসপাতালে আর ওদের স্কুলের—

ফিরেছে।

বিভাস দত্ত থমকে তাকিয়েছেন। জ্যোতিরাণী মূর্তির মত শয্যার একপ্রান্তে বসেছিলেন, তিনি ঘরে ঢুকতে উঠে দাঁড়িয়েছেন।

কে ফিরেছে? শমী ফিরেছে? কোথায় ছিল? ডাকো ওকে—

এই মাত্র ঘুমোলো।

উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে উঠলেন বিভাস দত্ত, সমস্ত মুখে কালচে ছাপ, হাঁপাচ্ছেন। কোথায় ছিল সমস্ত দিন? ঘুমুতে হবে না, এক্ষুনি ডাকো ওকে—

নিজেকে সংযত করতে সময় লাগল একটু জ্যোতিরাণীর। বললেন, ওর দোষ নেই, স্কুল থেকে সিতু ওকে ধরে নিয়ে গেছল। ওর শরীর ভালো না, এখন ডাকা ঠিক হবে না—

বিভাস দত্ত কি শুনছেন খেয়াল করলেন না হয়ত। আরো ক্রুদ্ধ হয়ে বলতে গেলেন, আমি জানতে চাই ও কি বলে—

শেষ করতে পারলেন না। ধুপ করে শয্যায় বসে পড়লেন আবার। কাঁপছেন অল্প অল্প। কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে। গায়ে জড়ানো চাদরটাও টেনে খুলতে সময় লাগছে। জামা গায়েই শুয়ে পড়লেন, তারপর দম নিতে চেষ্টা করে ইশারায় পাখাটা দেখালেন।

ঘাবড়ে গিয়ে জ্যোতিরাণী তাড়াতাড়ি পাখা খুলে দিলেন, অথচ পাখার গরম আর নেই এখন। কাছে এগিয়ে এলেন। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে স্পষ্ট বোঝা যায়।

কি হল?

জবাব পেলেন না। কষ্ট বাড়ছে। পাখা চলছে তবু বাতাসের অভাব যেন। ইশারায় বালিশ উঁচু করে দিতে বললেন। জ্যোতিরাণী আর একটা বালিশ মাথার নীচে গুঁজে দিলেন। খানিক বাদে জল চেয়ে খেলেন। কিন্তু ছটফটানি কমছে না। জ্যোতিরাণী পাশে বসলেন, বুকে হাত বুলিয়ে দিলেন। ভয়ই পেয়েছেন তিনি। মাস কয়েক আগের আর এক দুপুরের দৃশ্য মনে পড়ল। তিনি মিসেস দত্ত হবার আগের। যে সাক্ষাতের ফলে এই একজনের জীবনে আসতে হয়েছে তাঁকে। ভোর রাতে যে বীভৎস স্বপ্ন দেখার পর দুপুরে না এসে পারেননি। উত্তেজনায় মুখে

সেদিনও এমনি কাঁপতে দেখেছিলেন, এমনি ঘাম দেখেছিলেন, শেষে এমনি শ্বাসকষ্ট দেখেছিলেন। আজ সবই আরো বেশি দেখছেন।

বিভাস দত্ত একসময়ে বললেন, শরীরটা কদিন ধরে খারাপ যাচ্ছে, হঠাৎ শমীর ব্যাপারটার এই ধকলে···মাস কয়েক আগেও মাঝেসাঝে এ-রকম হত, তখনো হার্টের ব্যাপার বলে সন্দেহ হয়নি···ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু ঠিক চট করে হল না। সুস্থ-স্বাভাবিক বোধ করার প্রাণপণ চেষ্টা চলছে জ্যোতিরাণী অনুভব করতে পারেন। বিকেলেও চোখ-মুখ এমন কালচে শুকনো দেখেননি। ওধুধ কবে এনে রাখা হয়েছে জানেন না। নিজেই চেয়ে খেলেন। কিন্তু তার পরেও থেকে-থেকে চাপা ছটফটানি একেবারে গেল না।

বিভাস দত্তর পরিচিত ডাক্তার কাছে থাকেন না। জ্যোতিরাণী অন্য ডাক্তার ডাকার কথা বললেন। কিন্তু ডাকবেন কাকে? বাড়িতে ফোন নেই, কাউকে চেনেনও না। এ অবস্থায় ছেড়ে ফোন করার জন্য বাইরেও বেরুতে পারছেন না। অগত্যা জ্যোতিরাণী পাশের ফ্ল্যাটের অবাঙালী ভাড়াটের শরণাপন্ন হলেন। সেই ভদ্রলোক নিজে বেরিয়ে পাড়ার এক ডাক্তার ধরে নিয়ে এলেন। রাত তখন কম নয়।

ডাক্তারের কাছে বিভাস দত্ত গত পাঁচ-ছ দিনের অসুস্থতার যে ফিরিস্তি দিলেন, জ্যোতিরাণীও সেটা এই প্রথম শুনলেন। শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট তখন থেকেই অল্প অল্প শুরু হয়েছে। হার্টের দিকে কি-রকম অস্বস্তি। সেটা অনেক আগে থেকেই ছিল, তবে বেশি নয়। দিন পাঁচেক আগে হঠাৎ একটু অসুস্থ বোধ করার দরুন ওমুক ডাক্তারকে দেখানো হয়েছিল। তিনি বলেছেন, ডায়বেটিসের উপসর্গ থেকে হার্টের গোলযোগ দেখা দেয় অনেক সময়, সেই সন্দেহই করেছেন। দিনকতক সম্পূর্ণ বিশ্রামে থেকে এবং ওষুধ খেয়ে শ্বাসকষ্ট কমলে হার্টের প্লেন এক্স-রে আর ইলেকট্রো-কার্ডিওগ্রাফ করবার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

রোগী পরীক্ষা করে এই ডাক্তার আগের ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনের সঙ্গে আরো কিছু যোগ করলেন, আর একটু সুস্থ বোধ করলেই অন্য নির্দেশগুলো যথাযথ পালন করতে বললেন। যাবার মুখে বারান্দায় জ্যোতিরাণীকে বলে গেলেন, হার্ট একটু বেশিই ড্যামেজ মনে হচ্ছে—এক্স-রে, কার্ডিওগ্রাফ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করানো দরকার।

পাশের ফ্ল্যাটের ভাড়াটে ভদ্রলোকটিই ওষুধ এনে দিলেন। তারও বেশ খানিকক্ষণ বাদে কিছুটা স্বাভাবিক বোধ করলেন বিভাস দত্ত।

জ্যোতিরাণী বললেন, পাঁচ-ছ দিন ধরে কষ্টটা টের পাচ্ছ, আমাকে কিছু

বলোনি তো?

ভাবনার মধ্যে না ফেলে নিজেই সামলে নিতে পারব ভেবেছিলাম।

জ্যোতিরাণী আর কিছু বলেননি, বলতে পারেননি। নিজে সামলে নেবার এই চেষ্টাটা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করছেন এখন। নিঃশব্দে সামলাতে চেয়েছেন বলেই পাঁচ-ছ দিন আগে ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ আনার কথা জানাননি। নিঃশব্দে সামলাতে চেয়েছেন বলেই দিন-রাত শয্যার আশ্রয়ে বই পড়ে কাটছিল। আর নিঃশব্দে সামলাতে চেয়েছেন বলেই শমী বাড়ি ফিরছে না দেখেও চট করে নড়তে চাননি। জ্যোতিরাণীর তাড়ায় নড়তে হয়েছে, ক'ঘণ্টা উত্তেজনা আর ছোটাছুটির ধকল গেছে। তার পরেও নিঃশব্দেই সামলাতে চেয়েছেন। কিন্তু পারা গেল না।

রাত বাড়ছে। বিভাস দত্ত ঘুমুচ্ছেন। ওষুধ খাওয়ার পর ঘুম একটু বেশি হবে ডাক্তার বলেই গেছলেন। জ্যোতিরাণী শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। ঘুমন্ত মানুষটাকে দেখছেন। শ্রান্ত ফ্যাকাসে মুখ দেখছেন। শমী বাড়ি ফেরার পর যে ধাক্কা খেয়েছেন, ভিতরে ভিতরে তার দুর্বহ ক্ষয় চলেছে। সত্তার ক্ষয়। তার ওপর এই অঘটনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভাগ্যের বিড়ম্বনার কথা ভাবছেন না তিনি। এই মানুষের প্রতিও অভিযোগ নেই। তাই প্রথমেই মনে হয়েছে, মানুষটা শয্যা ছেড়ে নড়তে চাননি, তিনি ঠেলে পাঠিয়েছেন। অভিযোগের বদলে মায়া হয়েছে তাঁর। সঙ্গোপনে নিজেকে রক্ষা করার তাগিদে যে মানুষ অস্থির তাঁকে এই বিপর্যয়ের মুখে টেনে এনেছে সিতু। সব ছাড়িয়ে এই সত্যটাই বড় হয়ে উঠেছে। সত্তাক্ষয়ী সত্য শুধু এটুকুই।

দিন কয়েকের মধ্যেই জ্যোতিরাণী এক্স-রে আর কার্ডিওগ্রাফ করাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। পরদিনই একজন বড় ডাক্তার আনা হয়েছিল। তিনিও একই কথা বলেছেন। এক্স-রে কার্ডিওগ্রাফ ছাড়াও ব্লাড কোলেস্টিরাল না কি করাবার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু বিভাস দত্ত গা করছেন না খুব। বলছেন, হবে, যাক কটা দিন।

কেন বলছেন জ্যোতিরাণী বুঝতে পারেন। সবই খরচার ব্যাপার। এরই মধ্যে চুপচাপ দুই-একখানা চিঠিও লিখতে দেখেছেন। কি চিঠি বা কাকে চিঠি, জানেন না। অনুমান করতে পারেন। প্রকাশকদের কাছে টাকার তাগিদে চিঠি সম্ভবত। অন্য দুই প্রকাশক বাড়িতে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন। মনে হয় টাকাও কিছু কিছু দিয়ে গেছেন। কিন্তু মুখ থেকে দুশ্চিন্তার ছায়া সরার মত টাকা নয় বলে ধারণা। জ্যোতিরাণী ভাবতে চান না কিছু, তবু মনে পড়ে

শোকার্ত অহঙ্কারে ছ মাসও হয়নি এই মানুষ শমীর নামে তিন হাজার টাকা আটকে রেখেছেন। জ্যোতিরাণী ভাবতে চান না, তবু মনে পড়ে, জীবনের কটা ধাপ আগে এই দুটো হাত দিয়েই লক্ষ লক্ষ টাকা নাড়াচাড়া করেছেন।···আশ্চর্য!

সেদিন বিকেলে স্কুল থেকে ফিরতে দেরি হল একটু। এসেই জানালেন, পর-দিনই এক্স-রে হবে, আর যা-কিছু করা দরকার তাও দু-চার দিনের মধ্যেই হয়ে যাবে, তিনি ব্যবস্থা করে এসেছেন।

বিভাস দত্তর সংকোচ বিরক্তির আকার নিয়েছে।—কালই কি দরকার, কটা দিন সবুর করলে হত না?

মুখের দিকে চেয়েই জ্যোতিরাণী জবাব দিয়েছেন, টাকার জন্যে ভাবনা নেই, আমার কাছে যা আছে তাতেই হবে।

মুখ বুজেই একটা যন্ত্রণা সামলেছেন বিভাস দত্ত। জ্যোতিরাণী তাও অনুভব করেছেন। কিন্তু আপত্তি শোনার জন্য অপেক্ষা না করে কাজের অছিলায় সরে এসেছেন। এত বড় চিকিৎসা করার মত উদ্বৃত্ত টাকা তাঁর হাতে থাকার কথা নয়। গয়নার খবর রাখে না বলেই পরিত্রাণ, সামনে দাঁড়িয়ে জেরায় পড়তে চান না।

এক্স-রেতে দেখা গেল হার্ট ডায়েলেটেড—বেশি মাত্রায় জখম। দীর্ঘদিনের টানা বিশ্রাম নির্দেশ। ওষুধপত্র আর আনুষঙ্গিক খাওয়া-দাওয়ার চার্টও ছোট নয়। ডাক্তারের কাছে অনুনয় করে সমস্ত দিনে-রাতে মাত্র দু-তিন ঘণ্টা করে লেখার অনুমতি আদায় করেছেন বিভাস দত্ত। পরে বরং জ্যোতিরাণীই বাধা দিতে চেষ্টা করেছেন, সেরে গেলে তো সবই চলতে পারবে, এত ব্যস্ত হবার দরকার কি।

বিভাস দত্ত জবাব দেননি। এই ভাগ্যটার ওপরই বোধ করি সব থেকে বেশি অভিমান তাঁর। শেষে বলেছেন, তুমি বিশ্বাস করো, হার্টের এইরকম ব্যাপার আমি জানতুম না।

জ্যোতিরাণী বাইরে স্থির, কিন্তু ভিতরে ভিতরে মুহূর্তের জন্য অস্থির আলোড়ন একটা। অর্থাৎ, জানলে নিজের জীবনে এভাবে তাঁকে টেনে আনতেন না। পরক্ষণে হাসতে চেষ্টা করেছেন।—তুমিও বিশ্বাস করো, এ নিয়ে আমি কিছু ভাবছি না।

তার একটু বাদেই বিভাস দত্ত ঘুমিয়ে পড়েছেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জ্যোতি-রাণী আবার সেই অসহায় ঘুমন্তমূর্তি দেখেছেন। কেন তিনি অমন আলোড়ন অনুভব করেছিলেন সেটা নিজেরও অগোচর নয়। এই জীবনে তাঁকে টানা

হয়েছে বটে, কিন্তু কতটা আসতে পেরেছেন তিনিই শুধু জানেন। তিনি মিসেস দত্ত হয়েছেন এটা বাস্তব সত্য, অনুভবের সত্য নয়। এ কি মিথ্যাচার? তাই যদি হয় এত বড় মিথ্যের বোঝা তিনি বইবেন কি।করে সত্য হোক না হোক, মিথ্যেটাকেও অস্বীকার করতে চান জ্যোতিরাণী। তাঁকে দয়া করতে বলা হয়েছিল, রক্ষা করতে বলা হয়েছিল। তিনি তাই করেছেন। রণাঙ্গনের সেই নার্সের কথা ভাবতে চেষ্টা করেছেন তিনি। হিম-শীতে মুমূর্ষু সৈনিকের দেহে যে তাপ ছড়াতে চেষ্টা করেছিল, তাঁরও সেই ভূমিকা।

কিন্তু বড় কঠিন ভূমিকা।

মুমূর্ষু সৈনিকের জ্ঞান ছিল না, বিচার ছিল না, দাবি ছিল না। এই আহত মানুষের সঙ্গে তাঁর এইখানেই তফাৎ। দিন গেছে, মাস গেছে, বছর ঘুরেছে। চিকিৎসায় আর বিশ্রামে বিভাস দত্তর শরীর কিছু ফিরেছে, কিন্তু স্নায়ুর পীড়ন বেড়েছে। আত্মাভিমানে আঁচড় পড়েই চলেছে। তিন ঘণ্টার জায়গায় এখন দশ ঘণ্টা লিখতে চান। বাধা দিলে বিরক্ত হন, বলেন, কিছু যদি হয়ই তো এমন কি ক্ষতি? আর কতকাল এভাবে টানবে?

জ্যোতিরাণী সহজভাবেই বলেন, চলে তো যাচ্ছে—

কি-ভাবে কেমন করে চলছে আমি জানি না?

এই গোছের বিরক্তির মুখেই গভীর আগ্রহে হাত বাড়িয়ে তাঁকে কাছে টেনে এনেছিলেন একদিন। জিজ্ঞাসা করেছেন, কত বড় অবস্থার মধ্যে ছিলে একদিন, আর কি অবস্থার মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছ—একথা সত্যি তোমার মনে হয় না? সত্যি না?

জবাব দিতে সময় লেগেছে একটু। জ্যোতিরাণী বলেছেন, টাকার সুখ আগেও বড় করে দেখিনি, এখনো দেখি না। তুমি বড় করে দেখতে শুরু করেছ বলে আমার অসুবিধে হচ্ছে।

তখনকার মত নিশ্চিন্ত বোধ করেছেন বিভাস দত্ত। বিশ্বাসও করেছেন। কিন্তু নিজের ভিতর থেকেই যোগ্যতার প্রশ্ন উঠেছে আবার। বাস্তবের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারেননি। শুধু অর্থ রোজগারের বাস্তব নয়। এক সামগ্রিক ব্যর্থতার ছায়া দেখেছেন তিনি। সেটা ঠেকাবার জন্যে এত যোঝাযুঝি, সেই কারণে অসহায় আক্রোশ। লেখা বাড়িয়েছেন, কিন্তু তার ফল তেমন আসছে না। তাঁর লেখার প্রতি পাঠকের অনুরাগ তিলমাত্র কমেছে এটা তিনি বিশ্বাস করতে চান না। প্রকাশকদের নিস্পৃহতার প্রতি মর্মান্তিক ক্রুদ্ধ তিনি। বলেন, খেলো যুগের

বাতাস এসেছে, সস্তার চটকদার জিনিস ছেপে দাঁও মারার লোভ ওদের।

সমালোচকের বিরূপ সমালোচনা চোখে পড়লে ফুঁসে ওঠেন, স্নায়ু ঠাণ্ডা হতে সময় লাগে। শ্রুতিকটু মন্তব্য করে বসেন এক-একসময়। লেখার প্রসঙ্গ জ্যোতিরাণী সন্তর্পণে পরিহার করে চলতে চান সেটা টের পেলে আত্মাভিমানে অস্থিরই হয়ে ওঠেন। লেখার কদর কেন গেছে, কেন বিরূপ সমালোচনা, জ্যোতিরাণী ভালো করেই অনুভব করতে পারেন। প্রতিটি লেখায় এই স্নায়ু আর এই ক্ষোভের ছাপ পড়ছে। নিজের ব্যক্তি-জীবনের ন্যায্য প্রাপ্তির ঘোষণা প্রতি ছত্রে উঁকিঝুঁকি দেয়। স্বামী-স্ত্রীর বিরোধকে স্বতঃসিদ্ধ বিদ্বেষের দিকে টেনে আনার ঝোঁক। হিন্দু বিয়ের অবিচ্ছেদ্য অনুরাগের প্রতি তাঁর অবিরাম কটাক্ষ আর অকরুণ আঘাত।

জ্যোতিরাণী অনেকসময় বাধা দিতে চেষ্টা করেছেন, অনেকসময় বলেছেন, এসব নিয়ে গবেষণা না করে সাদাসিধে গল্প লেখো না?

সঙ্গে সঙ্গে আত্মাভিমানে ঘা পড়েছে। তর্ক তুলেছেন, নিজের মতটাকে লেখার মতই অকরুণ করে তুলতে চেয়েছেন। শেষে রাগ করে লেখা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। আর তেমনি মানসিক অস্থিরতার মুখে একদিন বলেই ফেলেছেন, পাঁচটা খেলো বইয়ের মত কাটতি না দেখে আমার লেখার ওপর তোমারও আস্থা গেছে তাহলে···।

সেই থেকে পারতপক্ষে জ্যোতিরাণী আর বলেন না কিছু। কিন্তু না বলার ক্ষোভও পুঞ্জীভূত হতে থাকে অনুভব করতে পারেন। ক্ষোভের থেকেও বিভাস দত্তর হৃত-মর্যাদার যাতনা বেশি। আজকাল বাইরে বেরোচ্ছেন একটু-আধটু। কিন্তু খুব খুশিমনে ফেরেন না। কিছুদিন আগের ঘটনা। বাইরে থেকে ফেরার পর থম্‌থমে মুখ। তারপর কটা দিন এক চাপা ছটফটানি লক্ষ্য করেছেন জ্যোতিরাণী। খেদ গোপন রাখতে পারেননি শেষ পর্যন্ত। এই কলকাতায় মস্ত একটা সাহিত্য অধিবেশন হয়ে গেল। অধিবেশন না বলে উৎসব বলা যেতে পারে। জ্যোতিরাণী কাগজ পড়ার অবকাশ কম পান বলেই খবর রাখেন না। সেই উৎসবে বিভাস দত্তর সম্মানের আসন মেলেনি, সাদর আহ্বানও না। কর্মকর্তারা তাকে একখানা আনুষ্ঠানিক ছাপা আমন্ত্রণ পাঠিয়েই খালাস। এই অবজ্ঞা অপমানের নামান্তর। বুকের মধ্যখানে এসে লেগেছে।

আঘাতটা ব্যক্ত করে ফেলার পর ক্ষোভ আর যাতনা বাড়তেই দেখেছেন জ্যোতিরাণী। রাগের কথা সঙ্কল্পের কথা পরিতাপের কথা শুনেছেন। আর বুকের তলায় জমাট বাঁধা কান্নার স্তূপ দেখেছেন। এই মানুষকে তিনি সুস্থ জীবনের আলোয় ফেরাবেন কি করে জানেন না। তিনি শুধু অসহায় বোধ করেছেন।

ওদিকে শমীর মধ্যেও কিছু পরিবর্তন এসেছে অনুভব করতে পারেন। এখন নয়, সেই এক রাতের পর থেকেই। অপরিণত, হাসিখুশি সরল মনের ওপর লোলুপতার এক বীভৎস থাবা পড়েছে। রাতারাতি তার ভিতরের দৃষ্টি সজাগ হয়েছে, বাইরে তাই আগের তুলনায় ঠাণ্ডা। সামনে স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষা। পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত। মাসীকে কাছে পেলে আগের মতই খুশি হয়, পড়াশুনার ব্যাপারে সাহায্যের প্রত্যাশায় দশবার করে এ-ঘরে উঁকিঝুঁকি দেয়। কিন্তু সে-রকম আনন্দের মুহূর্তেও একটা নাম আর তাকে উচ্চারণ করতে শোনেননি। সাদা-মাটা ভাবে গেল বছর সিতু আই-এসসি পাস করেছিল, তখনো জ্যোতিরাণী ছাপা রেজাল্ট বুক না এনে পারেননি। শমীর সামনেই সেটা উল্টে দেখছিলেন মনে পড়ে। তখনো ও মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করতে পারেনি, সিতুদার কি হল? পরে নিজে দেখেছে কিনা তাও জানেন না।

অবকাশ নেই বললেই চলে। শমীকে পড়ানো, দুবেলার অল্পস্বল্প রান্না, স্কুল, বিভাস দত্তর ওষুধপত্র-পথ্য যোগানো, আর তাঁর হতাশার নানা প্রতিক্রিয়ার জের সামলানোর ফাঁকে বিরাম নেই। তবু জ্যোতিরাণীর মনে হয়, তিনি থেমে আছেন। তিনি ভবিতব্যের এক অমোঘ গহ্বরে প্রবেশ করেছেন। তার কোনো একটা ধাপে এসে দাঁড়িয়ে গেছেন। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, আরো কিছু বাকি। হয়ত অনেক বাকি।

তাঁর এই আপাত-শান্ত দিন যাপনের মধ্যে অকস্মাৎ স্নায়ুগুলো সব কেঁপে ওঠার মতই ঘটনা একটা। এর সঙ্গে নিজের ভবিতব্যের যোগ নেই। এই মাশুল আর একজন দিল।

স্কুল থেকে ফিরে দোতলায় ওঠার আগেই দু চোখ কপালে তুলে শমী ছুটে এসে জানালো, মাসী, মিত্রামাসী মারা গেছে! কালী জেঠু তাকে নিয়ে এসেছিল।

জ্যোতিরাণী বিমূঢ় হঠাৎ। ফ্যাল ফ্যাল করে কয়েক নিমেষ চেয়ে থেকে শেষ সিঁড়ি থেকে বারান্দায় উঠে দাঁড়ালেন।

রুদ্ধশ্বাসে শুনলেন তারপর। দুপুরে ও-ঘরে কাকু ঘুমুচ্ছিল আর শমী পাশের ঘরে পরীক্ষার পড়া পড়ছিল। হঠাৎ রাস্তা থেকে কাকুর নাম ধরে কাকে ডাকতে শুনে রেলিং-এ এসে দেখে ট্রাকের মত ছোট একটা খোলা গাড়িতে মিত্রামাসী শোয়া, গলা পর্যন্ত চাদরে ঢাকা—দেখলেই বোঝা যায় মরে গেছে। আর তার পাশে শুধু কালী জেঠু, আর কেউ নেই। ওকে দেখে জিজ্ঞাসা করল, মাসী কোথায়, স্কুলে শুনে বলল, ফিরলে বলিস আমি এসেছিলাম। গাড়ি থেকে কালী জেঠু

নামেওনি, তক্ষুনি চলে গেল। কালী জেঠুর একটুও মন খারাপ মনে হয়নি শমীর, বলল, হাসি-হাসি মুখেই কথা কইল, তারপর চলে গেল।

জ্যোতিরাণী তেমনি বিমূঢ়, নির্বাক। মিত্রাদি তাঁর অনেক নিয়েছে, তাঁর সত্তাসুদ্ধু কাটা-ছেঁড়া করেছে। তবু এ-রকম একটা খবর কানে আসবে কখনো কল্পনাও করেননি। সব থেকে আশ্চর্য, কালীদার তার মৃতদেহ এখানে নিয়ে আসা। কি দেখাতে এনেছিলেন তিনি? কেন এনেছিলেন—শেষ দেখে জ্যোতিরাণী সান্ত্বনা পেতে পারেন ভেবে?···মিত্রাদিকে ট্রাকের মত খোলা গাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, দেহ ছাই করার জন্য পাশে শুধু কালীদা, আর কেউ না। শুরুতে কালীদা আর শেষ-যাত্রায় কালীদা।

গায়ে হঠাৎ কাঁটা দিয়ে আত্মস্থ হলেন একটু। ঘরে পা দেওয়া মাত্র বিভাস দত্ত জিজ্ঞাসা করলেন, শুনেছ? কালীদা আবার তাকে এখানে আনতে গেল কেন!···

জবাব দেবার নেই কিছু। জ্যোতিরাণী নিজেই জানেন না কেন। খানিক চুপ করে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, একবার শ্মশানে যাব?

তুমি? না।

চিন্তার অবকাশ না দেবার মত করেই বললেন বিভাস দত্ত। আপত্তি না করলেও জ্যোতিরাণী যেতে পারতেন কিনা সন্দেহ।

নিঃশব্দে স্মৃতি মুছে মুছে দিন কাটাচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু স্মৃতি মোছে না মরে? রাতের বিনিদ্র শয্যায় তারা ভিড় করে এসেছে।···মিত্রাদি প্রভুজীধাম বীথি, আর সব মেয়েরা। মিত্রাদি আর কালীদা, মিত্রাদি আর তিনি নিজে, মিত্রাদি আর বীথি, মিত্রাদি আর ত্রিকোণ রাস্তার বড় বাড়ির দালানের কজন···মিত্রাদি মিত্রাদি মিত্রাদি···কি হয়েছিল মিত্রাদির? হঠাৎ তাঁর কপালে এই শাস্তি কেন? বিয়ে নাকচের আইন পাসের সঙ্গে সঙ্গে ডাইভোর্সের নোটিশ পেয়ে তিনি ধরে নিয়েছিলেন, ওই ত্রিকোণ রাস্তার বড় বাড়ির দালানে মিত্রাদির পাকাপাকি অধিষ্ঠানের সূচনা ওটা। তিনি ঠিক ধরে নেননি, কালীদার মুখে বিভাস দত্ত এই গোছের আভাস পেয়ে তাঁকে জানিয়েছিলেন। জ্যোতিরাণী অবিশ্বাস করেননি, কারণ তিনি বাড়ি ছাড়ার পর থেকে মিত্রাদির এই আশার কথা শুনে এসেছেন। কিন্তু সব আশা-আকাঙ্ক্ষা এরই মধ্যে ফুরিয়ে গেল?

পরদিন বিকেলে ঘরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিরাণীর মুখে রক্ত উঠল এক ঝলক। ঘরে কালীদা বসে খুশি মেজাজে শমীর সঙ্গে গল্প করছেন। তাঁকে দেখে হাসিমুখে ডাকলেন, এত দেরিতে ছুটি কেন তোমার?

জ্যোতিরাণী কি যে করবেন ভেবে পেলেন না। পায়ে পায়ে সামনে এসে দাঁড়াতে হল। মৃদু প্রশ্ন করলেন, কতক্ষণ এসেছেন ?

অনেকক্ষণ। প্রথমে বিভাসকে একহাত নিয়েছি, বাইরে কি কাজ দেখিয়ে ও পালাতে এখন শমীকে নিয়ে পড়েছি।···বিভাসের শরীর তো যাচ্ছেতাই খারাপ হয়েছে দেখলাম, চেনা যায় না। ভালোমত চিকিৎসা-টিকিৎসা করাচ্ছে ?

এই সাক্ষাতের ধাক্কা সামলাতে চেষ্টা করে জ্যোতিরাণী সামান্য মাথা নাড়লেন। ডাইভোর্সের নোটিস পাওয়ার পর এই প্রথম দেখা কালীদার সঙ্গে। মুখ দেখে বা স্বাভাবিক কথাবার্তা শুনে মনে হবে জ্যোতিরাণী বরাবরই মিসেস দত্ত, আর দিনকতক অনুপস্থিতির পর তিনি হঠাৎ এসে হাজির হয়েছেন। এই আসার পিছনে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই। কিন্তু কালীদা যা পারছেন, জ্যোতিরাণী তা পারছেন না। সহজ হবার চেষ্টা করতেও বিসদৃশ লাগছে তাঁর।

মিত্রাদির কি হয়েছিল ?

বলব'খন, তুমি মুখ-হাতে জল দিয়ে এসো।

জ্যোতিরাণী চলে এলেন। মুখ-হাতে জল দেবার তাড়ায় নয়, একটু আড়াল দরকার। একটু প্রস্তুতি দরকার। কালীদা হাসতে পারছেন, সহজ হতে পারছেন অন্য কারণে। তিনি গৌরবিমলবাবু নন। জ্যোতিরাণী মিসেস দত্ত হবার ফলে খুশি যদি কেউ হয়ে থাকেন, এই একজনই হতে পারেন। কালো নোটবইয়ে তাঁর শকুনিস্মৃতি ভোলবার নয়। সব থেকে বড় আক্রোশ তাঁর যেখানে বাস করেন সেই বাড়ির মালিকের উপর। ওই একজনের সব কিছু ধূলিসাৎ দেখার আশায় বসে আছেন কালীদা, বুক ভাঙতে দেখার আশায় বসে আছেন।

তবু বিভাস দত্তর স্ত্রী হিসেবে সামনে এসে দাঁড়ানোর বিড়ম্বনা কম নয়!··· কাল মিত্রাদি মারা গেছে, কালীদা কালও এসেছিলেন। আজও এলেন আবার। কিন্তু কেন ?

একটু সময় নিয়ে চায়ের পেয়ালা হাতে ঘরে ঢুকলেন। কালীদা হাত বাড়ালেন, এসো, চায়ের কথাই ভাবছিলাম।

পেয়ালা হাতে নিয়ে পর পর গোটাকয়েক চুমুক দিলেন। সহজ হাসিমুখের তলায় শ্রান্তির ছাপ লক্ষ্য করলেন জ্যোতিরাণী। চুলে তেল পড়েনি বোধ হয় কয়েকদিন। শমী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সেদিকে চেয়ে কালীদা বললেন, মেয়েটা দেখতে দেখতে বড় হয়ে গেল। বোসো ···

বসলেন।

চায়ের পেয়ালা রেখে তাঁর দিকে ফিরলেন।—তোমাকেও তো বেশ শুকনো

শুকনো দেখছি, শরীর ভালো তো?

হ্যাঁ।

সহজ বাক্যালাপের সুরে কালীদা বললেন, তুমি আগের স্কুল ছেড়েছ শুনেছিলাম, অন্য স্কুলে ঢুকেছ শুনেছি কিনা মনে নেই। আর মিত্রাকে নিয়ে অত ধকলের পর খেয়ালও ছিল না।···হাসপাতালে চোখ বোজার আগে দু-তিনবার তোমার নাম করেছিল, বোধ হয় দেখতে চেয়েছিল, তাই যাবার সময়ে কোন্ মূর্তিতে গেল একবার দেখিয়ে যাই ভাবলাম।

নিজের অগোচরে জ্যোতিরাণী উদ্‌গ্রীব। কথার সুর শান্ত, নিস্পৃহ।—খবর দিলেন না কেন?

হ্যাঃ। অর্থাৎ খবর দেওয়ার প্রসঙ্গ বিবেচনাযোগ্যও ভাবেননি। বললেন, তাছাড়া মারা যাবার আগেই সতের ঝামেলা, মারা যাবার পর তো কথাই নেই। পুলিসের টানা-হেঁচড়া, পোস্ট-মর্টেম। সকালে মরেছে, বডি পেতে পেতে বিকেল—

মুহূর্তের মধ্যে ভিতরে বুঝি তোলপাড় হয়ে গেল জ্যোতিরাণীর। মিত্রাদি কেমন, মিত্রাদি তাঁর কোন্ স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছে আর কত ক্ষতি করেছে, কয়েক নিমেষের জন্যে তাও যেন ভুলে গেলেন জ্যোতিরাণী।—কেন? মিত্রাদির কি হয়েছিল?

হয়নি কিছু, পেন্সিল-কাটা ছুরি দিয়ে গলার এই জায়গাটা ছিঁড়ে নিয়ে এসেছিল। আঙুল দিয়ে নিজের কণ্ঠনালীর কাছটা দেখালেন কালীদা।

জ্যোতিরাণী শিউরে উঠলেন। অস্ফুট আর্তনাদের মত একটা শব্দ বেরুলো গলা দিয়ে। স্তব্ধ খানিকক্ষণ। পরক্ষণে মনে পড়ল কি।···মিত্রাদির আশা ছিল—ত্রিকোণ রাস্তার বড় বাড়ির খালি জায়গা দখল করবে, বাড়ির আর অঢেল ঐশ্বর্যের কর্ত্রী হবে। আত্মহত্যা করল কেন, বাড়ি আর ঐশ্বর্যের মালিক তাকে বিয়ে করতে রাজি হল না শেষ পর্যন্ত—সেই দুঃখে? কিন্তু কালীদার দিকে চেয়ে সেই রকমও মনে হল না, ওই সহজতার আড়ালে দু চোখ চকচক করেছে একটু, আর মুখখানাও অকরুণ দেখাচ্ছে।

জিজ্ঞাসা না করে পারলেন না।—এ-রকম করল কেন? কি হয়েছিল?

শুনলেন কেন, আর কি হয়েছিল।

দিন চারেক আগে সন্ধ্যার পর মিত্রাদি ত্রিকোণ রাস্তার বাড়ির দোতলায় উঠেছিল। বাড়ির মালিক ঘরে ছিলেন। খুশি মুখেই দোতলায় উঠেছিল মিত্রাদি। দুজনে একসঙ্গে রাতের কোনো ফাংশনে যাওয়ার কথা ছিল বোধ হয়। কালীদা তখন নিজের ঘরেই ছিলেন। একটু বাদে সেদিনের খবরের কাগজটা

শুধু শামুকে দিয়ে কর্তার ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। কর্তার যদি দেখার দরকার হয় বা আর কেউ যদি দেখে। কাগজের প্রথম পাতার কোণের দিকের একটা খবরে লাল পেন্সিলে গোল করে দাগ দেওয়া ছিল।

হঠাৎ মেয়ে-গলার কানের পর্দা-ছেঁড়া চিৎকারে বাড়ির সকলে চমকে উঠেছিল। কেবল না-না-না-না আর্তনাদ একটা। বুকে অস্ত্র-বেঁধা প্রাণীর শেষ আর্তনাদের মত। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যাবার মত। সিতু মেঘনা শামু ভোলা ছুটে এসেছিল, কালীদাও বেরিয়ে এসেছিলেন। রাস্তায়ও লোক দাঁড়িয়ে গেছল।

...ঘরের মধ্যে বাড়ির মালিক কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে, আর মিত্রাদি শর-বেঁধা পশুর মতই মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। আর কেবল সেই আর্তনাদ, না-না-না-না। খবরের কাগজটা তার পাশে মাটিতে লুটোচ্ছে।

কালীদাই প্রথম ঘরে ঢুকেছেন। মিত্রাদিকে মাটি থেকে টেনে তুলতে চেষ্টা করেছেন। তাঁকে দেখে মিত্রাদির হুঁশ ফিরেছে, চোখের পলকে নিজেই উঠে দাঁড়িয়েছে, তারপর পাগলের মত ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটতে ছুটতে চলে গেছে। আর তারপরেও বাড়ির মানুষগুলোর সম্বিৎ ফিরতে সময় লেগেছে।

বিবর্ণ-পাংশু বাড়ির মালিক শিবেশ্বর চাটুজ্যে কালীদাকেই জিজ্ঞাসা করেছেন, কি হয়েছে, কাগজ দেখেই ওরকম করল কেন? কি খবর বেরিয়েছে?

মাটি থেকে কাগজটা তুলে কালীদা লাল দাগ দেওয়া অংশটুকু তাঁকে দেখিয়েছেন।

ছোট খবর। অমুক নামের দার্জিলিঙবাসিনী কুড়ি-একুশ বছরের সুশ্রী এক বাঙালী ছাত্রীর মর্মান্তিক মৃত্যু-সংবাদ। স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা ছিল। সেখানকার দুজন সম্ভ্রান্ত পুরুষ এবং এখানকার এক-জোড়া আধবয়সী হাতুড়ে দম্পতি এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। নির্বিঘ্নে সঙ্কটত্রাণের আশ্বাস দিয়ে মেয়েটিকে ওই দম্পতিটির বাড়িতে এনে তোলা হয়েছিল। বিপদ উদ্ধারের স্থূল নৃশংস প্রচেষ্টার ফলে এই শোচনীয় মৃত্যু। জেরায় প্রকাশ, ওই প্রচেষ্টার আগে মেয়েটির হাত-পা বেঁধে মুখে কাপড় গুঁজে দেওয়া হয়েছিল। সেই প্রাণঘাতী যাতনা কল্পনাসাপেক্ষ। মেয়েটির মৃতদেহ সরকারী হেপাজতে চালান দেওয়া হয়েছে।

পড়ার পরেও প্রায় দুর্বোধ্য ঠেকছিল শিবেশ্বর চাটুরজ্যে কাছে। কালীদা জানিয়েছেন, মেয়েটি মৈত্রেয়ীর।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মিত্রাদি নিজের গলায় ছুরি চালিয়েছিল পরদিন সন্ধ্যায়। তার আধ ঘণ্টার মধ্যে চাকরের টেলিফোন পেয়ে কালীদা গেছেন। আয়নার সামনে মেঝেতে পড়েছিল মিত্রাদি। ঘর রক্তে ভাসছিল। সেখান

থেকে হাসপাতাল। ডাক্তার বলেছে, আত্মহত্যার এমন আসুরিক চেষ্টার নজির কমই দেখা যায়। হাসপাতালে প্রায় ছত্রিশ ঘণ্টা বেঁচেছিল মিত্রাদি। কথা বলতে পারেনি, কিন্তু অনেকসময় জ্ঞান ছিল। যতবার খেয়াল হয়েছে কালীদা পাশে বসে আছে, ততোবার তাঁর দিকে চেয়ে দু হাত জোড় করেছে। আর শেষের দিকে বারকয়েক জ্যোতিরাণীর নাম করেছে।

স্তব্ধ, নির্বাক খানিকক্ষণ। সর্বাঙ্গ সিরসির করেছে জ্যোতিরাণীর। কালীদার দিকে চোখ পড়তে সচকিত একটু। কালীদা তাঁর দিকেই চেয়ে আছেন। তাঁর দু চোখ আগের থেকেও বেশি চকচক করছে এখন। ঠোঁটের ফাঁকে আর গালের ভাঁজে ধারালো ছুরির ফলার মতই একটুকরো হাসি।

বললেন, তোমার আর যত লোকের যত ক্ষতি মিত্রা করেছে, তার সবটা না হোক কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে···কি বলো ?

মাইলের কাঁটা যে দাগে উঠলে সিতুর ছোটার সঙ্গে মেলে, দুনিয়ার কোনো গাড়ির স্পিডোমিটারে সে-দাগ নেই।

তার এই তেইশ বছর বয়েসটা এখনো পিছনের নানা বাঁকে আটকে আছে। সেই দশ বছরের বাঁকে, চৌদ্দ বছরের বাঁকে, আঠেরোর বাঁকে। আরো বহু বাঁকে। ক্ষয়ের সহজ পথ না পেয়ে সেইসব রুদ্ধ আবেগ শুধু জমাট বেঁধেছে। জমাট বেঁধে বেঁধে এই তেইশের রূপ নিয়েছে। তেইশের এ-যৌবন ক্ষ্যাপার মত তার কাঁধে চেপে আছে। কখন ওটা চাবুক চালায় ঠিক নেই। ও কেবল ছোটে ছোটে আর ছোটে। দুর্বার উচ্ছৃঙ্খল ছোটার তাড়না রক্তের ভিতর দিয়ে তাপ ছড়াতে ছড়াতে মাথার দিকে ধাওয়া করে। ছোটার নেশা ততো বাড়ে।

সিতুর গাড়ি হয়েছে অনেকদিন আগেই। ছোট অস্টিন। এমনি হয়নি, ও আদায় করেছে। কারো ইচ্ছে-অনিচ্ছে বা মতামতের পরোয়া করেনি। সব ব্যবস্থা করে বাবাকে বলেছে, তার গাড়ি আসছে, টাকা লাগবে।

গাড়ি আসার পনের দিনের মাথায় পাশে ড্রাইভারও রাখেনি। গাড়ি নিয়ে বেরোয় যখন কোথায় যাচ্ছে জানে না, ফিরবে কখন তাও না। ছোটার তাগিদে ছোটে। ছোটাটাই অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে এখন। কলকাতার বেষ্টনী ছাড়িয়ে বাইরেও কতবার বেরিয়ে পড়েছে ঠিক নেই। বিশ পঁচিশ পঞ্চাশ মাইল নয়,

পাঁচশ, হাজার মাইলও পাড়ি দিয়েছে। একা, সঙ্গে শুধু টাকা সম্বল। বেরোয় যখন, মনে হয় আর ফিরবে না। কদিন না যেতে আবার কি এক অদৃশ্য আকর্ষণ তাকে ঘাড় ধরে টেনে আনে।

বি-এসসি পাস করেছে তিন বছর আগে। পরীক্ষার আগে মাসখানেক বই-গুলো উল্টেপাল্টে দেখেছিল। পাস-ফেলের ভাবনা ছিল না। পরীক্ষা একটা দিতে হবে, তাই দিয়েছিল। ধরেই নিয়েছিল সেটাই শেষ পরীক্ষা। পাস কোর্সে ঠেকেঠুকে উতরে গেছে। উতরে গেছে কিনা সেটা জানারও আগ্রহ ছিল না। তারপর কিছুই আর করছে না দেখে জেঠুই একদিন ডেকে বলেছিল, তার সঙ্গে অফিসে আসতে, কাজ-কর্ম দেখতে।

কথাটা যে তার নয়, বাবার—জেঠু স্পষ্ট করে না বললেও সিতু বুঝেছিল। বাবার বাইরেটা তেমনি, কিন্তু ভিতরের একটু পরিবর্তন বুঝতে পারে। মিত্রামাসী আত্মহত্যা করার পর থেকে কি…? না, তারও অনেক আগে থেকেই। সেই মা চলে যাবার পর থেকেই বোধ হয়। তবু কটা বছর বাবা মেজাজ আর ঝোঁকের ওপর কাটিয়েছে। সিতুর চোখ-কান খোলা সর্বদা। আর মাথার ভিতরে সারাক্ষণের এক বিশ্লেষণের যন্ত্র বসানো। টাকার আমদানি আগের থেকেও বেড়ে চলেছে মনে হয়। তবু তার বরাবরই ধারণা, মা চলে যাবার পর থেকেই বাবার শক্তি অনেক ক্ষয় হয়ে গেছে। বাবার মেজাজ, রাগ-বিরাগ, ক্ষিপ্ততা সব কিছুর লক্ষ্য ছিল একজন। সেই একজন লক্ষ্যচ্যুত হতে বাইরের মেজাজ আর রাগ-বিরাগের খোলসটা তেমনি আছে বটে, ভিতরে যেন শাঁস নেই, শেকড় নেই। এখন আগের থেকে আরো গম্ভীর, কিন্তু সেও দাপটশূন্য।

তার প্রতি অলক্ষ্য বাবার মনোযোগ সিতু বিশেষ করে টের পেয়েছিল মিত্রা মাসী মারা যাবার পর থেকে। জেঠুর কালো নোটবইয়ের সেই লেখাগুলোর এক বর্ণও দুর্বোধ্য নয় এখন। ক বছর ধরে জেঠু নোটবইটা কোথায় সরালো কে জানে। ওটার প্রতি সিতুর কৌতূহল আগের থেকেও ঢের বেশি। অনেক খোঁজাখুঁজি করেছে। না পেলেও মনে আছে সবই। মায়ের ওপর ওর অমন দুর্বার আক্রোশের হেতু নিজের কাছেই স্পষ্ট নয় খুব। অনেকসময় নিজেরই বিস্ময় জাগে, অহেতুক প্রতিহিংসার এই তাপ বাবার থেকে পেলো কিনা। অথচ আশ্চর্য, বাবার উপরে তার বিতৃষ্ণা একেবারে স্পষ্ট। সিতু আগেও তাকে পছন্দ করত না। এখন সেটা বিতৃষ্ণায় দাঁড়িয়েছে। মা চলে যাবার পর বাবা অনেক সময় তার পড়ার টেবিলের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, নয় তো দূরে দূরে পায়চারি করেছে আর মাঝে মাঝে তার দিকে চোখ তুলে তাকিয়েছে।

কিন্তু সিতু কখনো কাছে ঘেঁষেনি, বাবা কাছে আসুক তাও চায়নি। তার আই-এসসি পরীক্ষার ফল দেখে বাবা অবাক। অত অবাক হতে দেখেই সিতুর মনে হয়েছিল পাস না করে ফেলটা করলে আরো ভালো হত। বি-এসসিতে পাস ফেলের চিন্তাই করেনি। তবু উৎরেই গেছে। তারপর থেকে বাড়িতে শুধু থাকা-খাওয়ার সম্পর্ক। তাও কমে আসছে। শুধু টাকার সম্পর্কটা আছে। বাবা সেটা লক্ষ্য করেনি তাও ভাবে না। বেশি রাতেও বাড়ি ফেরার পর বাবার ঘরের আলো নিভতে দেখে। আর সেরকম দরকার হলে বিছানার তলা থেকে চাবি নিয়ে সিতু তার সামনেই সিন্দুকও খোলে। কোনরকম অনুশাসন আর চলবে না সেটা বুঝেছে বোধ হয়, ও বোঝাতেই চায়।

জেঠু অফিসের কাজকর্ম দেখার কথা বলতে সাদাসিধে জবাব দিয়েছে, তার দ্বারা ওসব হবে না। মুখের ওপর তাকে অমান্য করে না, তা বলে পরোয়াও আর তেমন করে না। জেঠুর বলার সুরে হুকুমের আভাস ছিল না, তারও জবাবের সুরে ঝাঁজ কিছু ছিল না। তার পরেও জেঠু হেসে বলেছিল, তোর দ্বারা কি হবে তাই ঠিক কর তাহলে, তোর বাবাকে জানিয়ে দিই।

সিতু তক্ষুনি ধরে নিয়েছিল তাকে নিয়ে দুশ্চিন্তাটা জেঠুর নয়, বাবার। জবাবের সুরও বদলেছে তখন—কিছু না করলে বাবা কি করবে জানতে পারলে তখন বলব।

এরই মধ্যে একটু ভালো লাগে ছোট দাদু যখন হঠাৎ-হঠাৎ এসে হাজির হয়। ছেলেবেলার গল্পের আসরের কাল গেছে। কিন্তু ভারী মিষ্টি স্মৃতির মত সেই সব গল্প মনের তলায় ছড়িয়ে আছে। আগের থেকে গম্ভীর হয়েছে ছোট দাদু। তাও শ্রীশূন্য নয়। ভালো লাগে। আবার এই ছোট দাদুর ওপরেও রাগ হয় তার। এটা অন্য রকমের রাগ। মনে হয়, ছোট দাদু কিছু একটা সুখের সন্ধানে আছে, কোনো শান্তির উৎস খুঁজছে, কি সুখ, কোন্ শান্তি, সিতুর ধারণা নেই। কিন্তু ও দুটোর সঙ্গে আপসও নেই। কি মনে পড়লে নিজেই কৌতুক বোধ করে। কালো ডায়েরিতে ছোট দাদুর সম্পর্কে জেঠুর লেখা মনে পড়লো। জেঠু কেন ছোট দাদুকে পাষণ্ড বলেছিল আর মরতে উপদেশ দিয়েছিল সেটা বোঝার মত বুদ্ধি বছর কয়েক আগেই হয়েছে। কল্পনার লাগাম টানার অভ্যেস নেই। একটা সম্ভাবনার চিত্র চোখের সামনে দাঁড় করাতে গিয়ে হেসেই ফেলেছিল। মনে মনে ছোট দাদুর রসজ্ঞানের তারিফ করছে। জেঠুর ভাষায় ছোট দাদু কতটা মরেছিল জানতে ইচ্ছে করেছে। দশ বছরের সিতু কত সময়ে হাঁ করে মা-কে চেয়ে চেয়ে দেখত মনে পড়ে। কেমন দেখত তাও। ষোল বছরের সেই মা-কে ছোট দাদু কেমন দেখত? মা যখন কারো বউ হয়নি, কারো মা হয়নি—

তখন ?

হাসি মিলোবার আগেই চোয়াল শক্ত হয়েছে। খরখরে চোখের তাপে আগে নিজের ভিতরটা ভস্ম করতে চেয়েছে। নিজের উদ্দেশে অস্ফুট গালাগাল করে উঠেছে। বিস্মৃতির তন্ময়তা থেকে সরোষে নিজেকে ছিঁড়ে নিয়ে এসেছে।

ছোট দাদু এলেই ওকে নিয়ে পড়ে। অনুযোগ করে, বকা-ঝকাও করে একটু আধটু। এবারেও এসে বলেছিল, এ-রকম বাউণ্ডুলে হয়ে গেলি কেন ?

সিতু হাসিমুখেই পাল্টা প্রশ্ন করেছে, তুমি যা হয়েছ তার নাম কি ?

বিব্রত মুখে ছোট দাদু চোখ পাকাতে চেষ্টা করেছে, আমাকে বাউণ্ডুলে বলিস ! ডাকব তোর বাবাকে ?

মুখের হাসিতে টান ধরেছিল সিতুর। একটা স্মৃতির ধাক্কা সামলাতে হয়েছে। আগেও ছোট দাদু এমনি চোখ পাকাতো, বাবাকে ডাকার কথা কখনো বলত না, সর্বদাই শাসাতো, ডাকব তোর মাকে ?

পায়ের চাপে গাড়ির গতি বাড়ে, স্পিডের কাঁটা ঘোরে। বেপরোয়া গাড়ি চালানোর দায়ে গোটাকতক ওয়ার্নিং খেয়েছে, বারকয়েক জরিমানা দিয়েছে। পথ-নীতির সেসব গণ্ডগোল সামলাবার দায় সিতুর নয়। জেঠু সামলায়, বাবা তাকে সামলাতে বলে। বার দুই ড্রাইভিং লাইসেন্স বাতিল হতে বসেছিল। সিতু বাবাকে জানিয়ে খালাস। বাবা জানে লাইসেন্স বাতিল হলেও ও গাড়ি চালাবে। তখন আরো মুশকিলের সম্ভাবনা। অতএব ব্যবস্থা যা করার বাবাই করুক, দুর্ভাবনা সিতুর নয়।

তার এই ছোটাছুটিটা যৌবনের উদ্দীপনা কিছু নয়, সবটাই উত্তেজনা। দুটো আলাদা জিনিস। উদ্দীপনা নিজের ভিতর থেকে পুষ্টির রসদ পায়, উত্তেজনা দোসর খোঁজে। সিতুর দোসর নেই। ছেলেবেলার বন্ধুরা নাগালের মধ্যেই আছে, ফাঁক পেলে তারা কাছে আসতেই চায়। কিন্তু সিতুর ভিতরটা দূরে সরেছে। কারণ, ও থেমে নেই, বাদবাকি সকলে যেন এক জায়গাতেই থেমে আছে। দেখা হলে ভীতু অতুল তিন কথার পরেই নিজের বুকের ব্যথাটার কথা তোলে, আর অত জোরে গাড়ি চালানো উচিত নয় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই উপদেশ দিতে চেষ্টা করে। চালবাজ দুলুর ফ্যাক্টরী বন্ধ থাকলে আগের মতই আড্ডা জমাতে চায়। ফ্যাক্টরীতে কোন ওপরঅলার মুখের ওপর কবে কি বলল, আর ওর কোন্ কাজে সকলের তাক লাগল—ঘুরে ফিরে এই গণ্ডীর মধ্যেই বিচরণ তার। ক্লাসের সেই ভালো ছেলে সমর—উত্তর বলার জন্যে যে হাত তুলে ঘোড়ার মত লাফাতো—কলেজ ছাড়ার পরে তার সঙ্গেও মাঝে-মধ্যে দেখা হয়। গেল বারে

এম-এ পাস করে এখন রিসার্চ করছে। জ্ঞানের কোন্ দুরূহ সিঁড়ি বেয়ে উঠছে ও, আর কত কি জানে, সেটা জানাবার জন্যে সেই ছেলেবেলার মতই উদগ্রীব। আর নেশা-গর্বী সজারু-মাথা সুবীর, কলেজে পড়ার সময় বন্ধুত্ব যার সঙ্গে সব থেকে বেশি জমে উঠেছিল—সে এখন সামান্য কি একটা চাকরি করছে, নিতাইদার সঙ্গে তার ভাবটা এখন বাংলা-মদে এসে ঠেকেছে। সেদিনও সাগ্রহে চুপিচুপি সিতুকে এসে জানিয়েছিল, সিনেমায় গোপন ছবি দেখানো হয় এমন একটা জায়গার সন্ধান পেয়েছে, তবে সেসব দেখতে এমনি সিনেমার অনেক গুণ বেশি টাকা লাগে···

ওরা সব সেই এক জায়গাতেই থেমে আছে, ছুটছে শুধু সিতু একা। তাই তার দোসর নেই।

গাড়ি চালাতে চালাতে সিতুও হঠাৎ থেমে যায় এক-একসময়। কিন্তু সেটাকে ঠিক থামা বলে না।···উল্টো দিক থেকে আসছে হয়ত চোখে পড়ার মত কোনো মেয়ে বা বউ। অথবা কোনো অচেনা বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে তেমনি কেউ। বেগের মুখেই সিতুর গাড়িটা আচমকা থেমে যেতে পারে। যে-কারণে থামল, বেপরোয়া দু চোখ সেদিকে ধাওয়া করবে। সেটা এত স্পষ্ট যে অপর দিক থেকে বিরক্তি অথবা বিতৃষ্ণার ঝাপটা আসবেই। তারপর নিজেই ঘাবড়ে গিয়ে বা অস্বস্তি বোধ করে তরুণী বা মহিলা পাশ কাটাবে অথবা বারান্দা থেকে সরে যাবে। এই নিয়ে ছোটখাটো এক-আধটা বিপদের সূচনাও হয়ে গেছে। আত্মস্থ হয়ে তখন আরো বেপরোয়া গাড়ি চালিয়েছে। নির্জন পথে একবার এমনি এক অবাঙালী মেয়ে ট্যাক্সির আশায় দাঁড়িয়েছিল। সিতুর গাড়িটা ঘ্যাঁচ করে তার পাশেই দাঁড়িয়ে গেছল। পাশের দরজা খুলে দিয়ে বলেছিল, ট্যাক্সি এখানে চট্ করে মিলবে না, লিফ্‌ট্ দিতে পারে।

ঠাণ্ডা ধন্যবাদ জানিয়ে মেয়েটা অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়েছিল। কিন্তু গাড়িটা দাঁড়িয়েই থাকল দেখে আবার ফিরে তাকাতে হয়েছে। দরজাও তেমনি খোলা। চালকের শ্যেন-চক্ষু দুটো শিকারীর চোখ। ক্রুদ্ধ মেয়েটা ঝাঁজিয়ে উঠে তাকে নিজের রাস্তা দেখতে বলেছিল। জবাবে সিতু ধীরে সুস্থে নেমে তার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল। আমি রাস্তায় গাড়ি নিয়ে দাঁড়াব, তুমি আমাকে যেতে বলার কে?

মুখ লাল করে মেয়েটি প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিল, তুমি দূর হবে কিনা আমি জানতে চাই!

সিতুর চোখে হাসি, চোয়াল শক্ত। বলার ইচ্ছে, এখনো দিনের আলো আছে, ভগবানের দয়ায় আর একটু অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত ট্যাক্সি না পেলে গাড়িতে তুলতে

পারে কিনা দেখে যাওয়ার বাসনা। কিছুই বলা কওয়ার ফুরসত মেলেনি। কলকাতায় নির্জন রাস্তা কত আর নির্জন। পাঁচ-সাতজন লোক এসেই গেল। ভরসা পেয়ে উত্তেজিত মেয়েটা তাদের কাছে অভিযোগের মর্ম স্পষ্ট করে তোলার আগেই সিতু বাধা দিয়ে উঠেছিল, ওয়েট্ ওয়েট্—গোইং টু ফার মাইডিয়ার। তারপর উপস্থিত মানুষ-কটির দিকে ফিরে ঠোঁটে হাসি টেনে বলেছিল, ব্যাপার বুঝতেই পারছেন মশাইরা, কপাল মন্দ, বিরাগের অধ্যায় শেষ হয়নি এখনো—গুড বাই!

সকলের বিমূঢ় মুখের ওপর দিয়ে গাড়ি হাওয়া।

ঠিক এই তালেই সিতুর সাহস বেড়ে চলেছিল। পরশুরাম নাকি জগৎ নিঃক্ষত্রিয় করেছিল কতবার। ওরও বুঝি জগৎটাকে রমণী-শূন্য করার তাড়না। এই ধ্বংসের রূপটা অবশ্যই ভিন্ন।

স্বেচ্ছা-দোসর একজন আছে। দুলালের দিদি নীলিদি। গাড়িতে ওঠার জন্য পা বাড়িয়েই আছে। তাকে আবার এড়িয়ে চলার দায় সিতুর। তাকে দেখলে ধ্বংসের তাপ জুড়োয়। টাকা দিয়ে অনুকম্পা দেখাতে আপত্তি নেই। গাড়িতে উঠতে চাইলেই মেজাজ বিগড়োয়। তার থেকে মাথা-উঁচু রঞ্জুদি বরং এখনো বেশি চোখ টানে তার।

সেদিন একটা কাণ্ড হয়ে গেল।

দিনটা এই ষাট সালের ষোলই জুলাই। আসামের বাঙালী নিধন যজ্ঞের প্রতিবাদে কলকাতার বাতাস গরম। হরতালের দিন। গৌহাটি শিবসাগর জোড়হাটের পাল্টা কিছু এখানেও ঘটে কিনা কলকাতার অবাঙালী মহলে সেই ত্রাস। কিছুই ঘটেনি। বিকেলের ফাঁকা রাস্তায় সিতু গাড়ি হাঁকিয়ে চলেছিল। রাস্তা ফাঁকা হলেও ফুটপাথ ফাঁকা ছিল না। বিকেল চারটের পরে বাস ছাড়ার কথা। সেই বাসের প্রত্যাশায় এক-এক জায়গায় পঞ্চাশ-ষাটজন করে লোক দাঁড়িয়ে। ময়দানের মিটিং-এ যাবে। পাঁচটা মেয়ে অপেক্ষা করছিল এক বাসস্টপে। স্বভাবতঃই সিতুর চোখ সেদিকে গেছে। তারপরেই ব্রেক কষে গাড়িটা থেমে গেছে। বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে রঞ্জুদি।

মুখে নয়, প্রশ্ন সিতুর চোখে—আসবে?

গাড়িসহ সিতুকে দেখে রঞ্জুদি এই প্রথম খুশি বোধ হয় একটু। ঘণ্টা দুই দাঁড়িয়ে থাকলেও এমন অভদ্র ভিড় ঠেলে উঠতে পারত না হয়ত। এগিয়ে এলো। সিতু দরজা খুলে দিতে রঞ্জুদি পাশে বসল। তারপর নিজেই দরজাটা বন্ধ করে হাসিমুখে তার দিকে তাকালো। গাড়ি ততক্ষণে স্টার্ট নিয়ে এগিয়ে গেছে।

রঞ্জুদি বলল, খুব পেয়ে গেলাম তোমাকে, আজ আর ওঠার আশা ছিল না।

তুমি বলছে, সিতুর কান এড়ালো না। গাড়ির বেগ বাড়ছে। এই রঞ্জুদি ডানা ধরে হিড়হিড় করে মায়ের কাছে তাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, ভোলেনি। সিতু যখন বি-এসসি পড়ে, তখনো ছোট ভাইয়ের বন্ধু হিসেবে ছেলেমানুষই ভেবেছে। এখনো তাই ভাবে বোধ হয়, এই আল্‌গা সম্মানটুকুও হয়তো গাড়ির দৌলতে। এই কারণেই পাশের রঞ্জুদিকে একটু বেশি ভালো লাগছে সিতুর, কিছু তাকে বুঝিয়ে দেওয়ার বাসনা।—এই হরতালের দিনে বেরিয়েছিলে যে?

অনেক কাজ। অফিস থেকে জিপ পাঠিয়ে চুপি চুপি তুলে নিয়ে গেছে, বাইরে ফটক বন্ধ. ভিতরে কাজ চলেছে, এখন আর জিপ দেবে কেন, বলে দিল, বাস চলছে, নিজেরাই যাও।

রঞ্জুদি কি চাকরি করে সিতু জানে, রেডিও পার্টস জোড়ে, প্যাকিং-এর কাজ করে। সাদামাটা প্যাকিং নয়, এর জন্যেও আগে ট্রেনিং নিতে হয়েছিল শুনেছে। মন্তব্যের স্বরে সিতু হাল্‌কা প্রশ্ন ছুঁড়েছে, হরতালের দিনে মেয়েদের জীপে করে নিয়ে এসে ফটক বন্ধ করে······বেশ রসিক কোম্পানী বলো তোমাদের।

রঞ্জুদি ঈষৎ বিস্ময়ে তাকালো তার দিকে। না হেসেও পারেনি একটু।—তুমিও তো বেশ রসিক হয়ে উঠেছ দেখছি। বলার স্বরটা দিদি-জনের মত।

সিতুর ঠোঁটে পুরুষের হাসি দাগ কেটে বসছে। কথা বেশি বলছে না। নীরবতা লক্ষ্য করুক, তাই চায়। কিন্তু রঞ্জুদির লক্ষ্য সামনের দিকেই। অতএব গম্ভীরমুখে দ্বিতীয় দফা রসিকতার নজির দেখানোর তাড়না সিতুর—অতুল বলছিল, দু-দুবার তোমার বিয়ে হব-হব করেও হল না···সেই রাগে এখন প্যাকিং বাক্সের কাজেই জীবন বিসর্জন দেবে ঠিক করলে?

রঞ্জুদির মুখখানা আবারও তার দিকে ফিরেছে। তেমন ফর্সা নয়, তবু মুখে চাপা লালের আভাস লক্ষ্য করেছে সিতু। একটু থেমে সংযত কিন্তু পাল্টা পরিহাসের সুরে রঞ্জুদি বলল, তুমি তো মস্ত ঘরের ছেলে, জীবন বিসর্জন দেবার মত আরো বড় কিছু তোমার হাতে আছে?

ষ্টিয়ারিং-এ চোখ রেখে সিতু জবাব দিল, থাকলেও আমার হাতে পড়তে কি তুমি রাজি হবে······।

রঞ্জুদির এবারের মুখ দেখার মত। সিতু আড়ে আড়ে দেখছে। পুরুষের পাশে বসে আছে টের পেতে শুরু করেছে মনে হয়। গাড়ির বেগ আরো বেড়েছে।

রঞ্জুদির হঠাৎ খেয়াল হল গাড়ি চেনা রাস্তা ধরে চলছে না। মাঠ-ঘেঁষা ফাঁকা রাস্তা একটা। আর যাই হোক, বাড়ির পথ নয় এটা। সচকিত হয়ে জিজ্ঞাসা

করল, এ কোন্‌দিকে যাচ্ছি ?

সিতু জবাব দিল, আমি দিক-কানা, ফাঁকা রাস্তা পেলাম চালিয়ে দিলাম।

রঞ্জুদির মুখে দ্বিধার ছায়া নেমেছে, বলল, তুমি আর কোথাও যাবে জানতুম না, আমার এখনই বাড়ি ফেরা দরকার।

কেন, খিদে পেয়েছে ?

না।

সামনে চোখ, সিতুর নির্লিপ্ত মুখ। কিন্তু ভিতরটা নির্লিপ্ত নয়, হেসে উঠে এ বৈচিত্র্য পণ্ড করার ইচ্ছে নেই। জিজ্ঞাসা করল, বাসে গেলে দু ঘণ্টার আগে বাড়ি ফেরা হত না বোধ হয়, তারও আগে ফেরা দরকার ?

রঞ্জুদির মুখে জবাব যোগালো না। তার চোখেমুখে চাপা বিস্ময়, চাপা অস্বস্তি। এ-দিকের রাস্তা দেখার অছিলায় বারকয়েক তাকিয়েছে তার দিকে। সামনের রাস্তা আরো নির্জন, গাড়ির ভয়াল গতি। কিন্তু সিতু এটুকুতেও পরিতুষ্ট নয়। এক হাত স্টিয়ারিং-এ রেখে অন্য হাত বুক-পকেটে ঢোকালো। সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার বার করে নিজের কোলের উপর রাখল। এক হাতেই প্যাকেট খুলে ঠোঁটের ডগায় সিগারেট ঝোলালো একটা। এই গতির মুখে এক হাতে লাইটার জ্বেলে সিগারেট ধরানো সম্ভব নয় যেন। লাইটারটা কোল থেকে তোলার অবকাশ পেল না, দু হাতে স্টিয়ারিং ধরার দরকার হল।

ওটা জ্বালো তো।

রঞ্জুদি থমকে ফিরে তাকিয়েছে আবার। কোলের ওপর লাইটারটা দেখেছে। হাতে করে ওটা তুলেও নিতে হল। বারচারেক চেষ্টার পরে জ্বালতে পারল। সিতু হেসে উঠে বলল, এই তো হয়েছে, এই এক জিনিস মেয়েদের শেখাতে হয় না।

মুখ বাড়ানোর আগেই আগুনটা নিবে গেল। অগত্যা বার দুই জোরে বোতাম টেনে লাইটারটা আবার জ্বেলে দু হাতে বাতাস আড়াল করতে হল। আর সিগা-রেটের মুখে এগিয়ে দেবার জন্য পাশের দিকে না ঝুঁকেও উপায় নেই। অঘটন না ঘটিয়ে চট করে সিগারেটটা ধরিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে সিতু তাড়াতাড়ি বেশি ঝোঁকার ফলে রঞ্জুদির কাঁধে কাঁধ ঠেকল। হাতে থুতনি ঠেকল। আর সিগারেট ধরাবার ওইটুকু ফাঁকে তার চোখে চোখ রাখল একবার। রঞ্জুদির দু চোখ আট-দশ আঙুলের মধ্যে।

যাক, বোঝানোর পর্ব ভালো মতই শেষ হয়েছে। রঞ্জুদির হাত থেকে লাইটার ফেরত নিয়ে পকেটে পুরেছে। হাতের স্পর্শের, কাঁধের স্পর্শের, থুতনির স্পর্শের আর সব শেষে অব্যর্থ নিবিড় চাউনির স্পর্শেই প্রতিক্রিয়া দেখার লোভে ঘুরে বসে

তাকাতে ইচ্ছে করেছে সিতুর। স্থির গাম্ভীর্যে শক্ত হয়ে আছে রঞ্জুদি। কিন্তু সিতু এখন যে কোনো বাজী রেখে বলতে পারে, চাক বা না চাক, পুরুষের পাশে বসে আছে ছাড়া আর কিছু এখন ভাবতে পারছে না। ইচ্ছে করলে সিতু রঞ্জুদির মুখের এই গাম্ভীর্যও রসাতলে পাঠাতে পারে, ভয়ের কাঁপুনি ধরিয়ে দিতে পারে। লোভ একটু-আধটু না হচ্ছিল তা নয়। কিন্তু থাক, অনেক হয়েছে। এটুকুই মনে থাকবে বোধ হয়। গাম্ভীর্যের আড়ালে ভিতরের অস্বস্তি আর হতভম্ব-বিস্ময় কাটিয়ে উঠতে পারলেই ফিরতে বলবে জানা কথা। অতএব এবারও পুরুষোচিত কাজ করল সিতু। সামনের বাঁকের মুখে গাড়ি ঘুরিয়ে দিল।

পঁচিশ মিনিটের মধ্যে বাড়ির সামনের গলি। গাড়িটা থামতে রঞ্জুদি আত্মস্থ। ঘড়ি দেখে সিতু বলল, বাসের থেকে কিছু আগেই ফিরেছ। আর প্রাণ নিয়েই ফিরেছ। তার গা ঘেঁষে হাত বাড়িয়ে দরজাটা খুলে দিল।

রঞ্জুদি নামতে সশব্দে দরজা টেনে দিল। হাসছে অল্প অল্প। রঞ্জুদিও তাকিয়েছে তার দিকে। গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করেনি সিতু, গাড়িটা বাড়ির দিকে ঘুরিয়ে শেষ-বারের মতই ঘাড় ফেরালো। এই রকমই আশা করেছিল, শুধু পুরুষ নয়, অবিশ্বাস্য এক পুরুষ-দেখা চাউনি রঞ্জুদির।

কিন্তু এ খেলার আর এক যাতনা আছেই। বাসনার স্ফুলিঙ্গ নিভিয়ে এ খেলায় নামা যায় না। খেলা দুদণ্ডে ঘোচে। বাসনার তপ্ত কণাগুলো তখন শিরায় শিরায় নেচে বেড়াতে থাকে। দশ বছর বয়সে যে মানসিকতা কৈশোরের বেড়ার ওধারে উঁকিঝুঁকি দিয়ে বেড়াচ্ছিল, তেইশে এসে সেটা নতুন যৌবনের গণ্ডীর মধ্যে বসে নেই।

...সঙ্কল্পটা মুহূর্তের মধ্যে মগজে ঘা দিয়ে গেল। এই রকমই হয়, প্রস্তুতির অবকাশ থাকে না। নিজের সঙ্গে বোঝার ফুরসত মেলে না।

গাড়ি বাড়ির দোরে থামি-থামি করেও এগিয়ে গেল খানিকটা, তারপর বাড়ি পিছনে ফেলে ছুটেই চলল আবার। একবার খালি মনে হয়েছে, কাজটা ঠিক হল না, ছোট দাদু বাড়িতে আছে, না খেয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকে। ফেরা উচিত। কিন্তু অবাধ্য আবেগে ছুটে চলল যে সে আর একজন। তার আচরণে উচিত অনুচিত বলে কিছু নেই।

.

চলেছে হেলেন জোন্সের কাছে। স্টুয়ারডেস হেলেন জোন্স।

যৌবন-বাস্তবের প্রথম রমণী। মাত্র মাস কয়েকের অন্তরঙ্গতা তার সঙ্গে। সেটা যে-কোনদিন শেষ হতে পারে হেলেন জোন্সও জানে। হেসে বলে, তোমার

মত পাগলা ঘোড়াকে টিট করার চাবুক হাতে পেতে ইচ্ছে করে।

হেলেন জোন্স চাবুক চালাতে জানে না। তার চাবুক চালাবার সম্বলও অনেক-টাই নিষ্প্রভ। চাবুক চালানোর ছটা আছে সম্বল আছে, এমন আরো দু-চারটে মেয়ের সন্ধান জানা আছে তার। তবু প্রবৃত্তির অন্ধ তাড়নায় সিতু এখানেই ছুটে আসে। হেলেন জোন্স-এর কাছে। হেলেন জোন্স শক্ত মেয়ে নয়। শক্ত মেয়ের অভিনয়ও করতে পারে না। বলে, গেট আউট, ইউ উইল কীল মি সাম ডে—

বলে বটে, আবার দু হাতে ওর ঝাঁকড়া চুলের মুঠি ধরে জোরে জোরে ঝাঁকায় আর হাসে।

সাহেবপাড়ায় থাকে। সিতুর গাড়ি সেই পথে ছুটেছে।

এই ছোটার মুখে যে মেয়ে-বউকে দেখে তার গাড়ি থেমে যায়, লিফ্‌ট দেবার জন্যে যে মেয়েকে জোর করেই গাড়িতে তুলে নিতে চায়, বা রঞ্জুদির মত যে মেয়েকে পাশে বসিয়ে অশান্ত স্নায়ুর খেলায় মেতে ওঠে—দোসর তারা কেউ নয়। হেলেন জোন্সও নয়।

এরা উপলক্ষ্য। লক্ষ্য শুধু একজন। দোসর শুধু একজন। দু'ঘরের ফ্ল্যাট বাড়ির মেয়ে শমী বোস। আর কেউ না।

মাথার ভিতরে অবিরাম যে আগুন জ্বলে সেটা ছারখারের আগুন। নিজে পুড়বে। শমী বোস পুড়বে। সেই সঙ্গে জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যাবে আর একজন। ওই একজন। যে এখন মিসেস দত্ত। অব্যর্থ থাবা বাড়িয়ে তার বুক থেকে শমী বোসকে সে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে একদিন। যাবেই। কেউ রক্ষা করতে পারবে না।

পাঁচ বছর আগের ময়দানের স্মৃতি ভোলেনি। সেই তাপ ভোলেনি। সেই ব্যর্থতার খেদ ভোলেনি। তবু ভালই হয়েছিল। শমী পালাতে পেরেছিল, ভালই হয়েছিল। তখনো সময় হয়নি। তৃষ্ণার এই পরিণত স্বাদ তখনো জানা ছিল না। গ্রাসের ক্রূর থাবা দুটোর ওপর এই আস্থাও ছিল না। লগ্ন আবারও আসবেই। শেষ লগ্ন। নিঃশেষের লগ্ন।

গত পাঁচ বছরের মধ্যে সিতু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। দোসর বদলাবার মত কোনো প্রলোভন মনের কোণে ঠাঁই পায়নি। সে শুধু প্রতীক্ষা করছে। একটি মাত্র শিকারের প্রতীক্ষা। ব্যাধের অব্যর্থ অমোঘ প্রতীক্ষা। গাড়ি হাঁকিয়ে আগে-ভাগে কখনো ওর কলেজ গেটের মুখে দাঁড়িয়ে থাকে। কখনো বা বাসস্টপের সামনে। শমী চিনতে চায় না। দেখতে চায় না। গোড়ায় গোড়ায় ত্রস্ত হয়ে উঠত। চমকে কলেজে ঢুকে পড়ার জন্য ব্যস্ত হত। যে কোনো বাসে উঠে পড়তে চেষ্টা করত। এখন আর তা করে না। উপেক্ষার চাবুক দেখিয়ে চলে যায়। কখনো বা ঘাড়

ফিরিয়ে ঠাণ্ডা দু চোখ তার মুখের ওপর বুলিয়ে নেবার স্পর্ধা দেখায়!

সিতু হাসে মিটিমিটি। চাবুক চালানোর ছটা দেখে, সম্বল দেখে। ছটা বাড়ছে। সম্বল বাড়ছে। শমীর বয়েস কুড়ি এখন, হিসেবে ভুল হবার নয়। সেই মোটা-সোটা আদুরে মেয়েটা কুড়ির মন্ত্রে লাবণ্যের এই আঁটসাঁট নিটোল ছাঁদে এসে স্থির হবে—সিতু কল্পনা করেনি। অথচ ছাঁদ-বদলের এই কারুকার্য বলতে গেলে তার চোখের ওপর দিয়েই ঘটে গেছে। ময়দানের সেই ব্যাপারের পর কটা বছর সিতু নিজে ওর লক্ষ্যের আড়ালে থাকতে চেষ্টা করেছে। তারপর আর পেরে ওঠেনি। পারার দরকারও বোধ করেনি। তাকে দেখে, তার দিকে চেয়ে শমী সেই শেষের আর নিঃশেষের অব্যর্থ ঘোষণা যদি দেখতে পায়—পাক। সেইদিন এগিয়ে আসছে। যখনই দেখে, প্রতীক্ষা অসহ্য হয়ে ওঠে। রক্তে আগুন লাগে। তবু যাক কটা দিন। অনেক—অনেক দিন তো গেছে। আরো কটা দিন যাক। সামনেই ওর বি-এ পরীক্ষা। সেইজন্যেই এখন আর বাস-স্টপে বা কলেজের গেটে দেখতে পায় না। পরীক্ষাটা হয়ে যাক। আরো ছটা বাড়বে, আরো সম্বল বাড়বে। কল্পনায় এই শমীর থেকেও অনার্স গ্রাজুয়েট শমীর মুখ লোভনীয় ঠেকেছে। তাড়া নেই। ঝোঁকের মাথায় কিছু করে বসার মত সেই ময়দানের বয়েসও নেই আর। এবারের থাবা আর ঢিলে হবে না। কিভাবে কেমন করে অব্যর্থ গ্রাসের মধ্যে তাকে টেনে আনবে তা নিয়ে এখনো মাথা ঘামায়নি। সময় হোক, একভাবে না একভাবে আনবেই। এ বিধানের নড়চড় নেই। ওই ফ্ল্যাটের আর একজনের বুকের ভিতরটা একখানা আস্ত মরুভূমি করে না দিতে পারলে ওর নামে যেন ঘরে ঘরে কুকুর পোষে সকলে।...ওই একজনকে শমী এখনো মাসী ডাকে শুনেছিল। সাত বছর বয়েস থেকে মাসীর আদর খাচ্ছে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত সেই পুষ্টিই বুঝি দেহের নানা ভাঁজে নানা খাঁচে উপচে উঠেছে, জমাট বেঁধেছে। এরই ঠমকে সিতুর প্রতি ওর এখন এত উপেক্ষা, এত অবজ্ঞা।

স্নায়ুতে স্নায়ুতে আগুন ধরানোর এই আক্রোশ যে তেইশ বছরের কোন পরিণত বা সুস্থ চিন্তার ফল নয়, সেটা মনে আসে না। বয়েসটা তখন নিজের অজ্ঞাতে সেই দশ, বা আঠারোর আশপাশ দিয়ে ছুটতে থাকে। নাবালক, বালক, আর এই তেইশের সিতুর কিছু একটা করে বসার ঝোঁক তখন মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। মাস দুই আগে এমনি এক কাণ্ড করে বসেছিল। তার আগের বিকেলে শমীকে বড় বেশি ভাল লেগেছিল। বই বুকে করে বিকেলে বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েই ছিল। পরনে হাল্কা গোলাপী পাতলা শাড়ি, গায়ে সিল্কের সাদা ব্লাউস। তেল না পড়ার দরুন একপাশের কোঁকড়া চুলের গোছা বিন্যাসের বাধা ঠেলে দুলছে

অল্প অল্প। দেহতটের চেনা রেখাগুলো সিতুর চোখ দুটোকে বড় বেশি টানছিল, বড় বেশী অবাধ্য করে তুলেছিল। সেই একদিন শেষ পর্যন্ত গাড়ি থেকে নেমে না এসে পারেনি। নিঃশব্দে একটা ঠাণ্ডা অপমানের ঝাপ্টা মেরে শমী মুখ ফিরিয়ে না নিলে হয়ত একটু উদার হতেও পারত। নিরিবিলিতে পেলে ঠাট্টার সুরে হয়তো জিজ্ঞাসা করত, দশ বছর আগে ওর বউ হবার প্রস্তাবটা এখন একেবারে বাতিল কিনা।

পাশে দাঁড়িয়ে গলা খাটো করে সিতু বলেছিল, এদিকে আসবে একটু, কথা ছিল।

গাড়িতে আসার কথা বলেনি, আসবে না জানা কথাই। ওকে কাছে আসতে দেখে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, আর মুখ ফেরায়নি। আসা বা কথা শোনা দূরে থাক, ওকে চেনেও না। ফলে আশপাশের দু-চারজন লোক সকৌতুকে ঘাড় ফিরিয়ে সিতুকে দেখেছে। রমণীর ধীর গম্ভীর রূঢ় প্রত্যাখ্যানের আঁচ পেয়েছে তারা।

সিতু ফিরে এসেছে, তারপর গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেছে। স্নায়ুর পুঞ্জীভূত বারুদে তাপ লেগেছে। পরদিনই সেই কাণ্ড। বিকেলে ঘড়ি ধরে হেলেন জোন্স-এর কাছে হাজির।—এক্ষুনি বেরুতে হবে, জাস্ট নাউ!

মোটরে হাওয়া খাওয়ার নামে হেলেন জোন্স লাফিয়ে ওঠে। কিন্তু এ তাড়াটা ঠিক হাওয়া খাওয়ানোর তাড়ার মত লাগেনি। জিজ্ঞাসা করেছে, কোথায় যাওয়া হবে।

আঃ, ডোণ্ট টক্, কাম্ অন্—

বাহু ধরে টেনে গাড়িতে তুলেছে তাকে। তারপর সেই বাস-স্টপ। রাস্তার উল্টো ধারে শমীর ঠিক মুখ বরাবর ঘ্যাঁচ করে গাড়িটা দাঁড় করিয়েছে। ওকে দেখেই দাঁড়িয়ে গেল যেন। আর ঠিক সেইখানেই সিগারেট ধরানোর দরকার হল। ঠোঁটে সিগারেট ঝুলিয়ে হেলেন জোন্সকে বলল ধরিয়ে দিতে। তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে দ্রষ্টব্যের দিকে চোখ ফেরাল। ঠিক যেমনটি আশা করেছিল, তাই হয়েছে। শমীর দু চোখ ধাক্কা খেয়েছে। তারপর মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। বাস এসে ভাল করে দাঁড়ানোর আগেই উঠে পড়েছে।

বরাত ভাল সিতুর, মজা দেখা আর দেখানোর আক্রোশ তার পরেও মিটেছে খানিকক্ষণ ধরে। বাসের এদিকের জানলার ধারের লেডিস সীট-এ বসেছিল শমী। সিতুর গাড়ি ওই বাসের পাশ ঘেঁষে সঙ্গ নিয়েছে। এক হাতে স্টিয়ারিং ধরে ছিল, বাঁ হাতটা তখন হেলেন জোন্স-এর কাঁধ বেষ্টন করে আছে। বাসের

একজন ছাড়া আর কে দেখছে না দেখছে ভ্রূক্ষেপ নেই। উৎকট আনন্দে যে-রকম পাশ ঘেঁষে গাড়ি চালাচ্ছিল, লেগেও যেতে পারত। শমীর চোখে-মুখে ঘৃণা উপচে উঠতে দেখেছিল সিতু।

শমী বাস থেকে নামার পরেও কম করে বিশ গজ পর্যন্ত গাড়িটা ওর গা ঘেঁষে চলেছে। ফুটপাথের ও-মাথায় চলে যেতে হাসতে হাসতে বড় একটা শিস দিয়ে উঠে গাড়ির মুখ ঘুরিয়েছে।

কিন্তু এতক্ষণ ধরে পাশের একজন যে বেশ নিবিষ্ট আগ্রহে তাকে লক্ষ্য করছিল খেয়াল করেনি। গাড়ি অনির্দিষ্ট খোলা রাস্তা ধরতে হেলেন জোন্স বেশ আঁট-গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন ছুঁড়েছে, হু ইজ দ্যাট গার্ল?

সিতু মেজাজে ছিল, আলাপটা হাসাহাসির দিকে গড়িয়েছিল। আর হেলেন জোন্স মন্তব্য করেছিল, আই থিঙ্ক শি ইজ দি গার্ল ফর ইউ, দরকার হলে তোমার গালে চড় বসিয়ে দিতে পারে, ইউ রিকোয়ার দ্যাট স্ল্যাপিং ডোজ—

হেলেন জোন্স-এর সংশ্রবে সিতুকে টেনে এনেছিল হালফিলের এক সিন্ধী সহচর। সিতুর আড্ডার বৃত্ত বদল হয়েছে অনেকদিন। অভিজাত আসনে বসে রেস খেলে, উঁচু মহলের তিন তাসের আসরে বসে, চটকদার সান্ধ্য ক্লাবেও হানা দেয়। টাকা খরচ করতে পারলে সর্বত্র কদর। অতএব রাতের কলকাতার খবর রাখে এমন সহচরও জুটবে দুই-একজন এ আর বেশী কথা কি। সিন্ধী বন্ধু তাকে বলেছিল—শি ইজ নট চার্মিং, বাট শি ইজ সুইট—

আর ওকে টেনে এনে হেলেন জোন্সকে বলেছিল, হি ইজ এ গুড ফ্রেণ্ড, হ্যাজ মানি অ্যাণ্ড এ নাইস কার টু্য।

হেলেন জোন্স হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল তাকে। তারপর হেসেই জিজ্ঞাসা করেছিল, তোমার আবার টাকা আর গাড়িঅলা গুড ফ্রেণ্ড জুটিয়ে দিয়ে সরে পড়তে কতদিন সময় লাগবে?

হেলেন জোন্স-এর দিকে চেয়ে প্রথম দিনই কি দেখেছিল সিতু, ঠিক ঠাওর করতে পারেনি। সুন্দরী নয়, সিন্ধী সহচরের মন্তব্য অনুযায়ী তেমন সুইটও নয়। তবু কিছু একটা ছিল যা সিতুকে আটকে রাখতে পেরেছে। পরে বুঝেছে কি। কথাবার্তার সরলতা আর হাসির আড়ালে এক ধরনের বিষণ্ণ কমনীয়তা। কথা শুনলে বা হাসি দেখলে লোভের ওপর মায়ার প্রলেপ পড়তে চায়। এ-পথে এই মেয়ের ভাগ্য তেমন প্রসন্ন হবার কথা নয়।

ভিতরের অশান্ত তাড়নায় এক-একদিন বিকেলের অনেক আগেই এসে হাজির হয়েছে সিতু। দুটো নীল চোখ দূরের নীলের দিকে ছড়িয়ে জানলার পাশে পুরানো

ময়লা ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে বসে থাকতে দেখেছে তাকে। ও যেন কোন্ দূরের তন্ময়তায় বিভোর। দূরের তৃষ্ণায়ও। এর থেকে ওকে ছিনিয়ে আনতে সময় লাগে, এক-একদিন বিরক্তিও ধরে। তখন আবার মেয়েটার খুশি করার তৎপরতা দেখে হেসেও ফেলে।

হেলেন জোন্স বিলিতী মেয়ে। সমুদ্র পেরিয়ে এদেশে এসেছে বছর তিনেক আগে। সিতুর সমবয়সী হবে। বাংলা বা হিন্দী বোঝে না, বলতেও পারে না। বাঁধা বুলি যা দু-একটা বলতে চেষ্টা করে, তাও হাসির ব্যাপার হয়। এদেশের কোন কিছুতে রপ্ত হওয়ার আগ্রহ নেই। একটু অন্তরঙ্গ হতেই বোঝা গেছে দেশে ফেরার ফিকিরে আছে। টাকা অনেক লাগে। সিতুর মনে হয় সেই জন্যেই টাকার অত খাঁই। থাকে সাদামাঠাভাবে। টাকা জমায় বোধ হয়। ইংলণ্ডের গাঁয়ের দিকে থাকত। সেখানকার প্রসঙ্গ উঠলে আর কথা নেই, উচ্ছ্বাসে চোখ-মুখ অন্য রকম হয়ে যায়। সমুদ্র সাঁতরে ও বুঝি একেবারে দেশে গিয়েই হাজির হয় তখন। গাঁ ছেড়ে ইংলণ্ডের শহরে এসেছিল চাকরির খোঁজে। চাকরি না পেয়ে হতাশ হয়েছিল। শেষে এদেশের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে যোগাযোগ। ভদ্রলোক সপরিবারে ইংলণ্ডে থাকত। দুটো ছেলে-মেয়ে আর রুগ্না স্ত্রী। সেখানে মোটামুটি ভাল মাইনের স্টুয়ারডেসের চাকরি পেয়েছিল। দেশে ফেরার সময়ে ভদ্রলোক আগ্রহ করে তাকে সঙ্গে করে এদেশে নিয়ে এলো। আগ্রহ তার স্ত্রীরও ছিল। ছেলে-মেয়ে দুটোও ওকে ভালবাসত। মা বার বার নিষেধ করেছিল, ও শোনেনি। তখন নতুন দেশে আসার ভূত মাথায় চেপেছিল। তার ওপর চাকরির মায়া, আরো অনেক বেশী মাইনের মায়া। সেই সঙ্গে নিজের পায়ে দাঁড়াবার তাগিদ। মায়ের নিষেধে কান দেয়নি।

বোম্বাইয়ে পা দিতে না দিতে চাকরিটা গেল। ভদ্রলোকের বউ ওকে জবাব দিয়ে দিলে। বউটার দোষ নেই। হেলেনকে জাহাজে তোলার পর থেকেই ভদ্রলোকের মতি-গতি বদলাতে থাকল। আত্মরক্ষার দায়ে তখন ওকে পালিয়ে বেড়াতে হত। চাকরিটা যেতে লোকটার সুবিধেই হল। এক নামকরা হোটেলে এনে তুলল ওকে। আশ্বাস দিল, সে-ই তাকে দেখবে আর স্টুয়ারডেসের থেকে অনেক ভাল হালে রাখবে।

কিন্তু ও-রকম ভাল হালে থাকার ইচ্ছে তখন হেলেন জোন্স-এর ছিল না। সেই রাতেই ম্যানেজারের সঙ্গে ভাব করে আর এক জায়গায় স্টুয়ারডেসের চাকরির সন্ধান পেল। বোম্বাইয়ে আরো দুটো বাড়িতে স্টুয়ারডেসের চাকরি করেছিল। কিন্তু টিকতে পারেনি। এদেশের ভদ্রলোকরা স্টুয়ারডেসকে মিস্ট্রেস ভাবে।

ওদেশেও এ-রকম লোক নেই তা নয়। কিন্তু স্টুয়ারডেসেরও স্বাধীনতা আছে। ইচ্ছের বিরুদ্ধে এভাবে এসে ঝাঁপিয়ে পড়তে সাহস করে না। বোম্বাইয়ে তারপর এক গোয়ান দস্তির পাল্লায় পড়েছিল হেলেন জোন্স। প্রাণটা যেতে বসেছিল। বম্বে থেকে তার চোখে ধুলো দিয়ে একদিন কলকাতায় পালিয়েছিল। শুনেছিল, ক্যালকাটা গ্রেট সিটি। ভেবেছিল এখানে আসতে পারলে একটা হিল্লে হবে।

হেসে-হেসেই বলেছিল হেলেন জোন্স, এখন দেখছ তো কেমন হিল্লে হয়েছে?

সিতু অবাক হয়ে শুনেছে। হাসিটা ঠিক হাসির মত লাগেনি। এ ভাবটা অবশ্য বেশীক্ষণ থাকেনি। ভদ্র সংস্থান খুঁজলে কি আর পেত না? সহজ রাস্তাই বেছে নিয়েছে।

তবু সময় সময় ওর থেকেও ওর কথাবার্তাগুলো বেশী ভাল লাগে সিতুর। এক দিন ওকে বলেছিল, তুমি এ-রকম বুনো কেন?

সিতু রসিকতা করে জবাব দিয়েছিল, মেয়েরা বুনো পুরুষ পছন্দ করে।

ননসেন্স, ছাট গোয়ান বাফেলো অলমোস্ট টুক মাই লাইফ। তারপরেই কি ভেবে জিজ্ঞাসা করেছে, তোমাদের তো নামের মানে থাকে, হোয়াট ডু ইউ মীন বাই সাটকি?

মানে নেই। আমাদের ক্লাসিকের একটা লোকের নাম, এ রেচেড ফেলো।

হেলেন অবাক, তাহলে তোমার এ-রকম নাম কেন, আর ইউ রেচেড?

তা না হলে তোমাদের এই স্বর্গে এসে হাজির হব কেন?

হেলেনের মুখ মলিন হয়েছিল, হতভাগা ভিন্ন কেউ এ-পথ মাড়ায় না এ যেন অস্বীকার করতে পারেনি। খানিক চুপচাপ বসে থেকে হঠাৎ কি ভেবে আবার বলে বসেছে, আই লাইক ইউ, আই ডোণ্ট নো হোয়াই।...তোমার মা আছে?

ওকে চমকে দেবার মত করেই ঝাঁজিয়ে উঠেছিল সিতু, নো—নেই! হঠাৎ মায়ের খোঁজ কেন?

রাগের কারণ না বুঝে হেলেন বিমূঢ় মুখে চেয়েছিল খানিক। তারপর বলেছে, এই জন্তেই তুমি এ-রকম।...আমার মা-কে বড় মনে পড়ে, মায়ের কাছে যেতে ইচ্ছে করে।

এই ছেলেটার সঙ্গে মনের কথা বলতে পারে বলেই তাকে পছন্দ। এখানে কেউ মনের কথা বলতে বা মনের কথা শুনতে আসে না। অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সে। দু চোখ ঘোরালো করে সাটকি চ্যাটার্জি লক্ষ্য করছে তাকে খেয়াল করেনি।

মায়ের কথার পরেই এ তন্ময়তা দেখে সিতুর মেজাজ বিগড়েছে। ও যেন হিংস্র হয়ে উঠেছিল, ওই তন্ময়তা থেকে ওকে ছিঁড়ে আনার আক্রোশে হ্যাঁচকা টানে

কাছে টেনে এনেছে, রূঢ় নিষ্পেষণে ওকে সজাগ করে দিতে চেয়েছে।

উঃ!

পাঁজরের দিকটা চেপে ককিয়ে উঠেছিল হেলেন জোন্স। ব্যথাটা সামলে নেবার চেষ্টায় কয়েক নিমেষের জন্য সমস্ত মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছল।

সিতু অপ্রস্তুত। কি হল?

ইউ আর এ রাস্কেল। হেসে সামলে নিয়েছে ততক্ষণে, বলেছে, ও কিছু নয়, একটা পুরনো ব্যথা বড় জ্বালাচ্ছে। হঠাৎ লেগে গেছে—

কি রকম যে জ্বালাচ্ছে সিতু একটু আগেই দেখেছে।—পাঁজরের ব্যথা ভাল কথা নয়, চিকিৎসা করাও না কেন?

সে-রকম চিকিৎসা করাতে একগাদা টাকা খরচ, একসঙ্গে অত টাকা পেলে তো বম্বে গিয়ে জাহাজের টিকিট কেটে বসতাম। এক বড় ডাক্তারের কাছে গেছলাম, সে তার নার্সিং হোমে রেখে চিকিৎসা করাতে আটশ টাকা চাইলে।

সিতুর হঠাৎ কি ঝোঁক চেপে ছিল মাথায়। চিকিৎসার থেকেও সত্যিই দেশে যাওয়াটা বড় কিনা যাচাইয়ের ইচ্ছে। অত টাকার খাঁই কেন তাও বুঝে নেবার চেষ্টা। মাত্র আটশ টাকা জুটিয়ে দেশে যেতে পারছে না, বিশ্বাস হয় না। বলেছিল, আটশ টাকা দিতে পারি, কিন্তু এক শর্তে।

হেলেন জোন্স-এর মুখে আশার আলো।—কি? কি শর্ত?

নার্সিং হোমে থেকে খুব মন দিয়ে চিকিৎসা করাবে।

আশার আলো নেভেনি তখনো, বলেছে, কেন, অত টাকা পেলে অনায়াসে দেশে গিয়েও তো চিকিৎসা করাতে পারি?

তুমি দেশে চলে গেলে আমি অত টাকা দিতে যাব কেন?

অবাস্তব আশাই যেন করেছিল কিছু হেলেন জোন্স। মায়া হবার মতই মুখ। আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বলেছে, তাও তো বটে।

অবাক লেগেছিল সিতুর, অস্বস্তিও বোধ করেছিল। প্রত্যাশা যেন একেবারেই ফুরিয়েছে। টাকার প্রসঙ্গ আর তোলেনি। চিকিৎসা করবে বলেও টাকার লোভে হাত বাড়ায়নি। আটশ টাকার বিনিময়ে কেউ ওকে আটকে রাখবে, তাও চায় না যেন। এমন কি, চিকিৎসাই করবে বলে টাকা চেয়ে বসতে পারত, তারপর টাকা হাতে এলে যা খুশি করতে পারত। কিন্তু সিতু লক্ষ্য করেছে সে-চিন্তার দিকেও যায়নি মেয়েটা।

চিকিৎসাই যে আগে দরকার, এর পর সিতুর সেটা অনেকদিনই মনে হয়েছে। পাঁজরের পুরনো ব্যথা বেড়েই চলেছে। দিনকে-দিন কেমন ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে,

গালের হাড় উঁচিয়ে উঠছে। ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া করে কিনা সন্দেহ। টাকা সিতুই মন্দ দেয় না তাকে। আর কোন আগন্তুক বরদাস্ত করতে রাজি নয় বলেই বেশী দেয়। কিন্তু এ মেয়ে সেটা খরচ করে, না আধ-পেটা খেয়ে তার থেকে দেশে যাবার রসদ জমায়, কে জানে। কিছু বললে বিমনা জবাব দেয়, চেষ্টা করছে ভাল থাকতে, কিন্তু এখানকার ক্লাইমেটটাই স্যুট করছে না তার।

পরক্ষণে খেয়াল হয়েছে বোধ হয়, যে সম্বলের ওপর নির্ভর, সেই দেহ পুরুষের চোখে এ-রকম অসুস্থ ঠেকলে বিপদ। হেসে দু হাত বাড়িয়ে চুলের মুঠি ধরে ওর মাথা বুকের কাছে টেনে এনেছে। বেশী খুশির কারণ ঘটলে এই করে।—সব ঠিক আছে, তোমাকে অত মাথা ঘামাতে হবে না।

রঞ্জুদিকে নামিয়ে দিয়ে এতটা পথ আসতে আসতে মাথা কিছুটা ঠাণ্ডা হয়েছিল। তাই হয় আজকাল। বিস্মৃতির তিমিরে টানার জাদু জানে না হেলেন জোন্স। বিপুল সম্ভোগের আমন্ত্রণ কিছু নেই তার মধ্যে। সেই কারণে সিতুর আসাটাও কিছু কমেছে। তবু যখন আসে, ভালো লাগে। কথা বলতে ভালো লাগে, ওর কথা শুনতেও ভালো লাগে, এলে তাপ জুড়োয়।

হেলেন জোন্স-এর ঘর তালাবন্ধ দেখামাত্র মেজাজ চড়ল। ও আসুক না আসুক, এরকম হবার কথা নয়। গত কটা মাসের মধ্যে এরকম হয়নি। ঘর তালাবন্ধ দেখেই ধরে নিল নতুন কোনো লোভের হদিস পেয়েছে। শরীরের ওই হাল, তবু লোভের শেষ নেই। ওর চোখে ধুলো দিয়ে তলায় তলায় বাড়তি খদ্দের জুটিয়ে জাহাজভাড়া তোলার চেষ্টায় আছে বলেই শরীরের এই হাল কিনা কে জানে! যাওয়াচ্ছে ওকে দেশে। সম্পর্ক ছেঁটে দেবার সঙ্কল্প নিয়েই গাড়ি ছোটালো আবার।

বাড়ি ফিরে চলেছে। বেইমানী যদি করে থাকে তার সাজাও হেলেন জোন্স পাবে। তবু মনে হল, দেখা না হয়ে ভালই হয়েছে। ফিরতে রাত হত। ছোট দাদু অপেক্ষা করে বসে থাকত। এত রাত হল কেন, জিজ্ঞাসা করত। এই একজনের কাছেই সিতু মাঝে-সাঝে মুশকিলে পড়ে যায়।

বাড়ি ফিরে জেঠুর ঘরে উঁকি দিল একবার। সেখানে ছোট দাদু একা বসে। তাঁকে একটু বেশি গম্ভীর আর চিন্তাচ্ছন্ন মনে হল। সিতুকে দেখেও লক্ষ্য করল না যেন। বারান্দায় মুখোমুখি বাবার সঙ্গে দেখা। তারও চোখমুখ অন্যরকম। পাশ কাটিয়ে পায়ে পায়ে জেঠুর ঘরের দিকে এগোতে দেখল বাবাকে। নিজের ঘরের দোরে এসে সিতু ফিরে তাকালো। জেঠুর ঘর পর্যন্ত না গিয়ে কি ভাবতে

ভাবতে বাবা আবার নিজের ঘরের দিকেই ফিরছে।

ঘটেছে কিছু। কিছু ঘটলে সিতু গন্ধ পায়। গন্ধ পেল।

ঘরের মধ্যে মেঘনা তার শয্যাবিন্যাস করছে। এই বাড়িতে সিতু একজন প্রবল পুরুষ এখন। তাকে সামনে দেখলে ভোলা শামু তটস্থ হয়ে ওঠে। হুকুম শেষ করার আগেই তা পালন করতে ছোটে। ব্যতিক্রম শুধু মেঘনা। ছোট মনিবকে ভয় সেও বিলক্ষণ করে। কিন্তু বাইরের আচরণে সেটা প্রকাশ করতে আপত্তি। কথার পিঠে গজগজ করে কথা বলে ওঠে, চলে যাবে বলে শাসায়। আরক্ত চোখে সিতু ওর দিকে ঘুরে দাঁড়ালে ভয়ে ভয়ে দু-পাঁচ হাত সরে দাঁড়ায় বটে, সঙ্গে সঙ্গে রসনার জোর বাড়িয়ে ভয়টা ঢাকতেও চেষ্টা করে। দিনকয়েক আগেও গোল গোল দু চোখে রাগ ছড়িয়ে ও বলে উঠেছিল, শিগগীরই তোমার মায়া যাতে ছাড়তে পারি সেজন্যে কালই কালীঘাটে গিয়ে মা-কালীর কাছে মানত করে আসব—বুঝলে?

পরদিন সিতুই ওকে ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে তাড়াবে বলে শাসিয়েছিল—তার জবাবে এই। মানত করার মেজাজে দুমদাম পা ফেলে ও চলে যাবার পর সিতু হেসে বাঁচেনি।

ওকে তাড়াতে চাওয়াটা যেমন সাময়িক রাগের ব্যাপার, ওর মায়া ছাড়ার তম্বিও তাই। নইলে দুজনের অসহায় অবস্থা দুজনেই জানে। ছোট ছেলের বিয়েতে একটু আমোদ-ফুর্তি করবে বলে কালীদাদার থেকে সাত দিনের ছুটির আর্জি মঞ্জুর করে নিয়েছিল মেঘনা। সাত দিন বাড়িতে থাকবে না শুনে ছোট মনিব খাপ্পা। একেবারেই চলে যেতে বলেছিল প্রথম। তারপর ছোট ছেলের বউকে ভালো একটা সোনার গয়না উপহার দেবার জন্য ওর হাতে মোটা টাকা দিয়ে বলেছিল, দিন তিনেকের মধ্যে ফিরে আসতে চেষ্টা করিস।

অতগুলো টাকা হাতে পেয়েই যেন আনন্দে তাড়াতাড়ি প্রস্থান করেছে মেঘনা। কিন্তু যেতে যেতে শাড়ির আঁচলে ওকে চোখ রগড়াতে দেখেছে সিতু। তিন দিন নয়, দ্বিতীয় দিনের বিকেলেই ফিরে এসেছিল। তারপর ওর গজগজানিও কানে এসেছে, কোথাও গিয়ে কি দু দিন তিষ্ঠোবার জো আছে, ওর হাতে-পায়ে বেড়ি।

জামাটা খুলে আলনায় ফেলে শয্যার দিকে এগোতে চাপা ভীত গলায় মেঘনা বলল, বাড়িতে কোনো খারাপ খপর এলো নাকি গো ছোট মনিব......সব যেন কেমন কেমন দেখছি।

খবরের গন্ধ সিতুই পেয়েছিল। থমকে তাকালো।—কি কেমন কেমন দেখছিস?

মেঘনা জানালো, বিকেলে আপিস থেকে ফেরার মুখে কালীদাদা কিছু একটা খবর এনেছে আর সেটা ভাল খবর নয় বলেই ওর ধারণা। নিজের ঘরে না ঢুকে বাবুকে কি বলল কালীদাদা, তারপর থেকেই বাবুর হাবভাব অন্যরকম। আর মামাবাবুর সঙ্গেও কালীদাদার কিসব কথাবার্তা হল খানিকক্ষণ ধরে। মেঘনা শুনেছে, কালীদাদা শ্মশানে না কোথায় যাবে বলছিল মামাবাবুকে।

মেঘনার শেষের কথাগুলো কানের পর্দা কাটা-ছেঁড়া করে মগজে গিয়ে ঢুকল যেন। সিতু নির্বাক কয়েক মুহূর্ত। ঘর ছেড়ে পায়ে পায়ে ছোট দাদুর কাছে এলো আবার। ছোট দাদু একভাবেই বসে আছে।

গৌরবিমল ডাকলেন, আয়, কখন ফিরলি ?

তোমার নাকের ডগা দিয়েই ফিরেছি, দেখতে পাওনি।...কি ব্যাপার বলো তো, কি হয়েছে ?

একটু চুপ করে থেকে গৌরবিমল বললেন, বিকেলে বিভাস দত্ত মারা গেল।... অনেকদিন ধরে ভুগছিল, কালী প্রায়ই দেখতে যেত। আজ হয়ে গেল।

সিতু কি এর থেকেও বড় কিছু বিপর্যয় শোনার আশঙ্কা নিয়ে এসেছিল ? যদি এসে থাকে তো সেটা গেছে। কিন্তু খবর শোনার প্রতিক্রিয়া মুখে দাগ কেটে বসছে। অপ্রত্যাশিত বটে। প্রায় অসম্ভব গোছের। সিতুর কাছে এটা কোনো আনন্দের খবরও নয়, নিরানন্দেরও নয়। এ খবরের সঙ্গে বাড়ির কারো কোনো সম্পর্ক আছে ভাবতেও রাজি না। তবু চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে, চাউনিটা কঠিন।

ছোট দাদুকেই দেখছিল। ঠোঁটের ডগায় হাসি চিকিয়ে গেল, এক মর্মান্তিক রসিকতার লোভ সামলে বেরিয়ে এলো। বলতে পারলে বলে আসত, বিভাস দত্ত মরেছে শুনে খুশী না হয়ে অত ভাবনায় পড়ার কি হল ছোট দাদুর, মায়ের বয়েস সবে তো চল্লিশ—

বলতে না পারার তাপ মুখে নিয়ে ঘরে ফিরল। সটান বিছানায় শুয়ে পড়ল। সিতুর মাথা ঘামাবার মত কিছু ঘটেনি। তবু মাথার মধ্যে কাটা-ছেঁড়া করে চলেছে কি।...কত দিনের জন্য মিসেস দত্ত হয়েছিল ? বড় জোর পাঁচ বছর কি ছ বছর। এই ছটা বছর কালের অস্তিত্ব থেকে মুছে গেলে কি হয় ?

না, সেটা আর মুছে যাবার নয়। বিভাস দত্ত মুছে গেলেও না।

দোরগোড়ায় মেঘনা এসে উঁকি দিল। কি হয়েছে জানার ইচ্ছে। কিন্তু ঘরে ঢুকতে ভরসা পেল না। দূর থেকে দেখল—ছোট মনিব চিৎপাত হয়ে শুয়ে আছে। আর তার গনগনে চোখ দুটো যেন ঘরের ছাদটাকে ভস্ম করছে।

॥ একচল্লিশ ॥

ছোট গাড়িটা মাসখানেকের ওপর টানা ছুটি ভোগ করল। সিতু বাইরে বেরোয় না, দোতলা থেকে একতলায়ও কমই নামে। খায়-দায়, ঘরে শুয়ে-বসে কাটায়। দুই-একটা বই পড়ে।

কালীনাথ এক-আধ সময় ঘরে এসে জিজ্ঞাসা করেন, কি রে, এ সময়ে শুয়ে যে, শরীর ভালো তো?

বিরক্তি চেপে সিতু একটু বেশিই মাথা ঝাঁকায়। অর্থাৎ খুব ভালো। একদিন জবাব দিয়েছিল, ঠিক বলতে পারি না, পাঞ্জা লড়ে দেখবে ভালো কি খারাপ? বছর কয়েক আগে জেঠু মাঝে মাঝে পাঞ্জা লড়ে ওকে জব্দ করত।

এই একজনকে এখন কতটা পছন্দ করে, আর কতটা করে না, সিতুর নিজের কাছেই স্পষ্ট নয়। তার প্রচ্ছন্ন-গম্ভীর কৌতুক এখনো ভালো লাগে। এত সব ওলট-পালটের পরেও জেঠু ঠিক তেমনি আছে। এই চরিত্রে কিছুই বুঝি দাগ কাটে না। আবার দাগ যে কাটে তাও ভালোই জানে। তার শকুনি-স্তুতির নানা অর্থ মাথায় আসে আজকাল। ওগুলো দুর্বলের ব্যর্থ আক্রোশ কিনা তাও ভাবে। কিন্তু জেঠুকে দুর্বল ভাবা লোহাকে নরম ভাবার মতই যেন। সিতুর সব থেকে অসহ্য তার বাবাকে। তবু তার সঙ্গে জেঠুর প্রীতির সম্পর্কটা সর্বদা সন্দিগ্ধ চোখে দেখে।

জেঠুকে নিয়ে সংশয়ের আরো কারণ আছে। তার ধারণা, জেঠু এখন গোটাগুটি বাপের ছেলেই ভাবে তাকে, মায়ের ছেলে ভাবার আর কোন কারণ নেই।·· কালো ডায়রীতে লেখা ছিল, ওকে মায়ের ছেলে মনে হলে ভালবাসতে ইচ্ছে করে, আর বাপের ছেলে মনে হলে ভিতরের ছুরি ওর দিকেও উঁচিয়ে উঠতে চায়। ফলে জেঠু এখন শরীরের খবর নিতে এলে তার দিকে চেয়ে সিতু অদৃশ্য ছুরি না খুঁজে পারে না।

কিন্তু খোঁজ কখনো পেয়েছে এমনও মনে হয় না। পাঞ্জা লড়তে চেয়েছিল, সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি একদিন হতে পারে সেটা বুঝিয়ে দেবার জন্যই। কিন্তু তার মুখের হাসিতে টান ধরতে দেখেনি। মুখখানা চিরে দেখতে চেষ্টা করেও না।

ছেলের এই পরিবর্তন শিবেশ্বর চাটুজ্যেও লক্ষ্য করেন। সময় সময় ওর ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ান তিনিও। তেমনি গম্ভীর, তেমনি বিরাট মর্যাদার মুখোশ

আঁটা। বইয়ের প্রতি সিতুর তখনি সব থেকে বেশি মনোযোগ। নিঃশব্দে চলে যাবার পর বিরক্তিতে হাতের বই ছুঁড়ে ফেলে দেয়। বাবার ব্যক্তিত্বের দাপট আগের থেকে দ্বিগুণ অত্যাচারী হয়ে উঠলেও এত বিরক্তির কারণ হত না বোধ হয়। জল্লাদেরও শৌর্য আছে। এটা শৌর্যের ছায়া।

লক্ষ্য ওকে মেঘনাও করে। সেদিন ঘরে এসে বলেছিল, গাড়িটা যে তোমার একেবারে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে পড়ে আছে গো ছোট মনিব, আমাকেই না হয় ডেরাইভারিটা শিখিয়ে দাও—হাত-পায়ের আড় ছাড়াই।

নিঃসঙ্গতা শুধু সাধকের আসন নয়, দানবেরও। বিভাস দত্তর মৃত্যু হঠাৎ এই নিঃসঙ্গতার মধ্যে ঠেলে দিল কেন সেটা সিতুরও অগোচর। ও বিশ্রাম চেনে না। তবু বিভাস দত্তর চোখ বোজার খবরটা এক সুনির্দিষ্ট বিরতি ঘোষণার মত। সাময়িক বিরতি। সিতু সেটা মেনে নিয়েছে, তাই স্নায়ু আপাতত ঠাণ্ডা। এই বিরতিতে শক্তি সঞ্চয়ের স্বাদ পাচ্ছে বলেই ভালো লাগছে। খেলার হাফ-টাইমে দুর্ধর্ষ খেলোয়াড়রা যেমন মাঠে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকে, অনেকটা তেমনি। তখন যে যত বেশি নিস্তেজ নিষ্প্রাণ, প্রস্তুতির সঞ্চয় তার ততো জোরালো। এই বিশ্রাম সিতুকে নিষ্ক্রিয়তার দিকে টানছে না একটুও, শক্তি যোগাচ্ছে। সেটা কোন্ ভাবে কোন্ কাজে লাগবে জানে না। শুধু জানে, লাগবেই।

এই বিরতি থেকে তাকে টেনে বার করল হেলেন জোন্স। অন্য লোক মারফত টেলিফোনে তাগিদ পাঠালো, দেখা হওয়া দরকার, অবশ্য যেন আসে।

মাস দেড়েকের অদর্শনের ফলে মায়া কমে এসেছিল। যাবার তাগিদ বোধ করেনি, কিন্তু হেলেন জোন্সের দরকারটা কি জানে। গেল মাসের শেষে টাকা দেওয়া হয়নি, আর এ মাসে তো যায়ইনি। সিতুর মত টাকা দেবার লোক জোটানো ওই চেহারায় আর হবার নয়। টানাটানিতে পড়েছে।

গিয়ে এক প্রচণ্ড ধাক্কা খেল। হেলেন জোন্স শয্যায় মিশে আছে। দেড় মাস আগেও যাকে দেখেছিল, এ তার প্রেত। জীবনটা যেন শুধু দুটো চোখে এসে ঠেকেছে। ওকে দেখে অভিমানে সেই চোখও ফিরিয়ে ছিল খানিকক্ষণ। তারপর বলল, তুমি তো অন্যের মত আনন্দ করতে আসতে না, তুমিও ছেড়ে যাবে ভাবিনি। তবু কদিন ধরে বড় দেখতে ইচ্ছে করছিল, ভেবেছিলাম খবর পেয়েও আসবে না।

বুকের একটা দিক চেপে উঠে বসতে চেষ্টা করল। পারল না। যন্ত্রণায় মুখটা কুঁচকে গেল। সিতু তাড়াতাড়ি তাকে ধরে শুইয়ে দিল। নিজেও পাশে বসল।

—এ কি চেহারা হয়েছে!…ব্যথাটা এত বেড়ে গেল কি করে?

বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখে বড় বড় নীল দুটো চোখ সার। মুখের দিকে চেয়ে এই উদ্বেগ কৃত্রিম কিনা তাই যেন দেখে নিল আগে। খুশির ছোঁয়া লাগল একটু। বলল, আমার স্বামীর উপহারের জোর দেখো একবার, শেষ পর্যন্ত শেষ করেই ছাড়ল একেবারে।

সিতু বিমূঢ়, কিছুই বোধগম্য হল না। শীর্ণ হাত বাড়িয়ে ওর একটা হাত হেলেন জোন্স নিজের হাতে তুলে নিল। এই স্পর্শে সিতু শিউরে উঠল কেন জানে না। খানিক চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে হেলেন জোন্স বলল, পাছে বাতাসে খবর পেয়ে লোকটা বোম্বাই থেকে কলকাতা চলে আসে সেই ভয়ে কাউকে বলিনি। এখন আর ভয়ের কিছু নেই, তবু এখনো রাতে ঘুমের মধ্যে ওকে স্বপ্নে দেখে আঁতকে উঠি, জানো···।

নির্বাক বসে সিতু শুনল লোকটা কে, কি উপহার দিয়েছিল। হেলেন জোন্স যেন আজ গল্প করতেই চায়। নালিশ নয়, জীবনের এত বিড়ম্বনা বুঝি কৌতুকের মত ঠেকছে।

বোম্বাইয়ের সেই গোয়ান দস্তিকে ও বিয়ে করেছিল। বিয়ের পর শিগগীরই সে তাকে বিলেতে নিয়ে যাবে লোভ দেখিয়েছিল। দেশে ফেরার লোভে আর মাকে পাবার লোভে লোকটা কেমন জেনেও তার ফাঁদে পা দিয়েছিল। বিয়ের দু মাসের মধ্যে সে যখন তাকে দেহ-বেসাতির মধ্যে টেনে আনার ষড়যন্ত্র করেছিল, হেলেন জোন্স গোপনে তখন আর একজনের সঙ্গে সমুদ্র পাড়ি দেবার ব্যবস্থা করে ফেলেছিল। কিন্তু নিজের সামান্য ভুলে ধরা পড়ে গেল। জাহাজ ছাড়ার আগের রাতে ও তার গোয়ান্ স্বামীর চোখে ধুলো দিয়ে পালালো। লোকটা ঠিক তাকে খুঁজে বার করল।···তারপর? এ ড্যাম্ ব্লো। বেশ হাল্কা সুরেই বলল হেলেন জোন্স, সেই ঘুঁষি দেখলে জো লুই ওকে ধরে নিয়ে যেত বোধ হয়। ঠিক মত লাগলে এই দু-আড়াই বছর জীবনটাকে নিয়ে আর এত মেহনত করতে হত না। তখনই সব চুকে-বুকে যেত। হেলেনের প্রাণে বাঁচার তাগিদে ওটা মুখ ফসকে পাঁজরে এসে লাগল। তক্ষুনি অজ্ঞান। জ্ঞান হতে দেখে সে স্বামীর ঘরে শুয়ে আছে। যে লোকটার সঙ্গে সমুদ্র পাড়ি দেবার মতলব করেছিল, প্রাণের ভয়ে সে নিখোঁজ। হয়ত একাই চলে গেছে। আর জানোয়ারের মত হেসে ওর গোয়ান্ স্বামী শাসিয়েছে, বিলেত ছেড়ে কবরের তলায় গিয়ে ঢুকলেও তার হাত থেকে পরিত্রাণ নেই।

হেলেন জোন্স বিছানা ছেড়ে ওঠেনি। প্রায় মরে যাচ্ছে এমনি ভান করে দু দিন বিছানায় পড়ে ছিল। ফলে নিশ্চিন্ত হয়ে সে যখন বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছে, হেলেন জোন্স সোজা স্টেশনে এসে কলকাতার গাড়িতে চেপে বসেছে। গাড়ি না

ছাড়া পর্যন্ত তার সে কি কাঁপুনি।

…কলকাতায় আসার দিনকয়েকের মধ্যে চীনাবাজারের এক চমৎকার লেডির সঙ্গে যোগাযোগ তার। প্রথম আলাপ-সালাপে এত মিষ্টি এমন সহৃদয় মহিলা আর দেখেনি। সস্নেহে সে তার সমস্ত ভার নিয়েছিল, ভালো রোজগারের ব্যবস্থা করে দেবে আশ্বাস দিয়েছিল। কৃতজ্ঞতায় উপ্‌চে উঠে হেলেন জোন্স তার মনের বাসনা ব্যক্ত করেছিল, বলেছিল, সে আর কিছু চায় না, দেশে তার মায়ের কাছে ফেরার মত রোজগারটুকু তাড়াতাড়ি করে উঠতে পারলেই চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। মহিলা হাসিমুখে আশ্বাস দিয়েছিল, দু-চার মাসের মধ্যেই সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে।…কিন্তু মেয়েমানুষ যে এত নীচ এত হিংস্র হতে পারে তার ধারণা ছিল না। একটানা ছ মাস সে তাকে বন্দী করে রেখেছিল। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তিন-চার দফাও নতুন নতুন লোক আনত। হেলেনের চেহারা তো তখন ভালই ছিল। প্রত্যেকের কাছ থেকে কুড়ি টাকা করে নিত, তার থেকে ওকে দিনে পাঁচ টাকা করে দিত। টুঁ শব্দ করলে তাও দেবে না বলে শাসাতো। কিছু বলতে গেলে মার-ধর করত পর্যন্ত।

…ছ মাস বাদে পালাতে পেরেছিল। সেই নরক থেকে এই নরক।

একটানা কথা বলার ফলে হাঁপ ধরেছে, বুকের ব্যথায় বারকয়েক কুঁকড়েছে। হাসতে চেষ্টা করার ফলে শুকনো ঠোঁট কেঁপেছে বারকয়েক। চোখের কোণ সির-সির করেছে। অস্ফুট স্বরে বলেছে, দেশে মায়ের কাছে ফেরা আর হল না… আসার আগে কতবার করে নিষেধ করেছিল,তখন শুনলাম না।

অন্য দিকে মুখ ফেরালো।

মাথার মধ্যে কি যে হয়ে যাচ্ছে সিতুর, জানে না। দুই চোখে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। দেখছে ওকে। বিলেতের এক মেয়ে জীবন ভরে তোলার আশা নিয়ে অর্বাচীনের মত ভেসে এসে কি পেল, দেখছে। উঠে দাঁড়াল আস্তে আস্তে। কথার আকারে একটা অসহিষ্ণু যাতনাই বুঝি গলা দিয়ে বেরিয়ে এলো।—হেলেন জোন্স! তুমি দেশে যাবে, তুমি তোমার মায়ের কাছে যাবে হেলেন জোন্স! আমি ব্যবস্থা করে দেব, আর দেরি করব না, আমার দিকে ফেরো হেলেন জোন্স, শুনছ—?

কথাগুলো তার ভিতরে পৌঁছে দেবার অব্যক্ত তাড়নায় দু হাতের প্রবল আকর্ষণে তাকে এদিকে ফেরাতে চেষ্টা করেছে। তার হাতের মধ্যে হেলেন জোন্স কাঁপছে থর থর করে।

কিন্তু যা বলেছে তা আর হবার নয়।

একটা করে দিন গেছে, ক্ষ্যাপার মত দু হাতে নিজের মাথার চুল টেনে

ছিঁড়তে চেয়েছে সিতু। কেন, কেন এত দেরি করে ফেলল ও।

শেষের দু দিন বিকারের ঘোরে কেটেছে। নীল দু চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘরের চারদিকে তাকিয়েছে হেলেন জোন্স। শিশুর ভীতত্রস্ত দিশেহারা দৃষ্টি। সিতুকেও চিনতে পারেনি। বিড়-বিড় করে একধার থেকে বলেছে, দেশে যাব···মা···মায়ের কাছে যাব···মা কোথায়···।

গাড়ি নিয়ে ছুটতে ছুটতে কলকাতা থেকে দেড় হাজার দু হাজার মাইল দূরে চলে গেছে সিতু। দুঃসহ একটা গণ্ডি থেকে ছুটে বেরুনোর উদ্ভ্রান্ত তাগিদ। কিন্তু যত ছুটছে গণ্ডিটা ততো আঁট হয়ে ছেঁকে ধরছে তাকে চারদিক থেকে। কাঁটার গণ্ডি। কাঁটায় ছাওয়া। তীক্ষ্ণ, ধারালো। কেবল বিঁধছে। বিঁধছে বিঁধছে বিঁধছে।

বেরুনো গেল না। পনের দিনের মধ্যেই ফিরল। রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত। এবারে সময় হয়েছে। এখন সব পারে। হেলেন জোন্স তার মাকে ছেড়ে এসেছিল। মাকে আর পাবে না। সিতু পেলে এই দুটো হাতে করেই ঐ মায়ের কলজে ছিঁড়ে নিয়ে আসতে পারে। তার অপরাধ? অপরাধ-টপরাধ সিতু জানে না—পারে। সব মায়েরই পারে।

···আর একজনেরও পারে। পারার সময় হয়েছে।

এরপর দিনে-দুপুরে এই কলাতার শহরেরই এক রাস্তায় ভয়ানক কাণ্ড হয়ে হয়ে গেল একটা। সেই কাণ্ড নিয়ে রাস্তার দশ হাত দূরে দূরে সন্ধ্যে পর্যন্ত উত্তেজিত জটলা। এরকম তাজ্জব দুঃসাহসের কাণ্ড কলকাতার শহরেই শুধু ঘটতে পারে।

যাতায়াতের পথে পাড়ার ছেলে-ছোকরারা মেয়েটাকে তো ভালো করেই লক্ষ্য করে। যতক্ষণ দেখা যায় চোখের আওতায় আগলে রাখতে চেষ্টা করে। শুধু লক্ষ্য করা কেন, পাড়ার লোকে খবরও কিছু রাখে। অমুক কলেজ থেকে এবারে বি-এ পাস করল, এম-এ পড়ার তোড়জোর চলছে। লেখক আত্মীয় মারা যাবার পর ফ্ল্যাটে শুধু দুজন থাকে—ওই মেয়ে আর তার মাসী। মাসী স্কুলে চাকরি করে—মাসীর বয়েস কিছু হল বোধ হয়, এখনো এত রূপ যে চোখ ফেরানো যায় না। ফ্ল্যাটের ভদ্রলোক মারা যাবার পর ওই ফ্ল্যাটের প্রতি দৃষ্টি অনেকেরই উৎসুক হয়েছে। কিন্তু বড় অমিশুক দুজনেই।

···ওই মেয়েকে নিয়েই দুপুরে খোলা রাস্তায় বিষম ব্যাপার হয়ে গেল।

গাড়িটা মোড়ের মাথায় অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়েছিল চোখে পড়লেও লক্ষ্য কেউ করেনি। মেয়েটা পাশ কাটানোর আগেই গাড়ি থেকে নেমে এক ফিটফাট চেহারার লোক পথ আগলে দাঁড়িয়েছিল। এপাশ-ওপাশে দুই একটা বাড়ির আর

রাস্তারও কেউ কেউ দেখেছে লোকটা কি বলছে আর মেয়েটাকে গাড়িতে তুলতে চাইছে। গন্‌গনে মুখে মেয়েটা চলে যেতে চেষ্টা করতেই আচম্‌কা তার মুখে কি একটা চেপে ধরে চোখের পলকে আল্‌তো করে তুলে তাকে গাড়ির মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। আর বিশ সেকেণ্ডের অবকাশ পেলে গাড়ি নিয়ে হাওয়া হয়ে যেত।

কিন্তু তার আগে হৈ-হৈ করে গোটাকতক লোক ছুটে এসেছিল বলে রক্ষা। তারা ব্যাপার বুঝে বাধা দিতে দাঁড়াতেই লোকটা ক্ষ্যাপার মত তাদের ওপর দিয়ে গাড়ি চালাতে চেষ্টা করেছিল। আর মেয়েটা দরজা খুলে পালাতে চেষ্টা করতে গিয়ে এক চড় খেয়ে উল্টেই পড়েছিল। কিন্তু ততক্ষণে অনেক লোক এসে গেছে। লোকটা এমন বেপরোয়া যে গাড়ি থেকে নেমে একা অতগুলো মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছে। ত্রাসে ওষ্ঠাগত প্রাণ মেয়েটাকে সেই ফাঁকে গাড়ি থেকে নামানো হয়েছে। ক্রুদ্ধ উন্মত্ত জনতা ততক্ষণে দিনে-দুপুরে গাড়িতে মেয়ে তুলে নেওয়ার দুঃসাহসিক চেষ্টার ফয়সালায় মত্ত হয়েছে। যে রুমাল দিয়ে মুখ চেপে ধরে মেয়েটাকে গাড়িতে তোলা হয়েছিল তাতে অজ্ঞান করার ওষুধ মেশানো ছিল। গাড়ি তল্লাস করে আরো কিছু মিলেছে। দশ না বারো হাজার নগদ টাকা। আরো পরে জমার ঘরে বিশাল অঙ্ক বসানো সাত্যকি চ্যাটার্জির নামে ব্যাঙ্কের গোটা দুই পাসবই মিলেছে।

কিন্তু সেসব পরের ব্যাপার, ক্রুদ্ধ জনতা যখন গাড়িটাকে গুঁড়িয়ে ভাঙার উদ্যমে মেতেছিল তখনকার। তার আগে লোকটাকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত থেতলে থেঁতলে মাটিতে শুইয়েছে তারা। কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আর যখন নড়ছে না তখন থেমেছে। মেয়েটা ভিড় ঠেলে দু-একবার সেদিকে যেতে চেষ্টা করেছে, পারেনি। তারপর, মাথা ঘুরে পড়ে যেতে জনাকতক মিলে ধরাধরি করে তাকে অদূরের এক ডিস্‌পেনসারিতে নিয়ে তুলেছে।

পুলিস এসেছে। লোকে লোকারণ্য। ক্ষিপ্ত উত্তেজনায় হাত পাথর আর লাঠি যারা চালিয়েছে, লোকটা মরেই গেল ভেবে তারা সরে দাঁড়িয়েছে। অতঃপর ঘটনা বলা আর ঘটনা শোনার জনতার চাপই বেশি। তাদের ভিতর থেকে উদ্ধার করে পুলিস ভাঙাচোরা একটা দেহের কাঠামো ট্রাকে তুলে নিয়ে গেছে। ভাঙা গাড়ি টাকা আর পাসবইয়ের দায়ও তারাই নিয়েছে।

এক ঘণ্টা না যেতে দিশেহারার মত বাড়িতে ফিরেছে শমী বোস।

পুলিস তার এজাহার চেয়েছিল, তাকে থানায় নিয়ে যেতে চেয়েছিল। শমী যেতে পারেনি, যেতে চায়নি। পুলিস তার বাড়ির ঠিকানা নিয়ে গিয়ে তাকে সুস্থ-

হবার অবকাশ দিয়েছে।

বাড়িতে একা। মাসী তখনো ফেরেনি। তার চোখের সামনে সব কিছু ঘুরছে তখনো। বাড়িটাসুদ্ধ ঘুরছে। চৌকিতে বসে আছে কিন্তু মনে হচ্ছে উল্টে পড়ে যাচ্ছে। থেকে থেকে চোখে অন্ধকার দেখছে।...রক্ত রক্ত রক্ত, কত রক্ত দেখল শমী? মাথা ফেটে রক্ত, সর্ব অঙ্গে রক্ত। কি হয়ে গেল? শমীর গা ঘুলিয়ে সমস্ত অস্তিত্ব ঘুলিয়ে কি যেন গলা দিয়ে উঠে আসতে চাইছে। এক-একবার বাথরুমের দিকে ছুটে যাচ্ছে সে, আবার টলতে টলতে এসে বসছে।

স্নায়ুর ধকল শুরু হয়েছিল সিতুদা গাড়ি থেকে নেমে পথ আগলানোর সঙ্গে সঙ্গেই। অনেকদিন দেখেনি, ওই মুখ আর ওই চাউনি দেখে ভয়ই ধরেছিল। ও-রকম অস্বাভাবিক মূর্তি বুঝি দেখেনি। পথ আগলে বলেছিল, তাকে গাড়িতে উঠতে হবে, বিশেষ দরকার আছে। শমী সরোষে পাশ কাটাতে চেষ্টা করেও পারেনি, সাঁড়াশির মত এক হাতে তার হাত চেপে ধরেছে। বলেছে, জোর করলে বিপদ হবে, চুপচাপ গাড়িতে এসে উঠতে হবে। সেই মুহূর্তে শমীর মনে হয়েছে, গাড়িতে নয়, কেউ বুঝি মৃত্যুর অব্যর্থ ফাঁদে নিয়ে গিয়ে ফেলতে চাইছে তাকে। এমন অপ্রকৃতিস্থ ধক্-ধকে দুটো চোখ শমী কল্পনাও করতে পারে না। একটু জোরেই বকাবকি করে উঠে এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়াতে চেষ্টা করতে যাচ্ছিল। কিন্তু চোখের পলকে রুমালে মুখ চেপে ধরে আলতো করে তুলে তাকে গাড়ির মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। ভিজে রুমালের গন্ধ নাকে-মুখে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শমীর সবগুলো স্নায়ু ঝিমঝিম করে উঠেছে। আর একটু বাদে একটা চড় খেয়ে উল্টে পড়েছিল মনে আছে। আর তার একটু বাদে সে গাড়ি থেকে মাটিতে নেমেছে। নিজে নেমেছে কি কেউ নামিয়েছে জানে না। তারপর যে দৃশ্য দেখেছে, গা ঘুলিয়ে ঘুলিয়ে উঠেছে, বার বার চোখ বুজে ফেলেছে, চেতনা যেতে বসেছে। একটা মানুষের দেহকে এভাবে ভেঙেচুরে একাকার করে দিতে পারে কেউ! অস্ফুট আর্তনাদ করে ওদের থামতে বলতে চেয়েছে, গলা দিয়ে শব্দ বেরোয়নি। ভিড় ঠেলে বার দুই ওদিকে এগোতে চেষ্টা করে চোখে রাশি রাশি অন্ধকার দেখেছে। সম্বিৎ ফিরেছে ডিস্‌পেনসারিতে আসার পর।

কিন্তু ওদিকে কি হয়ে গেল? কি সর্বনাশ হয়ে গেল ওদিকে?

সন্ধ্যা পেরিয়েছে। রাত্রি।

জ্যোতিরাণী শমীর শয্যায় বসে আছেন। স্থির, নিশ্চল। মাঝে মাঝে শমীর মাথায় হাত বুলোচ্ছেন। থেকে থেকে চোখে-মুখেও জল দিচ্ছেন। সেই থেকে

শমী তাঁর কোলে মুখ গুঁজে পড়ে আছে। এত কেঁদেছে যে আর কাঁদার শক্তিও নেই বুঝি। নিস্পন্দের মত পড়ে আছে। থেকে থেকে এক-একবার সর্বাঙ্গ কেঁপে কেঁপে উঠছে।

ঠিক এই অবস্থায় পাড়া-প্রতিবেশিনীরা অনেকে এসে দেখে গেছে। এ-বাড়ির অন্যান্য ফ্ল্যাটের মেয়েরাও এসেছে। শমী তখনো বলতে কিছুই পারেনি। জ্যোতিরাণী আসামাত্র পাগলের মত দৌড়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে আর্তনাদ করে উঠেছে, মাসী গো, সিতুদার কি হল শিগ্‌গীর খোঁজ করো, ওরা বোধ হয় মেরেই ফেলে দিল সিতুদাকে!

জ্যোতিরাণী নির্বাক নিশ্চেতন তখন। কারণ মোড় থেকে এটুকু রাস্তা হেঁটে আসতে আসতে চার-পাঁচজন এগিয়ে সাগ্রহে তাঁকে সম্ভাব্য বিপদের বার্তা জানিয়েছে। ঘটনা বলতে বলতে বাড়ির দরজা পর্যন্ত এসেছিল তারা। জ্যোতিরাণী কি তখনো আশা করছিলেন? তখনো কোনো অসম্ভব প্রাণান্তকর আশা নিয়ে দোতলায় উঠেছিলেন?

শমীর আর্তনাদ শোনামাত্র স্তব্ধ নির্বাক তিনি। ভদ্রবেশী মেয়েধরা ডাকাতের কথা আর গাড়ির কথা শোনামাত্র বুকের ভিতরটা দুমড়ে মুচড়ে উঠেছিল। লোক-গুলোকে বিদায় দেবার জন্য এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে রুদ্ধশ্বাসে দোতলায় উঠতে উঠতে তবু প্রার্থনা করেছিলেন, আর কেউ হোক, সিতু না হয়ে আর কেউ হোক।

শমীকে দেখে আর শমীর আর্তনাদে আশা নির্মূল।

কোলে মুখ গুঁজে শমী কেবল কেঁদেছে আর কেঁদেছে। কাঁদতে কাঁদতে অস্থির হয়েছে। বার বার জলের ঝাপটা দিয়েও ওকে সুস্থ করা যায়নি। ভয় পেয়ে শমী যাই বলুক, জনতার ক্ষিপ্ত আঘাত সম্পর্কে জ্যোতিরাণীর কোন ধারণা নেই, তাই সিতুর প্রাণের আশঙ্কাটাই তখনো সব থেকে মর্মান্তিক যাতনার ব্যাপার নয় তাঁর কাছে। তার থেকে দ্বিগুণ যাতনা, শমীকে যে অজ্ঞান করে মোটরে তুলে নিয়ে পালাতে চেষ্টা করেছিল সে সিতু—এই সত্যটা। শমীর কান্না আর অস্থিরতা অনেকক্ষণ পর্যন্ত নীরবে সামলাতে চেষ্টা করে হঠাৎ একবার মাত্র জ্যোতিরাণী তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠেছিলেন, তুই এত কাঁদছিস কেন? তোর এত অস্থির হবার কি হল? যা হবার তাই হয়েছে, লোকের মার তুই ঠেকাবি কি করে?

শমী আরো বেশি ডুকরে উঠেছিল, সিতুদা পাগল হয়ে এ কাজ করেছিল মাসী, তুমি জানো না ওরা তার কি করেছে!

ঘরের দরজায় অন্য ফ্ল্যাটের মেয়েরা আর আশপাশের বাড়ির কয়েকজন মহিলা দোরগোড়ায় উঁকিঝুঁকি দিয়েছে। তারপর ভিতরে এসেছে। তাদের তখনো

ধারণা, মেয়েটা ভয়েই এরকম করছে। কথার ফাঁকে শোনা বৃত্তান্ত বা আধা-শোনা বৃত্তান্ত ফাঁপিয়ে ব্যক্ত করেছে তারা, আর আশ্বাস দিয়েছে, এত বড় দুঃসাহস আর শয়তানীর ফল হাতে হাতে পেয়েছে লোকটা, প্রাণে বাঁচবে কিনা সন্দেহ, বাঁচলেও মেয়েচুরির সাধ এজন্মে আর হবে না বোধ হয়। দুজন বয়স্কা সরোষে বলে উঠেছিলেন, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ারই বা অবস্থা রাখল কেন, একেবারে শেষ করে দিল না কেন!

জ্যোতিরাণী নির্বাক, হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ। আলুথালু মূর্তিতে তাঁর কোল থেকে শমী ছিটকে উঠে বসতে বসতে প্রায় চিৎকার করে উঠেছিল, আপনারা যান এখান থেকে, যান—যান বলছি! মাসী ওদের যেতে বলো।

অপ্রত্যাশিত বিস্ময় নিয়েই তারা প্রস্থান করেছে। শমী আবার কোলে মুখ গুঁজেছে।

সন্ধ্যার পর আবার থানা থেকে লোক এসেছে। এই অবস্থায় কেউ বাঞ্ছিত নয়। কিন্তু ঠেকানো যাবে কি করে। তাছাড়া তারা কিছুটা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েছে। বাড়ির নম্বর আর ব্যাঙ্কের পাসবইয়ের নাম-ঠিকানা ধরে খোঁজ নিতে জানা গেছে আসামী নিজেই সাত্যকি চ্যাটার্জি—প্রতিপত্তিশালী ধনী শিবেশ্বর চ্যাটার্জির ছেলে। আসামী হাসপাতালে অজ্ঞান, তখনো চিকিৎসা পর্যন্ত শুরু হয়নি। বাড়ির লোক এসে তাকে সনাক্ত করার ঘণ্টাখানেক পরে হাসপাতাল আর পুলিসের লোকের টনক নড়েছে। পুলিসের আর শাসনপর্যায়ের এমন সব হোমরাচোমরাদের তত্ত্ব-তল্লাসী শুরু হয়েছে যে, সকলকেই তৎপর হতে হয়েছে। আসামীকে হাসপাতালের সব থেকে ভালো ক্যাবিনে সরানো হয়েছে। আর ওপরঅলাদের বিশেষ অনুমোদনে সেই ক্যাবিনে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের হাট বসে গেছে। এই আসামী নিয়ে কারবার, থানার মানুষেরা তৎপর না হয়ে করে কি।

পুলিসের লোক জেরা করেছে, সাত্যকি চ্যাটার্জিকে এরা জানে কিনা, চেনে কিনা, আগে কখনো দেখেছে কিনা।

জেরার জবাব জ্যোতিরাণী দিয়েছেন। জবাব বলতে মাথা নেড়েছেন, জানেন চেনেন দেখেছেন।

পরের জেরা স্বতোৎসারিত। কেমন করে আর কতদিন ধরে জানেন চেনেন, কতদিন আগে দেখেছেন।

খানিক চুপ করে থেকে সব প্রশ্নের জবাবে জ্যোতিরাণী ধীর ঠাণ্ডা স্বরে শুধু বলেছেন, সে আমার ছেলে।

পুলিসের মাথা ঘুলিয়ে গেছে। তারা এলোমেলো প্রশ্ন করেছে। বিকেলের

ঘটনার বিবরণ জানতে চেয়েছে শমীর কাছ থেকে। কিন্তু শমীর অসুস্থতার কথা বলে শান্ত মুখে জ্যোতিরাণী আপাতত অব্যাহতি চেয়েছেন। পুলিস কেসএর ব্যাপার, অব্যাহতি চাইলেই সেটা মেলে না। দুজনকেই থানায় নিয়ে যাবার ইচ্ছে ছিল তাদের। কিন্তু শমী বোসের অসুস্থতার বিবেচনায় হোক বা এই মহিলার শান্ত ব্যক্তিত্বের প্রভাবে হোক, তখনকার মত তারা বিদায় নিয়েছে।

দরজার কাছে এসে জ্যোতিরাণী জিজ্ঞাসা করেছেন, ও কেমন আছে?

তারা জানিয়েছে, ভালো না, বাঁচবে কিনা বলা যায় না।

তাদের মুখে এই খবরটা পাওয়ার পর জ্যোতিরাণীর নীরব যাতনার রূপ বদলেছে। না, প্রাণ সংশয়ের কথা তিনি আগে ভাবেন নি। শমীর এত অস্থিরতার কারণ এবারে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন। পারছেন। শমীর চোখে মুখে মাথায় এখনো জলের হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। বাইরে এখনো তেমনি নির্মম রকমের স্থির। কিন্তু বুকের তলায় এবারে অন্য ঝড় উঠেছে।

অন্ধকার অন্ধকার অন্ধকার। অন্ধকারের সমুদ্র। সেই অন্ধকারের সমুদ্রে ডুবছে কেউ, ভাসছে কেউ। সাঁতার কাটতে চেষ্টা করছে কেউ। ডুবতে ডুবতে ভাসছে, ভাসতে ভাসতে ডুবছে। অন্ধকারের অনন্ত সমুদ্র, শেষ নেই তল নেই কূল নেই। কিন্তু সেই অন্ধকারে একটু একটু করে লাল আলো মিশছে। লালচে অন্ধকার। সেই লাল একটু একটু করে সাদার দিকে ঘেঁষছে।

···মা-গো!

ঘরের সব কটা লোক একসঙ্গে চমকে উঠলেন। চব্বিশ ঘণ্টা ডাক্তার মোতায়েন। তিনি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ঝুঁকলেন। নার্স দৌড়ে এলো। শিবেশ্বর চ্যাটার্জি গৌরবিমল কালীনাথ জ্যোতিরাণী সকলেই সচকিত। অদূরে শমীর বুকের ভিতরটাও ধড়াস করে উঠেছে।

সতের দিন সতের রাত পরে মাথা থেকে পা পর্যন্ত ব্যাণ্ডেজমোড়া একটা দেহে প্রথম চেতনা সঞ্চারের স্বচনা। স্বচনার প্রথম কাতোরোক্তি, মা-গো!

জ্যোতিরাণীর একাগ্র দৃষ্টিটা আস্তে আস্তে স্থির হয়ে রোগীর শয্যা থেকে ওপাশের দেয়ালের একটা চেয়ারের দিকে ঘুরল। সেই চেয়ারে বসে শিবেশ্বর। নিজের অগোচরে তাঁরও দু চোখ জ্যোতিরাণীর মুখের ওপর উঠে এসেছে। তারপরেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন শিবেশ্বর চাটুজ্যে। সতের দিনের মধ্যে চোখে চোখে এই প্রথম বিনিময়। ঘরের আর তৃতীয় কেউ বোধ হয় জানলো না, শিবেশ্বর চাটুজ্যের সতের দিনের একটানা অব্যক্ত নীরব অসহিষ্ণুতার একটা নিঃশব্দ জবাব সেই মুহূর্তে

সারা।

গত সতের দিনের প্রতিটি দিন শমীকে নিয়ে জ্যোতিরাণী বিকেল চারটে থেকে ছটা হাসপাতালের এই ক্যাবিনে এসে বসে থাকছেন। স্কুল থেকে দু ঘণ্টা আগে ছুটির ব্যবস্থা করতে হয়েছে এজন্যে। ঠিক চারটে বাজলে আসেন। চুপচাপ একটা চেয়ারে বসে থাকেন। আবার ঠিক ছটার ঘণ্টার সঙ্গে সঙ্গে শমীকে নিয়ে উঠে চলে যান। হাসপাতালের ভিজিটিং আওয়ারস্ চারটে থেকে ছটা। কেউ তাঁকে আসতে বলে না, কেউ তাঁকে যেতেও বলে না। সর্বব্যাপারে বিশেষ ব্যবস্থার ক্যাবিন, চব্বিশ ঘণ্টা ডাক্তার থাকেন, চব্বিশ ঘণ্টা নার্স থাকে, আর পালা করে দিন-রাতের বেশির ভাগ সময়ই হয় কালীনাথ থাকেন, নয়তো গৌরবিমল থাকেন। অতএব জ্যোতিরাণীরও আসা-যাওয়াটা হাসপাতালের নিয়মরক্ষার সঙ্গে যুক্ত নয়। কিন্তু ঠিক চারটেয় নিঃশব্দে এসে ঘরে ঢোকেন তিনি আর ঠিক ছটায় তেমনি নীরবে উঠে চলে যান। একটি কথাও জিজ্ঞাসা করেন না। কালীদা শুধু নিজের থেকে রাত্রির আর দিনের খবর জানান তাঁকে।

সতের দিন আগে শিবেশ্বর চাটুজ্যে বিকেল চারটের সময় টানা প্রায় দশ বছর বাদে প্রথম দেখেছিলেন জ্যোতিরাণীকে। ঠাণ্ডা দু চোখ তুলেই দেখেছিলেন। জ্যোতিরাণী তাঁর দিকে তাকাননি। কিন্তু তিনি অনেকক্ষণ ধরে দেখেছিলেন।

পরনে চওড়া কালো পেড়ে শাড়ি, দু-হাতে দুগাছা সরু রুলি, গলায় খুব সরু হার একছড়া, কানে সাদা দুটো ছোট পাথর—চোখে পড়ে না প্রায়, এত ছোট। সিঁথি খরখরে সাদা। তাঁর পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন এক অখণ্ড নীরবতা জমাট বেঁধে আছে।

দেখা শেষ করে শিবেশ্বর আর সরাসরি তাকাননি। তাঁর চোখে মুখে চাউনিতে নীরব হাবভাবে এক প্রচণ্ড অসহিষ্ণু বিরক্তি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এত স্পষ্ট যে জ্যোতিরাণীও তা লক্ষ্য করেছেন। অনুভব করেছেন। তারপর থেকে প্রতিদিন লক্ষ্য করে আসছেন, অনুভব করে আসছেন। তিনি ঘরে ঢোকা মাত্র কালীদার দিকে যেভাবে তাকান, একটাই অর্থ। কেন আসে, আসার দরকার নেই বলে দিতে পারো না? কিন্তু মুখ ফুটে এযাবৎ কেউ তাঁকে আসতে নিষেধ করেননি। তাঁর উপস্থিতিতে কালীদাই শুধু স্বাভাবিক হবার চেষ্টায় উসখুস করেন একটু, গৌরবিমল নির্লিপ্ত গম্ভীর—ভালো চেনেনও না যেন। আর, একজনের ওই চাপা অসহিষ্ণু মূর্তি, কেন আসে, আসা কেন!

চেতনার সূচনায় স্তব্ধ ঘরে রোগীর শয্যা থেকে যে শব্দটা সকলকে সচকিত করল, সেটা বাবাকে নয় জেঠুকে নয় ছোট দাদুকে নয়—সেটা শুধু মাকে ডাকার

কাতর-ধ্বনি।

রোগশয্যা থেকে তাই নিজের অগোচরে শিবেশ্বর চাটুজ্যের দুচোখ ঘরের বিপরীত কোণে জ্যোতিরাণীর দিক ফিরেছে। আর জ্যোতিরাণীর দৃষ্টিটাও আস্তে আস্তে তাঁর দিকেই ঘুরেছে। কেন আসেন, এই জবাবটাই যেন সম্পূর্ণ হয়েছে। জবাবটা জ্যোতিরাণী দেননি, শয্যার ওই যন্ত্রণাকাতর মুখ থেকে এসেছে।

পরদিন।

থানা থেকে তলব পেয়ে শমীকে নিয়ে থানায় এলেন জ্যোতিরাণী। থানা অফিসার ছাড়াও পুলিসের একজন কর্তাব্যক্তি উপস্থিত সেখানে। আর বসে আছেন কালীনাথ আর শিবেশ্বর চাটুজ্যে। থানা অফিসার তাঁদের কি জিজ্ঞাসা করছেন আর লিখছেন।

স্কুলের মাইনের খাতায়ও জ্যোতিরাণী এ পর্যন্ত দত্ত লেখেননি। জ্যোতিরাণী দেবী লিখে আসছেন। এখানে নাম জিজ্ঞাসা করতে স্পষ্ট জবাব দিলেন জ্যোতিরাণী দত্ত। অন্য প্রশ্নের জবাবেও শান্ত মুখে বললেন, বিবাহবিচ্ছেদের আগে তিনি মিসেস চ্যাটার্জি ছিলেন, সাত্যকি চ্যাটার্জি তাঁর ছেলে। ছেলের স্বভাব এবং মতিগতি সম্বন্ধে প্রশ্ন হতে একটু থেমে জবাব দিলেন, এসব ওঁদের জিজ্ঞাসা করুন, দশ বছরের মধ্যে তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ নেই।

আসল এজাহার শমী বোসের। পুলিসের বড়কর্তা তাকে নির্ভয়ে যাবতীয় সত্য ঘটনা ব্যক্ত করতে বললেন। সঙ্কোচ কেমন করে মুছে গেছল শমী জানে না। সংক্ষিপ্ত ঘটনা বলল। কিন্তু গাড়িতে তুলতে চাওয়ার সময় সাত্যকি চ্যাটার্জীকে তার প্রকৃতিস্থ মনে হয়নি এই ধারণাটার ওপরেই বেশি জোর পড়ল। রাগে অন্ধ হয়ে এই কাজ করেছে, যারা এসে ওইভাবে মেরেছে, ভুল তারাই করেছে জানাতেও দ্বিধা করল না। জেরার জবাবে জানালো, সাত্যকি চ্যাটার্জির সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ প্রায়ই হয় আর তার সঙ্গে মনোমালিন্যের ফলেই এই ব্যাপার ঘটেছে। ওষুধ-মেশানো রুমাল চেপে অজ্ঞান করে তুলে নিয়ে যাওয়ার মতই মনোমালিন্য কিনা জিজ্ঞাসা করতেও মাথা নেড়েছে। তাই।

তাদের আলাদা বসিয়ে পুলিসের কর্মকর্তারা আগের ডায়েরির সঙ্গে মিলিয়ে রিপোর্টের খসড়া ঠিক করার পরামর্শে বসলেন বোধ হয়। এ-ঘরে শমী জ্যোতিরাণী শিবেশ্বর আর কালীনাথ নির্বাক বসে।

একটু বাদে শিবেশ্বর উঠে বাইরে এসে পায়চারি করলেন খানিক। কি ভেবে দাঁড়িয়ে ঘরের দিকে তাকালেন। শমীকে ইশারায় কাছে ডাকলেন তারপর। ডেকে

পায়ে পায়ে ঘরের লোকের দৃষ্টির আড়ালে চলে এলেন।

শমী এলো। শান্ত, ঈষৎ সঙ্কুচিত। ছেলেবেলায় এই একজনকে কি ভয়ই না করত। তাঁর কাছে আসা এই প্রথম। হাসপাতালে এতদিন দু ঘণ্টা করে এক ঘরে কাটালেও তাকে কাছে আসা বলা যায় না। কি মনে হতে শমী নত হয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে উঠল।

গম্ভীর শিবেশ্বর চাটুজ্যে বিব্রত ঈষৎ। প্রণামে অভ্যস্ত নন, প্রণামের জন্য প্রস্তুতও ছিলেন না। সেই ছোট ফ্রক-পরা মেয়েটাই এই মেয়ে কিনা, চোখে সেই গোছের সংশয় প্রায়। হাসপাতালেও দেখেছেন বটে, কিন্তু আর একজনের উপস্থিতিতে আর ছেলের সঙ্কটে সেই দেখার প্রায় সবটুকুই আচ্ছন্ন।

ঠোঁটে একটু হাসি ফোটাতে চেষ্টা করেও ঠিক পেরে উঠলেন না। জিজ্ঞাসা করলেন, সিতুকে বাঁচানোর জন্যে তোমাকে এভাবে বলতে বলা হয়েছিল ?

এক মুহূর্ত তাঁর দিকে তাকিয়ে শমী প্রশ্নটা বুঝে নিল। তারপর আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে জানালো, মাসীমা এ সম্বন্ধে কিছুই বলেননি।

শিবেশ্বর চেয়ে রইলেন। এ চাউনি কোমল, যা সচরাচর হয় না।···অঘটনের পর এই মেয়েটার প্রতি ছেলেবেলা থেকে সিতুর অস্বাভাবিক ঝোঁকের কথা কালীদা কি যেন বলছিল সেদিন। কুশাগ্রবুদ্ধি মানুষ, মেয়েটার মুখের দিকে চেয়ে কি দেখলেন তিনিই জানেন। এতখানি ব্যাপারের পরেও পুলিসের কাছে যা বলেছে নিজের তাগিদেই বলেছে, এটুকুই স্পষ্ট চোখে পড়ল বোধ করি। কি একটা উদ্গত অনুভূতি নিষ্পেষণ করলেন। জীবনের অনেক সহজ সুন্দর স্বাভাবিক সম্ভাবনা কঠিন হয়ে গেছে সেটাই অনুভব করলেন হয়ত। যা কখনো করেননি, আত্মচেতন মর্যাদাচেতন, মানুষটা হঠাৎ তাই করলেন। ডান হাতখানা তুলে আলতো করে একবার শমীর মাথায় ছুঁইয়ে নামিয়ে নিলেন।

তুমি পড়ো ?

হ্যাঁ।

কি পড়ো ?

এবারে এম. এ-তে ভর্তি হয়েছি।

কোন্ সাবজেক্ট ?

ইকনমিক্স্।

এই জবাবই যেন আশা করেছিলেন তিনি। হাসতে চেষ্টা করলেন একটু। ইচ্ছে করলেই তিনি হাসতে পারেন না, তাই হাসিটা অদ্ভুত দেখালো। বিড়বিড় করে বললেন, ও বিষয়টা এককালে আমিও একটু-আধটু জানতুম, এখন ভুলে

গেছি।

শমীও চেয়েই ছিল তাঁর দিকে। কি রকম যেন লাগছে তার। আনন্দ হচ্ছে একটু, কিন্তু আনন্দটুকু ব্যথার মত।···বিষয়টা একটু-আধটু জানতেন বললেন, কিন্তু শমী খবর রাখে অত বড় স্কলার আজকের দিনেও কমই হয়।

আচ্ছা, তুমি বোসোগে।

অন্যমনস্কের মত পায়চারি করে বারান্দার ওধারে চলে গেলেন তিনি। শমী তবু দাঁড়িয়ে দেখল একটু। প্রায় কোটিপতি শিবেশ্বর চাটুজ্যের প্রৌঢ় নিঃসঙ্গতার কোনো একটা দিক কি শমীর চোখে ধরা পড়ার উপক্রম হয়েছিল? ও ঠিক বুঝল না।

থানার কাজ শেষ। সাত্যকি চ্যাটার্জির জবানবন্দি নেবার আগে তাদের রিপোর্ট সম্পূর্ণ হবে না। তার সে পর্যায়ে সুস্থ হয়ে উঠতে দেরি আছে। কালীনাথকে নিয়ে শিবেশ্বর চাটুজ্যে গাড়িতে উঠে চলে গেলেন। আর কাউকে চেনেনও না।

ফ্ল্যাট বাড়ি থেকে থানা খুব দূরে নয়। দূর বরং আর যারা এসেছিল তাদের বাড়ি থেকে। এই এলাকার ঘটনা বলেই এ থানার দায়িত্ব। রাস্তায় এসে শমী হঠাৎ প্রস্তাব করল, চলো মাসী হেঁটেই যাই, ভিড়ের সময় ট্রাম-বাসে উঠতে ইচ্ছে করে না—কষ্ট হবে?

না কষ্ট কি, চল্। জ্যোতিরাণীর ধারণা শমী কিছু বলার জন্যে উসখুস করছে। ওকে বাইরে ডাকতে দেখে মনে মনে তিনিও কম বিস্মিত হননি।

যেতে যেতে শমী বলল, মেসোমশাই আমাকে বাইরের বারান্দায় ডেকেছিলেন।

আগে মেসোমশাই বলত, এখনো আর কি বলতে পারে শমী ভেবে পেল না। জ্যোতিরাণী নীরবে মাথা নাড়লেন। দেখেছিলেন।

বারান্দায় কি কথা হল শমী নিজের থেকেই বলল। কথা অল্পই হয়েছে। বলতে সময় লাগল না। জ্যোতিরাণী নিঃশব্দে শুনলেন। তারপরে তেমনি নীরবেই চলতে লাগলেন। তিনি ফিরে তাকানওনি ওর দিকে, তবু টের পেলেন শমী ঘাড় ফিরিয়ে এক-একবার দেখছে তাঁকে।

···কি দেখছে?

আজ কি জ্যোতিরাণী প্রথম নিজেকে বিধবা ভাবতে চেষ্টা করলেন? শমী কি এর আগেও তাঁর ভিতরে এমনি করে চোখ চালিয়েছে? দ্বিতীয় জীবনে তাঁর ছয় বছর মেয়াদের বিয়ে আর এই বৈধব্য কতটুকু রেখাপাত করেছে, সে কি শমীর

চিন্তার মধ্যেও উঁকিঝুঁকি দিয়ে গেছে কখনো ?

কাকা চোখ বুজতে শমীর শোক কম হয়নি। কিন্তু সেই শোক তাকে তেমন বিড়ম্বিত করেনি। বিড়ম্বিত বোধ করেছিলেন তিনি নিজের কারণেই। বড় সূক্ষ্ম অথচ নিরুপায় অপরাধচেতন বিড়ম্বনার মত। দ্বিতীয় জীবনের শুরু থেকেই সেটা অনেকবার উঁকিঝুঁকি দিতে চেয়েছে। আর বড় নিঃশব্দে সেটা তিনি অস্তিত্বের বাইরে ঠেলে সরিয়ে রেখেছেন।...তাঁর প্রথম জীবনের আগন্তুক হিংস্র বিকৃত অবুঝ অত্যাচারী, রমণীর দেহ-লোলুপ অন্ধকারের নৃশংস পুরুষ। প্রবঞ্চনাপটু, ব্যভিচারী, বিশ্বাসঘাতক। জীবনের শুরু থেকে তারই সঙ্গে অবিরাম দ্বন্দ্ব, আর তারই সত্তা-গ্রাসী ক্ষুধা থেকে আত্মরক্ষার অবিরাম সঙ্কট। আইনগত বিচ্ছেদে সব কিছুর অবসান। তা নিয়ে পরিতাপ করেননি। কিন্তু আইনের বিচ্ছেদ সমস্ত স্মৃতি নির্মূল করবে কেমন করে। বিচ্ছেদ তিনি নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছেন, কিন্তু অবিরাম সংঘাতের মধ্য দিয়েই প্রথম বয়সের টানা চোদ্দটা বছরের যুক্ত জীবনে বিরূপতার আকারেও কিছু যদি পুষ্ট হয়ে থাকে, তাই বা মুছে দেবেন কি করে। থাকুক আর নাই থাকুক, পুরুষ তাঁর জীবনে একজনই। এই সত্যটা দ্বিতীয় বাসরে পদার্পণের মুহূর্তে বড় নির্মমভাবে উপলব্ধি করতে হয়েছিল তাঁকে। বিচ্ছেদের মুহূর্তে, তার আগেও, বলতে গেলে মিত্রাদির বন্ধ দরজার আঘাত নিয়ে ফেরার পরক্ষণ থেকেই আপসশূন্য সঙ্কল্পে ওই পুরুষকে তিনি জীবন থেকে ছেঁটে দিয়েছেন। সঙ্কল্পের নড়চড় কখনো হয়নি। তবু সত্যটা থেকেই গেছে।...পুরুষ ওই একজনই।

বিভাস দত্তর জীবনে আসাটা বিধিলিপির এক বিচিত্র অধ্যায়। কালের আইন-সিদ্ধির এক অদ্ভুত বলি যেন তিনি। কলের পুতুলের মত কেউ তাঁকে টেনে এনেছিল। ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রশ্ন ছিল না, বিচার-বিবেচনার সামর্থ্যও ছিল না। ঘটবে বলেই ঘটেছে। পুরুষ জীবনে একজনই—এই অকারণ সত্যটা মোছেনি বলেই শুরু থেকে একটানা ছটা বছর রণাঙ্গনের সেই নার্সের ভূমিকা তাঁর—হিমেল দুর্যোগে আহত অর্ধমৃত সৈনিককে যে নিজের দেহের তাপের বিনিময়ে জীবনের তাপে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেছিল। দিনে দিনে এই ভূমিকাটা বড় হয়ে উঠেছিল। দেহ-চেতনার নিভৃত বিড়ম্বনার কাল দ্রুত নিঃশেষ হয়েছিল। সেবার এই ভূমিকাটাই সত্য ছিল শুধু, আর সবই মিথ্যা হয়ে গিয়েছিল। দু হাতে একটা মানুষকে সর্বব্যর্থতার গ্রাস থেকে টেনে তোলার অক্লান্ত চেষ্টা করেছেন তিনি। পারেননি। ছ বছরের ভবিতব্যের অধ্যায় শেষ হয়েছে।

শেষের সে-চিত্র ভোলবার নয়।

....বাঁচার এমন আকৃতি আর কি কখনো দেখেছেন। বুকে বাতাস নেই,

একটু বাতাসের জন্য সে কি দারুণ ছটফটানি, মুখে কিছু বলতে পারেননি—শুধু দুই চোখ দিয়ে বলেছেন। বলতে চেয়েছেন—আমাকে বাঁচাও, বাঁচিয়ে রাখো। আবার বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখেছেন তারও আগে। তাঁকে নয়, কালীদাকে বলেছেন, যত ক্ষতি তিনি জ্যোতিরাণীর করে গেলেন, তেমন আর কেউ করেনি। তিনি অযোগ্য, বেঁচে থাকলেও অযোগ্য, স্বার্থে আর মোহে অন্ধ হয়ে এতকাল তিনি সেটা বোঝেননি। বুঝেছেন যখন ক্ষতি হয়েই গেছে। এখন তিনি চোখ বুজতেই চান, আর কিছু চান না।

কিন্তু জ্যোতিরাণীর কোনো অভিযোগ ছিল না। চলে যাবার পরেও না। আত্মপীড়িত মানুষকে মনে মনে শেষ নমস্কার জানিয়েই বিদায় দিয়েছেন। দুঃখও হয়েছে। কিন্তু সেটা স্বামী-বিয়োগের শোক নয়। সে-সময়ে প্রাথমিক অনুষ্ঠানগুলো তাই সূক্ষ্ম অপরাধচেতন বিড়ম্বনার কারণ হয়েছিল। অনুষ্ঠান হৃদয়ের বস্তু হয়ে উঠতে পারেনি।

অনুষ্ঠানের ছকগুলো শমীই বাতিল করে দিয়েছে। চওড়া কালো-পেড়ে শাড়ি এনে দিয়ে বলেছে, সাদা পরা চলবে না। নিজে জোর করে হাতে দু গাছা রুলি পরিয়েছে, আর গলায় সরু হার, কানে পাথর। বলেছে, এ আজকাল সবাই পরে। জ্যোতিরাণী আপত্তি করেননি। আপত্তি করলেই বরং ছেলেমানুষি মিথ্যাচার হত ভেবেছেন।

কিন্তু আজ? অমন উৎসুক মুখে শমীকে ওই কথাগুলো বলতে শুনে আজ কি এই প্রথম নিজেকে বিধবা ভাবতে চেষ্টা করছেন তিনি? বিধবা ভেবে উদ্গত কোনো দুর্বল মুহূর্ত নির্মূল করে দিতে চাইছেন?

দিন-রাতের বেশির ভাগ সময় বেঁহুশ অবস্থার মধ্যে সিতুর আরো তিন-চার দিন কেটে গেল। যাতনায় আর ওষুধের ঘোরে আচ্ছন্ন। ঘরে কে আসছে কে যাচ্ছে কারা বসে আছে, ঠিক খেয়াল করতে পারে না। তবে চাউনির ঘোলাটে ভাবটা কেটে আসছে।

সেদিন বড় নিঃশব্দে দুঃসহ একটা আঘাত বুকে চেপে সিতুর ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে এলেন জ্যোতিরাণী।

সিতু ঘুমুচ্ছিল তখনো। ঘরের মাঝামাঝি পাশের দিকে জ্যোতিরাণী একটা চেয়ারে বসে। রোজ এসে ওই একটি জায়গাতেই বসেন। শিবেশ্বর চাটুজ্যে তখনো আসেননি। সিতুর ওপাশে বিছানার কাছে চেয়ার টেনে কালীদা বসে ছিলেন। শিয়রের দিকের দরজার কাছের টুলে শমী। এই কটা দিন ও আর

সামনের দিকে আসছে না; শয্যা থেকে মাথা উঁচিয়ে পিছন দিকে না তাকালে ওকে দেখতে পাওয়ার কথা নয়। সেভাবে দেখার সম্ভাবনা আপাতত নেই-ই।

অস্ফুট একটু যন্ত্রণার শব্দ করে সিতু চোখ খুলল। অল্প অল্প মাথা নেড়ে এদিক-ওদিক তাকালো। আচ্ছন্ন ভাব আজ অনেকটাই কম। গলা থেকে মাথা পর্যন্ত শুধু চোখ দুটোই দেখা যায়। আর সব ব্যাণ্ডেজের নীচে।

কালীনাথ সামনে ঝুঁকলেন। সিতু চেয়ে রইল একটু। চিনল বোধ হয়। খুব ধীরে মাথাটা এপাশে সরালো। দৃষ্টিটা আস্তে আস্তে জ্যোতিরাণীর মুখে এসে থামল। জ্যোতিরাণী উঠে কাছে আসবেন কিনা ঠিক করে উঠতে পারছেন না। সিতু চেয়েই আছে কিন্তু কি দেখছে ঠিক যেন বুদ্ধির গোচর নয়।

তারপরেই কি বুঝি হয়ে গেল। কিছু বুঝি সরাসরি ওর মগজে গিয়ে ধাক্কা দিল। উত্তেজনা স্পষ্ট হয়ে উঠল। চাউনির ঘোলাটে ভাব সম্পূর্ণই কেটে আসছে। যাকে দেখছে ঠিক দেখছে কিনা নিঃসংশয় হবার অস্থির চেষ্টা। নিঃসংশয় হল বোধ হয়। ঘোরালো ধারালো প্রায় হিংস্র হয়ে উঠল বড় বড় দুটো চোখ। উত্তেজনায় শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বাড়তে থাকল। দুই চোখের গভীর থেকে বুঝি নিদারুণ গলিত বিদ্বেষের ঝাপটা এসে লাগল জ্যোতিরাণীর মুখের ওপর। মুখের যেটুকু আভাস মেলে, অসহ্য উত্তেজনায় তাও বিষম অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে।

জ্যোতিরাণী অবশ নিস্পন্দ একেবারে। ওই তীব্র তীক্ষ্ণ তপ্ত গলিত বিদ্বেষের ঝাপটা মুহূর্তে যেন পঙ্গু করে দিল তাঁকে। তারপরেও ওই ঝাপটা এসে লাগছেই—লাগছেই। বিদ্বেষ-ভরা এই চোখের চাউনি আগেও বারকয়েক দেখেছেন, দেখে আগেও ধাক্কা খেয়েছেন। কিন্তু সে-ও এত গভীর থেকে এমন উদগ্রভাবে ঠিকরে বেরোয়নি। এর যেন শেষ নেই। উত্তেজনায় ওর চাদরে ঢাকা শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে, পারলে উঠে বসত। শক্তি থাকলে মুখে যা বলত দুটো চোখ দিয়ে তাই বলছে। অফুরন্ত আক্রোশ আর বিদ্বেষের ঝাপটা মেরে মেরে এই ঘর থেকে যেন তাঁকে ঠেলে সরিয়ে দিতে চাচ্ছে।

সম্বিৎ ফিরতে সময় লাগল। কোনরকমে চেয়ার থেকে দেহটাকে টেনে তুললেন জ্যোতিরাণী। সমস্ত মুখ ফ্যাকাশে, রক্তশূন্য। পায়ে পায়ে দরজার দিকে এগোলেন—ওই আঘাতের বিরাম নেই তবু, যতটা সম্ভব চোখ ফিরিয়ে তেমনি করেই যেন চেতনার অস্তিত্ব থেকে ঠেলে সরাতে চেষ্টা করছে তাঁকে।

জ্যোতিরাণী বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন।

কালীদা লক্ষ্য করেছেন সবই। ঝুঁকে সিতুর ব্যাণ্ডেজের ওপর আলতো করে হাত ছুঁইয়ে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করছেন তিনি। কিন্তু শমী কিছুই বোঝেনি।

অতি নিঃশব্দে কিছু একটা উত্তেজনার কারণ ঘটে গেল এটুকুই শুধু অনুভব করছে। দুর্বোধ্য বিস্ময়ে শয্যার দিকে, কালীজেঠুর দিকে আর দরজার দিকে তাকালো, তারপর আস্তে আস্তে উঠে সেও বাইরে এলো।

মাসীর এই মুখ দেখে ঘাবড়েই গেছে। ত্রস্তে কাছে এসে ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল, কি হল?

একটা অস্ফুট শব্দও উচ্চারণ করতে পারলেন না জ্যোতিরাণী। সামান্য একটু মাথা নাড়লেন শুধু। অর্থাৎ কিছু না।

কালীনাথ বাইরে এলেন। বিব্রত মুখে বললেন, হঠাৎ দেখেছে, তাই একটা ইমোশনাল ব্যাপার কিছু হয়েছে বোধ হয়···

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে অস্ফুট স্বরে জ্যোতিরাণী বললেন, আমি যাচ্ছি।

একটু অপেক্ষা করো না, এক্ষুনি ঠিক হয়ে যাবে। আমি ওর সঙ্গে দুই-একটা কথা বলি, তারপর তুমি ঘরে এসো।

তাতে ক্ষতি হবে। আমি আর আসব না। আপনি যদি পারেন মাঝে-মধ্যে একটু খবর দেবেন কেমন থাকে।

দ্বিতীয় অনুরোধের অপেক্ষা না রেখে জ্যোতিরাণী আস্তে আস্তে সিঁড়ির দিকে এগোলেন। ভিতর থেকে কাতরোক্তি কানে আসতে কালীনাথ তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে গেলেন। শমী হতভম্ব মুখে খানিক দাঁড়িয়ে থেকে শেষে মাসীকে ধরার জন্য তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল।

বাইরে এসেই উদ্‌গ্রীব মুখে জিজ্ঞাসা করল, আমি তো কিছুই বুঝলাম না, কি হয়েছে বলো তো?

কিছু না। একটা ট্যাক্সি ধর।

ট্যাক্সি কেন ধরতে চায় মাসীর মুখ দেখেই টের পাচ্ছে।—কিছু না তো ওভাবে উঠে এলে কেন? আর আসবে না বললে কেন জেঠুকে?

আমাকে চায় না।

কিন্তু কিছু তো বলেনি, চায় না তুমি বুঝলে কি করে?

বুঝেছি।

তবু বিস্ময়ের অন্ত নেই শমীর। একটু ভেবে বলল, এ-রকম একটা ধকল, রাগ করে হয়ত তাকিয়েছে তোমার দিকে, তা বলে সত্যি তুমি আর আসবে না?

রাগ নয়, আমাকে চায় না। দেখলেও ক্ষতি হতে পারে।···ইচ্ছে হয় তো তুই একা যাস।

শমী ঝাঁঝের মুখে বলে বসল, তোমাকে চায় না আর দেখলে ক্ষতি হয়,

আমারও সেখানে গিয়ে কাজ নেই—বুঝলে ?

হাত তুলে ট্যাক্সি থামালো। মাসীকে আগে তুলে নিজে উঠল। দুজনেই চুপচাপ খানিকক্ষণ। শেষে আবারও মুখ না খুলে পারল না শমী। বলল, কিন্তু সিতুদা তো তোমাকে কিছু বলেনি, তোমার বুঝতেও তো ভুল হতে পারে!

ভুল হয়নি।

শমী চুপ। কিছু না বুঝুক, শুধু এই মুখ দেখেই অনুভব করতে পারে, মাসীর ভুল হয়নি।

॥ বিয়াল্লিশ ॥

নাকে মুখে মাথায় বুকে পিঠে কোমরে পায়ে প্রবল বৃষ্টির ধারার মত আঘাত যখন পড়ছিল, সেই যন্ত্রণায় শরীরটা কোন্ এক অতল গহ্বর থেকে ভেঙে দুমড়ে কুঁকড়ে যাচ্ছিল বটে, তবু সেই অসহ্য যাতনাটা শুরুতে বিস্ময়কর রকমের অদ্ভুত লাগছিল সিতুর। দিনের খটখটে সাদা আলোর রং বদলাচ্ছিল। চোখের সামনে সব কিছুতে লালের ছোপ পড়ছিল। সেই লাল গাঢ় হয়ে হয়ে শেষে কালোর দিক ঘেঁষছিল। তারপর অন্ধকারে একাকার সব কিছু। সৃষ্টিগ্রাসী অন্ধকারের বন্যা। সেই অন্ধকারের সমুদ্রে প্রায় অচেতন অস্তিত্বের মত সে ভাসতে শুরু করেছিল। আর শরীরের রক্তগুলো সব সির্‌সির্ সির্‌সির্ সির্‌সির্ করে নীচের দিকে—পাতালের দিকে নামতে লেগেছিল। কেবল নামছিল, কেবল নেমেই চলেছিল। রক্তেরও শেষ নেই, নামারও বিরাম নেই।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল, কতক্ষণ বা কদিনের জন্য ঘুমিয়েছিল জানে না। কিন্তু তারপর সেই অন্ধকার বিস্মৃতির গহ্বরের মধ্যেই অবচেতনার কোনো স্তরে কেউ বুঝি জেগে উঠেছিল। তখন সেই সির্‌সির্ অনুভূতিটা আবার ওকে কোন্ পাতালের দিকে টেনে নিয়ে চলছিল। ও যেন অসীম উঁচু থেকে খসে প্রবল বেগে নীচের দিকে পড়ছিল। এ পাতালেরও শেষ নেই, তাই পড়ারও বিরাম নেই। অনন্তকাল ধরে কেবল বুঝি পড়বেই।

এই পতনও কতক্ষণ বা কতদিন ধরে চলেছে জানে না। সেই আচ্ছন্নতার মধ্যেই একদিন বা একসময় মনে হয়েছে সির্‌সির্ অনুভূতিটা কমে আসছে। আর সে নীচে নামছে না। ওপরেও উঠছে না। কিন্তু একটা ওঠার তাগিদ শুরু হয়েছে। তারপর খুব একটু একটু করে অন্ধকারের রং বদলাতে লেগেছে। খুব

একটু একটু করে ফিকে হয়েছে। সাদাটে হয়েছে। শেষে সাদাই হয়েছে।

সিতু চোখ মেলেছে।

চেতনার প্রথম বিমূঢ় বিস্ময়। অনন্ত বিচরণের পর কোথা থেকে কোথায় এসে পৌঁছল ঠাওর করা গেল না।

সাদা আলো চোখে সয়ে আসছিল। কিন্তু জাগলেই যন্ত্রণা। ঘুমুতে চায়। ঘুমোয়। ঘুম ভাঙলে সব আবছা দেখে প্রথম। যা দেখে তার কোন্‌টা সত্যি কোন্‌টা স্বপ্ন ঠাওর করতে পারে না।…জেঠুর মুখ। তারপর এপাশে আর একখানা মুখ। আচম্‌কা উত্তেজনায় মাথায় রক্ত উঠতে থাকে। এ মুখ স্বপ্ন কি সত্য জানে না। স্বপ্ন বা সত্য কোনটাই চায় না। দুই-ই সরিয়ে দিতে চায়।……সরে যাচ্ছে। সরে গেল। তারপরেও অস্বস্তি। অস্বস্তি আর যন্ত্রণা। এক্ষুণি ঘুমুতে চায়। শুধু ঘুম চায়। আর কিছু চায় না।

ঘুমের মেয়াদ কমে আসছে। দেহের যন্ত্রণাও অত অসহ্য নয় আর। মাথা সক্রিয় হয়ে উঠছে। কেন এখানে এসেছে, কেন এখানে পড়ে আছে—সেই বিভ্রম কেটে গেছে। সবই মনে পড়েছে। দেহের যন্ত্রণা কমছে বটে, কিন্তু কি এক অব্যক্ত যন্ত্রণা ভিতর থেকে গুমরে গুমরে ঠেলে ঠেলে ওপরের দিকে উঠছে। সেই যন্ত্রণার অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া। এক মাস দু মাস কেটে গেল, এই যন্ত্রণা কমা দূরে থাক, বাড়ছেই। আর সেটা বড় নিষ্ঠুরভাবে তাকে হালকা করে চলেছে, শূন্য করে চলেছে। জন্ম থেকেই সে বুঝি কিছু সঞ্চয় করা শুরু করেছিল। ইচ্ছে অনিচ্ছে রাগ আক্রোশ চিন্তা ভাবনা লোভ কামনা বাসনা প্রবৃত্তির অজস্র আবেগের সব ফলাফল তার ভিতরে জমছিল। জমে জমে তেইশের শেষে শক্ত নিটোল একটা মূর্তি ধরেছিল। সেটাই তার চরিত্র, সেটাই ও নিজে। ওটা তাকে ক্ষ্যাপার মত তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল, ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল, আবেগ যোগাচ্ছিল, প্রেরণা যোগাচ্ছিল, শক্তি যোগাচ্ছিল। ওকে বাদ দিয়ে সিতুর আর কোন অস্তিত্ব ছিল না।

কিন্তু ভিতর থেকে ঠেলে ওঠা যন্ত্রণার তাপে এক বিচিত্র ব্যাপার ঘটতে শুরু করেছে। ওই দুর্বার মূর্তির ইস্পাত-কঠিন জমাট বাঁধুনির ভাঙন ধরেছে। ওটা আকারভ্রষ্ট হচ্ছে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খসে খসে পড়ছে। যেটুকু খসছে তা বাষ্প হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। এই করে গত দুই মাস ধরে গোটা মূর্তিটাই যেন বাষ্প হয়ে মিলিয়ে গেল। ভিতরটা নিদারুণ শূন্য, নিদারুণ খালি।

নিস্পন্দের মত পড়ে থাকে। দৃষ্টি সেই দারুণ শূন্যপথে।……ও তাহলে কে? সিতু কে? সাত্যকি চ্যাটার্জি কে? সে কি সত্য ভূমিষ্ঠ হল? কিন্তু তেইশ

বছরের ব্যর্থ চেতনা তো আছে। এই চেতনাসহ সত্ত্ব ভূমিষ্ঠ হলে সে দাঁড়াবে কোন্ সম্বল নিয়ে? বাঁচবে কেমন করে?

ওই শূন্যপথে ডুব দিয়ে দিয়ে থমকেছে হঠাৎ। চমকেছে। দু চোখ বিস্ফারিত। নিজের সেই দারুণ শূন্যতলে বসে আছে একজন। তাকেই দেখছে। সে কোনো সম্বল নিয়ে বসে নেই। অস্তিত্বের শোক নিয়ে বসে আছে। অস্তিত্বের বিপুল শোক্।

শুদ্ধ মূক যাতনায় দু চোখ টান করে সিতু তাকে দেখছে।

সেই একজনও সিতুকে দেখছে।

আড়াই মাস বাদে বাড়ি ফিরেছে। কিন্তু পরস্পরকে দেখার বিড়ম্বনা ঘুচল না। আর বুঝি ঘুচবেও না। সিতু বাড়ি ফিরতে চায়নি। হাসপাতাল থেকে সোজা হাজতে যেতে চেয়েছিল। চেয়েছিল জেল হোক। হলে এই দুর্বহ শূন্যতার কিছু লাঘব হত বোধ হয়। তাও হল না। পুলিসের দপ্তরে নিজের অনুকূলে একটি কথাও বলেনি। তবু জেল হল না। বাবার টাকার জোরে হল না। আর অপর তরফের এজাহারে অভিযোগ মুছে দেবার চেষ্টার দরুন হল না। সেটা আরো দুঃসহ।

বাড়ির বাতাস আর একদফা বদলেছে। ওকে ঘিরেই বদলেছে। বাবা ঘরে আসে। চুপচাপ বসে থাকে। নয় তো পায়চারি করে। ঘরে তৃতীয় কেউ থাকলে বাবা খুশি হয়। তখন যে কোনো প্রসঙ্গে ঔৎসুক্য দেখাতে চেষ্টা করে। নতুন হবার তাগিদ। নতুন করে শুরু করার চেষ্টা। সেটা কি সিতু ভেবে পায় না? গাড়িটা ভেঙেচুরে নষ্ট হয়ে গেছে। ওকে শুনিয়েই বাবা একটা নতুন গাড়ির অর্ডার দিয়ে রাখতে বলেছে জেঠুকে। কোন্ গাড়ি পছন্দ সিতু বলবে আশা করে তার দিকে তাকিয়েছিল। ওর নামের ব্যাঙ্কের পাসবইগুলো আর যে হাজার কতক টাকা সিন্দুক থেকে নিয়ে শমী-হরণে বেরিয়েছিল, সেই পাসবই আর টাকা হাতে পেয়ে বাবা ওকে দেখিয়ে ঘরের আলমারিতে রেখে গেছে। আরো ঢের বেশি দিতে পারে এবং দেবে সেই প্রশ্রয়ের আভাসও অস্পষ্ট ছিল না একটুও।...শমীকে গাড়িতে তুলতে পারলে বাবা আর এ জীবনে তার মুখ দেখতে পেত কিনা সন্দেহ। নিজের সেই মূর্তি চোখে ভাসতে সিতু শিউরে উঠেছিল। সেই বীভৎস মূর্তিটা বাষ্প হয়ে মিলিয়ে গেছে বটে, কিন্তু স্মৃতি থেকে চেহারাটা মুছে যায়নি। সিতু কি পাগল হয়ে গেছল?...এখনই বা তাহলে কি?

ঘরে জেঠু আসে, ছোট দাদু আসে। এই ঘরটাই যেন তাদের আড্ডার জায়গা

এখন। এই আড্ডার মধ্যে ওকেও টানার বাসনা। চেষ্টা করেও সিতু যোগ দিতে পারে না। অর্থহীন প্রলাপ মনে হয়। তারা ভাবছে ও ভয়ানক কিছু খুইয়েছে। খুইয়েছে ঠিকই। চেতনার শুরু থেকে এ পর্যন্ত একটা পাগলামির বোঝা সরে গেছে। এ ধরনের পাগলামির বোঝা চেপে থাকলে শক্ দিয়ে সারানোর ব্যবস্থা আছে শুনেছিল। যার নাম শক-থেরাপী। যা ঘটে গেছে তাতে সত্তাসুদ্ধ প্রচণ্ড নাড়া-চাড়া খেয়ে ওই বোঝাটা ঝেড়ে ফেলেছে। আবার ওকে তার মধ্যে ফেরাতে চায় কেন এরা? ওর ভিতরের যে মূর্তিটা বাষ্প হয়ে মিলিয়ে গেছে সেই গোছের ছোটখাটো একটা করে মূর্তি এদের মধ্যেও বাসা বেঁধে আছে নাকি? তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালিয়ে সিতু দেখে নিতে চেষ্টা করেছে। এই চাউনিটাই আবার অস্বাভাবিক ঠেকেছে ছোট দাদু আর জেঠুর চোখে। সিতু বুঝতে পারে বলেই হাসি পায়। যে প্রবল অনড় মিথ্যাটা সরে গেছে তার জন্যে একটুও ক্ষোভ নেই, খেদ নেই। তার হতাশা অন্য কারণে। তেইশ বছরের এই জীবনটা তন্ন-তন্ন করে দু পায়ে উঠে দাঁড়াবার মত এতটুকু সঞ্চয়, এতটুকু সম্বল চোখে পড়ছে না বলে।

কিন্তু কি সেটা? কি চায়? কি পেলে সেটা সম্বল ভাবতে পারত, সঞ্চয় ভাবতে পারত? অন্তস্তলে ওই যে একজন চেয়ে আছে তার দিকে—চেয়েই আছে, কি পেলে তার শোকার্ত দেউলে দৃষ্টিটা মুছে যাবে? কোন্ সম্বল পেলে সে উঠবে, দাঁড়াবে, কাছে এসে তার হাত ধরবে—তার সঙ্গে মিশে যাবে?

সিতু কেবল ভাবে ভাবে আর ভাবে। যত ভাবে ততো হতাশা। ততো রিক্ত দেউলে মনে হয় নিজেকে। নিজের নিভৃতের ওই অসহায় পঙ্গু সত্তার পুষ্টির রসদ সে খুঁজে পায় না। অজ্ঞাতে কখন তার হাহাকার সিতুর নিজের হাহাকার হয়ে ওঠে।

তার মাথার মধ্যে যেন বিশ্লেষণের কল বসে গেছে একটা।···ঠিক কোন্ শক্তিতে নিজেকে পুষ্ট করে তুলতে পারলে এ-রকম হত না? বাবার প্রতিভা ছিল। মায়ের প্রবল শক্তি ছিল। সেই প্রতিভা আর শক্তি থেকে তার জন্ম। ওই পাগলামির বোঝা গোড়া থেকে ছেঁটে ফেলা সম্ভব হলে হয়ত বাবার থেকেও অনেক বড় অনেক সফল একজন কেউ হয়ে বসতে পারত। তাহলে? তাহলে কি হত?

নিজের নিভৃতে চোখ চালিয়েছে তক্ষুনি। না, অসহায় পঙ্গুর মত যে বসে আছে সে বসেই আছে—এই সার্থকতাও তার শক্তির রসদ নয়, পুষ্টির রসদ নয় একটুও।

কিন্তু বিশ্লেষণের শেষ নেই। ঘুম কমে আসছে, আহারে রুচি নেই, বিশ্রাম

মৃত্যুর মত, তবু কোথাও ছুটে বেরুনোর তাগিদ নেই।

এরই মধ্যে যখন মেঘনা আসে, বসে, ভালো কথা বলতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত মন্দ কথাই বেশী বলে, আর শেষ পর্যন্ত কান্না লুকোবার জন্য উঠে পালায়—তাকে একটু কাছের মানুষ মনে হয় সিতুর। সেদিন এক অদ্ভুত কাণ্ড হয়েছিল। পরের সংসারের বেগার বোঝা ওর মাথায় চাপানো হয়েছে বলে মায়ের উদ্দেশে গাল-মন্দ করে উঠে মেঘনা হঠাৎ তার সামনেই কেঁদে ফেলেছিল। সিতু ঠিক সেই মুহূর্তে মেঘনাকেও দেখেনি, নিজেকেও না। তারই নিভৃতে যে একজন বসে আছে তাকে দেখেছিল। মনে হয়েছিল অদ্ভুত তৃষ্ণার্ত দু চোখ মেলে সে মেঘনাকে দেখছে, মেঘনার বুকের ভিতরে ঢুকে গিয়ে সেখানে হারানো কাউকে আবিষ্কার করতে চাইছে।

বাড়ি ফেরার পর সেই প্রথম নাড়াচাড়া খেয়েছিল সিতু। ভিতরে যে বসে আছে তাকে ভুলতে চেয়েছিল, নিষ্ক্রিয়তা ঝেড়ে ফেলে আবার উঠে দাঁড়াতে চেয়েছিল।

পারেনি। আরো দেউলে হয়েছে। আরো হতাশার মধ্যে ডুবেছে।

সিতু আড়াল চায়। চারদিকের দরজা জানলা বন্ধ করে শুধু ভাবতে চায়, ভাবনার জাল ফেলে ফেলে হতাশার আবর্ত থেকে নিজেকে উদ্ধার করতে চায়। কিন্তু কি ভাবে, কি বিশ্লেষণ করে, ক্ষণে ক্ষণে ভুল হয়ে যায়। তখন আবার নতুন করে আরো নিশ্ছিদ্র নিঃসঙ্গতার বিবরে ঢোকার তাগিদ।

এই বিবর থেকে হয়ত বেরিয়ে পড়তই একদিন। তবু বেরুবার প্রত্যক্ষ কারণ ঘটল একটা। নিঃসঙ্গতা ঘুচল না, শুধু বিবরের আশ্রয়টুকুই গেল।

বেলা তখন দেড়টা-দুটো হবে। হন্তদন্ত হয়ে দরজা ঠেলে মেঘনা ঘরে ঢুকল। হাসির সঙ্গে চাপা উত্তেজনা।—ও ছোট মনিব, ওঠো ওঠো, কে এসেছে বলো দেখি?

অনুমান করা গেল না, কে। সিতুর মুখে বিরক্তির ছায়া ঘন হতে থাকল। মেঘনা তাড়াতাড়ি বলল, শমী—শমী এসেছে! সেই এতটুকু ফ্রক-পরা মেয়ে এত বড়টি হয়েছে, এমন সুন্দর হয়েছে, আমি কি জানি! নিজে নাম বলতে তবে চিনলাম।…তা এখানেই ডাকি?

ডাকতে হল না। শমী নিজেই উঠে এসেছে। মেঘনা অনুমতি পাবার আগে তাকে দোরগোড়ায় দেখা গেল। চোখ থাকলে সিতু অনুভব করতে পারত, অনেক দ্বিধা দ্বন্দ্ব আর মানসিক বাধা ঠেলে শমী এই অসাধ্যসাধন করতে পেরেছে—আসতে পেরেছে। আস্তে আস্তে সিতু উঠে বসেছে, দেখছেও, কিন্তু চোখ নেই।

...পাঁচ মাস আগে, সেই অঘটনের দিনে কোন্ দিক্ থেকে কে একজন তার মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করে বসেছিল। ওকে দেখামাত্র আচমকা ঠিক সেখানটায় একটা যাতনা বোধ করল, সেখান দিয়ে বুঝি ভিতরে ভিতরে রক্তক্ষরণ হয়ে গেল একপ্রস্থ।

অনেকখানি প্রস্তুতির পরে আসা, ডাকের অপেক্ষায় বাইরে দাঁড়িয়ে না থেকে শমী পায়ে পায়ে ভিতরে এসে দাঁড়াল। কি করবে ভেবে না পেয়ে মেঘনা তাড়াতাড়ি ঘরের কোণ থেকে চেয়ারটা টেনে আনল। তারপর ব্যস্তসমস্ত মুখে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

শমী বসল।

এবারে সিতু কি করবে? প্রাণপণে চেষ্টা করলেও ওর চোখের সামনে থেকে নিজেকে আড়াল করতে পারবে না? ও চেয়ার ছেড়ে আবার না ওঠা পর্যন্ত সহজ সাদাসিধে দু-চারটে কথা বলতে পারবে না? দরকার হলে একটু হাসতে পারবে না?

এ সময়ে কোথা থেকে?

য়ুনিভার্সিটি থেকে।

এম. এ পড়ছ?

হ্যাঁ।

এত তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেল?

ছুটি করে নিয়ে এলাম।

কেন?

দেখতে।

কি দেখতে?

এই প্রশ্নটাই শুধু সংযমের সুরে ব্যাঘাত ঘটালো একটু। শমী চুপচাপ চেয়ে রইল তার দিকে।

সিতু হাসতে চেষ্টা করল।—কি দেখছ, তোমার ওই চিবুকের দাগ থেকে এই মুখে অনেক বেশি দাগ পড়েছে?...হঠাৎ কি দেখতে এলে?

কথাবার্তায় একটু আগের সুরটা বজায় রাখার চেষ্টা শমীর।—জেঠু বলছিল, হাসপাতাল থেকে ফেরার পর এই কমাসের মধ্যে একদিনও বাড়ি থেকে বেরোওনি?

আর কি বলেছে? সিতুটা পাগল হয়ে যাচ্ছে বলেনি?

তার দিকে চেয়ে থেকে শমী সামান্য মাথা নাড়ল। বলেনি।

তা তুমি হঠাৎ এলে কেন, আমাকে বাড়ি থেকে বার করার ইচ্ছে?

শমী নিরুত্তর।

সিতু চেয়ে আছে। সে কি উন্মাদের মত কাণ্ড করেছিল একদিন, আর তার-পরেও এই মেয়ের আসাটা কত বড় ব্যাপার, তা একবারও মনে এলো না। তার ক্ষিপ্ত নৃশংস হাতের মুঠো থেকে ছুটে পালানোর তাড়নায় দু-দুবার যে ত্রাস আর আতঙ্ক দেখেছে এই মুখে, নিজে সে এই দুপুরে ঘরের দোতলায় এসে হাজির হয় কেমন করে তাও ভাবল না। বাস-স্টপে গাড়ি থামিয়ে পরিপুষ্ট রমণী-দেহের সৌষ্ঠব তার চোখে আর শিরায় শিরায় যে গ্রাসের নেশা জাগাত—সেই সব-কিছু নিয়েই সে তার কাছে বসে আছে। সিতু দেখছে, কিন্তু তার চোখ টানছে না। গ্রাসের নেশা জাগছে না। সে শুধু এই আসার মধ্যে, এই বসার মধ্যে, টুকটাক কথার মধ্যে, এমন কি এই চেয়ে থাকার মধ্যেও আর একজনের স্নেহের পুষ্টি দেখছে। স্নেহের প্রলেপ দেখছে। এই স্নেহের যোগ প্রায় নাড়ির যোগের মত মনে হচ্ছে তার।

তুমি এখানে নিজে এসেছ না আর কেউ পাঠিয়েছে?

এক মুহূর্তের দ্বিধা কাটিয়ে শমী জবাব দিল, নিজেই এসেছি···মাসী তো এখন স্কুলে।

কেউ তাকে পাঠায়নি বটে, কিন্তু সে-যে আসবে এখানে মাসী জানে। সেটুকুই এড়িয়ে গেল।

সিতুর দুই চোখ শমীর মুখের ওপর ঘোরালো হয়ে বসছে।—আমি তাহলে এখন তোমাদের দয়ার পাত্র, খুব করুণার পাত্র হয়ে উঠেছি—দেখতে আসতে আর ভয় পাও না?

সুর চড়েনি, কিন্তু ধার বাড়ছে। সেই সঙ্গে চাউনিও বদলাচ্ছে দেখে শমী সক্রিয় হয়ে উঠল একটু। বলল, ভয় পেয়ে কত বড় ভুল করেছি দেখতেই তো পাচ্ছি।

কি ভুল? সিতুর চোখের ধার বাড়ছেই।

কয়েক মুহূর্ত চোখে চোখ রেখে শমী ফিরে জিজ্ঞাসা করল, গাড়িতে টেনে তুলে তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলে?

জাহান্নমে।

শমী আস্তে আস্তে বলল, তাহলেও সঙ্গেই যখন ছিলে অতটা ভয় পেয়ে ভুল করেছি।

বিড়বিড় করে সিতু বলল, ভুল সেদিন করোনি, ভুল আজ করছ। সেদিনের সে লোকটা মরে গেছে, একেবারে মরে গেছে···বুঝলে?

শমীর দিকে চেয়ে আছে, কিন্তু চোখ দুটো যেন তার ভিতর দিয়েই তাকে

ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে গেছে। শমী ভিতরে ভিতরে ঘাবড়েছে একটু। তবু জোর দিয়েই বলতে চেষ্টা করল, সেটা অত সহজ নয়।

দূরের থেকে আবার কাছে ফিরল যেন সিতু। শান্তমুখে জিজ্ঞাসা করল, আমাকে দেখা হয়েছে?

এখন যেতে বলছ?

সিতু নিরুত্তর।

শমী চেয়ার ছেড়ে উঠল তক্ষুনি।—আবার আসি তাও চাও না বোধ হয়?

কে চাইবে?…যে চাইতে পারত, সে থাকলে আজও তুমি সাহস করে এভাবে আসতে পারতে না। সে নেই। যে আছে সে বাঁচার রাস্তা খুঁজছে। সে এত দুর্বল যে, তোমাদের দয়া আর করুণার আঘাত তার সহ্য নাও হতে পারে।

আরো কয়েক নিমেষ চেয়ে থেকে শমী নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো। ঘোরানো বারান্দার মাঝামাঝি এসে দাঁড়াল একবার। চারদিকে দেখল। পিছন ফিরেও তাকালো একবার। এখানে শেষ এসেছিল ন-দশ বছর আগে, এগারো বছর বয়সে। আর কাকুর হাত ধরে প্রথম এসেছিল সাত বছর বয়সে। বাপ-মা ছেড়ে আসার দুর্বোধ্য একটা শোক বুকের তলায় গুমরে মরছিল যখন। ন-দশ বছর বাদে এখানে ঢোকামাত্র মনে হয়েছে, এটা সেই বাড়ি যেখানে আসতে না পারলে সেদিনের ছোট মেয়েটা কুঁকড়ে মরে যেত। আজও মনে হল এ-বাড়িটা তার কাছে তীর্থক্ষেত্রের মত। আর মনে হল, মাসী এখন তার খুব কাছে, ফ্ল্যাট বাড়ির একই ঘরে তার সঙ্গে থাকে বটে, কিন্তু ঠিক সেই মাসীকে সে যেন আর পায়নি। আজও মাসী বুঝি এখানকার এই শূন্যতার মধ্যে অনেক বেশি ছড়িয়ে আছে। যেন যে কোনো ঘর থেকে বা যে কোন কোণ থেকে বেরিয়ে এসে এখুনো হাসিমুখে বলতে পারে, কি রে, এলি? খুব রাগ হয়েছে বুঝি মাসীর ওপর?… যে হাসি দেখলে শমীর চোখ জুড়োতো, মন জুড়োতো, বুক জুড়োতো।

চাপা একটা নিঃশ্বাস ফেলে ঈষৎ দ্রুত সিঁড়ির দিকে এগলো। একজন প্রকারান্তরে তাকে তাড়িয়েই দিল। আর যাতে না আসে ঘুরিয়ে তাও প্রায় স্পষ্ট করেই বলে দিল। দিক—এখনো অকে প্রকৃতিস্থ ভাবতে রাজি নয় শমী। আসার সময় যেটুকু সঙ্কোচ ছিল, এই মুহূর্তে তাও নেই। যে যাই বলুক, এই বাড়িটার সঙ্গে তার সম্পর্ক ঘুচে গেল, এ সে কিছুতেই মেনে নিতে রাজি নয়। এই চিন্তাটাকে সে আমল দিতেও রাজি নয় যেন। সময় হলেই আবার আসবে, তাকে আসতে হবে—ঠেকাবে কে।

আধ ঘণ্টার মধ্যে ভিতরটা বুঝি দ্বিগুণ দেউলে, দ্বিগুণ রিক্ত হয়ে গেল সিতুর।

দেহের প্রাচুর্য আর বুকের তলার প্রাচুর্য নিয়ে শমী এসেছিল তার কাছে। ভর-ভরতি একটা মেয়ে। যত বড় আঘাতের উপলক্ষ হয়ে বসেছিল, তার সবটুকু মুছে দেবার মত উদার হবার তাগিদ নিয়ে এসেছিল—এত সুস্থ, এত সবল ও। কিন্তু যার কাছে এসেছিল, তার ভিতরের নিঃস্ব পঙ্গু মূর্তিটা দেখেনি। ও চলে যাবার পর প্রায় হিংস্র আক্রোশে নিভৃতের সেই মূর্তির দিকে তাকিয়েছে সে, আঘাত দিয়েই তাকে সজাগ করে তুলতে চেয়েছে। অহুক্ত স্বরে বার বার শাসিয়েছে তাকে, দয়া চাও? করুণা চাও? কি চাও?

চায় না, চায় না। সিতু জানে—চায় না। ওই পঙ্গুমূর্তির যত ক্ষোভ আর যত অভিযোগ আর যত নির্ভরতা তারই ওপর। তার তেইশ শেষের এই নিষ্ফল অস্তিত্বের ওপর। সে নিঃস্ব বলেই ও নিঃস্ব, সে দেউলে বলেই ও দেউলে। সে এত ব্যর্থ বলেই ওর এত হাহাকার।

সিতু ভাবে, ভাবে আর ভাবে। ভাবনা খুঁড়ে খুঁড়ে শক্তির উৎস খোঁজে। আবার এই ভাবনার থেকে মুক্তি পাওয়ার তাগিদেই বাড়ি ছেড়ে বেরুতে শুরু করে। বেরুতে শুরু করার পর ফেরার সময়ের ঠিক থাকে না। পথ-চলতি মানুষের মুখগুলো চেয়ে চেয়ে দেখে, ট্রাম-বাসের মুখগুলো খুঁটিয়ে দেখে। মনে হয়, প্রত্যেকের ভিতরে একটা করে জোরালো ভাবনার যন্ত্র বসানো। সেটাই তাদের ঠেলছে টানছে ঘোরাচ্ছে ফেরাচ্ছে। তবু সিতুর সঙ্গে সকলের এত তফাত কেন? এরা কি একজনও তার মত জলছে পুড়ছে হাহাকার করছে? বোধ হয় না। ভাবনার যন্ত্রটা সঙ্গোপন নিভৃত থেকে কে ঘোরাচ্ছে, তার সঙ্গে বোধ হয় মুখোমুখি দেখা হয়নি এদের কারো। সেটুকুই ওপরঅলার আশীর্বাদ বোধ হয়। এইখানেই তফাত ওর সঙ্গে।

দিন যায়, একটা ছুটো করে। সিতুর বিশ্লেষণ বেড়েই চলেছে। বিশ্লেষণের জাল ফেলে ফেলে নিজেকে উদ্ধার করার অবিরাম চেষ্টা। অথচ উদ্ধারের বদলে ওই জালে ক্রমশ আটকে পড়ছে। স্নায়ুর সঙ্গে স্নায়ুর অবিশ্রান্ত জটলা চলেছে। সিতু টের পায়, ভাবে এটাই আবার এক ব্যাধি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তক্ষুনি সঙ্কল্প করে আর ভাবনা নয়, আর বিশ্লেষণ নয়। শূন্যতার ঘাটতি পূরণের অন্য রাস্তা দেখতে হবে। এভাবে হবে না। অন্য রাস্তার খোঁজে পরমুহূর্তে সেই একই তপ্ত দুর্বোধ্য বিশ্লেষণের জালে আটকা পড়ে যায়। সেই জাল ছিঁড়ে আবার ওঠার তাগিদ, উঠে আবার নতুন করে জাল বোনার তাগিদ।

হঠাৎ আত্মস্থ হল একদিন। দৃষ্টিটা নিজের গভীরে চালান করে দিয়ে দেখল। সেখান থেকে হতাশার বাষ্প তেমনি উঠছে, শূন্যতার হাহাকার তেমনি শোনা যাচ্ছে

—অথচ যাকে সে উদ্ধার করবে সেই আহত সত্তাটাকে ভালো দেখা যাচ্ছে না আর। এই ভাবনা আর বিশ্লেষণের বোঝার তলায় সে চাপা পড়ে গেছে, আরো তলিয়ে গেছে। আরো বেশি গুমরে গুমরে উঠছে।

সিতু থমকেছে। তক্ষুনি মনে হয়েছে মাথাটা তার ঠিক রাস্তায় চলছে না। সর্বদা এত অস্বাভাবিক ভারী কেন মাথাটা ? শিরার ভিতরে সর্বক্ষণ অমন দপদপ করে কেন ? রাতে ঘুম নেই কেন ? আর যেটুকু ঘুমোয়, তার মধ্যেও যে হিজিবিজি ব্যাপারটা চলতে থাকে—সেটা কি ? ক্যালেণ্ডারের দিকে চোখ পড়তে অবাক। একষট্টি সাল! ষাট সাল কবে গড়ালো, একষট্টি সালই বা কবে এলো ? শুধু আসেনি, একটু হিসেবে তলিয়ে মনে হল জানুয়ারীর গোটা দুই সপ্তাহ পার হয়ে গেছে। তাই। খবরের কাগজে একষট্টি সালের তৃতীয় সপ্তাহের তারিখ একটা। ...এই জানুয়ারীর কবে যেন তার জন্মদিন। মনে পড়ছে না কেন ? তার সাত্যকি চ্যাটার্জি নামটা মনে আছে তো ? কেন মনে পড়ছে না ? বয়েস কত হল তাহলে ...চব্বিশ ? কিন্তু কবে জন্মদিন ?

তারিখ মনে করতে গিয়ে চকিতে মনে উদয় হল কি।...চুলোয় যাক জন্মদিন, না জন্মালে কি হত ? আদৌ না জন্মালে ? আরো কবে যেন এই রকম ভেবেছিল, কিন্তু না জন্মানোর আকৃতি এত বড় হয়ে ওঠেনি। সঙ্গে সঙ্গে ও কি লোভের ইশারা উকিঝুঁকি দিচ্ছে ?...এই নিদারুণ হতাশা, এই হাড়গুঁড়ানো ব্যর্থতা আর শূন্যতা থেকে মুক্তির উপায় তো আছে। ইচ্ছে করলেই তো এই যন্ত্রণার থেকে অব্যাহতি পেতে পারে। জন্মানোর ওপর তার হাত ছিল না। কিন্তু সেটা বহন না করার হাত তো আছে। ছেদ টেনে দিলে ? একেবারে পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিলে ?

না না—না!

মুক্তিলাভের সহজ উপায়টা লালসার মত দু চোখের তারায় ঘন হবার মুখে শব্দশূন্য এক প্রচণ্ড গর্জনে সিতুর মুখ দিয়েই অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এলো একটা। আচমকা ঝাঁকুনি খেল। গর্জনটা উঠছে তারই কোন্ শূন্য গুহা-গহ্বর থেকে। গর্জনের শেষটা বিদ্যুতের মত নিজের অস্তিত্ব বিদীর্ণ করে করে ওপরে উঠে আসছে। তারপর সোজা মাথার মধ্যে ঘা দিচ্ছে। সিতু ঘামছে, সিতু কাঁপছে।

...মাত্র পাঁচ সাড়ে-পাঁচ মাস আগের আঘাতে দীর্ঘকালের জমাট-বাঁধা এক খ্যাপা বাষ্পীয় দানব কাঁধ থেকে নেমে গেছে বটে, কিন্তু সেই নির্দয় নির্মম আঘাত বুক পেতে নিয়েছে আর একজন। অসহায় শিশুর মত যে তার এই দেহটাকে আশ্রয় করে আছে—সে। আঘাত কাকে বলে সে জানে। একেবারে সত্তাবিনাশী আঘাত হানার লালসার বারতা তার কাছে পৌঁছে গেছে। এ আঘাত কেমন

আঘাত সে-ই শুধু অনুভব করতে পারে। এটা তারই আর্ত গর্জন।

সিতু ঘামছে। কাঁপছে। মাথা নাড়ছে অল্প অল্প। অস্ফুটস্বরে বিড়বিড় করে বলছে কিছু। বলছে, না, তা সে করবে না। তা সে করবে না।

...তাহলে কি করবে?

বাড়ির লোকের হাবভাব চাউনি কি রকম বদলেছে মনে হল। কেউ আর তাকে বিরক্ত করে না বিশেষ, অথচ অলক্ষ্য থেকে কারো না কারো চোখ আছেই তার ওপর। ভোলাকে শামুকে কাছে ডাকলে ওরা ভয়ে কাঁপে থর থর করে। আর মেঘনার মুখে বুঝি কয়েক বর্ষার মেঘ জমে আছে। বাবা আর জেঠুতে, জেঠুতে আর ছোট দাদুতে, আবার কখনো বাবা জেঠু আর ছোট দাদুতে মিলে কদিন ধরে কি পরামর্শ চলেছে একটা। সিতুর চোখে পড়েছিল বটে কিন্তু খেয়াল করেনি বা তা নিয়ে মাথা ঘামায়নি।...কি পরামর্শ করে তারা? কি কথা বলে?

ভাবতে ভাবতে ময়দানের ভিতর দিয়ে চলছিল। কি কথা, কেন পরামর্শ অনুমান করা যাচ্ছে। অন্যমনস্কের মত বার দুই পিছন ফিরে তাকিয়েছিল। বিশেষ করে কাউকে লক্ষ্য করেনি। হঠাৎ মনে হল, লক্ষ্য করুক না করুক, কোনো চেনা মুখ দেখেছে। ঘুরে দাঁড়াল।

ভোলা। চিৎকার করেই ডেকে উঠল সিতু।

ভোলা দূর থেকে আড়াল নেবার ফুরসত পেল না, ওই ডাক শুনে পালাবারও শক্তি থাকল না। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল সে।

পায়ে পায়ে সিতু তার সামনে এসে উপস্থিত হল। দেখল ভালো করে। বিবর্ণ ভয়চকিত মুখ দেখে হেসে ফেলার দাখিল।—এই কর্ম কতদিন ধরে চলছে?

ভয়ের চোটে ভোলা দু হাত জোড় করে ফেলল।

এ হুকুম তোকে কে দিয়েছে, জেঠু না বাবু?

মা-মামাবাবু।

সিতুর মনে হল ব্যাটা সেয়ানা, মিছে কথা বলল।—আচ্ছা, আয় বসি এখানে। ঘাসের ওপর নিজেই আগে বসে পড়ল।—বোস্ না, অত ভয় পাওয়ার কি হল তোর?

ভয় পেয়ে অদূরে গুটিসুটি হয়ে বসল ভোলা।

চিনেবাদাম খাবি?

মোলায়েম আপ্যায়ন শুনে আর হাসিহাসি মুখ দেখে ভোলা খাবি খাচ্ছে। মাথা নাড়ল, খাবে না। খাবে বললে বাদাম গলায় আটকাবে ভাবছে।

সিতু আবার একটু চেয়ে থেকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, আমাকে ভয় করিস খুব?

ভোলা তক্ষুনি মাথা নাড়ল, করে।

কেন? আমারও তো তোর মতই দুটো হাত, দুটো পা, একটা মাথা—বেশি কি আছে, ভয় করিস কেন?

সাহস সঞ্চয় করে ভোলা জবাব দিল, আপনি যে মনিব।

ও…। সিতু ভাবল কি অন্যমনস্কের মত।—যা পালা, যে তোকে পাঠিয়েছে তাকে বলিস দাদাবাবু বলেছে আর এ কাজ করতে হবে না।

হাতের মুঠোয় প্রাণ ফিরে পেয়ে ভোলা চলে গেল।

মনিবের এই নতুন ভুমিকা দেখে সিতু নিজেও অবাক। হাসছে।

বাড়ি ফিরে গাইড হাতড়ে নামকরা একজন হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের ঠিকানা বার করল। মাথার চিকিৎসা তারাই ভালো করে শুনেছিল। তাছাড়া এই চিকিৎসা গোপন রাখা সহজ। আগে সুস্থ হতে হবে, মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। তার আগে আর কোনরকম ভাবনা-চিন্তার ধারে কাছে ঘেঁষবে না।

ডাক্তার দেখালো। কি চিন্তা হয় আর কোন্ ব্যাধির আশঙ্কা করছে খোলাখুলি বলল। ওষুধ নিয়ে ফীস্ গুনে দিয়ে ভারী নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি ফিরল। তিন-চার দিন নিয়মিত ওষুধ খেল, সময়মত খাওয়া-দাওয়া করল। শরীর রাখতে হলে একটু পরিশ্রম করা দরকার। পরিশ্রম করার তাগিদে পাঁচ মাইল সাত মাইল দশ মাইল করে হাঁটল। তবু পরিশ্রমটা ঠিক মনের মত হয় না। আর ঘুমই বা কই? সকালে উঠে দেখে ফুটপাথের মানুষ ইঁট মাথায় দিয়ে অকাতরে ঘুমুচ্ছে—আর নরম গদিতে শুয়ে তার কেন ঘুম হয় না?

হোমিওপ্যাথির ওপর তিন-চার দিনের বেশি আস্থা থাকল না। আপাতত শরীর সারানোর সমস্যাটাই সব থেকে বড়।…কবিরাজী চিকিৎসা করাতে পারলে কাজ হত। তার অনেক ঝামেলা। কাগজের বিজ্ঞাপন পড়ে নিজেই গোটাকতক ওষুধ বাছাই করল। কিনেও আনল। আবার তিন-চার দিন যেতে না যেতে সব নিয়ে রাস্তার ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে এলো।

এরপর নিজেকে সে একদিন আবিষ্কার করল কালীঘাট মন্দিরে আর একদিন দক্ষিণেশ্বরে। অনেক লোক। মেয়ে-পুরুষ। আসছে যাচ্ছে পুজো দিচ্ছে। এরই মধ্যে নিরিবিলিতে বসে চোখ বুজে জপ করছে কেউ। আর প্রার্থনা তো সকলেই করছে।

সিতু বিগ্রহ দেখছে, মন্দির দেখছে না। মানুষগুলোকে দেখছে। তার কেবল মনে হচ্ছে প্রার্থনার নামে জপের নামে সকলে দুঃখ জমা দিচ্ছে। কেউ কিছুই করছে না, কেবল দুঃখ জমা দিতে আসছে, জমা দিয়ে ফিরে যাচ্ছে। কিন্তু

জমা দিয়ে কেউ বুঝি খালিহাতে ফিরছে না। আবার দুঃখ নিয়েই ফিরছে। আশার দুঃখ, চাওয়ার দুঃখ।

সিতুর জমা দেবার কিছু নেই। সে কেবল জানতে চায় জীবনটা এরকম হয়ে গেল কেন। গোড়া থেকে কিভাবে শুরু করতে পারলে ও এ-রকম নিঃস্ব দেউলে হত না। ভিতরে ওই রকম গুমরে কাঁদে কে? কি পেলে তার কান্না থামে?

কাতারে কাতারে লোক এসে কার পায়ে এভাবে ধরনা দিচ্ছে? কে সে? কেমন ধারা? সে কি দুঃখ দেবার আর দুঃখ টেনে নেবার মালিক? সে কি ভোলার মনিবের মত মনিবগোছের কেউ যে, ইচ্ছে হলে দুঃখ দেবে আবার ইচ্ছে হলেই দুঃখ দূর করবে? ভোলার মুখ দেখে সেদিন মনে হয়েছিল মনিব তুষ্ট থাকলে দুনিয়ার সব ভাবনার অবসান।···সিতুরও মনিব আছে কেউ?

ঘোড়ার ডিম আছে। নিজেকে দিয়েই জানে, মনিব মানে খেয়ালে রুষ্ট, খেয়ালে তুষ্ট। ভোলাটা ভীতু। অমন মনিবের দেখা পেলে সে খেয়ালপনা ঘুচিয়ে ছাড়ত। হঠাৎ অবাক লাগছে সিতুর। ভিতরটা কেমন হাল্কা-হাল্কা, সেদিকে চোখ চালালো। ভিতরের যে অবিচ্ছেদ্য অশান্ত মূর্তিটা কেবল হাহাকার করে আর কেবল হতাশা ছড়ায়, তাকে দেখা যাচ্ছে। তার মুখে আশার আলো, তুষ্ট মনিব দেখে ভোলার মুখখানা যেমন দেখেছিল, ঠিক সেই রকম। মনিব তুষ্ট হলে এরও যেন সব ভয়-ভাবনা ঘোচে। ওর মত অসহায়ের ভার নেবার আর যেন কেউ কোথাও নেই।

যত পাগলের কাণ্ড।

এই রাস্তা মাড়ানো ছাড়ল সিতু। কিন্তু ভিতরের ওই অবুঝ থেকে থেকে এক তুষ্ট মনিবের ডাক শোনার ইশারা যোগাতে চেষ্টা করছে তাকে।

অগত্যা সিতু বই পত্র যোগাড় করল কিছু। এই মনিবের কথা বলে এমন বই। খুব মন দিয়ে পড়া শুরু করেছিল, শেষে বিরক্ত হয়ে সব ঠেলে সরিয়েছে। নীরস নীতি আর তত্ত্বের বোঝা সব। আর মনিবের অনুগৃহীতরা যেন ম্যাজিসিয়ান এক-একজন।

সিতু কাগজ পড়ে না, কোনো খবরও রাখে না। কিন্তু সেইদিনের খবরটা কদিন আগে থেকেই বাতাসে ছড়িয়েছিল। তবু সে খবরে সিতুর একটুও আগ্রহ ছিল না। কদিন ধরে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া আর বিশ্লেষণ আবার চরমে উঠেছে। খরখরে লালচে মুখ, চোখে নিষ্ফল খোঁজার তাপ, খোঁজার তৃষ্ণা। কি খুঁজছে জানে না, শুধু খুঁজেই চলেছে।

দক্ষিণ থেকে উত্তর কলকাতার মাঝামাঝি হেঁটে চলে এসেছিল। তারপর

পায়ে পায়ে বাধা। লোকের ভিড়। খানিক বাদে এক পা এগনো দায়। লোকে-লোকারণ্য। ফুটপাথে নয়, রাস্তায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। রাস্তার ধারের বাড়ি-গুলোর একতলা দোতলা তিনতলার ছাদ কার্নিশ মেয়ে-পুরুষে ছেয়ে গেছে। রাস্তায় একটিও লোক নামতে দিচ্ছে না, পুলিস পাহারা দিচ্ছে।

রাণী আসছে। ইংলণ্ডের রাণী। কলকাতার রাণীদিন এটা।

সিতুও দাঁড়িয়ে গেল। রাণী দেখবে।...রাণী কি সুখী?

রাণী আসছে, আসছে! জনতার উল্লাসে আকাশ ভরাট হয়ে গেল। ওই রাণী আসছে। ওই যে গাড়িতে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে জনসমুদ্রের শুভেচ্ছা নিতে নিতে আর হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানাতে জানাতে এগিয়ে আসছে।

সিতুও রাণী দেখছিল। কিন্তু চোখের সামনে হঠাৎ এ কি কাণ্ড হয়ে গেল তার? এ কাকে দেখছে?

...কবে যেন ছোট দাদু এক রাণীর গল্প বলেছিল। মনে পড়েছে, স্বাধীনতার দিনে বলেছিল। সেই রাণীর সঙ্গেই নাড়ির যোগ এই রাণীর। কিন্তু এই রাণীকে দেখতে গিয়ে সেই রাণীকে মনে পড়ে গেল সিতুর। আর তার নটি ফাঁসির আসামীকে ক্ষমা করার সেই গল্প।...সিতুর মনে আছে, শুধু ও নয়, শুধু জেঠু নয়—দরজার কাছে দেয়ালে ঠেস দিয়ে আর একজনও সেই গল্প শুনছিল। কান দিয়ে, চোখ দিয়ে, মন ঢেলে দিয়ে গল্প শোনার পরের সেই মূর্তি।...ফ্যাল ফ্যাল করে ছোট দাদুর দিকে চেয়েছিল...মাথা থেকে তার শাড়ির আঁচল খসে পড়েছিল...লালচে মুখ...কপালে লাল টক্‌টকে সিঁদুরের টিপ।

রাণী মুছে গেল, জনতা মুছে গেল, শুধু সেই মুখখানাই জলজল করে উঠল সিতুর চোখের সামনে। সিতু তাকেই দেখছে, নিজের অগোচরে হাসছে একটু একটু।...সেও রাণীর মতই।...রাণীর থেকেও বেশি।...জ্যোতিরাণী।

হঠাৎ পাগলের মতই ভিড় ঠেলে ছুটে পালাতে চেষ্টা করল সিতু। নিজেকে ছিন্নভিন্ন করে ছোটার তাড়না। কেউ ভুরু কোঁচকালো, ধাক্কা খেয়ে কেউ কেউ গালাগালও করে উঠল। সিতু ভ্রূক্ষেপও করল না। ধ্বংসের মতই কোনো সর্ব-বিস্মৃতির আগুনের সমুদ্রে ঝাঁপ দেবার তাগিদে শুধু ছুটে বেরুতে চায় সে।

নিরিবিলিতে এসে হঠাৎ ঠাণ্ডা খানিকক্ষণ। বাড়ি ফিরল, আরো ঠাণ্ডা। ঘণ্টা দুই নিঃশব্দে কাটল। নিশ্চল, ঠাণ্ডা।

সন্ধ্যা হয় হয়। আলমারি খুলে কিছু টাকা নিল। কত টাকা গুণে দেখল না। পাঁচশ সাতশ যাহোক কিছু হবে। ছোট ব্যাগে দুটো কাপড় দুটো জামা আর একটা চাদর পুরে নিল। আর কিছু না। কি ভেবে প্যাড টেনে এক লাইন

চিঠিও লিখল।

—কেউ কিছু ভেবো না, ভালো থাকার চেষ্টাতেই বেরুলাম।—

সিতু।

খামে পুরে ওটা আলমারির গোছা গোছা নোটের ওপরে রেখে দিল। খোঁজ পড়লে কেউ না কেউ আলমারি খুলবে। পাবেও। ভাবাতে কাউকে চায় না। একটু অবকাশ চায় শুধু।

বাইরের বাতাস এই প্রথম বুঝি দু হাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা জানালো তাকে।

স্মৃতির গণ্ডির ওধারে পা না ফেলতে পারলে মুক্তি নেই। এই গণ্ডি ছাড়াবার জন্তে কোথায় কত দূরে যেতে হবে, সিতু জানে না।

॥ তেতাল্লিশ ॥

টানা সাড়ে তিন বছরের যবনিকাটা আবার সরবে বলেই একেবারে নিঃশেষে হারিয়ে গেল না।

মনিবের ডাক শুনেছে? জানে না।

মনিবের ডাক কানে এলে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়তে হয়, নড়াচড়ার ক্ষমতা থাকে না, যেমন ভোলা দাঁড়িয়ে পড়েছিল। আর, ডাকটা অদৃশ্য থেকে এলে সেটা অনুসরণ করে পড়ি-মরি করে ছুটতে হয়। সিতু ডাকের মালিককে দেখেনি, ডাকও শোনেনি বোধ হয়। কিন্তু তার ভিতরে যে-একজন বাসা বেঁধে আছে, বারবার সে-ই তাকে চমকে দিয়েছে। সিতু অবাক হয়ে দেখেছে, তার ভিতরের ওই একজন নিষ্প্রভ নির্জীব পঙ্গু হয়ে বসে নেই আর। উল্টে সে-ই তাকে উৎসহ যোগাচ্ছে, প্রেরণা যোগাচ্ছে, তাকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। আর থেকে থেকে বলে উঠেছে, ওই শোনো, মনিব ডাকল! কখনো বলেছে, দেখো দেখি, মনিব ডাকছে! তারই ইশারায় শোনার জন্য দিকে দিকে ছুটেছে, তারই ইঙ্গিতে দেখার জন্তে যেখানে সেখানে দাঁড়িয়েও গেছে।

কখনো নিঃসীম মৃত্যুর গভীরে ডুব দিয়ে, কখনো বা জীবনের স্রোতে ভেসে ভেসে, আর কিছু না হোক, সিতু নিজেকে হারানোটা প্রায় সম্পূর্ণ করে এনেছিল। অচেনা জনারণ্যের মধ্যে হারিয়েছে, ধূসর পাণ্ডুর মরুভূমির নির্জনতার মধ্যেও। কখনো অনাদি-গম্ভীর সমুদ্রগর্জন কান পেতে শুনেছে, কখনো বা পাহাড়-পর্বতে গুহা-কন্দরের স্তব্ধতার মন্ত্র। আকাশের আগুন হাড়ের সার শুষে নিয়েছে, আবার

তার প্রলয় দুর্যোগ অস্তিত্বের গ্রন্থিগুলো ছিঁড়েখুঁড়ে দিয়ে গেছে। তাপে দগ্ধ হয়েছে, হিমে পাথর হয়েছে। তবু বেঁচে থাকার অদ্ভুত একটা শক্তি লুকিয়ে আছে বুঝি কোথাও। নইলে জঠরের আগুনেই ভস্ম হয়ে যেতে পারত, উপোসের হিমেই দেহযন্ত্র নিস্পন্দ পাথর হয়ে যেতে পারত।

টাকা যতদিন ছিল, খরচ করেছে। আধা-আধি খরচ করার পরে বাকি টাকা হারিয়েছে কি চুরি গেছে জানে না। কখনো খেয়ালে বা অকরুণ প্রয়োজনে সিতু এরই মধ্যে কিছু কিছু উপার্জনও করেছে। কাজের মায়ায় মানুষ কোথায় না ছড়িয়ে আছে। কোথাও জঙ্গল বিদীর্ণ করে জীবনের রসদ সংগ্রহের অনুষ্ঠান চলেছে, কোথাও বা জড় পাহাড়ের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিদীর্ণ করে। কাজ চাইতে হয়নি, গিয়ে দাঁড়ালেই কাজ মিলেছে। হিসেবের কাজ, তদারকের কাজ, তেমন দরকারে মেহেনতী কাজও। তারপর যেমন নিঃশব্দে এসেছে তেমনি নিঃশব্দেই সরে গেছে আবার একদিন।

জঠরের নিষ্ঠুর তাগিদেও কাজ মেলেনি, এমনও হামেশা হয়েছে। জীবন থেমে আসার উপক্রম হয়েছে, চোখে অন্ধকার ঘনিয়েছে। তখন শুধু একটু জলের জন্য হাত বাড়িয়েও মানুষের নির্লিপ্ত ভ্রূকুটি দেখেছে। আবার ওই অন্ধকারে একেবারে হারিয়ে যাবার মুখেও এই মানুষেরই অযাচিত প্রসন্ন করুণা দেখেছে।

এই বিশ শতকে প্রায় কোটিপতির একমাত্র ছেলে সাত্যকি চ্যাটার্জির নিজস্ব সঞ্চয় কিছু যদি জমা হয়ে থাকে তো সে শুধু বিস্ময়ের সঞ্চয়, অবাক হবার সঞ্চয়।

এই সঞ্চয় আর একটু বাড়ল হরিদ্বারে এসে। ওরা বলে—হরির দুয়ার হরিদ্বার। দুয়ারে প্রবেশ করেছে ছ মাস আগে, হরির সাক্ষাৎ মেলেনি। মিলবে আশাও করেনি। দাস মহারাজ বলেছিলেন, চোখ হয়নি বলে তাঁর সাক্ষাৎ মেলে নি। মহারাষ্ট্রীয় যোগী দাস মহারাজ। এখানে এসে প্রথম দু মাসে সিতু গোটা চার-পাঁচ আশ্রমে ঘুরেছে। মন বসেনি। কোথাও আধ্যাত্মিকতার থেকে তার অহমিকা বেশি প্রবল মনে হয়েছে, কোথাও বা ত্যাগের থেকে ত্যাগের আড়ম্বর। অর্থ যশ প্রতিপত্তি এমন কি প্রবৃত্তিরও অনেক চাপা স্রোতের আবিল ছায়া চোখে পড়েছে। পড়ুক না পড়ুক সন্দেহ হওয়া মাত্র সরে গেছে।

চার মাস আটকে ছিল দাস মহারাজের আশ্রমে। দাস শব্দটাই সিতুকে মোহাচ্ছন্ন করেছিল কিনা জানে না। মহারাজের সদা-তিরিক্ষি ভক্তনির্যাতনও একটা বাড়তি আকর্ষণ বোধ হয়। মুখের দিকে চেয়ে চটকদার কথাবার্তা বলতে পারেন। সিতুকে দেখেই বলেছিলেন, বড়ঘরের আরাম তো তোর পাতালে বাসা করেছে, ওর ক্ষয় অত সহজে হয় না—লেগে থাক। অর্থ বা সংস্থানের জন্য নয়, ওই

আরাম সংহারের জন্তেই ভক্তদের ভিক্ষায় বেরুতো হত, দিবারাত্র পরিশ্রম করতে হত। আরাম ক্ষয়ের তাগিদে না হোক, নিজেকে ক্ষয় করার তাগিদে সিতু লেগেই ছিল।

সব আশ্রমের মতই এখানেও দুঃখ জমা দেওয়ার ভিড়। পুরুষের ভিড়, মেয়েদের ভিড়। সিতুর স্থৈর্যচ্যুতি ঘটে মেয়েদের দেখলে। দুই-একটা আশ্রম থেকে শুধু মেয়ের ভিড় দেখেই পালিয়েছিল। এটা রোগ নিজেই জানে। ক্ষোভের মুহূর্তে মনে থাকে না। আশ্রমেও রমণী ভিন্ন রঙ ধরে না মনে হয়। মনে হলেই যত রাগ ততো বিতৃষ্ণা। ক্ষমতা থাকলে সিতু এদের আসা বন্ধ করে দিতো।

ক্ষমতা নেই। দাস মহারাজের আঙিনায়ও তারা আসে। বসে। শ্রীমুখের কথা অমৃতসমান ভাবে। স্থানীয় বড়ঘরে সুশ্রী মেয়ে-বউদের আনাগোনাও কম নয়। সেই সব বড় ঘর থেকে বড় বড় সিধা আসে, ভোগ আসে, ভারী প্রণামী আসে। এ-সব ঘরের মেয়ে-বউরা যখন আসে, ভক্তদের নির্লিপ্ততার মধ্যেও এক ধরনের চাপা ব্যস্ততা চোখে পড়ে সিতুর। ভাবে চোখের ভুল, রোগের বিষ। অসহিষ্ণুতা বাড়ে, আত্মপীড়নও।

বেলা দুপুরে সেদিন ভিক্ষায় এসেছিল এক বাড়িতে। বনেদী বড়লোকের বাড়ি। হিমাচল প্রদেশীয় প্রৌঢ় গৃহস্বামীটি দাস মহারাজের ভক্ত। তাঁর থেকেও বেশী ভক্ত তাঁর বৃদ্ধা মা। ছেলের বউয়ের সঙ্গে নিজেদের তেজী ঘোড়ার টাঙায় চেপে আশ্রমে আসেন। সিতুর ধারণা তাঁর কিছু সমস্যা আছে। কি সেটা জানে না। এই এলাকায় এলে বৃদ্ধার দরাজ হাতের ভিক্ষা মেলে। তবে আসে না বড়। অন্তের সঙ্গে এক-আধবার এসেছে। বাড়িটা আশ্রম থেকে বহু দূরে।

বিস্ময়ের সঞ্চয় আরো কিছু বাড়বে বলেই হয়ত ঘুরতে ঘুরতে সেদিন ওদিকটায় এসে গেছল, আর বাড়িটায় একবার ঘুরে যাবার কথা ভেবেছিল।

বৃদ্ধার দর্শন মিলল না। দর্শন মিলল আর একজনের। ছেলের বউয়ের। সুশ্রী, তারই সমবয়সী। বছর সাতাশ-আটাশ হবে বয়েস। আশ্রমে বারকয়েক সামনা-সামনি দেখেছে শাশুড়ীর সঙ্গে। দেখলে সর্বদা যা করে তাই করেছে, মুখ ফিরিয়ে তক্ষুনি দূরে সরে গেছে। এই গোছের অভ্যর্থনায় অভ্যস্ত নয় বলে বউটিও তাকে লক্ষ্য করেছে কিনা জানে না। মহারাজের ঘরে শাশুড়ীর পাশে বসে দৃষ্টিটা দূরের দিকে প্রসারিত হতে হতে দুই-একসময় তার মুখের ওপর এসেও থেমেছে। রিক্ত সিতুর সেটা চোখে পড়লে আরো আড়ালে সরেছে।

দোতলার রেলিং-এর কাছে এগিয়ে এসে মহিলা নীচের দিকে ঝুঁকল। কোন্ আশ্রমের ভিক্ষার্থী, দেখেই চিনল হয়ত। তবু ওপরের আয়ত দুটো চোখ তক্ষুনি

মুখের ওপর থেকে সরে গেল না বলেই সিতুর বিরক্তি, অস্বস্তিও। হাত তুলে গম্ভীর মুখে বউটি ইশারায় অপেক্ষা করতে বলল।

সিতু শ্রান্ত, ক্লান্ত। আমল দিক না দিক, ঘোরাঘুরিতে পা দুটো ভেঙে পড়তে চায়। দাওয়ায় বসল। বেশ কিছুক্ষণ আর সাড়াশব্দ নেই কারো। ভাবলো, অসময়ে আসা উচিত হয়নি, বৃদ্ধা হয়ত বিশ্রাম করছিলেন, তাই ভিক্ষা নিয়ে নামতে দেরি।

বৃদ্ধা নয়, নেমে এল ওই বউটিই। সামান্য মাথা নেড়ে তেমনি গম্ভীর ইশারায় তাকে ভিতরে আসতে বলল। দাস মহারাজের প্রিয়জন বলেই হয়ত ডাকার অভিব্যক্তিটুকু নম্র নয় খুব। পাঁচ-সাত পা এগিয়ে সিতু দাঁড়িয়ে পড়ল। বউটি একটা ঘরের মাঝামাঝি এসে আবার ফিরে তাকাল। এবারে স্পষ্ট হিন্দীতেই আবার তাকে আসতে বলে এগিয়ে চলল। অগত্যা বিমূঢ় সিতু তাকে অনুসরণ করে একে-একে তিনটে ঘর পেরিয়ে চতুর্থ ঘরে এসে থামল।

ঝকঝকে তকতকে মেঝের মাঝখানে ছোট একটা শৌখিন গালচে পাতা। মহিলা তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল একবার। তার মাতৃভাষা হিন্দী। আঙুল দিয়ে পাশের ফালি বারান্দায় জলভরা বালতি আর ঘটি দেখিয়ে অপেক্ষাকৃত নরম সুরে বলল, কৃপা করে ব্রহ্মচারীজী মুখ-হাতে জল দিয়ে এসে বসলে ভাল হয়।

মা-জী নেই?

মহিলা জবাব দিল না, ঠাণ্ডা আয়ত দুটো চোখের কালো তারা মুখের ওপর আটকে রইল।

সিতু বিড়বিড় করে বলল, বেলা হয়েছে, ভিক্ষে পেলে চলে যেতাম।

ভিক্ষে দেবার জন্য মা-জী সর্বদা সব সাজিয়ে বসে আছে?

একটু থমকে সিতু ত্রুটি স্বীকার করল, বড় অসময়ে এসে পড়েছি, আজ থাক তাহলে—

ভিক্ষে মিলবে। তার আগে মুখ-হাতে জল দিয়ে এসে বসতে হবে।

সুর বদলেছে, নম্রতা কমেছে। নির্বাক সিতু তবু কয়েক নিমেষ দাঁড়িয়ে থেকে কলের মূর্তির মত এগিয়ে গিয়ে বালতির জলে হাত পা মুখ ধুয়ে এসেছে। মহিলা তোয়ালে এগিয়ে দিয়েছে, তারপর বসতে বলেছে।

সিতু বসল।

আনাহার হয়েছে?

স্নান হয়েছে, আহার কুটিরে ফিরে গিয়ে হবে।

চুপ একটু। রমণীর কালো চোখের তারা মুখের ওপর থেকে নড়ল না, সরল না।—এ রাস্তায় কত দিন আসা হয়েছে?

ভিক্ষে মাথায় উঠেছে। মেজাজ চড়ছে। তবু সংযত স্বরে জবাব দিল, তোমার জন্মের আগে থেকে বোধ হয়।

অনেক সার্থক সাধকের আজীবন কচি-কাঁচা মুখ থাকে শুনেছিল।

রমণীর চোখে পলকের বিস্ময়, কিন্তু তারপর কি চাপা হাসি চিকিয়ে উঠতে দেখল একটু।

জিজ্ঞাসা করল, বয়েস কত তাহলে?

সিতু আরো গম্ভীর।—আড়াই-কুড়ি তিন-কুড়ি হবে।

সেটা তোমার বয়েস না তোমার বাবার বয়েস?

মুখ লাল, গালচে ছেড়ে সিতু এবার উঠে দাঁড়াবে কিনা ভাবছে।

কোন্ দেশের লোক?

বাংলা দেশের।

গম্ভীর মুখে মহিলা বলল, কুটিরে ফিরে গিয়ে নয়, এখানেই আহার হবে। ভক্তবাড়িতে সাত্ত্বিক আহারের অভাব হবে না, ব্যবস্থা করে নিয়ে আসছি।

তাতে দেরি হবে। মহারাজ রাগ করবেন।

মহিলা চেয়ে আছে। চাউনিটা সিতুর চোখের ভিতরে ছুরির ফলার মত বসে যাচ্ছে। ঠোঁটের ডগায় খুব সূক্ষ্ম হাসির দাগ। বলল, মহারাজ অন্তর্যামী হলে একটু ভাবনার কথা বটে, তা না হলে কিছুই বলবেন না, ভিক্ষের ঝুলি ভরে দেব'খন, ভাববেন ঘুরে ঘুরে অত ভিক্ষে যোগাড় করতে বেলা বয়ে গেল। পরক্ষণে কথার স্বর বদলালো, দেরি হয় হবে, অত ভয় নিয়ে এপথে আসা কেন—বোসো, আমি ব্যবস্থা করে নিয়ে আসছি।

যেতে যেতেও আর একবার ঘাড় বাঁকিয়ে দেখে নিয়ে চলে গেল। আর সেই মুহূর্তে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল কেন সিতুর? ভিতর থেকে কে বলে উঠছে, পালাও পালাও—পালাবার ইচ্ছে থাকে তো এই মুহূর্তে পালাও! সঙ্গে সঙ্গে মাথায় একটা বাড়ি পড়ার মত করে আরো কি মনে পড়েছে তার। সঙ্গী ভক্তদের একদিনের রসিকতার কথা।…ভিক্ষে-টিক্ষে এখানে মেয়েরাই বেশি দেয়, তারা ঠাট্টা করেছিল, 'বংগালী' গুরুভাইয়ের ভিক্ষের বরাত ভালো, তার মুখখানা দেখেই এত বেশি বেশি ভিক্ষে দেয়। রসিকতার ছলেই পরে সাবধান করেছিল তারা। বলেছিল, এখানে অনেক পুরুষের বিবাগী মন বিয়ের পরেও বিবাগী হয়ে যায়, আবার অনেক পুরুষ অক্ষম ভোগবিলাসে দিন কাটায়। তাদের নিঃসন্তান যুবতী বউদের তখন অনেক সময় সুশ্রী চেহারার অল্পবয়সী সাধু-সন্ন্যাসীর ওপর চোখ পড়ে—ভিক্ষে দেবার নাম করে ঘরে এনে আটকায়। আগে এরকম হামেশাই হত, এখনো একেবারে হয়

না কেউ হলপ করে বলতে পারবে না। ঠিকমত খোঁজ করলে অনেক পরিবারে এরকম সন্ন্যাসীর ছেলের সন্ধান মিলতে পারে। আর অনেক পরিবারে আছে যেখানে গোপনতার বালাই নেই, সেই সন্তান বাড়ির কর্তাটির কাছেও আদরের সন্তান। অতএব সাধু সাবধান।

…এত বড় বাড়িটা খাঁ-খাঁ করছে, এখানে কোনো ছেলেপুলের অস্তিত্ব আছে বলে মনে হল না সিতুর। আশ্রমেও এই মহিলাকে শুধু তার শাশুড়ী আর কখনো-সখনো স্বামীর সঙ্গে যেতে দেখা গেছে।

সিতুর সর্বাঙ্গ ঘেমে উঠেছে। রুদ্ধশ্বাসে হনহন করে হেঁটে চলেছে সে। পালাচ্ছে। যেন একটা সাপে তাড়া করেছে তাকে। বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে এসে ঘুরে তাকালো একবার। মহিলা দাওয়ায় দাঁড়িয়ে, স্থির নিশ্চল মূর্তি। তাকে পালাতে দেখছে। সিতু সভয়ে আরো দ্রুত চলল। যেন ওই চোখের আওতার মধ্যে পেলে ও আবার তাকে টেনে নিয়ে যেতে পারে।

বাড়িটা একেবারে আড়াল হতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। তারপরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত সর্বাঙ্গ জ্বালা জ্বালা করেছে। নাক দিয়ে গরম নিঃশ্বাস পড়েছে। পা আর চলতে চায় না, অবসাদে শরীর ভেঙে পড়ছে। কুটির এখনো অনেক দূর। এক জায়গা থেকে এক আঁজলা জল খেয়ে নিল। খালি পেটে জল খেয়ে হাঁটতে গিয়ে শরীরটা আরো ঘুলোচ্ছে। বড় রাস্তা ছেড়ে ঝোপঝাড়ের পাশ দিয়ে পায়ে-হাঁটা সরু ছায়ার রাস্তা ধরে চলতে লাগল। ক্লান্ত শ্লথ গতি।

আশ্রমে পৌঁছুতে বিকেল।

আঙিনায় পা দিয়েই প্রচণ্ড ধাক্কা খেল আবার একটা। মহারাজের ঘরের সামনের উঠোনে তেজী ঘোড়ার টাঙ্গা দাঁড়িয়ে একটা। কম্বল বিছানো তক্তাপোশে মহারাজ এদিকেই অর্থাৎ বাইরের দিকে মুখ করে বসে। তাঁর মুখোমুখি ওই মহিলার অবস্থান। যার কাছ থেকে পালিয়েছিল। ওদিক ফিরে আছে, শরীরের আধ-খানা দেখা যাচ্ছে।

সিতুর পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে এপাশ-ওপাশের ভক্তরা সচকিত যেন। তাদের চোখে-মুখে উদ্বেগের ছাপ।

সাট্‌কী। ইধার আও।

গর্জন শুনে সিতু চমকে উঠল। দূর থেকেও ক্রোধে নিষ্ঠুর দেখাচ্ছে মহারাজের মুখ। পায়ে পায়ে সিতু দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

ইধার আও!

ভিতরে ঢুকল। মহিলা ফিরে তাকালো একবার, থমথমে গম্ভীর চোখে

প্রতিহিংসা।...যে শাড়ি জামা বাড়িতে পরা ছিল সেই বেশবাসেই বেরিয়ে এসেছে।

সিতু স্থির দাঁড়িয়ে, কিন্তু দেহের রক্তকণাগুলো বুঝি ওঠা-নামা করছে। দাস মহারাজ রাগে কাঁপছেন, আর চিৎকার করে অকথ্য অশ্রাব্য গালাগাল করছেন। বাপ-মা চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করতে করতে অন্ধ আক্রোশে হঠাৎ ঝুঁকে মাটি থেকে কাঠের খড়ম জোড়ার একটা তুলে নিয়ে সোজা মুখ লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলেন। গলার পাশে কানের নীচের দিকটা ঘেঁষে প্রচণ্ড আঘাত একটা। সিতুর মাথা ঘুরে গেল, চোখে অন্ধকার দেখল।

বেইমান নীচ বেশরম কুত্তা কাঁহাকা, নিকাল যা। নিকাল যা। নিকাল যা হিঁয়াসে!

প্রভুজী শক্তি দাও, শক্তি দাও—কল্পিত প্রত্যাঘাতে এক বৃদ্ধের ভূ-লুণ্ঠিত দেহ দেখছে সিতু চোখের সামনে, কে বুঝি ওই বৃদ্ধের দেহ মাটিতে লুটিয়ে দেবার জন্য সামনের দিকে ঠেলেছে তাকে—প্রভুজী শক্তি দাও, সংযম দাও!

দু চোখ বুজে প্রাণপণে নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা করছে সে। আবার চমকে উঠল হঠাৎ, এ কাকে ডাকল সে? হঠাৎ ভিতর থেকে এ কোন্ নাম স্মরণ করল?

আস্তে আস্তে চোখ মেলে তাকালো। দৃষ্টিটা প্রথমে ওই রমণীর দিকে ঘুরল। বিস্ফারিত নেত্রে মহিলা তাকেই দেখছিল, আঘাতের দিকটা এরই মধ্যে বীভৎস রকম ফুলে উঠেছে। ওই অদ্ভুত দৃষ্টিটা তার মুখে এসে আটকাতে হঠাৎ কি এক অজ্ঞাত ভয়ের কাঁপুনি সর্বাঙ্গে। বিবর্ণ পাংশু মুখে মহিলা উঠে দাঁড়াল পরমুহূর্তে, মহারাজকে প্রণাম করতে ভুলে দ্রুত ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল সে।

হঠাৎ তাকে এভাবে পালাতে দেখে মহারাজও রাগ ভুলে বিস্মিত এবার। সিতুর দৃষ্টিটা তাঁর দিকে ঘুরেছে। মহারাজও বিব্রত বোধ করলেন কেমন। ওই দৃষ্টি যেন তাঁরই গোচরের বা অগোচরের কোনো স্তরের এক রমণীর দাসকে টেনে বার করে দেখছে—দেখাচ্ছে। রমণীর নালিশ শুনে এই কাণ্ডজ্ঞানশূন্য চণ্ডাল ক্রোধের আড়ালে দাস-মূর্তিটাই যেন দেখাতে চাইছে তাঁকে। ও যেন দাস মহারাজকে দেখছে না, রমণীর দাসকে দেখছে।

সিতু মাটি থেকে খড়মটা তুলে নিয়ে আর এক পাটির সামনে রাখল। তারপর আস্তে আস্তে ফিরে চলল।

এ লাট্কী, ইধার আও।

সিতু দরজার কাছ থেকে ঘুরে দাঁড়াল। দেখল একটু। তারপর তেমনি শান্ত মুখে শান্ত পায়ে ঘর ছেড়ে সাধনের আঙিনা পেরিয়ে দাস মহারাজের

আশ্রম থেকে খোলা রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

ভিতরে আশ্চর্য অনুভূতি একটা। রমণীর হিংসা মনে নেই, নিজের রাগ মনে নেই, দাস মহারাজের অপমান মনে নেই, আঘাত মনে নেই।…সেই মুহূর্তের সঙ্কটে সে কাকে ডেকেছিল? কাকে স্মরণ করেছিল? কার কাছে শক্তি আর সংযম ভিক্ষা করেছিল?

চোখের কোণ দুটো হঠাৎ সির্‌সির্ করছে কেন সিতুর?

সঙ্গে সঙ্গে কোন্ গোপন নিভৃত থেকে একখানা চেনা মুখ ভেসে উঠল চোখের সামনে। সেও এক রমণীর মুখ। সেই মুহূর্তে আবেশের প্রলেপ মুছে গেল। শক্তি আর সংযম ধূলিসাৎ। ওই নামের সঙ্গে এই মুখ মনে পড়ল কেন? এই মুখ টেনে আনল কেন? কেন? কেন? কেন?

অশান্ত পা ফেলে ফেলে সিতু সামনের দিকে এগিয়ে চলল।

* * * *

গঙ্গার এদিকটার নাম নীলধারা।

এ নির্জনতা আগেও টানত। দাস মহারাজের আশ্রম থেকে পথে নেমে হাঁটতে হাঁটতে সিতু কখন এখানে চলে এসেছে জানে না। শ্রান্তির অনুভূতি আর নেই। সমস্ত দিন খাওয়া হয়নি তাও মনে নেই।

সামনে এক দুরন্ত তাড়ায় নীল স্রোত ছুটে চলেছে। ওপারের কাছে-দূরে নীলাভ পাহাড়। গঙ্গার খরধারা, ছোটার মত্ত তাড়ার পাশে আরো বেশি মৌনী গম্ভীর মনে হয় পাহাড়গুলোকে। ওগুলোর নীল ছটা এসে পড়ে বলেই হয়ত এদিকটার জল এত নীলাভ। গঙ্গা আসছে অদূরের মস্ত একটা বাঁক ঘুরে। বাঁকের ওধারে নীলধারা নীল আকাশে মিশে আছে।

ঘণ্টা দুই হল সিতু ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। সন্ধ্যার আবির্ভাব দেরিতে এখানে। বিদায়ী সূর্য এতক্ষণে পশ্চিমে ঢলেছে। নীল জলে লালের আভা মিশেছে। অন্য দিন সিতু দু চোখ ভরে শুধু দেখে। জল দেখে, পাহাড় দেখে, আকাশ দেখে—আর এই রং বদল দেখে। কিন্তু আজকের এই দেখাটা নিজের অগোচরে কোন্ অনুভবের অন্তঃপুরে চলে গেছে। সেখানেও কি এক নিষ্ঠুর রং-বদল ঘটে গেছে। ঘটছে। নিষ্ঠুর, অথচ ক্ষুদ্র নয়। সিতু দাঁড়িয়ে আছে—নিশ্চল, স্থির। আধ-বোজা চোখে জলের আভাস। থেকে থেকে দুই ঠোঁট নড়ছে একটু একটু। সে বলছে না কিছু, ওই বিপুল স্রোতধারার মত কোনো অব্যক্ত কথা তারও নিভৃতের সব বাধা ঠেলে সরিয়ে নিজের পথ করে আরো নিভৃতের-দুর্গমে ছুটে চলেছে।…জাহ্নবী, তুমি প্রাণের ছবি। তুমি জাগ্রত কল্লোল। তুমি চেতনার কল্লোল। মর্ত্যের

কান্না শুনে আর মৃত্যুবন্দী প্রেতের আর্ত ডাকে বিচলিত হয়ে মৃত্যুঞ্জয়ীর জটা থেকে অক্ষয় অমৃতধারায় তুমি নেমে এসেছ—তুমি মৃত্যু মোছাও, তুমি জীবনের বন্ধ্যাত্ব ঘোচাও!

চমকে উঠল হঠাৎ। পাশে দাঁড়িয়ে প্রায় সমবয়সী একটি লোক। পরনে সাদা ধুতি, গায়ে সাদা ফতুয়ার ওপর সাদা চাদর। হিন্দীতে মিষ্টি করে জিজ্ঞাসা করল, সে সাত্যকি চ্যাটার্জি কিনা।

অচেনা মানুষ। সিতু মাথা নাড়ল, তারই নাম।

লোকটি জানালো, আনন্দবাবা ডেকেছেন, তাঁর আখড়ায় একবারটি আসতে হবে।

সিতু অবাক। এখানে এসে আনন্দবাবার নাম শুনেছে বটে, চোখে দেখেনি। তিনি তাকে চিনলেন কি করে আর ডাকবেন কেন ভেবে পেল না। তার সংশয় লক্ষ্য করেই লোকটি হিন্দীতে আবার বলল, আনন্দবাবার কাছে আসতে ভাবনা কি ভাই, আসুন।

দুর্বোধ্য বিস্ময়ে সিতু সঙ্গ নিল তার। পথে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করল না। এটুকু সংযমে অনভ্যস্ত নয় এখন। আখড়া কাছেই। বাঁশের বেড়া দেওয়া জমিতে বিচ্ছিন্ন অনেকগুলো বড় বড় পাকা ঘর। আর মাঝে মস্ত একটা হলঘর। পঞ্চাশ-ষাটজন নানা বয়সের লোক বসে সেখানে। পরনে সকলেরই সাদা ধুতি সাদা ফতুয়া। হলএর এমাথা-ওমাথা শতরঞ্চি ফরাস বিছানো। একধারে গান-বাজনার সরঞ্জাম কিছু। দেয়াল-ঘেঁষা সারি সারি কতগুলো আলমারি বইয়ে ঠাসা। পরিবেশ দেখলে মনে হয়, কোনো জলসা-টলসা বা সাংস্কৃতিক আলোচনা শুরু হবে। নরম গলায় অনেকে অনেকের সঙ্গে কথা কইছে।

সিতু এসে দাঁড়ানো মাত্র ফরাসের প্রায় ওমাথা থেকে দরাজ গলায় স্পষ্ট বাংলায় একজন ডেকে উঠলেন, এই যে সাত্যিকি মহারাজ, সোজা ইদিকে চলে এসো—

সিতু পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। ডাকলেন যিনি তাঁরও পরনে ধপধপে সাদা থান, আদুড় গায়ে একটা তসরের চাদর জড়ানো। চাদরের নীচে তেমনি সাদা মোটা পৈতে। সমস্ত মাথাজোড়া চকচকে বাদামী রঙের টাক। কোনদিন ও-মাথায় এক গোছা চুল গজিয়েছিল মনে হয় না। টাকের রঙ আর গায়ের লালচে আভা মিলে মিশে একাকার। বেঁটে মোটাসোটা মানুষ, বয়েস বাট-পঁয়ষট্টির মধ্যে মনে হয়। সিতু পরে জেনেছে বয়েস একাশী। যে লোক তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে, এগোবার ফাঁকে সেই চুপিচুপি বলে দিয়েছে, উনিই আনন্দবাবা।

সামনে এসে তাঁর উদ্দেশে সিতু দু হাত জোড় করল শুধু, প্রণাম করল না।

জবাবে আনন্দবাবা ভবল ভক্তিভরে দু হাত জোড় করে প্রণামের ভঙ্গিতে টাক মাথা প্রায় ভুঁড়িতে ঠেকালেন। সিতু ঈষৎ অপ্রস্তুত, কিন্তু গম্ভীর। অনেক দেখে ভিতর শক্ত হয়েছে, কি ব্যাপার না জেনে বা না বুঝে বিগলিত হবার কারণ নেই।

বসতে আজ্ঞা হোক মহারাজ, এই পুণ্য-পদার্পণ ঘটবে বলে টানা চার মাস বসে আছি। ছদ্মগাম্ভীর্যে আনন্দবাবার মুখখানা আরো টস্‌টসে দেখালো।—দাস মহারাজের হাতে পালিশ হচ্ছে শুনে অপেক্ষা করছিলাম, আজ শুনলাম সেখানকার বন্দরের কাল শেষ, তুমি পাখা মেলেছ হেথা নয় হেথা নয় বলে। আর আমি? দেখব বলে বসে আছি আমি, 'ভারতের কোন্ বৃদ্ধ ঋষির তরুণ মূর্তি তুমি'। ভারী গালের ভাঁজে ভাঁজে চাপা তরল হাসির খেলা, দু চোখ কুঁচকে মুখখানা ভালো করে নিরীক্ষণ করলেন একটু, হাল্‌কা মন্তব্য করলেন, পালিশের কারুকার্য তো দাস-মহারাজ ভালই করেছেন দেখছি।

উপস্থিত প্রায় সকলেরই চোখ সিতুর দিকে। সরাসরি হাসছে না কেউ, কিন্তু হাসি-হাসি মুখ সকলেরই। আনন্দবাবার শেষের মন্তব্য সিতুর গলা আর গালের একদিকের আঘাত লক্ষ্য করে। ফুলে আছে, কালশিরেও পড়েছে মনে হয়। যে করেই হোক, এ আঘাতের বৃত্তান্ত সকলেই জানে বোঝা গেল। হয়ত ওখানকার শিষ্য-সামন্তদের সঙ্গে এখানকার লোকেদের যোগাযোগ আছে। এই পরিহাসের পরেও মেজাজ চড়বে না এ পর্যায়ের সংযম শিক্ষা হয়নি এখনো। কিন্তু তার প্রতি আনন্দবাবার আগ্রহ কেন সেটা অজ্ঞাত এখনো। ঠাণ্ডা প্রশ্ন করল, কৃপা করে আমাকে ডেকেছেন কেন, এবারে আপনারও একটু পালিশ করার ইচ্ছে?

উৎফুল্ল আনন্দবাবা তৎক্ষণাৎ তুমি থেকে তুই-এ অবতরণ করলেন, ঠিক ধরেছিস্ রে ব্যাটা, ভালো জমি দেখলে আমারও হাত নিশপিশ করে।...থাকবি এখানে?

মনের অবস্থা যেমনই হোক, তার আঘাত নিয়ে কৌতুকের একটা কঠিন জবাব দেবার সুযোগ পেল এবারে। একটু চুপ করে থেকে ধীর স্বরে জিজ্ঞাসা করল, এখানে মেয়েছেলের যাতায়াত কেমন?

এরকম একটা প্রশ্ন আনন্দবাবার মুখের ওপর কেউ ছুঁড়ে দিতে পারে ভাবা যায় না। সকলের হাবভাবে অস্বস্তিকর চাপা বিস্ময়। কিন্তু আনন্দবাবার দু চোখ কপালে। দুর্মুখ ছেলেটাকে আগে ভালো করে দেখে নিলেন তিনি। তারপর অকস্মাৎ একটা বিরাট হাসি যেন পাহাড়ের উঁচু থেকে ধাক্কা খেতে খেতে সমতলের দিকে গড়াতে লাগল। সিতুর এই মানসিক অবস্থাতেও মনে হল, এ হাসি দেখার জিনিস। ভারী গালের খাঁজে খাঁজে হাসি জমছে আর উপ্‌চে ছড়িয়ে পড়ছে।

শুধু মুখ কেন, আনন্দবাবার সর্বাঙ্গ দিয়ে হাসি ঝরছে যেন। শব্দের বিরাম ঘটলেও হাসির তরঙ্গ তাঁর মুখের সর্বত্র খেলা করে বেড়াতে লাগল। বড় করে দম নিয়ে বললেন, যাক, এখনো মেয়েছেলের মধ্যে আটকে আছিস বোঝা গেল। মেয়েছেলে ঢের আসে, তবে তোর রোগ সারানোর মত কেউ আসে কিনা বলতে পারব না বাপু। তা তুমি দয়া করে থাকো এখানে কটা দিন, গৌরকে না-হয় আমি একটা টেলিগ্রামই করে দিই, তার হারানিধি এই আস্তানায় এসেছে, আর রোগ যখন ধরাই পড়েছে আশা করা যাচ্ছে সারবেও—সে তো একধার থেকে চিঠির চাবুক চালাচ্ছে আমাকে, দাস মহারাজের কাছে পড়ে থাকতে দিচ্ছি কেন, কেন ধরে নিয়ে আসছি না। আমি যে পালিশ-করা মালের অপেক্ষায় বসে আছি, সে তো আর জানে না!

একটু একটু করে সিতুর সমস্ত বিস্ময়ের অবসান। গৌর কে প্রথমে ধরতেই পারেনি। পরে বুঝেছে। ছোট দাদু। হরিদ্বারের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগ জানত, সে যোগটা যে এই আখড়ার সঙ্গে সেটা কল্পনায়ও আসেনি। হাল্কা বোধ করছে হঠাৎ। সাড়ে তিন বছরের টানা একটা ক্লান্তির অধ্যায় যেন শেষ হয়ে গেল, বহু আঘাত সয়েও বুঝি এক আলোর উৎসব-প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হয়েছে। সে আলোর উৎস এই একজন—এই আনন্দবাবা।

এই প্রথম সিতুর মনে হল, এবারে ও একটু বিশ্রাম চায়, একটু অবকাশ চায়। যে লোকটি তাকে নীলধারা থেকে ডেকে এনেছিল সে এখানে প্রেমভাই নামে পরিচিত। প্রেমচাঁদ বা প্রেমলাল গোছের নাম হতে পারে, আবার আনন্দবাবার দেওয়া নামও হতে পারে। পরে অন্তরঙ্গ আলাপের ফাঁকে সেই জানিয়েছে, ছোট দাদু আনন্দবাবার কাছে ওর ফোটো রেখে গেছে প্রায় তিন বছর আগে। ছোট দাদুকে ভারী ভালবাসেন আনন্দবাবা, তখনি নাকি বলে দিয়েছিলেন, ভাবনা নেই, ঘুরে-ফিরে একদিন এই আখড়াতেই আসবে। তারপরেও ছোট দাদু অনেকবার এখানে এসেছে, আর নাতির খোঁজ পাচ্ছে না বলে উতলা হয়েছে। আনন্দবাবা এক কথাই বলেছেন, সময় হলে আসবে। মাস চারেক আগে দাস মহারাজের আশ্রমে সিতুর হদিস পেয়ে ছোট দাদুকে খবর দেওয়া হয়েছিল। খবর পেয়েই ছোটদাদু আসার জন্য ব্যস্ত হয়েছিল। আনন্দবাবা নিষেধ করেছেন, বলেছেন, আসতে হবে না, নাতির ভার তিনি নিলেন, সময়ে এখানেও ডেকে নেবেন।

সিতু কান পেতে শুনেছে। শুনেছে আনন্দবাবার গল্পও। ওর ধারণা ছিল আনন্দবাবা বাঙালী। না, ইউ-পি'র মানুষ তিনি। তবে বাংলাদেশে দীর্ঘদিন কাটিয়েছেন। অনেকগুলো ভাষা জানেন, যখন যে ভাষায় কথা বলেন তখন সেই দেশের

মানুষ মনে হয় তাঁকে। পাণ্ডিত্যেরও শেষ নেই, কর্মজীবনে নামকরা অধ্যাপক ছিলেন। তিন ছেলে আর বউ ছিল। এক পুণ্যস্নানের দিনে গোমতীর নীচেকার ঘূর্ণি স্রোত তিন ছেলেকেই টেনে নিল। বউ পাগল হয়ে গেল, আর শেষে ছেলে ফিরিয়ে দে, ছেলে ফিরিয়ে দে বলে ওই গোমতীর জলেই ঝাঁপ দিয়ে জ্বালা জুড়লো। সেইদিন থেকে হাসা শুরু করেছিলেন আনন্দবাবা, পঞ্চাশ বছরের বেশি হল, আজও হেসেই চলেছেন। প্রেমভাইয়েরা এ গল্প নাকি গৌরবাবু অর্থাৎ ছোট দাদুর মুখে শুনেছে। ছোট দাদুরা কার কাছে শুনেছে জানে না, আনন্দবাবা পুরনো জীবনের কথা একটিও বলেন না। জিজ্ঞেস করলে হেসে জবাব দেন, রোজই তো নতুন করে জন্মাচ্ছি রে বাপু, পূর্বজন্মের কথা কার অত মনে থাকে, আর বাসি ব্যাপারে মাথা ঘামিয়েই বা কাজ কি। হাসতে শুরু করার পর প্রায় তিরিশ বছর আনন্দবাবার আর খোঁজখবর মেলেনি। ঘুরে ঘুরে তামাম পৃথিবীটাকে দেখেছেন। বিদেশে বহু জায়গায় চাকরিও করেছেন, আবার পাহাড়ে-জঙ্গলে কত বছর কাটিয়েছেন ঠিক নেই। গল্পকথা কিনা প্রেমভাইরা জানে না, তারা শুনেছে আনন্দবাবা নামটা নাকি তাঁর গুরুজীর দেওয়া। রাগ করে গুরুজী একদিন তাঁকে পাহাড় থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলেন। ঘণ্টা দুই বাদে চোখ মেলে দেখেন, প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করে শিষ্য হামা দিয়ে তাঁর কাছে উঠে আসছেন—মুখখানা তেমনি হাসিতে ভরাট, সেখানে যাতনার চিহ্নও নেই। গুরুজীও নাকি তখন একগাল হেসে তাঁর দিকে ঘুরে বসে হাত জোড় করে বলেছেন, অপরাধ নিও না আনন্দবাবা, দেহজ্ঞান আমার থেকেও বেশি খুইয়েছো মনে হচ্ছে, আর এখানে থাকার প্রয়োজন নেই—দুনিয়ায় এবারে তোমার আনন্দমন্ত্র বিলোও গে যাও। সত্য কিনা যাচাই করতে গেলে আনন্দবাবা সত্রাসে আগে নাক-কান মোলেন, তারপর হেসে বলেন, ওই কথা বলে তোদের একে একে বিদায় করতে পারলে তবে আমার মুক্তি।

সিতু খুব মুগ্ধ বা অভিভূত কিছু হয়নি। শিষ্যমুখে গুরুস্তুতি শুনে দু কান অভ্যস্ত। দাস মহারাজ সম্পর্কেও তাঁর ভক্তদের মুখে অনেকরকম অলৌকিক ক্ষমতা আর গুণের কথা শুনেছিল। আনন্দবাবার আনন্দসাধনার সমাচার খারাপ লাগেনি, এই পর্যন্ত। দুদিন পরের কথা। আখড়ার সান্ধ্য আসরটাকে মজলিশের আসর বলা যেতে পারে, জীবনের সার্থক সম্পদ খোঁজার প্রসঙ্গে বাঙালী মহাকবির একটি কবিতা গল্পের মত করে রসিয়ে বলছিলেন আনন্দবাবা। সিতুর মনে হয়েছিল, এই কৌতুককাহিনীর লক্ষ্য সে-ই। বাঙালীদের জন্য বাংলায় বলছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে চমৎকার হিন্দীতে অন্যদেরও বক্তব্য বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন।

যথা, বিধাতার সৃষ্টিকর্ম যখন সারা, সে পূর্ণতা দেখে দেবতারা সব আনন্দে

আত্মহারা। একবাক্যে তারা বাহবা দিচ্ছে আর আনন্দ করে বলছে, পূর্ণতার এমন ছবিটি আর হয় না, ফাঁক কোথাও নেই। তাদের আনন্দ-সভার মধ্যে হঠাৎ কে একজন বলে উঠল, দেখো তো দেখো তো, জ্যোতির মালা থেকে একটা তারা যেন কোথায় খসে পড়েছে! ব্যস, তাদের গান গেল, আনন্দ গেল, সকলেরই মনে হল একটা তারা নেই বটে। আর তারপর মনে হতে থাকল, 'সেই তারাতেই স্বর্গ হত আলো—সেই তারাটাই সবার বড়ো, সবার চেয়ে ভালো।' অতএব চলল সন্ধান, চলল খোঁজাখুঁজি, সেই হারা-তারা না পেলে ভুবন কানা। জগৎ সেই থেকে হারানো তারাটা খুঁজে বেড়াচ্ছে। আনন্দবাবার হাসিমাখা ঝক্ঝকে দৃষ্টিটা সিতুর দিকে ঘুরল, অল্প মাথা নেড়ে টেনে টেনে পরের কথা কটা যেন তারই গভীরে ছড়িয়ে দিলেন, 'শুধু গভীর রাত্রিবেলায় স্তব্ধ তারার দলে—"মিথ্যে খোঁজা, সবাই আছে," নীরব হেসে বলে।' জোরেই হেসে উঠলেন আনন্দবাবা, হারিয়েছে ভাবলে আর খুঁজে পাবিনে রে বাবা,খুঁজে পাবি নে—সবই আছে, বুঝলি? কিছু হারায়নি।

সেই মুহূর্তে সিতুর ভালো লেগেছিল আনন্দবাবাকে। দেখছিল তাঁকে। চক্চকে টাকমাথা দেখছিল, ঝক্ঝকে মুখখানা দেখছিল, কি গালের ভাঁজে-ভাঁজে হাসি চুয়ানো দেখছিল জানে না। তারপর দিনে দিনে ভালো লেগেছে, তাঁকে কাছে পেতে ভালো লেগেছে, তাঁর হাসি দেখতে ভালো লেগেছে, তাঁর কথা শুনতে ভালো লেগেছে। অথচ সকলের সামনে ওকে কম ঠেস দিয়ে কথা বলেননি তিনি। বলেছেন, আধুনিক যৌবন সাহসিক নয় একটুও, ভীরুতায় ঢাকা। বলেছেন, তারুণ্যের বিদ্রোহ অস্পষ্ট নয়, সরল নয়—তাই সে কেবল অবলম্বন খোঁজে, অস্ত্র খোঁজে, আর শেষে পালানোটাই সার্থক রাস্তা ভাবে। যে মুহূর্তে পালালি সেই মুহূর্তে আনন্দের বারোটা বাজালি, আনন্দ গেলে থাকল কি? বীরের আশ্রয় না পেলে লক্ষ্মী পালায়, পলাতকের ধারে-কাছে ঘেঁষে নাকি সে কখনো!

রাত ছটোর সময় তিনটের সময় উঠে এই মানুষেরই আবার আর-এক মূর্তি দেখেছে সিতু। পা-টিপে উঠে গিয়ে তাঁর ঘরের বাইরে থেকে উঁকি দিয়েছে। তখন ঘরের প্রদীপের বেশি রঙ কি আনন্দবাবার দেহের, জানে না। এমন ধ্যানস্থ মূর্তি আর বুঝি দেখেনি। সিতুর মনে হয়েছে, দেহ-আধারে একটা বাতি জেলে রেখে আনন্দবাবা দুর্নিরীক্ষ্য বিচরণে বেরিয়েছেন, ফিরে এলে তবে ওই দেহে সাড়া জাগতে পারে—তার আগে নয়।

এখানে যারা আছে সকলেই কাজ করে। ক্ষেতের কাজ, বাগানের কাজ, পড়াশুনা। হঠাৎ-হঠাৎ অনেকে চলে যায়, আবার কোথা থেকে নতুন মানুষ আসে। সিতু শুধু শুনেছে, নানা জায়গায় নানারকমের প্রতিষ্ঠান আছে, বেকার বসে থাকার

জো নেই কারো। সিতু জিজ্ঞাসা করেছে তার কি কাজ, আনন্দবাবা বলেছেন, আপাতত স্ফূর্তি ফেরানো কাজ—স্ফূর্তি করে খা-দা আর ঘুমো। সদলবলে নীলধারায় চানে এসেছিলেন সেদিন। বৃষ্টি হবার ফলে হঠাৎ ঠাণ্ডা পড়েছে, তায় বরফের মত জল। শীতে হাড়ে-হাড়ে ঠোকাঠুকি। সিতু চান করছে আর কাঁপছে। আনন্দবাবা হঠাৎ বললেন, একটা গান কর্ দিকি নাইতে নাইতে।

সিতু হাসিমুখে জবাব দিল, চেষ্টা করতে গেলে গানের বদলে হি-হি করে গলা দিয়ে কান্না বেরুবে।

উৎফুল্লমুখে আনন্দবাবা অন্যদের দিকে ফিরলেন, বোকাটার কথা শোন একবার, কান্না যেন গান হতে নেই।

প্রতি মুহূর্তে এমনি করেই সিতু যেন পাচ্ছে কিছু। কি বলতে পারে না, শুধু অনুভব করে।

পনের দিনের মাথায় হঠাৎ এক সকালে ছোট দাদু এসে হাজির। তাঁকে দেখে সকলে হৈ-হৈ করে উঠল। সিতুর ভেতরটাও উৎসুক, উন্মুখ। আনন্দবাবার পায়ে মাথা রেখে অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম করতে দেখল ছোট দাদুকে। ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দবাবা আঙুল তুলে সিতুকে দেখালেন।—পৃথিবীটা কত গোল দেখলি ?

দুপুরের নিরিবিলিতে সিতু তাকে কাছে পেল যখন, ভিতরটা তখন অনেক ঠাণ্ডা। জিজ্ঞাসা করল, তুমি চলে এলে যে ?

গৌরবিমল জবাব দিলেন, তোকে নিতে।

সিতু সচকিত, কেন ? আনন্দবাবা বলেছেন ?

না, আমিই বলছি। তোর বাবার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না, গত তিন মাসের মধ্যে দুবার মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে গেছল—একবার গাড়িতে, একবার বাড়িতে। ব্লাড প্রেসার চড়েই আছে।···তোর খবর পাওয়ার পর থেকে মনে মনে খুব আশা করছে তোকে—

সিতুর মনে হল; আলো থেকে কে বুঝি আবার তাকে সেই পুরানো অন্ধকারের মধ্যে টানতে চাইছে। ফেরার নামে অন্তরাত্মা বিমুখ। খানিক চুপ করে থেকে বলল, মাথার চাপ এত বেশি হয়েছে, না ঘোরাই আশ্চর্য। ভালো করে চিকিৎসা করাও, আমার যাওয়া সম্ভব হবে না।···এখানে এদের সামনে টানা-হেঁচড়া করতে যেও না।

গৌরবিমল প্রকাশ্যে টানা-হেঁচড়া করেননি বটে, নিজেই তাকে ফেরাতে চেষ্টা করেছেন। না পেরে তিন-চার দিন বাদে একাই ফেরার জন্যে প্রস্তুত হয়েছেন।

তার আগের সন্ধ্যায় সিতু আবার তাঁকে নিরিবিলিতে পেয়ে হুকুমের সুরেই অনুরোধ করেছে, যাবার আগে আনন্দবাবাকে আমার জন্যে একটু ভালো করে বলে যেও দেখি—

কি বলে যাব, চট্ করে তোকে খাঁটি সন্ন্যেসী বানিয়ে দিতে ?

ভাবল একটু।—জানি নে, এভাবেও ভালো লাগছে না।

ভালো না লাগলে কে তোকে থাকতে বলেছে, আমার সঙ্গে চল্।

তুমি ছাই বুঝেছ। উৎসুক হঠাৎ, আচ্ছা ছোট দাদু, আনন্দবাবা সত্যি কি দিতে পারেন বলো তো ?

গৌরবিমল হাসিমুখে জবাব দিলেন, তাঁকেই জিজ্ঞেস করে দেখ। একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, ওঁকে দেখলে শোক পালায়, আর কিছু না হোক মানুষের শোক ভোলাতে পারেন বোধ হয়।

সিতুর বয়েস প্রায় আটাশ, আর ছোট দাদুর ষাট ঘেঁষতে চলেছে। কিন্তু কাছাকাছি হলে বয়েস দুজনেরই আগের মত নেমে আসে খানিকটা করে। তার ওপর এই সাড়ে তিন বছরের নানা ধাক্কায় আর কিছু না হোক, সিতুর চক্ষুলজ্জার বালাই গেছে। শোনামাত্র কিছু না ভেবে ঝপ্ করে মুখের ওপর বলে বসল, তোমার শোক ভোলাতে পেরেছেন ?

আমার আবার কি শোক ?

সিতুর খুশির মাত্রা বাড়ল, দ্বিধাশূন্য মুখে আবার বলে বসল, তুমি ছোট দাদু না হয়ে বাবা হলে ব্যাপারখানা কেমন হত কলকাতায় বসে দুই-একবার ভাবতে চেষ্টা করে হেসে সারা আমি—সে যাক, তোমার অবস্থাটা কি বলো।···মা-কে ভুলতে পেরেছ ?

এভাবে আক্রান্ত হয়ে গৌরবিমল ধড়ফড় করে উঠলেন একপ্রস্থ, মুখ লাল। —ধরে দেব এক থাপ্পড়। অবাকও কম হননি, এসব তোর মাথায় কে ঢোকালে ?

কেউ না, জেঠুর সেই কালো ডায়েরীতে কত যে মণিমুক্তা ছড়ানো তা যদি জানতে। একবার হাতিয়ে নিয়ে পড়ে ফেলেছিলাম। তা থাপ্পড় দাও আর যাই করো, জবাবটা দাও না, ভুলতে পেরেছ ?

অর্বাচীনের পাল্লায় পড়ে গৌরবিমলের যেন হাল ছাড়ার দাখিল প্রথমে। তারপর মিটিমিটি হেসে বললেন, আনন্দবাবার মতে সুন্দর যা, তা ভোলার দরকার নেই।

নিজের অগোচরে সহজতায় টান ধরছে সিতুর। কথার সুরও নীরস। বিড়বিড় করে বলল, সুন্দরকে ভোলার দরকার নেই, কিন্তু এখন আবার সুন্দরের কি আছে

—সবই তো অসুন্দর হয়ে গেছে।

হাল্‌কা ধমকের সুরে গৌরবিমল বললেন, তোর মাথা হয়েছে, আনন্দবাবা বলেন, দুর্যোগে চন্দ্র-সূর্য ঢাকা পড়ে, তা বলে তাদের রূপ খোয়া যায় না।

সিতু আর কথা বাড়ালো না। ভিতরটা এরই মধ্যে তিক্ত হয়ে গেছে তার। এ প্রসঙ্গ তুলেছে বলে নিজের ওপরেই বিরূপ সে। ছোট দাদুর কথাগুলো সান্ত্বনার মত, তাই আরো খারাপ লাগল। উঠে চলে গেল সেখান থেকে। অনেকদিন বাদে আবার যেন সেধে গণ্ডগোলের রাস্তায় পা ফেলার ঝোঁক একটা। সেটাকে নির্মূল করার অসহিষ্ণু তাড়না।

মাঝরাত পর্যন্ত আনন্দবাবার ঘরে ছিল ছোটদাদু। সিতু লক্ষ্য করেছে কিন্তু মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করেনি কি এত কথা হল। সকালে তাকে বেশ খুশিমুখেই কলকাতায় রওনা হতে দেখল। সিতু নিশ্চিন্ত বোধ করতে চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না কেন?

॥ চুয়াল্লিশ ॥

শেষ ঘনালো?

বিভাস দত্তর চোখ বোজার অনেক আগেও জ্যোতিরাণীর মনে হত ভবিতব্যের এক অমোঘ বিবরে প্রবেশ করেছেন তিনি। মনে হত, যেখানে এসে দাঁড়িয়েছেন সেটাই শেষ নয়, সব নয়—আরো কিছু ঘটবে, আরো কিছু বাকি।

অনেক কিছুই ঘটেছে। তবু তখনো তো শেষ দেখেননি তিনি, শেষের ছায়া দখল নিতে আসেনি, বিবরের শেষের ধাপে পৌঁছেছেন ভাবেননি। কত কিছুই তো ঘটল। মিত্রাদি মুছে গেল। শেষের মাশুলের একটা দগ্‌দগে ক্ষত রেখে গেল, তবু মুছে যেতে পারল। বিভাস দত্তর চাওয়া ফুরালো, জ্যোতিরাণীর ভিতরের সেই যুদ্ধক্ষেত্রের নার্সের ভূমিকাও নিঃশব্দে শেষ হয়ে গেল। আবার এক সর্ব-নিঃশেষের মত দৃশ্য দেখেছেন হাসপাতালে মুমূর্ষু ছেলের দিকে চেয়ে—আঘাতের সেই বীভৎস দৃশ্য বুঝি জ্যোতিরাণীর গলাতেই শেষ কুলুপ এঁটে দেওয়ার উপক্রম করেছিল। কিন্তু দিয়েও দিল না। এক মাসের মর্মান্তিক প্রতীক্ষার পরে ওই ছেলেই আবার সে যাতনার ওপর দ্বিগুণ আঘাত দিয়ে মুখের ওপর দু চোখের গলগলে বিতৃষ্ণা-বিদ্বেষের ঝাপ্‌টা মেরে তাঁকে দূরে সরিয়েছে।…তারপর ছেলের নিরুদ্দেশের খবরও কানে এসেছে। কালীদার যাতায়াত আছে, তাঁর মুখেই

শুনেছেন। দিনের পর দিন গেছে, একে একে তিন-তিনটে বছর কেটে গেছে, কোনো সন্ধান মেলেনি। কালীদা এলেই শমীর উদগ্রীব মুখ দেখেছেন, একটা খবরের আসায় ওকে উন্মুখ দেখেছেন। আড়ালে কাঁদে-টাদে কিনা সেই সন্দেহও হয়। চার-পাঁচ মাস আগে হরিদ্বারে আছে খবর আসতে শমীর চেহারাই বদলে গেছল। ও আশা করেছিল, ত্রিকোণ রাস্তার বাড়ি তালাবন্ধ করে সকলে হরিদ্বারে ছুটবে। পারলে ও নিজেও ছুটত।

পরে কালীদা জানিয়েছেন, সেখান থেকে মামুর আনন্দবাবার নির্দেশ এসেছে কেউ যেন না যায়, সময় হলে তিনিই ডাকবেন। তারপরেও এই কমাস ধরে শমীর চাপা অস্থিরতা লক্ষ্য করছেন জ্যোতিরাণী। সম্ভব হলে শমীকে সান্ত্বনা দিতেন তিনি, বলতেন, ওটা শেষের ছায়া নয়, ভাবিস না। এত সবের পরেও সত্যিই জ্যোতিরাণীর মনে ওদিক থেকে কোন শেষের ছায়া ঘনায়নি।

ওটা এসেছে সম্পূর্ণ অন্যদিক থেকে। নিজের দেহের অভ্যন্তর থেকে, নিজের এই দেহকে কেন্দ্র করে। ওই ছায়ার সূত্রপাত বছর দেড়েক আগে, তখনো ওটার সম্পর্কে তেমন সচেতন ছিলেন না জ্যোতিরাণী। বছরখানেক হল সচেতন হয়েছেন। তারপর একেবারে যেন স্থির হয়ে গেছেন, শুব্ধ হয়ে গেছেন তিনি। অথচ দীর্ঘদিন পর্যন্ত বুঝতে দেননি কাউকে, শমীকেও না। নিজের ভিতরে নিজেকে আগলে রাখার এক অদ্ভুত শান্ত শক্তি অর্জন করেছেন তিনি।

এই সর্বনিঃশেষের ছায়ার খবর শমী জেনেছে মাত্র মাসখানেক আগে। জেনে প্রথমে পাথর হয়েছে, তারপর দিশেহারা হয়েছে। এখনো প্রাণপণে ওটা ঠেলে সরাতে চেষ্টা করছে, অস্বীকার করতে চেষ্টা করছে। কিন্তু জ্যোতিরাণী জানেন ওই ছায়া শেষের ছায়া, এবারে সব ঢেকে দেবে ওটা। তাই আরও শান্ত আরও স্থির আরও নির্লিপ্ত তিনি। মনে মনে কেবল নিজেকে প্রস্তুত রাখতে চেষ্টা করেছেন, প্রার্থনা করেছেন, শেষের বিচারই সব—তাই শেষটুকু সুন্দর হোক শুধু, আর তিনি কিছু চান না।

গোড়ায় গোড়ায় কিছু বুঝতেই পারেননি। বগলের গ্ল্যাণ্ড-এ অস্বস্তিকর একটা ব্যথার অনুভূতি। হাত দিয়ে টিপে টিপে দেখেন, ব্যথাটা কোথায় ঠিক ধরতে পারেন না। কিছুদিনের মধ্যে সেটা কমে এলো, হয়ত বা সয়ে এলো। তারপর একদিকের বুকের নীচের নরম জায়গাটা কি রকম শক্ত-শক্ত লাগল একদিন। ব্যথা নেই, অথচ জায়গাটা একটু একটু করে শক্ত হচ্ছে। এদিকে জ্বর-জ্বর ভাব, মাথাটা ঘোরে, শরীরের ওজনও কমছে মনে হয়।

তখনো ডাক্তার দেখানো দরকার ভাবেননি বা শমীকে কিছুই বলেননি।

মাস চার-পাঁচ বাদে মনে হল, নরম জায়গাটা শুধু শক্ত হয়নি, লালচেও হয়েছে। সেই সঙ্গে মাথা ঘোরা বাড়ছে, সর্বদা কেমন দুর্বল মনে হয়। শেষে শমীকেই ডেকে প্রথম বললেন, দেখ্ দেখি কি হল, পাঁচ-ছ মাস ধরে এ জায়গাটায় কি একটা হয়েছে বুঝছি না।

মাসীর শরীর খারাপ হচ্ছে, মুখ ফ্যাকাশে ও সাদা হয়ে যাচ্ছে সেটা শমী আগেই লক্ষ্য করেছিল। সেটা যে শারীরিক অসুস্থতার কারণেও হতে পারে, ভাবেনি। শমী দেখল, কিন্তু কিছুই বুঝল না। তার ধারণা ফোড়া-টোড়া কিছু হচ্ছে। জায়গাটা ভাল নয়, সে জ্ঞান আছে। কিন্তু পাঁচ-ছ মাস ধরে এই অবস্থায় আছে শুনে অবাক। তাড়াতাড়ি এক লেডী ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল মাসীকে। সেই ডাক্তার কয়েকটা ইনজেক্শন দিল, ওষুধপত্র দিল। কিন্তু উপকার কিছুই হল না।

পরের মাসকতক মাসীর কথা শুনেই ব্যাপারটা ভুলে গেল। জিজ্ঞাসা করলে বলে, ভালোই আছে। তবু এক-একসময় মনে হয়, মাসী বড় রোগা হয়ে যাচ্ছে, আর অমন কাঁচা সোনার রঙ কাগজের মত সাদা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কিছু বললে মাসী কানে তোলে না, বলে কিছু ভাবতে হবে না। ওর দুর্ভাবনা দেখলে মাসী বেশ ভালো আছে দেখাতে চেষ্টা করে। শমীর ফুরসত কেবল বিকেলের দিকে। ভালোভাবে এম-এ পাস করার পর মেয়ে-কলেজে চাকরি পেয়েছে। সকালে তাড়াহুড়োর মধ্যে খেয়ে-দেয়ে কলেজে যায়, মাসী স্কুলে। সন্ধ্যার পর শমীকে আবার রীতিমত পড়াশুনা করতে হয়, মাসীর স্কুলের খাতা আর কলেজের মেয়েদের খাতাপত্রও দেখতে হয়। এর ওপর নিরুদ্দিষ্ট একজনের জন্য সংগোপন দুশ্চিন্তার ফলেও অনেক কিছু চোখ এড়ায়। যেটুকু অবকাশ পায়, গল্পগুজব, হাসিখুশিতে মাসীকে ফুর্তিকে রাখতে চেষ্টা করে সে। এম-এ পড়ার সময় থেকেই শমী তার সমবয়সী হয়ে বসেছে। মাসীকে বলতে পারে না এমন কথা নেই। কলেজের কোন্ ছোকরা প্রোফেসারের জ্বালায় অস্থির, আর কখন কি কাণ্ড করে সে—সেই গল্পও বাদ যায়নি। মাসী হেসে বলে, বাড়িতে ডাক না একদিন, কথা বলে দেখি।

শমী চোখ পাকায়, মুখের ওপর চটুল কিছু বলে বসে নিজেই হেসে গড়িয়ে মাসীর কোলে আগের দিনের মতই শুয়ে পড়ে। হাসিমুখেই ফস করে একদিন বলে বসেছিল, যতই চেষ্টা করো আমার হাত থেকে তোমার ছেলের নিস্তার নেই—সেই আট বছর বয়েস থেকে নাকানি-চোবানি খাওয়াচ্ছে, শোধ না নিয়ে ছাড়ব ভাবো ?

জ্যোতিরাণী একটা কথাও বলতে পারেননি, ওর গায়ে-পিঠে হাত বুলিয়েছেন

শুধু। আর একদিন বলেছিল, তোমার ছেলের দোষ নেই বাপু, আমি তার মাকে এভাবে কেড়ে নিলাম, সইবে কেন! এবারে দেখা পেলেই দিয়ে দেব।

এই দিনযাপনের মধ্যে ভিতরে ভিতরে মাসী যে কোনো শেষের ছায়া দেখছে, শমী কল্পনাও করেনি। খেয়াল হলে শরীর কেন এত খারাপ হচ্ছে সেই অভিযোগই করে শুধু। মাস দুই আগে এক সকালে মাসীকে বেরুতে দেখে তার মনে হল, বেশ কিছুদিন ধরে সপ্তাহের ওই একটা দিনই একই সময়ে মাসী কোথায় যেন বেরোয়। জিজ্ঞাসা করলে বলে—কাজ আছে। আর সেই দিনটাতে স্কুলও কামাই করে। ওদিকে পরদা-ঢাকা তাকে কিছু ওষুধপত্রও জমছে লক্ষ্য করল একদিন। কিসের ওষুধ ঠিক বুঝে উঠল না। পরের সপ্তাহে জিজ্ঞাসা করল, প্রত্যেক সপ্তাহের এই দিনটাতে কোথায় যাও বল তো, কোনো ডাক্তারের কাছে নাকি?

জ্যোতিরাণী ভয়ে ভয়ে মাথা নাড়লেন। তাই।

বেশ! শমী রেগে গেল, আর আমাকে কিছু বলোনি! আমি কি বাধা দেব?

জ্যোতিরাণী চুপ। জেরায় পড়তে হবে জানা কথাই। কি অসুখ, কোন্ ডাক্তার, কেমন ডাক্তার। জ্যোতিরাণী যতটা সম্ভব এড়াতে চেষ্টা করে জানালেন, বুকের ওই ব্যাপারটার জন্যেই একজন স্পেশ্যালিস্টের কাছে কিছুদিন ধরে যাতায়াত করেছেন। একেবারে সারছে না শমী এটুকুই জানে কেবল, কিন্তু সেদিন দেখে বেশ ঘাবড়ে গেল। আগের থেকে অনেক শক্ত হয়েছে, লাল হয়েছে। তক্ষুনি ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করার জন্য সেও ব্যস্ত হল। কিন্তু জ্যোতিরাণী আমল দিলেন না, বললেন, অত ভাবতে হবে না, চিকিৎসা তো হচ্ছেই, পরে দেখা যাবে।

পরের সপ্তাহে ইচ্ছে করেই জ্যোতিরাণী ওর পরে বেরুলেন। তারপরের সপ্তাহেও তাই।

কিন্তু গোপন করা গেল না শেষ পর্যন্ত। ধরা পড়লেনই।

শমীর দৃষ্টি সেই দিন থেকেই সজাগ ছিল। তার কেবলই মনে হয়েছে, বিশেষ কিছু না হলে গোপনে চিকিৎসা করার মানুষ নয় মাসী। আর মনে হল, শরীর কত খারাপ হয়েছে ঠিক নেই, অথচ জিজ্ঞাসা করলেই মাসী তার চোখে ধুলো দিতে চায়। শুধু তাই নয়, মাসী যখন নিজের মনে একলা থাকে, তখন যেন কোথায় কোন্ দূরে চলে যায়। আবার এক-একসময় কি এক দুর্বহ বেদনার সঙ্গে নিঃশব্দে যুঝতেও দেখে। হঠাৎ কি এক অজ্ঞাত ভয় ছেঁকে ধরতে লাগল শমীকে। মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করতে পারল না। যে রোগের বিভীষিকা তার মগজ কাটাছেঁড়া করে দিয়ে গেল, প্রাণপণে সেটা দূর করতে চেষ্টা করছে সে।

…এরপর সপ্তাহের ওই একটা দিনে কলেজ যাবার জন্য ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়েও

শমী যেতে পারল না। কেবলই মনে হল, বিষম কিছু একটা ঘটেছে যা ও জানতে পারছে না। আজও ডাক্তার দেখাবার দিন, অথচ মাসী বোধ হয় ওর ভয়েই বেরুলো না। খানিক ঘোরাঘুরি করে ফ্ল্যাটে ফিরে এলো আবার।

ঘর তালাবন্ধ।

এরই মধ্যে খেয়ে-দেয়ে স্কুলে চলে গেল? শমীর ব্যাগে দ্বিতীয় প্রস্থ চাবি। তালা খুলে ভিতরে ঢুকল। কি ভেবে পরদা-ঢাকা তাকের ওষুধপত্রগুলো নেড়েচেড়ে দেখল। পাশেই ছোট একটা টিনের হাতবাক্স। সেটা খুলতে দুই-একটা ভাঁজ-করা কাগজ চোখে পড়ল। তার একটা খুলেই শমী থরথর করে কেঁপে উঠল।

প্রেসক্রুপশন। শমী প্রেসক্রুপশন পড়েনি, সেটার মাথায় হাসপাতালের নাম দেখেই শরীরের রক্ত জল তার। প্রেসক্রুপশনও পড়তে পারা গেল না, চোখে অন্ধকার দেখছে।

ঘণ্টা দুই বাদে ক্লান্ত জ্যোতিরাণী দোতলায় এসে ফ্ল্যাটের দরজা খোলা দেখে অবাক। তারপর ঘরে ঢুকে নিশ্চিন্ত একটু, শমী ওপাশ ফিরে শুয়ে আছে, তার হাতে বই একটা। বইয়েতে কিছু একটা হাসির ব্যাপার আছে বোধ হয়, ওপাশ ফিরে শমী ফুলে ফুলে হাসছে মনে হল।

জিজ্ঞাসা করলেন, কি রে, এরই মধ্যে তোর কলেজ ছুটি হয়ে গেল?

জবাব পেলেন না, তেমনি কেঁপে কেঁপে উঠতে দেখলেন বারকয়েক। একটু নিশ্চিন্ত বোধ করলেন, তিনিই বা এত সকাল সকাল ফিরলেন কোথা থেকে সেই জেরায় নাও পড়তে হতে পারে। বললেন, হেসেই অস্থির হলি যে, কি বই ওটা?

বই ফেলে শমী এক ঝটকায় উঠে বসল। সেই মুহূর্তে জ্যোতিরাণী হতভম্ব।

শমী ফুলে ফুলে হাসছিল না, ফুলে ফুলে কাঁদছিল। জ্যোতিরাণীর সমস্ত মুখ বিবর্ণ পাংশু। আস্তে আস্তে পাশে বসলেন। চোখে জল নিয়েই শমী হঠাৎ তাঁর কোলে মাথা খুঁড়তে লাগল, সরোষে বলে উঠল, কেন তুমি আমাকে এতদিন কিছু বলোনি? কেন আমাকে লুকিয়েছ? কেন? কেন?

জ্যোতিরাণী তার মাথায় একখানা হাত রেখে নিস্পন্দের মত বসে।

খানিক বাদে কান্না থামিয়ে শমী উঠল। হঠাৎ তার মনে হল ক্যান্সার হাসপাতালে অন্য চিকিৎসাও তো হতে পারে। যা ভাবছে তা না-ও হতে পারে। আশায় উদ্‌গ্রীব। আঁচলে চোখ মুছে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করল, বলো কি হয়েছে, ঠিক ঠিক বলো শিগগীর।

খানিক চুপ করে থেকে জ্যোতিরাণী বললেন, কি হয়েছে বুঝতেই তো

পেরেছিস, কিন্তু জানলি কি করে?

প্রেসক্রিপশনে হাসপাতালের নাম দেখে। ডাক্তার বলেছে ওই হয়েছে?

জ্যোতিরাণী আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন।

আবার একপ্রস্থ কান্নার বেগ সংবরণ করল শমী। শক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, ডাক্তার আশা নেই বলেছে?

জ্যোতিরাণী এবারে হাসতে চেষ্টা করলেন, আশা না থাকলে যাচ্ছি কেন? চুপচাপ ভাবলেন কি একটু। তারপর ঠাণ্ডা মুখে বললেন, কালীদা এলে তাকে বা আর কাউকে কিছু বলবি না।

বলব বলব, একশবার বলব। সকলকে ঢাক পিটিয়ে বলব। হরিদ্বারে গিয়ে যে যোগী হয়ে বসে আছে, ছোট দাদুর কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে তাকেও লিখে পাঠাব। তুমি এই শত্রুতা করলে, আমিই বা ছাড়ব কেন?

গায়ে-পিঠে হাত বুলিয়ে জ্যোতিরাণী আবার একটু সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলেন তাকে। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, তোর কাছ থেকে আমি হাত পেতে অনেক নিচ্ছি, নেবও।···শুধু তুই ছাড়া আর কেউ কিছু করতে এলে অসুবিধেয় পড়ব···বললে আমার ক্ষতি করবি।

শোক আর ত্রাস ভুলে শমী এর পর চিকিৎসার সুবন্দোবস্তের জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে। নিজে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। আড়ালে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছে। না, মাসীকে ও যেতে দেবে না, মাসীকে ভালো করে তুলতে হবে—মাসী গেলে ওর আর কি থাকবে? এই শেষ ঘনাতে পারে না, পারে না—মন্ত্রের মত এই কথা অজস্রবার নিজেকে শুনিয়েছে। শুনিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছে।

কালী জেঠু এসেছে। খবর এনেছে।···ছোট দাদু হরিদ্বার থেকে ঘুরে এলো।··· দেখা হয়েছিল। আনন্দবাবা না কোন্ এক সাধুর আশ্রমে আছে। ভালো আছে। শমীর চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করছিল, বলতে ইচ্ছে করছিল, ভালো থাকুক, খুব ভালো থাকুক—শুধু মাসীর খবরটা জেঠু পৌঁছে দিক তার কাছে—তার পরেও ভালো থাকুক।

বলতে পারেনি। মাসীর দিকে চোখ পড়তে তার চোখে নিষেধ দেখেছে। শমী টুঁ শব্দও করেনি। মাসীকে সে ভয়ই করে। এত ধৈর্য এত সহিষ্ণুতা বুঝি কোনো মানুষের হয় না। মাসী বলেছিল, কাউকে কিছু বললে ক্ষতি হবে। মাসীর মত এত নরম মানুষ আর দেখেনি শমী, আবার এত শক্ত মানুষও দেখেনি।

একে একে তিনটে সপ্তাহ কাটল। এর মধ্যে জেঠু আর আসেনি। সপ্তাহে একদিন অন্তত আসেই। এদিকে এই তিন সপ্তাহ ধরে মাসীও নীরবে কি বুঝি চিন্তা করে চলেছে। ছুটির দিনে তাকে জেঠুর প্রত্যাশায় থাকতে দেখেছে। সেদিন বলল, কালীদাকে একবার ফোন করে আয় তো, কেন আসছেন না—

শমীর মনে হল মাসীর কিছু একটা মতলব আছে, নয় তো এভাবে তাগিদ দিত না। তক্ষুনি বেরুলো ফোন করতে। ফিরল শুকনো পাংশু মুখে।

কি হল ?

শমী নিরুত্তর খানিক। তারপর আস্তে আস্তে বলল, ও-বাড়িতে মেসোমশাইয়ের একটা বড় রকমের ফাঁড়া গেল। স্ট্রোক হয়েছিল···সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস, জেঠু বলল, এখন একটু ভালো আছেন, তবে উঠে বসতেও পারেন না।

মাসীর দিকে তীক্ষ্ণ চোখ রেখেছে শমী। এই স্তব্ধতাও স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক ঠাওর করে উঠতে পারছে না। ও নিজেই বেশি অস্বস্তি বোধ করছে।

কবে হয়েছে ?

শমী জানালো, জেঠু এখান থেকে যাবার পরদিনই, উনিশ-কুড়ি দিন হল।

স্কুল না থাকলে মাসী বাড়ির বার হয় না বড় আজকাল। স্কুলও যে আর বেশিদিন করা চলবে না শমী অনুভব করতে পারে। কিন্তু সেই দিনই বিকেলের দিকে মাসী ওকে বলল, বেরুব একটু, তৈরি হয়ে নে।

শমী ঠিকই সন্দেহ করেছিল। ট্যাক্সি ত্রিকোণ রাস্তার বড় বাড়ির সিঁড়ির সামনে দাঁড়াল।

জ্যোতিরাণী নামলেন। পিছনে শমী।

সামনে সেই সরু বারান্দা। সামনে পাশাপাশি সেই দুটো বসার ঘর। আর তার পাশ দিয়ে অন্দরের পথ, দোতলার সিঁড়ি।

অনেকখানি শক্তি সংগ্রহ করে জ্যোতিরাণী এ পর্যন্ত আসতে পেরেছেন। সেই ধকলেই বোধ হয় এত অবশ লাগছে। পায়ে পায়ে এগোলেন।

সামনে মেঘনা। জ্যোতিরাণী দাঁড়ালেন। মেঘনার মুখে রাজ্যের বিস্ময়। কয়েক মুহূর্ত হাঁ করে চেয়ে থেকে হঠাৎ গা-ঝাড়া দিয়ে আর একদিকে ছুটে চলে গেল সে। ওধার থেকে ভোলা আর শামুর মুখও চকিতের জন্য দেখা গেল।

জ্যোতিরাণী সিঁড়ি ধরে দোতলায় উঠলেন। পিছনে শমী আছে কি নেই, মনে নেই।···সেই ঘোরানো বারান্দা। জ্যোতিরাণী দাঁড়িয়ে গেলেন।

বারান্দার মাঝামাঝি গৌরবিমল আর কালীনাথ দাঁড়িয়ে। তারাও নির্বাক কয়েক মুহূর্ত। কালীনাথই এগিয়ে এলেন তাড়াতাড়ি। কিন্তু কি যে বলবেন

ভেবে পেলেন না।

অনুচ্চ স্বরে জ্যোতিরাণী জিজ্ঞাসা করলেন, আমি ও-ঘরে গেলে ক্ষতি হবে?

সর্ব ব্যাপারে হাসতে পারেন, হাল্‌কা কথা বলতে পারেন যে মানুষ সেই কালীনাথও থমকালেন একটু। ক্ষতির সম্ভাবনা ভেবে নয়, এই পরিস্থিতির দরুন। সামলে নিয়ে বললেন, না, ক্ষতি কি হবে, ভালই আছে এখন···তবে বাঁ দিকটা ধরে গেছে, এসো।

রোগীর পক্ষে উত্তেজনা ভালো নয় ঠিকই, তবু না ডেকে পারলেন না। জ্যোতিরাণীর দিকে চেয়ে তাঁর মনে হল এই একজন ঘরে গেলে আর যাই হোক ক্ষতি কিছুতে হতে পারে না। জ্যোতিরাণী পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন। সামনে গৌরবিমল। জ্যোতিরাণী পা স্পর্শ করলেন না, মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন। গৌরবিমলের মুখেও রাগ বা ক্ষোভের চিহ্ন নেই আর, তিনিও বিভ্রান্ত শুধু।

জ্যোতিরাণী দরজার দিকে এগোলেন।

শিবেশ্বর ঠিক দেখছেন কিনা জানেন না, জেগে আছেন কি ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছেন তাও বুঝতে পারছেন না যেন। চেয়ে আছেন ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে, চেয়েই আছেন। তাঁর অবশ অঙ্গের ভিতর দিয়ে একটা অনুভূতি ওপরের দিকে উঠতে উঠতে আবার হারিয়ে যাচ্ছে। বাঁ দিকটায় সাড় নেই, ডান হাতটা তুলে আস্তে একবার নিজের চোখ আর মুখের ওপর বুলিয়ে নিলেন। তারপর হঠাৎ যেন সচেতন হলেন, স্বপ্ন নয়, তিনি জেগে আছেন, যাকে দেখছেন ঠিকই দেখছেন। উদ্গত উত্তেজনায় মুখের চেহারা বদলাতে লাগল।

অস্ফুট মৃদুস্বরে জ্যোতিরাণী জিজ্ঞাসা করলেন, বসব?

এই বিকল শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কোথায় যে এত চাপা আবেগ জমেছিল শিবেশ্বর জানেন না। জবাব দিলেন না, দিতে পারলেন না। মাথার মধ্যে কি একটা হচ্ছে, কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে। অপলক দু চোখের দৃষ্টি ক্ষণে ক্ষণে আবছা হয়ে আসছে।

তেমনি মৃদুস্বরে জ্যোতিরাণী বললেন, তোমার অসুবিধে হচ্ছে, আমি যাই তাহলে···।

না, শিবেশ্বর তাও চান না। শেষ চেষ্টায় নিজেকে সংবরণ করতে পারলেন বুঝি। চোখের ইশারায় সামনের চেয়ারটা দেখালেন।

জ্যোতিরাণী বসলেন। তারপর শান্ত মনোযোগে অর্ধপঙ্গু মানুষটার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিলেন একবার। এত কাছাকাছি প্রায় পনের বছর পরে দেখা।

শরীর ভেঙেছে, মাথার চুল অর্ধেক সাদা, দুদিকের চোয়াল উঁচিয়ে আছে, মুখের একটা দিক বেঁকে গেছে, সর্বাঙ্গে বার্ধক্যের অপ্রসন্ন ভ্রূকুটি। চাউনিটাই শুধু নিষ্প্রভ নয় অত।

জ্যোতিরাণী বলেননি, আপনা থেকেই তাঁর মুখ দিয়ে কথা কটা বেরুলো যেন।—শরীরটা এভাবে নষ্ট করলে···

বিড়বিড় করে শিবেশ্বর বললেন, তোমারও তো ভালো দেখছি না কিছু।

কথার স্বর টানা, জড়ানো, প্রায় অস্পষ্ট বিকৃত। এই রোগে এ-রকমই হয়। উদ্‌গত অনুভূতিগুলো এবারে চোখের দিকে ভিড় করতে চাইছে শিবেশ্বরের, কিন্তু তা যদি করে, তার আগে আবার স্ট্রোক হোক। তেমনি টানা বিকৃত স্বরে বললেন, কেন এলে···।

একটু চুপ করে থেকে জ্যোতিরাণী আস্তে আস্তে বললেন, এ-রকম হয়েছে আগে জানতুম না···আজ খবর পেয়ে মনে হল এ কদিন তুমি অনেকবার আমাকে ডেকেছ।

অন্যদিকে মুখ ফেরাতে চেষ্টা করলেন শিবেশ্বর। কিন্তু বেশিক্ষণ চোখ ফিরিয়ে থাকতে পারলেন না। তার ভিতর থেকে কে বলছে, এই বোধ হয় শেষ দেখা, বোধ হয় শেষ কথা। তাই থেমে থেমে আবার বলে গেলেন, এ বাড়ি থেকে চলে যাবার পর তুমি এত বড় হয়ে উঠেছিলে যে আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। তাই আইনের দাবি ছেড়ে দিয়ে দেখার ঝোঁক চেপেছিল তুমি কি করো—একটুও নীচে নামো কিনা।···বিভাসের ঘরে গেছ শুনে তোমাকে ঘৃণা করতে পারার মত আনন্দ হয়েছিল আমার। কিন্তু ও মরে যাবার পর কালীদা খটকা বাধালো আবার। সবসময় গোলমেলে কথা বলে কালীদা···বলল, সে আগেই জানত জ্যোতির এত বড় দয়া বিভাস সহ্য করতে পারবে না, ও নিজের সর্বনাশ নিজেই ডেকে আনল। আমি বিশ্বাস করতে চাইনি, তোমাকে বড় দেখতে চাইনি, কালীদার ওপর রাগ হয়েছিল···কিন্তু সব আবার গণ্ডগোল হয়ে গেল দিনের পর দিন হাসপাতালে সিতুর বিছানার পাশে তোমাকে দেখে, আর থানায় সেই একদিন তোমাকে আর শমীকে দেখে। তোমাকে সেভাবে আর ঘৃণা করতে পারছিলাম না, ছোট করে দেখতে পারছিলাম না বলেই নিজে আরো বেশি জ্বলে মরছিলাম। কিন্তু আজ কেন এলে বলো···আমাকেও দয়া করতে চাও?

এত কথা বলে শিবেশ্বর হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। কপালে আবার ঘাম দেখা দিয়েছে। শেষের কথা কটা বিকৃত আর্তনাদের মত শুনিয়েছে। সম্ভব হলে জ্যোতিরাণী উঠে কাছে এসে বসতেন, সম্ভব হলে কপালের ঘাম মুছিয়ে দিতেন। সম্ভব নয়।

কিন্তু একসঙ্গে এতগুলো কথা আর এমন কথা জ্যোতিরাণী কি কোনদিন শুনেছেন? এক নিষ্প্রাণ স্তব্ধতার মধ্যে বাস করছেন তিনি এখন, ভিতরে ভিতরে শেষের পথে পা ফেলার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। তবু বুকের তলায় এ-রকম কাঁটা-ছেঁড়া হয়ে যাচ্ছে কেন?

যাক্। সহ্য করতে পারবেন। কিন্তু আর কারো বুকের তলায় কিছু হোক্, এ তিনি চান না। চুপচাপ খানিক মুখের দিকে চেয়ে থেকে তেমনি ধীর মৃদু স্বরে জবাব দিলেন, না, আমি কিছু চাইতে এসেছি।...আমি সত্যি খুব তুচ্ছ, কত তুচ্ছ প্রত্যেক দিনই টের পাচ্ছি। তুমি মন খারাপ কোরো না, শরীর নষ্ট কোরো না ..ভালো হয়ে ওঠো।...আর, তুমি আপত্তি না করলে আমি একবার সিতুর সঙ্গে দেখা করতে যাব।...সে খবর পেয়েছে?

যাতনা চাপার মত করে শিবেশ্বর জবাব দিলেন, জানি না, খবর পেলেও আসবে না।

তবু আমি যাব একবার। তোমার জন্যে আসা দরকার, আর ওই একটা মেয়ের জন্যেও। ওকে ফেরাতে পারলে আমার আর কিছু চাওয়ার থাকবে না। আমরা না পারি, শমী ওকে ফেরাবে...তোমার আপত্তি হবে না তো?

শিবেশ্বরের চোখে হঠাৎ বুঝি আগ্রহ দেখা গেল একটু। বললেন, শমীকে একদিন একটু পাঠিয়ে দেবে?

জ্যোতিরাণী আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন। অপলক নেত্রে শেষবারের মতই বুঝি সামনের অর্ধবিকৃত মুখখানা দেখে নিলেন তিনি। তারপর আস্তে আস্তে দোরগোড়ায় এসে পর্দা সরিয়ে দাঁড়ালেন। বারান্দার রেলিং-এর কাছে তিনজন দাঁড়িয়ে, কালীনাথ, গৌরবিমল আর শমী। ইশারায় জ্যোতিরাণী শমীকে ডাকলেন। শমী তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসতে খুব মৃদু সুরে বললেন, ভিতরে গিয়ে বোস একটু।

নিজে ঘর ছেড়ে বারান্দায় এলেন জ্যোতিরাণী। তারপর পায়ে পায়ে বারান্দার ওই রেলিংয়ের দিকেই এগোলেন। গৌরবিমলের উদ্দেশে অনুচ্চ স্পষ্ট সুরে বললেন, আমি একবার হরিদ্বারে যেতে চাই...আপনি দয়া করে সেখানকার গুরুদেবকে একটু লিখে দেখবেন, অনুমতি দেন কিনা?

গৌরবিমল মাথা নাড়লেন শুধু, লিখবেন।

...তিনি কি সিতুর সম্পর্কে সব জানেন?

গৌরবিমল আবারও মাথা নাড়লেন। জানেন।

দুই-এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে জ্যোতিরাণী কালীনাথের দিকে তাকালেন।--আমি নীচে অপেক্ষা করছি, শমী বেরুলে পাঠিয়ে দেবেন।

কালীনাথ বা গৌরবিমল কেউ বলতে পারলেন না, নীচে কেন, এখানেই বসতে পারে, এখানেই অপেক্ষা করতে পারে। বলার কথা ভাবার আগেই জ্যোতিরাণী ধীর শান্ত পায়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেছেন।

কালীনাথ পিছন থেকে দেখছেন। গৌরবিমল দেখছেন। এই জ্যোতিরাণীর স্বাস্থ্য আগের তুলনায় ভেঙেছে, দেহ শীর্ণ হয়েছে, গায়ের রং এত সাদাটে হয়ে গেছে যে মুখের আর গলার নীল শিরা ফুটে উঠেছে। কিন্তু সব সত্ত্বেও কিছু যেন দেখলেন তাঁরা, যা আগে কখনো দেখেননি। একদিনের এ-বাড়ির বউ জ্যোতিরাণী আজ অনেক খুইয়েছে অনেক হারিয়েছে, তবু এই জ্যোতিরাণী বুঝি এমন কিছু পেয়েছে যা ওই অনেক খোয়ানো অনেক হারানোকেও ছাপিয়ে উঠেছে।

কি সেটা দুজনের কেউ ঠাওর করে উঠতে পারলেন না।

॥ পঁয়তাল্লিশ ॥

শমী বেঁকে বসেছিল। মাসীকে নিয়ে হরিদ্বারে রওনা হতে চায়নি। তার কেবলই মনে হয়েছে মাসীর এত তাড়া তার জন্যে। তার সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হবার জন্যে। কিন্তু বাপের এত বড় অসুখের খবর পেয়েও যে ছেলে এলো না, তারা গেলেই সে ফিরবে মনে হয় না। সে চেষ্টা একমাত্র ছোট দাদু করতে পারতেন। ও-বাড়ির লোকেরা এ ব্যাপারে নিশ্চেষ্ট দেখে শমী মনে মনে ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

মাসী ওকে নিয়ে হরিদ্বারে যেতে চায় শোনামাত্র মেজাজ বিগড়েছে।—এই শরীর নিয়ে তুমি যেতে পাবে না।

জ্যোতিরাণী জিজ্ঞাসা করেছেন, তুই কলেজ থেকে কবে ছুটি নিতে পারবি বল্।

ছুটি নিতে পারব না, ছুটি পাওয়া যাবে না।

ছুটি না নিলে তো আমায় একাই যেতে হবে রে।

এইখানেই মাসীকে ভয় শমীর। জানে সঙ্কল্প যদি করে থাকে, তার নড়চড় হবে না। তবু বাধা দিতে চেষ্টা করেছে, তুমি যাবে কেন?

যাওয়া দরকার। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে।

কেন, ও-বাড়ির ওঁরা কেউ গেলে পারতেন না?

ওঁদের যাওয়ার সঙ্গে আমার যাওয়ার অনেক তফাত। পারিস তো দিন সাতেকের ছুটি নে।

অনেক তফাত শমীও জানে। কিন্তু তার মন সায় দিচ্ছে না। ভাবনা মাসীকে

নিয়ে। একে শরীরের এই অবস্থা, গিয়ে যদি আরো দুঃখ পায়, আঘাত পায়।... ওদিকের রাগ যে কার ওপর সব থেকে বেশি, শমী ভালই জানে। দুশ্চিন্তা গোপন করতে পারেনি, মাসীকে বলেওছে কথাটা। কিন্তু মাসীর জবাব শুনে মুখে কথা সরেনি। মাসী বলেছে, ও আমার জন্যেই অপেক্ষা করছে, এখনো না গেলে পরে আরো বেশি দুঃখ পাব।

কলেজ থেকে শমী ছুটি না নিয়ে পারেনি। রওনা হবার পরেও ভিতরটা দুশ্চিন্তায় ছেয়ে ছিল। ডাক্তারের মুখে শুনেছিল, এ রোগের যন্ত্রণা শুরু হলে সহ্য করা শক্ত হয়। শমীর বিশ্বাস যন্ত্রণা শুরু হয়েইছে। আর মাসী তা মুখ বুজে সহ্য করছে। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে এক-একদিন ঘরে আর ভিতরের বারান্দায় পায়চারি করতে দেখে তাকে। পাছে ও টের পায়, সেজন্য ঘরের আলোটা পর্যন্ত জ্বালে না। জিজ্ঞাসা করলেও, খুব একটা যন্ত্রণা হচ্ছে বলে না। এজন্যেই শমীর আরো বেশি ভয়।...তবে কি সময় এগিয়ে এলো? এইজন্যেই ছেলেকে ফেরাবার তাড়া? এই অসুখ জানবার পর থেকে শমীর মুখের হাসি গেছে, আনন্দ গেছে। সর্বক্ষণের ত্রাস। মাসী নেই ভাবতে চেষ্টা করলেও দম বন্ধ হতে চায়।

হরিদ্বারে পা দিয়েই ভালো লাগল। প্রকাশ পাক আর নাই পাক, কটা বছরের প্রত্যাশার জ্বালা-পোড়া ছিল, রোমাঞ্চও ছিল। স্টেশনে আশ্রমের লোক এসে পরম সমাদরে নিয়ে গেল তাদের। ছোট দাদু আগেই খবর দিয়ে রেখেছেন বোঝা গেল। সব থেকে ভালো লাগল এখানকার প্রধান যিনি, তাঁকে। আনন্দ-বাবাকে। হাসি-খুশি, প্রিয়জনের মত ব্যবহার। মাসীর পর শমী প্রণাম করে উঠতে কাঁধে হাত দিয়ে কাছে বসালেন। যেন কতকালের চেনা। মাসীকে দেখে বললেন, খাসা মা দেখি আমার, অ্যাঁ? পাগলাটা এই মাকে ছেড়ে জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে! শমীর দিকে ফিরেছেন, আর এই বুঝি শমী? এও তো খাসা সুলক্ষণা মেয়ে! কেমন যোগীপুরুষ দেখলি বেটি, দেখেই ধরেছি। তার পরেই অট্টহাসি, আঙুল তুলে অপরাপরদের দেখিয়ে মন্তব্য করলেন, ভণ্ডর কথা শুনে ওরা সব মনে মনে হাসছে—এঃ, গৌরের চিঠির খবরটা কাউকে না বললেই ভালো হত দেখছি।

সব ভুলে শমী তাঁকেই দেখছিল আর হাসছিল মুখ টিপে। সাধু-সন্ন্যাসী সম্পর্কে মনে মনে কি রকম একটা ভয় ছিল, সেটা এখানে আসামাত্র গেল। শিশুর হাসি সুন্দর। বৃদ্ধ শিশুর মত হাসতে পারলেও কম সুন্দর নয়। হঠাৎ তার আশা হল, এই লোকের দয়ায় মাসীর অসুখটা সেরে যায় না!

সকলকে বিদায় দিয়ে, এমন কি শমীকেও তাদের নির্দিষ্ট ঘরে পাঠিয়ে মাসী

সঙ্গে খানিকক্ষণ কি কথা বললেন, জানে না। পরে মাসীর মুখ দেখেও কিছু বোঝা গেল না। এখানে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরো স্থির আরো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে যেন।

শমী উদ্‌গ্রীব সারাক্ষণ। নতুন জায়গায় আসার আনন্দ বা রোমাঞ্চও অনুভব করছিল না আর। যে তাগিদে আসা, তার সঙ্গে দেখা হয়নি এখনো।...তারা যে এসেছে না জানার কথা নয়। জানে বলেই ঘর থেকে বেরোয়নি।

দেখা হল দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর। একজন লোক এসে খবর দিল, আনন্দবাবা সাত্যকি ভাইয়ের ঘরে যেতে বলেছেন তাদের।

শমীর বুকের ভিতরটা ধড়াস করে উঠল কেমন। কিন্তু মাসী তেমনি নির্বিকার। বললেন, চল্—

সেই লোকটিই ঘর দেখিয়ে দিল। বিচ্ছিন্ন ঘরগুলোর একেবারে শেষের ঘরটা। কলের মূর্তির মতই শমী মাসীর পাশেপাশে সেদিকে চলল।

ছোট তক্‌তকে ঘর। এক কোণে পরিচ্ছন্ন ভূমিশয্যা। শয্যা বলতে পাতলা কম্বলের ওপর চাদর পাতা। বালিশের মত পাতলা একটা তুলোর বস্তুও আছে। এ ঘরে সিতু একাই থাকে। মাঝে ছোট দাদু এসে দিনকতক তার সঙ্গে ছিল। কম্বলের আসনে বসে, সামনের ছোট জলচৌকিতে মোটা ইংরেজি বই একটা। সিতু পড়ছিল।

না, একবর্ণও পড়ছিল না। বইয়ের দিকে চেয়েছিল শুধু। দোরগোড়ায় কারা এসে দাঁড়ালো টের পেয়েছে। টের সকালেই পেয়েছে। গত রাতে আনন্দবাবা জানিয়েছেন কারা আসবে। শোনামাত্র সিতু হৃষিকেশ বা লছমনঝোলার আশ্রমে চলে যেতে চেয়েছিল। অনুমতি মেলেনি।

রাতে ঘুমোয়নি। সকাল থেকেও নিজের সঙ্গে যোঝার বিরাম নেই। গত প্রায় চার বছরের বিস্মৃতির নিবিষ্টতা ঘুচতে চলেছে। সংযমের বাঁধ বারবার ভাঙার উপক্রম হয়েছে। এক অন্ধ আদিম মানুষ বারবার জেগে উঠতে চেয়েছে তার মধ্যে। আর প্রাণপণে সে তার কবল থেকে নিজেকে উদ্ধার করে চলেছে।

এখনো পারেনি উদ্ধার করতে। দোরগোড়ায় ওই দুজন এসে দাঁড়ানোমাত্র পুরনো ক্ষতর মুখ দিয়ে বুঝি রক্ত ঝরতে শুরু করল। জ্বালা—বিষম জ্বালা। সেই জ্বালা সহ্য করার চেষ্টায় সিতুর পাষাণমূর্তি। মুখ তুলল না, তাকালো না, ডাকল না। দু চোখ বইয়ের পাতায় আটকে আছে।

শমী আধাআধি ঘরে এসে দাঁড়ালো। হঠাৎ ভারি ভালো লাগছে তার। সঙ্কোচ আছে, শঙ্কা উবে গেছে। ঘর দেখছে, ঘরের মানুষকে দেখছে। অদ্ভুত

লাগছে। কোটিপতির ছেলের এই ভূমিশয্যা, ভূমিআসন। মাথার চুল ছোট করে ছাটা। পরনে ধপধপে সাদা থান, গায়ে পরিষ্কার গেঞ্জির ওপর তেমনি সাদা চাদর জড়ানো। কৃচ্ছ্র-সাধনের উগ্রতা নেই, আবার আরামও দূরে সরে আছে।

নিষ্পলক চেয়ে আছেন জ্যোতিরাণীও। শুষ্কতার বুকে প্রথম বন্যার মত একটা অনুভূতি কিছুতে আর প্রতিরোধ করতে পারছেন না তিনি। ভিতরটা থর-থর করে কাঁপছে তাঁর। ভয়ে নয়, শঙ্কায় নয়। কেন কাঁপছে তাও জানেন না। থেকে থেকে এক পাগল শিল্পীর আঁকা একখানা ছবি চোখে ভাসছে তাঁর। সেই ছবি আজও প্রভুজীধামে টাঙানো আছে। ওই ছবির সঙ্গে আজ এই মুখের বড় বেশি মিল দেখছেন তিনি। দেখছেন আর কাঁপছেন।

চেয়েই আছেন। নিজের অগোচরে ভিতরে এসে দাঁড়িয়েছেন।

সিতু উঠল। একপাশে দুটো আসন পেতে দিয়ে আবার বসল। মুখ তুলে একবারও তাকায়নি। দু চোখ বইয়ের দিকে।

বোসো।

জ্যোতিরাণী আত্মস্থ হলেন একটু। বসলেন। শমী আর একটু এগিয়ে এলো শুধু, দাঁড়িয়েই থাকল।

অস্ফুট মৃদু স্বরে জ্যোতিরাণী জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন আছিস?

ভালো। দৃষ্টি বই থেকে সরল না।—তুমি কেমন আছ?

জ্যোতিরাণী চট করে জবাব দিতে পারলেন না। বিহ্বল দু-চোখ ওই মুখখানা বেষ্টন করে আছে। আস্তে আস্তে বললেন, কেমন আছি একবার দেখ্ না চেয়ে।

সিতু মুখ তুলল না, তাকাল না। উদ্‌গ্রীব মুখে শমী দাঁড়িয়ে। একালের এম-এ পাস মেয়ে, কলেজে পড়ায়, কিন্তু ভিতর থেকে একটা কান্না ঠেলে উঠছে কেন জানে না।

খানিক বাদে বইয়ের ওপর চোখ রেখে তেমনি শান্ত গম্ভীর স্বরে সিতু জিজ্ঞাসা করল, তোমরা এখানে কেন এসেছ?

জ্যোতিরাণীর মুখ সাদা হচ্ছে আবার। তেমনি মৃদু স্বরে বললেন, তোকে নিয়ে যাবার জন্যে।

কোথায় নিয়ে যাবে···তুমিই বা কে?

শমীর বুকে একটা আঘাত এসে লাগল যেন। জ্যোতিরাণী আরো স্থির, কিন্তু মুখ আরো ফ্যাকাশে। বললেন, কেউ না হলে বসতে বললি কেন?

এখানকার মালিকের হুকুমে।

কয়েক নিমেষের ব্যথাতুর নীরবতা, জ্যোতিরাণী তার থেকে টেনে তুললেন

যেন নিজেকে। বললেন, আমি তোর কেউ হতে চাইব না।··কলকাতায় একজন অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন, প্রতি মুহূর্তে তোকে আশা করছেন।

ভালো করে চিকিৎসা করাবার জন্যে ছোট দাদুকে লিখেছি।

এর বেশি আর কিছু করার নেই তোর?

না।

কিন্তু এখানকার বাবাও বলেছেন তোর যাওয়া উচিত। তাছাড়া শমী কি দোষ করেছে, ওর কি হবে?

ঈষৎ ঝাঁঝালো স্বরে শমী বাধা দিয়ে উঠল, আঃ মাসীমা! আমার জন্যে তোমাকে কারু কাছে ভিক্ষে করতে হবে না।

আস্তে আস্তে মুখ তুলে সিতু তার দিকে তাকালো। শুধু শমীর দিকে। বলল, দাঁড়িয়ে কেন, বোসো।

শমী বসল না, গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়েই রইল। সিতুর খরখরে দৃষ্টি আবার বইয়ের পাতায় নেমে এলো। একটু থেমে আগের প্রশ্নের ঠাণ্ডা জবাব দিল, আমি কারো দোষ-গুণের বিচারে বসিনি, শমীর কি হবে তা জানি না। এই দিনে কেউ কারো পথ আগলে বসে থাকে না, থাকতে পারে না—এই শিক্ষা ও এখনো পায়নি কেন তা ভাবারও সময় পাইনি।

শমীর মুখ লাল হতে থাকল আস্তে আস্তে। ঘর ছেড়ে সবেগে প্রস্থান করার ইচ্ছে, কিন্তু পা দুটো পাথরের মত আটকে আছে মেঝের সঙ্গে। এই অপমানের সবটুকুই মাসীর উদ্দেশে নয়। ওই ঠাণ্ডা মুখেও মেয়েদের প্রতি ঘৃণা আর আক্রোশ পুঞ্জীভূত দেখছে শমী।

ঠিকই দেখছে। সিতুর এত আয়াসে গড়া সংযমের বাঁধ ভাঙছে একটু একটু করে। মৌন স্তব্ধতায় ঘরের বাতাস ভারী হয়ে উঠছে। বইয়ের থেকে চোখ ফেরায়নি, নিশ্চল গম্ভীর। ভিতরে ভিতরে আরো দূরে সরে যেতে চেষ্টা করছে, গলার স্বরও তাই আরো ধীর, স্থির। খানিকক্ষণের স্তব্ধতা ভেদ করে সেই কণ্ঠস্বর কানে এলো, আমার দাদুকে মনে আছে তোমার, না ভুলেছ?

প্রশ্ন জ্যোতিরাণীর উদ্দেশে। অস্ফুট জবাব দিলেন, ভুলব কেন···

ভোলার কথা। ভুললেও আমি মনে করিয়ে দিতে পারি। মুখ না তুলে সিতু তেমনি নির্মম গাম্ভীর্যে কেটে কেটে বলে গেল, শুনেছি দাদুর বাবাও অত্যাচারী ছিল, আর দাদুর জন্মের আগে তার মা বিধবা হয়েছিল। কিন্তু তার আগেও দাদুর মা রুখে দাঁড়িয়েছিল, রুখে দাঁড়িয়ে দাদুর বাবার পাপই দূর করতে চেয়েছিল। যা চেয়েছিল তা পেয়েছিল। ভিটে ছেড়ে চলে যায়নি। বিধবা হবার পরেও তার

রূপ ছিল, আনন্দের সময় ছিল, টাকা ছিল।···সব থাকা সত্ত্বেও দাতুর মা শুধু দাতুকে মানুষ করার সাধনা করে গেছল। দাতু তার সেই মায়ের আদর্শ আর স্মৃতি বুকে নিয়ে চোখ বুজেছে। কিন্তু তুমি আমার জন্যে কি রাখলে ?

গম্ভীর যাতনাতপ্ত দু চোখ এই প্রথম জ্যোতিরাণীর মুখের ওপর বিদ্ধ হল। অনেক অনেক দিনের অসহ্য দহনে দৃষ্টি আচ্ছন্ন, নইলে এই মূর্তি দেখে সিতুর আঁতকে ওঠার কথা। আগের চোখ নিয়েই তাকিয়েছে, আগের চোখ নিয়েই দেখছে। তেমনি চেয়ে থেকেই শেষ মর্মান্তিক আঘাত করে বসল। বলল, আমার বাবা এখনো বেঁচে, আর, আমার মা বিধবা, বড় চমৎকার যুগে বাস করছি! আজ তুমি আমাকে কোথায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এত পথ ছুটে এসেছ ?

সিতুদা! শমীর অস্ফুট আর্তনাদ।

সিতুর জ্বালা-ধরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটা আস্তে আস্তে সামনের খোলা বইয়ের ওপর ফিরে এলো আবার। জ্যোতিরাণী পাথর। শেষ রক্তবিন্দুও বুঝি সরে গেছে মুখ থেকে, ভয়াবহ রকমের সাদাটে নিস্পন্দ নিষ্প্রাণ মূর্তি। দুই ঠোঁট নড়ল একটু, অস্ফুট স্বরে বলতে চেষ্টা করলেন, আমি চলে যাচ্ছি···

তোমরা আনন্দবাবার অতিথি, তাঁকে বলে যাও।

সিতুর মুখের ওপর একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে শমী তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে মাসীকে টেনে তুলল। তাঁরই ওপর ঝাঁজিয়ে উঠল, ছেলের কাছে আসার সাধ মিটেছে তো—চলো এবার। তারপরেই মনে হল, ধরে নিয়ে গিয়ে এক্ষুনি বিছানায় শুইয়ে দেওয়া দরকার।

ধরে বাইরে নিয়ে এলো। দূরের উঠোনে দাঁড়িয়ে আনন্দবাবা তামাক খাচ্ছেন আর জনাকয়েক ভক্তর সঙ্গে কথা কইছেন। জ্যোতিরাণীকে এভাবে ধরে নিয়ে আসতে দেখে হুঁকোটা একজনের হাতে দিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন।—কি হল, মায়ের শরীর খারাপ নাকি ?

শমীর হাত থেকে জ্যোতিরাণী নিজেকে ছাড়িয়ে নিলেন। কিন্তু শমী রাগ আর চেপে রাখতে পারল না, বলে উঠল, আপনার ওই মস্ত জ্ঞানী পুরুষ তার মাকে একলা পেয়ে যাচ্ছেতাই অপমান করেছে, বুঝলেন ? আমরা রাতের গাড়িতেই চলে যাচ্ছি—

আনন্দবাবার দুই চক্ষু বিস্ফারিত। দুজনকেই দেখলেন একটু, কি বলবেন ভেবে না পেয়েই যেন নিজের টাক মাথায় হাত বুলালেন একবার।—আমার মা-কে অপমান করেছে···বলিস কি রে! মা-কে আবার ছেলে অপমান করে কি করে ? তাছাড়া ঘরে তো তুই ছিলি—একলাই বা পেল কি করে ? অপমান করল আর

তুই কিছু বললি না ?

জ্যোতিরাণী নিস্পন্দের মত দাঁড়িয়ে। আর রাগে শমীর মুখ তেমনি লাল। আনন্দবাবা আর এক পলক তাকে দেখে নিয়ে গম্ভীর মুখে আঙুল তুলে সিতুর ঘর দেখিয়ে বললেন, যা, আমি তোকে হুকুম দিচ্ছি, বলে আয়, যা মুখে আসে তাই বলে আয়—মা-কে অপমান করে এত সাহস! এই ফাঁকে আমি মায়ের সঙ্গে একটু কথা বলে দেখি, কি অপমান করল।

মাসীর কাঁধে হাত রেখে বারান্দা ধরে তাকে ওদিকে নিয়ে চললেন তিনি। শমী সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকল। একলা কথা বলতে চান বুঝেছে।

বারান্দার শেষাশেষি এসে আনন্দবাবা দাঁড়ালেন। খুব কোমল গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, পাগলাটা বড় দুঃখ দিয়েছে, না মা ?

জ্যোতিরাণীর মুখে রক্ত নেই এখনো, আত্মস্থ হতে চেষ্টা করে সামান্য মাথা নাড়লেন। দুঃখ দেয়নি। বলতে পারলে বলতেন, যা পাওনা তাই পেয়েছি।

আনন্দবাবার ঠোঁটের হাসি গালের ভাঁজ ধরে সমস্ত মুখে ছড়াতে লাগল। গলার সুরেও অনাবিল আনন্দের রেশ।—দেখো মা, একটা কথা বলি, অনেক দুঃখ পেয়েছ, কতজনে তোমাকে কত কি বলেছে ঠিক নেই। কিন্তু আমি বলি, যা হয়েছে তার সবটুকুই দরকার ছিল—পাই পয়সা পর্যন্ত দরকার ছিল—এর এতটুকু বাকি থাকলে তোমার ছেলের পাওনায় ঘাটতি পড়ত।

জ্যোতিরাণীর বুকের তলায় কি যাতনানাশী প্রলেপ বুলিয়ে দিচ্ছে কেউ ? নির্বাক ঠাণ্ডা দু চোখ তুলে তাকালেন তাঁর দিকে।

তেমনি খুশি-ঝরা মিষ্টি গলায় আনন্দবাবা বলে গেলেন, ভক্তদের উপদেশ দিই, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে—আনন্দ থেকেই সব কিছুর জন্ম। তেমন আধার পাইনে বলে এর থেকেও বড় কথাটা বলিনে, বলিনে—স তপোহতপ্যত—তপস্যা থেকে দুঃখ থেকে সবকিছুর সৃষ্টি। সুখের সাধনার থেকেও দুঃখের সাধনার একটা মহৎ দিক আছে, তুমি যে এই সৃষ্টি আর এই সাধনার মধ্যে একেবারে ডুবে আছ গো মা!···মানুষের, শুধু মানুষের কেন, গোটা মানব সমাজের যে কোনো মঙ্গলের গোড়াতে আধ্যাত্মিক শক্তি আছেই, তোমার ছেলে এই শক্তির দিকে এগোচ্ছে দেখার পরেও দুঃখ ?

জ্যোতিরাণী কাঁপছেন অল্প অল্প, সর্বাঙ্গ দুলছে। চোখের সামনে আনন্দবাবার মুখখানাও বুঝি আলোয় আলোয় ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে এক-একবার। এই অনির্বচনীয় অনুভূতিটুকুর আর কোনো ভাষা নেই, আর কিছু প্রকাশ নেই।

দূরে দাঁড়িয়ে শমী মাসীকেই লক্ষ্য করছিল বটে, কিন্তু মন এদিকে ছিল না।

ভিতর জ্বলছে এখনো। চলে তো যাবেই, সম্ভব হলে আজই যাবে, কিন্তু এত অপমান আর উপেক্ষার একটা জবাবও দিয়ে যাবে না? মাসীকে নিয়ে আনন্দবাবা দূরে সরার সঙ্গে সঙ্গে শমীর পা-দুটো আবার ওই ঘরের দিকেই ফিরতে চেয়েছে। নিজেকে সংযত না করে যেতে পারছিল না।

সিতুর সামনে বইটা তেমনি খোলা পড়ে আছে। জানালা দিয়ে দু চোখ দূরের দিকে উধাও—ওই মনসা পাহাড়ের দিকে। ঘরে কারো পদার্পণ ঘটেছে টের পেয়ে এদিকে ফিরল।

শমী। তার দিকেই চেয়ে আছে, তাকেই দেখছে। বলল, মাসীকে নিয়ে তোমাদের আনন্দবাবা ওদিকে গেলেন, বোধ হয় সান্ত্বনা-টান্ত্বনা দিচ্ছেন। তুমি যে অপমান করেছ সেটা কিছু নয় তাই বোঝাচ্ছেন বোধ হয়। তা বোঝান, কিন্তু আমিও তোমাকে একটু কিছু বুঝিয়ে যাবার দরকার বোধ করছি।

দুই-এক মুহূর্ত মাত্র চেয়ে থেকে সিতু বইয়ের দিকে চোখ ফেরালো। নির্লিপ্ত, নিস্পৃহ।

শোনো, আজ যাকে এভাবে অপমান করে তাড়ালে আর তার দেখা পাবে না বোধ হয়। সময় ফুরিয়ে এসেছে বলেই এভাবে ছুটে এসেছিল। মাসীর ব্রেস্ট্ ক্যানসার হয়েছে, এখন সেটা বাড়তির দিকে—বুঝলে?

শোনার পরেও সিতু তেমনি নির্লিপ্ত, তেমনি নির্বাক খানিকক্ষণ। তারপর নিস্পৃহ গোছের মন্তব্য করল, অনেকেরই হয়—এ রোগ হলে সারেও না বড় একটা।

তপ্ত বিদ্রূপে শমী ঝলসে উঠল তক্ষুনি, এত জানো? তাহলে তো অনেক জ্ঞান লাভ হয়েছে দেখছি তোমার!

সিতুর ঈষৎ অসহিষ্ণু স্থির দৃষ্টি শমীর দিকে ফিরল আবার। শমীর অস্থির দু চোখ সমান তালে তার মুখের ওপর ঝাপ্টা দিয়ে গেল আর একপ্রস্থ। বলল, ছেলে হয়েও এই মা-কে চিনলে না, এই মায়ের ভিতর দেখতে পেলে না—তোমার দুঃখ ঠেকাবে কে? হরিদ্বার ছেড়ে হিমালয়ের মাথায় গিয়ে বসলেও তোমার শোক ঘুচবে না, বুঝলে?

যা বলতে এসেছ, বলা হয়েছে?

না হয়নি। মস্ত সাধু হয়ে বসেছ এখানে এসে—ওই মা যাক বা থাকুক কিছু যায় আসে না, কেমন? তোমার ভণ্ডামি আমি জানি না? তোমাকে আমি চিনি না? সেই দশ বছর বয়েস থেকে তুমি যে কি আমার জানতে বাকি?

আমিও জানি। ঠাণ্ডা গলায় সিতু জবাব দিল, নিজের এই ভণ্ডামি ছাড়তেই চেষ্টা করছি।

করো করো, খুব ভালো করে করো। কিন্তু না পারলে তখন আবার শমীর কাছে ছুটে যেও না, মাসী চলে গেলে শমী তোমাকে চিনতেও পারবে না, দয়া করে এটুকু মনে রেখো।

জলন্ত ক্ষোভে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই শমী স্থির হঠাৎ। বারান্দার ও-মাথায় আনন্দবাবা দাঁড়িয়ে হাসছেন মিটি-মিটি। আর তাঁর দু পায়ের ওপর মাথা রেখে নিশ্চল পড়ে আছেন জ্যোতিরাণী।

কতক্ষণ এভাবে পড়ে আছে মাসী, শমী জানে না। মনে হল অনেকক্ষণ, আর মনে হল, আরও কতক্ষণ এভাবেই পড়ে থাকবে তারও ঠিক নেই।

সেই সন্ধ্যায়ই শমীরা কলকাতায় রওনা হল আবার। আনন্দবাবা বাধা দেননি। যত রাগই হোক, আজ এসে আজই আবার কলকাতার গাড়িতে উঠতে হবে শমী ভাবেনি। দু দিনের পথ, মাসীর এই শরীর।

ঘরে এসে ঘণ্টাখানেক চুপচাপ বসে থাকার পর জ্যোতিরাণীই বলেছেন, রাতের গাড়িতে ফিরবেন।

শরীরের কথা বলে বাধা দেবার আগে চাপা ঝাঁজে শমী বলে উঠেছিল, কেন ? বড় না বলেছিলে ছেলে তোমার জন্তেই অপেক্ষা করে আছে, না এলেই নয় ?

জ্যোতিরাণী চুপচাপ খানিক চেয়েছিলেন তার মুখের দিকে। তারপর শান্ত মৃদু জবাব দিয়েছেন, ঠিকই বলেছিলাম···না এলে ওর আমার দুজনেরই কত ক্ষতি হত জানিস না।

না, শমী আর কিছু বলতে পারেনি। দুই-একদিন অন্যত্র থাকার প্রস্তাব করেছিল। মাসী তাও নাকচ করেছে। তার দিকে চেয়ে চেয়ে শমীর মনে হয়েছে, এ-রকম ঘটবে জেনেই যেন এসেছিল, কাজ শেষ, এখন ফেরার তাড়া।

আনন্দবাবাকে প্রণাম করে সন্ধ্যের পরেই রওনা হয়েছে। শমীর সব থেকে অবাক লেগেছে যে, আনন্দবাবাও একটি বার থাকতে অনুরোধ করলেন না তাদের। মাসীর সঙ্গে তাঁর কি কথা হয়েছে জানে না। যাই হোক, সকালের দিকে তাঁকে দেখে যতটা ভক্তিশ্রদ্ধা হয়েছিল, এখন আর অতটা নেই। থেকে থেকে মনে হয়েছে, এমনই যদি মহাপুরুষ, মাসীর এত বড় অসুখটা টের পেলেন না কেন ? এই শরীরে দু দিনের পথ ভেঙে এসে এ-রকম আঘাত নিয়ে আজই আবার ফিরে চলল মাসী, তবু এতটুকু তাপ উত্তাপ নেই কেন ? উল্টে ওর মাথায় হাত রেখে পল্কা ঠাট্টা করেছেন, তুই বেটী এই মেজাজে ফিরে চললি কেন—একটু হাস্ দেখি।

তারা চলে যাবার পরেই আনন্দবাবার মুখের হাসি মেলাতে দেখল ভক্তরা। উঠে পড়তেও দেখল।

সিতু ঘর ছেড়ে একবারও বেরোয়নি। মেরুদণ্ড শক্ত করে মূর্তির মতই বসে ছিল। সচকিত হয়ে ঘাড় ফেরাল। তারপর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল।

আনন্দবাবা ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। অনুচ্চ কঠিন গলায় বললেন, যারা এসেছিল তারা চলে গেল।

সিতু দাঁড়িয়ে আছে। বিমূঢ়। এতদিনের মধ্যে আনন্দবাবার এমন থমথমে মুখ আর দেখেনি। এই কণ্ঠস্বরও শোনেনি। নিঃশব্দে আরো ভালো করে দেখার তাড়না, যে দুর্বলতার দরুন দাস মহারাজ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন সে কি এঁর মধ্যেও বাসা বেঁধে আছে!

বোস্। আনন্দবাবা হুকুমই করলেন।

সিতু আস্তে আস্তে বসল আবার। চেয়েই আছে।

কদিন ধরে পাঠ নেবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছিলি না? আজ একটা পাঠ দেব, লেখ্, কলম নে—

প্রায় নিজের অগোচরেই সিতু কলম তুলে নিল। তেমনি ভারী থমথমে গলায় আনন্দবাবা বলে গেলেন, লেখ্—ধৈর্যশূন্য তেজ শুধু দম্ভায়, নম্রতাশূন্য নীতির বোঝা শুধু ভার বাড়ায়, বিনয়শূন্য সামর্থ্যের নাম দাম্ভিকতা, আর বুদ্ধিশূন্য পৌরুষের নাম অত্যাচার।...হয়েছে লেখা? তীব্র চোখে চেয়ে আছেন, বললেন, কথাগুলো যখন নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে ওঠা-নামা করছে টের পাবি, তখন আবার মুখ দেখাস আমাকে।

চলে গেলেন। সিতু মূর্তির মত বসে। চোখে ঝাপ্সা দেখছে।

আঙিনা পেরিয়ে আনন্দবাবা নিজের ঘরের দিকে চলেছেন। এই মুখের চেহারা আর একরকম। আব্ছা অন্ধকারে তাঁর ভারী গালের খাঁজে খাঁজে একটা হাসির ধারা নিঃশব্দে লুটোপুটি খাচ্ছে যেন।

* * *

দিন যায়, মাস যায়। একে একে তিন মাস গত হল।

সিতুর এক-একসময় রাগ হয়, রাগের থেকেও অভিমান দ্বিগুণ। আনন্দবাবা আর তাকে ডাকেনও না, কথাও বলেন না। সিতু তাঁর চোখের আড়ালেই থাকে। তবু দৈবাৎ এক-আধসময় দেখা হয়ে গেলে চেনেনও না যেন। এই অবজ্ঞার আশ্রয় সিতু আর বরদাস্ত করে উঠতে পারছে না। এক-একসময় ঝোঁক চাপে যেদিকে দু চোখ যায় আবার বেরিয়ে পড়বে—দরকার নেই কাউকে তার। কিন্তু তাও পারে না। কি এক অদৃশ্য শক্তি যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে তাকে। যত

নির্লিপ্ত কঠিনই হোন, এখানকার এই একজনকে ছেড়ে যাবার নামেও বুকের ভিতরটা একেবারে খালি খালি মনে হয়।

সব সত্ত্বেও এই আখড়া আঁকড়ে থাকার আরো একটা সঙ্গোপন কারণ আছে। দুরাশার মতই একটুখানি লোভ। প্রেমভাই তাকে মন খারাপ করতে নিষেধ করেছে। চুপি চুপি বলেছে, তাদের বিশ্বাস সিতুভাইয়ের মহাসৌভাগ্যের দিন এলো বলে। বাবা যার ওপর সব থেকে বেশি সদয় হন, তাকেই শুধু ও-রকম করে শাস্তি দিয়ে পরীক্ষায় ফেলেন। এ-রকম পরীক্ষায় পড়ার সৌভাগ্য ক্বচিৎ কখনো দুই-একজন ভক্তের হয়। এমন সৌভাগ্য এযাবৎ গৌরবিমলবাবুরও হয়নি। পরীক্ষার কাল কাটলেই বাবা হঠাৎ একদিন মাঝরাতে ডেকে পাঠাবেন, অন্তরের সমস্ত দুর্লভ ঐশ্বর্য ঢেলে দেবেন—তার পর দিন থেকে আর তাকে এই আখড়ায় দেখা যাবে না। সে যে কোথায় কোন্ উর্ধ্ব সাধনার পথে চলে যায় কেউ জানে না। এখানে সকলেই নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে, সিতুভাইয়ের এই গোছের একটা সৌভাগ্যের দিন এলো বলে।

সিতু বিশ্বাস করেনি। করেনি কারণ, এ-রকম সৌভাগ্যলাভের কোন হেতু সে খুঁজে পায়নি। তবু নিভৃতের সপ্তস্তরের তলায় একটুখানি আশা, একটু লোভ। ···অহেতুক কৃপাও তো পায় কেউ কেউ। কেন পায় কে জানে।

সত্যি হোক না হোক, প্রাণপণে আশাটুকু আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করে এক-এক সময়। রাতে ঘুমুতে পারে না। মন্ত্রের মত জপ করে, ডাক আসুক, ডাক আসুক, ডাক আসুক—প্রভুজী, একবার ডাক আসুক। চমকে ওঠে, বুকের তলায় কাঁপুনি ধরে—সে-রকম আকুতির মুখে নিজের সম্পূর্ণ অগোচরে এ কাকে স্মরণ করে সে, কাকে ডেকে বসে? সমস্ত রাত ধরে কার পায়ে মাথা খোঁড়ে আর জপ করে, ডাক আসুক, ডাক আসুক—

ডাক এলো।

রাত্রি সেদিন গভীর। সিতু ঘুমুচ্ছিল। ধড়মড় করে উঠে বসল। তার নাম ধরে ডাকছে কেউ। হ্যাঁ, প্রেমভাই। ভারী গলায় বলল, বাবার ঘরে যাও, তিনি অপেক্ষা করছেন।

প্রেমভাই বেরিয়ে গেল। সিতু হতভম্ব, বিমূঢ়। ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখল কিনা সেই সংশয়।···স্বপ্ন নয়, বারান্দায় প্রেমভাইয়ের মৃদু খড়মের শব্দ মিলিয়ে যাচ্ছে।

কয়েক নিমেষ ধরে বুকের ভিতরে তুমুল দাপাদাপি চলল। তারপর স্তব্ধ। কাপড়ের খুঁটটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরুলো। সামনের আঙিনা পেরিয়ে

চলল। মাথার ওপর থালার মত চাঁদটা জ্যোৎস্না ঢালছে।

আয়, ঘুমুচ্ছিলি নাকি?

দরজার কাছ থেকে আনন্দবাবা মিষ্টি গলায় ভিতরে ডেকে নিলেন তাকে। তিন মাসের বিচ্ছিন্নতার কোনো দাগ নেই। যেন রোজই দেখা হয়, কথা হয়। আসনে বসে আছেন। পায়ে পায়ে সিতু কাছে এসে দাঁড়ালো।

বোস্।

বসল। বোবা, নির্বাক। ভিতরটা শুধু কাঁপছে একটু একটু।

আনন্দবাবাও তার দিকে ঘুরে বসলেন, ঈষৎ কৌতুকে দেখলেন। তারপর বললেন, একেবারে যে ফাঁসির দড়ি গলায় পড়ার আগের মুখ দেখি তোর···ঘাবড়ে গেলি নাকি?

সিতু মাথা নাড়ল। ঘাবড়ায়নি।

বেশ, আনন্দবাবা খুশি, এবারে তোকে এক কাজ করতে হবে, যা বলব করবি তো?

সিতু আবারও মাথা নাড়ল, করবে।

মনে থাকে যেন কথা দিলি।···কালই কলকাতায় যাবি, এখান থেকে আপাতত তোর ছুটি।

সিতু বিমূঢ়, হতভম্ব। এ-রকম আদেশ হতে পারে কল্পনাও করেনি। বুঝতেও সময় লাগছে যেন। মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করল, কলকাতায় কোথায় যাব···।

কোথায় আবার, তোর নিজের বাড়ি-ঘরে। কালই যাবি।

একটা প্রচণ্ড আঘাত খেল যেন সিতু। বিবর্ণ স্তব্ধ। হঠাৎ কান্নার মত কিছু যেন গুমরে উঠছে ভিতর থেকে। প্রাণপণে সংবরণ করতে চেষ্টা করল নিজেকে। জিজ্ঞাসা করল, এই শাস্তি কেন?

আনন্দবাবার মুখে কৌতুক ঝরল, শাস্তি কি রে বোকা, এখন যাওয়া দরকার বলেই যেতে বলছি।···নিরিবিলির কবরে ঢুকে তোর প্রতিভা খুলতে পারে, কিন্তু বাপু, চরিত্র তৈরি করতে হলে ওই সংসার-সমুদ্রের দু-চারটে ঝড়-ঝাপটা খাওয়া চাই। আগে সেইটাই দরকার। স্ফূর্তি করে যা, সব দেখ্, শোন, ভিতরে যে কত কি চাই-চাই করছে সেগুলোর দাসত্ব ঘোচা—এ কি কম দরকার নাকি!

এক অজ্ঞাত বিষণ্ণ আবেগ সামলানোর চেষ্টায় সিতু ঘামছে অল্প অল্প। তেমনি স্তব্ধ হয়ে বসে রইল খানিক। আনন্দবাবার মুখের দিকে চেয়ে মনে হল, ওই পায়ে লুটিয়ে পড়ে কাঁদলেও হুকুমের নড়চড় হবে না। অনুচ্চ স্পষ্ট স্বরে জিজ্ঞাসা করল, আবার কবে ফিরতে পাব?

কি মুশকিল, তোকে কি বনবাসে পাঠাচ্ছি নাকি আমি! যখন খুশি তখন আসবি।

আমি আসার কথা বলছি না, আবার কবে তোমার কাছে ফিরতে পাব?

কি বলতে চায় সেটা ওর চোখে-মুখে লেখা। আনন্দবাবা দেখছেন। হাসছেন মৃদু মৃদু। সেই হাসির রূপ বদলাতে লাগল, রঙ বদলাতে লাগল। হাসি মিলিয়ে মিলিয়ে তাঁর মধ্যেই ছড়াতে থাকল। দেখছেন। কত কাছ থেকে যে দেখছেন ঠিক নেই যেন। সেই দৃষ্টিতে সিতুর ভিতর জুড়িয়ে যাচ্ছে, বাইরেটাও জুড়িয়ে যাচ্ছে। দৃষ্টির এমন দুর্লভ স্পর্শের স্বাদ আর বুঝি কখনো অনুভব করেনি।

খানিক বাদে আনন্দবাবা কথা বললেন। এই কণ্ঠের স্বরও বুঝি আলাদা।—একটা মজার কথা বলি শোন্। কেউ দূরে সরে নেই, সব তোর হাতের নাগালের মধ্যেই আছে। কিন্তু একটা সময় আসে যখন আর হাত বাড়াবার কথাও মনে থাকে না। ভাবে সব পেলাম, আর পাওয়ার কিছু নেই। একদিন যদি তোর মনে হয় যা হারিয়েছিলি তার দ্বিগুণ ফিরে পেলি সব—কানায় কানায় সমস্ত দিক ভরে উঠেছে, আর কিছু করার নেই, আর কিছু পাওয়ার নেই—তখনো যদি ভাবতে পারিস সুন্দরের সেখানেই শেষ নয়, সুন্দরের পূজায় ত্যাগের আরো সাদা নজির রেখে যেতে হবে, সুন্দর খোঁজার আরো সাদা নজির কিছু দিয়ে যেতে হবে —সর্বসুন্দরের জন্য আরো কিছু পেতে বাকি—তখন যেদিকে তাকাবি, যেদিকে ফিরবি, দেখবি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত আনন্দবাবারা তোর চারদিকে ছেয়ে আছে।

কি এক দূরের নিবিষ্টতা থেকে যেন আগের সহজতার মধ্যে ফিরলেন আনন্দ-বাবা। হেসেই বললেন, সে যার ব্যবস্থা তাঁর, ও নিয়ে তোর এখন মাথা ঘামিয়ে কাজ নেই—এখন পালা, কালই যেতে হবে মনে থাকে যেন, এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে।

॥ ছেচল্লিশ ॥

সিতু কলকাতায় ফিরল চার বছর বাদে। একভাবে চললে চারটে বছর কিছু নয়, কিন্তু ওর এই ফেরাটা এক জীবন থেকে আর এক জীবনে ফেরার মত। ফলে চার বছরের বিচ্ছিন্নতাটুকু বড় বেশি স্পষ্ট।

স্টেশনে পা দিয়ে দেখে কালী জেঠু দাঁড়িয়ে। অর্থাৎ তার ফেরাটা অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। সে আসছে এ খবরটা আনন্দবাবার আখড়া থেকে বাড়িতে আগেই

এসেছে বোঝা গেল। এমনও হতে পারে, এখানকার অনুরোধে উত্ত্যক্ত হয়েই আনন্দবাবা দুটো মিষ্টি কথা বলে তাকে ফেরত পাঠালেন। যাক, যা হবার হয়েছে। এগিয়ে এসে হাসিমুখে জেঠুকে প্রণাম করল।

কালীনাথের হাবভাবে ছদ্ম ত্রাস।—করলি কি রে, সাধুসন্ন্যেসী মানুষ, পায়ে হাত দিয়ে আরো পাপের ভাগী করলি ?

গাড়িতে উঠেও ছদ্মগাম্ভীর্যে নিরীক্ষণ করলেন একটু, হিমালয়ের বাতাসে মাথা বেশ ঠাণ্ডা হয়েছে, না আবার ঝামেলা বাধাবি ?

কি মনে হতে সিতু পাল্টা ঠাট্টাই করল, কোন্‌টা চাও বলো।

পলকা নিবিষ্টতায় দু চোখে ওকে খানিক ওজন করে কালীনাথ বললেন, শোন্, আমারও ভিতরে ভিতরে একটু সাধু-সাধু ভাব এসেছে। তাই কোন্‌টা চাই মিথ্যে বলব না। হয় একেবারে ঠাণ্ডা মাথায় সব দায়-দায়িত্ব নিয়ে বাড়িতে থাকবি, নয়তো রাঁচির গারদে একটা ঘর ঠিক করে দেব—নিশ্চিন্ত মনে সেখানে থাকবি। এই দুয়ের মাঝখানে থেকে আর লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি চলবে না, আমার হাতে এখন অনেক ক্ষমতা মনে থাকে যেন।

সিতু হাসতে লাগল। জেঠুর বাইরেটা অন্তত কিছুই বদলায়নি। জিজ্ঞাসা করল, ক্ষমতা তো বরাবরই দেখে আসছি, এখন আরো কি বাড়ল ?

কালীনাথ এবার হাসতে লাগলেন। পরে মন্তব্য করলেন, তোকে দিয়ে আশা আছে দেখছি।

বাবাকে দেখে সিতু চমকেই উঠেছিল। এক অতি চেনা মহীরুহ যেন প্রাণের সমস্ত ইশারা খুইয়ে শুধু কাঠামোটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেটাই বোঝার মত। সিতু প্রণাম করল। তিনি নিঃশব্দে ওর মাথায় হাত রাখলেন একটু, তারপর দেখলেন চুপচাপ।

সিতুর আগের সেই বিরূপ অনুভূতিটা গেছে, কিন্তু আগের থেকেও বেশি বিচ্ছিন্ন লেগেছে নিজেকে। শামু আর ভোলা এসে তাকে প্রণাম করেছে। মেঘনা দু চোখ বড় করে খানিক দেখেছে তাকে, তারপর মাটিতে মাথা ঠেকিয়েছে। সিতু ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করেছে, হেসেই জিজ্ঞাসা করেছে, কি হল, তোরও এত ভক্তি কেন ?

মেঘনার স্বভাব বদলায়নি খুব, জবাব দিয়েছে, তোমার আগের দাপটে মনে মনে কত দণ্ডবৎ হয়েছি ঠিক নেই, এখন সামনাসামনিই, ধন্যি ছেলে বাপু তুমি !

এদের সকলের চোখ দিয়েও নিজেকে দেখতে পাচ্ছে সিতু। যে মানুষ বাড়ি

ছেড়ে গেছল, আর যে ফিরে এলো, তারা যে এক নয়, সকলের হাবভাবে এ বড় বেশি স্পষ্ট। দুপুরের খাওয়া-দাওয়া বিশ্রামের পর বিকেলের দিকে সিতু আবার বাবার ঘরে এসে বসল। টুকটাক কথাবার্তা হল দু-চারটে। বাবার অসুখ আর চিকিৎসা সম্পর্কে খোঁজখবর নিল। কিন্তু সেও নিজের কানেই শুকনো কর্তব্য করার মত শোনালো। শিবেশ্বর জানালেন, এখন ভালই আছেন, হাঁটতে-চলতেও পারেন একটু-আধটু, তবে ডাক্তার বাড়ি থেকে বেরুবার অনুমতি দেয়নি…আর দেবেও না হয়ত।

জেঠু ঘরে আসতে স্বস্তি। কথাবার্তার ধারা সহজ হল একটু। এইভাবে এখানে কতদিন কাটাতে পারবে ভেবে সিতুর হাঁপ ধরার দাখিল।

সেই রাতেই কালীনাথ শুতে যাবার আগে শিবেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করলেন, দলিলটা বদলাবার ব্যবস্থা করবে কিনা।

স্ট্রোক হবার পর একটু সুস্থ হয়ে শিবেশ্বর খুব ভেবেচিন্তে আর আঁটঘাট বেঁধে যে কাজটি করেছেন সেটা এই দানপত্রের দলিল। মনের ওপর তখন মৃত্যুর ছায়া ঘন হয়ে এঁটে বসেছে। দ্বিতীয় স্ট্রোকে সব শেষ হবে ধরে নিয়েছেন। ফলে এত অর্থ, এত বিষয়-সম্পত্তির মায়া তাঁকে উতলা করেছে, উত্ত্যক্ত করেছে। জীবনের এই সার্থকতাটুকুও কোনো কাজে আসবে না ভাবতে বুকের ভিতরটা টনটন করেছে, রক্তচাপ বেড়েছে। শেষে এই দানপত্র করেছেন তিনি। নিজের যেটুকু প্রয়োজন হতে পারে, সেটুকু শুধু আলাদা রেখেছেন। বাকি সব কিছুর রক্ষণাবেক্ষণ আর কর্তৃত্বের ভার কালীনাথের হাতে তুলে দিয়েছেন, ছেলের জন্য যা দরকার তিনিই খরচ করবেন। ছেলে সুস্থচিত্তে ঘরে ফিরলে আর সম্পত্তি নষ্ট হবে না বুঝলে সব তার হাতে তুলে দেবার নির্দেশ। এক কথায় দলিলে কালীনাথকেই পুরোপুরি ছেলের সম্পত্তির অভিভাবক করে রাখা হয়েছে। ছেলের ভালো-মন্দ বিবেচনা করে সম্পত্তিরক্ষার সমস্ত দায়িত্ব তাঁর।

শিবেশ্বর চুপচাপ ভাবলেন একটু। তারপর ক্ষুদ্র জবাব দিলেন, এখন যা আছে তাই থাক…পরে ওর সঙ্গে কথা বলে যা ভালো বুঝবে করবে।

কালীনাথ চলে এলেন। ঠোঁটের ডগায় হাসির আভাস। নিশ্চিন্ত বোধ করছেন। ছেলেটার মতিগতি খুব ভালো লাগছে না তাঁর। ওদিকে এক চাপা আবেগের মুহূর্তে হাসপাতালে জ্যোতিরাণীকে তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন, শমীর জীবন শূন্য না হয়ে দম বন্ধ হবার মত ভরাটও হতে পারে—হয় যাতে, সেই চেষ্টা অন্তত তিনি করবেন। মাসখানেক হল জ্যোতিরাণী হাসপাতালে আছেন। অবস্থা এখন সমূহ আশঙ্কায় দাঁড়িয়েছে। শিবেশ্বরকে এখনো ভালো করে কিছু জানানো

হয়নি। মামুকে দিয়ে হরিদ্বারের আখড়ায় কালীনাথই চিঠি লিখিয়েছিলেন। মামুকে এখনো কাপুরুষই ভাবেন তিনি। সময় ঘনিয়েছে টের পেয়েই কাজের নাম করে বাইরে পালিয়েছে। অত যন্ত্রণার মধ্যেও জ্যোতিরাণীকে সারাক্ষণ শমীর ভাবনাতেই অস্থির দেখে আসছিলেন তিনি। তারপর মামুকে দিয়ে হরিদ্বারে চিঠি পাঠিয়ে জ্যোতিরাণীকে ওই আশ্বাস দিয়েছিলেন।···আশ্বাস খুব পেয়েছে মনে হয়নি। উল্টে সংশয় দেখেছেন। কেন তাও অনুমান করতে পারেন। সংশয়ের হেতু সেই কালো নোটবই—কালো ডায়েরিতে তাঁর সেই শকুনির প্রতীক্ষা ঘোষণা।

কালীনাথের ঠোঁটের হাসি আরো বিস্তৃত হয়েছে। ছোঁড়াটার ভিতরে ভিতরে বড়গোছের কিছু পরিবর্তন এসেছে মনে হতে যা একটু ভাবনা তাঁর। দেখা যাক।

এবারে আবার ঠাকুমার ঘরটাই বেছে নিয়েছে সিতু। বাড়ির মধ্যে ওটাই সব থেকে নিরিবিলি ঘর। কম্বলের ওপর সাদা চাদর বিছিয়ে নিজেই ভূমিশয্যা পেতেছে। মেঘনা কোমর বেঁধে ঝগড়া করতে এসেছিল। কিন্তু ছোট মনিবের হাসি দেখে আর কথা শুনে তার এমন গা জ্বলেছে যে সেখান থেকে পালিয়েছে। সিতু বলেছিল, বেশি গণ্ডগোল করলে ওধারে আর একটা কম্বল পেতে ওকেও এ-ঘরেই শুতে হুকুম করবে, তারপর চোখে সরষের তেল লাগিয়ে দিয়ে একসঙ্গে পাঁচ ঘণ্টা মুখ শেলাই করে আর শিরদাঁড়া সোজা করে বসে থাকতে শেখাবে।

পায়ে পায়ে কালীনাথ এই ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালেন। কৌতুক গাম্ভীর্যে ঘরের ভিতরটা দেখলেন একটু। সিতুর ঠোঁটেও হাসির আভাস।

ভিতরে ঢুকে কালীনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, এখানেও তাহলে ব্রহ্মচর্য পালন করা হবে?

সিতু হেসেই জবাব দিল, হ্যাঁ, তোমার মত।

কালীনাথ গম্ভীর, বয়েস কত হল তোর?

···উনত্রিশ, কেন?

এখনই এত বর্জন শুরু করলে উনসত্তর বা উনআশির জন্য কি থাকবে?

ওই বয়েস আমার থেকে তোমার আগে আসবে—মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।

কালীনাথ হেসে ফেলেও ভ্রূকুটি করলেন, ক'বছরে বেশ লায়েক হয়েছিস দেখছি। ভাবলেন কি, তারপর খুব সাদাসিধেভাবে বললেন, শোন্, কাল একবার হাসপাতালে গিয়ে জ্যোতিকে দেখে আয়···কি হয়েছে জানিস তো? অবস্থা ভালো না—

সিতু হঠাৎ একটা ধাক্কা খেয়ে নির্বাক একেবারে। খবর দেবার ফাঁকে কালীনাথের সজাগ দৃষ্টি। জানালেন, মাসখানেক হল ওমুক হাসপাতালের ক্যাবিনে

আছে।···খরচের ব্যাপার। শমীই সব চালাচ্ছে, কি করে চালাচ্ছে সেই জানে, কারো কাছ থেকে এতটুকু সাহায্য নেয়নি।

এবারে ওকে নিরিবিলিতে থাকার অবকাশ দিয়ে কালীনাথ চলে গেলেন।

সিতু স্থির, নিশ্চল বসে।···আসার আগের রাতে আনন্দবাবা পরদিনই কলকাতায় রওনা হতে হুকুম করেছিলেন, বলেছিলেন, কালই যেতে হবে, এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। কেন দেরি, কিসের দেরি এখন অনুভব করতে পারছে। সেই সঙ্গে আনন্দবাবার কটা কথা কানের পরদায় বিঁধছে।···ধৈর্যশূন্য তেজ শুধু দম্ভায়, নম্রতাশূন্য নীতির বোঝা শুধু ভার বাড়ায়, বিনয়শূন্য সামর্থ্যের নাম শুধু দাম্ভিকতা, আর বুদ্ধিশূন্য পৌরুষের নাম অত্যাচার।

কলেজ ছুটির পর শমী সোজা হাসপাতালে চলে আসে। সন্ধ্যে পর্যন্ত থাকে। সকালেও কলেজ যাবার আগে দেখে যায়। ছুটির দিনে সারাক্ষণই মাসীর কাছে থাকে। হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা করে নিয়েছে।

ওয়ার্ডের সামনে আসতেই তার পা দুটো যেন মাটির সঙ্গে আটকে গেল হঠাৎ। অদূরে যে মানুষটা বোবার মত দাঁড়িয়ে, তার দিকে চোখ গেছে।

সিতুও দেখেছে তাকে। কি এক অব্যক্ত বাধা ঠেলে কাছে এগিয়ে আসতে পারছে না। দাঁড়িয়েই আছে।

শমী আস্তে আস্তে ভিতরে ঢুকে গেল। সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠে গেল।··· দেখা মাত্র তার কাছে আসতে ইচ্ছে করছিল। বলতে ইচ্ছে করছিল, দেরিই হয়ে গেছে, আর এসে কাজ নেই—এখন সে হরিদ্বারে বা হিমালয়ের মাথায় বসে মনের সাধে সাধন-ভজন করতে পারে। কিন্তু মাসীর মুখ চেয়েই বলার ইচ্ছে দমন করেছে। কার আসার আশায় মাসি সারাক্ষণ উন্মুখ, ও সেটা ভালই জানে।

হরিদ্বার থেকে ফেরার পরেই মাসী বড় অদ্ভুত কথা বলা শুরু করেছিল। ফাঁক পেলেই প্রভুজীর গল্প করে, প্রভুজীর কথা বলে। আর প্রভুজীর গল্প থেকে ছেলের কথায় চলে আসে। কালী জেঠুর থেকে চাবি চেয়ে নিয়ে তালাবন্ধ প্রভুজীধামের সেই প্রভুজীর বড় ছবিটা তিন-চার দিন দেখে এসেছে। কালী জেঠু ছবিটা মাসীকে দিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। মাসী ওখান থেকে ওটা খুলে আনতে রাজি হয়নি। তারপর এক পাগলাটে শিল্পীকে দিয়ে ওই ছবিটা আঁকানোর গল্প করেছে মাসী। আর প্রায় চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করেছে, দেখ্ তো, ছবির মধ্যে কার আদল সব থেকে বেশি চোখে পড়ে? শমীর চোখে তেমন কিছু পড়ে না বলে বিরক্ত যেন, তোমার চোখের ভুল কি—হরিদ্বার থেকে ঘুরে এসে আমি তো আরো বেশি স্পষ্ট দেখছি।

মাসী দু-দুটো শক্ত কড়ার করিয়ে নিতে চেষ্টা করেছে। বলেছে, আমি থাকি না থাকি, তোরা কান্নাকাটি করতে পাবি না। প্রভুজী কান্না পছন্দ করতেন না। তাই আনন্দবাবাকে দেখেই আমার প্রভুজীর ভক্ত মনে হয়েছিল। আর, সিতু ফিরলে—ফিরবেই তো, না ফিরে থাকবে কি করে—রাগ করে কক্ষনো আর তাকে দুঃখ দিবি না। সে কত দুঃখ পেয়েছে জানিস না। আশায় আনন্দে অদ্ভুত দেখতে হয়েছিল মাসীর মুখখানা, বলেছিল, আসার আগে আনন্দবাবা কি বলেছিলেন জানিস? বলেছিলেন, ওই অত দুঃখ না পেলে ও যা হয়েছে তা হতে পারত না—সবই দরকার ছিল। ওই কথা শুনেই তো আমি বেঁচে গেছি, নইলে ওর দুঃখের কথা ভেবে তো আমি পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম!

এই ধরনের সব কথা শুনে শমী অনেক সময় হকচকিয়ে গেছে। সেই জন্যেই দেখা হওয়া মাত্র তাকে চলে যেতে বলতে পারেনি। আবার রাগ সামলে ডেকে আনতেও পারেনি।

জ্যোতিরাণী শয্যায় বসে ছিলেন। বসতে কষ্ট। কিন্তু শমী আসবে জেনে চেষ্টা করে উঠে বসেন। এক নজর তার দিকে তাকিয়েই জিজ্ঞাসা করলেন, কি রে, মুখখানা এ-রকম কেন?

শমী জবাব দিল, আমার ভালো মুখ আবার কবে দেখলে। ভালো মুখ এক্ষুনি দেখতে পাবে।

কিছু না বুঝে অবাক হয়ে জ্যোতিরাণী দরজার দিকে তাকালেন। তারপর শমীর দিকে। শমী গম্ভীর, চার্ট দেখছে, ওষুধপত্র দেখছে। উদ্‌গ্রীব মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, কে এসেছেন, মামাবাবু নাকি?

শমী নিরুত্তর। একটু বাদে জ্যোতিরাণী সচকিত। তারপরেই বুকের ভিতরটা বিষম দুলে উঠল, ফুলে উঠল। বুকের ক্ষতয় অসহ্য যন্ত্রণা একটা, তারই ওপর তেমনি ঠাণ্ডা প্রলেপ। চোখে ঝাপসা দেখলেন কয়েক নিমেষে, তারপর সব স্বচ্ছ, পরিষ্কার।

চেয়ে আছেন। সিতুও চেয়েই আছে।

ডাকলেন, আয় ভিতরে আয়—

এক পা দু পা করে সিতু শয্যার সামনে এসে দাঁড়ালো। জ্যোতিরাণী এবারে ভালো করে দেখলেন তাকে, চোখ দিয়ে বুক দিয়ে সমস্ত সত্তা দিয়ে দেখলেন। ঠোঁটে হাসি, খুব সহজ মৃদু গলায় বললেন, রাগ করে মায়ের কাছে না এসে থাকতে পারলি?

সিতু স্থির, নির্বাক। শমী ওদিক ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। দু চোখ ভেঙে জল

আসতে চাইছে বলে নিজের ওপরেই রেগে আগুন হচ্ছে।

বোস্, ওখানে নয়—এখানে বোস্। হাত দিয়ে শয্যায় নিজের পাশটা দেখালেন জ্যোতিরাণী।

সিতু বসল। দু হাত তুলে জ্যোতিরাণী তার মাথায় বোলালেন, তারপর মুখে, গালে। হাসি-মাখা অনুযোগের সুরে বলে উঠলেন, দু-তিন দিন দাড়ি কামাসনি বুঝি, হাতেও খোঁচা-খোঁচা লাগছে! শমীর দিকে তাকালেন, এই মেয়ে, এ-দিকে ফের্ বলছি! তাকেও শয্যা দেখালেন, এখানে এসে বোস্।

শমী ঘুরে দাঁড়ালো শুধু, এগিয়ে এলো না। কিন্তু মাসীকে বড় অদ্ভুত সুন্দর লাগছে তার। সেই আগের দিনে ফিরে গেছে যেন। অল্প অল্প হাসছেন জ্যোতিরাণী, দু হাতের আদরে ছেলের মুখখানা কেমন হচ্ছে লক্ষ্য করলেন, তারপর শমীর দিকে চেয়ে বললেন, ওর দশ বছর বয়সে কোনো সময় ওকে কাছে টেনে একটু-আধটু আদর করলে ও খুব লজ্জা পেত। হাসছেন, দু চোখ ছেলের দিকে ঘুরল, আর শমী এখনো কি করে জানিস, ঘরে কেউ না থাকলে চট করে একটু কোলে শুয়ে নেয়—

অনির্দিষ্ট ঘোরাঘুরির কালে সিতু মরুভূমির মত জায়গাও দেখেছে। জলের অভাবে সব জ্বলে জ্বলে যেতে দেখেছে। তখন মনে হত, একটু জল পেলেই তো সব অন্যরকম হতে পারত, জল নেই কেন? আজ নিজের ভিতরটাও ঠিক সেইরকম লাগছে—একটুও জল নেই কেন?

কবে এলি?

কাল।

সেখানকার বাবা ভালো আছেন?

সিতু মাথা নাড়ল, ভালো আছেন।

এসে প্রভুজীধামে গেছলি? প্রভুজীকে প্রণাম করেছিস?

সিতু হঠাৎ চমকে উঠল কেন জানে না, মাথা নাড়ল, যায়নি।

কালই গিয়ে প্রণাম করে আসবি। হাসিমুখে শমীর দিকে তাকিয়েই চোখ রাঙালেন, তুই এই মুখ করে থাকলে এবারে মার খাবি আমার কাছে। ঘরে চায়ের ব্যবস্থা রেখেছিস, একটু চা-ও করলি না এখনো। চা কর, সিতুকে দে, নিজে খা, আমাকেও একটু দিস। তার পরেই তো আবার ঘড়ি দেখে ছুটতে চাইবি—আজ আর তোর কোথাও যাওয়া চলবে না, কাল বলে দিস। হাসির ওপরেই রাগ ছড়িয়ে সিতুর দিকে ফিরলেন, আমাকে এই রাণীর হালে রাখার জন্য নিজে খেটে খেটে আধখানা হয়ে গেল—কলেজের পর সন্ধ্যায় সপ্তাহে তিন দিন করে দুটো টিউশনি করে, এক জায়গায় একশ পঁচিশ টাকা পায়, আর একজায়গায় একশ।

কলেজ ছাড়াতে না পারিস, ওর এই দুটো বন্ধ কর্ তো এখন—আমি এত বারণ করি, আমাকে কেয়ারই করে না।

···ভিতরটা খাঁ-খাঁ করে জলছে সিতুর, একটুখানি জলের লেশমাত্র নেই কেন। শমী ওদিকে ফিরে চা করতে বসেছে।

রাত্রি।

জ্যোতিরাণী চোখ বুজে শুয়ে আছেন। ঈষৎ শ্রান্ত। কিন্তু সমস্ত মুখ তৃপ্তিতে ভরা। এই আনন্দের প্রতীক্ষাতেই ছিলেন বুঝি। ওরা দুজনেই ঘরে আছে। তাঁর ইচ্ছে বুঝে কালীদা হাসপাতালের লোকের সঙ্গে কথা বলে এই রাতটা ওদের দুজনেরই এখানে থাকার ব্যবস্থা করে গেছেন। ভোলাকে দিয়ে বাড়ি থেকে রাতের খাবার পাঠিয়েছেন। জ্যোতিরাণীর কথামত সিতু আর শমী পাশাপাশি বসে খেয়ে নিয়েছে। তিনি নির্নিমেষে দেখেছেন।

রাত বাড়ছে। ঘরে সবুজ আলো। সিতু শয্যার পাশে ইজিচেয়ারে বসে। শমী ওপাশের মেঝেতে একটা বিছানা করে নেবে বলেছিল, এখনো নেয়নি। মাসীর শিয়র ঘেঁষে বসে আছে।

জ্যোতিরাণী আচ্ছন্নের মত পড়ে আছেন। ঠোঁট দুটো একটু একটু নড়ছে। সিতু চেয়ে ছিল। তার মনে হল তন্দ্রার মধ্যে প্রভুজীর নাম জপ চলেছে।

কতক্ষণ কেটেছে বা কটা বেজেছে রাত্রি খেয়াল নেই। সিতু চমকে উঠল একসময়। মায়ের নিষ্পলক দুই চোখ তার মুখের ওপর আটকে আছে। ওদিকে শমীও বাহুতে মাথা রেখে বসে আছে।

চোখোচোখি হতে জ্যোতিরাণী জিজ্ঞাসা করলেন, ঘুমুবি না একটু?

ঘুমুব, তুমি ঘুমোও।

শমী চমকে সোজা হয়ে বসল। জ্যোতিরাণী চোখ বুজলেন আবার। মুখখানা হাসি-হাসি। কোনো এক স্মৃতিতে বিভোর হয়ে আছেন যেন।

সিতু!

সিতু সামনের দিকে ঝুঁকল। জ্যোতিরাণী বললেন, অত দূরে বসে আছিস কেন, কাছে আয়।

সিতু ইজিচেয়ারটা সামনে এগিয়ে আনল।

ছোটবেলার কথা সব মনে আছে তোর?

সিতু মাথা নাড়ল। আছে।

তোর ছোট দাদু সেই যে এক জলের জীবের গল্প বলেছিল—কত জাহাজ

বাঁচিয়েছিল, কত লোকের প্রাণ বাঁচিয়েছিল···তার নামটা কি রে?

পেলোরাস্ জ্যাক্।

আমি কিছুতে মনে করতে পারছিলাম না। অদ্ভুত চকচকে দেখাচ্ছে দুই চোখ। ঠোঁটের মৃদু হাসি সমস্ত মুখে ছড়াচ্ছে। শমীর দিকে তাকালেন। গল্পটা শুনেছিস? ওর কাছে শুনে নিস।···ওর তখন বছর বারো-তেরো হবে বয়েস। ছোট দাদুর গল্প বলা শেষ হতে ওর দিকে চেয়ে কি দেখলাম জানিস? দেখলাম বড় বড় দুটো মুক্তোর মত ওর দু চোখ ভরা জল। আমার কাছে ধরা পড়ে ও ছুটে পালালো···

ওধার থেকে দু চোখ তুলে শমী সিতুর দিকেই চেয়ে আছে, তাকেই দেখছে।

সিতু কি করবে? সেদিন চোখে জল এসেছিল বলে ছুটে পালিয়েছিল, আজ আসছে না বলে পালাবে? একটুখানি জলের জন্য ভেতরটা সেই থেকে জ্বলছে। মরুভূমির জায়গাগুলো যেমন জ্বলতে দেখেছিল।···একটু জল নেই কোথাও?

ছদিন বাদে সকালের দিকে হাসপাতালের ডাক্তার আর নার্স'রাও অদ্ভুত শান্ত এক মৃত্যু দেখল।

সেই মৃত্যুর পাঁচ মিনিট আগেও জপের মত দুই ঠোঁট নড়েছে। মিনিট দুই আগেও প্রসারিত দুই চোখ ঘরের সকলের মুখের ওপর ঘুরেছে। ঘরে কালীনাথ আছেন, গৌরবিমল আছেন। সিতু আর শমী আছে।···আর জনা-দুই ডাক্তার··· আর দু-তিনজন নার্স···

তারপরে প্রশান্ত বিরতি···চির ঘুমের কোলে স্নিগ্ধ বিশ্রাম।

মাসীমা গো!

শমী আর্তনাদ করে উঠেছিল। পরমুহূর্তে নিজেই বিষম চমকে উঠেছে। মুখে শাড়ির আঁচল গুঁজে দিয়ে সামলাতে চেষ্টা করেছে। শান্তির ব্যাঘাত ঘটে গেল বুঝি। মাসী যেন স্পষ্ট নিষেধ করল, বারণ করেছি না···!

কোথাও এতটুকু জলের লেশমাত্র নেই বলে ভিতরটা দুমড়ে মুচড়ে একাকার হয়ে যাচ্ছে সিতুর। গত দু দিন ধরে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই এখানে আছে। মাঝে দুবার করে তাকে খেতে পাঠানো হয়েছে। সিতু কিছুই খায়নি, অনির্দিষ্টের মত খানিক ঘোরাঘুরি করে, পেয়ালা দুই চা খেয়ে আবার ফিরে এসেছে। আনন্দবাবা বলেছিলেন, সব দেখ্ শোন—ভিতরে কত কি চাই-চাই করছে, সেগুলোর দাসত্ব ঘোচা। সিতুর মনে হয়েছিল, না খেলে কি হয়, কতখানি কষ্ট হয়? দাসত্ব ঘোচাবার তাগিদে নয়, এই কষ্ট কি তাকে কিছু বিস্মৃতি দিতে পারবে? টানা আটচল্লিশ ঘণ্টা

চলে গেছে, কয়েক পেয়ালা ছাড়া আর কিছু খায়নি।

মাথাটা ঝিম ঝিম করছে। চোখের সামনে ঝাপসা দেখছে থেকে থেকে, অন্ধকার দেখছে। কিন্তু সব খরখরে। একটু জলের লেশমাত্র নেই কোথাও। একটুখানি জলের জন্ত ওর ভিতরটা জলে-পুড়ে খাক হয়ে গেল বুঝি। বন্যায় ভেসে যায় না কেন সব?

শ্মশানে এলো বেলা একটা নাগাদ। নিস্পন্দের মত দাঁড়িয়ে সিতু দেখছে। শমীর স্তব্ধ মুখ দেখছে। জেঠু আর ছোট দাদুর তোড়জোড় দেখছে। আর চির-নিদ্রায় শয়ান একজনের হাসি-হাসি মুখ দেখছে। সিতু চমকে উঠল।···কবে এক রাণী নজন ফাঁসির আসামীকে ক্ষমা করে হেসেছিল। তার থেকেও অনেক বড় ক্ষমা করে আর এক রাণী হাসিমুখে ঘুমুচ্ছে। তার নাম জ্যোতিরাণী···।

ওই গঙ্গা দেখা যাচ্ছে। সিতু এগিয়ে গেল সেদিকে।···ডুব দিয়ে আসবে গোটাকতক? একটু বাদে ফিরে এলো আবার। ওই শুকনো গঙ্গার সব জল ঢাললেও এই তাপ জুড়োবে না।

হঠাৎ সচকিত সকলে। লাঠি ভর করে এদিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছেন শিবেশ্বর চাটুজ্যে। এলেন। খাটের পাশে দাঁড়ালেন। নির্নিমেষে যাত্রিণীকে দেখলেন চেয়ে চেয়ে। এই ঘুম ডাকলেও আর ভাঙবে না, এ যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না।

লাঠি ভর করে প্রথমে শমীর কাছে এলেন। তার মাথায় হাত বুলোলেন একটু। তারপর সিতুর দিকে ফিরলেন, তুই কাজ করবি?

সিতু কলের মত মাথা নাড়ল।

কালীনাথের ইশারায় গৌরবিমল এগিয়ে এসে ধরলেন তাঁকে। বললেন, তুমি আবার এই শরীর নিয়ে চলে এসেছ···বাড়ি চলো।

চলো। লাঠি ভর করে আস্তে আস্তে আবার চোখের আড়াল হয়ে গেলেন তিনি।

চিতা সাজানো হয়েছে। শমী আবার মুখে শাড়ির আঁচল গুঁজে দিয়েছে। আবার বাধা পড়ল একটু। মাঝবয়সী অপরিচিত মহিলা চিতার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। পরনে লালপেড়ে শাড়ি, ঘোমটার ফাঁকে তামাটে কালচে মুখখানা শুধু দেখা যাচ্ছে। কপালে আগের দিনের বড় পয়সার মত জলজলে সিঁদুর। পিঠের ওপর তেল-জলশূন্য শনের মত লালচে পাকানো খোলা চুল। ওদিক ফিরে একাগ্র চোখে শবদেহ দেখছে, আর বিড়বিড় করে বলছে কি। উদ্‌ভ্রান্ত হাবভাব।

শ্মশানের পুরুত তাকে অন্যদিকে সরিয়ে দিয়ে জানালো, মহিলার মাথা খারাপ, রোজ শ্মশানে আসে আর চিতা নিভ্‌লে কলসী কলসী জল এনে ঢালে। কোথায় কার এক বউ নাকি তার জন্যে আত্মহত্যা করেছিল। সেই থেকে নিভন্ত চিতা দেখলেই জল ঢেলে ঢেলে, আত্মার মুক্তি প্রার্থনা করে করে নিজের পাপ ক্ষয় করে।

এই চিতাও জ্বলে জ্বলে নিভল একসময়। সিতুর দু চোখ বুজে বুজে আসছিল। ষাট ঘণ্টা হয়ে গেল কিছু খায়নি মনে নেই, শুধু মনে হচ্ছে মাথার মধ্যে কি-রকম যেন হচ্ছে। চোখের সামনে যা দেখছে তার সবটা সত্যি কিনা জানে না।

জ্যোতিরাণীর দেহ ভস্মে বিলীন হয়ে গেল। এদিকে সবে সন্ধ্যা পেরুল। ঘড়া ঘড়া জল এনে চিতা নিভানো হল। সেই বিকৃত-মস্তিষ্ক ঘোমটা দেওয়া মহিলাও কোমরে শাড়ির আঁচলটা জড়িয়ে একে একে তিন-চার ঘড়া জল ঢালল। পরক্ষণে অবাক কাণ্ড। মুঠো মুঠো ভিজা চিতার ছাই কপালে বুকে ঘষতে লাগল। ফলে মাথার কাপড় খসে গেছে। সিতু চোখ টান করে দেখতে চেষ্টা করল তাকে। রাতের আলোয় সব কিছু আরো বেশি ঝাপ্‌সা দেখাচ্ছে এখন।...মহিলার অপ্রকৃতিস্থ মুখ, অপ্রকৃতিস্থ চাউনি, তবু মুখের আদল হঠাৎ চেনা-চেনা লাগল কেমন। কিন্তু ভাবতে গিয়েও ভাবা গেল না, মাথাটা বড় বেশি ঘুরছে। আর, সব মুখের আদল এইমাত্র যে দেহ ভস্ম হয়ে গেল, তার মুখের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

বাড়ি। গাড়ি থেকে নামল সকলে। জেঠু শমীকেও ধরে এনেছে। শমী আপত্তি করেনি। আপত্তি করার শক্তিও নেই।

থানের আঁচল কামড়ে মেঘনা আগুন, লোহা, পাটপাতা স্পর্শ করালো। সিতু সোজা একতলার চানঘরে গিয়ে ঢুকল। গঙ্গায় ডুব দিয়ে এসেছিল, এবারে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে চান করে শেষে বেরুলো।

দোতলায় উঠল। থমথমে বাড়ি। কি একটা চেনা স্মৃতির স্পর্শ অনুভব করল সর্বাঙ্গে। খুব কাছের, খুব চেনা স্মৃতি। ও'কে? ও...মেঘনা। ওই কোণের ঘরের দরজার বাইরে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে। পায়ে পায়ে সিতু এগিয়ে গেল। আগে বাবার ঘর...ওই তার পরেরটা!

মেঘনার পাশ কাটিয়ে ওই কোণের ঘরেই ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে সেই চেনা স্মৃতির স্পর্শ আবার। পনের বছর আগে একদিন যেমন হয়েছিল। পনের বছর আগে নয়, মাত্র আজই কেউ সমস্ত ভরা-স্মৃতি একপাশে সরিয়ে রেখে বিদায় নিল যেন। সিতুর বয়েস কত এখন, উনত্রিশ না চৌদ্দ? চারদিকে তাকালো।...সেই খাট, সেই আলমারি, সেই ড্রেসিং-টেবিল, সেই আলনা...সব ফেলে কবে গেল? শাড়ি

আজ? জোরে নিঃশ্বাস টানল। সেই তেলের গন্ধ, চুলের গন্ধ, গায়ের গন্ধও তো পাচ্ছে। আলনায় শাড়ি নেই। পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে ড্রেসিং টেবিলের দেরাজ খুলল একটা। থাকে থাকে শাড়ি। একে একে অনেকগুলো নামালো, স্পর্শ করল, কোন্ শাড়িটা পরলে সব থেকে ভালো দেখাতো?…সবগুলোই সব থেকে ভালো দেখাতো…এটা…এটা…এটা। এটা কি?

বাঁধানো খাতা একটা। খুলল। গোটাকতক গান লেখা। ভাবতে চেষ্টা করছে…গান কখনো শুনেছে? মনে পড়ছে না। কোনো একসময় গাইত নিশ্চয়, নইলে গান লেখা থাকবে কেন? গোটা গোটা মুক্তোর অক্ষরের মত এই লেখা তো কত চেনা ঠিক নেই।

…এ আবার কি রকম গান? একই চেনা হাতের লেখা। পড়তে পারছে না, কিন্তু এ কি হল, শরীরটা এত কাঁপছে কেন সিতুর? লেখাগুলোও ভালো দেখতে পাচ্ছে না কেন? এ কার স্তব? যাঁরই হোক, চেনা লেখার মধ্য দিয়ে চেনা গলা কানে আসছে!

…জগতের প্রভু আলো পাঠিয়েছে। তোমরা এসো, এই আলোয় বুক ভরে নাও। সমস্ত সত্তা ভরে এই আলো পান করো। এই আলোয় সকলে মিলে আর একবার অন্তরের জগৎ সৃষ্টি করো। যে যেখানে আছ এসো। আলো থেকে এসো, অন্ধকার থেকে এসো, গৃহ থেকে এসো, গুহা-কন্দর থেকে এসো। বাবারা এসো, মায়েরা এসো, যতো ভাইয়েরা এসো, বোনেরা এসো। হে সুখীজন, তোমরা এসো। হে বেদনাহত, তোমরা এসো! হে শক্তিমান, তোমরা এসো। হে পদানত, তোমরা এসো। হে ভোগশ্রান্ত, তোমরা এসো। হে কর্মক্লান্ত, তোমরা এসো। হে জীবন-তাড়িত, তোমরা এসো। হে মরণ-পীড়িত, তোমরা এসো। জগতের প্রভু আলো পাঠিয়েছে।…"

মা! মা! আমার মা!

বাড়িটার স্তব্ধতা চিরে হঠাৎ মেঘনার চিৎকার শোনা গেল, কালীদাদা, মামাবাবু শিগগীর এসো—ছোট মনিবের কি হল দেখো!

॥ সাতচল্লিশ ॥

…প্রথমে অপরিচিত মুখ একখানা, তারপর ছোট দাদু আর জেঠুর মুখ…আর বাবার উদগ্রীব মুখ…আর ওধারে শমীর মুখ, তার পিছনে মেঘনা। সিতুর চোখের সামনে থেকে একটা ধোঁয়াটে কুণ্ডলী সরে যাচ্ছে, মুখগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বিভ্রান্ত বিস্ময়ে চারদিকে তাকাতে লাগল সে।

শরীরের কয়েক জায়গায় ছুঁচ বেঁধার অনুভূতি। গোটাকয়েক ইন্‌জেকশান করা হলে যেমন লাগে। তাই করা হয়েছে জানে না।··কিন্তু কি ব্যাপার, এরা এভাবে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে কেন?

সামনের অপরিচিত মানুষটি নামী ডাক্তার। তিন ঘণ্টা ধরে বসে থেকে চিকিৎসা করছেন। তিনি সামনে ঝুঁকলেন। কেমন আছে জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর এই কদিনের মধ্যে খাওয়া-দাওয়া কি হয়েছে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করতে লাগলেন। সিতু প্রথমে চুপ করেই ছিল, পরের জেরায় প্রকাশ পেল গত তিন দিনের মধ্যে পেয়ালা-কয়েক চা ছাড়া আর কিছু খাওয়া হয়নি।

ডাক্তারের অনুমানে ভুল হয়নি। সামনে বসে এক গেলাস গরম দুধ খাওয়ালেন। তারপর বাইরে এসে কালীনাথ আর গৌরবিমলকে যথাযথ নির্দেশ দিয়ে তিনি চলে গেলেন।

আচ্ছন্নতার ঘোর কাটেনি ভালো করে। ঘরে যারা আছে সিতু তাদেরই দেখছে চেয়ে চেয়ে।…মেঘনা, শমী, বাবা। সকলকে ছেড়ে দু চোখ বাবার মুখের ওপর আটকালো। কে চলে গেল, কার দেহ চিতায় ভস্ম করে এসেছে, এইবার মনে পড়ছে।

ছেলের দিকে চেয়ে আছেন শিবেশ্বর চাটুজ্যেও। নির্বাক, অসহায়। জীবনের শুরু থেকে এই প্রৌঢ়কাল পর্যন্ত এত মাথা খোঁড়াখুঁড়ির সার ফল দেখছেন। কি পেলেন তার শেষ চিত্র দেখছেন। বিত্ত আর বৈভবের বিশাল স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে নিষ্ফল সঞ্চয়ের এক দম-বন্ধ-করা শূন্য দৃশ্য দেখছেন বুঝি তিনি। কিন্তু দেখতে পারছেন না। তাঁর শরীর ভেঙে আসছে। ঘুম পাচ্ছে। কালীনাথ আর গৌরবিমল ঘরে ঢুকতে প্রায়-অথর্ব দেহটা টেনে টেনে ঘরের বাইরে এলেন তিনি, দেয়াল ধরে ধরে নিজের ততোধিক শূন্য বিবরে এসে আশ্রয় নিলেন।

নির্দেশমত মেঘনা ছোট মনিবের রাতের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে [illegible]।

কালীনাথ সিতুর বিছানার পাশে দাঁড়ালেন। শমীকে বসতে বলে সিতুর দিকে ফিরলেন।—তুই তাহলে এই কটা দিন উপোসীবাবা হয়ে ছিলি? শমী, পুণ্যি করতে চাস তো উপোসীবাবা দেখে নে ভালো করে···আর মামু, তুমি তোমাদের আনন্দবাবাকে খবর দাও একটা, হরিদ্বার ছেড়ে এখানেই এসে একটা আশ্রম খুলে বসুক।

কথাগুলো কালীনাথ খুব গম্ভীর মুখেই বলেছেন। শোনার পরেও হাসেনি কেউ। এই বাতাসে হাসি বেমানান। শমী বসেনি, তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। গৌরবিমল ঘরের মধ্যেই পায়চারি করছেন। একটু বাদে কালীনাথ চলে গেলেন। সিতু চোখ বুজে শুয়ে আছে। কিছু ভাবতে চেষ্টা করছে। শ্মশান থেকে ফিরে অনেকক্ষণ ধরে চান করেছিল, তারপর দোতলায় উঠে ঘরে ঢুকেছিল···তারপর কি এক ভর-ভরতি স্পর্শের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিল···ডুবে গেছল। মাঝের পনেরটা বছর মিথ্যে হয়ে গেছল।

চোখ মেলে তাকালো সিতু। সেই ঘরেই শুয়ে আছে। মায়ের ঘরে। মায়ের বিছানায়। মাঝের পনেরটা বছর এখনো সরিয়ে দিতে পারছে। তাই আবেশে চোখ বুজে আসছে।···একদিন মা তাকে এই ঘরে টেনে এনে, এই বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আর নিজেও শুয়ে তাকে বুকের কাছে টানতে চেষ্টা করেছিল। সিতুর অস্বস্তির একশেষ, সরে যেতে চেষ্টা করেছিল, আর বলেছিল লজ্জা করছে।

সচকিত। মায়ের কি একটা সম্পদ যেন হাতে পেয়েছিল···পড়ছিল। এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। শমী এগিয়ে এলো আর একটু। গৌরবিমল কাছে এসে মাথায় হাত বোলালেন একবার।—কিছু চাস?

···একটা বাঁধানো খাতা ছিল।

গৌরবিমল তক্ষুনি বুঝলেন কোন্ খাতা খুঁজছে। মেঘনার চিৎকারে ছুটে এসে খাতা বুকে নিয়ে ঘরের মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে থাকতে দেখেছিলেন। ড্রেসিং-টেবিলের ওপর থেকে বাঁধানো খাতাটা তুলে নিয়ে শেষের সেই লেখাটা দেখতে দেখতে কাছে এলেন আবার।—এটা পড়ছিলি বুঝি?

সিতু জবাব দিল না।

গৌরবিমল বললেন, তোর মায়ের বাবা রোজ সকালে এই স্তোত্র পড়তেন, গলা ছেড়ে সকলকে আলোয় আসতে ডাকতেন।···তোর মা লিখে রেখেছিল দেখছি।

লেখাটা শমীর দিকে এগিয়ে দিলেন তিনি। শমী পড়ল। চোখের জলে ঝাপসা দেখছে লেখাগুলো। সময় লাগল পড়ে উঠতে। বুকের তলায় কান্নার সমুদ্র। তবু কাঁদতে পারছে না। স্বামী কাঁদতে বারণ করেছিল। এই দিনে এই আলোর

ডাক শুনেও প্রাণভরে কাঁদতে না পারা যে কত বড় শাস্তি, এ কি মাসী এখন জানতে পারছে, দেখতে পাচ্ছে ?

ওকে বসতে বলে গৌরবিমল ওর খাওয়ার ব্যবস্থা দেখতে গেলেন। খাতা হাতে শমী শয্যার পাশেই বসল। ঘাড় ফিরিয়ে সিতু এবার তাকে দেখছে।

বিষণ্ণ দু চোখ তুলে শমী চেয়ে রইল একটু, তারপর আহত মৃদু স্বরে বলল, তিন দিন ধরে খেতে বেরিয়ে না খেয়ে ফিরে এসেছ ?

সিতু নিরুত্তর। যে অনুভূতির মধ্যে ভাসছে তাতে ছেদ পড়ুক, চায় না। ছেদ পড়ল না, বরং অদৃশ্য এক পাওয়ার স্পর্শ কত যে নিবিড় হতে লাগল ঠিক নেই। ও সব হারিয়েছিল, সব হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছিল। যে গেল সে আর আসবে না। কিন্তু তার সত্তার নিভৃতে বড় বিচিত্রভাবে ফিরে এসেছে সে। তাকে ঘিরে রেখেছে, তাকে কোলে নিয়ে বসে আছে যেন। সিতু যেন ধরতে ছুঁতে পারছে তাকে। বাইরে তাকে আর পাবে না ভাবতে বুক ভেঙে যাচ্ছে, ভিতরটা ভরাট। এত বড় শোকের মধ্যেও সেখানে পাওয়ার উৎসব লেগেছে—সিতু সেই জোয়ারে ভাসছে। তাই সব ভালো লাগছে। ওই একজন ছিল না তাই জগৎ বিবর্ণ হয়ে গেছল, ঊষর মরুভূমি হয়ে গেছল। কিন্তু এক মুহূর্তে যেন রঙ বদলে গেছে, সবেতে ফল ধরেছে। সিতু সব ফিরে পেয়েছে, সকলকে ফিরে পেয়েছে। নিজেকে, বাবাকে, ছোট দাদুকে, জেঠুকে, মেঘনাকে…শমীকে। শমীর দিকে নিষ্পলক চেয়ে আছে। মা যেন তার নিজের অনেকখানি ওর মধ্যেই ছড়িয়ে রেখে গেছে।

এই শমীকে কোনদিন ভালো করে দেখেনি কেন সিতু ?

কান পেতে শুনতে হয় এমনি অস্ফুট স্বরে বলল, শমী, আমার মা শুধু রাণী নয়, আমার মা জ্যোতিরাণী…।

কান্না রোধের শেষ চেষ্টা করছে শমী। বিষণ্ণগভীর দুই চোখে আশা আগ্রহ আকুতি উপ্‌চে উঠল। নিজের অগোচরে সামনে ঝুঁকল, তপ্ত হাতখানা তার হাতের ওপর রাখল। অধীর ব্যাকুল দু চোখ মুখের ওপর স্থির মুহূর্তের জন্য। তারপর আরো ঝুঁকে ধরাগলায় ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল, তোমার মা জ্যোতিরাণী তুমি বুঝতে পারছ ? পারছ ?

সেই রাতেই দ্বিতীয়বার স্ট্রোক হল শিবেশ্বর চাটুজ্যের। রাত্রিতে শামু তাঁর ঘরের দরজায় শোয়। প্রথমবারের স্ট্রোকের পর অনেকদিন পর্যন্ত কালীনাথ নিজেই তাঁর ঘরে থাকতেন। এটা পরের ব্যবস্থা। ভোরের দিকে শামু অস্বাভাবিক একটা শব্দ শুনে জেগে উঠেছিল। দেখে—বাবু মেঝেতে পড়ে

আছেন। তক্ষুনি ছুটে গিয়ে কালীনাথকে আর ছোট দাত্নকে খবর দিয়েছে।

একটা মৃত্যুর চাপা প্রতিক্রিয়া অনুভূতির বাস্তব জুড়ে বসতে না বসতে জীবন-মৃত্যুর আর এক খেলা শুরু। এ খেলায় জীবন জিতবে কি মৃত্যু, সেটা অনিশ্চিত ছিল না খুব। মৃত্যুর দখল প্রতি মুহূর্তে প্রতি পলে স্পষ্টতর হয়ে উঠছিল। সিতু নির্বাক দ্রষ্টা, শমীও। কিন্তু সমস্ত শক্তি দিয়ে এই মৃত্যু প্রতিরোধ করতে চেয়েছেন একজন। কালীনাথ।

আশ্চর্য, এবারেও তিনি জিতলেন। শহর কলকাতার চিকিৎসা-জগৎটাকে তিনি যেন ত্রিকোণ রাস্তার বড় বাড়ির এই একটা ঘরের মধ্যে এনে ফেললেন। তারপর টানা পাঁচ সপ্তাহ দুর্বহ নীরবতার মধ্যে চলল জীবন-মৃত্যুর সেই যুদ্ধ। তারপর একসময় মনে হল মৃত্যু সরে দাঁড়াচ্ছে। সরেই দাঁড়াল। কিন্তু যা রেখে গেল, তাও জীবন কি মৃত্যু বোঝা ভার। জীবনের সর্বাঙ্গে মৃত্যু এবারে যে থাবাটা বসিয়ে গেল, দেখলে চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করে।

শরীরের অর্ধ-বিকল দিকটা সম্পূর্ণ বিকল হয়েছে। ডান হাতটা আর ডান দিকটা সম্পূর্ণ পঙ্গু, অসাড়। বাঁ-দিকেরও খানিকটা করে। মুখ বেঁকে দুমড়ে এক অদ্ভুত আকার নিয়েছে। জিভ আড়ষ্ট, কথা বলার শক্তিও সম্ভবত চির-কালের মত গেছে।

এ দৃশ্য শমী দেখতে পারে না, ঘরে ঢুকলে ছুটে বেরিয়ে আসতে ইচ্ছে করে। নির্বাক স্থির চোখে সিতু দেখে চেয়ে চেয়ে। বিরাট শক্তি, বিরাট দম্ভ, বিরাট ক্ষোভের শেষ পরিণাম দেখে—ভাঙা দুমড়ানো নিঙড়নো ভয়াবহ একটা আকার শুধু। সব থেকে মর্মান্তিক, ওতে জীবনের স্পন্দন আছে, অনুভব-শক্তি আছে। সিতুর মনে হয় মৃত্যু এর থেকে অনেক সুন্দর, অনেক—অনেক বেশি কাম্য।

আশ্বাস দিয়ে বড় ডাক্তার যেদিন নিয়মিত আসা ছাড়লেন, কালীনাথ সেই রাতে সিতুর ঘরে এসে বসলেন। সিতু আবার তার ঠাকুমার ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। মায়ের ঘরে শমী থাকবে, এটা তারই ব্যবস্থা।

কালীনাথ শ্রান্ত, কিন্তু নিশ্চিন্ত কিছুটা। সত্যিকারের ঝড়টা যেন তাঁর ওপর দিয়েই গেল। বললেন, এযাত্রাও ফাঁড়া কাটল—

কথাটা কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সিতু সচকিত হয়ে তাকালো জেঠুর দিকে। যা দেখতে চাইল, তা দেখা গেল কিনা সে-ই জানে। জেঠু অনেক করেছে, যা করেছে তার জন্যে যে কোনো ছেলের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কিন্তু এই করাটা কতখানি প্রীতি-ভালবাসার তাগিদে আর কতখানি শকুনির প্রেরণায়, হঠাৎ সেই সংশয়। জীবনকে জিইয়ে রেখে মৃত্যু দেখার তুষ্টি কিনা, সিতু তাই বুঝে নিতে চায়। কিন্তু

জেঠুর মুখে মনের ছায়া পড়ে না বড়। জিজ্ঞাসা করল, ফাঁড়া কাটল বলে তুমি খুশি?

কালীনাথ থমকালেন একটু। সেটা প্রশ্নের ধরন দেখে। সন্দেহ কিছু করলেন না, ভাবলেন এমন জীবন্মৃত অবস্থায় বাঁচাটা বাঁচার মত নয় বলেই বলছে। জবাব দিলেন, কি করবি বল্, ধরে রাখার চেষ্টা তো করতেই হবে।

সিতু আর কিছু বলল না। প্রশ্নটা একটা অস্বস্তির মত মনের তলায় থেকেই গেল।

সর্বরকমের পরিস্থিতি দখলে আনার চেষ্টাটা স্বাভাবিক। এই চেষ্টার ফলে বাবা এই বাড়ির মধ্যে থেকেও এক ধরনের বিচ্ছিন্নতার ওধারে চলে গেল। রোজ একজন ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে যায়। পাকা-পোক্তভাবে তিনজন অভিজ্ঞ নার্স ঠিক করা হয়েছে। পালা করে চব্বিশ ঘণ্টার ডিউটি তাদের। টাকা ঢালতে পারলে সহিষ্ণু সজাগ সেবা কেনার অসুবিধে নেই। মোটা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে চিরশয্যাশ্রয়ী গৃহস্বামীর যাবতীয় দায়িত্ব তারা গ্রহণ করেছে। এছাড়া কর্মঠ আর একজন বাড়তি চাকর বহাল করা হয়েছে—সারাক্ষণ ওই ঘরের দরজায় মোতায়েন থাকা কাজ তার।

এই সমস্ত ব্যবস্থাই জেঠু করেছে। তবু সিতুর ধারণা এসব ব্যবস্থা বাবার ইচ্ছেতেই হয়েছে, নিজেই এই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে সরে গিয়ে ওদের স্বস্তি দিতে চেয়েছে। কথা বলতে পারে না, হাতের আঙুল পর্যন্ত নাড়ার শক্তি নেই—এমন অথর্ব দেহের প্রতি আপনজনেরও বিমূঢ় উদ্বেগ সর্বদা কাম্য নয় বোধ হয়। এক জেঠু ছাড়া আর সকলের যখন-তখন ওই ঘরে ঢোকাও কমে এলো। সিতু সকালে আর সন্ধ্যায় একবার করে যায়, চুপচাপ খানিক বসে থাকে, তারপর বাবার নীরব অস্বস্তি অনুভব করেই উঠে চলে আসে আবার।

তিন-তিনজন নার্স আসার আগে দুই-এক দিন শমী ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওঘরে কাটিয়েছে। শেষে তারও মনে হয়েছে, বসে থেকে সে যেন সুবিধের থেকে অসুবিধেই বেশি সৃষ্টি করেছে। এখন কালী জেঠু সন্ধ্যার দিকে একবার ডাকলে ঘরে যায়, তার ইঙ্গিতে আবার উঠে চলে আসে। এখান থেকেই কলেজে যাতায়াত করছে।

ফ্ল্যাটবাড়িতে যাবার প্রস্তাব করে শমী জেঠুর কাছে ধমক খেয়ে কিছুদিন চুপ করেছিল। শেষে সিতুর কাছেই কথাটা তুলল একদিন, বলল, এবার ফ্ল্যাটে ফেরা দরকার তো···।

খানিক অপেক্ষা করে সিতু জিজ্ঞাসা করল, দরকার কেন?

শমী মুশকিলে পড়ল একটু। আমতা-আমতা করে বলল, দিনকতক থেকে

আসি···মাসী তো হাসপাতাল থেকেই চলে গেল, তার ঘর, জিনিসপত্র সব তেমনি পড়ে আছে।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে সিতু শান্ত মুখে বলল, শমী, আমার মন বলছে তোমার মাসী এখানেই ছিল, এখান থেকেই গেছে, তার যা-কিছু পড়ে আছে এখানেই পড়ে আছে··আর, তুমি তার ঘরেই আছ। এরকম ভাবতে তোমার খুব অসুবিধে হবে?

ঘাবড়ে গিয়ে শমী তাড়াতাড়ি মাথা নাড়ল, অসুবিধে হবে না।

বাড়ির মধ্যে এই একজন কথা এত কম বলে আজকাল যে শমীর ভয়ই করে। মাসী তাকে অনেক উপদেশ দিয়েছিল, আর সাবধান করেছিল, ও ফিরে এলে দুঃখ দিবি না, অবাধ্য হবি না, আমার কথা ভেবে কক্ষনো একটুও রাগ পুষবি না, দুঃখে জ্বলে-জ্বলে ও কি যে হয়ে গেছে জানিস না, ভাবলে আমার আনন্দ হয়, আবার ভয়ও করে।

শমী জিজ্ঞাসা করেছিল, ভয় কেন। মাসী বলতে পারে নি কেন। বলেছিল, কি জানি কেন ভয়। মাসীর সেই অজানা ভয়ের সুরটাই শমীর মনে লেগে আছে কিনা জানে না।···ফিরেছে বটে, কিন্তু যে গেছল সে ফেরেনি। মানুষটা সর্বদাই যেন খুঁজছে কিছু, কিছু একটা হাতড়ে বেড়াচ্ছে, আর নিঃশব্দে কি এক অপরিপূর্ণতার ভার বইছে। খুব কাছে থাকলেও কাছে মনে হয় না। শমী এক-একসময় খুঁটিয়ে লক্ষ্য করেছে। সেই বারো-তেরো বছর বয়েসের অপরিণত তৃষ্ণায় ওর দেহটার ওপর কত রকমের হামলা যে করেছে ঠিক নেই। আঠারো বছর বয়সেব নৃশংস তাড়নায় ওকে ভুলিয়ে স্কুল থেকে বার করে নিয়ে গিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে ময়দানের বেঞ্চিতে টেনে এনে রাক্ষসের মত ওকে ভিন্নভিন্ন করে দিতে চেয়েছিল। কলেজে বা য়ুনিভার্সিটিতে যাতায়াতের বাস-স্টপের উল্টোদিকে গাড়ি থামিয়ে দিনের পর দিন ওকে শুধু দুটো চোখ দিয়েই নিঃশেষে গ্রাস করতে চাইত, আর, সবশেষে গ্রাসের সেই নিষ্ঠুর মত্ততায় পাগলের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে গাড়িতে টেনে তুলেছিল—সেই সব প্রবৃত্তির ছিটে-ফোঁটাও আর চোখে পড়ে কিনা শমী খুঁটিয়ে লক্ষ্য করেছে। লক্ষ্য করতে গিয়ে শমী নিজে অপ্রস্তুত হয়েছে, নিজের উদ্দেশে ভ্রূকুটি করেছে, তবু লক্ষ্য না করে পারেনি।

নিস্পৃহতা নয়, বরং সব থেকে বেশি টান এখন তারই ওপর, অনুভব করতে পারে। তবু শমীর ধারণা, কাছে আছে বটে, কিন্তু ভিতরের মানুষটা অনুপস্থিত, নিরুদ্দিষ্ট। কোথায় কোন্ দূরে বিচরণ করছে, চেষ্টা করেও শমী তার হদিস পায় না। মাসীকে নিয়ে হরিদ্বার ছেড়ে আসার আগে রাগের মাথায় তীব্র শ্লেষে মুখের

ওপর যে কটূক্তি করে এসেছিল মনে আছে। বলেছিল, তার ভণ্ডামি সে চেনে, দশ বছর বয়স থেকে সে যে কি তা ওর জানতে বাকী নেই।…বলেছিল যখন, তখনো ভাবতে পারেনি মানুষটা কত বদলেছে।

সেদিন শিবেশ্বরের ঘর থেকে বেরিয়ে কালীনাথ সিতুর ঘরে এলেন। শমীও তখন সেই ঘরে। মেঘনা তার হাত দিয়ে ছোট মনিবের জন্য গরম দুধ পাঠিয়েছিল, খাওয়া হলে গেলাসটা নিয়ে যাবে বলে শমী দাঁড়িয়ে আছে।

দুজনকেই এক পলক দেখে নিয়ে কালীনাথ গম্ভীর মুখে বসলেন। সিতুকে বললেন, তোর সঙ্গে একটা দরকারী আলোচনা আছে…লজ্জা না পেলে শমীও শুনতে পারে।

জেঠুর তাজা ভাবটুকু বজায় আছে বলেই বাড়ির বাতাস সর্বদা গুমরে মরছে না এখনো। শমী আর সিতু জিজ্ঞাসু।

কালীনাথ ধীরে-সুস্থে আবার মুখ খুললেন।—তোর বাবা বলছিল আর দেরি না করে বিয়েটা তাড়াতাড়ি হয়ে যাওয়া দরকার।

পায়ে-পায়ে শমীর সরে পড়ার মতলব। কিন্তু ওদিকে আর একজনের দিকে চোখ পড়তে যেতেও পারল না। দুধের গেলাস রেখে সিতু সোজা হয়ে বসেছে। —বাবা বলছিল!

মুখে না বলতে পারলেও তোর বাবা কখন কি বলতে চায় আমি বুঝতে পারি।

সিতুর মুখে বিরক্তির আঁচড় পড়তে লাগল, যা আজকাল সচরাচর পড়ে না। বলল, দেড় মাস হয়নি মা গেছে, এর মধ্যে বিয়ে!

কালীনাথ দ্বিধান্বিত, বললেন, কিন্তু এদিকের যা অবস্থা, দেরি করা ঠিক হবে?

তা তো বুঝলাম, এক বছর না গেলে বিয়ে হয় কি করে?

এই সমস্যায় পড়বেন কালীনাথ ভাবেননি। শমী মনে মনে চাইছে, জেঠু এ নিয়ে যেন আর কথা না বাড়ায়। কালীনাথও অনুভব করলেন কিছু, কথা না বাড়িয়ে প্রস্থান করলেন।

দিনকতক বাদে শমী আবার এক বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ল। সন্ধ্যার পর পাশের ঘরে ডাক পড়তে গিয়ে দেখে মেসোমশায়ের সামনে জেঠু বসে, আর তার সামনের ছোট টেবিলের ওপর বেশ বড়সড় সুটকেস একটা। জেঠু সেটা খুলতে বলল ওকে। খুলে শমী অবাক। সুটকেস ভর্তি লাল-নীল-সবুজ গয়নার বাক্স। জেঠু জিজ্ঞাসা করল, এগুলো কার ছিল বুঝতে পারছিস?

শমী সামান্য মাথা নাড়ল, পারছে।

তোর শ্বশুরের খুব ইচ্ছে এগুলো তুই পরিস, এখানেই বসে পর দেখি খানকয়েক।

বিমূঢ় শমী বিছানায়-শোয়া মানুষটার দিকে তাকালো একবার। নির্বাক দুটো চোখে শুধু অনুরোধ নয়, আকুতি দেখল যেন। প্রথম যেটা হাতে ঠেকল শমী সেই বাক্সটাই খুলল আস্তে আস্তে। বড় হার একটা। পরল। জেঠু তাগিদ দিল, ও কি, হাত গোটালি কেন, আরো পর।

একে একে আর এক ছড়া হার, দুল, দুগাছা করে চুড়ি আর তার ওপর মোটা মোটা দুটো বালা পরার পর নিষ্কৃতি। খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে জেঠু মন্তব্য করল, থাক, আর পরলে তোকে আবার টেনে তুলতে হবে। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পরিস, সুটকেসটা নিয়ে যা।

দুজনকে প্রণাম করে সুটকেস হাতে শমী ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা সিতুর ঘরে। দরজা আবজে দিয়ে সুটকেসটা ধপ করে তার সামনে রেখে বলল, দেখো কাণ্ড—

কি?

নতুন কিছু দেখছ না?

আর একবার চোখ বুলিয়ে সিতু বলল, গয়নাগাঁটি পরেছ দেখছি।

হ্যাঁ, জেঠুর মারফৎ বাবার হুকুম—মাসীর এসব গয়না আমাকে পরতে হবে। এগুলো তাঁদের সামনে পরেছি, এখন তাঁদের ইচ্ছে বাদবাকীগুলো তুমি পরিয়ে দাও, তারপর আমাকে একটা ঠেলাগাড়িতে তুলে ঠেলে নিয়ে বেড়াও।

সহজ হবার চেষ্টায় বলা। সিতুর ঠোঁটেও হাসি, চোখে দেখার আগ্রহ। নিষ্পলক চেয়ে আছে। খুশী হয়েছে বোঝা যাচ্ছে। শমী আবার বলল, এ গয়না পরে মাসীকে কি দেখাতো আর আমারই বা কি রূপ খুলেছে!

সিতুর আনন্দ-উপ্চানো দু চোখে কি যেন তন্ময়তা। সুটকেসের গয়নার বাক্সগুলো নাড়াচাড়া করল খানিক। স্পর্শ অনুভবের চেষ্টা। ছোট একটা বাক্স খুলল। তার মধ্যে বড় ঝক্‌ঝকে একটা হীরের আংটি। শমীর হাত টেনে নিয়ে আঙুলে পরিয়ে দিল সেটা। লজ্জারক্ত শমী চকিতে পিছন ফিরে ভেজানো দরজার দিকে তাকালো একবার।

সিতুর চোখে-মুখে দূরের তন্ময়তা। শমীর হাত তার হাতে তখনো। নিজের মনেই বলল, মা-কে পেয়ে আমি কত পেলাম ঠিক নেই…

কি-চ্ছু পাওনি, ছদ্মগাম্ভীর্যে শমী বলল, তোমাকে দেখলে মনে হয় হরিদ্বারের কোন্ পাহাড়ের মাথায় বসে আছ এখনো।

শমীকে ভালো লাগে, কত যে ভাল লাগে সিতুই শুধু জানে। যখন কিছু ভাল লাগে না, কাউকে ভাল লাগে না, তখন বাড়ির মধ্যে শুধু ওকেই খোঁজে। মায়ের গয়না পরার দরুন আজ আরও ভাল লাগছে। স্বল্পক্ষণের জন্যে হলেও স্বাভাবিক কৌতুকের একটা মিষ্টি লোভ উঁকিঝুঁকি দিল। হেসে বলল, বিয়ের তো বেশ দেরি এখনো, পাহাড় থেকে বেশী নামলে তোমার পক্ষে ভাবনার কথা হবে না?

শমীর চোখে-মুখে আনন্দের ছটা। প্রত্যাশার অতিরিক্ত কিছু শুনল যেন। তার হাত তখনো ওই হাতের মুঠোয়, ভিতরটা বিহ্বল। এই তরল সহজতাটুকু ধরে রাখার চেষ্টা। সম্ভব হলে বলত, সত্যি নেমে এলে ভাবনা বরং ঘোচে। বলল যা তাও কম নয়। ঠোঁটে হাসি, চোখে চোখ।—ভাবনায় তো পড়ে আছি সেই ন বছর বয়েস থেকে, আজ আংটি পরানো পর্যন্ত সারা, ভাবনারই বরাত। তা পাহাড় থেকে নামোই যদি কিরকম ভাবনার কথা হবে? ভুলিয়ে স্কুল থেকে বার করে গড়ের মাঠে নিয়ে গিয়ে তুলেছিলে, সে রকম...না বি-এ পাস মেয়েকে দিনে-দুপুরে চড়ের চোটে গালে পাঁচ আঙুলের দাগ বসিয়ে গাড়িতে টেনে তুলতে চেয়েছিলে, সে-রকম—নাকি, তার থেকেও বেশি?

সিতু হাসছে। অদ্ভুত লাগছে। কথাগুলো পুরনো ক্ষত মনে করিয়ে দেবার মত নয়, উল্টে ক্ষত মুছে দেবার মত। এক পলক দেখে নিয়ে আরো গম্ভীর মুখ করে শমী আবার বলল, তবু নেমেই এসো তো, বেশী ভাবনায় ফেলতে চেষ্টা করলে আমার হাতেও ব্যবস্থা আছে।

কি ব্যবস্থা?

মেয়েদের খাতা একগাদা জমে আছে, হাতে পেন্সিল দিয়ে খাতা দেখতে বসিয়ে দেব।

গয়নার বাক্স ফেলে রেখেই উঠে চলে এলো। লজ্জাই করছে। ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে মাসীর চোখে চোখ—দেয়ালের ছবির মধ্যে বসে মাসীও মুখ টিপে হাসছে তার দিকে চেয়ে। ভুরু কুঁচকে বলতে ইচ্ছে করল, ওভাবে না বলে এসে করি কি, নিজের ছেলের ভাবখানা তো দেখছ!

ভিতরে ভিতরে সিতু কি যে হাতড়ে বেড়াচ্ছে নিজেই ঠাওর করতে পারে না। শক্ত বর্তমানের এই বাস্তবের দিকেই ফেরাতে চায় মনটাকে। বাড়ির দিকে, বাবার দিকে, বাড়ির অন্য মানুষদের দিকে, শমীর দিকে। সকলের ভিতরে থেকেও এই মন কোথায় উধাও হয়ে যায় আর অবিরাম কি যে খোঁজে, জানে না। কালের আঘাতে গড়া এই শূন্যগর্ভ স্বপ্ন থেকে সত্য কিছু ছেঁকে তোলার তাগিদ।

প্রভুজীধামের চাবি এখন তার কাছে। মাঝে মাঝে সেখানে যায়। লোক রেখে ওখানকার পরিত্যক্ত চেহারাটা বদলানো হয়েছে আবার। কেন জানে না চোখে খারাপ লেগেছিল তাই বোধ হয়। সামনের হলঘরে খেয়ালী শিল্পীর আঁকা প্রভুজীর সেই বড় অয়েল-পেন্টিং টাঙানো। তার সামনে এসে দাঁড়ায়। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে ঠিক নেই। কখনো ভাবে, ওখান থেকেই নির্দেশ আসবে কিছু ; হরিদ্বারে এক-একটা সঙ্কটের মুখে হঠাৎ হঠাৎ ভিতরটা এঁরই শরণাপন্ন হত কেন।

এক-একসময় শমীও সঙ্গে থাকে। কোথায় যাচ্ছে টের পেলেই সঙ্গে আসে। ওই ছবির সামনে তাকে অমন নির্বাক নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে কি এক অদ্ভুত আশঙ্কায় ভিতরটা অস্থির হয়ে ওঠে। এই ছবির সামনে দাঁড়িয়ে রক্ত-মাংসের একটা মানুষ এ-রকম স্থির হয়ে যায় কি করে ভেবে পায় না। সঙ্গে সঙ্গে মাসীর এক-একদিনের গল্প মনে পড়ে। সব থেকে বেশি মনে পড়ে এগারো দিনের এক শিশুর ঝাঁকড়া কালো চুলের মধ্যে ধপ্‌ধপে একটা পাকা চুল দেখে তার ঠাকুমার চিৎকার করে ওঠার গল্পটা। আর তক্ষুনি এম. এ পাস কলেজে-পড়ানো মেয়ের বুকের ভিতরটা দুরদুর করে ওঠে কেমন।

সেদিনও বহুক্ষণ অমনি শুব্ধ মুখে দাঁড়িয়ে থেকে সিতু একসময় নিজের মধ্যে ফিরে এলো। হেসে উঠে বলল, যত পাগলের ব্যাপার—

কি ?

সচকিত হয়ে সিতু তাকালো তার দিকে, কাউকে শোনাবার জন্য ও-কথা বলেনি। শমী আবার জিজ্ঞাসা করল, পাগলের ব্যাপারটা কি ?

কিছু না, চলো।

শমী লক্ষ্য করল, গাড়িতে উঠে বসতে না বসতে মানুষটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল আবার। ও পাশে বসে আছে, তাও আর হুঁশ আছে কিনা সন্দেহ।

আনন্দবাবা সংসারে ফিরতে বলেছিলেন সিতুকে, সব দেখতে বলেছিলেন, শুনতে বলেছিলেন। সিতু দেখে, শোনে। কিন্তু দেখার কি আছে, শোনার কি আছে ভেবে পায় না। দুনিয়াটা যেন কি এক অনড় বোঝা ঘাড়ে নিয়ে একভাবে দাঁড়িয়ে আছে। নিজের ছেলেবেলায় যেমন দেখেছিল তেমনি।···ছেষট্টি সাল এটা। এর মধ্যে কত কি ঘটে গেছে, রোজ কত কি আলোড়ন উঠছে। দু-দুটো সঙ্ঘর্ষের বন্যা পার হয়েছে দেশের ওপর দিয়ে—একবার চীনের সঙ্গে হামলা, আর একবার পাকিস্তানের সঙ্গে ছোটখাটো যুদ্ধ একটা। একে একে কজন দেশনেতা চোখ বুজল— বিধান রায়, জওহরলাল, লালবাহাদুর। মাসের পর মাস ধরে চতুর্দিক

থেকে একটা নেই-নেই রবে কানে তালা লাগার উপক্রম—চাল নেই, ডাল নেই, তেল নেই, চিনি নেই, পরনের কাপড় নেই, মাথা গোঁজার জায়গা নেই। অথচ এত কাণ্ডর মধ্যেও মানুষের ভেতর বদলায়নি। সেই একভাবে, এক সুরে চলছে। চলছে না, থিতিয়ে আছে।

সিতু চেয়ে চেয়ে দেখে।···সেই চালিয়াত ভুলুর সঙ্গে দেখা হয় কখনো-সখনো। ভুলু সাগ্রহে দাঁড়িয়ে পড়ে। ফ্যাক্টরীর ফোরম্যান হয়েছে এখন। দু-দশ কথার পর কোন্ ওপরঅলার সঙ্গে খাতির আর কার ওপর রাগ—আগের মত এখনো ঠিক সেই কথাই এসে পড়ে। নীচে এসে দাঁড়ালে কখনো-সখনো গলির মুখ থেকে ভীতু অতুল এগিয়ে আসে। পাঁচ মিনিট কথা বললেই ও এখন কোন্ অসুখে ভুগছে আর কোন্ অসুখের ভয়ে তার ভিতরটা মুষড়ে আছে বোঝা যায়। নেশা-গর্বী সজারুমাথা সুবীর আগের মতই বড়লোকের ছেলেকে খাতির করার জন্য সাগ্রহে এগিয়ে আসে। দু-চারটে কুশল প্রশ্নের পরেই হেসে বলে, তোমাকে তো এখন ভাল নেশায় ধরেছে শুনছি, আধ্যাত্মিক নেশা—আমরাই মরলাম। ভাল-মন্দ দুই-ই তার কাছে নেশার ফল। কি ভেবে ক্লাসের সেই ভাল ছেলে সমরের বাড়িতে গেছল একদিন—উত্তর বলার জন্যে হাত তুলে যে ঘোড়ার মত লাফাত—আর সর্বদা বোঝাতে চেষ্টা করত, সকলের থেকে কত বেশি জানে। সে এখন কোন্ পরিকল্পনা বিভাগে বড় চাকরি করছে। দেখা হতে খাওয়ালো, আদর-অভ্যর্থনাও করল। আর বলল, কারো মগজে কিছু নেই, এ দেশের হবে কি। হাতে ক্ষমতা থাকলে দেখিয়ে দিতে পারত, মাথা খাটিয়ে কত কি করা যায়। এবারে একটা চমকপ্রদ প্ল্যান নিয়ে মেতে আছে সে, দেখা যাক কর্তাদের টনক নড়ে কিনা।

···কয়েক বছর আগে নীলিদি নাকি কার সঙ্গে চলে গেছে কোথায়। সিতু ভাবে, নীলিদির আগেও তো অনেকে ওইভাবেই গেছে। গলিতে ভরা-বয়স আর উঠতি বয়সের নতুন মুখ দেখা যাচ্ছে আবার—একদিন যাদের ছোট দেখেছিল, তারা। গলির মুখে দাঁড়িয়ে থাকে, মানুষ-জন দেখে, নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করে, গল্প করে।···সেই একই চিত্র। এদের মধ্যে কারো কারো বিয়ে হবে, দুই-একজন নীলিদির মত নিখোঁজ হবে, মিত্রামাসী আর হেলেন জোন্স-এর মতও হতে পারে কেউ কেউ—এক-আধজন হয়ত বা রঞ্জুদির মত হবে। রঞ্জুদিকেও দেখেছে, লক্ষ্য করেছে। ওই গলিতেই থাকে এখনো। সাড়ে নটায় বেরুতে দেখে, সাড়ে পাঁচটা-ছটায় ফেরে। কোথায় চাকরি করে এখন সিতু জানে না। পা থেকে মাথা পর্যন্ত—গোটা রঞ্জুদি একটা কঠিন বস্তুতে পরিণত হয়েছে যেন।

দু-দিকের চোয়ালের হাড় উঁচিয়ে উঠেছে, মাথায় চুল কমে গেছে, শরীর শুকিয়েছে। আসা-যাওয়া করে যখন, গলির মুখের অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের হাসি-গল্প বন্ধ হয়ে যায়।

…ছোট ছোট ছেলেরা বাইরের রকে বসে বা রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ঠিক তেমনি করেই আড্ডা জমায়। যা ওরা করত। সেই রকমই ছুটোপুটি করে, অশ্লীল কটূক্তি করে ওঠে, মেয়েদের দেখলে ভিতর চঞ্চল হয়, নিজেদের মধ্যে টীকা-টিপ্পনী কাটে।…ওদের কেউ সুবীর হবে, কেউ সমর হবে, কেউ দুলু হবে কেউ বা ভীতু অতুল হবে…আর কেউ বা ওর মত হবে।

সিতু চমকে ওঠে। না ওর মত হয়ে কাজ নেই।

দম বন্ধ হবার উপক্রম হঠাৎ। এ কি স্রোতশূন্য ধারাশূন্য জীবনের বদ্ধ জলার মধ্যে পড়ে আছে তারা? কত দিন ধরে পড়ে আছে? কত কাল ধরে? আর কত কাল এমনি থাকবে? এই একটা পাড়ার আয়নায় যেন গোটা দেশটাকে দেখা যাচ্ছে, চেনা যাচ্ছে। এ কি কাণ্ড!

একটা ছোট আলো জ্বলে উঠলে একরাশ অন্ধকার দূর হয়ে যায়। চেতনার কোন্ গভীর থেকে তেমনি একটা আলো জ্বলে উঠল বুঝি। কতকালের সঞ্চিত অন্ধকারের স্তূপ দীর্ণ-বিদীর্ণ করে সেটা কাছে এগিয়ে আসতে পারল। ছোট একটা প্রশ্নের আকারে মগজের সুপ্ত কোষগুলো সব জাগিয়ে দিয়ে যেতে লাগল।…যা হয়ে আসছে, তা যদি আর না হয়? ওই মেয়েগুলোর কেউ যদি নীলিদি, রঞ্জুদি, হেলেন জোন্স, মিত্রামাসী না হয়? ওই ছেলেগুলোর অনাগত মুখগুলো যদি সুবীর সমর দুলু অতুল বা সিতুর মত না হয়? অস্তিত্বের এই শোকটুকু শুধু যদি ঘোচানো যায়? তাহলে?

তাহলে কি হয় সেই চিত্রটা কল্পনায় দেখতে চেষ্টা করছে সিতু। দেখতে দেখতে বিভোর হয়ে যাচ্ছে। নিভৃতের ছোট আলোর ছটা বড় হয়ে হয়ে কাছে থেকে দূরে, দূর থেকে আরো কত দূরে ছড়িয়ে পড়ছে ঠিক নেই। এই তন্ময়তার মধ্যে তিন-চার দিন কেটে গেল। বাড়ির সকলে লক্ষ্য করছে, তন্ময়তার এই রূপটা নতুন ঠেকেছে সকলের চোখে। এই ভাবনার তলায় যাতনা নেই, অস্থিরতা নেই— শুধু যেন গভীর থেকে গভীরতর কিছুতে ডুব দেবার প্রশান্তি আছে।

সেদিনও সিতু নিজের ঘরের মেঝের আসনে বসেছিল। রাত তখন আটটা হবে। শমী কাছেই ঘুর-ঘুর করছিল। সিতু লক্ষ্যও করেনি। হঠাৎ সে ভাবছিল আনন্দবাবার কথা। থেকে থেকে কেবলই মনে হচ্ছিল, আনন্দবাবা শুধু মা-কে দেখার জন্যে তাকে ঠেলে পাঠাননি। ওকে সংসারে পাঠিয়েছেন আর সব দেখতে

বলেছেন, শুনতে বলেছেন, শুধু এই জন্তে। এই আলোটুকু দেখার জন্তে, আলোর এই সেতুপথে কানে অবিরাম যে বার্তা আসছে তাই শোনার জন্তে। তার ভাবনাটা সঙ্কল্পের যে মোহনার দিকে ধেয়ে চলেছে, শুধু সেদিকে ছোটার জন্তে।

কি হল হঠাৎ কে জানে। শশব্যস্তে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।···চিন্তার আনাচ-কানাচেও যার অস্তিত্ব ছিল না, হঠাৎ সে আবার কোথা থেকে এলো? আগে মনে পড়েনি কেন? এই কদিন মনে পড়েনি কেন?

গায়ের চাদরটা টেনে নিয়ে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। সামনে শমী। ব্যস্ততা দেখে অবাক।—কি হল? কোথায় যাচ্ছ?

মুখ দিয়ে অস্ফুট একটা শব্দ বেরুলো শুধু, কি বলল বোঝা গেল না। দাঁড়িয়ে কথা বলে সময় নষ্ট করার মত সময়ও হাতে নেই যেন। চোখের পলকে নীচে নেমে গেল। সিঁড়ির সামনে বড় গাড়িটা দাঁড়িয়ে। কে বেরুবে, কার জন্তে দাঁড়িয়ে, জানে না। ড্রাইভারকে ডাকার ধৈর্যও নেই। উঠে বসে অনেক বছর বাদে নিজে কলকাতার রাতের রাস্তায় গাড়ি ছোটালো সিতু।

শ্মশান। এক পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে নামল। ত্রস্ত পায়ে ভিতরে ঢুকে থমকে দাঁড়াল। সাদাটে আলোয় রাত বোঝা যায় না। গোটা দুই-তিন চিতা জ্বলছে, গোটা দুই নিভে এসেছে। যে চিতায় মায়ের দেহ ভস্ম হয়েছিল আগে সেদিকে চোখ গেল। সেটা জ্বলছে না। সন্ধানী দু চোখ চারদিকে ঘুরে ঘুরে কাউকে খুঁজতে লাগল। পেল না। গঙ্গার ঘাটের দিকে এগলো।

এক কোণে বসে আছে একজন।···মেয়েছেলে। লালপেড়ে শাড়ি দেখে মনে হল সে-ই। সেই বিকৃতমস্তিষ্ক রমণী, যে চিতাভস্মে জল ঢালে—তারই জন্তে কোন্ এক বউ আত্মঘাতিনী হয়েছে বলে যার মাথা খারাপ। পায়ে পায়ে সিতু তার পিছনে এসে দাঁড়াল। মহিলা টের পেল না, তন্ময় হয়ে রাতের আকাশ দেখছে।

বীথিমাসী!

বিষম চমকে ঘুরে বসল। বিস্ফারিত দুই চোখে রাজ্যের বিভ্রম। চেয়ে আছে। কপালের বড় সিঁদুরের টিপটা জ্বলজ্বল করছে।

···কে তুমি?

আমি তোমাদের জ্যোতিরাণীর ছেলে সিতু, আমাকে চিনতে পারছ না?

সময় লাগল, কিন্তু চিনতে পারল। চেয়ে আছে। চেয়েই আছে। অনেকক্ষণ বাদে চাপাগলায় বলল, দিদির দেহ সেদিন তোমরা ওই ওখানে এনে ছাই করে দিয়ে গেলে না?

হ্যাঁ, দেহ···।

বিহ্বল চোখে শুকনো টান ধরছে। অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করল, আজ আবার কাকে নিয়ে এলে ?

কাউকে না, আমি তোমাকে নিতে এসেছি।

আবারও সেই বিস্ময়, বিভ্রম।—আমাকে, আমার কত পাপ জানো ?

সিতুর ঠোঁটে হাসি, দেখছে তাকে। হাল্কা কৌতুকের স্বরে বলল, যে আগুনে তোমাদের জ্যোতিরাণীর দেহ ছাই হয়ে যায়, তার থেকে ডবল আগুনে জ্বলে জ্বলে তোমার ও পাপটুকুও ছাই হয়নি বলছ ? আগুনকে অত অবিশ্বাস কোরো না বীথিমাসী।

নিজের অগোচরে বীথি উঠে দাঁড়াল আস্তে আস্তে। কাছে এগিয়ে এলো। দু চোখে আশা, ভয়, অবিশ্বাস। সত্যি তার সামনে কেউ দাঁড়িয়ে কিনা নিঃসন্দেহ হবার জন্য হাত বাড়িয়ে সিতুর গা, মুখ স্পর্শ করল।—আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে ?

প্রভুজীধামে।

চমকে উঠল প্রথম। তারপরেই আর্ত আকৃতিতে ফিসফিস করে বলে উঠল, সত্যি ? সত্যি সেখানে নিয়ে যাবি ? ওরে, তোকে কে পাঠাল ? আমাকে নেবার জন্য তোকে কে পাঠাল ?

সিতুর গলার স্বর ভারী, একটু থেমে জবাব দিল, বোধ হয় প্রভুজী নিজেই। এসো।

॥ আটচল্লিশ ॥

রাত মন্দ নয় তখন। কালীনাথ আর গৌরবিমল এক-একবার বাইরের বারান্দায় ঘোরাফেরা করে যাচ্ছিলেন, আবার ঘরে গিয়ে বসছিলেন। শমী লক্ষ্য করছে, মেঘনারও মুখ ভার। রাত আটটার পরে চোখের ওপর দিয়ে লোকটা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল, সাড়ে এগারটা বাজে, ফেরার নাম নেই, অথচ কোথায় গেল জানে না —এ যেন তারই দোষ। জেঠুর সামনেই একবার ওর গজগজানি কানে আসতে পালাতে হয়েছিল। মেঘনা বলছিল, বিয়েটা তাড়াতাড়ি চুকিয়ে-বুকিয়ে ফেলাই ভালো—রকম-সকম ভালো লাগছে না।

বারোটার কিছু আগে নীচে গাড়ি থামার শব্দ কানে এলো। একটু বাদে সিতু

ওপরে উঠে এলো। সামনে সকলকে দেখে অপ্রস্তুত।—সবাই ভাবছিলে বুঝি?

জবাব না দিয়ে গম্ভীর মুখে কালীনাথ কাছে এগিয়ে এলেন। গায়ের চাদরটা সরিয়ে দেখলেন ভিতরে কি আছে। শুধু গেঞ্জি একটা। দুটো ট্যাঁকই হাতড়ে পরীক্ষা করে নিলেন একবার। তারপর গৌরবিমলের দিকে ফিরলেন।—সাধু-টাধুদের ঠাণ্ডা লাগে না শুনেছি, মাঝরাস্তায় গাড়ির তেল ফুরিয়ে গেলে সেটা কিনতে পয়সাও লাগে না নাকি? ড্রাইভার বলছিল—গাড়িতে তেল বেশি ছিল না। শমীর হাসি-মুখখানা চড়াও করলেন কালীনাথ, হাসছিস কি, মেঘনার প্রেসক্রিপশনটা ওকে শুনিয়ে দিস—

শমীর মুখ লাল হওয়া সার। সিতু ততক্ষণে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেছে। সে যেন অদৃশ্য জ্যোতির তর্জনীর স্পর্শ পেয়েছে একটা। তার শিহরণে ভিতরটা কাঁপছে। কে কি বলছে কানে এলেও ভিতরে পৌঁছুচ্ছে না।

শমী ঘরেই খাবার এনে দিল। হাত-মুখ ধুয়ে সিতু খেতে বসল। রাতের আহার নামমাত্র। বাইরে কটা বছর কাটানোর ফলে এটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। তবু শমী কিছু বেশিই আনে, একথা-সেকথায় ভুলিয়ে খাওয়াতে চেষ্টা করে।

আজ সিতু খেয়াল না করেই খাওয়া সারল। মুখ-হাত ধোয়ার ফাঁকেও মাঝে মাঝে শমীকে দেখছে। দৃষ্টিটা ঝক্‌ঝকে। শমী অস্বস্তি বোধ করছে, আবার এ-মুখ অদ্ভুত ভালোও লাগছে। তাকালে মনে হয়, ভিতরের কি এক ভাবনার বোঝা সরে গেছে। চোখে-মুখে আনন্দ আর উদ্দীপনার ছটা, অথচ শান্ত, কমনীয়।

সিতুর খেয়াল হল কেউ একটি কথাও বলছে না। জিজ্ঞাসা করল, তোমার তো এখনো খাওয়া হয়নি বোধ হয়?

কই আর হল, দুজনেরটা একসঙ্গে এনেছিলাম, তুমি একাই শেষ করে দিলে।

অপ্রস্তুত মুখে সিতু শূন্য থালার দিকে তাকালো একবার।—সত্যি নাকি?

শমী হেসে ফেলল, তোমার আজ হল কি? আমার কি তোমার মত সাত্ত্বিক খাওয়া নাকি!…হবে'খন। জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল, কোথায় যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু এক্ষুনি আবার অন্য চিন্তায় ফেরাতে চায় না। বলল, ছোট দাদু আর জেঠু মনে মনে সারাক্ষণ বকছিল আমাকে, তাদের ধারণা, তুমি কোথায় গেলে না গেলে আমার না জানাটা দোষের। আর মেঘনা তো রেগেই আগুন, বলছিল, বিয়েটা তাড়াতাড়ি চুকেবুকে যাওয়া দরকার, তোমার রকম-সকম ওর ভালো লাগছে না। জেঠুরও সেই মত দেখলাম…

সিতু চেয়ে আছে শমীর দিকে। দু চোখ ঝকঝক করছে তেমনি। বলল,

মা যে কি করে গেছে ওরা জানে না, মন্ত্রটাকে তাই বড় করে দেখছে।

শমীর হাবাগোবা মুখ।—বিয়েটা হয়েই গেছে বলছ?

হ্যাঁ। আগ্রহে উদ্দীপনায় সিতু কাছে ঝুঁকল।—শমী একটা কাজ করবে?

শমী আরো ভালো করে অনুভব করছে—এই রাতের মধ্যেই কিছু একটা ঘটে গেছে। ভালো কিছু তাতেও সন্দেহ নেই—কিন্তু ওই চোখ-মুখ এত ঝকঝক্ করছে দেখেই অস্বস্তি বাড়ছে তার। লাজলজ্জা বিসর্জন দিয়ে তাই কৌতুকের সহজ রাস্তা আঁকড়ে থাকার চেষ্টা। ঘাবড়ে যাবার মত মুখ করে বলল, বিয়ে হয়েই গেছে বলছ, রাতে এ ঘরে থাকতে-টাকতে বলবে নাকি?

ঝোঁকের মুখেও সিতু না হেসে পারল না। দেয়ালের দিকে চোখ ফেরালো। এ ঘরেও জ্যোতিরানীর একখানা ফোটো টাঙানো। আঙুল তুলে দেখালো শমীকে, তোমার দুষ্টুমি দেখে মা হাসছে। তারপর হাসিমুখে নিজের বুকটা দেখিয়ে আবার বলল, যে ঘরেই থাকো সর্বদা এখানেই আছো।

ভিতরে আনন্দের ঢেউ একটা, সামলে নিয়ে শমী হাল্‌কা সুরেই জবাব দিল, তাহলে যা বলবে না করে আর পারি কি করে!—কি কাজ?

তোমার ওই কলেজের চাকরি-টাকরি ছাড়তে পারবে?

এ আর এমন কি পারা, কোটিপতির ছেলের বউ আমি, চাকরি করতে যাবই বা কেন? তা কি করতে চাও, আমাকে সন্ন্যাসিনী-টন্ন্যাসিনী বানাবে নাকি?

সিতুর চোখ-মুখ আগের মতই জ্বলজ্বল্ করছে আবার। জবাব দিল না।

হন্তদন্ত হয়ে কোথায় গেছলে, প্রভুজীধামে?

প্রথমে শ্মশানে, সেখান থেকে প্রভুজীধামে।

শ্মশানে শুনে শমী অবাক। সিতু বীথিমাসীর কথা জানাল তাকে। শোনার পর শমী স্তব্ধ খানিকক্ষণ। তারপর বলল, বীথিমাসীকে ওখানে একলা রেখে এলে?

একলা কোথায়, যাঁর ডেরা তিনিই আছেন, তাছাড়া দারোয়ান মালীরাও তো আছে।

খানিক চুপ করে থেকে শমী আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল, আবার প্রভুজীধাম গড়তে বসবে?

তার চোখে চোখ রেখে সিতু মাথা নাড়ল, তাই। বলল, তবে আগে যে রকম দেখে এসেছ, সে রকম নয়, অন্য কিছু।

হরিদ্বার থেকে ফেরার কিছুদিন বাদে কালীনাথ বিশ-বাইশ হাজার টাকার একটা পাসবই সিতুর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। দরকারে চাইতে না হয়। তাই

দিয়েই সিতু প্রভুজীধামের আর একদফা সংস্কার শুরু করে দিয়েছিল। পরে ভার দিয়েছে ছোট দাছুকে। বলেছে টাকা যা লাগে জেঠুর কাছ থেকে চেয়ে নেয় যেন।

গৌরবিমল অবাক।—আবার কি হবে ওখানে?

* * *

কি হবে বলেছে। গৌরবিমল শুনেছেন, শমী শুনেছে, শুনেছেন কালীনাথও। কিন্তু আদর্শের পরিকল্পনা শোনা এক, আর তার আলো সমস্ত সত্তায় জলতে দেখা আর এক। সিতুর মুখের দিকে চেয়ে তাই দেখেছে সকলে। কালীনাথেরই শুধু নির্লিপ্ত বিরস মুখ।

প্রভুজীধামের এই নতুন চিত্রটা সিতুর চোখের সামনে এত স্বচ্ছ আর স্পষ্ট যে সেটাই বিভ্রমের কারণ। তার বক্তব্য, কাঁচা বয়সের ছেলেরা পরিণত বয়সে যা হয়ে ওঠে, আর তা হবে না। প্রভুজীধাম আবার জেগে উঠবে এই ছেলেদের নিয়ে। তাদের চরিত্রের ধাতু বদলে দিতে হবে। তারা সুন্দর হবে, অসুন্দরের সঙ্গে তারা আপস জানবে না। তারা জ্ঞানী হোক, বিজ্ঞানী হোক, যা খুশি হোক, আর তারপরে যেখানে খুশি যেদিকে খুশি ছড়িয়ে পড়ুক—বাধা নেই। কিন্তু সব কিছুর আগে আনন্দের মধ্য দিয়ে আর শুচিতার মধ্য দিয়ে অভিশপ্ত কালের লোভ হিংসা ভয় আর অশুভ বাসনার জঠর থেকে মুক্ত করতে হবে তাদের। এই অভিশাপ অনায়াসে জয় করতে পারার মত চরিত্রের পাকাপোক্ত ভিত গড়ে দিতে হবে। নতুন ভিত। প্রভুজীধামের সেটাই হবে একমাত্র লক্ষ্য, একমাত্র শিক্ষা।

ধ্যানী ভারতের যে চিত্রটা সিতুর চোখে ভাসছে, সেটা বিচিত্র বটে। তার মতে ভারতের প্রথম আর্যরা ছিল বিরাট স্রষ্টা। ছিল কবি-মানস, জ্ঞান-মানস রস-মানসের পূজারী। দেহ-নগরের মধ্যেই সার্থক রূপ-নগরের ফসল ফলাতে চেষ্টা করত তারা। তারা গান গাইত, স্তব করত, মন্ত্র পড়ত, ছড়া কাটত, নাটক করত। আকাশের ঝড় দেখে বজ্র দেখে স্তবস্তুতির মধ্য দিয়ে তারা প্রকৃতির রহস্যের মূলে পৌঁছুতে চাইত, আগুন বৃষ্টি রোগ শোক সংসার-জটিলতার অন্তর্মূলেও ঠিক একইভাবে দৃষ্টিপাত করত তারা। তাদের সেই সব গান স্তব মন্ত্র ছড়ার সমষ্টিই বেদ। কারণ বেদ মানে তো জ্ঞান। কালে এই জ্ঞানের শাখা যত বেড়েছে, বেদের শাখাও ততো বেড়েছে। চিকিৎসা-শাখা হয়েছে আয়ুর্বেদ, যুদ্ধশাস্ত্র হয়েছে ধনুর্বেদ। সংসার-বৈচিত্র্যের হাসি-কান্না চাওয়া-পাওয়ার সংহত রূপ প্রতিফলিত যে 'ঋক'-এ অর্থাৎ মন্ত্রে, সেটা ঋক্‌বেদ সংহিতা, যজ্ঞের জন্য যে কাব্যমন্ত্র দরকার সেটা যজুর্বেদ, আর যজ্ঞের সুরের গান সামবেদ। ভূত-ব্যাধি মানুষকে অথর্ব করে ফেললে যে মন্ত্র-তন্ত্র-টোটকা দরকার, তার হদিস দেবার জন্য অথর্ববেদ।

মানুষের সব থেকে বড় শোক তার এই কবি-মন ক্ষয়ের শোক। ক্ষয় যত বেড়েছে, তার সমূহ স্বার্থের দেহ-নগর ততো বড় হয়ে উঠেছে, রূপ-নগর ততো দূরে সরেছে। যত ক্ষয় হয়েছে, প্রক্ষিপ্ত জটিলতায় বেদ ততো দুরূহ হয়ে উঠেছে। তখনই দেখা দিয়েছে বেদ-শাখার উপর কায়েমী অধিকার লাভের মোহ, অধিকার লাভের গরিমা। বেদাধিকার ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদির শ্রেণীর গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়েছে। অধিকার-ভেদের রেষারিষির সেটাই সম্ভবত সূচনা।

এরই মধ্যে রাজর্ষিরা ধ্যানের ভারতের স্বপ্ন দেখেছিল। রূপনগরের বাস্তব স্বপ্ন। তাদের ধ্যানের সঙ্গে কর্মের নিগূঢ় যোগ ছিল। এমন কি, শ্রীরামচন্দ্রের সত্যযুগকেও কৃষিপ্রসারের কর্মযুগ বলে কল্পনা করা যেতে পারে। জনকের পেশা ছিল চাষবাস। রামচন্দ্র অহল্যা উদ্ধার করেছিল অর্থাৎ পূর্বভারতে হাল পড়েনি এমন বন্ধ্যা জমি উদ্ধার করেছিল ভাবলে ভুল হবে কেন? আর, চাষের জমিতে সীতা অর্থাৎ লাঙলের ফাল কুড়িয়ে পেয়েছিল ভাবলে? সেই সীতা বা ফাল সে নিয়ে গিয়েছিল দক্ষিণ ভারতে, তার মানে সে দেশে কৃষিপ্রসার লাভ করেছিল। বানর আর রাক্ষস বলতে অনার্যরা বাস করত তখন সে দেশে।

রূপনগর কল্পনার বড় অন্তরায় ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়বর্গের অধিকার রক্ষার লোলুপতা, তাদের দম্ভ মোহ শাসন শোষণ। তাদের হৃদয় থেকে নির্বাসিত হয়ে পড়ছিল বৃহৎ জনতা। এরই বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা শ্রীকৃষ্ণের। ক্ষত্রিয়দের মধ্যেও সে নীচু বর্ণের মানুষ। জনতার মরুহৃদয়ে উত্থানের বন্যা নিয়ে এসেছিল সে। ধর্মরাজ্য বলতে তারও ছিল আপামর সকলকে নিয়ে রূপনগর প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ অন্ধতা মূঢ়তা স্বার্থপরতানাশী রূপনগর প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ নয় কেন? সর্বস্তরের মানুষকে জ্ঞানে কর্মে ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা ছাড়া গীতার আর কি লক্ষ্য?

নজির আরো আছে। ঘৃণা লোভ বিভেদের অন্ধকার দূর করার জন্য আপামর সকল মানুষকে মানুষ বলে ডাক দিল সিদ্ধার্থ গৌতম। তার রূপনগরে উঁচু-নীচু সকলের একাসনে বসার অধিকার। সিদ্ধার্থ নির্মূল করতে চেয়েছিল মানুষের অহংবোধ, তাকে সৎ হতে বলেছিল, স্বাভাবিক হতে বলেছিল, অহিংস হতে বলেছিল।

তার এই রূপনগরের ধ্যান বহন করেছে কত রাজাধিরাজ—অশোক, কণিষ্ক, হর্ষ। এই ভারতের বুকে বিজয় পতাকা পুঁতেছে সাম্রাজ্যগ্রাসী পাঠান, দর্পোদ্ধত রথের চাকা ঘুরেছে মোগল বাদশাহদের, বহু তেজ বিকীর্ণ হয়েছে ইংরেজের শাসন পতাকায়। যুগে যুগে তখনো আধ্যাত্মিক ভারতে রূপনগরের ধ্যান করেছে

বিচ্ছিন্ন সাধকেরা—শ্রীচৈতন্য থেকে বিবেকানন্দ গান্ধী পর্যন্ত। জনতাকে ডাক দিয়ে দিয়ে গেছে তারাও, বুকের তলায় রূপনগরের আলো জ্বালতে চেয়েছে।

তারপর ?

তারপর ইংরেজ গেছে। অশোকের ভারতরচনার প্রেরণা আড়ম্বরের বুদ্বুদে মিলিয়েছে। জনতাকে কে ডাকবে ? কে বলবে বেদাহম্ ? শুধু জনতার নয়, ডাক দেবার দায়িত্ব আর নেতৃত্ব যাদের—শত সহস্র বছরের লোভ ব্যভিচার হিংসা দ্বেষ দ্বিধা দ্বন্দ্বের আঘাতে আঘাতে তারা ভ্রষ্ট বিভ্রান্ত বিমূঢ়। রূপনগর গড়ার প্রেরণা শুধু শব্দ আর অনুষ্ঠানের আবর্তে বিকৃত হয়ে উঠেছে, হৃদয়ের অন্তঃপুরে আলো ফেলেনি। রূপনগর নয়, একের পর এক শুধু নগর পুষছে আর পুষ্ট করছে মানুষ। বিকৃত আশা আকাঙ্ক্ষার নগর, বিলাস ব্যসন ব্যভিচারের নগর, হিংসা দ্বেষ হানাহানির নগর, স্বার্থ ভয় অবিচারের নগর।

এই নগরের জঠর থেকে রূপনগর উদ্ধার হবে কেমন করে ? এই নগরের আলো নিভেছে, বাতাস বিষিয়েছে। যা জ্বলছে সেটা লোভের চিতা, যা বইছে তা ওই বিষাক্ত চিতার বাতাস। তাই এই নগরে বসে রূপনগর হবে না, দূরে যেতে হবে, দূরে সরতে হবে—নগর পারে যেতে হবে।

প্রভুজীধাম এই নগর থেকে দূরে নয় বটে, কিন্তু সিতুর স্থির বিশ্বাস, প্রভুজী-ধামের হৃদয় অনেক, অনেক দূরে সরানো সম্ভব হবে—যদি দু-পাঁচজনও গড়ার লোক মেলে, ডাক দেবার লোক মেলে। দশ বছর বাদে বছরে যদি পাঁচ-সাতটি করেও লোভমুক্ত বিকৃত স্বার্থমুক্ত ছেলে বেরোয় প্রভুজীধাম থেকে, তাদের শুভ শক্তিতে দূর-ভবিষ্যতে এই গোটা দেশের চেহারা বদলে যাবে। ওই রূপনগরের আলো তখন নগরের দিকে ধেয়ে আসবে, সেই আলোয় নগর শুচিস্নান করবে।

এই ভাবনা সিতু একদিনে বা কোন এক তপ্ত উচ্ছ্বাসের মুখে ব্যক্ত করেনি। অস্থির আবেগে মুখর হয়ে ওঠেনি। সত্তার ধীর গম্ভীর গভীরতম উৎস থেকে দিনে দিনে প্রকাশের আলোয় এসেছে। গৌরবিমলের মুখে কথা সরেনি। শমীর চোখের পলক পড়েনি···বিপুল অন্ধকার দূর করার অটুট সঙ্কল্প নিয়ে মশাল হাতে একলা বেরিয়ে পড়েছে এক মানুষ, সেই মশালের আলোয় শুধু তারই মুখখানা দেখা যাচ্ছে নিষ্কম্প, স্থির। থেকে থেকে শমীর সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠেছে।

* * * *

মুখ একদিন কালীনাথ খুলেছিলেন শুধু। পরিবেশ অনুযায়ী ঠাণ্ডা গম্ভীর মুখে গৌরবিমলকে বলেছিলেন, মণ পাঁচেক বরফের অর্ডার দাও।

সিতু রাগ করেনি, তর্ক করেনি, ঠাট্টা কানেও তোলেনি। কাগজ কলম নিয়ে

একমনে প্ল্যান করেছে, ছক কেটেছে, শমী আর ছোট দাত্মর সঙ্গে আলোচনা করেছে, ছুটে ছুটে প্রভুজীধামে গেছে বীথিমাসীর সঙ্গে পরামর্শ করতে। সিতুর চোখে বীথিমাসী দিনে দিনে প্রায় মায়ের মতই সুন্দর হয়ে উঠছে যেন। ওদিকে যাদের নিয়ে জেগে উঠবে আবার প্রভুজীধাম, তাদেরও খোঁজ চলেছে। কাদের চাই, কাগজে-কাগজে তার পুরো বিবরণ বেরিয়েছে। গোছা গোছা চিঠি আসা শুরু হয়েছে, ব্যক্তিগত আবেদন-নিবেদনেরও কামাই নেই। এ ছাড়া সরকারী বে-সরকারী আশ্রয়-কেন্দ্রগুলোতেও ঘোরাঘুরি করছে সিতু, কার মুখে প্রতিশ্রুতির স্ফুলিঙ্গ চাপা পড়ে আছে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছে। যাদের চাই তার, তাদের অভাব এদেশে অন্তত হবে না তাও বুঝে নিয়েছে।

সেদিন শমী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, তুমি এসব যে করছ, জেঠুর মত নিয়েছ?

সিতু লিখছিল কি, ঈষৎ বিস্ময়ে মুখ তুলল।—জেঠুর মত নেব কেন?

একটু চুপ করে থেকে শমী বলল, তুমি আবার প্রভুজীধাম নিয়ে মেতে উঠেছ সেটা জেঠুর পছন্দ নয়, এজন্যে সেদিন আমাকেই বকছিল।···আর বাধা না দিয়ে সায় দিচ্ছে বলে ছোট দাত্মর ওপরেও বিরক্ত। এখন যা খরচপত্র হচ্ছে সে-সব বোধ হয় ছোটদাত্মর পকেট থেকেই যাচ্ছে, এই ব্যাপারে এক পয়সাও দেবে না জেঠু তাকে জানিয়ে দিয়েছে। ব্যাপারটা আমার ভালো লাগছে না···।

সিতু হতভম্ব খানিক।—জেঠু টাকা দিচ্ছে না বা দেবে না তোমাকে কে বলল?

আমার সামনেই জেঠু ছোট দাতুকে বলছিল।

এ প্রসঙ্গে শমীকে সিতু আর কিছু বলল না। কলম তুলে চুপচাপ আবার লেখায় মন দিল। হরিদ্বারে প্রেমভাইকে চিঠি লিখছে। প্রভুজীধামের কাজে হরিদ্বার ছেড়ে আসা সম্ভব কিনা জিজ্ঞাসা। একটু অপেক্ষা করে শমী চলে গেল। খবরটা যাকে দেওয়া হল তার চোখে-মুখে এতটুকু উদ্বেগের ছায়া দেখল না।

শমী প্রমাদ গুণল সেই সন্ধ্যায়। সিতুকে জেঠুর ঘরের দিকে যেতে দেখে পায়ে পায়ে সেও দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। জেঠু দেখলেও সঙ্কোচের কারণ নেই, তবু ভিতরে ঢুকতে পারল না।

ঘরে ঢুকে সিতু জেঠুর খাটে তার কাছ ঘেঁষে মুখোমুখি বসল। বলল, মায়ের প্রভুজীধাম আবার নতুন করে শুরু হবে জানো তো?

কালীনাথ হাল্কা জবাব দিলেন, তোড়জোড় দেখছি তো। দরজার দিকে চোখ ফিরিয়ে গলা চড়ালেন, এই মেয়ে, আড়ালে দাঁড়িয়ে আছিস কেন, ভিতরে আয়।

ঠোঁটে হাসি ফোটাতে চেষ্টা করে শমী ঘরে এসে দাঁড়াল। ভিতরে অস্বস্তি।

সিতু জিজ্ঞাসা করল, বাবা তাঁর টাকা আর বিষয়সম্পত্তির কি ব্যবস্থা করেছেন?

আমাকে ট্রাস্টি করে সব রক্ষা করার দায়িত্ব আমার ঘাড়ে চাপিয়েছে।

কার জন্যে রক্ষা করতে বলেছেন?

তোর জন্যে।

সব মিলিয়ে কত টাকা হতে পারে?

কালীনাথ ভাবলেন একটু।—নগদ সত্তর-পঁচাত্তর লক্ষ হবে আর বাড়ি ঘর জমি-জমার দাম ধরলে আরো লাখ চল্লিশেক হতে পারে।

দুই এক মুহূর্ত ভেবে সিতু শান্ত মুখে বলল, সব প্রভুজীধামের নামে ট্রান্সফার করার ব্যবস্থা করো।

মনে মনে কালীনাথও প্রস্তুত ছিলেন। আরো ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিলেন, আমার তাতে আপত্তি আছে।...শমী, ওই চেয়ারটা টেনে বোস্ না।

শমী কাঠ, নড়তেও পারল না।

সিতু জেঠুর দিকে চেয়ে আছে। একটা অসংযত রেখাও পড়েনি মুখে, ঠোঁটের কোণে বরং হাসির আভাসের মত একটু।—তুমি আপত্তি করার কে?

লেখাপড়া অনুযায়ী ভালো-মন্দ বিবেচনা করে সম্পত্তি রক্ষার সমস্ত দায়িত্ব আমার—তুই সুস্থ চিত্তে ঘরে ফিরলে আর সম্পত্তি নষ্ট হবে না বুঝলে তোর হাতে তুলে দেবার কথা।

আমি সুস্থ চিত্তে ফিরিনি বা সম্পত্তি নষ্ট হবে মনে হচ্ছে তোমার?

হ্যাঁ।

কালীনাথ গম্ভীর। সিতু নিষ্পলক চেয়ে আছে তাঁর দিকে। অনুচ্চ স্পষ্ট স্বরে জিজ্ঞাসা করল, তা হলে?

বিয়ে-থা হয়ে যাক, চাল-চলন দেখি। ভালো বুঝলে দিয়ে দেব।

আর তারপরেও যা করতে যাচ্ছি তাই যদি করি?

তখন আর আমার কিছু কর্তব্য থাকবে না। এখনো যদি কথা দিস—পাগলামি না করে ঠাণ্ডা হয়ে বসবি, বিশ্বাস করে সব তুলে দিতে রাজি আছি।

প্রভুজীধামে সব দিয়ে দিলে পাগলামি করা হবে?

হ্যাঁ।

এতেও সংযমে চিড় খেল না বটে, কিন্তু সিতুর গলার স্বর বদলালো একটু। বলল, তোমার বিশ্বাসের জন্য ধন্যবাদ।...বিশ্বাস ভঙ্গ না করেই সব পাবার ইচ্ছে। তাই পেতে হলে এখন বোধ হয় বাবাকে বলতে হবে?

ট্রাস্ট হয়ে যাবার পর তার আর কিছু বলার অধিকার নেই। তার ওপর কথা বলা ছেড়ে হাতের আঙুলও নাড়তে পারে না যখন।...তবে বললে আর একটা স্ট্রোক হয়ে সব শেষ হয়ে যেতে পারে অবশ্য।

তাহলে তাঁকেও কিছু না বলা ভালো বলছ?

তোর টাকা পাওয়ার ব্যাপারে তাকে কিছু বলা না বলা সমান, তাই বলছি।

জেঠুর মুখের ওপর থেকে মুহূর্তের জন্যেও চোখ সরেনি সিতুর। বলল, বাবাকে এর মধ্যে টেনে কাজ নেই তা হলে, তুমিও বোলো না...টাকা পেতে হলে আর কি করা যেতে পারে?

একটু ভেবে কালীনাথ পরামর্শ দেবার সুরে বললেন, আমার ট্রাস্টিশিপ নাকচ করার জন্যে কোর্টে একটা কেস্ করে দেখতে পারিস।

শমীর ব্যাকুল মুখ, কাকে থামাতে চেষ্টা করবে জানে না। জেঠুর সমস্ত মুখ ঘোরাল, কঠিন আর ওদিকের স্থির দুটো চোখ যেন ঝকঝক করছে।

সিতু খাট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল আস্তে আস্তে, দৃষ্টিটা জেঠুর মুখের ওপর আটকে আছে তেমনি। ধীর প্রত্যয়ে বলে গেল, শোনো, বাবার প্রতিটি কপর্দক প্রভুজী-ধামে যাবে।...মা যেদিন প্রভুজীধামের দরজা খুলেছিল সেই তারিখের আর পাঁচ মাস সতের দিন বাকি। সেই দিন সেই তারিখে সেই সময়ে আবার প্রভুজীধামের দরজা খোলা হবে জেনে রাখো...এর নড়চড় হবে না।

ঘর ছেড়ে চলে গেল।

কয়েক মুহূর্তের জন্য জেঠুর অস্থির মুখ দেখল শমী। অস্থির, কঠিন। উঠে পায়চারি করছে ঘরের মধ্যে, ও আছে এও খেয়াল নেই বোধ হয়। শমীর ভয় ধরেছে। চুপ করে থাকতে না পেরে বলে উঠল, এ আবার তোমরা কোন্ রাস্তায় যাচ্ছ জেঠু?

কালীনাথ দাঁড়িয়ে গেলেন। কাছে এলেন।—তুই কি করতে বলিস?

করবেই যখন, যা চাইছে দিয়ে দাও, গণ্ডগোল করে লাভ কি?

থাম্! যা কখনো করেন না তাই করলেন কালীনাথ, চাপা গর্জনই করে উঠলেন। তারপর কঠিন স্বরে বলেন, বুদ্ধি থাকে তো আমাকে না বলে ওকে বোঝাওগে যাও।

ঘর ছেড়ে চলে গেলেন তিনিও। শমী কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে। বুঝতে কোথায় যেন গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে তার।...হাসপাতালে মাসীকে জেঠু কি যেন কথা দিয়েছিল মনে পড়ছে। কথা দিয়েছিল, ওই একজনকে ঘরে ফেরাবে, শমীর জীবন শূন্য না হয়ে যাতে দম বন্ধ হবার মত ভরাট হয় সেই চেষ্টাই করবে।...তাহলে

এরকম করছে কেন জেঠু ? শমী টাকা চায় না পয়সা চায় ?

এরকম মনে হওয়ার পরেও জেঠুকে বোঝার গণ্ডগোল থেকেই গেল যেন।

দিনকয়েকের মধ্যে কালীনাথ কোর্টের শমন পেলেন। সিতু তার সম্পত্তির মালিকানা দাবি করেছে। নোটিসটা হাতে করে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। সামনে শমীকে দেখে হাসিমুখে বললেন, সিতু কোর্টে কেস ঠুকে দিয়েছে, আমার হাত থেকে সব আদায় না করে ছাড়বে না।

সিতুর ঘরে এলেন, ঠোঁটের কোণ থেকে তখনো হাসির আভাস মেলায়নি। পাংশু মুখে তাঁর পিছনে শমীও এসে দাঁড়িয়েছে।

কালীনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, কেস করাই ঠিক করলি তাহলে ?

তাঁর দিকে চেয়ে সিতু তেমনি হালকা জবাব দিল, হ্যাঁ, ও ছাড়া আর রাস্তা নেই তুমিই তো বললে।

কালীনাথ আবার রসিয়ে মন্তব্য করলেন, কিন্তু এও তো দূরের রাস্তা···

ঠিক বোধগম্য হল না। সিতু জিজ্ঞাসা করল, এতেও সুবিধে হবে না বলছ ?

হবে, তোর কেস্ তো জোরালো। তবে তিন-চার বছর সময় লাগতে পারে, পাঁচ মাস কদিনের মধ্যে প্রভুজীধামের দরজা খোলা হবে বলছিলি না···তারও তো আবার কটা দিন চলে গেল।

জবাবে সিতু চেয়ে রইল একটু, তারপর নিরুত্তাপ স্বরে বলল, যেদিন বলেছি দরজা সেই দিনই খোলা হবে।···ততদিনে তোমার শকুনির কর্তব্যবোধ চলেও যেতে পারে।

এইবার অবাক হবার পালা শুধু শমীর। উক্তির তাৎপর্য বুঝল না, প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট। জেঠুর ঠোঁটের হাসি গেছে, সহজতা গেছে। সবিস্ময়ে তাঁকে চেয়ে থাকতে দেখেছে খানিক। তারপর ঘর ছেড়ে চলে যেতে দেখেছে।

শমী উদ্‌গ্রীব, জেঠুকে ও আবার কি বলে বসলে ?

সিতু হাসছে অল্প অল্প। বলল, তুমি বুঝবে না, ঘাবড়াবার মতো কিছু নয়।

দিনকে-দিন শমীর ভয় তবু বেড়েই চলেছে। শুধু ভয় নয়, অজ্ঞাত অস্থিরতাও।

একে একে কটা মাস কেটে গেল। এক জেঠু বদলেছে বলেই বাড়ির বাতাস বদলে গেছে। প্রত্যেক দিনের থেকে প্রত্যেক দিন বেশি গম্ভীর মনে হয় জেঠুকে। বাড়ির অথর্ব মালিকের ঘরে শুধু নিয়মিত ঢুকতে দেখে তাকে। আর কারো সঙ্গে কথাবার্তা নেই তেমন। মাসে দুই-একদিন কেস-এর তারিখ পড়লে বাদী-প্রতিবাদী

দুজনকে একসঙ্গে একই গাড়িতে কোর্টে যেতে দেখে। ফেরেও একসঙ্গে। শমী হাঁ করে চেয়ে চেয়ে দেখে দুজনকেই। অস্বস্তিতে মন ছেয়ে যায়।

ওদিকে প্রভুজীধামের বিস্তৃত আয়োজন থেমে নেই। টাকার অনিশ্চয়তার দরুন প্রাথমিক অনুষ্ঠানের কোথাও এতটুকু রদবদল হয়নি। ইদানীং এই জন্যেই ছোট দাদুকেও বেশ উতলা দেখছে শমী। তাঁকেই বলেছে, কি হবে ছোট দাদু, শেষে বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার হবে না তো কিছু?

গৌরবিমল ওকে আশ্বাস দিয়েছেন বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোথায় গড়াবে ব্যাপারটা নিজেই ভেবে পাচ্ছেন না। সিতুকে বাধা দিচ্ছেন না বলে কালীনাথ তাঁর ওপরেই বেশি অসন্তুষ্ট। কিছুদিন আগেও গৌরবিমল তাঁকে ডেকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন, বলেছিলেন, জ্যোতির প্রভুজীধাম করার সময় শিবুর থেকে তুই-ই তো টাকা আদায় করে দিয়েছিলি, এখন একেবারে বেঁকে বসলি কেন?

ঝাঁজালো শ্লেষে কালীনাথ জবাব দিয়েছেন, তখন আদায়ের প্রশ্ন ছিল, এখন দেবার—লক্ষ লক্ষ টাকা আর সম্পত্তির লোভ এত সহজে ছাড়া যায়? তোমার মতো সাধুপুরুষ তো নই!

অস্বস্তি গোপন করে গৌরবিমল হেসেই বলেছিলেন, এক পয়সাও দিবি না শুনে বিগড়ে গিয়ে সব চেয়ে বসেছে, যা আছে তার মধ্যে কত আর লাগত। একটা ফয়সালা করে কাজটা শুরু হতে দে না, এতটা এগিয়ে গেছে—

আরো চাপা তপ্ত অসহিষ্ণুতায় কালীনাথ বলে উঠেছেন, এগিয়ে যেতে দিলে কেন? বার বার তোমাকে নিষেধ করিনি?

গৌরবিমল আর কিছু বলেননি। কালীনাথের এই মেজাজ দেখে অবাক তিনি। নিষেধ করা হয়েছিল মনে আছে। কিন্তু আনন্দবাবার সায় পেয়েই হাল ধরতে এগিয়েছেন তিনি। সমস্যার কথা তাঁকে লেখা হয়েছিল, তিনি জবাব দিয়েছেন, সব ওপরঅলার ইচ্ছে, উল্টোদিকে সাঁতার না কেটে তাঁর ইচ্ছের স্রোতে বরং গা ভাসাও। আনন্দবাবার এই নির্দেশ কালীনাথকে জানিয়েছিলেন, আর তার ফলে শুধু মামুর ওপর নয়, ওই বাবাটির ওপরেও বিলক্ষণ চটতে দেখা গেছে তাঁকে।

শমী কলেজের চাকরি ছাড়ার নোটিস দিয়েছে বটে, কিন্তু এখনো ছাড়া পায়নি। সেশনের শেষভাগে ছেড়ে এলে মেয়েদের অসুবিধে। কর্তৃপক্ষের অনুরোধে কটা মাস কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। প্রভুজীধামের আসন্ন অনুষ্ঠানের দিন তিনেক আগে ও ছাড়া পাবে। সিতু তাতে আপত্তি না করে বরং সায় দিয়েছে।

সেই অনুষ্ঠানের আর দিন কুড়ি বাকি। এর মধ্যে সিতু দুদিনের জন্য একবার হরিদ্বারে এলো। শমীকে বলল, আনন্দবাবাকে দেখতে ইচ্ছে করছে। শমীরও

সঙ্গে আসার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু একাই যাওয়ার বাসনা দেখে জোর করল না। দুটো দিন আনন্দবাবা যেন বুকে করে রাখলেন সিতুকে। তাঁর হাসিখুশি আনন্দ ধরে না। ঢালা ফতোয়া দিলেন, তোর যাকে খুশি, যত জনকে খুশি নিয়ে যা এখান থেকে, তোর কাজ হয় তো গোটা আখড়াটাকেই তুলে নিয়ে যেতে পারিস।

সিতুর এই মতলবেই আসা। প্রেমভাই ছাড়া আখড়ার আরো জনা পাঁচেককে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় ফিরল। আনন্দবাবাও দুই-একদিনের জন্য এসে সব দেখে-শুনে যেতে চেষ্টা করবেন কথা দিয়েছেন। পথে প্রেমভাই সিতুকে জানালো, গত রাতে আনন্দবাবাকে যত গম্ভীর দেখা গেছে তেমন আর কখনো দেখেনি। শুধু গম্ভীর নয়, বিমর্ষও মনে হয়েছে তার।

সিতু অবাক।—সে কি! আমি তো সারাক্ষণ খুব খুশি দেখলাম!

প্রেমভাই জানিয়েছে, মাঝরাত্রি থেকে একেবারে অন্যরকম দেখা গেছে তাঁকে।

সিতু প্রথমে ভেবে পায়নি কি হতে পারে। প্রেমভাই ভুল করার মানুষ নয়। পরে মনে হয়েছে, জেঠু যা করছে সেই কারণেই উতলা হয়েছেন তিনি। এই একজনের দুশ্চিন্তার ফলেই সিতু জেঠুর ওপর দ্বিগুণ বিরূপ।

মায়ের মৃত্যুর একটা বছর পার হয়ে গেল। পঁয়ষট্টির শেষে চোখ বুজেছিল, এটা ছেষট্টির শেষ। শমীর সেদিন মন খারাপ। কেঁদেছে। মাসীর ছবিতে মালা পরিয়েছে। সিতু হেসে বলেছে, আমি তো প্রভুজীধামের কথা ভাবলেই মা-কে দেখতে পাই।

অনুষ্ঠানের তোড়জোড় একটুও শিথিল হয়নি। কোথা থেকে এত জোর পাচ্ছে সিতু জানে না। প্রভুজীধামে সাড়া জাগছে। বাছাই করা গুটি পঁচিশেক কাঁচা বয়সের ছেলে এসে গেছে—একদিন রূপনগরের মশাল হাতে নিয়ে বেরুবে যারা। আরো আসছে, আরো আসবে। হরিদ্বারের কর্মী যারা এসেছে তারা ব্যস্ত, গৌর-বিমল ব্যস্ত, বীথির নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই। সিতু সমস্ত দিন এখানে কাটিয়ে রাতে বাড়ি ফেরে। ফাঁক পেলে শমীও আসে, বীথিমাসীকে সাহায্য করে। কিন্তু এখনো জেঠুকে অটল অনড় দেখে তার দুশ্চিন্তার শেষ নেই।

তারিখ এগিয়ে আসছে। আর আট দিন মাত্র বাকি। সকালে সত্যিই আনন্দ-বাবা এসে হাজির। একাই বেরিয়ে পড়েছেন। দিনতিনেক কলকাতায় থেকে আবার কোথায় যাবেন। প্রভুজীধামে উঠেছেন। তাঁর আসাটা অপ্রত্যাশিত আশাবাদের মত ভাবছে সিতু। দিনতিনেকের বেশি থাকবে না শুনে রেগেই গেল। —কষ্ট করে আসতে পারলে আর বাকি কটা দিন থেকে যেতে পারবে না?

শমীর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে আনন্দবাবা হাসিমুখে জবাব দিলেন, তুই এবার হরিদ্বারে গিয়ে মাত্র দুদিন ছিলি, আমি তো তবু একদিন বেশি থাকব।

সিতুও তেমনি হেসে ভয় দেখালো, আগে যেতে চেয়ে দেখো, পা খোঁড়া করে দেব।

হা-হা শব্দে হেসে উঠে আনন্দবাবা গৌরবিমলের দিকে ফিরলেন, দেখলি? একেই বলে প্রাণঘাতী ভক্তি। সিতুকে বললেন, পা খোঁড়া করতে খুব বাকি রেখেছিস নাকি?

রাতে গাড়ি নিয়ে শমী একাই ফিরেছে। জ্যোতিরাণীর গাড়িটা এখন ওর দখলে। অন্য দুজন ওখানেই থেকে গেছে। সিতু সকালে বাড়ি এলো। বীথিমাসীর হাতে কিছু টাকা দিতে হবে। বীথিমাসীর হাত খালি, ছোট দাদু আনন্দবাবাকে নিয়ে ব্যস্ত, তাকে বলার ফুরসত মেলেনি, তাই সিতুকে বলেছে।

জেঠু যে পাসবইটা তার হাতে তুলে দিয়েছিল, তাতে বিশ-বাইশ হাজার টাকা আছে এখনো। তার থেকেই তুলবে ঠিক করেছিল। আগামী অনুষ্ঠানের খরচও তার থেকেই চলে যাবে। সমস্যা তার পরে। কিন্তু তা নিয়ে সিতু আগেও মাথা ঘামায়নি, এখনো মাথা ঘামাতে রাজি নয়। সঙ্কল্পে বাদ সাধতে পারে এত শক্তি কারো আছে ভাবে না। তবু বাড়ি ফেরার পর কি খেয়াল মাথায় চাপল তার। জেঠু বাবার ঘরে, সেও ঢুকল। নার্স তখন বাইরের বারান্দায় বসে। বাবা নড়তে পারে না বা কথা বলতে পারে না জেনেও তাকেই জিজ্ঞাসা করল, সিন্দুকের চাবিটা কোথায়?

নির্বাক শিবেশ্বরের চোখে বিস্ময়। তার পরে ব্যস্ততার আভাস। দৃষ্টিটা কালীনাথের দিকে ঘুরল, ব্যগ্র মুখে তাঁকে কিছু যেন বোঝাতে চাইলেন তিনি। ঠাণ্ডা মুখে কালীনাথ সামনের দেরাজ থেকে চাবি বার করে সিতুর হাতে দিলেন।

সিন্দুকে আগের মতই নোটের পাঁজা সাজানো। একশ টাকার একটা বাণ্ডিল তুলে নিয়ে সিতু সিন্দুক বন্ধ করল। চাবিটা জেঠুর হাতে ফেরত দিয়ে বাবার দিকে ফিরল। তখনো তার বিস্মিত চাউনি দেখে খুব সহজ সুরেই বলল, সিন্দুকে আছে ভেবেই আর ব্যাঙ্কে দৌড়ালাম না···ঘরে এত কাঁচা টাকা রাখা ঠিক নয়। হেসে নোটের তাড়াটা দেখালো। অবশ্য আমিই হয়ত হালকা করে দিতে পারব, আপাতত এই নিলাম।

নিল বলেই শিবেশ্বর কৃতজ্ঞ যেন। টাকা জেঠুর কাছ থেকে না নিয়ে এখান থেকে নেওয়া হল কেন সে প্রশ্নও মনে এলো না। ছেলের এই সহজ কথার সুরটুকু যেন চোখ দিয়ে আর দু কান দিয়ে আস্বাদন করলেন তিনি। সিতু আবার

বলল, আর ঠিক সাত দিন বাদে ঘটা করে আবার মায়ের প্রভুজীধামের দরজা খোলা হবে, জানো তো?

জানেন কি জানেন না বোঝা গেল না। ছেলের দিকে চেয়ে আছেন। দেখছেন। ঠোঁটে হাসি ফোটাতে চেষ্টা করছেন।

সিতু বেরিয়ে এলো। যেখান থেকে এসেছে, এক্ষুনি আবার সেখানেই ছুটতে হবে। শমীকে বলতে হবে তার অপেক্ষায় না থেকে কলেজ ফেরত ওখানে চলে যায় যেন। শমীর দেখা পেল না, বোধ হয় চানে গেছে। অপেক্ষা করার ফুরসত নেই, মেঘনাকেই বলে যাবে ভাবল।

সামনে কালীনাথ। ঠাণ্ডা নিস্পৃহ চোখে দেখলেন একটু।—বেরুচ্ছিস?

হ্যাঁ।

কালীনাথ বললেন, আজ কেসএর তারিখ ছিল। সাড়ে নটা বাজে—

কয়েক মুহূর্তের নিঃশব্দ দৃষ্টি বিনিময়। সিতু জবাব দিল, আচ্ছা।

নিজের ঘরের দিকে চলে গেল। খানিক বাদে একসঙ্গে বেরুলো দুজনে। যেমন যায়। কোর্টের কাজ শেষ হতে বিকেল। কালীনাথ গাড়ির সামনে অপেক্ষা করছেন। সিতু এসে বলল, তুমি গাড়ি নিয়ে যেতে পারো, আমি অন্য দিকে যাব।

একটু থেমে কালীনাথ বললেন, আমি এখন তোদের প্রভুজীধামে যাচ্ছি। তুই কোন্ দিকে যাবি?

…প্রভুজীধামে কেন?

ফোনে মামু বলছিল, তোদের আনন্দবাবা আমাকে একবার দেখতে চাইছেন খুব। দেখা দিয়ে আসি।

দ্বিতীয় কথা না বলে সিতু গাড়িতে উঠে বসল।

পাশাপাশি বসে দুজনে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করল। আর একটিও কথা হল না।

প্রভুজীধামে পৌঁছে সিতু অদূরের বড় ঘরটা দেখিয়ে দিল। অর্থাৎ বাবা ওই ঘরে। সে বীথিমাসির খোঁজে চলে গেল।

আনন্দবাবার কাছে গৌরবিমল বসেছিলেন আর শমী বসেছিল। দরজার সামনে জেঠুকে দেখে শমী চমকেই উঠেছিল। সকৌতুকে আনন্দবাবাও তাঁকে নিরীক্ষণ করলেন একটু। তারপর হাসিমুখে ডাকলেন, এসো কালীনাথ এসো, তোমার অপেক্ষাতেই বসেছিলাম, সিতু কোথায়?

কালীদাথ মৃদু গম্ভীর জবাব দিলেন, ওদিকে গেল—

হাসিমুখে আনন্দবাবা বললেন, বোসো। শমীর দিকে ফিরলেন, যা কাজকর্ম

দেখ্ গে, সেই থেকে তো কেবল আড্ডাই দিচ্ছিস—আমি নতুন মানুষের সঙ্গে একটু গল্প-সল্প করি।

দুরু-দুরু বক্ষে শমী উঠে গেল। তার কি যেন আশা, আবার ভয়ও। এই আশা-আশঙ্কার মধ্যেই ঘণ্টাখানেক কাটল। কোনদিকে মন দিতে পারেনি, ঘুরে ফিরে এই দরজার দিকেই চোখ রেখেছে।

এক ঘণ্টা বাদে জেঠুকে আর তার পিছনে ছোট দাদুকে বেরুতে দেখে আশার থেকেও এবারে শঙ্কা বেশি। জেঠুর মুখ ভয়ানক গম্ভীর। তারা গাড়িতে উঠে চলে যেতে পায়ে পায়ে শমী আনন্দবাবার ঘরের দিকে না এসে পারল না।

তেমনি হৃষ্টমুখে আনন্দবাবা ডাকলেন, আয়, ঘরে কেউ নেই, এই ফাঁকে তোর সঙ্গেও একটু জমিয়ে নিই।

লজ্জা পেলেও শমী তাঁর কাছ ঘেঁষে বসল। ঝুঁকে আনন্দবাবা ওকে ভালো করে দেখলেন একটু। তাঁর হাসিমাখা চোখের দিকে চেয়ে শমীর হঠাৎ একবার মনে হল, ওই হাসির নীচে বিষণ্ণ ছায়ার মত কি যেন দেখল একটু। তারপরেই ভাবল, ভুল দেখেছে, শুধুই হাসছেন।

আনন্দবাবা গলা খাটো করে জিজ্ঞাসা করলেন, তোদের ওই জেঠু এভাবে বাদ সাধছে কেন তুই জানিস?

শমী আস্তে মাথা নাড়ল, জানে।

আনন্দবাবার দৃষ্টি তার মুখের ওপর স্থির একটু।—তোর ভয় করছে?

শমী থমকালো একটু, তারপর তেমনি করেই মাথা নাড়ল আবার। ভয় করছে না।

আনন্দবাবার চোখে হাসি ঝরল, কথায়ও। ওর পিঠ চাপড়ে বলে উঠলেন, তুই একটা মেয়ের মত মেয়ে রে বেটী!

সন্ধ্যার পর সকলের সামনেই আনন্দবাবা বললেন, কাল রাতের গাড়িতে তো যেতে হবে, তার আগে সন্ধ্যায় একটু ক্রিয়াকলাপ সেরে যাব। সিতুকে নির্দেশ দিলেন, তুই আবার দিনের বেলায় ভাত-টাত গিলে বসে থাকিস না। শমীর দিকে ফিরলেন, তুইও না।

পরিবেশ-গুণে ব্যক্তিগত আনন্দের দিকটা এত দূরে সরেছে যে কেউ আর এ উক্তি নিয়ে মাথা ঘামালো না। এই রাতেও গাড়ি নিয়ে শমী একাই বাড়ি ফিরেছে। গাড়িতে বসে ভাবছে, বিকেলে আনন্দবাবাকে সত্যি কথা বলেনি। চারদিকের এত আনন্দের মধ্যেও কেন যেন তার ভয়-ভয়ই করছে।

সকাল।

ঘুম ভাঙার পর থেকে এই দিনটা সিতুর অন্যরকম লাগছে কেন জানে না। সিতু দরজার সামনে এসে চারদিকে দেখেছে চেয়ে চেয়ে। প্রভুজীধামে জাগার সাড়া পড়েনি তখনো। সকালটা যেন এইমাত্র শুচিস্নান করে উঠল। আঙিনার ঘাসে ঘাসে শিশির-জলের স্নানব্রত চলছে এখনো। বাগানের আধ-ভেজা টাটকা জুঁইগুলোকে কচি কচি ছেলেমেয়ের নিষ্পাপ হাসিমুখের মত দেখতে লাগছে।

সিতুর মনের তলায় অদ্ভুত একটা পরিপূর্ণতার স্বাদ। এই স্বাদ নিয়ে ভরা উদ্যমে সে দিনের কাজ শুরু করল। অন্য সকলেও ব্যস্ত, উদ্দীপনায় ভরপুর।

ছোট ছেলেদের জড়ো করে তাদের চোখের সামনে সোৎসাহে তখন এক মজার দিনের ছবি তুলে ধরছিল। হঠাৎ সচকিত একটু। কান খাড়া করে এদিক-ওদিক তাকালো। মনে হল কেউ যেন ডাকল তাকে। কাছ থেকে না দূর থেকে ঠিক ঠাওর করতে পারল না। আশ্চর্য মিষ্টি ডাক। আনন্দবাবা কিনা দেখার জন্য বাইরে এলো। কেউ নেই। সত্যি শুনল কিনা বুঝে উঠল না, অথচ সেই ডাকের রেশ সমস্ত দিন ভিতরে লেগে থাকল আর আনন্দ ছড়ালো।

সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দবাবার কাণ্ড দেখে অবাক যেমন খুশিও তেমনি। পাওয়ার দিন বটে একটা আজ। দুটো আসন পেতে শমী আর ওকে মুখোমুখি বসিয়ে সকলের আনন্দের হাটের মধ্যে দুজনের হাতে হাত মিলিয়ে দিলেন আনন্দ-বাবা। মন্ত্র পড়ে বিয়ে দিলেন। শমীর কপালে ও সিঁথিতে সিঁদুর দিলেন। একসঙ্গে অনেক শাঁখ বেজে উঠল।

শমী আনন্দে কাঁপছে। এত লোকের মধ্যেও সিতু চেয়ে চেয়ে দেখছে তাকে। চোখ ফেরাতে পারছে না এমন সুন্দর লাগছে তাকে।

এর খানিক বাদে আনন্দবাবা বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হলেন। দুজনে শেষবার তাঁকে প্রণাম করে উঠতে তিনি সিতুকে বললেন, তোকে আর স্টেশনে আসতে হবে না, এরাই পৌঁছে দেবে'খন—শমীকে নিয়ে তুই বাড়ি যা, বাবাকে প্রণাম কর।

এই আনন্দের দিনে ড্রাইভার খুশিমুখে বাড়ির দিকে গাড়ি ছুটিয়েছে। পিছনে শমী আর সিতু বসে। সিতুর বাঁ হাতে শমীর ডান হাতখানা ধরা। এ কি খুশির জোয়ারে ভাসছে সিতু জানে না। মুখে কথা নেই। এই পাওয়ার তলায় তলায় সকালের সেই আশ্চর্য ডাকের রেশও রিনরিন করছে যেন। শমীর মনের ডাকই সে কল্পনায় শুনেছিল কিনা কে জানে।

কথা শমীও বলছে না। নীরবতায় ভরাট করে রাখার মতই এ বিহ্বলতা।

এমন আনন্দের বরাত এ যেন বিশ্বাস হয় না। তাই অগোচরের ভয়ও একটু। ভয় তাড়িয়ে মনে মনে নিজেই আবার হাসছে।

বাড়ি। দুজনকে দেখে মেঘনা প্রথমে হকচকিয়ে গেল একটু। তারপরেই ব্যাপার বুঝে আনন্দে চেঁচামেচি করে উঠল। ভোলা আর শামুও খুশিতে আটখানা।

বাবার ঘরে জেঠু বসে। শমীর পিঠে হাত দিয়ে তাকে নিয়ে সিতু হাসিমুখে ভিতরে ঢুকল। শিবেশ্বরের দু চোখ বিস্ফারিত হঠাৎ। শমীর মাথায় ঘোমটা, কপালে সিঁথিতে সিঁদুর। দুজনে তাকে প্রণাম করে উঠতে চেতনা ফিরল যেন। উদ্বেলিত মুখখানা আনন্দে স্তব্ধ।

বাবার পরে জেঠুকে প্রণাম করল দুজনে। শমীর মনে হল অনেক দিন পরে জেঠুর গম্ভীর মুখে চাপা হাসির রেশ দেখল একটু।

বাবার দিকে ফিরে সিতু বলল, আনন্দবাবা নিজে বসে বিয়ে দিয়ে তবে রওনা হয়ে গেলেন।

শিবেশ্বরের নির্বাক দুই চোখে হাসি ঝরছে, আশীর্বাদ ঝরছে, আর সেই সঙ্গে একটা আনন্দের কান্নাও বুঝি উথলে উঠতে চাইছে।

ঘরে এসে দুজনে মায়ের ছবিতে প্রণাম করে এদিক ফিরতে দেখে দরজার কাছে জেঠু দাঁড়িয়ে। সিতু ডাকল, এসো—

কালীনাথ এগিয়ে এলেন একটু। খুব সাদাসিধে ভাবে বললেন, কোর্ট থেকে আজ কেস তুলে নেওয়া হয়েছে।···টাকা আর বিষয়-আশয় সব কবে বুঝে নিবি?

জবাব দিতে সময় লাগল। জেঠুর মুখখানা শমী নতুন করে দেখছে আবার। আনন্দে কিনা জানে না, বুকের ভিতরটা ধড়াস ধড়াস করছে তার।

সিতু হাসছে। বলল, তাড়া নেই, সময় হলেই জানাব।

কালীনাথ চলে গেলেন।

রাত্রি।

ইচ্ছেমত কিছু মেয়েলি অনুষ্ঠান পালন করে, দুজনকে একসঙ্গে বসিয়ে খাইয়ে-দাইয়ে মেঘনা খানিক আগে তাদের অব্যাহতি দিয়েছে।

বিছানায় আধশোয়া হয়ে সিতু জেঠুর কথা ভাবছিল। হঠাৎ এই পরিবর্তন আশা করেনি। জেঠুর সঙ্গে আনন্দবাবার গত কাল কি কথা হয়েছে জানে না। সিতু হাসছে আপন মনে। আবারও মনে হচ্ছে, সকাল থেকেই আজ পাওয়ার

উৎসব লেগেছে। সেই আনন্দের মধ্যেই ডুবে যাচ্ছে সে।

শমী লক্ষ্য করছে। এই তন্ময়তা দু চোখ ভরে দেখার মত। দেখছে। এত সুন্দর বলেই কি যেন ভয়। সেই অগোচরের ভয়।...তন্ময়তার এই সৌন্দর্য কাছের নয়।

কাছের নয় মনে হতে ভিতরটা সজাগ হয়ে উঠল শমীর। নিঃশব্দে দরজার ছিটকিনি তুলে দিয়ে এসে পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল আবার। তারপরে কাঁধে বেশ জোরেই একটা ধাক্কা, সঙ্গে ছদ্ম অনুশাসন-ভ্রূকুটি।—এই।

তন্ময়তায় ছেদ পড়ল, সিতু অপ্রস্তুত।—কি হল?

কোথায় ঘুরছিলে, হিমালয়ে না প্রভুজীধামে?

সিতু হাসতে লাগল। পাওয়ার এক সুরে বিভোর হয়ে ছিল, এ আর এক সুর।—তোমার কোন্‌টা পছন্দ?

একটাও না।

প্রভুজীধামও না?

শমী অনায়াসে কথা ঘোরালো।—সেটা পছন্দ না হয়ে আর উপায় কি, আমার প্রভুজীধাম মানে তো তুমি।

সিতুর ভালো লাগছে, মজা লাগছে।—এই যে বললে একটাও পছন্দ না?

ঠিক বলেছি। তুমি নিজের মধ্যে ঘুরবে সেটা পছন্দ না।

বুঝলাম। তুমি কোথায় ঘুরতে বলো?

শমী গা ঘেঁষে বসল। তার একটা হাত তুলে নিয়ে নিজের বুকে ঠেকালো। —আপাতত এইখানে।

...জীবনের এই বুঝি এক পরম লগ্ন, পরম ক্ষণ। ওর চোখে আমন্ত্রণ ছিল। বুকের তলায় আকুতি ছিল। সেই আমন্ত্রণ আর আকুতি দিয়ে অনেক দূরের এক দুর্লভ সুন্দরকে কাছে টানতে পেরেছে। খুব কাছে। নিজে হারিয়ে যাবার মত কাছে। অধরস্পর্শে, বাহুবন্ধনে সর্বাঙ্গ কেঁপে কেঁপে উঠছে। ন বছর বয়েস থেকে বি. এ পাস করা পর্যন্ত এই দেহের ওপর এই মানুষই কতবার হামলা করতে চেয়েছে। শমী তখন ত্রাসে কেঁপেছে। আজও কাঁপছে। আনন্দে কাঁপছে, এই নিবিড় বন্ধন শিথিল হওয়ার শঙ্কা মনের তলায় উঁকিঝুঁকি দিয়েছিল বলেও কাঁপছে।

চোখের ওপর আলোটা ফটফট করে জ্বলছে। কুমারী তনু বিমুখ ওটার প্রতি। তবু ওটা দূর করার ইশারা অব্যক্ত থাকল।—অন্ধকারের পরদা টেনে চোখের আগলটুকুও ঘোচাতে চায় না। সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভবের তৃষ্ণা, আগলে রাখার ব্যাকুলতা। এই অতনুবন্ধনে ও নিঃশেষে হারিয়ে যেতে চায়, নিঃশেষে নিজেকে

বিলিয়ে দিতে চায়।···হারিয়ে গেছে। বিলীন হতে পেরেছে। দেহের অণুতে অণুতে অনাগত সৃষ্টির শিহরণ লেগেছে, অস্তিত্বের প্রতি কণায় ছড়িয়ে ছড়িয়ে শেষে শান্ত বিলয়ের তটে এসে পৌঁছেছে।

রাত্রি তখন গভীর।

সিতু চমকে উঠল। কে ডাকল? সেই সকালের মত। আরো স্পষ্ট। ও ঘুমিয়েছিল কি তন্দ্রাবেশে এক ভরা প্রাপ্তির স্রোতে ভেসে চলেছিল জানে না। এই ডাক যেন চেতনার কোন্ অন্তঃপুরের এক বন্ধ দরজার কড়া নেড়ে দিয়ে গেল।

আশ্চর্য···কে ডাকল?

শমী তার বুকে মুখ গুঁজে ঘুমুচ্ছে। নড়াচড়ার ফলে তার গভীর সুখসুপ্তিতে ব্যাঘাত ঘটার আশঙ্কা সিতুর। একহাতে তাকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে রাখল খানিক। তারপর আস্তে আস্তে উঠে বসল। শমীর মুখখানা দেখল একটু। ভারী সুন্দর লাগছে, ভালো লাগছে। সকাল থেকে সবই তো সুন্দর লাগছে, ভালো লাগছে।

···কিন্তু ডাকল কে?

সিতু স্পষ্ট শুনেছে। সকালের থেকেও স্পষ্ট। ভুল হবার নয়। কোন্ নামে কোন্ ভাষায় ডাকল ঠাওর করতে পারছে না। ওই ডাকের একটা তরঙ্গ শুধু স্নায়ুতে স্নায়ুতে ওঠানামা করছে এখনো।

শয্যা থেকে নেমে দাঁড়াল। ঘরের আলোটা নেভালো। সঙ্গে সঙ্গে জানালা দিয়ে একটা জ্যোৎস্নার স্রোত বিছানার ওপর আর শমীর পায়ের ওপর লুটোপুটি খেতে লাগল। সন্তর্পণে দরজার ছিটকিনি খুলে সিতু সামনের ঘোরানো বারান্দায় এসে দাঁড়ালো।

জ্যোৎস্নার এই বন্যা বড় চেনা-চেনা।···হরিদ্বারে মাঝরাত্তিরে আনন্দবাবার ডাক শুনে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোন পেরিয়ে এমনি জ্যোৎস্নায় স্নান করতে করতে তাঁর ঘরের দরজায় পৌঁছেছিল। সেদিন আনন্দবাবা ডেকেছিলেন, আজ কে ডাকল তাকে?

স্তব্ধ, উৎকর্ণ। তারই অন্তস্তলে কানাকানি চলেছে কি। পাওয়ার ভরপুর আনন্দে পরিতৃপ্ত আত্মা···তারই কলধ্বনি। কিন্তু নিভৃতের আর এক তটে বসে তারই দিকে হাত বাড়িয়ে অপেক্ষা করছে ও কে? নিশ্ছিদ্র এই প্রাপ্তির উৎস থেকে ওই হাত ধরে এবারে তাকে উঠে আসতে বলছে। বিপুলতর কোনো আনন্দ সাগরের হদিস দিতে পারার মত প্রতিশ্রুতির ইশারা দেখছে ওই হাতে।

সর্বাঙ্গে আবার সেই রোমাঞ্চ। আলো-আঁধারি সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে আশা-প্রত্যাশার সব কোলাহল ছাড়িয়ে এ কোন্ সিন্ধুপারের আরতিশঙ্খ কানে আসছে তার? সকালে আর রাতের গভীরে এই ডাকই কানে এসেছিল? নিজের অভ্যন্তরে চেতনার বিদ্যুৎ ঝলসে গেল বুঝি আর একপ্রস্থ। মনে পড়েছে কি। ...যখন মনে হবে সমস্ত দিক কানায় কানায় ভরে উঠেছে, আর কিছু করার নেই, আর কিছু পাওয়ার নেই, তখনো ভাবা দরকার সুন্দরের সেখানেই শেষ নয়, সুন্দরের পূজায় ত্যাগের আরো সাদা নজির রেখে যেতে হবে, সুন্দর খোঁজার আরো সাদা নজির কিছু দিয়ে যেতে হবে, সর্বসুন্দরের জন্য আরো কিছু পেতে বাকি—

আনন্দবাবার কথা।...হরিদ্বারের সেই এক গভীর রাত্রিতে নিজের ধ্যানের আসনে বসে আনন্দবাবা কি সত্যিই মন্ত্র দিয়েছিলেন তার কানে!

দ্রুত, খুব দ্রুত চিন্তা করে চলেছে সিতু। চিন্তা ঠিক নয়, মগজের কোষে কোষে ঝলসে ঝলসে আলো পড়ছে যেন।...যা হারিয়েছিল তার দ্বিগুণ করেই সব আবার ফিরে পেয়েছে বটে। পাওয়ায় সমস্ত দিকে কানায় কানায় ভরে উঠেছে, উপচে উঠেছে। মা-কে পেয়েছে, শমীকে পেয়েছে, হৃদয় নামে এক দুর্লভ জাদুবস্তুর সন্ধান পেয়েছে। ওই হৃদয় দিয়ে অন্তরপুরুষের কাছ থেকে রূপনগর গড়ার নির্দেশ পেয়েছে। চোখের সামনে কচিমুখ ভাসছে ওগুলো। তারা রূপনগরের অভিযাত্রী। তারা এসেছে, আরো আসছে।...আর প্রেমভাইয়ের সঙ্গে সারি সারি আরো অনেকের মুখ চোখে ভাসছে। প্রেমভাইএর সঙ্গীদের মুখ, বীথিমাসী আর শমীর মুখ, ছোট দাদুর মুখ...অভিযাত্রীদের গড়ে গড়ে তোলা কারিগরদের মুখ। তারা এসেছে, আরো আসবে।...এদের সকলের মুখ, এমন কি শমীরও উজ্জ্বল মুখ ছাপিয়ে আবার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে এ কার হাসি-হাসি ঝকঝকে কালো একখানা মুখ?

...জেঠুর মুখ। যার নাম কালীনাথ। কালো মুখের এত আলো আর কে কখনো দেখেছে?

এই এদের মধ্যে এরপর সিতুর কি কাজ? সে কি করবে? কি দেবে? রূপনগর গড়ার নামে এদের সকলের মধ্যে বসে থেকে শ্রদ্ধা কুড়োবে, ভক্তি কুড়োবে, প্রীতি-ভালবাসা কুড়োবে? এরা যা করবে যা দেবে রূপনগরের ছেলে-মেয়েদের জন্য তার বেশি ওর আর কিছু করার নেই? দেবার নেই? সুন্দর ওখানেই শেষ, সর্বসুন্দরের জন্য আরো কিছু পেতে হবে না? সুন্দরের পূজায় ত্যাগের আরো সাদা নজির কিছু রেখে যেতে হবে না? সুন্দর খোঁজার আরো সাদা নজির কিছু দিয়ে যেতে হবে না? ওই প্রভুজীধামের ছোট-বড় সকলে কি

অনুভব করে, যদি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে পারে, তাদের সিতু রূপনগরের জন্য আরো কিছু আলোর খোঁজে গেছে—সেটা সাদা নজির হবে না ?

সিতু স্থির নিস্পন্দের মত দাঁড়িয়ে। পুবের আকাশ সাদা হয়ে আসছে।

পায়ে পায়ে ঘরে এসে দাঁড়াল। ঘুমন্ত শমীর মুখখানা দেখল। নির্নিমেষে দেখতে লাগল।

শয্যায় উঠে বসে ঘড়ির দিকে চোখ পড়তে শমী লজ্জা পেল। বেলা সাড়ে সাতটা। শয্যা ছেড়ে তাড়াতাড়ি নেমে পড়ল। সর্বাঙ্গে একটা সুখের স্পর্শ জড়িয়ে আছে মনে হতেই মুখ লাল। বাইরে এসে এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে যাকে দেখবে আশা করেছিল, তার দেখা পেল না। হাত-মুখ ধুতে গিয়ে একেবারে স্নান সেরে ঘরে ফিরল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের হাতে কপালে সিঁথিতে সিঁদুর পরল। এই সিঁদুরের কৌটোটা কাল আনন্দবাবা দিয়ে গেছেন ওকে।

ঘুরে দেখে মেঘনা দাঁড়িয়ে। পরিতৃপ্ত আনন্দে তাকেই দেখছে। শমী আর একপ্রস্থ লজ্জা পেল।—কি ?

হাসিচেপে মেঘনা বলল, কি আর, ছোট মনিব নেই, সাতসকালে প্রভুজীধামে চলে গে—এ বাড়িতে কেউ কথা শোনে নাকি আমার !

শমী থমকালো একটু, তারপর হেসেই বলল, যাবেই তো, আর চারটে দিন বাদ কত বড় কাজ ওখানে।

কলেজ থেকে ফিরতে বিকেল। আর মাত্র দুদিন, তারপরেই কলেজের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ। বাঁচা যায়। মেঘনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া দায়, একরাশ খাই তবে ছাড়ল। গাড়ি নিয়ে শমী ছুটল প্রভুজীধামের দিকে।

এখানে এসে বীথিমাসীর কাছে শুনল, সকাল থেকে ওই সামনের ঘর বন্ধ। সামনের ঘর মানে যে ঘরে প্রভুজীর বড় অয়েলপেন্টিং টাঙানো। বলল, ঘর বন্ধ করে সিতু সকাল থেকে কি যে এত লিখে চলছে ও-ই জানে। দুপুরে এ বার ধরে এ চোরটি খাইয়ে দেওয়া গেছে শুধু—

শমীর সঙ্গেও দেখা হল না। শমীর মন খারাপ হল বটে, তবু দরজা ঠেলে কাজে ব্যাঘাত ঘটাতে মন সরল না।

পরদিন বিকেলে এসে একই ব্যাপার শুনল। অবিরাম লি ই চলেছে। বীথিমাসী লেখার কথাই বলল শুধু, কিছু একটা খবর গোপন করে গেল। শুধু লেখা নয়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রভুজীর ওই মূর্তির সামনে পাথরের মত যে দাঁড়িয়ে থাকতেও দেখেছে, এ খবরটা বলল না।

কিন্তু এইদিনে শমী দেখা না করে ফিরতে পারল না। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। বারকয়েক মৃদু আঘাত করতে দরজা খুলে গেল।

শমীর বুকের ভিতরটা কি রকম করে উঠল প্রথম। আনন্দে কি শঙ্কায় জানে না। বোধ হয় দুইয়েরই মিশেল। পরশুও কি এত সুন্দর দেখেছিল? নাকি ওরই চোখে ঘোর লেগেছে। কাছে এসে দরজা খুলেছে বটে, কিন্তু এখনো কোন্ দূরের তন্ময়তায় বিভোর হয়ে আছে যেন।

ঘরের মেঝের আসনে একপাঁজা লেখা কাগজ। সহজ হবার চেষ্টায় ছদ্মগাম্ভীর্যে শমী ঘরের চারিদিক একবার দেখে নিল। পরে চোখে চোখ রাখল।—ডিস্টার্ব করলাম?

…দূর থেকে এবারে কাছে আসছে যেন মানুষটা। সিতু হাসল। আসনে ফিরে বসে বলল, না, বোসো।

শমী তার মুখোমুখি মেঝেতে বসে পড়ল।—এত সব লিখছ কি?

সিতু জবাব দিল, প্রভুজীধামের খসড়া…কম ব্যাপার নাকি?

তা শেষ হল?

আরো একটু বাকি।

তার মানে আজও বাড়ি ফেরা নেই। কিন্তু আমি আমার প্রভুজীধাম ছেড়ে থাকি কি করে?

সিতুর মনে পড়ল, পরশু রাতে বলেছিল ও-ই তার প্রভুজীধাম। হাসছে, মৃদু মৃদু। তেমনি হাল্‌কা সুরে জিজ্ঞাসা করল, অঙ্ক করেছ কোন কালে?

সেই স্কুলে পড়ার সময় করেছিলাম। ভুলে গেছি।

আমি মনে করিয়ে দিচ্ছি। তোমার প্রভুজীধাম আমি, আবার আমার ধাম এটা—তাহলে দাঁড়ালো তোমার প্রভুজীধাম এটাই। বুঝলে?

বুঝলাম। তাহলে আমিও রাতে এখানেই থেকে যাই।

সিতু হাসছে, কিন্তু নিষ্পলক চেয়েও আছে তার দিকে।—তাড়া কি, থাকবেই তো। কিন্তু ওই সাদামাটা অঙ্কটা মনে থাকবে তো?

শমী ফিরে চোখ রাঙালো, তোমার পাল্লায় পড়লে কিছু ভোলার জো আছে?

এই জবাবের ফলে ওই চোখে-মুখে যে আনন্দের ছটা দেখল তাতেই ভরপুর হয়ে শমী বাড়ি ফিরল।

পরদিন।

কলেজের এটা শেষ দিন। আজ হলেই অব্যাহতি। মেয়েরা আবার বিদ

অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করেছে ফিরতে দেরিই হবে হয়ত। শমী একটু আগেই কলেজে বেরিয়ে গেল।

সাড়ে দশটায় কালীনাথও অফিসে চলে গেলেন।

তার একটু বাদে সিতু উপস্থিত। মেঘনা আনন্দে কলকল করে বকে উঠল তাকে। হাসিমুখে সিতু বাবার ঘরে এলো। তার সামনে খানিক বসে আবার বেরিয়ে এসে মেঘনাকে বলল, খিদে পেয়েছে, খেতে দে।

শশব্যস্তে মেঘনা খাবার যোগাড় করতে ছুটল। তারপর নিজে সামনে বসে পরিপাটী করে খাওয়ালো তাকে। যা খায়, সিতুকে তার দ্বিগুণ খেতে হল। মুখ হাত ধোয়া হতে মেঘনা তাকে ঘরে শুতে পাঠালো। বলল, দু-দণ্ড জিরোও দেখি, আমি চট্ করে কাজ সেরে নিই—

সিতু ঘর থেকে বেরুলো যখন, বেলা তখন দেড়টা। পায়ে পায়ে বাবার ঘরে সামনে দাঁড়াল। ভিতরে ঢুকল না। দরজায় মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল।

অদূরে মেঘনা। অবাক মুখ। সিতু অপ্রস্তুত একটু, কিন্তু ঠোঁটের কোণে হাসি। কাছে এগিয়ে গেল।

মেঘনা জিজ্ঞাসা করল, হঠাৎ বাবার ঘরের দরজায় প্রণাম করলে যে?

হাসিমুখে তার একটা হাত সিতু দুই হাতের মুঠোয় তুলে নিয়ে বলল, এমনি। তোর খাওয়া হয়েছে তো?

এই তো হল। মেঘনার দু চোখ সজল, মুখের দিকে চেয়ে বলল, তুমি কি ছিলে ছোট মনিব, আর কি হয়েছ। আ-হা, আজ যদি তোমার মা বেঁচে থাকতো গো…

দু চোখ একবার বুজে কথাগুলো যেন আস্বাদন করল সিতু। তারপর আবার তাকালো তার দিকে। চোখে হাসি ঝরছে। বলল, তুইও তো এ-বাড়ির একটা মা-ই র।

হাসির মুখে উদ্গত কান্নার ঢেউ একটা, হাত ছাড়িয়ে মেঘনা তাড়াতাড়ি সামনের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

সিতু হাসছে। পায়ে পায়ে সিঁড়ি পেরিয়ে নিচে নেমে গেল।

শমী বাড়ি ফিরল সন্ধ্যার একটু আগে। দোতলায় পা দিতেই সামনে মেঘনার উদ্বেগভরা মুখ। তাড়াতাড়ি কাছে এগিয়ে এলো মেঘনা।

চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে শমী শুনল কিছু।

শুনল, সকালে সাড়ে দশটার পরে মেঘনার ছোট মনিব এসেছিল। নিজে চেয়ে

খাওয়া-দাওয়া করেছে। বেলা দেড়টার পরে প্রভুজীধামে চলে গেছে। যাবার আগে বাবার ঘরের দরজায় মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করেছে, আর মেঘনাকে এ-বাড়ির একজন মা বলে গেছে। ছোট মনিবের মুখের সেই সুন্দর হাসি দেখে মেঘনার চোখে জল এসেছিল।···তারপর প্রভুজীধাম থেকে এক লোক এসে জেঠুর হাতে একটা চিঠি দিয়ে গেল। সেই চিঠি পড়েই জেঠুর মুখ একেবারে যেন কেমন হয়ে গেল। চিঠি হাতে তক্ষুনি জেঠু শমীর খোঁজে তার ঘরে গেল। ওকে না পেয়ে সেখানেই হাত-পা ছড়িয়ে বসে থাকল খানিক। তারপর ধড়মড় করে উঠে নীচে নেমে গাড়ি হাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল।

খানিক বাদে হুঁশ ফিরল যেন শমীর। ঢুকেই থমকে দাঁড়াল আবার। টেবিলের ওপর খোলা চিঠি, পাশে খাম। এগিয়ে এলো। চিঠিটা তুলে নিল। পড়তে চেষ্টা করল। ঝাপ্‌সা দেখছে চোখে। শক্ত হয়ে বারকয়েক চেষ্টা করার পর অক্ষরগুলো স্পষ্ট হল যেন একটু।

জেঠু,

শকুনির স্বর্গলাভ এত সহজে হয় না। বিষয়-আশয়ের ওপর প্রভুজীধামেরও সব বোঝা ঘাড়ে নিয়ে থাকো এখন বসে। আমি চোখ বুঝলেই দেখতে পাই সামনের উৎসবে প্রভুজীধামের আসল মঙ্গলঘণ্টাটি তুমিই হাতে নিয়েছ। যেমন জ্বালিয়েছ, তার ফল বোঝো এখন। তবে একটা কথা চুপি চুপি স্বীকার করে যাই, তোমার মত সাধকও কম দেখেছি আমি। কিন্তু বড় দুর্বলও—এত নরম মন কেন তোমার জেঠু?

প্রভুজীধাম থাকল, প্রভুজীধামের সকলে থাকল, আর সকলের উপর তুমি থাকলে। আমার সমস্ত চিন্তা আমি লিখে রেখে গেলাম, দরকার মনে করলে দেখে নিও। তা ছাড়া কি হবে না হবে, ছোট দাদুও জানে সব।···আমার যে না বেরিয়ে উপায় নেই জেঠু। রূপনগরের জন্যে আরো যে সাদা নজির চাই, আরো জ্যোতি চাই, আলো চাই। আমি তোমাদের জ্যোতিরাণীর ছেলে, সেই আলোর খোঁজ জ্যোতির খোঁজ আমি পাব না তো কে পাবে? ওই আলোর খবর জ্যোতির খবর অষ্টপ্রহর আমার কানে আসছে।

তুমি মন খারাপ কোরো না, কাউকে মন খারাপ করতে দিও না। তাদের বোল, সিতু আরো কিছু আলোর খোঁজে গেছে, আবার ফিরবে। আর শমীকে মনে করিয়ে দিও, অঙ্কটা যেন না ভোলে। তাকেও মন খারাপ করতে বারণ কোরো, আবার তো ফিরবই আমি—

তোমাদের সিতু।

সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। দেয়ালে প্রভুজীর বড় ছবিটার সামনে সেই থেকে চুপ দাঁড়িয়ে আছেন কালীনাথ।…দীর্ঘদিন বাদে হরিদ্বার থেকে ফিরে সিতু স্টেশনে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মুখে দূরের ছায়া দেখেছিলেন তিনি। প্রায় ওই ছবির মতই দূরের। ধরে রাখার, আগলে রাখার সব বেড়া ভেঙে আবার পালালো…।

এখন ওই ছবির দিকেই চেয়ে আছেন তিনি। এগার দিনের শিশু কোলে ও ঠাকুমার সেই আর্ত পুলকিত চিৎকার কানে বাজছে, তার হাতে পাকা চুল একটা —ওরে কে আছিস কর্তাকে ডাক্ শিগ্‌গীর। দেখো দেখো বউমা, ঘরে কে বুঝি এলো—শিগ্‌গীর দেখো!

দরজা ঠেলে ঘরে পা দিয়ে প্রথমেই ওই ছবির দিকে চোখ পড়তে শমীও শুক্ক মাসীর মুখে শোনা এই একই দৃশ্য তারও মনে এলো। পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে শমী জেঠুর পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল। ওই ছবির দিকে চেয়ে রইল।

কালীনাথ ফিরে তাকালেন। আস্তে আস্তে শমীর মুখখানাও তাঁর দিকে ঘুরল। শান্ত কমনীয়, কালীনাথের নিজেরই দু চোখ জলে চিকচিক করছে। একখানা হাত ওর কাঁধে রেখে হাসতে চেষ্টা করে তবু ওকেই যেন সান্ত্বনা দিলেন। বিড়বিড় করে বললেন, মন খারাপ করিস কেন, আবার তো ফিরবেই বলে গেছে রে…।

সমাপ্ত